প্র কা শি ত হ ল

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম ছত্র ও শিরোনাম-সূচী

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৭টি খণ্ডে ও অচলিত সংগ্রহ ২ খণ্ডে সংকলিত যাবতীয় রচনার সূচী এই প্রথম প্রকাশিত হল। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত যে-কোনো রচনার সূত্রসন্ধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। মূল্য কাগজের মলাট ৪·০০, রেক্সিনে বাঁধাই ৬·০০ টাকা।

সংগীত-চিন্তা

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত হল। এর অনেকগুলি রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। মূল্য ৭·০০ টাকা।

চিঠিপত্র। প্রথম খণ্ড

সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। গ্রন্থশেষে মৃণালিনী-প্রসঙ্গ সংযোজিত নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। চিত্র-সম্বলিত। মূল্য ৩·০০ টাকা।

Tagore for You

ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের রচনা, অভিভাষণ, পত্রাবলী, কবিতা ও রূপক-কাহিনীর সংকলন-গ্রন্থ। রবীন্দ্র-জীবন ও প্রতিভা সম্বন্ধে তথ্যমূলক ভূমিকা সম্বলিত। সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। মূল্য ৫·০০ টাকা।

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার

চিত্রশিল্পীরূপেই অবনীন্দ্রনাথ কীর্তিত। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি কতটা সফল শিল্পী এই গ্রন্থে তা বিশেষভাবে আলোচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা-বক্তৃতামালায় কথিত। সচিত্র। মূল্য ২·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭৩

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭৩

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি

লঙ্ঘন করে

অতিথিদের আপ্যায়ন করলে

আপনার অহমিকা হয়তো তৃপ্ত হতে পারে

কিন্তু তার ফলে

হাজার হাজার লোক

দৈনন্দিন খাদ্যে বঞ্চিত হয়

অতএব

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলুন

যাঁদের নিমন্ত্রণ না করলে নয়, শুধু তাঁদের
নিমন্ত্রণ করুন

আর যে-সব খাদ্য-পরিবেষণ আইনসম্মত
শুধু তাই খাওয়ান

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

LILY
BRAND
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৭৩

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৭৩

Barley
Lily's Malto
LILY'S BOSTON CREAM BISCUIT
LILY THIN ARROWROOT BISCUITS
লিলি
বিস্কুট
শুধু বড়দের নয়
ছেলেমেয়েদেরও প্রিয়
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪
LB-21/66

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭৩

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭৩

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৭৩

'THE PRABASI', 'THE MODERN REVIEW'

77/2/1 Dharamtala Street,
Calcutta-13

Phone : 24-5520

Please send :
All correspondence, M.O.s, Advt. orders etc., to the above address.

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৭৩

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৭৩

রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ প্রথম খণ্ড	বৈশাখ, ১৩৭৩	প্রথম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অর্থনীতির ব্যাখ্যা

যদি কোন দেশের জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোটি হয় তাহা হইলে সেই দেশের সকল লোকের জীবনযাত্রা সুগম ও আনন্দময় করিতে হইলে কি কি প্রয়োজন হইতে পারে সেই সকল বস্তু এবং অবাস্তব সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদির একটা দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা বিশেষ কঠিন হইতে পারে না। একটা কথা প্রথমেই বলা যাইতে পারে। যদি সেই বিরাট জনবহুল দেশে প্রায় দেড় শত কোটি বিঘা চাষের উপযুক্ত জমি থাকে এবং তাহা বাদ দিয়াও প্রায় আরও দেড় শত কোটি বিঘা পর্ব্বত কন্দর, অরণ্য, নদনদী জলাশয়, হ্রদ, পথঘাট প্রভৃতি থাকে তাহা হইলে সেই বিশাল দেশের বিপুল জনশক্তির ব্যবহার ব্যবস্থা থাকিলে কাহারও খাদ্যাভাব কিংবা বাসস্থান, শিক্ষা, বস্ত্র, বাসন, আসবাব, ঔষধ, চিকিৎসা, অবসর উপভোগ আয়োজন ও সভ্যভাবে জীবন নির্ব্বাহের অন্যান্য উপকরণের অভাব থাকিতে পারে না। কারণ মাথা-পিছু এক বিঘা জমি থাকিলে ও সেই জমি উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইলে তাহা হইতে এক ব্যক্তির খাদ্যের সকল অভাব সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষ ভাবে দূর করা যায়। মাথাপিছু দুই বিঘা জমি থাকিলে অপর সকল অভাবও উৎপন্ন বিনিময় করিয়া নিবারণ করা যায়। আর এক বিঘার উৎপন্ন বস্তু যদি এক এক ব্যক্তির দেয় রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হয় তাহা হইলে উপযুক্ত ও উন্নততর চাষের ব্যবস্থা করিলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ৬০।৬৫ কোটি হইলেও কাহাকেও ভিক্ষাপাত্র লইয়া দেশবিদেশে ঘুরিবার প্রয়োজন হইবে না। আমাদের দেশের জনসংখ্যা ৫০ কোটি অপেক্ষা অল্প। আমাদের দেশের সরকারী খবর অনুসারে ৯০।১০০ কোটি বিঘা জমি চাষ হইয়া থাকে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তাহা হইলে আমাদিগের নানান প্রকার খাদ্য-বস্তুর অভাব কেন? কারণ খুঁজিতে বেশী দূরে যাওয়া প্রয়োজন হয় না। ভারতের বাৎসরিক জাতীয় আয় যাহা হয় তাহার অধিকাংশই ক্ষেত্রজাত বস্তুলব্ধ। অর্থাৎ যথাসম্ভব অর্থ ব্যয় করিয়াও ভারত সরকার ক্ষেত্রকর্ষণ ব্যতীত অপর উপায়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে বিশেষ কিছু পারেন নাই। এবং ভারত সরকারের রাজস্ব আদায় জাতীয় আয়ের ১/৪ অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। এই কারণে, যদি ৯০ কোটি বিঘা মাত্র চাষ করা হয় ও তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে অনেক অংশ রাজস্বের হিসাবে কোন না কোন ভাবে চাষীর ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে অভাব সৃষ্টি হইবেই। কারণ ৪৫ কোটি লোক সুখে বসবাস করিতে হইলে ৯০ কোটি বিঘার উৎপন্ন বস্তু তাহাদিগের নিজেদের ভোগে লাগা প্রয়োজন। নানাভাবে তাহাদিগের ভোগের কথা

ছাড়িয়া দিয়া রাজস্ব ও রাজকার্য্য সম্পর্কিত অর্থনীতির আবেগে জমির ব্যবহার হইতে থাকিলে, চাষীর ঘরে অভাব দেখা দিবে নিশ্চয়ই। ভারত সরকার দুইটি মহাভুল করিয়া আজ দেশকে দেউলিয়া করিতে বসিয়াছেন। প্রথম ভুল দেশের জনশক্তি ব্যবহার করিবার পূর্ণ ব্যবস্থা না করিয়া শুধু পরমুখাপেক্ষী অর্থনীতি অনুসরণ। এই কথা আমরা বিগত বহু বৎসর হইতেই বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু ভারত সরকার বা তাঁহাদিগের অনুচর প্রদেশ সরকারগুলি স্বদেশী পরামর্শের কথা শুনিতে ভালবাসেন না। সৎবুদ্ধি বিদেশ হইতে আমদানি করিলে তবে তাহা সরকারের মনঃপূত হইতে পারে। এই কারণে আমরা অথবা অপর কোন কেহ যদি তাঁহাদিগের পরিকল্পনার কোন সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাহা কদাপি গ্রাহ্য হয় নাই। দ্বিতীয় ভুল, চাষের ক্ষেত্র প্রসার না করা। যে স্থলে রাজস্ব পাইতে চাষের ক্ষেত্রই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ, সে স্থলে ঋণ করিয়া বিদেশী যন্ত্র না বসাইয়া আরও একশত কোটি বিঘা চাষের ক্ষেত্র, ফলবাগান, মৎস্য উৎপন্ন করিবার জলাশয়, পশুপালন ক্ষেত্র ইত্যাদি গঠন-চেষ্টা পূর্ব্ব হইতেই করা উচিত ছিল। যন্ত্র-নিবিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয় ভারতের বহু লোকেরই জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় ছিল। টি, ভি, এ, অথবা ড্নাপ্রপেট্রভস্ক্ প্রভৃতির নামও অনেকেই জানিতেন। কিন্তু কংগ্রেসের অর্থনীতি বিশারদদিগের মনে হইল কল চালাইয়া দেশের সকল অভাব দূর করিয়া ফেলা এতই সহজ যে, বিদেশী যন্ত্র ও যন্ত্রচালক কিছু কিছু আনাইয়া ফেলিলেই ঐশ্বর্য্যের বন্যা বহিতে আরম্ভ করিবে। ফলে আসিল সুদ ও আসল দিবার ধাক্কা। কিন্তু কষ্টকল্পনার এখনও শেষ হয় নাই। গরীবের মেহনতের ফল রাজস্ব হিসাবে লইয়া এখনও সেই নিউইয়র্ক, লণ্ডন ও মস্কোই চলিতেছে। বিদেশীর দাসত্বের পুরাতন মনোভাবের ইহা নতুন অভিব্যক্তি। ভারতবর্ষে শতাধিক সহর আছে যেগুলিতে এক লক্ষাধিক করিয়া লোকের বাস। আরও বহুশত সহর আছে যাহাতে ১০,০০০ হাজার হইতে এক লক্ষ লোকের বাস। এই সকল সহরে আবাস ও কারখানার কেন্দ্রগুলিতে ভারতের কয়েক কোটি লোকের বাস—প্রায় ১০।১৫ কোটি হইতে পারে। এই সকল লোকের কার্য্য জ সহিত সাক্ষাৎভাবে জড়িত নহে এবং ইঁহাদিগের খ দোকানদার, আড়তদার প্রভৃতির সাহায্যে যথাস্থ পৌঁছায়। অর্থাৎ ভারতের উৎপন্ন খাদ্যবস্তুর শতক ২৫।৩০ ভাগ দোকানদারদিগের সাহায্যে সহরে কারখানা অঞ্চলে চালান হয়। ইহার লাভ যাহা তাহার কিছু অংশ নানা ভাবে রাজকার্য্যে লাগি থাকে। ভোটের খরচও, মনে হয় এই খাদ্য ব্যবস গণই অধিক করিয়া দিয়া থাকে। সেইজন্য খ ব্যবসায়ীদিগের জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করা রাষ্ট্রনী ক্ষেত্রের নেতাগণের অধিকাংশের দ্বারা পরোক্ষভ অনুমোদিত। বর্ত্তমানে যে খাদ্যের অকুলান, মূল্য ও ভেজাল ইত্যাদি প্রসূত নিকৃষ্ট, তাহার জন্য খাদ্য বিক্রেতাগণই অপরাধী বলা যাইতে পারে। তা দিগকে যাহারা সাহায্য করে, প্রশ্রয় দেয় ও আইন কবল হইতে বাঁচায়, তাহারাও এই বিরাট অপরাধে সহিত জড়িত। ইহাদিগের মধ্যে সরকারী লোক অস আছে বলিয়া সকলের ধারণা। অর্থাৎ বর্ত্তমান খা সমস্যা খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতির জন্য কিছুটা ঘা থাকিলেও, প্রধানত তাহা খাদ্য ব্যবসায়ী সাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টার ফল। ভা সরকার ও প্রদেশ সরকার সমষ্টি কোন সময়ে ইহার বে আমূল সংস্কার চেষ্টা করেন নাই। ডি. আই. আর. f অল্প কয়েকজন ব্যবসায়ীকে দমন চেষ্টাকে আমূল সং চেষ্টা বলা ভুল হইবে। অর্থাৎ আড়ত ও দোক চলিতেছে প্রায় সেই একই ভাবে প্রবঞ্চনার পথে। খ উৎপাদন বিশেষ করিয়া অধিক হইলে এবং তা কেনাবেচা ও চালানের উপর কোন প্রকার সরকারী ব না থাকিলে ব্যবসায়ীদিগকে জনসাধারণ কিছুটা সা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার উপায় নাই। কা যে সকল বস্তু রপ্তানি করিয়া ভারত সরকারের হ বিদেশের অর্থ আসে তাহার জোগাড় ও চালান খ ব্যবসার সহিত মিলিত। দেখা যায় মৎস্য চালান হই আসে প্রায় ৫ কোটি টাকা। বাদাম ইত্যাদি হা ২৩ কোটি, কফি ৮ কোটি, চা ১২৫ কোটি, মশলা কোটি, তৈল ইত্যাদি ৩৫ কোটি, তামাক ২২ কে

চামড়া সাড়ে ৮ কোটি, চীনাবাদাম ৪ কোটি, কাঠ ৩ কোটি, পশম সাড়ে ৫ কোটি, তুলা ইত্যাদি ১৭ কোটি, অভ্র ৯ কোটি, খনিজ লৌহ ইত্যাদি ৪০ কোটি, খনিজ ম্যাঙ্গানিজ ৮ কোটি, হাড় ইত্যাদি আড়াই কোটি, অরণ্যজাত বস্তু ৮ কোটি, কয়লা আড়াই কোটি, চীনাবাদাম তেল সাড়ে ১৩ কোটি, অপর তৈল সাড়ে ৭ কোটি, ট্যানকরা চামড়া ২৬ কোটি, তুলার কাপড় ইত্যাদি ৫৬ কোটি, পাট ইত্যাদি ১০৬ কোটি, ব্যাগ থলে প্রভৃতি ৪৮ কোটি, কৃত্রিম কাপড় ইত্যাদি ১১ কোটি, বস্ত্রজাতীয় বস্তু ৪ কোটি, গালিচা ৬ কোটি, জুতা ৩ কোটি। অর্থাৎ সবই প্রায় আড়ত ও দোকানগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট। নব নব পরিকল্পনা হইতে পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। অথচ সহস্র সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে আর্থিক উন্নতি করা হইয়াছিল, হইতেছে ও হইবে তাহা হইতে উৎপন্ন কোন বস্তু বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। খাদ্যবস্তু উৎপাদনের পরিবর্ত্তে রপ্তানির মাল উৎপাদনের জন্য অনেক চাষের জমি ব্যবহার করা হইতেছে, যাহার ফলে ভারত সরকার ব্যয় করিবার জন্য বিদেশী অর্থ পাইতেছেন। জনসাধারণের ভোগের জন্য এই অর্থের বিশেষ কিছু ব্যয় করা হইতেছে না। শুধু কিছুদিন বাধ্য হইয়া খাদ্য আমদানি করা হইতেছে। এবং কিছু যুদ্ধের মালমশলার জন্যও ব্যয় হইয়াছে, যাহা না করিলেই চলিত না। ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতি বাজারের দুর্নীতির সহিত গভীর ভাবে জড়িত। ইহার সংস্কার সমাজ সংস্কারের প্রধান কার্য্য।

ভারতের অর্থনীতির মূল কথা এখনও চাষ, পশুপালন, খনিজ আহরণ, তুলা, পাট, চা, কফি, পশম, রেশম প্রভৃতি উৎপাদন এবং ঐ সকল বস্তুকে কারখানায় নব নব আকার দান করা। অতি আধুনিকভাবে গঠিত যে সকল কারখানা সেগুলির জন্য জাতীয় সম্পদ ততটাই নিযুক্ত করা উচিত যাহা না করিলে নহে এবং যাহা না করিলে জনসাধারণ ও দেশের উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করিয়া জগতের অপরাপর দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ ও সেই সকল দেশের লোক ডাকিয়া আনিয়া ভারতের জীবনধারায় বৈপরীত্যের সৃষ্টি করা আর্থিক পরিকল্পনার অঙ্গ হইতে পারে না। এই সকল কথা বিচার করিয়া চলিলে ক্ষমতার ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত আগ্রহ ও চেষ্টার আবর্ত্তে পড়িয়া এই মহাদেশের অবস্থা আজ জগতসভায় এতটা অসম্মানকর হইত না।

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র পর্য্যটন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে গমন করিয়া অপর দেশের রাষ্ট্র-নেতাদিগের সহিত আলাপ ও আলোচনা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের সম্বন্ধে যে সকল ভুল ধারণা ও বিরুদ্ধভাব অপর দেশে ভারত শত্রুগণ সৃষ্টি করিয়াছে সেই মনোভাব দূরীকরণ এবং ভারতের সহিত সকল দেশের যথাসম্ভব মিত্রতা স্থাপন চেষ্টা। শ্রীমতী গান্ধী প্রথমে ফ্রান্সে গিয়া প্রেসিডেন্ট দ্য গল-এর সহিত ভারত ও ফ্রান্সের পারস্পরিক ব্যবসা, বৈজ্ঞানিক কৌশল ও জ্ঞান বিনিময় এবং কৃষ্টি পরিচয়জাত সম্বন্ধ বিস্তার লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করেন। যদিও জেনারেল দ্য গল ভারত-চীন-পাক সম্বন্ধ বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, তাহা হইলেও ব্যবসার বিনয়, বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সাহায্য ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করা আলোচনার মধ্যে বারম্বার উঠিয়াছিল। এই আলোচনা ভারত-ফ্রান্সের সম্বন্ধ নিকটতর করিয়াছে।

শ্রীমতী গান্ধী অতঃপর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সেখানে তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা দেওয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা নানান বিষয়ে হইয়াছিল। প্রথমত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তহবিলে যেসকল অর্থ পি এল৪৮০ পদ্ধতির খাদ্য সরবরাহের জন্য ভারতে জমা আছে তাহা হইতে টাকা লইয়া একটি শিক্ষা বিস্তার ব্যবস্থার গঠন প্রস্তাব স্থির করা হয়। এই জন্য আমেরিকার তহবিল হইতে ৩০০০০০০০০ ডলার ব্যয় করা হইবে। ভারত কি দিবেন তাহা স্থির হয় নাই। বিজ্ঞান ও শিল্প কৌশল শিক্ষা সম্ভবত এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে প্রসার লাভ করিবে। ইহা ব্যতীত ভারতকে খাদ্য সাহায্য হিসাবে আমেরিকা ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও ৩৫ লক্ষ টন খাদ্য পাঠাইবেন স্থির হয় এবং তাহারও অতিরিক্ত সাহায্য বলিয়া অপরাপর

খাদ্যবস্তু, যথা উদ্ভিজ্জ তৈল, গুঁড়া দুগ্ধ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে ভারতে পাঠান হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অপরাপর দেশের নিকটও ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। সেই সাহায্য খাদ্য ব্যতীত সাধারণ ভাবে আর্থিক ও অন্যান্য ভাবেরও হইবে। শ্রীমতী গান্ধীর আমেরিকা গমনের ফলে ভারতের বর্ত্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক অভাব অনেকটা দূর হইবে। কিন্তু অভাবের কারণ দূর হইবে কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না। সহজলব্ধ সাহায্য অনেক ক্ষেত্রে মানব চরিত্রের উপর বিপরীতভাবে কার্য্য করে। এই কারণে ভারতের জনসাধারণ সাহায্য পাইয়া লাভবান হইবেন বর্ত্তমানে, কিন্তু ইহার ফল ভবিষ্যতে কি হইবে সে বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কংগ্রেসী রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থার সংস্কার প্রায় সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া প্রয়োজন। দল বাঁধিয়া ভোট সংগ্রহ করা সহজ, কিন্তু ঐ কার্য্যে যাহারা বিশেষ পটু ও সক্ষম, রাজকার্য্য ও অর্থনৈতিক গঠনে তাহারাই আনাড়ি ও অকর্ম্মা প্রমাণ হইতেছে। এই কারণে কংগ্রেসের পক্ষে নিজেদের দলের সংস্কৃতি সাধন না করিয়া, জনসাধারণের ঋণের বোঝা বাড়ান উচিত নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে শ্রীমতী গান্ধী ইংলণ্ডে কয়েক ঘণ্টার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেখানে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলসন তাঁহার সহিত অশেষ বন্ধুত্বের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধের সময় ভারতের ও ব্রিটেনের বন্ধুত্বে বড় বড় ফাট দেখা দিয়াছিল, ব্রিটেনের পক্ষপাতিত্ব দোষে। সেই ফাট মেরামত করিবার চেষ্টা উইলসন করিয়াছেন। লাল গোলাপ ও মিষ্ট কথার বাহুল্যে শ্রীমতী গান্ধী অভিভূত হইয়াছিলেন অন্তত সাময়িকভাবে। বস্তুত ব্রিটেন কি ভাবে অতীতের শত্রুতাকে ভবিষ্যতের সখ্যে পরিণত করিবেন তাহা এখনও অজানার অন্তরেই নিবিষ্ট। শ্রীমতী গান্ধী ইহার পরে মস্কো গমন করিলেন। এখানে তিনি সম্ভবত কোসিগিন মহাশয়কে বলেন যে ইউ.এন. এবং তাসখন্দের ফলে পাকিস্তান যুদ্ধের পরাজয়কে রাষ্ট্রনৈতিক বিজয়ে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু ভারতের কি সুবিধা হইয়াছে তাহা বোধগম্য হইতেছে না। এই অবস্থায় রুশ নিজ কার্য্যের ফল হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য কি করিতে পারেন। অবশ্য রুশ বর্ত্তমানে চীনকে না ঘাঁটাইয়া চলিতেই উৎসুক। অর্থাৎ পাকিস্তান এখন কম্যুনিষ্ট জগতের বিশেষ অনুগৃহীত পোষ্য এবং কোন রাষ্ট্রনৈতিক গুপ্ত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এংলো আমেরিকানদিগেরও পোষ্য। এই অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত ভারতের পূর্ণ সমর্থন কোন রাষ্ট্রই করিবেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সাবধানতা ও আত্মনির্ভরশীলতাই অবশ্য প্রয়োজনীয় পন্থা।

হরতালের অর্থ কি ?

হরতালের অর্থ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, হরতাল করা হয় দোকান-পাট, কারখানা ইত্যাদি বন্ধ রাখিবার জন্য। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয় মানুষের যাতায়াতের প্রয়োজন থাকে না বলিয়া। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে রাস্তায় চলাচল করিলে হরতালের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। এবং দেখা যায় যে হরতালের দিনে সহস্র সহস্র ব্যক্তি, প্রধানত অল্পবয়স্ক বালক ও যুবক, কাতারে কাতারে রাস্তায় ঘুরিতেছে। অফিস অঞ্চলের রাস্তায় ইহারা যায় না, কারণ সেখানে লোকজন না থাকায় কোন প্রকার উত্তেজনার কারণও থাকে না। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ইহারা ঘুরিয়া লোকের গাড়ি থামাইবার চেষ্টা করে ও গাড়ি চড়িয়া কেহ যাইলে তাহাদিগকে অপমান সূচক কথা বলে। অনেক সময় অপর প্রকার দুর্ব্বিনীত ব্যবহারও করে। মনে হয় যেন হরতাল হইলে পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়ান ও হৈচৈ করা বারণ নহে; শুধু গাড়ি চড়িয়া কেহ বাহির হইলেই তাহা মহা অপরাধের বিষয়। কিন্তু যদি গাড়িতে কোনও বিশেষ পতাকা উড়ান হয় তাহা হইলে গাড়িও চলিতে পারে। জনসাধারণের উচিত হরতালের পূর্ব্বে এই সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া "নেতা" ও তাঁহাদিগের সৈন্যদলের সহিত। কারণ তাহা না হইলে গাড়ি চড়িয়া বাহির হইবার অপরাধে বিশেষ শাস্তি পাইতে হইতে পারে। হরতাল অর্থে যদি নাবালকরাজ ও সাবালকের যথেচ্ছাচার বুঝিতে হয় তাহা হইলে জনসাধারণ আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাতে যোগদান

করিতে পারিবেন না। শোক দুঃখ প্রকাশ বা বিরুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে হরতাল করিতে হইতে পারে, কিন্তু অসভ্যতার প্রয়োজন কোথায়?

ভারতের খাদ্যাভাব

কেউ বলেন, দেশে খাবার যথেষ্ট নাই। কেউ বলেন, আছে কিন্তু ব্যবসাদারদিগের লোভের জন্য কালোবাজারে চলিয়া গিয়াছে এবং লোকে উচিত মূল্যে ক্রয় করিতে পারে না। আরও অপর লোকে বলেন, গভর্ণমেণ্টের নিয়ম-কানুনের ধাক্কায় খাদ্যবস্তু বাজার হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং কণ্ট্রোল উঠাইয়া দিলেই সকল অভাব দূর হইয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট বলেন "লেভি" বা আইনতভাবে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল ক্রয় করিয়া তাহা সকলকে আইনত নির্দ্দিষ্ট বিক্রয় মূল্যে অল্প অল্প করিয়া দিবার ব্যবস্থা, বা "র‍্যাশনিং" করিলেই খাদ্যাভাব দূর হইবে। ইহার মধ্যে সত্য কোথায় গা ঢাকা দিয়া লুকাইত তাহা কে বলিতে পারে? দেশে যথেষ্ট খাদ্যবস্তু নাই, সকলের ইচ্ছামত খাইবার পক্ষে; এ কথা সত্য। অল্প অল্প খাইলে যথেষ্ট আছে বলিয়া মনে হয়। অধিক খাইবার ইচ্ছা থাকায় ব্যবসাদারগণ যাহাদিগের অধিক অর্থ আছে তাহাদিগকে মূল্য বাড়াইয়া খাদ্যবস্তু বিক্রয় করিতে সক্ষম হয়। যথেষ্ট খাদ্যবস্তু থাকিলে তাহা করা সম্ভব হইত না। অধিক অর্থ আছে সহরের ও কারখানার লোকজনের। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই গভর্ণমেণ্টের চাকুরি করেন এবং অপরাপর লোকের সহিতও গভর্ণমেণ্টের পরোক্ষভাবে সংযোগ আছে। এই কারণে সহরে ও কারখানা অঞ্চলে যদি খাদ্যমূল্য বাড়িয়া যায় তাহা হইলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে তাহার নিবৃত্তির জন্য গভর্ণমেণ্টের ব্যয়-বাহুল্য হইবে নিশ্চয়। অপরাপর অফিস, দফতর কারখানার বিক্ষোভও গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ের উপর প্রতিফলিত হইবে। সেই কারণে গভর্ণমেণ্টের খাদ্যমূল্যে নিয়ন্ত্রণ করিবার ইচ্ছা সদাজাগ্রত। কিন্তু খাদ্য উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিবার ইচ্ছা গভর্ণমেণ্টের আছে বলিয়া লোকে মনে করেন না। গভর্ণমেণ্টের স্বভাব সর্ব্বক্ষেত্রে রাজস্ব হিসাবে সকল কিছু আদায় করিয়া লওয়া। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে গভর্ণমেণ্টের "লেভি"র মূল্য চাষীরা উপযুক্ত মূল্য বলিয়া মনে করেন না। কারণ তাহা মনে করিলে তাঁহাদিগের গভর্ণমেণ্টকে ধান-চাল বিক্রয়ে অনিচ্ছা কেন? গভর্ণমেণ্টও যে দরে ক্রেতাকে খাদ্য বিক্রয় করিতেছেন তাহার তুলনায় অতি অল্প মূল্য দিয়া বিক্রেতার নিকট হইতে ধান চাল আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জনমত। উপযুক্ত মূল্য যদি না দেওয়া হয় তাহা হইলে যতটা অল্প দেওয়া হইতেছে সেই অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করিয়া লওয়ার মত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের কিছু লোককে খাদ্যবস্তু সরবরাহ করিবার ভার লয়েন তাহা হইলে তাহার লাভ-লোকশানের অংশ সকল দেশবাসীর পক্ষে সাম্য নীতি অনুগামী হওয়া উচিত। চাষীকে অল্প মূল্য দিয়া সে লোকসান পুরাইবার নিয়ম সাম্য নীতি অনুগামী নহে। যাহারা কালোবাজারে খাদ্যবস্তু বিক্রয় করে তাহাদিগের উপর বিশেষ কর বসাইয়া কিছু লোকসান পূরণ ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে। যাহারা গ্রামে যে দামে খাদ্যবস্তু বিক্রয় করিতে পারে তাহাদিগকে সেই মূল্য দিলে তাহারা গভর্ণমেণ্টকে খাদ্যবস্তু বিক্রয় করিতে নারাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। শুধু বাংলা দেশে নহে, সকল প্রদেশেই দেখা যাইতেছে যে, গভর্ণমেণ্টের "লেভির" মূল্য অত্যল্প বলিয়া সকলেরই অভিযোগ। এবং এই অল্প মূল্য দিয়া খাদ্যবস্তু আদায় করিয়া লওয়া গুপ্তভাবে রাজস্ব আদায় বলিয়া অভিযোগকারীগণ মনে করিতে পারে। কালোবাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদিগের উপর শুধু অসহায়ভাবে চাহিয়া থাকা ও মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের নিন্দা করিলেই শাসকের শাসন-কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। ডি. আই. আর. নিয়মে কিছু ধরপাকড় করিয়া তাহার পরে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিলেও ভারতরক্ষার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। যদি খাদ্যের বাজারে ভারত শত্রুগণ আত্মগোপন করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে থাকে তাহার দায়িত্বও গভর্ণমেণ্টের। তাহার জন্য চাষীকে অল্প মূল্য দিয়া তাহার উৎপন্ন খাদ্যবস্তু আইনের জোরে আদায় করিয়া লইলেই দেশরক্ষা করা হয় না। এইবার যাহা হইল ও হইতেছে তাহা দেখিয়া ও তাহাতে ঠেকিয়া যদি দেশের শাসকদিগের শিক্ষা না হয়, তাহা হইলে আর কোন উপায়ে দেশবাসী সে শিক্ষা

গভর্ণমেণ্টকে দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে? দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অরাজকতা কোন ন্যায্য উপায় নহে, একথা সকলেই জানে। গভর্ণমেণ্ট কি কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে পারেন না?

আধ্যাত্মিকতা ও রাজকার্য্য

ভারত যখন ইংরেজের অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে পরিগণিত হইত এবং তাহাদিগের ব্যবসাদার, শাসন-কর্ত্তাবৃন্দ, সৈনিক, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি ব্রিটিশ জাতীয় ব্যক্তিদের যশ ও ধনোপার্জ্জনের ক্ষেত্র ছিল, তখন কিছুদিন সেই বিদেশীদিগের লুণ্ঠন, শোষণ, অত্যাচার, অনাচার ইত্যাদি সহ্য করিয়া ভারতের চিন্তাশীল ও কর্ম্মী লোকেদের পরাধীনতা শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া স্বাধীন হইবার আগ্রহ হইল। ইহার পরে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ইংরেজের দাসত্ব মুক্ত হইবার জন্য ভারতীয় নরনারী উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। যে দিকেই দেখা যাউক না কেন, ইংরেজের আধিপত্য নষ্ট করিয়া নিজেদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের চেষ্টা ভারতে সর্ব্বত্র জাগ্রত হইয়া পড়িল। শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় ভারতবাসীগণ নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় বুদ্ধিমত্তা কোন অংশে কম নহে, বারম্বার প্রমাণ হইল। চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন ব্যবসা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, সামরিক কৌশল ও বিভিন্ন বিজ্ঞান-চর্চ্চায় ভারত জগতের অপরাপর জাতির সহিত সমকক্ষতা দেখাইতে লাগিল। ক্রমশঃ ব্যবসা, শিল্পকলা, যন্ত্র ও কারখানা চালনা ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়েও ভারত পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রাম নানাভাবে চলিতে লাগিল। সশস্ত্র আক্রমণ, কথায় ও লিখিত ভাবে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার, অসহযোগ আন্দোলন, রাজস্ব দান নিবারণ চেষ্টা, ব্রিটিশের ব্যবসা নষ্ট করিবার জন্য বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন প্রভৃতি বহু উপায়ে তাহাদিগের পক্ষে সাম্রাজ্যরক্ষা কঠিন বা অসম্ভব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই কার্য্য প্রধানত ত্রিবিধ রূপ ধারণ করে। ব্যক্তিগত উন্নতির চেষ্টা, প্রচার, বিদেশী বাণিজ্য বর্জ্জন ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগরণের চেষ্টা; সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা ব্রিটিশ বিতাড়ন এবং কংগ্রেসের প্রচার ও আন্দোলন। প্রথম উপায়ে ভারতব্যাপী জনমত গঠিত হয় এবং ক্রমশঃ বহু লোকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রমাণ হইয়া যায় যে, ভারতীয়দিগের উপর দাসত্ব করিবার কোন মানসিক অক্ষমতাজাত কারণ নাই। বহু ব্যক্তি নিজ নিজ চেষ্টায় এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৯০—১৯৪০ এই অর্দ্ধশতাব্দীকালে, এরূপ ভাবে কর্ম্মক্ষমতা, পাণ্ডিত্য, কলাকৌশল ইত্যাদি দেখাইয়াছিলেন যাহাতে ব্রিটিশের তথাকথিত স্বয়ংসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতা ক্রমশঃ মিথ্যা প্রমাণ হইয়া যায়। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে বহু মহামানব ছিলেন যাঁহারা অভূতপূর্ব্ব চরিত্রবলও দেখাইয়াছিলেন ও যাঁহাদিগের দৃষ্টান্তেই ভারতের জনগণ উন্নতির পথে একাগ্রতার সহিত চলিতে আরম্ভ করেন। ভারত স্বাধীনতার ইতিহাসে ইঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত কিন্তু সে ইতিহাস লিখিবার যথাযথ চেষ্টা এখনও কেহ করেন নাই। সশস্ত্র অভিযান যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহু অসীম সাহসের নিদর্শন অনেকে দেখাইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষণের ফলে বহু মহাবীর প্রাণ দিয়াছিলেন ও শত্রুপক্ষেরও অনেক লোক হতাহত হইয়াছিলেন। এই সকল সশস্ত্র দলের মধ্যে বালেশ্বরের যুদ্ধ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যুদ্ধ ও সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ভারত আক্রমণ বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার পরেই ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ করে এবং কংগ্রেস স্বাধীনতার আলোচনার ক্ষেত্রে দলবদ্ধ ভাবে উপস্থিত থাকায় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ তাঁহাদিগের অহিংসা নীতি দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায়, কংগ্রেসী নেতাগণই ভারত বিভাগ ও ব্রিটিশ হস্ত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিবার দায়িত্ব লইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার পরেও দেখা যায় ভারত বিভাগ করা হইয়া থাকিলেও ভাগের অপর পক্ষের লোকেরা ক্রমাগত দস্যুবৃত্তি চালিত রাখিয়া আইনত যাহা প্রাপ্য, লুণ্ঠন-নীতি অনুসরণে তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভারতের

নেতাদিগের মধ্যে যুদ্ধ বিরুদ্ধতা কঠিন মানসিক ব্যাধির ন্যায় সংক্রান্ত হইয়া থাকায় তাঁহারা কোন আন্তর্জ্জাতিক অবস্থারই বাস্তব রূপ দেখিতে অক্ষম ছিলেন। এবং তাঁহারা বিদেশী এবং বিদেশী মনোভাবের দ্বারা চালিত হইয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর হইতে আরও গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। ভারত লুণ্ঠনে ব্রিটিশ আমলে বিদেশীরা যতটা লাভ করিয়াছিল স্বাধীন যুগের আর্থিক পরিকল্পনার সুযোগে তাহার বহু গুণ লাভ অপরের তহবিলে চলিয়া যায়। জাতীয় ভাবে যাহা পাওয়া যাইল এখন অবধি তাহা শুধু ঋণের সুদের ও লোকসানের ধাক্কা। যুদ্ধ-বিরুদ্ধতার প্রথম কুফল হইয়াছিল চীনের সেনাদলের নিকট অপদস্থ ও বিধ্বস্ত হওয়া। ইহার পরে কিছুটা জাগরণ হয় এবং পাকিস্তানের কাশ্মীর লুণ্ঠন অভিযানে ভারতীয় সেনাগণ উক্ত দেশীয় সেনাদলকে পরাজিত করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহার পরেই ধর্ম্মভাব আবার প্রবল বন্যায় নেতাগণকে ভাসাইয়া লইয়া গেল এবং ভারতের রক্ষকদিগের বর্ত্তমান মানসিক পরিস্থিতি কিছুমাত্র দেশবাসীর পক্ষে নিরাপদ নহে। বর্ত্তমানে চীন ও পাকিস্তানের সংযুক্ত প্রচেষ্টা যাহাতে ভারত খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ঐ দুই দেশের সহিত কিছু কিছু সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত হইয়া যায় ও কিছু কিছু উহাদেরই সামন্তরাজ্যের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হাত জোড় করিয়া অবস্থান করে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চীন আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় অস্ত্রশালাজাত করিতেছে। আণবিক অস্ত্রের নির্ম্মাণ-কার্য্য ভারতের অজ্ঞাত নহে; কিন্তু পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন তিনি ভারতকে আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে দিবেন না, সুতরাং ভারত ঐ কার্য্যে কিছুতেই লাগিতে পারেন না। নেহরুর পূর্ব্বকালের গুরুর সংখ্যাও কম নহে। তাঁহারাও নানা প্রকার ধর্ম্মমত যুগে যুগে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সাক্ষাৎ ভাবে নেহরুকে শিক্ষা দিয়া যিনি মানুষ করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার মতে শুধু হিংসা বর্জ্জনই জাতীয় রাষ্ট্রনীতির বড় কথা ছিল না। কারখানা ও শহরে সভ্যতারও তিনি বিরোধী ছিলেন। চরখা, তকলি, বেশভূষা অতি সাধারণ, নিরামিষ আহার, নিজের কোন পয়সা-কড়ি না থাকা ইত্যাদি আরও অনেক শিক্ষা তিনি নেহরুকে দিয়াছিলেন। নেহরু কিন্তু তাহার কোন কথাই মানিয়া চলেন নাই। শুধু ঐ আণবিক অস্ত্র বর্জ্জন করিলেই অহিংসার চূড়ান্ত করা হয়। সাধারণ গোলা-বারুদ,যাহাতে বিগত দুইটি মহাযুদ্ধে প্রায় ১০ কোটি লোকের প্রাণহানি করা হইয়াছে, ব্যবহারে কোন দোষ নাই। লাঠি দিয়া মাথা ফাটাইলে তাহা হিংসা নহে। না খাওয়াইয়া মারিলে তাহা হত্যা নহে। ধর্ম্মের পথে বহু উপায় আছে বাধা ও কষ্ট সহজ করিয়া লইবার। কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মই শেষ অবধি বিকৃত রূপ ধারণ করে এবং মানুষ নিজে ধর্ম্মধ্বজা হইয়া পড়িয়া জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হয়। ভারতের আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ জাতীয় অস্তিত্বের থাকা না থাকার কথা। ইহা লইয়া খেলা চলে না। নেহরুর উপদেশ বা বুদ্ধের বাণী আওড়াইয়া জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিবার কোন অধিকার কাহারও নাই। নেহরুর স্মৃতি যাঁহারা "পবিত্র" রাখিতে চাহেন তাঁহারা রাখিতে পারেন। ভারতের জনসাধারণ সে কথা কখনও জাতির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লয় নাই। সুতরাং কংগ্রেসের ধর্ম্ম জনসাধারণের জীবন-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বলা নিছক মিথ্যা কথা। যদি জাতিকে নিজের অস্তিত্ব, নিজের গৌরব ও নিজের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে নেহরু বা অপর কোন পূর্ব্বের বা পরের কংগ্রেস-নেতার কথা না মানিয়া চলিতে হয় তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। কারণ নেহরু নিজে প্রয়োজন বোধ করিলেই পূর্ব্বকালের গুরুদিগের কথা অমান্য করিয়া নিজ ইচ্ছামত চলিতেন। অতএব আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ ভারতের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য ইহা মানিতেই হইবে। ইহা না করিলে চীন ও পাকিস্তানের নিকটে ভারতের উচ্ছেদ ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ভারতের রাষ্ট্রনেতাদিগের আশা আমেরিকা-রুশিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স প্রভৃতি আণবিক অস্ত্রাধিকারী জাতিদিগের সহায়তায় ভারতের আণবিক অস্ত্রের অভাব যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আণবিক আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিতে দিবে না। অর্থাৎ এই সকল জাতি ভারত আণবিক অস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া আণবিক আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ কষ্টকল্পনাজাত রাষ্ট্রনীতি শুধু

ভারতের নেতাদিগের পক্ষেই অবলম্বন করা সম্ভব। কারণ, আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলে ভারতের যে মহা আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনাসঙ্কুল অবস্থা তাহাতে অপর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া পড়িয়া নেতাদিগের সুসংযত চিন্তার ধারায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে।

আমাদিগের মত, এবং এই মত বহু লোকেরই প্রকাশ্যে বা মনের ভিতরে রহিয়াছে যে কংগ্রেসের নেতাদিগের পাকিস্তান সৃষ্টি, চীনের তিব্বত দখল মানিয়া লওয়া, প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধে ও দ্বিতীয় কাশ্মীর যুদ্ধে সংযুক্ত জাতি সংঘের হুকুমে যুদ্ধবিরতি মানিয়া লওয়া, তাসখন্দ মীমাংসা ও তাহার বাস্তব পরিণতি যেন-তেন ভাবে স্কন্ধে তুলিয়া লওয়া প্রভৃতি কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় অক্ষমতার পরিচায়ক। কংগ্রেসের নেতাদিগের পক্ষে ভারতের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা ধর্ম্মক্ষেত্রে করাই সমীচীন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে কংগ্রেস যাহা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় সেই ভাবে চলিলে ভারতের ভবিষ্যত অন্ধকার। আর্থিক পরিকল্পনা দেশরক্ষার ব্যবস্থা, শাসন ও অপরাপর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদিগের কার্য্য—আধ্যাত্মিক শুচিবাইগ্রস্তের কার্য্য নহে।

সমুদ্র সন্তরণ

ব্যবহারজীবী মিহির সেন ভারত ও সিংহলের মধ্যে অবস্থিত ২২ মাইল চওড়া "পাক" প্রণালী গত ৫।৬ এপ্রিলে সাঁতার দিয়া পার হইয়াছেন। স্রোতের টান থাকাতে তাঁহাকে প্রায় ৩০ মাইল সাঁতার কাটিতে হইয়াছিল এবং এই সময় পূর্ণিমার জোয়ারের ঢেউ উঠিয়াও তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে তাঁহার গতিবেগ প্রথম দিকে ঘণ্টায় ১½ মাইল হইয়াছিল ও পরে তাহা আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ঘণ্টায় প্রায় ১ মাইলে দাঁড়ায়। পূর্ণ জলপথ অতিক্রম করিতে মিহির সেনের ২৫ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সময় লাগে। এই কঠিন কষ্ট ও শ্রমসাধ্য অভিযানের ফলে মিহির সেনের শরীরের ওজন একদিনে ১৫ পাউণ্ড কমিয়া যায়। অদম্যভাবে সকল কষ্ট ও ক্লান্তি অগ্রাহ্য করিয়া মিহির সেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঢেউ ও স্রোতের বিরুদ্ধে মহা পরাক্রমে সংগ্রাম চালাইয়া পাক প্রণালী দমনে সক্ষম হইয়াছেন। সমুদ্রে সর্প ও হাঙ্গরের উপস্থিতিও লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর যে সকল নৌকা ও জাহাজ নৌ সেনা ও অন্যান্য লোক লইয়া যাইতেছিল তাহাদিগের সতর্কতায় কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে নাই। নৌ-বাহিনীর লেফটেনাণ্ট মার্টিস তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহু ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মিহির সেন লেফটেনাণ্ট মার্টিসকে নিজ সাফল্যের জন্য বিশেষ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানান। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মিহির সেন সাঁতার দিয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে ভারতবাসীদিগের মধ্যে এই কার্য্যে সক্ষম হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ২৮ বৎসর মাত্র। বর্ত্তমান সন্তরণ যুদ্ধের সময় তিনি বয়সে হইলেন ৩৬ বৎসর। শারীরিক শক্তির ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধনের উপযুক্ত সময় ৩০ বৎসরের পূর্ব্বেই। অনবসন্ন ভাবে মাংসপেশী চালনা করিয়া যাওয়া অধিক বয়সে ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশ্য ৪০ বৎসর বয়সেও, অনেকে পূর্ণ যৌবনের সকল শক্তি বজায় রাখিয়া চলিতে সক্ষম হন। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ ও অপরাপর ক্রীড়ায় অধিক বয়স হইলেও অনেকে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন। শ্রীমিহির সেনের কৃতিত্ব এই জন্য আরও অধিক বলিয়া ধার্য্য হইবে।

রোমাণ্টিসিজমের আলোকে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্য

অধ্যাপিকা শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী

রোমাণ্টিসিজম্ কথাটি ইংরেজি সাহিত্য থেকে আমদানী। রোমাণ্টিক অনুভূতি ও কল্পনা বলতে এমন কিছু বুঝি যা অপরিচিত অভিনব করে দেখায় কোন পরিচিত জিনিষকে, কোন পরিচিত লোককে। হৃদয়কে প্রতিষ্ঠা করে জীবনের ভিত্তিভূমিতে, কিন্তু ঔৎসুক্য জাগায় জীবনাতীতের জন্য……কোন অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোক-কল্পলোকের রূপমাধুরী রসমাধুরীর জন্য… এবং বন্ধনের মধ্যে, সীমার মধ্যে, খণ্ড জীবনের মধ্যে এনে দেয় অখণ্ড অসীম জীবনের সীমাহীন ব্যাকুলতা। কল্পলোকের আলোকপাত হয় এই অনুভূতিতে—অর্থাৎ এমন কিছু যাকে ঠিক ধরা-ছোঁওয়া যায় না……মন যাত্রা করে সুদূরে…অসীমে…অথচ সত্য-সুন্দর-সৌন্দর্যের প্রতি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা! রোমাণ্টিক কবিদের মানস-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে কতকগুলি দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য তাই লক্ষ্য করা যায়: বিস্ময়বোধ, সুন্দরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, গৃহপ্রত্যাবর্তনের সুর বা পলায়নী মনোভাব, বিদ্রোহের সুর, নিসর্গপ্রেম, মানবপ্রেম এবং আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা ও আদর্শবাদ। রোমাণ্টিক কবিদের মানসপটে পর্যায়ক্রমে মোটামুটি এই বৈশিষ্ট্যগুলি একের পর এক নানা বৈচিত্র্যের রেখা-ছন্দ-সুরের আলিম্পন বুলিয়ে দিয়ে যায়। শেলী তাই বলেছেন—"We look before and after and pine for what is not." রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।"

ইংরেজি সাহিত্যে টমাস মুর থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্, বায়রণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে আধুনিক কালের কবিদের মধ্যে এসে এই রোমাণ্টিকতা আশ্রয় নিয়েছে। যুগে যুগে সমস্ত কবিকেই এ হাতছানি দিয়েছে অল্প-বিস্তর মনে দোলা লাগিয়েছে। শেলী এই স্বপ্নলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বলেছেন—'away, away'—বাস্তবের তুচ্ছতা, দীনতা, হীনতা হতে মন যে মুক্তি চায়—তাই তার অভিসার অতীত-স্মৃতির রোমন্থনে—ভবিষ্যতের স্বপ্নঘেরা মায়াপুরীতে। কারণ "Romanticism is nothing but the restless state of mind, it is the calling of the past, calling of the future." তাই তাঁদের অভিসার "Ode to the Nightangle," "Ode to a Grecian Urn"-তে। গ্রীসের অতীত সভ্যতার গৌরব, শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবন সান্ত্বনা জোগায় কবিমনে—আর আশায় উদ্বেলিত করে তোলে ভবিষ্যতের স্বপ্নময়তা। সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস, ভবভূতি এবং বৈষ্ণব রোমাণ্টিক গীতিকবিদের সৌন্দর্যচেতনা, প্রেমচেতনা, অধ্যাত্মচেতনা যেমন রবীন্দ্র শিল্প-মানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে—তেমনি ইংরাজী সাহিত্যের রোমাণ্টিক কবিদের সুদূরাভিসারী ভাবকল্পনাও তাঁর কবি-মানসকে করেছে উদ্বেলিত। ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রজ্ঞাদীপ্ত জীবনবোধ ও নিসর্গপ্রেম, শেলীর আদর্শবাদ ও আর্তি, কীট্‌সের পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রমানসে চির ভাস্বর হয়ে তাঁর কাব্য-সাধনার পথ-পরিক্রমাকে বার বার উদ্দীপিত করেছে।

'কল্পনার' পাখায় ভর করে রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক-মনও তাই বর্তমানকে অতিক্রম করে যাত্রা করে কালিদাসের স্বপ্নপুরী উজ্জয়িনীতে। কিন্তু এই যে যাত্রা—এই যে বাস্তব জীবনে সুখী না হয়ে স্বপ্নঘেরা জীবনের উদ্দেশ্যে অভিসার—একে আমরা escapism বা 'পলায়নী মনোভাব' বলতে পারি নে। কারণ কবি-শিল্পীর জীবন-সাধনাই ত জগতকে ঘিরে, জীবনকে ঘিরে…মর্ত্য পৃথিবীর ধূলি মলিন প্রাণপ্রবাহের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার লীলা বিলাসকে কেন্দ্র করে। বাস্তবের এই তুচ্ছতা, দুঃখ, দৈন্য কবি-মনে আলোড়ন তোলে—কবি স্বপ্ন দেখেন নূতন পৃথিবীর। 'স্বর্গ হ'তে তাই কবি বিদায়' নিয়ে সেখানকার সুখময় ঐশ্বর্য দিয়ে সত্য-সুন্দর-সৌন্দর্য-মণ্ডিত করবার স্বপ্ন দেখেন মর্ত্যের এই ধূলি-মলিন পৃথিবীকে। তাই ত তাঁর তীব্র ব্যাকুলতা—"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে, হে কল্পনে রঙ্গময়ি"—তাঁর কাব্যসাধনা তাই কেবল আত্মকেন্দ্রিক স্বপ্নবিলাস মাত্র নয় তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রমুদিত হয় বিশ্বপ্রেম—সীমিত এই জীবনবোধকে অতিক্রম করে ভাবচেতনার হয় নূতন স্ফুরণ।

'কল্পনা'র কবি কিন্তু রোমাণ্টিসিজমের এই ভাবরূপটিরই পূজারী। তাই ইউরোপীয় রোমাণ্টিকতার সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত হয়—তা কর্মচেতনা। তাঁর কল্পনা কেবল fancy নয়, imagination। Fancy হ'ল কেবল রঙিন স্বপ্ন, কেবল দোলা জাগায়, রঙ লাগায় কবি-

মনে কিন্তু imagination আনে aspiration. রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এই imagination—কেবল স্বপ্নবিলাস মাত্র নয়, নয় কেবল মন-বিহঙ্গের রঙিন পাখায় ভর করে নভোলোকে বিহার। এর মধ্যে প্রকটিত হয়ে ওঠে কবি-মনের সত্যসুন্দর, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাধনা-সংকল্পে মহিমান্বিত একখানি বিরাট চিত্তের আত্মজীবন সাধনার অভিব্যক্তি। তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'নবজাতক' কাব্যের 'রোমান্টিক' কবিতাটিতে কবি নিজেই তাঁর রোমান্টিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন—

"আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক
সেকথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক।
* * * *
জানি তার অনেকটা মায়া
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে, "এরে কভু বলে বাস্তবিক
আমি বলি, কখন না, আমি রোমান্টিক।
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেথায় আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা
* * * *
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ"।

এই সাধনসম্ভাত,—ত্যাগ তিতিক্ষায়, কর্মে-ধর্মে বীর্যবান রোমান্টিকতাই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার স্বরূপ। এ জীবন ব্যতিরেক নয়—better, beautiful more complete life-ই আনে। এই রোমান্টিক কবির প্রকৃতি-চেতনার স্বরূপ—"They all had a deep interest in nature not as a centre of beautiful scenes, but as an informing and spiritual influence on life." কবি-মানসের সক্রিয় আত্মবিভোরতা বা তন্ময়তা প্রকৃতির বহিরঙ্গ অঙ্গনে বা রূপোল্লাসের ক্ষেত্রে তাকে ঠিক যথাযথ ভাবে না দেখে তার মধ্যে দিয়ে এক তত্ত্বধর্মী মনের পরিচয় দেয়—কবি আপন জীবনদর্শন এবং ভাব-ভাবনার সঙ্গে একে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাই মূক প্রকৃতিও রোমান্টিক কবির গভীর জীবন-চেতনার অমৃত স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে···চঞ্চল হয়ে ওঠে···এই রোমান্টিক কবি-মানসের প্রেম-চেতনায় বা রূপ-চেতনায় তাই দেখি রূপ সম্ভোগের বিশুদ্ধ উল্লাস। রূপসাধনার রসঘন অভিব্যক্তিতে এবং শিল্পকৌশলে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও কবির তত্ত্বধর্মী জীবনচেতনার সুনিবিড় স্পর্শে তা ইন্দ্রিয়াতিরেক কোন অলৌকিক মাধুরিমায় অভিস্নাত হয়ে দেশ-কাল অনালিঙ্গিত কোন স্বর্গীয় সুষমা দান করেছে। 'কল্পনা'র 'প্রেম' ও 'প্রকৃতি' সম্পর্কীয় কবিতাগুলিতে তার যথেষ্ট নিদর্শন মেলে।

'কল্পনা'-কবির রোমান্টিক মন তাই বর্তমানকে অতিক্রম করে দূরলোকে যাত্রা করে—ভারতের গৌরবময় অতীতলোকে, সৌন্দর্যলোকে-প্রেমলোকে স্বপ্ন সঞ্চরণের দ্বারা আপন রসবোধের সৌন্দর্যবোধের আত্মতৃপ্তি খোঁজে। জীবনের অন্ধকার, দুঃখ, দৈন্য, বেদনাকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁর সৌন্দর্যলোকে, ধ্যানলোকে অনুগমন। 'দুঃসময়' জীবনে আসে কিন্তু 'এখনি অন্ধ বন্ধ ক'রো না পাখা'। এ 'দুঃসময়' 'অসময়' যেন গতিকে রুদ্ধ না করে। সুন্দরের কল্পনা যেন এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্যেও দেখা দেয়। সংসারে এই দুঃখ-দৈন্য-গ্লানি যেমন সত্য, তেমনি সত্য প্রেম সৌন্দর্য স্নেহ মমতা প্রীতি। তাই 'বর্ষামঙ্গলে'র মধ্যে কবি স্বপ্ন দেখেন—

শতেক যুগের কবিদল মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।

যুগ-যুগান্তরে কবি কণ্ঠে কবি সুর মিলান, আর আমাদেরও মনকে টেনে নিয়ে যান অলকাপুরীতে। এই ভাবে 'বর্ষামঙ্গল', 'বর্ষশেষ', 'বসন্ত', 'বৈশাখ' প্রভৃতি কবিতায় কবির সৌন্দর্যবোধের ধ্যান-ধারণার মধ্যে দিয়ে যে সত্য-সুন্দর জীবনধর্মের সাধনা, তার পটভূমি রচনা করেছে এই কবিতাগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ। কবির প্রকৃতির প্রতি deep interest আছে কিন্তু তা spiritual influence of life হিসাবে কাজ করেছে। রোমান্টিক কবির প্রকৃতি-চেতনা কেবল মানব জীবনের পটভূমি রচনার ক্ষেত্র নয়—"প্রকৃতি আপন জীবনলীলায় চঞ্চল···লীলাবিলাসে লাবণ্যময়ী···প্রাণপ্রবাহে সজীব এক স্বতন্ত্র সত্তা। 'বর্ষশেষ' কবিতায় তাই দেখি প্রকৃতিকে পটভূমি হিসেবে দাঁড় করিয়ে কবির 'ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত নিষ্ফল সঞ্চয়' দূর করে ফেলে দিয়ে নব জীবনের যাত্রাপথে তার কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয়

করতে চেয়েছেন। প্রকৃতির একটা spiritual influence-ই এখানে লক্ষ্য করি—

এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,
এবার আসনি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে
ধন্য ধন্য তুমি!
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী, রাজ সম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়!

আবার 'বৈশাখ' কবিতায়—

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকারক্ষুব্ধ ধুলা-সম উড়ুক গগনে,
ভরে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ সনে
আকুল আকাশ—
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষ কোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

এখানেও কবির নিসর্গানুভূতির সঙ্গে কবির নটরাজরূপকে মিশিয়ে দিয়ে কবি মানসের ধ্যান-কল্পনায় সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর নিকট হ'তে 'মহাজীবনের গভীর সুগম্ভীর' রূপ প্রার্থনা করেছেন। 'বৈশাখে'র আহ্বানের মধ্যে দিয়ে চিরনূতনের আহ্বান করে করেছেন রুদ্ররূপের ধ্যান।

অপর দিকে এ কাব্যের বিশিষ্ট প্রেম কবিতাগুলির মধ্যে কবির রোমান্টিক শিল্প-চেতনার এক অনবদ্য সৌন্দর্য-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষাই পরিদৃশ্যমান। কালিদাসের চোখে দেখা শিল্পলোক সৌন্দর্যলোককে কবি ভাবে ভাষায় ছন্দে শব্দে কল্পনায় চিত্রে রঙে রসে এ যুগের রসিক জনের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন আপন তুলির সুনিপুণ চিত্রকৌশলে। কবির রোমান্টিক মনের বিস্ময়-বোধ পরিচিত লোককে—প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার রূপমাধুরী, রসমাধুরী, সৌন্দর্যমাধুরীকে দূরলোকে স্থাপন করে তার অন্তর্নিহিত বাণীটুকুকে ললিত মাধুর্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁর 'স্বপ্ন', 'মার্জনা', 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'মদনভস্মের পূর্বে ও পরে', 'পিয়াসী', 'প্রার্থী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে দিয়ে। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে এবং কাছে পাওয়ার মধ্যেই যে প্রেমের যথার্থ প্রাপ্তি নয়—সীমার বন্ধনমুক্তি ঘটলে তবেই যে প্রেমের সত্যকার মাধুর্য-বীর্য প্রকটিত হয়—এই স্বর্গীয় প্রেমের—সাধন প্রেমের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই সমস্ত কবিতার অপরূপ ছন্দমাধুর্যে। প্রেমের মধ্যে যে সৌন্দর্য-বোধের রূপ সাধনার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন এবং দেহকামনার ঊর্দ্ধে একে ঠাঁই দিয়ে খণ্ড জীব-জীবনের কামনা-বাসনা থেকে একে মুক্ত করে বিশ্বের বহু-বিচিত্র লীলাময়ীর সঙ্গে সেই প্রেমিকার অচ্ছেদ্য বন্ধন কল্পনা করেছেন, অথচ গৃহের কল্যাণী রূপের মধ্যেও তার যে বিচিত্র আস্বাদন—সেই মহৎ প্রেমের সার্থক রূপ-বিলাস এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। 'স্বপ্ন' কবিতায়—

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু আছ তো ভাল?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার।
দুজনে ভাবিনু কত—মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

অথবা 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতায়—

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারী,
দুয়ার-সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর গেহ,
অগুরু গন্ধে আকুল সকল দেহ,
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি,
রয়েছি বিজন রাজপথ পানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি'।

এ সমস্ত কবিতায় মিলনের মধ্যে যে বিরহ-বেদনা, যে দ্বিধা, যে ভ্রষ্ট লগ্নের বেদনা-বিধুর শান্ত সৌম্য প্রতীক্ষা তা কবি-মনের সম্ভোগের আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা না-পাওয়ার চিরন্তন বেদনা-মাধুর্যেই যে প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে তা আর অগোচর থাকে না। প্রেমের সাধনময় জীবনে যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অসীম ব্যাকুলতা, মিলনের পূর্বে

প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়কে যে আশা-আনন্দ-শিহরণের রোমাঞ্চিত দোলায় উদ্বেলিত করে তোলে,...অথচ এই দ্বিধা-শঙ্কা-শরমে কত শুভ মুহূর্তই যে ব্যর্থ বয়ে যায়—তা কবির সূক্ষ্ম অনুভূতির নিকট ধরা পড়ে রামধনুর বিচিত্র বর্ণসুষমার সৃষ্টি করেছে তাঁর প্রেমচেতনার অসীম দিগন্তকে স্পর্শ করে। বর্তমানকে নিয়ে অপরিসীম অতৃপ্তি বলেই রোমান্টিক কবি-মন এখানে সুরলোকে বা অতীতের সৌন্দর্যলোকে ভাবমুক্তি অর্জন করতে চেয়েছে।

কিন্তু 'কল্পনা'-কবির রোমান্টিক ভাবসাধনা কেবল সৌন্দর্যলোকেই আত্মমুক্তি খোঁজে নি। সুন্দরের উপাসনার জন্য এ-লোক থেকে প্রত্যাবর্তন করে সে মানস তৃপ্তি লাভ করে নি। তাই দেখি 'মানবপ্রেম' তথা 'স্বদেশপ্রেম', 'আদর্শবাদ'—তাঁর স্বপ্নবিভোর ভাবচিত্তকে নাড়া দিয়ে অতিশয় আত্মসচেতন করে তুলেছে। সেই মনেরই সৃষ্টি 'আশা', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'শরৎ', 'মাতার আহ্বান', 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ', 'হতভাগ্যের গান' প্রভৃতি কবিতা।

'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতায়—

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।

অথবা 'হতভাগ্যের গানে'—

বন্ধু,
কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করবো মোরা পরিহাস!

এই সমস্ত কবিতায় স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি কর্তব্যবোধে কল্যাণবোধে কবির যে দায়িত্ব বা কর্তব্য তা কবির মহত্তর স্বদেশানুরাগেরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই কর্তব্যবোধ এবং কল্যাণবোধের স্বাভাবিক স্ফূর্তিই যে মানবিকতার স্বাভাবিক ধর্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ সচেতন। দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত লাঞ্ছিত স্বদেশ বা স্বজাতির দুঃসময়ে কবি পলায়নী মনোভাব নিয়ে কল্পলোকে বিহার করেন নি। তাঁর রোমান্টিক মন—

সেথায় উত্তরী ফেলি—পরি বর্ম
সেথায় নির্মম কর্ম
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ।

এ কথাকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর দীর্ঘ সারস্বত জীবন-সাধনার ক্ষেত্রে স্বদেশচিন্তা-বিষয়ক নানা রচনা এবং প্রত্যক্ষ জীবন-রঙ্গভূমিতে বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে 'কল্পনা'র 'স্বদেশ-বিষয়ক' কবিতাগুলি সে সাক্ষ্য বহন করে। তাই একথা অবশ্যস্বীকার্য যে তাঁর রোমান্টিক মন সুন্দরের অতীন্দ্রিয় জীবন সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের শোক-তাপ-দুঃখদীর্ণ অমঙ্গলকেও বরণ করে নেবার শক্তি সাধনা করেছে। কবির অন্তর্জীবন সাধনার ক্ষেত্রে এই শক্তি সঞ্চয়ের নিমিত্ত তাঁর যে বিশেষ ব্যাকুলতা এবং আর্তি তা 'অশেষ', 'বৈশাখ', 'নববর্ষ' এবং অন্যান্য বহু স্বদেশপ্রেম-বিষয়ক কবিতার মধ্যে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। তাই 'কল্পনা'র প্রথম কবিতা 'দুঃসময়ে' কবির মন-বিহঙ্গ যে আশঙ্কাসঙ্কুল অনিশ্চিতলোকের উদ্দেশ্যে ডানা মেলে ছিল—সে-ই আবার 'দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা' দেখে বুকে আশা নিয়ে নূতন দিনের আলোর অপেক্ষায় প্রহর গুনেছে—আত্মশক্তিকে উজ্জীবিত করেছে সংগ্রামের দুর্যোগমুখর সংঘর্ষে! 'বিদায়' কবিতায়ও কবির এই আশ্বাস শুনি—শুনি নব জীবনের আহ্বান—

শুধু সুখ হতে স্মৃতি
শুধু ব্যথা হতে গীতি
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলা শ্রান্তি
বাসনা হইতে শান্তি
নভ হতে নীড়।

কবির এই রোমান্টিকতা তাই কেবল নভঃচারী কল্পনাবিলাস মাত্র নয়, সুন্দরতর, কল্যাণতর জীবনের কল্পনা—জীবনাকাশকে নব নব রঙের আলিম্পনে রাঙিয়ে দিয়ে যাবার বাসনা! এই 'কল্পনা'র জন্ম প্রেম হ'তে, আনন্দ হ'তে, কর্মচেতনা হ'তে। তাই তিনি pragmatic, তিনি 'ভূমাকেন্দ্রিক'। এই মর্ত্য, প্রেম-পরিণতি লাভ করেছে আধ্যাত্মিকতার স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-চেতনায়। প্রথম কবিতার মধ্যে 'দুঃসময়'কে স্বীকার করেই কবির মন-বিহঙ্গ 'কল্পনা'র ডানায় ভর করে সত্য-সুন্দরের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করে 'পরিণামে' এসে পৌঁছেচে—আশ্রয় খুঁজেছে সেই বিশ্বদেবতার পায়ে! সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে এই একই সুরের তরঙ্গ বয়ে চলেছে এক মহাসমুদ্রের দিকে—যদিও ঋতুতে ঋতুতে তা পালা বদল করে বাঁক নিয়েছে নব নব পথে। 'পরিণামে' তাই কল্পনা'র পরিসমাপ্তি—

জনম মোরে দিয়েছ তুমি
আলোক হতে আলোকে
জীবন হতে নিয়েছ নবজীবনে।

এই প্রেমে, ত্যাগে, বীর্যে সংকল্পে সাধনার মহিমান্বিত রোমান্টিকতার সাধনাই 'কল্পনা' কবির সাধনা।

অলৌকিক রহস্য

আলোক ও বর্ণের যে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় ভোরের আলোর দ্রুত পরিবর্তনশীল রংএর খেলার মধ্যে। রাত্রির অনন্ত-বিস্তৃত অন্ধকারের প্রবাহ ঊষার আরম্ভে যখন দৃষ্টিপথে এসে উৎক্ষিপ্ত রশ্মি-ধারার বর্ণ-বিন্যাসে ঊর্ম্মিমালার মত তমসার তটভূমিতে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হয়ে আছড়ে পড়তে থাকে, তখন নূতন নূতন রংএর প্রক্ষিপ্ত ও প্রতিফলিত রূপ আবছাধূসর ধরণীর বক্ষে এক অপরূপ দৃশ্যের স্বজন করে। সেই প্রত্যূষের আরম্ভ মুহূর্ত্তেই আলোক ও বর্ণের জন্মক্ষণ। তখন মানুষ যা দেখে তাই নূতন রূপ ও রংএ সজ্জিত স্বপ্নের ওড়নায় আধ ঢাকা। যে গাছে ফুল নেই সেই গাছেরও পাতায় পাতায় রংএর আভাস দেখা দেয়। সায়রের জলে পদ্মবন না থাকলেও নীল, লাল ও শ্বেত পদ্মের আবছারূপ ভেসে উঠে মোহিনী মায়ার সৃষ্টি করে। ভোরের হাওয়া যেমন স্নিগ্ধ, কোমল, ভোরের আলোও তেমনি মধুময়—চোখ-ঝলসান নয়। ঘুমের পরে মানুষ যেমন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে পূর্ণ জাগরণে এসে যায়, প্রত্যূষের আলোর ধারাও তেমনি মানুষকে মৃদু স্পর্শে বর্ণ অনুভূতিতে টেনে এনে আস্তে আস্তে অন্তরে প্রখরতর উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে।

আমার অভ্যাস অতিপ্রাতে উঠে লেকের ধারে গিয়ে একটা কোন বেঞ্চের উপর বসে আকাশে গাছে, জলে আর শিশির ধোয়া ঘাসের উপর সেই আলো-আঁধারের ও রংএর খেলা দেখা। ভোরের হাওয়া আর পাখীদের জাগরণের কাকলি আমার আনন্দে আরও বৈচিত্র্য এনে দিত। সেদিনও আমি অন্ধকার থাকতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। রাস্তায় তখনও আলো জ্বলছে, আর সব মানুষজন নিঝুম নিস্তব্ধ নিদ্রার অবসন্নতায় নিমজ্জিত। ভোরের দিকের ঘুমটাই বোধ হয় সবচেয়ে গাঢ়, যদিও নিদ্রার আরম্ভের দিকেই অর্থাৎ প্রথম রাত্রেই তার আরাম ও ক্লান্তিহরণ শক্তি সর্ব্বাধিক। লেকের এলাকার মধ্যে অনেকগুলি রাস্তা আছে। কোন কোন রাস্তা দিয়ে এমন জায়গায় পৌঁছান যায় যেখানের শান্ত নির্জ্জনতা অরণ্য সদৃশ। আমি ঐ রকম একটা বৃক্ষবহুল-নির্জ্জন প্রান্তে গিয়ে আমার পরিচিত একটা বেঞ্চির ওপর গা ঢেলে দিয়ে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। এই ধরনের পারিপার্শ্বিকেই সম্ভবত মুনি-ঋষিরা সাধনার জোরে মায়ার আবরণ ভেদ করে সত্যের স্বরূপ দেখতে পেতেন। মনে হ'তে লাগল যেন সুদূর অতীতে চলে গিয়েছি—আর এক গভীর অরণ্যের ভিতরে আশ্রম স্থাপন করে সৃষ্টির গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছি।

গাছগুলির মধ্যে একটা নূতন চঞ্চলতার আভাস পাচ্ছি মনে হওয়ায় ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলাম। মনে হ'ল গাছের ভিতর রং-বেরংএর পাতা নড়ছে, যেন বড় বড় গাছগুলি হঠাৎ অতিকায় পাতাবাহারের সাজে

কাকাতুয়া ও চন্দনার তীব্র প্রভাত বন্দনার মতও মনে হচ্ছে।

সেজে একটা নূতন রঙিন অভিনয়ে মেতে উঠেছে। কিন্তু, তা ত নয়; কিছু কিছু ঝটাপট আওয়াজও শোনা যাচ্ছে; এমন কি কাকাতুয়া ও চন্দনার তীব্র প্রভাত বন্দনার মতও মনে হচ্ছে। আরও ভাল করে দেখতে লাগলাম। আলোও কিছুটা তখন বেড়ে উঠেছে। দেখলাম গাছে গাছে অসংখ্য বড় বড় পাখী। এই জাতীয় রকম রকম পাখী ত আগে কখনও এ অঞ্চলে দেখা যায় নি। এ সব লেকের ধারে কোথা থেকে এল? পাখীর সঙ্গে নিকটতর পরিচয়ের জন্যে এক সময় আমরা কয়েকজন চিড়িয়াখানায় ও মাঠে-ঘাটে পাখী দেখে বেড়াতাম। তাই আজ ভোরের এই সব আকস্মিক আগন্তুকদের মধ্যেও দুই-চারটি পরিচিত পাখী দেখতে পেলাম। সমুদ্রের কূলে উড়ে বেড়ায় যারা সেই সব রং-বেরংএর "গাল", লাল ঠোঁট লাল পা ময়না, সোনালি "ফেজান্ট" যার বুকের কিছুটা লাল আর চিত্রবিচিত্র লম্বা ঝোলা ল্যাজ, "লরিকেট", হলদে ঝুঁটি সাদা কাকাতুয়া, আরও অনেকে দেখলাম গাছে বসে নিজ নিজ ভাষায় নূতন দিনের আলোর সম্ভাষণে নিযুক্ত। আমি অবাক হয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখছি আর ভাবছি, "স্বপ্ন দেখছি না ত?" কারণ এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি এর আগে। অসংখ্য রকমারি বিহঙ্গমের সঙ্গমস্থল হয়ে দাঁড়াল এই কাকের তীর্থক্ষেত্র লেকের গাছগুলো! আশ্চর্য্য কাণ্ড! আর আমি ভাবছি এটা কেমন করে সম্ভব হ'ল। কোন পাগল কি কিনে এনে এই সব বহুমূল্য পাখীগুলিকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছে?

জল্পনা-কল্পনায় শীঘ্রই একটা বাধা পড়ে গেল। পাখীগুলি প্রথমতঃ চঞ্চল হয়ে উঠল ও পরে উত্তেজিত-বিচলিতভাবে উড়ে যেতে লাগল। আমি ভাবছি এর কারণ কি? এমন সময় কারণ সশরীরে দেখা দিল। মনে হ'ল যেন গাছের ডালের উপর ভারী ভারী দ্রব্যাদি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তখন আলো অনেক বেড়ে উঠেছে। গাছের ডাল-পাতা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি যা দেখলাম তা মহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। দেখলাম চার-পাঁচটা বড় বড় বানর। শুধু তাই নয়, দেশ বিদেশের বানর। বিরাটদেহ একটা ওরাংওটান এল সবার আগে। সচকিত ভীত ভাব, এদিক-ওদিক দেখছে, যেন কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না। তার পিছনে পিছনে এল গিবন, ল্যাঙ্গুর, হনুমান···আরও কত বিভিন্ন আকারের বানর। এই বানর বাহিনী ক্রমশঃ সংখ্যায় বেড়ে যেতে লাগল আর গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে

লাফিয়ে আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। বিষয়টা জটিল হয়ে উঠছে দেখে বেঞ্চি ত্যাগ করে উঠে ঐ নির্জ্জন প্রান্ত ছেড়ে বড় রাস্তার দিকে চললাম। কিন্তু বেশীদূর যেতে হ'ল না। দেখলাম দুইজন যুবক-বয়সের লোক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছে। তারা চিৎকার করে বলছে "মশায়, পালান, পালান!" কেন পালাব তা বুঝতে বিশেষ বিলম্ব হল না। বড় রাস্তার দিক থেকে ঘোড়-দৌড়ের মত আওয়াজ হতে লাগল আর দেখলাম দুটো গণ্ডার ছুটে এই দিকে আসছে। ছেলে দু'জন ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি রেস দিয়ে গণ্ডারগুলোকে হারিয়ে দেব সে আশা ত্যাগ করে কাছাকাছি একটা বড় গাছ ছিল সেই দিকে দৌড়ে গিয়ে দেহের ক্ষতবিক্ষত ভাব অগ্রাহ্য করে কোন উপায়ে নিচের একটা মোটা ডালে উঠে পড়লাম। অনেকদিন, তা প্রায় চল্লিশ বৎসর হবে, গাছে চড়ার সুবিধা বা প্রয়োজন হয় নি। উঠতে না পারাই উচিত ছিল, কিন্তু গণ্ডার তাড়া করলে মানুষের ঔচিত্য বোধ থাকে না। ডালটা ছিল ৫/৭ হাত উঁচুতে, তাই এ যাত্রা প্রাণ বাঁচল। প্রথম গণ্ডারটা ছিল প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু আর ১৩।১৪ ফুট লম্বায়। ওজনও ২৫ মণ নিশ্চয়ই। সে আমাকে গাছে উঠতে দেখেছিল। কিন্তু আমার প্রতি তার ততটা বিতৃষ্ণা দেখা গেল না, যতটা গাছটার উপরে দেখলাম। প্রথমে সোজা এসে গাছে একটা গুঁতো মেরে সে আরও রেগে গেল। গাছটার উচিত ছিল পড়ে যাওয়া কিন্তু খাড়া থেকে যাওয়ায় ব্যাপারটা গণ্ডারের পক্ষে অপমানকর হয়ে দাঁড়াল। এই রকম উদ্ধতভাবে পরাজয় স্বীকার না করাটা প্রায় খোলাখুলি যুদ্ধং দেহি বলার মতই। সুতরাং কয়েকবার ক্রমান্বয়ে গাছটাকে শৃঙ্গাঘাত সহ্য করে প্রমাণ করতে হ'ল যে সে সহজে হার মানবার পাত্র নয়। গাছটা নড়ে উঠল কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। আমি সেই আন্দোলনের মধ্যে ডালটাকে জড়িয়ে আঁকড়ে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করলাম। গণ্ডারটা প্রত্যাক্রমণ প্রতীক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত ঐ অসাড় প্রতিদ্বন্দ্বীটাকে ঘৃণায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

অদূরে খুব হাল্লা সুরু হয়ে গেল। তার পরেই সব চুপ। কেউ নড়ে-চড়ে না, আওয়াজও করে না। এমন কি গণ্ডারের নামে কলকাতার চিরবর্ত্তমান, সদাজাগ্রত, ভ্রাম্যমান নিষ্কর্ম্মার দলও হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! এইখানেই মানুষের জাতিগত ভাবে প্রাপ্ত, সুষুপ্ত স্মৃতির ভাণ্ডারের দরজা নিজের থেকে খুলে যায় আর মানুষ সাক্ষাৎভাবে বুঝে নেয় যে যত দ্রুত পদসঞ্চারে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। রাজপথে যদি গণ্ডার ধাবিত হয় তা হ'লে অপর জীবের পক্ষে রাজপথ ত্যাগ করে অন্যত্র গমনই সমীচীন। আমি গাছ থেকে নামা যুক্তিসঙ্গত মনে করতে পারছিলাম না; কেননা যে পথে গণ্ডার আসতে পারে, সে পথে যে কোন হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব হ'তে পারে। আর আমি একবার বৃক্ষারোহণে সক্ষম হয়েছি বলেই যে বার বার হব তার নিশ্চয়তা কোথায়? এই কারণে গাছে বসে থাকাই সঙ্গত। হঠাৎ গাছের তলা দিয়ে দুটো উটপাখী ও তিন-চারটে কৃষ্ণসার চলে গেল। এতে আমার গাছ থেকে নেমে বাড়ী যাওয়ার চেষ্টা করতে আরও অনিচ্ছার উদ্ভব হ'ল।

বেলা হয়ে এল। সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে সবকিছু চোখের সামনে এনে ধরে দিতে লাগল। লেকের পথে আর কেউ এল না। আমি চারিদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম কিন্তু মনে হ'তে লাগল সহরে জনমনুষ্য নেই। অনেকক্ষণ গাছে বসে থেকে মনে হতে লাগল একবার নেমে জলের ধারে গিয়ে দেখলে হয় অবস্থাটা কি রকম। প্রয়োজন হ'লে দৌড়ে ফিরে এসে আবার গাছে চড়লেই হবে। কিছু চিন্তা করে শেষে ডালটা ধরে ঝুলে পড়লাম, আর হাত ছেড়ে দিতেই কিছুটা নিচে ঘাসের উপর পড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। গাছে আবার উঠতে হ'লে কিভাবে ওঠা সহজ হ'বে তা ভাল করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে লেকের জলের দিকে চললাম। কোথাও কাউকে দেখা গেল না। জলের ধারে গিয়ে দেখলাম এপারে-ওপারে লোকের চিহ্নমাত্র নেই। একদিকে, আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে দেখলাম জলের ধারে একটা নৌকা লাগান আছে। আস্তে আস্তে সেই দিকে যেতে লাগলাম। জলের ধার ঘেঁষে, যাতে দরকার হ'লে জলে নেমে পড়তে সময় না লাগে। নৌকাটায় দু'খানা দাঁড়ও ছিল। আমি আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না, বুঝলাম নৌকার মালিক ওখানে নেই। তখন আমি ওতে চড়ে বসে দাঁড় চালিয়ে কাছাকাছি ঘুরে দেখতে লাগলাম কেউ আছে কি না। কিছু দূরে জলের ধারে দেখলাম একটা হরিণ ঘোরাফেরা করছে। তাতে বোঝা গেল যে মানুষের যাতায়াত লেকের ধারে তখন অবধি বিশেষ হয় নি। আমি জলপথে নৌকা চালিয়ে যথাসম্ভব সাদার্‌ন্ অ্যাভেনিউ বড় রাস্তার কাছে যাওয়া যায় সেই
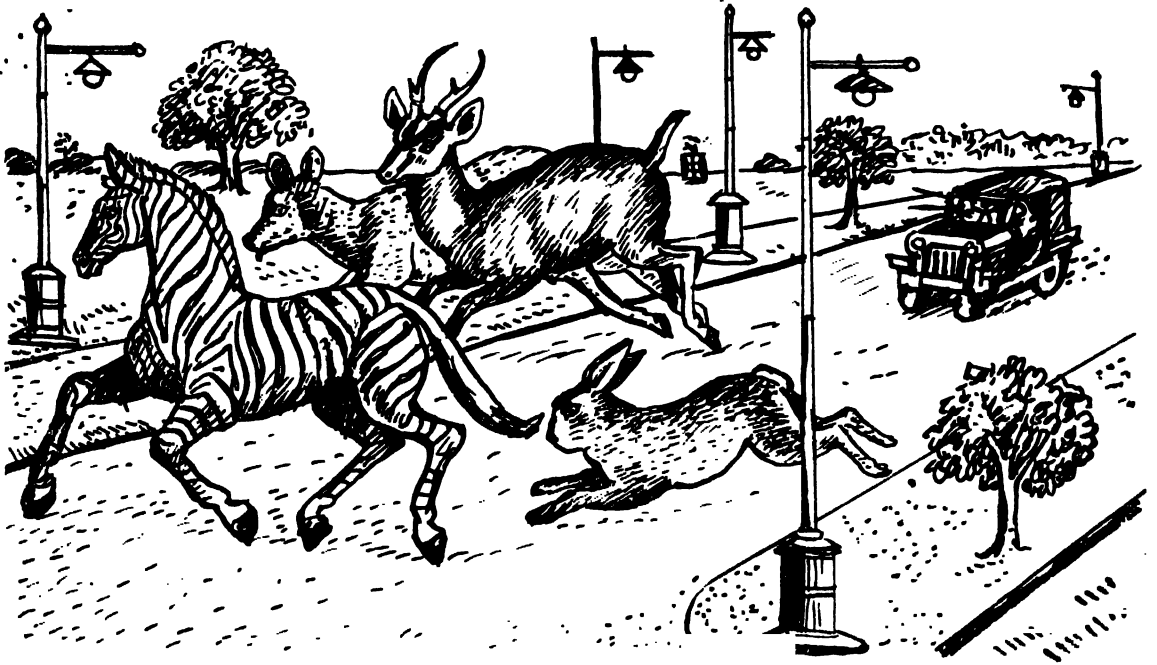
জেব্রা রাস্তা দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে চলেছে

দিকে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ মনে হ'ল। হঠাৎ দেখলাম দুটো জেব্রা রাস্তা দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে চলেছে। তার পিছনে চলেছে একটা সাঁজোয়া গাড়ি, যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে লাগলাম। বুঝলাম যে রকম অবস্থা তাতে নিরাপদে বাড়ী ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। রাস্তা দিয়ে আবার অনেকগুলি হরিণ ছুটে চলে গেল আর তার পিছনে সৈন্যদের গাড়ি। আমি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি বাড়ী ফিরে যাওয়া কখনও হবে কিনা সেই কথা ভেবে, এমন সময় আমি যেখানে নৌকায় ছিলাম তার কাছের সরু রাস্তা দিয়ে একটা বড় ওয়েপন ক্যারিয়ার গাড়ি চলে এল। আমায় দেখে গাড়িটা থামিয়ে ড্রাইভারের পাশের একজন লোক চিৎকার করে জিগ্যেস করল, "আপনি কে, নৌকায় বেড়াচ্ছেন? জানেন না যে চিড়িয়াখানার জানোয়ার পালিয়েছে আর চারদিকে ঘুরছে? ভালুক, নেকড়ে, গণ্ডার, বড় বড় হরিণ, বাঁদর আরও কত কি।" আমি চিৎকার করে উত্তর দিলাম "আমি খুব ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে এসেছিলাম। তার পরেই এই বিপদ সুরু হয়েছে। আমায় কোন রকমে বড় রাস্তাটা পার করে দিন। আমি বাড়ী চলে যাব।" উত্তর হ'ল, "চলে আসুন।" আমি নৌকাখানা জলের ধারে লাগিয়ে এক দৌড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। গাড়িটা চালিয়ে আমায় অল্পক্ষণ পরেই আমার বাড়ীর রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। আমিও দ্রুতপদে নিজেদের বাড়ীর সামনে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সকলে আমায় দেখে খুবই নিশ্চিন্ত হলেন, কেননা আমি প্রায় দু'তিন ঘণ্টা অসহায় ভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভেবে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

বাড়ীর লোকেরা কেউই সকাল থেকে বাইরে কোথাও যায় নি। কারণ সকাল বেলায় প্রথম বেতার খবরেই সহরবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া হ'ল যে ভোর রাত্রে আলিপুরের চিড়িয়াখানার প্রথমে গণ্ডারগুলি কোন অসাবধানতার ফলে বেরিয়ে পড়ে ও পরে তারাই গুঁতো মেরে অনেক খাঁচা ও বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে অন্যান্য জন্তু ও পাখীদেরও বেরিয়ে পড়তে দেয়। অতঃপর তারা প্রায় এক রকম শোভাযাত্রা করেই চিড়িয়াখানার বাইরে ফাটক পার হয়ে সহরের পথে দৌড়ঝাঁপ সুরু করে দিয়েছে। গণ্ডার দুটো আর অনেক পাখী আর বানর, হরিণ প্রভৃতি জন্তু কালিঘাটের পথে ক্রমে লেকের দিকে গিয়েছে। ভালুক নেকড়ে ও হায়নাগুলি ঘোড়-দৌড়ের মাঠে ঢুকেছে। জিরাফ ও বুনো শুয়োর দেখা

গিয়েছে চৌরঙ্গীর পথে। এখন সর্ব্বত্র সৈন্য পুলিশ ইত্যাদি কর্ম্মী লোকেরা সাঁজোয়া বা অপরাপর জাতীয় গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জানোয়ারগুলিকে খেদা করে নানান এলাকায় আটকিয়ে ফেলবার জন্য। সহরবাসী যেন যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে নিজেদের বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন। এই খবরের পরে সহরের বেশীর ভাগ লোকই রাস্তায় না বেরিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন। গণ্ডারের গুঁতো খাবার সখ কারুরই থাকে না। এমন কি বুনো শুয়োর বা ভালুকও কেউ দেখতে চায় না। আমি বাড়ী পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে বেতারে খবর পাওয়া গেল যে গণ্ডার দুটো কয়েকটা ঘোড়া ও মহিষ মেরেছে এবং দুখানা মোটর গাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে বর্ত্তমানে গড়িয়াহাট রাস্তা ধরে বালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছে। পুলিশ ও সৈন্য-চালিত গাড়ির সাহায্যে তাদের কোথাও ব্যারিকেড করে আটকে ফেলে পরে খাঁচায় বন্ধ করে চিড়িয়াখানায় চালান দেওয়া হবে। অপরাপর জন্তুদের বিষয়ে ঐ ব্যবস্থাই করা হবে কিন্তু বানর ও পাখীরা অনেক দূরে পৌঁছে যাওয়ায় তাদের বিষয়ে কোন পাকা ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। পরে জানান হবে সহরের কোন্ কোন্ অঞ্চল জন্তুদের অনুপ্রবেশমুক্ত আছে। সেই সব জায়গায় বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম হবে।

অতঃপর যে সব খবর আসতে লাগল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিধান সভায় বুনো শুয়োরের আবির্ভাব। যদিও সে সময় অ্যাসেম্বল গৃহে সভ্যরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন না, তা হ'লেও যখন একটা দাঁতাল বুনো শুয়োর স্পীকারের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল তখন অপোজিশনের পাণ্ডারাও নিজেদের স্বভাবসুলভ বেপরোয়া ভাব ভুলে পলায়নপর হলেন। গোলমালের মধ্যে শুয়োরটা বেরিয়ে ইডেন গার্ডেনে ঢুকে পড়ল। আর তার পরে রাজভবনের দিকে চলে গেল। দ্বিতীয় ঘটনা হ'ল হাইকোর্টে জিরাফের প্রবেশ চেষ্টা। এইবারে বাদী ফরিয়াদী উকিল মক্কেলের চিৎকার ও ধাক্কাধাক্কির ফলে জিরাফটা পালিয়ে লাট প্রাসাদে ঢুকে পড়ে আর পালাতে পারল না। তৃতীয় ঘটনাটা বড়ই রহস্যপূর্ণ। রাইটারস্ বিল্ডিংএ ত মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে। অথচ সেখানে অনেকগুলো বেবুন জাতীয় বানর কেমন করে ঢুকে পড়ল, তা কেউ বলতে পারে না। আবার অনেক ঘর সে সময় খালি থাকায় তারা কয়েকটা ঘর দখল করে জমিয়ে বসে গেল।
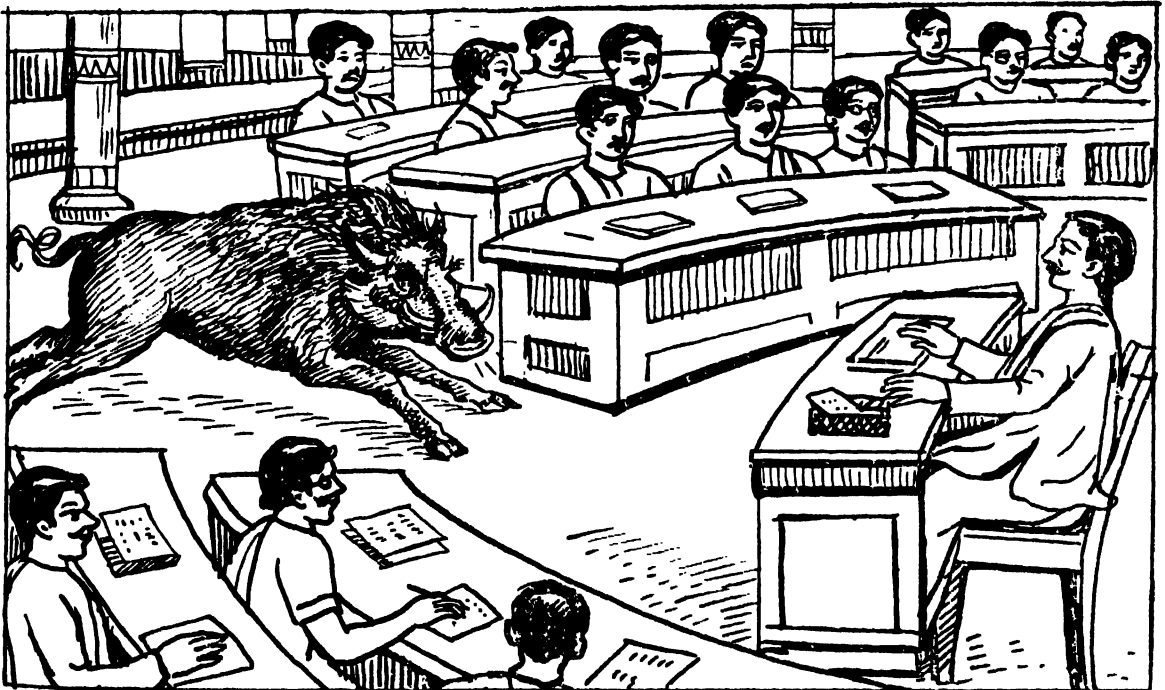
একটা দাঁতাল বুনো শুয়োর স্পীকারের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল

পরে তাদের ঘর বন্ধ করে কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে আধমরা করে বেঁধে নিয়ে গেল পুলিশে। চার দফায়, বড়বাজারে দুটো নেকড়ে ও একটা হায়েনা এসে হাজির হওয়ায় বাজারে মন্দা পড়ে গেল। দ্রুত গমনে অনভ্যাস থাকলেও মাড়োয়ারী বণিক মহলে তীব্র গতিতে গমনাগমন আরম্ভ হয়ে গেল। চারদিকে সব দোকান বন্ধ হ'তে দুই-এক মিনিট মাত্র সময় লাগল। পথে যারা ছিল তারা দৌড়ে যেখানে-সেখানে ঢুকে পড়তে লাগল। আশ্রয় নেবারও একটা "ভাও" হয়ে গেল। এক টাকা, দু টাকা করে শীঘ্রই দর বেড়ে পঁচিশ টাকায় দাঁড়িয়ে গেল। ঐ দরেও চাহিদা মিটল না। বহু স্থূলকায় বিকানীরবাসী হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে ছোট ছোট দোকান ঘরে যেমন তেমন করে ঢুকে পড়তে লাগল। কারুর স্থূলমধ্য অনাবৃত হয়ে দুই-তিনখানা মোটর গাড়ির টায়ারের মত মেদচক্র দেখা দিতে লাগল। কেউবা পড়ে গিয়ে সরল বিকট কণ্ঠে কান্না সুরু করে দিল। নেকড়ে ও হায়েনারা সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চিৎপুর অঞ্চলে অন্তর্হিত হ'ল। বড়বাজার স্তব্ধ নিঝুম। দূরে চেঁচামেচির শব্দ ক্রমশঃ আরও দূরে চলে যেতে লাগল। বেতারের বিশেষ বার্ত্তাবহের ভাষায় সহরে আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হয়।

গণ্ডার দুটো ওদিকে গড়িয়াহাটের রাস্তা ধরে পুরাতন বালিগঞ্জে এসে পড়ল। তাদের পেছনে চলল কেল্লার সাঁজোয়া গাড়ি, সসম্মানে ব্যবধান বেশ কিছুটা দীর্ঘ মাত্রায় বজায় রেখে· কেননা গণ্ডার পশ্চাদ্ধাবন বা অনুসরণ পছন্দ করে না। এ বিষয়ে গণ্ডারদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ একত্রবাসনীতিতে অবিশ্বাস লক্ষিত হয়। এই জন্যই বোধ হয় জন্তু-জগতে গণ্ডারদের প্রতি ভয় থাকলেও কোন জীবই গণ্ডারকে নেতা বলে মানতে চায় না। আজকের এই যে চিড়িয়াখানার বিক্ষোভ ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টা,এতেও দেখা যায় গণ্ডারগুলি সকলকে মুক্তির পথ খুলে দিয়েছে; কিন্তু তা হ'লেও তারা স্বৈরাচারেই বিশ্বাস অটুট রেখে বালিগঞ্জের পথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে আগুয়ান। এই ধরনের একগুঁয়ে ভাব নেতৃত্বের পথে বাধার সৃষ্টি করে। অতিমানব যেমন এক-গুঁয়ে হ'লে শেষ পর্য্যন্ত একলা লড়তে বাধ্য হয়, এই অতিকায় বর্ম্ম-চর্ম্ম মহাপশু তেমনই হায়েনা, শুয়োর, বাঁদর ইত্যাদির দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে একলাই চলেছে। গণ্ডারগুলির উপরেই মানুষের যত আক্রোশ। সেই জন্য বেতারবার্ত্তা সকলকে জানান যে পরিস্থিতি ক্রমশঃ কার্য্যকরী হয়ে আসছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। কারণ প্রায় ১০০।১৫০ লরী সংগ্রহ হয়েছে এবং সব রাস্তা "জাম"
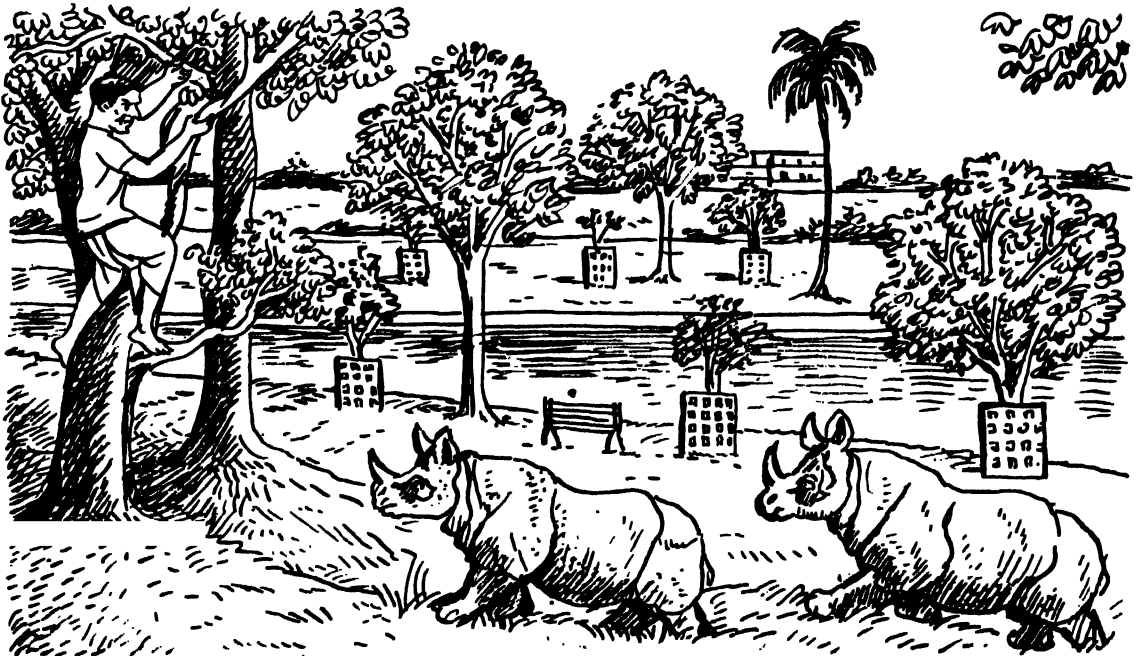
গণ্ডার দুটো ওদিকে···আগুয়ান

লেকবাজার থেকে খবর এসেছে মুখে মুখে

করে দিয়ে গণ্ডারগুলিকে কোন একটা ফাটক-বিশেষের পথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হ'তে চলেছে···ইত্যাদি। অর্থাৎ গণ্ডারগুলির অতঃপর পুনঃধৃত হ'তে বিশেষ বিলম্ব নেই।

আমরা লেকের ধারে থাকি। আমাদের অঞ্চলে সব বাড়ীর ছাদে ছাদে বেবুন, লাংগুর চরে বেড়াচ্ছে। কখন কখন একটা-দুটো মহাচঞ্চু ধনেশ জাতীয় পাখীও কিছুক্ষণের জন্য এসে পড়ছে। ছেলেপিলে সব ঘরে বন্ধ। শোনা যাচ্ছে যে শীঘ্রই জাল ফেলে এই সব জীবদের আবার নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্ধ করা হবে। কখন তা কেউ জানে না। আমরা নিজেরা অবশ্য ভালই আছি, কারণ বাড়ীতে অল্প বয়সের ছেলেপিলে বিশেষ নেই। আর বড়রা জানলার গরাদের ভিতর দিয়ে বাইরে দেখছে আর নানা রকম সম্ভাবনার আলোচনায় ব্যস্ত। দেখা গেল দু'-একটা জীপ বেরিয়েছে। তাতে কে গেল তা জানি না। সম্ভব সখের শিকারীরা, যদিও গুলী চালান পুলিশে বারণ করে দিয়েছে। জন্তুগুলি মূল্যবান। জীবন্ত ধরে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাতে কতদূর সক্ষম হবে পুলিশ পল্টনে তা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। লেকবাজার থেকে খবর এসেছে মুখে মুখে, যে খাঁচাভাঙ্গা বানরের দল সেখানে গিয়ে কলার কাঁদি লুঠ করে ফাঁক করে দিয়েছে। কদলী-বিক্রেতারা রণে ভঙ্গ দিয়ে বিজয়ী বেবুনদের হাতে বাজার ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে। পুলিশ এইখানে বানরদের লোভ ও আত্মম্ভরিতার সাহায্যে তাদের অনেককে ধরে ফেলতে আরম্ভ করেছে। কয়েক ছড়া কলা ও একটা আয়না রেখে দিলেই বানরগুলি লোভে সেখানে যায়, আর আয়নায় নিজেদের রূপ দেখে অহংকারমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন উপর থেকে ঝুপঝাপ জাল ফেলে তাদের বেঁধে ফেলা হয়। পাখীগুলিকেও নানান রকম লোভ দেখিয়ে যাদবপুর থেকে বালিগঞ্জ অবধি নানান বাড়ীর ছাদে ফাঁদ পেতে ধরা আরম্ভ হয়েছে।

বেতারের খবর, অ্যাসেম্বলি হল ও ইডেন গার্ডেন ফেরত রাজভবনের ভ্রাম্যমান বন্যবরাহ কিছুতেই ধরা পড়ছে না। তাকে লোভ দেখালে সে লোভ সম্বরণ করে উচ্চতর আদর্শে আত্মরক্ষা করছে। কি করা যায় এ বিষয়ে কোন মন্ত্রীই কিছু বলতে পারছেন না, কারণ লোভ আর ভয় যার নেই, তাকে দমন করা অসম্ভব, এ কথা তাঁরা আগের থেকেই জানেন। পোষা কুকুর দিয়ে শুয়োর তাড়িয়ে বাইরে আনা গেল না; কারণ কুকুর

শুয়োরকে তাড়াতে পারল না, বরং শুয়োরই কুকুরকে তাড়িয়ে বিদায় করল। এখন খোল, করতাল আর টিন পেটানর ব্যবস্থা চলছে। মনে হয় সে অসঙ্গত শব্দ আলোড়ন শুয়োরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না। চিৎপুরে দুর্দ্ধর্ষ বালকবাহিনী পটকা-হাতে হায়েনা আর নেকড়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে গঙ্গার দিকে। ঐখানে কাঠগুদামের মধ্যে মধ্যে বড় বড় খাঁচার মত ফাঁদ বানিয়ে রাখা হয়েছে। পটকা-বিধ্বস্ত হিংস্র পশু স্বভাবতই লুকাবার জায়গা খুঁজবে। ঐ সব খাঁচার ভিতরে গেলেই দরজা পড়ে তাদের খাঁচায় বন্দী করে ফেলবে। এই রকম নানা প্রকার বিলিব্যবস্থা চলছে। মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে সহর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। চিড়িয়াখানা থেকে নিস্ক্রান্ত জন্তুগুলিকে পুনরায় নিজ নিজ নিবাস-কেন্দ্রে পুনর্বাসন ব্যবস্থা সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। শুধু ঐ গণ্ডার দুটো এখনও যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করে কোন ব্যবস্থামতই আত্মসমর্পণ করবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। বালিগঞ্জ অঞ্চলের ধনবান শ্রেষ্ঠীগণ নিজ নিজ উদ্যানে খেদার ব্যবস্থা করতে দিয়েছেন, কিন্তু ঐ গণ্ডারদ্বয় ধনীর বাগানে প্রবেশে অনিচ্ছুক। নরসমাজেও দেখা যায় যে সুরুচির পারিপার্শ্বিকে অমার্জ্জিত রুচির মানব স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দে যেতে চায় না। কারণ, কৃষ্টি বা রুচি-সংঘাত। উচ্চ-নিচের পরস্পরবিরোধী মনোভাবের ঐতিহ্য অতি দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত। গণ্ডারের সুরুচি-হীনতা এক্ষেত্রে তার নিজের পক্ষে সুবিধার কারণই হয়েছে। ঐ জন্তুদ্বয় এখন বালিগঞ্জের সুখাবাসগুলি অবহেলা করে পল্টনের ছাউনির দিকে গিয়েছে। পল্টনের লোকেদের গুলী চালান বারণ। তারা সতর্কতার সঙ্গে এই বিষয়ের পরিণতি কি হয় তা দেখছে।

বিকেলের বেতার সংবাদে জানা গেল যে, গণ্ডার দু'টি তথাকথিত বালিগঞ্জ ময়দান পার হয়ে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের কাছে যেখানে বিমানধ্বংসী কামান আছে, সেইখানে গিয়ে পৌছে একটা কামান গুঁতো মেরে উল্টে দিয়েছে। কামানটার দেহে খড়্গাঘাত করে কোন সুবিধা না হওয়াতে তারা একটা "নাস্তেন" গুদামঘর আক্রমণ করে তার টিনের দেওয়াল ছিন্নভিন্ন করে ভেতরে ঢুকেছে। সৈন্যরা সেখানে ভারি ভারি বাধা খাড়া করে গণ্ডারগুলিকে সেখানেই আবদ্ধ রেখেছে। এখন চেষ্টা হচ্ছে কোন উপায়ে একটা খোলা মুখের কাছে একটা খাঁচা বসিয়ে যদি সেগুলিকে বন্দী করা যায়। শহরে আতঙ্কের কিছুটা আংশিক প্রশমন দেখা গিয়েছে। এখন দুঃসাহসী যারা তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাইরে যেতে আরম্ভ করেছে। দু'জন ছেলে মোটর সাইকেল চড়ে গণ্ডার ধরা দেখতে গিয়েছিল। তারা ফিরে এসে বললে যে গণ্ডার দু'টি অনেকক্ষণ চুপচাপ আছে দেখে গুদামের এক দিকের দরজা খুলে একটা জোরাল টর্চ জ্বালিয়ে দেখা হ'ল যে তারা কি করছে। দরজা খুলে টর্চ জ্বালিয়ে দেখা গেল যে গণ্ডারগুলি যেখানে পাঁচশ বস্তা ময়দা ছিল, সেখানে গিয়ে ময়দার বস্তাগুলি ফুটো করে ময়দার একটা পাহাড়ের মধ্যে দাপাদাপি করছে। কিছুটা হয়ত খেয়েওছে, আর বাকিটা সর্ব্বাঙ্গে মেখে একেবারে সাদা হয়ে উঠেছে। চোখে টর্চ্চের আলো পড়তেই প্রথমতঃ গণ্ডারগুলো থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার পরেই জেট এঞ্জিন চালিত মহা প্রলয়ের রকেটের মত তারা আলোটার উপরে নিজেদের নিক্ষেপ করল। সৈন্যরা সবে গিয়ে খাঁচাটা কোন রকমে দরজাটার দিকে ঠেলে দিয়ে পাশ থেকে সেটাকে চেপে রাখবার চেষ্টা করল। কিন্তু খাঁচাটার উপরে প্রায় পঞ্চাশ মণ গণ্ডার ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেটা ভেঙ্গে উড়ে গেল। দেখা গেল দুটো সাদা গণ্ডার তীরের মত চলে গেল। পথে একটা তারের বেড়া, একটা ময়লার ডাষ্টবিন, একটা খালি গাড়ি আর দুটো রিক্‌শা ছিল; সেগুলোও ঝড়ের মুখে খড়ের মত উড়ে গেল। লান্সডাউন প্লেসের ভিতর দিয়ে গণ্ডার দুটো পাগলের মত ছুটে চলল; ধোপারা কাপড়ের পুঁটলি, ধুনুরিওয়ালারা ধুনুরি আর ঝাঁকামুটেরা মাথার মাল পথে ফেলে যেমন করে পারে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করল।

এর পরে গণ্ডারগুলো রাস্তা দিয়ে পদ্মপুকুরের দিকে চলল। কখনও গুঁতো মেরে ডাষ্টবিন ওল্টায়, কখনও বা খালি গাড়ি ভাঙ্গে। কিন্তু মানুষরা তাদের গতিতে বাধা দেবার কোন চেষ্টা না করায় গণ্ডারদিগের খড়্গাঘাতে কোন মানুষের প্রাণহানি হয় নি এখন পর্য্যন্ত। দূরে দূরে থেকে একটা সাঁজোয়া গাড়ি গণ্ডারদের পেছনে চলেছে। তারা থামলে গাড়িটাও থামছে। পদ্মপুকুরের কাছে এসে গণ্ডার দুটো প্রথমেই পুকুরে নামবার জন্য রেলিং ভেঙ্গে ভেতরে চলে গেল। সেখানে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকতে না পেরে তারা আবার উঠে অপর দিকের রেলিং ভেঙ্গে যদুবাবুর বাজারের দিকে চলল। এবার অনেকগুলি ট্যাক্সি, বাস প্রভৃতি রাস্তায় রাত্রিবাস করার ফলে আক্রান্ত হ'ল। কিছু কিছু ওলটপালট করে

গণ্ডার দুটো বাজারের বাইরের অনেক দোকানের মাল-পত্র নষ্ট করার চেষ্টা করে। এখানে উল্টো দিক থেকে সামরিক গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওদের গতি রোধ করার চেষ্টা হয়। গণ্ডারগুলো অনায়াসে সেই গাড়ির প্রাকার ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ট্রামরাস্তা পার হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোডের দিকে যেতে লাগল। এখানে দোকান-পাট সব বন্ধ করে অনেক আগেই লোকে রাস্তা খালি করে দিয়েছিল। উত্তরদিক থেকে একটা গাড়ি আসছিল, সেটা দূর থেকে গণ্ডার দেখে ঘুরে উল্টো পথে অন্তর্হিত হয়ে গেল। গণ্ডার দুটো মন্থরগতিতে এখন চলতে লাগল। তাদের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল যেন তারা কোন কিছু গন্ধের সাহায্যে লক্ষ্য করে চলেছে। গণ্ডারের ঘ্রাণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও বহুদূর থেকে তারা গন্ধ পায়। এখন তারা আবার ছুটতে আরম্ভ করল, আর অতি শীঘ্রই শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট অতিক্রম করে আলিপুরের ছোট পুলটার দিকে ছুটল। বোঝা গেল ময়দানের দিকে না গিয়ে বিপরীত দিকে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য সম্ভবত পুনরায় চিড়িয়াখানায় প্রত্যাবর্ত্তন চেষ্টা। পুলটা পার হওয়া সম্বন্ধে মনে দ্বিধার উদয় হ'ল। এদিক-ওদিক দেখে শুঁকে হঠাৎ পুলের পাশ দিয়ে দুই অতিকায় নিচে নেমে একটা বাড়ীর তারের বেড়া প্রভৃতি ছিন্নভিন্ন করে জলকাদার ভিতরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওপারে হাজির হ'ল। তারপর একটা প্রচণ্ড দৌড় আর চিড়িয়াখানার ফাটক ভেঙে ভিতরে যাওয়া। ঘ্রাণে নিজেদের আবাস খুঁজে নিতে তাদের কোনও অসুবিধা হ'ল না। তারা পালাবার পথেই আবার ফিরে গিয়ে নিজ নিজ কর্দ্দম-শয্যায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি ততক্ষণ বাড়ীতে বসে খালি বেতার সংবাদ শুনছি, আর ছেলেদের আমদানি-করা উড়ো খবরের মূল্য বিচার করছি। একজন খবর আনল ভালুকটা ঘোড়দৌড়ের মাঠের একটা আস্তাবলে ঢুকে ঘুমিয়ে ছিল। তার কাছে একটা খাঁচার মত তৈরী গাড়ি নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবার পরে সে খাঁচার ভিতরে নিজের প্রিয় খাদ্য সব রয়েছে দেখে ঢুকে পড়ল। খাঁচাটা তখন বন্ধ করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বুনো শুয়োরটা তখনও লাট প্রাসাদের বাগানে ঝোপে লুকিয়ে আছে। সেখানে জায়গাটা দূর থেকে শক্ত করে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। তাকে না কি খেতে না দিয়ে রাখলে সে খাবার দেখলে খাঁচায় ঢুকে পড়বে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার ভোরের আলোয় গড়া রঙিন স্বপ্ন ক্রমশঃ যেভাবে রূপাশ্রয়ে বাস্তব হয়ে দাঁড়াল তাতে মনে হ'তে লাগল যে বস্তুকে প্রকটভাবে সামনে আসতে দিলে রস ও সৌন্দর্য্য অনুভূতি আহত ও নষ্ট হয়ে যায়। কল্পনা কিংবা স্বপ্নে দেখা যা-কিছু তা নিজের স্বরূপ পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দেখায় না তাই তার সৌন্দর্য্যে কোন রসহীন শুষ্কতার ভেজাল থাকে না। মানব মন সর্ব্বদা রস আর সৌন্দর্য্য খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু মন যা চায় বাস্তব তা নয়। কল্পনা, আদর্শ কিংবা বস্তুর রসগ্রাহ্য আকার বাস্তবে সহজ-লভ্য নয়। আবার বাস্তবে যা আছে তাও অর্দ্ধজাগ্রত দৃষ্টিতে মোহন রূপ ধারণ করতে পারে। মানবমন যদি স্বেচ্ছায় প্রবঞ্চিত হতে না পারত তা হলে জীবনক্ষেত্রে বাস্তবের উৎকট ভাব অসহনীয় হয়ে উঠত। তাই অঘটনঘটনে মানুষের রসতৃষ্ণা তৃপ্তিলাভ করে; আবার অবস্থা স্বাভাবিকে ফিরে গেলে মনের শুষ্ক কঠিন বাস্তব উপলব্ধি ও পুনর্জাগ্রত হয়।

মুক্তির আগ্রহ জাগ্রত হলেই যে মুক্তি কি তা পরিষ্কার জানা যায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার মুক্তি কি ও কোথায় তার জ্ঞান থাকলেই যে মানুষ মুক্তির জন্য চঞ্চল হয়ে উঠবে তাও কেউ বলতে পারে না। আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, বিক্ষুব্ধ অভাববোধ; কোন কিছুই মানব-মনকে সত্যপথের দিগ্দর্শনে সক্ষম করবেই এরূপ আশ্বাস কেউ দিতে পারে না। তবে জীবনপথে গতির আবেগ থাকবেই; তা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যবর্জ্জিত হলেও। বানরের শাখায় শাখায় বা পাখীর আকাশে বিচরণ স্বভাবজাত। গণ্ডারের গুঁতাও তাই। বিজ্ঞান এই সকল মাংসপেশীর প্রক্ষিপ্ত অভিব্যক্তির কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যান উপস্থিত করলেই বিষয়টার শেষ পরিচয় পাওয়া হয়েছে বলা যায় না। সৃষ্টির আকাশে, বাতাসে, প্রাণশক্তি প্রগতির আবেগ ও গূঢ় মর্ম্ম-প্রেরণা বহুধারায় প্রবাহিত। এই সবের পূর্ণ অর্থ, পেশী, গণ্ড, নাড়ী, অস্থি, গ্রন্থি, কিংবা বৃক্ষকাণ্ড, গৃহপ্রাকার, পর্ব্বত বা জলাশয়ে পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয় না। বর্ণনা শুধু অনুসন্ধানের দরজা খুলে দিতে পারে। আমি যা দেখলাম বা শুনলাম, তা সকলকে দেখালাম ও শুনালাম। অতঃপর বিশ্লেষণ, সত্য নির্ণয়, অর্থ উদ্ঘাটন ও অনুসন্ধিৎসার পালা।

—•—

আমি বটতলা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজব সহর কোলকাতা। তারই সেরা সেকালের আজব মহল্লা চিৎপুর। আর আমি তারই সেই চির পরিচিত বটতলা। 'বটতলার বই' এ নামে যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তা'কে উপেক্ষা করতে চান, করুন। 'বটতলার বই' নাম শুনে ঘৃণায় নাক সিঁটকাতে চান, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি বাংলা সাহিত্যের যে কী উপকার সাধন করেছি, সে কথা প্রকাশ্যে বললে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মহাপণ্ডিত-দের লজ্জা বোধ হতে পারে। এটা তাঁরা মনে-প্রাণে জানেন আমি না থাকলে তাঁদের ভাগ্যে বাংলা সাহিত্যের ডি লিট্, পি এইচ্ ডি, ডি, ফিল্ হওয়া হয়ত কোনদিন সম্ভবপর হ'ত না। প্রলয় পয়োধিজলে ভগবান তাঁর মীনরূপে যেমন বেদ উদ্ধার করে রেখেছিলেন, আমিও তেমনি বটতলারূপ ধারণ করে দুর্লভ অজ্ঞাত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার ও সযত্নে রক্ষা করে এসেছি।

আমি বটতলা। বিগতশতকে কোলকাতার চিৎপুরের তেমাথা বড় রাস্তার পাশে আমিই ছিলাম সেই প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ। আমারই নিচে ছিন্ন মাদুর বিছিয়ে কয়েকজন পুস্তকবিক্রেতা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত-পুরাণ, গীতা, চণ্ডী, পালাগান, বৈষ্ণব পদাবলী, পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধা, বৃন্দাবনলীলা, দেবী ভাগবত, বাংলার পাঁচালী গান, আগমনী বিজয়ার গান মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, বাংলার ব্রতকথা, বাংলার বাউলসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, প্রভৃতি পুস্তক সাজিয়ে বসে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার রাখতেন গোপালভাঁড়, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাহার দরবেশ, আরব্য উপন্যাস, *পারস্য উপন্যাস, গোলেবকাওলী, প্রেমপত্র লিখনপ্রণালী*, বশীকরণ তন্ত্র প্রভৃতি। আবার কেউ রাখতেন নূতন পঞ্জিকা, সরল ধারাপাত, সরল শুভঙ্করী, শিশুবোধক, পত্রদলিল লিখন শিক্ষা, পুরোহিত-দর্পণ প্রভৃতি। কেউ আবার রাখতেন যাত্রাভিনয়ের বই ও নানা মজাদার শ্লীল অশ্লীল গল্পের বই।

এইভাবে চলত বটতলার বইয়ের কেনাবেচা। সে বটবৃক্ষ যে কোথায় কি ভাবে ছিল এখনকার লোকে সে কথা জানেন না, সন্ধান করবারও চেষ্টা করেন না। তখনকার দিনের চিৎপুর এখনকার দিনের চিৎপুরের মত ছিল না। একদিকে ছিল যেমন বনেদী বড়লোকের গেটওলা বড় বড় অট্টালিকা—যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজত পেটা ঘড়ি আর সাঁঝ সকালে চলত জুড়িগাড়ী—কিটন-পাল্কীর আনাগোনা—আর একদিকে ছিল নোংরা অপরিসর গলির ঘুপ্‌সী ছোটখাট বাড়ীগুলো। মেটে উঠোনের চারপাশে খোলার চালাও করোগেট টিনে ছাওয়া বস্তি-ঘরও ছিল অগস্তি। এই সব নোংরা গলির বাড়ীতে শুধু যে গরীব বাসিন্দারাই থাকতেন তা নয় নামজাদা অধিবাসিনীরাও তাঁদের নিরঙ্কুশ ব্যবসা চালাতেন। এখনকার মত ফ্ল্যাট-বাড়ী না থাকলেও চটু-টাঙানো দোতলা তে-তলাতে দরমার বেড়া-দেওয়া হাফ্-গেরস্ত ঘরও ছিল। নিচের বারান্দার গায়ে কীর্ত্তন গায়িকা, টপ-গায়িকা, ঝুমুর-গায়িকাদের নাম, অপেরা ও যাত্রাপার্টির সাইন-বোর্ড, বাইজীদের নেম-প্লেটও মাঝে মাঝে দেখা যেত। টেরিকাটা সরু সোনার মফচেন গলায় ভাঙা বাংলাভাষী হিন্দুস্থানী পান-ওলাদের পানের দোকানগুলিতে তখন না পাওয়া যেত কি! সন্ধ্যার পর পাকানো চাদর গলায় ছড়ি হাতে পম্পসু পায়ে আতর কানে লম্বা জুল্‌পি বাবুদের আনাগোনা যে-সব পথে, যেখানে বেলফুলের *কদর খুব। সে পল্লী ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলেই* তিনটে রাস্তা তিন দিক থেকে মিলেছে যেখানে, সেখানে

ছিলাম আমি—সেই বিরাট্ বটবৃক্ষ। এখন অবশ্য আমার সেই বৃক্ষরূপ একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে, স্থানটিও খুঁজে বার করা একরকম অসম্ভব—তবু আমার নামটি এখনও আছে 'বটতলা'।

অতীতের সেই বটগাছের তলায় তখনকার দিনের সেরা পুস্তক বিক্রেতা চক্রবর্ত্তী মশাই। পাকা গোঁফ, পাকা বাবরি চুল, কানে খাগের কলম, মুখখানিতে হাসি—মাদুর পেতে সামনে একটা আধভাঙ্গা কাঠের বাক্স নিয়ে লম্বা ফালি ফালি হলদে রংয়ের কাগজে হিসাব করেন বই বিক্রীর। সামনে দু'চারটে বেতের মোড়া। আশপাশে কয়েকজন পাইকারী খদ্দের।

শালু-কাপড়ে কেনা বই বেঁধে তারা বসে আছে চক্রবর্ত্তীমশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে। চক্রবর্ত্তী মশাই হিসাব করেন—"ওহে নকুড় সাঁই, তোমার হোল গিয়ে সাঁইত্রিশ টাকা চোদ্দ আনা, এই ধরনা কেন—পেত্নীর বিয়ে পাঁচখানা, মনসার ভাসান তিনখানা, মানিকপীরের গান তিনখানা, বিবিবউ সাতখানা, আক্কেল গুড়ুম দশ খানা, রামায়ণ দু'খানা, মহাভারত একখানা, সরল যাদুবিদ্যা তিনখানা—ব্যস্—আর কিছু নেবে নাকি হে নকুড়?"

চক্রবর্ত্তীর সাকরেদ মুকুন্দ থেলো হুঁকোয় জলন্ত কল্কে বসিয়ে চক্রবর্ত্তীর হাতে দেয়। হুঁকোয় দু'চারটে টান দিয়ে হুঁকোটা একপাশে রেখে চক্রবর্ত্তী বলে ওঠেন—দেখ মুকুন্দ, দাশু রায়ের পাঁচালীর প্রথমখণ্ডের পাণ্ডুলিপি দিয়েছি বিদ্যাদায়িনী প্রেসে, তার কতটা কি হোল একবার খবর নাও, আর নীলকণ্ঠের যাত্রার গানও দিয়েছি ঐ প্রেসে—তার ছাপা শেষ হোল কি না সে খবরটাও নিয়ে এস।

মুকুন্দ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। চক্রবর্ত্তীমশাই এবার একটা চৌকো কৌটো খুলে তা থেকে এক খিলি পান মুখে পুরে অপর একজন খরিদ্দারের দিকে চেয়ে বললেন—"দেখ সামন্ত, তোমার ঐ 'গোঁসাই বাড়ীর কেচ্ছা' বইখানা এখন আর দিতে পারব না দু'এক দিনের মধ্যে। বরং এখন খানকয়েক 'আজব বউয়ের লীলারঙ্গ' 'বনেদীঘরের গুপ্তকথা' আর 'বউ নিয়ে কেলেঙ্কারী' বই নিয়ে যাও।"

সামন্ত ঘাড় নেড়ে বলে—"না না, ও সব থাক্ এখন। এবার বরং দিন চক্রবর্ত্তীমশাই—'অভিনব রন্ধন পদ্ধতি', 'শ্রীমন্তের মশান', আর 'বিদ্দেদূতীর রসকলি' দু'খানা করে। আর দিন বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ পাঁচখানা, তারক গাঙ্গুলীর স্বর্ণলতা দু'খানা।"

বটগাছের দক্ষিণদিকে আর একজন পুস্তকবিক্রেতা শম্ভু শীলও মাদুর পেতে দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন। শিশুবোধক, অভিনব রন্ধনপ্রণালী, মেয়েদের ব্রতকথা ও প্রেমপত্র লিখন শিক্ষা বইগুলি তাঁর একচেটিয়া বিক্রীর বই। অবশ্য এর সঙ্গে যাত্রাভিনয়ের বইও কিছু কিছু রাখেন। তাঁর দোকানেও দু'তিনজন খরিদ্দার উবু হয়ে বসে বই কেনার ফর্দ্দ লিখছে। শম্ভুশীলের একটা মস্ত মুদ্রাদোষ—কথা বলতে বলতে তিনি মাঝে মাঝে 'বুঝলে কিনা', 'বুঝলে কিনা'—এই কথার মাত্রা দিয়ে বসেন। একজন খরিদ্দারের দিকে চেয়ে শম্ভুশীল বললেন—"ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ" আর 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' বই দু'খানা তোমার আজ চাই না-কি হে অনাদি? দু'দিন বুঝলে কিনা, সবুর কর। প্রেস থেকে আনিয়ে নিতে হবে কিনা।"

অনাদি বলে—"তাই না হয় দেবেন শীলমশাই। তবে আজ তিনখানা 'হস্তরেখা বিচার', দু'খানা 'শক্তিপদাবলী' আর খানপাঁচেক 'অক্রূর সংবাদ' দিন। টাকাটা পরশু নাগাদ দিয়ে যাব। ও হো ভুলে যাচ্ছিলাম—'উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা''ও পাঁচখানা দিতে হবে।

হাই তুলে নিজেই নিজের মুখের কাছে তিনটে তুড়ি দিয়ে শম্ভুশীল বললেন—তোমরা, বুঝলে কিনা, পুরোনো খদ্দের। তোমাদের কাছে টাকা, বুঝলে কি না, পড়ে থাকলে ক্ষতি নেই। তবে এখন আখেরের সময়, পরশু, বুঝলে কিনা, দিয়ে যেতে ভুলো না যেন।

অনাদি কতকগুলো বই খেরো কাপড়ের পুঁটুলিতে বেঁধে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—পরশু পারব না শীলমশাই, তবে হপ্তাখানেকের মধ্যেই কিছু দিয়ে যাবো 'খন।

শম্ভুশীল একটিবার মাত্র অনাদির দিকে তাকিয়ে অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করলেন।

হঠাৎ চিৎপুরের রাস্তায় একটা সোরগোল উঠল। মল্লিকাবাবুদের চৌঘুড়ি আসছে। স্বর্গীয় মল্লিক কর্ত্তার সেজ ছেলে পান্না মল্লিক যাচ্ছেন গড়ের মাঠের হাওয়া খেতে। চারটে কালো রংয়ের ওয়েলার ঘোড়া কদম-চালে রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছে। সহিস কোচম্যানের জরির পাগড়ি আর রেশমী আচকান। ল্যাণ্ডোর মধ্যে অর্দ্ধশয়ান সেজবাবু সোনালী তবক মোড়া আতর-দেওয়া মিঠে পানের খিলি খাচ্ছেন। তাঁর সামনের সীটে অপরূপ সাজে সজ্জিতা দিলজানবাঈজী একটি বড় ফুটন্ত গোলাপফুল শুঁকছেন আর হেসে হেসে সেজবাবুর সঙ্গে

কথা বলছেন। রাস্তার দু'পাশে লোকে এ দৃশ্য দেখতে লাগল। গাড়ী চলে যাবার পর ভিড়ও কমে গেল।

বটতলার চক্রবর্তীমশাই ও শম্ভুশীল উঠে দাঁড়িয়েছিলেন পথের পানে চেয়ে, এবার মাদুরে বসে পড়লেন।

শম্ভুশীল একজন খদ্দেরের দিকে চেয়ে বললেন—এর পরে, বুঝলে কিনা বেরুবে "হাটখোলার দত্ত বাড়ীর সাদা ঘুড়ির কিটন," তার পরেই "বাগবাজারের গোকুল মিত্তিরের চৌঘুড়ি।" বুঝলে কিনা কাদের মিঞা গেল-জন্মে কত পুণ্যই না করেছিল এরা এখন বুঝলে কিনা, তারই ফল ভোগ করছে।

কাদের মিঞা বললে—"ঠিক বাত বলেছেন শীলমশাই বেহেস্ত ভোগ হয় এই দুনিয়াতেই। আমরা আর ও-সব ভেবে কি করব বলুন? এখন খানকতক কেতাব মেহেরবাণী করে দেন্ দেখি—দিন—পারস্য উপন্যাস একখানা, গোলেবকাবলী তিনখানা, তাহার দরবেশ তিনখানা, সোরাব রুস্তম দু'খানা, লায়লা মজনু তিনখানা আর মানিকপীরের গান দু'খানা। সব দাম আজ দিতে পারব নি শীল মশাই—আধা দিচ্ছি।

শীলমশাই বললেন—"তা না হয় দিলে, কিন্তু, বুঝলে কিনা, বই বেশী কাটাচ্ছ কৈ?

কাদের মিঞা হেসে বললে—"কাটাচ্ছি বৈ কি! তবে হয়েছে কি জানেন, এ সময়টাতে লোকের হাতে পয়সা নেই। তবে খোদার মর্জিতে দেশের এ হাল আর বেশিদিন থাকবে না।

হঠাৎ সামনের রাস্তায় ঘোড়ায়টানা ট্রাম থেকে নেমে তিনজন ভদ্রলোককে সেদিকে আসতে দেখে শম্ভুশীল ও চক্রবর্তী মশাই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন—"আসুন, আসুন—আজ কি ভাগ্য!"

তাঁরা বটগাছের নিচে আসতেই তাঁদের মোড়া পেতে বসতে দেওয়া হোল।

ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বললেন—"আমার 'জন্মান্তর রহস্য' আর 'পুরোহিত দর্পণ' কেমন বিক্রি হচ্ছে চক্রবর্তী?

চক্রবর্তী গদগদ কণ্ঠে বললেন—মন্দ বিক্রী হচ্ছে না ভট্টাচার্যি মশাই। আর আপনার মত দার্শনিক পণ্ডিতের লেখা—লোকে ত আদর করেই নেবে।

ভট্টাচার্যি মশাই খুশী হলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন—"আমার সামাজিক উপন্যাস 'মিলন মন্দিরে'র পাণ্ডুলিপিখানা ঠিক করে রেখেছি। একদিন গিয়ে নিয়ে এস।"

চক্রবর্তী বিনীতভাবে বললেন—"আজ্ঞে নিশ্চয়—কাল যাব কি?"

ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—"না কাল যেও না, কাল একবার যাব উত্তরপাড়ার রাজা প্যারী মুখুয্যের কাছে। আমার লেখা বই "প্রেমের প্রতীক্ষা'র পাণ্ডুলিপি শোনাতে। তিনি শুনতে চেয়েছেন"

এবার আর একজন ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে চক্রবর্তী মশাই বললেন—"আপনার উপন্যাসখানাও এবারে বিক্রী হচ্ছে ভালই, চাটুয্যে মশাই।"

ভদ্রলোকটি এবার মৃদু হেসে বললেন—"তা হলে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বই-এর পরেই আমার বই কাটে ভাল—কেমন, তাই নয় কি চক্রবর্তী?"

সুরেন্দ্রমোহন বাবু বললেন—"দেখ, কালীপ্রসন্ন, তোমার লেখাও যে চমৎকার হে! তবে উপন্যাসের রাজত্বে আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারছি না এই ভুবন মুখুয্যেকে—কি বল ভুবন? তোমার ঐ 'হরিদাসের গুপ্তকথা' এবার বাজার মাৎ করেছে।

অপর ভদ্রলোক ঈষৎ লজ্জিতভাবে বললেন—তোমরা আমাকে স্নেহের চোখে দেখে থাক—সে আমি জানি সুরেনবাবু—তবে আমি সমাজের দোষগুণ যা দেখিয়েছি, সব বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া—মিথ্যে কিছুই লিখি নি।

কালীপ্রসন্ন চাটুয্যে বললেন—"তা' ছাড়া কি চমৎকার তোমার ভাষা ভুবন। মানুষের মনের মধ্যে গিয়ে সব কথা যেন ঘা দেয়। তুমি অমর হয়ে থাকবে হে ভুবন—অমর হয়ে থাকবে।"

ভুবন মুখুয্যে বললেন—"যা দেখেছি, তা-ই লিখেছি। এতে আর আমার বাহাদুরি দেখলে কোথায়? এখন আবার উপেন মুখুয্যের তাগিদে আমাকে বড় বড় ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদে হাত দিতে হচ্ছে।"

সুরেন্দ্রমোহনবাবু মৃদু হেসে বললেন—"সে ত ভালই হে। তোমার অনুবাদের মত অনুবাদ কি আর হয়।"

এবার শম্ভুশীল কথা বললেন—"কাল কি হয়েছিল জানেন? ঐ যে, হুগলী জেলার দেবানন্দপুর থেকে, বুঝলে কি না, কে এক চাটুয্যে ছোকরা এসে ভুবনবাবুর হরিদাসের গুপ্তকথার খুব সুখ্যাতি করে গেল। বইখানা না-কি পড়ে পড়ে তার মুখস্থ হয়ে গেছে।"

সুরেন্দ্রমোহনবাবু বললেন—"যে বই লিখেছ ভুবন, কত ভাল ভাল লোকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবে—তা ছাড়া

তোমার ঐ দেবানন্দপুরের কে-এক চাটুয্যে ছোকরার মত কত ছোকরারই মুখস্থ থাকবে বইখানা।

হঠাৎ একটা লোক ঢোল পিটতে পিটতে সেদিকে এল। ব্যাপার কি জানবার জন্যে সকলেই উৎসুক হয়ে উঠলেন। শোনা গেল পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে বুলবুলির লড়াই হবে বেলা দশটায়। বটতলার চারিদিকে এ কথা নিয়ে বেশ একটা সোরগোল পড়ে গেল।

এর মধ্যে আর একজন লোক এসে চক্রবর্তীদের আসরে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে দেখে শম্ভুশীল আর চক্রবর্তী দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠলেন—"ব্যাপার কি গুরুদাসবাবু—হঠাৎ এদিকে যে?"

গুরুদাস ওরফে গুরুদাস চাটুয্যে বললেন—আর বল কেন—তোমাদের পাড়ার দেবেন ঠাকুরের ছেলে রবীনঠাকুর তার লেখা খানকয়েক বই বিক্রী করতে পাঠিয়েছিল আমার বইয়ের দোকানে। আশ্চর্য্য! সবগুলিই বিক্রী হয়ে গেছে ক'দিনের মধ্যে। তাই আরো বই নিতে এসেছি। ছোকরা কবিতা মন্দ লেখে না হে।

সামনের চিৎপুরের রাস্তায় আবার সোরগোল উঠল। জনকয়েক লোক হ্যাণ্ডবিল বিলোতে বিলোতে সেদিকে আসছে দেখা গেল।

হ্যাণ্ডবিলে লেখা আছে—আগামী শুক্রবারে ও শনিবারে পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের "একেই কি বলে সভ্যতা" আর "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" অভিনীত হবে।

একটিপ্ নস্যি নিয়ে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন—খৃষ্টান হলে কি হয়, মাইকেলের মনটা কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দুর। আর অমন জোরালো পদ্য আর হয় না শম্ভু, অমন জোরালো পদ্য আর হয় না। কবি বলতে এখন ঐ মাইকেল। আশ্চর্য্য প্রতিভা বটে লোকটার।

কালীপ্রসন্ন চাটুজ্যে বললেন—"তা' আর বলতে। কবি হেম বাঁড়ুজ্যে ত আনন্দে মাইকেল মধুসূদনের নাম নিয়ে বাঙ্গালীকে ধ্বজা ওড়াতে বলেছেন।"

গুরুদাস চাটুজ্যে মশাই বললেন—"একটা মজার খবর শুনুন আপনারা। দেবেন ঠাকুরের ছেলে ঐ রবীন ঠাকুর সেদিন মাইকেল সম্বন্ধে আমাকে কি বললে জানেন? রবীন ঠাকুরের মত মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য না-কি শুধু লড়াইয়ের কাব্য। তার ভাল লাগে নি ওটা।"

সুরেন্দ্রমোহনবাবু বললেন—হাজার হোক্ কাঁচা বয়স। ঐ বয়সে মাইকেলের কাব্য বিচার করতে গেলে অমনধারা হয়েই থাকে, তবে আমি বলে রাখছি দেখো, এ মত পাল্‌টাতে হবেই রবীনের।

সামনে চিৎপুরের রাস্তায় এবার কাকে দেখতে পেয়ে চক্কত্তি মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—আরে ভট্টাচায্যি মশাই যে! আসুন আসুন এ দিকে পায়ের ধুলো দিন।

ভদ্রলোকটি আসতেই আর একটি মোড়া তাঁকে সসম্ভ্রমে দেওয়া হ'ল।

সুরেন্দ্রমোহনবাবু বিনীতভাবে বললেন—আপনার কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকটি যথেষ্ট সুখ্যাতি পেয়েছে ভট্টাচায্যি মশাই। কি চমৎকার অভিনয়ও হয়েছে। সমাজের গ্লানি চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন আপনি।

কালীপ্রসন্নবাবু বললেন—গুপ্তদাদার সংবাদ প্রভাকরেও বেশ ভাল আলোচনা হয়েছে।

চিৎপুরের রাস্তায় আবার হৈ চৈ শোনা গেল। খবরের কাগজ বিক্রী হচ্ছে চেঁচিয়ে—নীলদর্পণের মামলার রায়—লঙ্ সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা আর এক মাস কারাদণ্ড। সিংহী মশাই হাজার টাকা জমা দিয়েছেন—পড়ুন পড়ুন—

খবরটা শুনে সকলে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। অনেকক্ষণ কারোর মুখে কথা নেই। হঠাৎ সেখানে এখন এলেন এমন একজন ভদ্রলোক যাঁর চোখে মুখে বেশ সপ্রতিভ সহাস্য ভাব। চলবার ভঙ্গীটিও একটু অসাধারণ।

তাঁকে দেখে একসঙ্গে শম্ভুশীল আর চক্কত্তি মশাই বলে উঠলেন—"আরে মুস্তফি মশাই যে! এদিকে আবার কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

উপস্থিত সকলে বেশ সচকিত হয়ে উঠেছিলেন মুস্তফি মশাইয়ের আগমনে। সুরেন্দ্রমোহনবাবু তাঁকে বললেন—"আচ্ছা অর্দ্ধেন্দুশেখরবাবু, আপনি কিন্তু বেশ জব্দ করেছিলেন সাহেবী দেবকার্সনের দলকে। ইডেন বাগানে তাঁবু ফেলে ব্যাটারা বাঙ্গালীবাবুকে ঠাট্টা আর গালাগাল দিয়েছিল। আপনিও তার উত্তরে বেহালা হাতে সাহেব সেজে ঐ ফিরিঙ্গী সাহেবগুলোকে খুব এক চোট নিয়েছেন।"

একখানা মোড়ার ওপর বেশ জুৎসই হয়ে বসে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি মশাই একটু ঝাঁঝালো সুরে বললেন—"নোব না? ব্যাটারা বাংলা দেশের বুকের উপর দাঁড়িয়ে করবে বাঙ্গালীকে ঠাট্টা? তারা জানে না এ বাঙ্গালী জাতকে। ব্যাটাদের তখন তাঁবু গুটুতে হয়েছিল মশাই—পালাতে আর পথ পায় নি!

মুস্তফি মশাইয়ের বলবার ভঙ্গি দেখে সকলে ত হেসেই অস্থির। আশপাশের দু'দশজন লোক তখন

সেখানে এসে জুটেছে। ক্রমে নীলদর্পণের কথা উঠল। মুস্তফি মশাই গদ্ গদ্ কণ্ঠে বললেন—

"জানেন, আমি থিয়েটারের অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছি।"

সুরেন্দ্রমোহনবাবু বললেন—"কি পুরস্কার অর্দ্ধেন্দু-বাবু?"

হঠাৎ মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুস্তফিমশাই ডান হাতখানি মাথায় আর বাঁ হাতখানা কোমরে রেখে অঙ্গ দুলিয়ে বলে উঠলেন—"বিদ্যেসাগরের চটি মশাই, বিদ্যে-সাগরের চটি। থিয়েটারে নীলদর্পণ দেখতে এসে আমার সাহেবের পার্ট দেখে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁর পা থেকে চটি খুলে ছুঁড়ে মেরেছিলেন আমার গায়ে। আর আমি তখনি তাঁর সে চটি মাথায় নিয়ে আনন্দে নৃত্য করে বলেছিলাম—আমার সাহেবের পার্ট সার্থক হয়েছে। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমি আর কোনদিন পাই নি। যাক্—এবার তা' হলে উঠি,—আজ আবার থিয়েটারের রিহার্সেল আছে। গিরীশ আর অমৃত বোধ হয় এতক্ষণ থিয়েটারে এসে বসে আছে। আচ্ছা, আসি তা' হলে।"

কথাটা বলেই ঘাড় দুলিয়ে গুন্ গুন্ করতে করতে মুস্তফিমশাই চলে গেলেন। এবার সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন চাটুয্যে আর ভুবনমোহন মুখুজ্যেও উঠে পড়লেন বটতলার বইয়ের দোকানের আসর ছেড়ে।

শম্ভুশীল আর চক্কত্তি মশাই আবার বইয়ের হিসাবের কাজে মন দিলেন, কিন্তু সে আর কতক্ষণ? তখনকার চিৎপুরে একটা-না একটা হুজুক লেগে থাকত প্রতিদিন। হঠাৎ জন-তিনেক ছোকরা উত্তেজিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল। ছোকরাদের মধ্যে একজন চক্কত্তি মশাইয়ের পরিচিত। সে চক্কত্তি মশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—"বড়লোকদের আক্কেলখানা দেখেছেন মশয়? এই চিৎপুরের হরেন শীলের বাড়ীতে গহরজান আর মাল্কাজানের গান হবে শুনে আমরা এলাম নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে সেই কোন্নগর থেকে। আজ এখানে ঢুকতেই ত দিলে না শ্লা দরওয়ান দিয়ে কি-না তাড়িয়ে দিলে। এত অধর্ম কি শ্লা সইবে ভাবছেন?

চক্কত্তি মশাই প্রশ্ন করলেন—খুব ভিড় হয়েছে বুঝি?

ছোকরা বললে—"তা আর হবে না? বাড়ীর উঠোনে ফিটন, বগী আর পাল্কীর মেলা বসে গেছে। শহরের বড় বড় লোক আর সাহেব-সুবোর আসতে আর বাকী নেই। একদিকে শ্লা পেনিটির লোক আর একদিকে শ্লা নবীন ময়রার লোক—হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে খাবার বইতে। অত উঁচু সিঁড়িগুলো শ্লা সব লাল ভেলভেটের চাদরে ঢাকা।

বাধা দিয়ে চক্কত্তি বললেন—আরে, গান শুনতে না পেয়েছ, তাতে কি—অনেক কিছু ত দেখতে পেলে।

ছোকরা বললে—শুধু কি গাড়ি-ঘোড়া আর লোক-জন দেখতেই গঙ্গা পেরিয়ে এলুম? খুব শিক্ষা হয়েছে এবার। বড়লোকের বাড়ীর দরজা এবার আর কোন্ শ্লা মাড়ায়? চল্ রে জগা, আবার গঙ্গা পেরিয়ে বাড়ী ফিরতে তো হবে।

ছোকরারা চলে গেল। এদিকে বেলাও পড়ে এল। শম্ভুশীল আর চক্কত্তি মশাই ছড়ানো সাজানো বইগুলি গুছিয়ে নিলেন। দু'জন রোজ-কার মুটে এসে হাজির হ'ল সেখানে। উঠি-উঠি করছেন শম্ভুশীল আর চক্কত্তি—হঠাৎ একজন মাঝবয়সী লোক এসে বললেন—তরজা শুনতে যাবে না-কি তোমরা?

—কোথায় হচ্ছে তরজা?- চক্কত্তি প্রশ্ন করলেন।

লোকটি বললেন—হাটখোলার দত্ত বাড়ীতে হবে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী আর ভোলা ময়রার তরজার লড়াই। যে জিতবে তাকে দেওয়া হবে সোনার মেডেল। শুনছি নাকি কলুটোলা থেকে আসছেন মতিশীল, জোড়াসাঁকো থেকে আসছেন রাজেন মল্লিক আর বাগবাজার থেকে আসছেন গোকুল মিত্তির তরজার বিচার করতে। লোকে লোকারণ্য হবে—একটু সকাল-সকাল যাই চল।

চক্কত্তি বললেন—বল কি হে! কিন্তু আমার আর যাওয়া চলবে না। শম্ভু যায় ত যাক। আজ একবার প্যারীচাঁদ মিত্তিরের বাড়ী যেতে হবে—একটু কাজ আছে।

শম্ভুশীল বললেন—বলেই ফেল না চক্কত্তি কাজটা কি। কেন আমি শুনলে কি কোন ক্ষতি হবে?

চক্কত্তি বললেন—'না,—তা নয়,—ঐ প্যারীচাঁদ মিত্তির আর একখানা কি বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেবেন আমাকে। ওঁর আগের বই 'আলালের ঘরের দুলাল' বেশ নাম করেছে এরি মধ্যে। তবে সেখানে প্যারীচাঁদ মিত্তির নিজের নাম না দিয়ে একটা ছদ্মনাম দিয়েছে—টেকচাঁদ ঠাকুর। খলিফা লোক বটেন! শোনা যায় আসল চরিত্র থেকে গল্পটা নেওয়া।

শম্ভুশীল বললেন—এ যেন কালী সিংহীর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার 'শ্রীহুতোম' আর কি!

চক্কত্তি বললেন—কালে কালে হোল কি! কত আর দেখব শম্ভু, কত আর দেখব।

এই সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল এক ছোকরা। বেঁটেখাটো চেহারা, বেশ ফিটফাট—লম্বা চুল ও জুল্‌পি শাড়ীর মত চওড়া-পেড়ে ধুতি পরণে, লম্বা ঝুল পিরাণ গায়ে। চিৎপুরের কালাচাঁদ মিস্ত্রির সাইড স্প্রীং ঘোড়তোলা কালো বার্নিশের বগলস্-দেওয়া জুতো পায়ে, বাঁ-হাতের কব্জিতে বেলফুলের মালা জড়ানো,—এসেই চক্কত্তি মশাইকে উদ্দেশ করে বললে—"প্রাতঃ পেন্নাম হই চক্কত্তি মশাই—আপনার কাছে 'সরল নৃত্যশিক্ষক' বইখানা আছে? দিন ত একখানা আমাকে।

চক্কত্তি মশাই তার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—আরে, কাশী চাটুয্যে যে! থিয়েটার থেকে ফিরছ নাকি?

কাশী চাটুয্যে হেসে বললে—ধরেছেন ঠিকই চক্কত্তি মশাই, থিয়েটার থেকেই আসছি। আজ থিয়েটারের পুরো রিহার্সেল ছিল কিনা! প্লে হচ্ছে গুরুদেব গিরীশ বাবুর চৈতন্যলীলা, আর শ্রীচৈতন্যের পার্ট করছে বিনোদিনী। ওঃ কি পার্টই করছে মেয়েটা! গিরীশ বাবুকেও কাঁদিয়ে ছেড়েছে।

চক্কত্তি বললে—বল কি হে কাশীনাথ—বিনোদিনী করছে চৈতন্যের পার্ট।

কাশী চাটুয্যে বললে—বিনোদিনীর মধ্যে জিনিষ আছে চক্কত্তিমশাই—তা না হলে অমন উৎরে যায়! প্লে আরম্ভ হলে একদিন দেখতে যাবেন। নাচের তালিম কিছু কিছু দিয়েছি আমি আর গানের সুর দিচ্চেন দেবকণ্ঠ বাগচি মশাই। প্লে যা জমাটি হবে—দেখতে পাবেন।

আতর দেওয়া রঙীন রুমালখানা মুখে একবার বুলিয়ে নিয়ে সেই রুমাল দিয়েই নতুন বার্নিশ জুতোটা একবার মুছে নিলে কাশী চাটুয্যে, তারপর হেলে দুলে সেখানে থেকে চলে গেল।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে। ঘোড়ায়-টানা ট্রামগুলোও আর যাতায়াত করছে না। চিৎপুরের রাস্তায় এখন ছোকরাবাবুদেরই ভিড় বেশি। শম্ভুশীল ও চক্কত্তিমশাই এবার দোকান গুটিয়ে মুটের মাথায় বইয়ের স্তূপ চাপিয়ে সামনের দুখানা ছোট ঘরে গিয়ে উঠলেন। একটু আগে বাগবাজারের রাসের মেলা থেকে একদল পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক আঁচলে আঁচলে গিঁট বেঁধে সারি দিয়ে পথ চলছিল, তাদের সঙ্গের মাথার-চাদর জড়ানো মুরুব্বি লোকটি কোথায় হারিয়ে গেছে, তাই স্ত্রীলোকগুলি পথে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। সেখানেও কিছু লোকের ভিড় জমে গেছে। ওদিকে আবার বিডন বাগানে মাখন সর্দারের পুতুল নাচ শেষ হয়েছে—তাঁবু থেকে পিল্ পিল্ করে লোক বেরুচ্ছে। আবার ওদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতাও শেষ হয়েছে। ওখানের দাড়ি-ওলা ব্রাহ্মের দল এগিয়ে আসছেন ধ্বজা পতাকা হাতে নিয়ে বিডন বাগানের দিকে। সেখানে নাকি কেশব সেনের নববিধানকে উপলক্ষ্য করে কি একটা ব্রাহ্ম সভা হবে।

চক্কত্তিমশাই মৃদু হেসে শম্ভুশীলকে বললেন—"দেখছ শম্ভু, চিৎপুরের বাজার বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে।

শম্ভুশীল বললেন—"হবে না-ই বা কেন দাদা! কলকাতার বনেদী স্থান বলতে ত এই চিৎপুর। ঐ যে ঈশ্বর গুপ্ত লিখছেন "আজব শহর কলকাতা, এখানে ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, বলিহারী একতা!—এটা খুবই ঠিক।

এই সময়ে একজন মাঝারি বয়সের লোক বটতলার পাশ দিয়ে পূর্ব মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। লোকটিকে দেখলে বেশ বোঝা যায় তিনি একটু অসাধারণ গোছের মানুষ। চক্কত্তি তাঁকে দেখতে পেয়ে খুবই সম্ভ্রমের সুরে বললেন—"এদিকে কোথা যাচ্ছেন ভট্টমশাই?"

ভট্টমশাই মৃদু হেসে বললেন—দেবেন ঠাকুরের বাড়ীতে গান শিখিয়ে এখন যাচ্ছি একবার নবকেষ্ট দেবের বাড়ী। সেখানে একটা ছোটখাট গানের আসর হচ্ছে।

—"তা বেশ বেশ, এখন এখানে একটু পায়ের ধুলো পড়বে। একটু বসবেন?

ভট্টমশাই বললেন—"আজ আর বসব না চক্কত্তি—ওদিকের আসর বসবার সময় হয়ে এল।"

ভট্টমশাই চলে যেতেই শম্ভুশীল জিজ্ঞাসা করলেন—ইনিই যদুভট্ট না-কি?

চক্কত্তিমশাই মৃদু হেসে বললেন—"এত বড় গুণী, আর কত সাদাসিদে চালচলন দেখেছ শম্ভু। বাংলাদেশে এমন সঙ্গীতজ্ঞ আর নাই হে!

শম্ভুশীল বললেন—"আজকের দিনটা ত একরকম কাটল—কাল আবার এ অঞ্চলে বিলক্ষণ হৈ-চৈ পড়ে যাবে।"

চক্কত্তিমশাই বললেন—"বুঝেছি শম্ভু, তুমি ত দু' তরফের মাতৃশ্রাদ্ধের কথা বলছ?"

শম্ভুশীল বললেন—"ব্যাপারটা একবার বোঝ—কত বড় বড় লোকের ভিড় হবে—কত দানখয়রাৎ হবে—

আবার শুনছি নাকি গরীব লোকদের কম্বল বিতরণ হবে।

চক্কত্তি বললেন—"তা আর হবে না? লোক দুটি কেমন? একদিকে রামদুলাল সরকারের মাতৃশ্রাদ্ধ—আর একদিকে তারক প্রামাণিকের মাতৃশ্রাদ্ধ। বৃষোৎসর্গ দানসাগর অধ্যাপক বিদায় আর হাজার হাজার বাসন-কোশন ও কম্বল বিতরণ ছাড়াও দীয়তাং ভুজ্যতাং খুব জবর হে!

শম্ভুশীল চক্কত্তিমশাইয়ের কথায় খুব এক চোট হেসে নিলেন। তারপর বললেন—"দেখ, চক্কত্তিমশাই—কাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাখানা পড়লাম—তাতে খবর পেলাম আনন্দকুটীরে আনন্দমেলা বসবে সামনের সপ্তাহে। সেখানে একটা খোপ ভাড়া করে বই সাজাবে না কি?

চক্কত্তিমশাই বললেন—"কথাটা মন্দ বল নি শম্ভু। সেবারের পান্তির মাঠের মেলায় মন্দ বিক্রী হয় নি বই। কাল একবার খবর নাও দিকিন্।

শম্ভুশীল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

এদিকে রাত্রি বেড়ে যাচ্ছিল। দোকানপাট বন্ধ করে চক্কত্তিমশাই আর শম্ভুশীল নিজের নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। বটবৃক্ষ নেই, তবু আমি বটতলা। আমার চারপাশে তখনকার দিনের চিৎপুরের কথা এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। আমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে উপেক্ষিত অনাদৃত লেখক শ্রেণী, তাঁদের কথাও বিস্মৃতির গর্ভ থেকে চকিতচমকে মনে পড়ে। যারা নাম চেয়েছিল তারা নাম পায় নি, যারা নাম চায় নি মহাকাল তাদের নাম জাগিয়ে রেখেছে যুগ হতে যুগান্তরে। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে কেউ কেউ চিরকালের জন্তে সরে গেছে, হয়ত তাদের আর সন্ধানই পাওয়া যাবে না। কিন্তু তারাও যে চেয়েছিল বাংলা সাহিত্যের সেবা করতে, সে কথা কি ভুলে যাব? আমার এই পথের ধুলায় যাদের এই পদচিহ্ন পড়েছিল একদিন, তারাই বয়ে এনেছিল বঙ্গভারতীর আরতিপ্রদীপ। তাদের রুচির কথা ভেবে এখনকার পাঠকেরা হয়ত নাসিকাকুঞ্চন করবেন, কিন্তু সে যুগের অর্দ্ধশিক্ষিত, প্রায়-অশিক্ষিত জনসাধারণের মুখ চেয়েই ঐ সব কুরুচিপূর্ণ লেখা ছাপাতে হয়েছিল। তবে সেটা ছিল মুক্ত, আবরণহীন কুরুচি। কিন্তু এ যুগের অতি-আধুনিক লেখকদের মধ্যে কি তার চেয়েও বেশি কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল লেখা ভাষার কুয়াসায় ফুটে ওঠে না? আগে যেটা ছিল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, এখনকার দুঃসাহসী লেখকেরা সেই অশ্লীলতাকে ভাষার কেরামতিতে প্রস্ফুট করে সমাজ-দ্রোহীর কাজ করছেন না? তবু আমি বটতলা—বাংলা সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হয়েও চির-উপেক্ষিত ভাগ্য-বিড়ম্বিত বটতলা। আমার সবচেয়ে দুঃখ—আমারই অনুগ্রহ-পুষ্ট বিশ্বপণ্ডিতের দল আমারই উদ্দেশে ঘৃণার দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। বাংলা সাহিত্যের গৌরবভিত্তি যে এই বটতলার মাটিতে সে কথা বিশ্বপণ্ডিতের দল অস্বীকার করতে চাইলেও বাংলা সাহিত্যের সত্য ইতিহাস কখনও বিস্মৃত হবে না।

ক্রমশঃ

—•••—

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১) বিদায় গাথা

কলকাতার আসর থেকে ধ্রুপদ গান এবং এক মজার ধ্রুপদীর বিদায় নেবার কাহিনী। আজ থেকে ৩২।৩৪ বছর আগেকার কথা। দু'টি ব্যাপার প্রায় একই সঙ্গে ঘটেছিল, সামান্য আগে পরে। আর তাদের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

কল্কাতার সঙ্গীতচর্চায় তখন একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা লক্ষ্য করবার মতন দেখা যাচ্ছিল—ধ্রুপদ গানের আসর আর জনপ্রিয় থাকছে না। ধ্রুপদের আসর শুধু জমছে না, তাই নয়। ধ্রুপদ আর শ্রোতাদের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারছে না, আকর্ষণ করা দূরের কথা। ধ্রুপদ আর লোকের ভাল লাগছে না। দেশের শ্রেষ্ঠ গায়করা গাইলেও, না। যে ধ্রুপদীর উদাত্ত মধুর কণ্ঠের গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসরে চলেছে আর সকলে একাগ্রচিত্তে শুনেছে মন্ত্রমুগ্ধের মতন, তাঁর গানও লোকে আর এখন পছন্দ করছে না, যদিও তাঁর সঙ্গীতের মান এতটুকুও নেমে যায় নি। আর তিনি অভিমানে সঙ্গীত-জগৎ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দূরে, নিভৃত লোকে। অগণিত শ্রোতার পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল আসর থেকে পল্লীগ্রামের অবসর জীবনে। তাঁর এককালের অসংখ্য গুণগ্রাহীদের তাঁর আসরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে এখন আর কোন আগ্রহ নেই!

একটার পর একটা ধ্রুপদের আসর বসছে আর ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—কখনও শ্রোতাদের অভাবে, কখনও বা শ্রোতাদের সহানুভূতির অভাবে। অথচ ধ্রুপদীদের মধ্যে তখনও এমন কয়েকজন ছিলেন, শ্রেষ্ঠ গায়কদের মধ্যে যাঁরা গণ্য হবার যোগ্য। রাগবিস্তার, যথাযথ উপস্থাপনায় ও কণ্ঠ-সম্পদে। তবু কল্কাতার সঙ্গীতাকাশ থেকে ধ্রুপদের ভাগ্য রবি অস্তাচলে নেমে যাচ্ছিল। আর ধ্রুপদীরা হারিয়ে যাচ্ছিলেন অপরিচয়ের অন্ধকারে।

বলতে গেলে, কলকাতা থেকে বিদায় নেওয়া মানে আমাদের সঙ্গীত-ক্ষেত্রের এক রকম শ্রেষ্ঠ মঞ্চ (platform) থেকেই বিদায় নেওয়া। কারণ (ক্যাল্কেশিয়ান অপবাদ পাবার আশঙ্কা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে) আধুনিক কালে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে বাংলার সংস্কৃতি-চর্চার অন্যান্য অঙ্গের মতন সঙ্গীতেরও প্রাণকেন্দ্র হল কল্কাতা। যে প্রক্রিয়া সমগ্র দেশে দেখা দেবে তার পূর্বাভাস অনেক সময় কলকাতাতেই দৃশ্য হয়। আর কলকাতায় যা ঘটে, অচিরকালে তা বিস্তৃত হয় দেশের অন্যান্য অংশে। সাংস্কৃতিক জগতের অনেক ব্যাপারের মতন ধ্রুপদের বেলাও এই রকম দেখা গেল।

কিছু বছর আগে থেকেই হয়ত এই প্রক্রিয়া সঙ্গীত-ক্ষেত্রের অন্তঃস্থলে চলেছিল। কিন্তু তা প্রকট হয়ে উঠ্ল এই সময়ে ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে পর পর কয়েকটি আসরে তখন লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল যে, ধ্রুপদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখন কলকাতা থেকে বিদায় নেবে, ক্রমে অন্যান্য জায়গার আসর থেকেও। কিংবা হয়ত অন্যান্য আসর থেকে বিদায় নিয়েছে, এখন কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে তার মৃত্যু ঘোষিত হবে। গানের আসরে ধ্রুপদের দিন ফুরিয়েছে।

ধ্রুপদ গান যে তারপর থেকে কল্কাতায় একেবারে লোপ পেয়ে যায় তা নয়। প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে তখনও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী কলকাতার আসরে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান করতেন বটে। কিন্তু তা হ'ত খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত ভাবে। কখনও হয়ত অন্যান্য রীতির গানের আগে মুখপাত্র হিসেবে হ'ত। কখনও নিতান্ত ঘরোয়া আসর বস্‌ত কোন অনুরাগী বা শিষ্যের বাড়িতে। সাধারণের জন্যে কোন বিরাট আসরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ধ্রুপদ গান অর্থাৎ শুধু ধ্রুপদের জন্যে প্রকাশ্য ও প্রকাণ্ড আসর আর বিশেষ দেখা যেত না। সঙ্গীত-জগতে

ধ্রুপদের যে প্রাধান্য ও মর্যাদার আসন এই সময়ের কয়েক বছর আগে পর্যন্তও ছিল, তা রীতিমত টলে যায়। আর তা ফুটে ওঠে এ সময়কার কয়েকটি আসরের ঘটনায়।

আসরে সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে ধ্রুপদ গানে যেমন অনীহা প্রকাশ পেতে থাকে, তেমনি অন্যান্য কয়েকটি কারণও যুক্ত হয়ে যায় এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে। তা হ'ল, নেতৃস্থানীয় কিংবা জনপ্রিয় বেশ কয়েকজন ধ্রুপদগুণীর ইহজগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ, ধ্রুপদের সম্মেলন আর আসরের সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি। যে সময়টির উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছু বছর আগে থেকে এবং কিছু পরে পর্যন্ত এই কার্যকারণ সূত্রটি লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি নতুন ধারা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করতে যেমন সময় লাগে কিছু লুপ্ত হতে গেলেও তেমনি। একটি দেশের একটি ঘটনায় হঠাৎ কিছু ঘটে যায় না। দৃশ্য বা অদৃশ্য হয়ে নানা উপলক্ষ্য ও ঘটনা কার্য করতে থাকে একটি প্রক্রিয়ার মূলে। তারপর ফল যখন ঘটে, তখন সকলে সচকিত হয়ে জানতে পারে। ধ্রুপদের এই অবলুপ্তির ব্যাপারটিও অনেকেরই অলক্ষ্যে চলেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে।

সকলের চোখে পড়ে অবশ্য ওই সময়টিতে। ক'জন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীর জীবনাবসানের কথা যে বলা হয়েছে, তা ওই সময়ের ১২।১৪ বছর আগে থেকে ঘটতে থাকে। রাধিকাপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং অতি মাধুর্যময় কণ্ঠ-সম্পদের অধিকারী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও, আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, অমৃতকণ্ঠ আশুতোষ রায়, স্বনামধন্য লছমীপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি দশ বছরের মধ্যে (১৯১৯-২৯) বিদায় নিলেন এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করে।

প্রায় এই সময়েই বন্ধ হয়ে যায় বিখ্যাত বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন—'শঙ্কর উৎসব।' পাখোয়াজ গুণী দীননাথ হাজরা, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা উদ্‌যোগ করতেন বলে 'শঙ্কর উৎসবের' কয়েক বছরের আসরগুলিতে ধ্রুপদের মুখ্য স্থান থাকত। এই উৎসব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলার ধ্রুপদীদের একটি বড় আসর উঠে যায় কলকাতা থেকে।

তারপর লালচাঁদ উৎসবের নামও করা যায় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের তিন পুত্র কিষণচাঁদ, বিষণচাঁ ও রাইচাঁদ তাঁদের পিতার স্মৃতিরক্ষার জন্যে এই নামে ে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করতেন, তার তিন দিনে অধিবেশনের মধ্যে প্রথমটি নির্দিষ্ট থাকত ধ্রুপদের জন্যে বাকি দু'দিন হ'ত খেয়াল, ঠুংরি ইত্যাদি। লালচাঁ উৎসব আসলে ছিল উচ্চমানের নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের তুল্য এবং কলকাতার পরবর্তীকালে পেশাদার নিখিল ভারত সম্মেলনগুলির অপেশাদার পথ-প্রদর্শক। এই উৎসবের ধ্রুপদের আসরে বাংলা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীরা গান শুনিয়ে গেছেন। লালচাঁদ উৎসব বন্ধ হয়ে যায় ঠিক ওই সময়টিতে, যখন একটির পর একটি সাধারণ আসরে শোনা যেতে থাকে ধ্রুপদ ও ধ্রুপদীদের পূরবীর মূর্ছনা।

তার অব্যবহিত পরের কথাও একটু বলা যায়। পরের কয়েক বছরের মধ্যেই বিদায় নেন অন্ধ-গুণী নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, মধুকণ্ঠ ধ্রুপদী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদাচার্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এক অমৃতকণ্ঠ ধ্রুপদগায়ক ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কম্বু অথচ ললিত-কণ্ঠ ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহলোকের আসর থেকে। আর বিদায় নেন মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য।

ধ্রুপদীদের অবর্তমানে যে ক্ষতি হ'ল তাও পূর্ণ হবার নয়। আবার সেই সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের মৃত্যুতে সঙ্গীতের মহা অভাব শুধু নয়, সুদীর্ঘ ৩০ বছরের অধিককালের বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনেরও মৃত্যু ঘটল। তাঁর গুরু মুরারিমোহন গুপ্তের স্মৃতিতে দুর্লভচন্দ্র কয়েকদিন ব্যাপী যে মুরারি সম্মেলনের আয়োজন প্রতি বছর করতেন তার মধ্যে বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই হ'ত ধ্রুপদ।

বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীরা ত তাতে যোগ দিতেনই, বাংলার বাইরের লোকও কোন কোন ধ্রুপদী মাঝে মাঝে সেসব আসরে অংশ নিয়েছেন। মুরারি সম্মেলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শঙ্কর উৎসব বা লালচাঁদ উৎসবের চেয়ে ধ্রুপদের বিষয়ে ক্ষতি হ'ল বেশি। কারণ এতকাল ধরে অনুষ্ঠানের ফলে এই সম্মেলনের কল্যাণে কলকাতার ধ্রুপদের আসরের একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর

কল্‌কাতার শিবনারায়ণ দাস লেনে দুর্লভচন্দ্রের বাড়ির কাছেই দুটি রাস্তার মোড়ে বিরাট মণ্ডপ তৈরী করে বসত সম্মেলনের আসর। সারারাত ধরে গান বাজনা চল্‌ত। উচ্চশ্রেণীর গান শুনত সাধারণ শ্রেণীর শ্রোতারা।

সে মঞ্চ যখন ভেঙে গেল, ধ্রুপদচর্চার যে ক্ষতি হ'ল তা বেশি করে বল্‌বার নেই।

এমনি সব ঘটনা পরম্পরা একটি বিস্তৃত পটভূমি রচনা করেছিল প্রায় দু'যুগ ধরে। আর সেই সঘন পশ্চাৎপটে একটি বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়ে চলেছিল ধ্রুপদ বিদায়।

তার কেন্দ্রীয় দৃশ্যাবলী যা নাটকটিকে অনিবার্য ট্রাজেডির দিকে চালনা করছিল—দেখা যায় ১৯৩২, ৩৩, ৩৪ সালের কয়েকটি আসরে।

তাদেরই কিছু বিবরণ এবার দেওয়া যাক।

প্রথমটি ছাত্রদের সভা। কোন কলেজের বার্ষিক মিলন কিংবা ওই রকম কোন উপলক্ষ্যে ছাত্ররা তার আয়োজন করেছিল। ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়। মধ্য কলকাতার কোন সভা-গৃহ।

তরুণদের সেই আনন্দ-সম্মিলনীতে প্রধান অনুষ্ঠান ছিল সঙ্গীত। আর সেজন্যে তখনকার খ্যাতনামা গুণী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। তিনি ধ্রুপদী, সুতরাং ধ্রুপদ গাইবেন জেনেই নিয়ে আনা হয় তাঁকে। উদ্‌যোক্তা আর শ্রোতা সকলের তা জানা ছিল।

অনেকদিন ধরেই কল্‌কাতায় এ রকম রেওয়াজ চলে আসে। ভাল গানের আসর হ'লে বেশির ভাগ তা হয়ে থাকে ধ্রুপদেরই। সাধারণ শ্রোতাদের সঙ্গীতের তত্ত্বকথা জানা না থাকলেও ধ্রুপদ ভাল লাগবে, ধ্রুপদ গানে রাগের যথার্থ রূপায়ণে মুগ্ধ হ'তে, খাঁটি স্বরের প্রভাবে মনে সাড়া জাগতে কোন বাধা ছিল না। আর সেসব যুগে বাংলাদেশ বরাবরই শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে সুকণ্ঠ ধ্রুপদী। মধুরকণ্ঠ ধ্রুপদীর অভাব বাংলায় কোনদিনই হয় নি। যা' রঞ্জন করে তাই রাগ আর রঞ্জনী শক্তির অধিকারী ধ্রুপদ গুণীরা যুগের পরে যুগ ধরে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে এসেছেন ধ্রুপদ অঙ্গে রাগ পরিবেশন করে।

বিশেষ ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন ধ্রুপদী। এমন উদাত্ত অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠ বেশি ধ্রুপদগুণীর ছিল না। রাগবিদ্যাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন দীর্ঘকালের সাধনায় আর প্রতিভাগুণে। ওজস্বীকণ্ঠের অধিকারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গীতকণ্ঠ বেশি স্ফূর্তি লাভ করত উত্তরাঙ্গ-প্রধান গানে, অর্থাৎ যে সব রাগে তারা গ্রামে বা চড়ায় বেশি কায হ'ত। যেমন আড়ানা, বসন্ত, সুরট, হাম্বির, হিন্দোল, বাগেশ্রী, দেশ ইত্যাদি। তাঁর কণ্ঠে এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে অনেক শ্রোতারা গানের বিষয়ে তেমন না বুঝলেও এসে যেত না, তাঁর ধ্রুপদে তৃপ্তিলাভ ঘটতই। গানকে বা রাগকে লঘু না করেও জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন তিনি।

সুতরাং সে সভার উদ্‌যোগী ছাত্ররা ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে আসরে গান গাইতে নিয়ে এসে অস্বাভাবিক বা ভুল কাজ কিছু করে নি। কিন্তু ফল হ'ল অন্য রকম।

দেখা গেল, ছাত্রদের তাঁর গান ভাল লাগছে না। গাওয়া কিছুই খারাপ হয় নি, স্বভাবসিদ্ধ সুকণ্ঠেই তিনি গাইছিলেন। তবু আকর্ষণ করতে পারছিলেন না তরুণ শ্রোতাদের।

প্রথমে তিনি ইমন কল্যাণ গাইলেন। আগে চৌতালে, তারপর ধামারে। সে গান ছাত্রদের ভাল না লাগলেও তারা কোন রকমে ধৈর্য ধরে অর্থাৎ গোলমাল না করে গান দু'খানি শুনল। কিংবা বলা যায় যে, চুপ করে রইল।

কিন্তু তারপর যখন তিনি হাম্বির আরম্ভ করলেন, তখন আর ধৈর্য রাখতে পারলে না তারা। প্রথমে উস্‌খুস্ করতে লাগল নিজের মধ্যে। তারপর হাসাহাসি আরম্ভ করলে। গানে বিশ্রী বিঘ্ন।

শ্রোতাদের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন ভূতনাথবাবু গান গাইতে গাইতেই। তারপর অবস্থার পরিবর্তন হ'ল না দেখে ক্ষুব্ধ চিত্তে নিজেই গান বন্ধ করে দিলেন।

উদ্‌যোক্তা বা শ্রোতা কারুর পক্ষ থেকেই আর তাঁকে সে আসরে গাইতে অনুরোধ করা হ'ল না।

দ্বিতীয় আসর। বৌবাজারের হিদারাম ব্যানার্জী লেনের একটি বাড়ি। ১৯৩৩ সাল।

এই আসরের উদ্‌যোগ করেছিলেন পাখোয়াজী অরুণপ্রকাশ অধিকারী। সঙ্গীত-জগতে তিনি কেবলবাবু নামে সুপরিচিত। তাঁর পাখোয়াজের গুরু দীননাথ হাজরা। হাজরা মশায়ের নামে বার্ষিক স্মৃতিসভা কেবলবাবু করতেন সঙ্গীত-অনুষ্ঠান দিয়ে। কয়েক বছর যাবৎ তিনি গুরুর স্মৃতিতে আসর করতেন এবং কল্‌কাতার বা বাংলাদেশের প্রায় সব নাম করা ধ্রুপদই সে আসরে কোন-না-কোন বছর গান শুনিয়েছেন।

এবারেও উদ্‌যোগী হয়ে আসরের আয়োজন করেছেন কেবলবাবু। তখনকার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী আমন্ত্রিত হয়ে আসরে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন অমরনাথ ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু), যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। তা ছাড়া, হাওড়ার প্রবোধবাবু, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান শিষ্য পরেশচন্দ্র মিত্র, তাঁর আর এক কৃতী শিষ্য অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। একটি আসরের পক্ষে অতিরিক্ত রকমের আয়োজন বলা যায়।

এতজন গায়ককে নিয়ে বেশ বড় একটি ধ্রুপদ আসরের পরিকল্পনা কেবলবাবু করেছিলেন। আসরের স্থানও অতি প্রশস্ত।

কিন্তু আশ্চর্য, গান আরম্ভ করে দেখা গেল—শ্রোতা বিশেষ কেউ এত বড় আসরে নেই। সে বাড়ির ছেলেরা মাঝে মাঝে আসরে আসা-যাওয়া করছে। খানিক হয়ত দাঁড়াচ্ছে। কিছু বাইরের কোন শ্রোতা উপস্থিত হয় নি, নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন শ্রোতাদের আবির্ভাব ঘটল না, তখন অগত্যা গায়করাই শ্রোতা হলেন। এবং গান আরম্ভ করে সকলে গেয়ে গেলেন একে একে। স্মৃতিসভা বলে সকলেই গান গাইলেন। তা ছাড়া বোধহয় তাঁদের একপ্রকার নম্রতার জন্যেও বটে। এ যুগে হলে আসরে গানের কি হ'ত বলা যায় না।

তৃতীয় আসর। কল্‌কাতার সঙ্গীত ক্ষেত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হাওড়ার শিবপুর সঙ্গীতকেন্দ্র। ১৩৩৩ সাল। কলকাতার সুপরিচিত ধ্রুপদী এবং বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা মোহিনীমোহন মিশ্র এই আসরের উদ্‌যোক্তা।

মিশ্র মশায় সেসময় শিবপুরে থাকতেন, সেজন্যে সেখানে এই আসরের আয়োজন করেন। বসন্ত ঋতুর উপলক্ষ্যে বসন্ত-উৎসবের ব্যবস্থা। ধ্রুপদের আসর। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি সব অঙ্গের এবং বহু যন্ত্রে সঙ্গীত-চর্চা করলেও মোহিনীমোহন আসলে ছিলেন ধ্রুপদী। তাই ধ্রুপদীদেরই সে আসরে গানের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর কয়েকজন পাখোয়াজীকে।

গায়ক যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। প্রত্যেকেই সুকণ্ঠের জন্যে জনপ্রিয়, বিশেষ প্রথম দুজন অসাধারণ এ বিষয়ে। মোহিনীমোহনের ক'জন শিষ্য গাইবার জন্যে আসরে আসেন। পাখোয়াজীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেবলবাবু।

সন্ধ্যার খানিক পরে আসর বসল। গান আরম্ভ করবার আগে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধ্রুপদের আসর, তাই ধ্রুপদ গানের সম্বন্ধেই বক্তৃতা। বক্তা এ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌তে আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু প্রথম থেকেই শ্রোতাদের আপত্তির জন্যে বক্তৃতা বেশি দূর এগোতে পারলে না। বক্তৃতার বিষয়টাই ভাল লাগল না শ্রোতাদের। বক্তা গোড়া থেকেই বাধা পেলেও দম্‌লেন না। তিনি বলে যেতে লাগলেন। কিন্তু মাত্র ৩,৪ মিনিটের বেশি চল্‌ল না তাঁর ভাষণ। শ্রোতারা চীৎকার শব্দে তাঁকে একেবারে বসিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হ'ল।

তাদের মতিগতি দেখে গান আরম্ভ করতে তৎপর হলেন মোহিনীমোহন। এখানে বলে রাখা যায় যে, সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে বরাবর শরীর-চর্চাতেও মিশ্র মশায় পারদর্শী ছিলেন। নিয়মিত ব্যায়াম করতেন এবং কুস্তি ইত্যাদি মল্লযুদ্ধে অনেক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতেন, বাংলার বাইরেও। সুদৃঢ় শরীর ছিল তাঁর। আর মনেও ছিলেন তেমনি অকুতোভয়। সঙ্গীত-জগতের অনেকেই তাঁর পালোয়ানীর কথা জানতেন।

যা' হোক, এবার গান আরম্ভ হ'ল আসরে। ভাল ভাল গায়ক। গানও ভালই হ'তে লাগল। কিন্তু শ্রোতাদের তা ভাল মনে হ'ল না আদৌ। ললিতবাবু, জ্ঞানবাবু, অনুকূলবাবু একে একে গেয়ে গেলেন। বেশির ভাগ সঙ্গত করলেন কেবলবাবু।

শ্রোতারা কিছু উঠে গেল। কিছু বসে রইল বটে, তবে ভাল লাগার জন্তে নয়। গান যে তারা পছন্দ করছে না, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। সুখ্যাতি করা দূরের কথা, মাঝে মাঝেই বিরক্তি প্রকাশ করেছে, এমন কি বাধাও দিয়েছে। তবে মোহিনীমোহনের ভয়ে কিংবা অন্ত যে কারণেই হোক গান বন্ধ করিয়ে দিতে বা আসর একেবারে পণ্ড করতে পারে নি বটে। কিন্তু বাধা দিয়েছিল যথাসাধ্য এবং আসরও জমে নি।

মোহিনীমোহন অবশ্ব আসরকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রায় বারোটা পর্যন্ত। কেবলবাবু প্রায় দশটা পর্যন্ত বাজান। তারপর পাখোয়াজ নিয়ে বসেন মোহিনীমোহন বাবু। নেহাৎ তাঁর দৃঢ়তার জন্তে আসর শেষ পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু সঙ্গীতের দিক থেকে আসর ব্যর্থই হয়েছিল বল্‌তে হবে, কারণ শ্রোতারা সন্তুষ্ট হয় নি। গায়কের সঙ্গে শ্রোতার আত্মিক যোগাযোগ সার্থক হতে পারে নি সেদিনকার গান।

চতুর্থ আসর। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ী। ১৯৩৪ সাল।

এ আসরেরও উদ্‌যোগী ছিলেন পাখোয়াজী অরুণপ্রকাশ অধিকারী অর্থাৎ কেবলবাবু। উপলক্ষ্যও তাঁর গুরু দীনু হাজরা মহাশয়ের স্মৃতিবার্ষিকী।

প্রধানত ধ্রুপদের আসর। ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখরা ছিলেন। এবং টপ্পা-শিল্পী বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো কয়েকজন গায়ক। পাখোয়াজী এবং তবলা বাদক। সকলেই গুণী।

কিন্তু আসর বসতে দেখা গেল, শ্রোতা উপস্থিত হয়েছেন অতি সামান্ত। ৪৫ জন মাত্র। গায়ক ও সঙ্গতকার তার চেয়ে বেশি।

সেই নামমাত্র শ্রোতাদের নিয়ে আসর আরম্ভ হ'ল। প্রথমে গাইতে বসলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। তিনি ধরলেন দরবাড়ী কানাড়া। এটি তাঁর বিশেষ প্রিয় রাগ এবং গম্ভীর, মনোমুগ্ধকর দরবারীর রাগালাপ ও গান গেয়ে তিনি অনেক আসর মাৎ করেছেন।

একাধারে বীর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত তাঁর কণ্ঠস্বরে দরবারী কানাড়ার রূপায়ণ অতি হৃদয়গ্রাহী হ'ত। দু'খানি গ্রামোফোন রেকর্ডে তিন মিনিটের বাংলা গানেও তিনি তার স্মরণীয় নিদর্শন রেখে গেছেন—'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়' এবং 'বাজে মৃদঙ্গ বীণা।'

এ আসরেও তিনি চমৎকার গাইতে লাগলেন দরবারী কানাড়া। তালে গঠিত গান আরম্ভ করবার আগে রীতিমত পদ্ধতিগত আলাপচার শোনাতে লাগলেন রাগের উদ্‌বোধন করে। তাঁর অনুপম কণ্ঠে আলাপ অতি চিত্তাকর্ষক শোনাচ্ছিল।

কিন্তু তাঁর আলাপচারী শেষ হবার আগেই অধৈর্য হয়ে উঠ্‌ল সেই মুষ্টিমেয় শ্রোতারাও।

একজনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আর কতক্ষণ আলাপ চলবে?

জ্ঞানবাবু বিরক্ত হয়ে গান থামালেন। ধ্রুপদ গানের আগে আলাপ করবার রীতি ও বিধি নিয়ে তিনিও রাগতভাবে বল্‌লেন দু'চার কথা।

কথায় কথায় তর্ক বেধে গেল, বচসা আরম্ভ হ'ল। তর্কাতর্কি থামিয়ে দিলেন অন্তান্ত গায়করা। কিন্তু আসর ভেঙ্গে গেল। গান আর না গেয়ে আসর থেকে চলে গেলেন জ্ঞানবাবু।

পঞ্চম আসর। উত্তর কলকাতার আহেরীটোলার একটি বাড়ি। এটিও ১৯৩৪ সালের ঘটনা।

স্মৃতিসভা কিংবা অন্ত কোন উপলক্ষ্যে এদিন গানের আয়োজন হয় নি। ধ্রুপদের হ'লেও এটি ছিল ঘরোয়া আসর। ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল গায়ক হিসেবে আসেন। দুর্লভচন্দ্রের শিষ্য পিয়ারীমোহন রায় হলেন সঙ্গতকার।

অল্প কয়েকজন মাত্র শ্রোতা।

ভূতনাথবাবু গৃহস্বামীর অনুরোধে গান আরম্ভ করলেন। সামান্ত আলাপচারির পর চৌতালে কামোদের একটি ভাল বন্দেশী গান গাইতে লাগলেন তিনি।

শ্রোতার সংখ্যা বেশি না হলেও ভূতনাথবাবুর

উৎসাহের অভাব ছিল না। গান তাঁর প্রাণের আরাম ছিল, যে কোন আসরেই তিনি সঙ্গীতের উচ্ছমান বজায় রেখে গেয়ে যেতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যতক্ষণ শ্রোতারা শুনতে চায়। তাঁর তেজস্বী মধুর কণ্ঠে গান শুনতে শ্রোতাদেরও আগ্রহের অভাব দেখা যেত না, আগেকার কালে।

এ আসরেও সুমিষ্ট রাগ কামোদের গান তিনি যে ভাবে দরদ দিয়ে গাইছিলেন তা সকলেরই ভাল লাগবার কথা। কিন্তু আসরের শ্রোতাদের বেলায় তা দেখা গেল না। তারা এদিক-ওদিক চাইতে লাগল, হাই তুলতে লাগল কেউ কেউ। গান শোনবার দিকে কারুর মন নেই স্পষ্টই বোঝা গেল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় উচ্চাঙ্গের শিল্পী হলেও আসরের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন প্রকৃতির বা আত্মভোলা নন। রীতিমত আসর-সচেতন গায়ক তিনি। যত আন্তরিকতার সঙ্গেই গান করুন, শ্রোতাদের দিকে তাঁর নজর থাকে। গান আরম্ভ করবার কিছুক্ষণের জন্যেই শ্রোতাদের অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করলেন তিনি। এবং গান সংক্ষেপ করে আনলেন।

তবু দেখলেন, কামোদ শেষ হবার আগেই আসরে তাস এসে গেছে। গান তখনও চলছে, কিন্তু তা শোনবার লক্ষণ না দেখিয়ে প্রকাশ্যেই তাস খেলতে আরম্ভ করলে শ্রোতারা।

মর্মান্তিক অভিমানে ভূতনাথবাবু গানখানি শেষ করলেন, কিন্তু তাঁর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'ল না।

কামোদের পরই তিনি আর একখানি গান ধরলেন। এটি তাঁর তাৎক্ষণিক রচনা। মনে মনে রচনা করেই গানটি গাইতে লাগলেন।

সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর অন্য একটি কৃতিত্ব এই ছিল যে, তিনি উৎকৃষ্ট গান রচনা করতে পারতেন বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষাতেই। এবং অনেক আসরে স্বরচিত ব্রজভাষায় ধ্রুপদ শুনিয়ে শ্রোতাদের তিনি পরিতৃপ্ত করেন।

এ আসরে যে গানটি মুখে মুখেই রচনা ক'রে তিনি গাইতে লাগলেন, তা কোন সাধারণ গান অবশ্য নয়। গানখানি বিদ্রূপাত্মক। তাস খেলায় রত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে তিনি শোনাতে লাগলেন—

কোই নেহি সমঝ্ তা
হাম্ কেয়া গাওয়ত,
খালি তাস খেলে।......ইত্যাদি

কাব্যমূল্য বিশেষ না থাকলেও গানখানি সাঙ্গীতিক মূল্যে দারিদ্র্য ছিল না। কারণ চিত্তাকর্ষক মিশ্র খাম্বাজে গঠিত করে তিনি গেয়ে চললেন তেওড়া তালে। রীতিমত গমক দিয়ে ধ্রুপদের আসরের উপযুক্ত করে গানটি গাইতে লাগলেন।

শ্রোতাদের ধ্রুপদের প্রতি বিরূপ মনোভাবকে তীব্র তিরস্কার করবার উদ্দেশ্যে তিনি দস্তুরমত ধ্রুপদ পদ্ধতিই ব্যবহার করলেন, বলা যায়। এ গানখানিও শোনার মতন হয়েছিল, যদিও শ্রোতারা প্রথমটা বুঝতে পারে নি যে এই ব্রজভাষার গানে তাদেরই আক্রমণ করা হচ্ছে। ভূতনাথবাবু তাদের মৌখিক গদ্যে তিরস্কার না করে মারাত্মক বিদ্রূপ করলেন সাঙ্গীতিক প্রথায়—একথা সবাই বুঝতে পারলে গানখানি শেষ হবার পর।

সে রাত্রে সেখানে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আহারেরও নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু গান শেষ করে তানপুরা নামিয়ে রেখেই চলে গেলেন অভিমানী মন নিয়ে। শুধু আসর থেকে নয়, সে বাড়ি থেকেও।

তারপর আর কারুর গানও সে আসরে হয় নি।

এমনিভাবে ধ্রুপদের বিদায়-গাথা ধ্বনিত হ'তে লাগল পরের পর আসর থেকে। এ বিষয়ে আর বেশি দৃষ্টান্তের বোধহয় প্রয়োজন নেই।

অথচ তার কিছু বছর আগে পর্যন্তও ধ্রুপদ গানের কত অগণিত ও শ্রদ্ধাপরায়ণ অনুরাগী শ্রোতা ছিল, আর কি উদ্দীপনায় ভরা সব আসর হ'ত এই কলকাতাতেই। কি ঐশ্বর্যময় ধ্রুপদ-চর্চা ছিল। আর তেমনি প্রাণবন্ত সে সব আসর।

আগেকার আমলের ধ্রুপদের সাফল্য আর বড় বড় আসরের অতি সজীব আবহ সমস্তই নির্ভরশীল ছিল শ্রোতাদের রসবোধ ও সহযোগিতার ওপর। সমমর্মী ও সংবেদনশীল শ্রোতা না হ'লে আসরের সঙ্গীত কি সার্থক হ'তে পারে?

বৃদ্ধ বরজলাল আর 'নবীন যুবা' কাশীনাথের দরবারে গান গাওয়ার হৃদয়স্পর্শী প্রসঙ্গ বর্ণনা করে 'গান ভঙ্গ'

কবিতায় সেকথা অতি প্রাঞ্জলভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুই জনে
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে—
বাতাসে বনসভা শিহরী কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি
জাগে।'

আগেকার শ্রোতাদের appreciation-এর জন্যে ধ্রুপদের আসরের উচ্চ মান সম্ভব হয়েছিল। গায়কের কৃতিত্বের সঙ্গে শ্রোতাদের এই মানসিক সংযোগের কথা ভোলা যায় না।

বিগত যুগের সেসব আসরে কি উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকত সুর। তখনকার প্রায় সব শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সতেজ কণ্ঠে কি চড়া 'স্কেলে' অবলীলায় গান শোনাতেন। সেই ভাবেই তাঁদের গলা সাধা ছিল, সেই ভাবেই থাকত আসরের পর্দা বাঁধা। কারণ ধ্রুপদ গানে কণ্ঠ-সাধনার স্থান ও সম্মান অনেকখানি।

কে কোন্ শার্পে আসরে গাইতেন তা দেখবার জন্যে কয়েকজন গুণীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। এ থেকে বোঝা যাবে, তখনকার ধ্রুপদীদের কি জীবনীশক্তি এবং আসরে কণ্ঠচর্চার মান (standard) ও মর্যাদা কতখানি ছিল।

আশুতোষ রায় গাইতেন এফ্ স্কেলে। মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এফ্-এ গাইতেন। ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশির ভাগ শোনাতেন এফ্-এ, কখনও কখনও ডি শার্পে। তার নীচে কখনও নয়। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গাইতেন ডি শার্পে। শুধু রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর গলা এঁদের তুলনায় একটু ঝিম্ ছিল বলে সাধারণত সি-তে গাইতেন। তাও তাঁর গুরুতর বসন্ত রোগের আক্রমণে কণ্ঠস্বর ঈষৎ সানুনাসিক হয়ে বসে যাবার ফলে হয়ত। তাঁর প্রথম জীবনের গলার স্কেল কি ছিল জানা যায় না।

ব্যতিক্রম হিসেবে গোঁসাইজীর কথা বাদ দিলে, ডি-এর নীচে আসরে ধ্রুপদ গাইবার প্রথা বিশেষ ছিল না। গাইলে বিদ্রূপ ও সমালোচনার পাত্র হতেন গায়করা। বড় গাইয়েরা তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতেন—'মর্দানা গায়ক নয়। অর্থাৎ পুরুষোচিত নয় তাঁর কণ্ঠ।

তাই সে যুগে উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগের আদর ও কদর আসরে বেশি ছিল। আর সেসব রাগই হ'ত গায়কদের ও শ্রোতাদের বেশি প্রিয়।

সে যুগের অবস্থার সঙ্গে এখনকার তুলনা করলে দেখা যায়, গায়কদের বি-তে গাওয়ার রেওয়াজ এবং উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগচর্চার ঘাট্তি। এখন যে কথা হচ্ছিল।

সেকালে ধ্রুপদীরা কণ্ঠ-সাধনার ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন আর তাঁদের জীবনীশক্তি হয়ত বেশি ছিল। তাই আসরে রেওয়াজ দাঁড়িয়ে যায় মর্দানা ঢঙ্-এর গলায় গান। অর্থাৎ হারমোনিয়ামের স্কেল হিসেবে তা যেন ডি-র নীচে না নামে। সি-তে গাইলে সে গায়ক আসরে কণ্ঠকৃতির জন্যে মর্যাদা পেতেন না, তা তাঁর যত নামডাকই থাক।

অন্যে পরে কা কথা, রাধিকাপ্রসাদের তুল্য গুণী এবং আচার্যস্থানীয় গায়ককে গলার জন্যে সমালোচনার ভাগী হতে হয় কোন কোন আসরে, যেখানে কোন বিরুদ্ধ-পক্ষীয় উত্তরাঙ্গ কণ্ঠগায়ক উপস্থিত থাকতেন। এমন একটি আসরের কথা এখানে বলা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, গোঁসাইজী সাধারণত সি-তে গাইতেন। সেজন্যে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যতদিন জীবিত ছিলেন, কলকাতায় গুরুর প্রায় প্রত্যেকটি আসরে হাজির থাকতেন তাঁর সঙ্গে। অতি দরাজ গলা ছিল মহীন্দ্রনাথের, এফ্-এ তিনি গাইতেন। তাই আসরে গলা নিয়ে যদি কোন প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যেত, মহীন্দ্রনাথ মহড়া নিতেন প্রতিপক্ষের সঙ্গে। ভাবটা এইরকম প্রকাশ করা হ'ত, যাঁর শিষ্য এমন উঁচু পর্দায় গান শোনাতে পারেন তাঁর গুরুর পক্ষে গলার আওয়াজের প্রশ্ন অবান্তর। তা' ছাড়া, গোঁসাইজীর সি-তে গাওয়ার জবাবে আহ্বানকারী হয়ত ডি-তে গান শুনিয়ে দিলেন আসরে তাঁর ওপর টেক্কা দেবার জন্যে। তখন মহীন্দ্রনাথ এফ্-এ গেয়ে প্রতিযোগীকে অপ্রস্তুত এবং আসর মাৎ করলেন, এমনও হয়েছে মহীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর

শিষ্যরা প্রায় সকলেই রাধিকাপ্রসাদের শিক্ষাধীনে চলে আসেন। ভূতনাথবাবুও। তখন থেকে রাধিকাপ্রসাদের কোন আসরে দরকার হলে ভূতনাথবাবু মহীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি নিতেন।

যে আসরে রাধিকাপ্রসাদের সি-তে গাওয়া নিয়ে একটি দৃশ্য অভিনীত হয়, সে আসরটি বসেছিল বেলেঘাটার একটি বাড়িতে। সেখানে গাইবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন রাধিকাপ্রসাদ এবং গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছ'জনের গানের গলায় যেমন পার্থক্য দেখা যেত, তেমনি তাঁদের স্বভাবেও। গোঁসাইজী ছিলেন সত্যিই বৈষ্ণব প্রকৃতির। নিরীহ, শান্ত স্বভাবের মানুষ, বিবাদ-বিসংবাদ সাধ্য মতন এড়িয়ে চলতেন। আর বারাণসীর সন্তান গোপালচন্দ্রের চরিত্রে অনেক সময় প্রকাশ পেত শাক্ত-সুলভ একটা আক্রমণাত্মক ভাব। রাধিকাপ্রসাদ ক্ষীণাঙ্গ। গোপালচন্দ্রের ব্যায়াম-বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ শরীর প্রথম জীবনে অনেক হিন্দুস্থানী পালোয়ানকেও মল্লযুদ্ধে ধরাশায়ী করেছে।

রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গীত-কণ্ঠের সমালোচক ছিলেন গোপালচন্দ্র এবং তাঁর সে মনোভাব প্রকাশও করতেন সঙ্গীতজ্ঞ মহলে। গোঁসাইজীর সঙ্গীত-প্রতিভা বা রাগবিদ্যায় অধিকার নিয়ে নয়, তাঁর গলার আওয়াজের জন্যেই বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁকে সুনজরে দেখতেন না।

বেলেঘাটার আসরটিতেও প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর সেই মনোভাব।

আসরে তাঁর গান আগে হ'ল। তিনি যথারীতি ডি-তে গেয়ে রাধিকাপ্রসাদকে চ্যালেঞ্জ করলেন সকলের সামনে। গোঁসাইজী সি-র চেয়ে উঁচু স্কেলে গাইতে পারেন না এমন মন্তব্যও যেন করলেন।

রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে বসেছিলেন ভূতনাথ প্রভৃতি কয়েকজন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্যে ভূতনাথ গাইবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করলেন গোঁসাইজী।

বললেন—না, থাক। আমিই গাইব।

যদিও তিনি সাধারণত সি-তে গাইতেন, তা হলেও এমন প্রকাশ্য আসরে যখন গলা নিয়ে কথা উঠেছে, উত্তর যথাযোগ্য দিতে হবে। এড়িয়ে গেলে চলবে না, শান্তিপ্রিয় হলেও সাঙ্গীতিক ব্যাপারে পরাজয়ের মনোভাব ছিল না তাঁর। তা ছাড়া, সেকালের এইসব ধ্রুপদের আসরে সম্মানের প্রশ্নটা বড় বেশি করে থাকত। কণ্ঠ-সাধনার বড় মর্যাদা ছিল তখন। সুপ্রতিষ্ঠিত গায়করা সে বিষয়ে খাটো হ'তে চাইতেন না।

তাই ডি-তেই গান আরম্ভ করলেন রাধিকাপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এবং আসরের আরো অনেককে বিস্মিত করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সুদক্ষভাবে ডি তে গেয়ে গেলেন। অভ্যাস না থাকলেও চ্যালেঞ্জের জবাব দিলেন ভাল ভাবেই। শ্রোতারাও এই সুস্থ সাঙ্গীতিক প্রতিযোগিতা রীতিমত উপভোগ করলেন।

এমনি ছিল ধ্রুপদের গৌরবের যুগের আসর। আর সে গৌরব ত একদিনে কিংবা মুখের কথায় হয় নি।

সুদীর্ঘ কাল ধরে, অসংখ্য ধ্রুপদ সাধকদের অবদানের ফলে এই মহান্ ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়। শতাব্দী পার হয়ে চলে এসেছিল তাঁদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার ধারা।

ধ্রুপদের দুর্দশা যখন আসরে আসরে প্রকট হয়ে উঠছিল, তার একশ' বছরেরও আগে থেকে কলকাতায় ধ্রুপদের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়ে দেওয়া যাক। কলকাতায় ধ্রুপদ ঐতিহ্য বিষয়ে না হলে সঠিক ধারণা করা যাবে না।

বিষ্ণুপুর তথা বাংলার আদি ধ্রুপদাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্যেরা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ প্রথম প্রচলন করেন। তাঁরা হলেন রামকেশব ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কেশবলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। একথা অনেকেরই জানা কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না, তাঁরা কলকাতায় ধ্রুপদের আসর বসাবার প্রায় দু' যুগ আগে থেকেই এখানে ধ্রুপদ গান শোনা যেত।

১৮২৮ সালে রামমোহন প্রথম যখন ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন সেখানে প্রতি সপ্তাহের অধিবেশনে গান গাইবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীকে। এই দুই ধ্রুপদী ভ্রাতা নদীয়া জেলায়

রানাঘাট অঞ্চলের সন্তান এবং কৃষ্ণনগর রাজ-দরবারের পশ্চিমা গুণীদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ওই বছরে ব্রাহ্মসমাজে নিযুক্ত হবার পর থেকে তাঁরা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং তাঁরাই হলেন কলকাতার প্রথম দুজন প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ-গায়ক। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র সুদীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বিষ্ণুচন্দ্রই তাঁর প্রথম সঙ্গীত-গুরু।

এখানে কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্রের সঙ্গীতজীবন আরম্ভ হবার বছর দশেকের মধ্যে স্বনামধন্য ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আসরে আবির্ভাব। তিনিও নদীয়া জেলার আর এক অঞ্চলের সন্তান এবং ১৫।১৬ বছর বয়সে সেখান থেকে কলকাতায় চলে এসে রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষা করতে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করতে যান। সেখানে দশ-বারো বছর ধ্রুপদ শিখে ফিরে আসেন কলকাতায়। বেশির ভাগ এখানেই থাকতেন, তার পরে এবং তাঁর দুই প্রধান শিষ্য হলেন যদু ভট্ট ও হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদু ভট্টের প্রথম গুরু বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য শিষ্যের ১৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলে যদু দু'বছর পরে কলকাতায় আসেন। কিছুকাল জীবন-সংগ্রামের পরে তিনি গঙ্গানারায়ণের আশ্রয় ও শিক্ষালাভ করে সুপ্রসিদ্ধ হন খাণ্ডারবাণী রীতির ধ্রুপদী রূপে। পরে তিনি নানা দরবারে নিযুক্ত থাকেন। তার মধ্যে কিছুদিন ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজে এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর গায়ক রূপে। গঙ্গানারায়ণ ও তাঁর অন্য কৃতী শিষ্য হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতায় অবস্থানের ফলে এখানে যে ধ্রুপদচর্চার ধারা প্রবর্তিত হয়, পরে তাতে পরে দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে পাওয়া যায়।

কলকাতার আসরে গঙ্গানারায়ণ প্রথম খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ প্রচলন আরম্ভ করবার পর বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ এখানে নিয়ে আসেন রামকেশব ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কেশবলাল চক্রবর্তী প্রভৃতিরা, একথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁদের সামান্য কিছু পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক এবং কাশীর ধ্রুপদাচার্য গোপালপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্য গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর পশ্চিমা রীতির সমৃদ্ধ ধ্রুপদ কলকাতার আসরে শোনা গেল। তাঁর পরে আলী বখ্‌স্ ও মুরাদ আলি খাঁর শিষ্য অঘোরনাথ চক্রবর্তীর ধ্রুপদ শিক্ষা পুরোপুরি এবং ধ্রুপদ সাধনারও অনেকখানি কলকাতার। বিষ্ণুপুরের সন্তান এবং বেতিয়া ঘরাণার উত্তরাধিকারী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। রাধিকাপ্রসাদের আগে-পরে মুরাদ আলী খাঁর উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ পরিবেশন ও তাঁর বিভিন্ন বয়সী ধ্রুপদী শিষ্যদের ধ্রুপদ সাধনা। তাঁদের মধ্যে যদুনাথ রায় ও কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়কে কখনো কখনো কলকাতার আসরে দেখা গেলেও তাঁরা যথাক্রমে ময়ূর-ভঞ্জ ও তমলুকেই বেশির ভাগ ছিলেন। আলীর অন্যান্য শিষ্যদের কলকাতার আসরেই প্রধানত পাওয়া যায়,—যথা, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ঘোষ এবং আশুতোষ রায়।

তারপর তাঁদেরই বয়োকনিষ্ঠ সমসাময়িক হিসাবে অঘোরনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরনাথ ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ রাওয়ের শিষ্য সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) (এবং অমরনাথ ভট্টাচার্য) লছমীপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্যবর্গ এবং রাধিকাপ্রসাদের শিষ্য-ধারার উল্লেখ করলে কলকাতায় ধ্রুপদ চর্চার পরিক্রমা আলোচ্য কালে পৌঁছে যায়।

মোটামুটি এই রূপরেখায় কলকাতায় ধ্রুপদের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। এতদিন ধরে এত শিল্পীর সাধনায় ধ্রুপদ গান তার বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে এখানকার আসরে দেদীপ্যমান ছিল শ্রোতাদের সমমর্মিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ-রীতিকে বাঙালীর সঙ্গীত-মানস আপন ও আত্মস্থ করে নিয়েছিল এমন ভাবে যে, বাঙালীর সঙ্গীত-চর্চার তা অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। পশ্চিমের এই গীতি-পদ্ধতির সঙ্গে বাঙালীর এত অন্তরঙ্গতার জন্যেই বোধ হয় এত ধ্রুপদাঙ্গের গান রচিত হয় বাংলা ভাষাতেও। বাংলার বহু গায়ক, সুরকার ও গীতি-রচয়িতা বহু বাংলা ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করে বাংলার সঙ্গীত-ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যময় করেছেন। অথচ

এই গৌরবময় ইতিহাসের পরিণতিতে এক অচল অবস্থা দেখা গেল আসরে আসরে।

ধ্রুপদের শান্ত, গম্ভীর সৌন্দর্যের যাঁরা উপাসক, এই সঙ্গীতে রাগের ঋজু সজু ও অবিকৃত রূপায়ণে যাঁরা মুগ্ধ, ধ্রুপদীদের পরিশীলিত কণ্ঠকৃতিতে যাঁরা আস্থাবান এবং ভারতীয় সঙ্গীতের এক মহৎ অবদান হিসেবে ধ্রুপদের চর্চা করে কলকাতার আসর সুসমৃদ্ধ হয়েছে বলে যাঁদের ধারণা—তাঁরা এই নূতন পরিস্থিতি দেখে ব্যথিত হলেন। আর যে শিল্পীরা ধ্রুপদের চর্চায় নিজেদের নিয়োগ করেছেন পরিপূর্ণভাবে, তাঁদের বিক্ষুব্ধ বেদনার সীমা রইল না।

এমনি একজন সত্যকার গুণী, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধ্রুপদ যাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠ সাধ ও সাধনা। ধ্রুপদচর্চা বাদ দিয়ে তিনি যেন নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারেন না। বহুদিনের অনুশীলনের ফলে তাঁর জীবনে তা এমন সহজ সাধনও।

এই গানের জন্য এতদিন কলকাতার আসরে কি সম্মান ও প্রতিষ্ঠা তিনি পেয়েছিলেন। আজ তাঁর গান শোনবার জন্যে আসরে শ্রোতা পাওয়া যায় না, একদিন তা শুনতে আসর সরগরম থাকত উৎসুক শ্রোতাদের ভিড়ে। দরাজ অথচ মাধুর্যময় কণ্ঠে প্রাণের স্ফূর্তিতে যেমন অক্লেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেয়ে যেতেন, শ্রোতারাও তেমনি শেষ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে তাঁর গান শুনত। ধৈর্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর, এত আকর্ষণ ছিল তাঁর কণ্ঠের, তাঁর গানের। 'মুরারী সম্মেলন' শঙ্কর উৎসব, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদি বড় বড় আসর থেকে আরম্ভ করে নানা ছোটখাটো আসরেও তাঁর অনুরাগী শ্রোতার অভাব ছিল না। উত্তরাঙ্গের রাগে কৃতিত্ব দেখাতেন বেশি। সেই হিসেবে বসন্ত, হিন্দোল, গৌরি, আড়ানা, বাগেশ্রী, সুরট, বাহার, দেশ ইত্যাদি তাঁর প্রিয় রাগের রূপায়ণে স্মরণীয় ছিলেন।

হিন্দীতে অনেক ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন এবং সেসব গান শুনিয়েছেন অনেক আসরে। স্থানাভাবে এখানে তাঁর রচনাশক্তির নিদর্শন দেওয়া গেল না। 'কাঁহারে গোপাল' বলে উদাত্ত দরদী কণ্ঠে যে গানখানি (সুরাট, চৌতাল) গেয়ে আসরে শ্রোতাদের অশ্রুসজল করতেন, তা' এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল। গানটি তানসেনের রচনা—

> কাঁহা রে গোপাল নন্দলাল,
> যশোদা দুলাল ব্রজবালা প্রাণ।
> রাধারমণ মদনমোহন কংস নাশন,
> মথুরেশ হরে॥
> গোকুল ছোঁড়ি কাঁহা গেঁই,
> কাঁহা নন্দ যশোদা মাঈ কাঁহা,
> গোপী ব্রজবালা কাঁহা প্যারে॥
> কাঁহা বংশী বট কালিন্দী তট,
> কাঁহা নব নব নিহারী ঘট,
> কাঁহা গোবর্ধন বংশী ধুন
> যমুনা উলটি মধুরে বোলে।।
> তানসেন কহত নিঠুর
> কাহে দোড়ি ব্রজপুর
> অব মধুপুর কুব্জা নাগর
> এই সে ধরম তেঁরো।।

তাঁর লেখা ও সুরতালে গঠিত এমনি কত ধ্রুপদ তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে আসরে প্রচলিত ছিল।

অনেক শিষ্য গঠন করেছিলেন তিনি। পরেশ মিত্র, অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই দাস, শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্রের পুত্র, ইনি ললিত মুখোপাধ্যায়েরও শিষ্য ছিলেন) প্রবোধকিশোর মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন মজুমদার, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্র পাড়ুই প্রভৃতি। বহুমুখী মনীষীর আধার ও অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ভূতনাথবাবুর কাছে নাড়া বেঁধে প্রায় দু'বছর ধ্রুপদ শিখেছিলেন।

আরো অনেকে গান শিখতে আসতেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। তাঁর মতন আদর্শবাদী, যত্ন ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক আমাদের সঙ্গীতক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় নি। যেমন দরদী, তেমনি সুদক্ষ আচার্য।

মার্কাস স্কোয়ারের পূর্বদিকে তাঁর বাসায় প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছাত্রদের সঙ্গীত-শিক্ষা দিতেন। বেশির ভাগই বিনা বেতনে। কিন্তু সেজন্যে আন্তরিকতা ও গুরুত্বের কোন অভাব ছিল না। যথাসাধ্য নিপুণ

ভাবে শেখাতেন প্রত্যেকটি ছাত্রকে। নতুন গান শেখাবার সময় গানটি লিখিয়ে গলায় একেবারে তুলিয়ে দিতেন। তারপর ছাত্র যদি গানখানি সঠিক প্রদর্শন করে উপরন্ত নিজস্ব কিছু প্রকাশ করত, তা হলে অত্যন্ত খুশী হতেন তিনি। তাকে বিশেষ করে উৎসাহ দিতেন।

শিক্ষার ওই দুর্দিনের মধ্যে তালিম দিতেন মঙ্গলবার। আর ছাত্রদের নিয়ে বৃহস্পতিবার গানের আসর বসাতেন। সেদিন ছাত্রদের পাখোয়াজের সঙ্গে গাইতে হ'ত, নিজেও গাইতেন তিনি। ছাত্রদের সঙ্গে বাজাবার জন্যে দুর্লভচন্দ্র, কেবলবাবুর মতন ধুরন্ধর সঙ্গতকার আসতেন। দুর্লভচন্দ্র আবার কঠিন কঠিন বোল বাজাতেন ছাত্রদের তালে সুদৃঢ় করবার জন্যে।

ছাত্রদের জন্যে ভূতনাথবাবুর মমতা তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে যেমন প্রকাশ পেত, তেমনি তাঁর কথাবার্তা ও তাদের সঙ্গে ব্যবহারেও জানা যেত। তিনি বল্‌তেন, 'ছেলেদের মধ্যে আমরা বাঁচব বটে, কিন্তু তার বেশি করে বাঁচব ছাত্রদের মধ্যে।

নিজেদের ব্যক্তি-জীবনের চেয়ে সঙ্গীত-জীবনকে যে বেশি প্রাধান্য দিতেন, তা এই কথা থেকে বোঝা যায়।

তাঁর সঙ্গীত-চর্চা কম বয়স থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, যদিও রীতিমত গান শেখেন নি তখন। ছেলেবেলা থেকেই সুকণ্ঠ। শুনে শুনে বাংলা গান গাইতেন। সেসব গানও ভাল লাগত সকলের। পিতা বেণীমাধব গায়ক ছিলেন। তাঁর কাছেই উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ত পান গানের প্রেরণা।

হাওড়া জেলার জনাইয়ের কাছে বলুহাটিতে বাড়ী। সেখানকার উচ্চ ইংরেজী হাই স্কুলে পড়েন, কিন্তু এনট্রান্স পাস করা হয় নি। বাল্যকাল থেকে গানের প্রতি আসক্তি ছিল, তা আরো প্রকাশ পায় কলকাতায় কাজ করতে এসে। কল্‌কাতায় তখনও যাত্রার আসর জীবন্ত ছিল আর সেখানে গানের একটি মুখ্য স্থান ছিল।

সুমিষ্ট কণ্ঠের জন্যে যাত্রা-দলের সংস্পর্শে আসেন ভূতনাথ। মাঝে মাঝে যাত্রার আসরে গেয়ে খুব প্রশংসা পেতেন। এইভাবে তখন তাঁর সঙ্গীত-চর্চা চলেছিল।

একদিন এক যাত্রার আসরে গান করবার পর তাঁকে অনেক তারিফ্ করলেন ধ্রুপদী পাখোয়াজী দানীবাবু (সতীশচন্দ্র দত্ত)।

ভূতনাথকে তিনি বললেন—এমন সুন্দর গলা আপনার? ভাল করে গান শিখুন না।

কিন্তু তখন রীতিমত শিক্ষা করবার সেরকম তাগিদ অনুভব করলেন না তিনি। সতীশবাবুর কথাটা তেমন মনে লাগল না। বয়স তখন তাঁর ২০ বছরও হয়নি।

তারপর চাকরি পেলেন জেম্‌স্ ফিন্‌লে-তে। আর মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটে এক মেসবাড়ীতে বাস করতে লাগলেন।

নানা রকমের বাংলা গান গাওয়াও চলেছে আগের মতন। এখন তাঁর গান শুনে সকলেই সুখ্যাতি করেন। কেউ কেউ আবার বলেন ভাল গান শিখতে। বেশি করে সে কথা বলেন মেসের সহবাসী নন্দলালবাবু।

নন্দবাবু রাগ-সঙ্গীতের একজন সমঝ্‌দার। ভূতনাথবাবু তখনও এক্ শার্পে গাইতেন উদাত্ত কণ্ঠে। শুনে নন্দবাবু মাঝে মাঝেই বল্‌তেন—এমন সুন্দর চড়া গলা, বাংলা গান গেয়ে নষ্ট করছেন কেন?

ভূতনাথবাবু তাঁর কথা মানতেন না, তর্ক করতেন তাঁর সঙ্গে। রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে তখন তাঁর ভাল ধারণা ছিলনা। নন্দবাবুর কাছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন রাগ-সঙ্গীত নিয়ে।

এমনিভাবে দিন চলে যাচ্ছিল। তখন তাঁর ২১ বছর বয়স। এমন সময় একদিন ঘটনাচক্রে গান শুনতে এসে পড়েন মুরারি সম্মেলনে, শিবনারায়ণ দাস লেনে।

এখানে মধুকণ্ঠ ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান সেদিন শুনলেন। ধ্রুপদ গানকে এতদিন ব্যঙ্গ করে এসেছেন ভূতনাথ। কিন্তু মহীন্দ্রনাথের গানে তাঁর ধারণা একেবারে বদলে গেল। মহীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ শুনে তিনি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলেন বললেও ঠিক বলা হয় না। অভিভূত হলেন, বলা যায়।

সে গান শুনে মেসে ফিরে এলেন আচ্ছন্নের মতন সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। গান এত গম্ভীর হয়েও এত মধুর হতে পারে? এই তা হলে রাগসঙ্গীতের আসল নমুনা? না জেনে এই গানকে এতদিন বিদ্রূপ

করে এসেছেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মনের তারে ঝঙ্কার দিয়ে বাজতে লাগল মহীন্দ্রনাথের অমৃতকণ্ঠের গান।

পরের দিন নন্দবাবুকে ডেকে বললেন—ধ্রুপদ গান এত সুন্দর হতে পারে? কি জিনিষ শুনে এলুম কাল ওই লোকের কাছে, ওই জিনিষ যদি শিখতে পারি,তবেই জন্ম সার্থক হয়। কিন্তু সে কি আমার বরাতে হবে?

শুনে নন্দবাবুই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের লালমাধব মুখার্জী লেনে মহীন্দ্রনাথের বাড়ীতে। ভূতনাথবাবু সেখানে মনোবাসনা নিবেদন করলেন এবং তাঁর নিয়মিত সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল।

তারপর থেকে একাদিক্রমে মহীন্দ্রনাথের কাছে তিনি শিখতে লাগলেন ১২।১৩ বছর। মহীন্দ্রনাথের ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত। ভূতনাথের তখন ৩৪ বছর বয়স। গুরুর মৃত্যুর পর রাধিকাপ্রসাদের কাছেও কয়েক বছর শিখলেন। মহীন্দ্রনাথের তিনি প্রিয়তম ও সর্বোত্তম শিষ্য। মহীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিষ্য ধ্রুপদ গুণী যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত-জগতের ভাগ্যক্রমে আজো বিদ্যমান আছেন।

ভূতনাথের ওজস্বী কণ্ঠ এবং সঙ্গীত-প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করে' বিকাশের পথ পেলো ধ্রুপদ গানে। সাধনাও তাঁর আদর্শ ছিল, বলা যায়। প্রতিদিন ভোর ৪টা থেকে ৩,৪ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রিও ৪।৫ ঘণ্টা। শুধু শিক্ষার সময়ে নয়, পরবর্তীকালেও এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেওয়াজ করতেন অসুস্থ হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত। এত অফুরন্ত দম তাঁর ছিল যে আসরে অত বেশিক্ষণ শ্রোতাদের আবিষ্ট করে আর কেউ বোধহয় গেয়ে যেতে পারতেন না। আর মহীন্দ্রনাথের মতন তাঁরও গানের এই প্রভাব দেখা যেত যে, তাঁর গানের পরে আর কোন গায়কের পক্ষে আসর জমানো অতি কঠিন হ'ত। সুরাট, চৌতালে যেমন কাঁহারে গোপাল গানখানি, তেমনি দেশ-এর ধামার 'রঙ্গ ঝরিলা' কিংবা ধুরিয়া মল্লারের সেই গানটি শুনিয়ে তিনি কত আসর যে মাৎ করেছিলেন!

দেশের সঙ্গীত সমাজের দুর্ভাগ্য যে অমন ঐশ্বর্যময় কণ্ঠের কোন চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। তাঁর গুরু মহীন্দ্রনাথের মতন তিনিও রাজি হন নি তিন মিনিটের গ্রামোফোন রেকর্ডে ধ্রুপদ গান ধরে রাখতে।......

এ হেন ধ্রুপদী ভূতনাথবাবু আসরে ধ্রুপদের হতাদর এবং তাঁকে অনাদর করতে দেখে কি মর্মাঘাত না অনুভব করতে লাগলেন তা অনুমান করা যায়। সেই সঙ্গে আরও ক'টি এমন কারণ দেখা দিল যে, অভিমানী শিল্পী কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন কিশোর প্রতিভা মধুসূদন মজুমদার তাঁর কাছে শিক্ষা এবং ধ্রুপদ-চর্চা ত্যাগ করে অন্য রীতির গান শিখতে আরম্ভ করলেন। ওদিকে তাঁর গুরু-পুত্র ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পিতার প্রতিভা ও কণ্ঠসম্পদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উদীয়মান হলেন ধ্রুপদের আসরে। ললিতচন্দ্র ভূতনাথবাবুর শুধু পরম স্নেহের পাত্র গুরু-পুত্রই নন, মহীন্দ্রনাথের কথায় কিছুদিন ভূতনাথবাবু তাঁকে শিখিয়েও ছিলেন। কিন্তু ললিতচন্দ্র যখন তাঁর অনিন্দ্য কণ্ঠ ও পূর্ণ প্রতিভা নিয়ে সঙ্গীতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, আরম্ভ হ'ল বাঙালীসুলভ একটি দলাদলির গুঞ্জরণ। ললিতচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুরাগী ও শিষ্যদের যে গোষ্ঠি গঠিত হ'ল, সে পক্ষীয় কেউ কেউ এমন রটনা করতে লাগলেন যে, ললিতচন্দ্রকে ভূতনাথবাবু প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন এবং প্রথমোক্তের উন্নতিতে অসূয়াপরবশ হয়েছেন ইত্যাদি।

নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ভূতনাথবাবুর দিক থেকে এরকম কোন মনোভাব ছিল না। ১৩।১৪ বছরের বয়োকনিষ্ঠ ললিতচন্দ্রকে তিনি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গীত জগতে সমাদর-লাভে আন্তরিক আনন্দিতই ছিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের বিপরীত মন্তব্য কানে গেলে তিনি বলতেন, ললিত আমার গুরুর ছেলে। তার উন্নতিতে হিংসে করব, আমি? আমি চাই তার আরও উন্নতি হোক। আমি কোন দিন তার পথের কাঁটা হব না।

কিন্তু নিন্দা প্রচার যাদের স্বভাব তারা সত্যের ধার ধারে না। আর এই সব অপপ্রচারে অতি মনোকষ্ট

পেতে লাগলেন ভূতনাথবাবু। সেই সঙ্গে তাঁর মর্মপীড়ার প্রধান কারণটি যুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে বিদায় নেওয়া সাব্যস্ত করলেন। ধ্রুপদ গানের অনাদরে মন তাঁর ভেঙ্গে গেয়েছিল একেবারে।

১৯৩৬ সালের শেষ দিকে কলকাতা ছেড়ে তিনি বসুহাটিতে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্যে ফিরে যান। তারপর কয়েকবার কলকাতায় এসেছিলেন, বিশেষ উপরোধে গান গাইতে বা অন্য কোন প্রয়োজনে। কলকাতার শেষ গান দুর্লভচন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুর্লভ সম্মেলনে গেয়েছিলেন।

কলকাতার সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পরও তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয় কেউ কেউ পুনরায় প্রচার করতেন যে, তিনি ললিতচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে চলে গেলেন কলকাতা ছেড়ে, তাঁর গানের ক্ষমতা আর নেই।

কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার তখনও পূর্ণ পরিণতি অবস্থা। শক্তিশালী কণ্ঠে অটুট গায়ন ক্ষমতা। বয়স ৫১ বছর। তাঁর বিরোধী কোন অভিযোগই সত্য নয়। তিনি বৃদ্ধ বরজলালের সঙ্গে তুলনীয় নন। তাঁর গানভঙ্গ ঘটেনি বয়সে ট্র্যাজেডীতে বা কালের চক্রান্তে। ধ্রুপদের জনপ্রিয়তা ম্লান হবার অভিমানে তিনি সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান।

দুর্লভ সম্মেলনে তাঁর শেষ গানেও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর প্রতিভার দীপ্তি।

তারপর দেশে গিয়ে যে দু' বছর সুস্থ ছিলেন, দিন-রাতের অধিকাংশ সময় গান গেয়েই তাঁর কেটে যেত। কোন কোন ছাত্র এখানেও তাঁর কাছে শিখতে আসত, বাকি সময় তিনি নিজের গানেই থাকতেন বিভোর হয়ে। অনন্ত মর্মপীড়া সঙ্গীতের মধ্যে ভুলে থাকতে চাইতেন এবং ভুলে ছিলেনও।

কিন্তু সে সুখেও বাদ সাধলেন বিধি। বছর দুয়েক পরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং সেই অবস্থায় প্রায় ৭ বছর সঙ্গীতহীন জীবনধারণ করে অবশেষে সব দুঃখ-বেদনার উর্দ্ধে চলে যান।

—(*)—

সাহিত্যযোগী স্বামী সারদানন্দ

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

"স্বামী সারদানন্দ শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্য ছিলেন—এ তথ্য বাংলা দেশে সকলেরই জানা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিতে তিনি যে কর্ম-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সকলের সহিত আমিও তাঁহাকে কর্মযোগীরূপে অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু এ সকলের উর্দ্ধে তাঁহার একটি বড় পরিচয় আমার কাছে প্রতিভাত—তাহা হইতেছে তাঁহার অনন্যসাধারণ সাহিত্য-কৃতি। এই কারণে আমি তাঁহাকে সাহিত্যযোগীরূপেই জানি।"*

স্বামী সারদানন্দের লেখা 'ভারতে শক্তি পূজা', 'গীতা তত্ত্ব' 'বিবিধ প্রসঙ্গ' 'পত্রমালা' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

* "স্বামী সারদানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন" নবভারত পৌষ, ১৩৩৫

প্রসঙ্গ', 'The Vedanta—Its Theory and Practice' গ্রন্থাবলী বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমর সম্পদরূপে পরিগণিত হয়ে আছে। তাই উপরে উল্লিখিত উক্তির মধ্যে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী সারদানন্দকে সাহিত্য-যোগীরূপে অভিহিত করেছেন। যোগের পথে, সাধনার পথে আর কর্মের পথে থেকেও তিনি সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকতেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণিক ও নিখুঁত জীবনী বললেই গ্রন্থের সব পরিচয় দেওয়া হয় না। এই গ্রন্থ দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যায় ও ভাষার কাব্যময় মাধুর্যে অপূর্ব সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন হয়ে আছে। 'গীতা তত্ত্ব' গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ গীতার দুরূহ তত্ত্ব অতি সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করেছেন। 'যত মত তত পথ'-রূপ সমন্বয় সাধনার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে মানস-পটে সমুজ্জ্বল রেখে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা পাঠ করলে মনে হয় মানুষের সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা পরিহার করে বীর্যবলসম্পন্ন করবার জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। গীতা হিন্দুর অতি প্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ যাতে সকলে পড়ে বুঝতে পারে তার জন্যে স্বামী সারদানন্দ সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষা ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থের সূচনায় তিনি লিখেছেন—"উপনিষদ-সকল যেন গাভীস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ তার দুধ দুইছেন, অর্জুন সেই গাভীর বাছুরের মত হয়েছেন। বাছুর যেমন গাভীর কাছে না গেলে গাভী দুধ দেয় না, সেই রকম অর্জুনের প্রশ্নেই শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রোপদেশ এবং গীতারূপ দুধের উৎপত্তি। এই দুধ পান করবে কে? সুধী অর্থাৎ পণ্ডিত লোক। পণ্ডিত মানে বিবেকী লোক। আমাদের দেশে আজকাল যাঁরা দু'চারখানা বই পড়েছেন, দু'চারটে কথা গুছিয়ে বলতে পারেন, তাঁদেরই পণ্ডিত বলা হয়। কিন্তু গীতা বলেন, যারা মুখে কেবল লম্বা-চওড়া বলেন, তাঁরা পণ্ডিত নন। যাঁরা সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন, যাঁদের অপরোক্ষানুভূতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে, অসৎ হ'তে সৎ যাঁরা বুঝে নিতে পারেন, তাঁরাই পণ্ডিত। শুনা যায়, এক শ্রেণীর হাঁস আছে, যারা দুধে জল মিশে থাকলে শুধু দুধটুকু খেতে পারে। তেমনি এই সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত সংসারে যিনি অসৎ বাদ দিয়ে সৎ নিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। তিনিই গীতা বুঝতে ও বোঝাতে পারেন।"

স্বামী সারদানন্দের গ্রন্থে তাই আমরা দেখি সহজ সরল ভাবের উৎস আর ভাষার মধ্যে দেখি ধ্বনি-মিলন শব্দের অপূর্ব ঝঙ্কার। পাণ্ডিত্যের দুরূহতায় তাঁর রচনা ভারাক্রান্ত করেন নি। সর্বসাধারণ পাঠককে দুরূহ তত্ত্ব গ্রহণ করাবার প্রয়াস তাঁর রচনায় পরিস্ফুট। এর দ্বারা পাঠকের প্রতি তাঁর অসামান্য কারুণ্য প্রকাশ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আদর্শ কর্মযোগীরূপে জেনেছিলেন, তাই তাঁর দ্বারা মিশনের অনেক কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন।

আমরা দেখি স্বামী সারদানন্দের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়—তাঁর রচনায় সেই ভাবই ফুটে উঠেছে। প্রথম যুগে উদ্বোধন পত্রিকার পরিচালনা তিনিই করতেন। এখনও এই পত্রিকাটি নানা সাহিত্য-সম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

এই জ্ঞানী সন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর মর্ম উদ্‌ঘাটন করে যে গ্রন্থগুলি রচনা করে গেছেন তা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন হয়ে আছে।

স্বামী সারদানন্দের সন্ন্যাসপূর্ব নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পিতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী স্বগ্রাম জনাই থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতাতেই তাঁরা সপরিবারে বাস করতেন। মা নীলমণি দেবী অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল খুব বেশী। মায়ের কাছ থেকেই শরৎচন্দ্র ভক্তির ও সাহিত্য সাধনার প্রথম বীজটি পান।

১৮৬৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর জন্ম। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী শনিবার শুভদিন নয়, কিন্তু জাতকের কোষ্ঠী পর্যালোচনায় জানা যায় তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যরূপে পরিগণিত হবেন। স্বামী সারদানন্দ মহা-সমাধি লাভ করেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট।

আজ জন্ম-শতবার্ষিকী দিনে স্বামী সারদানন্দের আধ্যাত্মিক এবং কর্মময় জীবনের কথা স্মরণ করছি। তাঁর জীবনের নানাদিক নিয়ে ও তাঁর সাহিত্য-কৃতির পরিচয় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া উচিত। তা হ'লে তাঁর জীবনের ও সাহিত্যের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারব। দেখতে পাব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবঘন মূর্তিখানিকেও।

আলোর প্রহর

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সারাটা পথ বাসবীর ছেলেটার কথা মনে পড়ল। চেহারাটা প্রীতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। তেমনই গৌর, তেমনই আয়তলোচন।

আশ্চর্য, মহীতোষবাবু যে এমন একটা কাজ করেছে একথা অফিসের ত কেউ বলে নি। বালববাবু, যে বাসবীর মুখোমুখি হ'লেই আবোল-তাবোল এক রাশ কথা বলে, সেও এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ।

মহীতোষবাবু নিজেও কিছু বলে নি।

ভালই হয়েছে, মহীতোষবাবুর সংসারে সব ছিল, কেবল শিশুর স্পর্শ ছিল না। মনের মধ্যে দু'জনেরই গোপন ক্ষোভ ছিল। তৃষ্ণা ছিল।

এতদিনে সে তৃষ্ণার নিবারণ হ'ল।

বাস থেকে বাইরে চোখ ফিরিয়েই বাসবী চমকে উঠল। চেনা গাড়ি। গাড়ির মধ্যে বসে-থাকা লোকটাও চেনা।

কিন্তু অনিমেষ রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চুপচাপ বসে আছে কেন? ভাল করে বাসবী দেখেছে। আলো-ঝলমল চৌরঙ্গীতে ভুল দেখবার কথা নয়। তবু বাসবী ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার দেখল। মোটরের নম্বর মিলিয়ে দেখল। এক মোটর, এক মানুষ।

সম্ভবত কারো জন্য অনিমেষ অপেক্ষা করছে।

রাস্তার অন্যদিকে চোখ ফিরিয়েই বাসবী ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

অভিজাত হোটেল। অনেক লোক যাওয়া-আসা করছে। দামী মোটর থেকে সবাই নামছে।

বাসবীর মনে পড়ে গেল এখান দিয়ে যেতে যেতেই বার দুয়েক বেলাদেবীকে দেখেছে। উগ্র প্রসাধন, আধুনিক সজ্জায় মোহিনী বেশে নিজেকে সাজিয়ে হোটেলের মধ্যে ঢুকছে। একলা নয়, পাশে পুরুষ সঙ্গী।

তার মধ্যে একজনের পরিচয় বাসবী পেয়েছিল। মেট্রোর সামনে বাসবীর সঙ্গে তাকে একবার দেখেছিল। অনিমেষ বলেছিল মিষ্টার মেটা, লোহার কারবারী।

কিন্তু বেলাদেবীকে দেখবার জন্য অনিমেষ পথের অন্য পাশে মোটর থামিয়ে বসে আছে, এমন অসম্ভব কথা ভাবতেও বাসবীর ভাল লাগল না। ইদানীং সামান্য একটু দুর্বলতার ভাব লক্ষ্য করলেও, সম্পর্কছিন্ন, স্বৈরিণী এক নারীর ওপর অনিমেষের একটা আকর্ষণ হবে, এটা প্রায় অসম্ভব।

একদিন দু'জনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, কিছুদিন একসঙ্গে ঘরও করেছিল, এসব স্বীকার করে নিলেও অনিমেষ বেলাদেবীর প্রতি নতুন করে আকর্ষণের কিছু পাবে এটা অবিশ্বাস্য।

তবে!

এ তবের উত্তর বাসবী পেল না। অবশ্য এমন একটা ব্যাপারের উত্তর তাকে জানতে হবে এমন কোন কথা নেই। এটা অনিমেষ রায়ের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

নিজের মনকে বাসবী এত কথা বলে বোঝাবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পরের দিন অফিসে যাবার সময় ঠিক করল, সুযোগ পেলে অনিমেষকে একবার জিজ্ঞাসা করবে।

কামরায় পা দিয়েই কথাটা বাসবীর মনে পড়ে গেল।

অনিমেষ ত অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে। দীঘায়। তা হ'লে গতকাল রাত্রে বাসবী কাকে দেখল? শুধু মানুষটাকেই দেখে নি, তার মোটরও দেখেছে।

বাসবী রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল।

টিফিনের একটু আগে একটা ফাইলের ব্যাপারে নিশিবাবু ঘরে ঢুকল।

বাসবী সকাল থেকে কিছু করে নি, চিঠির গোছা সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে ছিল।

নিশিবাবু সামনের চেয়ারে বসতে বাসবী বলল, আপনাকে একটা গোপনীয় কথা বলব নিশিবাবু।

নিশিবাবু পাটল বর্ণ ধারণ করল। দুটো চোখে খদ্যোতের দীপ্তি। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে বলল, আমাকে আপনি নিশ্চিন্তে সব কথা বলতে পারেন মিস সেন। আমি দু'কান করব না। এরকম বিশ্বাসী লোক আর এ অফিসে দু'টি পাবেন না।

নিশিবাবুর উচ্ছ্বাসকে বাসবী বিশেষ আমল দিল না। বলল, আচ্ছা, ম্যানেজার কি দীঘায় যান নি?

সে কি? নিশিবাবু প্রায় লাফ দিয়ে উঠল, তাঁর ত পরশু চলে যাবার কথা। প্রথমে বলেছিলেন টানা মোটরে যাবেন তারপর শুনলাম একটু দূর হবে বলে ট্রেনে যাওয়াই ঠিক করেছেন, কেন বলুন ত?

বাসবী নিজেকে সামলে নিল, না, কাল রাস্তায় যেন তাঁর মতন একজনকে দেখলাম। মোটরে বসে আছেন। ম্যানেজার যে কলকাতায় নেই, সেটা আমার খেয়ালই ছিল না। আমিই ভুল দেখেছি।

নিশিবাবু নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বাসবীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ধোঁয়ার মধ্যে থাকবার আর দরকার কি। দাঁড়ান, আমি সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। বেলটা টিপুন ত।

বাসবী বেল বাজাল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা এসে টেবিলের কাছে দাঁড়াল।

আচ্ছা, ম্যানেজারসায়েব দীঘা যান নি?

নিশিবাবু প্রশ্ন করল।

বেয়ারা আচমকা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর বলল, আজ্ঞে পরশু থেকে তাঁর জ্বর।

নিশিবাবু একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল, পরশু থেকে জ্বর, তুমি চুপচাপ আছ? অফিসে জানাও নি? তোমার মতন বেয়ারাকে ফাইন করা উচিত।

বেয়ারা দুটো হাত যোড় করে বুকের ওপর রাখল। আমতা আমতা করে বলল, আজ্ঞে, সায়েবই বলে দিলেন অফিসে কিছু বলতে হবে না। আমি একটু সেরে উঠলেই বাইরে চলে যাব। মিছামিছি অফিসের লোককে ব্যতিব্যস্ত করার কোন দরকার নেই।

নিশিবাবুর মেজাজ সপ্তমে। বেয়ারা চলে যেতে একেবারে ফেটে পড়ল।

অফিসের লোকের ত সায়েবের শরীরের জন্য ঘুম হচ্ছে না। দৌড়োদৌড়ি যা করবার এই শর্মাই করবে। এ অফিসে দায়িত্বজ্ঞান বলে কারো কিছু আছে না কি।

হঠাৎ নিশিবাবু গলার স্বর খাদে নামাল।

চলুন মিস সেন, অফিসের পরে ম্যানেজার সায়েবকে একবার দেখে আসি। কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

বাসবী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল বটে কিন্তু ব্যাপারটা তারও আদৌ বোধগম্য হ'ল না।

অসুস্থ শরীর নিয়ে অনিমেষ বেরিয়ে ছিল? অবশ্য মোটরে বসার ভঙ্গিটা খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, কিন্তু সেটা বাসবী অনিমেষের মানসিক অবসাদজনিত বলেই ভেবে নিয়েছিল।

নিশিবাবু যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল।

কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি আবার রাস্তায় কোথায় ম্যানেজারকে দেখেছেন বললেন?

না, না, বাসবী সজোরে ঘাড় নাড়ল, আমার দেখতে ভুল হয়ে থাকবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হ'তেও পারে, শব্দ করে নিশিবাবু হাসল, চোখের সামনে দিনরাত দেখে দেখে মনের মধ্যেও বসে গেছে।

তার মানে? বাসবী অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও স্বর নরম করতে পারল না।

তার মানে, আমাদের সকলেরই শ্রীরাধার অবস্থা। নীল কিছু দেখলেই শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করে বসে থাকি। কথাটা ভেবে দেখুন, বৃন্দাবনে যেমন শুধু শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, অফিসেও তেমনিই ম্যানেজার। ওঁর ছত্রছায়াতেই ত আমরা আছি।

হতভম্ব বাসবীকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে নিশিবাবু হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নিশিবাবু এসে দাঁড়াল।

বাসবী ভেবে রেখেছিল যাবে না। এমনিতেই নানা লোকে নানা কথা রটনা করছে। কল্পনার জাল বুনে বুনে মিথ্যা কাহিনী। তার ওপর বাসবী যদি অনিমেষের বাড়ী গিয়ে ওঠে, তা হ'লে দুষ্টলোকের রসনা একেবারে অসংযত হয়ে উঠবে।

কিন্তু নিশিবাবু এসে দাঁড়াতে বাসবী সোজাসুজি অস্বীকার করতে পারল না। কিছু বলা যায় না, বাসবী না গেলেও নিশিবাবু ত যাবেই। গিয়ে স্পষ্ট বলবে অনিমেষকে বাসবী আসবে বলে কথা দিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গিয়েছে। একটা লোক অসুস্থ জেনেও দেখতে আসার ভদ্রতাবোধটুকুও বুঝি বাসবীর নেই।

অনিমেষ রায়ের বাড়ীর সামনে যখন দু'জনে নামল তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। রাস্তায় বাতি জ্বলে উঠেছে। কিছু আলো, কিছু অন্ধকারে সব কিছু মেশানো।

ঠিক দরজার কাছেই একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভৃত্যশ্রেণীর কেউ হবে।

নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করল, সায়েব বাড়ীতে আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ আছেন। সায়েবের জ্বর, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

সায়েবের অফিস থেকে।

অ, আসুন ওপরে।

ভৃত্যটির পিছন পিছন দু'জনে ওপরে গিয়ে উঠল।

পরিচ্ছন্ন বসবার ঘর। কৌচ সোফা সাজানো। মাঝখানের গোল টেবিলের ওপর একটা ফুলদানি। তার মধ্যে রক্তগোলাপের গুচ্ছ।

নিশিবাবু আর বাসবী দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসল।

চাকর বোধ হয় ভিতরে খবর দিতে গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এসে বলল, আপনারা ভিতরে আসুন।

নিশিবাবু উঠে দাঁড়াল। বাসবী একটু ইতস্তত করছে দেখে বলল, উনি ডাকছেন যখন যেতে বাধা কি।

সবুজ পর্দাটা চাকর একহাতে তুলে ধরেছে। তার পাশ কাটিয়ে দু'জনে ভিতরে ঢুকল। প্রথমে নিশিবাবু, পিছনে বাসবী।

এক কোণে বড় সাইজের একটা খাট। তার ওপর পিঠে বালিশ দিয়ে অনিমেষ বসে। ক্লান্ত, অবসন্ন চেহারা। লোকটা যে সুস্থ নেই সেটা তাকে এক নজরে দেখলেই বোঝা যায়। পরনে স্লিপিং স্যুট।

পাশে গোটা দুয়েক বই, খবরের কাগজের কয়েকটা পাতা বিক্ষিপ্ত রয়েছে।

নিশিবাবু দু' হাত যোড় করল।

দেখাদেখি বাসবীও নমস্কারের ভঙ্গি করল।

কি ব্যাপার, আপনারা খবর পেলেন কোথা থেকে।

নিশিবাবুর দিকে চকিতের জন্য একবার দেখেই অনিমেষ পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেরাল বাসবীর দিকে।

বাসবী শুধু আরক্ত নয়, একটু আড়ষ্টও হয়ে গেল।

ততক্ষণে ভৃত্য বাইরের ঘর থেকে দুটো চেয়ার এনে এ ঘরে রেখেছে।

অনিমেষ হাতটা প্রসারিত করে বলল, বসুন আপনারা।

এবার নিশিবাবুর কণ্ঠে আক্ষেপের সুর ফুটল, আপনি ক'দিন অসুস্থ, একটু খবরও দেন নি স্যার। কাকের মুখে খবর পেলে ছুটে আসতাম।

অনিমেষ হাসল, আজ কার মুখে খবর পেয়ে ছুটে এলেছেন?

আপনার বেয়ারার কাছ থেকে জানতে পারলাম। তাও নিজে বলে নি, আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করতে তবে বলল। আমি ত স্যার জানি আপনি দীঘায়। দু' একদিনের মধ্যে ফিরে আসবেন।

অসুস্থ হয়ে পড়লাম বলে আর যাওয়া হয় নি। অবশ্য আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে ফোন করে আমার অবস্থা জানিয়েছি। বলেছি, একটু সুস্থ হলেই রওনা হব।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর? নিশিবাবুর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন।

হ্যাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর দু'মাসের ছুটিতে বাইরে গিয়েছিলেন, কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় আগেই ফিরে এসেছেন।

প্রায় কথার মাঝখানেই ভৃত্য এসে দাঁড়াল।

সায়েব আমি এই বেলা ওষুধটা নিয়ে আসি। লাল ওষুধটা একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

অনিমেষ হাত নেড়ে বারণ করল, ওষুধ এখন থাক। তুমি আগে এদের চায়ের ব্যবস্থা কর।

নিশিবাবু দাঁড়িয়ে উঠল। ভৃত্যের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দাও, দাও, কাগজ আর টাকা আমাকে দাও। এই ত মোড়ের মাথায় ডিসপেনসারি। তোমার চা হ'তে হ'তে আমি ফিরে আসব।

কাউকে নিষেধের অবকাশ না দিয়ে নিশিবাবু দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

বাসবী চোখ না তুলে বুঝতে পারল অনিমেষের দৃষ্টি তার ওপর ন্যস্ত।

নিশিবাবু বুঝি আপনাকে ধরে এনেছেন?

বাসবী ঘাড় নাড়ল, কেন, ধরে আনতে হবে কেন? এটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ বুঝি আমার নেই।

কৃতজ্ঞতাবোধ? কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন উঠছে কেন?

বাঃ, আপনি আমার অন্নদাতা।

অনিমেষ উচ্চ হাস্য করে উঠল, না, আপনার উন্নতি অবধারিত। জাত-কেরাণীর কলাকৌশল সব আপনার করায়ত্ত। যাক, একটা কাজ করবেন?

কি বলুন?

ওই টেবিলের ওপর ছোট শিশি রয়েছে, ওটা থেকে দুটো বড়ি বের করে আমায় দিন। পাশে এক গ্লাস জলও রয়েছে, সেটাও নিয়ে আসুন। বড়ি দুটো আমার এক ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনে ছিল না।

বাসবী উঠে দাঁড়াল। টেবিলের কাছে গিয়ে শিশি থেকে দুটো বড়ি বের করে জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বিছানার কাছে ফিরে এল।

হাত বাড়িয়ে ওষুধ আর জলের গ্লাসটা নিতে নিতে

অনিমেষ বলল, এ কাজটা অবশ্য আমি নিজেই করতে পারতাম, কিন্তু হাতের কাছে আপনি রয়েছেন বলে, সেবা নিতে ইচ্ছা করছে। তা ছাড়া রোগী যদি নিজের হাতে ওষুধ নিয়ে এসে খায়, তা হলে সে আর রোগী থাকে না, কি বলেন ?

বাসবী মুচকি হাসল। কোন উত্তর দিল না।

কিছুতেই বাসবী সহজ হতে পারছে না। নিশিবাবু যে তাকে কথা বলবার সুযোগ দিয়েই এভাবে ছুতো করে বেরিয়ে গেল, এটা বুঝতে তার একটুও অসুবিধা হ'ল না। অনিমেষের কাছে বাসবী একলা থাক এটাই নিশিবাবুর মনোগত অভিপ্রায়।

কিন্তু এই অভিপ্রায়ের পিছনে কি স্তরের মনোবৃত্তি সজাগ সেটা ভেবেই বাসবী শিউরে উঠল।

ওষুধ খাওয়া শেষ করে অনিমেষ গ্লাসটা টিপয়ের ওপর রেখে দুটো হাত মাথার ওপর তুলে ক্লান্ত ভঙ্গী করল। তারপর বলল, বড় পরিশ্রান্ত বোধ করছি। ভাবছি কিছু দিন ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যাব।

বাসবী অনিমেষের দিকে চেয়ে দেখল। সত্যিই অনিমেষকে খুব পাংশু, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। দুটি চোখে শ্রান্তির আভা। সারা শরীরে অসহায়তার আমেজ।

একেবারে হঠাৎ। এমন একটা কথা যে বাসবীর মুখ থেকে বের হবে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি।

শরীরের এ অবস্থায় কাল রাত্রে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন কেন তবে ?

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও অনিমেষ বোধ হয় এতটা চমকে উঠত না।

খুব মৃদু কণ্ঠে, প্রায় অস্পষ্ট স্বরে অনিমেষ বলল, আমি ? কে বলল ?

বাসবী হাসল, আমি নিজের চোখে আপনাকে দেখেছি।

অনিমেষ কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। বলতে পারল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বাসবীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে, যখন বাসবী ভেবেছিল, অনিমেষ বুঝি আর কিছু বলবেই না, তখন অনিমেষ কথা বলল, মিস্ সেন, অফিসের পরে কি আপনি সারা শহর ঘুরে ঘুরে বেড়ান ?

না তা বেড়াই না, কিন্তু এক জায়গা থেকে ফেরার সময় হঠাৎ নজরে পড়ে গেল। রয়েল হোটেলের উল্টো দিকে গাড়ী নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন।

অনিমেষ নির্বাক।

একটু একটু করে বুঝি সাহস বাড়ল বাসবীর। কিংবা সে ভাবল, এখনই হয় ত নিশিবাবু এসে পড়বে। তার মধ্যে যা কিছু জানবার যা কিছু জিজ্ঞাসা করার সব সেরে ফেলতে হবে।

আমি জানি, আপনি বেলা দেবীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

অনিমেষ বেশ কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। ভদ্রমহিলার বাড়ীর ঠিকানা আমার জানা নেই, তবে বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি, ওই হোটেলে তার নিত্য আসা-যাওয়া। রাত সাতটা থেকে কোন-কোনদিন রাত বারোটা পর্যন্ত থাকেন। অবশ্য একলা নয়, সবান্ধবে। বেলার মুখোমুখি দাঁড়ানো আমার একবার বিশেষ দরকার। এ ভাবে কেন আমাদের নামে কালি ছিটিয়ে বেড়াচ্ছে, তা জানা দরকার। বিশেষ করে আমার পরিচিত মহলে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে !

আমাদের নামে ? আমাদের মানে ? বহুবচনটা বাসবীর কান এড়ায় নি।

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে দ্বিধাদীর্ণ কণ্ঠে অনিমেষ বলল, আপনাকে আর আমাকে জড়িয়ে।

এইবার বাসবী চমকাল। চেয়ারের হাতলদুটো শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে নিজেকে কিছুটা সামলাল। সারা মুখ রক্তশূন্য, সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

অনিমেষের কণ্ঠে দূরাগত সঙ্গীতের মতন কানে ভেসে এল।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে এসেছি। কাল বেলা আসে নি হোটেলে।

বাসবী আর একটি কথাও বলতে পারল না। শব্দ করার সব শক্তিটুকু কে যেন হরণ করে নিয়ে গেছে। এখন কি করবে বাসবী ? চুপচাপ এমনই জড়ের মতন বসে থাকবে, না কোন অছিলায় উঠে দাঁড়াবে বাড়ী যাবার জন্য।

রাস্তায়, ফাঁকা জায়গায়, উন্মুক্ত বাতাসে একটু দাঁড়াতে পারলে ভাল হ'ত। শরীরের কোষে কোষে যে দাহ সমস্ত সত্তাকে অঙ্গারে পরিণত করার চেষ্টা করছে, সে দাহ বুঝি একটু প্রশমিত হ'ত।

কিন্তু কেন ? কেন কুৎসা প্রচারের এই হীন অপচেষ্টা ! অনিমেষের সঙ্গে ত বেলা দেবীর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে ঋণ শোধও হয়ে গেছে। অনিমেষের প্রতি আকর্ষণের ছিটে-ফোঁটাও থাকবার কথা নয়। অনিমেষ কোন্ মেয়ের প্রতি

পক্ষপাতিত্ব দেখাল, তাতে বেলা দেবীর বিচলিত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না।

তবে? এমন ত নয়, অনিমেষের মতন বেলা দেবীও একদা-স্বামীর প্রতি গোপন আকর্ষণ লালিত করছে অন্তরের অন্তঃস্থলে। প্রেমের ফল্গুধারা বহমান, তাই সহজেই ঈর্ষায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

তাই যদি হয় তবে বেলা দেবীর এমন চঞ্চল জীবন-যাপন করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? অনিমেষের কাছে ফিরে আসতে বেলা দেবীর কিসের বাধা, কোথায় বাধা! ভেবে সত্যিই বাসবী কুলকিনারা পায় না।

অবশ্য এসব তার ভাববার কথাও নয়। কেবল তার নাম জড়িত হয়েছে, স্থানে-অস্থানে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হচ্ছে, সেই জন্যই তার চিন্তা।

বাসবী মনে মনে ঠিক করল, সেও একবার বেলা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সুযোগ পেলে তাকে নিভৃতে ডেকে এনে তার দুটো হাত চেপে ধরে বলবে, আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি ধনীর দুলালী নই, অভিজাত শ্রেণীর কেউ নই, নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। মান-সম্ভ্রমের মূল্য আমার কাছে অনেক। গায়ে একটু কালির আঁচড় লাগলে সে দাগ আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। আপনাদের এই কাদা-ছোড়াছুঁড়ি খেলা থেকে আমায় অব্যাহতি দিন।

বাইরে কাশির শব্দ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিশিবাবু ঘরে ঢুকল।

সামনের ডিসপেনসারীতে পাওয়া গেল না স্যর, একটু দূরে যেতে হ'ল।

অনিমেষ আর বাসবী দুজনেই নিস্তব্ধ। কেউ কোন কথা বলল না। মুখ তুলে দেখল না পর্যন্ত।

নিশিবাবু টেবিলের ওপর শিশিটা রাখল। পাশে বাড়তি পয়সাগুলো।

একবার দু'জনের দিকে নিশিবাবু চোখ ফিরিয়ে দেখল। মনে হ'ল দুটি মুখই মেঘাচ্ছন্ন। তার ক্ষণেক অনুপস্থিতির অবকাশে কি এমন নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল যে এমন থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল ঘরের মধ্যে।

কেউ কিছু বলবার আগে ভৃত্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। হাতে বিরাট ট্রে। দু' কাপ চা, টোষ্ট আর ডিম।

নিশিবাবু একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল।

এ কি করেছেন স্যর, এত কে খাবে?

অনিমেষ মৃদু হাসল, কেন আপনারা। অফিস থেকে ফিরছেন দুজনে।

বাসবী কোন কথা বলল না। কথা বলার মতন অবস্থা তার নয়। বিশ্রী একটা চিন্তা মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। অন্য কিছু প্রসঙ্গ আলোচনা করলেও ভাল লাগছে না।

একটা ক্ষয়িষ্ণু সংসার বাঁচাবার দৃঢ় শপথ নিয়ে বাসবী এগিয়ে এসেছিল। অনেকগুলো অসহায় মুখে অন্ন যোগাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

কিন্তু ক্রমেই সে হতাশ হয়ে পড়েছে। একটার পর একটা আঘাত তার সমস্ত সঙ্কল্পকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে।

নারী হয়ে জন্মাবার অনেক অসুবিধা, অনেক প্রতি-বন্ধক। নিজের কষ্টার্জিত অন্ন মুখে তোলার ব্যাপারেও কম বাধার সৃষ্টি হয় না। পুরুষের পক্ষে যা সামান্য অপরাধ, নারীর পক্ষে তাই ঘোরতর পাপ। একবার পদস্খলন হলেই কেউ ক্ষমা করবে না।

অথচ সবাই মিলে পথ এমন পিচ্ছিল করে রাখবে যে একটু অসাবধান হলেই পদস্খলন হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

নিন মিস্ সেন, আপনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন?

অনিমেষ অনুযোগ করল।

টোস্টটা কামড়াতে কামড়াতে নিশিবাবু বলল, মিস সেনের শরীরটা কি খারাপ?

শাড়ী গুছিয়ে নিয়ে বাসবী সোজা হয়ে বসল, না। শরীর আমার ঠিকই আছে।

হাত বাড়িয়ে বাসবী চায়ের কাপ টেনে নিল।

শরীরটা সম্পূর্ণ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত টুরে বের হবেন না স্যর। দীঘার কাজ এমন কিছু জরুরী নয়। দু'-একদিন পরে গেলে কোন ক্ষতি হবে না।

এবার নিশিবাবু অনিমেষের দিকে ফিরল।

অনিমেষ একটু হেসে বলল, অসুখটা মারাত্মক কিছু নয়। ডাক্তার বলেছেন ফ্লু। জ্বরটা নেই, তবে দুর্বলতা রয়েছে। আর দিনদুয়েকের মধ্যেই বোধ হয় দীঘা রওনা হতে পারব।

আরো কিছুক্ষণ অফিসের কথা হ'ল। দরকারী ফাইল সংক্রান্ত কয়েকটা নির্দেশ। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ত ছুটি শেষ হবার আগেই কাজে যোগদান করবেন এসব টুকিটাকি তথ্য।

বাসবী গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

কি ব্যাপার মিস সেন আপনি কিছু বলুন।

অনিমেষ বোধ হয় বাসবীর মনের অবস্থা বুঝেই প্রশ্ন করল। একটু কথা বলুক বাসবী। হাসুক। সহজ হোক।

নিশিবাবু যখন রয়েছেন তখন আমি আর অফিসের কথা কি বলতে পারি।

খুব ক্লান্ত, নির্জীব কণ্ঠে বাসবী উত্তর দিল।

বিভাসবাবুর সেই কেসটা স্যর একেবারে বন্ধই হয়ে গেল? টাকাগুলো উদ্ধার করার আর কোন পথ রইল না।

নিশিবাবু খুব উদ্বেগ প্রকাশ করল।

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না, পথ আর রইল কোথায়। যে দেবার আসল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই ত শেষ হয়ে গেল। এখন বাকি বিভাসবাবু, যাঁর কোন পাত্তাই নেই, আর তাদের নাবালক এক ছেলে, শুনেছিলাম কোন অনাথ আশ্রমে তাকে দেওয়া হবে।

না ভাগ্য ভাল ছেলেটির, অনাথ আশ্রমে আর যেতে হয় নি। মহীতোষবাবু তাকে মানুষ করছেন। আমি কাল মহীতোষবাবুর বাড়ী থেকেই ফিরছিলাম।

এতক্ষণ পরে বাসবী যেন বলবার মতন কিছু একটা পেল। ক্লেদাক্ত এক কুৎসা রটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দর, সবল, সূর্যদীপ্ত এক কাহিনী।

মহীতোষবাবু মানুষ করছেন?

অনিমেষ যেন একটু আশ্চর্যই হ'ল।

বাসবী কোন কথা বলল না। ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, মহীতোষবাবু সেই শিশুকে বুকে তুলে নিয়েছে। এ পৃথিবীতে বিভাসবাবু, বেলা দেবী যেমন আছে, তেমনই আছে মহীতোষবাবু আর রাধাপদর দল। এরা আছে বলেই পৃথিবী এখনও সাধারণ মানুষের বাসযোগ্য। দয়া, মায়া, প্রীতি, প্রেম হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত হবার অবকাশ পায়।

একটু পরেই নিশিবাবু উঠে দাঁড়াল।

আজ উঠি স্যর। কালও আসব অফিস-ফেরত। আপনার শরীরটা খারাপ দেখে গেলাম, খুব উদ্বিগ্ন থাকব। খুব সাবধানে থাকবেন স্যর। ফ্লু টা বড় পাজী রোগ। আপনি একটু বসবেন ত?

শেষের প্রশ্নটা বাসবীকে।

কোলের ওপর রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে বাসবী দাঁড়িয়ে উঠল। দুটো হাত জোড় করে বলল, আজ চলি।

অনিমেষ কোন কথা বলল না। কি একটা যেন ভাবছে। একটু অন্যমনস্ক মনে হ'ল তাকে।

দু'জনে বেরিয়ে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল।

ভাগ্য ভাল বাসবীর, নিশিবাবুর সঙ্গে অনেকটা পথ তাকে একসঙ্গে যেতে হবে না। চৌরাস্তা পর্যন্ত, তারপর দু'জনের পথ দু'দিকে।

যেতে যেতে বাসবী বার বার পিছিয়ে পড়তে লাগল। ক্লান্তিতে, হতাশায়, দুর্ভর এক চিন্তার ভারে। যেমন করে মধ্যবিত্ত জীবন কুৎসার ভার সইতে পারবে না, বিশেষ করে মিথ্যা কুৎসার ভার, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে, সে কথাটা বেলা দেবীকে সোজাসুজি বলে দিতে হবে।

আপনাকে খুব পরিশ্রান্ত বোধ হচ্ছে, নিশিবাবু পাশে এসে বলল, আপনিও কিছুদিন ছুটি নিয়ে স্যারের সঙ্গে দীঘা ঘুরে আসুন না। বিশ্রামও হবে—

নিশিবাবু কথাটা আর শেষ করতে পারল না। বাসবী জ্বলে উঠল। আরক্ত সারা মুখ, দুটি চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, সমস্ত শরীর ঋজু কঠিন।

অগ্নিক্ষরা বাক্যে নিশিবাবু ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

কি মনে করেছেন আপনারা আমাকে? আমি কি নটী যে আপনাদের ম্যানেজারের মনোরঞ্জন করার জন্য আমাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হবে! ইজ্জত, মান-অপমান সব ধূলায় মিশিয়ে?

পথ একেবারে নির্জন নয়। এদিকে-ওদিকে লোক চলাচল করছে। বাসবীর চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দু'-একজন দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল।

কিন্তু তার আগেই বাসবী সামলে নিয়েছে নিজেকে। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, কিছু মনে করবেন না। সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ। এতটা পথ না এলেই হ'ত।

নিশিবাবু বিব্রত হবার ভান করল, আপনি আর ট্রাম বাসের ভীড়ে উঠবেন না। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই বরং।

বাসবী হাত নেড়ে বারণ করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। পিছনে নিশিবাবু আসছে কিনা ফিরেও দেখল না। একটা চলন্ত বাসকে হাতের ইসারায় থামিয়ে বিপজ্জনক ভাবে উঠে পড়ল।

বাসে বসার জায়গা নেই, কিন্তু একটু বসতে পারলে বাসবী যেন বাঁচত। শরীরটা এখনও কাঁপছে। মাথার ওপর রডটা ধরে কোনরকমে বাসবী দাঁড়াল।

বাড়ীতে যখন গিয়ে পৌঁছল তখন শরীরের কোষে কোষে গভীর অবসাদ। বাসবীর মনে হ'ল যেন অনেক দিনের অসুস্থতার পর সবে শয্যাত্যাগ করেছে।

রোজকার মতন মা বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময়টুকুই মায়ের যা অবসর। বিকালের দিকে রান্নাবান্না সেরে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

একলা আকাশের দিকে চোখ মেলে চুপচাপ চেয়ে থাকে। কি ভাবে কে জানে!

অবশ্য ভাবনার অন্ত নেই। গোটা সংসারের ভবিষ্যৎ সামনে। একটা মেয়ের মুষ্টিভিক্ষা নির্ভর। বাসবী কোন দিন বিয়ে করবে কিনা কে জানে। তার অন্য ঘরে যাওয়া

এ সংসারে মাসান্তে খয়রাতি করে যাবে এমন আশা দুরাশা মাত্র।

তারপর খোকন আছে। নীচু ক্লাশে কোন রকমে তার খরচ বাসবী চালিয়ে যাচ্ছে। এর পর যখন খোকনের প্রয়োজন আরও বাড়বে। তার লেখাপড়ার খরচ, তার পোশাক-পরিচ্ছদের খরচ, এ সব, এত সব বাসবী কোথা থেকে যোগাবে।

এর ওপর রুবির সমস্যা আছে। ততদিন কি বাসবীর মাকে বাঁচতে হবে! একবার ফুরিয়ে গেলে আর কোন চিন্তা নেই, কোন ভাবনা নয়। একটা লোক এ সংসার থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আজ আর এ সংসারের হাজার সমস্যা তাকে পীড়ন করে না, ব্যথিত করে না। তেমনই সেদিন বাসবীর মারও সংসারের জন্য কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে না। পুড়ে ছাই হয়ে যাক সংসার, মানুষগুলো নিশ্চিহ্ন হোক, বাসবীর মার একটু দীর্ঘশ্বাসের শব্দও কেউ শুনতে পাবে না।

অসীম আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বাসবীর মা বুঝি সেই সান্ত্বনাই খোঁজে।

দরজায় হাত রেখে বাসবীর মেজাজ আবার খারাপ হয়ে গেল। বেলা দেবীর পরিচয়ের পরিধি কতদূর বাসবীর জানা নেই। অফিসের লোকের কানে এ কুৎসা যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। তা হ'লে একেবারে সোনায় সোহাগা। এমনিতেই তারা হয়ত অনেক কিছুই কল্পনা করে বসে আছে, বাড়তি সংবাদটুকু সেই কল্পনার ওপর রংয়ের গাঢ় আঁচড় বোলাবে।

মেয়ে হওয়ার অনেক জ্বালা। প্রতি মুহূর্ত নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলা যে কতটা দুঃসাধ্য সেটা ইতিমধ্যেই অনুমান করতে পারছে বাসবী।

তোর আজকাল রোজই দেরী হচ্ছে বাসী।

দরজা খোলার পরই মার প্রথম প্রশ্ন।

অন্য দিন বাসবী একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে। কিছু একটা বোঝায় মাকে। সেদিন কিন্তু বাসবী নিজেকে সমর্পণ করল মায়ের কাছে। কোন তর্ক নয়, প্রশ্ন নয়, কিছু আর বাসবীর বলবার নেই।

আর আমি পারছি না মা। চাকরি করতে আর পারছি না।

বাসবী কাঁদল না বটে, কিন্তু কণ্ঠে তার কান্নার সুর।

মা একেবারে হতভম্ব। আজ আবার কি হ'ল? মেয়ে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছে। দু'চোখে সংগ্রামের দীপ্তি নেই, সারা শরীরে কেমন ভেঙে-পড়া ভাব। পরাজিত সৈনিকের মতন বাসবী ম্রিয়মান, বিধ্বস্ত।

কি, হ'ল কি তোর?

মা খুব কাছে এসে দাঁড়াল। বাসবীর শীতল সান্নিধ্যে।

তুমি ঠিকই বলতে মা, মেয়ে হওয়ার অনেক অসুবিধা, অনেক জ্বালা।

এবার মা চমকে উঠল। এসব কি কথা বলছে বাসবী। মেয়ে হওয়ার চরম জ্বালা সে বোধ বাসবীর এল কি করে? যদি পুঁথিপড়া বিদ্যা থেকে আওড়ে থাকে, তবু একটু সান্ত্বনা, কিন্তু এ বোধ যদি অভিজ্ঞতাপ্রসূত হয়, তা হ'লে কি হবে! কোথায় মুখ লুকাবে বাসবীর মা। বাসবীও এই কলঙ্কের পশরা মাথায় নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে!

কি সর্বনাশ হয়েছে বাসী, সব খুলে আমাকে বল।

মা হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সে চীৎকারে শুধু বাসবীই যে সচকিত হয়ে উঠল এমন নয়, পাশের ঘর থেকে খোকন আর রুবি এসে দাঁড়াল।

খোকন চুপচাপ করে রইল, কিন্তু মার কান্না দেখে রুবিও কেঁদে উঠল।

এতক্ষণ পরে বাসবী আত্মস্থ হ'ল। একি করছে সে? একটা মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষুর কাছে সংসার বাঁচাবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি এত দ্রুত এত সহজে ভাঙতে চলেছে। সামান্য একটু কুৎসার হাওয়ায় এভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছে। এর চেয়ে কত বড় ঢেউ, কত প্লাবন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, উন্মূলিত করার প্রয়াস করবে তার ঠিকানা নেই।

দু' হাতে মার দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বাসবী বলল, তোমার কি হয়েছে বল ত মা, এমন করছ কেন?

মার শীর্ণ দেহটা বাসবীর শরীরের ওপর আছড়ে পড়ল।

তুই আমার কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছিস বাসী। কি হয়েছে সত্যি করে বল?

এবার বাসবী কণ্ঠে রুক্ষতা আনল, কি হয়েছে কি যে লুকোব? তুমি অর্ধেকটা শুনেই ত কান্নাকাটি আরম্ভ করলে। নাও চোখ মোছ। বস এখানে।

মার চোখ মুছিয়ে বাসবী মাকে বারান্দায় বসিয়ে দিল।

তারপর রুবি আর খোকনের দিকে চেয়ে বলল, যাও, তোমরা পড় গে যাও। আমি মার সঙ্গে একটু কথা বলি।

রুবি আর খোকন পরস্পরের দিকে চাইতে চাইতে ভিতরে চলে গেল।

বাসবী মার পাশে বসল। পা মুড়ে।

অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, আজ খবর পেলাম ম্যানেজার বাইরে যায় নি, অসুস্থ হয়ে বাড়ীতে রয়েছে। অফিসের বড়বাবুর সঙ্গে ছুটির পরে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে অফিসের বড়বাবু ম্যানেজারের ওষুধ কিনতে বেরিয়ে গেল।

সর্বনাশ। মার তপ্ত নিশ্বাস বাসবীর দেহের ওপর আগুনের ঝলকের মতন মনে হ'ল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে মার দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে বাসবী বলল, কিছু সর্বনাশ নয় মা। সর্বনাশ এত সহজে হয় না। বাড়ীর মধ্যে চাকর-বেয়ারা সবাই ছিল। তারপর যখন বড়বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে আসছি রাস্তার ওপর বেলা দেবীর সঙ্গে দেখা।

বেলা দেবী! মা যেন কি একটা মনে করার চেষ্টা করল।

হ্যাঁ, ম্যানেজারের স্ত্রী। যার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কোন সম্পর্ক নেই।

তারপর। মার দু'চোখে উৎচীয়মান কৌতূহল। আমাকে দেখে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে হেসে উঠল।

বলে নি কিছু?

তখন বলে নি, পরে বলবে। আমার নামে চারদিকে কাদা ছিটিয়ে বেড়াবে। লোকে সত্যি-মিথ্যা যাচাই করবে না, সবকিছু উপভোগ করবে। তাই বলছিলাম মা, মেয়ে হওয়ার অনেক জ্বালা। পুরুষ হ'লে এসব প্রশ্নই উঠত না। এই যে বড়বাবু ম্যানেজারকে দেখতে গিয়েছিল, এ নিয়ে কোনদিন কোন কথা উঠবে?

মার চোখের একটি পলকও পড়ল না। একদৃষ্টে বাসবীর দিকে চেয়ে রইল।

কিছু অন্যায় বলে নি বাসবী। অপবাদের ভয় মেয়েদের জীবনে কম জ্বালা নয়। কেউ খুঁটিয়ে কিছু বিচার করবে না, সব ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতেও চাইবে না। মুখরোচক একটা ঘটনা কানে এলেই তারিয়ে তারিয়ে তার রসাস্বাদন করবে।

কিন্তু কি বলতে পারে বাসবীর নামে? কি অন্যায় সে করেছে? নাকি সব কথা মাকে বলছে না বাসবী। বলবার মতন কথাও বুঝি নয়। ম্যানেজারের সঙ্গে গোপন অভিসারের গন্ধ তার মাও পেয়েছে। বাসবীর চাল-চলন ধরন-ধারণ ভাল ঠেকে নি। এক সঙ্গে মোটরে যাওয়া-আসা, অফিসের কাজের ছুতোয় বাইরে কাটিয়ে আসা, একসঙ্গে পাশাপাশি বসে হোটেলে খাওয়া, এসব বুঝি একেবারেই দূষণীয় নয়।

কিছু দোষ না থাকলে হঠাৎ কেউ কিছু বলতে পারে?

মা কিন্তু মেয়ের সোজাসুজি এসব প্রশ্ন আলোচনা করল না। এসব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেও লাভ নেই। মেয়ে বিপদে পড়ে মার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে উদ্ধার করাই এখন একমাত্র কর্তব্য।

তা ছাড়া মেয়ের নামে অপবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে, সে অপবাদের ছিটে পরিবারের সকলের গায়েই লাগবে।

তাই মা অন্য কথা বলল।

তুই ত আর একলা ছিলি না ম্যানেজারের কাছে। তুই-ই ত বললি তার চাকর-বাকর সব ছিল।

ছিলই ত। বাসবী ঘাড় নাড়ল, কিন্তু সে সব কথা কে শুনছে, কে বুঝবে। এমন একটা কাহিনী সবাই উপভোগ করবে। বিশেষ করে মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু।

মা কিছুক্ষণ কিছু বলল না, তবে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাল না বাসবীর দিক থেকে। বাসবীর সারা দেহে দৃষ্টি বুলিয়ে বুঝি বাসবীর সত্যভাষণের মাত্রাটা নিরূপণ করার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ পরে বাসবী যখন সামনে উঠে ঘরের মধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে, তখন মা মৃদু গলায় বলল, তোদের অফিসের বড়বাবুই বা কেমন লোক। ম্যানেজারের বাড়ীতে লোকজন রয়েছে, সাত-তাড়াতাড়ি তার ওষুধ আনতে যাবার কি দরকার ছিল?

বাঃ, কাজ দেখাতে হবে না। নইলে ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র হতে পারবে কি করে? তার ওষুধ এনে দেবে, দরকার হলে বাজার করে দেবে, তবেই ত উন্নতি হবে। সত্যি বলছি মা, অফিসে ঘেন্না ধরে গেছে। এর চেয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হওয়া ঢের ভাল।

মা যেন একবার চমকে উঠল। এমন একটা ভয়ই মনের গোপনে এতদিন উঁকি দিচ্ছিল। হয়ত এমন দিন আসবে যখন নিজের সুখের জন্য সংসারকে, সংসারের অন্য মানুষদের অবহেলাভরে দূরে ফেলে দিয়ে বাসবী নিজের জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে।

কোথাও বুঝি বাসবী নীড় বাঁধবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এসব তারই পূর্বাভাস।

মার চোখের দিকে চোখ পড়তেই বাসবী বুঝতে পারল মা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এই সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে বাসবী নিজের নতুন সংসার গড়ে তোলবার দিকে মন দিয়েছে, এমন একটা ভয়ের ছায়া তার দু'টি চোখের তারায়।

বাসবী আবার কঠিন বাস্তবের মধ্যে ফিরে এল।

মার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, বিয়ে করলেই কি নিস্তার আছে মা। তখন ত শ্বশুরবাড়ীর সবাইয়ের মন যুগিয়ে চলতে হবে। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ।

মা আর কথা বাড়াল না। বাড়িয়ে লাভ নেই। এ মেয়ের হালচাল বোঝা তার ক্ষমতার বাইরে। কখন কোন্ দিকে হেলবে জানা দুষ্কর।

মা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে কেবল বলল, কিরে চা খাবি ত?

না মা, বাসবী ঘাড় নাড়ল, ম্যানেজারের বাড়ীতে এক পেট খেয়ে এসেছি। অফিসের পরে খিদেও পেয়েছিল খুব।

রাত্রে খাবি ত?

তা খাব। একটু রাত করে খাব।

নিজের ঘরে ঢুকে বাসবী দেখল বই সামনে নিয়ে খোকন আর রুবি চুপচাপ বসে আছে। চোখ দুটো তাদের বইয়ের পাতার ওপর একেবারেই নেই। দুজনেরই চোখে-মুখে শঙ্কার ছায়া।

অন্যদিনের মতন বাথরুমে না গিয়ে বাসবী তাদের পাশে গিয়ে বসল। দু'জনের পিঠে দুটো হাত রেখে বলল, তারপর কি রকম পড়াশোনা হচ্ছে বল?

খোকন চোখ তুলে একবার আড়চোখে দেখল। রুবি মুখই তুলল না।

ভাবছি, রোজ বিকালে তোদের নিয়ে বসব। একলা-একলা তোদের পড়তে বেশ অসুবিধা হয় বুঝতে পারি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে মা যখন আবার এ ঘরে এসে দাঁড়াল, দেখল বাসবী খোকনকে একটা ইংরাজী কবিতার মানে বোঝাচ্ছে। বাসবীর কোলের ওপর মাথা দিয়ে রুবি শুয়ে রয়েছে।

এই মেয়েকে মা চেনে। এর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এই ছোট্ট সংসারের আত্মা। আপদে-বিপদে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজেকে মন্থন করে যেটুকু অমৃত সংগৃহীত হচ্ছে, সেটাই পাত্র ভরে সংসারের আর সকলের মুখের কাছে ধরছে।

আজ বলে নয়, চিরদিনই বাসবী এমনই। বাড়ীর মানুষটা বেঁচে থাকবার সময় থাকতেই। বাসবীকে নিয়ে কোনদিন মাকে ভুগতে হয় নি, তার জন্য কোন অশান্তির সৃষ্টি নয়।

আজকাল বাসবী সংসারের গণ্ডীর বাইরে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। সংসারেরই প্রয়োজনে। পুরোণো দিনের ছবিটার সঙ্গে মিল যেন ক্রমেই কমে আসছে।

মা নিরুপায়। একদিকে সংসার, আর একদিকে বাসবী। একটাকে বাঁচাতে আর একটাকে ছাড়তে হয়।

পরের দিন বাসবী একটু ভয়ে ভয়েই অফিসে গেল।

আগের দিন ভেবেছিল যেমন করেই হোক বেলা দেবীর সঙ্গে দেখা করবে। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার আচরণের কৈফিয়ৎ চাইবে। অন্তত বাসবীর নাম ছড়িয়ে কুৎসা রটাবার কৈফিয়ৎ।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, অযথা আলোড়ন সৃষ্টি করা ক্ষতিকরই হবে। বেলা দেবী যদি বোঝে যে কুৎসা প্রচারে কাজ হয়েছে, ঘায়েল হয়েছে বাসবী, তা হলে আরও দ্বিগুণ উদ্যমে এ কাজ করে যাবে।

বাসবী তার মুখোমুখি দাঁড়ালে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে, বেলা দেবী অন্তত যে সে ধাতের মেয়ে নয়, এটুকু বাসবী ভাল করেই জানে।

বরং চুপ করে থাকলে, অপবাদের ধুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে, বেলা দেবী হয়ত থেমে যেতে পারে।

অফিসে গিয়ে বাসবী নিজের কামরায় না ঢুকে একেবারে নিশিবাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

নিশিবাবু ঘাড় হেঁট করে কি লিখছিল, মুখ না তুলেই বলল, বলবেন কিছু?

আপনার কাছে মাপ চাইতে এলাম।

মাপ? এবার নিশিবাবু কলম থামিয়ে মুখ তুলে দেখল।

হ্যাঁ, কালকের ব্যাপারের জন্য।

আরে সেকথা আবার আপনি মনে করে রেখেছেন? শরীর খারাপ থাকলে মেজাজ কখনও স্ববশে থাকে? যান, আপনি বসুন গিয়ে। আমি এখনই যাচ্ছি আপনার কাছে। গোটা দুয়েক ফাইল দেখা দরকার।

বাসবী নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল। ম্যানেজার নেই, ম্যানেজিং ডিরেক্টরও এখনও যোগ দেন নি, কাজেই সারা অফিসে একটা শ্লথ ভাব। খুব দরকারি কাজগুলোই শুধু সবাই করে যাচ্ছে। বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেন্টেরা সই করছে। তাড়া দেবার কোন লোক নেই।

বাসবী চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। বেশীক্ষণ অবশ্য এ ভাবে বসা চলবে না। কাজের ভান করতে হবে। এখনই নিশিবাবু ঘরে এসে ঢুকবে।

এই এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। লোকটা অফিসের কারো সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা করে না। নিজের মনে কাজ করে যায়। কর্তাদের মোসায়েবী করে। একেবারে জাত-কেরাণী। অস্থি-মজ্জায় মেদে-শোণিতে দাসত্বের ভাব।

লোকটাকে বাসবীর ভাল লাগে না। কোনদিন লাগে নি। তার আপাত-অমায়িক মুখের চেহারার অন্তরালে একটা খল, কুটিল চরিত্র বাস করছে। যে চরিত্র মানুষের সর্বনাশে আনন্দ পায়।

ক্যাবিনেট খুলে কয়েকটা ফাইল বের করে বাসবী ইতস্তত ছড়িয়ে রাখল। কতকগুলো চিঠি টেবিলের উপর চাপা দেওয়া ছিল। সেগুলো খুলে বসল।

কাজ করবে না ভেবেছিল, একটু বিশ্রাম নেবে, কিন্তু নিজের অজানিতেই কাজের সমুদ্রে বাসবী ডুব দিল।

ক্রমশঃ

আমার এ পথ

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

'আমার এ পথ'—জীবনের ঘটনাবলীর স্মৃতি কথা। অনিবার্য কারণে অনেক জায়গায় নাম ধাম বদলাতে হয়েছে তবে মূল চরিত্র যাতে বিকৃত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

যা' সবার কাছে বলা যায় আর যা' সবার কাছে বলা যায় না, তার মাপকাঠি ঠিক রাখা খুবই মুস্কিল। কৃতকার্য হতে পেরেছি কিনা জানিনে। লেখার মধ্যে কাউকে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তা ইচ্ছাকৃত নয়, সে কথা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি॥

উপক্রমণিকা

আমার কাজ রঙ আর মাটি নিয়ে—বলতে গেলে এক রকম খেলাই! খেলাও শিখতে হয়। শিখেছিলাম শান্তিনিকেতনে। সে সব কথা এখন থাক। আরম্ভ করি শেখাবার, অর্থাৎ মাষ্টারী জীবন থেকে। এও ত' শেখাই বলতে গেলে!

শেখাবার কাজ, নিজের ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, ছুটির সময় প্রদর্শনী করে বেড়ানো···সময় কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যায় তার হিসেব রাখা বড় একটা হয়ে ওঠে না। অথচ সময় যে নেই তাও নয়। সারা দিনের মধ্যে বহু সময় অযথা নষ্ট হয়ে যায়। পরচর্চা এবং আলস্যে যে সময় কাটাই না তাও নয়। সুতরাং চলতি-পথে পিছন ফিরে জীবনের অভিজ্ঞতা, দেনা-পাওনার হিসেব দিনান্তে মাঝে মাঝে করি বটে, কিন্তু তা মনের মুকুরে ক্রমে ক্রমে আবছা হয়ে যায়। বেশ বুঝতে পারি এও একটা বেশ মস্ত বড় ক্ষতি। শিল্পীদের স্কেচ-বইয়ে কত রকমের ছোটখাটো স্কেচ থাকে; সেগুলো উল্টে-পাল্টে যখন দেখা যায়, তখন কত কথাই না মনে পড়ে! স্কেচগুলো চোখের সামনে ধরলেই বহু পুরাণো জায়গার কথা বা স্মৃতি, পুরাণো চেনা লোকের স্মৃতি আবার জেগে ওঠে মনের মধ্যে। ডায়েরী লেখাও এক রকম তাই। স্কেচ করারই মত। অতীতকে ধরে রাখার একটা প্রশস্ত উপায়। অথচ ক'জনই ডায়েরী লেখে! এমনি করে জীবনের কত টুকুরো ছবি বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যায়! আর তাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

শিল্পীর পক্ষে স্কেচ-বই ছাড়া ঘুরে বেড়ানো যে কত ক্ষতিকর তা বলা যায় না। আমার শিক্ষাগুরু শিল্পী নন্দলাল বসুর মুখে শোনা একটি গল্প বলি। একজন জাপানী শিল্পী, স্কেচ-বই না নিয়ে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ একটি গাছের আঁকাবাঁকা ডাল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে বহুক্ষণ গাছটিকে দেখে মনে রাখবার চেষ্টা করল; কিন্তু মনে রাখা মুস্কিল মনে হওয়াতে, নিজের বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বার বার অদৃশ্য রেখা টানতে টানতে সমস্ত পথ হেঁটে বাড়ী ফিরে তাড়াতাড়ি কাগজে সেটা এঁকে তবে সে শান্ত হ'ল * এই যে মনের মুকুরে সব জিনিষ ধরে রাখা সম্ভব নয়,—সেই জন্যেই স্কেচ-বই! সেই জন্যই ডায়েরী লেখা!

ডুন স্কুলের একটি ইংরেজ শিক্ষক Mr. Holdworth অক্সফোর্ডের ক্রিকেটের এবং ফুটবলের 'ব্লু' একদিন একটি ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেলেন যে, কর্মী লোক কখনও সময়ের অজুহাত দেয় না। দিনের চব্বিশ ঘণ্টা এমন ভাবে প্ল্যান করে সে কাজ করে যে, শোবার, খাবার, গল্প করবার, কাজ করবার, চিঠির জবাব দেবার—টুকি-টাকি সব কাজ করবারই সে সময় পায়। কথটা খুব সত্যি, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও তাঁর কর্ম জীবনে তা দেখিয়েছেন। গান্ধীজি, তাঁর জীবনেও তার পরিচয় দিয়েছেন;—অবশ্য এঁরা

* গল্পটি অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ে আছে। নন্দবাবুর মুখে আমি শুনি অনেক আগে।

হলেন মহাত্মালোক। আমি প্রফেসার অমরনাথ ঝা'র কথা জানি। তাঁকে চিঠি লিখলে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে জবাব পাওয়া যেত। হাজার কাজের মধ্যেও সবাইকে নিজের হাতে চিঠির উত্তর দিতে তাঁর সময়ের অভাব হ'ত না। যে কাজ তাঁকে দিয়ে সম্ভব, কখনও তিনি তা ফেলে রাখতেন না। অথচ, তাঁকে সভার সভাপতিত্ব, বন্ধুদের নিয়ে চা-পার্টি ও ডিনারে হাসি-তামাশাও ক'তে দেখা যেত,—নিজের পড়াশুনা এবং কাজও সব ঠিক মত করতে হ'ত। পণ্ডিত নেহরুও না কি সেই জাতের লোক। জেলে গিয়েও তিনি সময় নষ্ট করেন নি। তাঁর বেশীর ভাগ বই তিনি জেলে বসেই লিখেছেন।

জেলে যাবার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু জেলে না গিয়েও অনেক লোককে জেল-যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়। আমার মনে হয়, কাজের লোক যখন কাজ করার সুযোগ পায় না, তখনই তার সত্যিকারের জেল। কাজ করতে যাঁরা আমোদ পান,—কাজ করতেই তাঁদের মুক্তি ও ছুটির সমান আনন্দ। কিন্তু একথাও সত্যি, কাজের মধ্যে সব সময় ডায়েরী লেখার মত 'অকাজ' হয়ে ওঠে না।

ডুন স্কুলের চাকরি! বছরে দু'বার ছুটি। শীতের সময় দেড় মাস,—গরমের আড়াই মাস। এ ছাড়া ছুটকো ছুটি বিশেষ নেই। থাকলেও সে সময় ডিউটিতে থাকতে হয়;—অর্থাৎ ছেলেদের নিয়ে কোথাও এক্সকারশানে যাওয়া—বছরে অন্ততঃ দু'চার বার—তিন-চার দিনের জন্য মাত্র।

১৯৫৩ সালে শীতের ছুটি আরম্ভ হবার কিছু আগেই দিল্লীতে ছবির প্রদর্শনী করবো ব'লে দিল্লী গেলাম! সেখানে প্রদর্শনী আরম্ভ হ'ল। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করলেন শ্রীঅনিল চন্দ। তিনি তখন দিল্লীতে ডেপুটি মিনিষ্টর। কয়েকখানা ছবি বিক্রীও হ'ল। দিল্লী থেকে দেরাদুন ফিরেই কলকাতা যাবার কথা। সেখানে বেড়িয়ে ও কাছাকাছি নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াবার প্ল্যান ছিল। কিন্তু কে জানত এমন একটা অঘটন ঘটবে!

—দেরাদুন থেকে কলকাতা যাচ্ছি ছেলেদের সঙ্গে একই ট্রেণে। ছুটি সবে সুরু হ'য়েছে। লাকসার স্টেশনে আমাদের স্পেশাল ট্রেণটা অনেকক্ষণ দাঁড়াবার কথা। তখন রাত হয়েছে, ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কয়েকটি ছেলের জ্যোৎস্না রাতে বেড়াবার সখ হ'ল। তাদের সঙ্গে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের পথে। গরুর গাড়ি চলা গ্রাম্যে মেঠো পথে বেড়ানো খুব কবিত্বময় সন্দেহ নেই; কিন্তু রাস্তার গর্তে পা মচ্‌কে হাড় ভেঙে ছেলেদের কাঁধে ভর দিয়ে ট্রেণে ফিরে আসাটা মোটেই সুখের হ'ল না। ছুটিতে বেড়াবার প্ল্যান সব ভেস্তে গেল। কলকাতা পৌঁছে পা এক্স্‌রে করা—তারপর ডাক্তারের কাছে পায়ে প্লাষ্টার লাগিয়ে 'নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিছু' হয়ে তেতলার ঘরের কোনে বসে থাকাটা খুব লোভনীয় কিছু নয়। এই পরিস্থিতিতে খাতা নিয়ে কিছু লিখতে বসা ছাড়া আর কিছুতেই ছুটির আনন্দ ভোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব মনে হ'ল না। ভাবলাম যতদিন এমনিভাবে পড়ে থাকতে হবে একা, ততদিন রঙ তুলি দিয়ে, নয় কালি-কলমে চিত্রাবলী লিখে ফেলতে পারলে মন্দ হবে না। এ একটা সুযোগ বৈকি! ঠিক ডায়েরী বলা একে চলে না। লাভ-লোকসানের অঙ্ক কষা আমার উদ্দেশ্য নয়। কি পেয়েছি, কি পাই নি—তাও যাচাই করে দেখতে চাই না। এ কেবল পিছন ফিরে দেখা—একটু আনন্দ পাওয়া। ডায়েরীর সজীবতা এতে নেই। কিন্তু এতে আছে অতীত থেকে খুঁজে বের করা নানান রঙের চিত্রাবলী।

'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—'

মানুষ ভাবে এক—হয় আর এক রকম। এ কিছু নতুন কথা নয়। মানুষ ভাবে যে রকম, সেই রকমটিই যখন ঘটে তখন আমরা ততটা আশ্চর্য হই না। যা ভাবতে পারি নি বা ভাবতে চাই না তাই যখন ঘটে যায় তখনই আমরা সজাগ হয়ে উঠি! আমি ছোটবেলা থেকেই চিত্রকরের কাজ বেছে নিতে চেয়েছিলাম। বাধা-বিঘ্ন অনেক ছিল; কিন্তু তবু চিত্রকরের কাজ নিয়েই আছি, সুতরাং এতে ভাববার কিছু নেই। আমি অন্যান্য সবার মতই বিয়ে করে সংসারী হ'তে চেয়েছিলাম। বিয়েও করলাম নিজের পছন্দে। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ও পরিপূর্ণতায় খানিকটা রশ্মিপাত হয়েছে আমার জীবনে। স্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে বিবাহিত জীবনের অবসান ঘটলেও—বিবাহিত জীবনকে যারা 'দিল্লীকা লাড্ডু', যো খায়া সো পস্তায়া, যে নেহী খায়া সো ভি পস্তায়া বলে তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দেবার মত মনে করি না। পস্তাবার কোন কথাই এতে ওঠে না। কারণ 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা'—সব কিছু, সে ক্ষণিকের জন্যই হোক না কেন—সব মিলিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ করে তোলে—সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে। সব কিছুরই দরকার।

পিতার দায়িত্ব থেকেও আমি বঞ্চিত নই। সুতরাং

একটি জীবনের সম্পূর্ণতার জন্য যা দরকার তা সবই প্রায় আমার জীবনে ঘটেছে। সুতরাং পস্তাবার কোন কারণ কিছুই আমার নাই। কি পেলাম না, তা নিয়ে দুঃখ-বিলাপ আমার নেই। পেয়েছি অনেক। কিন্তু পাওয়ার শেষ নেই জেনেও, পর্য্যাপ্ত না-পাওয়ার দুঃখ মনে রেখাপাত করে না। মানুষের জীবনে এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসে যখন সে সুখ বা দুঃখ সমান আদরে গ্রহণ করবার ক্ষমতা পায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক পেয়েছেন। স্বীকার করেও লিখেছেন তাঁর—"দীনদশা ঘুচিল না ঘুচিল না" —আরও তাঁর চাই। কিন্তু কি চেয়েছেন?—"তোমারে না বোলে আমি ফিরিব না, ফিরিব না"—এই 'তুমি'-কে নিত্য-নতুন করে পাবার জন্য তিনি তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে হারাতেও রাজি! তাঁকে খোঁজার আনন্দও বড় কম নয়!

টুকু বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে যে, স্কুলে ঢোকাই তখন সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হয়েছিল আমার পক্ষে। ঈশ্বরে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা একেই বলেন 'ঈশ্বরের অদৃশ্য নির্দ্দেশ।' স্কুলের কাজে ঢোকা ছাড়া আমার অন্য কোথাও গতি হ'ত না।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম—ছাত্র ভাবে দিন কেটেছিল একরকম ভালই। তার পর আসল বাস্তবের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়ের পালা। ঘুরে-ফিরে দেখলাম অনেক, কিন্তু অনেক রইল বাকী! যত ঘুরি, ততই বুঝি শেখার শেষ নেই। যত শিখি, ততই জেনে সেই শেখার রাজ্যটা বড় হয়ে যায়···

ঘুরতে ঘুরতে বম্বে সহরে পৌঁছেছিলাম। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে ক্লান্ত। একদিন খবরের কাগজে দেখলাম, গোয়ালিয়রে একজন চিত্রকর চায়।

দেরাদুনে আমি যেখানে ২০ বছর বাস করেছিলাম

ঈশ্বরের অদৃশ্য নির্দ্দেশ

শিল্পী হবার জন্য একদিন স্কুল পালিয়েছিলাম। কিন্তু তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম ভবিষ্যতে আমাকে সেই স্কুলে এসেই ঢুকতে হবে এবং জীবনের বেশীর ভাগ সময় স্কুলের ভেতর ছেলেদের সঙ্গে কাটাতে হবে! কিন্তু একে অদৃষ্টের পরিহাস বলে উড়িয়ে দিতেও পারি না। যে সময় স্কুলের মাষ্টার হয়ে আবার স্কুলে ঢুকেছিলাম, সেই সময় একটুখানি ব্যাপারটা 'অদৃষ্টের পরিহাস' মনে হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পর নানান রকম ঘাতপ্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে এসে এই-

গোয়ালিয়র দুর্গের ভেতর সর্দ্দার ও জায়গীরদারদের শিক্ষার জন্য একটা স্কুল ছিল। Mr. Pearce (পিয়ার্স) তখন সেই স্কুলটির প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি বহু কষ্টে স্কুলটিকে 'পাব্লিক স্কুলে' পরিণত করেন। বিলাতী 'ইটন' বা 'হ্যারো' জাতীয় পাব্লিক স্কুল আমাদের ছিল না। তার প্রথম সূত্রপাত করলেন মিঃ পিয়ার্স। গোয়ালিয়রের সর্দ্দার স্কুলটার নাম বদলে দিলেন। সিন্ধিয়া স্কুল বলে সেটা পরিচিত হ'ল। সর্দ্দার জায়গীরদারদের ছেলেরা ছাড়াও যে কেউ স্কুলটিতে ছেলে পাঠাতে পারবে, সেই রকম ব্যবস্থা হ'ল। সাধারণ

ড্রইং মাষ্টার তুলে দিয়ে তিনি শিল্পী (আর্ট মাষ্টার) রাখতে চাচ্ছিলেন, সেই কারণেই আমার ডাক পড়ল গোয়ালিয়রে। দরখাস্ত আমি করেছিলাম। ইণ্টারভিউর ডাক এল যখন,—মাথায় বাজ পড়ল! এত টাকা খরচ করে যেতে হবে গোয়ালিয়রে!

গোয়ালিয়রে কাজের ইণ্টারভিউ

দু'টি ছবি একটি মূর্ত্তি বিক্রী করে তিনশ' টাকা পকেটে এসে গেল হঠাৎই। একেই বলে কপাল! ভাবলাম, চাকরিটা পাই না পাই, গোয়ালিয়রে ঘুরে আসায় ক্ষতি কি। গেলাম সোজা গোয়ালিয়র। স্কুলে তখন ছুটি। মি. পিয়ার্স ছিলেন দুর্গের উপর সিন্ধিয়া স্কুলে। আমি উঠেছিলাম একটি হোটেলে। পিয়ার্স সাহেব এলেন এই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে; যেন আমিই চাকরি-দেনেওয়ালা। অনেক কথাবার্ত্তার পরও মনস্থির করতে পারলাম না। ওঁকে বললাম, বোম্বাই ফিরে গিয়ে জানাব মাষ্টার হ'তে রাজি আছি কি না। বোম্বাই ফিরে গিয়ে বুঝলাম, সহরের গোলমাল ছেড়ে গোয়ালিয়র দুর্গের উপর কিছুকাল নির্জ্জনবাসের আমার খুব দরকার। ভাঙা মন্দির, পুরোণ বাঁধান ঘাট, পাথরের ভাঙা মূর্ত্তি—যেখানে সেখানে পড়ে আছে। লোকগুলোর মাথায় অদ্ভুত টুপী···ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম করে—এ যেন এক অন্য রাজ্য! বাঙালী আমি, বোম্বাই সহরে টেঁকা আমার দায় হয়ে উঠেছিল। তার উপর ছিলাম কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে। কেউ কেউ আমায় 'কমরেড' বলে ডাকত। সুতরাং পুলিশ-গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ নজর আমার উপর ছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম বোম্বাই সহর থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে সারা জীবন ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরের নজরবন্দী হয়ে থাকবার সম্ভাবনা আছে। গোয়ালিয়রের চাকরিটি স্বর্ণ-সুযোগ। রাজী হয়ে লিখে দিলাম চিঠি। ১৯৩৪ সালে স্কুল মাষ্টার পদে নিজেকে অভিষিক্ত করলাম।

মাষ্টারী-জীবনের সুরু

পরীক্ষা পাশ করলাম না, অথচ মাষ্টার হয়ে বসলাম। আঁকা আর মূর্ত্তি গড়ায় আমার মন, আমার মন বাঁশী বাজানতে। রবীন্দ্রনাথের গান শান্তিনিকেতন থাকতে শিখেছিলাম। শান্তিনিকেতনে যাবার আগেও আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চ্চা ছিল। অবশ্য ওস্তাদী গানের নয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত, ব্রহ্ম-সঙ্গীত। মাষ্টারী করতে যে সব গুণ দরকার তা আমার সব ছিল না। বই পড়া বিদ্যেটাকে কোন দিন শ্রদ্ধা করি নি। শিল্পী বা কবি বলতে সর্ব্ব-সাধারণের যা ধারণা; বড় চুল, ভাবে ভরা চোখ, খাওয়া-পড়ার সময়ের ঠিক নেই, বেয়াড়া জীবনযাপন—এ সমস্তই
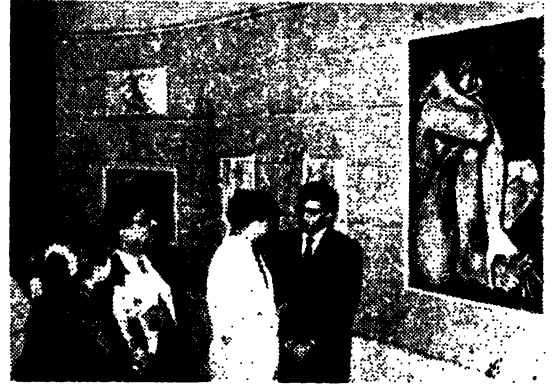
আর্টগ্যালারি বোম্বাই ১৯৬২

আমার অজানা ছিল না। সেই জন্যেই মনে-প্রাণে চেষ্টা করতাম যাতে লোকে আমায় 'কাছা-খোলা' চিত্রকরের দলে ফেলে। শিল্পী হ'তে গেলে যে সব গুণ দরকার, তার মধ্যে একটা হচ্ছে চোখ খুলে চলা, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যথার্থ পরিচিত হওয়া, তার সঙ্গে সময় বিশেষে একেবারে একসঙ্গে মিশে যাওয়া এবং তাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা। চোখে দেখে শেখা, কাণে শুনে শেখা—এ একেবারে চরম শেখা। সেই শেখাই সামান্য কিছু আমার পুঁজি এবং তাই নিয়েই সাহসে ভর দিয়ে 'মাষ্টারজী' হয়ে বসলাম গোয়ালিয়রে।

প্রথম ভারতীয় পাব্‌লিক স্কুল

শান্তিনিকেতনে ছিলাম, সুতরাং বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রজীবন কেমন, সে ধারণা আমার ছিল। গোয়ালিয়র দুর্গের উপর একশ' ছোট-বড় ছাত্র নিয়ে মাষ্টাররা বিলেতী পাব্‌লিক স্কুলের অনুকরণে না হ'লেও সেই ধরনে শিক্ষার সুরু করল। আমার চোখে অনেক কিছু অদ্ভুত লাগত। ছেলেগুলো 'মাষ্টারজী' বলতে অজ্ঞান। দেখা হলেই জোড়-হাত করে বলে 'মাষ্টারজী'। শিগ্‌গীরই অভ্যাস হয়ে গেল, মনে মনে স্বীকার করে নিতেই হ'ল আমি 'মাষ্টার'।

পাব্‌লিক স্কুল বলতে যা বোঝায় তা গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া স্কুলে থাকতে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। বড়লোক ছেলেদের জন্য বোর্ডিং স্কুল আর কি! খেলা-

ধুলার নানান রকম বন্দোবস্ত, সকাল-বিকাল ঘোড়ায় চড়া শিখবার ব্যবস্থা, সময়মত ঘণ্টা—খাবার সময়, স্কুলের সময়।

খেলার সময় হাফপ্যান্ট-সার্ট, স্কুলের সময় পাগড়ি আচ্‌কান, চুড়িদার পাজামা, ঘোড়ায় চড়ার সময় যোধপুর ব্রিচেস্‌। খেলার মাঠে মাষ্টারদের পালা করে তদারক। বোর্ডিংএ স্টাডির সময় মাষ্টারদের ডিউটি দেওয়া। 'হাউস্‌ মাষ্টার'—অর্থাৎ কি না হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বোর্ডিংএর কাজ তদারক করেন। প্রত্যেক হোষ্টেলে একজন করে মহিলা 'মেট্রন'—এঁরা দৃষ্টি রাখেন ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়ের উপর। শনিবার হাফ ছুটি। ছেলেরা খেলা নিয়ে মাতে। ছবি আঁকা বা মূর্ত্তি গড়ার উৎসাহে কেউ কেউ সময় পেলেই আঁকতে বা গড়তে আসে শিল্প বিভাগে। কেউ ছুতোরের কাজ করতে যায় কারখানায়। কেউ বাগানে। মাষ্টারদের মিটিং হয় মাঝে মাঝে। মুখ গম্ভীর করে মাষ্টারী চালে মিটিং করি। মোট কথা, শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলাম, সেখানেও ঘণ্টা পড়ত, সেখানেও কাপ্তেনগিরি করত ছেলেরা, মাষ্টাররা থাকতেন ছেলেদের সঙ্গে। খেলাধুলা সেখানেও হত, পড়াশুনোও হ'ত; তবে স্কুলের ঘরে নয়, গাছের ছায়ায়। সেখানেও ঘরের নাম ছিল, যেমন বীথিকা ঘর, শমীন্দ্র কুটির ইত্যাদি। গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া স্কুলও দেখি তাই। পাব্‌লিক স্কুল তবে আর নতুন কি। গুরুদেব সে সব বহুকাল আগেই চালিয়ে দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। শত শত বছর আগেও নালন্দায়ও এইরকম ধরনেরই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

মহারাজের সঙ্গে প্রথম মোলাকাত্‌

ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়ার কাজ জোর চালালাম। যে ছেলেটা পারে না কিছু—তাকেও এঁকে দেই, সে মহা খুসী। যা এঁকে দেই সেটাকেই খানিকটা পেন্সিল রবার ঘষে নষ্ট করে, মনে নেয় সেটা যেন তারই নিজের আঁকা ছবি। এমনি করেই দু'চার জন ক্রমে ক্রমে সত্যি সত্যিই শিখল অল্পসল্প আঁকতে। দেখতে দেখতে সারা গোয়ালিয়রে রটে গেল সিন্ধিয়া স্কুলের খ্যাতি! একেবারে জয়জয়কার! মহারাজা আসবেন স্কুল দেখতে। রাস্তায় জল ঢালা, দরজা-জানালা ঘষা-মাজা, সারা স্কুল পরিষ্কার আর সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারদের মধ্যেও ধূম পড়ে গেল। পরিষ্কার জামাকাপড়, বিলিতি স্যুট বা আচকান, মাথায় মস্ত বড় বড় সাফা বা পাগড়ি। মোটর এসে দাঁড়াতেই সব তাল ঠুকে মুজরে—অর্থাৎ নীচু হয়ে তিনবার সেলাম। আমি ত "Your Highness" বলতেই ভুলে গেলাম। পরে কি আপশোষ।

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্‌ না

এমনি করেই কাটল বছর দেড়েক। নির্জ্জন গোয়ালিয়র দুর্গের উপর আর মন টেঁকে না। মিঃ পিয়ার্সের ভারতীয় স্ত্রী শ্রীমতী অনুসূয়া দেবী। তাঁদের তখন দু'টি যমজ ছেলে। বয়স বছর তিনেক। তাদের নিয়ে খেলি। টেনিস খেলি মাঝে মাঝে। খেলার পর পিয়ার্স পরিবার বা অন্য কয়েকজন মাষ্টারের সঙ্গে গোয়ালিয়র দুর্গের ভেতরই তেলী মন্দির, শাস-বহু মন্দির, মানসিংহের প্যালেস ঘুরে বেড়াই। দুর্গের প্যারাপেটে গিয়ে বসি। মন চলে যায় কোথায় কে জানে। হঠাৎ অনুসূয়া দেবীর দৃষ্টি হয়ত আমার দিকে পড়ে। বলে বসেন: "কে সে ভাগ্যবতী? কাকে ভাবছ?"

লজ্জিত হয়ে অস্বীকার করে বলি: 'কেউ নয়! ভাবছি, এমনি করে চলবে আর কত দিন?'

উনি আশ্চর্য্য হয়ে বলেন: 'কি তোমার বুঝি এখানে আর ভাল লাগছে না?'—স্বামী-স্ত্রীতে ওমনি কথা সুরু হয়: "ওকে একটু ভাল জায়গায় থাকতে দাও। ওর বোধ হয় থাকবার কোয়ার্টারটা পছন্দ নয়। ওখানে খাবার সুবিধা না হ'লে আমাদের বাড়ী এসে খেলেই ত হয়। আমরা কিন্তু নিরামিষ খাই! মাছ-মাংস না পেলে বাঙালী—ওর চলবে কি?"

পিয়ার্স সাহেব মৃদু মৃদু হাসেন: তা নয় অনু, ওর আসলে একটি 'লাইফ-পার্টনার' দরকার; তবেই সব ঠিক হয়ে যায়। গোয়ালিয়র ফোর্ট আইডিয়েল জায়গা—হনিমুনের!"

অনুসূয়া দেবী হাসেন: "তা ঠিক। আচ্ছা, বাঁশীটা আন নি কেন আজ? আচ্ছা, বাঁশী না হয় নাই বাজালে, একটা টাগোরের গান হয়ে যাক—সেই 'একলা চালায় বসি'টা—বেশ সুরটা!"

সন্ধ্যার অন্ধকারে অবাঙালী শ্রোতাদের মাঝে প্যারাপেটে বসে গান ধরি—'কবে তুমি আসবে বলে রইবো না বসে, আমি চলব'...

চাঁদ ওঠে আকাশে। প্যারাপেট থেকে দুর্গের নীচে রাজার বাড়ীর হাজার আলো জ্বলে ওঠে। সেই দিকে তাকিয়ে আবার মনে হয়—"এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্‌ না"—

প্যালেসের মূর্ত্তি

সর্দ্দার, খুব বড় সর্দ্দার! তখন তিনি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী। খুব বিলাসপ্রিয়। বড় বাড়ী, বড় গাড়ি, বড় কথা, সব কাজই তার বড় বড়। তিনি আসতেন মাঝে মাঝে সিন্ধিয়া স্কুলে। আমার কাজও দেখতেন। একদিন দুপুরে ছেলেদের নিয়ে কাজে ব্যস্ত, হঠাৎ তলব পড়ল—"তসবীর মাষ্টারজী কো বোলাও তুরন্ত"—প্যালেস থেকে টেলিফোন এসেছে। "কাম হ্যয়"—চাপরাশী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে খবর দিল। যারা শুনল প্যালেস থেকে আমার ডাক এসেছে তারাই অবাক! কেউ খুসী, কেউ আবার একটু হিংসে করতে লাগল। কেউ বলল, আমার নাকি কপাল খুলে গেল।

গোয়ালিয়র দুর্গের ওপর থেকে প্যালেস যাওয়া সোজা কথা নয়। হেঁটে দুর্গের গেট পর্য্যন্ত নামতে লাগবে আধ ঘণ্টা, তার পর টাঙ্গা নিয়ে প্যালেস যেতে আরও মিনিট কুড়ি! আবার টাঙ্গা পেলে হয়! তার ওপর মনে পড়ল খালি মাথায় প্যালেসে ঢুকতে দেয় না। সাফা, পাগড়ি বা টুপী চাই। পড়লাম মহা মুস্কিলে! টেলিফোনে জানালাম, "তুরন্ত প্যালেস যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিলে তুরন্ত যেতে পারি।" অন্যান্য মাষ্টাররা বলল: "কি বোকা লোকটা! প্যালেস থেকে ডেকেছে —যা তাড়াতাড়ি! না তার গাড়ি চাই! এমন না হলে ছবি আঁকে!"

দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড একখানা মোটর দুর্গের ওপর এসে আমার খোঁজে হর্ণ দিতে লাগল। সবার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে প্যালেসে রওনা হওয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক প্যালেসের অফিসে বসিয়ে রাখল। নানান রকম লোকের নানান প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ল। তার পর প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিস থেকে ডাক পড়ল। এতক্ষণ বসে থেকে থেকে মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল। শুনলাম, ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। মহারাজের বাগানের একটি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তির রং চটেছে। আমাকে দিয়ে সেটা সাফ করবার ব্যবস্থা হতে পারে কি না। আত্মসম্মানে ঘা লাগল। রক্ত এমনিতেই গরম, আরও গরম হয়ে উঠল। বললাম—"ও কাজ আমার নয়। নিজের তৈরী মূর্ত্তি ছাড়া, অন্যের তৈরী কাজে আমি হাত লাগাই না।" সর্দ্দার সাহেব অমন সোজা উত্তর পেয়ে অবশ্য খুসী হলেন না: কিন্তু আমি অটল রইলাম। চলে আসবার সময় বললেন; "আমার ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে দু'দিন করে আঁকা শেখাতে পারবে?"

বললাম—"যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করে দিলে আপত্তি নেই।"

মোটর গাড়ি সপ্তাহে দু'দিন আসতে লাগল। সর্দ্দার সাহেবের দশ-এগার বছরের মেয়েকে আঁকা শেখাতে আরম্ভ করলাম। সর্দ্দার সাহেবের উঁচু গোঁফ, কপালে রক্ততিলকওয়ালা একটা মূর্ত্তিও গড়েছিলাম সেই সময়।

জেনারেল থিমায়া (১৯৪৮)

মিস্ পামার

মিস্ পামারের স্নেহ পেয়েছিলাম। ভাল খাবার বাড়ীতে হলেই তাতে আমার ভাগ ছিল। পাঠিয়ে দিতেন, নয়ত আমায় ডেকে পাঠাতেন। মাষ্টারীও করতেন সুবিধে পেলে আমার ওপর। ইংরেজী উচ্চারণ যদি আমার অদ্ভুত রকম হ'ত তখনই সেটা ঠিক করে দিতেন। কোথাও পিক্‌নিক্ করবার ইচ্ছে হলে আমায় ছাড়া কখনও হ'ত না। তাঁর ছোট মোটর ছিল একটি। সেটাতে কত বেড়িয়েছি তার ঠিক নেই। কখনও শিউপুরী—কখনও আগ্রা। ওঁরই উৎসাহে একটি মূর্ত্তির অর্ডার পাই। ফটো দেখে মূর্ত্তি গড়ে সেই আমার প্রথম উপার্জ্জন। পাঁচশ' টাকা পেয়েছিলাম মূর্ত্তিটির জন্য। স্কুলে যদি অন্য কোনও মাষ্টারের সঙ্গে আমার বাকবিতণ্ডা হ'ত, তবে মিস্ পামার সর্ব্বদা আমায় নানান রকম ভাবে শান্ত করতে চেষ্টা করতেন। হঠাৎ উৎসাহের চোটে আমি একটি মোটর সাইকেল, পুরোন রেসিং

মডেলের, কিনে ফেলি। মিস পামারের সে কি আপত্তি। এই নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হ'ত। মোটর সাইকেলের শব্দে তাঁর কানে তালা লাগে। তাঁর কাজের ও পড়ার ক্ষতি হয়। যখন-তখন আমি প্রচণ্ড শব্দ করে সাইকেলে স্টার্ট দেই সেটা মোটেই সুখের নয়—এই সব বলতেন। তারপর একদিন মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়ে গেল—অল্পের ওপর দিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। মিস পামার সেই দিন বললেন, ঠিক এই ভয়টাই তিনি করছিলেন। দু'চক্ষে দেখতে পারেন না তিনি দু'চাকার ফট্‌ফট্ করা ঐ অদ্ভুত সাইকেল! ওগুলো মানুষ-মারা কল! দাও ওটাকে ফেলে, না হয় বিক্রী করে। বল্‌লেন—"আর্টিষ্ট মানুষ তুমি, ও-সব 'গুণ্ডামি' তোমাকে শোভা পায় না।"

মোটর সাইকেলটা শেষ পর্য্যন্ত বিগড়ে গেল একেবারে। তাকে আর ঠিক করতে পারলাম না। শেষ কালে জলের দরে জঞ্জাল বিদায় করলাম। মিস্ পামার খুব খুসী!

গোয়ালিয়র থেকে চলে আসার সময় উনি আমায় একটি বই উপহার দিয়েছিলেন, সেটি এখনো আমি যত্নে রেখেছি। বইখানি হ্যাভেল সাহেবের 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিং এ্যাণ্ড স্কালপ্‌চার।' পরে মিস পামারের সঙ্গে আরো কয়েকবার দেখা হয়। শেষ দেখা হয় বিলেত যখন যাই—১৯৩৭ সালে। তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

কমলা রাজা

মিস পামার প্রথম চাকরি নিয়ে আসেন গোয়া-লিয়রের মহারাজার বোন কমলা রাজার শিক্ষয়িত্রী হিসাবে। সেই কমলা রাজা মারা গেলেন কত অল্প বয়সে। বিয়ে হ'ল ঘটা করে, তখন আমি গোয়ালিয়রে মাত্র গিয়েছি। হৈ চৈ, সারা গোয়ালিয়র সহর আলোয় ঝলমল, রাস্তা-ঘাটে বর্ণাঢ্য উৎসব সজ্জা। অমন আমি বড় একটা দেখি নাই আগে। গোয়ালিয়র দুর্গের ওপর থেকে, যে প্যারাপেটের ওপর থেকে রাত ন'টায় তোপ পড়ে, সেইখানে রাত্রে গিয়ে বসতাম। আকালকোটের রাজা বিয়ে করতে এলেন। উৎসব বেশে সজ্জিত কাতারে কাতারে হাতী-ঘোড়ার সে কি বিচিত্র শোভা-যাত্রা। প্যারাপেটের ওপর থেকে আমি ছবি এঁকে-ছিলাম। প্যালেসে একদিন আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে-ছিল আলপনা ও সাজাবার জন্য। বিয়ের সাত দিন পর হঠাৎ খবর পেলাম কমলা রাজা মারা গেছেন। মোটরে কমলা তাঁর বরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। মোটর উল্টে যায়। তাঁর বর বাহাদুরী করে সত্তর-আশী মাইল বেগে গাড়ি চালিয়েছিলেন। তখনও গোয়ালিয়রে বিয়ের উৎসবের আলো নেভেনি, উৎসব সজ্জা তখনও শুকোয়নি। কিন্তু কমলা এ-পৃথিবী থেকে ঝরে পড়লেন। সে কি ভীষণ দিন গোয়ালিয়রের। এক মুহূর্ত্তে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। মনটা ছিল তখন আমার খুবই কাঁচা। কমলাকে দেখেছিলাম, আলাপ ছিল না। কিন্তু মনটা কি ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল তা বলবার নয়।

তারপর মিস পামারের কাছে কত গল্প শুনেছি কমলা রাজার। কমলা ভাল ঘোড়ায় চড়তে জানতেন, ছবি আঁকতেন, বন্দুক চালাতেন। মহারাজা না কি তাঁকে ছেলের মতই সব শিক্ষা দিয়েছিলেন। মিস পামার প্যালেস থেকে চলে এলেন—সেখানে তাঁর আর মন বস্‌ছিল না। অথচ গোয়ালিয়র ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। সুখের দিনে যেখানে ছিলেন, দুঃখের দিনেও গোয়ালিয়রেই থাকতে চাইলেন। সিন্ধিয়া স্কুলে না কি সেই জন্যই চলে এলেন। দুর্গের প্যারাপেট থেকে প্যালেসের দিকে তাকাতেন—তাঁর চোখের পাতা ভিজে উঠত—আর তার আমেজ লাগত আমার মনেও!

৮ মিঃ ফিরোজের ফটো দেখে মূর্ত্তি গড়ার অর্ডার

গোয়ালিয়র সহরে বহুকাল আগে এক ইটালিয়েন পরিবার বাস করত—ফিরোজ পরিবার। তাঁদের দুই মেয়ে ছাড়া গোয়ালিয়রে আর কেউ ছিল না। মিঃ ফিরোজ মারা যান দুই মেয়ে রেখে। মিঃ ফিরোজ মহারাজের কাছ থেকে বেশ বড় জায়গীর পেয়েছিলেন। মিস্ পামারের সঙ্গে একদিন ঐ বৃদ্ধা আমার কাছে এসে হাজির। সঙ্গে একটা ফটোগ্রাফ মিঃ ফিরোজের। বললেন: "তোমার কথা মিস পামারের কাছে এত শুনেছি যে কি বলব। তুমি না কি একজন 'ভেরি ক্লেভার বয়,' পারবে এই ছবিখানা দেখে একটা 'লাইফ সাইজের' বাষ্ট্‌ করতে?"

ছবি দেখে এর আগে কখনও মূর্ত্তি গড়ি নি। ছবি দেখে মূর্ত্তি গড়ে যারা তাদের একটু হেয়-জ্ঞান করতাম। কিন্তু এঁদের 'না' বলতে পারলাম না। মিঃ ফিরোজের চেহারাটি বড় সুন্দর ছিল। দাড়ি-গোঁফ, কোঁকড়া চুল, মুখে দীপ্ত অথচ শান্ত ভাব। রাজী হয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। কাজটা মাটিতে যখন শেষ হ'ল, ওঁরা এসে দেখলেন। সে দৃশ্য আমার মনে দাগ কেটে-

ছিল। খেটেছিলাম খুব। মূর্ত্তি হয়েছিল ভালই, তবে ফটো দেখে করা হাজার হোক। ওঁদের পছন্দ হবে কি না সন্দেহ ছিল। দুই বোন ত এলেন। পরদা সরিয়ে ফেলতেই দু'বোনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলেন। বড় বোনের বয়স অনেক হয়েছে, তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কি ভক্তি ও স্নেহের সে দৃষ্টি! পিতৃভক্ত দুই কন্যা। কি বলে আমায় কাঁপছে টের পাচ্ছিলাম। বললেন: "ও আমার আদরের 'ক্লেভার বয়', আমার একটি কথা শুনবে? তোমার চোখে সুখের চেয়ে দুঃখের ছাপ রয়েছে বেশী। তুমি দুঃখ পাবে আর মানুষকে দুঃখ দেবেও অনেক। ভগবানে বিশ্বাস রেখো। সব দুঃখ তোমার সার্থক হবে।"

ওঁরা চলে গেলেন। সন্ধ্যার সময় মিস পামার একটা

রবীন্দ্রনাথ (১৯৫৮)

ধন্যবাদ দেবেন কথা খুঁজে পান না তাঁরা। আমার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন: "তুমি সত্যিই 'ক্লেভার বয়' বটে!" তারপর আমার দু'হাত তাঁর দু'হাতে ধরে চেয়ে রইলেন চোখের দিকে।—যেন কি পড়বার চেষ্টা করছেন। তাঁর খোলা চোখ দুটো থেকে তখনও জল পড়ছিল,—হাত তাঁর চিঠি পাঠালেন আমার কাছে। খুলে ফেললাম তাড়াতাড়ি। দেখি, খামের ভেতরে একশো টাকার পাঁচখানা নোট, ছোট্ট চিঠি একখানা—"সুধীর, ফিরোজ বোনেরা এই টাকা তোমাকে পাঠিয়েছেন। একবার এস, কথা আছে—"

তক্ষুণি গেলাম মিস পামারের কাছে। উনি খেতে

বসেছিলেন। ওঁর সাথে একটু পুডিং খেতে হ'ল। খাওয়া শেষে বললেন : চল, বসবার ঘরে—"

বসলাম দু'জনে একটি সোফায়। বললেন—"একটা কথা। সিনিয়র মিস ফিরোজ, তোমায় যা বললেন—চলে যাবার সময়, তা শুনে রাগ কর নি ত!"

"না, রাগ করার মত কোন কথা ত উনি বলেন নি।"

"না, আমি হ'লেও হয়ত রাগ করতাম না—ভয় পেতাম।"

"না ভয়ও আমি পাই নি"—হেসে বললাম।

"তোমার জন্য আমার যে ভয় করে সুধীর! তোমার ভগবানে বিশ্বাস আছে ত?"

হেসে বললাম আবার—"আছে বলেই ত আমার বিশ্বাস।"

* * * *

শরণের দাদী

শরণ ছিল ম্যানুয়েল ট্রেনিং টীচার। অর্থাৎ সে ছেলেদের কাঠের কাজ শেখাত। ফুটবল খেলত ভালো! আমাদেরই বয়সী বিহারী ভদ্রলোক। বিবাহিত স্ত্রী ও বুড়ী দাদীকে নিয়ে সে থাকত একটি ছোট্ট কোয়াটারে। সেখানে প্রায়ই তার কাছে যেতাম। মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়াও করতাম। শরণের বউ অবশ্য আমাদের সামনে বার হ'ত না। বুড়ী দাদী আমাকে ভালোবাসতেন। খুব বয়স হয়েছিল তাঁর। একেবারে দেহাতী যাকে বলে, তাই তিনি। তাঁর কথাও ভালো করে বুঝতাম না, কিন্তু খুব কথা চালাতাম। আমার ভাঙা ভুল হিন্দী ওঁদের কাছে বেশ একটা হাসির ব্যাপার হ'ত। দাদী তাঁর নিজের হাতে তৈরী লাড্ডু, ডালপুরী আর পাঁপর ভাজা খাওয়াতেন। একবার তিনি একটি মজার গল্প বলেছিলেন। বললেন—"বুড়ী হয়েছি, আর বেশীদিন বাঁচব না। মরেই ত গিয়েছিলাম একবার!"

জিজ্ঞেস করলাম—'সে কি-রকম?'

তিনি বলতে সুরু করলেন : "দেশে নিজেদের গাঁয়ে ছিলাম গত বছর। খুব শরীর খারাপ। মরেই যাবার মত। তার ওপর হল কি একদিন হাই তুলতে গিয়ে 'হাঁ' আর বন্ধ হয় না। খেতে পারি না, কথা বলতে পারি না। নাতিকে ইঙ্গিতে বললাম—'মরেই ত যাব, চল কাশী নিয়ে। মরি ত কাশীতেই মরব'।"

নাতি বলল—"বেশ তোমার শেষ ইচ্ছে মেটাব। চল কাশী!" ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে ট্রেণে গিয়ে বসলাম। ক্ষিধেতে তখন প্রায় মরতে বসেছি। কাশী পর্যন্ত বুঝি আর পৌঁছতে পারি না। মোগলসরাই স্টেসনে পৌঁছলাম, সেখানে বড় ডাক্তার আছে। নাতি ছুটল তার খোঁজে। এল ডাক্তার। সে একেবারে সায়েব ডাক্তার। লাল টুকটুকে তার শরীরের রঙ! মরব কি শেষটায় ফিরিঙ্গীর হাতে! আমার মুখে কি শেষটায় মেলেচ্ছো ফিরিঙ্গীটা হাত দেবে? রামঃ রামঃ! আমি কিছুতেই তাকে আমার কাছে আসতে দেব না, আর সে ছোকরা ডাক্তার হাসে আর আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি সব কথা বলে! তারপর কথা নেই, বার্ত্তা নেই, মাথার কাপড়টা সরিয়ে ফেলে একেবারে দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে হাসল। তারপর হাতে তোয়ালে নিয়ে দু'হাতে আমার চোয়ালটা ধরে আচম্‌কা দিলে একটা চাপ অদ্ভুত কায়দায়! আমি হঠাৎ তাকে গালাগাল দিয়ে বলছি: "দূর্ হ' ফিরিঙ্গী, ছাড় আমায়!" তাই শুনে, সবাই দেখলাম হো হো করে হাসছে। যত গালাগাল দেই ততই সবাই হাসে। তখন হুঁশ হ'ল : তাই ত আমি যে ভালো হয়ে গেছি! তবে আর কি করতে কাশী যাওয়া! খানিকটা গঙ্গাজল দিয়ে মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিলাম। নাতিকে বল্‌লাম, চল্, বাড়ী ফিরি। মরব না যখন তখন আর কি করতে কাশী যাব? ফিরে গেলাম দেশে।" খানিক হেসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দাদী বললেন,—"আমার আর কাশী যাওয়া হয় নি।"

পরে যখনই গোয়ালিয়রে গিয়েছি, দাদীকে গিয়ে প্রণাম করেছি। শুনেছি, সিন্ধিয়া স্কুলের বন্ধুদের মুখে দাদী আমার কথা ভোলেন নি। প্রায়ই না কি আমায় স্মরণ করতেন। এই ত, কিছুদিন আগে খবর পেলাম দাদী মারা গেছেন!

জীয়ালাল দার

জীয়ালাল দার কাশ্মীরি সায়েন্স পড়ান সিন্ধিয়া স্কুলে আমরা একসঙ্গে কাজে ঢুকেছি। খুব কথা বলতে পারে তিনি। তাঁর বাড়ীতেও ছিল আমার আড্ডা। যেদিন তাঁর বাড়ীতে ভালো রান্না হ'ত,—শালগম দিয়ে মাংস—সেদিনই আমার ডাক পড়ত। তাঁর বউ রান্না করত খাস্ কাশ্মীরের মেয়ে—ফরসা, বড় বড় ডাগর চোখ, টানা টানা ভ্রূ—কথায় কথায় সব সময়েই মুখে হাসির ঝিলিক লেগে থাকত। দু'হাতে দু'থালায় ভাত, ডাল, মাংস—সব সাজিয়ে টেবিলে রাখত, আর আমরা পরমানন্দে খেতে আরম্ভ করতাম। আমাদের থালা দু'টো রেখে সে নিজের থালাটা এনে এক টেবিলেই খেতে বসত চলত খোস গল্প। স্কুলের গল্পই হ'ত বেশীর ভাগ! কে

বেশী মাইনে পায়,—কে হেডমাষ্টারের পায়ে বেশী তৈল মর্দ্দন করে,—কার কোয়ার্টার বড় ও ভালো—কিছুই বাদ যায় না। গোয়ালিয়র দুর্গের ওপর এ যেন এক ছোট্ট পৃথিবী। এখানে বেশী দিন থাকলে মানুষ কূপমণ্ডুক হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

ফুট সাহেব

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম এক ফুট সাহেব আসছেন বিলেত থেকে। মিঃ এস. আর. দাস অনেক টাকা তুলেছিলেন বিলেতের 'ইটন' বা 'হ্যারো' জাতীয় একটা স্কুল এখানে খুলবার উদ্দেশ্যে। সে টাকা এতদিন না কি জমাই ছিল। উনি মারা যাবার পর উদ্যোগ করে কেউ এতদিন সে বিষয়ে মন দেয় নি। এতদিন পর এই স্কুলের গোড়াপত্তন করতে ফুট সাহেবকে হেডমাষ্টার করে আনা হচ্ছে। ফুট সাহেব 'ইটনের' মাষ্টার ছিলেন। উনি ভারতবর্ষে এসে প্রথমে এখানকার সব স্কুল ও দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে ঘুরবেন,ভারতবর্ষে যারা শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবেন, তার পর যত শীঘ্র সম্ভব স্কুলটির কাজ আরম্ভ করবেন। দেরা-দুনের পুরোনো ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রকাণ্ড গাছ-পালা-ভরা বাড়ীঘরশুদ্ধ জায়গাটা এই স্কুল স্থাপনের জন্ম নেওয়া হয়েছে শুনতে পেলাম। বোম্বাই থেকে দেরাদুন যাবার পথে একদিন ফুট সাহেব সস্ত্রীক গোয়ালিয়র এসে হাজির হলেন। ভদ্রলোকের বয়স তখন বছর পঁয়ত্রিশ হবে। লম্বা, গোবেচারা চেহারা দেখতে তখন একটু বোকা বোকা লেগেছিল। পিয়ার্স সাহেব তাঁকে নিয়ে সারা স্কুল ঘুরে দেখালেন। সব মাষ্টারদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ফুট সাহেব ভারতবর্ষের নানান জায়গা বেড়িয়ে, নানান স্কুল দেখে দেরাদুন পৌঁছুলেন। হঠাৎ আমার নামে একটি চিঠি এল গোয়ালিয়রে। খুলে দেখি ফুট সাহেবের লেখা। লিখেছেন, দেরাদুন স্কুলের শিল্প বিভাগের জন্ম একজন শিল্পী তার দরকার। আমাকে না কি তাঁর পছন্দ হয়েছে,—আমাকে পেতে পারেন কি না। যদি আমি রাজী থাকি তবে তিনি পিয়ার্স সাহেবকে লিখবেন। তিনি যদি হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হন তবেই আমাকে দেরাদুনের শিল্পীর কাজের জন্ম গ্রহণ করবেন।

গোয়ালিয়রে ওয়ান-ম্যান শো

পিয়ার্স সাহেব যে ছেড়ে দেবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমার উন্নতির পথে বিঘ্ন হবেন সে ধরনের মানুষ তিনি নন। হ'লও তাই। দেরাদুনের নতুন পাব্লিক স্কুলে আমার কাজ হয়ে গেল। ১৯৩৬

ড্রয়েট

সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে সেখানে কাজে যোগ দিতে হবে। খবর যখন পেলাম, তখনও হাতে চার-পাঁচ মাস বাকী। ভাবলাম, গোয়ালিয়র ছেড়ে যাবার আগে এখানে একটা একক প্রদর্শনী করে যাব। সেইজন্ম কাজে নামলাম, বহু ছবি আঁকা ছিল, আরো অনেক আঁকলাম। স্কুলের কাজও হৈ চৈ করে চলতে লাগল। আমি ছেড়ে যাব বলে ছেলেরা একটু অনুযোগ করতে লাগল। তাদের আশা দিলাম যে আমার জায়গায় তারা আর একজন ভালো শিল্পীকেই পাবে। আমি চলে যাবার পর আমার পরিচিত শিল্পীবন্ধু শ্রীপ্রভাত নিয়োগী এই কাজে যোগ দেন। গোয়ালিয়র প্রদর্শনীতে ছোট-বড় প্রায় একশো ছবি রেখেছিলাম। তার মধ্যে প্রায় চল্লিশ খানা ছবি বিক্রী করে ফেললাম। অবশ্য ছবির দাম খুব বেশী রাখি নি বলেই এটা সম্ভব হ'ল। বলতে গেলে এই প্রদর্শনীই আমার প্রথম ওয়ান-ম্যান শো।

ক্রমশঃ

—•—

বসেছিলেন। ওঁর সাথে একটু পুডিং খেতে হ'ল। খাওয়া শেষে বললেন : চল, বসবার ঘরে—"

বসলাম দু'জনে একটি সোফায়। বললেন—"একটা কথা। সিনিয়র মিস ফিরোজ, তোমায় যা বললেন—চলে যাবার সময়, তা শুনে রাগ কর নি ত!"

"না, রাগ করার মত কোন কথা ত উনি বলেন নি।"

"না, আমি হ'লেও হয়ত রাগ করতাম না—ভয় পেতাম।"

"না ভয়ও আমি পাই নি"—হেসে বললাম।

"তোমার জন্য আমার যে ভয় করে সুধীর! তোমার ভগবানে বিশ্বাস আছে ত?"

হেসে বললাম আবার—"আছে বলেই ত আমার বিশ্বাস।"

* * * *

শরণের দাদী

শরণ ছিল ম্যানুয়েল ট্রেনিং টীচার। অর্থাৎ সে ছেলেদের কাঠের কাজ শেখাত। ফুটবল খেলত ভালো! আমাদেরই বয়সী বিহারী ভদ্রলোক। বিবাহিত স্ত্রী ও বুড়ী দাদীকে নিয়ে সে থাকত একটি ছোট্ট কোয়ার্টারে। সেখানে প্রায়ই তার কাছে যেতাম। মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়াও করতাম। শরণের বউ অবশ্য আমাদের সামনে বার হ'ত না। বুড়ী দাদী আমাকে ভালোবাসতেন। খুব বয়স হয়েছিল তাঁর। একেবারে দেহাতী যাকে বলে, তাই তিনি। তাঁর কথাও ভালো করে বুঝতাম না, কিন্তু খুব কথা চালাতাম। আমার ভাঙা ভুল হিন্দী ওঁদের কাছে বেশ একটা হাসির ব্যাপার হ'ত। দাদী তাঁর নিজের হাতে তৈরী লাড্ডু, ডালপুরী আর পাঁপর ভাজা খাওয়াতেন। একবার তিনি একটি মজার গল্প বলেছিলেন। বললেন—"বুড়ী হয়েছি, আর বেশীদিন বাঁচব না। মরেই ত গিয়েছিলাম একবার!"

জিজ্ঞেস করলাম—'সে কি-রকম?'

তিনি বলতে সুরু করলেন : "দেশে নিজেদের গাঁয়ে ছিলাম গত বছর। খুব শরীর খারাপ। মরেই যাবার মত। তার ওপর হল কি একদিন হাই তুলতে গিয়ে 'হাঁ' আর বন্ধ হয় না। খেতে পারি না, কথা বলতে পারি না। নাতিকে ইঙ্গিতে বললাম—'মরেই ত যাব, চল কাশী নিয়ে। মরি ত কাশীতেই মরব'।"

নাতি বলল—"বেশ তোমার শেষ ইচ্ছে মেটাব। চল কাশী!" ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে ট্রেণে গিয়ে বসলাম। ক্ষিধেতে তখন প্রায় মরতে বসেছি। কাশী পর্যন্ত বুঝি আর পৌঁছতে পারব না। মোগলসরাই স্টেশনে পৌঁছলাম, সেখানে বড় ডাক্তার আছে। নাতি ছুটল তার খোঁজে। এল ডাক্তার। সে একেবারে সায়েব ডাক্তার। লাল টুকটুকে তার শরীরের রঙ! মরব কি শেষটায় ফিরিঙ্গীর হাতে! আমার মুখে কি শেষটায় মেলেচ্ছো ফিরিঙ্গীটা হাত দেবে? রামঃ রামঃ! আমি কিছুতেই তাকে আমার কাছে আসতে দেব না, আর সে ছোকরা ডাক্তার হাসে আর আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি সব কথা বলে! তারপর কথা নেই, বার্ত্তা নেই, মাথার কাপড়টা সরিয়ে ফেলে একেবারে দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে হাসল। তারপর হাতে তোয়ালে নিয়ে দু'হাতে আমার চোয়ালটা ধরে আচমকা দিলে একটা চাপ অদ্ভুত কায়দায়! আমি হঠাৎ তাকে গালাগাল দিয়ে বলছি : "দূর্ হ' ফিরিঙ্গী, ছাড় আমায়!" তাই শুনে, সবাই দেখলাম হো হো করে হাসছে। যত গালাগাল দেই ততই সবাই হাসে। তখন হুঁশ হ'ল : তাই ত আমি যে ভালো হয়ে গেছি! তবে আর কি করতে কাশী যাওয়া! খানিকটা গঙ্গাজল দিয়ে মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিলাম। নাতিকে বললাম, চল্, বাড়ী ফিরি। মরব না যখন তখন আর কি করতে কাশী যাব? ফিরে গেলাম দেশে।" খানিক হেসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দাদী বললেন,—"আমার আর কাশী যাওয়া হয় নি।"

পরে যখনই গোয়ালিয়রে গিয়েছি, দাদীকে গিয়ে প্রণাম করেছি। শুনেছি, সিন্ধিয়া স্কুলের বন্ধুদের মুখে, দাদী আমার কথা ভোলেন নি। প্রায়ই না কি আমায় স্মরণ করতেন। এই ত, কিছুদিন আগে খবর পেলাম দাদী মারা গেছেন!

জীয়ালাল দার

জীয়ালাল দার কাশ্মীরি সায়েন্স পড়ান সিন্ধিয়া স্কুলে। আমরা একসঙ্গে কাজে ঢুকেছি। খুব কথা বলতে পারেন তিনি। তাঁর বাড়ীতেও ছিল আমার আড্ডা। যেদিন তাঁর বাড়ীতে ভালো রান্না হ'ত,—শালগম দিয়ে মাংস—সেদিনই আমার ডাক পড়ত। তাঁর বউ রান্না করত। খাস্ কাশ্মীরের মেয়ে—ফরসা, বড় বড় ডাগর চোখ, টানা টানা ভ্রূ—কথায় কথায় সব সময়েই মুখে হাসির ঝিলিক লেগে থাকত। দু'হাতে দু'থালায় ভাত, ডাল, মাংস—সব সাজিয়ে টেবিলে রাখত, আর আমরা পরমানন্দে খেতে আরম্ভ করতাম। আমাদের থালা দু'টো রেখে সে নিজের থালাটা এনে এক টেবিলেই খেতে বসত। চলত খোস গল্প। স্কুলের গল্পই হ'ত বেশীর ভাগ! কে

বেশী মাইনে পায়,—কে হেডমাষ্টারের পায়ে বেশী তৈল মর্দন করে,—কার কোয়ার্টার বড় ও ভালো—কিছুই বাদ যায় না। গোয়ালিয়র দুর্গের ওপর এ যেন এক ছোট্ট পৃথিবী। এখানে বেশী দিন থাকলে মানুষ কূপমণ্ডূক হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি?

ফুট সাহেব

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম এক ফুট সাহেব আসছেন বিলেত থেকে। মিঃ এস. আর. দাস অনেক টাকা তুলেছিলেন বিলেতের 'ইটন' বা 'হ্যারো' জাতীয় একটা স্কুল এখানে খুলবার উদ্দেশ্যে। সে টাকা এতদিন না কি জমাই ছিল। উনি মারা যাবার পর উদ্যোগ করে কেউ এতদিন সে বিষয়ে মন দেয় নি। এতদিন পর এই স্কুলের গোড়াপত্তন করতে ফুট সাহেবকে হেডমাষ্টার করে আনা হচ্ছে। ফুট সাহেব 'ইটনের' মাষ্টার ছিলেন। উনি ভারতবর্ষে এসে প্রথমে এখানকার সব স্কুল ও দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে ঘুরবেন,ভারতবর্ষে যারা শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবেন, তার পর যত শীঘ্র সম্ভব স্কুলটির কাজ আরম্ভ করবেন। দেরাদুনের পুরোনো ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রকাণ্ড গাছপালা-ভরা বাড়ীসমেত জায়গাটা এই স্কুল স্থাপনের জন্য নেওয়া হয়েছে শুনতে পেলাম। বোম্বাই থেকে দেরাদুন যাবার পথে একদিন ফুট সাহেব সস্ত্রীক গোয়ালিয়র এসে হাজির হলেন। ভদ্রলোকের বয়স তখন বছর পঁয়ত্রিশ হবে। লম্বা, গোবেচারা চেহারা দেখতে তখন একটু বোকা বোকা লেগেছিল। পিয়ার্স সাহেব তাঁকে নিয়ে সারা স্কুল ঘুরে দেখালেন। সব মাষ্টারদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ফুট সাহেব ভারতবর্ষের নানান জায়গা বেড়িয়ে, নানান স্কুল দেখে দেরাদুন পৌঁছুলেন। হঠাৎ আমার নামে একটি চিঠি এল গোয়ালিয়রে। খুলে দেখি ফুট সাহেবের লেখা। লিখেছেন, দেরাদুন স্কুলের শিল্প বিভাগের জন্য একজন শিল্পী তাঁর দরকার। আমাকে না কি তাঁর পছন্দ হয়েছে,—আমাকে পেতে পারেন কি না। যদি আমি রাজী থাকি তবে তিনি পিয়ার্স সাহেবকে লিখবেন। তিনি যদি হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হন তবেই আমাকে দেরাদুনের শিল্পীর কাজের জন্য গ্রহণ করবেন।

গোয়ালিয়রে ওয়ান-ম্যান শো

পিয়ার্স সাহেব যে ছেড়ে দেবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমার উন্নতির পথে বিঘ্ন হবেন সে ধরনের মানুষ তিনি নন। হ'লও তাই। দেরাদুনের নতুন পাব্লিক স্কুলে আমার কাজ হয়ে গেল। ১৯৩৬

ড্রয়েট

সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে সেখানে কাজে যোগ দিতে হবে। খবর যখন পেলাম, তখনও হাতে চার-পাঁচ মাস বাকী। ভাবলাম, গোয়ালিয়র ছেড়ে যাবার আগে এখানে একটা একক প্রদর্শনী করে যাব। সেইজন্য কাজে নামলাম, বহু ছবি আঁকা ছিল, আরো অনেক আঁকলাম। স্কুলের কাজও হৈ চৈ করে চলতে লাগল। আমি ছেড়ে যাব বলে ছেলেরা একটু অনুযোগ করতে লাগল। তাদের আশা দিলাম যে আমার জায়গায় তারা আর একজন ভালো শিল্পীকেই পাবে। আমি চলে যাবার পর আমার পরিচিত শিল্পীবন্ধু শ্রীপ্রভাত নিয়োগী এই কাজে যোগ দেন। গোয়ালিয়র প্রদর্শনীতে ছোট-বড় প্রায় একশো ছবি রেখেছিলাম। তার মধ্যে প্রায় চল্লিশ খানা ছবি বিক্রী করে ফেললাম। অবশ্য ছবির দাম খুব বেশী রাখি নি বলেই এটা সম্ভব হ'ল। বলতে গেলে এই প্রদর্শনীই আমার প্রথম ওয়ান-ম্যান শো।

ক্রমশঃ

—•—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

একচল্লিশ

রামকিঙ্কর বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা করে সবিতার সব কথা জানালে। উপেন চলে যাওয়ার পরে সবিতা যে কি কষ্টের মধ্যে আছে, তারও একটা বর্ণনা দিলে। বলতে বলতে তার চোখে জল এল। কিন্তু বিশ্বনাথ বড় বড় চোখ মেলে সব কথা শুনলে, বিচলিত হ'ল বলে মনে হ'ল না।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিশ্বনাথ শুধু বললে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, এ ত জানাই কথা।

রামকিঙ্কর অবাক হয়ে গেল।

বিশ্বনাথ বলতে লাগল, আমি কি করব বল। দু'পাঁচ টাকা সাহায্য করব, সে সঙ্গতিও নেই। বাবার অসুখে জলের মত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।

—তাঁর কি হয়েছে?

—কি যে হয়েছে, তা ডাক্তারেও বুঝতে পারছেন না। যা বোঝা যাচ্ছে, সে হচ্ছে, প্রেসার খুব বেড়েছে, হার্টের অবস্থাও ভাল নয়। যে কোন মুহূর্তে কিছু হয়ে যেতে পারে। তোমার কাছ থেকে সবিতার কথা শুনলাম, কিন্তু সে কথা বাবাকে ত বলবার উপায়ই নেই, মাকেও না! মা শুনে কান্নাকাটি করবেন। হয়ত এক সময় বাবাকেও বলে বসবেন।

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

বিশ্বনাথ বললে, সবিতাকে ক্ষমা করা আমাদের পক্ষে এই কারণে কঠিন যে, আমাদের পরিবারের শান্তি সে ভেঙে দিয়ে গেছে। বাবার শরীর অবশ্য ভাল চলছিল না, কিন্তু এ রকম অবস্থা হয়েছে সবিতার জন্যে। অনেকদিন তুমি আমাদের বাড়ী যাও নি। মাকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে না। তাঁর সব গোলমাল হয়ে গেছে। পরিচয় না দিলে তোমাকেই হয়ত চিনতে পারবেন না। এখুনিকার কথা এখুনি ভুলে যাচ্ছেন। তারই মধ্যে যন্ত্রের মত দু'বেলা দুটো রান্না করছেন, বাবার সেবাও করছেন। আর কে করবে বল। আমি সকালে ট্যুইশান করতে বেরুই, ফিরেই দুটো নাকে-মুখে গুঁজে আপিস ছুটি। সেখান থেকে আর বাড়ী আসি না। পথে পথেই দুটো ট্যুইশান সেরে ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা-দশটা।

একটু চুপ করে থেকে বিশ্বনাথ বললে, কি করে যে ফিরি, ভগবান জানেন। ফ্ল্যাটের দরজায় এসে থমকে দাঁড়াই। কান পেতে শুনি, ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে কি না। আওয়াজ আসছে না নিশ্চিত হ'লে তখন দরজায় কড়া নাড়ি।

বিশ্বনাথ বললে, কিন্তু একদিন কান্নার আওয়াজ উঠবে। সেদিনও খুব দূরে নয়। সেদিন কি করব, জানি না।

মুখ নিচু করে বিশ্বনাথ বোধ হয় অশ্রু গোপন করলে।

অপরাধীর মত রামকিঙ্কর বললে, আমিও খুব মুস্কিলের মধ্যে রয়েছি বিশু। মেয়েমানুষ কর্তা। তার মেজাজ বোঝা যায় না। সব সময় ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। তার ওপর সবিতা। (সারদার কথা গোপন করলে।) মাঝে মাঝেই ইচ্ছা করে তোমাদের বাড়ী যাই। সকলের খবর নিই। কিন্তু পেরে উঠি না।

বিশ্বনাথ বললে, আমাদের খবর আর কি নেবে? ওই ত শুনলে। কারও করবার কিছু নেই। মিছিমিছি দেখে কষ্ট পাওয়া। সবিতার সম্বন্ধেও তাই। বললে, শুনলাম। কষ্ট পেলাম। আমার কিছুই করবার নেই। এর মধ্যে সান্ত্বনা এইটুকু যে, তুমি তার পাশে দাঁড়িয়েছ। ওর দু'টি ছেলে-মেয়ে, না?

—হ্যাঁ। সেই ত হয়েছে আরও মুস্কিল। সবিতা একলা হলে ভাবনার ছিল না। কিছু লেখাপড়া শিখেছে, একটা পেট কোনরকমে চালান যেত। এখন চাকরি যে করতে যাবে, ছেলে-মেয়ে দু'টিকে রেখে যাবে কার কাছে?

—তাও ত বটে।

হঠাৎ বিশ্বনাথ খুব ব্যস্ত হয়ে বললে, আজ আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, ভাই। বাবার জন্যে একটা ওষুধ কিনতে হবে। এ পাড়ায় কোথাও পাওয়া গেল

না। দেখি যদি ধর্মতলার দিকে পাওয়া যায়। একদিন সময় মত এস, এ্যাঁ?

বিশ্বনাথ হন হন করে চলে গেল।

পথে-পথে দেখা। বিশ্বনাথ চলে যেতে রামকিঙ্কর সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। মনের মধ্যে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। চন্দ্রনাথবাবু অসুস্থ। বৃদ্ধ বয়সে অসুখটা নতুন কিছু নয়। মৃত্যু দেহ-দুর্গের চারপাশে টোকা দিচ্ছে। যেখানে একটু দুর্বল দেখে, সেইখানেই গাঁইতি চালায়। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়। তিনি ছুটে আসেন। দুর্গের দুর্বল স্থান মেরামতের চেষ্টা করেন। কখনও পারেন, কখনও পারেন না। সুতরাং এ নিয়ে দুশ্চিন্তার বড় একটা কিছু নেই।

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুর অসুখটা যতখানি বার্দ্ধক্যের জন্যে, তারও চেয়ে বেশী কন্যার কাছ থেকে পাওয়া অপ্রত্যাশিত দারুণ আঘাতের জন্যে। ডাক্তার আসছেন, দেখছেন, ঠিকই। কিন্তু সুবিধা করতে পারছেন না বোধ হয় হৃদয়ের ক্ষতের জন্যে। যক্ষ্মার মত একটা কীট বৃদ্ধের হৃদয় কুরে কুরে খাচ্ছে। তাঁকে সেরে উঠতে দিচ্ছে না।

অথচ সবিতা, সে যে বাপকে ভালবাসে না, তাও নয়। অল্প বয়েসে হৃদয়াবেগের চাপে পড়ে একটা কাজ করে বসল, যার উপর, সত্যি বলতে কি, তার নিজেরও হাত ছিল না। আজ সে এর জন্য অনুতপ্ত কি না, রামকিঙ্কর জানে না। সবিতাও ভেঙে পড়েছে। রামকিঙ্করের এমনও মনে হয়, ছেলেমেয়ে দু'টি না থাকলে, সেও বাঁচত না। শুধু ছেলে-মেয়ে দু'টির মুখ চেয়ে ভাঙা দেহ ও মন কোনরকমে চালিয়ে যাচ্ছে।

পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রামকিঙ্কর এতগুলো কথা ভেবে ফেললে। যেন কতকগুলো ছবি তার চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত তরঙ্গে বয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে, এবারে কি করা যায়? এবারে কোথায় যাওয়া যায়? যাবার জায়গা তার দু'টি মাত্র। হয় সবিতার ওখানে, নয় সারদার ওখানে। মনস্থির করতে কিছুটা সময় নিল। তারপর সারদার বস্তীর দিকে পা বাড়াল।

এই সময়ে সারদার ঘরে রামকিঙ্কর কখনও যায় না। সাধারণতঃ সন্ধ্যার দিকেই সে যায়। একখানি ময়লা শাড়ি পরে সারদা তখন রান্না করছিল। মাথার চুল চুড়া করে বাঁধা। ঘাম ঝরছে।

ওকে দেখে সারদা অবাক: হঠাৎ এ সময়ে যে?

রামকিঙ্করের নিজেরও মনে হ'ল, এখন আসা ঠিক হয় নি।

সলজ্জভাবে বললে, এখন আসা নিষেধ না কি?

সারদা বুঝলে, রামকিঙ্কর লজ্জা পেয়েছে। বললে, না, নিষেধ কিছু নেই। কিন্তু এ সময়ে ত তুমি কখনও আস না, তাই বলছিলাম।

সারদার রান্না হয় বাইরের সরু বারান্দার এককোণে। সেইখানে একটা কড়াইয়ে কি যেন একটা রান্না চড়েছিল, রামকিঙ্কর চোখ মেলে দেখে নি।

সারদা বললে, একটু বস। তরকারিটা নামিয়েই আসছি।

কিছু পরে ফিরে এসে বললে, কি খবর বল।

রামকিঙ্কর হাসলে। বললে, দেখ, মনে হচ্ছে, খবরে আমার বুকের ভেতরটা ঠাসা। অথচ বলবার খবর একটাও পাচ্ছি না।

—সে আবার কি!

—তাই। মনে একটা মুহূর্ত শান্তি নেই। অথচ কি করলে শান্তি পাব, তাও বুঝতে পারছি না।

—অশান্তি কি তোমার আমাকে নিয়ে?

—তোমাকে নিয়ে, সবিতাকে নিয়ে, সবচেয়ে বেশী আমার নিজেকে নিয়ে।

সবিতার নাম সারদা এই প্রথম শুনলে। বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সবিতা কে?

রামকিঙ্কর সবিতার সমস্ত কথা সারদাকে বললে। এমন কি একটু আগে বিশ্বনাথের সঙ্গে যে সমস্ত কথা হয়েছে, তাও।

বললে, তার জন্যেই বেশী চিন্তা। তুমি দরকার হ'লে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পার। সে একেবারে অতান্তরে পড়েছে। লেখাপড়া শিখেছে, একটা মাষ্টারী করে খেতে পারে। কিন্তু প্রথমত মাষ্টারী কোথায়? তার পরে মাষ্টারী পেলেও ছেলেমেয়ে দু'টিকে দেখবে কে?

সারদা কি যেন ভাবতে লাগল। তার পর জিজ্ঞাসা করলে, এখন কে তাদের দেখছে?

—ভগবান।

—আর তিনি দেখতে পারবেন না বলেছেন?

রামকিঙ্কর হেসে ফেললে: তাঁর ত দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পেলে স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব আদায় করে নিতাম।

সারদা জিজ্ঞাসা করলে, আর তোমার নিজেকে নিয়ে কি চিন্তা বলছিলে?

—সে আমিও জানি না। কিন্তু মনে কোন সময় সুখ নেই, শান্তি নেই।

—অথচ জান না, কেন সুখ নেই, শান্তি নেই?

—না!

—তা হ'লে তোমার কথা থাক। বলছিলাম কি, আজ সন্ধ্যেবেলায় একবার আসবে?

—কেন?

—আমাকে একবার সবিতার কাছে নিয়ে যেতে।

রামকিঙ্কর ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

সে দৃষ্টিতে সারদা হেসে ফেললে। বললে, আমি কি ভাবছিলাম জান? একজন কানা, একজন খোঁড়া। তারা দু'জনে মিলে একটা গোটা মানুষ হ'তে পারে না?

—আর একটু পরিষ্কার করে বল।

—বলছিলাম কি, ধর আমি তার ছেলেমেয়েদের দেখলাম। সে মাষ্টারী করতে লাগল। আমরা দু'জনে যদি এক জায়গায় থাকি, তা হ'লে দিব্যি চালিয়ে নিতে পারব। এমন কি, যতদিন সে মাষ্টারী না পাচ্ছে, ততদিন আমিই বাইরে কাজকর্ম করে সংসার চালাতে লাগলাম, হয় না?

রামকিঙ্কর অবাক। বললে, তুমি খেটে তার সংসার চালাবে?

সারদা হেসে উঠল: কে কার সংসার চালায় গো? আমি তোমার ভরসা করে আছি, সেও তোমার ভরসা করে আছে। আমরা দু'জনে এককাট্টা হ'লে, চাই কি, হয়ত তোমার সাহায্যেরই দরকার হবে না। আসবে আজকে সন্ধ্যেবেলায়?

রামকিঙ্কর উঠতে উঠতে বললে, চেষ্টা করব। তবে জানই ত, আমার মালিক বড় কড়া। আজকাল আবার তাঁকে সন্দেহবাতিকে ধরেছে। সব সময়ে খবর রাখেন, আমি কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি।

সারদা হেসে ফেললে। বললে, আমার তালটা তোমার ওপর পড়েছে! সাবধানে থাকবে। মেয়েদের সন্দেহ বড় সাংঘাতিক জিনিস। বিশেষ সে মেয়ের হাতে যদি পয়সা এবং ক্ষমতা থাকে।

রামকিঙ্কর সভয়ে বললে, তাই না কি!

সারদা বললে, হ্যাঁ। দেখলে না, ওই বাতিকের উৎপাতে আমি অত আরাম ছেড়ে পালিয়ে এসে বাঁচলাম।

রামকিঙ্কর আবার ফিরে এসে তক্তাপোষে বসল। জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা তুমি বৌরাণী সম্বন্ধে আর একটা কথা যে বলছিলে, সেটা সত্যি, না তোমার বাতিক?

সারদা বললে, কি কথা?

রামকিঙ্কর সলজ্জভাবে বললে, বৌরাণীর আমার ওপর টান না কি একটা যেন আছে।

সারদা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। বললে, তোমার কি মনে হয়?

—মনে হয়, ওটা তোমার বাতিক।

শুনে, সারদা যেন খুশীই হ'ল। সে জানে, এ সব বিষয়ে বড় একটা ভুল হয় না। কিন্তু অবস্থা বিশেষে ভুল হ'লে খুশীই হয়।

বললে, তাও হ'তে পারে। কিন্তু তুমি আজ সন্ধ্যেবেলায় আমার এখানে নিশ্চয় আসবে। তার পরে আমরা দু'জনে সবিতাদির ওখানে যাব।

রামকিঙ্কর যেতে যেতে বলে গেল, আসব।

অসুবিধা অনেক, তবু রামকিঙ্কর বিকেলের দিকে এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল। সারদার জন্যে তার তত চিন্তা হয়নি, যত হয় সবিতার জন্যে। সবিতার দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে বলে ত বটেই, তা ছাড়া স্বাবলম্বীতার দিক দিয়ে সারদার সঙ্গে সবিতার তুলনাই হয় না। বাইরের জগতের সঙ্গে সারদা অনেকদিন ধরে লড়াই করছে। তার ভয় কেটে গেছে। কিন্তু সবিতা চিরদিন ঘরের কোণেই কাটিয়েছে, বাপ-মা'র হেপাজতে। বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই করা দূরে থাক, ভাল করে পরিচয়ই হয় নি। সেই দিক দিয়ে সে নিতান্ত অসহায়। সব সময় তাকে দেখবার-শোনবার একজন লোক দরকার। সারদা কানা-খোঁড়ার উপমাটা ঠিকই দিয়েছে। তবে আরও ভাল করে বলতে গেলে বলতে হয়, দু'জনে যোগাযোগ হ'লে সেটা মণি-কাঞ্চন যোগাযোগ হবে।

ওকে দেখে, সারদা একগাল হেসে সম্বর্ধনা জানালে। বললে, ছাড়া পেলে? আমি ভাবছিলাম, শেস পর্যন্ত আসতে পারবে না।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, যা বলেছ! ব্যাপার সেই রকমই। কিন্তু তুমি তৈরী হয়ে নাও নি?

—আবার কি তৈরী হব? সবিতাদির কাছে যেতে গেলে আবার বেনারসী পরতে হবে না কি?

সারদার পরণে একখানা ক্যাটকেটে মোটা শাড়ী, যা ঝিয়েরা পরে থাকে। তাও খুব ফর্সা নয়।

রামকিঙ্করের মনটা খুঁতখুঁত করছিল। বললে, না,

বেনারসী নয়। তবে আর একটু ফর্সা কাপড় পরলে ভাল হ'ত না?

—কিছুই ভাল হ'ত না। মনে রেখ সবিতাদিকে ভাঁওতা দেবার জন্যে আমি যাচ্ছি না। আমি যা, সেই বেশেই তার কাছে যেতে চাই। আর দেরি ক'রো না, চল। নইলে শেষ পর্যন্ত তোমার অত সুন্দর চাকরিটা চলে যাবে।

দু'জনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ল।

সবিতা সবে গা ধুয়ে ঘরের মধ্যে কাপড় ছাড়ছিল। মানে একখানা ভিজে ময়লা কাপড় ছেড়ে আর একখানা শুকনো ময়লা কাপড় পরছিল। স্যাঁৎসেঁতে বারান্দায় বসে ছোট ছেলেটা একটা ছোট কলাই-করা বাটিতে মুড়ি খাচ্ছিল। বাটির মুড়ি শেষ হয়ে গেছে। মেঝেতে যেগুলি পড়েছিল, এখন সেইগুলি একটি একটি করে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। রামকিঙ্কর চেনা লোক, কিন্তু সারদাকে কখনও দেখে নি। তার দিকে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

দু'জনের পায়ের শব্দে এবং রামকিঙ্করের কণ্ঠস্বরে সবিতা ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল: এস, এস।

কিন্তু তখনই সারদাকে দেখে থেমে গেল। এবং জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে একবার তার এবং আর একবার রাম-কিঙ্করের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, এর নাম সারদা। বড় ভাল মেয়ে। তোমার কথা আজ সকালে এর কাছে বলছিলাম। শুনে সারদা বললে, সবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে? ও খোঁড়া, আমি কানা। কিন্তু দু'জনে মিলে একটা গোটা মানুষ হ'তে পারি হয়ত।

তিনজনেই হাসতে লাগল।

সবিতা বললে, আসুন, আসুন, ঘরের মধ্যে বসবেন আসুন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আমি খোঁড়া বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনি কানা কিসের?

সারদা বললে, পেটে বিদ্যে না থাকলেই মানুষ কানা। কিন্তু আমাকে আপনি-আপনি বলবেন না। আমার পরিচয় উনি ঠিক দেন নি। উনি যে জমিদার বাড়ীর ম্যানেজার, আমি সেই বাড়ীর বৌরাণীর খাস-ঝি ছিলাম। সেটা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আপনার মত আমিও বেকার।

সারদা হাসতে লাগল। সেই সঙ্গে সবিতাও।

সবিতা বললে, খুব ভাল হয়েছে। আমার সঙ্গে, যাকে বলে রাজযোটক। আমরা দু'জনেই দু'জনকে তুমি-তুমি করব, এই প্রথম দিন থেকেই।

সারদা বললে, সেই ভাল। কিন্তু তোমার খাটে আমি বসব সবিতাদি? মনে কিছু করবে না ত?

সবিতা ব্যস্তভাবে বললে, না, না। জাতের অহঙ্কার আমার ঘুচে গেছে, সারদাদি। তুমি নিশ্চিন্তে বসতে পার।

খাটে বসে সারদা রামকিঙ্করের দিকে চাইলে। বললে, এইবার তুমি যেতে পার। যা তোমার মনিব, দেরি না করাই ভাল।

দ্বিধাভরে রামকিঙ্কর বললে, যাব?

—যাবে বৈ কি। আমাকে পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবছ?—সারদা হেসে বললে—আমি একলা খুব যেতে পারব।

রামকিঙ্কর চলে যেতে সবিতাকে জড়িয়ে ধরে সারদা বললে, তুমি কিছু ভেব না। তোমার যখন দরকার হবে, আমাকে বল।

সবিতা হেসে বললে, আমার ত সব সময়েই দরকার।

—তুমিও সব সময়েই আমাকে পাবে। দরকার হ'লে আমি তোমার কাছে এখানেও থাকতে পারি।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত দু'জনে অনেক গল্প করলে। দু'জনেই নিজের নিজের মন উজাড় করে কিছুই বলতে বাকি রাখলে না। বস্তুতঃ সবিতা যেন এমনি একটি দরদী বন্ধুই খুঁজছিল, যার কাছে অকপটে মনের কথা প্রকাশ করা যায়। তাই বলতে না পেরে তার আরও কষ্ট হচ্ছিল।

সারদা যখন উঠল, সবিতা বললে, এত রাত্রে যাবে সারদাদি?

সারদা হেসে বললে, তা কি হয়েছে? এমন কত দিন গেছি।

—ভয় করে না?

—আমাদের আর ভয় কি?

দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসে সবিতা বললে, তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছে না। আবার কবে আসবে বল?

—দু'এক দিনের মধ্যেই আবার আসব। ইতিমধ্যে যদি কোথাও মাষ্টারী পেয়ে যাও, নেবে। তোমার ছেলেমেয়ের ভার আমি নিলাম। আচ্ছা, আজ আসি।

সারদা চলে গেল।

(বিয়াল্লিশ)

বৃন্দাবনের বাড়ীটি সংস্কার হয়ে যাওয়ার পর গিন্নীমা আর একটা দিনও অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না। এমন কি, একটা শুভদিন দেখবার জন্যেও না। হেসে বললেন, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমার আবার দিন-অদিন কি? যাচ্ছি ঠাকুরের কাছে, সব দিনই শুভদিন।

বিদায়-পর্ব খুব সংক্ষিপ্ত।

বৌরাণী এসে প্রণাম করলে। তার চিবুকে হাত দিয়ে গিন্নীমা আশীর্বাদ করলে। নাতিটিকে কোলে করলেন। চুমু খেলেন। বললেন, একে খুব সাবধানে রাখবে। নিয়মিত চিঠি দেবে। আর একটি কথা বলে যাই, সব দিকে চাইবে না, সব কথা শুনবে না। বড়-লোকের বাড়ীতে কিছু ফেলা-ছড়া যাবেই। সেটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।

গিন্নীমা হাসলেন: আমার কথা বুঝতে পারলে?

বিনীত ভাবে ঘাড় নেড়ে মালতী জানালে, পেরেছে।

কি জানি কেন, মালতীর চোখেও জল দেখা দিল।

কিন্তু বিপদ বাধালে দাসী-চাকরেরা। তারা গিন্নীমার পায়ের কাছে পড়ে পায়ের ধুলো মাথায় নেয় আর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে।

তাদের কান্না দেখে গিন্নীমারও চোখে জল এসে গেল। সেই অবস্থাতেই সস্নেহে ধমক দিলেন, আ মোলো যা! কাঁদিস কেন? আমি কি মারা গেছি না কি? যাচ্ছি তীর্থে, সবাই হাসিমুখে আশীর্বাদ কর্।

বলে মালতীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে আগেই বলেছি বৌমা, এদের কারও চাকরি যেন না যায়। এরা সবাই থাকবে। আর আমার তহবিল থেকে মাইনে পাবে।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিন্নীমা মোটরে উঠলেন। সঙ্গে জিনিষপত্রও বেশী নয়। আর হরিদাসী ঝি। রামকিঙ্কর সঙ্গে গেল পৌঁছে দিতে।

বাড়ী দেখে গিন্নীমার পছন্দ হ'ল। ওপাশের অংশে কতকগুলি ভাড়াটে স্ত্রীলোক ইতিমধ্যেই এসে গেছে। গিন্নীমার অভ্যর্থনার সব ব্যবস্থা তারা ঠিক করে রেখেছে।

দিন দুই থেকে সমস্ত গোছগাছ করে দিয়ে ফেরবার সময় রামকিঙ্কর গিন্নীমাকে বললে, যাচ্ছি বটে, কিন্তু আপনাকে বলি, যেতে আমার ইচ্ছে করছে না।

গিন্নীমা হেসে বললেন, ইচ্ছে না করবার মতই জায়গা। আমার ত এমন মন বসে গেছে যে, মনে হচ্ছে, চিরদিন এইখানেই আছি। বলেই বললেন, তোমার ত থাকবার উপায় নেই, রাম। তোমার ওপর কত বড় বোঝা। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। বৌমাও বেশ বুদ্ধিমতী। দু'জনে মিলে বড় বাড়ীর মর্যাদা রাখার চেষ্টা কর।

রামকিঙ্কর বললে, কথা দিলাম, আমি যতদিন আছি, চেষ্টার ক্রুটি হবে না।

বৃন্দাবন রামকিঙ্করের সত্যি ভাল লেগে গিয়েছিল। কিন্তু থাকবার উপায় নেই। তার দুশ্চিন্তা বড় বাড়ী নিয়ে নয়। বড় বাড়ীর রথ বাঁধা ছকে চলে। কারও সাময়িক অনুপস্থিতিতেই তার ব্যতিক্রম হয় না। নিজের ছকে নিজে নিজেই চলতে পারে। তার দুশ্চিন্তা সারদা আর সবিতাকে নিয়ে।

সারদা ইতিমধ্যেই সবিতার কাছে চলে এসেছে। তার ফলে সবিতা অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েছে। সারদার কাছে তার নিজের টাকাকড়ি এখনও কিছু আছে। রামকিঙ্কর দিতে গিয়েছিল, নেয় নি। বলেছিল, ফুরিয়ে গেলে চাইব।

রামকিঙ্কর তাতে কম অবাক হয় নি। বলেছিল, কি বোকা তুমি! টাকা দিচ্ছি নেবে না?

সারদা বলেছিল, বললাম ত, আমার কাছে টাকা রয়েছে।

রামকিঙ্কর বলেছিল, সে টাকা যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন আমার মন যে বদলে যাবে না, কে বলতে পারে?

সারদা হেসে বলেছিল, মন বদলে গেলে তোমার কাছ থেকে টাকা নেব কেন?

আশ্চর্য বোকা মেয়ে!

সবিতার বাড়ীতে বাজার-হাট, বাইরের কাজকর্ম সব সারদা করে। সবিতা যখন রান্না করে, তখন সারদা ছেলেমেয়ে দু'টিকে সামলায়। ঘর-দোর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা কিছুই সারদা সবিতাকে করতে দেয় না।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে রামকিঙ্কর দেখলে, এরই মধ্যে সবিতার চেহারার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সে বিশ্রাম পেয়েছে এবং কিছুটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তিও পেয়েছে।

রামকিঙ্কর যখন এল, তখন সবিতা কোমরে কাপড় জড়িয়ে ভিজে এলোচুলে গেড়ো দিয়ে রান্না করছিল। আর সারদা মশলা পিষছিল।

রামকিঙ্করের পায়ের শব্দে চমকে পিছন ফিরে চেয়েই সবিতা বলে উঠল, ওমা, রামদা যে! সারদাদি ত ঠিকই বলেছিল, কখন এলে?

রামকিঙ্কর সহাস্যে বললে, এই মাত্র। কিন্তু তোমার সারদাদি 'ঠিক'টা কি বলেছিল?

সবিতা হেসে বললে, সারদাদি আজ বাজার থেকে মেলা মাছ নিয়ে এল। আমি হেসে বললাম, এত মাছ কি হবে, সারদাদি? সারদাদি বললে—

সারদা এমন ধমক দিলে যে, সে কি বলেছিল, তা আর সবিতার বলা হ'ল না।

সারদা জিজ্ঞাসা করলে, 'এইমাত্র' মানে কি? ষ্টেশন থেকে সটান আসছ?

—হ্যাঁ, বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। তোমাদের সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব। তোমরা ত বেশ জমিয়েছ দেখছি।

সারদা উঠে বললে, ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে তোমার জিনিষপত্র নামিয়ে নিয়ে এস। এখানে স্নান-খাওয়া সেরে এক ঘুম ঘুমিয়ে তবে যাবে।

এর জন্যে রামকিঙ্কর প্রস্তুত ছিল না। সবিস্ময়ে বললে, সে কি!

সারদা তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, হ্যাঁ, তাই। তুমি আর দেরি কর না, যাও।

যেতে যেতেই রামকিঙ্করের কানে গেল, সবিতা বলছে, রামদার জন্য তোমার মাঝে মাঝে মন ডাকে, না সারদাদি?

সারদা ঝঙ্কার দিলে: মন আবার কি ডাকবে? ভাল মাছ পেলাম, কিনলাম। উনি এলেন, আটকালাম। না এলে, নিজেরাই দু'দিন ধরে খেতাম।

সবিতা হেসে বললে, কিন্তু তুমি যে বললে, রামদা আজ আসতে পারেন।

সারদা আবার ধমক দিলে, সে এমনি কথার কথা বললাম।

স্নানাহার সেরে রামকিঙ্কর খাটের উপর লম্বাভাবে শুয়ে পড়ল। ট্রেণে অত্যন্ত ভীড় ছিল। শোওয়া দূরে থাক, ভাল করে বসবার জায়গাই পায় নি। মাঝে মাঝে একটু একটু ঘুম হয়ত হয়েছে। কিন্তু সে বসে-বসেই। সুতরাং একে ট্রেনের ধকল, তার উপর ঘুমের অভাব। রামকিঙ্কর শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

একাদিক্রমে ঘণ্টা তিনেক গভীর নিদ্রার পর যখন রামকিঙ্কর চোখ মেললে, দেখলে, ঘরে কেউ নেই। উঠে বসে একটা সিগারেট টানলে।

ওরা বোধ হয় বাইরের বারান্দাতেই বসে ছিল। দেশলাই জ্বালার শব্দে ভিতরে এসে মেঝের বসল।

সারদা হেসে বললে, যা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলে, ভাবলাম সন্ধ্যের আগে তোমার ঘুম বোধ হয় ভাঙবেই না।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, নাকের দোষ নেই সারদা। সমস্ত ট্রেণ বেচারার ওপর দিয়ে যা গেছে, সে আর বক্তব্য নয়।

—কি রকম?

—কামরায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। কত মানুষের নিঃশ্বাস এবং কাপড়-চোপড়ের দুর্গন্ধ ত আছেই, তার ওপর জুটল বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ। তাও কোন রকমে যদি বা সহ্য হ'ল, গুটিকয়েক জটাবল্কধারী সন্ন্যাসী পর্যায়ক্রমে গঞ্জিকা সেবন আরম্ভ করলেন। সমস্ত রাস্তা কামরার মধ্যে সেই সমস্ত তাল পাকিয়ে ঘুরেছে—আর নাকের মধ্যে গেছে। নাক তখন কিছু করে নি, এখন নিরাপদে বসে গর্জন করে আপত্তি জানালে।

ওরা দু'জনে হাসতে লাগল।

সবিতা বললে, তোমার জন্যে একটু চা আনি?

—আনতে পার। কিন্তু তার আগে একটু জল খাওয়াও।

সবিতা জল দিয়ে চা করতে গেল।

ঘরের মধ্যে সারদা আর রামকিঙ্কর।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগছে বল?

খুশীভরা কণ্ঠে সারদা বললে, খুব ভাল।

—কিছু অসুবিধা হচ্ছে না?

—কিছুমাত্র না। দু'জনে ভারী আনন্দে আছি। এমন মিষ্টি মেয়েকে কোন স্বামী যে ছেড়ে যেতে পারে, ভাবতে অবাক লাগে।

রামকিঙ্কর বললে, পৃথিবীতে কত অসম্ভব ঘটনাই ত ঘটে। ধরে নাও ও সেইরকমের একটি মেয়ে।

তারপর বললে, সবিতার মুখ থেকে আমি কিছু অবশ্য শুনি নি, কিন্তু অন্য লোকের মুখ থেকে যতদূর শুনেছি, উপেনবাবুও আর পারছিলেন না। অভাবে অভাবে ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শেষে মদ পর্যন্ত ধরেছিল। উপেনবাবুর কথা সবিতা কিছু বলে?

—একদম না।—সারদা বললে,—একদিন উপেনবাবুর কথা আমি তুলেছিলাম, সবিতাদি তৎক্ষণাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, ওঁর কথা নয়। ওঁর কথা আমরা কোনদিন আলোচনা করব না।

রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে সারদা বললে, এইটেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে। উপেনবাবুর সম্বন্ধে ওর মন একেবারে বিষিয়ে গেছে। কেন?

—কি করে জানব?

—অথচ ভালবেসেই একদিন দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করেছিল। সবিতাদি ত তার জন্যে বাপ-মাকে পর্যন্ত ছেড়েছিল।

সারদার দিকে কটাক্ষে চেয়ে রামকিঙ্কর হাসলে। বললে, দেখ, ভালবাসা সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু জানি না। তবে অনেক দেখে-শুনে এই আমার ধারণা হয়েছে যে, ভালবাসা আর যাই হোক, তার ওপর নির্ভর করে ঘর বাঁধা চলে না।

—কেন চলে না?

—তা জানি না। কিন্তু চলে না। সবিতাদের চলল না। আরও অনেকের চলে নি। বোধ হয় ভালবাসার জোয়ার-ভাঁটা আছে বলে। কি হয়ত নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধতে গেলে আরও অন্য জিনিষের দরকার, যা সবিতাদের ছিল না।

—কি সে জিনিষ?

—তা বলতে পারব না।

এমন সময় সবিতা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওদের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

চা খেয়ে সারদা জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে বড় বাড়ীতে হাজিরা দিতে যেতে হবে কখন?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, সন্ধ্যের পরে যাব এক সময়।

সারদা উঠতে উঠতে বললে, তবে আর কি, তোমরা দু'জনে গল্প কর। আমি গা'টা ধুয়ে আসি।

একখানা ফর্সা কাপড় কাঁধে ফেলে সারদা চলে গেল।

সবিতা বললে, আজকে ও বাড়ী আর না-ই গেলে রামদা? রাত্রিটা এখানে থেকেই যাও না।

রামকিঙ্কর সভয়ে বললে, ওরে বাবা! সে কি হয়?

—কেন হবে না? তোমার কি দোতলার ঘরে না শুলে ঘুম হয় না?

লজ্জিতভাবে রামকিঙ্কর বললে, না, সেজন্যে নয়।

—তবে?

দ্বিধাভরে রামকিঙ্কর বললে, তোমাদের এই ত একখানি ঘর। অসুবিধা হবে না?

—কিছু অসুবিধা হবে না রামদা। পাশের ঘরের রোহিণীবাবুর নাইট ডিউটি চলছে। সেখানে আমরা বেশ শুতে পারব।

—তার কি দরকার সবিতা? তাছাড়া কয়েকদিন কলকাতা ছাড়া। কাজ-কর্ম সব কি অবস্থায় আছে, সে এক চিন্তা।

সারদাও এসে বললে, না, না সবিতাদি, ওঁকে আটকাবে না। উনি অনেক ঝামেলার মধ্যে আছেন।

সবিতা সারদার মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইল। সে বোধ হয় আশা করেছিল, সারদা প্রস্তাবটি সর্বান্তকরণে সমর্থন করবে। তার আগ্রহ নেই দেখে, সেও আর জোর করল না।

রামকিঙ্কর যখন বড় বাড়ীতে ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উঠানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই তার চোখে পড়ল, বালাখানায় আলো জ্বলছে। সে অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। বহুদিন বালাখানায় আলো জ্বলে নি। ইদানীং কিছুকাল থেকে বৃন্দাবনচন্দ্রও সন্ধ্যার পরে বালাখানায় বসতেন না। সন্ধ্যা হলেই অন্দর থেকেই সটান বাগানবাড়ী চলে যেতেন। শেষের দিকে যখন বাগানবাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখনও বালাখানায় বসতেন না, অন্দরেই থাকতেন।

সেই বালাখানায় হঠাৎ আলো জ্বাললে কে? মানুষের গলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে যেন।

যে চাকরটা ট্যাক্সির থেকে রামকিঙ্করের জিনিষপত্র নিয়ে আসছিল, ফিক করে হেসে সে বললে, ডাক্তারবাবু আছেন।

—ডাক্তারবাবু!—রামকিঙ্কর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—ডাক্তারবাবু কে?

—আমাদের ডাক্তরবাবু গো। মনোহর ডাক্তার।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: কারো অসুখ-বিসুখ না কি?

চাকরটা মালপত্র নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, তা জানি না। তবে ডাক্তারবাবু ক'দিন ধরে এখানেই আছেন। কিন্তু ওষুধ-পত্র কই আসছে না।

রামকিঙ্কর ভেবেছিল, মনোহর ডাক্তারের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। সারদার কথাতেই তার এই রকম বিশ্বাস হয়েছিল। সেই পর্ব আবার সুরু হবে এবং কর্তামার অনুপস্থিতিতে একরকম প্রকাশ্যভাবে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রামকিঙ্কর চাকরটার পিছু পিছু নিজের ঘরে গিয়ে ঘর খুলে বসল।

গিন্নীমা কি এইরকম একটা অনুমান করেছিলেন? নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্যে তাই কি সময় থাকতেই তিনি চলে গেলেন? মনে পড়ল তাঁর একটি কথা: 'বড় বাড়ীর মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করো'। তারও নিগূঢ় অর্থ এখন যেন স্পষ্ট হ'ল। কিন্তু সে কি করতে পারে? সে ত কর্মচারী মাত্র। যাঁর বাড়ী তিনি যদি মর্যাদা না রাখতে চান, কর্মচারী হিসাবে তার সাধ্য কতটুকু?

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, মনোহর ডাক্তারের সঙ্গে বৌরাণীর ভাব চটেছিলই বা কেন, আবার জমলই বা কেন? এ সম্পর্কে সারদা যা বলেছিল, তা সে কোনদিনই বিশ্বাস করে নি। আজও করে না। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বাস না করে সে ভালই করেছিল। এখন তার মনে হয়, গিন্নীমার ভয়েই বৌরাণী এ বাড়ীতে মনোহর ডাক্তারের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছিল। গিন্নীমার প্রস্থানের পরে এখন মনোহর এসে পাকা আস্তানা গাড়লে।

মনোহর ডাক্তারের সঙ্গে কোনদিন তার কলহ হয় নি। হবার কারণও ঘটে নি। তবু, কেন জানি না, মনোহর ডাক্তারের নাম সে সহ্য করতে পারে না।

চাকরটাকে সে জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারবাবু কি এইখানেই রয়েছেন না কি রে?

চাকরটা বললে, তাই ত দেখছি।

—কবে থেকে?

—ওই যে বললাম, তিন-চারদিন থেকে?

রামকিঙ্করের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, এইখানেই থাকা, এইখানেই খাওয়া?

বোঝা যাচ্ছে, এই ব্যাপারে দাসী-চাকর মহলে একটা খুব কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছে। চাকরটা জবাব দিলে, থাকবেন এখানে, খেতে যাবেন কোথায়?

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল। তার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত জ্বালা করছিল। মনে মনে বললে, তোমার থাকা-খাওয়া বের করছি, দাঁড়াও।

অথচ কি সাহসে বললে, তা সে নিজেও বুঝতে পারলে না।

চাকরটা বললে, কাল থেকে ডাক্তারবাবু সেরেস্তার কাগজ-পত্রও তলব করছেন।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: তাই না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমি নেই, কাগজ-পত্র দিচ্ছে কে?

—তিনকড়িবাবু। তিনি প্রথমে দিতে চান নি। ডাক্তারবাবু ধমকাধমকি করাতে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

রামকিঙ্কর তিনকড়িকে ডেকে পাঠালে। তিনকড়ি চাকরটার কথা সমর্থন করলে। ক্রোধে রামকিঙ্কর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। তখনই চাকর দিয়ে বৌরাণীর কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে সে অন্দরে গেল।

—কখন ফিরলেন?

মালতীর কণ্ঠস্বর সলজ্জ। কথা বলতে বাধছে। যেন অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গে এই প্রথম কথা বলছে।

এই মেয়েটির কত রূপই না রামকিঙ্কর দেখলে। নব-বিবাহিতা বধূ-বেশে প্রথম যখন এল, সে এক রূপ। মাতাল স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিতা অসহায়া মালতী, সে এক রূপ। কি করুণ, কি মর্মস্পর্শী! সেই রূপে রামকিঙ্করের সহানুভূতি এবং সমবেদনা সে আকর্ষণ করেছিল, যার জন্যে অমন যে দুর্দণ্ড-প্রতাপ গিন্নীমা এবং তাঁর অশেষহিতৈষী, তাঁরও বিরুদ্ধে সে যেতে দ্বিধা করে নি। তারপর বৌরাণীর হঠাৎ বোধ হয় একটা পরিবর্তন এল। নিজের সম্বন্ধে, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে একটা কিছু সে বোধ হয় স্থির করে ফেললে। মার খেয়ে আর সে কাঁদলে না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেলে। সেও অনেকদিন। তারপরে একটি সন্তান হ'ল। মদ্যপ, নিষ্ঠুর স্বামীর কাছ থেকে বাঘিনীর মত সতর্কতায় শিশুটিকে দূরে দূরে রাখতে লাগল। মার্বেল পাথরে খোদাই-করা সেই স্তব্ধ, গম্ভীর মূর্তি বেশ মনে পড়ে।

তারপর বৃন্দাবনচন্দ্রের আকস্মিক এবং রহস্যজনক মৃত্যু। অত্যন্ত দ্রুতবেগে কি যেন একটা ঘটে গেল। তারপরের যে রূপ তার সঙ্গে আগের রূপের কোন সম্পর্ক নেই। সেই রূপেরই আর একটি প্রকাশ এই সলজ্জভাব।

রামকিঙ্করের মনে হ'ল, মানুষও বহুরূপী। যখন যে পরিবেশে থাকে, তখন সেই পরিবেশের রঙ নেয়।

বললে, এই কিছুক্ষণ।

মালতী জিজ্ঞাসা করলে, সেখানে মায়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে এলেন ত? কোন অসুবিধা হবে না ত?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, দেখুন, নিজের বাড়ী থেকে বাইরে অন্য কোথাও গেলে কিছু অসুবিধা হয়ই। দেখে এলাম, গিন্নীমা সে সমস্ত এরই মধ্যে মানিয়ে নিয়েছেন। সেই বুড়ো ভদ্রলোক দু'বেলা খবর নেন। কিন্তু তারও দরকার হবে না। ক'টি বৃদ্ধা ভাড়াটে আছেন, তাঁরা সকল সময় গিন্নীমার সেবা-যত্ন করেন। মোটের ওপর, তিনি ভালই আছেন।

একটু চুপ করে থেকে মালতী জিজ্ঞাসা করলে, আপনি আসবার সময় কিছু বলে-টলে দিলেন?

রামকিঙ্কর বললে, বিশেষ কিছু নয়। দীর্ঘকাল ধরে এই এতবড় সংসার ওই একটি মানুষ বুকে করে ধরে-ছিলেন। আশ্চর্য, যে ক'দিন ছিলাম, এই সংসার সম্বন্ধে একদিনও একটি কথাও বলেন নি। যেন একে তিনি ভোলবার চেষ্টা করছেন। শুধু আসবার দিন যখন প্রণাম করলাম, তখন শান্তকণ্ঠে বললেন, রাম, তোমাকে

বলার কিছু নেই। শুধু লক্ষ্য রেখ, বড় বাড়ীর মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

রামকিঙ্কর হাসলে। সে হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল কি না জানি না, কিন্তু মালতীর মুখ এক ঝলক রক্তে রাঙা হয়ে উঠল।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারবাবুকে দেখলাম। উনি কি এখানেই থাকবেন?

মালতী সংক্ষেপে বললে, ক'দিন ত রয়েছেন।

রামকিঙ্কর বললে, সেরেস্তার কাগজ-পত্রও তলব করছেন শুনলাম। কিছু কি কাজকর্মও দেখাশোনা করবেন?

মালতী হেসে বললে, ওঁর ত খেয়াল। ক'দিন হয়ত করবেন। তারপর আবার হয়ত একদিন বাক্স-বিছানা গুটিয়ে ডিসপেনসারীতে চলে যাবেন। সবই ওঁর খেয়াল।

রামকিঙ্কর কিছু বললে না। কিন্তু মনোহর ডাক্তারকে তার চিনতে বাকি নেই। সে যে সত্য সত্যই কোনদিন বাক্স-বিছানা গুটিয়ে স্বেচ্ছায় চম্পট দেবে, এ আশংকা বৌরাণীর মনে যদি থাকেও, রামকিঙ্করের নেই। কিন্তু সে প্রথম দিনেই আর কথা বাড়ালে না।

(তেতাল্লিশ)

এমন বিপদে রামকিঙ্কর জীবনে কখনও পড়ে নি। তার বুকের ভিতর সব সময় যেন তুষের আগুন জ্বলছে। আগুন একটা নয়। তার দাহও বিভিন্ন রকমের।

প্রথম আগুন মনোহর ডাক্তার। তাকে তুষের আগুন বলা হ'ল। সে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ধিকি ধিকি জ্বলছে, সর্বক্ষণ। তার আহারে রুচি গেছে, রাত্রে নিদ্রা গেছে।

মনোহর তার উপর ছড়ি ঘোরায় না। বরং, বোধ হয় বৌরাণীর ইংগিতেই, অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারই করে। বৌরাণী তাকে কাছে এনে রেখেছে অন্য কারণে। এবং কাছে এনে রাখতে গেলে একটা উপলক্ষ্য দরকার। তাই তাকে কাজ দেওয়া হয়েছে খাতাপত্র দেখবার। বালাখানায় আসর জমিয়ে অপরিসীম গাম্ভীর্য ও আত্ম-তৃপ্তির সঙ্গে সে খাতাপত্র দেখাশুনো করে। কিন্তু এই বিষয়ে বৌরাণীর বোধ হয় তার উপর ভরসা কম। মনোহর ডাক্তার-মানুষ। এই কাজ সে দীর্ঘদিন অধ্যবসায়ের সঙ্গে করতে পারবে, এ বিশ্বাস বোধ হয় বৌরাণীর নেই। তা ছাড়া দোকান অথবা জমিদারী সেরেস্তার কাজের সে বোঝেই বা কি? সুতরাং রাম-কিঙ্করের মতন সৎ ও কর্মদক্ষ লোককে হারাতে সে চায় না।

বৌরাণী জানে, রামকিঙ্কর মনোহর ডাক্তারের উপর প্রসন্ন নয়। তার সন্দেহ এটা বোধ হয় ঈর্ষা। এবং এই সন্দেহ করে তরুণীসুলভ আত্মপ্রসাদও অনুভব করে।

পক্ষান্তরে মনোহরের রামকিঙ্করের উপর কোন ঈর্ষা নেই। পদে পদে রামকিঙ্করের বুদ্ধি ও যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে বরং সে তাকে মনে মনে শ্রদ্ধাই করে। এবং তার সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহারের ত্রুটি করে না। কিন্তু ঈর্ষাই কি না কে জানে, কিছুতেই তুষের আগুন নেভে না। রামকিঙ্কর বুঝতে পারছে না এই জ্বালা নিয়ে সে কতদিন এখানে কাজ করতে পারবে।

দ্বিতীয় আগুন সবিতা।

পথে হঠাৎ একদিন বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা। তার দাঁড়াবার সময় নেই। চন্দ্রনাথবাবুর বাড়াবাড়ি অসুখ। ডাক্তার সেখানে বসে রয়েছেন। বিশ্বনাথ ছুটেছে ইংজেকশনের ওষুধ কিনতে। আশা বিশেষ নেই, তথাপি একটা শেষ চেষ্টা।

শুনেই রামকিঙ্কর ছুটল বিশ্বনাথের বাড়ী। চন্দ্রনাথ-বাবু খাটের উপর শুয়ে। শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। পদপ্রান্তে বসে সুলোচনা তাঁর হিমশীতল পায়ে পাউডার ঘষছেন। পাশের একটা চেয়ারে শুষ্কমুখে ডাক্তার বসে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশ্বনাথ ওষুধ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরল। ডাক্তারবাবু তৈরি হয়েই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইনজেকশন দিলেন। একটু পরে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করলেন। এবং শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

সব শেষ।

দাহ সম্পন্ন করে রামকিঙ্কর বরাবর সবিতার বাসায় গেল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সবিতা রান্নাঘরে, আর সারদা ছেলে-মেয়ে দু'টিকে গল্প বলছে। সারদাকে দুঃসংবাদটা জানালে।

জিজ্ঞাসা করলে, কি করা যায় বল ত? সবিতাকে খবরটা জানাবে? না চেপে যাবে?

সারদা সবিস্ময়ে বললে, চেপে যাওয়া কি কথা, সে মেয়ে, তাকে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ করতে হবে।

—কিন্তু সে কি সহ্য করতে পারবে?

—না পারলেও জানাতে হবে।

সারদা সবিতাকে রান্নাঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে এল। সেখানে রামকিঙ্করের সামনে তাকে ধীরে ধীরে খবরটা জানালে।

সবিতা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। বোকার মত ক্যালক্যাল করে একবার রামকিঙ্করের আর একবার সারদার মুখের দিকে চাইতে লাগল। ওদের সান্ত্বনা-বাক্য তার কানে যাচ্ছিল বলে মনে হ'ল না। চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। হঠাৎ চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

তৃতীয় আগুন হচ্ছে সারদা।

নিজের চেষ্টায় সবিতা একটা মাষ্টারী জোগাড় করেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াতে হয়। লিখতে হয় ষাট টাকা, পায় চল্লিশ টাকা। তাতে সংসার চলে না। তাও বটে, এবং সবিতার যে রকম আত্মসম্মান জ্ঞান, যার জন্যে সে রামকিঙ্করের কাছেও সে হাত পাতে না, তার জন্যেও বটে, সারদাও কয়েক বাড়ীতে কাজ জোগাড় করেছে।

ভোরে উঠেই বেঁটে ছাতাটি হাতে নিয়ে সবিতা স্কুলে যায়। সারদা তার আগেই উঠে সবিতা, তার ছেলে-মেয়ে এবং নিজের জন্যে চা তৈরি করে। সবিতা চলে যাওয়ার পরে ছেলে-মেয়ে দু'টিকে কিছু খাইয়ে সারদাও কাজে চলে যায়।

তিন বাড়ীর কাজ। সারতে ঘণ্টা চারেক লাগে। ফিরতে ন'টা হয়। মেয়েটা শান্ত আছে, ঝামেলা ছেলেটিকে নিয়ে। আরও ঘণ্টা দেড়েক পরে সবিতা ফেরে।

এমনি করে দু'জনে মিলে কারও বিনা সাহায্যে দুঃখের সংসার একরকম করে চালাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সবিতার আকস্মিক পিতৃবিয়োগ হ'ল। আঘাতটা আরও গুরুতর এই জন্যে যে, চন্দ্রনাথবাবু কন্যার মুখ দর্শন করেন নি। সবিতার মনের মধ্যে অহর্নিশি একটা কথা নিরবচ্ছিন্নভাবে তোলপাড় করছে, পিতার মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষভাবে সেই দায়ী। সে পিতৃঘাতিনী।

যেমন স্কুলে যাবার, সে যায়। রান্না করার, সে করে। কিছু কিছু ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও করে। কিন্তু কিছুতেই তার যেন প্রাণ নেই। নিতান্ত অভ্যাস-বশেই করে। হাসে না, গল্প করে না, শরীর এবং মন তার ভেঙে যেতে লাগল।

একদিন ছেলেমেয়ে দু'টিকে দেখিয়ে সে বললে, এ দু'টি আমি তোমাকেই দিয়ে গেলাম, সারদাদি। আমি যখন থাকব না, তুমি ওদের দেখ।

এই যে একটি মেয়ে, সবিতা, উন্মাদ নয়, অথচ উন্মাদের মত, চোখের সামনে চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ যে রয়েছে, তার ছোঁয়াচ সারদার মনের ওপরে কম ঝাপটা দিচ্ছে না।

সারদা ধমক দিলে, ওসব কি কথা, সবিতাদি! ওসব বলতে নেই। তোমার ছেলে-মেয়ে তুমিই দেখবে। তোমাকেই মানুষ করতে হবে। ভেঙে পড়লে ত চলবে না।

ধমক খেয়ে সবিতা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বললে, কি হয় জান? তোমাকে বলতে বাধা নেই, আগে রোজ রাত্রে বাবাকে আমি স্বপ্ন দেখতাম। ছেলেবেলার মত আদর করে যেন তিনি আমাকে ডাকছেন। এখন হয়েছে কি, একলা থাকলে দিনের বেলাতেও বাবাকে স্বপ্ন দেখি। তিনি আমাকে ডাকেন।

একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে সবিতা সারদার দিকে চেয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে সারদা ভয় পেয়ে গেল।

এমনি একটি মেয়ের সঙ্গে একত্রে বাস মনের উপর কম চাপ দেয় না। রামকিঙ্করকে সব কথা সে বলতে পারে না। কিন্তু তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠতে লাগল। রামকিঙ্করের সে হয়েছে আরেক জ্বালা।

রামকিঙ্কর ওদের খবর নিতে প্রায় প্রত্যহই আসে। কিন্তু সারদার মেজাজের সামনে বেশীক্ষণ তিষ্ঠতে পারে না। একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই পালায়।

মধ্যে মাঝে মাঝে সিনেমা যাওয়া চলছিল। এখন সে সবও বন্ধ।

একদিন একটু সুযোগ বুঝে রামকিঙ্কর সারদার কাছে কথাটা পাড়লে। বললে, তোমাদের হোটেলে আমার একটু জায়গা হ'তে পারে সারদা?

সারদা ভ্রূকুঞ্চিত করলে: কেন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে?

—অনেকটা সেই রকমই। ওখানে বেশীদিন পোষাবে বলে মনে হচ্ছে না।

—কেন?

রামকিঙ্কর মনোহর ডাক্তারের কথা সংক্ষেপে বললে। বড় বাড়ীর ব্যাপারে সারদা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তার মতামতের মূল্যও যথেষ্ট।

সারদা নিঃশব্দে রামকিঙ্করের সমস্ত কথা শুনল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, আমি এমন ভাবি নি। তোমার জন্যে আমার খুব ভয় ছিল। অবশ্যি তোমার ওপর ভরসাও ছিল। যাই হোক ভগবান রক্ষা করেছেন।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু আমাকে?

সারদাও হেসে জবাব দিলে, তোমাকেও তিনি রক্ষা করেছেন।

—কি করে? চাকরিটা খেয়ে?

—চাকরি কি সংসারে ওই একটাই আছে? আর নেই?

—পাই নি ত।

সারদা ভরসা দিলে, দরকার হয় নি, পাও নি। যখন হবে, তখন ঠিক পাবে।

—মাঝখানের ক'দিন?

সারদা হেসে বললে, তখন আমাদের হোটেল ত আছে।

রামকিঙ্করের মনটা খুশী হ'ল। অনেকদিন পরে সারদা হাসলে।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে রামকিঙ্কর ক্ষত-বিক্ষত। একদিন সে আর পারলে না। বৌরাণীর কাছে গিয়ে বললে, এবার আমাকে ছেড়ে দিন। আমার আর ভাল লাগছে না।

বৌরাণী বিস্মিত হ'ল বলে বোধ হ'ল না। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাল লাগছে না? চাকরি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কেন ভাল লাগছে না? কি অসুবিধা হচ্ছে আমাকে বলুন।

বৌরাণীর কণ্ঠে সহানুভূতি। কিন্তু তাকে অসুবিধার কথা বলবে কি, রামকিঙ্কর নিজেই জানে না, কোথায় অসুবিধা হচ্ছে। কিছুই বলতে না পেরে সে অসহায় ভাবে ঘামতে লাগল।

বৌরাণী হাসলে। বেশ মিষ্টি করেই হাসলে। বললে, আমি জানি, আপনার অসুবিধাটা কোথায়। কিন্তু আপনাকে আমি ছাড়ব না। আসলে ওটা আপনার মনের ভুল। যান, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করুন গে।

রামকিঙ্কর বেকুবের মত ফিরে এল। কিন্তু কাজে মন বসাতে পারলে না। দুপুরে খানিকটা ঘুমোবার চেষ্টা করলে। ঘুম এল না। সন্ধ্যার মুখে সবিতাদের বাড়ী গেল। সবিতা এবং সারদা দু'জনেই শুষ্ক মুখে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে। ছেলে-মেয়ে দুটো বোধ হয় পাশের ঘরে খেলতে গেছে। ওকে দেখে দু'জনেই খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

তাকে ইসারায় ডাকলে। রামকিঙ্কর তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সারদা ফিস ফিস করে বললে, তোমার কাছে টাকা আছে?

কত টাকা, কি বৃত্তান্ত কিছুই জিজ্ঞাসা না করে রামকিঙ্কর তার মানিব্যাগ থেকে এক গোছা নোট বের করে সারদার হাতে দিলে।

সারদা ব্যস্তভাবে বললে, এত নয়, এত নয়। দশ টাকা হলেই হবে।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, হবে না। যা দিলাম, রেখে দাও। আবার দরকার লাগলে খরচ করবে। তখন হয়ত চাইতে লজ্জা করবে, চাইতে পারবে না।

ঠোঁট ফুলিয়ে সারদা বললে, আহা! এই ত চাইলাম। লজ্জা করেছি?

বলেই বললে, দরকার পড়ে নি, তাই চাই নি। অনেকদিন তুমি আস নি, তোমাকে বলা হয় নি। সবিতাদির চাকরিটা নেই।

—সেকি!

—হ্যাঁ। ওটা ত স্থায়ী চাকরি ছিল না, তার ওপর গরমের ছুটি এল। মুখপোড়া ইস্কুলটা করে কি জান? এই সময় অস্থায়ী দিদিমণিদের চাকরি ছাড়িয়ে দেয়। গরমের ছুটির পর আবার নেয়। যা একটা মাসের মাইনে বাঁচে।

সারদা রামকিঙ্করকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার খবর কি বল।

রামকিঙ্কর বললে, খবর বিশেষ কিছু নেই।

বৌরাণীর সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, বললে। কৌতুকে সারদার চোখ চকমক করে উঠল। ঠোঁটে বিদ্যুতের মত একটা হাসি ঝিলিক মেরে গেল। বললে, আমি জানতাম।

—কি জানতে?

—বৌরাণী তোমাকে ছাড়বেন না। বৌরাণী একটা আশ্চর্য মেয়ে। জীবনে এত মেয়ে দেখেছি, এমনটি আর দেখি নি।

তারপর হেসে বললে, আমাদের হোটেলে তা হ'লে তুমি আসছ না?

—দরজা ত খুলে রেখ, কখন কি হবে, কিছুই জানি না।

সবিতা কখন উঠে গিয়েছিল, ওরা খেয়াল করে নি। এখন সে চা নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওর দিকে চেয়ে

এক ফোঁটা রক্ত নেই। বললে, তোমার এ কি চেহারা হয়েছে সবিতা!

কোন জবাব না দিয়ে সবিতা ধীরে ধীরে বোধ হয় রান্নাঘরে চলে গেল।

সারদা বললে, মেয়েটা কি রকম যে হয়েছে, সে আর বলবার কথা নয়। এতদিন ওর ইস্কুল ছিল, সকালটা অন্ততঃ নিশ্চিন্ত থাকতাম। এখন যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি, ওকে চোখে চোখে রাখি। কিন্তু আমাকেও ত বাইরে কাজ করতে যেতে হয়। খুব ভয়ে ভয়েই থাকি, কখন কি করে বসে।

সভয়ে রামকিঙ্কর বললে, তাই না কি!

—কোনদিন মুখে কিছু বলে নি। কিন্তু আমার কেমন ভয় করে।

জেগে এবং ঘুমিয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে সবিতার স্বপ্ন দেখার কথা সারদা রামকিঙ্করকে বললে। বললে, সবিতাকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা!

সে জানে না, তাকে এবং সবিতাকে নিয়েও রামকিঙ্করের জ্বালা কম নয়।

(চুয়াল্লিশ)

কয়েক মাসের মধ্যেই সবিতার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ টের পাওয়া যেতে লাগল। আর কিছু নয়, শুধু আত্মহত্যার ইচ্ছা। তাকে একলা ঘরে রেখে যেতে সাহস হয় না। সারদা চার জায়গায় ঠিকের কাজ করছে। তার দুটো ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছে। সবিতা কখন কি করে, তাকে সবসময় চোখে চোখে রাখার জন্যে ও দুটোও ছেড়ে দিতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু অতখানি চাপ রামকিঙ্করের ওপর দেওয়া সংগত হবে না বিবেচনা করে ছাড়তে পারছে না।

একদিন রামকিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলে, ওখানে কেমন আছ?

—ভাল নয়।

সারদা ব্যস্তভাবে বললে, ভাল না থাকলেও এখনি যেন চাকরিটা ছেড়ে বস না।

—কেন বল ত?

—সবিতাদির জন্যে। এ অবস্থায় তার কোথাও চাকরি হওয়ার আশা নেই। ওর জন্যে দুটো কাজ আমি ছেড়েছি, বাকি দুটোও কতদিন রাখতে পারব, জানি না। এই অবস্থায় একমাত্র ভরসা তুমি। এই সময় তুমিও যদি চাকরি ছাড়, তা হ'লে আমরা একেবারে জলে পড়ব।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, ভাল কথা। আমি ভাবছিলাম, সারদার হোটেল আছে, আমার আর ভাবনা কি। তা না তোমরাই আমার ওপর ভরসা করছ?

সারদা হেসে বললে, আমার হোটেল ত আছেই, কিন্তু ক'টা মাস সবুর কর। সবিতা একটু সেরে উঠুক, তার একটা চাকরি-বাকরি হোক, তার পরে।

সবিতা কথাবার্তা বলা মধ্যে একেবারেই বন্ধ করেছিল। সেই সঙ্গে রান্না-বাড়ার কাজকর্মও। এখন একটু একটু কথা বলছে। শুধু জিভে যেন একটু জড়তা আছে। চোখের সেই শূন্য দৃষ্টিও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। এখন রান্নাঘরেও আবার ঢুকেছে। সেই সঙ্গে কাজকর্মও কিছু কিছু করে!

রামকিঙ্কর বললে, বেশ। বেঁধে মারে, সয় ভাল। এখন বুঝছি, বৌরাণী কি করে নিঃশব্দে বাবুর হাতের মার হজম করতেন।

সারদা খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, তুমি কি বোকা! বৌরাণী মার খেয়ে আনন্দ পেতেন।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: বল কি? মার খেয়ে আবার কেউ আনন্দ পায় না কি?

—পায়। সে তুমি বুঝবে না, বোঝার চেষ্টাও কর না। মোট কথা, অন্ততঃ আমরা একটু সামলে না নেওয়া পর্যন্ত চাকরিটা দয়া করে ছেড় না।

ঠিক কথা। রামকিঙ্কর চাকরি ছাড়বে না, যদি না ওরা ছাড়িয়ে দেয়।

আজকাল সন্ধ্যার পরে বৌরাণী বড় একটা ডেকে পাঠায় না। বৈষয়িক কাজকর্ম এবং হিসাব-নিকাশের ব্যাপারটা মনোহর ডাক্তারের হাতে। সেই দেখাশুনা করে। তার জন্যেও রামকিঙ্করকে মনোহরের কাছে যেতে হয় না। অন্য কর্মচারীর হাত দিয়ে কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয়। কিছু বোঝাবার দরকার হ'লে সেই বুঝিয়ে দেয়। এদিক দিয়ে রামকিঙ্কর মুক্তি পেয়েছে।

তাই সেদিন সন্ধ্যায় সারদাদের কাছ থেকে ফিরে এসে রামকিঙ্কর যখন শুনলে বৌরাণী ডেকে পাঠিয়েছে, তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি জানি, কি আবার ব্যাপার ঘটল। চিন্তিতভাবেই রামকিঙ্কর বৌরাণীর কাছে গেল।

মালতী জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় বেরিয়েছিলেন?

রামকিঙ্কর গোপন করবার প্রয়োজন বোধ করলে না। কাকে গোপন করবে? কিই বা গোপন করবে?

বললে, একটু সবিতার ওখানে গিয়েছিলাম।

মালতী জিজ্ঞাসা করলে, তার মাথাটা একটু সুস্থ হ'ল ?

রামকিঙ্কর অবাক। মালতী ঘরের ভিতর থেকে কি করে এ খবর পেল ?

বললে, একটু ভাল। কিন্তু আত্মহত্যার ইচ্ছেটা এখনও যায় নি।

—এ রকমটা হ'ল কেন ?

—বাপের আকস্মিক মৃত্যুর জন্তেই।

বৌরাণী ফিক করে হাসলে: নাও হ'তে পারে। ডাক্তার দেখিয়েছেন ? কোন সাইকোলজিষ্ট ? মেয়েদের অনেক ব্যাপার আছে, যা আপনারা বোঝেন না। অনেক সময় দেখা গেছে, বিয়ে দিয়ে দিলে এ রোগ সেরে যায়।

রামকিঙ্কর অবাক: বিয়ে !

—হ্যাঁ। ভাবছেন, পাত্র পাওয়া যাবে না ? যেতেও পারে। নয়ত, আপনি ত ওদের হিতৈষী। আপনি নিজেই বিয়ে করতে পারেন। অবশ্য সারদা যদি অনুমতি দেয়।

বৌরাণী হাস্য গোপন করলে।

রামকিঙ্করের পায়ের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত চিনচিন করে উঠল। তার মনে পড়ল, সারদার কথা: বৌরাণী একটি অস্বাভাবিক মেয়ে। মনে হ'ল, সারদা ওকে ঠিকই চিনেছে। ইচ্ছা হ'ল, গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু ততখানি সাহস নেই।

ভোরবেলায় সারদা যখন কাজে বেরোয়, তখনও অন্ধকার থাকে। এদিনও তাই ছিল। পাশে ছেলে-মেয়ে ছ'টি নিদ্রিত। তাদের ওপাশে সবিতা। সারদা উঠে সবিতাকে দেখতে পেলে না। ভাবলে, হয়ত বাথরুমে গেছে এমন অনেকদিন হয়। তারও কাজের তাড়া। সুতরাং সবিতার জন্তে অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল।

যখন ফিরল, তখন সূর্য উঠে গেছে। দূর থেকেই দেখলে বাড়ীর সামনে একটা প্রকাণ্ড ভীড়। পা চালিয়ে বাড়ীর সামনে এসে দেখলে, বহুলোক দরজার সামনে ভীড় করেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে একটি পুলিশ সেই ভীড় আটকাচ্ছে। সারদার বুকের ভিতরটা ঢিব ঢিব করে উঠল। কি আবার অঘটন ঘটল !

কিন্তু তখনও তার সবিতার কথা মনে হয় নি। ক'দিন থেকে সবিতা বরং একটু ভালই ছিল। কাজকর্ম করছিল, একটু একটু গল্প-গুজবও করছিল ! একেবারে যে হাসছিল না, তাও নয়। বস্তুতঃ তার উপর থেকে সারদার খরদৃষ্টি অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছিল। সুতরাং সবিতার কথা মনে হওয়ার কারণ ছিল না।

কিন্তু ভীড় ঠেলে ভিতরে গিয়েই সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। গলায় তখনও দড়িটা বাঁধা, বীভৎস মূর্তি।

সারদা তৎক্ষণাৎ বুঝলে, ভোরে কাজে বেরুবার সময় সে যে সবিতাকে দেখতে পায় নি, সে এই জন্তেই। তার আগেই হয়ত সে কার্য শেষ করেছে। এমনও মনে হ'ল, হয়ত তার আগে করে নি। তখনই খোঁজ করলে হয়ত এ কার্য নিবারিত হ'তে পারত। কিন্তু সে কথা ভাববারও সময় নেই।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দৃষ্টি থেকে এই বিভৎস দৃশ্য আড়ালে রাখবার জন্যে তাদের একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে সবিতার ছেলে-মেয়ে ছ'টিও আছে। তৎক্ষণাৎ রামকিঙ্করের কাছে এই দুঃসংবাদ পাঠানো হ'ল।

মৃতার আঁচলে একখানা চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে :

'পৃথিবীতে আসিয়া অবধি কাহাকেও আনন্দ দিতে পারি নাই। বাবা আমারই জন্য মারা গেলেন। মাও মৃত্যুশয্যায়। স্বামী পলাতক। এই জীবন রাখিয়া লাভ নাই। তাই আত্মহত্যা করিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। ছেলে-মেয়ে ছ'টির ভার সারদাদিকে দিয়া গেলাম। ইতি

সবিতা।'

কিন্তু পুলিশ তা হ'লেও ছাড়বে না। সারদাকে, এমন কি বাড়ীর প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত করে তুলল। বাড়ীর কাজকর্ম, রান্নাবাড়া, আপিস যাওয়া—সমস্ত বন্ধ। ক্ষুধার জ্বালায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বন্ধ ঘরের মধ্যে চিৎকার সুরু করেছে। ইতিমধ্যে রামকিঙ্কর এসে পড়ল। সে জমিদারী সেরেস্তার লোক। পুলিশের সঙ্গে যথেষ্ট দহরম-মহরম। অল্পায়াসে সে মর্গে লাশ স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করল। এবং নিজেও তাদের সঙ্গে গেল।

তখন বেলা পড়ে গেছে। কারও ঘরে উনোন জ্বলে নি। বাবুরা না খেয়েই আপিস চলে গেল। মেয়েরা তাড়াতাড়ি উনোন ধরিয়ে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিলে নিজেদের এবং ছেলেমেয়েদের জন্তে। আর সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগতা সবিতার উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ করতে

লাগল। তার পেটে পেটে যে এত বুদ্ধি ছিল, কেউ জানত না।

নির্বাক শুধু সারদা। সমস্ত বাড়ী নিঃশব্দে গোবরজল দিয়ে ধুয়ে সে সবিতার ছেলে-মেয়ে দু'টিকে নিয়ে রামকিঙ্করের অপেক্ষায় বসে রইল।

ছেলে-মেয়ে দু'টি থাকে থাকে, আর শুধু একটি প্রশ্ন করে, মাসী, মা কোথায় গেল?

সারদা বলে, হাসপাতালে।

—কখন ফিরবে?

—সন্ধ্যেবেলায়।

ছেলে-মেয়ে দু'টি ঘোরে-ফেরে আর সারদাকে জিজ্ঞাসা করে, মাসী, এখনও সন্ধ্যে হ'ল না ত?

সারদা জবাব দিতে পারে না। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ মোছে।

সহ-ভাড়াটিয়ারা সকলেই খুব ভদ্র। কেউ বা আপিস থেকে সকালে-সকালে ছুটি নিয়ে, কেউ বা আপিসের ছুটির পর সটান হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে রামকিঙ্কর ঠায় বসে। স্নান নেই, আহার নেই একবার একে ধরে, একবার ওকে ধরে। যাতে তাড়াতাড়ি মৃতদেহ ছাড়া পাওয়া যায়।

কিন্তু তার যো কি। ছাড়া পাওয়া গেল সন্ধ্যার অনেক পরে। তখন ভাড়াটিয়ারা সবাই জুটে গেছে।

রামকিঙ্করের টাকায় খাটিয়া এল, তোষক এল, ফুল এল। হরিধ্বনি করে সবাই শবদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল।

এতক্ষণ পর্যন্ত রামকিঙ্কর বেশ ছিল। কিছু উস্কো-খুস্কো, কিছুটা ক্ষুধা-তৃষ্ণাবোধহীন। শুষ্ক-শুষ্ক মুখ! কিন্তু শ্মশানে এসে শবদাহ যখন চিতায় শোয়ানো হ'ল—খোকাটিকে সারদা নিয়ে এসেছিল, সে যখন মুখাগ্নি করলে—তখন হঠাৎ রামকিঙ্কর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। অবিশ্রান্ত কান্না। অকস্মাৎ বাঁধ-ভাঙা কান্নার বন্যা।

সে কাঁদে কেন? তা সে নিজেও জানে না। তার চোখের সামনে ভাসছে অন্য সবিতা নয়, সেই কিশোরী সবিতা, যে প্রথম দিন তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। তাকে কি সে ভালবেসে ফেলেছিল?

দাহান্তে বাড়ী ফিরতে তাদের রাত দুটো বেজে গেল। তক্তাপোষের উপর বিছানায় রামকিঙ্কর শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে আসছিল। কিন্তু চোখে ঘুম নেই।

নিচের মেঝের উপর সারদা ছেলে-মেয়ে দু'টিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। তারও চোখে ঘুম নেই। মাথায় নানা দুশ্চিন্তা। এ কি বোঝা তার ঘাড়ের ওপর এসে চাপল।

কিছুক্ষণ উসখুস করে সারদা জিজ্ঞাসা করলে, ঘুমুলে না কি?

—না।

—আমি কি করব বল ত? এ কি বোঝা আমার ঘাড়ে চাপল!

রামকিঙ্কর বললে, ঠাকুর চাপিয়ে দিলেন। তুমিও ঘাড় পেতেই ছিলে। তুলে নাও আর কি করবে?

—আমি খেটে-খাওয়া মানুষ। খাটতে যাব, না এদের দেখব?

—খাটতে যাবে না।

—বেশ। তা হ'লে পেট চলবে কি করে?

রামকিঙ্কর পাশ ফিরে অন্ধকারেই তাকে দেখবার চেষ্টা করলে। বললে, ঠিক চলে যাবে।

—তার মানে তোমার বোঝা হয়ে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামকিঙ্কর বললে, কে কার বোঝা বয়, সারদা? ওসব কথা ভেবো না। অন্ততঃ সবিতার জন্যেও ছেলেমেয়ে দু'টিকে মানুষ করতে হবে। যা তুমি পার, তুমি করবে। যা আমি পারি, আমি করব। আসল বোঝা বইবেন ঠাকুর নিজে।

একটু থেমে বললে, শ্মশান থেকে যখন ফিরলাম, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। অথচ বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না। চোখের সামনে ভাসছে, সবিতার কিশোরী বয়েসের কচি মুখখানি। কড়া নাড়তেই মিষ্টি হেসে দরজাটা খুলে দিত। তারপরে সবিতা বড় হ'ল। নিজের ইচ্ছায় ভালবেসে বিয়ে করলে। সে মুখও দেখেছি। স্বামী-পরিত্যক্তা শীর্ণ মেয়েটির মুখও দেখেছি। কিন্তু তা মনে পড়ছে না। ভুলেই গেছি বোধ হয়। মনে পড়ছে, অনেকদিন আগেকার সেই কিশোরী মেয়ের মুখখানি।

সারদা চুপ করে রইল।

রামকিঙ্কর বললে, বৌরাণীকে সবিতার সব কথা একদিন বলেছিলাম। শুনে তিনি বলেছিলেন, ওর বিয়ে দিয়ে দিন। তা হ'লেই সেরে যাবে। এমন অনেকে নাকি সারে।

সারদা চমকে উঠল: কে বলেছিলেন? বৌরাণী?

—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সারদা বললে, আমিও এ কথা ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, তোমাকে একদিন ধরব: ওকে বিয়ে করবার জন্যে।

বিস্ময়ে রামকিঙ্কর বিছানার উপর উঠে বসল: আমাকে ধরবে ভেবেছিলে! হঠাৎ আমাকে কেন?

—যে নেই তার কথা শুনে আর কি হবে?

সারদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

রামকিঙ্কর গুম হয়ে বসে রইল।

ভোর হয়ে আসে। রাস্তায় ময়লা-ফেলা গাড়ির চলাচল সুরু হয়েছে। হোসপাইপে রাস্তা পরিষ্কার করার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই সময় প্রত্যহ সারদা উঠে কাজে যায়। কালও বেরিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলে, তা হ'লে কি করব? কাজে বেরুব না?

রামকিঙ্কর বললে, বললাম ত, না।

সারদা একটুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে, আর ভাবতে পারি না।

আমার মাথায় কিছু আসছে না। তুমি যা বললে, তাই করব। একটু বেলা হ'লে এক সময় গিয়ে ওদের জানিয়ে দিয়ে আসব, অন্য লোক দেখতে।

রামকিঙ্কর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছে না।

কাজ যে কিছু বেড়েছে, তা নয়। বেড়েছে ডাকা-ডাকিটা। কথায় কথায় বৌরাণী ডেকে পাঠায়। খানিকটা আজেবাজে গল্প করে। কথায় কথায় মনোহর ডাক্তারও ডেকে পাঠায়। এটা এমন হ'ল কেন? ওটা অমন হ'ল কেন? সেটা তেমন হ'ল না কেন? হ'লে কি ক্ষতি হ'ত? নিতান্ত অবান্তর প্রশ্ন করে। রাম-কিঙ্কর বিরক্ত হয়, কিন্তু নিরুপায়। এখন তার অবস্থা হয়েছে প্রায় সংসারী লোকের মত। সারদার জন্যে চিন্তা ছিল না। সারদা নিজের ভার নিজে বইতে পারে। দরকার হ'লে দু'দশ দিনের জন্যে তার ভারও। কিন্তু সবিতার ছেলে-মেয়ে দু'টি আছে। তারা সারদার হাত-পা বেঁধে রেখেছে। বলতে গেলে, রামকিঙ্করের ঘাড়ে একটা সংসার।

মনোহরকে তার কখনই ভাল লাগত না। এখন সেটা আরও বেড়েছে। মনোহরের চোখে যেন একটা ক্রূরদৃষ্টি। তাকে দেখলেই কি রকম করে চায়। সে দৃষ্টিতে রামকিঙ্করের আপাদমস্তক জ্বালা করে।

শুনে সারদা হাসে। বলে, হিংসে। বৌরাণী তোমাকে বারেবারে ডেকে পাঠান, তোমার সঙ্গে হাসি-গল্প করেন, সেটা সে সহ্য করতে পারে না।

রামকিঙ্কর বলে, বৌরাণী ডেকে পাঠান কাজে। কখনও কখনও হয়ত বিনা কাজেই। সে কি আমার অপরাধ?

সারদা হেসে বলে, অপরাধ তোমার নয়, কিন্তু হিংসে জিনিষটা যে সাংঘাতিক। বিছের কামড়ের মত তার যন্ত্রণা।

উপায় থাকলে রামকিঙ্কর এ চাকরি ছেড়ে দিত। মাঝে মাঝে তার এমনও মনে হয়, সারদাদের নিয়ে কলকাতার বাইরে, বাংলা দেশের বাইরে, অনেক দূরে, যেখানে কেউ তাদের জানবে না, চিনবে না, চেনবার অবকাশও হবে না, এমন জায়গায় গিয়ে বাসা বাঁধে।

কতদিন সারদার কাছে সে গল্প করেছে। বলেছে, এরাই হবে আমাদের ছেলেমেয়ে।

সারদার তাতে উৎসাহ যথেষ্ট। সাগ্রহে বলেছে, তাই চল।

কিন্তু বললেই ত যাওয়া যায় না। রোজগারের অন্য একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে। তার সুযোগই ত দেখা যাচ্ছে না।

রামকিঙ্কর প্রত্যহ খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে, কোথাও কোন চাকরি খালি আছে কি না। সুবিধামত বিজ্ঞাপন দেখলেই সেখানে দরখাস্ত করে। তার পরে যা হয়, জবাব বড় একটা আসে না।

এমনি করে মাসের পর মাস চলে যায়। রামকিঙ্করের মনের অশান্তি বাড়ে। কিছুতে সে শান্তি পায় না। অথচ প্রতিকারের কোন পথও নেই।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এল। চাকুরির নিয়োগপত্র। মোগলসরায়ের কাছাকাছি একটা জায়গায় কি একটা নতুন কারখানা খুলছে, সেইখানে। কিন্তু মাইনেটা তেমন বেশী নয়।

তা না হোক, রামকিঙ্কর মনে মনে বললে।

তা না হোক, সারদারও তাই মনে হ'ল।

কলকাতা শহরে দু'জনেই বিভিন্ন কারণে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাদের চেনা সমাজ থেকে দূরে গিয়ে তারা বাসা বাঁধতে চায়। নতুন জীবন আরম্ভ করতে চায়।

—তা হ'লে এটা নিয়ে নিই?

—নাও।

সারদার মুখে-চোখে হাসি।

বৌরাণীর কাছে যাওয়া-আসাটা রামকিঙ্করের এখন খুব সরগড় হয়ে গেছে। আর এত্তেলা করতে হয় না। সন্ধ্যার পরে রামকিঙ্কর সটান বৌরাণীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ভদ্রমহিলা একটু অসংযতভাবেই খাটে শুয়ে ছিল। রামকিঙ্করকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল। লজ্জিত ভাবে বেশবাস সংযত করে নিলে।

সাধারণতঃ ডেকে না পাঠালে রামকিঙ্কর বড় একটা আসে না। মালতী জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার? হঠাৎ? কিছু খবর আছে?

—আছে একটু।

কুণ্ঠিতভাবে রামকিঙ্কর পদত্যাগপত্র বৌরাণীর হাতে দিলে। সেখানা পড়তে পড়তে বৌরাণীর মুখ ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর। ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল। চিঠিখানা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে মালতী খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। প্রায় চিৎকার করে বললে, কি ভেবেছেন কি? কেন এখান থেকে চলে যাবেন? কি অসুবিধা হচ্ছে এখানে?

তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বরে রামকিঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। কোনমতে বললে, না, অসুবিধা কিছু হচ্ছে না।

—তবে? কেন যেতে চাচ্ছেন?

—বাইরে ভাল একটা চাকরি পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যঙ্গভরে মালতী বললে, সেইখানে সারদাকে নিয়ে বাসা বাঁধতে চান, এই না?

রামকিঙ্কর অস্বীকার করলে না। শুধু বললে, মনোহরবাবু ত রয়েছেন, এখানে কাজের কিছু অসুবিধা হবে না

—মনোহরবাবু ত রয়েছেন! মনোহরবাবু ত রয়েছেন! মনোহরবাবু রয়েছেন ত আপনার কি?

বলতে বলতে মালতীর সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠল। বাঘিনীর মত সে রামকিঙ্করের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অস্ফুটকণ্ঠে বার বার বলতে লাগল, আমি না ছেড়ে দিলে তুমি যেতে পার···আমি না ছেড়ে দিলে তুমি যেতে পার···

সমস্ত কথা রামকিঙ্কর অকপটে সারদার কাছে বললে। তার কণ্ঠে অপরাধীর সুর। কিন্তু সারদা রাগ করলে না! তার মুখ থেকে তিরস্কারের একটি বাক্যও বার হ'ল না। নতমুখে মৃদু হেসে সে শুধু বললে, এ আমি জানতাম।

সমাপ্ত

শিল্প ও সংস্কৃতি

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

শ্রীঅশোক সেন

বিখ্যাত সুইডিস নাট্যকার অগাষ্ট ষ্ট্রীণ্ডবার্গের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'কনফেশন অভ্ এ ফুল' বিদগ্ধ সাহিত্য-রসিকদের কাছে চিরকাল সমাদৃত হয়ে আসছে। নাট্যকার হিসাবে ষ্ট্রীণ্ডবার্গকে সঠিকভাবে বুঝতে হ'লে 'কনফেশন অভ্ এ ফুল' বা 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি' অবশ্যপাঠ্য হিসাবে ধরে নেওয়া দরকার। গেটে তাঁর 'সরোজ অভ্ ভার্দার'-এ ব্যর্থ প্রেমের যে বিরাট হাহাকার আমাদের শুনিয়েছেন তার গভীরত্ব মানব-মনের অন্তরের অন্তঃস্তলে গিয়ে যেমন আঘাত হানতে থাকে, তেমনি ষ্ট্রীণ্ডবার্গের 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি' পড়েও পাঠকের মন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। দু'টি রচনাতেই বেদনার গভীরতা এবং তীব্রতা এতটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে যে, বিনা দ্বিধায় এ দু'টি বইকে ইওরোপীয়ান সাহিত্যের দু'টি ক্ল্যাসিকস্ নামে অভিহিত করা যায়। 'কনফেশন অভ্ এ ফুলের' ভাবানুবাদ 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি' সুরু করবার আগে অগাষ্ট ষ্ট্রীণ্ডবার্গের মানুষ এবং সাহিত্যিক হিসাবে কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার।

আধুনিক নাট্যকারদের ভেতরে ষ্ট্রীণ্ডবার্গ ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী—তাঁর রচনার ভঙ্গি ছিল কাব্যিক আর নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নাটকের সম্প্রসারণ এবং বিবর্তনের ব্যাপারে যে নতুন আন্দোলন সেই সময় ইওরোপে সুরু হয়েছিল তার সঙ্গে ইবসেনের থেকে ষ্ট্রীণ্ডবার্গই ছিলেন অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। অন্য নাট্যকারদের থেকে যতটা তিনি পেয়েছিলেন, তার থেকে অনেক গুণ বেশী নিজে শিখিয়েছিলেন সমসাময়িক নাট্যকারদের।

আধুনিক ইওরোপের নব-নাটক ষ্ট্রীণ্ডবার্গের কাছে দু'বিষয়ে ঋণী। তাঁর রচিত ন্যাচারেলিষ্টিক প্লে-গুলি থিয়েটার লাইবার শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের রেপারটয়ারে সব সময় যুক্ত করা হ'ত। তা ছাড়া ইওরোপের অন্যান্য সব দেশের মঞ্চেও ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক নিয়মিত ভাবে অভিনীত হ'ত। এর ফলে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন। ষ্ট্রীণ্ডবার্গ মনে আশা পোষণ করতেন যে ভবিষ্যতে তিনি ফরাসী বা জার্মান ভাষাকেই তাঁর রচনার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবেন। সাহিত্যিক গোষ্ঠী তাঁর নাটকের মঞ্চরূপায়ণ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন এবং তাঁর রচনারীতির অনুকরণে অনেকে লিখতে সুরু করলেন। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক থিয়েটারগুলো অর্থাৎ যেখানে তাঁর নাটক তখন অভিনীত হ'ত—ষ্ট্রীণ্ডবার্গকে ঠিক জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারেন নি। কারণ তাঁরা যে সব শো করতেন তা সীমিত থাকত বিদগ্ধ সাহিত্যিক শ্রেণীর ভেতর। 'ইন্‌ফারনোর' প্রডাকসনের পরই ওদিক দিয়ে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ঠিক আগের কয়েক বছর এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে ইওরো-আমেরিকার সর্বত্র ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সবাই তাঁর নাটক পড়তে চায়, সবাই তাঁর নাটকের মঞ্চরূপ দেখবার জন্য পাগল। রাইনহার্ট যখন ষ্ট্রীণ্ডবার্গের 'এ ড্রিম প্লে' এবং অন্যান্য 'চেম্বার প্লেগুলো' মঞ্চস্থ করতে লাগলেন তখন চারিদিকে এই সুইডিস নাট্যকারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ষ্ট্রীণ্ডবার্গের মৃত্যুর পরও (১৯১২ সাল) তাঁর জনপ্রিয়তা কমল না— সমালোচকেরা এর কারণ নির্দেশ করলেন এইভাবে : "তাঁর শেষের দিকের নাটকগুলো যথার্থভাবে তৎকালীন পৃথিবীর সঙ্কটপূর্ণ এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার আলেখ্য তুলে ধরাতেই এটা সম্ভব হয়েছে।" ওই সব সমালোচক এই ধরনের ভবিষ্যৎ বাণীও করলেন যে ইওরোপের সামাজিক ক্ষত এবং ব্যাধিগুলো আরোগ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ থেকে ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাটকও অপসারিত হ'তে থাকবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি। দুই বিরাট বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যখন পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিল—ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক এবং তাদের মঞ্চরূপায়ণ দেখবার জন্য, বিরাট উত্তেজনা দেখা যেত নাট্যরসিকদের ভেতর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়েও তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এমন কি আমাদের দেশেও কয়েক বছরের ভেতর ষ্ট্রীণ্ডবার্গের কয়েকটি নাটক অনুবাদের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করা হয়েছে এবং দর্শকেরা এ সব নাটক মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছেন।

রাইনহার্ট যখন যশের উচ্চতম শিখরে উঠে গিয়ে-

ছিলেন নাটকের প্রডিউসার হিসাবে, সেই সময় তিনি ষ্ট্রীণ্ডবার্গের পরের দিকে লেখা নাটক ও চেম্বার প্লেজ-গুলোর মঞ্চরূপায়ণ করে প্রভূত যশ এবং খ্যাতি অর্জন করেন। এজন্য সে সময় কেউ কেউ এ ধরনের মতবাদও প্রকাশ করেছিলেন যে ঐ সব নাটকের বিরাট জনপ্রিয়তা সম্ভব হয়েছিল প্রযোজনার কৃতিত্বে। নাটকগুলোর নাট্যিক গুণের জন্যও নয়। প্রডিউসার হিসাবে রাইনহার্ট বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু নাটকগুলো যদি সাধারণ পর্যায়ের হ'ত বা সুগঠিত না হ'ত তা হ'লে তাদের মঞ্চরূপায়ণে মিরাক্যাল সৃষ্টি করবার কোন সুযোগই রাইনহার্ট পেতেন না। তা ছাড়া পরবর্তী সময়েও সুইডেন এবং অন্যান্য দেশে ঐ সব নাটক অন্যান্য পরিচালকের প্রযোজনায় বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে এবং ঐ সব প্রডাকসনে নাট্যকারের ষ্টেজ ডিরেকসন-ই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন নতুন ডিরেক্টররা।

আর এক বিষয়ে এইখানে আমার প্রতিবাদ জানিয়ে রাখি। কেউ কেউ বলেন ষ্ট্রীণ্ডবার্গের প্লে-গুলোকে সম্যকভাবে উপভোগ করা যায় মঞ্চরূপায়ণের ভেতর দিয়ে—পড়ে তেমন রস পাওয়া যায় না। এ কথা অবশ্য সব নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—কারণ নাটকের সমগ্র রূপায়ণ দেখতে হলে মঞ্চাভিনয় না হ'লে হয় না। তেমনি নাটক যদি ভাল না হয়, সে নাটককে মঞ্চাভিনয় করিয়ে ভাল করে তোলা যায় না। ভাল ষ্টেজ প্রডাকসন খারাপ নাটককে উপভোগ্য করে দিতে পারে, কিন্তু যে সব মহৎ নাট্যিক গুণ নাটকে নেই, তা নিজে সৃষ্টি করা প্রডিউসারের পক্ষে সম্ভব হয় না। ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাটকের মাহাত্ম্য তাঁর রচনার ভেতরই আছে, অভিনয়ের সময় হঠাৎ সেটা মঞ্চের পরিবেশে গজিয়ে উঠে না।

আসল কথা হচ্ছে ষ্ট্রীণ্ডবার্গের সমগ্র নাট্যরচনার ভেতর থেকে কোন বিশেষ মেসেজ পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায় ইবসেন এবং শ'য়ের রচনায়। অবশ্য ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক সম্বন্ধে উদ্দেশ্যহীনতার অভিযোগ কেউ করতে পারবেন না। এইট-টিজ অবধি তাঁর নাটকে স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলাদের প্রতি চরম ঘৃণার ভাব প্রকাশ করে গিয়েছেন ষ্ট্রীণ্ডবার্গ—আর 'টিল ডামাসকাস্' থেকে শুরু করে যে সব প্লে লিখেছেন, তাতে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আত্মার পরিশোধন এবং পরিমার্জনের দিকটা বর্ণিত হয়েছে।

অনেক সময় এই উদ্দেশ্যের ব্যাপারটাই নাটকের গতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় এটা বাদ দিলেও নাটকের কোন ক্ষতি হ'ত না। 'দি ফাদার' নাটকটি দর্শক বা পাঠককে অত্যন্ত গভীর ভাবে অভিভূত করে তোলে, কিন্তু সেজন্য নারীর ভয়াবহ আত্মিক স্বরূপটা ঐ রকম কদাকার ভাবে তুলে ধরবার যথাযথ প্রয়োজন আছে কি না এ প্রশ্নও মনের কোণে উঁকি দেয়। 'গুষ্টভ ভাসা' অত্যন্ত শক্তিশালী নাটক—কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের জন্য কেউ নাটকটি পড়ে অনুপ্রাণিত হবার চেষ্টা করবেন না। এ সব ক্ষেত্রে নাটকের উদ্দেশ্যটা হয়ে পরে গৌণ, নাট্যিক গুণের মাপকাঠিতেই নাটকের মূল্যের বিচার করা হয়।

আর এক বিষয়ে ষ্ট্রীণ্ডবার্গ ছিলেন অনন্যসাধারণ। তাঁর সমকালীন নাট্যকারেরা অন্য সাহিত্য বা সাহিত্যিকের কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করতে চাইতেন না। ষ্ট্রীণ্ডবার্গ যখনই কোন সাহিত্য বা সাহিত্যিকের কাছ থেকে কোন কিছু আহরণ করেছেন, নির্বিচারে ও নিঃসঙ্কোচে সেই ঋণ স্বীকার করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেছেন। বরং সময় সময় একটু বেশী জোর দিয়েই সে কথা বলেছেন। ১৮৮০ সালে তিনি নির্ভিকতার সঙ্গে ঘোষণা করলেন এমিলি জোলার আদর্শ অনুযায়ী সত্যিকার বাস্তববাদী নাটক লেখবার প্রচেষ্টা করছেন। ঠিক একই ভঙ্গীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলে বসলেন, তিনি মেটারলিঙ্কের শিষ্যস্থানীয়। এসব উক্তির ভেতর যথেষ্ট বাহুল্য আছে, কারণ যাকেই অনুকরণ করুন শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের নির্দ্ধারিত পথেই চলতেন এবং সে কথা তিনি নিজেও মনে মনে বেশ ভাল করেই জানতেন।

ষ্ট্রীণ্ডবার্গের বাস্তববাদী নাটকের ভেতর 'দি ফাদারে'র ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় জোলার একটি সুন্দর পরিচায়িকা সহ। থিয়েটার লাইবারে এটি অভিনীত হয় জোলারই পৃষ্ঠপোষকতায়। এই থিয়েটারের জন্যই ষ্ট্রীণ্ডবার্গ আরও দু'টি নাটক লেখেন—'মিস জুলি' এবং 'ক্রেডিটার্স্'। 'দি ফাদারের' পরিচায়িকায় জোলা লিখেছেন যে নাটকটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী সাহিত্যের নিয়ম-কানুন মেনে রচিত হয় নি। কিছুকাল আগে এক আমেরিকান সমালোচক আবার স্পষ্টভাবে বলেছেন 'দি ফাদার' এবং সমকালীন সময়ে লেখা ষ্ট্রীণ্ডবার্গের কয়েকটি নাটককে বাস্তববাদী রচনা বললে ভুল করা হবে—এগুলো আসলে অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে রচিত। একথা অবশ্য সবাই স্বীকার করেন যে, জার্মান এক্সপ্রেসনিষ্ট নাট্যকারেরা প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে ষ্ট্রীণ্ডবার্গের

লেখার থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িকদের সঙ্গে তুলনায় নাট্যকার হিসাবে তাঁর স্থান কোথায় এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁর অনুগামীরা বলেছেন "তিনি আধুনিকদের ভেতরেও আধুনিকতম"।

আমেরিকার ইউজিন ও'নিল—যাঁকে একালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে—স্ট্রীণ্ডবার্গকে গুরুর মত সম্মান এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছেন এবং তাঁকে যখন নোবল পুরস্কার দেওয়া হয় তখন স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রতি এক প্রশস্তি জানিয়ে বলেছিলেন, 'the greatest dramatic genius of modern times'. ও'নিল আরও বলেছিলেন—'স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক পড়েই বুঝতে শিখি কি ভাবে নাটক লিখতে হবে, এবং কত বিভিন্ন ভাবে নাট্যরচনা সম্ভব হ'তে পারে। ষ্টেজ-প্লে শেখবার জন্য আমি তাঁর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

বিখ্যাত নাট্যসমালোচক হ্যারল্ড ডার্ভনস স্ট্রীণ্ডবার্গ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন—"স্ট্রীণ্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২) চেয়েছিলেন এমন এক রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, যেখানে ভয়াবহকে দেখে আমরা শিউরে উঠ্‌তে পারি, হাসির জিনিষ দেখলে প্রাণভরে হাসতে পারি, যেখানে সত্যিকার জীবনের চেহারা দেখে আমরা ভয়ে পিছিয়ে না আসি। ধর্ম এবং সৌন্দর্যের মিথ্যা আবরণ দিয়ে ঢাকা বাস্তব জীবনের নানা কদাকার দিককে ঐ সব পর্দা সরিয়ে দিয়ে আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে স্ট্রীণ্ডবার্গ। His point was that true naturalism seeks out those vital points where the greatest conflicts befall." অনেক অপ্রিয় বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধেই তিনি লেখনী ধরেছেন এবং তাঁর বক্তব্যের ভেতর সবসময়েই একটা মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া গেছে। 'দি ফাদার' নাটকটি স্ট্রীণ্ডবার্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, একথা সবাই জানেন। টেক্‌নিকের দিক থেকেও এ নাটকে অনেক কিছু শেখবার আছে। এ ট্র্যাজেডীতে তিনি দেখিয়েছেন স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস থেকে নায়কের নিজের সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে মনে সংশয় জেগেছে। অথচ নায়ক-নায়িকার সংলাপে এতটুকু অশ্লীলতা নেই। কিছুটা এখানে তুলে দিলাম:

ক্যাপ্টেন—তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, তুমি আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছ, আমার বিচার-শক্তি লোপ পেয়েছে, মন শান্ত করে কোন কিছু চিন্তা করবার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আসলে তুমি চেয়েছিলে আমি পাগল হ'য়ে যাই। এখন যে কোনও মুহূর্তে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যেতে পারি। সুতরাং তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। নিজের স্বার্থের কথা ভেবে বল, তুমি কি চাও? আমি ভাল থাকব না পাগল হয়ে যাব? ভাল ভাবে বিচার করে দেখ। যদি আমি গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হই এবং মনের সমতা হারিয়ে ফেলি, তা হ'লে আমার চাকুরি চলে যাবে। আর তার ফলে বিপদে পড়বে তুমি। আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হ'লে ইন্‌সিওরেন্সের সমস্ত টাকা পাবে তুমি। কিন্তু আমি যদি আত্মহত্যা করি, সে টাকা তুমি পাবে না। সুতরাং যদি নিজের স্বার্থের দিকটাও দেখ, তা হ'লে আমাকে স্বাভাবিক ভাবেই জীবন কাটাতে দেওয়া উচিত হবে তোমার পক্ষে।

লরা—এটা কি একটা ট্র্যাপ?

ক্যাপ্টেন—ঠিকই ধরেছ। এখন তোমারই উপর নির্ভর করেছ এই ফাঁদে গিয়ে পড়বে, না এটাকে এড়াবার চেষ্টা করবে।

লরা—তুমি না বল্‌ছিলে তুমি আত্মহত্যা করবে? আমি জানি সে সাহস তোমার হবে না।

ক্যাপ্টেন—অতটা নিশ্চিত হয়ো না। মানুষ যখন একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে, এমন একজনকেও খুঁজে পায় না যাকে উদ্দেশ্য করে সে বাঁচবে—তখন সে মরতেই চায়।

লরা—তুমি তা হ'লে আত্মসমর্পণ করছ?

ক্যাপ্টেন—না, আমি তোমার কাছে শান্তির প্রস্তাব তুলে ধরছি!

লরা—কি সর্তে?

ক্যাপ্টেন—দয়া করে আমাকে আমার বিচার-বুদ্ধিটা অব্যাহত রাখতে দাও। আমাকে সংশয়মুক্ত কর। এ অন্তর্দাহ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

লরা—কি নিয়ে তোমার সংশয়?

ক্যাপ্টেন—বার্থার জন্ম-রহস্য।

লরা—এ সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ আছে না কি?

ক্যাপ্টেন—হ্যাঁ, আছে—এবং সেটা তুমিই জাগিয়েছ।

'নির্বোধের স্বীকারোক্তি' সম্বন্ধে স্ট্রীণ্ডবার্গ নিজেই বলেছেন 'এটি একটি ভয়াবহ রচনা। কেন এ বইটা লিখলেন এ নিয়েও তিনি পরে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কারণ বইটির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ বইটি তাঁর মাতৃভাষা সুইডিশে কখনও প্রকাশ করেন নি স্ট্রীণ্ডবার্গ। তাঁর প্রথম স্ত্রী সিরি ফন

এসেনের নির্মম হৃদয়হীন ব্যবহারে স্ট্রীণ্ডবার্গের সমস্ত অন্তরটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল—সেই ক্ষত-নিঃসৃত রক্তের অক্ষর দিয়ে যেন স্ট্রীণ্ডবার্গ রচনা করে-ছিলেন তাঁর মর্মভাঙা মর্মের কাহিনী এই "নির্বোধের স্বীকারোক্তি"। বিয়ের পর থেকেই স্ট্রীণ্ডবার্গ দাম্পত্য-জীবনে এতটকু সুখ পান নি। তখন থেকেই তাই মৃত্যু-চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে নিজের মনটাকে খুলে ধরতে চেয়েছেন রচনার ভেতর দিয়ে। যে লোকের কাছে জীবনের আর কোন মাধুর্যই অবশিষ্ট নেই। তিনি যখন তাঁর অন্তরজীবনের কথা বলেন, তখন তার ভেতর কোন মিথ্যার মিশ্রণ থাকতে পারে না। সহজ সরল নির্মম সত্যকেই তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেন। স্ট্রীণ্ডবার্গ ঠিক তাই করেছেন 'কনফেশন অভ এ ফুল'-এ।

The Great importance of the 'confession of a Fool' lies in the fact that it depicts the struggle of a highly intellectual man to free himself from the slavery of sexuality, and from a woman who is a typical representative of her sex.

এছাড়াও এ বইটির মাহাত্ম্য নির্ভর করছে এর প্রকাশ-ভঙ্গিতে—এর রচনাশৈলীতে। স্ট্রীণ্ডবার্গের অন্তরের তীব্র যাতনা ব্যথার দ্রাবকরসে পরিশুদ্ধ এবং পরিমার্জিত হয়ে শিল্পাকারে রূপায়িত হয়েছে তাঁর লেখায়।

পৃথিবীর সেরা শিল্প এবং সাহিত্যের মূলে থাকে বেদনা। সতী-বিরহেই শিবতাণ্ডবের সৃষ্টি হয়েছিল। নির্মমতম দৈবের প্রচণ্ড আঘাতই ইতিহাসকে মহৎ চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হ্যামলেটের ব্যথায়ভরা জীবনটাই তাকে সবার প্রিয় করেছে। 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি'র নির্বোধ, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সব দিক থেকেই নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। জীবনের কোন কিছু ঘটনাকে তিনি গোপন করেন নি—তবে তাঁর চিন্তাধারাটা অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নয়। নিজের আত্মিক জীবনটার উপরই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এই বইটিতে। নিজের অন্তরটাকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। তাই একই সঙ্গে তাঁর অন্তরের স্বর্গ এবং নরক—ভাল এবং মন্দ—আনন্দ এবং বেদনার দিকগুলো একে একে ফুটে উঠতে থাকে আমাদের চোখের সামনে। সাধারণ নভেলের সঙ্গে এ লেখার তুলনা হয় না—কারণ কল্পনায় অনুভব করে দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, সুখ প্রভৃতিকে ফুটিয়ে তোলা এক, আর নিজের জীবনে এ সবকে গভীর-ভাবে উপলব্ধি করে শিল্পানুমোদিত উপায়ে তার রূপায়ণ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জিনিষ।

'নির্বোধের স্বীকারোক্তি'র ভাবানুবাদ শুরু করবার আগে এই ভূমিকাটুকু জানা থাকলে রচনাটি বোঝবার সুবিধা হবে বলেই এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু করলাম।

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

প্রথম পর্ব

১৮৭৫ সালের ১৩ই মে—স্থান ষ্টকহম্।

রাজপ্রাসাদের পাশের দিকটার সমস্তটা নিয়ে ছিল রয়াল লাইব্রেরী। এরই সবচেয়ে লম্বা ঘরটায় আমি বসেছিলাম। এই বিরাট অট্টালিকার স্থাপত্য এবং সাজসজ্জা ছিল রকোকো ষ্টাইলের। দোতলার উপরদিকের চারপাশ ঘিরে গ্যালারি করা। সব জায়গায় বইতে ঠাসা—হাজারে হাজারে বই—বিস্মৃত অতীতের কত গভীর চিন্তা-ভাবনার সাক্ষ্য রয়েছে ঐ সব বইতে, যেগুলো যত্নভরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে থাকে থাকে ঘরের সেলফ্‌গুলোতে।

যে ঘরটিতে আমি বসেছিলাম সেখানে সর্বসমেত বারটি জানলা—এই জানলা দিয়ে বসন্ত কালের সূর্যরশ্মি এসে পড়ছিল সেল্‌ফের বইগুলোর উপর। রেনেসাঁসের ভল্যুমগুলো ছিল সাদা এবং সোনালী পার্চমেণ্টে বাঁধাই, সপ্তদশ শতাব্দীর বইগুলো কালো মরক্কো চামড়ায় রূপালী রং মিশিয়ে মাউণ্ট করা হয়েছিল। এর একশো বছর পরের ভল্যুমগুলোর কিনারার দিকগুলো ছিল লাল রংয়ের—এগুলো ছিল কাফ্-লেদারে মণ্ডিত। সাম্রাজ্যের যুগের সব বইগুলোর আবরণ ছিল সেই সময়ের রীতি অনুসারে সবুজ রং-এর চামড়ায়। আর আমাদের সময়ের যে সব বই, তার কাভারগুলো ছিল সব সস্তা দামের। সেল্‌ফে সেল্‌ফে প্রতিবেশীর মত পাশাপাশি দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম ব্রহ্মবিৎ এবং যাদুবিদ্যা বিশারদদের দার্শনিক এবং প্রকৃতিবিদ্যার পণ্ডিতদের, কবি ও ঐতিহাসিকের দলকে। পাশাপাশি অবস্থান করলেও এদের মধ্যে আজ কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই—এরা সবাই শান্তিতে বসবাস করছে। বিভিন্ন যুগের এবং বিভিন্ন বিষয়ের এইসব বইগুলো দেখে বারবার আমার ভূতাত্ত্বিক স্তরবিভাগের কথা মনে হচ্ছিল। মানব-সমাজের সভ্যতা, শিক্ষা, প্রতিভা, অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং অজ্ঞানের ইতিহাস যেমন ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন স্তরে যুগে যুগে স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবেই এসবের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন যুগের বইয়ের পাতায় পাতায়।

গোলাকার গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন এক

পুরানো বইয়ের কালেকশন্ ঠিকমত সাজিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করছিলাম—এ বইগুলো একজন নামকরা সংগ্রাহক লাইব্রেরীতে উপহার দিয়েছিলেন। সহজ উপায়ে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্ম ভদ্রলোক প্রত্যেক বইতে নিজের নাম এবং একটি আদর্শ বাণী ছেপে দিয়েছিলেন। এই বাণীটি ছিল ঈশ্বরের মহিমা-বিষয়ক। এদিকে আমি ছিলাম নাস্তিকদের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দিনের পর দিন এই কালেকশনটির সামনে দাঁড়িয়ে যখনই কোন বই খুলেছি, ঐ আদর্শ-বাণীটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আমার মনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে। আমার মনে হয়েছে লোকটি কি ভাগ্যবান, লোকটি কি সাহসী, জীবনে দুর্যোগ বা দুর্ভাগ্য এলেও সে আশাহত হয় নি ··আর আমি? আমার জীবন থেকে সমস্ত আলো, সমস্ত আশা যেন সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।

আমি জানি আমার জীবনে কোন উন্নতির আশা নেই। আমার পাঁচ অঙ্কের নাটকটি কোন দিনই মঞ্চস্থ হবার সুযোগ লাভ করবে না। চাকরিতে প্রমোশন অর্থাৎ লাইব্রেরীয়ান হবার পথে সাতজন আমার আগে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের প্রত্যেকেরই চমৎকার স্বাস্থ্য, চারজনের আবার ব্যক্তিগত অন্য ধরনের রোজগারও আছে। আমার মত একজন ছাব্বিশ বছরের যুবকের পক্ষে, যার মাসিক মাইনা মাত্র কুড়ি ক্রাউন, আর যার সম্বল বলতে, একটি পাঁচ অঙ্কের নাটক—আর এ্যাটিকেট টেবিলের ড্রয়ারে রয়েছে—নৈরাশ্যবাদী হওয়া ছাড়া:তার কি আর অন্য গতি আছে? আমাদের মত লোকেরা নাস্তিকতাবাদের মধ্যেই একটা চরম আনন্দ পেয়ে থাকে সমস্ত রকমের অসাফল্যের ভেতরও ঐ ধরনের মতবাদের থেকেই তারা এক রকমের সান্ত্বনা পায়। একেই বোধহয় বলা হয় এ্যাপোথিওসিস অভ্ স্কেপ্টিসিজম্। রাত্রের আহারের সংস্থান নেই, শীত শেষ হবার আগেই হয়'ত পয়সার জন্য ওভারকোট বাঁধা দিতে হয়েছে, নৈরাশ্যবাদীরা তাতেও মুষড়ে পড়ে না—নিজেদের সিনিক্যাল এটিচুডের থেকেই সব রকমের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করে নেয়।

আমি ছিলাম এক বিদগ্ধ বোহেমিয়ার (নিয়ম-রহিত শিল্পী সঙ্ঘ) সভ্য। নামডাকওয়ালা সব কাগজের লেখক, এবং সত্যিকার উচ্চমানসম্পন্ন—অথচ পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই, এমন সব পত্র-পত্রিকার রচনা শিল্পীদের অন্যতম। এছাড়া হার্টমানের 'ফিলসফি অভ্-দি আনকনসাসের' অনুবাদ করবার জন্ম যে সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, আমি ছিলাম তার একজন পার্টনার। সহজ প্রেমের পরিস্ফুটনের সহায়তা করবার জন্ম এই সময় একটি গোপন সঙ্ঘ স্থাপন করা হয়—এখানকারও আমি সভ্য ছিলাম। এ পর্যন্ত আমার লেখা দু'টি একাঙ্ক নাটক রয়াল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। অথচ এ সব সত্ত্বেও আমার আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে নিজের সংসার খরচ চালাতেই আমি হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতাম।

জীবন সম্বন্ধে আমার একটা বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। তাই বলে আত্মহত্যার প্রশ্ন কিন্তু কখনও আমার মনের কোনে উঁকি দেয় নি। বরং বেঁচে থাকবার জন্মই প্রাণপাত করে পরিশ্রম করতাম। শুধু নিজের বেঁচে থাকার কথা নয়, সমগ্র মানবগোষ্ঠী কি ভাবে বেঁচে থাকতে পারে এ সম্বন্ধেও যথেষ্ট চিন্তা করতাম। বহু লোকই পেসিমিজমকে হাইপোকাণ্ড্রিয়া অর্থাৎ অমূলক আতঙ্কগ্রস্ততার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। আসলে পেসিমিজম্ বলতে একটা শান্তিপূর্ণ অচঞ্চল এবং স্নিগ্ধতাপূর্ণ মনোবৃত্তির জীবন-দর্শ-কেই বোঝায়। আপেক্ষিকত্বের পরিমাপে প্রত্যেক বস্তুকেই নগণ্য হিসাবে প্রতিপন্ন করা যায়। সুতরাং অত্যন্ত সামান্য সব ব্যাপার নিয়ে জীবনে হৈচৈ করার কোন অর্থ হয় না। সত্য বলতে যা বুঝি, তাও ত পরিবর্তনশীল এবং স্বল্পায়ু। কত সময়েই ত দেখতে পাই, গতকাল যাকে সত্য বলে জেনেছি, আসছে কাল তা আমাদের অজ্ঞানতাজনিত ভ্রম বলে প্রমাণিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভুল আবিষ্কার করবার জন্ম বৃথা শক্তি এবং যৌবনের অপব্যয় করে লাভ কি? একমাত্র প্রমাণিত সত্য হচ্ছে যে সবাইকেই একদিন মরতে হবে। অতএব সে দিন না আসা পর্যন্ত বাঁচবার চেষ্টা করি? কিন্তু কার জন্ম বাঁচব? কি উদ্দেশ্য নিয়ে? হায়! কে বলে দেবে, কে আমাকে বলে দেবে এ প্রশ্নের উত্তর!

বইগুলো গোছাতে গিয়ে প্রচুর ধুলো নাকে মুখে ঢুকে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে আসছে। উঠে গিয়ে একটা জানলার সামনে দাঁড়ালাম—প্রশ্বাসের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন বাতাস গ্রহণ করলাম বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল টাট্‌কা লাইলাক এবং পপ্‌লারের গন্ধ। সামনের দিকে তাকালাম—উপরে বিরাট বিস্তৃত নীল আকাশ। নীচে ফুলের বাগান, তাতে কত রং-বেরং-এর ফুল, আগেই বলেছি সে সময়টা ছিল বসন্তকাল। আরও দূরে বন্দর, নানা দেশের—যথা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইউনাইটেড ষ্টেট্স, রাশিয়া, ডেনমার্ক—জাহাজ বন্দরে

এসে নোঙর করছে, তাদের মাস্তুলগুলো এবং নানা ধরনের পতাকা এখান থেকে বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

বইয়ের কথা ভুলে গিয়ে জানলা দিয়ে মাথা নুইয়ে দেখতে লাগলাম—মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন সদ্যস্নাত হয়ে উঠেছে। নীচে প্রহরীর দল কাউন্টের একটি সংগীতের তালে তালে কুচকাওয়াজে মত্ত ছিল। এই সংগীতে এবং পতাকাগুলো, নীল আকাশ, নানা বর্ণের ফুল দেখতে দেখতে এত আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে কখন একজন পোর্টার সেদিনকার ডাক নিয়ে অফিসে এসে ঢুকেছিল টের পাই নি। আমাকে সচকিত করে আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে সে চলে গেল। খামটার ওপও মেয়েলি হাতের লেখা। খামটা খুলে তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে ফেললাম। রোমাঞ্চকর কোন কিছু নিশ্চয় থাকবে! মনে মনে শিহরণ হচ্ছিল। ঠিক তাই!

"আজ বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় ৬৫ নম্বর পার্লামেণ্ট স্ট্রীটের সামনে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমার হাতে থাকবে একটি রোল অভ্ মিউজিক।" এর কিছুদিন আগে এক কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে আমি দারুণ নাজেহাল হয়েছিলাম এবং সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে প্রথম সুযোগেই নারী জাতির বিরুদ্ধে আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করব। এইবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল—সুতরাং দেখা করবই। শুধু একটা ব্যাপারে আমার একটু বাধবাধ ঠেকছিল। চিঠির ভেতর একটা আদেশব্যঞ্জক ভাব ছিল যা আমার পৌরুষকে যেন এসে আঘাত করছিল। এসব মহিলারা ভাবেন কি? পুরুষরা কি এত হেলাফেলা করবার জিনিষ? মহিলারা যেন মনে করেন আমাদের মতামতটা পর্যন্ত জানবার দরকার নেই—তাদের কাছে পরাজয় মানতে আমরা বাধ্য—সুতরাং তারা আদেশ করবে, আর আমরা তাই শুনব।

আগে থেকেই বন্দোবস্ত ছিল যে সেদিন বিকেলে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রমোদভ্রমণে বেড়াব। আর তা ছাড়া দিনের মধ্যভাগে সহরের একটি প্রধান রাস্তায় কোনও মহিলার সঙ্গে প্রেম করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়ে মিলিত হব, এ প্রস্তাবটাও খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল না। বেলা দুটোর সময় কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে গিয়ে হাজির হলাম—এখানেই সব প্রমোদ-ভ্রমণকারীদের একত্রিত হবার কথা ছিল। গিয়ে দেখলাম ইতিমধ্যে এণ্টি-রুমে অনেকে এসে ভীড় জমিয়েছে এদের মধ্যে কেউ কেউ পেশায় চিকিৎসক, আর কেউ কেউ দার্শনিক—সবাই আমাদের এক্কাকারসনের পুরো প্রোগ্রামটা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। ইতিমধ্যে আমি আমার মনস্থির করে ফেলেছিলাম। বহু ভাবে এপলজি জানিয়ে বললাম, আমি তাদের সঙ্গে যেতে পারব না। তারা এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল—আমার না যাবার কারণ জানতে চাইল। আমি চিঠিটা বের করে এক প্রাণী-বিদ্যাবিতের হাতে তুলে দিলাম। এ লোকটিকে সবাই মনে করত নরনারীর 'মন দেওয়া-নেওয়া' ব্যাপারের একজন বিশেষজ্ঞ। চিঠি পড়তে পড়তে মাথা নেড়ে লোকটি মন্তব্য করল:

"ব্যাপার মোটেই সুবিধাজনক নয়·········হয়ত বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে········হাল্কা সম্পর্ক স্থাপন করে খুশী হবে বলে মনে হয় না·········সংসার করবার ইচ্ছা, বুঝলে বালক বন্ধু,·········সোজা পথে চলতে চায়··· ·····যাই হোক তুমি যা ভাল বোঝ তাই করবে। আমরা প্রমোদভ্রমণ শেষ করে পার্কে এসে জড়ো হব—যদি মন চায় শেষের দিকেও ওখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলতে পার। এই মহিলা সম্বন্ধে আমার সমস্ত ধারণাটাই ভুলও হ'তে পারে ···"

ঠিক সময়মত নির্দিষ্ট বাড়ীর সামনে গিয়ে অপরিচিতা পত্রলেখিকার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাঁর হাতে থাকবে রোল অভ্ মিউজিক—নিশ্চয় বিয়ের প্রস্তাবই করবেন। হঠাৎ বেশ অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম—না, দেরি হয়ে গেছে—মহিলা এসে হাজির হয়েছেন, দু'জনে দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। তাঁকে দেখে আমার মনে যে প্রথম ইম্‌প্রেশন হ'ল—এই ইমপ্রেশনের যথেষ্ট মূল্য দিই আমি—সেটা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট ধরনের। তাঁকে দেখে তাঁর বয়স বুঝে উঠতে পারলাম না—উনত্রিশ থেকে চল্লিশের ভেতর যে কোন সংখ্যা দিয়ে তাঁর বয়স নির্দ্ধারিত হ'তে পারে। তাঁর সাজসজ্জার ভেতরও তাঁর খেয়ালী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। ভাবছিলাম মহিলার পেশা কি? আর্টিষ্ট না সাহিত্যিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। অন্যের উপর নির্ভরশীল, না মুক্ত এবং স্বাধীন। আধুনিক উগ্র ধরনের স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবীদার, না······অবাক বিস্ময়ে এই সব কথা ভাবছিলাম·········

মহিলা নিজেই পরিচয়-পর্বটা সেরে নিলেন। তিনি আমার এক পুরাণো বন্ধুর বাক্‌দত্তা—আমার এই বন্ধু ছিলেন অপেরা সিঙ্গার। বন্ধু না কি বলে পাঠিয়েছেন

যে এই মহিলা যতদিন সহরে থাকবেন আমি যেন তাঁর তদারক করি। পরে জানতে পেরেছিলাম মহিলার এই সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

মহিলা ক্রমাগত কথা বলে চলেছিলেন—আমার মনে হচ্ছিল একটি ছোট পাখী একটানা ভাবে কিচির-মিচির শব্দ করে চলেছে। আধঘণ্টা এভাবে তাঁর কথা শুনে তাঁর সম্বন্ধে যা জানবার জেনে ফেললাম। তাঁর চিন্তা-ধারাটাও আমার অজ্ঞাত রইল না। কিন্তু খুব একটা এই মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হলাম, তাও নয় জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি।

তাঁর বক্তব্য শোনবার পর বললাম: আমাকে কোন যুবতী নারীর খবরদারীর ভার দেওয়াটা বেশ বিপদজনক ব্যাপার। আপনি কি জানেন যে লোকে আমাকে সাক্ষাৎ শয়তানের অবতার বলে জানে।

মহিলা বললেন: এভাবে নিজের সম্বন্ধে ভাবতে আপনি ভালবাসেন। আপনার সম্বন্ধে কোন-কিছুই জানতে আমার বাকী নেই। আসল কথা হচ্ছে আপনি বড় অসুখী। আপনার অন্ধকারাচ্ছন্ন মনটাকে আলোতে টেনে আনতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার সম্বন্ধে সবকিছুই আপনি জানেন বলে মনে করেন? আপনি কি মনে করেন আপনার এই ধারণাটা নির্ভুল? আমার মনে হয় আমার বন্ধুবর এবং আপনার প্রতি বাক্‌দত্ত ভদ্রলোকটি অনেক আগে আমার সম্বন্ধে যে মনোভাব পোষণ করতেন, তারই কিছু আভাস আপনাকে দিয়েছেন। আমার বর্ত্তমান চরিত্রের সঙ্গে তাঁরও এখন কোন পরিচয় নেই—সুতরাং তাঁর ভুল মতামতের উপর নির্ভর করে আপনিও ভুল করে বসবেন না।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

এটা সত্যি আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য আজ পর্য্যন্ত সমালোচকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। রবীন্দ্র গদ্য-সাহিত্যের সম্বন্ধে দু'-একটি গ্রন্থের দু'-একটি অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা ছাড়া আমার চোখে কিছু পড়েনি। কিন্তু আমার মনে হয় যে রবীন্দ্র-সাহিত্য সঠিকভাবে বুঝতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব, তাঁর সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড ও বিভিন্ন লেখকদের বিষয় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানাও নিতান্ত প্রয়োজন।

আলোচ্য বিষয়ের সাথে প্রগাঢ় পরিচয়, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রামাণ্য যুক্তি, সুনির্ম্মল হাস্যরস ও সর্ব্বোপরি এক অপূর্ব্ব সৃজনী কল্পনা সমালোচক রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের নানা সময়ে সাহিত্যের সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁর অনেকগুলি চিঠিতেও আমরা তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা ও আপন কবিত্বসত্তার বিকাশের বিষয়ে অভিমত দেখতে পাই। এগুলি ক্রমান্বয়ে পড়ে গেলে দেখা যায় যে, বয়স, জীবনের অভিজ্ঞতা ও রসানুভূতির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হ'তে থাকে।

কৈশোরেই কবির সমালোচনা শক্তির উন্মেষ হয়েছিল, বয়সের সাথে সাথে তা পরিণতি লাভ করে এবং সেই পরিণত সমালোচনা-শক্তি তাঁর শেষদিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। এই জন্যই তাঁর লেখায় আমরা জরার বা বার্দ্ধক্যের কোন লক্ষণ দেখি না। নিজের শক্তির সম্বন্ধে তিনি যতটা সজাগ ছিলেন নিজের ত্রুটির বিষয়ও প্রায় ততটা সচেতন ছিলেন। এই সচেতন বোধশক্তি, এই বিচারবুদ্ধি, এই আত্ম-বিশ্লেষণ, এই আত্মসমালোচনা না থাকলে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই এত বড় কবি হ'তে পারতেন না। তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসবে কলিকাতা নগরীতে তাঁকে যে বিরাট অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে কবি তাঁর নিজের লেখার দোষ ও ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করেছিলেন।

"অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্ব্বে, নানা অবস্থায়, সুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনও নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জ্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই।"

(বিচিত্রা, সপ্ততিবর্ষপূর্তির প্রতি-ভাষণ, পৃঃ ৩১৫)

বার্দ্ধক্যে তাঁর লেখায় নানারকম দুর্ব্বলতা আসতে পারে সে বিষয়ে তিনি কতটা সতর্ক ছিলেন তা তাঁর 'শেষের কবিতা' পড়লে সহজেই বোঝা যায়। সেখানে আমরা অমিত রায়কে বলতে শুনি :

যে সব কবি ষাট-সত্তর পর্য্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না, তারা নিজকে শাস্তি দেয় নিজকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারিদিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাঙচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্ব্বের লেখা থেকে চুরি সুরু করে হয়ে পড়ে পূর্ব্বের লেখার রিসীভর্স অফ ষ্টোলন্ প্রপার্টি। (পৃঃ ২০)

জীবনের শেষদিনে তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর কবিতা "গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী"। তাই তিনি জানালেন :

> কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
> কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জ্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি
> সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
> সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
> নিজে যা পারিনা দিতে নিত্য আমি থাকি
> তারি খোঁজে।

জীবনস্মৃতিতে কবি আমাদের নিজে জানিয়েছেন যে জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক পত্রিকায় তাঁর সমালোচনা শক্তির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখ-সঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী এই তিনখানি কবিতার বই অবলম্বন করে জ্ঞানাঙ্কুরে তিনি তাঁর প্রথম সমালোচনা প্রকাশিত করেন। কবি নিজের প্রতি কৌতুক করে বলেছেন যে খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্যের কি কি লক্ষণ সে বিষয়ে তিনি 'অপূর্ব্ব বিচক্ষণতার সাথে' লিখেছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তাঁর এক বিশেষ বন্ধু এসে তাঁকে জানায় যে একজন বি.এ. তাঁর এই লেখার জবাব লিখছেন। এ খবর শুনে কবির নাকি আর বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না।

তিনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে লাগলেন যে খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য সম্বন্ধে তিনি যে কীর্তিস্তম্ভ খাড়া করে তুলেছিলেন তা বড়ো বড়ো কোটেশনের নির্মম আঘাতে সমস্ত ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ও পাঠক সমাজে তাঁর মুখ দেখাবার পথ একেবারে বন্ধ। সৌভাগ্যবশতঃ সেই বি. এ. সমালোচকের কবি কোনদিন দেখা পান নি।

এর পরে ১২৮৪ সালে ভারতীতে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনাটিতে তাঁর ভাবীকালের কিছু সম্ভাবনা পাওয়া যায় যদিও তারুণ্যের চুর্বলতা এতে সুস্পষ্ট। মাইকেলকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এই তীব্র আক্রমণাত্মক সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সমালোচনার সমধর্মী নয়। তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের সমালোচনায় আমরা তাঁর সুরুচি ও লেখকদের প্রতি সহৃদয় সহানুভূতি দেখতে পাই। মেঘনাদবধ কাব্যকে তিনি 'নামমাত্র মহাকাব্য' বলেছিলেন। ঐ কাব্যে কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড নেই। মহাকাব্যে যে এক অভ্রভেদী বিরাট মূর্ত্তি থাকে তা এতে নেই। না আছে এতে কোন মহৎ চরিত্র সৃষ্টি, না আছে কোন মহৎ কার্য্য বা মহৎ অনুষ্ঠান। চরিত্রগুলিতে অনন্যসাধারণতা নেই, অমরতা নেই। রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করে একটা যুদ্ধের আয়োজন করতে পারলেই মহাকাব্য হয় না। মাইকেল কেবল নূতন সৃষ্টি করতে অক্ষম হন নি তা নয়, তিনি অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করেছেন। তিনি জোর-জবরদস্তি করে কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ-নরক বর্ণনার অবতারণ করেছেন। তিনি তার কাতর-পীড়িত কল্পনার কাছ থেকে টানা-হেঁচড়া করে গোটাকতক দীন দরিদ্র উপমা ছিঁড়ে একত্র জোড়া-তাড়া লাগিয়েছেন। ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত তা তিনি করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ সে বয়সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মেঘনাদবধ কাব্য 'ধূমকেতুর মত চুর্দ্দিনের জন্য তার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ নিয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কা বর্ষণ করে বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক অন্ধকার রাজ্যে গিয়ে প্রবেশ করবে।' রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের গরল উদ্গারিণী লেখনীর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। তবে এই অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের যে দোষগুলির বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা তাঁর বিশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক। ভাষার কৃত্রিমতা মেঘনাদ-বধ কাব্যের সত্যিই একটা গুরুতর দোষ এবং এ জন্যই যদিও মাইকেল অসংখ্য নূতন শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন তার একটাও বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয় নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উত্তর জীবনে মাইকেলের 'অসামান্য কবিত্বশক্তির' প্রশংসা করেছেন এবং সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধে মাইকেলের বিদ্রোহী মনেরও সমর্থন করেছেন। (সাহিত্য পৃঃ ১১৪)

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এল এক অপূর্ব্ব সংযম ও সুরুচিবোধ। তিনি বুঝতে পারলেন যে কেবল ধর্ম্মের জন্য নয়, সৌন্দর্য্য ভোগের জন্য, কাব্য বিচারের জন্যও সংযম অপরিহার্য্য। সংযম আমাদের সৌন্দর্য্য ভোগের গভীরতা বাড়িয়ে দেয়। শুদ্ধভাবে নিবিষ্ট না হ'তে জানলে আমরা সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থল থেকে রস উদ্ধার করতে পারি না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা বা সৌন্দর্য্য উপভোগ করা অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম্ম নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের সার্থক কাব্যে ও সমালোচনায় আমরা তাঁর অপূর্ব্ব সংযম দেখতে পাই। অন্য লেখকদের সাহিত্যেও এই সংযম গুণটি তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করেছে। প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার বর্ণনায় কালিদাস যে সংযম দেখিয়েছেন তার প্রশংসা তিনি কয়েকবার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

এই ধ্যানমগ্ন চুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়াছেন; এবং সেই নিষেধের সংকেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

শকুন্তলা নাটকটির সমালোচনার পরিশেষে তিনি আবার মন্তব্য করলেন :

এমন আশ্চর্য্য সংযম আমরা আর কোন নাটকেই দেখি না। ...শকুন্তলার মত এমন প্রশান্ত গভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেক্‌স্‌পিয়ারের নাট্যাবলীর মধ্যে এক-খানিও নাই।

কালিদাসের শকুন্তলায় সংযম যা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল তা তাঁর নিজের কাব্য ও সমালোচনারও আদর্শ হয়ে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সমালোচনা-প্রতিভার পরিচয় আমরা ১৩০১ সন থেকে পাই। ১৩০১ থেকে ১৩১৪ এই চোদ্দ বছর তাঁর সাহিত্য সমালোচনার যুগ বললে বোধ হয় ভুল হবে না। সে সময়ের তিনটি পত্রিকায় ভারতী, সাধনা ও বঙ্গ দর্শনে—তাঁর সাহিত্য সমালোচনা একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে।

এই প্রবন্ধগুলি ১৩১৪ সনে সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য এই তিনটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। এর ২৯ বছর পরে ১৩৪৩ সনে সাহিত্যের পথে তাঁর চতুর্থ সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের স্বরূপ রবীন্দ্র-নাথের শেষ সমালোচনা গ্রন্থ। চুর্ভাগ্যবশতঃ কবির জীব-

দশায় এটি প্রকাশিত হ'তে পারে নি। এই গ্রন্থগুলিতে তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব ও বিভিন্ন লেখকদের বিষয়ে সমালোচনা পাই। এ ছাড়া অনেকগুলি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রেও তাঁর সাহিত্যের বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ছড়িয়ে আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অপূর্ব্ব রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হ'লে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের অন্ততঃ কয়েকটি মূল কথা জানা দরকার। যদিও তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে ভারতীয় রসবাদের ও পাশ্চাত্ত্যের রোমান্টিক সাহিত্য-সমালোচকদের কিছু প্রভাব অবশ্য আছে, তথাপি বিশ্বের সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মৌলিক দান স্বীকার করতেই হবে। নিজের সুদীর্ঘ কবি-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়ে তাঁর মতামত দিয়ে গেছেন। সাহিত্যের পথে গ্রন্থটির সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি আমাদের জানিয়েছেন:

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্তরে বাহিরে রসের যে পরিচয় পেয়েছি আমি তারই কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছি। (পৃঃ ৩১)

তাই তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে কোন পুঁথিগত তথ্য নেই, আছে প্রধানতঃ তাঁর কবি-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে সাহিত্যের সমালোচনা পছন্দ করতেন না। এ রকম সমালোচকদের তিনি ব্যবসাদার বিচারক বলেছেন এবং কয়েকবার এদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। সাহিত্যের বিচারক প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি এই ব্যবসাদার বিচারকদের বিষয়ে এই মন্তব্য করেছেন:

"তাহারা সারস্বতপ্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁক-ডাক, তর্জ্জন-গর্জ্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে, অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে।...... তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই।" (পৃঃ ২৭-২৮)

যেমন সাহিত্য সৃষ্টিতে তেমন সাহিত্য বিচারেও এক একজনের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকে রবীন্দ্রনাথ এই মতটি পোষণ করতেন। ঐ প্রবন্ধটিরই এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

এক একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না, যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

(সাহিত্য পৃঃ ২৭)

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ নিজে এই রকম একজন প্রতিভাশালী সর্বকালীন বিচারক।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর জীবন-দর্শনের উপরে গড়া। তিনি নিজেই একথা বলেছেন যে তাঁর কবিজীবন ও ধর্মজীবন এক অবিচ্ছেদ্য মিলন সূত্রে গাঁথা ছিল। কৈশোর অবস্থা থেকেই তিনি উপনিষদের মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করেছেন। ঐ শ্লোকগুলি তাঁর সমস্ত সত্তায় অনুপ্রবেশ করেছিল। উপনিষদের ঋষিদের মত তিনি এক সর্ব্বব্যাপী প্রাণের উপলব্ধি করেছিলেন। এই বিরাট বিশ্বকে তিনি এক নিরবচ্ছিন্ন সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছিলেন। সেই অখণ্ড সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে তিনি সাহিত্যও বিচার করেছেন। তাই দেখি তিনি সাহিত্য-বিচারে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার প্রাধান্য দেন নি। তাঁর মতে ঐ রকম পদ্ধতিতে সাহিত্যের উপাদানগুলি খণ্ড খণ্ড করে আলোচনা করলে সাহিত্যের সামগ্রিকতার বিষয়ে আমরা দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি। এতে আমাদের রসাস্বাদনের আনন্দ ক্ষীণ হয়ে যায়। এইজন্য আমরা দেখতে পাই যে শকুন্তলা নাটকের সমালোচনার প্রারম্ভে গেটের ঐ নাটকটির সম্বন্ধে বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধৃত করে তিনি গেটের সমালোচনা পদ্ধতির এই বলে প্রশংসা করেছেন যে গেটে

কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। একটা মাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপ-বর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ঐ নাটকটির সমালোচনায় ও নাটকটিকে প্রথমে সমগ্রভাবে দেখে পরে এক এক অঙ্ক ধরে তার গুণগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। পরিশেষে নাটকটিকে আবার এক অখণ্ড সৃষ্টিরূপে দেখেছেন। শেক্‌স্‌পিয়রের টেমপেষ্ট নাটকের সাথে তুলনা করে এর বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। এইটিই হ'ল রবীন্দ্রনাথের সার্থক সমালোচনার বিশেষ ধারা। প্রথমে একটি সাহিত্য বা একজন লেখককে সমগ্রভাবে দেখে পরে তার বিশ্লেষণ করে

তার দোষগুণ বিচার করেছেন এবং প্রবন্ধের শেষদিকে আবার ঐ সাহিত্যের মূল কথাটি আমাদের সামনে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার এই পদ্ধতি আমাকে কীট্‌সের Ode On a Greecian urn-এর আঙ্গিকের (technique) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানেও দেখি কবি কীট্‌স পাত্রটিকে প্রথমে সমগ্রভাবে দেখে পরে তার গায়ে যে নানা রকম ছবি আঁকা ছিল তার বিষয়ে বলেছেন ও শেষে আবার ঐ পাত্রটির মূল বাণীটিকে সে বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন। বিশ্বসাহিত্য-শীর্ষক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছেন :

প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব, এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব।

(সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য, পৃঃ ৭৬)

১৯৩৪ সালে লেখা সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথকে আবার আমরা এই সমগ্র দৃষ্টির উপর জোর দিতে দেখি। তিনি কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লবের বিষয়ে বিরাট গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন এইজন্য যে কার্লাইল ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে খণ্ড খণ্ড অসংখ্য ঘটনা ঘটেছিল তাদের বাছাই করে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটা সমগ্রতার ভূমিকায় দেখিয়েছেন ও আমাদের মন ঐ সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে পায়।

খাঁটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ থাকতে পারে, অনেক অত্যুক্তি, অনেক ঊনোক্তি হয়ত আছে এর মধ্যে, বিশুদ্ধ তথ্য বিচারের পক্ষে যেসব দৃষ্টান্ত অত্যাবশ্যক তার হয়ত অনেক বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু কার্লাইলের রচনায় যে সুনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিত ভাবে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হতে বাধা পায় না, এইজন্যে ইতিহাসের দিক থেকে যদি বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ।

(দীপিকা, সাহিত্যের তাৎপর্য, পৃঃ ৪৫০)

সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দুটো জিনিস দেখতে বলেছেন এবং নিজেও সেই দুটো জিনিস দেখেছেন। প্রথমটি হ'ল : বিশ্বের উপর সাহিত্যিকের হৃদয়ের অধিকার কতখানি। দ্বিতীয় : তা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হয়েছে কতটা। কবির কল্পনা-সচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। কিন্তু রচনা-শক্তির নৈপুণ্য সাহিত্যে মহামূল্য। যে মানস-জগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে উঠছে তাকে বাইরে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে হৃদয়ের ভাব উদ্রিক্ত হয়। সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ—তাদের হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করতে হয়। এই হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার কাজে মেয়েদের পুরুষের মত নিতান্ত সোজাসুজি সাদাসিধে ছাঁটাছোটা হ'লে চলে না। তাদের হ'তে হয় সুন্দর। তাই মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ, আভাস, ইঙ্গিত থাকা চাই। সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করবার জন্য অলঙ্কারের, রূপকের, ছন্দের আভাসের ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন বিজ্ঞানের মত নিরলঙ্কার হ'লে তার চলে না। রবীন্দ্রনাথের মতে চিত্র ও সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ।

তাই দেখি যে সব লেখকদের কাব্যে চিত্র ও সঙ্গীত প্রাধান্য পেয়েছে তাঁরা তাকে আকৃষ্ট করেছে এবং তাদের তিনি বার বার প্রশংসা করেছেন। কালিদাসের কাব্য, বানভট্টের কাদম্বরী ও ইংরেজ কবিদের মধ্যে কীট্‌স তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। এঁদের তিনি স্বগোত্র বলে জানতেন। ১৮৯৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিটিতে তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন :

আমি যত ইংরেজ কবি জানি সবচেয়ে কীটসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা বেশী করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে, অমন মনের মত কবি আর নেই।...কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দ সম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতান মিশেছে—যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের নাড়ীর যোগ আছে। টেনিসন, সুইন্‌বর্ন্‌ প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে খোদা ভাব আছে—তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না। টেনিসনের 'মড' কবিতায় যে সমস্ত লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং সুতীব্র হৃদয়বৃত্তি দ্বারা উজ্জ্বলরূপে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তবু মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশী অন্তরঙ্গ রূপে সত্য। টেনিসনের অচেতন কবি যেসমস্ত ছত্র লেখে, টেনিসনের সচেতন আর্টিষ্ট তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। কীটসের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। সেইটে আমাকে

তারী আকর্ষণ করে। কীট্সের লেখা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয় নি, কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে।

(ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ২৬০)

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল যে, যে-সকল কবিদের রবীন্দ্রনাথ সমধর্মী মনে করতেন তাঁদের রচনাগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিও তিনি সজাগ ছিলেন। কীটসের প্রায় কোন কবিতাই প্রথম ছত্র থেকে শেষ পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয় নি ও টেনিসন কবিত্ব করে লেখেন, তার রচনায় কৃত্রিমতা এসে পড়ে এই দোষগুলি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম বিচারবোধের কাছে সহজেই ধরা পড়েছে। যে যুগে টেনিসন জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে যুগেও রবীন্দ্রনাথ মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি টেনিসনের 'মডে'র লিরিকগুলির অপেক্ষা সাহিত্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের—এই মন্তব্যটি করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। আবার যে কালিদাস তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি ছিল এবং যাঁর কবিতা তাঁর নিজের কাব্যকে তরুণ বয়স থেকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার দোষ দেখাতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সংস্কৃত কাব্যে গতিবেগের অভাব এই কথাটি বোঝাবার জন্য তিনি কালিদাসের কাব্যের বিষয় উল্লেখ করলেন কাদম্বরীচিত্র প্রবন্ধটিতে :

কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মত সর্বাঙ্গ দিয়া চলে না। তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত, একবার থামিয়া দাঁড়াইয়া সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরক খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরক হারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথের নিরপেক্ষতা ও সমদর্শিতার বিষয়ে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই,কারণ সম্প্রতি সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটিতে একটি মন্তব্য দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সমালোচনাই পূজা ; ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেই তা পরিতৃপ্ত। এক্ষেত্রে আমি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সহমত হ'তে পারলাম না। আমার মনে হয় যে যে-কেউ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তিনি একথা স্বীকার করবেন যে এই মন্তব্যটি ভুল। রবীন্দ্রনাথ যেসকল লেখকদের তাঁর ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেছেন তাঁদেরও দোষত্রুটির উল্লেখ করতে ভোলেন নি। আমার মতটি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আমি আর দু'একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিগুরু বিহারীলালের প্রশংসার মাঝে ও সারদামঙ্গলের দোষের বিষয় বলতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি মন্তব্য করেছেন যে বিহারীলাল যে-সূত্রে সারদামঙ্গলের কবিতাগুলি গেঁথেছেন মাঝে মাঝে সে-সূত্র হারিয়ে যায়, মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়। আবার বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটির সমালোচনায় তিনি বঙ্কিমের কয়েকটি যুক্তির অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা দেখিয়েছেন। বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা-গুণের বর্ণনস্থলে যে অকারণে য়ুরোপীয়দের প্রতি অনাবশ্যক অন্যায় খোঁচা দিয়েছেন ও এতে তার মূল উদ্দেশ্যটি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে —একথা তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন :

ক্ষণে ক্ষণে বঙ্কিমের ধৈর্য্যচ্যুতি কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় গ্রন্থে অতিশয় অযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গিতে সর্বত্রই একটি গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য রক্ষা না করাতে বর্ণনীয় আদর্শ চরিত্রের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়াছে। (আধুনিক সাহিত্য, কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ৮৮)

এই মতটি যে সমালোচক দিয়াছেন তাঁর বিষয় আমরা কথনই এই মন্তব্য করতে পারি না যে তাঁর অধিকাংশ সমালোচনাই পূজা। তবে মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ সেই সব সাহিত্যিকদেরই বিশেষতঃ আলোচনা করেছেন যাঁরা তাঁকে মুগ্ধ করেছেন ও যাঁদের কাছে তিনি ঋণী। এই ঋণ স্বীকার করতে গিয়ে ভক্তির ভাব দু'এক জায়গায় হয়ত এসে গেছে কিন্তু ভক্তি কোথাও অতিশয়োক্তিতে পরিণত হয়নি, তাঁর ভক্তিবিগলিত চিত্ত কোথাও তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝাপসা করে দেয়নি।

আবার যে-সাহিত্য তাঁর আদর্শ অথবা রুচির সাথে মেলে নি তাও তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তার দোষের সঙ্গে তার গুণের কথা বলতে ভোলেন নি। তিনি বাংলা দেশের নবীন কবিদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষার সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব-অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। (সাহিত্যে নবত্ব, পৃঃ ৭৫-৭৬) তবে তিনি তাদের সাবধান করে দিয়েছেন যে নূতনত্বের খাতিরে তারা যেন কৃত্রিম সস্তা সাহিত্য সৃষ্টি না করে। যখন তাঁকে ইংরেজ আধুনিক কবিদের বিষয়ে বলতে বলা হ'ল তখন তিনি স্বীকার করলেন যে এ কাজটি করা তাঁর পক্ষে সহজ নয়। তিনি মানলেন যে তিনি "সেকালের কবি"। তাঁর

যুগের কবিরা ছন্দে-বন্ধে ভাষায়-ভঙ্গিতে যারা বিস্তার করে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আধুনিক কবিরা বলতে চায় মোহ জিনিসটার আর কোন দরকার নেই। এই মূলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই আধুনিক কবিদের বুঝবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই দু'যুগের কবিদের মধ্যে দৃষ্টিকোণের প্রভেদ কেন হ'ল তা রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

> আধুনিককালে জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা—জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। এই হুড়োহুড়ির মধ্যে অলঙ্কৃত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

দ্বিতীয় কারণ আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের প্রসার। বিজ্ঞান মোহতে বিশ্বাস করে না। বিজ্ঞান সৃষ্টির নাড়ী-নক্ষত্র বিশ্লেষণ করে বিচার করে দেখেছে যে মূলে মোহ নেই।

এই বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এক নৈর্ব্যক্তিক impersonal মনোবৃত্তি। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা-কিছু আছে তাকে আছে বলেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। আধুনিক যুগের শিল্পীদের মতে আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখাতে হবে এই হ'ল আধুনিক কবিদের মত।

রবীন্দ্রনাথ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক কারণও দিয়েছেন। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত নিষ্ঠুর ও কর্কশ হয়েছিল যে, তার বহুযুগ-প্রচলিত সব আদব আব্রু অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল। মানুষ এতদিন যেসকল শোভন-রীতি, কল্যাণ-নীতিকে আশ্রয় করেছিল তা হয়ে গেল বিধ্বস্ত। এতকাল সে যা কিছু ভদ্র বলে জানত তাকে দুর্বল বলে, আত্ম-প্রতারণার কৃত্রিম উপায় বলে অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল। তাই বিশ্ব-নিন্দুকতাকেই আধুনিক কবিরা সত্যনিষ্ঠতা বলে ধরে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত মোহমুক্ত দৃষ্টির প্রশংসা করেন। তিনি জানেন যে নিরাসক্ত মনই বিজ্ঞান হোক, কি সাহিত্য হোক, কি শিল্পকলা হোক তার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। তবে তিনি দেখলেন যে যদিও আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যিকরা দাবী নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা এদের নেই। আছে একটা উদ্ধত উগ্রতা, একটা নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা। এলিয়ট ও এমি লোয়েলের কবিতার সঙ্গে চীনের কবি লিপোর তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন যে সত্যিকারের নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টি ছিল এই চীনা কবির। বিলিতী কবিদের আধুনিকত্ব আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে বিশ্বকে দেখছে ও দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত।

একথা সত্যি যে, রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের সুবিচার করেন নি। এলিয়টের যে শেক্সপিয়র ও দাঁতের মত একটা অপূর্ব্ব শক্তি আছে অসুন্দরকে সুন্দর করে তুলবার, দুঃখকে নিংড়ে এক নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করবার—সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্ব্বাক। তিনি এলিয়ট ও আধুনিক কবিদের দোষগুলির উপরেই জোর দিয়েছেন। তবে যে ত্রুটিগুলি দেখিয়েছেন বেশীর ভাগ আধুনিক লেখকদের বিষয়ে তা সত্য। উদ্ধত বিকৃত রসবোধ আধুনিক সাহিত্যের একটা নিদারুণ দোষ। ইংরেজ সমালোচকেরা ও আধুনিক কবিদের কাদায় গড়াগড়ি দেওয়ার, পাঁকে ডুবে থাকার উৎকট বীভৎস আনন্দের তীব্র সমালোচনা করেছেন। F. L. Lucas তাঁর Authors, Dead and Living গ্রন্থে আধুনিক সাহিত্যিকদের বিষয়ে বলেছেন যে তারা

> "......... Could only snatch at vulgarity as the best substitute for vitality, whimsicality as the nearest thing for wit. A poet may well feel the need to utter his repulsion at certain sides of our life; only, inventorying dustbins does not happen to be the way to do it. It is the true poet's secret to be able to touch even pitch without becoming foul, but to touch not to wallow."

সুরুচিসম্পন্ন যে কোন সমালোচকই আধুনিক লেখকদের এই নোংরামির মধ্যে ডুবে থেকে একটা অস্বাভাবিক আনন্দ পাওয়া ও সেই বিকৃত আনন্দটা সকলের সামনে জোর গলায় জাহির করা সমর্থন করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিদের যে সমালোচনা করেছেন তা তীব্র হ'তে পারে কিন্তু কোথাও তাঁর সুশৃঙ্খলিত যুক্তি ভাবাবেগোচ্ছ্বাসে দোষিত হয় নি। আধুনিক ইংরেজ কবিদের তিনি তাঁর উঁচু আদর্শ, ও সুরুচি দিয়ে বিচার করেছেন ও নিজের বক্তব্যটি সুস্পষ্ট

রবীন্দ্র সমালোচনা-সাহিত্যের বিচিত্র বিভিন্নতাও আমাদের দৃষ্টি কম আকর্ষণ করে না। তাঁর সমালোচনায় এক প্রকার অভিনব আলোচনা আছে—যাকে সমালোচনা না বলাই ভাল। এগুলি এক একটি নূতন রসসৃষ্টি। এই পর্য্যায়ে পড়ে তাঁর কাব্যে উপেক্ষিতা ও মেঘদূত রচনা দু'টি। কাব্যে উপেক্ষিতা রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের চারজন অবহেলিত নারীর—উর্মিলা, অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা ও পত্রলেখার—অন্তরের অনুচ্চারিত বেদনাকে প্রকাশ করেছেন এক প্রাণস্পর্শী ভাষায়। মেঘদূত রচনাটিতে আবার পরিচয় পাই তাঁর এই সুগভীর অনুভূতি ও সংবেদনশীল কল্পনাপ্রবণ মনের। কালিদাসের মেঘদূতে তিনি এক নূতন অন্তনিহিত অর্থ উদ্ঘাটিত করেছেন। এ দু'টি প্রবন্ধকে আমরা সমালোচনা আখ্যা না দিয়ে বলতে পারি দু'টি গদ্যে গীতি কবিতা। কবির কল্পনা-শক্তির অভিনবত্ব ও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এখানে আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে।

আবার এক রকম সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন যাকে টীকা বলাই সঙ্গত। ফরাসি ভাবুক জুবেয়ারের বিষয়ে প্রবন্ধটি এই শ্রেণীর।

আবার পঞ্চভূতে পাই বৈঠকী সাহিত্য-আলোচনা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে আলোচ্য বিষয়টিকে দেখবার ও দেখাবার ইচ্ছা এবং শক্তি এখানে সুস্পষ্ট। এখানে ভাবুকতার পরিবর্তে পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের ক্ষুরধার বুদ্ধির, সুতীক্ষ্ণ মননশীলতা ও পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ শক্তির।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যকে সজীব ও উজ্জ্বল করেছে তাঁর সুনির্মল হাস্যরসবোধ। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসবোধ সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে স্বাভাবিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে এই ভাবগম্ভীর বিষয়গুলিও সুপাঠ্য ও উপভোগ্য করে তুলেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই।

নবীন সাহিত্যিকদের মতে তুচ্ছ ও মহত্তর, ভাল ও মন্দের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে এই যুক্তির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

আম ও মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এই জন্যে অতি বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদের যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমের অকুলোন হলে মাকাল দিতে পারিনে। তত্ত্বজ্ঞানের দোহাই পেড়ে মাকাল যদি দিতে পারতাম, এবং দিয়ে যদি বাহবা পাওয়া যেত তা হলে সস্তায় ব্রাহ্মণ ভোজন করানো যেত।

(সাহিত্যের পথে, সাহিত্যে নবত্ব, পৃঃ ৭৮)

সাহিত্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে সমালোচকদের কাছ থেকে তাঁর প্রায়ই শুনতে হয় যে তাঁর কবিতায় বাস্তবতা নেই, তা জনসাধারণের উপযোগী নয়, ইত্যাদি। তবে তিনি জানেন যে বাসর-ঘরে বর এবং পাঠক সমাজে লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। (সাহিত্যের পথে, বাস্তব, পৃঃ ১)

এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যের কয়েকটি গুণের বিষয় বলতে চেষ্টা করেছি। উপসংহারে তার দোষ-ত্রুটির বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, নিখুঁত সমালোচনা একটা আদর্শমাত্র। Eliot তাঁর Use of poetry and the Use of Criticisn গ্রন্থে এই কথাটি জোর দিয়ে বলেছেন :

'Pure' artistic appreciation is to my thinking only an ideal, when not merely a figment, and must be, so long as the appreciation of art is an affair of limited and transient human beings existing in space and time. (P. 109)

তাই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ত্রুটিমুক্ত নয়, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ভাষার অত্যধিক আলংকারিতা রবীন্দ্রনাথের প্রধান দোষ। যে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব, কয়েক জায়গায় তার আধিক্য সমালোচনাকে দুষ্ট করেছে। উপমার সার্থকতা হ'ল জটিল ভাবকে সুস্পষ্ট করায় কিন্তু যখন উপমা ভাবকে আরও অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য করে দেয় তখন তা দোষে পরিণত হয়। এই দোষ আমরা তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে কয়েক জায়গায় লক্ষ্য করি। এই নিবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ আর একটি অলংকার বারবার প্রয়োগ করেছেন—যাকে বলা হয় analogy বা সাদৃশ্য। সাদৃশ্যের প্রয়োগ ভাষাকে অলংকৃত করে নিঃসন্দেহে কিন্তু সাদৃশ্য দিয়ে কোন তথ্য প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এ কথাটি রবীন্দ্রনাথ বোঝেন নি।

সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আস্বাদনই প্রাধান্য পেয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধে, বিশেষতঃ তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলিতে—একথাও মানতে হবে। সমালোচক যত নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন ততই শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথে এই নিরপেক্ষতার অভাব দু'এক জায়গায় দেখা যায়। রবীন্দ্র-নাথ যদিও নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অনেক রচনায় কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ প্রতিভা ভাব বিশ্লেষণেরই প্রতিভা, বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল তাঁর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

রবীন্দ্রনাথ বস্তুতান্ত্রিক বর্তমান সাহিত্যিকদের বুঝতে

পারেন নি এ মন্তব্যটি প্রায়ই শোনা যায়। তবে তিনি এদের বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই চেষ্টাকে আমাদের প্রশংসা করতেই হবে। মতের ও আদর্শের মূলগত পার্থক্যের জন্যই এই অক্ষমতা কতকটা তাঁর মধ্যে এসে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক যুগই সাহিত্য ও শিল্পকলাকে তার একটা নিজস্ব মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে। সাহিত্যে একটা সর্ব্বযুগ-স্বীকৃত বা সর্বযুগ-গ্রাহ্য মানদণ্ড নেই। এ বিষয়ে T. S. Eliot আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

"......... no generation is interested in art in quite the same way as any other, each generation, like each individual, brings to the contemplation of art its own categories of appreciation, makes its own demands upon art, and has its own uses for art."
(Use of Poetry & the Use of Criticism, P. 109)

এ কথাটি স্মরণ থাকলে রবীন্দ্রনাথকে আমরা আর বৃথা দোষারোপ করতে পারব না।

—✱ ০ ✱—

বরযাত্রী

পি. মিশ্র

বরযাত্রী কথাটার ভেতর থেকেই বোঝা যায় যে বরের সঙ্গে যারা যাত্রী হিসেবে বিয়ের উদ্দেশে যাত্রা করে তারাই বরযাত্রী। বরের বন্ধু-বান্ধব, সাঙ্গ-পাঙ্গ ও আত্মীয়দের নিয়ে যে-দল কন্যাপক্ষের বাড়ীর উদ্দেশে লুচি, পোলাও, কালিয়া, মিষ্টি ধ্বংস করার জন্যে যাত্রা করে, তারাই বরযাত্রী। বর যদি হয় ভি. আই. পি., এরা তবে ভি. ভি. আই. পি.। আগেকার দিনে এই বরযাত্রীদের দাপটেই কন্যাপক্ষ অতিষ্ঠ হয়ে যেত। পৃথিবীতে সব কিছুই পরিবর্ত্তনশীল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই পাল্টে যায়, তাই বর্ত্তমানে বরযাত্রীরও অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে বরযাত্রীর পরিচর্য্যায় কন্যাপক্ষ সব সময় ব্যস্ত থাকত কিন্তু এখন তাদেরই সব কিছুর ব্যবস্থা করে নিতে হয়। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। কাজেই বরযাত্রীদের বরাতেও এখন নাকের বদলে নরুণ জুটছে। এই প্রসঙ্গে আমার বরযাত্রী যাওয়ার কিছু বিচিত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের বরযাত্রীদের সাবধান করে দিতে চাই। তাঁরা যেন এ দুর্বিপাকে না পড়েন।

বিপদতারণ বসু ওরফে ভোম্বল, ওরফে ভীষ্ম আমার ছোটবেলাকার গুলিখেলার বন্ধু। মা-বাবার অষ্টম সন্তান, সেইজন্যে দাদামশাই আদর করে নাম রেখেছিলেন ভীষ্মদেব। কিন্তু কিংবদন্তী আছে, ওর মা না কি বিপদতারিণীর পূজো করে ওকে পেয়েছিলেন, সেই জন্যে ওর নাম বিপদতারণ। বিপদতারণ জন্মাবার পর থেকে বিপদ আর ওকে তাড়া করে নি, ও-ই বিপদকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। ওর ভয়ে বিপদতারিণীই বোধ হয় বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে নিজের তাগা নিজের হাতে বেঁধেছেন। দেখতে অনেকটা হোঁদল কুতকুতের মতন হওয়াতে ওকে বন্ধু-বান্ধবেরা শ্রী-শ্রীল ভোম্বা বলে ডাকে। এহেন বিপদতারণের সম্ভবত শ্রীহীন অবস্থাটাই ভাল লাগে, তাই জগদীশ্বরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে শ্রী-শ্রী বর্জ্জন করে, ল অক্ষরটিকে নিজের ইচ্ছেয় স্থানচ্যুত করে নামের শেষে বসিয়ে নিয়ে পুরো নামটাকেই সংশোধন করে ভোম্বল হয়েছেন। সেই ভোম্বল এতদিন বিয়ে করবে না বলে ভীষ্মের পণ করে বসেছিল। আমরা বন্ধু-বান্ধবরাও অনেক চেষ্টার পরে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। বেশ কয়েক বছর চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ সেদিন মূর্ত্তিমান

দুঃসংবাদের মতন এসে সুসংবাদ দিলে। টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা চিঠি, তাতে লেখা "বন্ধু, আগামী ১৯শে ভাদ্র শনিবার, আমার বিয়ে। তোমার আসা চাই-ই। ইতি বিপদ।" খবর নিয়ে জানলাম যে বাগনানের কোন একটা গ্রামে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে। বাবা-মা একরকম জোর করেই বিয়ে দিচ্ছেন এবং বিয়ের দিন না থাকা সত্ত্বেও ভাদ্রমাসেই দিন স্থির হয়েছে। বিপদ অনেক চেষ্টা করেও বিপদ ভঞ্জন করতে পারে নি, তাই বাধ্য হয়েই মত দিয়েছে। ওর বাবার ধারণা উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না, তাই যত শীঘ্র সম্ভব ভোম্বলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখে যাবেন সেই জন্যেই ভাদ্র মাসেই বিয়ে।

বিপদ বিয়ে করে আমাদেরই বিপদে ফেললে। বিয়ের দিন সকাল থেকেই আমাদের তৈরী হতে হ'ল, কারণ বিয়ে গোধূলি লগ্নে, আবার যেতেও হবে অনেক দূর। ষ্টেশন থেকে নেমে আবার মাইল তিনেক হাঁটাপথে যেতে হবে। ভর দুপুর বেলা ধুতী-পাঞ্জাবী পরে ফুলবাবু সেজে আমরা বরযাত্রীরা তৈরী। বাড়ীতে কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন, তাঁরা জিজ্ঞাসা করাতে বললাম, বরযাত্রী যাচ্ছি। শুনে ত তাঁরা হতভম্ব। ভাদ্রমাসে বিয়ে তার আবার বরযাত্রী, কিন্তু অতশত গূঢ় তত্ত্ব তাঁরা ত আর জানেন না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। সেখানে আর এক বিপদ, ভোম্বলকে বরের বেশে দেখে রাজ্যের লোক দাঁড়িয়ে পড়ল। ভীড়ের মধ্যে থেকে নানারকম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ভোম্বলের কান ততক্ষণে বেগুনী হয়ে গেছে। কোন রকমে সামলে ওকে নিয়ে তারকেশ্বর লোকালে উঠলাম। ট্রেনে উঠে ওকে টোপর আর পাঞ্জাবী খুলে রাখতে বললাম। একজন আবার একটা বুশ সার্ট পরিয়ে দিলে। পথে আর কোন বিপত্তি হ'ল না। সকলে গাল-গল্পে এতই মশগুল যে, কখন বাগনান পৌঁছে গেছি টেরও পাই নি। কনের বাড়ীর লোকেরা এসেছে ষ্টেশনে বরকে রিসিভ করতে। বরকে আর চিনতে পারে না। কি করেই বা পারবে। কোঁচানো ধুতি আর বুশ সার্ট পরে বর গাড়ি থেকে নামল। পাঞ্জাবী আর টোপরের কথা আমাদের মনেই নেই। শেষ-কালে বরযাত্রীদের দেখে ওরা এগিয়ে এলেন। আমরা তক্ষুনি ষ্টেশনের টি-ষ্টলে ভোম্বলকে নিয়ে গিয়ে আবার রাজবেশ পরিয়ে দিলাম। কন্যাপক্ষ বর নিয়ে চলে গেল। দুপুর রোদে দারুণ গরমে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। বর ত চলে গেল, আমরা পড়ে রইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘোরার পর একখানা ফোর্ড গাড়ি এল আমাদের নিয়ে যেতে। গাড়ির অবস্থা দেখে আক্কেল গুড়ুম। লর্ড ক্লাইবের আমলের গাড়ি। ক্লাইব না কি ঐ গাড়ি চড়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতেন। উঠব কি উঠব না ভাবছি। ড্রাইভার বুঝতে পেরে ভরসা দিয়ে বললে, "উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন স্যার, এ একবারে পক্ষীরাজ, কোন ভয় নেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে।" মনে মনে বললাম গাড়ি ত নয়, রথ। গাড়ি কিছুক্ষণ যাবার পর দারুণ বৃষ্টি এল। যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল, মাঝপথে গাড়ি একবারে জগদ্দল পাথরের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল। সারথি দাশরথী বললে, স্যার একটু হাত লাগিয়ে দিন, এক্ষুণি আবার চলতে সুরু করবে। ভীষণ রাগ হতে লাগল। এই দুঃখেই ত গাড়ি চড়ি না। কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর গাড়িই আমার ওপর চাপে। কি করি, অগত্যা নেমে সকলে মিলে ঠেলতে সুরু করলাম। মাঝে মাঝে ঠেলি, দাশরথী ব্রেক মারে, একটু আওয়াজ হয়, আবার সব ঠাণ্ডা। কি করি, গাড়িতেও বসে থাকতে পারি না। পাড়াগাঁয়ের রাস্তা কত রকম বিপদ-আপদ যে পথে ওঁত পেতে থাকে কে বলতে পারে। একবার একবার ঠেলি, একটু বসি, আবার ঠেলি—এমনি করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মাঝপথে এসে এমনই অবস্থা, ফিরতেও পারছি না তখন। ফিরতে চাইলেও ফেরার কোন পথও নেই। বিয়েবাড়ীতে পৌঁছে শুনি কন্যাপক্ষ লণ্ঠন আর হ্যাজাক নিয়ে বরযাত্রীদের খুঁজতে বেরিয়েছে। ওখানে পৌঁছে সে আর এক বিপদ আমাদের, বরযাত্রীদের অবস্থা তখন শ্মশানযাত্রীদের মতন। সমস্ত গায়ে-মুখে কাদা জল লেগে চেহারা এমন হয়েছে যে, নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারছি না। কন্যাপক্ষ সদয় হয়ে আমাদের কয়েকখানা আধময়লা লুঙ্গি আর গেঞ্জী দিলেন। আমরাও অনন্যোপায় হয়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জী পড়তে বাধ্য হলাম।

বিয়ে হবার কথা ছিল গোধূলি লগ্নে কিন্তু ঝড়-বাদলে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। রাত দশটা বাজল, তখনও বিয়ের ব্যবস্থার কোন লক্ষণই দেখলাম না। বরকে তখনও একটা দালানে খালি গায়ে ভাঙ্গা কাঠের চেয়ারে বসিয়ে রেখেছে। ঘন্টাখানেক বাদে দেখি কনে এল। বলে না দিলে চিনতেই পারতাম না যে ওই কনে। সব ঠিকঠাক, বরকে চেয়ারশুদ্ধ এনে ছাদনাতলায় দাঁড় করান হ'ল। এখানে দেখি সবই উল্টো নিয়ম। বর স্ট্যাচু হয়ে চেয়ারে বসে রইল আর কনে হাই হিলের চটি পড়ে নিজেই বরের চারদিকে পাক মারতে লাগল। শুনলাম এদের না কি ওসব পিঁড়ে করে ঘোড়ানর নিয়ম নেই। অনেক কিছু নিয়মই নেই দেখলাম। মেয়ে কয়েকপাক ঘুরেই চটি পড়ে একবার বরের খালি পা, একবার পুরুতের পা মাড়িয়ে দিল। ভোম্বল সেই চাপেই উ-হু করে চেঁচিয়ে উঠল। ভাবলাম এটাও বোধ হয় নিয়ম। হঠাৎ দেখি মেয়ে ভোম্বলের পায়ের

কাছে পড়ে লুটছে। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল, মেয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কেউ বলে বরকে দেখে, কেউ বলে বরযাত্রীদের দেখে মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে—সে এক লঙ্কা কাণ্ড! তারপর শুনলাম মেয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। কি হবে, সাতপাক সম্পূর্ণ হয় নি। তখন ঠিক হ'ল মেয়েকে ঘুরতে হবে না, ছেলেকে ঘুরিয়ে সাত পাক দেওয়া হবে। এই শুনেই ভোম্বল ত আঁতকে উঠল। এদিকে আমরা বরযাত্রীরা সকলে মিলে বরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কন্যাপক্ষের একজনের দিকে লক্ষ্য পড়তে দেখি তিনি হাতে কয়েকটা হাঁসের ডিম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে পাশে আরও কয়েকজনের হাতেও দেখি ডিম আছে। পুরুতকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন যে এদের নিয়ম একটু বিচিত্র। সাতপাকের একটা করে পাক শেষ হবে, আর ঐ ডিমগুলি নাকি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হবে। জিজ্ঞাসা করলাম "মারা হবে মানে! কাকে মারা হবে?" পুরুত বললে যাকে সামনে পাবে তার গায়েই মারবে। ভালকরে তাকিয়ে দেখি সব আমাদেরই সামনে দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে। আমাদের ত চক্ষুস্থির, এ কি রসিকতারে বাবা! হ'লও তাই, ভোম্বলকে জোর করে চেয়ার শুদ্ধ ধরে এক পাক করে ঘোরায় আর আমাদের চোখে-মুখে এক ঝাঁক করে ডিম এসে পড়ে। সাতপাক শেষ হওয়াতে দেখলাম আমাদের ভোম্বল, মা-বাবার আদরের বিপদতারণ চেয়ারের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে আর ওর মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে। বেরোবে না, একে সমস্ত দিন উপোস গেছে, তার ওপর ঐরকম অত্যাচার, তবু ত বর বলে কিছুটা রেহাই পেয়েছে। কিন্তু আমরা হতভাগ্য বরযাত্রীরা অনাথের মতন পড়ে রইলাম। লুঙ্গি আর গেঞ্জী পড়ে জলকাদা মেখে তার ওপর আবার হাঁসের ডিমের নালঝোল সমস্ত মাথা গা বেয়ে পড়ছে, সে যে কি নিদারুণ অবস্থা আমরাই জানি। আমাদের তখন আর এ গ্রহের মানুষ বলে মনেই হচ্ছে না। সত্যিই, আমাদের যেন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে চেহারার কোন মিলই নেই। কে আবার বললে, দ্যাখ দ্যাখ, ঠিক যেন মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিকের মত দেখাচ্ছে আমাদের। রাত্রি দেড়টার সময় বরযাত্রীদের খাবার ব্যবস্থা হ'ল। চতুর্দিক খোলা এক ফাঁকা ছাদে দড়িতে দু'দিকে দুটো লণ্ঠন টাঙানো। সেখানে আমাদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। খেতে বসলাম তখন আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয়, চতুর্দিক খোলা আবার এক দমকা হাওয়া এসে লণ্ঠন দুটো নিবিয়ে দিল। ওখানে তখন ভূতের নেত্য চলছে। হাওয়ায় সবার পাতাই উড়ে গেছে। এর পাতের বেগুন ভাজা ওর পাতে, ওর লুচি এর পাতে। আন্দাজে কোন রকমে হাঁতড়ে হাঁতড়ে খাওয়া শেষ করলাম, ততক্ষণে পূবদিক ফরসা হয়ে এসেছে। ভোরের আলো দেখা দিতেই ওখান থেকে দুগ্যা বলে বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতায় পৌছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

নিত্যবৃন্দাবন

(কীর্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সেই বৃন্দাবনের লীলা পড়ে আজ মনে !
সেই নন্দগোপাল কান্ত কিশোর
আলোর দুলাল মরি মনচোর
নাচিত যে রাসে প্রণয়ের মধুবনে :
আজ পড়ে মনে তায় পড়ে ফিরে ফিরে মনে

প্রাণ তুফানে জলিত তারাদীপে যে গগনে
সেই কালো নিরাশায় আলোনন্দন.
ধূসর ধরায় রঙিন স্বপন,
রজনীবেদনা পোহাত যার বরণে :
আজ পড়ে মনে তায় পড়ে ফিরে ফিরে মনে।

মরু- ক্ষুধায় ঝরিত যে সুধানির্ঝরণে,
যত ম্লান অনিত্য বাঁধন মায়ার
কাটিত স্নিগ্ধ চাহিনীতে যার,
উছালিত প্রাণ যার প্রেম পরশনে :
আজ পড়ে মনে তায়—পড়ে ফিরে ফিরে মনে।

যত ক্ষয় ক্ষতি আনে অবসাদ এ-জীবনে,
যত চিন্তা ভাবনা জয় পরাজয়
সুখের কামনা লোক লাজ ভয়
ভুলিতাম যার "আয় আয়" বাঁশি-স্বনে :
আজ পড়ে মনে তায়—পড়ে ফিরে ফিরে মনে

ভাল- বাসা যে বিলাতে এসেছিল জনে জনে
দিতে ঠাঁই না চাহিতে তার রাঙা পায়
বিধুর নিশীথে মধুর উষায়,
ডাকে আজও সখী সে হৃদিবৃন্দাবনে
তার ঘরছাড়া নীল মুরলীর মূর্ছনে
চল্ ধরিতে লো তার চরণ চিরন্তনে।

ওরা হেসে বলে: ওরে পাগল, রাখিস্ মনে—
হায় অমৃত-স্বপন ফলে না ত জাগরণে!
চির রঙিনের ছবি শুধু কবিকল্পনা,
ছায়া- ইন্দ্রধনুর ক্ষণ জলজল্পনা,
চির- জীবন কোথায় মরণ ধরায় বল্?
চির- সুখ-আশা শুধু সোনার হরিণ ছল,
শুধু বেদনায় ধূ ধূ মরু ছায় এ-জীবনে।

ওরা হাসে—কলভাষে, ওরা জানে না তাই হাসে
ওরা জানে না—তাই মানে না,
আমি জানি—তাই মানি
আমি শুনেছি তোমার বাঁশি অন্তরে তাই বঁধু আমি জানি:
ডাকে যে তোমায় তুমি রাঙা পায় লও টানি'

তুমি এসেছিলে ভাল বেসেছিলে আমি জানি,
সুধা- ধারে ক্ষুধাবুকে ঝরেছিলে আমি জানি,
শুধু এসেছিলে নয়—আসো,
তুমি ডাকিলেই কাছে আসো,
আজো বাঁশি-সুরে ভালবাস,
ডাকি আঁখি-জলে যেই—"কোথা তুমি?"—সেই—
করুণায় নেমে আসো,
প্রেমে নয়ন মুছাতে আসো।
তুমি কর বুকে বুকে যুগে যুগে গান বঁধু
তাই ধরে তব ঝরে সুখে দুখে আজও মধু
তাই আনন্দে পাই যারে
পাই বেদনায়ও ফিরে তারে।

আলো- হরষে তোমায় জানি
কালো- বেদনে তোমায় জানি
দুখ- বাদলে তোমায় জানি
সুখ- কিরণে তোমায় জানি
বঁধু, বিরহে তোমায় জানি
মধু- মিলনে তোমায় জানি
আমি জীবনে তোমায় জানি
স্বামী, মরণে তোমায় জানি।।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে (অ-and-বা কু-) শিক্ষা!

সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যসম্ভারের মূল্য বৃদ্ধির সহিত তাল রক্ষাকল্পে এ-রাজ্যে শিক্ষার 'মূল্য'ও প্রায়-কালোবাজারী পর্য্যায়ে গিয়াছে। অভিভাবকগুষ্টি তাঁহাদের পুত্র-কন্যার শিক্ষার ব্যয় আর কতদিন বহন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা সন্দেহের বিষয়। বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করা যাইতেছে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কিণ্ডারগার্টেন, মন্টিসারী—প্রভৃতি সকল ছোট-বড় বিদ্যালয় প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছেন এবং বর্ত্তমানে এই বর্দ্ধিত বেতন সাধারণ গৃহস্থের আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে। ইহাদের বেতন বৃদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা এবং অতি-বাহুল্য দেখিয়া মনে হয় যেন রাজ্য সরকার এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা-নিয়ামকদের—এ বিষয় করণীয় কিছুই নাই, কিংবা কিছু করিবার কোন ক্ষমতা বা ইচ্ছাও তাঁহাদের নাই। শুনিতে পাই সরকার বাহাদুর না কি একটা নিম্নতম বেতনের হার বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বেতনের উর্দ্ধসীমা ধার্য্য তাঁহারা করেন নাই! বিত্তবান অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের জন্য যে কতকগুলি লিফাফা-দুরস্ত বনেদী কিণ্ডারগার্টেন, প্রাইমারী, মাধ্যমিক এবং উচ্চবিদ্যালয় আছে, সেখানে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের পক্ষেও প্রবেশ দুঃসাধ্য–আর্থিক অপারগতার কারণে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে একচেটিয়া কারবারের সহিত তুলনা করা চলে, কারণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি, বেতন এবং অন্যান্য বিষয়ে এই বিদ্যালয়গুলি—নিজেদের আইনমাফিক চলে এবং ইহাদের কর্ত্তৃত্বে বাহিরের, এমন কি—যাহাদের টাকায় এই বিদ্যালয়গুলির বিদ্যা-বিক্রয় কারবার চলে —সেই অভিভাবকদের কিছু বলিবার নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্তা, কর্ত্রীদের হুকুম নির্দ্দেশ ছাত্রদের নতমস্তকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে—ব্যতিক্রমে—ছাত্র-ছাত্রীকে অপসারণ! কিন্তু এই সব কায়দাদুরস্ত এবং ব্যয়বহুল বিদ্যালয়গুলির সহিত দেশের লোকের কতটুকু যোগা-যোগ আছে বলা শক্ত। এখানে শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং প্রণালীতে ভারতীয় শিক্ষা আদর্শও কতটুকু প্রতিপালিত হয় এবং তাহার প্রতি আন্তরিক কতটুকু শ্রদ্ধাও এখানে প্রদর্শিত হয় তাহাও কেহই বলিতে পারে না! এমন কয়েকটি শিশু বিদ্যালয়ও কলিকাতায় আছে যেখানের শুধু ছাত্রছাত্রীদের দেখিলে, তাহাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিলে, মনে হইবে ইহারা ফিরিঙ্গী সন্তান! এ-শিক্ষার শেষ কি এবং সমাজ-জীবনে মূল্যই বা কি জানি না।

গত কয়েক বছরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বেতনাদি ক্রমাগত বর্দ্ধিত করা হইতেছে। কেবল বেতন বৃদ্ধিই নহে, আনুসঙ্গিক সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই সবিশেষ 'মূল্য'-বৃদ্ধি চলিতেছে। 'গেম-ফি', পরীক্ষা-ফি, ডাক্তারী-ফি, ক্ষেত্র বিশেষে স্কুল-ইউনিফরম ফি এবং আরও কত ভাবে যে কত ফি আদায় হয়, তাহার ফিরিস্তি দেওয়া প্রায় অসাধ্য কার্য্য। বহু বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের খাতাপত্র কাগজ প্রভৃতিও বিদ্যালয় হইতে ক্রয় করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই সব বস্তুর মূল্য বাজার অপেক্ষা বেশী এবং গুণের দিক হইতেও হীন। কিন্তু এত সব করিয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি এত ব্যয়ভার বহন করিয়া ফললাভ হয় প্রায় শূন্য! সমারোহ আছে, ঢক্কা-নিনাদও কম নাই, এক একটি ছাত্রকে পিঠে ব্যাগে করিয়া বিপুল সংখ্যক পুস্তকের ভারও প্রত্যহ বহন করিতে হইতেছে (এবং প্রতি বৎসর নূতন পুস্তকের পালা!)—কিন্তু এই ভার বহন পিঠেই থাকিয়া যায়—ছাত্রের মস্তিষ্কে তিল পরিমাণও প্রবেশ করে কি না সন্দেহ! এ-বিষয় বহু কর্ত্তব্য আছে (বলিয়া লাভও নাই), কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি যদি মাসে অভিভাবকে অন্তত ৬০-৭০৲ টাকা দিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে কয়জন, কয়টি পরিবারের পক্ষে তাহা সম্ভব?

'অবৈতনিক শিক্ষার' ঘোষণা বহুবার বহু শাসকের কণ্ঠে শুনিয়াছি—কিন্তু একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া (এখানে

শিক্ষার নিম্নতম স্তর হইতে এম. এ. পর্যন্ত সকলেই বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করে, খরচাটা অবশ্য ভারত সরকারের অর্থাৎ আমাদের!) ভারতের আর কোথায় ইহা কার্য্যকর করা হইয়াছে? অবশ্য পিত্তরক্ষার জন্য কোথাও কোথাও নামমাত্র সামান্য কিছু অবৈতনিক বিদ্যাদানের ব্যবস্থা নিম্নতম স্তরে করা হইয়াছে স্বীকার করিব।

আজ বহু অভিভাবকের নালিশ—এই ভাবে খরচ ক্রমাগত এবং হু হু করিয়া বাড়িতে থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের র‍্যাশন, কেরোসিনের 'লাইনে'ই সর্ব্বক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইবে—বিদ্যালয় হইতে নাম কাটাইয়া দিয়া!

পৌরসভার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের অবৈতনিক স্কুলগুলির বিষয় যদি কিছু বলিতে হয় তবে তাহা পৌর-(উপ-) পিতাদের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হইবে না। কলিকাতার পৌরকর্ত্তাদের নিকট হইতে অবশ্য শিক্ষা বিষয়ে কিছু শিক্ষার আশা কেহই করে না, কারণ এই সকল 'মহাজ' পণ্ডিত কর্পোরেশনের সভাতে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং (অ-)সভ্যতার যে অপূর্ব্ব পরিচয় অহরহ দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকট হইতে করদাতারা বেকুফি, বেয়াদবী এবং বিলকুল বিকৃতি (সর্ব্ব বিষয়ে) ছাড়া আর কিছুই আশা করিতে পারেন না। কর্পোরেশন (প্রায় সব) প্রাথমিক স্কুলগুলি গোয়াল অপেক্ষাও অধম—এবং এখানে পশুও পাগল হইয়া যাইতে বাধ্য। শিক্ষার নামে বা অজুহাতে এই সব বিদ্যাভবনে প্রায় সর্ব্ববিধ অবিদ্যার চর্চ্চাই হইতেছে—এমন সংবাদই প্রকাশ পাইয়াছে। সংবাদপত্রও কর্পোরেশন স্কুলগুলিতে কি নোংরামি এবং অনাচার ঘটিতেছে সে তথ্য মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়। কর্পোরেশন কর্ত্তারা মনে করেন, তাঁহারা গরীবের অধম সন্তানদের বিদ্যাদানের ঢালাও ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পরম উপকার সাধনই করিতেছেন নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া—কিন্তু এই পরম দায় এবং মহানুভবতার ফলভোগ করিতেছে কাহারা? করদাতাদের পয়সা অপব্যয় করিয়া কলিকাতার নাগরিক পুঙ্গবের দল নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কাহার স্বার্থসিদ্ধি করিতেছেন? শিক্ষার নামে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা কোন্ বিদ্যাধরীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে? অন্নহীন, মলিন ছিন্নবসন-পরিহিত ক্লিষ্টদেহ বিষণ্ণবদন অভাগা বালকবালিকারা কলিকাতা শিক্ষার কি জাবর কাটিতেছে তাহার সংবাদ কেহ রাখেন কি না বলিতে পারি না। কর্পোরেশন-স্কুলে যে-সকল শিক্ষক এবং শিক্ষিকা (বেতনভোগী) নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যব্যক্তি অবশ্যই আছেন, কিন্তু তাহার সংখ্যা কত? শিক্ষকতার মাপকাঠির বিচারে শতকরা ১০।১৫ জনও কি যোগ্য বিবেচিত হইবেন?

সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কর্পোরেশন স্কুলগুলি প্রায় আড্ডাখানা এবং এখানে পঠন-পাঠন ছাড়া আর সর্ব্ব-বিদ্যার চর্চ্চাই অধিকতর হয়। এমন কথাও শুনা যায় যে, স্কুলবন্ধ হইবার পর এই সকল বিদ্যায়তনে বহুবিধ অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম সংঘটিত হয়—জুয়াড়ীদের পীঠস্থান বলিয়া কতকগুলি স্কুলবাড়ী খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এমন অবস্থায় কর্পোরেশন শিক্ষাবিভাগ এবং ভবন সম্পর্কে নূতন চিন্তার অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে। এই স্কুলগুলিকে আর কর্পোরেশন-মালিকদের হস্তে রাখা উচিত কি না সে চিন্তাও করা অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমান পৌর-সংস্থার সৎ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি দু'চারজন অবশ্যই আছেন, কিন্তু তাঁহারা নেহাৎ 'মাইনরিটি' এবং তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ অরণ্যে রোদন মাত্র। গলা এবং ভোটের চোটে অজ-ভেড়ার দলই সর্ব্বব্যাপারে পূর্ণ (অ-)'রাজকতা' কায়েম করিয়াছে। রাজ্য সরকারের এ বিষয় কোন দায়িত্ব আছে কি না জানি না, যদি থাকে কালবিলম্ব না করিয়া, অন্ততপক্ষে কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগটি একটি প্রকৃত শিক্ষাবিদ সংস্থার কর্ত্তৃত্বে আনা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সংস্থা অবশ্যই কর্পোরেশনের অধীন থাকিবে, কিন্তু ভোটের জোরে নির্ব্বাচিত অযোগ্য কাউনসিলারদের কর্ত্তৃত্বে নহে। দেশে এখনও সৎ এবং শিক্ষা-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক আছেন, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিনাবেতনে কর্পোরেশন স্কুলগুলিকে উন্নত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ সামাজিক কর্ত্তব্য হিসাবে করিতে অরাজী হইবেন না, এমন কি বিনা কিংবা নাম-মাত্র দক্ষিণাতেও।

এক একটি বাড়ীতে—(প্রচুর ভাড়া দিয়া)—কতক-গুলি ভাঙ্গাচোরা বেঞ্চি-টেবিল ভরিয়া বস্তি অঞ্চল হইতে কিছু সংখ্যক দরিদ্র ছেলেমেয়ে তাড়াইয়া আনিতে পারাটাই বড় কাজ নহে। উপযুক্ত ভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিয়া, সেই ব্যবস্থা মত কাজ হইতেছে কি না তাহাও দেখিতে হইবে। অযোগ্য শিক্ষকদের কর্ম্মচ্যুত না করিয়া সংস্থার অন্য কাজে বদলী করায় ক্ষতি কি? শিক্ষাব্রতীরা যদি তাঁহাদের আদর্শচ্যুত হয়েন, তাহা

'টিচারকে' 'চীটার' বলিয়া অভিহিত করিবার অবকাশ লোকে যেন না পায়—ইহা আমাদের পক্ষে অতীব পীড়াদায়ক।

হেনরি ডেভিড্ থোরো এবং আমরা

বিশ্বের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় চিন্তানায়কদের মধ্যে আমেরিকায় দার্শনিকপ্রবর হেনরি ডেভিড্ থোরো অন্যতম। শুনিয়াছি—মহাত্মা গান্ধী থোরোর রচনা পাঠে অনুপ্রাণিত হয়েন এবং অহিংস অসহযোগ আদর্শ গ্রহণ করেন। থোরো কনকর্ড শহরে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকার দাস প্রথার বিরুদ্ধে আইন-অমান্যের অপরাধে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। থোরোর কয়েকটি কথা আমাদের বর্ত্তমান সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্কেও প্রযোজ্য মনে করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:

"পিপীলিকার মতই সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করছি আমরা। এখন পর্য্যন্ত যদিও শুনিয়া থাকি যে বহুকাল হইতে আমরা মনুষ্য জীবনে ক্রমবিকাশের পথেই চলিয়াছি।......ভুলের উপর ভুল হইতেছে স্তূপীকৃত, চলিয়াছি জোড়াতালির উপর জোড়াতালি দিয়া। আমাদের শ্রেয়ত্বের চরম প্রকাশ বহিরাবরণে এবং নিবারণসাধ্য ক্ষেত্রে বিপত্তি সৃষ্টির মধ্যে। খুঁটিনাটি স্থির করিতেই জীবন কাটিয়া যাইতেছে।...দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় তথাকথিত উন্নতির সমারোহ এবং চটকদারীর খেলাই হইয়াছে সার। শাসন-পরিচালনার্থ গঠিত হইয়াছে অবাধ বিরাট এক প্রশাসন ব্যবস্থা। আসবাবপত্রেই ঘর পূর্ণ, নড়িতে চড়িতে ঠোক্কর খাইতে হয়। বিলাস-জর্জ্জরিত, অনর্থক অপব্যয়! কোন হিসাব নাই, কোন লক্ষ্যও নাই। সমগ্র জাতি ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—দেশের এবং দেশবাসীর এই ব্যাধি প্রতিকারের একমাত্র পথ—কঠোর মিতব্যয়িতা। নির্ম্মমভাবে, প্রাচীন স্পার্টার অধিবাসীদের অপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণে জীবন যাপন সংক্ষেপ করা, জীবনের লক্ষ্যের উন্নতি সাধন করা। আজ বিলাসব্যসন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশবাসী ভাবিতে শিখিয়াছে, রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য অপরিহার্য্য—বরফ চালান দাও, তারযোগে কর বার্ত্তা বিনিময় ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল (তখনকার কালে ইহাই ছিল প্রচণ্ড গতি!) ছোটো,—এসবের ব্যবস্থা যেন ত্রুটিহীন হয় দেশবাসী মানুষের অদৃষ্টে কিছু জুটুক আর নাই জুটুক; এখনও ঠিক করিতে পারি নাই আমরা মানুষের না বন-মানুষের মত জীবন যাপন করিব।"

থোরো আরও বলিয়াছেন:

"সহজ সরল হও আমি একথাই বলিব। একশ নয়, হাজার নয়—বিষয় ব্যাপার তোমাদের দুই আর তিনেই সীমাবদ্ধ থাক। সভ্য-জীবনের বীচি-বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রে এত মেঘ, এত ঝড়, এত চোরাবালি আর এত হাজার দফায় বিলি-বন্দোবস্ত যে, কোন মানুষকে বাঁচিতে হইলে...তাহার চুল পরিমাণ পর্য্যন্ত হিসাব রাখা দরকার! সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে হিসাবী হইতে হইবে মারাত্মক রকমের! সরল হোক, সব কিছু সরল হোক। দিনের মধ্যে তিনবার না খাইয়া দরকার মত একবার খাইলেই চলিতে পারে। একশটা ডিশের বদলে পাঁচটাই যথেষ্ট, সেই অনুপাতে অন্যান্য সব আড়ম্বরও কমানো যাইতে পারে..."

উপরি-উক্ত বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ (তথা ভারত) সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সমারোহের তুলনায় কি দেখা যাইবে? হুবহু মিল ছাড়া আর কিছুই নহে। পরিকল্পনার বিরাট সমারোহের সহিত বাস্তবের সম্পর্ক দেখা যায় কতটুকু? অন্নপূর্ণা বাঙ্গলা আজ অন্নহীন ভিখারীর দেশে পরিণত! প্রতিবেশী রাজ্যে চালের প্রাচুর্য্য—আর এদিকে বাঙ্গলার হতভাগ্য জনগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। আবার অন্য-দিকে দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্যের অধিবাসীদের বিষম গুঁতার চোটে কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা ঐরাজ্যে হাজার হাজার মণ চাল প্রেরণ করিতে কোন সঙ্কোচ বা অভাব-বোধ করিতেছেন না। অথচ আমরা অহরহ বাণী শ্রবণ করিতেছি যে—দেশে যতটুকু খাদ্য আছে, তাহা সকলে সম-বণ্টনের দ্বারা ভোগ করিব! শুনিতে অতি মধুর বাক্য!!

নীতি-বাণী প্রচারের সহিত বাস্তবে এমন সরকারী অহিত-প্রশাসন ব্যবস্থার সহাবস্থান সত্যই অতি বিচিত্র। কলিকাতার দিকে একবার দেখুন—এ-শহরে ফ্যাশনদুরস্ত রেস্তোঁরা, হোটেল এবং 'বার'-(শুঁড়িখানার) গুলিতে প্রত্যহ কি দেখিতে পাওয়া যায়? এই সকল স্থানে বি বিপুল অঙ্কের অর্থ সাহেব-বাবুদের বিলাস-ব্যসনে অপব্যয় হইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? কলি কাতার বুকে এই সকল উর্ব্বশী-নৃত্য স্থানগুলি আজ হইয়াছে কালো, হাফ্-কালো এবং সাধারণ মানুষ ও সরকারকে ঠকাইয়া অর্জ্জিত অর্থের সৎকারের তীর্থস্থান এখানে শেঠ এবং শঠের দল প্রতি সন্ধ্যায় হাজার হাজা অপভাবে অর্জ্জিত অর্থ এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়!

যে-দেশের শতকরা অন্তত ৭০ জন মানুষ প্রত্যহ এব

বেলাও পেট পুরিয়া খাইতে পায় না সেই দেশেই সামান্ত কয়জন দুরাচারী শেঠ ও শঠ, অনাহারে আর্ত্তনাদকারী কোটি কোটি মানুষের এমন অকল্পনীয় অবস্থায়, এই বিলাসব্যসন এবং অর্থ অপচয়ের এমন অনায়াস অপূর্ব্ব সুযোগ পায় কোন্ বিধির বলে? সরকারী ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপকের দল সত্যকার জনদরদী হইলে গরীব দেশে এই নারকীয় অনাচার অবিচারের সমাপ্তি ঘটিত একদিনেই।

দেশে একদিকে বঞ্চনা ও অত্যাচারের প্রবল স্রোত আর অপরদিকে সুবিধাবাদী প্রবঞ্চকদের ভোগবিলাসের রাজকীয় মহা উৎসবের আয়োজন। আর আমাদের হিতবাণী-বর্ষক নেতারা? তাঁহারা শাসনযন্ত্রের শীর্ষদেশে গদীতে বসিয়া পরমানন্দে এই নারকীয় উৎসব অবলোকন করিয়া তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত প্রশাসনের প্রকট প্রকাশ দেখিয়া পরম পুলকিত বোধ করিতেছেন! সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত ইঁহাদের এখন কোন যোগ নাই। নথিপত্রে সহির উপরেই শাসন-কর্ম্ম চলিতেছে—কিন্তু এই ভাবে আর কতদিন চলিবে?

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে দেশের উপর দিয়া জনরোষের যে প্রবল ঝড় বহিয়া গেল—তাহার সাময়িক সমাপ্তি হয়ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও সাবধান না হইলে, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে এবং তাহার শেষ পরিণতিই বা কি হইবে তাহা আন্দাজ করিলেও প্রকাশ করিতে ভরসা হয় না! পশ্চিমবঙ্গের বিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য কেবলমাত্র কম্যু এবং অন্যান্য বামপন্থীদের দোষী এবং দায়ী করিলেই সরকার এবং সরকার সমর্থকদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। এই সঙ্গে একথাও অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের লোকের এক অতি বৃহৎ অংশের সমর্থন না থাকিলে এত বড় এবং বিষম কাণ্ড ঘটিতে পারিত না। বাঙ্গলা দেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ প্রমাণ করিল—অভাব-অভিযোগ অত্যাচার তাহারা চিরকাল নতমস্তকে স্বীকার করিবে না। শাসকগুষ্টি মনে রাখিবেন এতকাল তাঁহারা প্রশাসন-রথ চালাইয়াছেন ঢালু পথে অনায়াসে। এবার চড়াই পথে এই রথকে ঠেলিয়া চালাইতে হইলে জনগণের সর্ব্বাত্মক সমর্থন-সহযোগিতা সদাসর্ব্বদা প্রয়োজন।

কালোবাজারীর প্ররোচনা দেয় কে?—পরিণাম কি?

দেশে চাল-ডাল-তেল-মাছ প্রভৃতির মজুতদার ও কালোবাজারী কাহারা, সরকার বাহাদুর এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ সবই জানেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এইসব অনাচার দমনের জন্য বাক্য ছাড়া আর কোন কার্য্যকর অমোঘ অস্ত্র কেন প্রয়োগ করা হয় না—এ প্রশ্নের জবাব সাধারণ মানুষ অবশ্যই দাবি করিতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে সরকার বাহাদুরের নীরব থাকা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। আজ ইহা প্রায় প্রমাণিত সত্য যে, সরকারী গোপন-আদরের ফলেই দেশের কালোবাজারীর দল নিরীহ মানুষের বুকের উপর দিয়া তাহাদের অত্যাচারের রোলার চালাইবার দুঃসাহস অর্জ্জন করিয়াছে। এ-বিষয়ে বামপন্থী নেতাদের কর্ত্তব্যও যথাযথ পালিত হয় নাই। সরকারী বাস, রেলের গাড়ি, পোষ্টাপিস, দুধের গুমটি প্রভৃতি বহুকিছু সম্পত্তি ছাই হইয়া গেল জনরোষের দাবানলে, কিন্তু প্রখ্যাত ও পরিচিত কালোবাজারীদের দেহে আগুনের সামান্য আঁচও লাগিল না কেন? পশ্চিমবঙ্গে কালো-বাজারী শঠ-শেঠ-অশেঠ সবাই এখনও বহাল তবিয়তে এবং বিনা বাধায় তাহাদের জনবঞ্চনার পুণ্যকর্ম্ম অনায়াসে অনুষ্ঠিত করিয়া চলিয়াছে! জন-রোষের কবল এবং আওতা হইতে ইহারা কোন্ পুণ্যবলে অক্ষত রহিল? সরকারী, বেসরকারী, জাতীয় এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তির ধ্বংস—ভূমিকা মাত্র, নিপীড়িত মানুষের অন্তর্জ্জালার বাহ্য প্রকাশ। ইহা ভবিষ্যতের ভীষণতর সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দিয়াছে!

একটি পুরাণো কাহিনী

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাণো ঘটনার কথা অবান্তর হইবে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রপতি হো চি মিন কলিকাতায় আসেন। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে যে রেড-কার্পেট পাতা হয়, তাহাতে তিনি পা না দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের সিমেণ্টের উপর দিয়া গিয়া গাড়িতে আরোহণ করেন। তাহার পর এই বিশিষ্ট অতিথির জন্য রাজভবনে একটি অতি সুশোভিত কক্ষে বিরাট পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু রাত্রিপ্রভাতে দেখা গেল—হো চি মিন সে শয্যায় শয়ন না করিয়া কক্ষের মেঝের উপর একটি সামান্য সাধারণ চাদরের উপরে শুইয়াই রাত্রি-যাপন করেন। রাজকীয় শয্যা তাঁহার পক্ষে কণ্টকশয্যা বলিয়া মনে হয়! বিশেষ একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহাকে এরূপ ব্যবহারের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রকারান্তরে বলেন যে, ভারতবর্ষের মত এমন ভীষণ দারিদ্র্যপীড়িত দেশের পক্ষে বিলাসবাহুল্য এবং অযথা এ ভাবে এত অপব্যয়—কেবল অর্থহীন নহে, অতি অশোভন—অন্যায়!

হো চি মিনের পক্ষে যাহা সহজ সম্ভব, আমাদের দেশের বিশিষ্ট জননেতা, এমন কি তথাকথিত 'মহারাজ' সর্ব্বস্ব-ত্যাগী-সন্ন্যাসীর পক্ষেও তাহা বোধ হয় কল্পনাতীত! কিন্তু আজ যাঁহারা, যে-সকল মহাপ্রভু মানুষকে আর মানুষ বলিয়া জ্ঞান করার প্রয়োজন বোধ করেন না, কপালগুণে উপরে উঠিয়া নিচের মানুষের মাথায় পা দিয়া দেশ শাসন তথা কল্যাণের নামে আত্ম-কল্যাণে যাঁহারা ব্যাপৃত আছেন, অচিরে এবং অতি-হঠাৎ এমন এক ভূমিকম্প ঘটিতে পারে, যাহার ফলে তাঁহাদের মাটিতে কণ্টকশয্যা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইতে পারে!

আমাদের মনে হয় বিগত আন্দোলন সামান্য স্ফোটক মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে যে সম্ভাবনার আশঙ্কা বিজ্ঞজনে করিতেছেন, সাবধান না হইলে, জনগণের সহিত শক্তি-পরীক্ষার মারাত্মক খেলার নেশা পরিত্যক্ত না হইলে জনরোষের সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিতে বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সবকিছুই ভস্ম হইয়া যাইবে। আজ যাঁহারা জনগণকে অবহেলা করিতেছেন, তাঁহাদের—"মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" ছাড়া আর কিছুই বলিবার নাই।

আমরা অযথা হাঙ্গামা এবং জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট করার পক্ষপাতী নহি এবং দেশের-দশের ক্ষতিকর কোন অযথা আন্দোলন হউক তাহাও চাহি না, কিন্তু আমাদের চাওয়া-না-চাওয়ার উপর গণ-আন্দোলন কতটুকু নির্ভর করে? বামপন্থীদের নেতৃত্বেই যদি এই সব ঘটে এবং কংগ্রেসী সরকার জনগণের সক্রিয় সংযোগিতায় বঞ্চিত হয়েন—তাহা হইলে বর্ত্তমান নেতৃত্বের অবসানই সঙ্কট মোচনের একমাত্র পথ।

উদ্বাস্তু সমস্যার শেষ কোথায়—কোন্ ঘাটে?

আরম্ভ ১৯৪৭ সালে, তাহার পর এই সমস্যার এখনও সমাপ্তি ঘটে নাই—পক্ষান্তরে ইহার মর্ম্মান্তিকতা বাড়িয়াই চলিয়াছে:

> ব্যয়বরাদ্দ আলোচনা-প্রসঙ্গে রাজ্য পুনর্বাসন-মন্ত্রী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাকে নৈরাশ্যজনক বলিলেও কম করিয়া বলা হয়। আর পুনর্বাসনে শোচনীয় অবস্থাসৃষ্টির হেতু যে এ সম্বন্ধে কেন্দ্রের পুরাপুরি দায়িত্ব পালনে গাফিলতি এই অপ্রিয় সত্যটাও তাঁহার বক্তব্যের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে।...
>
> ১৯৪৭ সন হইতে পশ্চিমবঙ্গে ৪০ লক্ষ ৮২ হাজার উদ্বাস্তু আসিয়াছেন। তাঁহাদের পুনর্বাস[ন] বাকী কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কেন্দ্রের দেওয়ার ক[থা] ১০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে কেন্দ্র ম[ঞ্জুর] করিয়াছেন ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। কিন্তু [এ] মঞ্জুরী টাকারও সব এ রাজ্যের ভাগ্যে, বলা উচি[ত] উদ্বাস্তুদের ভাগ্যে, জুটে নাই। রাজ্য সরকার [এ] পর্য্যন্ত পাইয়াছেন কিঞ্চিদধিক তিন কোটি টা[কা] অর্থাৎ মঞ্জুরী টাকার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী।
>
> কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসের এইখানেই শেষ ন[য়।] উদ্বাস্তু চাষী-পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন ৩৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু [এ] টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব [হয়] নাই। সম্ভব না হওয়ার কারণ, এই বাবদে প্র[দত্ত] অর্থের সঙ্গে এমন একটি অবাস্তব শর্ত্তের লেজু[ড়] জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থ[ায়] সেই শর্ত্ত পালন করিয়া টাকা ব্যয় করা যে স[ম্ভব] নহে, যে-কোন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই তা[হা] উপলব্ধি করিতে পারিবেন।...
>
> শর্ত্ত এই যে, প্রতি একর চারশত টাকা দ[রে] ভূমি সংগ্রহ করিয়া উদ্বাস্তু চাষী-পরিবারসমূ[হের] পুনর্বাসন করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তম[ান] ভূমিমূল্য সম্বন্ধে যাঁহার সামান্য ধারণা আছে, তি[নি] বুঝিতে পারিবেন, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে কি[ঞ্চিৎ] মাত্র জ্ঞান থাকিলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ [শর্ত্ত] আরোপ করিতে পারিতেন না। চারিশত টাকা[য়] যেখানে এক বিঘা জমিও দুষ্প্রাপ্য, সেখানে [সে] টাকাতে এক একর সংগ্রহের কথা কি করিয়া উঠি[তে] পারে? কৃষক উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কেন্দ্র সরকারের যদি কাম্য হয় এই অবাস্তব শ[র্ত্ত] প্রত্যাহার করা ছাড়া পথ নাই।
>
> এই তো গেল যে-সব উদ্বাস্তুকে সরক[ার] সাহায্য করিতেছেন বা করিতে চাহেন তাঁহা[দের] অবস্থা। কিন্তু রাজ্য পুনর্বাসনমন্ত্রীর বিবৃতিতে প্রকাশ যে সরকারের নিকট হইতে পুনর্বাসন বা[বদ] কোন সাহায্য পান নাই এমন উদ্বাস্তুও এ রা[জ্যে] আছেন আর তাঁহাদের সংখ্যা কম করিয়া ধরিলে সতেরো লক্ষ। কি অপরাধে তাঁহাদের ভা[গ্যে] সরকারী সাহায্যের শিকা ছিঁড়ে নাই, তাহা অ[বশ্য] পুনর্বাসনমন্ত্রী খুলিয়া বলেন নাই।
>
> দুর্ভাগ্যের এইখানেই শেষ নয়। পুনর্বাসনমন্ত্[রীর] বিবৃতিতেই প্রকাশ যে, যে দুই লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমব[ঙ্গে]

বাহিরে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ৭২ হাজার আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৪৯টি জবরদখল কলোনিতে যে ৩৫ হাজার পরিবার বাস করেন রাজ্য সরকার এখনও তাঁহাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। এই রাজ্যে যে ৪৮০টি সরকারী উদ্বাস্তু কলোনি আছে অর্থাভাবে সেগুলিরও উন্নয়ন সম্ভব হইতেছে না। কারণ, পুনর্বাসনমন্ত্রীর হিসাবমত যেখানে প্রয়োজন ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়াছেন মাত্র ৪৩ লক্ষ টাকা!

> কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার গাফিলতি বা অকর্মণ্যতা যাঁহারই হউক, তাহার জন্য দুর্ভোগ হইতেছে উদ্বাস্তুদেরই। দীর্ঘ আঠারো বৎসরেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমাপ্ত হইয়া তাঁহারা এ রাজ্যের সুস্থ নাগরিক হইতে পারিলেন না, উদ্বাস্তুই রহিয়া গেলেন! ইহা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারেরই অকর্ম্মণ্যতা, অদূরদর্শিতা ও কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্ক স্খালনে সরকারী চেষ্টা আরও বিলম্বিত হইলে ইতিহাসে তাহা মসীবর্ণেই চির-চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

অথচ এই উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন পরিকল্পনার দৌলতে অবাঙ্গালী বহু বহু বিত্তবানের বিত্ত আরও স্ফীত হইয়াছে—পরিকল্পনার বিষম চেষ্টার কারণে বহু অবাঙ্গালী বেকার (উদ্বাস্তু নহে) আজ পদস্থ উচ্চ-বেতনভোগী অফিসার। বহুজন পরিকল্পনার অর্থ-কল্যাণে আজ উত্তমরূপে 'পুনর্বাসন' লাভ করিয়াছেন—বাড়ী, গাড়ি এবং প্রায় সর্ব্বপ্রকার সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারা, কিন্তু যাহাদের জন্য এত বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা ও অর্থব্যয়, সেই উদ্বাস্তু আজও উদ্বাস্তুই রহিয়া গেল! মন্ত্রীর পর মন্ত্রী বদল হইল—কিন্তু উদ্বাস্তুদের প্রতি অবাঙ্গালী কোন কেন্দ্রীয় (পুনর্বাসন) মন্ত্রীর হৃদয়ের কোন পরিবর্ত্তন এখনও দেখিতে পাই নাই। পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বিরূপ এবং কদর্য্য বাদশাহী আচরণের কারণে ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কমিশনার, চেয়ারম্যান পুনর্বাসন দপ্তর হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহাদের বিষম অপরাধ ইঁহারা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের কল্যাণের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের হঠকারিতার প্রতিবাদ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই!

বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবার পরমুহূর্ত্তেই ঘোষণা করিয়াছেন যে—উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনার ব্যাপারে (উদ্বাস্তু না হইলেও) "হরিজনদের" দাবী (এবং কিঞ্চিৎ অগ্রাধিকারও) অবশ্যই গ্রাহ্য করিতে হইবে। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান পুনর্বাসন এবং শ্রমমন্ত্রী—সর্ব্বসময় হরিজনদের প্রতি সবিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রেল-মন্ত্রী থাকাকালেও ইঁহার হরিজন-প্রীতি বহু ক্ষেত্রে রেলের পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। এইবার হয়ত দেখিব দণ্ডকারণ্যে বিহার-উত্তরপ্রদেশের হরিজনদের জন্য বিশেষ বসতি এবং অন্যান্য প্রকার বিবিধ সুখ-সুবিধাকর প্রকল্পের প্রবর্ত্তন হইতে বিলম্ব হইবে না!

'হরিজনদের' কল্যাণ চাহে না এমন লোক কেহ নাই—কিন্তু দেশ খণ্ডিত হইবার ফলে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ী এবং বহু পুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া এ-পারে আসিতে বাধ্য হইয়াছে—কংগ্রেসী নেতৃত্বের নির্বুদ্ধিতা এবং গদিতে বসিবার অতি-আগ্রহের ফলে—সেই সব গৃহহীন বানে-ভাসা মানুষের পুনর্বাসন প্রশ্নের সহিত হঠাৎ হরিজনদের পুনর্বাস উঠিবে কেন? আত্মীয়-পরমাত্মীয়দের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা মমতা-বোধ এবং অন্তরের টান থাকে—কিন্তু ইহার জন্য, শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন মহাজনের আপাত অনাবশ্যক হরিজন-প্রীতির কি অর্থ লোকে করিবে?

আবার সেই পুণ্যকথা

কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেড় লাইন দেখিলাম—"লোকসভায় হিন্দী প্রসারের সরকারী নীতির পুনর্ঘোষণা!"

শ্রীনন্দা লোকসভায় পরমানন্দে ঘোষণা করেন যে "প্রশাসনে হিন্দী প্রচলনের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া সরকারের (বর্ত্তমান—উত্তর প্রদেশী ও বিহারী মন্ত্রী সংখ্যাগুরু কংগ্রেসী সরকার) নীতি হইলেও"—শ্রীনন্দা পরম দয়াভরে বলেন যে, "যাঁহারা হিন্দী জানেন না, তাঁহাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করা হইবে না!" অর্থাৎ এখন না হইলেও অদূর ভবিষ্যতে অহিন্দী-ভাষীদের হিন্দী শিখিয়া প্রশাসনের কাজকর্ম অবশ্যই চালাইতে হইবে—কারণ শ্রীনন্দা ঘোষণা করেন যে "অহিন্দীভাষী সরকারী কর্মচারীদের (ঝটপট?) হিন্দী শিক্ষা করিবার সকল প্রকার সুযোগ (?) দেওয়াও সরকারী নীতি!"

কিন্তু কেন? দেশের হাজার রকম অভাব-অভিযোগ এবং বিবিধ প্রকার কলহ-বিবাদের সময় হিন্দীই কি "সর্ব্বজ্বরগজসিংহ" পরমোত্তম টনিক বলিয়া বিবেচিত

হইল? হিন্দী শিখিলে ভারত সরকারের প্রশাসনিক কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিবে—এই সিদ্ধান্ত নন্দামহারাজ কোথা হইতে এবং কোন্ সূত্রে পাইলেন? শ্রীনন্দার ঘোষণায় মনে হয়—কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলিতে বর্ত্তমানে যে সকল অনাচার অপকর্ম্ম ঘটিতেছে সরকারী কর্ম্মচারীরা হিন্দী শিখিলেই তাহার অবসান ঘটিবে এবং অহিন্দী-ভাষী সরকারী কর্ম্মচারীরা যেদিন হইতে হিন্দীতে চিঠিপত্র এবং বাতচিত্ চালাইতে পারিবে—সেই দিনই কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃত সদাচারী রামরাজ্যে পরিণত হইবে!

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেই জোর করিয়া হিন্দী চাপাইবার প্রতিবাদে ভারতের বহু অহিন্দীভাষী রাজ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল, যাহার ফলে কেন্দ্রীয় হিন্দী ধ্বজাধারী মন্ত্রীদের সবিশেষ বিচলিত দেখা যায় এবং সাময়িক ভাবে তাঁহারা বিপদকালে পশ্চাদপসরণ নীতি আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়েন! এখন বোধহয় তাঁহারা 'এবার হয়েছে সময়' ভাবিয়া আবার হিন্দীর দামামা পিটিতে সুরু করিয়াছেন!

দেশের এবং দশের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক এবং জুটুক না কেন—আমাদের কেন্দ্রমণি হিন্দীভাষী মনিবদের একটা অপক্ক-ভাষাকে সর্ব্বভারতীয় এবং সকল জনগ্রাহ্য অবশ্যম্ভাকার্য্য ভাষা রূপে মানুষের ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার এই অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক পশ্চাত-পক্কতা প্রদর্শন সত্যই বিচিত্র! কর্ত্তারা কি আবার দেশের সংহতিনাশক হিন্দী-প্রচারেও তৎপর হওয়াটাই পরম কর্ত্তব্য ও অবশ্যকরণীয় সরকারী প্রশাসন কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিলেন?

সুড়ঙ্গ-পথে হিন্দী প্রচার ত বেশ চালানো হইতেছে—সরকারী ফর্ম্মে,পোষ্টাপিসের বিবিধ কার্য্যে—অহিন্দীভাষী রাজ্যের রেলষ্টেশনের নামের সাইনবোর্ডে হিন্দীকে জবরদস্তি পদাধিকারবলে ইংরেজি বাঙলা প্রভৃতি ঘাড়ের উপর বসাইয়া! এততেও কি কর্ত্তাদের বিষম হিন্দীর ক্ষুধার অবসান হইতেছে না? হিন্দীর আগুনে কি তাঁহারা ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইয়া—সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ্রাসী বিষম দাবানলে পরিণত করিয়া দেশের সব কিছুকে হিন্দী কবিরাজদের 'বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ' প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর? কথায় কথায় কর্ত্তারা 'গণতন্ত্র', 'রামরাজ্য', 'ব্যক্তিস্বাধীনতার' বাণী প্রচার করেন—কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে—সবই মৌখিক,ঝুটা! বিশেষ করিয়া হিন্দীর বিষয়ে কর্ত্তাদের হুকুমই শেষ কথা! সত্যই কি তাহাই? না শেষেরও একটা শেষ আছে?

প্রসঙ্গত কয়েকদিন পূর্ব্বের উপ-রাষ্ট্রপতির একটি বাণী উল্লেখ করা যায়। তাঁহার মতে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এখন আবশ্যক—অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষাকে Hindi-oriented করিতে হইবে!

পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্ব্বাচন বনাম কংগ্রেস

শুনিতেছি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রসপেক্ট সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিতেছেন। 'বিগত ১৩শে মার্চ্চ' দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকজন এম পি'র সহিত এ-বিষয় আলোচনা করেন। প্রকাশ যে এ-রাজ্যের এম. পি'রা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সাফল্য সম্পর্কে খুব একটা আশার ভাব পোষণ করেন না। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীঅজয় মুখার্জ্জির, 'সরকারী' অর্থাৎ শ্রীঅতুল্য ঘোষ শাসিত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং আগামী নির্ব্বাচনে 'স্বতন্ত্রী'-কংগ্রেসী প্রার্থী দাঁড় করাইবার পরিকল্পনা তাঁহাদের মস্তকে কিঞ্চিত বেশী উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে! ইঁহাদের ইচ্ছা অজয়বাবুর সঙ্গে একটা সমঝোতা করিয়া তাঁহাকে আবার কংগ্রেসের শ্রীঅতুল্য-গোষ্ঠীতে ফিরাইয়া আনা হউক। অতি উত্তম কথা। কিন্তু অজয়বাবুকে যে ভাবে এবং যে অপমান করিয়া কংগ্রেস সভাপতির পদ হইতে তাড়ানো হইয়াছে, এবং যে ভাবে অজয়বাবুর উত্থাপিত অভিযোগগুলিকে (কংগ্রেসের মোড়লদের বিরুদ্ধে) হিমঘরে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় অজয়বাবুর পক্ষে ক্ষমতাসীন বর্ত্তমান কংগ্রেস দলের সহিত আর কোন প্রকার প্যাক্ট বা চুক্তি ঘটা অসম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—বিগত-কালে অন্যান্য বহু ভদ্র এবং সদাচারী কংগ্রেস নেতাকেও অপমানিত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিতে হয় একান্ত বাধ্য হইয়াই (আচার্য্য কৃপালনী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—এমন কি নেতাজীরও নাম করা যায়)।

কংগ্রেসী নেতা এবং মন্ত্রীদের পরম জনপ্রিয়তা এবং চরম বিক্রম প্রকট হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের বিবিধ অঞ্চলে—বিশেষ করিয়া কলিকাতায় বিগত গত বিক্ষোভের কয়েকদিনে। প্রকাশ যে 'বঙ্গ-সম্রাট' হাঙ্গামার সূত্রপাত হইবামাত্র নিজ 'প্রাসাদে'—সরকারী খরচায় আর্ম্মড গার্ড (প্রায় ৩০ জন) রাখিয়া—স্বয়ং অদৃশ্য হয়েন। অন্যান্য

নেতাদের কার্য্যক্রমও একই প্রকার। জনপ্রিয় কংগ্রেসী নেতারা তথা মন্ত্রীগণ—মারমুখী জনতার পরোয়া না করিয়াই নিজ নিজ আবাস পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানস্থ হইবার জন্য অজ্ঞাতবাসে প্রয়াণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই! পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা শান্ত হইবার পর একে একে কংগ্রেসী নেতাদের পুনঃ আবির্ভাব দেখা গেল! বঙ্গ-সম্রাটের কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ ২৮শে মার্চ্চের সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেখিয়া বঙ্গবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা হর্ষাকুল হইয়াছে!

অবাক হইয়া ভাবিতেছি ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসী নেতাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ৪০।৫০ মাইল দূরের গ্রাম হইতেও হাজার হাজার লোক ছুটিয়া আসিত—আর আজ কোন কংগ্রেসী নেতা বক্তৃতা দিবার উপক্রম করিলেই জনতা তাঁহাকে ৪০।৫০ মাইল খেদাইয়া লইয়া যায়!!

সেই কংগ্রেস! এই কংগ্রেস!! হায় কংগ্রেস!!!

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী প্রার্থীদের ভাগ্যাকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘের সমারোহ দেখা যাইতেছে—ঝড়ের পূর্ব্বাভাসও অতি প্রকট। এমন অবস্থায় কামরাজী বাক্যের কোন দাম দিতে সাধারণ মানুষ রাজী হইবে কি? নেতারা জনগণকে বহুকাল যাবত ত্যাগের বাণী শুনাইয়াছেন—কিন্তু এবার বোধ হয় কংগ্রেসী নেতাদের অনায়াস-অর্জ্জিত বিত্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদ্গার করিয়া থলি হাতে পয়সাহীন অবস্থায় 'লাইনে' দাঁড়াইতে হইবে বিরস বদনে। এখন 'বেকার' নেতাদের জন্য দুই-চারিটা চ্যারিটি ফাণ্ডের আয়োজনও করা যাইতে পারে। কপালগুণে যাহা পকেটে প্রবেশ করিয়াছিল—কপালবৈগুণ্যে তাহা এবার পকেট বদল হইতে পারে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আমাদের বিরোধ বা কলহ নাই কিন্তু কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া যে-সকল নীরেট কিন্তু খাঁটি প্রবঞ্চক-প্রতারক চরিয়া খাইতেছে তাহাদের পাপাচার হইতে কংগ্রেসকে আমরা মুক্ত দেখিতে চাই।

মহিলা মঙ্গল

চাকুরিজীবী বাঙালী মেয়ে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙালী তথা ভারতীয় জনজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। যুদ্ধের সুফল ও কুফল স্থানীয় অধিবাসীকে পুরোমাত্রায় ভোগ করতে হয়। অন্যান্য যুদ্ধের মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও তার অবশ্যম্ভাবী সুফল ও কুফল নিয়ে এলো ভারতীয় জনজীবনে। অন্যান্য নানা কুফলের সঙ্গে ভারতীয় জনজীবন মুখোমুখি হ'ল নিদারুণ অর্থ সমস্যায়। আর্থিক অনটনের এই ভয়াবহরূপ বিশেষ করে বাঙালীর মধ্যবিত্ত জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলল। তখন নানাভাবে নানা উপায়ে উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে হ'ল বাঙালীকে, অনেকক্ষেত্রে অভাবের দায়ে কুপথেও নামতে হ'ল। এই অর্থসংকট শুধু বাঙালী পুরুষকেই নয়, ধীরে ধীরে গ্রাস করল বাঙালী নারীসমাজকেও। শুধু পুরুষের একক রোজগারে সংসার-যাত্রা নির্বাহ প্রায় অচল হ'তে সুরু করল। তখন সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখার জন্য অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিদারুণ অর্থসমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বাঙালী মেয়েকেও পথে নামতে হ'ল অর্থোপার্জনের জন্য। বাইরের জগতের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চিনে নিতে হ'ল অর্থোপার্জনের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রটিকে। কিন্তু শুধুমাত্র আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখার জন্য বা অভাবের নির্মম কঠোরতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই নয়; সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও মধ্যবিত্ত সমাজ বাঙালী মেয়েকে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে নামাতে বাধ্য হ'ল। দেশের সমাজভিত্তিক কাঠামো যখন ভেঙে পরিণত হ'ল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে তখন আর কোন উপায়ান্তর দেখা গেল না। বিশেষতঃ, অর্থ যখন সামাজিক মানরক্ষায় বা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির মানদণ্ড হ'ল, তখন এছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। অর্থ-সঙ্গতি নেই, অথচ সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারকে মেনে নিতে বাধ্য, সমাজের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আকুল প্রয়াস মধ্যবিত্ত সমাজকে এক নিদারুণ দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত করতে সুরু করল। যুগান্তরের এই ঢেউ রক্ষণশীল পরিবারেও এসে লাগল, ফলে, যুগের সব দাবী মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেয়ের চাকুরি-ক্ষেত্রে অবতরণও পরিবার মেনে নিতে বাধ্য হ'ল।

এইসব রক্ষণশীল ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা যখন বাইরের আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য হলেন তখন তাঁদের নানাবিধ সমস্যার সঙ্গেও মুখোমুখি হ'তে হ'ল! বিপ্লব আসে আকস্মিক; আকস্মিকতার আঘাতে সব-কিছুই ওলোট-পালোট হয়ে যায়। সহজাবস্থায় ফিরে আসতে কিছুটা সময় নেয়। চাকুরিক্ষেত্রে মেয়েদের এই অবতরণকে বাইরের নানা প্রয়োজনে মেনে নিলেও সমাজের মর্মমূলে এক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। মন থেকে মেনে নেওয়ার সহজতা এখনও নানা পরিবারের মধ্যে আসে নি; ফলে ঘর ও বাহির সামলাতে সামলাতে মেয়েরা হাঁপিয়ে উঠছে। ঘর ও বাহিরের এই দ্বিবিধ সমস্যায় রক্ষণশীল পরিবারের চাকুরিজীবী মেয়েরাই বেশি ক'রে বিব্রত হচ্ছেন। গৃহপরিচর্যার সকল দায়, সকল দায়িত্ব যুগে যুগে নারীর ওপরই অর্পিত হয়েছে। বহুকালার্জিত এই সংস্কারের বোধ থেকে আজও বাঙালী মেয়ে মুক্ত নয়। সংসারকে শান্তিময় ও সুন্দর রাখার ব্রত যেমন মেয়েদের, বাইরের জীবনে সংগ্রাম ক'রে চলার সাধনা তেমন পুরুষের। কিন্তু আজ কর্মক্ষেত্রে পুরুষকে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের কাছে হেরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তবুও ঘর সংসার রক্ষার দায়িত্ব তাঁকে কেউ দেয় নি। এই অলিখিত নির্দেশ তাই পুরুষকে সংসার-পরিচর্যা থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু নারীকে আজও বাইরের জীবনের সঙ্গে সমান তাল রেখে সংসার-জীবনের পরিচর্যা ক'রে যেতে হচ্ছে। ফলে এ দু'য়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা বহুক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না।

গৃহকে অস্বীকার ক'রে বাইরের জীবনকে বাঙালী মেয়ে আজও পুরোপুরি মেনে নিতে পারছেন না, ফলে উভয়ের মধ্যে বাধছে নিরন্তর সংঘর্ষ। যার বিষময় ফল সংসারের ক্ষেত্রে বহুদূর পর্যন্ত অশান্তির বীজ বপন করছে; স্বামীপুত্রের সঙ্গে আনছে বিচ্ছেদ, সংসারকে ক'রে তুলছে অসন্তোষ আর অশান্তির ক্ষেত্র। অন্যদিকে চাকুরিক্ষেত্রে আছে কর্তব্যের অনুশাসন; নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ জীবন। নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দেওয়া, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করার নির্দেশ সেখানে। সংসারের কাজ বজায় রাখতে গেলে অনেকক্ষেত্রেই চাকুরিজীবন হয়ে পড়ে নিরর্থক। কারণ, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে গৃহের কন্যা বা বধূকেই স্বহস্তে গৃহের যাবতীয় পরিচর্যা করতে হয়। সবকিছু কাজ সারা ক'রে চাকুরি-স্থলে হাজিরা দিতে কখনও কখনও হয়ত নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও সাংসারিক নানা কাজে বা সামাজিক নানা আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে চাকুরিস্থলে যাওয়াই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু চাকুরি-স্থল ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য নয়; সেখানে অনেকক্ষেত্রেই চাকুরি বজায় রাখা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে চাকুরি বজায় রাখতে গেলে সংসারও তার ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য হয় না। পরিবারের প্রিয়জনবর্গের কাছে তখন অপ্রিয় হয়ে উঠতে হয়, সমাজের কাছে হ'তে হয় অপরাধী। সংসার ও চাকুরি জীবনের এই নিরন্তর দ্বন্দ্বেই বাঙালী মেয়ে ক্ষতবিক্ষত। দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে চলতে পারাটাই আজ গৃহের বধূ বা কন্যার পক্ষে কঠিনতম কাজ। দুরূহতম সমস্যা।

উপযুক্ত জীবিকার সন্ধান পাওয়াও আর এক কঠিন সমস্যা। সামাজিক ও পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে জীবিকা নির্বাচন করাও এক কঠিনতম সমস্যা। দীর্ঘদিন যে নারী-সমাজের বিচরণক্ষেত্র ছিল গৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আজ আধুনিকতা ও বিপ্লবের অতর্কিত আঘাতে বাইরের জীবনের যথার্থরূপ মেয়েদের কিছুটা পথভ্রান্ত করে তুলছে। ফলে শতসহস্র মোহ ও প্রলোভনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে যথাযোগ্য জীবিকার অন্বেষণ করা বেশ কিছুটা আয়াসসাধ্য। আজকের বাঙালী মেয়ে এখনও ঠিক পথটি চিনে নিতে পারছেন না; এর জন্যও বহুবিধ সমস্যার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত হ'তে হচ্ছে। আর্থিক প্রয়োজনে যে কোন জীবিকাই তাঁকে গ্রহণ করতে হচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যোগ্য জীবিকালাভে সক্ষম হচ্ছেন না বহুতর ক্ষেত্রেই। ফলে শিক্ষার পরিমাণে সম্মান, কোথাও কোথাও মর্যাদাও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও শিক্ষা বা দক্ষতা অনুপাতে অর্থোপার্জন হচ্ছে না। ফলে সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ত দূরের কথা, সংসার নির্বাহই অনেক ক্ষেত্রে অচলাবস্থায় পরিণত হচ্ছে।

চাকুরিজীবী বাঙালী মেয়ের আর একটি সমস্যার কথা এখানে বলা যেতে পারে, তা হ'ল বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের অভাব। পাশ্চাত্ত্য বা অন্যান্য দেশে বাল্যাবস্থাতেই এই ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, যাতে প্রতিটি ছেলে এবং মেয়ে ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাচনের সহজ পথটি খুঁজে পান। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ছেলে এবং মেয়ে যাঁর যাঁর নিজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষ ও যোগ্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলা দেশে মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপক প্রচার আজও সম্ভব হয় নি। এর কারণও অবশ্য কিছুটা বাঙালী পরিবারের রক্ষণশীলতা, আবার কিছুটা অর্থ-সঙ্গতি হীনতা। ফলে খুব মুষ্টিমেয় কয়েক সংখ্যক মেয়ে ছাড়া অধিকাংশ মেয়েই গতানুগতিক পন্থায় চাকুরি করে যান। নতুন কিছু বা ছেলেদের মত কারিগরী ইত্যাদি জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করতে সক্ষম হন না।

অন্যান্য দেশের মেয়ের মত বাঙালী মেয়ে দেশ-ভ্রমণের, নানা দেশের ভাষা বা ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার, নানাবিধ খেলাধুলা করার সুযোগও অনেক ক্ষেত্রে পান না। কারণ হয়ত একই। কিন্তু বহুদিনের অলস নিষ্ক্রিয়তাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। এইগুলির অভাবে সহজ সপ্রতিভতা, চাকুরির ক্ষেত্রে যার দাম কিছুমাত্র কম নয়, সেটা লাভ করতে বেগ পেতে হয়। ফলে অন্যান্য দেশের মেয়ের মত, বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্যের, কর্মতৎপর ও দক্ষ হয়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লাগে।

অধুনা যানবাহনের যে রকম দুর্বল অবস্থা তাতে মেয়েদের পক্ষে যাতায়াত করাও এক দুরূহ সমস্যা। পুরুষের মতই যখন তাঁকে কাজে নামতে হয়েছে, তখন পুরুষের মতই ভীড় ঠেলে কোন প্রকারে ট্রাম বা বাসে তাঁকে উঠতে বাধ্য হ'তে হয় ঠিকই, কিন্তু তবু পুরুষ যা পারেন, আজ যতই আধুনিক হন মেয়েরা তা পারেন না। পুরুষ বহু দিনের অভ্যাসবশতঃ ভীড়ের চাপ সহ্য করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাকুরিস্থলে পৌঁছতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের পক্ষে ঠেলাঠেলি করে ট্রামে-বাসে ওঠা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাকুরিস্থলে পৌঁছতে হয়। আবার

গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়ও এই সমস্যা। বহু ক্ষেত্রে জীবনের বিরাট ঝুঁকি বহন ক'রে ট্রামে-বাসে উঠতে হয় মেয়েদের। এও এক নিদারুণ সমস্যা।

দেশের মধ্যবিত্ত সমাজই দেশের প্রাণকেন্দ্র; ফলে মধ্যবিত্ত সমাজেরই সমস্যা বিশেষ ব্যাপক। বলা চলতে পারে এসকল সমস্যার সমাধানকল্পে কোন সুনির্দিষ্ট পথ মধ্যবিত্ত সমাজ দেখাতে পারেন না। গত দশ-বারো বছরে দেশের যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পট-পরিবর্তন ঘটেছে তাতে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব এসেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন এতই আকস্মিক যাতে সমাজ এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারে নি। ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহারকে অস্বীকার করাও যেমন পরিবারের পক্ষে কষ্টকর হচ্ছে, আবার যুগের চাহিদা ও দাবীকে অস্বীকার করাও তেমনি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। ফলে চাকুরিজীবী মেয়েদের এই ঘর ও বাহির উভয় পক্ষকে সামলে চলার দায়িত্ব সমধিক। এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানও চিরন্তন সমস্যা। সহজ ভাবেই একদিন এ সমস্যার সমাধান ঘটবে এই আশাতেই আমরা সেই অনাগত ভবিষ্যতের অপেক্ষা ক'রে থাকব। আজকের যুগে নারী বা পুরুষের সমস্যায় বিভেদ বিশেষ স্পষ্ট নয়; কারণ, সকল ক্ষেত্রেই আজ পুরুষ ও নারীর সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সমান পদক্ষেপ ফেলেই তাঁদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই অন্যান্য সমস্যাগুলির ব্যাপক সমাধান প্রয়োজন। জীবিকার সংখ্যা বাড়ানো, বৃত্তিমূলক শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা গ্রহণ, যানবাহনের অপ্রচুরতা দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন যদি রাষ্ট্র বা দেশের কর্ণধার গ্রহণ করেন, তবেই এ সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব। সে শুধু বাঙ্গালী নারীর ক্ষেত্রেই নয়, পুরুষের ক্ষেত্রেও। যুগান্তরের এই অসুবিধাগুলি মেনে নিয়ে তাই আজও আমরা সেই দিনটির প্রতীক্ষায় আছি; যেদিন অন্যান্য দেশের সঙ্গেই সমান দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন ক'রে বাঙ্গালী মেয়ে আরো দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারবে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে।

স্বাতী ঘোষ

—

আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

খাদ্যশস্য ও খাদ্যসঙ্কট

গত মাসাধিক কালের মধ্যে দেশের জীবনের আর্থিক ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলি বা ঘটনাপরম্পরা গুরুতর, এমন কি সঙ্কটময় পরিণতির দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার মধ্যে অন্যতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেশের বর্তমান খাদ্য সঙ্কট। এই বিষয়টি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক সঙ্কট, গভীর অসন্তোষ এবং বিস্ফোরক আন্দোলনে—বিশেষ করে কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দুইটিতে (সরকারী হিসাব অনুযায়ী খাদ্য-শস্য উৎপাদনের দিক থেকে এই দুইটিই "ঘাটতি" রাজ্য)-সাধারণ মানুষের এমনিতেই ভারাক্রান্ত জীবনযাত্রার ধারাটিকে আরও গভীর ভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

বিষয়টির দুইটি বিশেষ বিশেষ দিকের বিচার প্রয়োজন। এই উভয় দিকই অবশ্য এবং অনিবার্য ভাবে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সংবদ্ধ। কিন্তু তবু তারা পৃথক এবং ভিন্ন।

প্রথমটি হ'ল বিষয়টির আর্থিক সমস্যার দিক। খাদ্যবস্তুর অন্যান্য সকল আবশ্যিক উৎপাদনের কথা বাদ দিয়েই কেবলমাত্র খাদ্য-শস্যটিকেই দেশের সাধারণ লোকের প্রধানতম, এমন কি প্রায় একমাত্র খাদ্য উপাদান বলে ভাবতে আমরা বহু দিন ধরেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সভ্য জগতে আজিকার দিনে আহার্যের খাদ্য উপাদান বা ক্যালরির হিসাবে পর্যাপ্ততা বা স্বল্পতা বিচার করা হয়ে থাকে। ক্যালরির হিসাবে আদর্শ অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাদ্যের হিসাব ধরা হয়ে থাকে—প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য ৩,০০০।৩,৩০০ ক্যালরি ; স্ত্রীলোকদের জন্য ২,৫০০।৩,০০০ ক্যালরি ; বালকদের জন্য ২,৫০০। ৩,৮০০ ক্যালরি ; বালিকাদের ২,৩০০।২,৮০০ ক্যালরি ; শিশুদের জন্য ১,২০০।২,০০০ ক্যালরি। আধুনিক পুষ্টি-বিজ্ঞানসম্মত হিসাব অনুযায়ী উপরোক্ত ক্যালরি হিসাবে খাদ্য একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে বর্তমানে ষ্ট্যাটুটারী র‍্যাশনবিধৃত এলাকায় যে হিসাবে সরকারী র‍্যাশন বণ্টন করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের সপ্তাহে মাথাপিছু ১ কিলোগ্রাম চাউল, ১ কিলোগ্রাম গম বা আটা/ময়দা এবং ২৫০ গ্রাম চিনি, তাতে মাথাপিছু দৈনিক সর্বোচ্চ ক্যালরির হিসাব দাঁড়ায় : গম—৬৫০ ক্যালরি ; চাউল ২৫০ ক্যালরি এবং চিনি—১০০ ক্যালরি ; অথবা মোট ১,০০০ ক্যালরি। অর্থাৎ বিজ্ঞানানুমোদিত হিসাব অনুযায়ী আমাদের আবশ্যিক পুষ্টির জন্য যত ক্যালরি খাদ্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন তার মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ মাত্র আমরা পেয়ে থাকি। অর্থাৎ ভাষাগত অর্থে (literally) আমরা একেবারে উপবাস করতে বাধ্য না হলেও যেটুকু খাদ্য আমরা এখন পাচ্ছি, তাতে ধীরে ধীরে আমাদের প্রাণ-শক্তি ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসবার পথে চলেছে। সরকারী বণ্টন নিয়ন্ত্রণের আওতায় আমরা যেটুকু খাদ্যশস্য ও চিনি এখন পাচ্ছি, এর চেয়ে বেশী সংগ্রহ করা বেআইনি এবং দণ্ডনীয়—তার ওপরে মাছ, মাংস, শব্জী, দুধ, মাখন বা ঘি ইত্যাদি যতটা সংযোগ করলে আমাদের দৈনিক আহার্যটুকু স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল হ'তে পারত, ততটুকু সংগ্রহ করতে হলে বর্তমান মূল্যে তার মাথাপিছু দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ যা দাঁড়াবে সেটা সাধারণ লোকের আয়ত্তের বহু ঊর্দ্ধে। সরকারী নির্দ্ধারিত বর্তমান মূল্য-মানে একটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাথাপিছু সাপ্তাহিক ১ কিঃ চাউল, ১ কিঃ গম এবং ২৫০ গ্রাঃ চিনি সংগ্রহ করতে বর্তমানে বার্ষিক খরচের অঙ্ক দাঁড়ায় মোটামুটি ৯৮·২৮ টাকা অথবা প্রায় ১০০ টাকা। এর ওপরে আরও অতিরিক্ত ২,০০০।২,৩০০ ক্যালরি মাছ-মাংস, দুধ ঘি ইত্যাদি দিয়ে পূরণ করতে হলে প্রয়োজন—মাছ বা মাংস (দৈনিক) ১০০ গ্রাঃ ; দুধ—১০০ গ্রাঃ ; সব্জী—৫০০ গ্রাঃ ; মাখন বা ঘি ৫০ গ্রাঃ অর্থাৎ দৈনিক আরও মাথাপিছু প্রায় ১·৫০ টাকা থেকে ১·৭৫ টাকা ; অর্থাৎ বার্ষিক ৫৪৭ টাকা থেকে ৬৩৯ টাকা। একটি সরকারী হিসাব অনুযায়ী (১৯৫৯ সনের জুলাই থেকে ১৯৬০ সনের জুন পর্যন্ত হিসাব), যাঁদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ৮৲ টাকা থেকে সুরু করে ১৮৲

টাকা পর্যন্ত দাঁড়ায় তাঁদের শতকরা সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায়—গ্রামবাসীদের মধ্যে ৬৪.৯% এবং সহরবাসীদের মধ্যে ৪১.৮% ; গ্রামে মাত্র শতকরা ৩% এবং শহরে ৮% লোকের মাথাপিছু মোট ব্যয়ের পরিমাণ মাসিক ৪৩ টাকার বেশী।* অন্য পক্ষে দেশের লোকের মাথাপিছু মোট (gross) আয়ের পরিমাণ, ১৯৬২-৬৩ সনের সরকারী হিসাব অনুযায়ী স্থির মূল্যমানে (১৯৪৮-৪৯—১০০) ২৯৪.৭ টাকা এবং বর্তমান মূল্যমানের হিসাবে ৩৩৯.৪ টাকা।** কিন্তু এতেও আসল অবস্থাটির একটা সম্যক ধারণা হওয়া কঠিন। গত বৎসরে প্রকাশিত একটি বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে দেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৭% ভাগ উর্দ্ধতম আয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১% ভাগ লোক অধিকার করে থাকেন এবং উর্দ্ধতম আয়ের শতকরা ৬% ভাগ লোক মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪০% ভাগ অধিকার করে থাকেন। তা হ'লে এই উর্দ্ধতম আয়ের শতকরা ১% এবং ৬% লোকের আয় বাদ দিয়ে মাথাপিছু আয়ের হিসাব করলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে বর্তমান মূল্যমানে—যথাক্রমে ২৮০ টাকা কিংবা স্থির মূল্যমানে ২০০ টাকা মাত্র। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাথাপিছু মোট আয়ের তুলনায় ভোগ্য আয় (disposable income) অনিবার্য ভাবেই আরও অনেকটা কম হবে।

অর্থাৎ বর্তমান আর্থিক অবস্থায় দেশের সাধারণ লোকের মোটামুটি খাদ্যের প্রধানতম এবং ওজন হিসাবে বৃহত্তম অংশ খাদ্যশস্যের দ্বারা পূরণ করতে হয়। ১৯৬১ সনের ডিসেম্বর মাসে প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদিত (authorised) একটি সরকারী পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে, বর্তমানে, বিদেশ থেকে আমদানী শস্য যোগ করেও দেশের লোককে মাথাপিছু দৈনিক ১৬ আউন্সের বেশী খাদ্যশস্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানের (তৃতীয় প্ল্যান অনুযায়ী) উৎপাদন-লক্ষ্যে যদি সার্থক ভাবে পৌছান যায় তবে ১৯৬৬ সন নাগাদ মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যশস্য সরবরাহের পরিমাণ ১৭½ আউন্সে বৃদ্ধি পাবে। *** দুঃখের বিষয় আজ ১৯৬৬ সনে মাথাপিছু দৈনিক ১৭½ আউন্স দূরের কথা, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দৈনিক এখন ৭.২ আউন্স খাদ্যশস্যও পাওয়া ভার হয়েছে। সরকারী হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, দেশের সাধারণ লোকের পুরো খাদ্যের মোট ক্যালরির তিন-চতুর্থাংশ ভাগ শস্য জাতীয় (cereals) খাদ্যবস্তু থেকে আহৃত হয়ে থাকে। সম পরিমাণ গম ও চাউলে মানুষ যদি দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবেও খাদ্যশস্য ভোগ করতে পারত, তবে মোট ক্যালরির পরিমাণ দাঁড়াত প্রায়: চাউল—৪৩৭.৫ ক্যালরি; গমজাত খাদ্য—১,১৩৭.৫ ক্যালরি; চিনি—১০০ ক্যালরি—মোট দৈনিক ১,৫৭৫ ক্যালরি। সরকারী হিসাব অনুযায়ী যদি লোকে এর সঙ্গে ক্যালরিতে আরো এক-চতুর্থাংশ অন্যান্য খাদ্যবস্তুর ভোগ দ্বারা পূরণ করতে পারত, তবে মোটামুটি প্রায় ১৯০০-২০০০ ক্যালরির মতন হওয়া সম্ভব ছিল! কিন্তু মানুষে খাদ্যশস্য থেকে, আমরা দেখিয়েছি, বর্তমানে মাত্র ১,০০০ ক্যালরি আন্দাজ পেয়ে থাকে। অন্যান্য খাদ্যবস্তুর বর্তমান অগ্নি মূল্যের কথা বিবেচনা করে মনে হয় যে সাধারণ লোক সেগুলো থেকে তার বর্তমান শস্যজাত খাদ্যবস্তু থেকে ভোগ করা মোট ১০০০ ক্যালরির এক-চতুর্থাংশের বেশী, অর্থাৎ ২৫০ ক্যালরি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ দেশের মোটামুটি জনসংখ্যার অন্ততঃ ৭৮% ভাগ লোক দৈনিক তার ন্যূনতম প্রয়োজন ৩০০০ ক্যালরির স্থলে মাত্র ১২০০ ক্যালরি দিয়ে যথাসাধ্য তার দেহের পুষ্টিসাধন করতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু একটা বিষয়, এই প্রসঙ্গে, সাধারণ লোকের কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। ১৯৬১ সনে, আমরা দেখছি, প্ল্যানিং কমিশন সরকারী ভাবে ঘোষণা করছেন যে ঐ বৎসর বিদেশ থেকে আমদানী করা খাদ্যশস্য ও দেশে উৎপন্ন ফসল, এই দুই মিলিয়ে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ দৈনিক ১৬ আউন্সের বেশী হবার মত

---

* ইণ্ডিয়া ১৯৬৪, ৬৪ নং হিসাবের খসড়া (India 1964. Tabb 64) পৃঃ ১৫১

** ঐ—ঐ ৫১ নং হিসাবের খসড়া, পৃঃ ১৪২

*** Towords A self Reliant Economy. Planning Commission (Govt of India Publication) P. 171-"To day even with food imports, the amount of food grains avilable per person per day is only 16 oz. The new production target will permit 17½ oz of cereals per day to be available per person by 1966."

সরবরাহ ছিল না। প্ল্যানিং কমিশনের একটি হিসাব অনুযায়ী খাদ্যশস্য উৎপাদনের নিম্নলিখিত খসড়া পাওয়া যাচ্ছে (ক) :—

শস্য	উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫০-৫১	(দশলক্ষ টন অঙ্কে) ১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১ (আনুমানিক)	১৯৫০-১৯৫১ সনের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সনে শতকরা বৃদ্ধি
চাউল	২০·৯০	২৭·১০	৩২·০০	৫৩%
গম	৬·৬০	৮·৬০	১০·০০	৫১%
অন্যান্য খাদ্যশস্য (cereals)	১৬·২০	১৯·২০	২২·০০	৪৬%
ডাইল জাতীয় শস্য	৮·৫০	১০·৯০	১২·০০	৪১%
মোট খাদ্যশস্য	৫২·২০	৬৫·৮০	৭৬·০০	৪৬%

১৯৬০-৬১ সনের পর থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মোট খাদ্যশস্যের বার্ষিক উৎপাদন ১০ কোটি টনে পৌঁছবে বলে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। তার মধ্যে চাউলের উৎপাদন অতিরিক্ত ৪০% বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টন, গমের উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন এবং সকল প্রকাশ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩২% বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১০ কোটি টনে পৌঁছবে বলে লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা হয় নি; একমাত্র ১৯৬৪-৬৫ সনে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ মোট উৎপাদন হয়, গড় পড়তা বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৮ কোটি টনের অধিক হয় নি। তা হ'লেও ভোগচাহিদার বাস্তব হিসাবে খাদ্যশস্যের বর্তমান সঙ্কটাবস্থার কারণ বোঝা মুস্কিল। আমরা পূর্বেই বলেছি যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য-শস্যের চলাচলে আঞ্চলিক বাধাগুলি প্রত্যাহৃত হলেই অবস্থা অনেকটা সহজ ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটা খানিকটা হৃদয়ঙ্গম হবে। রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ রাজ্যে মোট ৮৬,০০,০০০ লোককে মাথাপিছু সপ্তাহে ১ কিলোগ্রাম চাউল ও ১ কিলোগ্রাম গম পূর্ণ র‍্যাশনিং (statutory rationing) ব্যবস্থা অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে এবং ১,১৩,০০,০০০ লোককে আংশিক র‍্যাশনিং অনুযায়ী মাথাপিছু সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম চাউল এবং ১৩০০ গ্রাম গম দেওয়া হচ্ছে। সেই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, এই ব্যবস্থা চালু রাখতে সরকারের সপ্তাহে ১৭,৩০০ টন চাউল এবং ১৭,৭০০ টন গম খরচ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান লোকসংখ্যা বর্তমানে ৩,৯০,০০,০০০ লোকের কিছু কম হবে, তার মধ্যে উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী ১,৯৯,০০,০০০ লোক র‍্যাশন পাচ্ছেন। এই হিসাব অনুযায়ী মোট বার্ষিক চাউলের খরচ দাঁড়ায় ৭,৪০,৬০০ টন। তা ছাড়া আংশিক র‍্যাশনে যাঁরা সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম করে চাউল পাচ্ছেন তাঁদের ভোগের জন্য আরো ৫০০ গ্রাম করে চাউল দিতে হ'লে ২,৯৩,৮০০ টন বেশী লাগবে। বাকী ১,৯১,০০,০০০ লোককে দৈনিক ১৬ আউন্স অর্থাৎ সপ্তাহে মাথাপিছু ৩ কিলোগ্রাম চাউল দিতে হ'লে লাগবে ৩৪,৭৫,০০০ টন। কিন্তু রাজ্যের সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে ২৮% ০ থেকে ৮ বৎসর বয়স্কদের দলে পড়েন। এঁদের জন্য অর্দ্ধ বরাদ্দ ধরলে মোট ৪,২২,৯৬৮ টন চাউল কম লাগবে। অর্থাৎ মোটমাট তা হ'লে পশ্চিম-বঙ্গের চাউলের ভোগ-চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে ৪২,৮৯,৪৩২ টন, অর্থাৎ মোটামুটি ৪৩,০০,০০০ টন। অবশ্য এই হিসাব অনুযায়ী রাজ্যের ১,৯১,০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে কেহ চাউল ছাড়া গম বা অন্য শস্য ব্যবহার করবেন না অনুমান করে নেওয়া হয়েছে।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে আমন চাউলের মোট ফসলের পরিমাণ এ বৎসর ৪৪,০০,০০০ টন; তা ছাড়া আউসের ফসলের পরিমাণ আরও ৩,৬০,০০০ টন হবে বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যে চাউলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭,৬০,০০০ টন। তা হ'লে সরবরাহে এত সঙ্কট কেন!

বর্তমানে সমগ্র দেশে খাদ্যশস্যের দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির মানসে প্রবল প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টার নির্দেশক হিসাবে খাদ্য উৎপাদনে বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত পুঁজি লগ্নীর আয়োজন করা হয়েছে। পূর্বেও

(ক) Towords A self Reliant Ecquancy Planning Commission Govt of India. পৃঃ ১৭২

তা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্ল্যানের তুলনায় তৃতীয় প্ল্যানে কৃষি উন্নয়ন খাতে মোটামুটি ৩০% অধিক লগ্নীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু উৎপাদনে উন্নতি একরকম কিছুই হয় নি বলা যায়। বর্তমানে চতুর্থ প্ল্যানের প্রথম বৎসরে কৃষি উন্নয়ন প্রয়োগে মোট লগ্নীর (২,০৮১'৫৪ কোটি টাকা) ৩৮%-র বেশী (৭৯১'২ কোটি টাকা, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার সহ) লগ্নীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বৎসরের শেষে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৯ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। বাস্তব ফলাফল কি হয় লক্ষ্য করতে হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসর

গুরুত্বের দিক থেকে খাদ্য সঙ্কটের পরই পরিকল্পনা বাজেটকে স্থান দিতে হয়। বস্তুতঃ উন্নয়ন পরিকল্পনার লগ্নী এবং রূপায়ণে এতাবৎ যে সার্থকতার অভাব এবং সঙ্কট দেখা দিয়েছে, বর্তমান খাদ্য সঙ্কট যে অন্ততঃ আংশিক ভাবে তারই অনিবার্য প্রতিফলন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দেশের আর্থিক উন্নয়ন প্রয়াসে সরকারী প্রয়োগ এ পর্যন্ত এমন একটা ধারার অনুসরণ করে এসেছে যে তার ফলে অনিবার্য ভাবে কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী এবং বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেই মূল্য সঙ্কট (inflationary pressure) আজ উন্নয়ন গতি ব্যাহত করছে বলে সকলেই স্বীকার করছেন, সেটি মূলতঃ উন্নয়ন লগ্নীর অসার্থকতা এবং উন্নয়নের জন্য আর্থিক সংস্থান সংগ্রহ করবার মানসে বিধি বিরুদ্ধ রাজস্ব প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মোট কথা শিল্পপ্রয়োগে শক্তিশালী দেশগুলির শিল্পোন্নতির ইতিহাসের ধারা অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে সে সকল দেশেই দ্রুত শিল্পোন্নতির ধারা প্রবর্তিত হয়েছে প্রথমে কৃষি উন্নয়ন সাধিত হবার পর। আমরা কৃষি উন্নয়ন মানসে এ পর্যন্ত যতটা পুঁজি লগ্নী করেছি তার অধিকাংশটাই সার্থক ভাবে কৃষি-প্রগতির কাজে লাগান যায় নি; ফলে আমরা কেবল মাত্র পুঁজি সৃষ্টিকারক মালের আমদানীর জন্যই শুধু নয়, এমন কি খাদ্যশস্যের জন্যও আমদানীর ওপর পরনির্ভরশীল হয়ে রয়েছি।

বস্তুতঃ আমাদের দেশের মূল আর্থিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আজ পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত বা অনুসৃত হয় নি। দেশের আর্থিক জীবনের যেগুলি মূল সমস্যা সেগুলির সম্বন্ধে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ না করেই, আমরা এ পর্যন্ত উন্নত দেশগুলির আর্থিক প্রণালীগুলির নকল করে আমাদের পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করেছি; ফলে একদিকে যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরে পূর্বেকার আর্থিক বৈষম্য অনেক পরিমাণে বেড়ে চলেছে, তেমনি আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য একটা স্থাণু অবস্থায় এসে পৌছেছে; পুঁজি-লগ্নীর তুলনায় কর্মসংস্থানে উন্নতি হয় নি; উৎপাদনের তুলনায় মালের চাহিদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে একটা বল্গাবিহীন এবং দ্রুত অধিকতর অবনতির পথে এগিয়ে চলা মূল্য সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার মোট ফলাফল এই পর্যন্ত এই হয়েছে যে সামগ্রিক ভাবে দেশের সাধারণ জীবনমান পূর্বের তুলনায় আরো নীচে নেমে গেছে।

আমাদের দেশের আর্থিক কাঠামোটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই যে (১) দেশের আর্থিক বুনিয়াদ মোটামুটি কৃষিধর্মী; ফলে (ক) একদিকে যেমন পুঁজি সৃষ্টির গতি অত্যন্ত মন্থর এবং তার আয়তন অতি ক্ষুদ্র, তেমনি (খ) অন্যদিকে বেকার সংখ্যা অত্যন্ত বৃহৎ। কৃষি এবং আনুসঙ্গিক পেশার উপরে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৮ জন আজ পর্যন্ত তাঁদের জীবিকার জন্য নির্ভরশীল; কিন্তু কৃষি উৎপাদন থেকে জাতীয় আয়ের মোটামুটি ৫০ শতাংশের সামান্য মাত্র বেশী সংগৃহীত হয়; গত পনের বৎসর ধরে সরকারী প্রয়োগে এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রভূত পুঁজি লগ্নী হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় আয় সৃষ্টিতে কৃষির অংশ পূর্বেকার মতনই রয়ে গেছে এবং কৃষির ওপরে জীবিকার জন্য নির্ভরশীলদের শতকরা সংখ্যায় কোন আমূল সংস্কার সাধন সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে উন্নয়নের অজুহাতে পুঁজি সৃষ্টিকারক মালের (capital goods) আমদানী প্রচণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু অনুপাতে রপ্তানী বাণিজ্যের আয় বৃদ্ধি পায় নি; ফলে বৈদেশিক ঋণের বোঝা এমন গুরুভার হয়ে পড়েছে যে এই ঋণ শোধ করবার একমাত্র উপায় এখন আরও অতিরিক্ত ঋণ করে পুরানো দেনা ও তার সুদ শোধ করবার ব্যবস্থা করা।

* * * *

পারাদ্বীপ বন্দর

গত মাসে উপযুক্ত সমারোহের সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যাঁসিয়েঁ ষ্ট্যাম্বলিকের পৌরোহিত্যে ওড়িষা রাজ্যের নূতন পারাদ্বীপ বন্দরের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। বহু অর্থব্যয়ে এবং যুগোশ্লাভিয়ার সহযোগিতায় নির্মিত এই বন্দরের বাণিজ্য কোথা থেকে আসবে

সেটাই এখন সমস্যা। আমাদের দেশ থেকে বিদেশে, প্রধানতঃ জাপানে যে লৌহ আকর আজকাল রপ্তানী করা হয় তার বৃহত্তর অংশ ওড়িষা রাজ্য থেকে সংগৃহীত হয়; বাকীটা গোয়া থেকে। সম্ভবতঃ এই লৌহ আকরই পারাদ্বীপ বন্দর থেকে রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হবে। কিন্তু এই বাণিজ্যটুকু এই পর্যন্ত কলিকাতা বন্দর হতেই চলে আস্ ছিল। এই বাণিজ্যটি কলকাতা বন্দরের হাত-ছাড়া হ'লে এই প্রাচীন বন্দরটির যে প্রভূত ক্ষতি হবে তাতে সন্দেহ নেই। এবং দেশের মোট আর্থিক কাঠামোর দিকে একটা সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এতে সমস্ত দেশেরই ক্ষতি হবে। ওড়িষা যদি নূতন আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের উপায় সৃষ্টি করে পারাদ্বীপ বন্দরকে চালু রাখবার ব্যবস্থা করতে পারতো, তা হ'লেই এত অর্থব্যয়ে এই নূতন প্রয়োগ সত্যকার স্বার্থকতায় সমৃদ্ধ হতে পারত।

* * * *

টাকার মূল্য

দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের সহায়ক হতে পারে এই আশায় বিদেশী মুদ্রার তুলনায় টাকার দাম কমিয়ে দেওয়া হবে বলে একটা রব কিছুদিন ধরে উঠেছে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব-বহনকারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এই গুজবে কোন সত্য নেই একথা বলেছেন; তবুও তাঁদের আশ্বাসে লোকে যেন সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারছেন না।

এই রকম একটা আশঙ্কার প্রধান কারণ বলা হয়েছে যে, বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিদেশী বাজারে আমাদের রপ্তানীতে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা আনুপাতিক পরিমাণে কমে গিয়েছে; টাকার মূল্য বিদেশী মুদ্রায় কমিয়ে দিলে এই প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই যুক্তির স্বপক্ষে চায়ের এবং পাটজাত মালের উদাহরণ বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উভয় ক্ষেত্রে এককালে ভারতের মৌরসী অধিকার ছিল; এখন তার একটা মোটা অংশ অন্য প্রতিযোগীরা দখল করে বসেছেন। এর প্রধান কারণ আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য নীতি যাঁরা রচনা করছেন তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাব। ১৯৫০-৫১ সনে আমাদের পাটজাত মালের রপ্তানী প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়; তার প্রধান কারণ যে তখনও তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় কোন কোন দেশ মজুদ সৃষ্টির (stock-pile) দিকে খুব মনযোগ দেন। এই সুযোগে রাজস্ব প্রভূত পরিমাণ বাড়াবার আশায় পাটজাত কতকগুলি মালের ওপর রপ্তানী শুল্ক দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে পাটজাত মালের রপ্তানী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধেকেরও বেশী কমে যায়। সেকালে পাকিস্তান তখনও তার পাটকল চালু করতে পারে নি এবং এই বাজারে ছিল ভারতেরই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীহীন মৌরসী অধিকার। কিন্তু তা সত্বেও পাটজাত মালের প্রধানতম ব্যবহার ছিল অন্য মাল বস্তাবন্দী (packaging) করার কাজ। এবং এই বস্তুটির মূল্য যদি এত বেশী বাড়িয়ে দেওয়া হয় তা হ'লে তার ব্যবহার অনিবার্য ভাবে কমে যাবে। আজকাল ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিস্তৃত প্রয়োগের দিনে যে অল্প দিনেই অন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে সেটুকু দূরদৃষ্টি আমাদের থাকা উচিত ছিল। ইতিমধ্যে পাকিস্তানও পাটজাত মালের রপ্তানীর বাজারে সফল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে; ফলে আমাদের এই বৃহত্তম রপ্তানী বাজারটি প্রভূত পরিমাণে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। চায়ের বেলায়ও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে: চা বাগানের মালিকেরা উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির অজুহাতে চায়ের দাম, বিশেষ করে সাধারণ মানের সস্তা দরের চায়ের দাম অনবরতই বাড়িয়ে গেছেন। এর ফলে অনিবার্য ভাবে চায়ের বিদেশী বাজারে আমাদের মৌরসী অধিকারের একটা মোটা অংশ সিংহল এবং পূর্ব আফ্রিকার হাতে চলে গেছে।

এ কথাটা আমাদের এখন হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, আমাদের রপ্তানী বানিজ্য উপযুক্ত পরিমাণে বাড়িয়ে বিদেশী ঋণ এবং ভিক্ষার ওপর বর্তমান নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে নূতন ধরনের রপ্তানী প্রয়োগ দরকার। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা কল্পনা করেছি যে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে আমরা ইস্পাতের বিদেশী বাজারে প্রবেশ করে আমাদের রপ্তানী বাড়াতে পারব, কেননা তখন পর্যন্ত ভারত ছিল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় ইস্পাত উৎপাদনকারী। কিন্তু আমাদের ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির নীতি এমন পথ ধরে এগিয়েছে যে সে সুযোগ আর নেই; ভারত এখনই সবচেয়ে আক্রা দরে দুনিয়ার ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশগুলির অন্যতম একজন হয়ে পড়েছে এবং যে ধারা অনুসরণ করে আমরা এখনো ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা প্রসারিত করবার দিকে এগিয়ে চলেছি, তাতে শীঘ্রই যে এদেশে ইস্পাত উৎপাদনের খরচ দুনিয়ার সকল দেশ থেকে বেশী বেড়ে যাবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। সম্প্রতি বোকারো ইস্পাত কারখানা নির্মাণকল্পে সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে

তার নির্মাণ-ব্যয় এমন অঙ্কে স্থির হয়েছে যে কেবল মাত্র ডেপ্রিসিয়েশন এবং পুঁজি খরচার (depreciation and cost of capital investment) দায়েই শুধু টন প্রতি ইস্পাতের খরচা পড়ে যাবে—১৭ লক্ষ টন পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা চালু হওয়া পর্যন্ত—প্রায় ২৯০৲ টাকা এবং পুরো ৪০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা চালু হ'লে এই ব্যয় সামান্য মাত্র কমে প্রায় ২৩৮৲ টাকার মতন পড়বে বলে দেখা যাচ্ছে।

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এটা ভুল কল্পনা; রপ্তানী বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াবার জন্য যথেষ্ট সহায়তা দেবার ব্যবস্থা করা রয়েছে। শুধু মাত্র বিদেশী মুদ্রা আমদানীর আশায় আমরা জাপানকে রীতিমত আত্মঘাতী মূল্যে আকর লৌহ বিক্রী করছি। টাকার বিনিময় মূল্য কমালে এক মাত্র ফল যা দাঁড়াবে তা এই যে, আমাদের বর্তমান আয়তনের রপ্তানীতে বিদেশী মুদ্রার আয় আরো খানিকটা সঙ্কুচিত হবে।

গত মাসাধিক কালের মধ্যে দেশের আর্থিক জগতে আলোচনার যোগ্য আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। যথা ইকাফ্ সম্মেলনের আলোচনা; আমদানী সঙ্কোচনের ফলে উৎপাদন হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা; ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ক সম্মেলনে আলোচনা; পুঁজি বাজারে মন্দার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা; হরতালের আর্থিক মূল্য (money cost); খাদ্য চলাচলে আঞ্চলিক বাধার ওপর নরম্যান কিপিং সাহেবের অভিমত ইত্যাদি আরো অনেক ঘটনা। স্থানাভাবে এগুলো সম্বন্ধে বর্তমান সংখ্যায় কোন আলোচনা সম্ভব হ'ল না!

রোদে-ভেজা নীলাম্বরী শাড়ী

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

কোথা থেকে একখানা বাসাছাড়া মেঘ আসে উড়ে,
        হঠাৎ পশলা দিয়ে ব'লে যায়, বর্ষা নয় শেষ !
এ সময়ে তুমি কেন দেখা দিলে সারা মন জুড়ে ?
        মাটির সোঁদালো গন্ধ ; ভাবনায় রক্তালু আবেশ ।

নারকোল বনানীর উঁচুমাথা থর-থর কাঁপে ;
        টিনের ছাদের ঢেউয়ে ঝম্ ঝম্ কার মল বাজে ;
সাগরের ঝাপসায় মেছোয়া ঢেউয়ের দোল মাপে ;
        সাগর-চিলের পাখা একটাও দেখা যায় না যে !

এইটুকু জানালায় ভরে আছে দিগন্ত সাগর
        আমার বিছানা আর আকাশেতে নেই কোন দূর ;
সারা গায়ে নিঃশ্বাস ফেলে কোন ভোলা তেপান্তর ।
        তোমার আকাশে তারা ; এখানেতে নির্মম দুপুর ।

ধোয়া নীলে পুনরায় শাদা-শাদা ডানাদের সার
        কোন বন্ধ নিরালায় বুক ছিঁড়ে জমিয়েছে পাড়ি ।
এই ত ছবির মত ভাল লাগে চির চমৎকার
        তোমার কাঁকন গান ; রোদ-ভেজা নীলাম্বরী শাড়ী ।

ঘনিষ্ঠ তাপ

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমার বুকের
ঘনিষ্ঠ তাপ ; অনাবৃত এইটুকু আশা,
আনবে শতাব্দীর জোয়ার। একদিন
দিতে হবে শোধ করে, সকলের
দুর্লভ সময়ের দান। সেই আশায় আমি
কবিতা লিখি, গাই জীবনের জয়গান।

আমার বুকের
ঘনিষ্ঠ তাপ ; অনাবৃত এইটুকু আশা
সার্থক হবে সেদিন
যখন পৃথিবীর আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে
মহা-শান্তির ঐকতান।

সার্থক হবে সেদিন
যখন আউশ আমনের ক্ষেতে
পাখিরা পরম উল্লাসে খেতে পাবে ধান।

জানি সেদিন আসবে।
আমার বুকের ঘনিষ্ঠ তাপ ; অনাবৃত এইটুকু আশা,
আনবে শতাব্দীর জোয়ার।

শহীদ কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীকমলা দাশগুপ্তা

কানাইলাল দত্ত ১৮৮৮ সালের ৩০শে আগষ্ট চন্দননগরে মামাবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চুণীলাল দত্ত। দেশ হুগলী জেলার খরসরাই-বেগমপুর গ্রামে।

শৈশবে কানাইলাল পিতার কর্মস্থল বোম্বাইর কাছে গিরগাঁও গ্রামের 'এরিয়ান এডুকেশন সোসাইটি' নামে একটি হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে ১৯০৪ সালে তিনি চন্দননগরে মাতুলালয়ে আসেন পিতামাতার সঙ্গে। চন্দননগরের ডুপ্লে বিদ্যামন্দির (বর্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির) থেকে তিনি এণ্ট্রান্স এবং এফ. এ. পাস করেন। তারপর হুগলী কলেজ (বর্তমানে মহসীন কলেজ) থেকে তিনি বি. এ. পাস করেন। পাসের খবর যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি কারাগারে বন্দী।

চন্দননগরের তরুণ দেশসেবকেরা শারীরিক ও মানসিক শক্তির চর্চা করতেন। শত্রুকে আক্রমণের শক্তি অর্জনের জন্য বিপ্লবীদল চন্দননগরের সর্বত্র মুষ্টিযুদ্ধ ও লাঠিখেলার আখড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কানাইলালের মামাবাড়ীতেও এরূপ একটা আখড়া ছিল। কানাইলাল মুষ্টিযুদ্ধ ও বন্দুক ছোড়াতে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের কলেজের মাষ্টারমশাই চারুচন্দ্র রায় তাঁদের শিক্ষাগুরু ছিলেন। চারুবাবু বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা ছাড়াও কানাইলাল পড়তেন 'সন্ধ্যা', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'স্বরাজ', 'কর্মযোগিন্' এবং ঐতিহাসিক স্বদেশ-প্রেমিকদের জীবনী।

১৯০৫ সালে স্বদেশী প্রচারের সময় চন্দননগর বাজারে যাতে বিলিতি কাপড় বিক্রি বন্ধ হয় তার জন্য অন্যদের সঙ্গে কানাইলালও পিকেটিং করতেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সদলবলে যখন সভা করতে চন্দননগরে যান তাঁর গাড়ি কানাইলালরা স্বদেশী গান গাইতে গাইতে নিজেরাই টেনে নিয়ে যান "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

বি. এ. পরীক্ষার পর কানাইলাল মায়ের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন।

পরাধীন ভারতের গোলামী ঘোচাতে গিয়ে ভারতের বিপ্লবীরা সশস্ত্র ইংরেজকে প্রত্যাঘাত করবার জন্য সেদিন গোপনে বোমা তৈরী করেছিলেন ৩২ নং মুরারীপুকুর রোডে। পুলিস সে খবর পেয়ে গেল। বহু গ্রেপ্তার ও তল্লাসী সুরু হ'ল। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আলিপুর বোমার মামলা সুরু হয়। ১৯০৮ সালের ২রা মে তারিখে কানাইলাল গ্রেপ্তার হলেন। ওদিকে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর থেকে নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

আলিপুর বোমার মামলায় নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হন। বিপ্লবীরা আদর্শভ্রষ্ট নরেন গোঁসাইকে হত্যা ক'রে বিশ্বাসঘাতকদের সতর্ক ক'রে দিতে চেয়েছিলেন এবং আলিপুর বোমার মামলা থেকে বিপ্লবীদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন।

জেলের মধ্যে রিভলভার পাওয়া কঠিন। কিন্তু সে যুগে বাইরের লোকেদের সঙ্গে দেখা করার নিয়ম তখনো তত কড়া হয় নি। চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও বসন্তকুমার ব্যানার্জি জেলের মধ্যে দুইটি রিভলভার অতি সঙ্গোপনে বিপ্লবীদের দিয়ে এসেছিলেন।

আলিপুর বোমার মামলার আসামী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য সংকল্প করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন অরবিন্দ ঘোষের আত্মীয় এবং অভয়াচরণ বসুর পুত্র। মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামকে তিনিই দলে আনেন এবং দেশের জন্য প্রাণ বলি দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। অস্ত্র আইনের মামলায় ১৯০৮ সালে তাঁর দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয় মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরে জেল খাটবার সময় সত্যেন্দ্রনাথকে আলিপুর

বোমার মামলায় আসামী করা হয় এবং বিচারের জন্য কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আনা হয়।

১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষের দিকে সত্যেন্দ্রনাথ জেলের মধ্যে হাসপাতালে ছিলেন জ্বরের জন্য। ৩১শে আগষ্ট সত্যেন্দ্রনাথ নরেন গোঁসাইকে হাসপাতালে আনিয়ে দেখা করতে চান। ৩১শে আগষ্ট সকাল বেলায় নরেন গোঁসাই যখন ইওরোপীয়ান ওয়ার্ড থেকে জেল হাসপাতালে আসেন তাঁর সঙ্গে রক্ষীরূপে এসেছিল এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কয়েদী, নাম হিগিন্স। ওদিকে পেটে কলিক বেদনার ভান ক'রে কানাইলাল আগের দিন জেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। হিগিন্স নরেন গোঁসাইকে নিয়ে জেল হাসপাতালের দোতলায় উঠে সেখান থেকে একা ডিস্‌পেন্সারীতে ঢোকে। অন্য একটা ওয়ার্ড থেকে কানাইলাল বেরিয়ে এলেন। একটু পরেই গুলীর আওয়াজ শোনা গেল। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল জেল হাসপাতালের দরজায় নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন।

আদালতে বিচারের সময় প্রথমে একা কানাইলালের ফাঁসির হুকুম হয়। কানাইলাল বলেছিলেন, "There shall be no appeal." "আপীল করা চলবে না।" ফাঁসির আদেশে কানাইলাল বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। শান্ত ও তৃপ্তমুখে তিনি দণ্ডাজ্ঞা শুনেছিলেন এবং ফাঁসির আগে তাঁর ওজন বেড়ে গিয়েছিল।

ফাঁসির আগের রাতে তিনি এত গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন যে প্রত্যুষে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হ'তে বলতে গিয়ে জেল কর্মচারীদের তাঁকে ডেকে জাগাতে হয়। প্রতিদিনের মতো প্রাতের কাজ সেরে তিনি চিরবিদায়ের জন্য যাত্রা করলেন। ইওরোপীয়ান ওয়ার্ডারদের সঙ্গে সোজা হেঁটে গিয়ে উঠলেন তিনি ফাঁসিমঞ্চে। এমন শান্ত মনে ও দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসিকে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে।

১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অতি প্রত্যুষে কানাইলালের ফাঁসি হয়। কালিঘাটের শ্মশানে তাঁর শবদেহ দাহ করা হয়। হাজার হাজার লোক শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সজল চোখে সে দৃশ্য দেখেছিল—চিতাভস্ম সংগ্রহ ক'রে ধন্য হয়েছিল।

কানাইলাল ও সত্যেনের বিচারের সময় সত্যেনের ব্যাপারে জুরীগণ একমত হ'তে পারেন নাই ব'লে সত্যেনের মামলা হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট সত্যেনের ফাঁসির আজ্ঞা দেয়। বিচারের রায় পরে বার হবার জন্য সত্যেনের ফাঁসি হ'তে কয়েকদিন দেরি হয়ে যায়। সত্যেনের ফাঁসি হয় ১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর। কিন্তু জেল-চত্বরের ভিতরেই তাঁর মরদেহ দাহ করা হয়। কালিঘাটের শ্মশানে শোভাযাত্রা সহকারে কানাইলালের শবদাহের পরে যে-জনপ্রিয়তা বিপ্লবী শহীদরা অর্জন করেছিলেন তা দেখে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সতর্ক ও সাবধান হয়ে গিয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লববাদের প্রসার ও দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনের আদর্শ দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সত্যেন্দ্রনাথের শবদেহ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের হাতে দেয় নাই।

পরলোকে বিপ্লবী মহানায়ক বীর সাভারকর

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিনায়ক দামোদর সাভারকর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যু কালে তাঁহার ৮৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

সাভারকর ১৮৮৩ সালের ২৮শে মে তারিখে নাসিক জেলার ভাগুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মারাঠী ব্রাহ্মণগণের চিৎপাবন বংশীয় ছিলেন। এই বিখ্যাত বংশে পর পর কয়েক জন দেশপ্রাণ বীরের উদ্ভব হইয়াছিল। বালাজী বিশ্বনাথ বাজীরাও, নানা ফড়নবিশ, নানাসাহেব, গোখলে, রাণাডে এবং লোকমান্য তিলক।

কৈশোরেই সাভারকরের অসাধারণ প্রতিভা, দেশপ্রাণতা ও কাব্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া তিনি পুণায় ফার্গুসন কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে লণ্ডনে যান। তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মার্লের এডিকং স্যার কুর্জন ওয়ালিকে লণ্ডনে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করার অপরাধে তাঁর সহচর মদনলাল ধিনড়াকে অভিযুক্ত করা হয়। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সাভারকর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইহার ফলে ইউরোপীয়দের হাতে তিনি বিশেষভাবে লাঞ্ছিত ও গ্রেপ্তার হন।

সম্রাটের ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অপরাধে তাঁর প্রতি বিভিন্ন দফায় ৫৫ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

জাতীয় মুক্তির জন্য যাঁরা অগ্নিযুগের বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বীর সাভারকর তাঁদের অন্যতম। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর যে-কোন উপায়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য 'অভিনব ভারত' প্রতিষ্ঠান গঠন ও লণ্ডনে 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ-আয়োজন, ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে তাঁর অনুচর মদনলাল ধিনড়ার স্যার কার্জন ওয়ালির হত্যা, নাসিকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন নিধন ইত্যাদি আজ ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। এইসব ঘটনা উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডে সাভারকরের গ্রেপ্তার ও জাহাজযোগে ভারতে প্রেরণের পথে মার্সেই-এ জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়া এবং গুলীবর্ষণের মধ্যেও পলায়ন ও পুনরায় গ্রেপ্তার কাহিনী গোয়েন্দা-কাহিনী অপেক্ষাও চাঞ্চল্যকর।

যে-স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি জীবন পণ করিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম যেদিন সফল হইল, সেদিনও তিনি ভারত বিভাগের জন্য খুশি হইতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের মামলায় তাঁহাকে আসামী হিসাবে দাঁড়াইতে হইলে তিনি যে ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবৃতি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাও এক আন্তরিকতার দলীল হইয়া আছে। বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বিপ্লব ও সংগ্রামই ছিল তাঁর যৌবনের স্বপ্ন। তাঁর যত রচনা, যত পুস্তক-পুস্তিকা, তার অধিকাংশই বিপ্লবের জয়গান অথবা জাতীয়তার জয়ধ্বনি।

আজ একথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, বীর সাভারকর শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সকলের বিস্ময়-বিমিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

কিশোর বৈঠক

প্রবাসীর বৈশাখ সংখ্যা থেকে কিশোর বৈঠকের উদ্বোধন হলো। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাহিনী, মহাপুরুষদের জীবনী, ছড়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা প্রশ্ন নিয়ে সমৃদ্ধ হবে এই বিভাগ। এখানে বড়রা লিখবেন ছোটদের জন্য। আর, ছোটরা লিখবে সকলের জন্য।

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের এপারের সঙ্গে ওপারের এই ভাব-মিলন সার্থক হবে প্রবাসীর পাঠক পাঠিকাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা নিয়ে।

—দাদাজী

শিশুরবি

অমর মুখোপাধ্যায়

ইস্কুলে সে বন্ধ ঘরে যেতেই রবে না।
দিদি বলেন—রবিটার আর কিছু হবে না।
ইস্কুলেতে যাবার নামে মুখটা ভারী কেন?
চোখের কোলে জমল এসে কালবোশেখী যেন!
পাঁচিল-ঘেরা ঐ বাড়ীটা, নাম কেন ইস্কুল?
জেলখানা তার নামটি হলে হ'ত সে নির্ভুল!
পড়ার বই-এ মন চলে না, দূরের আকাশ ডাকে।
নদীর জলের ঢেউগুলি সব ডাকছে যেন তাকে॥
পাখীর সাথে মন ওড়ে তার দিগন্ত-কোল দিয়ে।
ভ্রমর চলে মন নিয়ে তার ফুলের মধু পিয়ে॥
মুক্ত-জীবন হাতছানি দেয় বদ্ধ-জীবন পারে।
আলোয় ঘেরা বিশ্বমাঝে ছড়ায় আপনারে॥
ছন্দে-গানে তাইত রবির বিশ্ব-পরিচয়,
রবির আলোয় জগৎ আলো, আমরা জ্যোতির্ময়।

যাঁদের করি নমস্কার

অপরেশ ভট্টাচার্য্য

একটি শিশু। ভারী সুন্দর আর ফুটফুটে চেহারা। কিন্তু ভীষণ দুষ্টু আর চঞ্চল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়—যখন-তখন বাড়ীর বাইরে চলে যায়। এ বাড়ী সে বাড়ী, এ পাড়া সে পাড়া ঘুরে বেড়ায়। নানান্ দুষ্টুমিতে পাড়ার মানুষের হাড়-মাস ঝালাপালা। এমনি করে একদিন ত একটা খুব মজার কাণ্ড ঘটে গেল। ঠিক দুপুরবেলা শিশুটি চুপি চুপি বেরিয়ে এল রাস্তায়। আর পড়বি ত পড় একেবারে দু দু'টো পাকা চোরের সামনে! একে অমন দুধে-আলতা গায়ের রঙ আর তার ওপর আবার গা-ভর্তি গয়না। গলার হার, হাতে বালা, পায়ে নূপুর, চোর দুটোর চোখগুলো লোভে চক্‌চক্ করে উঠল। দু'জনে যুক্তি এঁটে নিল যে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শিশুটিকে ওদের বাড়ী নিয়ে যাবে এবং গায়ের গয়না-টয়নাগুলো খুলে রেখে আবার রাস্তায় ছেড়ে দেবে। এই যুক্তি করে নিয়ে চোর দুটো এগিয়ে গেল শিশুটির সামনে আর খুব মিষ্টি করে "বাপ্, সোনা" বলে তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললে। সন্দেশ এবং আর মিষ্টি-টিষ্টি খেতে দিলে। তারপর তাকে আদর করে কোলে নিয়ে একজন বল্‌লে—"চল,তোমাকে বাড়ী দিয়েআসি।" অপর জন বল্‌লে—"সেই ভাল, চল, কোলে করেই বাড়ী দিয়ে আসি।"—শিশুটিও এক কথায় রাজী হয়ে গেল। তখন চোরেরা চলল তাদের আস্তানার দিকে। কিন্তু কোথায় আস্তানা! যাচ্ছে ত যাচ্ছেই—নিজেদের আস্তানা যে কোন্‌টা কিছুতেই আর খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে শিশুটি কেবলই তাড়া লাগাচ্ছে—"কোথায় বাড়ী, চল, তাড়াতাড়ি।" আর তাড়াতাড়ি! আস্তানাই ঠাহর করতে পারছে না, তাড়াতাড়ি করে আর কি করবে। ঘুরতে ঘুরতে, ক্লান্ত হয়ে নিজেদের অজ্ঞানতেই এসে হাজির হয়ে গেল সেই শিশুটিরই বাড়ীতে—আর কোন রকমে কোল থেকে তাকে মাটিতে নামিয়েই চোঁ চাঁ দৌড়। এদিকে হারানো ছেলেকে হঠাৎ ফিরে পেয়ে মা-বাবা ত মহা খুশী। চোর দুটো কিন্তু একেবারে ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেছে! ওরা ভেবেই পেলে না কি করে এটা হ'ল! কেমন করে নিজের ঘরকে ওরা ভুলে গেল!

পরবর্তীকালে কিন্তু গোটা বাংলা দেশটাই সব ভাবনা ভুলে ঘর ছেড়ে পথে বের হয়েছিল—ঘর-পর সমান করে নিয়েছিল। আপন ভুলে মানুষ মাত্রকেই জড়িয়ে ধরেছিল বুকে। এই শিশুটিই কিন্তু পরবর্তীকালের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বা সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যদেব। যিনি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের মন্ত্র—হরিনামের মালা। আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগে এক ফাল্গুনী পুর্ণিমার নবদ্বীপে তাঁর জন্ম হয়েছিল। সেও এক মজার ব্যাপার। ঠিক তাঁর জন্ম-মুহূর্তেই চাঁদেরও লাগ্‌ল গ্রহণ। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে বেজে উঠ্‌ল শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর; হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল চারদিক। তাঁর জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে হরিধ্বনি উঠেছিল তা' আর থামে নি কোনদিন। ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়ল সেই হরিধ্বনি।

নক্ষত্র পতন

শ্রীবিদ্যুৎকুমার ভট্টাচার্য্য

চমকে উঠলাম!

একবার মনে হ'ল আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। নইলে এও কি বাস্তবে সম্ভব! সুহাস—আমাদের গ্রামের ছেলে সুহাস—সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সেরা ছাত্র! আমারই স্কুলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। চানাচুর বিক্রী ক'রছে ট্রেনে? আমারই কাছে সে চানাচুরের প্যাকেট হাতে এসে দাঁড়িয়েছে চানাচুরওয়ালা হয়ে!

ট্রেণটা ছুটে চলেছে। আমি বিহ্বল নেত্রে ওর অবনত মস্তকের দিকে তাকিয়ে আছি! সুহাস! বিধবা মায়ের চোখের মণি—হৃদয়ের আলো। গত বৎসর ওর বাবাই অভাবের তাড়নায় ট্রেণের চাকার তলায় নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছে!

"স্যার, আপনি?" ওর কণ্ঠটা কে যেন চেপে ধরল।

"সুহাস—তুমি; চানাচুর বিক্রী করছ!" বিস্ময় কি আমারই কম!

হেঁট হয়ে পায়ে হাত রাখল সুহাস। চোখের জলে একাকার হয়ে গেল আমার জুতো জোড়া। "সামনে তোমার বার্ষিক পরীক্ষা, আর তুমি"—শেষ ক'রতে পারলাম না কথাটা। প্রচণ্ড বেগে ধাববান গাড়িটা থমকে দাঁড়ালো সহসা।

"মাইনের টাকা আর পরীক্ষার ফী জোগাড় ক'রছি স্যার! এ ছাড়া"—

চারিদিকের কোলাহলে সুহাসও শেষ ক'রতে পারল না কথা।

"কি হ'ল?" জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম বাইরে। ভীড়ের তাড়নায় দেখলাম না কিছুই। সকলেরই একই জিজ্ঞাসা—'কি হ'ল?

কি যে হ'ল—তা একটু পরেই জানা গেল। সুহাসের সমবয়সী একটি ছেলে। লজেন্স বিক্রী করে ট্রেণে ট্রেণে। পাশের কামরা থেকে আমাদের কামরায় আসতে গিয়ে হাত ফস্‌কে পড়ে যায় নিচে। একেবারে চলন্ত ট্রেণের চাকার তলায়। তারপর? তারপর সব কিছুই হারিয়ে গেছে অন্ধকারে!

দৃশ্যটা এক পলক দেখেই দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠেছিল সুহাস। রক্তের বন্যার মধ্যে ও কি ওর বাপের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে পেয়েছিল? ওর ডুকরে কেঁদে ওঠার কারণ কি তবে?

আমি শক্ত হাতে চেপে ধ'রলাম ওর হাত দু'খানা।

পরীক্ষা দিল সুহাস। ওর স্কুলের বকেয়া টাকা ক'টা আমিই দিয়েছিলাম। পরীক্ষার ফলাফলে ও সবার উপরেই আসন পেল।

তখন গোধূলি বেলা। সুহাস আমার দু'পায়ে মাথা রেখে উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। ওর দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। আমাকে প্রশ্ন করল—"আচ্ছা স্যার—সেদিন যে ছেলেটা ট্রেণের চাকার তলায় হারিয়ে গেল—সে যদি সুযোগ পেয়ে আমার সাথে পরীক্ষা দিতে পারত—তবে সে কি আমার চেয়ে বেশী নম্বর পেতে পারত না? সুযোগ পেলে সে কি একদিন পারত না 'জজ' হ'তে?

সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিমাকাশে। ধীরে ধীরে কালো পর্দাটা নেমে আস্‌ছে পৃথিবীর বুকে। আমার মুখে জবাব নেই।

চোখ দু'টো তুলে ধ'রলাম আকাশে। সহসা একটা তারা পড়ল খ'সে। আমরা দু'জনেই চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে!

ছোট্ট মনের আবার একটা বিরাট জিজ্ঞাসা—"এমনি কত ছেলেই ত অকালে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে—কে তাদের আলো দেখাবে?"

সহসা এক ঝাঁক সাদা পাখী কল-কাকলিতে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে উড়ে যাচ্ছে নীড়ে—সেই দিকে তাকিয়ে আমি দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রলাম সুহাসকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে।

আমার মুখের দিকে স্থির নিশ্চলনেত্রে তাকিয়ে রইল সুহাস। ওর চোখের উজ্জ্বল আলোর ম্লান হয়ে গেছে সূর্য ডুবে যাওয়া আঁধার! আমি কেন যে নমস্কার ক'রলাম তার অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে সুহাসের কাছে!!

জানা বা অজানা

শ্রীহিমাংশু ঘোষ

১০ই জানুয়ারী, সোমবার, ১৯৬৬ সাল, রাত্রি ১২টা। দিল্লীর ১০ নং জনপথ রোডের বাড়ীতে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। শ্রীমতী ললিতা দেবী টেলিফোনে স্বামীর কথা শুনতে পেলেন। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তখন সুদূর তাসখন্দে, রাশিয়ায়। টেলিফোনে তিনি ললিতা দেবীকে তাসখন্দ সম্মেলনের সাফল্যের কথা জানালেন। জানালেন আগামীকাল দেশে ফেরার কথা। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, মুখে কথা নিয়ে তিনি আর এদেশে ফিরলেন না। স্ত্রীর সাথে শেষ কথা মৃত্যুর দেড় ঘণ্টা পূর্বে ঐ টেলিফোনে। টেলিফোনে কথা—দূর থেকে কথা, কিন্তু মনে হয় যেন পাশাপাশি বসে কথা বলছি। এই দূরকে নিকট করছে যে যন্ত্র—যে এনে দেয় কাছাকাছি পাশাপাশি দু'জনকে; দূর করে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, বন-প্রান্তরের বাধা—দূর করে দূরের দূরত্ব সে এই টেলিফোন—বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় অবদান। এই টেলিফোন আবিষ্কারের কথাই আজ তোমাদের বলব!

আমরা যে কথা বলি সেটা একপ্রকার শব্দ। কোন বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়। এই কম্পন বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গ তোলে। এই শব্দ-তরঙ্গ বা বায়ু-কম্পন আমাদের কানে এসে আঘাত করে। কান একটি শ্রবণ-যন্ত্র। সে ঐ শব্দ-তরঙ্গ ধরে এবং আমরা কথা শুনতে পাই। আমাদের গলার ভিতরে স্বরযন্ত্র আছে। স্বরযন্ত্রের কম্পন সৃষ্টি করিয়া আমরা কথা বলি। শব্দ বিস্তারের জন্য মাধ্যম দরকার, টেলিফোনে কথা শুনিবার জন্যে মাধ্যম হিসাবে বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করা হয়েছে।

তোমরা হয়ত অনেকেই একটা খেলা খেলেছ। দুটো দেশলাইয়ের খোল (যাহাতে কাঠি থাকে) নিয়ে এবং বেশ কিছুটা সুতো লাগিয়ে দু'জনে একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন একটা খোল কানে নেয় এবং অন্যজন খোলটি মুখে নিয়ে কথা বলে। তখন যে কানে খোলটি লাগিয়ে রেখেছে সে কথা শুনতে পায়। ঠিক্ এই পদ্ধতিতেই প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল নামক একজন বৈজ্ঞানিক টেলিফোন যন্ত্রের মূলসূত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে টেলিফোন বেল টেলিফোন নামে পরিচিত। তিনি প্রথমে একখানি বৈদ্যুতিক তার ও দু'খানি পাতলা লোহার চাকা যুক্ত করে দেখলেন যে কণ্ঠস্বরের কম্পন একটি চাকার উপর তুললে উহা তারের অপর প্রান্তে অপর চাকার উপরও কম্পন তোলে। এর দ্বারা তিনি বুঝলেন যে, বিদ্যুতের তার শব্দকম্পন বহনে সক্ষম।

পরে একদিন তিনি তারের একপ্রান্ত বাড়ীর নিচের তলায় রেখে সেখানে এক বন্ধুকে বসিয়ে রাখলেন, এবং অপর প্রান্ত উপরের তলায় রেখে নিজে উপর থেকে বন্ধুকে ডাকলেন। সেই ডাকে বন্ধু ছুটে এলেন উপরে। সেদিন ছিল ১০ ই মার্চ, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। টেলিফোনের ইতিহাসে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে, এক স্মরণীয় দিন।

লাভষ্টোন-মিনি ও মার্কিন নীতি

অমর রাহা

লণ্ডনের খবরে একদিন জানা গেল যে, আদলাই ষ্টিভেনসন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা, শিক্ষিত, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষক এবং ইউ. এন. ও.-তেও এইরূপেই তিনি ছিলেন পরিচিত। অথচ এই ব্যক্তি এক তীব্র ও তিক্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন যেন মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় নেবার জন্য, আর মৃত্যু এসে তাঁর সর্ব্ব-দ্বন্দ্বের অবসান করে দিল।

মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্ব্বে প্যারিসে এক আমেরিকান রেডিও করেসপণ্ডেণ্টকে বলেছিলেন: "ছয় সপ্তাহ ধরে আমাকে ইউ. এন. ও.-তে বসে আমাকে আমার দেশের সাস্তো ডমিনগো সম্পর্কে নীতিকে সমর্থন করতে হয়েছিল, যদিও এই নীতি প্রথম হতেই ছিল বিরাট ভুল।" এবং ঐ একই জায়গায় বসে হ্যারিম্যানকে তিনি বলেন যে:

"I can tell you this, Averell, those six weeks in the U. N. took several years out of my life".

অথচ এই মার্কিন নীতিকে সমর্থন জানায় মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান AFL-CIO। সেদিন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ৯২৬ জন প্রতিনিধির সমর্থনে লাভষ্টোন ও মিনি পরিচালিত AFL-CIO-র প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এই প্রস্তাবে দেখা যায়:

After the experience with Castro-Moscow missile machinations of October, 1962, it was clear that outside intervention in Santo Domingo was urgent in order to overcome the immediate risk of another Cuba-type regime which could become an additional threat to the freedom of the Americas and the peace of the world".

শুধু তাই নয়। খুসী হয়ে ব্যাপক সমর্থন জানিয়েছে মার্কিন সরকারকে তার সাস্তো ডমিনগো নীতিকে।

অদ্ভুত ঠেকে এই চিত্র। যেখানে ষ্টিভেনসনের মত লোক সমর্থন করতে পারছে না মার্কিন নীতিকে সেখানে এগিয়ে আসছে সমর্থন জানাতে AFL-CIO.

এই AFL-CIO সম্বন্ধে একজন মার্কিন অটো শিল্পপতি কিছুদিন পূর্ব্বে বলেছেন: আগেকার দিনগুলি থেকে শ্রমিক আন্দোলন এখন ষ্টেটাস কো বজায় রাখার জন্য উদগ্রীব। এই কথাগুলি অতীব সত্য এবং তাই

উক্ত সুর শোনা যায় মার্কিন লেখক ও সমালোচক এ. এইচ. রাসকিনের ভাষায়: যদি না এক নতুন সচেতন উদ্দেশ্য বা আদর্শ না থাকে তবে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমান্বয়ে গভর্ণমেণ্ট বা শিল্পের পোষ্য হয়ে পড়বে, থাকবে না এর কোন গণতান্ত্রিক শক্তি বা থাকবে না কোন ক্ষমতা—যাতে করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হয়।

এই যে ব্যাধি এর হাত হ'তে হয়ত সম্ভবপর হবে না শীঘ্র মুক্ত হওয়া। কারণ হচ্ছেন দুই নেতা—লাভষ্টোন ও মিনি। এঁদের নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সিডনী লেনস্ বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এঁরা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় CIA এবং অন্যান্য সহযোগিতায় জগৎব্যাপী ইনটেলিজেন্স জাল ছড়িয়েছেন। শুধু কি তাই। Knight News papers-এর ওয়াশিংটন সংবাদদাতা Edwin Lahey-র ভাষায় লাভষ্টোন সম্বন্ধে বলা যায় যে CIA ইদানীং কালে আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রাথমিক খবরাদি সংগ্রহ করেছে লাভষ্টোন হ'তে। অর্থাৎ লাভষ্টোন হ'লেন পরোক্ষে CIA-র লোক। না, লাভষ্টোন না কি একথা স্বীকারও করেছেন। Chicago Tribune-এর ১৯৬৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সংবাদে দেখা যায়:

"Lovestone readily agreed that his AFL Free Trade Union Committee is engaged in intelligence work."

সাধারণতঃ দেখা যায় শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহ্য হ'ল এই দেখা যে সরকার যাতে বিশ্ব-শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থ-ক্ষুণ্ণকারী কোন বিশেষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ না করতে পারে; এবং দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন-ভঙ্গকারী কোন কার্য্য সমর্থিত না হয়। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধের পর হ'তে লাভষ্টোন-মিনি নেতৃত্ব মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনকে ইউ. এস. বৈদেশিক নীতির লেজুড় বানিয়ে দিয়েছে:

"It has acted virtually as an agent for the American Government on a broad basis" এবং "It has followed overseas a role so aggressive as to be a factor in the *internal* life of other nations". শেষতঃ "It has become involved, indirectly at least, in intelligence activities".

এঁদের কার্য্যকলাপ এমন পথ ধরে চলেছে যে তা অনেক মার্কিন সমালোচকের দৃষ্টিতে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই এক মার্কিন সমালোচক বলেছেন:

"Recently when both the Government and the U. S. Chamber of Commerce proposed increasing trade with the Soviet Union. Meany and his friends condemned it on the ground that it would only finance and facilitate further Soviet aggression against democracies".

এ থেকে বোঝা যায় মার্কিন নীতির সমর্থনে যেমন রয়েছে একদিকে লাভষ্টোন-মিনি পরিচালিত AFL-CIO প্রতিষ্ঠান, ঠিক অন্যদিকে রয়েছে আদলাই প্রভৃতির মত বুদ্ধিজীবীর দল। তবে AFL-CIO যদি CIA-র লেজুড় হয়ে থাকে তা হ'লে তা কারুর কাছেই সুখবর নয়।

ডাঃ ভাবা

কিছু সংখ্যক কবি বা সাহিত্যিক আছেন যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়, এঁরা হচ্ছেন লেখকদের লেখক। লেখক—তা তিনি যতই বড় বা মহৎ হোন না কেন, পাঠকদের উদ্দেশ্যেই তাঁর লেখনী ধারণ। সেক্ষেত্রে কারো সাহিত্য-সাধনাকে কেবলমাত্র লেখকদের মধ্যে বিশেষিত করতে যাওয়ার তাৎপর্য এটুকুই হ'তে পারে যে তাঁদের সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করতে যে রসজ্ঞ-মনের প্রয়োজন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, সাহিত্যের যাঁরা প্রত্যক্ষ কারবারী, যাঁরা সাহিত্যিক তাঁরাই তার রসগ্রহণ করেন বা করতে পারেন। গূঢ় অর্থে এঁরা জনচিত্তপ্রিয়তার অধিকারী বোধ হয় হন না, তথাপি চাঁদের মত মনোমুগ্ধকর না হলেও তাঁরা সূর্যের মত, সমসাময়িক লেখককুল তাঁদেরই আলোকে আলোকিত হয়ে জনসাধারণে সাহিত্য বিতরণ করে থাকেন।

সাহিত্যের মত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী" বলে কোন কথার প্রচলন নেই, তার কারণ বোধ হয় এই যে বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে জনসাধারণের ততটা যোগ নেই এবং বৈজ্ঞানিকরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। একজন বড় দরের বৈজ্ঞানিক হিসাবে ডঃ ভাবার যে কৃতিত্ব সে সম্বন্ধে আমরা সবাই মোটামুটিভাবে অবহিত। কোয়ান্টাম তত্ত্ব, পরমাণুর মৌলিক গঠন এবং মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় তাঁর অবদান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। মেশন কণিকা আবিষ্কারের ইতিহাসে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। কিন্তু এই মহৎ বৈজ্ঞানিক একজন বৈজ্ঞানিক নন মাত্র - নিজস্ব গবেষণার গণ্ডীতেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিক--- দেশের আয়তনে তিনি গবেষণার সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করতেন এবং সে অনুযায়ী তৎপর ছিলেন। পরমাণুশক্তির আবাহনে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা, এবং সে উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র বহিরাগত জ্ঞান ও যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশের মধ্যেই একদল দক্ষ বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরী করেছিলেন। পরমাণুশক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবার আগে তিনি ছিলেন টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চের কর্ণধার। বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে গবেষণার সুযোগ দেওয়ার জন্য গঠিত এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা কম উল্লেখযোগ্য নয়। বৈজ্ঞানিক ডঃ ভাবা এ ভাবে এককভাবে শুধু বিজ্ঞানের গবেষণা করে যান নি, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশবাসীর মধ্য থেকে একদল যোগ্য বৈজ্ঞানিক গড়ে তুলেছিলেন। দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি ছিলেন একজন প্রধান সংগঠক।

অর্থাৎ, বিজ্ঞানের বদলে সাহিত্যের জগতে যদি তিনি কাজ করতেন তা হ'লে বলা যেত: ডঃ ভাবা একজন লেখকমাত্র ছিলেন না, সে সঙ্গে ছিলেন লেখকদের লেখক।

নূতন টাওয়ার

মানুষ জানে, তার উচ্চাভিলাষ যত উঁচুই হোক না কেন আকাশকে তা ছুঁতে পারে না। মানুষ তবু তার কীর্তিকে স্তম্ভ গেঁথে পাকা করতে চেয়েছে, স্মরণীয় করতে চেয়েছে। ইতিহাসে বার বার তা দেখা গেছে; কুতুব মিনার, ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ার এবং অক্টারলনি মনুমেন্ট তারই কয়েকটি নিদর্শন মাত্র।

টাওয়ার যে শুধু উঁচুই হয় তা নয়, তার গঠনেও কত বৈচিত্র্য! ক্যানাডার মন্ট্রিয়লে ১৯৬৭ সালে যে বিশ্বমেলা বসছে তাকে স্মরণীয় করে রাখবে এই বিচিত্র টাওয়ারটি। মেঘকে স্পর্শ-করা এই স্তম্ভের চূড়ায় থাকবে পর্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত চত্বর। তার ঠিক পরেই রয়েছে নাচের হল, এবং তার চারদিক ঘিরে ২৮টা স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর।

আসুন, এমন ঘরের অতিথি হতে কার না ইচ্ছা করে।

প্রকাশ—সাহিত্যিক বনাম বৈজ্ঞানিক

প্রকাশের ব্যাপারে এতদিন আমরা সাহিত্যের, সাহিত্যিকদের দাবিই স্বীকার করে এসেছিলাম; কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে সে একাধিপত্য আজ টুটতে বসেছে। বিজ্ঞান তার নিজস্ব প্রয়োজনে নূতন প্রকাশ-ভঙ্গিমা প্রবর্তন করেছে শুধু মাত্র গণিত-নির্ভর সে পদ্ধতি নয়, সব মিলিয়েই তা নূতন। বিজ্ঞানের এ প্রকাশ পদ্ধতি বিজ্ঞানেরই জন্য, তবু তার কোন কোনটি দেখি খোদ সাহিত্যের দরবারেও সঞ্চারিত হয়েছে। সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর সে লেখাটাই ধরুন না স্বনামধন্য শ্রীশরৎ পণ্ডিতের সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন:

"শরৎ পণ্ডিতের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে যে যে উপাদান পাওয়া যায় তার অনুপাত শতকরা হিসাবে এই রকম দাঁড়ায়—

বিদূষক—	৮
কৌটিল্য—	১২
বিদ্যাসাগর —	২২
বীরবল—	১০
গোপাল ভাঁড়	১০
মুকুন্দ দাস—	৮
শরৎ পণ্ডিত—	৩০
	১০০

শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মার্জিন রেখেছি ৩০, তা আর কারো সঙ্গেই মেলানো যাবে না।

সাহিত্য নেই এখানে, তবু লেখক যা বলতে চান কি সফলভাবেই--না তা এখানে ফুটে উঠেছে।

এই চরিত্র সম্বন্ধেই লেখক অন্যত্র লিখেছেন—তুলনার জন্য তা এখানে তুলে দিলাম—"একদিকে প্রখর আত্মসম্মানবোধ তাঁকে যেমন ভিক্ষা করতে বাধা দিয়েছে, তেমনি তা বারে বারে তাঁকে দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করেও তাঁকে কদাপি পরাস্ত করতে পারে নি। মঙ্গলকাব্যের যাবতীয় দেবতা এঁর সঙ্গে লড়াই করতে এসে হেরে যেতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

সাহিত্যিক ভঙ্গিতে এ প্রকাশ অনবদ্য, তথাপি নিছক বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে লেখা লেখকের চরিত্র বিশ্লেষণ সাহিত্যের সহজাত প্রকাশ নৈপুণ্যের সঙ্গেই এখানে পাল্লা দিয়ে উঠেছে।

খেলাধূলার আসরে

পি মিত্র

আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী প্রথম ভারতীয় দলের শেষ প্রদীপটি চৈত্র মাসের কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ায় হঠাৎ নিভে গেল। ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী ঐতিহাসিক মোহনবাগান দলের অন্যতম সদস্য রাইট রেভারেণ্ড ডাঃ সুধীর চ্যাটার্জী গত মঙ্গলবার ১২ এপ্রিল বেহালায় নিজ বাসভবনে অকস্মাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩।

১৮৮৩ সালে ১২ই নভেম্বর শ্রীচ্যাটার্জী জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত ফুটবলে হাতে-খড়ি বলতে গেলে ন্যাশানাল এসোসিয়েশনে। আই. এফ. এ-র প্রথম ভারতীয় সম্পাদক শ্রীমন্মথ গাঙ্গুলীই শ্রীচ্যাটার্জীকে এখানে নিয়ে আসেন। ন্যাশানালে তিনি বিখ্যাত সিংহ পরিবারের অরুণ সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) ও শরৎ চৌধুরীকে সতীর্থ খেলোয়াড় হিসেবে লাভ করেন। ১৯০৫-৬ সালে তাঁকে স্বর্গত বিজয়দাস ভাদুড়ী মোহনবাগান ক্লাবে আনেন। ১৯০৯-১০ সালে মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে তিনি আই. এফ. এ. শীল্ডে খেলেন, ১৯১০ সালে চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত উঠেন। তার পর সেই ঐতিহাসিক ১৯১১ সালের শীল্ড ফাইন্যাল। ২৯শে জুলাই ফাইন্যালে মোহনবাগান ও ইষ্ট ইয়র্ক রেজিমেণ্টের খেলা। ইষ্ট ইয়র্ক দলে সবাই ষণ্ডাগুণ্ডা গোরা সৈন্য, টপরে খেলছে। মোহনবাগান দলে একমাত্র বুট-পরিহিত খেলোয়াড় শ্রীচ্যাটার্জী। মাঠে দারুণ উত্তেজনা। উত্তেজনা খেলোয়াড়দের মনেও। হঠাৎ মোহনবাগান ১ গোল খেয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু সেই গোল দেয়াই গোরাদের কাল হ'ল। ১০ গোলে পিছিয়ে থেকে দারুণ উৎসাহে খেলে শোধ করে দিয়ে খেলা শেষ হবার আগে আর এক গোল দিয়ে মোহনবাগান ইতিহাস সৃষ্টি করল। শ্রীচ্যাটার্জির নিজ মুখেই শোনা—"খেলায় জিতে বিজয়ী বীরের মতন মাঠ থেকে ফিরছি, গায়ে ইউনিফরম, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আবক্ষ-লম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু, গলায় পৈতে, বললেন যা করেছ তার জন্যে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করছি। একটা ত হ'ল কিন্তু ঐটে হবে কবে!" বলে ফোর্ট উইলিয়মের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।"

শ্রীচ্যাটার্জী শুধু একজন খেলোয়াড়ই ছিলেন না, খেলাধূলা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি সুপরিচিত। ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান স্কুল তাঁরই হাতে গড়া। এ ছাড়াও তিনি অধ্যাপনার কাজেও বেশ কিছুদিন লিপ্ত ছিলেন। আমরা যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি প্রায় অস্তমিত বললেই চয় কিন্তু তবুও খেলোয়াড়-সুলভ তারুণ্যের দীপ্তি তখনও তাঁর ভেতর সুউজ্জ্বল ছিল। তাঁর সৌম্য মূর্তিটিও ভোলার নয়। শ্রীচ্যাটার্জীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটা জীবন্ত অধ্যায় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। সেই ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয়ের বীর আর কেউ রইল না। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

• • •

কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা সংবাদ নয়। মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটাই সংবাদ। কোন সাঁতারুর সাগর সাঁতরানো অপেক্ষা সাঁতারু নয় এমন কোন লোক যদি সাগর সাঁতরায় সেটা আরও বড় সংবাদ। শ্রীমিহির সেন সম্প্রতি এক বিরাট সংবাদে পরিণত হয়েছেন।

ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন ব্যারিষ্টারী পড়তে। সেখানে গিয়ে তাঁকে এ্যাডভেঞ্চারে পেয়ে বসল। তিনি স্থির করলেন ইংলিশ চ্যানেল পার হবেন। কটকের ছেলে মিহির সেনকে দুরন্ত সাগর হাতছানি দিল, তাঁকে নেশায় পেয়ে বসল। এর আগে সাঁতারের ইতিহাসে মিহির সেনের নাম কোথাও ছিল না। সাঁতারের অভিজ্ঞতা তাঁর কতখানি ছিল তাও বলা শক্ত। ১৯৫৪ সালে ইংলণ্ডেই তাঁর সাঁতারে হাতে-খড়ি। ৫৪ থেকে ৫৮ অবধি পাঁচ বার তিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হবার চেষ্টা করেন। পঞ্চমবারে তিনি সফল হন। ভারতীয় হিসেবে তিনিই প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হন। যদিও বাঙ্গালী হিসেবে দ্বিতীয়। পাকিস্তানের নাগরিক ব্রজেন দাসই প্রথম বাঙ্গালী ও প্রথম এশীয় যিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হন। ইংলিশ চ্যানেল পার হবার আগে সাঁতারু হিসেবে মিহির সেনকে কেউ চিনত না। শ্রীমিহির সেন এবার সিংহল ও ভারতের মধ্যে বিস্তৃত তলাইমান্নার থেকে ধনুষ্কোটি—২২ মাইলের পক-প্রণালী পার হয়ে সাঁতারে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ৫ই এপ্রিল ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে তিনি তলাইমান্নার থেকে জলে নামলেন, বুধবার ৭টা ২৪ মিনিটে তিনি ভারতের মাটি স্পর্শ করলেন। এই পঁচিশ ঘণ্টায় তিনি প্রায় ৪০ মাইল সাঁতরেছেন। কারণ সেদিন ছিল পুর্ণিমা এবং সাগরও ছিল অত্যন্ত উত্তাল ও ভয়ঙ্কর। শ্রীমিহির সেনের সঙ্গে নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মারটিসও প্রায় কুড়ি ঘণ্টা সাঁতার কেটেছেন।

পক প্রণালী শুধু উত্তাল ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধই নয়, অতি ভয়ঙ্করও। প্রতি পদে পদে হাঙর ও বিষধর সাপের উৎপাত। শ্রীসেন সঙ্গে নাবিকদের একটি ছোট ছোরা রেখেছিলেন। হাঙর তাড়ানোর জন্যে নানা রকম প্রতিষেধকও ছড়ান হয়েছিল। মিহির সেনের এই অভিযানের ভারতীয় নৌবাহিনীর আন্তরিক উৎসাহ ও প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর সাহায্য ব্যতিরেকে এই গৌরব লাভ শ্রীসেনের সম্ভব হ'ত কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীর ছেলে মিহির সেন। বাঙ্গালী হিসেবে এই সাফল্যে গর্ব্বিত হবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে সন্দেহ নেই, তা ছাড়া খুব অত্যুক্তি হবে না যদি বলি শ্রীসেন সমগ্র দেশের যুব মহলকে অভিযানের দিকে, এ্যাডভেঞ্চারের দিকে টেনে নিয়ে যাবার এক মহৎ প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর সাফল্যের ভেতর যে নজির স্থাপন করলেন তা সব সময়েই যুব মহলে উৎসাহ দেবে ও নিত্য নতুন এ্যাডভেঞ্চারে নামার, অজানাকে জানার প্রেরণা দেবে।

* * *

কলকাতার হকি লীগ শেষ হয়ে গেল। বি. এন. রেল দল অপরাজিত থেকে এবারও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। গত বছরও তারা অপরাজিত থেকেই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিল। মোহনবাগান ও ইষ্টার্ণ রেলের পয়েন্টের সংখ্যা এক হওয়ায় গোলের গড় পড়তায় মোহনবাগান রাণার্স হয়। এবারের হকি খেলা দেখে দর্শক ও ক্রীড়ামোদীরা কি পেয়েছেন বা দেখেছেন সঠিক বলতে পারি না, তবে আমরা ক্রীড়া-সাংবাদিকরা বেশ বুঝতে পারছি হকির ভবিষ্যৎ কি। মোহনবাগান, বি. এন. রেল, ইষ্টবেঙ্গল এরা শুধু বাংলাতেই নয়, ভারতের হকি দলগুলির ভেতরও অন্যতম। তাদের খেলায় কোথাও কোন উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-শৈলীর দেখা পাই নি। মোহনবাগানের ইমানুর রহমানের ভেতর সত্যিকারের হকি প্রতিভার ছাপ আছে সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব এবং অসৌজন্যতা দুঃখদায়ক, কারণ তাঁর মতন একটা প্রতিভা শুধু অসৌজন্যতা ও অখেলোয়াড়োচিত মনোভাবের জন্যেই প্রস্ফুটিত হবার আগেই শুকিয়ে গেল। এক বছর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে থাকার পর তিনি এ বছর খেলায় অংশগ্রহণ করেন। এবার তাঁর যথেষ্ট সংযত হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে প্রথম থেকেই তিনি যে রকম চড়া মেজাজের পরিচয় দিতে থাকেন তাতে প্রায় প্রতি খেলাতেই তাঁকে কিছু সময়ের জন্যে মাঠের বাইরে থাকতে হয়। খেলাতেও আগের সে জৌলুস নেই।

এবারের লীগ খেলায় আর একটি জিনিষ—যা দৃষ্টিকটু লেগেছে তা ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং-এর শেষ খেলাগুলিতে অংশগ্রহণ না করা। খেলার জন্যেই খেলা, তাতে জয়-পরাজয় আছেই। যেহেতু লীগ বিজয়ের কোন সম্ভাবনা নেই অতএব খেলব না এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া কোন ক্লাবের পক্ষেই ঠিক নয়। ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান

লীগে কয়েকটি পয়েন্ট হারানোর পর শেষের খেলাগুলিতে আর অংশগ্রহণ করল না। এটা ঠিক খেলোয়াড়সুলভ নয়। সে দিক দিয়ে ডালহৌসী দলের প্রশংসা করব, কারণ অবনমনের আওতায় পড়েও তারা শেষ খেলাগুলি পরিত্যাগ না করে সব কয়টিতেই অংশগ্রহণ করে। হেরেছেও, নেমেও গেছে সবই ঠিক কিন্তু অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব দেখায় নি। শীর্ষস্থানীয় দলগুলি না খেলে যে নজির রেখে গেল সেটা তাদের কাছে কাম্য নয়।

লীগের পরই বেটন কাপের খেলা সুরু হয়েছে। স্থানীয় দলগুলি ছাড়া বাইরের অনেক দলের নাম করা হয়েছে যারা অংশগ্রহণ করবে। এদিকে শোনা যাচ্ছে যে শুধু নামই সার, অনেকগুলি দলই নাকি আসবে না। বেটন তার ঐতিহ্য ও সুনাম হারিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও আমরা বলব একটু আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচালনা করে বেটনকে স্বীয় ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপত্তি কিসের?

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
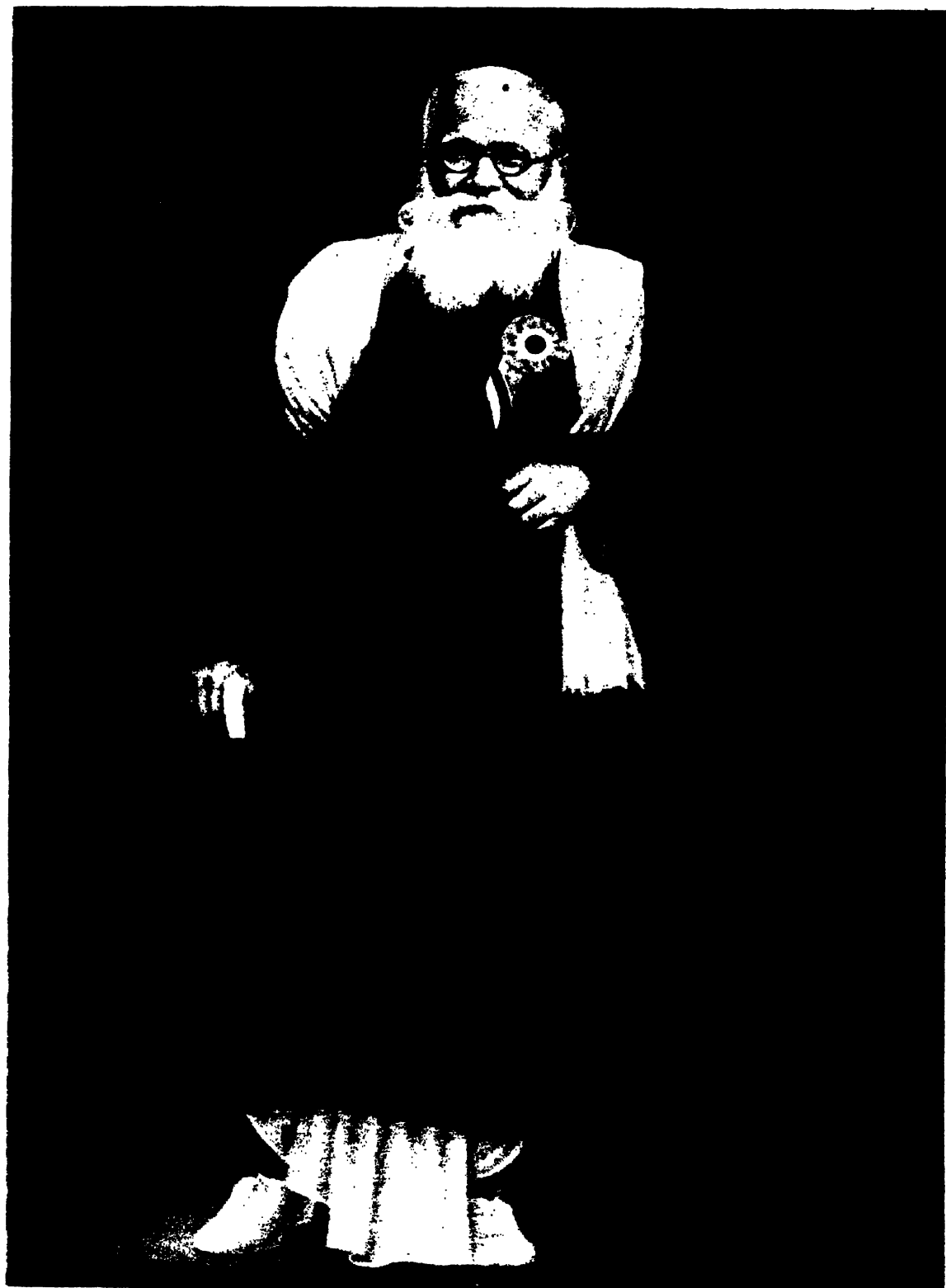
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ প্রথম খণ্ড	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩	দ্বিতীয় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রামানন্দ শতবার্ষিকী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী বৎসর এই মাসে শেষ হইল। তিনি দীর্ঘকাল অবিচলিত ভাবে সকল দুঃখকষ্ট বিপদ আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য তাঁহাকে কেহ কোন উচ্চপদে বসাইল কি না অথবা যথেষ্ট সম্মান দেখাইল কি না এই সকল কথা কখন তাঁহার মনে স্থান পাইত না। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে সাম্রাজ্যবাদের পরম শত্রু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং পদে পদে তাঁহাকে নানা ভাবে বাধা দিয়া কর্ত্তব্য-পথ হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করাই তাঁহার সম্বন্ধে সরকারী নীতি ছিল। বহুবার তাঁহাকে নির্ব্বাসন দিবার বা কারাগারে বন্ধ করিবার কথা উঠিয়াছে: কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এবং ন্যায়-পরায়ণতার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছিল এবং সেইজন্য ব্রিটিশরাজ তাঁহাকে কখন কখন আক্রমণ করিয়া থাকিলেও বিশেষ বাড়াবাড়ি করিতে পারেন নাই। ভারতীয় পুলিশ তাঁহার অফিস খানাতল্লাস করিয়া অনেকবার নিজেদেরই প্রেরিত রাজদ্রোহসূচক লেখা ও ছবি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু রামানন্দের সজাগ দৃষ্টি এড়াইয়া ঐ জাতীয় কার্য্যে সফলকাম হয় নাই। তাঁহাকে একবার প্রাণে মারিবার চেষ্টা হয় কিন্তু কাহার প্ররোচনায় তাহা হইয়াছিল তাহা ঠিক ধরা যায় নাই। এলাহাবাদ হইতে তাঁহাকে যে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয় তাহার মূলেও ছিল ব্রিটিশ শাসকদিগের জুলুম. কিন্তু কলিকাতায় আসার ফলে তাঁহার ব্রিটিশ-বিরোধ কার্য্য আরও সজোরে চালিত হইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব আন্দোলন নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করে এবং বহু প্রকারের নেতৃত্ব ও দাবিদাওয়ার সৃষ্টি হইতে থাকে। ভারতের সকল ধর্ম্ম. জাতি ও ভাষা লইয়া দরাদরি সুরু করাইয়া দেওয়ার মূলে ছিল ব্রিটিশের কূটবুদ্ধি. কিন্তু সেই সকল অপকর্ম্মের সহায়ক ছিল ভারতীয়েরাই। এই সময় হইতেই সত্যনিষ্ঠ রামানন্দকে বহু জননেতার বিরুদ্ধে লিখিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার শত্রুর সংখ্যা নিজ দেশবাসীদিগের মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গোপনে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহার প্রতিপত্তির হ্রাস করিবার চেষ্টা বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী দলের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইল: কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের তাঁহার উপর আস্থা বাড়িয়া চলিতে লাগিল। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যেও দেখা গিয়াছে যে ভারতের জনসাধারণ কি ভাবে রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহাদিগের অকুণ্ঠিত ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তিনি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যই আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, এবং দেশবাসীর ভক্তি ভালবাসাই তাঁহার সেই কঠিন সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই উপলক্ষ্যে প্রবাসী বহু বাধা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা যথাসাধ্য করিয়াছে। যাহা করা সম্ভব হয় নাই, তাহা অতঃপর যাহাতে করা সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী কি ভাবে কোথায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ আমরা পরে প্রকাশ করিবার আশা রাখি এবং এই কার্য্য যথাশীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করা হইবে।

সরকারী কৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার আদর্শ গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নেতা ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দেশবাসীকে পথ দেখাইয়া প্রগতির দিকে লইয়া যাইবার ক্ষমতা কতটা থাকিতে পারে তাহা রাষ্ট্রপ্রধান জীবনযাত্রার যুগে বিশেষ ভাবে আলোচ্য বিষয়। যে সকল দেশ মানব স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সর্ব্বদা অগ্রগামী ছিল এবং এখনও রহিয়াছে সে সকল দেশের ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা যখন সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে পারে নাই, সেই সময়েও রাজ-দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্টির প্রসার উত্তমরূপেই হইতে পারিত এবং তাহার কারণ ছিল রাজা ও তাঁহার সভাসদদিগের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ইত্যাদি ললিতকলা সমুদয় সম্বন্ধে অনুভূতি, বোধ ও বিশেষজ্ঞতা। কৃষ্টিবোধ ও জ্ঞান না থাকিলে শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রের প্রভাব দিয়া রস অনুভূতি ও প্রতিভার অভাব পূর্ণ করা যায় না। পূর্ব্বকালে রাজবংশের নরনারী ও অপরাপর অভিজাতদিগকে সকল কলা আয়ত্তাধীন করিতে হইত। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, নাট্য, অভিনয় ও তৎসঙ্গে রাজনীতি, ন্যায়, যুদ্ধবিদ্যা, অর্থনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে সুদক্ষ কৌশলী ও জ্ঞানী না হইলে কাহারও পক্ষে রাজকার্য্য চালনা সম্ভব হইত না। আভিজাত্যের যুগ চলিয়া যাইলে পর ক্রমশ সাধারণ মানব সমাজে অপর সকল মানবের সহিত সাম্য ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানকালে যে মানব সমাজের উচ্চ-নীচ বিভেদ দূর করিয়া দিয়া সকল মানবের মধ্যে সাম্য স্থাপন চেষ্টা চলিতেছে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সকল মানবের আত্মোন্নতির সুবিধা ও ব্যবস্থা সমান করিয়া দেওয়া। পাণ্ডিত্য, কলাকুশলতা ও অপরাপর শিক্ষালব্ধ অথবা প্রতিভাজাত গুণ সকলের মধ্যে সমানভাবে বিকশিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা অসম্ভব বলিয়াই সেই প্রকার চেষ্টা বা আশা কেহ কখনও করেন না। যদি কোন রাষ্ট্রনেতা মনে করেন যে তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন বলিয়া তাঁহার কণ্ঠের সঙ্গীতও সকলকে সুমিষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে অথবা তাঁহার লিখিত অশুদ্ধ বা কষ্টপাঠ্য প্রবন্ধাবলী সুখপাঠ্য সাহিত্যের আদর পাইবে তাহা হইলে সম্ভবত রাষ্ট্রক্ষেত্রের ভূপতিকে কেহই উৎকর্ষ ও সংস্কৃতির মালঞ্চের মালাকর বলিয়া মানিতে রাজি হইবে না। সুতরাং বুদ্ধিমান রাষ্ট্রনেতাগণ কখনও অনধিকারচর্চ্চার ধৃষ্টতাদোষে দুষ্ট হইতে চাহেন না; এবং কৃষ্টি ও বিদ্যার প্রাঙ্গণে সহজে গমন করিয়া নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকট করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেও অসম্মত হন। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে চাতুর্য্য দেখাইয়া শক্তি আহরণ করিয়া কেহ কেহ নিজেকে সর্ব্বগুণাকর প্রমাণ করিবার দূরাকাঙ্ক্ষায় নিজের জ্ঞান ও শিক্ষার সীমা অতিক্রম করিয়া অজানার অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন। রাজগুণ বলিতে প্রাচীনরা সর্ব্বগুণ বুঝিতেন। সর্ব্বগুণ কোনও রাজার না থাকিলেও বহুগুণ অনেকের থাকিত। রাজশক্তি বর্ত্তমানে সাধারণ মানুষের নাগালের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু রাজগুণ লাভ করিতে অল্পলোকেই পারেন। এবং যাঁহাদিগের মধ্যে রাজগুণের অল্পাধিক সঞ্চার হয়; তাঁহারা সচরাচর রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিচরণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে কৃষ্টির ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে নিজমত জাহির করিবার চেষ্টা প্রায় দেখা যায় না। যাঁহারা

গুণী, কলাকুশল, পাণ্ডিত্যে প্রধান ও প্রতিভাবান, তাঁহাদের সাহায্যেই রাষ্ট্রনেতাগণ জাতীয় প্রগতির আয়োজন পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা দেখা যায় সেই সকল দেশে যেখানে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অতি সাধারণ লোকে নেতৃত্ব করিতে পারে না। যেখানে বহুলোকের মধ্যেই কিছু কিছু বিদ্যাবুদ্ধি দেখা যায় ও অল্প লোকেই অনধিকারচর্চ্চার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেন। অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে দেখা যায় গুণহীনের গুণের অভিনয়ের অক্ষমতা। যে যাহা কিছুমাত্র জানে না সেই যায় অজানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে। তার পর চলে গায়ের জোরে লালকে কালো এবং বাঁকাকে সোজা প্রমাণ করিবার পালা। দুর্ভাগা জাতির দুর্ভাগ্য তাহাকে পদে পদে অনুসরণ করে। দেশনেতাই সে সকল দেশে হইয়া দাঁড়ায় দেশ-শত্রু। উন্নতি চেষ্টার ফলে হয় অবনতি।

যে সকল দেশে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে একনায়কত্বের কিংবা একমাত্র রাষ্ট্রীয় দলের আদেশে রাষ্ট্রের সকল কার্য্য চালিত হয়, সেই সকল দেশে সঙ্গীত, নাট্য, সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যও সরকারী দপ্তরের অনুপ্রেরণায় এবং অনুমোদনে অভিব্যক্ত হইতে পারে। অবশ্য প্রতিভার বিকাশ রোধ করা অনেক ক্ষেত্রেই দপ্তরের পক্ষে অসম্ভব হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণভাবে কৃষ্টির গঠন ও প্রগতি আড়ষ্ট হইয়া যায় যদি তাহার স্বাধীন বিকাশের পথে আইনকানুনের প্রাকার খাড়া করিয়া অরসিক কর্ম্মচারীগণ শিল্পী ও কলাবিদ্‌দের কার্য্যে সম্মতি বা অসম্মতির ধাক্কা লাগাইবার সুযোগ পায়। আমলা-চালিত সঙ্গীতের আসরে উৎকোচ দান পদ্ধতিতে বহু রাসভ ঢুকিয়া পড়িয়া আসর নিনাদিত করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। মন্ত্রীগণ স্বয়ং যদি কার্য্যভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রিয়জনেরা সর্ব্বত্র অবাধগতিতে যাতায়াত করিবেন এবং তাহার ফলে কৃষ্টিনিপীড়নের চূড়ান্ত হইবে। মন্ত্রীগণ আজকাল নিজ গুণ এতই সক্ষমতার সহিত প্রচ্ছন্ন রাখেন যে কেহই তাঁহাদিগের কোনও গুণ আছে বলিয়া সন্দেহও করিতে পারে না। এই অবস্থায় তাঁহাদিগের উচিত, কৃষ্টির বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিয়া গুণী লোকেদের সাহায্যে বিদ্যা, শিক্ষা, শরীর-সাধন, সাহিত্য, শিল্প ও সকল কলার সহায়তার ব্যবস্থা করা। জাতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ও শিক্ষার বক্ষ হইতে দপ্তরের প্রস্তর যথাশীঘ্র নামাইয়া লওয়া প্রয়োজন। নতুবা জাতির আত্মাও অবিলম্বে প্রস্তরীভূত হইয়া যাইবে।

রবীন্দ্র স্মরণী

যাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই তাহাকে বলে অদ্ভুত। অদ্ভুত জিনিস অনেক সময় খুবই বিস্ময়কর, চটকদার, বর্ণবহুল হয় ও মানুষকে চমৎকৃত করিয়া দেয়, কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয় না যে রস অনুভূতি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাওয়া এক কথা! মনের বিহ্বল অবস্থা নানা কারণে ঘটিতে পারে এবং বিহ্বলতার মূলে সর্ব্বদাই যে জাগ্রত রসবোধ থাকিবে এ কথা কেহ বলিতে পারে না। মনের আবেগ মাত্রই যে শুদ্ধ, পবিত্র ও সুরুচিজাত হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। উদ্ভট কল্পনা বা তাহার উৎকট অভিব্যক্তি চমকপ্রদ হইলেও তাহা ললিতকলা বা কারুশিল্পের অন্তর্গত হইবেই বলা যায় না। না হওয়াই অধিক সম্ভব। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল দেশবাসী জ্ঞানী ও সুধীজনের সহিত সকল সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া, দেশের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষার জন্য যে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা আমরা বাহির হইতে দেখিয়াছি ও দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। মহামানবের স্মৃতিরক্ষার জন্য যদি কোনও অট্টালিকা বা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা আকারে ও বর্ণে এমন হওয়া প্রয়োজন যাহা ক্ষণিকের আবেগ বা মোহপ্রসূত নহে ও যাহা বহুকালের বহুগুণী সমর্থিত রস কল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ "নূতন কিছু" করিবার আগ্রহের অভিব্যক্তি কোন মহামানবের স্মৃতিরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হওয়া কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। বাংলার মন্ত্রীমহলে ললিতকলাবিদ সুরুচির প্রতীক কেহ আছেন বলিয়া আমরা জানি না। যাঁহাদের হুকুমে দেশবাসীর নিকট হইতে আদায় করা অর্থ ব্যয় করা হয় তাঁহারা ভোটের অধিকারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বিদ্যা, শিক্ষা বা জ্ঞানের অধিকার তাঁহাদের ততটা আছে বলিয়া জানা

যায় নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থায় তাঁহারা অনেকটা অনধিকার চর্চা করিয়াছেন।

আকৃতি ও বর্ণ আধিক্যে যাহা করা হইয়াছে তাহাকে বিজ্ঞাপন শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা ও ভোগাবস্তু বিক্রয় ব্যবস্থা এক নহে। তাজমহল ও বিস্কুটের বাক্সের পরিকল্পনা একই প্রচেষ্টারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। অন্তরের একান্ত ও অতিগভীর আবেগ ও সম্ভার ডাক লাগাইয়া দিবার ইচ্ছা এক জিনিষ নহে। বাংলার কংগ্রেসের সভাগণ তাহা না বুঝিলেও বাংলায় এখনও বহু গুণীলোক রহিয়াছেন যাঁহারা এই সকল পার্থক্য বিচারে সক্ষম। মন্ত্রীগণ কেমন করিয়া নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতা দোষ হইতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি অকলুষিত রাখিতে পারিবেন তাহা বলা কঠিন। তবে চেষ্টা করিলে রবীন্দ্র স্মরণীর সংস্কার অসম্ভব হইবে না।

রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা

যে মহামানব ভারতকে জগতের নিকটে গৌরবোজ্জ্বল প্রভায় উপস্থিত ও পরিচিত করিতে বিশেষ ভাবে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিরক্ষা আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য। এবং এই কার্য্যে ভারতের সকল প্রদেশের সাধারণেরই গভীর আগ্রহ দেখা গিয়াছে। তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে, ভারত রবীন্দ্রনাথকে কখনও ভুলিবে না। এই সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি ব্যক্তিগত চেষ্টার ক্ষেত্রে আসা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কবিগুরুর ভক্তজনের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ভাবে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। অনেকে তাঁহার বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাহা পাঠ করিলে কবির সম্বন্ধে জ্ঞান আরও বিস্তৃত হয়। অনেকে অপর ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। এই সকল একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর রবীন্দ্র গ্যালারি। শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় বাল্যকালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। একাডেমির তিনি এখন সভাপতি এবং ইহার পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া গঠন, নির্ম্মাণ ও অপরাপর ব্যবস্থাও তিনিই করিয়াছেন। রবীন্দ্র-গ্যালারির দ্রষ্টব্যগুলি প্রধানত শ্রীমতী রাণু মুখো-পাধ্যায়েরই দেওয়া। এইখানে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত বত্রিশখানি চিত্র আছে। আর আছে ভানু সিংহের পত্রাবলীর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এই চিঠিগুলি কবি শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়কেই লিখিয়াছিলেন। অপরাপর রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত বহু চিঠিপত্র ব্যতীত এই গ্যালারিতে তাঁহার ব্যবহৃত অনেকগুলি কাঁথা, চাদর, কলম, ফুলদানি, ঘড়া ইত্যাদি রক্ষিত আছে। রবীন্দ্র-নাথের স্বাক্ষরিত গ্রন্থাবলী একটি আলমারিতে আছে। নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র ও অপরাপর দ্রষ্টব্য বস্তুসম্ভারে এই রবীন্দ্র-গ্যালারি শোভমান। জনসাধারণ এই গ্যালারি দর্শনে বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন।

একটি মোগল-রাজপুত চিত্র সংগ্রহ

একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের আর একটি কক্ষে একটি মূল্যবান মোগল-রাজপুত চিত্র সংগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। ইহা স্বর্গীয় স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্র স্যর বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টসকে দান করিয়াছেন। এই চিত্র সংগ্রহে মোট ৮২টি চিত্র আছে। এইগুলির মধ্যে পারস্য দেশের মোগলপূর্ব্ব কালের কয়েকটি ছবি আছে। মোগল চিত্রের সংখ্যা ২০টি। অপর চিত্রগুলি রাজপুত, পাহাড়ী ও অপরাপর কলমের। এই মূল্যবান সংগ্রহটির চিরস্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া একাডেমি অফ ফাইন আর্টস দেশবাসীর বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত লাভ ও মানবহিত

একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে মানব জাতির উন্নতি ও মঙ্গলই মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য। সমাজ গঠন ও বিভিন্ন ধর্ম্ম, শিক্ষা ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সৃজনও ঐ একই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। শুধু রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির ভিতরের কলকব্জা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলে মানবহিতবিরুদ্ধ উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থা ধরা পড়িতে পারে।

কারণ, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বা দল গঠন, বাক্যে জনগণের সুখ-সুবিধার জন্য করা হইতেছে শুনা যাইলেও কার্য্যত বহু ক্ষেত্রেই নেতা অথবা নেতাগোষ্ঠীর সুবিধা ও অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভাব স্থাপন ও রক্ষার জন্যই করা হইয়া থাকে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘের সুবিধার জন্যই গঠিত হয়। পরোক্ষভাবে আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা হইলে অনেক লোকের সুবিধা কিছু কিছু হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থাকে তাহা বিশেষ বিশেষ লোকের সুবিধার ব্যবস্থাই। এই সকল কারণে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক আয়োজন লোকচক্ষে সর্ব্বদাই সন্দেহভাজন হয়। রাষ্ট্রের ইতিহাসে সামরিকভাবে পরদেশ দখল বা সাম্রাজ্যবাদ মানবসভ্যতাবিরুদ্ধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ক্রমশঃ একাধিকারত্ব স্থাপন চেষ্টা করা হয় ও পরে ক্রেতাদিগের জন্য ক্রয়মূল্য অন্যায়ভাবে বাড়াইয়া শোষণ ব্যবস্থা করিয়া ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য আহরণের সুযোগ করা হয়। মানবসমাজে মানবহিত বিরোধ বহু ভাবেই করা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রগতির পরিণতিও যদি ঐ দিকেই যায় এবং সমাজতন্ত্রের নামে ব্যবসা করিয়াও যদি সমাজ-শোষণ পদ্ধতি পূর্ণভাবে চালিত রহিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বিশেষ আক্ষেপের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং জনসাধারণের তখন উচিত হয় ঐ প্রকার অন্যায়ের প্রতিকার চেষ্টা করা। মানুষ মাত্রেরই অধিকার বোধ ও অধিকার সংরক্ষণ আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অধিকার কি ও কতদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রসার তাহা জানেন না। সুতরাং মানুষকে অধিকার দেওয়া হইতেছে বলিয়া বুঝাইয়া অধিকার গোপনে কাড়িয়া লওয়া সহজেই সম্ভব। এই কারণে রাষ্ট্রীয় শক্তি যখন চক্রান্তকারী সমাজ-শত্রুদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়, তখন সমাজতন্ত্র ও জাতীয় ব্যবসায় প্রভৃতির নাম করিয়া কতকগুলি ব্যক্তি দলবদ্ধ ভাবে শক্তি ও ঐশ্বর্য্য হরণ করিতে সক্ষম হইতে পারে। যদি দেখা যায় যে, জনসাধারণের দারিদ্র্য হ্রাস কিছুতেই হইতেছে না যদিও কিছু কিছু লোক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সাধারণতন্ত্র ও জাতীয় ব্যবসায় পদ্ধতি যথাযথ ভাবে পরিচালিত হইতেছে না। যদি দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় আমলাগণ ক্রমশঃ উদ্ধত হইতে উদ্ধততর হইতেছে ও কাহারও কোন কার্য্য করা তাহাদিগের উৎপাতে শান্তিতে ও বিনা বাধায় সম্ভব হইতেছে না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রাষ্ট্রে অল্পলোকের শক্তিবৃদ্ধি হইতেছে ও সেই শক্তি অন্যায় ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। অর্থাৎ ফল দিয়া কার্য্য বিচার করা আরম্ভ হইলেই সমাজের সকল লোকে সহজে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদিগের অধিকার পরহস্তগত হইতেছে কি না।

জনসাধারণেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি চিন্তা করেন যে, সাধারণতন্ত্র একপ্রকার যাদু এবং তাহা নামে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহারা বিনা পরিশ্রমে আরামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন। সকলে পরিশ্রম করিবেন, সকলে নিজ নিজ অধিকার পদে পদে সংরক্ষিত হইতেছে কি না দেখিয়া চলিবেন, সকলে সকল অধিকারের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন ও অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজ সুবিধা বৃদ্ধি করিবার আয়াস ত্যাগ করিবেন—এই প্রকার ন্যায়জ্ঞান অন্তরে জাগ্রত না করিতে পারিলে কোন মানবসমাজই উন্নত হইতে পারিবে না।

নন্দলাল বসু

যিনি চিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, যিনি পুরাতন প্রেরণাকে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া নূতন অনুপ্রাণনার সৃজন করিতে পারেন, তিনিই রসস্রষ্টা, শিল্পী। চিত্রকলায় ভারতের প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে সকল প্রতিভাশালী শিল্পগুরু চিত্রকলার অভিব্যক্তিতে এবং বহু শিষ্যকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ও শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন নন্দলাল বসুর স্থান তাঁহাদিগের মধ্যে অতি উচ্চে। তিনি নিজে শিল্পগুরুপ্রধান অবনীন্দ্রনাথের কৃতী ছাত্র ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে সর্ব্বদা নিজের আন্তরিক স্নেহ ও প্রশংসায় অভিষিক্ত রাখিতেন এবং বলিতেন যে শিষ্যদের মধ্যে শিল্পপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে নন্দলাল অদ্বিতীয়। যৌবনে নন্দলাল অজন্তার

প্রাচীর-চিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কন-কার্য্য বিশেষ যোগ্যতার সহিত করিয়াছিলেন। অজন্তার চিত্রাবলী বহু শতাব্দী-কাল ধরিয়া বিভিন্ন গুহায় অঙ্কিত হইয়াছিল এবং তাহার শিল্পপদ্ধতি, আকার ও বর্ণবিন্যাসনীতি ইত্যাদি বিশেষ ধরনের ছিল। জীবজন্তু, মানুষ, পত্র, পুষ্প, বৃক্ষ, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বস্তু সকল যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল, অজন্তার অঙ্কনপদ্ধতি বলিয়া সেই ধরনের চিত্রাঙ্কন সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। নন্দলাল বসু এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি এতই আন্তরিক ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহার তুলির টানে সেই অতীতের কল্পনা ও প্রেরণা নূতন রূপ লাভ করিয়া ভারতের চিত্রকলার আদর্শ এক অভিনব অবিচ্ছিন্নতার সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া ললিতকলার হারানো গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করে। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যসম্প্রদায়ের দ্বারা ভারতের চিত্রকলার অতীত গৌরব পুনর্জ্জাগ্রত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের শিল্পপদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ গুজরাট, রাজপুতানা, দেকান, বুন্দেলখণ্ড, ভাসোলি, কাংড়া, মোগল দরবার ও তাহার প্রাদেশিক রকমারি অভিব্যক্তি ; এই সকল প্রকার রূপ-রচনা পদ্ধতিরই পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবার সুযোগ এই সময়ে হইয়াছিল। নন্দলাল বসু এই কার্য্যে অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ভিতরে সেই গুণ ছিল যাহা তাঁহাকে সকল শিল্পের নীতি, পদ্ধতি, আকার, প্রকার, গঠনবিন্যাস ও মূল প্রেরণার স্বভাব বিচার করিবার শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি দান করিত। এই কারণে তিনি যখন যে কোন শিল্প-পদ্ধতি ব্যবহার করিতেন, তাহাতেই তিনি ভাব ও অভিব্যক্তির সঙ্গতি রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন। বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় সৃষ্টি করিতেও তিনি বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন। একান্ত নিজস্ব যে সকল ভাব তিনি চিত্রে ব্যক্ত করিতেন তাহার মধ্যে অনেক সময় শিল্পপদ্ধতিও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের হইত। এই সকল সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির বাহিরের রচনার মধ্যেও নন্দলালের প্রতিভার ছাপ পরিষ্কার দেখা যায়। তিনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার পরলোকগমনে ভারতের শিল্পাকাশ নিষ্প্রভ হইয়াছে। কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের পরে শান্তিনিকেতন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। নন্দলাল বসু যতকাল ছিলেন কলাভবনের আলোক দীপ্ত উজ্জ্বল ছিল। আজ তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। শান্তিনিকেতন এখন গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত।

ভারতের নব-জাগ্রত কৃষ্টির যে যুগ রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই যুগের যে সকল জ্ঞানী, গুণী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের পাতায় পাতায় নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সমতুল্য ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে। জ্ঞানী, গুণী ও চরিত্রবান লোক না থাকিলে কোনও সমাজ যথার্থভাবে প্রগতিশীল হইতে পারে না। আমাদিগের দারিদ্র্য অর্থের, না চরিত্র ও প্রতিভার, ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। অর্থের অভাব প্রতিভা দিয়া দূর করা যায়। প্রতিভার অভাব অর্থ দিয়া দূর করা যায় না। দুইয়ের মধ্যে প্রতিভাই শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানবসমাজে আজ মানবের স্থান অতি নিম্নে। যথার্থ মানব যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা একে একে চলিয়া যাইতেছেন। মানব সভ্যতাও তাঁহাদিগের অভাবে হৃতগৌরব হইতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ললিত-কলা, সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, নগর-উদ্যান-রাজপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি যাহা কিছুতে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার উদাহরণ নূতন ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু মানব-মন সে সকলের স্থায়ী কোনও মূল্য আছে বলিয়া মানিতে চাহে না। আজ নন্দলাল বসুর তিরোধানে এ সকল কথা পুনর্ব্বার চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইতেছে। শিল্পকলার পরিণতি অতঃপর কি হইবে, কাহারা মানব সভ্যতা ও উৎকর্ষের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিচার করিবেন এবং তাহার ফল কি ভাবে সাধারণের চরিত্রে প্রতিফলিত হইবে, এই সকল প্রশ্ন প্রকট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিতেছে।

মহামতি গোখলে

একশত বর্ষ পূর্ব্বে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে ও জনহিতব্রতে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মানবদিগের মধ্যে অনন্যসাধারণ ছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ ভারতের অশিক্ষিত, দরিদ্র ও অসহায় মানবের সেবায়

জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই নেতৃত্বের সুখ-সুবিধা উপভোগ করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই এবং কেবলমাত্র অল্প কয়েক টাকা মাসহারা লইয়া আড়ম্বরহীন ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। গোখলের নাম সে যুগে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল আদর্শবাদ ও অক্লান্ত কর্ম্মক্ষমতার জন্য। নিজ শক্তির অতিরিক্ত কোনও অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কথা তিনি কখনও বলিতেন না। এবং যাহা বলিতেন তাহা তিনি করিতেন। মহামানবের ভারত উন্নতির যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার উপরে গঠিত ইমারত পরে কোথাও কাগজে, কোথাও বা শুধু বাক্যে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বস্তু বা কর্ম্ম অল্প অল্প কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে। এই কারণে দেশের উন্নতির ভিত্তিটুকু মাত্র সুগঠিত আছে ও তাহার উপরে ভবিষ্যতে কিছু গঠিত হইবে এই আশা আমরা মনে পোষণ করি। সেই ভিত্তি যাঁহারা উত্তমরূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা ভুলি নাই। কারণ শেষ অবধি দেখা যাইবে তাঁহারাই জাতি গঠন করিয়া গিয়াছেন। বিক্ষোভ, আলোড়ন ও আন্দোলন জাতিকে জাগ্রত করিয়াছে, কিন্তু কর্ম্মক্ষমতা দেয় নাই উপযুক্ত মাত্রায়। আজ তাই আমরা কর্ম্মীর সন্ধানে চারিদিকে দেখিতেছি। বাক্যবীরের অভাব নাই দেশে। অতি উচ্চ ও সুদূর বিস্তৃত আদর্শসমূহ অপ্রাপ্ত ভাবে সর্ব্বত্র সাজান রহিয়াছে। গোপালকৃষ্ণ গোখলের ন্যায় কর্ম্মীর প্রয়োজন। তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের জীবনাদর্শ সেইজন্য আজ আমাদিগের বিশেষ করিয়া চর্চ্চা করা আবশ্যক হইয়াছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন, ব্যক্তিগত জীবনে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা, চরিত্র গঠন, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও মঙ্গল প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় অধিকার আহরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বহু দিকে গোখলে ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আজ ভারতীয় মানব জাতীয় জীবনে যেটুকু উন্নতিসাধনে সক্ষম হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বহু মহাপুরুষের অক্লান্ত কর্ম্ম ও দেশহিত চেষ্টা। গোপালকৃষ্ণ গোখলে বিশেষ সক্ষমতার সঙ্গেই নিজের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই জন্যই তিনি দেশের জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

চীনের আণবিক বিস্ফোরণ

কিছুদিন হইল চীনের কম্যুনিষ্ট রাজ বহু অর্থব্যয় করিয়া আর একটি আণবিক বিস্ফোরণ করাইয়াছেন। ইহা কোনও নূতন ধরনের আণবিক বিস্ফোরণ কি না, তাহা লইয়া গবেষণা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ইহা হাইড্রোজেন বোমা। অপরে বলিতেছেন যে ইহা ইউরেনিয়ামলব্ধ প্লুটোনিয়াম বোমা। যে প্রকারের বোমাই হউক না কেন ইহা আণবিক বিস্ফোরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনের আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ চেষ্টা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য কি তাহা পরিষ্কার বলা সম্ভব নহে। আমেরিকার সহিত চীনের যুদ্ধ চলিতেছে এবং মনে হয় চলিতে থাকিবে, কারণ উভয় দেশেরই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার উপর নজর এবং সেই অঞ্চলের রাজ্যগুলির উপর প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া চলিয়াছে। চীন আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমেরিকাকে পরাস্ত করিবে এইরূপ কল্পনা করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু চীনের বেশ কিছুটা আণবিক অস্ত্র হস্তে থাকিলে আমেরিকার পক্ষে চীনের বিরুদ্ধে আণবিক অভিযান করাও কঠিন হইবে। কারণ আণবিক বোমা যদি একটাও কেহ যথাস্থানে ফেলিতে পারে তাহাতে যাহা ক্ষতি ও প্রাণহানি হইতে পারে তাহা অতিশয় ভয়াবহ। এই কারণে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার কেহই কাহারও উপর করিতে চাহিবে না যদি আণবিক প্রত্যাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। চীনের আণবিক হাতিয়ার নির্ম্মাণ এই কারণে মনে হয় নিজ দেশরক্ষার উপায় মাত্র। এবং অপর দেশ, যাহাদের আণবিক অস্ত্র নাই, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যও। অর্থাৎ ভারতের আণবিক অস্ত্র নাই। সুতরাং ভারত চীনকে ভয় করিয়া চলিতে বাধ্য হইবে। আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলে সে ভয়

থাকিবে না। এই জন্য বহু লোকেরই বিশ্বাস ভারতের আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু কয়েকজন অপেক্ষাকৃত জড়বুদ্ধি মতোন্মত্ত ব্যক্তির কথায় ভারতে রাজকার্য্য চলিয়া থাকে। এই কারণে যতক্ষণ এই লোকগুলির মত পরিবর্ত্তন না হয় ততক্ষণ ভারতকে চীনের আণবিক বিভীষিকায় ত্রাসবিমূঢ় হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণ করার গৌরব ভারতের নেতাদিগের বোধগম্য নহে। যেখানে সকলের হস্তে বন্দুক, সেখানে লাঠি-হাতে গমনাগমন আত্মসম্মান-হানিকর। বন্দুক থাকিলেই যে তাহা চালাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু না থাকিলে অপরে বন্দুক দিয়া ভয় দেখাইবে সন্দেহ নাই। ভারতের পক্ষে আণবিক অস্ত্র অতি আবশ্যক। এবং এই কথা দেখিয়া শিখিলেই উত্তম। ঠেকিয়া শিখিতে হইলে সর্ব্বনাশ। আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়ে :

"সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

ভাষা ও রাষ্ট্র

আমরা শুদ্ধ মতবাদের দিক দিয়া ভাষার সহিত রাষ্ট্রীয় অধিকার জুড়িয়া দেওয়ার বিপক্ষে। অর্থাৎ রাষ্ট্র যত বিভক্ত হইবে : কখনও ভাষা, কখনও বা ধর্ম্ম অথবা আর কিছু অনুসারে, রাষ্ট্রের শক্তি ততই হ্রাস পাইবে। এই কারণে আমরা মনে করি যে, ভারতের ভাষামূলক রাষ্ট্র বিভাগ-পদ্ধতি অতি বড় ভুলের কথা হইয়াছে। তাহার উপর হিন্দী ভাষাকে একটা অনাবশ্যক উচ্চ স্থান দেওয়াতে বিষয়টা আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে তাই দেখা যাইতেছে যে ভাষার খাতিরে রাষ্ট্র বিভাগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র হইতে গুজরাট বিচ্ছিন্ন হইল, পরে মহীশূর হইতে কিছু ছাঁট দিয়া মহারাষ্ট্রে সংযোগ করার কথা উঠিয়াছে। অন্য দিকে পাঞ্জাব কাটিয়া দুই ভাগ করা হইবে শুনা যাইতেছে। জাতি বা অপর কোন বিভেদের জন্য নাগা, মিজো প্রভৃতি জাতিগুলি নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য গড়িবার জন্য প্রবল আগ্রহ দেখাইতেছে। বাংলা দেশের কাটিয়া লওয়া অংশগুলি ; যথা ধানবাদ, চাস, চাণ্ডিল, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া ইত্যাদি অবশ্য বিহারে যুক্ত রহিয়াছে এবং বাংলার কংগ্রেসী নেতাগণ তাহা লইয়া কোনও উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। সম্ভবত চাকুরি যাওয়ার ভয়ে। কারণ মালিকগোষ্ঠীর মত না লইয়া বাংলার মহারথীগণ কখনও কোন দাবি-দাওয়ার কথা তুলিতে সাহস পান না। তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, অনেক বাঙ্গালী আজ "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া প্রবল হিন্দিবাদের ধাক্কা খাইতেছেন। সরকারী বিবৃতিতে ধানবাদ যে কখন বাংলা তথা পুরাতন বিষ্ণুপুর রাজ্যের অংশ ছিল তাহার উল্লেখমাত্র দেখা যায় না। "কালিমাটি" হিন্দী নাম এ কথাও বিহারের অন্তর্গত ধলভূম অঞ্চলে সকলেই মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালী আত্মবিক্রয় করিয়া "পরদাসখতে" নিজস্ব হারাইতে বসিয়াছে। এই কারণে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে ভারতে হয় এক রাষ্ট্র গঠন করা হউক, এবং তাহার বিভাগ প্রভৃতি শাসন সুবিধার জন্য মাত্র করা হইবে ধার্য্য করা যাউক ; নতুবা ভাষা বা জাতি-ভিত্তিক উপরাষ্ট্র গঠন করিয়া সকল ভাষাভাষী ও প্রত্যেক জাতির লোকদিগকে খুসী করিতে হইলে তাহাও পূর্ণমাত্রায় করার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এবং এই ব্যবস্থায় বাংলার ও বাঙ্গালীর অধিকার যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। যে সকল বাঙ্গালী অপর প্রদেশে গিয়া তাঁবেদারি করিতে ব্যস্ত, বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য অতঃপর তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রকার্য্য হইতে অবসর দান করা। যাঁহারা অপর দেশ অর্থাৎ চীন, রুশ কিংবা আমেরিকার দাসত্ব করিতে ব্যাকুল, তাঁহাদেরও বাংলায় স্থান না দেওয়াই বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। বাংলা প্রধানত বাঙ্গালীর হওয়া চাই এবং তৎপরে ভারতের। কিন্তু বাংলাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া সেই টুকরাগুলিকে বিহারে বা আসামে যুক্ত করিয়া রাখার সমর্থন কোন বাঙ্গালী করিবে না। বিহার বা আসামের সহিত সংযুক্ত থাকিলে বাংলার কোন কোন অঞ্চলের লোকেদের কৃষ্টি, শিক্ষা, অর্থনীতি অর্থাৎ চাকুরি ব্যবসায় প্রভৃতির দিক দিয়া কি কি ক্ষতি হইতেছে ও হইয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা করিলেই সকল কথা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্যে 'প্রগতি'

রণজিৎকুমার সেন

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন না, কিন্তু জীবন ছিল তাঁর সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত। তিনি ছিলেন আধুনিক থেকেও আধুনিক, অথচ তাঁর ঘরানা ছিল ভারতের মূল দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। সেই অর্থে তিনি যতখানি প্রগতিবাদী ছিলেন, ততখানি ছিলেন যা-কিছু শাশ্বত ও চিরন্তন—তাতে বিশ্বাসী। আইন বলতে যদি আমরা মানুষের ভারসাম্য বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়াবেগকে বুঝি, তবে 'প্রগতি' অর্থেও বুঝি এমন কিছু—যা চলে ও চালায় অথচ বিশ্বের চিরন্তনতাকে সে কোথাও বিকৃত ভাষ্যে পদদলিত করে না। এখানেও বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়াবেগই বড়। এদেশে প্রগতি আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং যেসব সাংস্কৃতিক কর্ম্মী সেই নেতৃত্বের পতাকা ও বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন গণমিছিলে, তাঁদের উভয় দিকের কর্ম্ম ও নির্দেশ বহু যুক্তিবাদের এষণা প্রতিষ্ঠা করেও মূল শিকড়কে কোথায় যেন শক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন নি, ফলে এতবড় একটা আন্দোলন জনচিত্তে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবার অবকাশ পেল না। তার একটা প্রধান কারণ বোধকরি এই ছিল যে—যতখানি সহানুভূতিশীল মন প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়েও যুগচেতনা ও নবীনকালের যুক্তিবাদকে অতিক্রম করেও আগামীকালের মন্দিরে গিয়ে শঙ্খধ্বনি করতে পারে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে তার কিছু অভাব ছিল। যে রামানন্দ সাংবাদিক, যে রামানন্দ শুধু ভারতবর্ষ নয়—বিশ্বচেতনায় চৈতন্যময়, যে রামানন্দ নবীনের উদ্গাতা ও প্রবীণের সুহৃদ, সেই রামানন্দ এদেশের প্রগতিবাদের সেই অভাববোধ সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী সচেতন ছিলেন। তাই তিনি যে লেখনী দ্বারা এদেশের অনেক জঞ্জাল দূর করেছেন এবং ব্রিটিশের গোলটেবলকে ভূমিকম্পের মতো নাড়া দিয়েছেন, সেই লেখনী দ্বারাই তিনি একদা রচনা করলেন 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি', জীবনে তিনি যেসব বৃহত্তর রচনায় হাত দিয়েছিলেন, এটি তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৪০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী (অধুনা নিখিল ভারত) বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের' সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এই 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' তথা "বাংলা সাহিত্যে 'প্রগতি' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" রচনাটি বিশেষভাবে পঠিত হয়। রচনাটি এই উভয় নামেই ১৯৪০ সালের ২৯শে ও ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের 'যুগান্তর' প্রমুখ বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেকার কথা। সে যুগের অনেক পাঠকেরই যেমন স্মরণে থাকবার কথা নয়, তেমনি '৪০-এর পর যাদের জন্ম, তাদেরও এ রচনা জানবার কথা নয়। এই উভয়বিধ পাঠকের পাঠের সুবিধের জন্য রামানন্দকৃত সেই অমূল্য রচনাটি আমি এখানে পুরোপুরি উদ্ধার করে দিচ্ছি। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে তখন যুদ্ধের কালোছায়া ও একটা দ্রুত পরিবর্ত্তনশীলতার উদ্যোগ চলেছে। সেই পরিবেশে লিখিত হয়েও রচনাটি আমাদের চিরকালীন বুদ্ধিবৃত্তির উপর যে অসামান্য আলোকপাত করেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষনীয়। রচনাটি সম্পর্কে নতুন টীকা নিষ্প্রয়োজন; পাঠকের নিজ নিজ উপলব্ধি ও তদনুপাতিক টীকা প্রস্তুতের উপর নির্ভর করে আমি এখানে হুবহু রচনাটি তুলে দিলাম।

"বাংলা সাহিত্যে প্রগতি

সাহিত্য সম্পর্কে 'প্রগতি' শব্দটির ব্যবহার কয়েক বৎসর থেকে হয়ে আসছে। অভিধানে দেখতে পাই 'প্রগতি'র 'অগ্রগতি', 'ক্রমোন্নতি', 'Progress'। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, সেইরূপ সাহিত্যেও প্রগতিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কেবল তার বিকৃতিতেই আপত্তি। এটা মনে রাখতে হবে, বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত প্রগতি আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। দু একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—কাব্য জগৎ থেকেই দিচ্ছি।

সকলেই স্বীকার করবেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে নূতন পথ দেখিয়েছিলেন, নূতন কিছু করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধু যে ছন্দের দিক দিয়েই বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, রামায়ণ বর্ণিত পৌরাণিক কাহিনীতে তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুযায়ী কিছু কিছু উপকরণও আমদানী করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক দিক দিয়ে নূতন পথ দেখিয়েছেন। এঁরা সকলে নিজ নিজ সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে পারতেন এটা ''প্রগতি'' সাহিত্য।

কিন্তু তা তাঁরা কেউ বলেন নি। অগ্রগতি মানে এগিয়ে যাওয়া, উন্নতির দিক দিয়ে যাওয়া। যাঁরা "প্রগতিবাদী" তাঁদের দেখতে হবে, তাঁরা সম্মুখের দিকে কতটা এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা উন্নতি করেছেন, না, অধোগতির পথ সোজা করে দিচ্ছেন।

পৃথিবীর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক দেশই কোন সময় উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছে, কোন সময় বা অবনতির নিম্নতম সোপানে নেমে গেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমাদের দেশেরও এইরূপ গতি লক্ষ্য করবার বিষয়।

শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, ইয়োরোপেও এরকম একটা মতের যেন প্রাদুর্ভাব হয়েছে বলে মনে হয় যে, মানুষের মনে যতগুলো প্রবৃত্তি আছে তার নিরোধ না ক'রে—বিশেষতঃ স্ত্রী-পুরুষের মিলন সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তির নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ না ক'রে—তার পূর্ণ পরিতৃপ্তির দিকে জোর দিলে তাতেই বড় সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পারে, এ রকম মত ঠিক বলে আমার মনে হয় না। অনেকে ফ্রয়েডের দোহাই দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা ফ্রয়েডের বই পড়েন নি। ফ্রয়েডের বড় শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ যে তাঁর দল ছেড়ে দিয়ে অন্য মতের প্রবর্তন করেছেন, সে কথা তাঁরা হয়ত অবগত নন। ফ্রয়েডের কোন কোন মতের গুরুতর সমালোচনার কথা তাঁরা জানেন কি? ফ্রয়েডের মতের কোনই মূল্য নাই, এমন অসার কথা আমি বলছি না। ফ্রয়েডের দোহাই দিলেই যে কোন মত সত্য হতে পারে না, আমি এই কথাই বলতে চাই।

রিপ্রেশন বা দমন, নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপর তিনি যতই খড়্গহস্ত হোন না কেন, একথা মানতেই হবে যে, সিভিলাইজেশন বা সভ্যতানিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে সম্ভবপর হতো না। শান্ত দান্ত হবার আদর্শ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তার মানে এ নয় যে, প্রবৃত্তিসমূহকে বিনষ্ট করতে হবে। গীতাতে বলেছেন, সাধককে যুক্তাহারবিহার হ'তে হবে, তাঁকে আহার-বিহার যথাযোগ্য করতে হবে। সকল শাস্ত্রে একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াটাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেন নি এবং অনেক সাধুপুরুষ প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট না করে সব্লিমেট করেন—বিশোধন ও উন্নয়ন করেন। মনুসংহিতাতে গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা করা হয়েছে। উপনিষদে দেখি, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আর তাঁর সহধর্মিণী মৈত্রেয়ীর মধ্যে আধ্যাত্মিক কথোপকথন হচ্ছে। সুতরাং সকলকেই সন্ন্যাসী হতে হবে, এমন কথা বলছি না।

কিন্তু এটাও ভেবে দেখা উচিত যে, প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বশবর্তী হয়ে যাওয়াটাই কি 'প্রগতি'? আমার যদি কারুর উপর রাগ হয়, তা হ'লে আমি যদি তার গালে চড় কষিয়ে দিই—সেটাই কি হবে সভ্যতা? যদি রাগ আরও প্রচণ্ড হয়, তা হ'লে যদি তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিই, তা হলে সেটা কি হবে সভ্যতা বা 'প্রগতি?' সকলেই বলবেন, 'না'। কিম্বা আমার খুব অভাব হয়েছে দেখলাম অপরের সিন্দুকে আছে প্রচুর অর্থ; সেক্ষেত্রে আমার প্রবৃত্তি দমন না করে যদি চুরি বা ডাকাতি করি, সেইটা কি হবে সভ্যতা? ময়রার দোকানে অনেক মিষ্টি দেখে যদি বিনিপয়সায় ভোজে প্রবৃত্ত হই, সেটাও সভ্যতা হবে না। এই রকম অন্য রকম প্রবৃত্তিরও দাস হওয়া সভ্যতা নয়, 'প্রগতি' নয়। কেবল কামের দাস হওয়াটাই কি তবে সভ্যতা ও 'প্রগতি'? মহাভারতের একটি উপাখ্যানে দেখতে পাই, এক সময়ে পুরুষ ও নারীর স্বৈরাচার প্রচলিত ছিল, এক ঋষিপুত্র নিজের জননীর অপমান দেখে এই কদাচারের উচ্ছেদ করেন। কদাচারটাই ছিল 'প্রগতি' এবং তার উচ্ছেদে হয়েছে অবনতি, এমন মনে করবার কোন কারণ নাই। পুরুষ আর নারীর মিলনের মূলে যে প্রবৃত্তি তাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত না করে তার হাতে আত্মসমর্পণ করাটা যদি সভ্যতা বলে মনে করা হয়, তবে সে ধারণা ভ্রান্ত। এই যে অত্যন্ত বেশী ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, এর কুফল সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে শোচনীয় ভাবে দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনেক মনীষী সেই কারণে সিভিলাইজেশুন না বলে সিফিলাইজেশুন বলেছেন। গোরা সৈন্যদের মধ্যে উপদংশাদি রোগের আধিক্যের কথা পড়ে আতঙ্কিত হতে হয়। আমাদের 'কালা' সৈন্যদের মধ্যে তার তুলনায় ঐ সব উৎকট রোগ কম হয়। সুখের বিষয় যে আমাদের মধ্যে এ রকমের 'প্রগতি' এখনো বেশী হয় নি। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে, সেটা আরম্ভ হয়েছে।

আমি সংক্ষেপে ক্রোধ, লোভ, কাম এই তিনটা প্রবৃত্তির কথা বলেছি। মোটামুটি বলতে গেলে ক্রোধ ও লোভের কুফল ক্রোধী ও লোভীই ভোগ করে—তাদের মানসিক বা দৈহিক ব্যাধির সংক্রামকতা নাই। কিন্তু কামুকের ব্যাধির সংক্রামকতা অতি ভীষণ; তা সমসাময়িক অনেককে ও ভবিষ্যৎ বংশেরও অনেককে ভোগায়। ক্রোধী ও লোভীকে সাহিত্যে বড় করে দেখাবার চেষ্টা যে হচ্ছে না, তা সুখের বিষয়। প্রগতির বিকৃত অর্থ ক'রে কামের মাহাত্ম্য

প্রচারকেই কি তা হ'লে আমরা সাহিত্যের একটা "মিশন" ব'লে মনে করব? অথচ কাম ক্রোধও লোভের চেয়ে ভীষণতর রিপু।

সভ্যতার মূলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই-ই আছে। প্রবৃত্তিকে একেবারে সমূলে বিনাশ করবার চেষ্টা করা ঠিক নয়; তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দি। মনে করুন, একটা ষ্টীম এঞ্জিন আছে। তাতে ষ্টীম (বাষ্প) উৎপন্ন করতে হবে;—কিন্তু বয়লার ফাটাবার জন্তে নয়। তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তার দ্বারা কাজ নিতে হবে। মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির প্রেরণারূপ যে ষ্টীম আছে— অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness), ব্যক্তিগত প্রভুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা (self assertion) ইত্যাদি যে-সমস্ত প্রবৃত্তি ভগবান মানুষকে দিয়েছেন, সেগুলো নিয়ন্ত্রিত করে তাকে চালাতে হবে। প্রবৃত্তিগুলোর দ্বারা সমাজ নষ্ট হোক, এ উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি হয় নি। আমাদের মধ্যে যে সব প্রবৃত্তি রয়েছে সেগুলো আমাদের নষ্ট করুক, উদ্দেশ্য এ নয়। সেগুলো দিয়ে যাতে সুফললাভ করা যায়, আনন্দ লাভ করা যায়, সমাজের হিত হয়, তাই হবে আমাদের লক্ষ্য। তা যদি না হয়, তা হ'লেও কি বলব যে আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে? 'প্রগতি' কথাটা বার বার উচ্চারণ করব না। কারণ তা হ'লে অল্পবয়স্করা মনে করতে পারেন যে, তাঁদের বিদ্রূপ করা হচ্ছে। কাউকে বিদ্রূপ করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়।

মোটের উপর পৃথিবীর যে ক্রমশঃ উন্নতি হয়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক দিয়ে ধ্বংসের লক্ষণও সুপ্রকট। অর্জ্জনস্পৃহা অদম্য লোভের আকার ধারণ করায়, আত্মপ্রতিষ্ঠার স্পৃহা অপরকে দাসে পরিণত করবার ইচ্ছায় রূপান্তরিত হওয়াতেও, পৃথিবীতে রক্তপাত যুদ্ধবিগ্রহ বাড়ছে। এক জাতি অপর জাতিকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবার বা করবার জন্তে প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে। ধনিকতন্ত্রের আতিশয্যে অনেক দেশ জর্জ্জরিত। মাত্র কয়েকজন লোক অর্থের জোরে সকলের উপর প্রভুত্ব করবে, এটা খুব খারাপ। যুদ্ধ জিনিষটাকে উঠিয়ে দেবার জন্তে পৃথিবীর বড় বড় মনীষীরা যেমন চেষ্টা করছেন, তেমনি তাঁদের সে প্রয়াসকে ব্যর্থ ক'রে যুদ্ধকে সফল করবার প্রেরণা নূতন ক'রে আসছে। তা ছাড়া আছে পণ্যোৎপাদনের কারখানা বিস্তারের দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা, যার দ্বারা সমগ্র জাতিকে দাস ক'রে নিয়ে কতকগুলি বিদেশী বড় মানুষ একাধিপত্য করতে পারে। এক দিকে যেমন রুশিয়ায় এক ধরনের বিপ্লব, অন্য দিকে তেমনি জার্মেনীতে ও ইটালীতে অন্য প্রকার বিপ্লব। হিটলার আর মুসোলিনী সকলকে পদানত ক'রে নিজেরা বড় হ'তে চায়। কিন্তু নিশ্চিত জানবেন, চিরকাল কেউ কারুর পদানত থাকবে না।

এখন কোন্ পথ আমরা অবলম্বন করব? এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের আদর্শই আমাদের অনুসরণীয়। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। একবার তিনি তাঁর কোন শিষ্যকে বীণার তার বাঁধার উপমা দিয়ে এ কথাটাই বুঝিয়েছিলেন যে, সকল বিষয়ে মধ্যপন্থী হওয়াই শ্রেয়ঃ। তার খুব ঢিলে করে বাঁধলে সুস্বর বেরয় না; আবার খুব কষে বাঁধলে কড়া আওয়াজ হয় বা তার ছিঁড়ে যায়; এই জন্যে মাঝামাঝি কিছু করাই আবশ্যক। তাই বলছি, কোন দিকে চরমে যাওয়া ভাল নয়। বয়ঃকনিষ্ঠদের বলি, প্রবৃত্তিকে উদ্দাম হতে দিয়ো না, তাকে বিনাশ করতেও যেয়ো না, তাকে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে কল্যাণ হয় তার চেষ্টা কর। বেশী চাওয়া ও জুলুম করা ঠিক নয়। তাতে যে কিরূপ অনিষ্ট হয় তার প্রমাণ রুশিয়া ও জার্মেনী। জার্মেনীর বর্ব্বরতার পরিচয় ত এখন সকলেই পাচ্ছেন। রুশিয়াতে সত্য কি হয়েছিল বা হচ্ছে, তা জানা কঠিন। ব্রেলসফোর্ড সাহেব আমেরিকার 'নিউ রিপাবলিক' কাগজে একবার লিখেছিলেন, 'আমি এ পর্য্যন্ত ষ্টালিনের আমলে তাঁর ৬০০ জন বিরোধীর প্রাণদণ্ড হয়েছে সে খবর পেয়েছি।' আমার কাছে রুশিয়া সম্বন্ধে একখানা বই আছে, তার থেকে জানতে পারি রুশিয়াতে কয়েক বৎসর আগে দুর্ভিক্ষ হয়ে কত লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। আবার অন্য রকম খবর এই যে, রুশিয়ায় বেকার কেউ ছিল না ও নাই। কোন্ খবরটা ঠিক? আমাদের দাস-মনোভাব (slave mentality) সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেন। তা সত্য হতে পারে, কিন্তু যিনি রুশিয়ার সবটাই ভালো বলেন, তাঁকে বলতে পারি, আপনারও ওটা "স্লেভ মেণ্ট্যালিটি'র পরিচায়ক।

সকলের চেয়ে কঠিন মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি, আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যাঁদের বয়স আছে তাঁদের বলছি, তাঁরা বাইরেও স্বাধীন হোন, ভিতরেও স্বাধীন হোন। নিজের উপর নিজে প্রভু হোন। তাঁরা নিজেরা চিন্তা ক'রে জ্ঞান লাভ ক'রে কাজ করুন। মনে রাখবেন, উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাধীনতা নয়। তাঁরা নিজে চিন্তা করবেন, নিজে তথ্য সংগ্রহ করবেন। নির্ব্বিচারে অন্য দেশের আদর্শ অনুসরণ করবেন না।

পৃথিবীতে একটা বিষয়ে 'প্রগতি' হয়েছে। তা পুরুষ আর নারীর প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে। পুরুষ আর নারীর

প্রেম সম্বন্ধে ধারণার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হয়ে আসছে। অনেক অতি পুরানো কাব্যে দেখবেন, প্রেম দৈহিক, রূপজ মোহমাত্র। তার পরের যুগেতে, যেমন সীতা প্রভৃতির চরিত্রে দেখা যায়, এটা ঠিক রূপজ মোহ নয়; মানুষের ভিতরের যে সৌন্দর্য্য, মানসিক ও আত্মিক সৌন্দর্য্য (intellectual beauty, spiritual beauty), তারই প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রকারে মানুষের প্রেমের আদর্শের ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে, প্রেম শুধু দৈহিক না হয়ে অন্য উপকরণের সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে।

কোন কোন 'প্রগতি' সাহিত্যিকের এই রকম ধারণা আছে বলে মনে হয় যে, যেমন "কানু বিনা গীত নাই", সেইরূপ পণ্যাঙ্গনা কিংবা সেই রকম স্বৈরিণী ভিন্ন 'প্রগতি'-সাহিত্য হয় না। কিন্তু যে কবি প্রাচীন সংস্কৃত "মৃচ্ছকটিক" নাটক লিখেছিলেন তাঁর নাটকের প্রধানা নায়িকা গণিকা হলেও তিনি 'প্রগতি'র দাবী করেন নি এবং তিনি উদ্দাম লালসার লোভনীয় ছবিও আঁকেন নি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ও দীনবন্ধু মিত্রের কোন কোন নাটকে পণ্যাঙ্গনা আছে। তাঁরা তাদের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে কেউ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং তাঁরা কেউ দাবী করেন নাই যে, তাঁরা 'প্রগতি'-সাহিত্যিক।

যাঁরা "প্রগতি"-বাদী তাঁরা কবি হুইটম্যানকে (Whitmanকে) তাঁদের অন্যতম নেতা বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁর কোন কোন আদর্শ যে কত বড়, তা তাঁর "অনেক সাধারণ বারবনিতার উদ্দেশে" লিখিত "To A Common Prostitute" কবিতাটি পাঠ করলে বোঝা যায়। আমি সেই কবিতাটি থেকে কয়েকটি পংক্তি পড়ছি।—

—"Be Composed…
I appoint you with an appointment.
Not till the Sun excludes you
do I exclude you ;
Not till the waters refuse
to glisten for you
and the leaves to rustle for you.
do my words refuse to glisten
and rustle for you,
And I charge you that you be
patient and perfect till I come."

হুইটম্যান তাকে শান্তসমাহিত হ'তে এবং দোষ ও অসম্পূর্ণতাশূন্য হ'তে, ধৈর্য্যশীলা হ'তে বলেছেন। তবেই সে তাঁর দেখা পাবে। সাহিত্য-সমালোচক Ernest de Selincourt বলেছেন যে, কবি এই কবিতাটিতে "speaks in language which for all its homely phrasing re-echoes the words of Christ to Mary Magdalene or the woman of Samaria."

অবসর ও সুযোগের অভাবে "প্রগতি" সাহিত্যের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ঘটে নাই। শুনেছি "প্রগতি" সাহিত্যিকরা পতিতাদের প্রতি করুণাময়, নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতি এঁদের দয়া আছে। এটি প্রকৃত তথ্য হ'লে সন্তোষের বিষয়। কিন্তু পথের ভিখারীকেও শুধু মৌখিক সহানুভূতি দেখান বৃথা। দস্যু ও নরহন্তাদের মত পতিতাদেরও কারও কারও কোন কোন ভাল গুণ থাকতে পারে। কিন্তু, যদি তাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্যে চেষ্টা করা না হয়, তা হ'লে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও করুণার কোন মানে হয় না। বেশ্যা ও বেশ্যালয়ের চিত্তাকর্ষক চিত্র আঁকলে, তাদের দুর্দ্দশার কোন প্রতিকার হয় না, দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টাই হয় না। আর, তাদের দুর্দ্দশা যে আছে তা প্রমাণ করা অনাবশ্যক। এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে কোন ভদ্রলোক, কোন "প্রগতি" সাহিত্যিক, নিজের আত্মীয়াদিগকে বেশ্যায় পরিণত করতে চান না। সর্ব্বাগ্রে চাই প্রকৃত দরদ। যদি এই সমস্ত সাহিত্যিকরা বাস্তবিকই দরদী হন, তা হ'লে তাঁদের রচনা পড়ে অন্য লোকেরা দুঃখীর দুঃখ মোচনে ব্রতী হবেন। তা হয়ে থাকলে ভাল কথা। এঁদের রচনার ফলে পতিতাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের জন্যে কটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ও চলছে সন্ধান লওয়া আবশ্যক। এঁদের রচনা পড়ে গরীব লোকদের জন্যে যদি কারো প্রাণ কাঁদে তা হ'লে তাঁরা ধন্য। আন্তরিকতা ও হৃদয়স্পর্শী আবেদন (Sincerity appeal to the heart) যদি এঁদের সাহিত্যে থাকে, তা হ'লে এদের সাহিত্য হবে সত্য। কিন্তু প্রবৃত্তিপ্রসূত আর বণিকবৃত্তি থেকে প্রসূত হ'লে, কারো লেখা সত্য হবে না। প্রকৃত করুণাপূর্ণ সহানুভূতি দেখান হলেও, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাতে বড় হ'তে পারে সে চেষ্টা না করলে, সবই ব্যর্থ। হুইটম্যান যে পতিতা নারীকে বলেছিলেন—"Be perfect" অর্থাৎ আগে পূর্ণ হও, তার পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব,—একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, কত বড় প্রেরণা এর ভেতরে রয়েছে। এই রকম প্রেরণা কি "প্রগতি" সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়? যদি সত্যই পাওয়া যায়, তা হ'লে

বলব, এঁদের সাহিত্যরচনা সার্থক। সাহিত্য যে সাহিত্যই, প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা নয়, সার্মন নয়, মনুসংহিতা নয়, তা আমি জানি। কিন্তু এও জানি যে, সুসাহিত্যের পরোক্ষ ফল সামাজিক উন্নতি, সামাজিক স্বাস্থ্য, শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি।

দেশের সাধারণ লোকদের প্রতি, চাষী মুটে মজুর কারিগরদের প্রতি, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গভীর সহানুভূতির প্রমাণ তাঁদের রচনা ও উক্তির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তাঁরা কেউ দাবি করেন নি যে তাঁরা 'প্রগতি' সাহিত্যিক।

কেশবচন্দ্র তাঁর 'সুলভ সমাচারে' রাজা ও জমিদারদের উদ্দেশ্যে যা লিখেছিলেন, তার সব কথা উদ্ধৃত করব না। দু'একটা কথা মাত্র উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন, প্রজা বলতে পারে, "আমি যে গায়ের রক্ত জল করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিলাম, আর তুমি আসিয়া তাহা লুটিয়া লইয়া যাও, তুমি কে? আমার পুত্রপরিবার অন্নাভাবে প্রাণে মরিতেছে আর তুমি রাশিরাশি অর্থ লইয়া সুখে বসিয়া আছ কি জন্য? দুঃখী প্রজার এ কথার উত্তর দিতে গেলে রাজার মুখ শুকাইয়া যাইবে।" আর এক জায়গায় কেশব লিখেছেন, "বলিতে গেলে বনেদী বড় ঘর এদেশে অল্প কিন্তু বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা? আমাদের দেশে এদেশের 'ছোট' লোকেরা। তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ি চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়-গুড়ি টানিত। দেখ, সামান্য লোকেরা আমাদের সর্ব্বস্ব দিতেছে। তাদের ধনে আমরা বড়মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয়জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব মনে করে?" অন্যত্র কেশব লিখিতেছেন, "আমাদের পাঠকগণ, যাহারা তোমাদের মধ্যে রেওত বা কারিগর আছ, সকলে একত্র হইয়া একবার গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তোমরা যাহাতে দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরতা, প্রজাপীড়ন, বলপূর্ব্বক থামাইতে পার ইহাতে একান্ত যত্ন কর।" "রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে পান না, বড় মানুষেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে না। এরূপ অপমান কি তোমরা চিরকাল সহ্য করিবে? তোমরা কি মানুষ নও? পরমেশ্বর কি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়া তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই? তবে কেন অজ্ঞান নিদ্রায় পড়িয়া আছ? তোমরাই এ দেশের বড়লোক, তোমরা না থাকিলে দেশ ছারখার হইবে, তাহা কি জান না?"

আমাদের দেশে আধুনিক সভ্যতার নানা উপকরণের উল্লেখ করে "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :—

"এই মঙ্গলের ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এতে মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, তাহাদের মঙ্গল হইয়াছে?"

তারপর নিজেই এর উত্তরে বলছেন :

"আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, তাহা হইলে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি। কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।...যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

বিবেকানন্দও বজ্রনির্ঘোষে এইরূপ কথাই বলেছিলেন। যথা :—

"হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ, তোমরা হৃদয়বান হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে?"

রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।" ইত্যাদি, তা সুবিদিত। তিনি বলেছেন, "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" তিনি ভগবানের উদ্দেশে লিখেছেন,—

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।"

"রাখো ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে,
ঘর্ম পড়ুক ঝ'রে।"

এখন পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য সম্পর্কে একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব। কেউ কেউ বোধ করি মনে করেন, একনিষ্ঠতা স্বাভাবিক নিয়ম নয়। অনেকে বিজ্ঞানের দোহাই দেন, কিন্তু তাঁরা কেউ কেউ বিজ্ঞান পড়ার দরকার আছে বলে মনে করেন না। না পড়ে বৈজ্ঞানিক অনেকেই হয়। একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হতে হলে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব জানা দরকার। ভেষ্টারমার্ক (E. A. Westermarck) প্রভৃতির বই পড়লে দেখা যাবে যে, একনিষ্ঠতা খুব পুরানো জিনিষ। এই ত গেল মনুষ্য-সমাজের কথা। পশুপক্ষীর মধ্যে পর্য্যন্ত একনিষ্ঠতা আছে। বড় বড় বই পড়বার যাঁদের অবসর বা সুবিধা নাই, তাঁরা স্কুলকলেজ পাঠ্য ছোট ছোট বই থেকেও একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে বহু তথ্য জানতে পারবেন। এখানে ব'লে দেওয়া দরকার যে, যে-কোন ঔদ্বাহিক রীতিতে কাওকে কাওকে পতিপত্নী-সম্বন্ধে আবদ্ধ করে দিলেই তা সত্য ও জীবনব্যাপী বিবাহের মর্য্যাদা লাভ করে, এ-রকম মত আমি শ্রদ্ধেয় মনে করি না।

যদি কেউ স্বাভাবিকতা ও সামাজিকতার প্রশ্ন তোলেন, তা হ'লে বলতে হয় জড়রাজ্যের স্বাভাবিকতা আর মানুষের স্বাভাবিকতায় প্রভেদ আছে। মাটি পাথর নানা রকমের ধাতু স্বাভাবিক যেমন সৃষ্ট হয়েছিল তেমনই হয়েই আছে, কিন্তু মানুষের যে কোন্‌টা স্বাভাবিক অবস্থা তা বলা কঠিন ; কেননা মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত, বিবর্ত্তিত (evolved) হচ্ছে। মানুষ ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করছে। সমাজেরও বিবর্ত্তন হচ্ছে। ক্রমোন্নয়নশীল অবস্থা ও ব্যবস্থাই স্বাভাবিক।

এক সময় হত্যার প্রতিশোধে হত্যা, দস্যুতার প্রতিশোধে দস্যুতা ইত্যাদি স্বাভাবিক বিবেচিত হ'ত, কিন্তু এখন হয় না। নির্ব্বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলাটাই স্বাভাবিক নয়, নিবৃত্তি জিনিষটাও স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে। সংযম, নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি কোনটাই হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে নি। প্রবৃত্তি যেখান থেকে এসেছে, নিয়ন্ত্রণও সেখান থেকে এসেছে। এ সমস্তর মধ্যেই একটা স্বাভাবিকতা আছে। এই স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে, প্রগতি অগ্রগতি স্বাভাবিকতা ইত্যাদি নামের মোহে মেতে উঠলে সুফল ফলে না। কার্লাইল এক জায়গায় বলেছেন যে, "বৈজ্ঞানিকরা অনেক সময় ঠিক-কারণটা ব্যাখ্যা করতে না পেরে এক একটা দুর্বোধ্য গ্রীক বা লাটিন কথা ব্যবহার করেন। বললেন, এটা ইলেকট্রিসিটি। কিন্তু ইলেকট্রিসিটিটা কি ?" শুধু নামে কোন জিনিষ বড় একটা কিছু হয় না। স্রোতে ভেসে ভেসে যাওয়াটা ঠিক নয়।

'প্রগতি' সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ কথাও শোনা যায় যে, তাতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা বিষয় সম্বন্ধে বৈপ্লবিক মত প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ মত প্রকাশও একেবারে নূতন নয়। একথা প্রমাণ করবার জন্যে পূর্ব্বতন লেখকদের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করবার এখন সময় নেই। কিন্তু কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের যে সব কথা উদ্ধৃত করেছি, তা কি বৈপ্লবিক নয় ? অন্ততঃ তাতে কি বিপ্লবের সূচনা নাই ?—যদিও তাঁরা ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ বলেন নি !

কোন বিষয়েই নূতন কিছু বলবার নাই, নূতন সত্যের আবিষ্কার হ'তে পারে না, কোন দিকেই অগ্রগতির আবশ্যক নাই, তার পথ নাই ;—আমি এরূপ কিছু বলছি না। নিশ্চয়ই নূতন কিছু বলবার আছে, অগ্রগতির, উন্নতির সম্ভাবনা ও প্রয়োজন আছে, নূতন পথ আছে। কিন্তু নূতন বক্তব্যটা শ্রবণ ও অনুসরণের যোগ্য হওয়া চাই, পথটা বিপথ না হওয়া চাই।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের "বাংলা ভাষা পরিচয়" গ্রন্থ থেকে তাঁর কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য শেষ করি :

"এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভাল-মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনও কখনও নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ে শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্দ্ধায় তা'র রুচি বিকৃত হ'তে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জ্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনও কখনও দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তো দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে, তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেই রকম কোন জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্ব্বলতায় জড়িয়ে ধরে তখন তার

সাহিত্যে, তার শিল্পে কখনও কখনও মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে।

"তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ করে যে রস-বিলাসীরা অহঙ্কার করে, তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে, শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

"মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হয়ে আত্মশ্লাঘা করে বেড়াবে তা নয়, তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্য্যবান হয়ে সকল প্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান না হয় নাই তৈরি হ'ল।"

—•—

অঙ্গ চালনায় ক্ষুধা হয়, বল বাড়ে, সুস্থ থাকা যায়, একথা বৈজ্ঞানিকেরা বলিবার আগেই শিশুর অকারণ উদ্দেশ্যবিহীন হাত-পা নিক্ষেপ কোন্ স্মরণাতীত যুগে আরম্ভ হইয়াছে। শুধু হাত পা নাড়া নয়, তালে তালে হাত পা ছুড়া। চলিতে শিখিবার পর, নৃত্যে শিশুদের স্বভাবপটুতা দেখা যায়, যেন কোন্ অরূপ নৃত্যাচার্য তাহাদিগকে এই বিদ্যা শিখাইয়াছেন। এ সব তাহাদের উচ্ছল আনন্দেরই রূপ।

শিশুদের কাছে সবই খেলা। শিক্ষাও তাহাদের কাছে খেলার মত হয়, যদি বিশ্ব আনন্দের অভিব্যক্তি বলিয়া শিক্ষকের বোধ থাকে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, মাঘ ১৩২২।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সদর রাস্তা থেকে পূবদিকে গরাণহাটা গলি। সেই গলির দু'পাশে ছোটখাট দোকানদার ও সারি সারি একতলা দোতলা বাড়ী। কোন কোন বাড়ীর দরজার উপরের দিকে খিলানের কাছে ছোট ও মাঝারি সাইন-বোর্ড লাগান। কোনটিতে লেখা "সুপ্রসিদ্ধা কীর্তন-গায়িকা হরিমতী দাসী" কোনটিতে "টপ্-গায়িকা পান্না-ময়ী", কোনটিতে লেখা "ঝুমুর সম্প্রদায়", কোনটিতে লেখা "সুপ্রসিদ্ধ তরজা-ওয়ালা কাঙালীচরণ সাঁই" প্রভৃতি।

সরু গলিটা অন্ধকার। ল্যাম্পপোষ্টের উপরে কাঁচের লণ্ঠনের ভিতরে তেলের বড় বাতি জ্বলছে। তাতেই কিছুটা অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। একটা পানের দোকানে সোনালি তবক্‌মোড়া পানের খিলি সাজানো। দোকানের সামনে এসে শম্ভু শীল চক্কত্তি মশাইকে বললেন—"এই পান-ওয়ালা রামসেবক পাঁড়েকে জিগ্যেস করে দেখি ভোলাময়রার দল হাটখোলায় গেছে কি না। তরজা শোনবার ইচ্ছাটা খুবই হচ্ছে চক্কত্তি মশাই, বুঝলে কি না।"

—"বেশ ত, তুমি যাও না। তবে আমাকে আজ প্যারী মিস্তিরের বাড়ী না গেলেই নয়!"

পান-ওয়ালা রামসেবক বললে—"ভোলাময়রা দলের নায়েক বাজনদার পেল্লাদ-এর গুনচি নীলমণি হয়েছে। বড় ডাক্তার গুডিভ্ চক্কত্তি দেখছে।"

শম্ভু শীল বললেন—"তুই ত সব খবরই রাখিস্ দেখছি। দেখা যাক্, সুবিধে হ'লে একবার ঘুরে আসব হাটখোলা থেকে।"

গলির মাঝামাঝি ডানহাতি চক্কত্তি মশাইয়ের এক-তলা বাড়ী। শম্ভু শীলের বাড়ী আরও একটু দূরে। শম্ভু শীল চক্কত্তি মশাইকে প্রাতঃ-প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে গেলেন। চক্কত্তি মশাই ভাঙা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। আশপাশের বাড়ী থেকে কোথাও-বা মেয়েলি ঝগড়ার সুর, কোথাও-বা হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে হাল্কা থিয়েটারি গান, কোথাও-বা যাত্রাপার্টির রিয়ার্সেলে বীররসের হুঙ্কার, কোথাও-বা টপ্পার সুরের সঙ্গে ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। একটা মিলিত ঐকতান যেন গলিটার বাতাস ভরে রেখেছে।

চক্কত্তি মশাই-এর বাড়ীর ভিতরটা অন্ধকার। একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছে উঠোনের এক পাশে। তাতে অন্ধকারের ধাঁধা আরও বেড়েছে। চক্কত্তি মশাই উঠোন পার হয়ে একটু উচ্চকণ্ঠে হাঁকলেন—বিলাসি, ও বিলাসি—

ভেতর থেকে একটা ঘড়ঘড়ে গলায় আওয়াজ এল—"যাই কত্তা।" একদিকের কাঁচভাঙ্গা একটা লণ্ঠন নিয়ে বিলাসী এসে সামনে দাঁড়ায়; বলে—"মাছ কৈ কত্তা, —ইলিস্ মাছ?"

চক্কত্তি একটু নরম সুরে বলেন—"সাধন জেলে আজ আর মাছ নিয়ে আসে নি। আর গঙ্গার ইলিসের দামও বেড়ে গেছে—আজকাল মরশুমের বাজারে চার আনা সেরে বিকুচ্চে, গেরস্থ লোকেরা কি আর কিনতে পারে? কালে কালে হ'ল কি? ইলিসের দর তিন আনা থেকে একেবারে চার আনায় উঠেছে। শ'বাজারের ঘাটে তবুও লোকে যাচ্ছে আর কিনছে।"

বিলাসী এবার একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলে—"রোজই ত আন্‌ব আন্‌ব করছ। আন্‌ছ কৈ?"

লণ্ঠনের আলোয় বিলাসীর অভিমানভরা মুখখানা দেখে চক্কত্তি ফিক করে হেসে উঠে বলেন—"তুই আমার হাফগিন্নি—তোকে কি না খাইয়ে আমার তৃপ্তি আছেরে বিলাসী!"

বিলাসী একটু রাগ-ভোলা মেয়েমাহুষ। মাথার উপর আধ ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে চক্কত্তি মশাইকে বলে—"আজ যে সন্ধ্যের পরেই তাড়াতাড়ি ফিরলে?"

—"একটু পরেই আবার একবার বেরব ভাবছি।"

চক্কত্তি এবার পাশের দালানে গিয়ে ওঠেন। বিলাসী লণ্ঠনটা ঘরের মধ্যে দরজার পাশে রাখে। তারপর চক্কত্তি মশাইকে বসবার একটা টুল এগিয়ে দিয়ে তাঁকে পাখা করতে থাকে।

চক্কত্তি মশাই মৃদু হেসে বিলাসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

সত্যিই বিলাসী যেন তাঁর বিয়ে-করা বউ। এতটা আদর-যত্ন এ বুড়ো বয়সে কে আর দেবে? বিলাসীর বয়স বছর চল্লিশের হবে। আগের ইতিহাস তার অজানা। তামাটে রঙ, একটু উঁচু কপাল, কিন্তু মুখখানির শোভা নথে বেড়েছে। আধময়লা চওড়া কালাপেড়ে সাড়ীখানা ভালই সেজেছে তার ঈষৎ স্থূল বপুতে। দু'হাতে একটা করে সোনার পাতমোড়া রুলি। বিলাসী এবার চক্কত্তি মশাইয়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, বলে—"একটা কথা রাখবে?"

—"কি বলছিস্ বিলাসী? বলেই ফেল্ না।"

—"কাল আমাবস্তে, একবার কালীঘাটে নিয়ে যাবে?"

—"যাব কি করে বল দিকিন্? আমার কি আর অবসর আছে, তার চেয়ে নফরের মা'র সঙ্গে যেও, আমি নৌকোভাড়া দোব।"

বিলাসী বলে—"তুমি সঙ্গে না থাকলে, আমার যেন—"

কথাটা শেষ হ'ল না বিলাসীর। চক্কত্তির মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন—"ওই সুখেই ত তোর কাছে পড়ে আছি বিলাসী, নইলে ঝাঁপড়দা'য় কি আর যেতে পারি নে! সেখানে আমার বিয়ে-করা বুড়ী গিন্নী তার ঘরসংসার নিয়ে আছে—ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি সব জমজমাট।" আমি সেখানে টিঁকতে পারি না কেন জানিস? কেবল 'দাও দাও' রব। আরে গেল যা:, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপায় করব আমি—আর আমাকেই কেবল হেনস্তা!—তাতে আবার তোর কথা শুনে বুড়ী আমাকে খ্যাংড়া মারতে আসে! দুঃখের কথা কি আর বলব বিলাসী—একদণ্ডও সেখানে থাকতে মন চায় না। তোর সেবাযত্নে আমি এখানে বেশ আছিরে—বেশ আছি। শুধু মাসকাবারি গোটাকতক টাকা পাঠিয়ে দি—ব্যস্—এই পর্যন্ত!"

কথাগুলো বলে চক্কত্তি মশাই যেন হাঁপিয়ে উঠেন। এর মধ্যে বিলাসী উঠে গিয়ে তামাক সেজে নিয়ে আসে।

হুঁকোতে বার দুই সুখটান দিয়ে চক্কত্তি মশাই বলেন—"ইলিশ ত এল না, এখন রাত্রে কি রেঁধে রেখেছিস?"

বিলাসী বলে—"বড়ি-পোস্ত, নারকোল দিয়ে কচুর শাক, আর আম-মুসুরির ডাল।"

"বাঃ বাঃ!—দে, তবে দুটো ভাত খেয়েই নি—তারপরে প্যারি মিস্তিরের বাড়ী যাব 'খন। রাত ত আর বেশি হয় নি।"

চক্কত্তি মশাইয়ের কথা শুনে বিলাসী ঘরের একপাশে আসন পেতে ঠাঁই করে দেয়। চক্কত্তি বসে পড়তেই, তাঁর সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে নিজেই কাছে বসে চক্কত্তিকে পাখার বাতাস করে।

দু'চার গাল ভাত খাওয়ার পরই পাশের বাড়ীর খোলার ঘর থেকে নারীকণ্ঠের একটা করুণ আর্তনাদ ওঠে। চক্কত্তি খাওয়া বন্ধ রেখে আশ্চর্য হয়ে বলেন—আজও দেখছি সামন্ত মদ খেয়ে তার বৌটাকে ঠ্যাঙাচ্ছে!"

বিলাসী বলে—"হ'লেই বা দ্বিতীয় পক্ষের বউ—অমন ভাল মেয়েমাহুষ বড় একটা হয় না। সামন্তকে কি যত্নই না করে!"

এক গাল ভাত মুখে দিয়ে জড়ানো কথা কন চক্কত্তি—"সামন্তর ঐ এক দোষ, মদ ছাড়তে পারে না, নইলে লোকটা এদিকে মন্দ নয়।"

বিলাসী এবার ঠোঁট ফুলিয়ে প্রতিবাদ করে—"তা বলে সোমত্ত বউটাকে ধরে ধরে রোজই মারবে! বুড়ো বয়সে একেই বলে ভীমরতি!"

চক্কত্তি হাসেন, বলেন—"আমারও ত তোর উপরে ভীমরতি আছে রে বিলাসী। তা না হ'লে সব ছেড়ে তোর কাছে পড়ে থাকি!"

বিলাসী বলে—"রাত যে বাড়ছে, কোথায় যে যাবে বলছিলে?"

খাওয়া শেষ করে চক্কত্তি উঠে পড়েন। গাড়ুতে

জল ছিল, তাই দিয়ে আঁচিয়ে এসে তক্তাপোষে বসেন। বিলাসী পান ছেঁচে এনে দেয়।

সত্যিই রাত বাড়ছে। রাস্তার কলরব ক্রমশঃ যেন থেমে যাচ্ছে। চক্কত্তি বললেন—"এত রাতে আজ আর কোথাও যাব না ভাবছি। কাল সকালেই না-হয় প্যারী মিত্তিরের বাড়ী যাব।"

বিলাসী বলে: "সারাদিন ত খেটেছ, এখন একটু ঘুমোও। আমি একবার সামন্তর বৌটাকে দেখে আসি।"

তক্তাপোষের উপর আড় হয়ে শুয়ে চক্কত্তি বলেন: "আমি কিন্তু উঠে গিয়ে তোকে আর কপাট খুলে দিতে পারব না। তুই বরং দালানেই শুয়ে থাকিস্।"

"আচ্ছা"—বলে বিলাসী চলে যায়।

চিৎপুরের বড় রাস্তার ডানদিকে সোনাগাছির খানিকটা অংশ পুকুর-বোজানো জায়গা। সেখানটায় এখনও দালানবাড়ী ওঠে নি, তবে অনেকগুলো সারি সারি টিনের চালাঘর ও খোলার ঘর নিয়ে একটা ছোট্ট বস্তি গড়ে উঠেছে।

আঁকাবাঁকা গলিটা বড় রাস্তার মোড়ে এসে পড়েছে। এখান থেকে একটু পুবদিকে বেঁকে গেলেই শ্যামবাজারে যাবার সড়ক। রাস্তার একপাশে সারি সারি কয়েক-খানা পাল্‌কি আর ছ্যাকড়া গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির ঘোড়াগুলোর মুখে ছোলার থলি ঝুলিয়ে দিয়ে কোচ-ম্যানেরা কেউ হুপ্‌টিতে শিরিষ বুলোচ্ছে, কেউ চাকায় ঠেসান দিয়ে শিস্ দিতে দিতে গান গাইছে।

ভিখু আর উঝো ঐ বস্তিরই ছ্যাঁচোড় ছেলে। ওরা ডাক্-সাইটে ছিঁচকে চোর। চিৎপুরের বটতলার চারপাশে ওদের যত কিছু রুজি-রোজগার। রাস্তার চল্‌তি লোকদের সামনে ভিখু কানা সেজে বসেছে, উঝো একটু তফাতে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে ন্যাংড়া সেজে ভিক্ষে চাইছে।

পথে লোকজন একটু কমতেই ভিখু বলে: এইবার চোখ খুলি, কি বলিস্।

হঠাৎ গুটোনো পা-টা আরও একটু বাঁকা করে উঝো বলে: চুপ,—চুপ—ঐ দেখ্ আর একজন বাবু আসছে।

ভিখু এইবার কান্নার সুরে চেঁচিয়ে বলে: কানা বাবা, একটা আধ্‌লা দাও বাবা!

বাবুটি ভিখুর সামনে এসে দাঁড়ায়, বলে: কি খাবি আধ পয়সায়?

—মুড়ি বাবা,—সারাটা দিন কিছু খাই নি—

দয়ালু বাবুটি একটা ডবলপয়সা ভিখুর দিকে ছুঁড়ে দেয়, কিন্তু পয়সাটা গড়িয়ে উঝোর দিকে যায়। উঝো সেটাকে টপ্ করে তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে পোরে।

বাবুটি চলে যেতেই চোখ খুলে ভিখু বলে: পয়সাটা দে।

উঝো বলে: বাঃ রে। পয়সা কোথা? মাইরি বলছি, কেউ দিলে না।

ভিখু বলে: আমি যেন দেখতে পাই নি রে শালা—তুই মুখে পুরলি—

—এই দেখ মুখ—উঝো হাঁ করে মুখের ভেতরটা দেখায়।

ভিখু বলে: আর কতক্ষণ এখানে বসে থাকব? আজ আর কিছু হ'ল না রে!

—এই, চুপ, চুপ—আর একজন বাবু আস্‌ছে।

—অন্ধ বাবা, খেতে পাই না বাবা, দয়া কর বাবা!

বাবুটি ভিখুর দিকে একটিবার মাত্র চেয়ে দেখে হন্ হন্ করে চলে যায়।

উঝো বলে: তুই সব মাটি করবি দেখছি! অমন মিটি-মিটি তাকাচ্ছিলি কেন? আমি তোর পয়সা চুরি করি বুঝি? না? ব্যাটা নিজে ছিঁচকে চোর!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে উঝোর গালে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে ভিখু বলে: আমি চোর রে শালা? আমি চোর?

—চোর নয়ত কি! কতবার তুই চুরি করিস্, আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেদিনও বিন্তীর আঁচল থেকে চুপি চুপি একটা পয়সা খুলে নিলি, আমি দেখিনি, না? তুই এখন খামকা আমাকে চড় মারলি! এমন লেগেছে, মাইরি!

—বিন্তীর আঁচলের পয়সায় গোলাপী বিড়ি কিনে-ছিলাম, মনে নেই? সে বিড়ির ভাগ তুইও ত পেয়ে-ছিলি! বিন্তিটা কিন্তু কিছু জানতে পারে নি—শালী বড় শয়তান!

রাস্তায় জন দুই লোক কথা বলতে বলতে আসছিল, ভিখু তাড়াতাড়ি চোখ বোজে। এবার দুটো আধলা।

চোখ খুলে ভিখু বলে: চল্ না আজ যাই!

—কোথায় রে?

—নিমতলায় কাঠের আড়তে নীলকণ্ঠর যাত্রা হচ্ছে—

—দূর! ওসব কেষ্ট-যাত্রা শুনতে ভাল লাগে না মাইরি!

—তবে শেঠেদের বাড়ী হীরে বাইজির নাচ হচ্ছে, দেখবি চল্।

—নাঃ, সেখানে যাব না, সেই গুঁপো দরওয়ানটা আমায় চেনে—ঢুকতে দেবে না।

—কাঁচ-কামিনীর বাড়ীতে রাস হচ্ছে, দেখতে যাবি না?

—দূর, ওসব জায়গায় শুধু মাগীর ভিড়—একটা পয়সাও রোজগার হয় না মাইরি। তার চেয়ে তুই-ই যা।

—বুঝেছি, আমি চলে গেলে তুই বাড়ী ফিরে বিন্তীর সঙ্গে মস্করা জুড়ে দিবি, না? আমি কোথাও যাচ্ছি না আজ।

উঝো হেসে বলে: বুঝেছি, তোর হিংসে হচ্ছে।

হঠাৎ উঝোর মাথার চুল খাম্চে ধরে নাড়া দিয়ে ভিখু বলে: ফের বিন্তীর সঙ্গে মাখামাখি করলে দেখিয়ে দোব মজাটা!

দু'জনে এবার গলির মধ্যে ঢোকে। সবে তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রাস্তায় আলো নেই। গরাণ-কাঠের আড়তটার পিছনে নোংরা গলি। সারি সারি খোলার ঘর। নর্দামার দুর্গন্ধ। রাস্তার মাঝখানে একটা মস্ত বড় তেঁতুল গাছ বস্তিটা যেন আড়াল করে রেখেছে। একটা ঘরের ভাঙ্গা জানালা দিয়ে কেরাসিনের কুপির আলো রাস্তায় এসে পড়েছে। খোলার ঘরের মাটির দেয়ালগুলোতে চুন দিয়ে গাছ, পাখী ও মাছ আঁকা। একটা ঘরে ঢোলকের শব্দ। পথ চলতে চলতে উঝো বলে: শালা বিল্লু ঢোলকটা ফাঁসাবে দেখছি। জানিস্ ও ওটা মেছোবাজারে চুরি করেছিল?

বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে ভিখু বলে: ও শালা আবার বিন্তীকে বে করবে বলে।

উঝো এ-কথায় হঠাৎ যেন কেমন-তর হয়। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে: তুই ঠিক জানিস্?

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।

উঝো একটু গম্ভীর হয়। ভিখু বলে: বিন্তীটা কিন্তু ওকে বে করতে চায় না। ও নাকি খুব কিপ্টে, বিন্তীকে একটা সিকি পয়সাও দেয় না।

—সত্যি?—উঝোর মুখে এবার হাসি ফোটে।

ভিখু এবার উঝোর পিঠে চিম্টি কেটে বলে: তুই বিন্তীকে বে করবি নাকি রে!

উঝো চুপ করে পথ চলে।

ওরা এবার এসে একটা খোলার ঘরের সামনে দাঁড়ায়। দরজায় একটা ধাক্কা দেয় উঝো।

ভেতর থেকে চিঁ চিঁ করে খোনা সুরে কে যেন বলে: দাঁড়া, খুলচি।

কেরাসিন তেলের কুপি হাতে খোনা বুড়ী দরজা খোলে, খোনা সুরে বলে: এত রাত্তির কল্লি যে!

ভিখু বলে: হয়ে গেল রাত।

খোনা বুড়ী বলে: ক'পয়সা উপায় করেছিস, আজ? দে, পয়সা দে।

—আজ আর কিচ্ছু পাই নি মাসী—তুই-ই বরং একটা পয়সা ধার দে, মুড়ি আনি—খিদে পেয়েছে।

—আজ সারাটা দিন কল্লি কি?—বিরক্ত স্বরে খন্ খন্ করে খোনা বুড়ী যেন ধম্‌কে ওঠে।

উত্তর দেওয়া শক্ত। খোনা বুড়ী সবই বোঝে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে ঘরের কোণে শুয়ে পড়ে।

হঠাৎ দরজার কাছে বিন্তী এসে দাঁড়ায়।

উঝো বলে: ভেতরে আয় না বিন্তী।

বিন্তী বলে: এনেছিস্?

ভিখু বলে: কি রে?

বিন্তী বলে: কেন, একপয়সার সাড়ে-বত্রিশ ভাজা! উঝোকে ত বলে দিয়েছিলাম।

উঝো নির্লজ্জের হাসি হেসে বলে: একদম ভুলে গেছি মাইরি। এই তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

চট্ করে একটু সরে গিয়ে বিন্তী বলে: বেশ, তুই না দিস, বিল্লু আমাকে এনে দেবে বলেছে।

উঝো হঠাৎ যেন গরম হয়ে ওঠে, বলে: ফের্ তুই বিল্লুটার সঙ্গে মাখামাখি করেছিস্? ও শালা একটা বদ্‌মাস্—

—বেশ করেছি—তোর তাতে কি?—বিন্তী বেশ রেগেই যেন কথাটা বলে।

—দেখ বিন্তী।—মারমুখো হয়ে উঝো উঠে দাঁড়ায়।

—তোর ভয়ে নাকি?—বিন্তী আঁচলটা কোমরে জড়ায়।

কেরাসিনের কুপির আলোতে বিন্তীকে দেখায় বেশ। বয়স সতের অথবা সাতাশ। রোগা পাকাটে গড়ন। গায়ের রং একটু কটা। তালি-দেওয়া ময়লা ডুরে কাপড় পরনে। চোখ দুটো ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল। সামনের দাঁত একটু উঁচু। কপাল ছোট। সামনের কয়েক গোছা

চুল কপালের উপর এসে পড়েছে। হাতে লাল রংয়ের কাঁচের চুড়ি। মাথার চুল রুক্ষ। সে রুক্ষ চুলে একটা ঢিবি খোঁপা। রাগলে বিস্তীকে দেখায় কিন্তু বেশ। উঝো মুগ্ধ চোখে বিস্তীকে দেখে।

ভিখু দু'জনার রাগ থামিয়ে দেয়, বলে :—এই নে বিস্তী, একটা বিড়ি নে—

বিস্তী একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলে : তোরা চা খাবি ?

—চা ?—অবাক্ হয়ে ভিখু আর উঝো বিস্তীর দিকে চায়।

বিস্তী বলে : বিডন বাগানে আজ সন্ধ্যেয় সাহেবেরা চা তৈরী করে রাস্তার লোকদের অমনি খাওয়াচ্ছিল। ওরা বলছিল, চা না কি খুব পুষ্টিকর। আমি ভিড় ঠেলে একঘটি চেয়ে এনেছি।

—দে, দে, চা দে।—হাসিমুখেই উঝো কথাটা বলে।

দুর্—এ ত একেবারে জল দেখছি। তাও আবার একদম ঠাণ্ডা।

চা ঐ রকম হয়।

কেন, আমি ত রাসের মেলায় সাহেবদের চা খেয়েছি,—সেটা ত বেশ লেগেছিল !

ভিখু বলে : এতে জল ঢেলেছিস্ বুঝি বিস্তী ?

বিস্তী ফিক্ ফিক্ করে হেসে ওঠে।

ভিখু উঝোর দিকে চোখ টিপে বলে : শালী একদম বিচ্ছু রে !

উঝো এবার খোনা বুড়ীকে বলে : "দে মাসী, কি আছে খেতে দে—"

খন্ খন্ করে খোনা বুড়ী বলে : ঘরের কোনে শাল-পাতা চাপা গামলায় কি আছে দেখ—"

ভিখু আর উঝো দেখে চারটে আধভাঙা মাটির গেলাসে ডাল তরকারি, ভাজা মাছ,—একটা গামলায় ভাত। টক্ গন্ধ।

ভিখু খোনা বুড়ীকে বলে : এসব কোথায় পেলি মাসী ?

মল্লিক বাড়ীর দান-ছত্তর থেকে।

দু'জনে খেতে আরম্ভ করে। উঝো বিস্তীকে বলে : "খাবি ? আয়।"

বিস্তী ঠোঁট উলটে বলে : দুর—আমি ও-সব খাই না।

খোনা বুড়ী হেসে বলে : আর এক গামলা ভাত-তরকারি ছিল, বিল্লু আর বিস্তীতে খেয়েছে। ওগুলো তোরা খা।

উঝো বলে : বিল্লুকে ডেকেছিল কে ?

খোনা বুড়ী চোখ পিট্ পিট্ করে হেসে বলে : বিস্তী।

উঝো বেজায় চটে ওঠে, বলে : ফের, বিস্তী ফের্—

রাগে বিস্তীরও মাথা গরম হয়। দরজার চৌকাঠে ডান পা'টা জোরে ঠুকে বিস্তী বলে : বেশ করব বিল্লুকে ডাকব ! আমার খুশী ! তোর তাতে কি রে হতচ্ছাড়া ?

—"দেখ্ বিস্তী !" উঝো রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়।

হঠাৎ এ সময় কোথা থেকে বিল্লু এসে ঘরে ঢোকে, বলে : কি হয়েছে রে বিস্তী ?

বিল্লুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে একটু ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদুনে স্বরে বিস্তী বলে :—"দেখ না, উঝো আমাকে মারতে আসছে !"

—ওরে শালা উঝো !

—ওরে শালা বিল্লু !

খুব এক চোট মারামারি হয়। বিষম মার খেয়ে চিৎপাত হয় পড়ে উঝো ষাঁড়ের মত চেঁচাতে থাকে। বিস্তী হাসে হিঃ হিঃ।

সকলের চোখের সামনে দু'হাত দিয়ে বিল্লুর গলাটা জড়িয়ে ধরে হঠাৎ বিস্তী বলে : তুই এখনি এসে পড়েছিলি তাই, নইলে উঝো আমাকে ঠিক মারত !

বিল্লু কট্‌মট্ করে উঝোর দিকে চেয়ে থাকে। ভিখু বলে : "আঃ, আর কেন, ও কথা ছাড়ান্ দে বিস্তী।"

বিল্লুর হাত ধরে বিস্তী মিটিমিটি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

গভীর রাত্রি। বস্তীর হল্লা থেমে গেছে। শুধু নর্দামার দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে। খোলার চালের উপর বেড়ালের ঝগড়া, তেঁতুলগাছে কাকের চিৎকার। অন্ধকার যেন এখানে-ওখানে তালগোল পাকিয়ে আছে। কোন্-এক বস্তি ঘরের দরমার খোলা দরজাটা বাতাসে মাঝে মাঝে কাৎরে উঠছে। ভিখু ঘুমোয়, উঝো ছট্‌ফট্ করে বিছানায় শুয়ে।

অন্ধকারে কে যেন আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে, তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে উঝোর গায়ে হাত দেয়। উঝো খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলে। মোটা কাঁচের চুড়ি-পরা হাত। উঝো রাগ করে হঠাৎ হাতটা সরিয়ে দেয়।

বিস্তী উঝোর কানের কাছে মুখ রেখে চুপি চুপি বলে : রাগ করেছিস্ উঝো ?

উঝো কথা কয় না।

উঝোর পিঠের উপর হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে বিন্তী বলে : তুই আমাকে হু'চোখে দেখতে পারিস্ না কেন বল্ ত ?

উঝো এবারেও কথা কয় না।

হঠাৎ বিন্তী হু'হাতে উঝোর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে : বিল্লুটা গুণ্ডা, ওকে বড় ভয় করে, তাই। তোকেই আমি ভালবাসি রে !

উঝো এবার উঠে বসে, বিন্তীর হাতটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে বাইরে আসে। তারপর দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বলে : তুই আজ বিল্লুকে দিয়ে আমাকে মার খাওয়ালি কেন ?

বিন্তী বলে : তুই আমাকে খাম্কা মারতে উঠলি কেন ? যাক্, ওসব কথা এখন ছেড়ে দে, এবার তোর সঙ্গে আবার ভাব, কেমন ?

উঝো বলে : আবার কোন্‌দিন হয়ত মার খাওয়াবি।

বিন্তী উঝোর ডান হাতখানা চেপে ধরে বলে : না রে না, তুই যে আমার মনের মানুষ।

উঝো বলে : তবে মাঝে মাঝে বিগড়ে যাস্ কেন ?

বিন্তী বলে : তুই ত সবই বুঝিস্। এবার থেকে দেখে নিস্।

উঝো বলে : এত রাত্তিরে এলি যে !

বিন্তী ফিক করে হেসে বলে : তুই না সেদিন বলেছিলি আমাকে টাকা দিবি সাড়ী কিনতে।

—দোবই ত, কিন্তু এত সাত-তাড়াতাড়ি কিসের ?

—পরশু ভোরে উঠে যে মাহেশে মেলা দেখতে যাব। সেখান থেকে কিনে আনব।

—এখনি কোথায় পাই বল্ ত ?

বিন্তী এবার অভিমানের সুরে বলে : বুঝেছি, তুই আমাকে ভালবাসিস্ না।

উঝো কি যেন ভাবে, তারপর বলে : গোটা টাকা না দিতে পারলে খুচরো পয়সা দিলে নিবি ত ?

হঠাৎ উঝোর গলাটা হু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিন্তী বলে : খু—ব।

—বেশ, তবে কাল নিস্, দিয়ে দোব। বলিস না যেন কাউকে।

—দূর, আমি কি তেমনি মেয়ে !

—আমার গা ছুঁয়ে বল।

খিল খিল করে চাপা হাসি হেসে বিন্তী উঝোকে কাছে টেনে নেয়, তারপর বলে : এই দেখ !

সকাল হ'তেই বস্তীতে খুব গোলমাল। স্যাংড়া সন্তকে কাল রাত্রে কে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। বেচারা ভিক্ষের পয়সাগুলো জমিয়ে রেখেছিল একটা টিনের কৌটায় সেটা তার বিছানার নিচেয় সর্বদা থাকত।

শেষরাত্রে সন্তর গোঙানি অনেকের কানে গেছে। কিন্তু তারা ভেবেছে ঘুমের ঘোরে সন্ত অমন ধারা গোঙাচ্ছে। বস্তীর হালচালই আলাদা, কে কার খবর রাখে।

সন্ত চিৎপাত হয়ে মরে পড়ে আছে দরজার কাছে। ভিড় জমে গেছে ঘরের বাইরে। সকলের মুখেই এক কথা, এখন কি করা যায়।

আহা বেচারা সন্ত। সকলেই খুব দুঃখ করে। অনেক দিনের বাসিন্দা সন্ত এ বস্তীর। তেলিনীপাড়ার চট-কলে ও আর ওর বউ কাজ করত পাঁচ বছর আগে। বৌকে কি একটা রুপোর গয়না গড়িয়ে দেবে বলে সে উপরি খাটত। একদিন রাত্রে কলের চাকায় ওর ডান পা আটকে যায়। হাসপাতালে পা কাটিয়ে তিনমাস পরে বগলে লাঠি লাগিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখে অন্য লোক সে ঘরে বাস করছে। বউটা কোথায় পালিয়ে গেছে বস্তীর মগনলালের সঙ্গে। কেউ বললে কামারহাটি, কেউ বললে শ্রীরামপুর। সন্ত বৌয়ের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে আবার এই বস্তিতেই এসে জুটল। সেই থেকে ভিক্ষে করে পেট চালাত।

সকলে হৈ চৈ করছিল, ট্যারা ছক্কু এসে ধমকে দিলে। বললে : সব চুপ কর্, শেষে কি সকলে পুলিসে যাবি ? ওরকম কত ভিখিরি মরে।

পুলিসের কথা শুনে সকলে সরে পড়তে চায়। ছক্কু বলে : আজ রাতেই একে বাগবাজারের পুলের নিচে, —বুঝলি ?

একটুখানি চুপচাপ। যেন কিছুই হয় নি। হঠাৎ মগনলাল একটা অশ্লীল গান গেয়ে ওঠে। সকলে হেসে উঠে সেখান থেকে সরে যায়।

গভীর রাতে বিন্তী এসে উঝোর গায়ে হাত দেয়, কানের কাছে মুখ রেখে বলে : জেগে আছিস ?

উঝো বলে : হুঁ—

—কাল যে বলেছিলি আজ টাকা দিবি ?

—হুঁ—

—কই দে, নইলে বিল্লু বলেছে ও আমাকে বালিবাজারে তার মাসীর বাড়ী নিয়ে যাবে।

উঝো হঠাৎ উঠে বসে, বলে: বিল্লু শালা কের তোকে ওসব কথা বলেছে?

—রোজই ত বলে, কত সাধাসাধি করে। আমি কান দিই না, তাই। আমি তোকেই ভালবাসি রে উঝো, তোকেই ভালবাসি। কৈ, দে, টাকা দে।

উঝো আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট ভাঁড়ে খুচরো কতকগুলো পয়সা, ডবল পয়সা, আধলা এনে বিন্তীর হাতে দেয়, বলে: এই নে।

বিন্তী বলে: এগুলো কোথায় পেলি বল ত?

উঝো আস্তে আস্তে বলে: পেলাম এক জায়গায়।

—দূর, তুই ত আজ সারাদিন ঘরে কাঁথা চাপা দিয়ে পড়েছিলি, গেলি আবার কোথায়?

উঝো হঠাৎ বিন্তির হাত দুটো চেপে ধরে।

বিন্তি বলে: ছাড়, লাগছে।

উঝো বলে: এখান থেকে দু'জনে পালিয়ে যাই চ। কি বলিস?

—পালিয়ে যাবি কেন রে?—বিন্তী একটু আশ্চর্য হয়ে অদ্ভুত ধরনের চাপা হাসি হেসে ওঠে।

উঝো হঠাৎ যেন চম্‌কে ওঠে।

—কি হ'ল রে?

—ও কিচ্ছু না।

বিন্তী এবার গম্ভীর হয়ে যায়, তারপর আড়ষ্ট স্বরে বলে: এ পয়সাগুলো তুই কোথা থেকে পেয়েছিস, আমি বুঝেছি।

হঠাৎ উঝো দু'হাতে বিন্তীর গলা চেপে ধরে, বলে: চুপ!

বিন্তী ভয় পেয়ে বলে: ছাড়, আমি কাউকে বলব না।

উঝো এবার জোর করে হাসে, বলে: নারে বিন্তী, তোর সঙ্গে ইয়ার্কি—

হঠাৎ বাধা দিয়ে বিন্তী বলে: চললাম উঝো, বড্ড ঘুম পাচ্চে।

পয়সার ভাঁড়টা আঁচলের তলায় লুকিয়ে বিন্তী তখনি একছুটে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

উঝো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ক'দিন ধরে উঝো লক্ষ্য করে বিন্তী যেন কেমনতর হয়ে গেছে। তার কাছে ত ঘেঁষেই না, বরং দেখলেই সরে যায়। বিন্তীর এ ভাব বস্তীর অনেকেই লক্ষ্য করে, আশ্চর্য হয়।

হঠাৎ একদিন বিন্তীকে একলা পেয়ে উঝো তার হাত চেপে ধরে, বলে: তুই আজকাল আমায় দেখে অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস কেন রে?

বিন্তী মৃদু হেসে বলে: দূর, তোকে দেখে পালাব কেন? শরীরটে ভাল নেই, তাই। নে, হাত ছাড়।

—ভাঁড়ের পয়সাগুলো কি কল্লি? সাড়ী কিন্‌লি না?

বিন্তীর মুখ কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ সে খিলখিল করে হেসে ওঠে, বলে: সে পয়সাগুলো সব রেখে দিয়েছি রে। তোর সঙ্গে যাবার আগে সাড়ী কিন্‌ব।

—তবে আজই যাই, চ—

—বাঃ রে, এখানে রাসের সং দেখব না বুঝি?

—ওঃ, ভারি ত সং, কত ত দেখেছিস।

—এবারে যে কেষ্টনগর থেকে নতুন মিস্ত্রি এসেছে—ছাড় উঝো, বেলা অনেক হ'ল।

উঝোর হাত ছাড়িয়ে বিন্তী চলে যায়।

পরদিন সকালেই বিল্লুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল উঝোর। বিল্লুটা হঠাৎ যেন বাবু বনে গেছে। গায়ে নতুন জামা।

উঝো গায়ে পড়ে বিল্লুর সঙ্গে ভাব করে, বলে: বিল্লু ভাই, জামাটা কবে কিন্‌লি?

বিল্লু মুচকে হেসে গোঁফে চাড়া দেয়।

উঝো আবার বলে: টাকা পেলি কোথায়? পকেট মেরেছিস বুঝি?

ঠাস করে উঝোর গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বিল্লু ধমকে ওঠে: তুই শালা নিজে পকেটমার কি না!

গালে হাত বুলুতে বুলুতে উঝো বলে: রাগিস কেন? উঃ, গালে এমন লেগেছে, মাইরি!

বিল্লু আবার গোঁফে চাড়া দিয়ে বলে: কাল বিন্তী আমাকে জামা কিনতে টাকা দিয়েছে।

—বিন্তী?

—হাঁ রে হাঁ, বিন্তী একটা ভাঁড় থেকে পয়সা ঢেলে দিলে আমার হাতে।

উঝো যেন কেমনতর হয়ে যায়। সে হাঁ করে বিল্লুর দিকে চেয়ে থাকে। বিল্লু গট্ গট্ করে বুক চিতিয়ে চলে যায়।

হঠাৎ উঝো কুয়োতলায় বিন্তীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বিন্তী বলে: সর, আমার ভিজে কাপড়!

উঝো রেগে উঠে বলে: তুই ভাঁড়ের পয়সা বিল্লুকে দিয়েছিস?

বিন্তীর মুখ কালো হয়ে যায়, সে ভয়ে ভয়ে বলে: তুই কার কাছে শুনেছিস?

—বিল্লুর কাছে।

ম্লান হাসি হেসে বিন্তী বলে: ও ধার চেয়েছিল, তাই দিয়েছি।

—ও পয়সা তুই দিলি কেন?

বাঃ রে, দিলেই বা, ও-পয়সা ত ও আবার ফেরৎ দেবে।

বস্তীর মাহিন্দরের বউ চাল ধুতে কুয়োতলায় আসছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিন্তীকে লক্ষ্য করে বললে: এখনও পীরিত শেষ হ'ল না বুঝি! যা, যা, ঘরে গিয়ে পীরিত কর্গে যা—কলতলা ছাড়—

বিন্তী সরে এসে উঝোকে চাপাগলায় বলে: কি এখানে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের পয়সা, ভাঁড়ের পয়সা কচ্ছিস—সবাই আঁচ পাবে যে!

উঝো হঠাৎ যেন ভয় পায়, বলে: আচ্ছা, আমি এখন চললাম, তুই কাপড় ছেড়ে আসিস, কথা আছে।

উঝো কিন্তু দু'দিন একদম বিন্তীর দেখা পায় না। মাহিন্দরের বউ বলে: বিন্তী তার মাসীর বাড়ী দর্জিপাড়ায় গেছে।

—দর্জিপাড়ায়?—উঝো অবাক হয়ে যায়।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দর্জিপাড়ায়"—মাহিন্দরের বউ মুচকে মুচকে হাসে।

—কবে গেল?

—সেই যে তোর সঙ্গে যেদিন কুয়োতলায় মস্করা করছিল, সেইদিনই চলে গেছে। বিল্লু তাকে পৌঁছে দিতে গেছে।

—বিল্লু?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তুই যে চোখ কপালে তুললি!—মাহিন্দরের বউয়ের হাসি যেন আর থামে না।

দর্জিপাড়া। পুব-পশ্চিমের বড় নর্দামাটা ডিঙিয়ে পার হয়ে উঝো একটা সরু নোংরা গলিতে ঢোকে।

বিন্তীর মাসীর বাড়ী। দরমা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট উঠোনের চারপাশে ছোট ছোট এঁদো ঘর। একটা ভাপ্সা দুর্গন্ধ। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে সমস্ত বস্তীটায় কাদা। উঠোনের একদিকে খানকতক ইঁট পাতা। তারই ওপর পা দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লোকজন যাতায়াত করে। দুটো নেড়ি-কুত্তার ঝগড়া, কচি ছেলের ককিয়ে কান্না।

উঝোকে হঠাৎ ঘরে উঁকি মারতে দেখে বিন্তীর মাসী বলে: কে রে?

উঝো বলে: বিন্তী আছে?

মাসী বলে: তুই কোন্ মুখপোড়া রে?

উঝো বলে: আমি গরাণহাটার উঝো।

এবার মাসী ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়ায়, ধারালো চোখে একবার উঝোকে দেখে।

বেশ মোটা-সোটা বেঁটে-খাটো কালো কালো মানুষটি এই মাসী। কপালে ও চিবুকে উল্কি, মাথার চুল আধ-পাকা, তাও আবার সব উঠে গেছে। খানিকটা টাক। ঘাড়ের কাছে একটা সুপুরী খোঁপা। মিশি দিয়ে মাজা কালো দাঁত বার করে মাসী বলে: তা তুই হঠাৎ এখানে যে?

উঝো বলে: বিন্তীকে খুঁজতে।

মাসী এবার একগাল হাসি হাসে, বলে: এত খোঁজা-খুঁজি কেন রে? পীরিতের টান বুঝি?

উঝো একটু চটে ওঠে, বলে: আসল কথাটা ঢাকছ কেন মাসী? সোজা উত্তর দাও না—

এবার মাসী বলে: ঢাকাঢাকির আর কি আছে? বিন্তী এখান থেকে চলে গেছে।

—কোথায়?

—কি জানি বাপু, বিল্লু নামে সেই জোয়ান লোকটা সঙ্গে ছিল, তারা যাবে শুনলাম গঙ্গা পেরিয়ে বালি-বাজার।

—বালি বাজার?—উঝো হাঁ করে থাকে।

বিন্তীর মাসী এবার চিবুনো হাসি হেসে বলে: অবাক হয়ে গেলি যে রে ছোঁড়া? তা যাবে না ত কি করবে বাপু? বিল্লু টাকা দেবে, গয়না দেবে,—ভিখিরীগিরি করা ত ওর চলবে না, আর তোর মত ভিখিরীর সঙ্গে থাকাও ওর পোষাবে না,—ঐ যে কথায় বলে—ফুল ফুটলে আবার ভোমরার অভাব কি?—খুব খানিকটা ফিক্ ফিক্ করে হেসে নেয় মাসী।

আশপাশের খুপরী-ঘর থেকে কারা যেন মাসীর রসিকতা শুনে হেসে ওঠে। উঝো বলে: কখন গেল তারা?

—তুই আসবার একটু আগেই,—তারা কাশী মিত্তিরের ঘাট থেকে নৌকো ভাড়া করবে।

উঝো আর দাঁড়ায় না। ছুট, ছুট্। বড় রাস্তায় এসে পড়তেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ছ্যাকড়া গাড়ির বিনুকু গাড়োয়ানের সঙ্গে। বিনুকু যাচ্ছিল বাগবাজার। উঝো লাফিয়ে তাড়াতাড়ি কোচবাক্সে উঠে পড়ে। বিনুকুকে অনুনয়ের সুরে বলে: একটু আগিয়ে দাও চাচা, আমি সামনের মোড়ে নেমে পড়ব।

কাশী মিত্তিরের ঘাটে এসে উঝো চারদিক তাকিয়ে দেখে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়। চালানি নৌকোর ভিড় ত কম নয়। পান্সিও দু'চার খানা আছে, মাঝিরা চেঁচাচ্চে—ওপারে কে যাবে এস, মাথা-পিছু দু'আনা—দু'আনা—

উঝো এবার ঘাটের নিচে নেমে যায়।

একটু আগে জোয়ার এসেছে, জল উঁচুতে উঠেছে। বাতাসে একটা পচানি-পচানি ভাপসা গন্ধ। ঘোলাজলে কত কি যে নোংরা জিনিষ ভাসছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তারই মধ্যে হাত নেড়ে নেড়ে ময়লা সরিয়ে মেয়ে-পুরুষ স্নান করছে। দু'টো নৌকোয় শেওড়াপুলির কলার কাঁদি এসেছে,মুটেরা হাঁটুজলে নেমে সেইসব কলা বইছে। একজন লোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে খুব জোরে জোরে গঙ্গাস্তোত্র আওড়াচ্ছে। রোদে মাঝগঙ্গার জলে ঝিকি-মিকি। জলের কাছাকাছি উড়ন্ত চিলের ছোঁ মারার ভঙ্গি। ঘাটের সিঁড়ির একপাশে কে এক বাবু এসেছেন স্নান করতে। দু'জন চাকর বয়ে এনেছে ফুলেল তেলের শিশি, গামছা, কোঁচান ধুতি আর কলকে-বসানো গড়গড়া।

এ-সব দিকে নজর নেই উঝোর। সে খর-চোখে চারদিক দেখতে সুরু করে। কোথায় বিস্তি আর বিল্লু?

হতাশ হয়ে উঝো কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়। হঠাৎ নজর পড়ে তার একখানা পান্সীর উপর। সেটা তখনি ঘাট থেকে ছেড়ে যাচ্ছে।

ঐ ত! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বিল্লু আর বিস্তীকে। উঝো চেঁচিয়ে ওঠে: নৌকো ফেরাও—নৌকো ফেরাও—ও লোকটা আমার বউ নিয়ে পালাচ্চে!—পুলিস, পুলিস—

ঘাটের লোকেরা হুজুকের সন্ধান পেয়ে জড় হয় সেখানে! নৌকো থেকে বিল্লু আর বিস্তী হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলে: ওটা পাগল, ওর কথা কেউ শুনো না।

উঝো নৌকো ধরবার জন্যে লাফিয়ে জলে নেমে যায়। রামবাগানের ক'জন মেয়েমানুষ স্নান করছিল দল বেঁধে, তাদের গায়ে জলের ঝাপটা লাগতেই তারা চেঁচিয়ে উঠে গালাগাল দেয়। পারের দু'জন ষণ্ডা লোক তেড়ে এসে উঝোকে চেপে ধরে বলে: শালা, পাগলামির আর জায়গা পাও নি—

—ছাড়—ছাড়—আমাকে ছেড়ে দাও—আমি ওদের ধরবই—

লোক দু'জন আরো জোরে চেপে ধরে উঝোকে। উঝো চেঁচিয়ে বলে: ওরা আমার টাকা নিয়ে পালাচ্চে, ওদের আমি খুন করব—আমি খুন করব—

ততক্ষণে লোক দু'জন জল থেকে জোর করে টেনে তুলে এনেছে উঝোকে। ভিড়ও বেশ জমে গেছে। কেউ বলে: এমন পাগলকে কি ছাড়া রাখতে আছে? পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেওয়াই ঠিক।

উঝোর মাথার ভিতরে আগুন জ্বলে। সে আঙুল বাড়িয়ে চিৎকার করে বলে: ছেড়ে দাও,—আমাকে ছেড়ে দাও—ওরা পালাচ্চে ওরা পালাচ্ছে—

—জোর করে সকলে উঝোকে চেপে ধরে।

ধস্তাধস্তিতে কপালের খানিকটা কেটে গেছে উঝোর। তারই ক্ষীণ রক্ত-ধারা নেমে এসেছে তার ডান চোখে। বীভৎস মুখভঙ্গি করে সে চিৎকার করে ওঠে—ওদের ধরো, ওদের ধরো—ওরা আমার টাকা নিয়ে পালাচ্ছে—ওরে! ও যে আমার খুনকরা টাকা রে!

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন ঠাট্টা করে বলে: একেবারে আস্ত পাগল—একবার বলছে বউ নিয়ে পালাচ্ছে—একবার বলছে টাকা নিয়ে পালাচ্ছে!

এ কথায় অনেকেই হেসে ওঠে।

পান্সীটা তখন গঙ্গার বুকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে, এধারে জোয়ারের টানে পড়েছে।

উঝো প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলে বেরোতে চায়, পারে না। মুখ বিকৃত করে কি যেন বলতে যায়,—কথা বেরোয় না, গলাটা শুধু ঘড়ঘড় করে ওঠে। এবারে সে মুখ থুবড়ে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে।

পান্সীটা তখন স্রোতের মুখে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

(ক্রমশঃ)

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১০) সঙ্গীতের দীপশিখা

এক একটি যুগের আসর কোন কোন শিল্পীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে। মুখে মুখে তাঁর নাম-ডাক সঙ্গীত জগতের দূর দূরান্তরে রটিত হতে থাকে। অনেক সময়ে কালান্তরেও এসে পৌঁছে যায় তাঁর খ্যাতির কথা, শ্রুতি-স্মৃতিতে রঞ্জিত হয়ে।

পরবর্তী কালের সঙ্গীত-রসিকের গোচরে আসে—পূর্ব যুগের আসরে এত বড় প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন সেকালের আসরে আর সে জন্যেই তাঁর নাম এসে পড়েছে একালের দরবারে। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর শিল্পী তাঁর সমসাময়িক কালে আর কেউ ছিলেন না। থাকলে তাঁর নাম নিশ্চয় শোনা যেত স্মরণ মননের সূত্র ধরে। যাঁর কীর্তি বেঁচে আছে তিনিই স্মরণীয়।

আগেকার দিনে, সঙ্গীত-ক্ষেত্রের ইতিহাস বা পরিচয় কথা যখন অলিখিত থাকত তখন বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সম্বন্ধে অনেক সময় ওইভাবে ধারণা করা হ'ত।

ইদানীং সঙ্গীত বিষয়ে সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়েছে। সঙ্গীতের শুধু তত্ত্ব কথা নয়—ইতিহাস, সঙ্গীত-শিল্পীদের জীবনী ও অবদান, তাঁদের বিষয়ে স্মৃতিকথা ও রম্য রচনা, সঙ্গীত-সাধকদের সঙ্গীত-চর্চার নানা প্রসঙ্গ। ফলে শিল্পীদের কথা ভাবীকালের পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে মুদ্রিত ও রক্ষিত হয়ে থাকছে। সাহিত্য জগতের 'পাথুরে প্রমাণ'। এই documentary evidence-এর সাহায্যে আগামী দিনের গবেষকেরা অতীতকালকে নতুন করে আবিষ্কার করবেন। বিস্মৃত বিগত যুগ জীবন্ত হয়ে দেখা দেবে নবীন যুগের চোখের সামনে।

যে কাজ সাহিত্য রচনার আগের যুগে করত শ্রুতি-স্মৃতি, এখনকার কালে সাহিত্য অর্থাৎ ছাপানো পুঁথি পুস্তক সেই দায়িত্ব পালন করে থাকে। বই পড়ে আমরা এখন জানতে পারি, আগেকার কালের সঙ্গীত-জগতে কে কেমন গুণী ছিলেন, সে সময়ের শ্রেষ্ঠ গায়ক বলে কার নাম সুপরিচিত ছিল আসরে, ইত্যাদি।

কোন এক সময়ে কেউ যদি শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে সমাদর লাভ করেন তাঁর সে স্বীকৃতি ত আসরেই পাওয়া যাবে! প্রকাশ্য আসর হ'ল সঙ্গীত-ক্ষেত্রের আলোর জগৎ! শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিভা যাঁর আছে আসরের আলোকপাতে তিনি প্রোজ্জ্বল হবেনই সঙ্গীত-সমাজে। আসর থেকেই ত তিনি সঙ্গীত-রসিকদের স্বীকৃতি পাবেন। কথাটাকে ঘুরিয়ে বলতে গেলে, আসরে যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেছেন, তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কারণ শ্রেষ্ঠতর প্রতিভা সে সময়ে আর কারুর থাকলে তিনি নিশ্চয় অবতীর্ণ হতেন আসরে।

আসরে যিনি গুণপনার পরিচয় না দেবেন, সঙ্গীত-জগৎ থেকে তাঁর নাম লুপ্ত হয়ে যাবে। সমসাময়িক কাল তাঁকে চিনবেনা, ভাবীকালও স্মরণ করবে না তাঁকে।

নটের জীবনে যেমন নাট্যমঞ্চের স্থান, সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনে তেমনি আসর। এই পাদপ্রদীপের সামনে আবির্ভূত হবার সুযোগ যিনি লাভ করবেন, তিনিই স্মরণীয়। ভাগ্য-দোষে কিংবা চক্রীদের চক্রান্তে যে ভাবেই হোক এ সুযোগ থেকে যিনি বঞ্চিত হবেন তাঁর সঙ্গীত-জীবন হবে নিষ্প্রদীপ। বৃহত্তর সঙ্গীত-সমাজ তাঁর কথা জানবে না, তাঁর কীর্তিকলাপ ঘোষণা করে সাহিত্য মুখর হয়ে উঠবে না। পরিচিতির জগৎ থেকে, ইতিহাস থেকে তাঁর নির্বাসন।

আসর থেকে যদি কোন গায়ক বা বাদককে অপসারণ করা যায় তা হ'লেই তাঁর সঙ্গীত জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তা তিনি যত বড় প্রতিভাধরই হোন। কারণ তাঁর প্রতিভা প্রকাশের আর কোন মাধ্যম নেই। একথা বিগত যুগের সঙ্গীত-জগতে যে কত সত্য ছিল তা' এখনকার বেতার, 'লং-প্লেয়িং' (long playing) রেকর্ড, অসংখ্য সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদি সুবিধার যুগে ঠিক ধারণা করা কঠিন। সেকালে সমস্ত প্রচার নির্ভর করত আসরের ওপর এবং সে আসরের পরিধি ছিল যেমন সীমিত তাদের সংখ্যাও ছিল তেমনি মুষ্টিমেয়।

প্রতিভা প্রকাশের সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা

অনেক সময়ে অতি তীব্র হ'ত। কোন বড় আসরে জয়-পরাজয়ের ওপর শিল্পীদের ভাগ্য বা সঙ্গীত-জীবনের সার্থকতা নির্ভর করত অনেকখানি। একবার কোন বড় আসরে কেউ অপদস্থ হ'লে তার জের অনেক দূর পর্যন্ত চলত। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পীকে এজন্যে বিদায় গ্রহণ করতে হ'ত সঙ্গীত-জগৎ থেকে।

সে যুগের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে যাঁরা ধুরন্ধর তাঁদের এই তত্ত্ব বিলক্ষণ জানা ছিল। তাই প্রতিপক্ষীয়দের চক্রান্ত নানা ভাবে কাজ করত আসরে। সঙ্গীতের আসর হয়ে উঠত দলাদলির আখড়া।

অনেক সময়ে সেসব চক্রান্ত নেপথ্যে ঘটত। তবে তার ফলাফল দেখা যেত প্রকাশ্য আসরে। দু'জন বা দু'দলের মধ্যে আসরে যে প্রতিযোগিতা দেখা গেল, তা যে আরম্ভ হয়েছে ব্যক্তিগত রেষারেষি কিংবা কোন অসাঙ্গীতিক কারণ থেকে, তা আসরের শ্রোতারা মানতে পারত না।

কখনো এমন হয়েছে যে, দু'জন বহু প্রসিদ্ধ শিল্পীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে একজন সঙ্গীতের আসর থেকে, এমন কি প্রায় সঙ্গীত-জগৎ থেকেও বিদায় নিয়েছেন। আর যিনি বিদায় নিয়ে গেছেন তাঁকে মনে করা হয়েছে—পরাজিত। কিছুদিন পরে লোকে তাঁর নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে। তিনি তলিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। আর তাঁর প্রতিযোগী তার পরে আসরে আসরে সম্মান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে সম্মান লাভ করেছেন তিনি। তাঁর নাম সেইভাবে গ্রন্থাদিতেও লিখিত হয়ে গেছে। শ্রুতি-স্মৃতির সূত্র থেকে তিনি ইতিহাসে স্থায়ী স্থান লাভ করেছেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে। তাঁর কীর্তিকথা আগামী দিনেও মুখরিত থাকবে।

আর যিনি আসর থেকে অবসর নিয়েছেন কোন শক্তিশালী চক্রান্তের ফলে, সাঙ্গীতিক অযোগ্যতার জন্য নয়—তাঁর নাম ইতিহাস থেকে, সুতরাং স্মরণ-মননের জগৎ থেকে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তিনি অধিকতর প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও। সংসার অনেক সময় স্থূল বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়, মানুষের বিচার হয় স্থূল ভাবে, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি সাধারণের মধ্যে অনেক সময়েই থাকে না এবং সংসারে সাধারণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। একবার একটা ব্যাপার ঘটনা হয়ে গেলে লোকে সেটাকে নির্বিচারে শুধু মেনেই নেয় না, আরো হৈ হৈ শব্দে তাকে প্রচার মহিমা দান করে সমালোচনার অতীত করে দেয়। পরবর্তী-কালের দরবারেও সে চীৎকারের রেশ ভেসে আসে আর গণ-দেবতারা বুঝে নেয় 'সত্য'-কে। যা রটে, তা-ই সত্য বটে!

সংসারের এই সাধারণ মতিগতি সঙ্গীতের আসরেও লক্ষ্য করা গেছে, কারণ এইসব মানুষ ত সঙ্গীত-জগতেও বিচরণ করে। সঙ্গীতজ্ঞ মহল ত স্বর্গ থেকে আমদানি হয় নি!

তবে সব সময়ে নয়, কোন কোন সময়ে এইরকম মনোভাব কার্যকর হবার সুযোগ পেয়েছে। তাই রক্ষা। নচেৎ সংসারে খাঁটি মানুষের টিঁকে থাকা যেমন অসম্ভব হ'ত, তেমনি আসরেও যথার্থ সুর-সাধক কিংবা মর্মজ্ঞ শ্রোতারা ঠাঁই পেতেন না। মানুষের শুভবুদ্ধি বেশির ভাগ সময়েই রক্ষা করেছে সত্য ও শ্রেষ্ঠের মর্যাদাকে।

তাই দেখা যায়, যিনি কোন যুগের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তিনি সঙ্গীত-জগতের শ্রুতিস্মৃতিতে অনেক সময়ে সেই ভাবেই সম্মানিত ও কীর্তিত থেকেছেন।

এ নিয়মের ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে এবং তেমনি একটি দৃষ্টান্তই এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু। কোন একটি সময়ে একজন শিল্পী অদ্বিতীয় বলে সমাদৃত হয়েছেন আসরে এবং শ্রুতিস্মৃতিতেও সে আসর অধিকার করে আছেন। অথচ তাঁরই সমসাময়িক শ্রেষ্ঠতর প্রতিভা অপরিচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন পাদপ্রদীপের অভাবে, দলীয় চক্রান্তে আসর থেকে অবসর নেওয়ার জন্যে। আসরের মাধ্যমে সাধারণ্যে তিনি গুণপনার পরিচয় দীর্ঘকাল ধরে দেবার সুযোগ না পাওয়ায় অধিকতর গুণী হওয়া সত্ত্বেও সুরজগতের শ্রুতিস্মৃতি থেকে নির্বাসিত হয়ে গেলেন। কেউ একবার বিচার-বিবেচনা করে দেখলে না—শ্রেষ্ঠতর প্রতিভার অধিকারী কে?

যাঁরা চক্রান্ত ক'রে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে সঙ্গীত-জগৎ থেকে প্রায় অবসর নিতে বাধ্য করলেন, তাঁদের বিবেকে বাধল না যে, মাত্র অসূয়া পরবশ হয়ে এতবড় এবং শান্তিপ্রিয় এক গুণীর সঙ্গে শত্রুতা বাধালেন কেন? এঁদের গোষ্ঠীর মুখপাত্র শিল্পী তাঁর তুলনায় অপকৃষ্ট, এই কি তাঁর অপরাধ? এঁদের পৃষ্ঠপোষিত গায়ক তাঁর প্রগাঢ় ও পরিশীলিত সঙ্গীতবিদ্যার হিসাবে অতি অল্প বিদ্যার কারবারী প্রমাণিত হয়েছেন, এই কি তাঁর পাপ?

দলীয় গায়কের প্রাধান্য সৃষ্টি করবার জন্যে যোগ্যতর শিল্পীকে আসর থেকে উচ্ছেদ করবার চক্রান্ত কোন্

শ্রেণীর সঙ্গীতপ্রেমের পরিচয়? নিতান্ত অকারণে এক সুর-সাধকের জীবনে বিপর্যয় ঘটালেন যাঁরা, তাঁদের অপরাধের মার্জনা কোথায়? শিল্পের ওপরে নিজেদের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীকে, শিল্পীর ওপরে দলীয় প্রাধান্যকে, সাধনার ওপরে অল্পবিদ্যার চমক ও চটককে স্থাপন করে তাঁরা এক কলঙ্কের ভাগী হয়ে রইলেন! তাঁদের সঙ্গীত-প্রেম কলুষিত হ'ল এই অপকর্মের জন্যে।

তাঁদের ষড়যন্ত্রের ফলে এক মহৎ গুণী কলকাতার আসরে প্রতিষ্ঠায় জলাঞ্জলি দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম লুপ্ত হয়ে গেল বৃহত্তর সঙ্গীত-জগৎ থেকে। আর উচ্চকিত ঘোষণায় যাঁকে সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ গায়ক বলে পরিচিত করা হ'ল তাঁর অল্প পুঁজির কথা তাঁদের নিজেদেরই জানা ছিল সবচেয়ে বেশী! সেই অল্পবিদ্যার সঙ্কীর্ণ শক্তি নিয়ে তিনি কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রথমোক্তের সামনে শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে অসমর্থ হবেন বুঝেই চক্রান্তের আশ্রয় তাঁদের নিতে হয়েছিল। সুস্থ প্রতিযোগিতার পথে অগ্রসর হতে পারেন নি তাঁরা। দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে সুর-জগতের রসপ্রত্যয় দেখাতে সক্ষম হন নি। অ-শিল্পী জনোচিত আচরণ করে চূড়ান্ত ক্ষতি করেছেন একজন নিরীহ ও উচ্চশ্রেণীর গুণীর। সঙ্গীতের সংবেদনের চেয়ে গোষ্ঠীগত প্রয়োজন তাঁদের কাছে অনেক বড় বলে বোধ হয়েছে।

এসব কথায় আর বেশি কাজ নেই। এখন আসল গল্পের সন্ধান নেওয়া যাক।

এই গল্পটির সূত্রে প্রথমেই আসে জগদ্দীপ মিশ্রের নাম। তিনিই এই বিয়োগান্ত নাটিকাটির নায়ক।

বারাণসীর অনন্য সঙ্গীত-প্রতীভা জগদ্দীপ। তখনকার সঙ্গীত-জগতের প্রোজ্জ্বল দীপশিখা। সুর-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালকে আলোকে উদ্ভাসিত করে শ্রুতিস্মৃতির রাজ্যেও অনির্বাণ থাকবার মতন দীপ্তি তাঁর প্রতিভার ছিল।

অথচ তাঁর নাম আজ সুরের জগতে প্রায়-বিস্মৃত বলা যায়। আসরের শ্রোতৃ সাধারণের কাছে সে নাম একেবারে অপরিচিত। বিগত যুগের নানা প্রতিভা-বানের পরিচয়-কথা কিংবা অন্তত তাঁদের নামগুলি স্মরণের সরণি বেয়ে এখনকার সঙ্গীত-সমাজে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু এত বড় এবং এসব বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা—যা তাঁর সমসাময়িক কালের উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিল—তার নামটি পর্যন্ত বহন করে আনতে পারে নি এ যুগের আসরে।

তাঁর স্মৃতির এই অবলোপের কারণ প্রবন্ধের প্রথম দিকে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসিদ্ধির পাদপ্রদীপের সামনে থেকে, মুগ্ধ শ্রোতাদের আসর থেকে তাঁর অকাল বিদায়। প্রতিভার পরিপূর্ণ সমৃদ্ধির সময়েই তিনি অবসর নেন আলোর মঞ্চ থেকে। এবং তাঁর নাম পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায় মহাকালের অন্ধকারে।

আসর থেকে তাঁর বিদায় নেবার পর প্রায় পঞ্চান্ন বছর পার হয়ে গেছে। তাঁকে যাঁরা দেখেছিলেন কিংবা তাঁর গান আসরে শুনেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সকরুণ উপসংহারের কথা জানতেন তাঁদের মধ্যে জীবিত আছেন মাত্র ক'জন প্রাচীন ব্যক্তি। তাঁদের পরে জগদ্দীপের নাম জানা আর কারুর অস্তিত্ব থাকবে না।

অথচ ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নাম চিরকালের স্মরণযোগ্য। যে সময়ে তাঁর সঙ্গীতজীবন—উনিশ শতকের শেষ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দশক, তখন উত্তর ভারতে বহু প্রতিভাশালী গায়কের আবির্ভাব হয়েছিল। বলতে গেলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এত প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-প্রতিভা ভারতবর্ষ লাভ করেছিল তার তুলনা এ দেশের অন্য কোন ঐতিহাসিক কালে বেশি পাওয়া যায় না। তবু সেই সৃষ্টি-প্রাচুর্যের কালেও জগদ্দীপ মিশ্র ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এই স্বীকৃতি তাঁর প্রতি-পক্ষের কাছেও পাওয়া যায়। সুতরাং ধারণা করা যেতে পারে কি অনন্য প্রতিভার আধার তিনি ছিলেন।

সে যুগে এবং অন্য সময়েও এমন শিল্পীর দর্শন কদাচিৎ পাওয়া গেছে, যিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি কণ্ঠ-সঙ্গীতের এই চার অঙ্গেই পারদর্শী। ভারতীয় সঙ্গীতের বিস্তার ও গভীরতা এত বেশী যে এ ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভা দুর্লভ দেখা যায়। রাগসঙ্গীতের প্রত্যেক অঙ্গ এমন বিশিষ্ট এবং এমন একান্ত সাধনা-সাপেক্ষ যে, প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর গুণীরাই এক একটি অঙ্গে বিশেষজ্ঞ, খুব বেশি ত দু'টি অঙ্গে—খেয়াল ও ঠুংরিতে। চারটি অঙ্গের জন্যে। গীতশিল্পীদের আলাদা রকমের মেজাজ, এমন কি সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। সেজন্যে অনেকে বিভিন্ন অঙ্গের চর্চা ঘরে করলেও বা ছাত্রদের শিক্ষা দিলেও আসরে প্রদর্শন করতে অভ্যস্ত নন।

অন্তত খেয়াল-ঠুংরির চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই নয়। খেয়াল-ঠুংরিও আজকালকার আসরে যত বেশি গায়ক-গায়িকা গেয়ে থাকেন, সেকালে তত ছিল না—এই দুই অঙ্গও আসরে সাধারণত পৃথক শিল্পীরা পরিবেশন করতেন।

কিন্তু জগদীপ মিশ্র এই দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যে, আসরে ওই চারটির যে কোন অঙ্গে গানের ফরমায়েস হ'ত, কিংবা যে ধরনের আসরে গানের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হতেন—তিনি পরিবেশন করতেন অনুরূপ প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত। চার অঙ্গেই তাঁর রীতিমত সাধনা ছিল, অশিক্ষিত পটুত্ব নয়। উপরন্তু সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সহজাত সংস্কার তাঁর সঙ্গীত-সত্তার মূলে ছিল।

প্রতিভা, পরিবেশ ও সাধনকৃতির সুবর্ণ ফল বারাণসীর জগদীপ মিশ্র। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কয়েকজন ভারতের শীর্ষস্থানীয় গুণীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

কাশীর বিখ্যাত প্রসদ্দু মনোহর (মনোহর ও হরিপ্রসাদ মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গীত-সাধনার জন্যে কীর্তিত) ঘরাণার (মিশ্র ধরাণা) রামকুমার ও তাঁর পুত্র লছমী ওস্তাদ এবং সুপরিচিত বেতিয়া ঘরাণার শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র ভ্রাতারা ছিলেন জগদীপের আত্মীয়।

প্রথম জীবনে তিনি বারাণসীতেই বাস করেন। যতদূর জানা যায়, তাঁর সঙ্গীতশিক্ষাও অনেকখানি সেইখানে। কিন্তু সঠিক জানা যায় নি কোন্ কোন্ কলাবতের অধীনে তিনি বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করেন কিংবা তাঁর স্বোপার্জন কতখানি।

শুধু একথা জানা যায় যে, তিনি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন। আগেই সমাপ্ত হয়েছিল সাধনার পর্ব।

কলকাতায় যখন আসেন তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত গুণী। শিক্ষার পাকা ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গীত-জীবন গঠিত। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি চার অঙ্গেই রীতিমত পারদর্শী।

উপরন্তু নৃত্যবিদ্। কত্থক নৃত্যের কলা-কৌশল ও ভাব প্রদর্শনে (ভাও বাৎলানা) অভিজ্ঞ। আসরে নৃত্য পরিবেশন করেন না বটে, কিন্তু নৃত্য-বিদ্যা নিপুণভাবে শিক্ষা দিতে পারেন। অনুরাগীদের অনুরোধে মুখ-চোখ ও ভ্রূবিলাস সমন্বয়ে অপরূপ ভাও বাৎলান ঘরোয়াভাবে। নৃত্য-শিল্পের সদৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করেন। এমনিভাবে পরিচয় দেন তৌর্যত্রিক বিষয়ে নিজের শিল্প মানসের।

সব মিলিয়ে জগদীপ মিশ্র এক দুর্লভ সঙ্গীত-প্রতিভা। গানের আসরে শ্রোতারা শুধু তাঁর পটুত্বে মুগ্ধ হতেন না, তাঁর সুকণ্ঠেও আকৃষ্ট হতেন। খুব ভাল আওয়াজ ছিল জগদীপের গলায়।

ঈষৎ খর্বাকৃতি হ'লেও তিনি সুপুরুষ ছিলেন। অতি সৌখীন পশ্চিমা পোশাকে শোভমান। পাগড়ি ও বেশ-ভূষার পারিপাট্যে নয়নদর্শন। রূপবানও। গৌরবর্ণ, দীর্ঘায়ত চক্ষু, সংযুক্ত বঙ্কিম ভ্রূ-যুগল। দৃষ্টিতে শিল্পী-প্রাণের স্বপ্নময়তা।...

গায়করূপে একজন যথার্থ শিল্পী মিশ্রজী। মনে-প্রাণে শিল্পী। স্পর্শকাতর, অভিমানী, শান্তিপ্রিয়। নির্বিরোধী এবং নিরাবিল পরিবেশে সঙ্গীত-চর্চায় অভিলাষী। দঙ্গল বা দলাদলিতে তাঁর মর্ম বিদীর্ণ হয়। সযত্নে পরিহার করে চলেন কলহ-বিবাদের সমস্ত সম্ভাবনা।

কলকাতায় পদার্পণের আগে কিছুকাল নেপাল দরবারে অবস্থান করেন। গুণী হিসেবে বিশেষ সম্মান ও সমাদর পান সেখানে।

কিন্তু বেশিদিন তখন নেপালে থাকেন নি। কি কারণে সেখান থেকে কলকাতার বিরাটতর সঙ্গীতক্ষেত্রে চলে আসেন, তা জানা যায় নি। কলকাতায় তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, সে কারণেও হ'তে পারে। কিংবা এখানকার ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রতিভার অধিকতর স্ফূর্তি লাভের আশায়, অথবা কোন অনুরাগীর আমন্ত্রণেও আসতে পারেন কলকাতায়।

কলকাতা তখনও ভারতের রাজধানী। রাষ্ট্রীয়ভাবে শুধু নয়, সঙ্গীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিষয়েও। সঙ্গীতের এত আসর এবং এত অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ভারতবর্ষের অন্য অনেক সঙ্গীত-কেন্দ্রেই দেখা যায় নি। তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমা গুণীদের আগমন ঘটতে থাকে এখানে। আজও এই প্রক্রিয়ার ধারা রুদ্ধ হয় নি, যদিও কলকাতা থেকে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল রাজধানী স্থানান্তরিত।

বর্তমান শতকের প্রথম দশকেও এখানে পশ্চিমাঞ্চলের কলাবতদের অনেককে স্থায়ীভাবে বাস করতে দেখা গেছে। অনুরাগী কিংবা আত্মীয়দের পরামর্শে জগদীপ মিশ্রের সে উদ্দেশ্যেও আগমন হ'তে পারে কলকাতা শহরে।

কলকাতায় এসে তিনি উত্তরাঞ্চলে বাস করতে লাগলেন। কলকাতার মধ্যে এইদিকেই তখনও সঙ্গীত-

চর্চার আধিক্য এবং পশ্চিমা গুণীদেরও বাস। এই ধারা উনিশ শতক থেকেই চলে এসেছে।

কলকাতায় জগদীপ কতদিন বাস করেছিলেন তা জানা যায় না। এখানে তাঁর শিষ্যগঠন সম্ভবত বেশি হয় নি বা সে সুযোগ বেশি পান নি তিনি। তবে প্রসিদ্ধা কলাবতী যাদুমণি তাঁর শিষ্যা হয়েছিলেন, জানা যায়। 'ছন্দহারা' অধ্যায়ে সে কথা বলা হয়েছে, পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকতে পারে।

জগদীপের এখানকার সঙ্গীত-জীবনের কথায় ছুলি-চাঁদের প্রসঙ্গ প্রথমে উল্লেখ করবার আছে। কারণ তিনিই ছিলেন মিশ্রজীর বড় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর বাড়ীর জলসায় জগদীপের গান বেশি হ'ত। আর সেখানেই হয়েছিল তাঁর শেষ আসর। ছুলিচাঁদের জলসায় জগদীপের গান যদি তখন না হ'ত, তা হ'লে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের ওই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতে পারত না।

আর সে ব্যাপারে কিন্তু নৈতিক দায়িত্বও ছিল ছুলি-চাঁদের। শুধু তাঁর বাড়ীর আসর বলেই নয়। বিবেক এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নও ছিল। অবশ্য এ প্রশ্ন দিয়ে যেমন সংসারের তেমনি আসরের সব সমস্যার বিচার বিবেচনা হয় না। দল বা গোষ্ঠীর এক একটা চক্রে হৈ হৈ করে এক একটা কাণ্ড ঘটে যায় আর সবাই বা বেশির ভাগ লোক মেনে নেয় ব্যাপারটা।

কিন্তু তবু মনে হয়, ছুলিচাঁদ যদি মেরুদণ্ডহীন না হয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হ'তেন, তা হ'লে হয়ত এমনটা হ'তে পারত না। প্রচুর অর্থব্যয়ে সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে তিনি মান্যগণ্য ছিলেন তখনকার কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে। বহু গুণীই তাঁর কাছে উপকৃত।

তিনি একটা ন্যায্য কথা যদি জোর দিয়ে সে সময়ে বিবদমান দলকে জানাতে পারতেন, তাঁদের পক্ষে অমান্য করা সম্ভব হ'ত না। কিংবা তাঁরা তাঁর মধ্যস্থতা অস্বীকার করলেও, জগদীপের মনের গ্লানি অন্তত দূর করতে পারতেন, তাঁকে সঙ্গীত-জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখতেন তিনি।

এত বড় একজন শিল্পীর অকালে সঙ্গীত-জীবন থেকে একরকম অবসর নেওয়া বন্ধ করা যেত ছুলিচাঁদ দৃঢ়চিত্ত হ'লে। কিন্তু সেসব ঘটনা বর্ণনা করবার আগে তাঁর সঙ্গীত-বিলাসের কথা আরও কিছু জানাবার আছে।

জাতিতে মাড়োয়ারি। কিন্তু কলকাতাকেই দেশঘর করে নিয়েছিলেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। রুজি-রোজগার সবই এখানে।

সেকালের এক typical 'কাপ্তেন' ছিলেন ছুলিচাঁদ। সঙ্গীতপ্রেমী, মহা শখ্‌দার, ভোগী এবং মুক্ত হস্ত।

তাঁর স্বজাতীয় বণিককুলের মধ্যে দু' শ্রেণীর দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। অর্থগৃধ্নু এবং অপরিমিত ব্যয়ী। শেষো-ক্তরা তুলনায় সংখ্যাল্প। দু' শ্রেণীরই অর্থোপার্জনে দক্ষতা থাকলেও ফলশ্রুতি ভিন্ন প্রকারের। ছুলিচাঁদ শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন।

পাটের কারবার ছিল। তাতে যেমন প্রচুর আয় করতেন, ব্যয়ও তেমনি। সেই খরচের একটি বড় খাত হ'ল—সঙ্গীতক্ষেত্র। তা ছাড়া, ভোগ ও শখের আরও নানা উপকরণও ছিল।

দমদমা অঞ্চলে দমদম রোডের ধারে বাগান-ঘেরা প্রকাণ্ড তাঁর বাড়ী। সুসজ্জিত অট্টালিকা। তার সর্বাঙ্গে গৃহস্বামীর স্বচ্ছলতার প্রকাশ।

তাঁর বাগান বা বাড়ীর অন্যান্য অংশের বর্ণনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এ অধ্যায়ের প্রধান ঘটনার সঙ্গে কিংবা জগদীপের আসরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে শুধু জলসা-ঘরটির। এখানেই তিনি অনেক আসর মাৎ করেছিলেন আর এখানকার আসরে শেষ গেয়েই সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে একরকম অবসর নিয়ে চলে যান।

বাড়ীর দোতলায় ছুলিচাঁদের সেই গান-বাজনার প্রশস্ত হল। সে জলসাঘরে ঢোকবার আগে, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে প্রশস্ত অলিন্দ পার হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায় অনভ্যস্ত শ্রোতারা। সামনেই ছুলিচাঁদের শখ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক রূপকথার গাছটি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। গাছের সঙ্গে আরও নানা সরঞ্জাম।

গোলাপ জলের একটি নাতি-বৃহৎ ফোয়ারা। তারই অঝোর ধারার নীচে আলোর ঝিকিমিকির মধ্যে স্বপ্ন-জগতের সেই কল্পতরুটির অপূর্ব শোভা।

তরুর কাণ্ড ও শাখা সবই রৌপ্যে রচনা। রূপালি ডাল থেকে আলম্বিত আছে সোনার ফুল। ফলগুলি মণি মুক্তা জহরতের। সেই ধাতব কাণ্ড শাখা ফুল ফল জলচূর্ণের প্রতিফলিত আলোয় ঝলমল করছে। এক অপরূপ বর্ণালী এবং সুবাসিত পরিবেশ।

অতি সুগন্ধী বাষ্পে ভরে উঠেছে গোলাপ জলের ফোয়ারা। নিমন্ত্রিতেরা সেখান দিয়ে জলসাঘরে যাবার সময় সেই সুমিষ্ট গোলাপ জলে রুমাল ভিজিয়ে নিচ্ছেন। শরীর মন পুলকিত হয়ে উঠছে সেই পরম রমণীয়তায়।…

তারপর তাঁর জলসাও হ'ত উচ্চশ্রেণীর। প্রতি শনিবার নিয়মিত। সেকালের হিসেবে দরাজ দক্ষিণার ব্যবস্থায় বড় বড় ওস্তাদ ও বাঈজীদের সঙ্গীতে আসর মুখর হয়ে থাকত গভীর রাত পর্যন্ত।

গায়ক-বাদকদের ছুলিচাঁদ মুজ্‌রো দিতেন যেমন তাঁদের সঙ্গে কথা হয়ে থাকে। অনেক সময় তার সঙ্গে উপরন্তু উপহার থাকত পাগড়ি কিংবা দোপাট্টা।

কিন্তু বাঈজীদের বেলা আলাদা বন্দোবস্ত। তাঁদের তিনি নিজস্ব ধরনে দক্ষিণা দিতেন। নির্দিষ্ট মুজ্‌রো ভিন্ন আরও একটি বিশেষ উপহার।

তাঁর একটি থলিতে অনেক রকমের আংটি রাখা থাকত। কম দামী ঝুটো মুক্তো আর অন্যান্য পাথরের থেকে আরম্ভ করে আসল মুক্তো, বহুমূল্য হীরের আংটিও।

যে বাঈজীর নৃত্যগীত বেশি ভাল লাগত, তাঁর সামনে ছুলিচাঁদ সেই থলির মুখ খুলে দিয়ে আংটি সব ঢেলে দিতেন। বলতেন—বেছে নাও, যে আংটি তোমার পছন্দ।

বাঈজী বখশিসস্বরূপ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতন একটি আংটি তার থেকে নিতেন।

এও ছিল ছুলিচাঁদের এক প্রিয় সখ।

প্রতি শনিবারের আসর ছাড়া অন্য কলাবতদেরও আসর বসত তাঁর জলসাঘরে। মুজরো দিয়ে যাঁদের আনতেন, তাঁরা ছাড়া তাঁর বাড়ীতে নিয়মিত বরাদ্দে অন্য ওস্তাদও নিযুক্ত থাকতেন। তাঁদের অনুষ্ঠানও হ'ত মাঝে মাঝে।

স্বনামধন্য ঠুংরির ওস্তাদ গণপৎ রাওকে তিনি অনুগত শিষ্যের মতন সেবাযত্ন করতেন, ওস্তাদজী কলকাতায় এলে। ছুলিচাঁদ নিজে সঙ্গীতচর্চা তেমন ভাবে না করলেও নিয়মিত সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর দিন কাটত এবং গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব)-কে অনেকে তাঁর সঙ্গীত-গুরু বলে মানত।

তারাবাঈ নামে একটি রক্ষিতাকে নিয়ে ছুলিচাঁদ দমদমার সেই বাড়ীতে বাস করতেন এবং তারাবাঈয়ের রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত রাখতেন উচ্চশ্রেণীর ওস্তাদ।

এই সূত্রেই তাঁর বাড়ীতে এসে বাস করেছিলেন বিখ্যাত গুণী বাদল খাঁ। এখানে আসবার অনেক বছর আগে খাঁ সাহেব নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারে নিযুক্ত থেকে প্রথম কলকাতায় অবস্থান করেন। কিন্তু সেবারে তাঁর কলকাতা বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিছুকাল পরেই ফিরে গিয়েছিলেন পশ্চিমে।

এবারে ছুলিচাঁদের আমন্ত্রণে যখন তাঁর বাড়ীতে নিযুক্ত হয়ে এলেন তখন খাঁ সাহেবের বয়স প্রায় ৮০ বছর। এ যাত্রায় জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত, ২০ বছরেরও বেশি কলকাতায় রইলেন। ছুলিচাঁদের বাড়ী বরাবর নয়, প্রথম ক'বছর মাত্র। কিন্তু ছুলিচাঁদের জন্যেই বাদল খাঁর এবারকার কলকাতা বাস আরম্ভ হয়।

ছুলিচাঁদবাবুর দমদমার সেই বাগানবাড়ী হস্তান্তরিত হয়ে তাঁর জলসার আলো যখন নিভে যায় তখন বাদল খাঁকে লাভ করে উপকৃত হয় কলকাতা তথা বাংলার সঙ্গীত-সমাজ। এবং এখানকার কয়েকজন প্রতিভাবান ও নেতৃস্থানীয় গায়ক তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন, যদিও অন্য গুণীর শিক্ষা তাঁরা আগেও পেয়েছিলেন। যথা—গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জমিরুদ্দিন খাঁ, শচীন্দ্রনাথ দাস ও আরও অনেকে। সেসব অন্য প্রসঙ্গ।

ছুলিচাঁদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। এত ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করেও তাঁর মনে একটা নিরাসক্তির ভাবও ছিল। এত সাধের আসর সমেত অট্টালিকাটির শেষরক্ষা করতে পারেন নি তিনি। সবই বিপরীত স্রোতে ভেসে যায়। প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু মন ভাঙ্গে নি আদৌ। তাই দেখা যায়, কিছুদিন পরে সেই বাগানবাড়ীর নতুন মালিক যখন তাঁকে আবার সেখানকারই আসরে নিমন্ত্রণ করেন, ছুলিচাঁদ অন্যান্য শ্রোতাদের মধ্যে বসে গান শুনছেন সেই জলসাঘরে। মনে তিলমাত্র বিকার নেই। যেন পরিবর্তন কিছুই হয় নি। অনেকটা হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের মতন মোহমুক্ত মন বলা যায়। এসব অবশ্য আমাদের মূল প্রসঙ্গের অনেক পরের কথা।

জগদীপ মিশ্রের আসর যখন সেখানে হ'ত, তখন তার মালিক ছিলেন ছুলিচাঁদ এবং তখন তাঁর খুব ধুমধামের অবস্থা

প্রতি শনিবারের বাঁধা আসর। তা ছাড়া অন্য দিনেও মাঝে মাঝে জলসা বসে। বাড়ীতে নিযুক্ত কোন গুণী কিংবা পশ্চিমাগত কোন কলাবত যোগ দেন সে আসরে। গোলাপজলের ফোয়ারায় আলো ঝলমল

রূপো গাছে সোনার ফুল মণি মুক্তার ফলের সামনেকার জলসাঘর সুর ছন্দে মুখর হয়ে ওঠে।

সেসব আসরে তখন জগদীপ মিশ্রের প্রতিভার দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে নিত্য নতুন করে। গুণবান ও রূপবান শিল্পী ছুলিচাঁদের আসরের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করেন। ছুলিচাঁদই তখন তাঁর শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

জগদীপের সঙ্গীত-প্রতিভার পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। তাঁর তখনকার বয়স সঠিক জানা যায় নি, তবে ৩৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে ছিল জানা গেছে। তিনি সে সময় বাস করতেন জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বলরাম দে ষ্ট্রীটের একটি বাসাবাড়ীতে।

বারাণসীর মিশ্র ঘরাণার নাম আগেই করা হয়েছে জগদীপের আত্মীয়তা সূত্রে। এই ঘরাণার রামকুমার মিশ্র ও পরে তাঁর পুত্র লছমীপ্রসাদ মিশ্র এবং আরও কয়েকজন বলরাম দে ষ্ট্রীটের বাসায় থেকেছেন। জগদীশও তাঁর আত্মীয় মিশ্রদের সঙ্গে তখন বাস করতেন সেখানে।

তখনকার কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে জগদীপ্ মিশ্র যখন এক দুর্লভ প্রতিভা বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন, এমন সময় বারাণসীরই আর এক প্রতিভাধর গায়কের এখানকার আসরে আবির্ভাব হ'ল।

তিনি সেকালের সঙ্গীত-জগতের আর একটি বিস্ময়। নাম মৌজুদ্দিন। খেয়াল ও ঠুংরি গায়ক। অসামান্য কণ্ঠসম্পদের অধিকারী এবং শ্রুতিধর প্রতিভা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মৌজুদ্দিনের সঙ্গীতকৃতি ও সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। সঙ্গীতরসিক ও সঙ্গীততাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয় অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় মৌজুদ্দিনকে অমররূপে চিত্রিত করে রেখেছেন 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থে।

এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকারা চমৎকৃত হয়ে জেনেছেন যে, মৌজুদ্দিনের প্রতিভা ছিল অলৌকিক এবং তিনি বিনা সাধনায় খেয়াল গানে এমন তান-কৃতিত্ব প্রদর্শন করতেন, সমসাময়িককালে সমগ্র হিন্দুস্থানে যার তুলনা ছিল না। বইটি থেকে তাঁরা মৌজুদ্দিনের পরমাশ্চর্য পরিচয় এইভাবে পেয়েছেন—'সে না জানে রাগ কাকে বলে, না জানে তাল, অথচ রাগ ও তালে গান করে। মাত্র একবার শুনেই গোটা গান আয়ত্ত করে ফেলে।...মৌজ্দ্দিন রেখব গান্ধার জানে না। ওকে কখনও সার্গম করতে শুনবে না।... এখন ও যা গায়, সেগুলি সমস্তই শুনে শেখা গোটা গান ওর অদ্ভুত স্মৃতি থেকে টেনে বার করা; কসরৎ করে শেখা নয়; কোনও কসরৎ ও কখনও করে নি।'...

মৌজুদ্দিনের প্রতিভার সংবাদে উক্ত বইখানির কোন কোন পাঠক-পাঠিকা স্তম্ভিত বোধ করেছেন এই ভেবে যে, বিনা কসরতে ও শুনে শেখা গোটা গান যা তিনি তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি টেনে বার করে আসর মাৎ করলেন সেসব কোন সাদা-মাঠা বাঁধা গান নয়। নব নবোন্মেষশালী, সৃষ্টিমুখর, অভাবিত তান বিস্তার অলঙ্কারাদির সুনিপুণ সৌন্দর্যে ভরা খেয়ালরীতির রাগ-সঙ্গীত!

এ হেন মৌজুদ্দিন—যিনি না-সাধা সুর, না-শেখা গান গেয়ে প্রত্যেক আসর মাৎ করতেন; যে কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর গান শুনে তাঁর পরেই সেই গানটি সে আসরে বহুগুণ ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে দৈবী-শক্তির পরিচয় দিতেন; যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গায়ক আর কেউ ছিলেন না—যখন কলকাতায় এলেন, তাঁর আমন্ত্রণ হ'ল ছুলিচাঁদের দমদমার বাগানবাড়ীতে।

কলকাতায় আগত নতুন পশ্চিমা কলাবতের গুণপনার কথা শোনবার ফলে যে এই আসর বসেছিল, তা হয়ত নয়। কারণ মৌজুদ্দিন তার আগে কলকাতায় আসেন নি। মৌজুদ্দিন গণপৎ রাও-এর গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায় এবং ছুলিচাঁদ গণপৎ রাও-এর শিষ্যসদৃশ বলে এই যোগাযোগ ঘটে থাকতে পারে। গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব) সে সময় কলকাতায় এসেছিলেন এবং মৌজুদ্দিনের গানের আসরে উপস্থিত ছিলেন।

মৌজুদ্দিন সেবার কলকাতায় এলে এবং ছুলিচাঁদ বাবুর জলসাঘরে তাঁর গানের আয়োজন হলে, একটি বিষম দঙ্গলের সৃষ্টি হ'ল এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে। জগদীপ মিশ্র এবং মৌজুদ্দিনকে কেন্দ্র করে মারাত্মক দলাদলি দেখা দিলে।

জানা যায় যে, এ ব্যাপারে জগদীপের কোন হাত ছিল না। দোষ ত নয়ই। তবু দেখা গেল যে, তাঁর অসামান্য সঙ্গীতগুণই দোষের কাজ করেছিল। 'গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।'

জগদীপ ও মৌজুদ্দিনের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ অনেকের কাছেই নতুন মনে হ'তে পারে। কারণ এ বিষয়ে লিখিত বা প্রকাশিত তথ্য তেমন কিছু নেই। আছে শুধু সমসাময়িক কোন কোন প্রবীণের স্মৃতিচারণ। অপর পক্ষে পাওয়া যায় মৌজুদ্দিনের প্রশস্তি কাহিনী।

এই দুইয়ের মধ্যে থেকে নিরপেক্ষভাবে সত্যকে উদ্ধার করে নিতে হবে।

সত্যই কি ঘটেছিল, কে বড় গুণী ছিলেন, দলীয় চক্রান্তে জয়-পরাজয়ের অভিনয় হয়েছিল কি না, যিনি বিদায় নিয়ে গেলেন অপযশের গ্লানি বহন করে তিনি শ্রেষ্ঠতার প্রতিভার আধার ছিলেন এবং অল্প পুঁজির কারবারি আসর জাঁকিয়ে রইলেন গোষ্ঠীতে প্রাধান্যের জন্যে কি না—এ সবের সত্য পরিচয় লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কোন ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্যে কারুর অসম্ভব মহিমা কীর্তন আমাদের লক্ষ্য নয়। ভাববিহ্বল বাষ্পজাল অপেক্ষা সত্যের কণিকাও অধিকতর মূল্যবান।···

আগেই বলা হয়েছে, মৌজুদ্দিন যখন প্রথম কলকাতায় এলেন, জগদীপ তার আগে থেকেই কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে বিশেষ দুলিচাঁদের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত গুণী। দুলিচাঁদ যে জগদীপের কলকাতায় সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন সেই আসরের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।···

দুলিচাঁদের জলসাঘরে প্রথম যেদিন মৌজুদ্দিন এলেন, জগদীপও সেদিন আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের দু'জনেরই গাইবার কথা হয় সে আসরে। শুধু তাই নয়, কার্যপরম্পরা অনুধাবন করলে সন্দেহ হয়, তাঁদের দু'জনের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে মজা উপভোগ করা কিংবা মৌজুদ্দিনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা মৌজুদ্দিনের পক্ষীয়দের তরফ থেকে হ'তে পারে। কারণ, দুলিচাঁদ-বাবুর জলসাঘর কলকাতায় আগত পশ্চিমা গুণীদের একটি বহুবিখ্যাত আসর এবং তাঁদের নাম-প্রচারের একটি বড় মঞ্চ। এখানকার জয়-পরাজয়ের ওপর কলাবতদের কলকাতার সমাজে সঙ্গীত-ব্যবসায় অনেকখানি নির্ভর করে। সুনাম যেমন মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়, বদনাম রটে তার চেয়ে বেশি।

এসব কথা সেকালের সঙ্গীতজগতে কিছু নতুন নয়। দশচক্রে একজনকে গাছে তোলা এবং আর একজনকে গাছ থেকে ফেলে দেওয়া আজকালকার তুলনায় সে যুগে অনেক সহজ ছিল। এখনকার হিসেবে প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্র তখন ছিল অত্যন্ত সীমিত ও সঙ্কীর্ণ। জবরদস্ত দল পিছনে না থাকলে এবং শিল্পী নিরীহ, অভিমানী ও শান্তিপ্রিয় হ'লে অনেক সময়ে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হ'ত।

এ আসরের ঘটনাটিও তার এক দৃষ্টান্ত। এখন সেই সূত্রে ফেরা যাক। সে রাত্রের আসর বসেছে।

মৌজুদ্দিনের গুরু, গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য গণপৎ রাও এবং আরও অনেকে সেদিন উপস্থিত হয়েছেন। জমজমাট আসর।

প্রথমে গাইলেন জগদীপ। মুরেঠা আদি দরবারি পোশাকে সুশোভন, দর্শন-সুন্দর শিল্পী। পরিশীলিত মোহন কণ্ঠ, রাগ রূপায়নে সংসিদ্ধ, অন্তর থেকে উৎসারিত সঙ্গীতের অনুভব। এমন বিদ্যা, এমন সৌন্দর্যময় পরিবেশন, এমন নিজস্ব গায়কী যে আসর মাতিয়ে দেবে, সে আর বিচিত্র কি?

সে আসরের সুররসিকদের মনে জগদীপ মিশ্র সঙ্গীতের একটি অনির্বাণ দীপশিখার তুল্য প্রতীয়মান হলেন।

এটি গেল সঙ্গীত-জগতের (এবং বাস্তব জীবনেরও) আলোকিত দিক। কিন্তু এর একটি ছায়া-পৃষ্ঠও আছে। সে অংশের সংবাদ এই যে, জগদীপের গান শেষ হবার আগেই মৌজুদ্দিন অনেকেরই অলক্ষিতে সেদিন আসর থেকে উঠে আসেন যাতে তাঁকে গাইতে না হয়। এত বড় স্বকীয় প্রতিভার সামনে গান গাইবার কথা সেদিন ভাবতে পারেন নি মৌজুদ্দিন। আসর ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন।

তারপর তাঁর কলকাতার প্রধান আশ্রয়স্থল, গুরুভাই শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ীতে তাঁকে এই ধরনের কথা বলেছিলেন যে, এ লোক (অর্থাৎ জগদীপ) কলকাতায় থাকলে আমি এখানে টিঁকতে পারব না।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী শুধু গণপৎ রাওয়ের শিষ্য বলেই নয়, চরিত্রগুণে এবং সঙ্গীত-জগতের বিদগ্ধ ব্যক্তিরূপে তখনকার কলকাতার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সম্মানিত। তাঁর গৃহ ছিল সঙ্গীতচর্চার একটি সুপরিচিত কেন্দ্র এবং বাংলার ও বাংলায় আগত পশ্চিমা গুণীদের অনেকেই তাঁর আসরে উপস্থিত হয়েছেন। দুলিচাঁদও বিশেষ খাতির করতেন শ্যামলালজীদের। গহরজান, মালকাজান প্রভৃতি কলকাতার শ্রেষ্ঠ বাঈজীরা ক্ষেত্রী মশায়ের শিষ্য। সব মিলিয়ে সেকালের কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর বৃহৎ গোষ্ঠী ও বিপুল প্রভাব। এবং তিনিই এখানে গুরুভাই মৌজুদ্দিনের প্রতিভাকে সঙ্গীত সমাজে সুগোচর ও সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে দুলিচাঁদের বাড়ীর মাইফেলে আনেন।

মৌজুদ্দিন যে জগদীপের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যাবেন,

এ অবস্থাকে মেনে নিতে পারলেন না শ্যামলাল ক্ষেত্রী। স্বভাবে তিনি উদারমনা এবং সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সেবক হ'লেও এ ক্ষেত্রে সঙ্গীতশিল্পের প্রতি নিরপেক্ষ ও অ-গোষ্ঠীগত মনোভাব দেখাতে পারলেন না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও এমন একটা কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, মৌজুদ্দিনকে তোলবার জন্যে জগদ্দীপকে নামাবার চক্রান্ত করা হয় শ্যামলালজীদের পক্ষ থেকে।

জগদীপের কোন বড় দল এখানে ছিল না এবং তিনি ছিলেন নিতান্ত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। দলাদলিটা সেজন্য একতরফাই হয়ে গেল।

এ বিষয়ে তাঁদের পক্ষীয় বিবরণ আছে অমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থে। অন্য দিকের কথা জানাবার আগে বইটি থেকে জগদীপ-মৌজুদ্দিনের যুক্তপ্রসঙ্গ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল (২৮-২৯ পৃষ্ঠা):

"বাবুজী (শ্যামলাল ক্ষেত্রী) বললেন,...তুমি ওকে আজ সকলের সামনে জিজ্ঞাসা কর, খাঁ সাহেব, তোমার গানের থেকেও ভাল গান শুনেছ কি না। তার পর বলব।"

সেইদিনই সন্ধ্যার বৈঠকে মৌজদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, খাঁ সাহেব! আপনার চেয়েও বড় গুণী আপনি দেখেছেন কি না, সত্য করে বলুন। আমরা ত জানি, আপনার উপরে আর কেউ নেই।

প্রশ্ন শুনেই মৌজদ্দিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাবুজী, তন্নুলালজীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "বাবুজী, জগদীপ, জগদীপ! আর কেউ নয়। আহা, হা, কি গানই করত। বাবুজীই বলুন, আমি ঠিক বলেছি কি না।"

জগদীপের প্রসঙ্গ ওঠে। বাবুজী ও তন্নলালজীর কথার সারাংশ উদ্ধার করে দিলাম।

জগদীপ সহায়, মৌজদ্দিনের থেকে কিছু বড়। বড় বড় আকর্ণবিস্তৃত দু'টি চোখ, গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, মধুর কণ্ঠ ও উন্নত শ্রেণীর শিক্ষিত পটুত্বই ছিল তার প্রতিষ্ঠার কারণ। ভাইয়া সাহেব ও মৌজদ্দিনের সঙ্গে দুলীচাঁদজীর সংশ্রবের পূর্বে দুলিচাঁদজীই ছিলেন জগদীপের পৃষ্ঠপোষক ও পালনকর্তা। জগদীপের যশোলাভ ছিল না। সে ছিল অতি বিনয়ী; দঙ্গল বা রেষারেষি বুঝতে পারলেই সরে যেত সেখান থেকে।

ভাইয়া সাহেব ও শ্যামলালজী যখন মৌজদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় দুলীচাঁদের বাড়ীতে প্রথম মাইফেল করলেন, তখন একই আসরে হয়েছিল জগদীপ ও মৌজদ্দিনের প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জগদীপের মুখের নায়কী বিলাস বিভ্রম এবং ভাবাবেগপূর্ণ গায়কী মৌজদ্দিনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে দিয়েছিল। সেই মাত্র একদিন হয়েছিল মৌজদ্দিনের আত্মাবমাননা; তার গান সেদিন জমে নি। কিন্তু এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ভাইয়া সাহেব ও বাবুজী। এঁরা জগদীপের অনুকরণে নায়কী ও গায়কী দিয়ে 'মৌজদ্দিনকে প্রস্তুত করে দিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের মাইফেলে জগদীপ ও মৌজদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেখা গেল, মৌজদ্দিন জগদীপকে ছাড়িয়ে উঠেছেন—তারই অনুকরণ করে।

জগদীপ মলিন মুখে দুলীচাঁদের আসর থেকে বিদায় নিলেন, এবং কলিকাতা ছেড়ে চলে গেলেন নেপালে তাঁর আত্মীয়ের কাছে। সেখান থেকে জগদীপ ব্যথিত হৃদয়ের অভিমানে ভরা একখানি চিঠি লিখেছিলেন শ্যামলালজীকে; লিখেছিলেন, "আপনারা আমাকে যে স্নেহ আদর করতেন, তা আমি ভুলিনি। কিন্তু মৌজদ্দিনের যশের কাঁটা হয়ে থাকব না। এক কলিকাতায় জগদীপ ও মৌজদ্দিন থাকতে পারে না। সে কারণেই আপনাদের মায়া কাটিয়ে এলাম।"

বাবুজী আক্ষেপ করে বলতেন, তিনি যদি জ্ঞাতসারে কোন পাপ করে থাকেন, তবে জগদীপের মনে কষ্ট দেওয়াই সেই একমাত্র পাপ। এই প্রায়শ্চিত্ত মাঝে মাঝে করতেন এক নিঃশ্বাসে মৌজদ্দিন ও জগদীপকে স্মরণ করে; চোখের জলের দু'এক বিন্দু দিয়ে ধোয়া ঐ দুটি নাম উচ্চারণ করে।

মধ্যে থেকে মৌজদ্দিনের মনে একটি অলোপনীয় প্রভাব রেখে গেল ঐ জগদীপ। সে একদিন বাবুজীকে বলে, "ঐ রকম চোখ, ঐ ভ্রূ, যদি ভগবান আমাকে দিতেন, তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই জগদীপের চেয়েও বড় হ'তে পারতাম। কি গানই করত জগদীপ! বাবুজী! ও রকম গান ত আর শুনলাম না। আচ্ছা বাবুজী, ওরকম চোখ, ভ্রূবিলাস নকল করা যায় না?"

বাবুজী আর কি বলবেন। বললেন, 'তুমি চোখে টেনে টেনে সুরমা লাগাতে আরম্ভ কর। তা হ'লেই চোখ-মুখের সুরত খুলে যাবে। ওস্তাদের কাছে মুখ বিলাস শিখে নিতে পার না?'

সেই থেকে মৌজুদ্দিনের সুরমা বাতিক আরম্ভ হ'ল।"...

এই বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে—(১) মৌজুদ্দিন তাঁর চেয়ে জগদীপকে বড় ও ভাল গায়ক বলে স্বীকার করতেন। (২) একই আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম দিন মৌজুদ্দিন জগদীপের প্রতিভার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যান। (৩) জগদীপের মনে আঘাত দিয়ে শ্যামলাল ক্ষেত্রী পাপ করেন, এই বোধ তাঁর পরে হয়েছিল। (৪) পরের দিনের আসরের জন্যে গণপৎ রাও ও শ্যামলাল মৌজুদ্দিনকে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত করে দেন জগদীপেরই গায়কী অনুকরণ করে। (৫) জগদীপ অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং রেষারেষি বুঝতে পারলেই সেখান থেকে সরে যেতেন : ইত্যাদি।

কিন্তু অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, 'মৌজুদ্দিন জগদীপকে ছাড়িয়ে উঠেছেন' আর 'জগদীপ মলিন মুখে দুলীচাঁদের আসর থেকে বিদায় নিলেন'—ব্যাপারটা ঠিক এইরকমই ঘটে নি।

মৌজুদ্দিনের জগদীপকে ছাড়িয়ে ওঠার কথাটা যথার্থ নয় এই হিসেবে যে, তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত হ'তে দেখে তাঁর মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি গান করতে পারেন নি নিজের শক্তি অনুযায়ী। এই দেখে তিনি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন যে, আসর থেকে সঙ্গীতের অনুভব অন্তর্ধান করে দলাদলির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সামনের সারির অতি বিশিষ্ট শ্রোতারা বসে এমন বিরূপ ভাব প্রদর্শন করছেন যাতে অন্যান্য শ্রোতাদের জগদীপের গান সম্বন্ধে ধারণা লঘু হয়ে যাচ্ছে। গৃহস্বামী ব্যক্তিত্বহীন ও তরল প্রকৃতির বলে তাঁর স্বপক্ষে এবং এত বড় দলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না। তাঁর গানের প্রশংসা আসরের বিশিষ্ট গুণীরা একবারও করলেন না অথচ তাঁদের দলীয় গায়কের স্তুতিতে হলেন পঞ্চমুখ।

গুণ বা বিদ্যায় পরাস্ত হয়ে জগদীপ আসর থেকে মলিন মুখে বিদায় নেন নি। তিনি বীতস্পৃহ হয়ে বলে আসেন এই কারণে যে, এখানে সঙ্গীতের চেয়ে দঙ্গল বড় ; এখানে সত্যকার গুণ ও বিদ্যার মর্যাদা নেই। শিল্পের যথার্থ আদর যেখানে নেই সেখানেও তিনি মাত্র অর্থ উপার্জনের আশায় থাকবেন না। এই মনোভাব নিয়ে ত্যাগ করে যান শুধু দুলিচাঁদের আসর নয়, কলকাতাও।

উদ্ধৃত অংশে এবং আমাদের বিবরণীতে একটি পার্থক্য দেখা গেছে। সান্যাল মশায়, প্রধানত শ্যামলালজীর বিবৃতি অনুসারে জানিয়েছেন যে, জগদীপ ও মৌজুদ্দিনের প্রথম দিনের প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মৌজুদ্দিনের গান জমে নি এবং তাঁর আত্মাবমাননা ঘটেছিল সেই প্রথম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে মৌজুদ্দিন জগদীপকে পরাস্ত করেন।

কিন্তু অন্য সূত্রে শোনা যায় যে, প্রথম দিন জগদীপের গান শুনে মৌজুদ্দিন আসর থেকে একেবারে চলে আসেন, গাইবার সাহস তাঁর হয় নি। পরের দিন তাঁদের দু'জনের আসর এবং মৌজুদ্দিনের গান ভাল না হওয়া ইত্যাদি হয়ে থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, একই আসরে জগদীপ ও মৌজুদ্দিনের গান হয়েছে এবং মৌজুদ্দিনের গান জমেছে বেশি, এমন ঘটনা একদিনের বেশি ঘটতে পারে না। জগদীপের গান যদি আশানুরূপ ভাল কোনদিন না হয়ে থাকে তা তাঁর কৃতিত্বের অভাবের জন্যে নয়, রেষারেষির সঙ্কীর্ণ পরিবেশ দেখে শিল্পী-সুলভ মেজাজ নষ্ট হওয়ার জন্যে। এবং সেই অভিজ্ঞতার পর দ্বিতীয় দিন আর সে আসরে গান করেন না, এমন নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন তিনি। পর পর দু'টি আসরে মৌজুদ্দিন তাঁকে ছাড়িয়ে উঠবেন' এরকম গায়ক জগদীপ নন।

এই সব বিবরণ—যার কোন লিখিত প্রমাণ নেই—পাওয়া যায় বর্তমান বাংলার অন্যতম প্রবীণ গুণীর কাছে। তিনি হলেন অনাথনাথ বসু, সুপরিচিত খেয়াল-ঠুংরি গায়ক এবং তবলা-বাদকও। তিনি এই ঘটনার প্রধান পাত্র ক'জনকেই চাক্ষুষ করেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বয়োকনিষ্ঠ হ'লেও সমসাময়িক হিসেবে তাঁর মতামত এ ব্যাপারে গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ তিনি এই তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

দ্বৈত কণ্ঠের গানে অসামান্য গুণের জন্যে 'বাংলার বুলবুল' নামে অভিহিত অনাথনাথ বসুর কিছু সাঙ্গীতিক পরিচয় 'বিস্মৃত ধ্রুপদ-গুণী' অধ্যায়ে পিয়ারা সাহেবের প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে, পাঠক-পাঠিকাদের মনে আছে আশা করি।

বসু মশায় অতি তরুণ বয়সে সঙ্গীতজীবন আরম্ভ করেছিলেন কলকাতায়। তখন থেকেই দুলিচাঁদের বাড়ীতে ও জলসায় তাঁর যাতায়াত। শুধু শ্রোতা হিসেবে নয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু প্রতিশ্রুতিবান গায়করূপে সে মহলে সুপরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন।

জগদীপ ও মৌজুদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে

নাথবাবু বলেন যে—গানের কোন বিষয়েই মৌজুদ্দিন গদীপের চেয়ে বড় ছিলেন না। একজনের ছিল শুনে নে গাওয়া গান, আর একজনের রীতিমত শিক্ষা ও াধনার ফলে অর্জন করা বিদ্যা। খেয়াল ইত্যাদি গানে ই সুরের তফাৎ অনেকখানি। পাঁচজনের কাছে শুনে নে তুলে নেওয়া গান গাইতে গেলে, গায়ক প্রতিভাধর লেও, গানের স্ট্যাণ্ডার্ড কি করে থাকবে? এক এক দিন তা এক এক রকম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জগ-দীপের গান কিংবা গায়কীর বিষয়ে তেমন কথা কেউ খনও বলেন নি। মৌজুদ্দিন তাঁর গান প্রথমদিন নেই বুঝেছিলেন যে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবেন না কানদিন। মৌজুদ্দিনকে তখন অপযশ থেকে বাঁচাবার ন্যে শ্যামলাল ক্ষেত্রীরা দল পাকিয়ে আসরে এমন অবস্থা ষ্টি করেন যাতে জগদীপের গান না জমে। তরল ভাব আর ব্যক্তিত্বহীন দুলিচাঁদ দলহীন জগদীপের হয়ে াঙুলটি পর্যন্ত তোলেন নি। এইসব কাণ্ড দেখে গদীপের মন ছোট হয়ে যায়। গান-বাজনার ক্ষেত্রে নেক জায়গায় দেখা গেছে যে, চক্রান্ত করলে যে কোন শিল্পীর আসর নষ্ট করে দেওয়া যায়। তা ছাড়া কথাই াছে—রাগ, রসুই ঔর পাগড়ি, কভি কভি বন যায়। াগ সঙ্গীত, রান্না এবং পাগড়ি কখনো কখনো বেশ উৎরে ায়, আবার কখনো ঠিক বসে না। জগদীপের গান দি কোন একদিন এইসব রেষারেষির ব্যাপারের জন্যে া জমে থাকে, তা থেকে একথা বলা চলে না যে মৌজুদ্দিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে তিনি চলে যান আসর থেকে। কিংবা মৌজুদ্দিন জগদীপের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গায়ক।

জগদীপ মৌজুদ্দিন সম্পর্কে বসু মশায়ের এই ধারণা ও মন্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট নয়। কারণ তিনি মৌজুদ্দিনের প্রতি বিদ্বিষ্ট কিংবা জগদীপের সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বরং মৌজুদ্দিনের পক্ষে তাঁর সমর্থন থাকতে পারত। কারণ তিনি (অনাথবাবু) মৌজুদ্দিনের কাছে কিছুদিন ঠুংরি শিখেছিলেন মালকাজানের বাড়ীতে। মৌজুদ্দিনকে তিনি তাঁর সাময়িক ওস্তাদ বলে জানেন এবং শিল্পীরূপে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু অপক্ষপাত বিচারে এবং জগদীপের সঙ্গে তুলনায় বুঝতে পারেন মৌজুদ্দিনের কৃতিত্বের সীমা-বদ্ধতা।

এইসব কারণে বসু মশায়কে এই বিতর্কের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মনে করা যায়।

তবে এসব আলোচনায় সেকালের ঘটনার স্রোত একালে বসে ফেরানো যাবে না। অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হবে না সত্যের পঙ্কোদ্ধার করা সত্বেও সে যুগের সঙ্গীত-চর্চার সরকারী ইতিহাস যখন লিখিত হবে, তখন দেখা যাবে তখনকার শ্রেষ্ঠ গায়ক প্রতিভার নাম মৌজুদ্দিন খাঁ। কলকাতার প্রচার-মুখর আসর থেকে চিরকালের মতন অবসর নিয়ে যে জগদীপ সুদূর নেপালে আত্মগোপন করে থাকেন, তাঁর কথা সে ইতিহাসের সাধারণ পাঠক-সমাজে অজ্ঞাত থেকে যাবে।

(ক্রমশঃ)

ধর্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে দল চাই, কিন্তু দলের বাহিরের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকা চাই, হৃদ্যতা চাই। ঘরের মধ্যে রাঁধিয়া খাই, ঘুমাই, কাজ করি বলিয়া আমরা চিরজীবন কেহ দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে থাকি না। যে কখন ঘরের বাহির হয় না, সে নিশ্চয়ই দুর্বল ও অসুস্থ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৩

চলতি রীতি

শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন

রাত্রি প্রায় দশটা হবে—

কোন এক আত্মীয়ের বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে মনোবিৎ অধ্যাপক বিশ্বদেব আর তাঁর গৃহিণী সুরুচি দেবী বাড়ী ফিরছেন—রাস্তাটা একটু নিরিবিলি হতেই সুরুচি বলল, "গরীব হোক, ভারি সুন্দর মানিয়েছে ওদের, বোধ হয় রাজ-রাজড়াদের এমন রাজ-যোটক মিলন হয় না—"

বিশ্বদেব কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করল না!

"কি— ?" সুরুচি আগ্রহেই প্রশ্ন করল।

"রাজ-রাজড়াদের বউ দেখবার সুযোগ কখনও হয় নি—জানই ত নিতান্ত গরীব ছিলাম ছাত্র অবস্থায়।"

"ও—!" সুরুচির ছোট্ট উত্তর। অর্থাৎ বিশ্বদেবের প্রচ্ছন্ন আর অনুক্ত ইঙ্গিতের সবটাই সুরুচি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছে। রাজ-রাজড়া— ? কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা লুকোন আছে—সুরুচির বিয়ে সামান্য বিদ্বান অথচ বিপুল বিত্তবান কোন এক সুশ্রী জমিদার কুমারের সঙ্গে মা ঠিক করে ফেলেছিলেন কিন্তু বাবার ঘোর আপত্তিতে কিছুটা মেলামেশা সত্বেও বিয়ে আর হয় নি! একথা বিশ্বদেব জানে, কাজেই আজকের নবদম্পতির মিলনকে রাজযোটক আখ্যা দেওয়াতেই বিশ্বদেবের হয়ত এই ধারণা হয়েছে যে, সুরুচি হয়ত তুলনা করে দেখছে নিজেদের মিলনটা! সুরুচিও মূর্খ নয়—ধান-চাল দিয়ে এম. এ. পাশ করে নি!

কিছুটা পথ চুপচাপ করে আসার পর বিশ্বদেব মিষ্টি করেই বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ রুচি—ভারি সুন্দর ওদের মানিয়েছে।"

কোন উত্তর সুরুচি দিল না। বিশ্বদেবের ঐ এক ধরন! এ যেন গায়ে আলপিন ফুটিয়ে দিয়ে পরে অনুগ্রহ করে আলপিনটা তুলে নেওয়া আর কি! তা হ'লে আর জ্বালা-যন্ত্রণার কি থাকে! গরীবের ছেলে ছিলেন, রাজ-রাজড়ার বউ দেখেন নি! তা ত আজ বলবেনই! গরীবানার গর্ব্ব বোধ হয় সেই গরীব তখনই করেন, যে গরীব যখন প্রাচুর্য্য আর সাফল্যের মুখ দেখেন—তার আগে নয়!

"রাগ করেছ রুচি? উত্তর দিচ্ছ না যে?"

রাগ করেছ মানে? রাগে যেন ফেটে পড়ছে সুরুচি কিন্তু নেহাৎ প্রকাশ্য রাজপথ তাই কোন রকমে রাগ সংবরণ করে গম্ভীর ভাবে শুধুমাত্র বলল, "না— !"

"না— ? এটা কিন্তু মোটেই তোমা'র মনের কথা নয়—কারণ—"

"থাক—থাক, কারণে আর দরকার নেই! না বলতেই যদি মনের কথা এত বুঝতে শিখে থাক তা হ'লে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনটা কি— ?"

"হুঁ— !" বিশ্বদেবও গম্ভীর হয়ে গেল। কারণ? কারণ সুরুচির বর্ত্তমান মনঃস্তত্ব বিশ্লেষণ করতে হ'লে বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই বিশ্বদেবের! রাগ হয়েছে—কারণ বিচিত্র ওদের মনের গতি। কারণ, ওঁর মনটা প্রচণ্ড এক টক্কর খেয়েছে নবদম্পতির মিলন সৌষ্ঠব দেখেই! যে প্রশংসা রুচি অযাচিত ভাবে এই কিছুক্ষণ আগে করছিলেন সেটা আর কিছুই নয় শুধু মাত্র ঈর্ষার অপর পিঠ—নিজ্জ্বান প্রতিবিম্বন! হ্যাঁ বিশ্বদেবের মনঃসমীক্ষণ অভ্রান্ত! বিশ্লেষণের ধারাল ছুরি চালিয়ে বিশ্বদেব দিব্যি দেখতে পাচ্ছে যে সুরুচির মনের অভ্যন্তরে যেন ঈর্ষার জীবাণু কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ঐ অজ্ঞাত জীবাণু সুরুচির মনের সুস্থতার রস বিষাক্ত করে দেবে—ক্রমে আসবে মনোবিকার, তারপর একদিন বদ্ধ পাগল—!

"সুরুচি!" বিশ্বদেব শক্ত করে ধরল সুরুচির বাহুমূল।

"ওকি— ?"

কিছু নয়। তবে আমি মনে করি যে, স্ত্রী যতবড়
ত আর যতই সাবালিকা হন না কেন তাঁর দেহ এবং
ওপর অভিভাবকত্বের চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁর স্বামীর
ং আমার একটা উপদেশ শুনবে রুচি—?"

যদি না শুনি—?'

দি না শোন তা হ'লে আইনে কি বলে আইনজ্ঞরাই
পারেন তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে যদি না
ত সম্পর্কের পাল বা গ্রন্থি একদিন-না-একদিন ছিঁড়ে
, কাজেই জীবনের ছেঁড়া পালটা সময় থাকতে
রাই সেলাই মেরামত করে নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় উকিল
না ডেকেই!"

কি বলতে চাইছে বিশ্বদেব কিম্বা বলতে চাইছে না?
হয়েছে নাকি বিশ্বদেব—? মনের ওপর অভিভাবকত্বের
যার মন, সেই যখন করতে পারে না তখন বিশ্বদেব
? স্বামী স্ত্রীর অপ্রকাশিত বিরূপতা বা অনুক্ত বিদ্বেষ
ই দোষনীয় যখন সেটা প্রকাশিত হয়—এইটাই বর্তমান
রের চলতি রীতি। যে লোক স্ত্রীর মনের স্বাধীনতা
কার করে সে স্ত্রীর স্বাধীনতা কোথায়? নৈতিকতা?
যতটা দৈহিক ততটা মানসিক হওয়া সম্ভব কি?
চির কোন একটা ফুল, কোন একটা গান বা বিশেষ
টা ছবি যদি ভাল লাগে তা হ'লে ঐ একই কারণে কোন
পুরুষ বা নারীকে আকস্মিক ভাবে ভাল লাগার হাত
সুরুচির মনকে কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে? ভাল
টা জীবন্ত মনের ধর্ম। মনোবিৎ পণ্ডিত বিশ্বদেবের কি
বর জানা নেই?

নিজেদের বাড়ীটা দূর হ'তে দেখা গেল—

বিশ্বদেব মাথা নিচু করে হাঁটছে—জটিল চিন্তার ভারে
টা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। সুরুচি হ'ল বিশ্বদেবের
গুরুর দেওয়া এক অমূল্য পুরস্কার। তিনি তাঁর
ীর কোন আপত্তিই শোনেন নি। বিশ্বদেবের সংসার যে
বরের ঘর হবে না একথা সুরুচির বাবা ভাল করেই
তেন; তবু তিনি বিশ্বদেবকেই পছন্দ করেছিলেন। একটা
ক্ত দম্পতির সংসার সোনা-দানায় আর ব্যাঙ্কনোটে
পূর্ণ না হ'লেও ওদের সংসারটা আদর্শ সুখে ভরে উঠবে
এ বিশ্বাস তাঁর ছিল—সুরুচি আর বিশ্বদেবের সংসার সেই
গভীর বিশ্বাসের পরিণাম।

কি জানি কেন হঠাৎ বিশ্বদেব জিজ্ঞাসা করে সেই
জমিদার কুমারের কথা—"রুচি, বাদল এখন কোথায়
আছে জান?"

"জানি—গয়ায়। হঠাৎ ওর কথা—?"

"এমনি আর কি—ভয় নেই ওর পিণ্ডি দিতে গয়ায়
আমি যাচ্ছি না। দেখলাম ওকে এখনও মনে আছে কি
না।"

"ও, বুঝেছি। তুমি বাদলের ভৌগোলিক ঠিকানা চাইছ
না—তুমি জানতে চাইছ যে বাদলকে আমি ভুলেছি কি না,
এই ত? তার উত্তরে যদি স্বীকার করি যে, হ্যাঁ, তাকে
আমি ভুলি নাই? আমাদের বাড়ীর পুষি বেড়ালটাকে
দেখেছ নিশ্চয়—তাকে যখন আজও ভুলি নাই তখন যার
সঙ্গে একদিন বিয়ে হবার কথা হয়েছিল সেই মানুষটাকেই
বা ভুলব কি করে? হয়েছে?"

"এ আমি জানতাম। তবে দুঃখ কি জান রুচি, দুঃখ
এই যে, যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার চেয়ে যদি যার সঙ্গে
বিয়ে হবার কথা ছিল তাকেই কোন স্ত্রীর মনে পড়ে বেশী,
তা হ'লে স্বামীটা শিক্ষিতই হোক বা অশিক্ষিতই হোক তার
নিশ্চয়—"

আনন্দ হয় না—এই ত? কিন্তু আমি একটা জিনিস
বুঝতে পারছি না—মানুষ চর্চা করে তার বুকটা চওড়া
করতে পারে—মনটা পারে না? যেটা সত্য সেটাকে
সহজে মেনে নিতে কুণ্ঠা কিসের?

"সত্য? সত্য মোটেই নয় রুচি, শুধু সত্যের নামা-
বলি ঢাকা দিলে অশুদ্ধ শুদ্ধ হয় না। বল, হয় কি?"

"এর উত্তর তোমার কাছে থেকেই চাই। একটা
সত্যি কথা বলতে প্রস্তুত আছ? আমি অবশ্য একথা
বলছি না যে তুমি হলফ করিয়ে না নিলে সত্যি কথা বল না,
বরঞ্চ আমি স্বীকার করি যে তুমি সত্যি কথাই বল, তবু
প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছি, বল সত্যি বলবে?" সুরুচি স্বামীর
মুখের দিকে তাকাল আড়চোখে।

"বলব।"

"এই ধর আমি ছাড়া আর কাউকে—" সুরুচি কিন্তু

কথাটা শেষ করতে পারল না—কুণ্ঠায় এবং কেমন এক আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল ; মনে হ'ল যে ক্ষেত্র বিশেষে মিথ্যে কথারও এক অনির্দেশ্য মূল্য আছে। স্বামী যদি এই মুহূর্তে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তা হ'লে যেন বেঁচে যায় সুরুচি।

"ঠিক আছে—সত্যিই বলছি—যতদূর মনে হয় তোমারই সহপাঠিনী এবং বর্তমানে বাদলেরই গৃহিণী—"

"কেতকী ?" রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল সুরুচি।

"দাঁড়াও!" বিশ্বদেব দাঁড়িয়ে পড়ল—"এত বিচলিত হচ্ছ কেন—কোন বিশেষ এক গান যদি ভাল লাগে—কোন বিশেষ ছবি যদি ভাল লাগে তা হ'লে কোন এক বিশেষ মেয়েকে একদিন যদি স্বামীর ভাল লেগেই থাকে তা হ'লে—"

"তা হ'লে সেটা প্রকাশ করার থেকে না করাই ভাল" —সুরুচি জোরে জোরে পা ফেলে বিশ্বদেবের থেকে এগিয়ে পড়ল কয়েক পা—

"প্রকাশ না করাই ভাল। একেই বলে নারী। অথচ প্রকাশ করার জন্ম তুমিই তো পীড়াপীড়ি করলে। উপরন্তু এইটাই ত তোমার থিয়োরী—

বাড়ী পৌঁছে গিয়েছে ওরা। বিশ্বদেব দরজার তালাটা খুলে দিয়ে সুইচটা টিপবার আগেই সুরুচি অন্ধকারেই হন হন করে চলে গেল ওপর ঘরের সিঁড়ি বেয়ে—

বিশ্বদেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করল—পিপাসা পেয়েছে—এক গেলাস হ'লে ভাল হ'ত। কিন্তু তিন দিন হ'ল চাকর নবদ্বীপ ছুটি নিয়েছে। আজ বছর খানেক হ'ল ও বিয়ে করেছে এবং তারপর থেকেই বাড়ী যাবার ছুটির তাগিদে ওর দেশের বাড়ীতে "মরণাপন্ন ভাবে" অসুস্থ হয় নি এমন নিকট বা দূর আত্মীয় কেউ থাকল না!

মনে মনে হাসল বিশ্বদেব—ওরাই বরং ভাল আছে—নবদ্বীপরা। একটা জৈবিক আকর্ষণের উৎকট টানে আর কিছু চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পায় না। চিন্তা দিয়ে আর যা'ই কিছু দূর করা যাক না কেন, চিন্তা দিয়ে চিন্তা দূর করা যায় না।

বিশ্বদেব পাঞ্জাবীটা খুলে হুকে টানিয়ে রাখল। হাত-পা ধুলো বারান্দায় বালতির জলে। টাটকা এক গেলাস জল নিয়ে এল উঠোনের টিউবওয়েল থেকে, দরজাটা বন্ধ না করেই একটা কড়া চুরোট ধরিয়ে বসল নিজের পড়বার টেবিলের সামনে—

শোবার ঘরের দিকে এখন আর বিশ্বদেব যাচ্ছে না—বিশ্বদেবের খাটের পাশে আর একটা খাটে এতক্ষণ সুরুচি শুয়ে পড়েছে কিন্তু বিশ্বদেব এই নিচের ঘর থেকেই নিশ্চিত ভাবে বলে দিতে পারে যে রাত্রি হ'লেও সুরুচি এখনও ঘুমোয় নি এবং আজ যে রকম বিচলিত হয়েছে তাতে ওর কখন যে ঘুম আসবে তার স্থিরতা নেই। এমন অবস্থায় বিশ্বদেব যদি ও ঘরে যায় তা হ'লে সুরুচির ওপর নির্দয়তার কাজ করা হবে, কারণ না ঘুমিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকাটা অনিদ্রার চাইতেও কষ্টদায়ক এবং বিশ্বদেব ঘরে ঢুকবার মাত্রই সুরুচি ঘুমিয়ে পড়ার ভান নির্ঘাৎ করবে—ওদের সব ভানের চাইতে ঘুমিয়ে পড়ার ভানটা অনেক দিন থেকে যায়।

ঘুমের ভান—?

বিশ্বদেবের মনস্তাত্ত্বিক মনের ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হ'ল। এর কারণ কি—মানসিক কারণ? কারণ লোভ! স্বামীর আর প্রিয়জনের কাছে আদর পাবার লোভ—উপেক্ষার বৈপরীত্য! উপেক্ষা মেয়েদের যত তাড়াতাড়ি কাবু করে ফেলতে পারে পুরুষদের ততটা পারে না। আর লোভ? লোভের সাক্ষাৎ উত্তর পুরুষ হ'ল ঈর্ষ্যা—অপরের প্রাচুর্য্যে আর চমৎকারিত্যে ঈর্ষ্যা বা হিংসা করে না এমন—

"গোটা কয়েক টাকা চাই—কাল সকালের গাড়িতেই কলকাতা চলে যাব বাবার কাছে—" সুরুচি কখন যে নেমে এসেছে একটুকুও টের পায় নি বিশ্বদেব।

"বেশ ত—নিও। কিন্তু তুমি তা হ'লে ঘুমোও নি? অবশ্য তুমি না বললেও আমি জানতাম যে তুমি ঘুমোও নি। জান সুরুচি—এই মাত্র আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেইটাই অভ্রান্ত।"

রাগে শরীরটা জ্বলে উঠল সুরুচির। ওঁর অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বড়াইটা চিরদিন ওঁর কাছে স্ত্রীর চাইতে বেশী আদরের ব্যাপার। সুরুচি যে কলকাতায় বাপের বাড়ী

চলে যাচ্ছে রাগ করে, সেদিক থেকে একটুকুও অনুযোগ করবার নেই তার মনস্তাত্ত্বিক স্বামীর। এইটাই হয়ত নিয়ম—কোন এক বিদ্যার চরম পাণ্ডিত্য মানুষকে অন্য ক্ষেত্রে একটি নাবালক গড়ে তোলে। জ্যোতির্বিদ আকাশের মঙ্গল গ্রহের অনেক তথ্য আবিষ্কার করে কিন্তু নিজের মঙ্গলের দিকে চাইবার ফুরসুৎ কই? অ্যানাটমিষ্ট রূপের খুঁতের চাইতে হাড়ের খুঁত বেশী ধরতে পারে। গাণনিক যদি ভুল করে ত সেটা নিজের বেহিসেবিপনারই—এইটাই কি নিয়ম? তা না হ'লে বিশ্বদেব পরের মনস্তত্ত্বই শুধু বিশ্লেষণ করেন নিজের মনস্তত্ত্ব ছাড়া? ওর মনোভঙ্গি যে আর একজনের কাছে জলের মতই পরিষ্কার উনি তা জানতে পারেন না! স্ত্রী যেন ওর স্বত্বস্বামীত্বের অধীন গবাদি সম্পত্তি—উপেক্ষা অবহেলার সামগ্রী—

"আমি কি বললাম শুনতে পেয়েছ?" সুরুচি কটমট করে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"পেয়েছি—"

"ভাল কথা। তাই বলে মনে ক'রো না যে আমার এখান থেকে যাওয়া-না-যাওয়াটা তোমার হুকুম-সাপেক্ষ। জানিয়ে যাওয়াটা কর্তব্য তাই জানাচ্ছি। টাকা? ইচ্ছে হয় দিও, না হয় দিও না।"

সুরুচি সশব্দে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল বিশ্বদেবের সামনে—মুখোমুখি।

অধিকার যখন সমান তখন চাইবার প্রয়োজন আছে কি? তোমার প্রয়োজনে তুমি বাক্স থেকেই নিতে পার আমার বিনা অনুমতিতেই। সুরুচি তুমি একজন শিক্ষিতা মহিলা—তোমাকে কি এটাও বলে দিতে হবে যে আমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া মানেই আমার কাছে খাটো হওয়া? দাবি যেখানে সমান সেখানে প্রার্থনার অবকাশ নেই। হে—উ—বিশ্বদেব একটা উদ্গার তুলল।

"একজন অশিক্ষিতা পেলেই তুমি বোধ হয় সুখী হতে বেশী, কারণ—"

"মোটেই নয়—মহিলা মহিলাই। টবের গাছ আর জমিতে লাগান গাছের যা পার্থক্য! তার বেশী কিছু ত আমি দেখলাম না সুরুচি—"

"দেখ, তুমি বোধ হয় ভুলই করেছ আমাকে বিয়ে করে—আমি এই ক'বছর যা দেখলাম তাতে আমার বিশ্বাস তুমি একটুকুও সুখী হও নি—কি?" সুরুচি ভারি গলায় প্রশ্ন করল।

"প্রশ্ন-ভিক্ষা ক'রে প্রশ্নের উত্তর হয় না, তবু কিন্তু আমিও ঐ একই প্রশ্ন করি—সত্যি বল ত রুচি, তুমি কি সুখী হয়েছ?"

"দুঃখ যাকে বলে তাই যখন তোমার কাছে কখনও পাই নি তখন সুখী নিশ্চয় হয়েছি—"

হঠাৎ বাইরে একটা চিৎকার আর পুলিশের বাঁশী শোনা গেল, ভারি বুট জুতোর শব্দও পাওয়া গেল রাস্তায় "—চোর, চোর—"

আগে-পিছু অনেক ক'টা বাড়ীর লোকজন জেগে উঠল—কয়েকটা জানলাও খুলে গেল গোটা কয়েক বাড়ীর—বিশ্বদেব আর সুরুচি ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য রাস্তার ধারে জানলার শিক ধরে দাঁড়াল।

কনষ্টবলটা এই দিকেই আসছে—বিশ্বদেববাবুর সদর বারান্দায় উঠে সেলাম জানিয়ে বলল—"চোরঠো তো আপনা লোগের দেওয়ালি টপকে রাস্তামে পড়ল—মগর আপলোগ তো দেখছি জাগিয়েই আছেন। কিছু চোরি-টোরি গেইল না কি?"

"চুরি? কই না ত! আমরা ত জেগেই আছি—"

"আচ্ছা—খুব বাঁচিয়ে গেলেন! একটু হুঁসিয়ারীসে থাকবেন বাবু! কয়টা দাগী শালা জেহল্‌সে নিকলেছে দু'চার দিন হোয়—" কনষ্টবল খুসিমনে চলে গেল নিজের ডিউটিতে।

বারান্দা থেকে দোতলা শোবার ঘর পর্যন্ত সমস্ত দরজাই হাট হয়ে খোলা ছিল—স্বামী স্ত্রী নিচের ঘরে। গেল না কি সব চুরি? সুরুচি সিঁড়ির দরজা পর্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়াল—সাহস হচ্ছে না একলা ওপরে যাবার। "এস না গো—ওপর ঘরটা দেখে আসি, দরজা-টরজা সব হাঁ করে খোলা পড়ে ছিল কতক্ষণ ধরে—"

"দেখ, তুমি আবার খাটো হচ্ছ আমার কাছে! সব দিক দিয়ে তুমি আমার সমান কিন্তু চোর ধরবার বেলাই স্বামী—"

"আঃ! এসো না—"

কিন্তু বিশ্বদেবের যেন বিশেষ কোন তাড়া নেই—চেয়ার থেকে উঠল, চুরুট বের করল ড্রয়ার থেকে, গোটা সাতেক কাঠি জ্বালানর পর তবে ধরল চুরুটটা। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল "ব্যস্ত হচ্ছ কেন, গয়নাগাটি সবই ত পরে আছ, বিয়েবাড়ী থেকে এসে খোল নি একটাও। আর টাকা? খুব জোর শ'দুয়েক ছিল সুটকেসটায়! যদি নিয়েই থাকে তা হ'লে ও ব্যাটাও বড়লোক হবে না, আমিও গরীব হব না। তা ছাড়া, একজন নেবে আর একজন দেবে না—এই নিয়েই ত দুনিয়া জুড়ে যত ফন্দি তত ফিকির! বুদ্ধি আর দুর্বুদ্ধির চিরন্তন লড়াই। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে চোরদের বিচার করলে দেখা যাবে—

"—দেখা যাবে ওরাও তোমার মতই এক একটি মনোবিৎ দিকপাল—"

ওপরে দু'জনে গিয়ে দেখল—সুটকেসটা মেঝেয় পড়ে আছে খোলা অবস্থায়, সুটকেসের কাগজপত্র ছড়ান আছে মেঝেয়। শাড়ি ব্লাউস জামা কাপড় কিছু নেয় নি—চোরে নিয়েছে কেবল সুটকেসে রাখা টাকা ক'টা—

"হ'ল ত? এ শুধু তোমার জন্যই—" সুরুচি দায়ী করল বিশ্বদেবকে।

"আমার জন্য?"

"না ত কি! তুমি যদি ওপরে আসতে তা হ'লে কি চুরি হ'ত?"

"আর তুমি যদি নিচে না নামতে তা হ'লে কি চুরি হ'ত?"

সুরুচির নিচে নামার জন্য না বিশ্বদেবের ওপরে না যাওয়া—কোন্‌টার জন্য চুরিটা হ'ল সে সম্বন্ধে বিশ্বদেব যে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তার দার্শনিক তত্ত্ব সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে কি নৈতিক কি দৈহিক—এই দুয়েরই প্রবণতা হ'ল অধোগতির দিকে, সুতরাং সুরুচির ওপর থেকে নিচে নামার—

সুরুচি এতক্ষণ সুটকেসটা উজাড় করে দেখছিল যদি টাকা ক'টা পাওয়া যায়—"না নেই! যাক—কাল সকালে ডাইরি করে আসবে।"

"ডাইরি!"

বিস্ময়ে সুরুচি তাকিয়ে থাকল স্বামীর মুখের দিকে—"ডাইরি কি জান না? থানা। থানা কাকে বলে জান, না তাও জান না?"

ও বুঝেছি! কিন্তু সে বড্ড ঝামেলা রুচি! টাকাটা যে যথার্থ চুরি গিয়েছে তার প্রমাণ কি? কত টাকা? নোট, না খুচরো? অত টাকা কোথায় পেলাম? কাকে সন্দেহ হয়? সাত সতের প্রশ্ন। তার চেয়ে যাকগে—কিন্তু তোমার কলকাতা যাওয়ার ভাড়াটা কি রেখে যায় নি সুটকেসে? অন্ততঃ চোরদেরও আমাদের শিক্ষিত করা উচিত যাতে সামান্য সৌজন্যবোধ ওদের থাকে। দেখ ত পোষ্ট অফিসের পাসবইটা আছে, না নিয়ে গেছে—"

"এই ত তোমার পাসবই—কিন্তু নিলেই ভাল হ'ত। এখন দেখছি তুমি কিংবা চোর একজনের অনুগ্রহ না হ'লে যেন আমার কলকাতা যাওয়া হবে না—"

"অনুগ্রহ বলতে যদি নিতান্তই বাধে তা হলে সৌজন্য বলতে পার। মোট কথা, কাল পোস্ট অফিস না খোলা পর্যন্ত একটা চুরোট কিনবার মত পয়সাও নেই—"

এরপর একদিন পাশবইখানাও চুরি যাবে, সেদিন হয়ত বলে বসবে, "রুচি—হাঁড়ি চড়াবার মত পয়সাও আর নেই! যাদের সামান্য একটু সাংসারিক বুদ্ধি নেই, তাদের বিয়ে না করাই উচিত।"

সাংসারিক বুদ্ধি থাকলে কেউ কি বিয়ে করে রুচি? আমার মনে হয় এবং এ বিষয়ে আমি চিন্তা করে দেখেছি যে—যে বিয়ের মন্ত্র-টন্ত্র রচনা করেছিল সে নিশ্চয় মেয়ে-ছেলে ছিল। তা না হ'লে এত পক্ষপাতিত্ব কেন? বিয়ে মানেই তোমাদেরই এক তর্ফা ডিক্রি? ঘণ্টা কয়েক ধরে পুরুষদেরই ত বক বক করিয়ে নাও। কত প্রতিশ্রুতি! হেন করব, তেন করব! আর তোমরা? চাটি বাঁধা ভাত যে বেড়ে দেবে একথাও তোমাদের বলতে হয় না। নির্বাক সাক্ষীগোপালের মত বাস থাক ছাঁদনাতলায়। দানকরা খাট পালঙ্ক তোষক বালিশের অংশ বিশেষের মতই তোমরা মুখ বুজে চলে আস। তারপর? তারপর যে কি—সেটা আর না

বলাই ভাল। আচ্ছা বল ত রুচি—যে মানুষের সাংসারিক বুদ্ধি এক বিন্দুও ঘটে থাকে, সে কি—

যান্ত্রিক গোলমালে ইলেকট্রিক বাতিগুলো সব এক সঙ্গে নিভে গেল—

"যাঃ। হ'ল ত—এখনও মশারি-টশারি ফেলা হয় নি—কই দাও দেখি তোমার দেশালাইটা—লণ্ঠনটা জ্বালি।" অন্ধকারেই সুরুচি হাত বাড়াল স্বামীর দিকে।

বিশ্বদেবের হাতের মধ্যে দৈবাতই সুরুচির হাতটা ঠেকে গেল—বিশ্বদেবের মনস্তাত্ত্বিক মনটা যেন কাব্যিক হয়ে উঠল নিমিষে—গৃহিণীর ছোট্ট নরম হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে মিষ্টি করে আকর্ষণ করে নিয়ে বিশ্বদেব বলল "—আজ আর নাইবা জ্বলল আলো!"

"জীবজগতে কেঁচো বা অমনি কোন জীবকে পিষিয়া ফেলিলেও তাহারা প্রতি আঘাত করে না। ইহা সাত্ত্বিকতা নহে। ইহা জড়তা। আবার অনেক প্রাণী আছে পিঁপড়া মৌমাছি বোলতা সাপ কুকুর ষাঁড় ইত্যাদি তাহারা আঘাত পাইলে আঘাত করে। মানুষের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বভাব আছে। সে আঘাত করিলে বলে, আমি তোমার অধীন হইব না কিন্তু আঘাতের বদলে আঘাতও করিব না।...আমি তোমার পশুভাব নষ্ট করিব।... তুমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে অধীন করিয়া রাখিতে চাও সেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে মারিয়া ফেলিব। নষ্ট করিব।"

—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৭

যখন খেয়াল হ'ল, ঘড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল, টিফিন সুরু হ'তে আর মিনিট পাঁচেক বাকি। নিশিবাবু আসে নি।

বাসবী একবার ভাবল নিজের টেবিলেই টিফিন খেয়ে নেবে, তার পর কি ভেবে টিফিনের প্যাকেটটা হাতে করে বাইরে বেরিয়ে এল।

অফিস প্রায় ফাঁকি। নিশিবাবু সীটে নেই। দু'একজন ইতস্তত বসে রয়েছে। বাসবী কৃষ্ণার কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা পা দুটো টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে। কোলের ওপর একটা বই। এক পাশে একটা উলের তাল। বোনবার কাঁটা।

বাসবী আচমকা গিয়ে ঢুকতেই কৃষ্ণা চমকে উঠে পা দুটো নামিয়ে নিল। হাত দিয়ে বিস্রস্ত শাড়ীটা ঠিক করে দিয়ে বলল, তাই ভাল, তুমি! আমি ভাবলাম বুঝি অফিসের বাবুরা কেউ এল।

বসতে বসতে বাসবী বলল, কেন, আমি বুঝি অফিসের বাবু নই?

উঁহু, তুমি বাবুনী। কৃষ্ণা হাসল।

অফিসের বাবুরা বুঝি এ কামরায় আসা যাওয়া সুরু করেছে। কি ব্যাপার?

ব্যাপার আর কি ভাই, যে যার নিজের তাগিদে আসে। কৃষ্ণার মোহে কেউ এদিকে পা বাড়ায় না। দেখছ না রঙের জেল্লা। এ কি বাসবী, যে অবিরত ভ্রমর গুঞ্জন সুরু হবে তাকে ঘিরে।

গুঞ্জনটাই দেখছ বন্ধু, দংশনটার ত খোঁজ রাখ না।

গোলাপের সঙ্গে কাঁটা ত থাকবেই। কাঁটা আছে বলেই গোলাপ অত মধুর।

কি জানি অতটা দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ রাখি না। নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলছি।

শেষদিকে বাসবীর গলাটা একটু যেন ভার ভার।

কৃষ্ণা অবাক হ'ল। এ ত নিছক পরিহাস বলে মনে হচ্ছে না। বুকে তীর-বেঁধা পাখীর মতন এমন ছটফটানি ভাব কেন বাসবীর?

বাসবী ভেবেছিল। কালকের ব্যাপার আর কাউকে বলবে না, জানাবে না। মাকে জানিয়েই বিপদে পড়েছিল একটা সত্যকে ঢাকতে অগণিত মিথ্যার আমদানী করতে হয়েছিল, কিন্তু পারল না। সারা অফিসে মেয়ে-কেরাণী শুধু বাসবী আর কৃষ্ণা। কৃষ্ণা সম্ভবত তার সব কথাই তাকে বলে। তাই বাসবীও নিজের জ্বালাযন্ত্রণাটা কৃষ্ণাকে না জানিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিল না। কাউকে না জানালে বুকের ভার লঘুও হয় না।

কিন্তু তার আগে তারও একটা জিজ্ঞাস্য ছিল। অবশ্য নিছক কৌতূহল।

অফিসের বাবুরা কেন এ ঘরে আসে বললে না?

সবাই আসে না, শুধু দু'জন। টেণ্ডার সেকশনের অরিন্দমবাবু আর একাউন্টস্-এর প্রতুল দেব।

কি ব্যাপার?

বললাম যে, নিজেদের জ্বালায়। প্রেমিকাদের সঙ্গে কথা বলতে। অফিসের ফোনে ত অসুবিধা। গোপন কথা পাঁচ কান হয়ে যাবে। তাই এখান থেকে ফোন করে। প্রতুল আবার বলে, কৃষ্ণাদি দু'কানে তুলো গুঁজে বসে থাকুন, কিংবা ভান করুন আপনি কালা। এসব কথা কিন্তু শুধু দু'জনের কথা। আমি হেসে বলেছি, দু'জনের কথা আর শুনতে পাচ্ছি কোথায়। আর একজনের কথা ত শুধু তোমার কর্ণকুহরে বর্ষিত হচ্ছে। প্রতুল হেসে বলেছে উত্তর শুনেই প্রশ্নটা আন্দাজ করতে পারবেন। সেটাই ত মারাত্মক। যা ইচ্ছা কল্পনা করে নিতেও বাধা নেই।

প্রতুলবাবু, মানে সর্বদা যিনি ঘাড় নীচু করে চলাফেরা করেন। মোটা লেজারের আড়ালে যাঁকে দেখাই যায় না?

ওরাই ত মারাত্মক হয়। ঠিক জায়গায় ওরা ঘাড় তোলে, ঠিক মানুষের সামনে। আর যখন দরকার পড়ে

তখন আর আড়ালে থাকে না। মেয়েটাকে কি আশ্বাস দেয়, কত বজ্রগর্ভ বাণী, তখন কে বলবে ভদ্রলোক বেসরকারী অফিসের এক শ পঁচাত্তর টাকার কেরাণী। দু'বছর মাইনে বাড়ে নি।

মাইনে বাড়ে নি দু'বছর?

হ্যাঁ, হিসাবে কি একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিল। চাকরি যায় যায় অবস্থা। সবাই মিলে ম্যানেজারকে ধরে চাকরি রক্ষা করেছে, তবে দু বছরের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ।

তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভাবে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তোমার জ্বালার কথা কি বলছিলে?

বাসবী ঢোঁক গিলল, একটু বুঝি ভাবল কতটা বলবে আর কতটা গোপন রাখবে, তার পর আস্তে আস্তে বলল, বেলাদেবী চারদিকে আমার নিন্দা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

বেলাদেবী?

হ্যাঁ।

কি নিন্দা?

যেটা অফিসসুদ্ধ লোকের অনুমান, তাই। আমি আর অনিমেষ রায় না কি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট।

কৃষ্ণা হাসল। বেশ শব্দ করে, তার পর রুমাল দিয়ে মুখটা চেপে হাসি সামলাল।

কি, হাসলে যে?

না, দেখছি এখনও গ্রন্থিচ্ছেদ হয় নি।

তার মানে? বাসবী একটু অবাক হ'ল।

মানে, বাইরে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়েছে কিন্তু অন্তরের মিল এখনও অটুট। তা না হ'লে এ ঈর্ষার প্রকাশটুকু সম্ভব হ'ত না।

ঠিক বলেছ। আমিও তাই ভেবেছি।

আমি এটা অনেক আগে থেকেই আঁচ করেছিলাম। যখন টাকা-পয়সা নিয়ে গোলমাল চলছে, বেলাদেবী সলিসিটর নিযুক্ত করেছেন তাঁর স্বার্থ দেখবার জন্য, তখনও তিনি ঝগড়া করতে ম্যানেজারের কাছে আসতেন। শুধু বাড়ীতে নয়, অফিসেও। বোধ হয় অনিমেষ রায়কে দেখবার জন্য।

কিন্তু এর কারণ কি? দু'জনের একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকার পথে বাধাটা কোথায়?

বাধা বেলাদেবীর উচ্ছৃঙ্খল জীবন। আমি ফোনে কান পেতে অনেক বার শুনেছি, বেলাদেবী অনুতাপ করেছেন। অবশ্য আরও আগে। তখন দু'জনে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা শুধু দেখা দিয়েছে, দু'জনের মাঝখানে এ ভাবে আইনের পাঁচিল ওঠে নি।

কি বলেছেন বেলাদেবী?

বলেছেন, তিনি কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন না। সন্ধ্যা হ'লেই রক্তের সমুদ্রে যেন জোয়ার আসে। নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। প্রজাপতির জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না। ম্যানেজার অনেক বোঝালেন, অনেক ভাল কথা বললেন। ফল কি হ'ল, তা ত দেখছই।

কিন্তু আমি মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। নিজের রক্ত দিয়ে, স্বেদ দিয়ে অর্থ উপার্জন করে সংসারের ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করছি। পুরুষদের সঙ্গে যেটুকু মিশছি নিজের প্রয়োজনে। অনিমেষ রায়কে অন্নদাতা হিসাবেই কল্পনা করি, আর কিছু ভাববার মতিও হয় নি, প্রয়োজনও নয়। অথচ আমাকে লক্ষ্য করে কাদা ছোড়ার মানে? অপবাদের ভার সইবার ক্ষমতা যে একটুও নেই, সেটা ওপরতলার বাসিন্দাদের অজানা থাকার কথা নয়।

উত্তেজনায় বাসবীর চোখ-মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। দুরন্ত আবেগে পীবর বুক ওঠানামা করতে লাগল। মুষ্টিবদ্ধ হ'ল দুটি হাত।

টিফিনের প্যাকেট টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। খোলার অবকাশই হয় নি।

কৃষ্ণা সেদিকে বাসবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল একবার।

নাও, টিফিন খেয়ে নাও। বেলাদেবীর ওপর রাগ করে আত্মদহন করে লাভ কি!

বাসবী টিফিনে মন দিল।

কৃষ্ণা অন্যদিকে চেয়ে বলতে লাগল, তুমি লক্ষ্য নও বাসবী, উপলক্ষ্য মাত্র। সম্ভবত বেলাদেবী অনিমেষ রায়কে একমাত্র তোমার সঙ্গেই মেলামেশা করতে দেখেছেন।

মেলামেশা?

ওই মাঝে মাঝে একসঙ্গে যাওয়া-আসা করতে দেখেছে। তার ওপর দু'জনের বাইরে যাবার খবরও কানে যাওয়া স্বাভাবিক।

বাসবী কোন কথা বলল না। টিফিন শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

তুমি এ নিয়ে অযথা মন খারাপ কর না। দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যেটা মিথ্যা সেটা আঁকড়ে মানুষ আর কতদিন চলতে পারে।

কৃষ্ণা দার্শনিক হয়ে উঠল।

বাসবী আর দাঁড়াল না। বাইরে বেরিয়ে এল।

টিফিন শেষ হয়ে গেছে। বাবুরা যে যার জায়গায় কাজে মগ্ন। দু'একজন মুখ তুলে বাসবীকে দেখল। অনেকেই দেখল না।

বাসবী এসে নিশিবাবুর সামনে দাঁড়াল।

কই, আপনি ফাইল দেখতে গেলেন না?

নিশিবাবু ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটতে ব্যস্ত ছিল। ছুরি সামনে নিয়ে হেসে বলল, কতকগুলো ঝামেলায় পড়ে গেছি। টেলিফোন পেলাম কাল থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়েন করছেন, তাঁর কাজগুলো সব ঠিক করে রাখতে হবে।

আবার বাসবী নিজের কামরায় ফিরে এল।

টেবিলে কাগজ ছড়ান। দু'একটা জরুরী চিঠি উত্তরের অপেক্ষায় পড়ে ছিল। কিন্তু বাসবী চেয়ারে বসল না। জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

তপ্ত দ্বিপ্রহর। তবু জনতার কমতি নেই। অবিরল জনস্রোত দিক-বিদিকে ছুটেছে। ব্যস্ত, ক্লান্ত, অতৃপ্ত মানুষের দল।

সারা পৃথিবীই অতৃপ্তিতেই ঠাসা বোঝাই। এখানে কেউ সুখী নয়, কেউ প্রসন্ন নয়। যার ঘরের সিন্দুক পূর্ণ, তার মনের সিন্দুক শূন্য। পোশাকে, চলনে-বলনে বেশীর ভাগ লোকই নিজেদের নিঃস্ব অন্তঃকরণ আবৃত করে ঘুরে বেড়ায়। লোভের যেমন শেষ নেই, সুখেরও তেমনই শেষ নেই। সকলেরই লক্ষ্য শিখরের দিকে। এক ধনী অপরকে হিংসা করে। এক নারী অপরের কুৎসা প্রচার করে বেড়ায়।

অফিসের মধ্যে একটা কোলাহল উঠতে চমকে বাসবী জানলার কাছ থেকে সরে এল।

চারদিকে কাঁচের আবরণ। বাইরের শব্দ বিশেষ ভিতরে প্রবেশ করে না, কিন্তু সম্মিলিত কণ্ঠের চীৎকারের বেশ কিছু কিছু ভেসে আসছে। জানলার কাছে দাঁড়ালে বেশ শোনা যাচ্ছে।

বাসবী একবার ভাবল, বাইরে বের হবে। অফিসের মধ্যে গিয়ে কি ব্যাপার দেখবে। কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে আর গেল না। চুপচাপ নিজের চেয়ারে বসে রইল।

আস্তে আস্তে কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। এক সময়ে সব শব্দ একেবারে থেমে গেল।

বাসবী বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকল।

বেয়ারার এসে দাঁড়াতে একটু দেরি হ'ল। সম্ভবত সেও চেঁচামেচি শুনে অফিসের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কি হয়েছিল? বাইরে অত হল্লা কিসের?

আজ্ঞে দিদিমণি, মহীতোষবাবু বিভাসবাবুকে এক চড় মেরেছেন।

বিভাসবাবু? বিভাসবাবু কোথা থেকে এলেন?

বিভাসবাবু অফিসে এসেছিলেন। খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। লাঠিতে ভর দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এসেছেন।

কিন্তু মহীতোষবাবু কেন চড় মারতে যাবে বিভাস হালদারকে। অফিসের অন্য লোকের সম্বন্ধে বরং এমন একটা কথা কিছুটা বিশ্বাস্য হ'তে পারত, কিন্তু মহীতোষবাবু দেবোপম চরিত্র, দুর্বার থেকেও কোমল। আচমকা সে কাউকে আঘাত করতে পারে, এমন কথা কল্পনা করতেও বাসবীর কষ্ট হ'ল।

আচ্ছা, তুমি যাও।

বাসবী হাত নেড়ে বেয়ারাকে বিদায় করে দিল। একবার ভাবল কোন কাজের ছুতোয় বাইরে কারও কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। নিশিবাবুর কাছে নয়, সেখানে প্রকৃত কথাটা জানবার সুবিধা হবে না। অর্ধেক বলবে, অনেকটাই বলবে না।

বাসববাবু কিংবা খোদ মহীতোষবাবুর কাছে। কিন্তু সেখানেও বিপদ আছে। বিভাস হালদার হয়ত এখনও বসে আছে। বাসবীকে দেখে আবার কি কটূক্তি করে বসে, ঠিক আছে।

বাসবী কৌতূহল দমন করল। এখন থাক। বাইরে যাবার সময় নেই। এক সময় ব্যাপারটা শোনা যাবে। কেউ-না-কেউ ঠিক বলবেই।

ঠিক পাঁচটা বাজতেই বাসবী উঠে পড়ল। আজ সারা দিনে কাজ প্রায় বিশেষ কিছু করে নি। বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক একটু ব্যস্ত ছিল। অবশ্য অফিসে এ রকম হয়। সব অফিসে। কেরাণীবাবুরা বলে জোয়ার-ভাঁটা। গঙ্গায় যেমন, অফিস-গঙ্গাতেও তেমনই। কোন কোন দিন কাজের স্রোত বয়ে যায়। মাথা তোলার উপায় থাকে না। হাতের মুঠোর মধ্যে দিয়ে কখন যে সময় সরে যায় টেরই পাওয়া যায় না। আবার মাঝে মাঝে জল সরে গিয়ে আলস্যের কাদা দেখা যায়। হাই তুলে, গল্প করে সময় আর কাটে না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুটপাথে পা দিতেই দেখা হয়ে গেল। বাসববাবু পানের দোকানে পান কিনছিল। চোখাচোখি হ'তে এগিয়ে এল।

কি ব্যাপার, আপনি ত ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছেন। শুধু দুর্লভ নয়, একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য।

আপনি আর খোঁজ-খবর নেন কোথায়? বাসবী হাসবার চেষ্টা করল।

নেব কি করে। লক্ষ্মণের গণ্ডির মধ্যে আপনার বাস। ওখানে খোঁজ নিতে গেলে প্রাণের চেয়েও প্রয়োজনীয় বস্তু চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

এ প্রসঙ্গ আর বাসবী বাড়াল না। বাড়ালে তারই বিপদ। দিকযন্ত্রের কাঁটার মতন সব প্রসঙ্গই উত্তর-মুখী হয়ে থাকবে। তার চেয়ে অন্য কথা বলাই ভাল।

অফিসে একটা গোলমাল শুনলাম, কি ব্যাপার বলুন ত?

শুধু গোলমাল, খুনোখুনিও যে হয়ে গেল।

খুনোখুনি?

বিস্মিত হ'লেও বাসবী এটুকু বুঝল বাসববাবু সব কিছুতেই চড়া রং মেশান। থিয়েটারী ঢংয়ে তিলকে তাল করতে তার জুড়ি নেই।

খুনোখুনি মানে মহীতোষবাবুর মতন ঋষিতপস্বী মানুষ যদি কারও গণ্ডে চপেটাঘাত করেন, তা হ'লে সেটা খুনোখুনির পর্যায়েই পড়ে।

জেনে-শুনেও বাসবী আর একটু বিস্ময়ের ভান করল। ভদ্রলোক একটু সময় নেবে। রসিয়ে রসিয়ে বলবে সব কিছু, তবু আসল খবরটা পাওয়া যাবে এর কাছেই। কারণ বাসববাবু আর মহীতোষবাবু কাছাকাছি বসে।

বিভাস হালদার এসেছিল অফিসে। চেহারা দেখে মনে হ'ল প্রায় শেষ অবস্থা। স্ত্রীর অনুসরণ করতে তার আর দেরি নেই। দাম্পত্য আর অমিতাচার তার জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও শুষে নিয়েছে। বিভাস মহীতোষবাবুর কাছে এসে বসল। অবশ্য একে একে সকলের কাছেই সে যেত, কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল।

বাসববাবু রুমাল বের করে ঠোঁটের দু'টি প্রান্ত মুছে নিল, তারপর আবার নাটকীয় ভঙ্গিতে সুরু করল। বাসবীর কেবল ভয় হ'ল আশ-পাশে লোক না জমে যায়।

মহীতোষবাবুর কাছে বসে বিভাস ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদুনী আরম্ভ করল। তার ছেলের নাকি অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার ডাকার মতন সঙ্গতি তার নেই। স্ত্রী গেছে, এই ছেলেই শেষ সম্বল। কাজেই সবাই মিলে যদি কিছু সাহায্য করে তবেই সে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারবে।

তারপর?

তারপর আর কি। মহীতোষবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বিভাসের গালে একটি চড় দিলেন। অবশ্য মহীতোষবাবু নিরীহ লোক। কাউকে মারধোর করা তাঁর অভ্যাস নেই, তাই চড়টার তেমন জোর ছিল না। কিন্তু কাজ হ'ল। বিভাস একটি কথাও না বলে আস্তে আস্তে উঠে গেল। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে একটু চেঁচামেচি করেছিল, সেই জন্যই যা একটু গোলমাল হয়েছিল।

ভদ্রলোকের সাহস ত কম নয়। এ অফিসে ঢুকলেন কি করে?

যাদের মান-অপমানের বালাই নেই, তাদের ত ওসব বিষয়ে দুর্ভাবনাই নেই। তা ছাড়া আমার মনে হয় কোথা থেকে শুনেছিল যে ম্যানেজার আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দু'জনেই ছুটিতে। বাসববাবু একটু থামল। তার চীৎকারে দু'একটি লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু' চোখে ঔৎসুক্য নিয়ে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার বলতে লাগল, বিভাসের একটু চালে ভুল হয়ে গেছে। তার পুত্রটি যে মহীতোষবাবুর গোকুলেই বাড়ছে, সেটা বেচারীর জানবার কথা নয়। বাড়ীভাড়া অনেক মাসের বাকি, কাজেই পুরোণো পাড়ায় আর তার ফেরার উপায় নেই।

শকুন্তলা সোমের খবর কি?

প্রশ্নটা আ'চমকা বাসবীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

আর কোন দুষ্মন্তকে পাকড়েছে। ওঁরা ত আর মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হন না, ওঁদের আকর্ষণের কেন্দ্র অর্থ। অফিসের চোরাই টাকা ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসকে জীর্ণ বস্ত্রের মতন ত্যাগ ক'রে গেছেন।

বাসবী চুপ ক'রে রইল। এখন রওনা না হ'লে লেডীজ ট্রাম পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু বাসববাবু হঠাৎ থামবে এমন সম্ভাবনা কম।

ভাগ্য ভাল বাসবীর। বাসববাবু হঠাৎই থামল। কোন ক্লাবে রিহার্সালের কথা তার আচমকা মনে পড়ে গেল।

হাত-ঘড়ির দিকে নজর বুলিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

চলি মিস সেন, আমার আবার বাগবাজারের দিকে যেতে হবে। খেয়ালী সঙ্ঘে রিহার্সাল আছে। জনা। বড় শক্ত বই ধরেছে। আমি এত বড় ঝানু অভিনেতা, আমারই বুক দুপ দুপ করছে। শেষদিকে বুড়ো বয়সে দানীবাবুর যা প্রবীর দেখেছি, অপূর্ব। তার ধারে-কাছে পৌছতে পারলে হয়।

অন্যবার বাসববাবু বলে, এবারে বাসবীই বলল।

জনা বইটা আমার দেখবার সাধ অনেকদিন থেকে। একটা কার্ড দেবেন ত?

বাসববাবু কৃতার্থ হয়ে গেল। বিগলিত-হাস্যে বলল, কি যে বলেন, আপনি দয়া করে যেতে রাজী হয়েছেন, এই আমার সৌভাগ্য। ঠিক সময়ে আপনাকে খবর দেব।

দ্রুতপায়ে বাসববাবু ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

পরের দিন অফিসে এসে বাসবী সবে চেয়ারে বসেছে, তখনও জল পর্যন্ত মুখে ঠেকায় নি, যা তার অভ্যাস, এমন সময় বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

দিদিমণি বড় সায়েব ডাকছেন।

বড় সায়েব? বাসবী ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, দিদিমণি।

বড় সায়েব মানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁর সঙ্গে বাসবীর ডাকাডাকির সম্পর্ক নয়। তিনি আবার কেন ডাকছেন? কাল অফিসে চেঁচামেচির ব্যাপারটা কেউ তাঁর কানে তুলে থাকবে। এটা বাজার নয়, অফিস। তিনি আশা করেন দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এখানে কাজ করেন। এ বিষয়ে বাসবী কি জানে সেটাই বোধ হয় জিজ্ঞাসা করতে চান।

দিদিমণি চলুন, বড় সায়েব বসে আছেন।

বেয়ারা মনে করিয়ে দিল।

যাচ্ছি।

বাসবী হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা টেনে নিয়ে এক চুমুকে সব জলটুকু পান করল, তারপর রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

যেতে যেতে শাড়ীর আঁচলটা মুখে বোলাল। মনে মনে ভাবল আর এক গ্লাস জল খেয়ে নিলে হ'ত। বুকের ভিতরে যেন মরুভূর শুষ্কতা। বার বার জিভটা নীরস কাগজের মতন বোধ হ'ল।

দরজার কাছে গিয়ে বাসবী একটু ইতস্তত করল। কিন্তু উপায় নেই। বেয়ারা এক হাত দিয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

বাসবী ঢুকতে গিয়েও থেমে গেল। নিশিবাবু কামরার ভিতরে ছিল, সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাসবী এগোতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুখ তুলে দেখলেন, তারপর বললেন, বস।

হঠাৎ বসা উচিত হবে কি না চিন্তা করতে করতে বাসবী আস্তে একটা চেয়ার সরিয়ে বসে পড়ল।

তুমি ত আজকাল কনফিডেনশিয়াল ফাইলগুলো দেখছ?

বাসবী ঘাড় নাড়ল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নীচু হয়ে একটা কাগজে খস খস করে কি লিখলেন, তারপর কাগজটা বাসবীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই দুটো ফাইল নিয়ে এস ত। তুমিই নিয়ে এস, এসব ফাইল বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠাবার চেষ্টা না করাই ভাল।

কাগজের টুকরো নিয়ে বাসবী উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক্, অন্য কিছু নয়। অফিসের কাজের জন্যই ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেকেছিলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাসবী ফাইল দুটো হাতে নিয়ে আবার এ কামরায় ঢুকল। ফাইল দুটো সাবধানে রেখে দিল টেবিলের ওপর।

তুমি বস।

বাসবী আবার বসল।

মিনিট পনের কেটে গেল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর একমনে ফাইল পড়ছেন, আর বাসবী প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে বসে আছে।

একরাশ চিন্তা মনের মধ্যে। কি জানি ফাইল থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কি প্রশ্ন করবেন। কোন পার্টি সম্বন্ধে নতুন কোন তথ্য জানতে চাইবেন।

বাসবী প্রায় সমাধিস্থ অবস্থায় বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফাইল থেকে চোখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ বাসবীকে নিরীক্ষণ করে দেখে বললেন, কেমন লাগছে অফিসের কাজ?

অদ্ভুত প্রশ্ন। যে জীবিকা প্রাণধারণের একমাত্র অবলম্বন, সেটা ভাল কি খারাপ এ চিন্তা অর্থহীন। এ সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে যাওয়াই প্রগলভতার নামান্তর। জীবন ভালবাসলে, জীবিকাকেও ভালবাসতে হবে। এমন নয় যে দশ রকমের জীবিকা ছড়ানো রয়েছে বাসবীর সামনে, তার মধ্যে একটা তাকে বেছে নিতে হবে।

কিন্তু এসব কথা এ কামরায় বলা যায় না। তাই বাসবী শুধু ঘাড় নেড়ে বলল, খুব ভাল লাগছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্মিতহাস্য করলেন।

শুনে খুব খুশী হলাম। মন দিয়ে কাজ কর, ভালই হবে। রয়ও তোমার খুব প্রশংসা করছিল।

চমকে বাসবী মুখ তুলল।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজেকে সংশোধন করে বললেন, তোমার কাজের প্রশংসা। হাত দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা ফাইল দুটো একটু সরিয়ে দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেয়ারে হেলান দিলেন।

ঠিক বুঝতে পারল না বাসবী। বসবে না উঠে দাঁড়াবে।

যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে গিয়েও বাসবী থেমে গেল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কথা বলছেন।

রয়ের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়।

বাসবী পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে

চেয়ে দেখল। কথাগুলো কি স্বগতোক্তি, না বাসবীকে উদ্দেশ করে বলা।

ম্যানেজারের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণীর সম্পর্ক কতটুকু? না কি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ধারণা, সম্পর্ক একটা আছে।

দুটো হাত কোলের ওপর রেখে বাসবী চুপচাপ বসে রইল।

তুমি রয়ের দাম্পত্য-জীবনের ব্যাপারটা জান বোধ হয়?

কিছু কিছু শুনেছি স্যার।

অথচ ওরা পরস্পরকে জেনে-শুনেই বিয়ে করেছিল। ওদের দু'জনকে কাছাকাছি আনার কিছুটা দায়িত্ব আমারও ছিল। বেলা আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে। মেয়েটাকে আমার খুব ভালই লাগত। সত্যি বলতে কি, আমার বাড়ীতেই বেলাকে রয় প্রথম দেখে। আমার স্ত্রীই ওদের দুজনকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ দেয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে অফিসে যোগ দিয়েছেন। ছুটিতে হয়ত কোন শৈলশিখরে কিংবা সমুদ্র-সৈকতে অবসর যাপন করতে গিয়েছিলেন। তার আমেজটুকু নিঃশেষে এখনও মন থেকে মুছে যায় নি। অফিসের আবহাওয়ায় ধাতস্থ হ'তে মন এখনও কিছুটা সময় নেবে।

সেইজন্যই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের এখন এ সব কথা বলতে ভাল লাগছে।

কিংবা এর মূল হয়ত আরও গভীরে। অনিমেষ আর বাসবীকে জড়িয়ে কুৎসার কিছুটা তাঁর কানে গিয়ে থাকবে। সেই জন্যই তিনি প্রকারান্তরে সাবধান করে দিচ্ছেন বাসবীকে। বেলা আর অনিমেষও পূর্বরাগের পালার মধ্যে দিয়েই পরস্পরকে বরণ করে নিয়েছিল, সেই ঘনিষ্ঠতার আজ কি পরিণতি বাসবী দেখুক। এক পতঙ্গ যে ভাবে নিজের পাখা পুড়িয়েছে, সে ভাবে বাসবীও অগ্নি-দগ্ধ হোক, এটা হয়ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর চান না।

বাসবী সাহস সঞ্চয় করে এক আশ্চর্য কাণ্ড করল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, এঁদের দু'জনকে আবার কাছে আনা যায় না স্যর? মিলিয়ে দেওয়া যায় না?

ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে-ছিলেন। কি বুঝি ভাবছিলেন। বাসবীর কথাগুলো কানে যেতেই মুখ ফেরালেন।

মিলিয়ে দেওয়া? দেখ না চেষ্টা করে। তা হ'লে ত খুবই ভাল হয়। দুটো জীবন বাঁচে। শুনলাম, মেয়েটা নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। নিজের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। তুমি চেষ্টা কর বাসবী। You have my best wishes.

বাসবী উঠে এল। খুব মৃদুমন্দ গতিতে। মাথা নীচু করে।

দুটো জীবন বাঁচে! অনিমেষের জীবন আর বেলার জীবন। কিন্তু দু'জনেই কি নিজেদের জীবনের ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে! বেলা নিজেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিঃশেষ হবার প্রয়াস করছে। যে জীবন বেছে নিয়েছে তা প্রায় বারবধূর জীবন।

আর অনিমেষ! বাসবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার বাসনা কি নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবারই দুর্দম প্রকাশ!

বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাসবী হার মানল।

নিজের সীটে গিয়ে বসল বটে, কিন্তু বুকের মাঝখানে একটা কাঁটা বিঁধে রইল।

এ সব কথা বাসবীকে জানাবার কি উদ্দেশ্য? এ ভাবে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কি সাবধান করে দিচ্ছেন বাসবীকে?

যদি বাসবীর মন অনিমেষের প্রতি সামান্যও আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হ'লে বাসবী শুনে রাখুক, অনিমেষ আর বেলাদেবীর মধ্যে বাইরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও, অন্তরের যোগসূত্র এখনও অটুট।

বাসবী নিজের অন্তরের দিকে চোখ ফেরাল।

স্বচ্ছ, কলঙ্কহীন। কোথাও পুরুষের কোন চিহ্নও পড়ে নি। অনিমেষ রায়ের ছায়া কোথাও নেই। তার সঙ্গ ভাল লাগে, তার সঙ্গে কথা বলতেও খারাপ লাগে না। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার বেশী কিছু নয়।

যে দুর্মর বেগ একটা মানুষকে ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে আর একটা সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, সে বেগের সন্ধান হৃদয় তন্ন তন্ন করেও বাসবী খুঁজে পায় নি।

কিন্তু তবু নিজের অন্তরকে বাসবী বিশ্বাস করে না। একটি মুহূর্তের ভুল, ক্ষণেকের দুর্বলতায় মানুষ সর্বস্ব হারায়, এমন নজিরও তার অজানা নেই।

ব্যক্তিগত জীবনে অনিমেষ সুখী নয়। সম্পদ, পদ-মর্যাদা সব কিছু থাকা সত্ত্বেও একদিক দিয়ে অনিমেষ হত-ভাগ্য, এমন একটা চিন্তা বাসবীর মনে বহুবার এসেছে। শুধু চিন্তা মনে আসা নয়, মাঝে মাঝে সমবেদনাও জেগেছে। এটাই মারাত্মক।

সমবেদনা আর সহানুভূতি থেকে গোপন প্রেমের দূরত্ব

বেশী নয়। যৌবনদৃপ্ত ছেলেমেয়েদের পণ্ডিতরা ঘি আর আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একের দাহিকা শক্তি অন্তকে ভস্মীভূত করে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আজকের কথাগুলো বাসবীর জীবনে সতর্ক বাণীর কাজ করুক, তাই সে চায়।

নিজের সীটে বসেই বাসবী টিফিন শেষ করল। আজ আর উঠে কৃষ্ণার কামরায় যেতে তার ইচ্ছা করল না। বেশী কথা বলতে ভাল লাগল না। কারও কথা শুনতেও মন চাইল না।

অফিসের কাজ ছাড়াও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর একটা গুরুভার তার কাঁধে চাপিয়েছেন। অনিমেষ রায় আর বেলাদেবীর মধ্যে তাকে সেতু বন্ধনের চেষ্টা করতে হবে।

কৃতকার্য হবে, এমন আশা কম, কিন্তু সে চেষ্টা করতে গিয়ে বেলাদেবীর কুৎসা-প্রচার যে অহেতুক, মিথ্যাভিত্তিক, সেটা অন্তত প্রমাণ করতে পারবে।

দিন দুয়েক পরেই অনিমেষ অফিসে এসে হাজির হ'ল। দীঘার আবহাওয়া তার শরীরের পক্ষে হিতকর হয়েছে বলেই মনে হ'ল। তাকে প্রফুল্ল, কর্মচঞ্চল, প্রাণোচ্ছল দেখা গেল।

সারাটা দিন একটানা পরিশ্রম করল। দুপুরে লাঞ্চ করতেও বের হ'ল না। ক'দিন যে অনুপস্থিত ছিল, সেটা কাজ দিয়ে পূরণ করে দেবার জন্য যেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

পাঁচটা বাজতে ফাইলের ফিতা বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে ডাকল, মিস সেন।

বাসবী ওঠবার বন্দোবস্ত করছিল। ভ্যানিটি ব্যাগের আয়নায় নিজের মুখটা নিরীক্ষণ করে দেখছিল। প্রসাধনের কোন ত্রুটি আছে কি না।

অবশ্য বাসবী খুব হালকা প্রসাধনই করে। আলগোছে শুধু একটু পাউডারের প্রলেপ। সারাদিনের ক্লান্তিতে মুছে-যাওয়া টিপটা নতুন করে বসায়। রুজ, লিপষ্টিকের বালাই তার নেই।

সকাল থেকে ম্যানেজার তাকে ডাকে নি। নিজের কাজে বিভোর হয়েছিল। পার্টিশনের এধারে যে আর একটা মানুষ বসে, সেটা অনিমেষ যেন ভুলেই গেছে।

ঠিক পাঁচটায় তাকে স্মরণ করতে বাসবী একটু বিরক্তই হ'ল।

কিন্তু নিরুপায়। সহাস্য মুখে অনিমেষের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ডাকলেন ?

আশ্চর্য লোক ত আপনি, অনিমেষ হাসল, একটা লোক সকাল থেকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করছে, সে দিকে দৃষ্টিই নেই আপনার ? তারপর লোকটা যখন অসুস্থ হয়ে বিছানা নেবে, তখন যাবেন সমবেদনা জানাতে।

বাসবী বুঝল এটা কথা নয়, কথার ভূমিকা মাত্র। অনিমেষের আর কিছু বলার আছে। ঠিক তাই।

অনিমেষ কলমটা বন্ধ করতে করতে বলল, চলুন, গঙ্গার ধারে একটু গিয়ে বসি। একটু বিশ্রামও হবে, শহরের কোলাহল থেকেও বাঁচব।

বাসবী গম্ভীর হয়ে গেল। এ ধরণেরই কিছু একটা সে আন্দাজ করছিল। হয়ত কোন রেস্তরায় চা খেতে আমন্ত্রণ জানাবে অনিমেষ, কিংবা কোথাও বেড়াতে যাবার অনুরোধ।

আমার আজ কোথাও যাবার উপায় নেই।

অনিমেষ ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

বাসবীই আবার বলল, বাড়ীতে মা'র শরীরটা খারাপ দেখে এসেছি। সোজা আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। বাসবীর মা'র শরীর ক'দিন খুব ভাল যাচ্ছে না। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে ওঠে। একটুতে পরিশ্রান্ত বোধ হয়।

বাসবী রোজই ভাবে অফিস ফেরত একবার পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসবে। রোগীকে ছুঁলেই চার টাকা দর্শনী। তার ওপর ওষুধের দাম আছে।

মাসের শেষে এটাও একটা ভাববার কথা।

তাই বাসবী মনকে বুঝিয়েছে। আর ক'টা দিন পার হ'লেই মাস শেষ হয়ে যাবে। হাতে মাইনের টাকাটা এলেই ডাক্তারকে ডাকবে।

অবশ্য ডাক্তার কি বলবে তাও যে বাসবী জানে না এমন নয়। বলবে, অত্যধিক পরিশ্রম হচ্ছে। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত সংসারে বিশ্রাম।

সংসারের খাটুনি যে খুব বেশী এমন নয়। চারটে মানুষের সংসার, তার মধ্যে দু'জন ত নাবালক। ঘর বলতে আড়াইখানি। তাও ঝাড়া-মোছা করা আর বাসন মাজার জন্য বাসবী একটা ঠিকা ঝি রেখেছে। দু'বেলা শুধু রান্নার কাজ। অন্য স্ত্রীলোকের কাছে এ কাজ এমন কিছু বেশী নয়।

কিন্তু মা'র দেহের খবর বাসবীর অজানা নয়। মা চিরকালই রুগ্ণা। একটু পরিশ্রমেই কাতর। বাসবীর ধারণা ছিল, বাবার আগে হয়ত মা-ই চলে যাবে। একদিন বিছানা নেবে আর উঠবে না।

জন্ম-মৃত্যুর কথা বলা যায় না। জরাজীর্ণ বাপ বেঁচে

থাকতে চোখের ওপর জোয়ান ছেলে অন্তিম নিশ্বাস ফেলে। এ এক অদ্ভুত বিধান! কোন যুক্তি-তর্কের অধীন নয়।

বিভাস হালদার বেঁচে রইল। মুছে গেল প্রীতিদেবী! বিপরীতটা হ'লে ছেলেটা বাঁচত, থাকতে পারত নিজের মায়ের কোলে। প্রীতিকেও আর একজনের ঋণ শোধ করার জন্য এমন প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হ'ত না।

তা হ'লে অবশ্য আমার আর কিছু বলার নেই। আপনার তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরাই দরকার। যদি বলেন ত আমি মোটরে এগিয়ে দিতে পারি।

বাসবী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই নতুন বিপদের জন্য সে একেবারেই তৈরী ছিল না।

সামলে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগোতে এগোতে বলল, না, না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি চলি।

ঠোঁটের প্রান্ত দু'টি ঈষৎ বেঁকিয়ে অনিমেষ হাসল। মৃদু অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, বুঝলাম আপনি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

বাঁচাবার চেষ্টা? বাসবী সত্যি সত্যিই অবাক হ'ল।

ধুলো-কাদা থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা। যাক, আপনি নতুন কিছু করছেন না। প্রত্যেক মেয়েই এই করে। মর্যাদার দাম সবচেয়ে বেশী হওয়াই উচিত। আর কোন মূল্যে তাকে নষ্ট হতে দেওয়া সমীচীন নয়।

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। কোটটা তুলে নিয়ে যেতে গিয়েই থেমে গেল।

পিছন থেকে বাসবী ডেকেছে।

শুনুন।

কোটটা পিঠে ঝুলিয়ে অনিমেষ ফিরে দাঁড়াল।

আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?

অবিশ্বাস? কেন?

বিশ্বাস করুন, আমার মা সত্যিই অসুস্থ।

ছি, ছি, এ আপনি কি বলছেন। মা'র শরীর নিয়ে মিথ্যা করতে বলতে কম মেয়েই পারে। আমি আপনাকে অবিশ্বাস করতে যাব কেন?

তবে ও কথা বললেন?

কোমরে দুটো হাত দিয়ে অনিমেষ দাঁড়াল। কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে বাসবীর আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, আপনি যে ভয়ে মোটরে আমার সঙ্গে যেতে চাইছেন না, তার কথাই বলছিলাম।

কিসের ভয়?

সম্ভবত কলঙ্কের। আপনি আমার কাছে যা শুনেছেন, যতটুকু, তাতেই হয়ত নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যে অপবাদের ভিত্তি নেই, আমার সঙ্গ বর্জন করলেই কি সে অপবাদ থেকে মুক্তি পাবেন। যারা কুৎসা রটায়, সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের খুব নিবিড় নয়।

বাসবী কোন কথা বলল না। মাথা নীচু করে রইল।

সেই অবকাশে অনিমেষ ক্ষিপ্রহাতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

পায়ে পায়ে বাসবী আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল। টেবিলের ওপর ভর দিয়ে দু' হাতে মাথাটা টিপে বসে রইল।

এ ছাড়া বাসবী আর কি করতে পারত। হয়ত অনিমেষ যা বলেছে তা কিছু পরিমাণে সত্য। মেলামেশা বন্ধ করলেই বেলাদেবীর কুৎসা রটানো বন্ধ হয়ে যাবে না। বিশেষ করে কুৎসার উৎস যখন নিজের অন্তরের বিক্ষোভ। হয়ত ভাববে দু'জনেই সাবধান হয়ে গেছে। পথে-ঘাটে যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন নিভৃত কোন আসরে মিলিত হচ্ছে দু'জনে।

কিন্তু তবু এ ছাড়া বাসবীর অন্য উপায় ছিল না। নিজেকে তাকে সরিয়ে নিতেই হবে।

চকিতের জন্য একটা কথা বাসবীর মনে হ'ল।

এর চেয়ে বি. টি. পাশ করে যদি কোন মেয়ে-স্কুলে শিক্ষিকার কাজ নিত, তা হ'লে বোধ হয় এমন দুর্ভোগের মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ত না।

কিংবা জোর করে কিছুই বলা যায় না। অদৃষ্ট মন্দ হ'লে সেখানেও বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসা কিছু বিচিত্র নয়। দুএকজন একদা-সহপাঠিনীর মুখে বাসবী শুনেছে। সেক্রেটারি না সেক্রেটারির ছেলে অন্তরঙ্গতা করার চেষ্টায় তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

আসল কথা এ দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানই বোধ হয় পাপ। আরও পাপ, ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে জীবিকা অর্জনের প্রয়াস।

কিন্তু বাসবীর ত এ ছাড়া পথও ছিল না; অন্তঃপুরিকার জীবন যাপন করলে, তার সংসার তাকে ক্ষমা করত না। অসহায় ভাই-বোনের কি অবস্থা হ'ত? কি অবস্থা হ'ত রোগজীর্ণ মায়ের?

কতক্ষণ বসে বসে এলোমেলো চিন্তা করছিল বাসবী খেয়াল ছিল না। সচেতন হয়ে ঘড়ির দিকে চোখ ফিরিয়েই চমকে উঠল।

ছটা বেজে গেছে। তার মানে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি

সে বসে রয়েছে। ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

অফিস খালি। কোন বেয়ারাও নেই। শুধু দরোয়ান বসে রয়েছে।

ম্যানেজার থাকলে কামরার বাইরে বসা বেয়ারাটাও অপেক্ষা করত, কিন্তু বাসবীর জন্য সে থাকা প্রয়োজন মনে করে নি। বাসবী কামরার মধ্যে বসলেও তার অফিসের পদমর্যাদা সম্বন্ধে বেয়ারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

ট্রাম ষ্টপেজে বাসবী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। চোখের সামনে দিয়ে অনেকগুলো ট্রাম চলে গেল। সব-গুলোই যে ভর্তি এমন নয়। চেষ্টা করলে বাসবী ঠেলে-ঠুলে উঠতে পারত। একটু দাঁড়িয়ে থাকলে লেডিজ সীটে জায়গাও পেয়ে যেত।

কিন্তু কেমন একটা নিশ্চেষ্টতা সারা শরীর ঘিরে। সব উদ্যম, সব উদ্দীপনা যেন স্তিমিত। সংসারযুদ্ধে বাসবী বুঝি হারই মানল অবশেষে। অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল, অনেক কল্পনা। আকাশচুম্বী কিছু নয়, মাটির মানুষের সাধ্যায়ত্ত যেটুকু। বলিষ্ঠ ভাবে খেয়ে-পরে বাঁচার স্বপ্ন। সেটুকুও বুঝি সম্ভব হবে না।

অনিমেষ তাকে জীবনের সঙ্গিনী করার কথা কোনদিন ভাবে নি। শুধু তাকে হয়ত পথের সঙ্গিনী হিসাবেই চেয়েছিল। যখন কোন কারণে শরীর পরিশ্রান্ত, মন বিক্ষুব্ধ, তখন শরীর-মন প্রফুল্ল রাখার জন্য একজন তরুণীর প্রয়োজন। বাসবী বুঝি সেই তরুণী।

অবশ্য অনিমেষ কোনদিন মাত্রা ছাড়ায় নি। শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে যে ধরনের আচরণ সম্ভব, সেই ধরনেরই ব্যবহার করেছে। হ'তে পারে বাসবীকে সে বান্ধবী হিসাবেই পেতে চেয়েছিল। এ যুগে পুরুষের বান্ধবী থাকাটা কেউ অপরাধ বলে মনে করে না।

কিন্তু পুরুষের পক্ষে সবই সম্ভব, সবই ত্রুটি রহিত। যত কিছু গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অপবাদ নারীর প্রাপ্য। তাই তাকেই সাবধান হ'তে হয় সবচেয়ে বেশী।

এতক্ষণ পরে বাসবী সামনে দাঁড়ান ট্রামে উঠে পড়ল।

নিতান্তই মন্দভাগ্য বাসবীর। মাঝ রাস্তা অবধি যাওয়ার পর ট্রাম বন্ধ হয়ে গেল। শুধু বাসবী যে ট্রামে ছিল, সে ট্রামই নয়, সামনে সার সার অনেকগুলো ট্রাম দাঁড়িয়ে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। ট্রাম কখন চালু হবে বলা মুশকিল।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আরোহীদের মধ্যে অনেকেই নেমে গেল। কাছাকাছি যাদের আস্তানা, তারা অনেকেই নেমে গিয়েছিল আগেই।

বাসবীর নেমে কোন লাভ নেই। এখান থেকে বাসে ওঠা প্রায় অসম্ভব, হেঁটে বাড়ী যাওয়া আরও অসম্ভব।

তবু অনন্তকাল এ ভাবে বসে থাকা যায় না। বাসবী এক সময়ে নেমে পড়ল। তবু যদি বাসে কোনরকমে জায়গা পাওয়া যায়।

রাস্তায় স্থানে স্থানে লোকের জটলা। যারা দূরের যাত্রী তারাই বোধ হয় পথে অপেক্ষা করছে।

বাসবী নেমে হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে যাবার চেষ্টা করল। কয়েকটা ট্রাম এগিয়ে গিয়ে উঠবে।

বাসবী।

নিজের নাম শুনে বাসবী চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাস্তার ধারে একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিল। সে বাসবীর দিকেই এগিয়ে এল।

গাছের ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকার।

লোকটাকে বাসবী ঠিক চিনতে পারল না।

লোকটা একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে বাসবী চিনল।

রণজিত গুপ্ত। দীপক গুপ্তর বাবা।

পোশাক-পরিচ্ছদে আরও সম্ভ্রান্ত, চেহারাও বেশ ঋজু।

সেটাই স্বাভাবিক। রজত মুদ্রাই কৌলীন্যের মাপকাঠি। সুখ, স্বাস্থ্য সব কিছু আসে সম্পদের সঙ্গে।

কি দুর্ভোগ দেখ ত মা। ট্রাম কখন চালু হবে কিছু ঠিক আছে।

আপনি আজকাল এদিকে থাকেন? বাসবী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

এদিকে, মানে, দীপু নিউ আলিপুরে কোয়ার্টার পেয়েছে। ট্রামের চেয়ে আমার বাসেই সুবিধা। ট্রামটা একটু খালি পেয়ে উঠে পড়লাম। ভাবলাম টালিগঞ্জের কাছে গিয়ে বদলে নেব। এখন যা হ'ল, কখন বাড়ী পৌঁছব, কে জানে!

আপনারা, বাসবী ঢোঁক গিলে নিজেকে সংশোধন করে নিল, আপনি এখন ভালই আছেন।

রণজিতবাবু হাসল। ম্লান, নিস্তেজ হাসি। এদিক-ওদিক চেয়ে আশপাশের লোকের কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় বলল, ভাল মানে যদি খাওয়া-পরার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, বল মা, তা হ'লে ভালই আছি বলতে হবে বৈ কি। আমার ত মনে হয়, মনের দিক থেকে আগেই যেন ভাল ছিলাম। আর্থিক সুখ হয়ত ছিল না, কিন্তু মনের শান্তি ছিল।

বাসবী কোন উত্তর দিল না। শুধু আলো-অন্ধকারে মুখ তুলে রণজিত গুপ্তকে নিবিড় ভাবে দেখার চেষ্টা করল।

আজকাল এটাই বোধ হয় রেওয়াজ। সুখে আছে, শান্তিতে আছে এ কথাটা কেউ স্বীকার করতে চায় না। কারণ বর্তমানের সুখ আর শান্তিতে কেউ সন্তুষ্ট নয়। মানুষের করায়ত্ত যেটুকু, লোভ তার দ্বিগুণ।

বাসবী যদি সম্পদের অধিকারিণী হয়, মনের মতন করে সাজাতে পারে সংসার, সংসারের লোকেরা যা চায়, যতটা, নির্বিবাদে মুঠো খুলে তাই দিতে পারে, তা হ'লে সেও কি এমনই ভান করবে। বলবে, এত পেয়েও সে সুখী নয়। অর্ধাশনে থাকার দিনগুলোই তার উজ্জ্বলতম দিন।

তোমার সঙ্গে দীপুর এবারে আর দেখা হয় নি, না ?

বাসবী ঘাড় নাড়ল।

তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে একবার ভাল হ'ত।

এতক্ষণ বাসবী যে কথা বলছিল, যা শুনছিল, সবই নিছক সামাজিক শিষ্টাচারবশত। এ সব কথাবার্তায় তার কোন আগ্রহ ছিল না। বিশেষ কৌতূহলও নয়। কিন্তু এবারের কথায় বাসবী একটু বিস্মিত হ'ল।

বাসবীর সঙ্গে দীপকের দেখা হওয়ার ওপর এতটা জোর দিচ্ছেন কেন রণজিতবাবু। সেই প্রশ্নই সে করল, আমার সঙ্গে দেখা হ'লে ভাল হ'ত কেন ?

রণজিতবাবু আবার এদিক-ওদিক দেখল, তার পর বাসবীকে বলল, একটু এদিকে সরে আসবে, মা।

কৌতূহলী বাসবী সরে এসে ফুটপাথের ওপর দাঁড়াল। রণজিতবাবু একটু ইতস্তত করল, তার পর আস্তে আস্তে বলল, এখন দীপু ভাল চাকরিই করছে। মাইনেটাও ভাল, তা ছাড়া আরও অনেক সুখ-সুবিধাও পেয়েছে। অফিসের গাড়িতে তাকে নিয়ে যায়, পৌঁছে দিয়ে যায়। সবই ভাল, কিন্তু আমার আগের দীপু কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

মনে মনে বাসবী একটু বিরক্ত হ'ল। এত ভনিতা করার ভদ্রলোকের কি দরকার ? কথাটা সোজাসুজি বলে ফেললেই পারে।

অবশ্য কিছুটা যে বাসবী বুঝতে পারছে না এমন নয়। মা-বাপকে দীপক হয়ত একটু অবহেলা করতে সুরু করেছে। যখন সম্বলহীন ছিল, তখন কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। মা-বাপের দুঃখ ঘোচাবার জন্য অনেক কিছু ভাবত। তাদের সামান্য দুঃখে বিচলিত হ'ত। এখন সামর্থ্য হয়েছে বলে, অতটা বোধ হয় চঞ্চল হয় না। কিংবা যে কাজটা নিজের হাতে করা উচিত, সেটা সম্ভবত অফিসের বেয়ারাদের দিয়ে করায়। আগে ছুটে ছুটে নিজে ওষুধপত্র কিনে আনত, এখন হয়ত পয়সা ফেলে দেয়।

নিজের কথা মনে পড়ল বাসবীর।

যখন চাকরির জন্য, এক মুষ্টি অন্নের জন্য অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াত, তখন কতদিন আকাশ থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথেছে। যদি একটা চাকরি জুটে যায়, সংসারের চেহারা বদলে দেবে। মা ভাইবোনের কোন কষ্ট রাখবে না।

যা কল্পনা ছিল, তার আর কতটুকু বাসবী করতে পেরেছে।

এখন নিজের কথা ভাবতে শিখেছে। নিজের ভবিষ্যতের কথা। মনকে বুঝিয়েছে নিজের ভবিষ্যৎ মানেই সংসারের ভবিষ্যৎ। হঠাৎ যদি বাসবী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হ'লে সংসারের অবস্থা অচল হয়ে যাবে। উপার্জন করার আর ত দ্বিতীয় লোক নেই।

অফিস থেকে ফেরার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রায়ই রাতে বাইরে খেয়ে আসে, রণজিতবাবুর কণ্ঠস্বরে বাসবীর নিজের চিন্তা চাপা পড়ে গেল।

তা ছাড়া এদিক-ওদিক থেকে অন্য রকম খবরও কানে আসছে।

কি খবর ?

রণজিতবাবু মাটির দিকে চেয়ে রইল। সেই ভাবেই মৃদুকণ্ঠে বলল, সে সব কথা তোমার কাছে বলতে লজ্জা করে মা।

আশ্চর্য লাগল বাসবীর। উপযাচিকা হয়ে এ সব কথা সে শুনতে চায় নি। রণজিতবাবুই পথ থেকে তাকে ডেকে নিয়ে বলতে সুরু করেছে। কি বলবে, কতটুকু বলবে, আদৌ বলবে কি না, সেটা সম্পূর্ণ রণজিতবাবুর ইচ্ছাধীন। শোনার জন্য বাসবী মোটেই উদ্‌গ্রীব নয়।

কিন্তু রণজিতবাবু লজ্জা কাটিয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

অনেকে বলে দীপুর না কি অনেক মেয়ে-বন্ধু হয়েছে। হোটেলে, পার্কে, পথে-ঘাটে তারা না কি দেখেছে।

রণজিতবাবু আর কিছু বলবার আগেই কোলাহল উঠল। ট্রাম চালু হয়েছে। লোকেরা ছুটোছুটি করে ট্রামে উঠে পড়েছে।

রণজিতবাবুর পাশ কাটিয়ে দ্রুতপায়ে এগোতে এগোতে বাসবী শুধু বলল, ছেলের বিয়ে দিয়ে দিন। এ সব অভ্যাস সেরে যাবে।

রণজিতবাবুর কথা কানে যেতে বাসবীর খেয়াল হ'ল রণজিতবাবু তার সঙ্গ ছাড়ে নি। পিছন পিছন আসছে।

তোমায় আর একটু বিরক্ত করব মা।

বাসবী কোন উত্তর দিল না। মুখও ফেরাল না। শুধু দাঁড়িয়ে পড়ল।

একবার তুমি দীপুকে অনশনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে। সেদিন তুমি ওকে সাহায্য না করলে, আমাদের কি যে অবস্থা হ'ত, ভাবতেও ভয় করে। আর একবার দীপুকে তুমি অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাও। আমার ভয় করে, নামতে নামতে দীপু এমন জায়গায় গিয়ে পৌছবে যেখান থেকে পৃথিবীর কোন শক্তিই আর ফেরাতে পারবে না।

এবারও বাসবী কোন কথা বলল না। সামনে যে ট্রামটা পেল সেটাতেই উঠে পড়ল। একবার শুধু আড়চোখে চেয়ে দেখল রণজিতবাবু তার পিছন পিছন আসছে কি না!

না, রণজিতবাবু এ ট্রামে ওঠে নি। হয়ত বাসবীকে আর তার প্রয়োজন নেই। যেটুকু বলার বলা হয়ে গেছে।

সীটে বসে বাসবী মাথাটা জানলা দিয়ে একটু বের করে দিল। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। ক্লান্তিহর, সুখপ্রদ। শরীর স্নিগ্ধ করে দেয়। এই রকম একটু বাতাসের বাসবীর ভারি প্রয়োজন ছিল। মাথাটা ভার হয়ে আছে। প্রতিটি স্নায়ু অবসন্ন।

বাসবী বুঝি নিখিল মানবের ত্রাণকর্ত্রী। যেখানে যত দুঃখভারাক্রান্ত, পথভ্রষ্ট মানুষের দল অন্যায়ের পঙ্কে নিমজ্জমান, সবাইকে বাসবী টেনে টেনে তুলবে। নিজের অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে সব মালিন্য মুছিয়ে বিশ্বের প্রদর্শনযোগ্য করে তুলবে।

অনিমেষ রায় আর বেলাদেবীকে বিচ্যুতির পথ থেকে উদ্ধার করে পরস্পরের বুকে ফিরিয়ে দিতে হবে। দীপক গুপ্ত অধুনা উন্মার্গগামী হয়ে উঠেছে, তাকে তার পিতার অঙ্কে সমর্পণ করতে হবে।

কিন্তু [বাসবীকে কে রক্ষা করবে! রক্ষা, অপবাদ, অসম্মানের কলঙ্ক থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য কে আসবে এগিয়ে?

বাড়ীর কাছ বরাবর এসে বাসবী একবার ওপর দিকে চেয়ে দেখল। বারান্দা খালি। মা দাঁড়িয়ে নেই।

বেশ রাত হয়েছে। মা বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেছে। নিশাচরী মেয়েকে অভিশাপ দিতে দিতে।

প্রত্যেক দিন আর এ ভাবে মাকে কিছু একটা বোঝাতে ভাল লাগে না বাসবীর। মা'র সন্দেহের মুখোমুখি নিত্য দাঁড়াতে অবসাদ আসে।

মাঝপথে আজ বৈদ্যুতিক গণ্ডগোলের জন্য যে বাসবীর আসতে দেরি হয়েছে, এ কথাটাও মা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। তার মানে, দরজা ভেজিয়ে রেখে মা ভিতরে চলে গেছে। মেয়ের মুখোমুখি না দাঁড়াতে হয়।

বাসবী মন ঠিক করে নিল। সত্যি কথাই বলবে, তাতেও যদি মা'র সন্দেহভঞ্জন না হয় ত বাসবী নাচার। তার আর কিছু করবার নেই। যার যা ইচ্ছা ভাবুক।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বাসবী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন একটা দৃশ্যের জন্য সে মোটেই তৈরি ছিল না।

বাসবীর তক্তপোষের ওপর মা শুয়ে। নিমীলিত চক্ষু। দু'পাশে খোকন আর রুবি। ভীত, অসহায় দু'টি মুখ। শিয়রে বসে ঠিকা ঝি মাথায় বাতাস করছে।

কি হয়েছে? অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বাসবী কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করতে পারল না।

রুবি আর খোকন চমকে দিদির দিকে চোখ ফেরাল। দু'জনেরই চোখ জলে পরিপূর্ণ।

তোমার আসতে এত দেরি হ'ল দিদিমণি? রান্নাঘরে কাজ করতে করতে মা মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস, আমার চোখে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে এখানে শুইয়ে দিলাম। গামছা ভিজিয়ে মাথায় দিলাম। বাতাস করতে করতে এতক্ষণ পরে একটু জ্ঞানের মতন হয়েছে। আমি ভাল বুঝছি না দিদিমণি, তুমি শিগ্‌গীর একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস। আমিই আনতাম, কিন্তু মাকে এ অবস্থায় রেখে আমি বের হই কি করে?

মা, মাগো। পরিবেশ ভুলে বাসবী মায়ের পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুটো হাত দিয়ে জাপটে ধরল মাকে।

বার দুয়েক ডাকার পর মা আস্তে আস্তে চোখ খুলল। এদিক-ওদিক চেয়ে কি খুঁজল, তারপর অস্বচ্ছ দৃষ্টি বাসবীর দিকে ফিরিয়ে ম্লান হাসবার চেষ্টা করল।

ঝি আর একবার মনে করিয়ে দিল, তুমি ডাক্তারের কাছে আগে যাও দিদিমণি। তবে ডাক্তার কি করতে পারবে জানি না। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, খারাপ বাতাস লেগেছে।

বাসবী আর দাঁড়াল না। চটি দুটো পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাসবী ডাক্তার নিয়ে ফিরল।

পাড়ার ডাক্তার। এ এলাকার দায়-বিপদে ইনিই দেখা-শোনা করেন। প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ লোক। বাসবীর বাপের সঙ্গেও পরিচয় ছিল।

অনেকক্ষণ ধরে বাসবীর মাকে দেখলেন। রক্তের চাপ, নাড়ীর স্পন্দন, চোখের কোণ টেনে টেনে পরীক্ষা করলেন।

তারপর বাসবীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই মা। পরিশ্রম বোধ হয় একটু বেশী হচ্ছে। কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন।

বিশ্রাম! কথাটা আচমকা বাসবীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার মৃদু হাসলেন, সবই বুঝি মা। মধ্যবিত্তের অভিধানে ও কথাটা নেই। কাজের জোয়ালে সবাই বাঁধা। ঘানি থেকে মুক্তি নেই। তবু শরীর বিকল হ'লে, এ ছাড়া আর উপায় নেই মা। বিশ্রাম না নিলে বড় রকমের একটা অসুখ শরীরকে অধিকার করাও বিচিত্র নয়।

বাসবী মাথা নীচু করে রইল। এই একটা মানুষের বিশ্রাম মানে, সারা সংসার থেমে যাবে। কারও অন্ন জুটবে না। একমাত্র উপায় বাসবীকে অফিস কামাই করে বাড়ীতে থাকতে হবে।

আমার সঙ্গে কাউকে পাঠিয়ে দাও, ওযুধগুলো নিয়ে আসবে।

ডাক্তার চলতে চলতে বলল।

চলুন আমিই যাচ্ছি।

যাবার আগে বাসবী ট্রাঙ্ক খুলে একটা খাম হাতে নিল। মাসের পর মাস সংসারের ক্ষুধা মিটিয়ে যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে, সেটুকু এই খামের মধ্যে জমা হয়। জমার পরিমাণ যে কত তা বাসবীর অজানা নয়।

বার তিন-চার ডাক্তার আনতে হ'লে এ সম্বলটুকু নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

ওযুধপত্র নিয়ে এসে ডাক্তারের প্রাপ্য মিটিয়ে বাসবী যখন ফিরে এল, তখন মা'র অবস্থা একটু ভাল। রুবি আর খোকনকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এসে মৃদু গলায় কথা বলছে।

বাসবী আসতে ঝি উঠে দাঁড়াল।

আমি চলি দিদিমণি, অনেক রাত্তির হয়ে গেল। এক বাড়ীতে কাজ করতেই যেতে পারলাম না।

কিছু বলার নেই। ঠিকা ঝি, এতক্ষণ যে ছিল, এই যথেষ্ট।

বাসবী খোকনের দিকে চেয়ে বলল, তুমি মাকে একটু দেখ খোকন, আমি রান্নাঘর থেকে আসছি।

একটু পরে বাসবী এককাপ গরম দুধ এনে মা'র মুখের কাছে ধরল। মা একবার দুধের কাপের দিকে, আর একবার বাসবীর দিকে দেখে বলল, এরা কি খাবে?

অর্থাৎ রুবি আর খোকনের দুধটুকু বাসবী মা'র জন্য গরম করে নিয়ে এসেছে।

বাসবী হাসবার চেষ্টা করল, একদিন দুধ না খেলে ওদের কোন কষ্ট হবে না, নারে? তুমি দুধটুকু খেয়ে নাও।

মা আর দ্বিরুক্তি করল না। আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে সব দুধটুকু শেষ করল।

রুবি বলল, আমরা আর দুধ খাব না মা। দুধ খেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। রোজ রোজ তুমি আমাদের দুধটা খাবে মা।

মা কোন কথা বলল না। বুঝি পারল না কথা বলতে। একদৃষ্টে রুবির দিকে চেয়ে রইল। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

একটা পোষ্ট কার্ডে মা'র অবস্থা জানিয়ে বাসবী তিন দিনের ছুটি প্রার্থনা করল। এখন তিন দিন ত নিক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে। অনেক ছুটি পাওনা রয়েছে।

ভোরে উঠে স্নান সেরে বাসবী রান্নাঘরে ঢুকল। কোমরে আঁচল বেঁধে। খোকন স্কুলে বেরিয়ে গেল। সম্প্রতি পাড়ার এক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ঠিকা ঝি তাকে পৌঁছে দেয়।

বাসবী মা'র ভাত থালায় করে টুলের ওপর এনে রাখল। ঝোল-ভাত খেতে ডাক্তার বলেছে।

এ কি, আমায় ডাকলি না কেন? আমি বুঝি রান্নাঘরে গিয়ে খেতে পারতাম না?

মা অনুযোগ করল।

দেখ না, একদিন তোমায় টেবিল-চেয়ারে বসিয়ে খাওয়াব। নাও, জল এনেছি। হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

বাসবীর মা হাত-মুখ ধুয়ে নিল। বাসবী পিঠে একটা বালিশ দিয়ে মাকে বসিয়ে দিয়েছে। পরিষ্কার থালা। পরিচ্ছন্ন ভাতের স্তূপ। ঝোলের রংটাও চমৎকার।

মাও রান্না করে। কিন্তু প্রতিদিনের কাজ বলে কোন রকম উৎসাহ পায় না। কোন রকমে রান্না-বান্নার কাজটা সেরে নেয়। পরিশ্রান্ত দেহ সব উৎসাহ স্তিমিত করে দিয়েছে।

বাসবী চিরকালই ঘোরতর সংসারী, অন্তত এই বিপর্যয় ঘটবার আগে পর্যন্ত। কলেজে পড়ার সময়েও মাঝে মাঝে

মাকে সরিয়ে নিজে রান্নাঘরে ঢুকত। সব রান্না এক হাতে করত। সেদিন বাড়ীর একটি লোকের কাছে সে সব অন্ন-ব্যঞ্জন অমৃত হয়ে উঠত।

অথচ বাসবীরই সংসার করা হ'ল না। মানুষটার মনে কি ছিল বাসবীর মা'র জানা নেই, কিন্তু তার নিজের খুব ইচ্ছা ছিল মেয়েকে ঠিক বয়সে বিয়ে দিয়ে ঘরণী, গৃহিণী করে তোলা। সে সব স্বপ্ন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে কোথায় বিলীন হয়ে গেল। মেয়ে যে ঘর বাঁধবে এমন আশা কম। বাঁধলেও নিশ্চয় মায়ের পছন্দমত লোকের সঙ্গে নয়। আজকাল যেমন আধুনিক বিয়ে হচ্ছে, সেই ধরনেরই কিছু একটা করবে। তাও ত এ-সব বিয়ের স্থায়িত্বর কথাও জোর করে কিছু বলা যায় না। এক বছর, দু' বছর, তার-পরই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

কি, খেয়ে নাও, আমার দিকে চেয়ে কি দেখছ?

তুই একটা বিয়ে কর বাসী। সংসারের কাজেই তোকে বেশী মানায়।

তারপর তোমাদের অবস্থা কি হবে? আমি নতুন সংসার গড়লে এ সংসার অচল হয়ে যাবে।

তোরা দু'জনেই এ সংসারে থাকবি।

মা'র কথা শেষ হবার আগেই বাসবী সশব্দে হেসে উঠল।

তুমি ঘরজামাই রাখতে চাও?

মা একটু বিব্রত হ'ল। বিব্রত ভাবটা সামলে নিয়ে বলল, ঘরজামাই কেন? বাড়ীর ছেলের মতন থাকবে।

বাসবী হাসি থামাল না। বলল, তোমার মতলব বুঝেছি মা। মেয়ের রোজগার, জামাইয়ের রোজগার দুটোই থাকবে এ সংসারে।

তা কেন, তোর তখন চাকরি করার আর দরকার কি?

তা হ'লে আর বিয়েও হবে না মা। সবাই এখন রোজগেরে পাত্রী খুঁজছে।

মা আর কথা বলল না। হয়ত তার কথাগুলো যুক্তিহীন, কিন্তু মনের ইচ্ছা, কামনা, বাসনা সব সময় যুক্তির পথ ধরে চলে না।

দুপুরবেলা মাকে ঘুম পাড়িয়ে বাসবী পাশে শুয়ে পড়ল। ঘুমাবার চেষ্টা করল, ঘুম এল না। আবোল-তাবোল সব চিন্তায় চেতনা আচ্ছন্ন করে দিল।

দীপক গুপ্ত বড় দরের কর্মচারী হয়েছে ইদানীং। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করছে। এতদিন যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে দরিদ্র জীবনযাপন করছিল, তার প্রতিশোধ নিতে সুরু করেছে। অনেক বান্ধবী জুটেছে। তারা কি দরের বান্ধবী জানতে বাসবীর বাকি নেই। মধুর আকর্ষণে মৌমাছির মতন, অর্থের প্রলোভনে এ ধরনের বান্ধবী এ শহরে খুব সহজলভ্য।

কিন্তু দীপকের সম্বন্ধে বাসবীর একটু অন্য রকম ধারণাই হয়েছিল। মেরুদণ্ড-নির্ভর বিবেকবান। এত সহজে পিচ্ছিল পথের হাতছানিতে ভুলবে, তা ভাবে নি।

কিংবা এমনও হ'তে পারে, হয়ত একটি বান্ধবী নিয়েই দীপক ঘোরাফেরা করে, যে বান্ধবীকে একদিন জীবন-সঙ্গিনী করবে। লোকের কল্যাণে এক বহুতে রূপান্তরিত হয়ে রণজিত গুপ্তের কর্ণগোচর হয়েছে। তার আশঙ্কার কারণ।

সকলেই একে একে ঘর বাঁধবে। এটাই জগতের নিয়ম। প্রকৃতি চলেছে এই বিধানে। দীপক নিজের সঙ্গিনীকে নিয়ে নীড় রচনা করবে। হয়ত অনিমেষ আর বেলাদেবীর মধ্যেও একদিন সেতুবন্ধন হয়ে যাবে। ফল্গু-ধারায় প্রবাহিত একের প্রতি অন্যের আকর্ষণই এই অসম্ভব সম্ভব করবে।

অভিশপ্ত জীবন শুধু বাসবীদের। চাকরি-সর্বস্ব মধ্যবিত্ত মেয়েদের। অবশ্য আজকাল চাকরি করছে এমন মেয়ে বিয়েও কম করছে না। ট্রামে-বাসে বাসবীরই বহু চোখে পড়েছে। ক'দিন আগে যার সিঁথি শূন্য, কিছুদিন পরেই দেখেছে সে স্বামীর পরমায়ুর চিহ্ন বহন করে চলেছে সিঁথিতে। প্রকোষ্ঠে আয়তির লক্ষণ। খুশীতে ডগমগ দেহ, আনন্দউছল দু'টি চোখ।

কিন্তু বাসবীর মতনও অনেক আছে। সংসার যাদের অক্টোপাশের মত বহু বাহু দিয়ে নিষ্পিষ্ট করে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে নিচ্ছে। বুভুক্ষা মুখব্যাদান করে আছে। আজ যদি বাসবী নিজের সুখটুকুই বড় করে দেখে, হৃদয়ের তাগিদে বিবেক ভুলে গিয়ে, অন্য মানুষের হাত ধরে নতুন এক সংসারে গিয়ে ঢোকে, তা হ'লে এতগুলো ক্ষুধার্ত, অসহায় মুখের কি হবে। কে দেখবে তাদের!

বাসবী মেঝের ওপর বিছানা পেতে শুয়েছিল। উঠে পড়ল। মা তক্তপোশে শুয়ে আছে। ক্লান্ত, অবসন্ন শোবার ভঙ্গি। তার বুকের কাছে ঘুমন্ত রুবি। রুবির স্কুল সকালে।

চেয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা মমতায় বাসবীর মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষের শেষ কথাগুলোর প্রতিধ্বনি কানে ভেসে এল। কর্তব্যের দৃঢ় রজ্জুতে বাসবী আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সংসারকে সরিয়ে

নিজের কথা ভাববার, নিজেকে দেখবার তার কোন উপায় নেই।

বাসবী বাইরের বারান্দায় চলে এল।

ছুটির ছুটো দিন কেটে গেল। ছু'দিনেই বাসবী যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ক'জনের রান্না সকালেই সেরে নেয়। তারপর সারাটা দিন যেন আর কাটে না। পুরোনো মাসিক পত্রিকা ছুপুর বেলা সময় কাটাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভাল লাগে নি। সব গল্পই একঘেয়ে, জীবনের স্পর্শবর্জিত মনে হয়েছে।

ট্রাম-বাসের ভীড়, অফিসের নিরুত্তেজ ফাইল-চিহ্নিত জীবন, কিন্তু তারও একটা মাদকতা আছে। অদৃশ্য মায়া-তন্তুর বাঁধনে কবে বাসবীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, বাসবী টেরই পায় নি। ছু'দিনেই তার আকর্ষণ অনুভব করতে পারছে।

মা'র শরীর অনেকটা ভাল। অসুস্থতার কারণ আর কিছু নয়, নিছক দুর্বলতা। ছু'দিনের বিশ্রামেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। আজ সকালে বাসবীকে রান্নার কাজে সাহায্য করতে গিয়েছিল, বাসবী জোর করে বিছানায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

বিকালে বাসবী চায়ের পাট শেষ করে গা ধুয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজায় শব্দ।

রুবি আর খোকন কেউ বাড়ী নেই। পার্কে গেছে। বালিশে হেলান দিয়ে মা বিছানায় বসে।

বাসবীই এগিয়ে গেল। দুধওয়ালা আসার কথা, কিন্তু সে ত আরও পরে আসে। সন্ধ্যা পার হয়ে গেলে।

এ সময়ে কে আবার এল ?

দরজা খুলেই বাসবী কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

এ কি, তুমি !

দরজার ওপারে অফিসের বেয়ারা গৌর দাঁড়িয়ে।

গৌর যে কথাটা বলল তাতে বাসবী চমকাল আরও বেশী।

ম্যানেজার সায়েব এসেছেন দিদিমণি।

ম্যানেজার সায়েব! অর্ধস্ফুট, স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করে বাসবী গৌরের পিছনে উঁকি দিল।

গৌর ব্যাপারটা বুঝল। হেসে বলল, তিনি নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন আপনার মা কেমন আছেন জানবার জন্য।

পলকের জন্ম চিন্তার একটা প্রচণ্ড আবর্ত মস্তিষ্ককোষে আলোড়ন তুলল। হয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই সাধারণ। ভদ্রতার সীমা-বহির্ভূত কিছু নয়। অনিমেষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তখন বাসবী গিয়েছিল। এটা স্বাভাবিক। এটাই শিষ্টাচার সম্মত।

সবই বুঝল বাসবী কিন্তু তার মন দিয়ে সবাই সব কিছুর বিচার করবে না। গৌরই সারা অফিসে বলে বেড়াবে, দিদিমণি তিনদিন অফিসে আসে নি, মা'র অসুখের জন্ম, তাই ম্যানেজার-সায়েব ছুটে গিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

অফিসের লোকের কথা থাক, বাড়ীর লোকটা কি মনে করবে। বেয়ারা পাঠিয়ে খবর নিলেই হ'ত, নিজে ছুটে আসাটা বাসবীর মা মোটেই ভাল চোখে দেখবে না।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসবীর এত কথা ভাববার সময় নেই। অনিমেষ হয়ত গলির মোড়ে মোটরে অপেক্ষা করছে, বাসবীর উচিত এগিয়ে গিয়ে দেখা করা।

তুমি একটু বস গৌর, আমি ম্যানেজার সায়েবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

দরজার পাশে রাখা চটি ছুটো বাসবী পায়ে গলিয়ে নিল। আঁচল দিয়ে মুছে নিল মুখটা। একবার ভাবল, হালকা পাউডারের প্রলেপ দিয়ে নেবে, কিন্তু কি ভেবে কিছুই করল না।

গৌরের পাশ কাটিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

নীচে নেমেই একেবারে অপ্রস্তুত।

বাড়ীর সামনে অনিমেষ দাঁড়িয়ে। পায়চারি করছিল, সম্প্রতি থেমে ছ'টি ছোট ছেলের মারপিট দেখছে।

এ কি আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ? ওপরে আসুন।

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, এখানে এসেই আপনাকে যথেষ্ট বিব্রত করেছি, ওপরে আর উঠব না। আপনার মা কেমন আছেন ?

একটু ভাল।

আমার হয়ত আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু নানা দিক ভেবে আর আসতে চাই নি। কিন্তু আজ সকাল থেকে নিজের মা'র কথা খুব মনে পড়ছে। জানেন, মাকে আমার ভাল মনেই নেই। আমার সম্বল মায়ের স্মৃতি। তাও একটা ফটোকে কেন্দ্র করে। অফিসে বসে ভাবছিলাম, মা'র অসুস্থতায় আপনি নিশ্চয় খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। মাকে পাই নি বলেই বোধ হয় এটা খুব বেশী করে বুঝতে পারি। তাই গৌরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বেশ করেছেন। আসুন, ওপরে আসুন। অবশ্য আপনার মতন লোককে অভ্যর্থনা করবার কোন সম্পদই আমাদের নেই। বাড়ীর এমন অবস্থা আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতেই আমার লজ্জা করবে।

আপনি চিরকালই বাক্‌পটিয়সী। সে পরিচয় আগেও পেয়েছি। কিন্তু আজ আর যাব না। একটু পরেই আমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ী যেতে হবে। অফিসের জরুরি কাজ রয়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। গৌরকে দয়া করে পাঠিয়ে দিন। ওকে বাসষ্টপে নামিয়ে দিয়ে যাব।

হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু বাসবী আর পীড়াপীড়ি করল না। সত্যি ঘরদোরের অবস্থা এমন নয় যে এ ধরনের লোককে নিয়ে গিয়ে বসানো যেতে পারে। তারপর কাটা হাতলভাঙা কাপে চা পরিবেশন করা, সেও কম লজ্জার কথা নয়। তার চেয়ে এই ভাল। এখান থেকে অনিমেষ বিদায় নিক।

তবু বাসবী একবার বলল, কিন্তু এ ভাবে আপনি বাড়ীর দরজা থেকে ফিরে যাবেন?

বললাম ত আর একদিন আসব। আপনার মা একটু ভাল আছেন, এমন খবরে খুবই খুশী হয়ে ফিরে যাচ্ছি।

অনিমেষ চলতে চলতে ফিরে দাঁড়াল।

কাল নিশ্চয় দেখা হচ্ছে অফিসে?

হ্যাঁ, কাল যাব অফিসে। হয়ত মা'র আরও বিশ্রামের দরকার, কিন্তু বাড়ীতে আমার আর ভাল লাগছে না।

কথাটা শুনে অনিমেষের কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য অপেক্ষা না করেই বাসবী দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। উঠতে উঠতেই ভাবল, অনিমেষ এলে শুধু বাসবীই যে বিব্রত হ'ত এমন নয়, বাসবীর মা অপ্রস্তুত হ'ত অনেক বেশী।

শুধু অপ্রস্তুতই নয়, কিছু পরিমাণে বিপর্যস্তও।

বাসবী ওপরে উঠে দেখল বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে। একটু দূরে গৌর।

বাসবী প্রমাদ গণল। মা তা হ'লে সবই দেখেছে। ম্যানেজারের সঙ্গে বাসবীর কথাবার্তা। বাসবীর ভয় হ'ল, গৌরের সামনে মা যেন কিছু বলে না বসে।

তাই বাসবী তাড়াতাড়ি গৌরকে বলল, ম্যানেজার তোমায় যেতে বললেন গৌর, ওঁর একটু তাড়াতাড়ি রয়েছে।

গৌর দ্রুত পায়ে নেমে গেল।

এবার বাসবী মার মুখোমুখি দাঁড়াল। মা কি বলবে বাসবীর অজানা নয়। ম্যানেজারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এত দূর গড়িয়েছে যে বাসবী তিনদিন অফিসে না গেলে, সে ছুটে তাকে দেখতে আসে। এতদিন শুধু ম্যানেজারের কথাই মা শুনেছিল, আজ চোখে দেখল। এত অল্প বয়স, এত সুপুরুষ এটা মা জানত না। জেনে বিপদ বাড়ল ছাড়া কমল না।

বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে মা বাসবীর দিকে চোখ ফেরাল।

তুই কি মেয়ে রে?

কেন মা। বাসবীর কণ্ঠস্বরে আশঙ্কার স্পর্শ।

অত বড় একটা লোককে বাড়ীর দরজা থেকে ফিরিয়ে দিলি?

বাসবীর মনে হ'ল মা যেভাবে কথাটা বলল, তার কানে ঠেকল, বাড়ীর দরজা নয়, বুকের দরজা।

হঠাৎ কোন উত্তর দেওয়া বাসবী যুক্তিসঙ্গত মনে করল না। মা'র কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সুরটা যদিও পরিহাসের নয়, তবুও মনে হ'ল ম্যানেজারের প্রতি আতিথেয়তায় মা'র এত উৎসুক হবার কথা নয়।

ছি, ছি, কি মনে করলেন ভদ্রলোক!

মা'র অনুশোচনার যেন শেষ নেই।

অনেক ভেবে-চিন্তে বাসবী উত্তর দিল, আমাদের সংসারে আনতে লজ্জা করল মা।

কেন, আমরা গরীব বলে? তুমি যে গরীব সেটা তোমাদের ম্যানেজার নিশ্চয় জানেন। অবস্থা ভাল হ'লে অন্য সম্বল থাকলে সচরাচর মেয়েরা পথের ভীড় ঠেলে চাকরি করতে বের হয় না। অবশ্য তুমি যদি অন্য পরিচয় দিয়ে থাক, আমার জানবার কথা নয়।

না মা, বিশ্বাস কর। আমরা যা, ম্যানেজারকে তাই বুঝিয়েছি। বাবার চলে যাবার পর থেকে আমরা কতখানি অসহায়, সব কিছু তাকে খুলে বলেছি। কিছু লুকোই নি, কিন্তু তবু পারলাম না মা, তাঁর ঝকঝকে তকতকে সাজানো গৃহস্থালীর পাশাপাশি আমাদের এই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সংসারটা এত বিশ্রী মনে হ'ল যে তাঁকে আনতে মন চাইল না। তা ছাড়া তাঁর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ীতে এখনই যাবার কথা, কাজেই অন্য কোথাও দেরী করতে পারবেন না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বাসবীর দিকে চেয়ে বলল, ম্যানেজার না আসতে পারেন, তাঁর স্ত্রীকে অন্তত নামিয়ে আনলে পারতে।

এবার বাসবী রীতিমত চমকে উঠল।

তাঁর স্ত্রী?

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ী যখন নিমন্ত্রণ তখন মোটরে স্ত্রী থাকাও খুব স্বাভাবিক।

বাসবী দম নিল। মনে মনে একটু ভাবল। এ ধরণের কথা গৌর নিশ্চয় মাকে বলবে না। বলতে সাহস করবে না। এ সব মারই কল্পনা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ী নিমন্ত্রণ নয় মা, অফিসের

কাজের জন্য যাচ্ছেন। তা ছাড়া স্ত্রী আবার কোথা থেকে এল?

সে কি, এখনও বিয়ে করেন নি ভদ্রলোক? মার ছুটি চোখ জ্বলে উঠল।

চোখের সেই দীপ্তির দিকে দৃষ্টি রেখেই বাসবী বলল, তোমাকে বলেছিলাম, তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ মা। ম্যানেজার বিয়ে করেছিলেন। বৌয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

বাসবী মাকে বলেছে কি না ঠিক মনে করতে পারল না। হয় ত সুযোগ পায় নি। কিংবা বলতে চায় নি কথাটা।

মা আর একটি কথাও বলল না। বারান্দা থেকে সরে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াল। বিদায়ী সূর্যের আলোয় মার ছায়াটা দেয়ালের ওপর দীর্ঘ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যে যেতে যেতে ক্লান্ত, বিষাদঘন সুরে মা বলল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পিঠটা বড্ড কনকন করছে। বিছানায় গিয়ে একটু শুই। তুই এখানে একটু দাঁড়া বাসী, ছেলেমেয়ে ছুটো পার্ক থেকে এখনই ফিরবে।

বাসবী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। অজস্র চিন্তার কীট কিলবিল করে উঠল মাথার মধ্যে। সম্ভবত মার মনে ক্ষীণ একটা আশা জেগেছিল। ম্যানেজার যখন উজান বেয়ে বাসবীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন দু'জনের মধ্যে একটা নতুন মধুর সম্পর্ক যে গড়ে উঠেছে, এটা মনে করার পথে কোন বাধা নেই। অনিমেষ রায়ের বয়স আর চেহারা ছুটোই মার পছন্দ হয়েছিল। মা ভেবেছিল, আরও কাছ থেকে দু'জনকে দেখবে। একেবারে পাশাপাশি। অনুরাগের মাত্রা কতটা হয় ত আন্দাজ করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু ম্যানেজারের বিবাহিত জীবনের ইতিহাস শুনে মা একটু ভয় পেয়ে গেছে। সব মাই এমন ভয় পায়।

তা ছাড়া, পরিণীতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার জটিল তত্ত্বটা মা এখনও আয়ত্ত করে উঠতে পারে নি। মা বয়সে খুব প্রবীণা নয়, কিন্তু মনের দিক থেকে পুরাতনপন্থী। ডাইভোর্স-এর ব্যাপার আজকাল অহরহ কানে আসে বটে কিন্তু সেটাকে পরিপাক করার মতন মনের জোর বা বিচার করে দেখার মতন বিশ্লেষণী শক্তি মার নেই।

কাজেই মা ভাবল, এখানে মেয়ে হয় ত সুখী হবে না। ভাঙা ঘরে সংসার পাততে গিয়ে বুঝি ঠকবে বাসবী। এক মেয়ে যখন স্বামীকে খুশী করতে পারে নি, তখন আর একজন যে পারবে তার স্থিরতা কোথায়?

মার মন বাসবীর অজানা নয়। এ ধরণের মায়েদের মন। মার ধারণা ম্যানেজারের সংসারে আগের স্ত্রীর অভিশাপ রয়েছে, তার অসুখী মনের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। এখানে কেউ সুখী হবে না।

বারান্দার রেলিং ধরে বাসবী আস্তে আস্তে বসে পড়ল। মার চেয়েও যেন ক্লান্ত মনে হ'ল নিজেকে।

(ক্রমশঃ)

"মানবজীবনের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস এবং সেই আদর্শকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, ধর্মের এই ছুটি প্রধান অঙ্গ। রাজনৈতিক পরাধীনতা এই বিশ্বাস ম্লান করে, বা জন্মিতে দেয় না।"

—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৩

কানিক্কর

তুষারকান্তি নিয়োগী

ক্যানভাসের গায় শিল্পী যেন সযত্নে ছবি এঁকে গেছে—তিরুনেলভেলি জেলার অম্বসমুদ্রম তালুকের পাহাড়-ঘেরা অঞ্চল, পশ্চিমঘাটের দু'পিঠ ছুঁয়ে কন্যাকুমারী জেলার আশপাশের অরণ্য, কেরালার ত্রিবান্দ্রম ও কুইলন জেলার চারপাশের ভূভাগে যারা বাস করে তাদের বসতিকেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে, এ কথাই মনে পড়বে। প্রকৃতির স্নিগ্ধছায়ায় বনসবুজের পাশে প্রকৃতির সন্তানদের রমণীয় বাসস্থান। নাম ওদের কানিক্কর, কেউ বা বলে 'কানি'। পশ্চিমঘাটের গা বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে জলকণা—সৃষ্টি হচ্ছে স্রোতস্বিনী—দু' তীর ঘিরে শ্যামলীন বনাচ্ছাদন; এরই মাঝে ইতস্তত বিচরণ করে বেড়ায় 'কানি'র দল ভারতের অন্যতম প্রাচীন এক 'কোম'। নদী বয়ে চলে পূর্বে-পশ্চিমে—নদীর ওপর কোথাও কোথাও নির্মিত হয় বাঁধ, সেই বাঁধের গা বেয়ে তৈরি হয় রাস্তা—বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হবার একমাত্র নিশানা। নিস্তরঙ্গ সীমিত সুমিত জীবন-প্রবাহ—সুশীল শান্তরসাস্পদ জীবনোপভোগ ওদের।

বর্তমান ভারতে যতগুলি আদিম কোম বাস করে, 'কানি'রা তাদের মধ্যে প্রাচীনতার দিক দিয়ে অন্যতম। আর ওদের আছে একটি বিশেষ চারিত্রিকতার অধিকার যেটা অন্যদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় না। ভারতের প্রায় সব ক'টি আদিবাসীদের কাছে বর্তমান সভ্যজগতের ভাব আচার ব্যবহার বিশেষ কিছু আকর্ষণীয় নয়—বরং ওরা যথাসম্ভব এই ধারাকে এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করে। ওরা সভ্যজগতের মানুষকে ভয়বিস্ময় আর ঘৃণামিশ্রিত এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। পক্ষান্তরে কানিক্করদের মধ্যে একটা সহৃদয় অতিথিবৎসল স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোন বাইরের লোকই তাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে যাক না কেন, ওদের স্বাদুহৃদয়-সৌরভের পরিচয় না পেয়ে সে ফিরবে না। অতিথিদের তারা হাসি মুখে অভ্যর্থনা করে—ধান মাড়াইয়ের কাঠের যন্ত্র এগিয়ে দিয়ে বসতে আহ্বান জানায়, আপ্যায়ন করে মিঠে নারকেলের সুস্বাদু পানীয় পাত্র এগিয়ে দিয়ে—সঙ্গে যোগাবে সাগু আর মধু। মানুষের আদি সুকুমার বৃত্তিগুলি, আতিথ্য সৌজন্যবোধ ইত্যাদি ওদের স্বভাবে স্বতঃপ্রকাশ, এই আতিথ্যানুগ্রহ এবং স্বাগতমের সঙ্গে এরা দুঃখ প্রকাশ করবে এই বলে যে তারা উপস্থিত অতিথির প্রয়োজন মত সবটুকু যোগাতে পারল না। একটি আদি কোম—কিন্তু বিনয়ে স্বভাব-মাধুর্যে কোন সভ্যমানুষের চেয়ে কম নয়।

কানিক্করা একাধিক নামে পরিচিত। নামগুলির মধ্যে যথাক্রমে কানি, কানিক্কর, কানিকরণ, কানিয়ণ, বেলনমার ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। থার্সটন কানিক্করদের উল্লেখ করেছেন দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলা-জাতি হিসেবে। শিকারে কানিক্করদের উৎসাহ এবং পারদর্শিতা লক্ষণীয়। খেলাধুলোতেও ওরা বেশ উৎসাহী। বাইরের সভ্যমানুষ এই অঞ্চলের অরণ্যে শিকার করতে আসলে কানিক্করদের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সাহায্যদানে এরা সদাতৎপর।

উদ্ভব-ইতিবৃত্ত

প্রত্যেক জাতিরই, কি সভ্য কি আদিম কোম, উদ্ভবের ইতিহাস থাকে এবং প্রায়শই সেই ইতিহাসে অলৌকিক রহস্যময় কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়। কানিদের মধ্যেও ওদের উদ্ভব ইতিহাস সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। তার দু'একটার উল্লেখ এখানে অবাঞ্ছনীয় হবে না। কানিদের ধারণা যে বহুপূর্বে ওরা ত্রিবাঙ্কুর রাজার রাজ্যে বসবাস করত, পরে তারা পপানসম তালুকে চলে আসে—এখানে এসে সিঙ্গমপট্টি জমিদারের বন পরিষ্কারের কাজে লাগে ওরা। অন্যমতে আসলে ওরা মাদুরাই এবং তিরুনেলভেলীর অধিবাসী যেখান থেকে পরে তারা কেরালায় এসেছিল।

ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক আদিম কোমের উদ্ভব ইতিবৃত্তের সঙ্গে শিবের কাহিনী জড়িত আছে। কানিক্করদের বেলাতেও এ ব্যাপারের প্রত্যয় ঘটে নি। তাদের ধারণা যে মূলে ছিলেন কেবল মাত্র শিব নিজে এবং সেই শিব থেকেই কানিদের সৃষ্টি হয়েছে। একবার হস্তপদাদি অঙ্গবিহীন শিবতনু দুরারোগ্য ব্যাধিতে

আক্রান্ত হয় এবং তাঁর সুন্দর স্বর্ণবর্ণ বিষকালো মূর্তিতে রূপ নেয়। একজন দেবতার কাছ থেকে শিব খবর পান যে মর্ত্যে বেলনমার নামে একজাতি বাস করে, যারা শিবকে নিরাময় করতে পারে। এই বেলনমাররা বাস করত চিত্রকন্নিমালা অঞ্চলে। যখন এই বেলনমারদের শিবকে সুস্থ করতে বলা হয় তখন তারা পরস্পরের শক্তি নিয়ে হিংসার ঝগড়া বাধায়। এতে শিব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ডান হাতের আংটি খুলে ফেলেন আর একুশটি মন্ত্রোচ্চারণ করে মর্ত্যে ছুঁড়ে মারেন, এর ফলে চিত্রকন্নিমালার ৭ জন স্ত্রীলোক ছাড়া সমস্ত পুরুষই মারা যায়। উৎক্ষিপ্ত আংটিটা ছিটকে এসে পড়ে বেলনমার নিবাসের কাছে। পরদিন সকালে উঠে যখন মেয়েরা ঘর-দোর পরিষ্কার করছিল তখন তাদের চোখে পড়ে ওই আংটিটা এবং তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করল আংটিটা পরতে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল যে প্রত্যেকটি নারীরই হ'ল গর্ভলাভ। সময় মত ৭টি সন্তানের জন্ম হ'ল। সেই ৭ জনের নাম হ'ল যথাক্রমে, ইন্দ্রন, ইল্যয়বন, চন্দ্রন, ষষ্ঠন, অদবি, মুরথি এবং অয়্-অবিল্লি। সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে তাদের ভাষাজ্ঞান হ'ল এবং দশ থেকে ষোল বছরের মধ্যে হ'ল তাদের মন্ত্রজ্ঞান। তারপর তারা গেল শিবের কাছে এবং সাতদিন ধরে পুষ্পমন্ত্র পাঠ করল—শিব লাভ করলেন আরোগ্য। শিব তাদের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের চাইলেন বর দিতে, পুরস্কৃত করতে। তিনি তাদের আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দিলেন চিত্রকন্নিমালায়।

কানি বা কানিক্করদের বৃত্তান্ত সম্পর্কে আর একটি চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। ত্রিবাঙ্কুরের যুবরাজ মরথান্দবর্মা সিংহাসন নিয়ে ইট্টবেত্তু পিল্লৈমারের (তদানীন্তন রাজা) ছেলেদের সঙ্গে যখন সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন তখন তার কাকা বেলনের একটি আদিনিবাসীর সাক্ষাৎ পান। তার ভ্রমণের সময় ওরা তাকে যথোপযুক্ত সাহায্য করে, তার জীবনরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয়। যখন শেষ পর্যন্ত তিনি সিংহাসন লাভ করলেন তখন তিনি ১০২,৫ 'কনি' জমি নেত্তুমনগাদ, স্তেওনিক্কর, বিলবনকোড এবং কলফুলম ইত্যাদি স্থানে বেলনদের দান করেন। তখন থেকে বেলনদের নাম হ'ল কানি। তারা রাজদরবারে যথেষ্ট খাতির পেত। বনের মধ্যে বিনা পরোয়ানায় তারা আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারত—বিচরণ করতে পারত বনে যথেচ্ছভাবে। স্বাধীনভাবে বনে বাস, বনজাত বস্তু সংগ্রহ, গাঁজার চাষ এবং এক জাতীয় গাছের রস থেকে মদ জাতীয় পদার্থও সংগ্রহ—সব কিছুই ওরা সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে করতে পারত। অবশ্য আজকের দিনে শেষ দু'টি জিনিষের সহজ ব্যবহারের অধিকার কানিরা পায় না। রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ওরা ত্রিবান্দ্রম রাজসভায় মধু, চিনি, বাঁশ, কলা, লাঠি, গাছের ছাল ইত্যাদি উপঢৌকন নিয়ে যেত।

কানিক্করদের বসতি কোন নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে নেই। তবে অধিকাংশ কানিনিবাসই তিরুনেলভেলীর জঙ্গলে দেখা যায়। এর কাছেই পপানসম, যা হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থান। এ ছাড়া অগস্তিপুরের কাছেও কানিদের দেখা যায়। পপানসন বাঁধের কাছাকাছি মিলারেও কানিদের চোখে পড়ে। এখানকার কানিক্কররা সঙ্গে বহুসংখ্যক কুকুর রাখে। মনে হয় পূর্বে যখন ওদের অহরহ বনের মধ্যে চলাফেরা করতে হ'ত তখন বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয়ে ওরা সঙ্গে বহুসংখ্যক কুকুর রাখতে বাধ্য হয়েছিল। ক্ষুদ্র আন্দামানের অধিবাসী খর্বাকায় ওঙ্গীদের মধ্যে অসংখ্য কুকুর পালনের স্বভাব দেখা যায়। শিকারে সাহায্যকারী জীব হিসেবে ওরা কুকুর রাখে। কানিদের মধ্যে আজকাল কুকুরের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যুবকদের মত: কুকুরগুলো সাহায্য ত দেয়ই না, বরং ভীড় বাড়ায়, ঘরদোর নোংরা করে। কন্যাকুমারী অঞ্চলে যে কানিদের বাস তারা অন্যান্য স্থানের কানিদের চেয়ে একটু বেশী প্রাচীনপন্থী। কোরবাকুঝি অঞ্চলের স্বল্প অরণ্যে অন্য আর একদল কানি বাস করে। এখানে খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় কানিদের মধ্যে সভ্যতা ও শিক্ষার আলো পড়েছে, অবশ্য সভ্যতার আলো-আঁধারি রূপ থেকে ওরা বঞ্চিত থাকবে না। অপর একটি কানিনিবাস হ'ল "থচমালাই"।

আকৃতি, প্রকৃতি, পোষাকপরিচ্ছদ ও অলংকার

কানিরা খর্বাকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ। গড়ে প্রত্যেক কানির উচ্চতা হবে ৫'৫"—মাথায় কোঁকড়া চুল থাকার জন্য ওদের ঈষৎ লম্বা দেখায়। মুখ গোল, ঠোঁট পুরু এবং নাক চ্যাপ্টা, পুরুষরা বেশ শক্ত সমর্থ ও স্বাস্থ্যবান—যথেষ্ট শক্তি রাখে দেহে, যদিও শারীরিক পরিশ্রমের ব্যাপারে, যেমন খনি খুঁড়তে, মাটি কাটতে, ওদের স্বভাব-অনীহা। বৃদ্ধেরা চুলের গোছাকে দড়ি দিয়ে একধারে বেঁধে রাখে। যুবকরা কিন্তু একরাশ চুল-বোঝাই মাথা মোটে পছন্দ করে না। কানিক্কররা ধুতি পরে তবে কাজকর্মের সময় তা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে রাখে।

কাজের সময় সঙ্গে একখণ্ড তোয়ালেও রাখে—প্রয়োজন মত সূর্যতাপ থেকে রক্ষা পায়। মেয়েরা কোমরের নীচের অংশ ঢেকে রাখে লম্বা কাপড় দিয়ে, শরীরের অন্যস্থান ঢেকে দেয় জাম্পার দিয়ে। মেয়েরা সাধারণত সাদা কাপড় পরতেই অভ্যস্ত। অবশ্য কাজকর্মের সময় ওদের সাদা কাপড় পরতে দেখা যায় না, কেননা ময়লা হওয়া ব্যাপারটা ওরা সভ্য মানুষদের মতই সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু ময়লা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'লেও ময়লা পরিষ্কার করার কাজটা ওরা কমই করে—অর্থাৎ ধোয়া কাচা খুব কমই করে। পপানসম অঞ্চলের কানি মেয়েরা নিবাসের বাইরে যাবার জন্য রঙীন শাড়ী পরে থাকে। পুরুষরা ধুতির ওপর সার্ট গায় দেয় বাইরে যাবার সময়।

মেয়েরা কেবলমাত্র 'তালি' ছাড়া অন্য বিশেষ কোন অলংকার ব্যবহার করে না। তালি একরকম মঙ্গল হার। অন্য যে সমস্ত অলংকার ওদের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তা খারাপ ধাতুর তৈরি। কোত্তয়রের উত্তরে যে কানিরা বসবাস করে তারা অনেক সময় ক্ষুদ্র উজ্জল গুটিকার এবং শামুকের মালা গলায় দেয়। পিতল এবং এ্যালুমিনিয়মের চুড়ি পরারও রেওয়াজ আছে ওদের মধ্যে। তবে অন্যান্য আদিম কোমের নারীদের মত কানিনারীরা বেশী রকম গয়না ব্যবহার পছন্দ করে না। পুরুষরা কেবলমাত্র কানে মাকড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা ব্যবহার করে না। পূজারী ও বৈদ্যেরা গলায় রুদ্রটত্তম পরে। সন্তান জন্মাবার ২৮ দিনের দিন একটা সুতোয় অনেকগুলি গিঁট দিয়ে উৎসবের মাধ্যমে নবজাতকের কোমরে পরিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেরা সাধারণতঃ উলঙ্গই থাকে।

কানিদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে কপালে উল্কি দেয়।

হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের পাদদেশে কানিকররা বাস করে। ওদের বসতি-কেন্দ্রের চারপাশ ঘিরেই অসংখ্য বনজবৃক্ষ ও বাঁশের ঝাড়। যেখানে পাহাড়ী ঢাল থেকে নদী আরণ্যক সমতলে মিশেছে, সেখানেই সাধারণতঃ কানিদের ছিমছাম বসতি-কেন্দ্রগুলি নির্মিত হয়। এই সমস্ত নদীর ওপর অনেকগুলি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে কানিকরদের যাযাবর স্বভাব সহজ-লক্ষ্য—ওরা কোন একস্থানে বেশী দিন বাস করে না। তবে একটা নির্দিষ্ট বাসস্থান যেখানে ওদের পূর্ব পুরুষদের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে তার ধারে-কাছেই ওরা ঘুরে-ফিরে বসত বানায়।

কানিকররা সভ্যতার অগ্রগতির পথের পথিক, বর্তমানের প্রতি কৌতূহলী ও নির্ভরশীল, গতি সম্মুখগামী —মুদাবারদের মত অতীতগামী বা পশ্চাদ্মুখীন নয়।

ব্যবহার্য জিনিষপত্র

দৈনন্দিন প্রয়োজনে কানিরা যে সমস্ত বাসনপত্র ব্যবহার করে তাদের নির্মাণ-প্রণালী বেশ সহজ সরল। ভাত রান্নার ও জল রাখবার জন্য মাটির পাত্রে কাজ চলে যায়। রান্না করে ওরা মাটির উনুনে। বিশেষ কোন মাঙ্গলিক উৎসবের দিনে ওরা কলাপাতায় খায়। অন্যদিনে এ্যালুমিনিয়মের পাত্রই ব্যবহার করা হয়। কানিরা 'উরল' বলে একপ্রকার কাঠের হামানদিস্তে দিয়ে ধান ভানার কাজ করে। লোহার দণ্ডের সঙ্গে হামানদিস্তের হামান লাগান থাকে। বোতল সংগ্রহ করে রাখবার জন্য কানিদের এক বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটা বাঁশের চোঙার মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুযায়ী বোতলের প্রস্থের মাপে ফুটো করে তার মধ্যে বোতলগুলো ঢুকিয়ে রাখে। ঘরের চালের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে বাঁশের ফাঁকে বদ্ধ বোতলগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই ভাবে বোতলগুলোকে বহুদিন পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় রাখা যায়। আগে মাটি খোঁড়বার জন্য ওরা এক রকমের কঞ্চি ব্যবহার করত, তবে বর্তমানে সমতলের লোকদের মত চেট্টুকত্থি, অয়কত্থি, কুঠার, শাবল ইত্যাদি দিয়ে সেই কাজ করে। আগুন জ্বালাবার জন্য কানিরা আগে চকমকি ব্যবহার করত। জানা যায় যে প্রায় প্রত্যেক পুরুষের সঙ্গেই ওই জিনিষটি থাকত। চকমকির সঙ্গে ছুটো ষ্টিলের টুকরো ঘা দিয়ে আগুন জ্বালান হয়। আগুনের হলকা এক টুকরো তুলোয় লাগিয়ে তাতে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালান হয়। আগুন জ্বালাতে যে সমস্ত উপকরণের দরকার হয় তা সযত্নে একটি ২"/২" সিলিণ্ডারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। আজকাল যদিও প্রায় সমস্ত আদিম 'কোম'ই—প্রাচীন পদ্ধতিতে আগুন জ্বালা ছেড়ে দিয়ে দেশলাই ব্যবহার করতে শিখেছে, কিন্তু কানিকররা এখনও ওদের বিশেষ পদ্ধতিকেই বজায় রেখেছে।

বসবাস, খাদ্য-পানীয়

কানিদের যাযাবর বৃত্তির কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস না করার জন্য ওদের চাষআবাদের ক্ষেত্রও কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। তারা যখন যেখানে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে চাষ করে সেই জমির লাগোয়া ভুখণ্ডেই তাদের বাসস্থান

নির্মাণ করে। প্রত্যেকটা পরিবারের বাসস্থান অবশ্য অপর পরিবারের নিবাস থেকে স্বতন্ত্রই থাকে। মাঝে মাঝে চার-পাঁচটা কুঁড়ে ঘরকে অত্যন্ত কাছাকাছি গড়ে উঠতেও দেখা যায়। কানিদের ঘর তৈরির একটা বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। দু' ঘরওয়ালা সমকোণী আকারের একজাতের ঘর তৈরি করে ওরা। ঘরের মেঝেটা মাটি থেকে কিছু উঁচুতে হয়। ঘরের দেওয়াল তৈরি হয় কাদামাটি দিয়ে; দেওয়ালগুলির উচ্চতা হয় ১ ইঞ্চি—তার ওপর নলখাগড়ার সার থাকে, ওদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'ইথই'। কোন কোন কানি বসতিকেন্দ্রে, যেমন পপানসমে, ঘাসও ব্যবহৃত হয় এ কাজে। ঘাসকে ওদের ভাষায় বলে থরবুপিল্লু। পপানসমে নলখাগড়ার অভাবের জন্যই ঘাস দিয়ে কাজ সারতে হয়। কাষ্ঠদণ্ড দিয়ে ছাদ তৈরি হয়ে থাকে। হাল্কা বাঁশ দিয়ে দুই ঘরের মধ্যে বেড়া দেওয়া হয়। তবে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে সহজেই যাতায়াত করা যায়। ঘরে ঢোকা এবং বেরোনর জন্য সামনে এবং পেছনে দুটো দরজা থাকে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে দরজা তৈরি হয়। প্রত্যেক ঘরেই প্রত্যেক নিবাসেই একটি করে চিলেকোঠা থাকে। চিলেকোঠাকে ওদের ভাষায় 'পরনই' বলে—এর মধ্যে ওরা বীজ ইত্যাদি সঞ্চয় করে রাখে।

১০০ ইঞ্চির ওপর বৃষ্টি হওয়া বাড়ীর জঙ্গলাভূমিতে কানিরা বাস করে। সুতরাং ভাল ফসল পেতে ওদের বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। সাগু ওদের প্রধান খাদ্য। নানারকমের সাগু উৎপন্ন হয় এখানে। সাধারণত দু'রকমের সাগুই ওরা ব্যবহার করে থাকে। এক জাতের সাগু বেশ মিষ্টি এবং অল্প সেঁকে বা ভেজে নিয়ে তা খাওয়া চলে। আর একজাতের সাগু আছে যার স্বাদ একটু তিক্ত এবং খাদ্যোপযোগী করবার জন্য একে সেদ্ধ করে নিতে হয়। নানাশ্রেণীর মশলাপাতির মধ্যে গোলমরিচ, শুকনো লংকা, আদা ইত্যাদির ফলন ভালই হয়। বৃষ্টিধোয়া ঢালে ওরা ধানের চাষ করে। কানি মেয়েদের প্রতিদিনের প্রধান কাজ ধানভানা যা রাত্রে সেদ্ধ করে ভাত হয়।

এ ছাড়া বনে প্রচুর পরিমাণে কাঁটাল, কলা ইত্যাদি ফসল পাওয়া যায়—মধুও পাওয়া যায় বনে। কানিরা কফি, তামাক, সুপারি উৎপন্ন করে প্রচুর পারিমাণে। মাঝে মাঝে হরিণ খরগোস ইত্যাদিও শিকার করে ওরা। কন্যাকুমারীতে বসবাসকারী কানিদের অনেকেরই বন্দুক ও বারুদ রাখবার পরোয়ানা আছে। মোষ এবং গোরু ছাড়া সকল জাতীয় মাংসই ওরা খেয়ে থাকে। এমনকি বড় বড় সাপও ওরা খায়। মোরগ ইত্যাদি ওদের পালিত জীব। সাগু আর মাছ একসঙ্গে মিশিয়ে একরকম খাবার তৈরী করে ওরা। তবে মাছ ধরার মত কাজে ওদের বিশেষ গা দেখা যায় না, ফলতঃ পাশের গাঁয়ের ভেগুর থেকে ওরা টাটকা মাছ কিনে আনে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ওদের দরাজ দিল—অনেকগুলি ভাগই থাকে ওদের পাতে। পুষ্টির অভাব ওদের বড় একটা হয় না, অজীর্ণ রোগে ওদের ভুগতে হয় না।

কৌম-শ্রেণীবিভাগ

প্রত্যেক কানি বসতিকেন্দ্রেই একজন করে মোড়ল থাকে। তার নাম মুট্টকানি। তার কাজে সাহায্য করে ভিঝি কানি; ভিঝি কানির কাজ হ'ল মুট্টকানির আদেশে কোন ব্যক্তিকে গ্রামপঞ্চায়েতের সামনে হাজির করা। এই দু'টি পদ যথাক্রমে মাতৃতান্ত্রিক আচারে পূরণ হয়ে থাকে। অবশ্য সময় সময় ধারাবহির্ভূত নতুন লোককেও দলপতির স্থান দেওয়া হয়। মুট্টকানির ওপর গ্রামস্থ দোষী ব্যক্তিদের বিচারের ভার থাকে। এই বিচারে আর্থিক জরিমানা এবং শারীরিক দণ্ডদানের ব্যবস্থাও করা হয়—তবে বর্তমান সভ্য সমাজের সঙ্গে পরিচিতির ফলে ওরা দণ্ডহ্রাস করেছে, কেবলমাত্র অর্থদণ্ডের ওপর দিয়েই ওরা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটায়। বনবিভাগের কর্তারা মুট্টকনির কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়ে থাকেন। যে টাকা সংগৃহীত হয়, জরিমানা ইত্যাদি বাবদ, তা দিয়ে বাৎসরিক কোন উৎসবের খরচপত্তর চালান হয়।

ধর্মাচার

কন্যাকুমারী-নিবাসী কানিদের শতকরা ৫ জন বাদে সকলেই হিন্দু। তিরুনেলভেলী জেলার ১৯৫ জন কানির মধ্যে ২৬ জন খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে কানিরা এক পুরুষ আগে পরিচিত হয় যখন তারা "কটলমলহ" নামে মিশনারী বসতিকেন্দ্রে বসবাস করত। তবে খ্রীষ্টান হোক আর হিন্দু হোক কানিদের সম্প্রীতির ব্যাপারে ধর্মের পার্থক্য কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

আচারগত দিক থেকে কানিরা প্রায়শই হিন্দুপ্রথাগুলি মেনে চলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিন পরমদেবতার পূজা কানিরা বেশ ভক্তিভরে করে থাকে। আবার এই সঙ্গে তারা সুব্রাহ্মনিয়া, আয়প্পন, সষ্ঠবু, থাম্বরণ এবং মুথরেম্মার পূজা করে থাকে। দেবভক্তরা তাদের মন্ত্রপাঠের জন্য (নেরচই) সঙ্গে করে টেরাকোটা মূর্তি

নিয়ে আসে। থক্কলইতে একটি সুব্রাহ্মনিয়ার মন্দির আছে; থচম লইতে আছে একটি থম্বিরণের মন্দির এবং থিরুনণডিবাকধহতে আছে মুথরম্মার মন্দির। পপানসম-নিবাসী কানিরা অগস্তের পুজো করে এবং অরসপট্টর করুমপনডিয়ম্মন পূজা করে কলকদের কানিক্করেরা। পথিগোইমলই অঞ্চলের কানিরা ভয়ঙ্কর শক্তি-সমন্বিত প্রেতভুত ইত্যাদির পূজা করে থাকে। এই সময় দেবদেবীর নাম পাহাড়-পর্বতের নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় কানিরা একটু বেশী পরিমাণে ধর্মীয় আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং কিছুটা গোঁড়া।

কানিদের পূজাকে দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—কোদাই এবং পদুক্কাই। প্রথম প্রকারের পূজার আয়োজন করা হয় মহৎ এবং শক্তিশালী দেবতাদের জন্য। থম্বিরণ হ'ল এই জাতীয় দেবতা। বছরে এই পূজা একবারই হয় এবং এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে সমস্ত কানিরা। বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। প্রায় দু' তিন দিন ধরে এই পূজা চলে। এই পূজাকে বাংলার দুর্গাপূজার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বাঁশের সাতটি স্তরে 'পুমকম' নামে একটি বেদী নির্মাণ করা হয় এবং এই বেদীকে নত্র পামপত্র ও ফুল দিয়ে সাজান হয়। আলোচাল দিয়ে তৈরী হয় পোঙ্গলা এবং সেই পোঙ্গলা দেবতার নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূজার পরে প্রসাদ হিসাবে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যে সমস্ত দেবতা পশুবলি পছন্দ করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে পাঁঠা মুরগী ইত্যাদি উৎসর্গ করা হয়। এই উৎসবে পূজার পর কোন এক বিশেষ ব্যক্তি মূর্তির মালিকানা দাবি করে, উন্মাদ নৃত্য করে যাতে আশপাশের ফুল ফল পাতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই নৃত্যশীল ব্যক্তিই উপস্থিত অতিথিবর্গকে চন্দনের টিপ পরিয়ে দেয়। ভক্তেরা উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে চাল-কলা ইত্যাদি বিতরণ করে।

পদুক্কাই নামে অন্য এক প্রকার যে পূজা আছে তা এত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয় না। পূর্বেরটি যেমন গোটা সমাজের উৎসব, এটা কিন্তু তেমন নয় এবং এর আবেদনও তত ব্যাপক নয়। অর্থাৎ প্রথমটি সার্বজনীন, অপরগুলি লক্ষ্মী শীতলা ষষ্ঠী ইত্যাদি পূজার মত। কোদায়ের জন্য যদি কানিরা ৫০০ টাকার বাজেট করে তবে পদুক্কাই-এর জন্য করবে ২৩ টাকার বাজেট।

ভূতপ্রেত এবং মূর্তিপূজা ছাড়াও কানিদের মধ্যে আরো কিছু উৎসব আছে, যেমন, ওনাম, মহম, দীপাবলী, করথিকই, এবং উদয়ম। ওনাম উৎসবে ওরা আলোচাল, ফল, কফি এবং অন্যান্য খাদ্য মূর্তির সামনে উৎসর্গ করে এবং পরে তা মদ ও মাংস সহযোগে গ্রহণ করে। সমতল অথবা কিছু নীচু জমিতে দীপাবলী উৎসব হয়ে থাকে। দীপালোকে চারপাশ উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে, তারপর হয় মেয়েদের নাচ, তারপর খাওয়া হয়—"নৈপ্রাম"। গোবর দিয়ে যে মূর্তি নির্মিত হয় তার সামনে পোঙ্গল উৎসর্গিত হয় কলাপাতায়।

বিবাহ-সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান

কানিরা কোন একটা বিশেষ স্থানে বসবাস করে না। তাই স্থানগত তারতম্যের জন্য কানিক্করদের বিবাহ-আচারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বিবাহ-আচারের দু'টি বিশেষ অঙ্গ সমস্ত কানিরাই মেনে চলে। সেই দু'টি আচার হ'ল—তাম্বুল বিতরণ এবং তালি বন্ধন। 'তালি' হ'ল একরকম মঙ্গল হার—বিবাহের অন্যতম স্মারক চিহ্ন হ'ল এই তালি। সধবার শাঁখা-সিঁদুর যেমন বাঙালী স্ত্রীলোকদের বিবাহিত জীবনের পরম পবিত্র বস্তু, কানি মেয়েদের কাছে তালির মূল্য তার চেয়ে কিছু কম নয়। আমাদের বাংলা দেশে স্ত্রীলোক বিধবা হ'লে শাঁখা-সিঁদুর দুটোই ত্যাগ করে—কানি মেয়েরা স্বামী হারালে 'তালি'ও খুলে ফেলে।

কানি সমাজে বিবাহ গোত্রাচারের ওপর নির্ভরশীল। গোত্র কথাটা 'হেল্লোম" নামে পরিচিত। ওরা স্বগোত্রে বিবাহ করতে পারে না। সাধারণত দু'টি ভিন্ন গোত্রের পরিবারের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কানিক্করা বিবাহকে সংস্কৃত শব্দ "বিবাহম" অথবা "কল্যাণম" নামে অভিহিত করে। ওদের মধ্যে ছেলেদের বিবাহযোগ্য বয়েস ২৪ থেকে ২৫ এবং মেয়েদের ১৯ থেকে ২০। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ১৯ বছরের ছেলে এবং ১৭ বছরের মেয়েরও বিবাহ হয়েছে। স্ত্রী সাধারণতঃ পুরুষের থেকে বয়সে ছোটই হয়—তবে যেখানে বিধবা বিবাহ হয়, সেখানে স্ত্রী পুরুষের থেকে বড় হ'তে পারে। কানিক্কর মধ্যে মেয়ের বাপের অবস্থা কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালী বাপের মত নয়। কোন কানি বাপই মেয়ের হয়ে পাত্রের দরজায় যায় না। বিবাহ-সংক্রান্ত যে সমস্ত কথাবার্তা হয় তাতে বর-পক্ষের দায়টাই বেশী। আর বিবাহ বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বাবার চেয়ে "কারনাভনে"র

(মামা) দায়টাই বেশী। কারনাভনই বিয়ের কথাবার্তা চালায়। কারনাভনই বিবাহ ব্যাপারে মূল উপদেষ্টা হলেও ছেলের মতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ওদের মধ্যে মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ প্রচলিত। বিবাহের প্রারম্ভিক উৎসব "তাম্বুল বিতরণ"। এই উৎসব বিবাহের নির্দিষ্টতার স্মারক। তাম্বুল বিতরণের পর বর এবং কনে উভয় পক্ষ থেকেই আসন্ন বিবাহের জন্ম জাঁকজমকপূর্ণ প্রস্তুতি চলে। বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্ম প্যাণ্ডেল (কল্যাণ কলারি) বাঁধা হয় মেয়ের কারনাভনের (মামার) বাড়ীর সামনে। বরের বাড়ীর সামনেও ঐ একই প্রকার প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়।

বিয়ের দিনে বর তার নিজের মামা, বাবা, মা, ছোটভাই ইত্যাদিকে নিয়ে মেয়ের বাড়ী যায়। বর-পক্ষ থেকে কনের জন্ম আনা হয়:

(১) একখণ্ড কাপড় যাকে ওদের ভাষায় বলে মুণ্ডু।

(২) মেয়ের মাথায় ঘোমটা দেবার জন্ম থোরথু।

(৩) তালি অর্থাৎ সোনা বা রূপার তৈরী মঙ্গল হার।

(৪) বিতরণের জন্ম পান-সুপারি।

বিবাহের সময় বর-কনেকে কাপড় এবং পান দেয়। তখন বাদ্য শোনা যায়। তারপর বড় তালি নিয়ে কনের গলার কাছে ধরে। বরের বোন (নাথুন) সেই তালি গ্রহণ করে কনের গলায় বেঁধে দেয়। বর নিজে এই কাজটা করে না কারণ, কনের লজ্জার জন্ম এই কাজে সে কনেকে ছুঁতে পারে না। এরপর গান হয়। গানবাজনার পর বর-কনেকে একই পাতায় মিষ্টি চালের ভাত খেতে দেওয়া হয়। তারপর আশীর্বাদের পালা। আশীর্বাদের জন্ম একটা উঁচু জায়গা করে তার পাশে দুটো পাত্রে জল রাখা হয়। যে-সব গুরুজন আশীর্বাদ করতে চান তাঁরা ধীরে ধীরে সেই জায়গায় আসেন। বর-কনে তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, তাঁরা আশীর্বাদ করেন আর জলপাত্রে অর্থ ফেলে দেন। বরের পাশের পাত্রে যা পড়বে তা বরের ভাগে আর কনের পাশের পাত্রে যা পড়বে তা কনের ভাগে যাবে। এতে করে বোঝা যায় না কে কত দিল। নোট যদি দেওয়া হয় তাও কাগজে মুড়ে হাতে দেওয়া হবে গৃহীতার।

এরপর অতিথিদের ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। পরের দিন বরের বাড়ীতেও একটা ছোটখাট ভোজের আয়োজন করা হয়। বিবাহের খরচ বাবদ প্রায় ৩০০ টাকা ব্যয় হয়।

মাতৃতন্ত্রী কানিক্কর সমাজে স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়। অবশ্য তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং সম্মানের চোখে দেখলেও মেয়েদের বাইরে বেরোন, সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি ব্যাপার কানি সমাজ বরদাস্ত করে না। বিদেশী অথবা অপরিচিত পুরুষের সামনে কানি স্ত্রীলোকরা বেরোয় না। কোন অতিথি আসলে হুট করে তার সামনে কোন কানি পরিবারের মেয়ে হাজির হয়না, অতিথি ঘর ত্যাগ করলে তবেই বাইরে আসে। যদি বাইরের কোন লোক ঘরে কথাবার্তা বলে তা হ'লে কানিক্কর মেয়েরা খিড়কির দরজা দিয়ে যাতায়াত করে। কেবলমাত্র আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া কানি মেয়েরা ঘর বা বসতি-কেন্দ্রের বাইরে বড় একটা যায় না। যাই হোক তাদের মধ্যে অবশ্য পর্দা-প্রথার প্রচলন নেই। নিজের স্বামী বা আত্মীয় পুরুষকে সাহায্য করে ওরা মাঠের কাজে। জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, কুঠার ইত্যাদি তৈরি কানিমেয়েরা বেশ ভালো ভাবেই করে থাকে। সাধারণত কানি মেয়েদের স্বভাবে সহজ-লজ্জাশীলতা ও নম্রকমনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কানিরা মাতৃতন্ত্রী পরিবারের লোক। ওরা মায়ের গোত্রে (হেল্লোম) পরিচিত হয়। বিবাহে কন্যাসংগ্রহে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'লেও কন্যাসংগ্রহে বিশেষ কোন পণ দিতে হয় না। বিবাহিত কি কুমারী, সতীত্বরক্ষা ওদের কাছে যথেষ্ট পবিত্রতার চিহ্ন। তবে দোষত্রুটি ঘটলেও স্ত্রীলোকেরা সহজেই ক্ষমা পেয়ে থাকে। ডিভোর্স চালু আছে, ব্যভিচার যথেষ্ট ঘৃণিত—তবে পুনর্বিবাহ দ্বারা তালিগ্রহণে শুদ্ধিকরণ চলে। বিধবারও বিবাহ হয় কানি সমাজে। কানি সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বড়ই মনোরম। ওদেরই ভাষায় বলা যায়: স্বামী হ'ল—তালিকোট্টিবনমপিল্লঃ—শ্রদ্ধার, যত্নের, সোহাগের এবং প্রেমের সম্পদ।

জীবনবৃত্ত

বনজ সংগ্রহের ওপর প্রাচীনকালে কানিরা জীবন-ধারণ করত। তবে আজকাল ওরা পুরোমাত্রায় কৃষি-জীবী। তবে ওদের কৃষির সঙ্গে সমতলের কৃষির প্রক্রিয়াগত পার্থক্য আছে। কেননা ওদের কৃষি-কাজ এমন এক স্বতন্ত্র পর্যায়ের যে সমতলে নিয়ে এসে ক্ষেত বীজ ইত্যাদি দিলে ওরা সে জমিতে ফসল ফলাতে পারবে না। বনে বাস করে বনের জমির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে ওরা ওদের নিজেদের মত একপ্রকার কৃষি-শিল্প গড়ে তুলেছে। বনজ সম্পদ নষ্ট না করে ঢালু

পাহাড়ী উপত্যকায় ওরা চাষাবাদ করে। বড় বড় গাছ ওরা চাষের জন্যে কেটে ফেলে না। বন পুড়িয়ে চাষের জমি তৈরি করার রেওয়াজ ওদের মধ্যে নেই।

উৎপাদিত ফসলের মধ্যে সাগুই প্রধান—সাগুই ওদের প্রধান খাদ্য। যে পরিমাণ ফসল পায় তাতে ওদের বছরের খোরাক সহজেই ঘরে ওঠে। বাকিটা বিক্রী করে যে অর্থ পায় তা দিয়ে ওরা নুন, শুকনো মাছ, নারকেল তেল, কাপড়, তামাক, পান, বিড়ি ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। ওরা বিক্রীর জন্য যে সাগু, কলা, গোলমরিচ, সুপারি ইত্যাদি নিয়ে আসে তাতে ওরা খুব লাভ করতে পারে না—কেননা সরল কানিদের কেনা-বেচার ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতাই নেই।

বর্ষাকালে লালরঙের এক জাতীয় ধানচাষ করে ওরা। বীজ বপনের আগে ক্ষেতটিকে ধারাল ছড়ির মুখ দিয়ে খুঁড়ে ফেলা হয়—তারপর হয় ধান চাষ। তাছাড়া লঙ্কা, হলদি, সুপারি, নারকেল, কাঁঠাল গাছও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কফির চাষও প্রচুর পরিমাণে হয়। ওদের বাসস্থান কৃষি-ক্ষেত্রের প্রায় সংলগ্ন হবার ফলে ক্ষেতের কাজে বাড়ীর সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারে। যদিও ক্ষেতের কাজে বা কোন কাজেই ওরা বেশ পরিশ্রমী নয় তবুও জমি উর্বরা হওয়ায় ভাল ফসলই গোলায় ওঠে। চাষাবাদ ছাড়া মধু কন্দমূল বন্যফল সংগ্রহ এবং শিকার কানি জীবনবৃত্তের অন্যতম কাজ। বন্য পশু শিকারে বন্দুক ব্যবহার করে ওরা। গ্রীষ্মকালে শিকারীর দল বনে হরিণ, বুনো গোরু, শূকর ইত্যাদি শিকার করে। শিকারে বেরবার আগে একটি দেবতার পূজা করে থাকে। শিকারে যা পাওয়া যায় নিবাসের সকল লোকের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হয়।

মৃত্যুর অপার রহস্যময়তার কোন কুলকিনারা, কি সভ্যমানুষ, কি আদিবাসী অর্দ্ধ সভ্যমানুষ, কেউই পায়নি। যাই হোক এই রহস্যময় ব্যাপার ঘটে গেলে বা ঘটে যাবার আগে থেকেই প্রত্যেক জাতের মধ্যেই কতগুলো আচার-আচরণ প্রচলিত আছে। সকল ধর্মেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান পালনের ইঙ্গিত আছে। আদিবাসী কানিক্করদের মধ্যেও মৃত্যুকেন্দ্রিক আচারের যে পরিচয় পাই তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

অসুখ, সে সাধারণই হোক আর কঠিনই হোক, হ'লেই এ ব্যাপারে মোড়লের সঙ্গে পরামর্শ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মোড়ল অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়। মোড়লের উপস্থিতিতেই গান-বাজনা হয়। সমস্ত রাত ধরে চলে গান-বাজনা, নাচ ও প্রার্থনার মহড়া—উপলক্ষ্য রোগের উপশম। এই প্রসঙ্গে ওরা একটি নৈবেদ্য প্রস্তুত করে যাতে থাকে সাগু, নারকেল, ময়দা, এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য। কিছুক্ষণ পরে মোড়ল দানবীয় ভঙ্গিতে নকল অভিনয় করে—সেই অভিনয়েরই মাধ্যমে ভাবে প্রকাশ করে যে রোগী বাঁচবে কি বাঁচবে না। যদি মৃত্যুর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবে সে বার বার মন্ত্র উচ্চারণ করে (কুহুনি বট্টু মন্ত্রম) এবং পীড়িতের কুহুমি (উপরের শিরা) কেটে দেয়। তারপর মৃত্যুর আগমন ব্যঞ্জক সঙ্গীত গীত হয়। এই সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা তাকে দেখতে আসে। মৃত্যুর পর গাঁজা, আলোচাল, নারকেল ইত্যাদি মৃতের ছেলে ও ভাইপো তার মুখে স্পর্শ করে। তারপর শব গোর দেওয়া হয় তার বাস-স্থান থেকে কিছুটা দূরে। সমস্ত কাজই চলে মন্ত্রো-চ্চারণের মধ্য দিয়ে। সময় সময় শব দাহ করা হয়ে থাকে। বাড়ী ফিরে আত্মীয়স্বজনরা স্নান করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু উপলক্ষ্যে ধার্য অশৌচ পার না হয় ততক্ষণ জমিতে উৎপাদিত কোন ফসলই গ্রহণ করতে পারে না—ভয়, নিয়মলংঘন করলে পাছে বন্য জন্তু তাদের ফসলের কোন ক্ষতি করে। তৃতীয় দিনে ঘরের পাশে একটা ছোট ঘর তোলা হয়। তারপর তিন রকমের সেদ্ধ চাল একটা কলাপাতায় সেই ঘরে রেখে দেওয়া হয়। তারপর স্নান করে তারা স্ব স্ব ঘরে ফেরে। সাতদিনের দিন এই আচার আবার পালন করে সেই অস্থায়ী ঘর ভেঙে ফেলা হয়। তারপর আবার নতুন ঘর তৈরি হয়। ঘরে ফিরে বাড়ী ও উঠানে গোবর-জল ছিটিয়ে শুদ্ধ হয় ওরা। যাদের টাকা-পয়সা বেশী আছে তারা ভাত-তরকারির একটা ছোট ভোজের বন্দোবস্ত করে। আম, নারকেল, কাঁঠাল ইত্যাদির ওপরও গোবরজল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। শবদাহের পর সেই ছাই কোন পাতায় বা পাত্রে করে নিকটবর্তী কোন নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পূর্বপুরুষদের স্মরণে ওরা একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান করে যাতে প্রধান নৈবেদ্য থাকে সেদ্ধ চাল।

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার মূর্তি

ডুন স্কুল : ১৯৩৬

দেরাদুন এসে পৌঁছলাম ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে। স্কুলটা সত্তর-আশী জন ছেলে নিয়ে ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই খুলে গিয়েছিল। গোয়ালিয়র থেকে ছবির বোঝা নিয়ে দেরাদুন পৌঁছে সে সব খুলে ঘর সাজাতে সুরু করলাম। আর্ট স্কুলের কাছেই আমার কোয়ার্টার—সবই বিলিতি ধাঁচের ব্যাপার। তা হবেই বা না কেন? কাজ চালাবার ভার যাঁদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে তাঁরা সবাই ত বিলেত থেকে আমদানী। হেডমাষ্টার 'ইটন' থেকে। 'হ্যারো' থেকে একজন। আরো ছোটখাটো বিলেতি গ্রামার স্কুল ও পাব্‌লিক স্কুল থেকে চার-পাঁচ জন। ভারতীয় মাষ্টাররাও বিলেতি কায়দা-দুরস্ত বিলেত-ফেরত। মাষ্টারদের পোশাক 'ইউনিফরমড্'—অর্থাৎ শীতকালে গ্রেফ্ল্যানেল স্যুট্, সাদা সার্ট, কালো টাই। হেডমাষ্টারকে বলে-কয়ে আমি কোনো রকমে এই 'ইউনিফরমিটি' থেকে রেহাই পেলাম। স্কুলে যাবার সময় সব মাষ্টার কালো গাউন পরে যায়। হেডমাষ্টার আবার শুধু গাউন নয়—হুড্‌টিও মাথায় লাগান।

সকালে ক্লাস আরম্ভ হয়। স্কুলের অর্ধেক ছেলেরা ড্রিল করে—যাকে বলা হয় P. T.—আর অর্ধেক ছেলে P. T.-র পোশাক পরে ক্লাসে যায় বই নিয়ে। প্রথম দলের P. T. শেষ হলে ঘণ্টা পড়লেই অন্য দল একটা ক্লাস করে P. T. করতে যায়। আর প্রথম দল P.T.-র পোশাক বদলে ক্লাস করতে যায়। এই হ'ল সকাল-বেলার হাজরির—অর্থাৎ ব্রেকফাষ্টের আগের ব্যাপার। অবশ্য ছেলেরা সকালে উঠে 'ছোটা-হাজরি' একটা করে থাকে। ব্রেকফাষ্ট ন'টার সময়। ভারতীয়

ধনী সম্প্রদায়, যাঁরা বিদেশী আলোকপ্রাপ্ত,—তাঁরা আর কিছু নকল করুন আর না করুন, বিলেতি ব্রেকফাষ্টটা বেশ ভালো ভাবেই নকল করেছেন। অবশ্য এই নকল এতই মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, একে আর নকল বলা চলে না। চা টোষ্ট, মাখন, মারমালেট, ডিম-'পরিজ' —এ ত দেখি সর্বদেশের লোকেরাই আজকাল খেয়ে থাকে। ডুন স্কুলে, খাওয়া-দাওয়া অবশ্য বিলেতী কায়দায়,—কাঁটা-চামচ-ছুরি ব্যবহার করতে হয়। ব্রেকফাষ্ট হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে ঘণ্টা পড়ে। আবার স্কুলের দিকে ছেলেরা ছোটে খাতা বই সব 'স্যাচেলে' নিয়ে। ক্লাস আরম্ভ হবার আগে সবাইকে অ্যাসেম্বলী-হলে যেতে হয়। স্কুলের সব ছেলে ও মাষ্টাররা এই অ্যাসেম্বলী প্রেয়ারে যোগ দেয়। এখানে একটু 'সেরিমনিয়াল' ভাব থাকে। ছেলেরা লাইন করে একটু মিলিটারী কায়দায় হলে ঢোকে, আর নিজের নিজের জায়গায় এ্যাটেন্‌সন্ হয়ে দাঁড়ায়। স্কুলের বড় ক্যাপ্টেন (যাকে 'হেড বয়' বলা হয়) 'অ্যাসেম্বলী'তে সবাই জড়ো হ'লে হেডমাষ্টারকে গিয়ে খবর দেয়। হেডমাষ্টার তখন কালো গাউন পরে, মাথায় হুড্‌টি লাগিয়ে 'গট্‌গট্' করে অ্যাসেম্বলী হলে এসে প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর দাঁড়ান। হাতে থাকে কাগজপত্র, নোটিশ ইত্যাদি। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে একটি ছোট প্রার্থনা পড়েন ইংরেজীতে। তারপর হয় গান। প্রথম প্রথম 'জনগণমন' কিংবা 'জয় হোক নব অরুণোদয়'—এই দু'টি গান হ'ত। গান দু'টি আমিই শিখিয়েছিলাম। আমাকেই স্কুলের গোড়াপত্তনের সময় গানের 'লীড্' নিতে হ'ত। কারণ তখনও গানের জন্য কোন লোক রাখা হয় নি। এ এক বেশ ঝক্কি! বেশীর ভাগ বেসুরো বাঙালী ও অবাঙালী ছেলেদের দিয়ে বাংলা গান গাওয়ানো,—সেকি সোজা কথা! গান হয়ে যাবার পর দৈনিক নোটিশ—য়' ছেলেদের বলবার থাকে হেডমাষ্টার তা ছেলেদের বলে দেন। তারপর হেডমাষ্টার নিজের হাত দুটো নীচে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র সারা স্কুল 'এ্যাটেন্‌শন্'—'রাইট এ্যাবাউট টার্ণ' করে লাইন দিয়ে নিজের নিজের ক্লাসে চলে যায়। ক্লাস হয় সুরু;—বেলা একটা পর্যন্ত চলে। মধ্যে অবশ্য আধ ঘণ্টার জন্য ব্রেক থাকে,—যখন মাষ্টাররা সব তাঁদের কমন-রুমে বসে গপ্পোগুজব এবং চা-পান করেন। ছেলেরাও সেই সময়-টুকু ছুটি পায়; কেবল দুষ্টু ও রুগী ছেলেরা ছাড়া। দুষ্টুদের সেই সময় হেডমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করতে ডাক পড়ে এবং অসুস্থ ছেলেরা হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের কাছে ওষুধ নেয়। হাসপাতালে ডাক্তার আসেন বাইরে থেকে। স্কুলের হাসপাতালে দিনে ও রাতে—সব সময় দু'টি নার্স ও একটি কম্পাউণ্ডার থাকেন।

ডুন স্কুলে ভর্তি হ'তে গেলে বড়লোক না হ'লে চলে না। কারণ মাসিক প্রায় তিনশো' সাড়ে তিনশো টাকা একটি ছেলের পিছনে খরচ করার সামর্থ্য যাঁরা রাখেন তাঁরাই এখানে ছেলে পাঠাতে পারেন। এঁরা সাধারণত নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী। এঁদের ছেলে-মেয়েরা বিলেতী আয়ার কাছে অনেকেই মানুষ হয়। নিজের মাতৃভাষার চেয়ে ইংরেজীতেই কথা বলে বেশী ছোটবেলা থেকেই। ভারতবর্ষের অনেক বড়ো লোকের ছেলেরা 'হ্যারো' বা 'ইটনের' বা অন্য কোনো বিলেতী স্কুলেও শিক্ষার জন্য যেতো। এটা ভালো কি খারাপ সে নিয়ে তর্ক করতে চাই না। স্বাধীন ভারতের প্রধান-মন্ত্রীও 'হ্যারোতেই' শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর নাতিরাও ডুন স্কুলের ছাত্র। Mr. S. R. Das নিজের ছেলেদেরও শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন বিলেতী পাব্লিক স্কুলে। ডুন-স্কুল স্থাপিত হবার আগে কলকাতায় 'হেষ্টিংস হাউস্' নামে ঐ ধরণের স্কুল একটা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সে স্কুল কিছুকাল চলে উঠে যায়। সে স্কুলের ভিত্তি স্থাপন হয়ত ভালো হয় নাই।

নানান কারণে, ডুন স্কুলে প্রথম এসে আমার মন মোটেই ভালো ছিল না। দেরাদুন জায়গাটি ভালো লেগেছিল। মুসৌরী পাহাড়—গাছপালা, পাহাড়ী নদী, বন-জঙ্গল মনকে মুগ্ধ করেছিল। স্কুলের ছেলেগুলোকে তেমন পছন্দ হ'ল না। অবশ্য তার জন্য ছেলেগুলোকে দোষ দেই না। ফ্লানেলের কেল্টহ্যাট্, নীল সার্টপ্যান্ট-পরা ছেলেগুলো ফিরিঙ্গী ষ্টাইলে ঘুরে বেড়ায়,—পথে-ঘাটে দেখা হ'লে অদ্ভুত ভাবে—গুড মর্নিং স্যার—গুড ইভনিং স্যার,—কেউ টুপি তুলে, কেউ সারা অঙ্গ দুলিয়ে বলে—

'গুড নাইট স্যার'। দেখে-শুনে আমার সারা অঙ্গ জ্বলতে থাকে। ক্লাসে আঁকা শিখতে আসতে লাগলো যখন, তখন প্রথমটা খুব সতর্ক ছিলাম। অল্প কারণেই শাস্তির ব্যবস্থা করে বসতাম। একটু মিলিটরী ভাব রেখে চলছিলাম। সারা দিন নিয়মের মধ্যে ঘণ্টা শুনে শুনে কাজ করে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। অন্ন সংস্থানের জন্য অন্য কোন রকম ব্যবস্থা যদি করতে পারতাম, তবে হয়ত এই স্কুল থেকে অনেকদিন আগেই চলে যেতাম। কিন্তু কি করা যায়। মাষ্টারী চাল বজায় রেখে চলতে লাগলাম। বর্ষাতে প্রায় আড়াই মাস লম্বা ছুটি আছে, শীতের সময়ও দেড়মাস। সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে দিনগুলোকে সরস করে তোলবার চেষ্টা করতাম।

স্কুলের অন্যান্য ভারতীয় মাষ্টাররা প্রথম দিকে বেশীর ভাগই বিলেতী ডিগ্রীধারী ছিলেন। খাস্ বিলেতী মাষ্টাররা কেউ হ্যারো থেকে, কেউ কেউ সেই জাতীয় কোন পাব্লিক স্কুল থেকে এসেছিলেন। হেডমাষ্টার 'ফুট' ইটনে কেমিষ্ট্রি পড়াতেন। কথাবার্তায় কারুর কারুর কি ষ্টাইল। কেউ 'কেম্‌ব্রিজ,' কেউ 'অক্সফোর্ড' ঢঙে কথা বলে। ছেলেরা আবার তাই নকল করে। প্রথম বছরেই বুঝলাম, এখানে বিলেত না গিয়ে সাহেব,—'বিলেত গিয়ে সাহেব' কিংবা প্রকৃত ইংরেজ সাহেব না হ'লে গতি নেই। মাষ্টারদের মিটিংএ, এখানে-সেখানে যেখানেই গল্পসল্প চলে, সেখানেই কেবল একই কথা,—হ্যারোতে অমনটি হয় না, ইটনে টপ্‌হ্যাট্ পরার চলতি আছে,—ছেলেরা মাষ্টারদের দু' আঙুল তুলে 'নড্' করে, সুতরাং এ স্কুলেও সে রকমটি হওয়া চাই। 'উইনচেষ্টারে' ষ্টাডি টাইমকে 'টয় টাইম' (Toye time) বলে, সুতরাং এখানেও ষ্টাডি টাইমকে 'টয় টাইম' বলা হোক।

একটি ইংরেজ মাষ্টার দু'চার মাসের মধ্যেই আবিষ্কার করে বস্‌লেন, ভারতীয় ছেলেদের 'ক্যারেকটার' কম,—তারা চুরিও করে,—এমনটি না কি বিলেতে হয় না। সব কথাতেই তাঁরা বিলেত টেনে আনেন। আর তো পারি না! ঠিক করে ফেললাম, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই যা থাকে কপালে একবার ঘুরেই আসব। চুপ করে মুখ বুজে সব শুনতে গা জ্বালা করে। তা ছাড়া দেখেই আসা যাক্ না, সব আর্ট গ্যালারীগুলো, আর্ট স্কুলগুলো। তার ওপর না হয় পাবলিক স্কুল ও আর্ট ডিপার্টমেণ্টগুলো চাক্ষুস দেখে এলে এঁদের 'চাল্'টা মুখ বুজে সহ্য করতে হবে না!

বিলাত ভ্রমণ

বছর খানেকের ছুটি নিয়ে ইতালী, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স ঘুরে ইংল্যাণ্ডে গেলাম। এই সফরের বিস্তারিত বিবরণ পরে ডায়েরী থেকে লেখার ইচ্ছে রইল। স্কুল, য়ুনিভার্সিটি, আর্ট গ্যালারি, ইটন ইত্যাদি সেবারে দেখা হ'ল। বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। দুন স্কুলের ছাত্রদের ছবি ও মূর্তি নিয়ে গিয়েছিলাম। তার প্রদর্শনী হ'ল ইণ্ডিয়া হাউসে। এই প্রদর্শনী দেখতে এসে একটি ছোট ইংরেজ ছেলে আমায় দেখে বললে—"You are an Indian, but where are your feathers." ভারতবর্ষ সম্পর্কে সেখানকার সাধারণ লোকের জ্ঞান তখন খুব বেশী ছিল না।

ইটনে যেদিন পৌঁছাই, সেই দিনই যে মাষ্টারটি আমায় নিয়ে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন, বললেন—'আজকে একটি ছেলে অন্য একটি ছেলের একটা ঘড়ি চুরি করেছে, সেইজন্য একটু গোলমাল গেল। হাউসের ছেলেদের সব সার্চ করা হয়েছিল, ধরা পড়েছে একটি ছেলে।' এ কি কথা শুনলেন! এখানকার ছেলেরাও তবে চোর! সেই ইংরেজ মাষ্টারটি ভারতবর্ষে এসে আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতীয় ছেলেরা চোর,—আমারও দেখি একই আবিষ্কার। কিন্তু একটি ছেলের দোষে সারা ইটনের বা ইংল্যাণ্ডের ছেলেদের দোষী করলে অন্যায় হবে। কিন্তু ফিরে গিয়ে ইংরেজ মাষ্টারটিকে বলতে হবে কথাটা! বলেও ছিলাম!

যাক্, বছরখানেক দেখেশুনে, ঘুরে-ফিরে আসা গেল। ফিরে এসে হলাম 'বিলাত-ফেরৎ'। ছেলেগুলো, চাকর-চৌকিদার, মালী, খানসামার দল,—এমন কি মাষ্টারও যখন দেখলে, লোকটা 'টাই' পাত্‌লুন পরতে জানে অথচ পারে না, তখন তারা আমায় 'শিল্পী' বলে মাফ করে দিলে বটে, কিন্তু আশ্চর্য হ'ল খুব। দু'একজন মাষ্টার আমার দেখাদেখি পাজামা, পাঞ্জাবী তৈরী করতে দিলে।

অদৃষ্টের পরিহাস

আমার মনে আছে, দুন স্কুলে যোগ দেবার ঠিক আগে 'ফুট' সাহেব আমাকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে উনি বিশেষভাবে লেখেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির আবহাওয়া রক্ষার দিকে আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে নজর রাখতে হবে। এও লেখেন যে, তাঁরা আনকোরা বিলেত থেকে এসেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির কতটুকুই বা জানেন, কতটুকুর সঙ্গেই বা তাঁদের পরিচয়। সুতরাং, এ দিকটার সম্পর্কে তাঁরা ভারতীয় শিক্ষকদের উপরই নির্ভর করবেন! খুব ভালো কথা! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, শান্তিনিকেতনের ছাত্র আমি। মাসে চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা খরচ করে আমার শিক্ষা শেষ করেছি। এখানে এসে দেখি এদের খরচের বহর। মনে হয়েছিল, একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! ভারতীয় সংস্কৃতি এখানে যে আমার দ্বারা কেমন করে রক্ষা পাবে ভেবেই পেলাম না। এরা ইংরেজীতে কথা কয়, ইংরেজী খানা খায়, 'ইটন,' 'হ্যারো' এদের আইডিয়াল—বিলাতী পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, এদের নিয়ে কি করতে পারি। তা ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতি কাকে বলে সেটা আমি নিজেই এখানে ভুলে যাচ্ছি। ভাবলুম, এক কাজ করা যাক। মোজা, জুতো, প্যাণ্ট-পরা ছেলেগুলোকে মাটিতে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে ছবি আঁকবার রীতি চালু করে দেওয়া যাক। ঝাঁ করে চল্লিশখানা আসনের অর্ডার দিয়ে ফেললাম সুরুলে। ছোট ছোট ডেস্ক, মাটিতে বসে কাজ করবার জন্য তৈরী করিয়ে নিলাম। বড় লোকের ছেলেগুলো আমার ক্লাসে বসে আঁকবে কি,—পা মুড়ে বসতেই পারে না! কারুর পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে, কেউ বসে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে, কেউ বা ডেস্কের ওপর চড়ে বসে। বছর খানেক তাদের মাটিতে বসার অভ্যেস করতে লেগে গেল। যাই হোক, ছেলেগুলোকে মাটিতে বসিয়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরে আমি ক্লাস করি। হেডমাষ্টার ভারতীয়-ভাবাপন্ন অভিভাবকদের বা কংগ্রেসী লীডারদের ক্লাস দেখাতে নিয়ে আসেন। ভারতীয় সংস্কৃতির জয়জয়কার পড়ে যায়! ক্লাসের পর ঘরে ফিরে ভাবি, কি মুস্কিলে যে পড়েছি,—এ কোথায় এলাম! এই রকম ঘণ্টা ধরে সাহেবী চালে কতদিন কাটবে জীবন!

দুন স্কুলের আর্ট স্কুল

ছেলেগুলো মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে আমি দিশী কাপড় পরি কেন? হেসে বলি—'আমি দিশী লোক বলে।' একটা বিলিতী মাষ্টারী চাল শিখে নিয়েছিলাম। ছেলেরা ক্লাসে গোলমাল করলে চেঁচিয়ে 'shut up' বলা। গোলমাল করছে—'shut up'! অযথা প্রশ্ন করছে—"shut up!" 'Shut up' হুংকার বড় কার্যকরী। ক্রমে ক্রমে দুন স্কুলের মাষ্টারী জীবনটা সহ্য হয়ে আসতে লাগল। মোটের ওপর যখন দেখলাম এই স্কুলে কাজ আমায় করতেই হবে, তখন নিজেকে স্কুলের জীবনধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘণ্টা পড়ে, ক্লাসে যাই। ক্লাস না থাকলে নিজের কাজ করি বেপরোয়াভাবে। যে যাই বলুক, যে যা ভাবে ভাবুক—এই ভাবখানা। এতে করে একটা প্রকাণ্ড উপকার হয়ে গেল আমার। নিয়মকানুনের মধ্যে থাকলে কাজ করবার যে অপর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় এবং কাজ করা যায়,—সেটা উপলব্ধি করলাম! কাজ করবার অভ্যাসটা গেল বেড়ে। এ্যাসেম্বলী হলেও ছবি আঁকা হ'ল তারপর। ছেলেদের দিয়ে লাইব্রেরীর দেয়ালে ছবি আঁকার কাজে লেগে গেলাম। ক্রমে ক্রমে আর্ট স্কুলটাও বড় হয়ে উঠতে লাগল। পাথরের মূর্তি, কাঠের মূর্তি তৈরীর বন্দোবস্ত করা হল। জয়পুর থেকে একজন মূর্তিকার আনা হ'ল। কাজ আরম্ভ হ'ল পুরোদমে। খটখট-খটাখট,—আর্ট স্কুল দিনে দিনে বেশ একটা লোভনীয় জায়গা হয়ে দাঁড়াল। যাঁরা স্কুল দেখতে আসেন, তাঁরাও আর্ট স্কুল দেখে অবাক হন। ছেলেগুলো কেউ কেউ মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে। অবিশ্যি অনেকে আবার জিনিস নষ্ট করতে, অন্যের ছবিতে হিজিবিজি কাটতে, মূর্তিতে কালি দিয়ে গোঁফ-দাড়ি আঁকতেও পিছ পা হ'ল না। সব রকমেরই ছেলে আছে। সবাই ত আর আঁকা-গড়ার কাজে মন দেবে না; আর সারা স্কুলটাও ত আর্ট স্কুল নয়! গানের স্কুলও হল। সেখানেও গানের মাষ্টারের কাছে ছেলেরা গান শেখে। ছুতোরের কাজ, লোহার কাজ—কিছুরই কমতি নেই—সবই দুন স্কুলে শিখবার বন্দোবস্ত আছে।

সময় নষ্ট করার সময় এরা সত্যিই পায় না। তবে জাতকুঁড়ো ছেলেদের কথা অবশ্য আলাদা।

আর্ট স্কুলের ভেতরই আমার নিজের আঁকবার, গড়বার জায়গা। সেখানে আমি নিজের কাজ করি। ছেলেরাও মাঝে মাঝে আমায় কাজ করতে দেখে। দরকার হলে আমার কাছে এসে কাজ বুঝে নেয়। কাজ করিয়েও নেয় অনেকে। এমনি করে বছরের পর বছর ঘুরে যায়।

কাছেই গ্রাম থেকে একটি কুমোরকে ডেকে এনে তাকে দিয়ে মাটি তৈরী করিয়ে নিতাম। মূর্তি গড়ার কাজ তাই দিয়ে চলত। আর্ট স্কুলের পিছনে একটি ছোটখাটো কুঁড়েঘর তুলে, তার ভেতরে কুমোরের-

নর্ত্তকী

চাক বসিয়ে কিছু পটারীর কাজ সুরু করে দেওয়া গেল। কুমোরের চাক ঘুরতে লাগল,—নেহাতই গ্রাম্যভাবে, লাঠির জোরে! ঘটি, বাটি, ফুলদানি ম্যাজিকের মত গড়ে ওঠে—ছেলেদের মহা ফূর্তি! সবাই করতে চায় কিছু! সবাই চেষ্টা করে; কাদা মেখে, ছিটিয়ে একাকার করে। দু'চারটি ছেলের হাতে যারা মন থেকে সহজে কিছু আঁকতে পারে না, তাদের মাটির গেলাস, বাটি, ফুলদানিতে ডিজাইন আঁকতে বলি। উঠে-পড়ে লেগে যায় ছেলেরা। কেউ কেউ বেশ ভাল ডিজাইন আঁকে ফুলদানীর উপর। সবাই দেখি 'পট্ পেন্টিং-এ' লেগে যায়। রং-চং করে আঁকে কেউ, কেউ আবার আধুনিক ডিজাইন ছাড়ে! রং, বাজারের

লেখক ষ্টুডিওতে

আবার বেশ ভালোভাবেই গড়ে ওঠে গেলাস ফুলদানি। ক্রমে মাটির গেলাস, ফুলদানীতে ঘর ভরে যায়। গ্রাম্যভাবেই ভাটি চড়িয়ে পুড়িয়ে নেওয়া হয় সেগুলো। বুড়ো কুমোরটার অনেক বছরের হাত সাফাই। জানে অনেক কিছুই; কিন্তু সব শেখাতে চায় না। গ্লেজিং ইত্যাদিও জানে। তখন যুদ্ধের বাজার, সহজে কিছু করা মুস্কিল, গ্লেজিংএর রং সব পাওয়া যায় না। তাই ভালো চুলোও হল না। তবু কাজ চলে পুরোদমেই। যুদ্ধের বাজারে ভালো কাগজ পাওয়া যায় না। ছেলেরা ছবি এঁকে কাগজ নষ্ট করে, আবার নষ্ট কাগজেই ছবি আঁকে। এ-পিঠ, ও-পিঠ। ছোটরা, গুঁড়ো রং, আটা মিশিয়ে তৈরী করে নেই,—কম খরচে হয়। ছেলেদের ডিজাইনে হাত খুলে যায়।

এমন করেই চলে আর্ট স্কুলের কাজ। সিলেবাস, পরীক্ষার বালাই রাখি নি। অন্যান্য স্কুলের মাষ্টাররা এসে জিজ্ঞেস করে—'সিলেবাস কই?' বলি—'ও-সবের ধার ধারি না আমি। মনের মধ্যেই সব সিলেবাস আছে। যার যে রকম সিলেবাস দরকার তাকে সেই রকম করতে দিয়ে থাকি।'

তাঁরা বলেন, 'ক্লাস ম্যানেজ করেন কি করে?'

আমার উত্তর—'কোন রকমে করে ফেলি আর কি! একটু মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয় কখনও

কখনও, কিন্তু কি আর করা যায়! সবাইকে এক জিনিষ কি করে আঁকাই বলুন? একি আর জ্যামিতির ক্লাস?'

ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতি

যুদ্ধের আরম্ভের সময়—১৯৪০-৪১ সালের কথা! এই সময় থেকেই মনের ভেতর প্রায়ই একটা প্রশ্ন জাগত। স্কুলটা পাব্লিক স্কুল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ যুগের শেষ অবস্থা! তখন কে জানত যে দেশ এত শীগগির স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা পাবার জন্য দেশের লীডাররা জেলে যেতে আরম্ভ করেছেন আবার। কিন্তু আমরা এই স্কুলে বিলিতী হেডমাষ্টার এবং বড় বড় সরকারী চাকুরেদের আওতায় বেশ নির্বিকার, নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্নে মনের সুখে আছি। এই স্কুলের ছেলেরা বড় হয়ে যথার্থ স্বদেশের কাজে কোন দিন যোগ দিতে পারবে কি না মনে সন্দেহ জাগত। এইখানে এই ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির আবহাওয়ায় ছেলেরা ভারতের প্রকৃত 'সিটিজন' হ'তে পারবে কি না সেটাও ভাববার কথা। এই স্কুলে আমরা আছি, গোড়াপত্তন থেকেই প্রায় আছি। এরই মধ্যে কত ছেলে এল, গেল! আরও কত আসবে। ওয়েটিং লিষ্টে অনেক ছেলের নাম রয়েছে। এখন যাদের খুব অল্প বয়স বা যারা সবে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাও নাম রেজিষ্ট্রি করে রাখছে এমন মা-বাপের অভাব নেই দেশে। এ স্কুল চলবে। ভাল ভাবেই চলবে সন্দেহ নেই। ছুটি ফুরোলেই এক-পাল নতুন বড়লোকের ছেলেরা আসবে। তাদের পেন্সিল, রবার, খাতা, রং, তুলি দিয়ে 'ইক্ড়ী মিক্ড়ী' আঁকা শেখাতে হবে!

শান্তিনিকেতন ও ডুন স্কুল

১৯৩৮ সালে বিলেত থেকে ফিরে বড়দিনের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। তখন গুরুদেব সেখানে ছিলেন। অনুমতি পেয়েছিলাম তাঁর মূর্তি গড়বার। তিনি বসে লিখতেন বা ছবি আঁকতেন। আমি পাশে চুপচাপ তাঁর মূর্তি গড়তাম। আমাকে প্রায়ই হেসে বলতেন, 'দেখ, সাহেবদের ইস্কুলে গিয়ে যেন সাহেব না হয়ে যাস। ওরা ভাল, কিন্তু ওদের ভালটা ত সব সময় আমরা গ্রহণ করি না—গ্রহণ করি খারাপ দিকটাই'—

নন্দবাবুর (মাষ্টারমশায়) সঙ্গে দেখা হ'তে উনিও আমার প্রতি একটু অসন্তুষ্ট মনে হ'ল। বললেন, 'তুমি গিয়ে সাহেবদের দলে ঢুকে কাজ করছ; তুমিও সাহেব হ'তে কতক্ষণ! পারবে কি ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বজায় রাখতে? ওরা ত সব চোর; দেশের সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেছে। দেখ বাপু, শেষটায় চোরের দলে তুমিও না চোর হয়ে পড়!'

লেখকের নিজের মূর্তি

মাষ্টারমশায় তখন সদ্য কংগ্রেস ক্যাম্পে গান্ধীজির সঙ্গ করে এসেছেন। প্যাণ্ডেলের প্যানেলে বহু ছবি এঁকে এসেছেন। সাহেবদের সঙ্গে যে এক সঙ্গে কাজ করি, সেটাও তাঁর অসহ্য লাগছে বুঝতে পারলাম। চুপ করেই রইলাম। আমি যে ঠিক ভারতীয় সংস্কৃতির আবহাওয়ার মধ্যে নেই, ভারতবর্ষে থেকেও সে বিষয় আমি প্রথম থেকেই সজাগ ছিলাম। এঁরা আরও সজাগ করে দিয়েছিলেন।

ডুন স্কুলের একজন ইংরেজ মাষ্টারকে নিয়ে শান্তি-নিকেতনে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আগে 'হ্যারোতে' মাষ্টারী করতেন। তিনি গুরুদেবের সঙ্গে যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন, সে সময় সঙ্গে আমি ছিলাম। গুরুদেব ডুন স্কুল কি রকম ধরনের হ'লে দেশের কল্যাণ

সে বিষয়ে সেই ইংরেজ মাষ্টারটিকে বলেছিলেন। অনেক কথাই বলেছিলেন। বিশ্ব-ভারতীর সম্মিলনীর সেক্রেটারী যখন খবর পেলেন যে একটি ইংরেজ—হ্যারোর মাষ্টার এসেছেন শান্তিনিকেতনে, তাঁকে ধরলেন আবহাওয়ায় মানুষ হবে; তা হোক না, ক্ষতি কি? স্কুলটা না থাকলে সেটাও যে হবে না। ইংরেজ মাষ্টাররা তাদের ইংরেজী পাব্লিক স্কুল মেথডে কতটা আর খারাপ করবেন এই জাতের বড়লোকের ছেলেদের।

শান্তিনিকেতনে লেখক

সম্মিলনীতে পাব্লিক স্কুল সম্পর্কে কিছু বলতে। সে সভায় বেশ খানিকটা আলোচনা-সমালোচনা হয়ে গেল। বিদেশী সাহেব ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল অবস্থার কোন খবরই জানতেন না। সুতরাং তিনি কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারলেন না। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের আইডিয়াল আর দুন স্কুলের আইডিয়াল যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, সেটা বেশ বড় করেই আমার কাছে ধরা পড়েছিল। তা হ'লেও দুন স্কুল মন্দের ভাল! কতকগুলো দেশের ছেলে দেশে থেকেই ইন্দ-ভারতীয় তাঁরা যে আগেই অনেক বেশী ইংরেজ হয়ে আছেন, বরং খানিকটা ভালই হবে মনে হ'ল। এর পরে ফুট সাহেব যখন শান্তিনিকেতনে যান, সে সময় আমিও যাই। সে কথা পরে লেখবার ইচ্ছে রইল।

ছুটির বাঁশী

স্কুলের কাজের ভেতর দিনগুলো কেটে যায় কোথা দিয়ে, কেমন করে, তার হিসেব রাখা তবু সহজ। কারণ স্কুলের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রাখতে পারা যায় না। কারণ, ঘণ্টার তালে অর্ডারি কাজ—সজাগ

হয়ে সে কাজ করতে হয়। সুতরাং মনে রাখা সহজ। কিন্তু ছুটিতে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যে-সব কাজ আমরা করে থাকি, তা সব সময় মনে থাকে না। মনের আনন্দে কখন কি যে করছি তার হিসেব পাওয়া শক্ত। দুন স্কুলে বছরে দু'বার লম্বা ছুটি। ১৯৩৬ সাল থেকে কত বার—প্রত্যেক বারই বেরিয়ে পড়েছি ছুটি উপভোগ করতে। গরমের ছুটিটা দুন স্কুলে দেরি করে হয়—তাকে আর গরমের ছুটি না বলে বর্ষার ছুটি বলাই ভাল। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে আগষ্টের শেষ পর্যন্ত প্রায়। শীতের সময় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারীর শেষ পর্যন্ত। এছাড়াও বছরে দু'বার ছুটির বাঁশী বাজে দুন স্কুলে। 'টার্মের' মাঝামাঝি সময় তিন দিনের ছুটি হয়, যাকে Mid-term বলা হয়। সব মাষ্টাররা তখন ছেলেদের নিয়ে কাছাকাছি কোন সুন্দর জায়গায় ক্যাম্প করতে বের হন। কেউ কেউ হিমালয়ের কোলে কোন ছোট চুড়োয় উঠতে যান। এই ছুটিগুলিতে ক্যামেরা, স্কেচ বই নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে কত যে ঘুরেছি বনে-জঙ্গলে তার হিসেব রাখা কি সোজা কথা! স্কেচ বইয়ের খাতায় এর খবর পাওয়া যায় খানিকটা। আর খানিকটা পাওয়া যায় 'স্ন্যাপ্ শট্' এ্যালবামের পাতায়। এই ছুটির বাঁশীর যে ছাপ মনের মধ্যে পড়ে তাও কালের স্রোতে ধুয়ে-মুছে ক্রমে ক্রমে মনের আয়নায় অস্পষ্ট হয়ে যায়। বসেছি আজ সে সব ছুটির ছবি আঁকতে। বিস্মৃতির কোল থেকে তাদের টেনে বার করতে পারি কি না তারই হবে পরীক্ষা। কিন্তু কি লাভ! লাভ-লোকসান ভেবেই কি মানুষে সব কাজ করে! পিছন ফিরে একটুখানি দেখা! অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া প্রিয়জনের ছবিকেও ত সময় সময় আমরা ফুটিয়ে তুলে ঘরে রাখি। নিজের জীবনের ফেলে-আসা নানান রঙের দিনগুলি—এরাও আমার প্রিয়জনেরই মত। হোক না যতই সাধারণ, আমার নিজের কাছে তার মূল্য যে অনেক। এই পুরণো ছুটির স্মৃতি স্মরণ করবার চেষ্টা ক্ষত ও ক্ষতির হিসাব মেলাবার জন্য নয়—কি পেয়েছি, কি পাই নি, কে দেনা শোধ করে নি তা নিয়ে দুঃখ করবার জন্যও নয়। এ কেবল পথে চলতে চলতে এক ঝলক পিছন ফিরে দেখার আনন্দ।

অবসর সময়ে

ঢাকা-সিলেট-শিলং

১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে দুন স্কুলের কাজে যোগ

দেই। সে বছর বর্ষার ছুটিতে কলকাতা গিয়েছিলাম। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা মনে পড়ে না।

শীতের ছুটিতেও কলকাতায় কাটাই। ফেরবার পথে কাশী, এলাহাবাদ হয়ে দেরাদুন ফিরি।

১৯৩৭ সালে বিলেত যাই। তার বিস্তৃত বিবরণ ডায়েরীর পাতায় লেখা আছে। সে কথা পরে বলবার ইচ্ছে রইল।

১৯৩৮ সালের জুনের শেষ। ছুটি আরম্ভ হ'তেই রওনা দিলাম দেরাদুন থেকে সোজা কলকাতা। কলকাতা ভ্যাপসানী গরম অসহ্য। সদ্য বিলেত-ফেরৎ তখন বলতে গেলে। ফ্যানের তলায় বসে ছবি আঁকলাম। দক্ষিণ চাপা বালীগঞ্জের ফার্ণ রোডের একটা বাড়ীতে আছি। সেইখানেই তখন মা থাকতেন। আমার ছোট বোন শান্তি আর বোধ হয় সেজদারাও ওখানে থাকতেন—ঠিক মনে নেই। বড়দা কাজ করেন তখন ঢাকা য়ুনিভার্সিটিতে। গেলাম চলে ঢাকা। সেই চির-পুরাতন ঢাকার উয়াড়ী-টিকাটুলি-রমনা! বেশ জায়গা ঢাকা;—অন্তত তখন ছিল। এখনকার কথা জানিনে। এখন ত ঢাকা বিদেশ—পাকিস্তান! ঢাকায় কিছুদিন থেকে গেলাম সিলেট। যাবার পথে মনে পড়ে, একটি মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা কি ভয়ই পেয়েছিলেন চাঁদপুরে। ষ্টীমার থেকে জিনিসপত্র কুলীর মাথায় চাপিয়ে চাঁদপুর থেকে সিলেট যাবার ট্রেণে বসলাম; ইণ্টার ক্লাসের যাত্রী আমি। ইণ্টার ক্লাসের কামরা একেবারে খালি তখনও। কেবল একটি মহিলা আছেন বসে। আমার পরনে সার্ট কোট প্যাণ্ট, মাথায় বোধ হয় সোলার টুপী। আমি কোন্ দেশী, হিন্দু, মুসলমান, কি খ্রীষ্টান কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না। ভদ্রমহিলা প্রথমে আমাকে দেখে মনে হল খুসীই হলেন। ভাব-খানা, তবু যা হোক এতখানি পথ একলা যেতে হবে না। ট্রেণ ছাড়তে তখনও কিছু দেরী ছিল। আমি ত জিনিষপত্র বাংকে তুলে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। তিনিও দেখি বসে বসে মাসিক পত্রিকা পড়ছেন, কিংবা পড়ার ভান করছেন। ট্রেণ ছাড়তে যখন আর বেশী দেরি নেই, তখন হঠাৎ তিনি 'কুলী, কুলী' বলে ডাকা-ডাকি আরম্ভ করে দিলেন। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। কিন্তু চুপ করেই রইলাম। কাছাকাছি কুলী ছিল না। তিনি নিজে নিজেই জিনিষপত্র টানাটানি করে নামাবার চেষ্টা করছিলেন। আমি শক্তিমান বঙ্গ-দেশীয় যুবক। তারপর আবার সেই বছরই বিলেত থেকে ফিরেছি। বয়োজ্যেষ্ঠা মাসী জাতীয় ভদ্রমহিলা, শিভ্যালরী করবার কথাই ওঠে না। নিছক ভদ্রতার খাতিরে দাঁড়িয়ে উঠে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললাম, 'কুলী বোধ হয় এখন পাবেন না। দাঁড়ান, আমিই আপনার কুলীর কাজটা করে দেই।'—ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন 'বাংলা জানেন দেখছি—আপনি বাঙালী—কোথায় যাচ্ছেন—সিলেট? কোথায় থাকবেন সেখানে?'—এতগুলি প্রশ্ন এক সঙ্গে কেন করলেন তা পরে বুঝেছিলাম। খানিক চুপ করে থেকে বললাম—হ্যাঁ, আমি নিরীহ বাঙালী। যাচ্ছি সিলেট, আমার দিদি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়ান—তার কাছেই উঠব।

—"ও আপনি আশাদির ভাই! না, থাক, জিনিষ-পত্র আর নামাবার দরকার নেই! কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম!"

হেসে বললাম—"চেহারাখানা দেখে শেষটায় আমাকে গুণ্ডা ঠাওরালেন!" তিনি হেসে বললেন—"তা ঠিক নয়, তবে এই পাঞ্জাবী মুসলমানগুলোকে ভয় করি বই কি! তা ছাড়া বিলেতি পোশাক পরে আছেন; কি করে বুঝব যে আপনি বাঙালী।"—ট্রেণ ছেড়ে দিল। তিনি তাঁর বেতের তৈরী খাবারের বাক্সটা খুললেন। বার হ'ল লুচি আলুর দম, তরকারি—যেন সেগুলো আমার জন্যই আনা হয়েছিল। একখান এনামেলের প্লেটে রেখে আমায় বললেন—'নাও, খাও দেখি এখন ভাল মানুষের মত! আশাদির ভাইকে আর আপনি বলি কি করে? কিছু মনে কর না।"

বললাম—কি মুস্কিল! কি মনে করব! আর এই লুচি আলুর দম হাতে নিয়ে! অতটা নিমকহারাম নই আমি।

* * *

পরের দিন বেলা দশটায় সিলেট পৌঁছলাম।

দিদি থাকেন মেয়েদের স্কুলের ভেতর—হোষ্টেলে।

আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ সুমতিদির বাড়ী। সুমতিদি তখন তাঁর বাবাকে নিয়ে স্কুলের কাছেই একটা বাড়ীতে ছিলেন। তখন পারতামও। চেনা নেই, শোনা নেই গিয়ে উঠলাম। থেকেও গেলাম সেখানে দিন দশ-বারো। সারা সিলেট ঘুরে বেড়ালাম। নৌকাতেও বেড়ান হ'ল কয়েকদিন। তারপর হঠাৎ একদিন সিলেট থেকে শিলং রওনা দিলাম। মোটরে প্রায় একশো মাইল, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ উঠে গেছে। দৃশ্য চমৎকার। পথে ডাউকী বলে একটা জায়গায় মোটর দাঁড়ায়। সেখানে একটা প্রকাণ্ড দীঘির মত আছে, বড় সুন্দর জায়গাটা। চেরাপুঞ্জি হয়ে পৌঁছয় শিলং। শিলং গিয়ে উঠলাম লীলামাসীর বাড়ী। তাঁর চার ছেলে-মেয়ে, কারুরই তখন বিয়ে হয় নি। বুড়ী, বিজু, রেণ্টু, খুকু। বিনোদ মামাকে খুব ভাল করে মনে পড়ে না। ছোটবেলা তাঁকে দেখেছিলাম—খুব পরোপকারী ছিলেন। তাঁরা শিলঙে অনেকদিন থেকে আছেন। শিলঙে এই আমার প্রথম আসা। বুড়ী বিজু, রেণ্টু, খুকু—চার জনই খুব ভাল গাইতে পারে। ঘোর বর্ষার মধ্যে পৌঁছে-ছিলুম শিলঙে। বৃষ্টি হ'ত বেশীর ভাগ সময়। কিন্তু তাতে আমার অসুবিধা হ'ত না। চার জনে মিলে বর্ষা-মঙ্গল গেয়ে বাড়ীর ছাদ উড়িয়ে দেবার যোগাড় করতাম।

শিলং জায়গাটা বড় সুন্দর। বেশ একটা আর্ট-পৌরে ভাব। এটা অন্যান্য 'হিল-ষ্টেশনে' দেখা যায় না। এই ত 'শেষের কবিতা'র রঙ্গভূমি। 'অমিট্রে' ও লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হ'লেও হ'তে পারত। 'লাবণ্য'র খোঁজে সারা পৃথিবী ঘুরতেও রাজী ছিলাম তখন!

হীতেন দা

* * * ঘুরে বেড়াবার সঙ্গী হিসাবে পেলাম এক জনকে। তিনি হীতেন দা। শান্তিনিকেতনের পুরাতন প্রাক্তন ছাত্র—অর্থাৎ আমাদেরও আগে শান্তিনিকেতনের সেই ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের সময়কার ছাত্র তিনি। তার সেই শিক্ষা সফল সব দিক দিয়ে—তিনি চিরকুমার। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে যখন-তখন যাওয়া চলে। যখন-তখন চায়ের জল গরম হয়, তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বের হওয়া যায়। সময় পেলেই সেখানে গিয়ে গল্প-আড্ডা, ডিমভাজা আর চায়ের সদ্ব্যবহার চলত। বাঁশী বাজাতাম, গানও করতাম। হীতেন দা খুব খুশী হতেন। কলকাতায় তাঁর 'কাজল-কালির' ব্যবসা বোধ হয় বেশ ভাল চলত। একলা মানুষ, নতুন বাড়ী করছিলেন। বাড়ীটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। হীতেন দার সঙ্গে দু'দিনেই বেশ ভাব হয়ে গেল। একদিন বিছানাপত্তর নিয়ে তাঁর বাড়ীতে উঠে গেলাম। সঙ্গে আঁকবার সরঞ্জাম কিছু ছিল। তাঁর বাড়ীর প্যানেলে এঁকে-ছিলাম কতকগুলো ছবি। হীতেন দা খুব খুশী। অনেক ছবি ছিল সঙ্গে। সব মিলে বেশ একটা ছোটখাটো ছবির প্রদর্শনী করা যায়। হীতেন দার খুব উৎসাহ। তাঁর নতুন বাড়ীতে ছবির প্রদর্শনী সাজানো গেল। সেখানেই শেষ হ'ল না। গানের পালা সুরু হ'ল। শান্তিনিকেতনের যত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী শিলঙে ছিল তারা সব জড় হ'ল। আশামুকুল দা তখন শিলঙে ডাক্তারী করতেন। শান্তিনিকেতনে 'ডাকঘর' অভিনয়ে অমলের পার্ট করে নাম করেছিলেন ছোটবেলায়—তিনিও এলেন। হৈ হৈ করে প্রদর্শনীর সঙ্গে হ'ল বর্ষা-মঙ্গল। এমনি করেই কাটল শিলঙের দিনগুলি। তারপর একদিন বিছানা বেঁধে ছবি, রঙের বাক্স নিয়ে সিলেট্ রওনা দিলাম।

সিলেট পৌঁছতেই সেখানকার কলেজের ছেলেরা আমায় ধরল। শিলঙে ছবির প্রদর্শনী করেছি, সিলেটেও করতে হবে। আবার ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে আমাকে না কি বক্তৃতাও দিতে হবে। কি সর্বনাশ! বক্তৃতা দেব আমি! শুনবে কারা? সারদামণি স্মৃতি হলঘরে—ঐ রকমই একটা যেন নাম—ঠিক মনে পড়ছে না—সেইখানে হ'ল ছবির প্রদর্শনী। চার পয়সা করে টিকিট করেছিল। সে কি ভীড়! বিকেলে বক্তৃতা ও গান-বাজনার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সিলেটের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির কাজ করবেন। সে কি ভয়! জীবনে প্রথম বক্তৃতা। দিদি ত ভয় পেয়ে বক্তৃতায় গেলেনই না। কি জানি,

ভাইটি যদি সভায় হাস্যাস্পদ হয় সে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

* * ছুটি দেখতে দেখতে গেল ফুরিয়ে। কলকাতায় ফিরে দু'-একদিনের মধ্যে উঠে বসলাম দেরাদুন এক্সপ্রেসে। দুটো রাত ট্রেণে কাটিয়ে সকালে চোখ মেলতেই সেই হরিদ্বার স্টেশন। তারপর শিবালিক রেঞ্জের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ট্রেণ ঢুকে যেই অন্য দিকে বের হয় মুসুরী পাহাড় চোখে পড়ে। পথটা বড় সুন্দর। একে বলে দুনভ্যালি। দু'দিকেই পাহাড়, বড় বড় গাছ, জঙ্গল, বড় বড় পাথর-ভরা পাহাড়ী নদী। মাঝে মাঝে হরিণের দল বের হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর চড়ে বেড়ায় সেই বনে-জঙ্গলে, আর দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় দুনভ্যালির বুনো হাতীর দল। বাঘ, ভালুক, বুনো শুয়োর—সবই না কি মেলে এই জঙ্গলে। তবে ট্রেণ থেকে মাঝে মাঝে হরিণ ও ময়ূর ছাড়া আর কিছু আমার নজরে পড়ে নি। যাওয়া-আসা করেছি এ পথে বহুবার। কিন্তু সকাল বেলায় হরিদ্বার থেকে দেরাদুন প্রতিবারই আমার চোখে এঁকে দেয় নতুনত্বের অঞ্জন।

মোটর দুর্ঘটনা

১৯৩৮ সাল। শীতের কি করব, কোথায় যাব সব ঠিক যখন করে ফেলেছি—ছুটির আর পাঁচ-ছ' দিন মাত্র বাকি—তখন একটা অঘটন ঘটে গেল। মামুদ আমার বন্ধু—দেরাদুনের এক বিশিষ্ট মুসলমান-পরিবারের ছেলে। ওর বাবা লখনউ মেডিকেল কলেজের অবসর-প্রাপ্ত ডাক্তার। দেরাদুনে এসেই ওঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। মামুদ অক্সফোর্ড পাশ—কিন্তু চাকরি করেন না, করেন পলিটিক্স। কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন। তাঁর স্ত্রী রসিদা ডাক্তারী পাশ। খুব ফরওয়ার্ড—নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার ক্ষমতা রাখেন পুরুষদের। দেরাদুনের 'নস্‌রিন' বলে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল তাঁদের। এখন সে বাড়ী না কি একটা মেয়েদের স্কুল হয়েছে শুনেছি। সে যাই হোক, সেখানে মামুদদের বাড়ীতে ছিল আমার খাবার নিমন্ত্রণ। খাবার পর রাত দশটায় মামুদ আমায় পৌঁছে দিচ্ছিল তার গাড়িতে। মামুদ নিজেই চালাচ্ছিল, আমি ছিলাম তার পাশে। রসিদা ছিল পিছনের সীটে। শীতের রাত, কন্‌কনে ঠাণ্ডা। স্টেশন রোডের কাছে মোড় ঘুরতেই লাগল ধাক্কা প্রকাণ্ড এক মোটর বাসের সঙ্গে। আমাদের গাড়িটা ধাক্কা খেয়ে কুড়ি-পঁচিশ ফিট ছিটকে গেল যেন! গাড়ির সামনের কাঁচ ভেঙ্গে কাঁচের টুকরো ছিটকে একাকার। মামুদের কপাল ফেটে রক্ত ছুটল, আর আমার পাঁজরের দুটো হাড় ভাঙ্গল। ঠিক ভাঙ্গল না; কিন্তু ফাটল ধরল। সেই শীতের রাতে কোন রকমে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। রসিদা নিজেই ডাক্তার। হাসপাতালে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে দিল। মামুদের মাথায় পড়ল ব্যাণ্ডেজ আর আমার বুকে পড়ল প্লাষ্টারের ব্যাণ্ডেজ। ছুটি আরম্ভ হয়ে গেল; কিন্তু আমি রইলাম পড়ে দেরাদুনে! ডিসেম্বর যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন ডাক্তারের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া গেল। বুকে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে রওনা দিলাম কাশী। সেখানে টাউন হলে প্রদর্শনী চলছিল, আমি পঁচিশ-ত্রিশখানা ছবি পাঠিয়েছিলাম। ছবিগুলো এত বিশ্রী ভাবে টাঙ্গিয়েছে যে, দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। কাশীতে কিছুদিন থেকে গেলাম কলকাতা। কলকাতা থেকে কিছুদিন পর আবার কাশী, তীর্থক্ষেত্র বলে নয়। কেন গেলাম পরে সবিস্তারে লেখবার ইচ্ছে রইল। সেখান থেকে এলাহাবাদ। জানুয়ারী মাস ফুরিয়ে গেল কত তাড়াতাড়ি!

এলাহাবাদে একক প্রদর্শনী

এলাহাবাদে ছবির প্রদর্শনী করেছিলাম—আমার ছবির একক প্রদর্শনী। ক্যাটালগ ছাপিয়ে নিয়েছিলাম কলকাতায়। আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীপুলিনবিহারী সেন, সে সময় 'প্রবাসী' অফিসে কাজ করতেন। পুলিনের উদ্যোগেই সচিত্র ক্যাটালগ ছাপা সম্ভব হয়েছিল। পুলিন সেই ক্যাটালগে নিজেই আমার ইন্‌ট্রোডাক্‌শন্ লিখে দিয়েছিল। লেখাটায় খুব আন্তরিক ভাব ছিল। বিলেত থেকে ফিরবার পর এলাহাবাদেই বলতে গেলে আমার ছবির একক প্রদর্শনী। পণ্ডিত অমরনাথ ঝা প্রদর্শনী খুললেন। পণ্ডিত B. M. Vyas মিউনিসিপ্যালিটির একজিক্যুটিভ অফিসার ছিলেন। তিনি তখন সেখানকার মিউজিয়মের কিউরেটরও ছিলেন। 'টপুন' বলেও একজন উদীয়মান আর্ট ক্রিটিক্ অমৃতা শেরগিল, আর্টিষ্ট ক্রষ্টার দম্পতীর, অসিত দার (হালদার) বিষয় বই

লিখেছেন। শ্রীরবি দেব তখন ইউনিভারসিটির লেকচারার—ছবি আঁকার সখ তখন সবেমাত্র সুরু হয়েছে। লিখতেন শিল্প বিষয়। এলাহাবাদে দেখলাম আর্টের সমঝদার ছিল অনেকেই। অধ্যাপক অমরনাথ ঝা আর্ট ভালবাসতেন। তাঁরই উৎসাহে ইউনিভারসিটির অনেকে আর্ট সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলেন। বিক্রী কিছু হ'ল, কিন্তু দানও করেছিলাম অনেক—'নামকা-ওয়াস্তে।' B. M. Vyas লোভ দেখালেন, কুড়ি-পঁচিশখানা ছবি তাঁকে দিলে,—অর্থাৎ এলাহাবাদ মিউজিয়মে যদি দান করি, তবে তিনি আমার নামে একটা হল করবেন। যেমন আছে—রোএরিক হল, হালদার হল। তখন আমার কাঁচা বয়স, লোভও সামলানো মুস্কিল হ'ল। দিয়ে দিলাম কুড়ি-পঁচিশখানা ছবি। পরে আবার আরও দশ-বারখানা ছবি দিয়েছিলাম। কিন্তু আজও সে হল হয় নি এলাহাবাদ মিউজিয়মে। * * *

* * পণ্ডিত অমরনাথ ঝা যতবার আমার ছবির প্রদর্শনী খুলেছেন, অন্ততঃ দুটো করে ছবি কিনেছেন। এলাহাবাদে সেবারেও দুটো ছবি কিনেছিলেন। 'টণ্ডন', রবি দেব দু'জনেই খবরের কাগজে আমার বিষয় লেখেন।

প্রদর্শনীতে অনেক পুরাণো চেনাশোনা লোকদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রফেসর বেনোয়াঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। বেনোয়াঁ সাহেব ফরাসী দেশের, শান্তিনিকেতনে আগে পড়াতেন। এলাহাবাদ ইউনিভারসিটিতে ফ্রেঞ্চ পড়াতেন তখন। বাঙ্গালী বিয়ে করেছেন। একটি মেয়ে। মেয়েকে নিয়ে এলেন প্রদর্শনীতে।

প্রদর্শনীর শেষদিন সেদিন। বিকেলে চা খেয়ে প্রদর্শনী হলে পৌঁছে দেখি একটি ভদ্রমহিলা আমার জন্ম অপেক্ষা করছেন। ছিপ্‌ছিপে, লম্বা, ফর্সা, চোখ খুব বড় বড় নয়, তবুও ভাবে ভরা। আগে তাঁকে কোন দিন দেখেছি বলে মনে পড়ল না। চিনতে না পেরে চুপ করেই রইলাম। তিনিই সুরু করলেন: 'আমায় চিনতে পারেন? আমরা আপনাদের পাশের বাড়ীতে ছিলাম··· সেই '৩২ সালে এলাহাবাদ এসেছিলেন, মনে পড়ে?"

—মনে পড়ল। ১৯৩২ সালে এলাহাবাদ গিয়ে আমার মাসতুতো দাদার বাড়ী উঠেছিলাম। দাদার ডাকনাম পটকা—ব্যাঙ্কে কাজ করতেন, বৌদির নাম বুলবুল। বুলবুল বৌদির কাছেই এই ভদ্রমহিলার কথা শুনেছিলাম। দেখেও ছিলাম কয়েকবার। তখন যেন দেখতে একটু অন্ত রকম ছিলেন। বুলবুল বৌদি বলেছিলেন, 'বড় ভাল মেয়ে বৌটি; তবে বড় বিষণ্ণ—দু'-দুবার সন্তান হ'ল; কিন্তু বাঁচল না একটিও। কি দুঃখ বৌটার! মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যান আর সেই অবস্থায় না কি হাসেন আর হাতড়ে হাতড়ে ছেলে খোঁজেন।' মনে পড়ল। এ নিশ্চয়ই সেই বৌটি। মুখের দিকে দেখলাম তাকিয়ে। সুন্দর মুখখানি! ফের বললেন, 'চিনতে পারলেন না?'

বললাম, 'আপনি জ্যোৎস্না দেবী নয়?'—

—তাঁর মুখ খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'ভাগ্যিস চিনলেন···তা না হ'লে বড় দুঃখ পেতাম। চলুন আমাদের বাড়ী, উনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ী

বন্যা

ফিরে এসেছেন। আমাদের নিজের বাড়ী হয়েছে··· আরও একটি দেখবার জিনিষ হয়েছে।' গেলাম তাঁর সঙ্গে। টঙ্গায় উঠে বললেন—'বিয়ে করেন নি এখনও?'

হেসে বললাম, 'না, কিন্তু সময় হয়েছে নিকট নয় কি?' খুব আপনার জন যেন। গল্প করতে করতে চল্‌লাম তাঁদের বাড়ীর দিকে।—এই সেই বৌ! যাঁকে কখনও দেখি নি; আড়ালে ছিলেন পাশের বাড়ীতে। আজকে তাঁর সেই ঘোম্‌টা আর লজ্জা গেল কোথায়?

বাড়ী পৌঁছলাম। চা খাওয়ালেন ঘটা করে। তাঁর কর্তার সঙ্গে আলাপ করলাম বসে। আর দেখলাম তাঁদের একঘর-আলো-করা বাচ্চাটিকে। সাত রাজার ধন এক মাণিক—তাই দেখাতেই ত নিয়ে আসা আমাকে! এমন ধন যাদের ঘরে, তাদের আবার কিসের লজ্জা।

বিবাহ

১৯৩৯ সালের বর্ষার ছুটিটা কাটল স্বপ্নের মধ্যে যেন। ছবি আঁকা প্রায় বন্ধ। কাশী-কলকাতা হয়ে জুলাই মাসেই দেরাদুন ফিরলুম। মটুরুদারা তখন দেরাদুনে বদলি হয়ে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্পর্ক হচ্ছে তিনিও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। মটুরুদার মা—লটি দি—তিনিও তখন দেরাদুনে। খুব বেড়াতুম রোজ। বনে-জঙ্গলে, যমুনার ধারে, কখনও কখনও গঙ্গার ধারে। আবার কখনও মুসুরী পাহাড়ে।

১৯৩৯ সালের ১৫ই আগষ্ট আমার কাছে খুবই স্মরণীয় দিন। ঐদিন আমরা দু'জনে মুসুরী কোর্টে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন মটুরুদা, ফুট সাহেব, আর মুসুরী বাসিন্দা হামেদ আলী সাহেব। সই করে সিভিল ল' অনুসারে কাজ আগেই হয়ে গেল। পরে সন্ধ্যেবেলা দেরাদুন ব্রাহ্মমন্দিরে ভগবানের নাম করে ব্রাহ্ম মতে বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের পরিবারের কেউ যোগ দিতে আসতে পারেন নি। অথচ মনোরমার বাড়ীর লোকেরা সবাই এসেছিলেন বিয়েতে। * * *

বাকি ছুটিটা কাটল দেরাদুনে আর নৈনিতাল পাহাড়ে—আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল যেখানে বিয়ের সাত বছর আগে। * * *

গিরিডি

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস। ছুটি আরম্ভ হতেই চললাম দু'জনে (এবার আর একলা নয়) গিরিডি। আমাদের নিজেদের বাড়ী ছিল গিরিডি। সে ত গেছে বিক্রী হয়ে। সেখানকার পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু, তখনও অনেকেই ছিলেন সেখানে। নিমন্ত্রণ এল ছোটদির কাছ থেকে। কলকাতা থেকে ছোটদি তাঁর সংসার নিয়ে গিরিডি গেছেন বেড়াতে। থাকবার জায়গার ভাবনা নেই। খাব-দাব, আর উশ্রীর ধারে—শালের বনে—'খ্রীষ্টান হীলে'—খাণ্ডুলী পাহাড়ে ঘুরে বেড়াব!

মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করে যেতে হয় গিরিডি। সেই চির-পরিচিত মধুপুর। ভোর না হ'তেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। তারপর ধীরে-সুস্থে গিরিডি ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলাম। মাঝখানে দু'টি মাত্র ষ্টেশন—মহেশমণ্ডা আর জগদীশপুর—তার পরেই গিরিডি।

১৯৩৬ সালে শীতের সময় গিরিডি গিয়েছিলাম, বেড়াতে নয়। আমার বড়দাদাও ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে মধুপুর পৌঁছলেন। তারপর দু'জনে গিরিডি ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে উঠে বসেছিলাম। আমার তিন ভাইয়ের দু'ভাই তখনও বিলেতে। আরেক ভাইও কাজে ছুটি পায় নি। তারা পাঠিয়েছিল সরকারী 'পাওয়ার অব্ এটর্নীর' কাগজ। বড় ভাই ও সবচেয়ে ছোট ভাই আমি বাবার ঋণ শোধ করতে বাবার নিজের হাতের তৈরী সখের গিরিডির বাড়ীটা দিলাম মেসোমশায়ের হাতে তুলে। বাবা মারা যাবার পর গিরিডির পাট ত' উঠেই গিয়েছিল। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে বাবা সেই গিরিডির বাড়ীতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। আবার যে গিরিডি যেতে হবে তা ভাবি নি। একটা জমাট-বাঁধা-সংসার তচনচ হয়ে গিয়েছিল বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা সব ভাই-বোনেরা ছড়িয়ে পড়লাম নানান জায়গায়। একত্র হয়ে মিলবার আর আমাদের কোন জায়গাই ছিল না। চোখের সামনে খাট-পালং, বাসন-কোসন—যা ছিল বাড়ীতে সব গেল!—এই সেই গিরিডি! এর প্রত্যেকটি রাস্তা, আনাচ-কানাচ আমার পরিচিত। এখানকার স্কুল থেকেই মাট্রিক পাশ করি। জেলখানার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা উশ্রী নদীর দিকে নেমে গেছে, সেই রাস্তায়—প্রায় উশ্রীর ধারে আমাদের বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীর কাছেই একটা ভাড়া বাড়ীতে ছোটদিরা উঠেছিলেন। সেখানে গিয়ে ত ওঠা গেল। তারপর রোজ বেড়ানো—ছোটদির দুই ছেলে—মানিক, ভানু, তারা তখন ছোট ছোট—তাদের নিয়ে কখনও শ্লেট বিভার

কখনও ভাড়া হ'ল। আমাদের বাড়ীটার সামনে দিয়ে উশ্রীর ধারে বেড়াতে যাবার সময় কত কথাই মনে পড়ত—অনেক স্মৃতি-জড়ানো সেই বাড়ী। মাইকার ব্যবসা করেন কে-এক সাহেব ভাড়া নিয়েছিলেন সেই বাড়ী।

গিরিডির ছাত্র বন্ধু

আমার ছেলেবেলার সঙ্গীরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ কেউ নেই গিরিডিতে। এক আছে হৃষিকেশ! একসঙ্গে পড়তাম আমরা। কাকার ব্যবসা চালাচ্ছে—কন্ট্রাকটর হয়েছে। বিয়ে করেছে অনেক দিন। ছেলেমেয়ে নিয়ে, মাথায় মস্ত টাক নিয়ে এরই মধ্যে বেশ ভারিক্কি হয়ে গেছে। তার কাছেই অন্যান্য সকলের খবর পেলাম। কেউ বিশেষ নেই গিরিডিতে। মাষ্টারমশায়রা যাঁরা পড়াতেন আমাদের তাঁরাও অনেকেই রিটায়ার করে গেছেন চলে। যুগলবাবু ইতিহাস পড়াতেন—কি সাংঘাতিক কড়া মাষ্টার ছিলেন, তিনিই এখন হেডমাষ্টার।

নবেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেও আমাদের ক্লাসেই পড়ত। গিরিডি ছাড়বার পর তাঁর সঙ্গে অনেকবার কলকাতায় দেখা হয়েছে। আমার ছবি ও গানের ভক্ত ছিল সে। উশ্রীর ধারে বসে কত গান গেয়েছি আমরা, গুরুদেবের গান। নবেন্দুর ছোটবেলা থেকে লেখার ঝোঁক ছিল, অভিনয় করার সখ ছিল। তারপর কলকাতায় এসে এক সিনেমা কোম্পানীতে কাজ করত। নিজে গান-গল্প লিখত। নিজে গান লিখে গেহুবাবুকে দিয়ে তাতে সুর-সংযোগ করে আমাকে দিয়েও সে একবার দু'খানা গানের রেকর্ড করিয়েছিল নিউ থিয়েটার্স কোম্পানীতে নিয়ে গিয়ে।

তারপর কি হ'ল কি জানি, কলকাতার জলহাওয়া সহ্য হ'ল না বোধ হয়, তার শরীর ভেঙে পড়ল। তাই আবার গিরিডিতে গিয়ে বসবাস করছে। বিয়ে করেছে, 'মাইকার' ব্যবসা চালাচ্ছে না কি। মাইকা ব্যবসায়ী হ'লেও নবেন্দু আসলে কবিই!

সেই বসন্তের দোকান। চা-চপ কত খেয়েছি সেখানে বসে। শক্তিবাবুর বাড়ী, বারগণ্ডায়, তার সামনে ছিল ডাক্তারবাবুর বাড়ী—ডাক্তার যোগানন্দ রায়। তাঁর বাড়ীতেই বসত শালবনী ক্লাবের মস্ত আড্ডা। শালবনী ক্লাবের মেম্বার ছিল গিরিডির যুবকের দল। পুজোর ছুটিতে গিরিডি অতিথিতে ভরে যেত, সেই সময় হ'ত ক্লাবের 'পূর্ণিমা সম্মিলন'। গান, আবৃত্তি, অভিনয়ের ধুম পড়ে যেত। রামানন্দবাবুর ছেলেরা, খুহুদার অভিনয় ও মুলুর আবৃত্তি শুনেছি ছোটবেলায়। তারাও অবশ্য তখন ছোটই। শালবনী ক্লাবের 'পূর্ণিমা সম্মিলনী'তে বহুলোক হ'ত। মনে আছে সেই গান—
'কেন, কেন, কেনরে চেঁচিয়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গ কেন'...

সুনির্মল বসু তখন গিরিডিতে ছাত্র ছিলেন। প্রথম তাঁর কবিতা প্রকাশিত হ'ল প্রবাসীতে। কবিতার নাম 'সাইকেল'। সেই সময় থেকে তিনি ছবি আঁকায় মন দিলেন। কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট', স্কুলে ভর্তি হলেন। পুজোর ছুটিতে বাড়ী আসতেন। তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যেতাম।

সুনির্মলবাবুর ভাই সুকোমল, ডাক-নাম বলু, আমার সঙ্গে পড়ত। সেই সময় থেকে আমিও ছবি আঁকায় মন দিয়েছিলাম। ছোটদি যখন গিরিডি গার্ল স্কুলে কাজ করতেন, ছোটদিই আমায় দশটি টাকা দিয়েছিলেন রঙের বাক্স, তুলি কিনতে। রঙের বাক্স কিনে দিলেন সুনির্মলবাবু। কলকাতা থেকে কিনে দিয়েছিলেন। 'ওয়াশ্' দিয়ে কেমন করে অবনীবাবুর ষ্টাইলে ছবি আঁকতে হয়, তিনিই আমায় দেখিয়েছিলেন প্রথম। তারপর তিনি ছেড়ে দিলেন ছবি আঁকা। কবিতা, গল্প লিখে নাম করলেন। কাজী নজরুলের কবিতা—"আনোয়ার আর না, দিল্ কাঁপে কারনা''—তিনি আবৃত্তি করেছিলেন আনোয়ার সেজে।

হিমাংশুবাবু (রায়) ছিলেন আমাদের বাংলার মাষ্টার। তিনি রবীন্দ্রভক্ত, শান্তিনিকেতনেও ছিলেন। তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা "পঞ্চনদীর তীরে" প্রথম শুনেছি। গিরিডির সেই ছেলেবেলার দিনগুলি—সে সব এখন মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে! পুজোর ছুটিতে হৈ-চৈ পড়ে যেত। প্রতিমা গড়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পুজো বারগণ্ডায় বড় একটা হ'ত না। গিরিডির বাসিন্দা হিসাবে বেশীর ভাগই ছিলেন তখন ব্রাহ্ম পরিবার।

সেখানে 'সাধারণ' এবং 'নববিধান' দু' সমাজেরই মন্দির আছে এবং সেখানে পুরোদমে উৎসব হ'ত। এখন কি আর সব তেমন আছে? সব টিমটিম করছে! মাঘোৎসবের সময় উশ্রীর ওপারে বনভোজন হ'ত। সমাজের সকলেই দলে দলে যোগ দিতেন, মাটিতে সতরঞ্চ পেড়ে বসা হ'ত, গানের উপাসনা হ'ত—তারপর পাত পেড়ে খাওয়া। সে গিরিডি এখন আর নেই! পুরনো বাসিন্দারা একে একে সব গিরিডি ছেড়ে চলে গেছেন, তার বদলে গেছেন মাড়োয়ারীরা, 'মাইকার' ব্যবসা করছেন তাঁরা। আর আছে 'ষ্টাটিষ্টিক্যাল ল্যাবরেটরি শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশের কল্যাণে!

—দেরাদুন ফিরে গেলাম আমরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। তারপর সেখানে আর যাওয়া হয় নাই! যাব আর কিসের টানে?

"সকল মানবে সমদর্শিতা, ধর্ম্মমতভেদ, আচারভেদ, জাতি ও বর্ণভেদ সত্ত্বেও অঘৃণা ও অদ্বেষ, কেবল প্রকৃত ধার্ম্মিকতা হইতেই জন্মে।...এই সমদর্শিতা, অঘৃণা ও অদ্বেষ না জন্মিলে ভারতবর্ষের মত নানা জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধ্যুষিত দেশে সকলে একপ্রাণ হইয়া স্বাধীনতা চাহিতেও পারে না, সুতরাং পাইতেও পারে না।"

—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৩

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

চিত্রিতা দেবী

ওগো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,—
বল দেখি কোথায় তুমি ছিলে,
কোন কবির কল্পনায় ?
আমাদের আশায় আর ভালোবাসায়,
তুমি কি এনে দেবে নতুন ছন্দ ?
নতুন রাগিণী ?
ওগো তুমি কি শোনাবে
রঙীন ভবিষ্যতের কাহিনী ?
আজকে বর্ত্তমান কিন্তু বড় কঠিন করে
ঘিরে ধরেছে।
চেপে চেপে নিংড়ে নিংড়ে
বার করে নিচ্ছে,
জীবনের সব রস।
দিনগুলি একেবারে সোজাসুজি
মৃত্যুর বশ।
কোন ঋষি বলেছিল "কোহ্যেবান্যাৎ"
"কঃ প্রাণ্যাৎ ?"
আকাশে আকাশে আনন্দরূপে
জীবনের জয়গান।
আনন্দ যদি না থাকে আকাশে,—
কে বাঁচ'বে তার প্রাণ ?
তবু তো বেশ বেঁচে আছি,
ওরা সবাই বলছিল।
আর অন্যেরা নাকি সুরে কাঁদছিল।
কান্না ওদের স্বভাব !
তা ছাড়া ওরা জানে না অন্য উপায়।
নালিশ করে ওরা আত্মার ক্ষুধা মেটায়।—
এদিকে পথের দু'ধারে সারি সারি বসে গেছে,
ভিকিরির দল,—
ওদের টুকরো টুকরো, ঝুলি-ঝোলা থেকে,
দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

ওরা অপেক্ষা করতে জানে না।—
ওদের সবুর করার সময় নেই।
ওরা অনায়াসে সুখের মুখের উপরে,
চাবুকের মতো লিকলিকে
দুই হাত বাড়িয়ে,
দাঁড়িয়ে থাকে।
ওগো ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতা,
ওগো জনগণের নায়কের দল,—
কল্পনার শক্তি নেই ওদের,—
পরিকল্পনায় নেই বিশ্বাস।
বাঁধ দিয়ে তো নদীকে বেঁধেছো।
মন বাঁধবার মন্ত্র জানো কি তোমরা?
শিখেছো কি কেমন করে দগ্ধ জীবনে
ছড়িয়ে দিতে হয় আশার বীজ?
ওগো, তোমরা কি ভুলে গেছো,
কেমন করে একদিন,
অবিশ্বাসের বক্ষ ভেদ করে,
বেরিয়ে এসেছিলো সত্যের অঙ্কুর,
ক্রমে সে অসংখ্য ডালে পাতায়—
মরুভূমির স্বপ্নকে সত্য করে
তুলেছিলো।
তখন পরিকল্পনা ছিল না,—
ছিল প্রাণপণ করা পণ।
করবই নয়ত মরব।
আজো ভাখো স্বাধীনতা আসে নি।
দারিদ্র্যের কশাঘাতে,
আজো দ্যাখো,
মাতৃভূমি পঙ্গু ও জর্জর।
আজো ভাখো,
একদিকে উত্তুঙ্গ ধনের গরিমা।
অন্যদিকে দারিদ্র্যের অন্ধকার গহ্বর।
ওগো পরিকল্পনা,
তুমি কি করবে এ দুয়ের সমন্বয়?
তাহলে,
আমরা না হয় ধৈর্য্য ধরে
অপেক্ষা করব আরো পাঁচ বছর।
ওগো কল্পনার নায়ক,
ওগো বিজ্ঞানী, ইঞ্জীনীয়ার,
নব ভারতের রূপকার।—

আমরা ধন চাই না
আমরা সুখ চাই।
আমরা বাঁচতে চাই।
তোমরা কার জন্যে ধনের প্রতিশ্রুতি
বয়ে বেড়াচ্ছ জানি না।—
আমরা সাধারণ মানুষ।—
আমরা চাই আলো আর বাতাস,
ক্ষুধার খাদ্য।—আর সব
অতি সাধারণ সুখ।
রোগের সময় একটু দয়া,
একটু সেবা,—একটু মধুর আশা।
ভোগের সময় সুস্থ সহজ
সীমান্ত টেনে দেওয়া।
ওগো কল্পনায়ক।
নদীতে বাঁধ দিয়ে,
তোমরা সোনা ফলাতে চেয়েছিলে।
এবারে জীবনে জীবনে,
সমাজে সমাজে
নতুন করে বাঁধ দাও!
গড়ে তোল মানুষ-গড়ার কারখানা।
ওগো নতুন দিনের রূপকার।—
মুছিয়ে দাও দুঃখীর চোখের জল।
বুঝিয়ে দাও, ধনের অহঙ্কার,
একেবারেই ভুয়ো।—
নিত্যের দরবারে,
ওর দাম কাণাকড়িও নয়।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হলদিয়া তৈল শোধনাগার

হলদিয়া তৈল-শোধনাগার অবিলম্বে স্থাপনের যে আশা কেন্দ্র-করুণা-প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গ এতদিন ধরিয়া সযত্নে লালন করিতেছিল—সে আশা বোধ হয় মুকুলেই শুকাইয়া যাইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে কেন্দ্রীয় সরকারের ফরাক্কা বাঁধ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের সঙ্গে এইবার হলদিয়া প্রকল্পের প্রাণ-কেন্দ্র তৈল শোধনাগার স্থাপনের কথা আপাতত ধামাচাপা দিয়া—যথাসময়ে নির্ব্বাপিত করার প্রয়াস সজোরে চলিতেছে। কেন্দ্রের যে বিশেষ শক্তিশালী জোট হলদিয়া প্রকল্পে তৈল শোধনাগারের বিরুদ্ধে প্রথমে হইতেই ছিল, সেই জোট এখন সক্রিয় হইয়া প্রস্তাবিত হলদিয়া শোধনাগারকে শেষ আঘাত দিয়া—ইহার কৈবল্যযোগ ঘটাইতে বিষম প্রয়াসী!

যে ফরাসী সংস্থা জোটের হলদিয়া শোধনাগার প্রতিষ্ঠার কথা ছিল—জানা গেল এখন নাকি ঐ বিদেশী জোটকে বর্ত্তমানে অন্য এক কাজে নিয়োজিত করা হইতেছে। এই বিশেষ ফরাসী সংস্থা জোটে আছে ঐ দেশের তৈল-ব্যবসায়ী, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাতা এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ।

হলদিয়া তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকার বাতিল করিয়া এই সংস্থাকে মাদ্রাজে আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজেই হাত দিবার জন্য বলা হইয়াছে। কথা ছিল ২২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার হলদিয়া শোধনাগারটির কাজই প্রথম ধরা হইবে, কিন্তু এখন জানা যাইতেছে যে, ৩০কোটি টাকা ব্যয়ে মাদ্রাজে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনই অগ্রাধিকার লাভ করিল। মুস্কিলের কথা, এই বিশেষ ফরাসী সংস্থা জোটের—দুইটি প্রকল্পের কাজ এক সঙ্গে গ্রহণ করার মত শক্তি নাই—কাজেই কেন্দ্রীয় যে শক্তিশালী জোট বা চক্র সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীকে ঠোকর দিতে সদা প্রয়াস করিতেছেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন হইতেই—সেই কেন্দ্রীয় জোট বা চক্র—শোধনাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও পশ্চিম বাঙ্গলাকে আঘাত করিতে বিষম উদ্যোগী হইয়া মাদ্রাজে (বিনা প্রয়োজনে) আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজটিকে প্রথমে ধরিবার সকল প্রয়াস করিতেছেন।

দোটানায় পড়িয়া সংশ্লিষ্ট ফরাসী কন্‌সোর্টিয়াম ফ্রান্সে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নিকট হইতে জানিতে চাহেন ভারত সরকার হলদিয়া এবং মাদ্রাজের মধ্যে কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দিতে চাহেন?

বলা নিষ্প্রয়োজন সরকার হলদিয়াকে সাইডিং-এ ঠেলিয়া মাদ্রাজের আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ আগে চাহেন বলিয়া উত্তর দিয়াছেন।

হলদিয়া বন্দরের অপেক্ষা মাদ্রাজ প্রকল্পের উপর সরকার কেন যে এত বেশী জোর দিতেছেন সে সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার নয়। তাই অনেকে এমন-ভাবে সরকারের মত পরিবর্ত্তনকে অভাবনীয় ঘটনা বলিয়া মনে করিতেছেন।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাদ্রাজ উদ্বৃত্ত রাজ্য। তাহার উপর সেখানে ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আর একটি নতুন তাপ বিদ্যুৎ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নতুন আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষমতা হইবে আরও ১০০ মেগাওয়াট। অতএব বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হইলে এ ব্যাপারে মাদ্রাজ পাশ্চাত্যের অতি উন্নত যে-কোন দেশের সমকক্ষ হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার যে রকম অস্বাভাবিক তাড়াহুড়া করিয়া তাঁহাদের অগ্রাধিকার পরিবর্ত্তন করিলেন তাহাতে সংশ্লিষ্ট মহল অতি বিভ্রান্ত। কারণ হলদিয়ার তৈল শোধনাগার প্রকল্পকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইলে এই প্রকল্পভিত্তিক যাবতীয় ব্যবস্থা বানচাল

হইয়া যাইবে। হলদিয়ার সামগ্রিক প্রকল্পের মূল ভিত্তি ছিল এই তৈল শোধনাগারটি। তাই, সরকারের এই শেষ সিদ্ধান্তে হলদিয়া বন্দরের ভবিষ্যতও অন্ধকারময় হইয়া পড়িল।

বাঙলা এবং বাঙালীর প্রায় সকল ব্যাপারেই কেন্দ্রের এই প্রকার বিমাতা-সুলভ আচরণ গত ১৭ বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে—ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এইরূপ আরো বহু দেখিতে পাইব আশা রাখি। লোকসভায় পশ্চিম বাঙলার এম. পি. মহাশয়গণ কি করেন? বাঙালী এম. পি.-দের কয়েকজন অবশ্য চীনা-পাক ব্যাপার লইয়া সদা অতিব্যস্ত এবং এতই ব্যস্ত যে যাহাদের কৃপাভোটের জোরে তাঁহারা দিল্লীতে বসিয়া আরাম করিতেছেন সেই গরীব ভোটদাতা এবং গরীব রাজ্যের কথা ভাবিবার সময় তাঁহাদের নাই! কংগ্রেসী এম.পি.-রা ত পার্টির হুকুমমত হাত তুলেন, নামান! সামান্য বাঙলা এবং বাঙালীর ভালমন্দ স্বার্থ চিন্তা করা তাঁহাদের পক্ষে পাপ! কিন্তু বঙ্গসম্রাট বিশালবপু অতি-বিচক্ষণবুদ্ধি এম. পি. শ্রীঘোষ মহাশয় কি করিতেছেন? তিনিও কি বাঙলা ও বাঙালীর কোন স্বার্থই দেখিতে পাইতেছেন না—জানি তিনি 'একদেশদর্শী' কিন্তু এই দৃষ্টি মাঝে মাঝে বাঙলার উপর ফেলিতে দোষ কি? শেষ পর্য্যন্ত বাঙলা কি লুটেরা রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে?

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য বহু রাজ্যে বহু বহু প্রকল্প—কোটি কোটি টাকা (বিদেশী মুদ্রা সমেত) ব্যয় করিয়া নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা কম সময়ে শেষ হইয়া গেল, কিন্তু কেন্দ্রীয় একটি অতিশক্তিধর চক্রের কারসাজিতে পশ্চিমবঙ্গের অত্যাবশ্যকীয় বহু প্রকল্পই আজ কাগজী পরিকল্পনাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে বছরের পর বছর। কলিকাতার সারকুলার রেল, ফরাক্কা বাঁধ, 'সি এম পি ও'-র বহু পরিকল্পনা—আজও ঝুলিতেছে। কবে শিকে ছিঁড়িয়া এই সব প্রকল্প বাস্তবরূপ লাভ করিবে, তাহা বলিতে পারেন এক বিধাতা এবং আর এক—বিধাতা অপেক্ষাও শক্তিমান কেন্দ্রের বিশেষ একটি বাঙলা-এবং-বাঙালী-বিদ্বেষী চক্র!

পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁহার সহ-cum-পার্শ্বচরদের নিকট হইতে অভাগা বাঙলা ও বাঙালীর জন্য বিশেষ কিছু আশা করা যায় না, তাঁহারা খাদ্যের সমস্যা লইয়া যে কেরামতি প্রদর্শন করিলেন—তাহাতে লোকের কাছে নিজেদেরই প্রায় অখাদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। আজ ইহা প্রমাণিত সত্য যে কেন্দ্রীয় সরকার সকল প্রকার ভদ্র যুক্তি অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তাঁহাদের কাছে একটি মাত্র যুক্তি অবশ্যগ্রাহ্য, এবং এই সহজ সরল অমোঘ যুক্তিটি গুঁতা নামক বস্তু। যে গুঁতার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্র, এবং অচিরে হইবে পাঞ্জাব রাজ্য। এ বিষয়েও পুরাণ একটি কথা আবার বলিতে হয়—

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন কালে

পশ্চিমবঙ্গ ঠিকমত গুঁতাইতে পারে নাই বলিয়া তাহার ভাগ্যে ধলভূম জুটিল না, মানভূমের শাঁসটুকু বাদ গিয়া খোসাটুকু মাত্র ভাগে পড়িল। যে সামান্য অংশ জুটিল—স্বর্গত ডঃ রায় আবার তাহা হইতে রসাল অংশটুকুই বিহারকে ফিরাইয়া দিলেন! কোন্ যুক্তি এবং অধিকারে তাহা আর আজ কেহ বলিতে পারিবে না!

একদিকে কলিকাতা করপোরেশনের ক্রমাগত ট্যাক্স বৃদ্ধি, অন্যদিকে বিবিধ পাকে-প্রকারে হঠাৎ ধনী অবাঙালী শেঠ এবং শঠের দলের, মধ্যবিত্ত বাঙালী বাড়ী মালিকদের দুই-তিন গুণমূল্য হাঁকিয়া বাড়ী কিনিবার বিচিত্র প্রলোভনে বহু বাঙালী মধ্যবিত্ত এবং ধনীও নিজেদের বসতবাটী বিক্রয় করিয়া—কলিকাতার কাছা-কাছি অঞ্চলে চলিয়া যাইতেছেন। ইহার ফলে গত কয়েক বছরে শতকরা প্রায় ৪০টি বাড়ী আজ বাঙালীর অধিকারচ্যুত হইয়াছে।

অবাঙালী বাড়ীওয়ালাদের নিকট বাঙালী ভাড়া-টিয়ার কোন মূল্য নাই, কারণ তাঁহাদের দাবিমত ভাড়া দেওয়া খুব কম মধ্যবিত্ত, এমন কি দেড় দুই হাজারটাকা মাসিক আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও এক প্রকার অসম্ভব। অবশ্য কোম্পানী বা সরকার যাঁহাদের বাড়ীর ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের কথা—এ হিসাবে নাই। কলিকাতায় যাঁহাদের কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, সেই সকল বাড়ীহীন মধ্যবিত্ত দরিদ্র বাঙালীদের এ শহরে বসবাসের কি ব্যবস্থা করা যায় (এবং করিতে হইবেই) তাহা সরকার বাহাদুরকে অবশ্যই স্থির করিয়া বাস্তব ব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকে বিনা মূল্যে দয়ার দান কিংবা অনুগ্রহ হিসাবে এ দাবি করিতেছে না ন্যায্য ভাড়ার বদলে একটু ভদ্র বাসারই দাবি (প্রার্থনা বলিলে সরকার যদি খুশী হন তবে তাহাই) করিতেছে। সহজে এ দাবি (বা প্রার্থনা) না মিটিলে শেষ পর্যন্ত হয়ত, সরকারের কাছে যে দাবি অবশ্য-গ্রাহ্য বলিয়া ইদানিং প্রমাণিত হইয়াছে সেই গুঁতার দাবির সামনে সরকারকে দাঁড়াইতে হইবেই। বাড়ী

ভাড়ার কালোবাজারীর সঙ্গে রসিদ না দিয়া ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে (আক্কেল) সেলামি আদায়ের প্রথাও এবার বন্ধ করিতে হইবে। কার্য্যত কোন ব্যবস্থা সরকার বাহাদুর যদি করিতে না পারেন তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত মানুষ মারিয়া এবং জাঁতাকলে ফেলিয়া যাহারা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধির সহজ পথ ধরিয়াছে সেই তাহাদেরই হয়ত জাঁতাকলের চাপে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে। কলের হাওয়ার বিষম পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেই বুঝিয়া চলাই হয়ত নিরাপদ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলিকাতায় ৩০।৪০ বছর ধরিয়া বহু ভাড়াটিয়া একই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। বাড়ী-ওয়ালারা এই প্রকার পুরাতন ভাড়াটিয়াদের বিবিধ প্রকারে নির্য্যাতিত করিয়া উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছেন। ফলে নিরীহ বহু ভাড়াটিয়া বাড়ী ছাড়িয়া প্রায় গাছ তলায় দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন। রেণ্ট কোর্টে মামলার হাঙ্গামা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া চাকুরিজীবীদের পক্ষে। বাড়ী মেরামত করার কথাই বর্ত্তমানে অবান্তর, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া প্রায় সর্ব প্রকার মেরামতি ভাড়াটিয়াকে করিতে হইতেছে। দুঃখের বিষয় রেণ্ট কোর্ট বা রেণ্ট কণ্ট্রোলার এ ব্যাপারে ভাড়াটিয়াদের প্রায় কোন প্রকার সাহায্য দান করিতে পারেন না। এই বিষয়েও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে বহুবার, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যাপার যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কলিকাতায় অবিলম্বে একটি ভাড়াটিয়া-সংঘ (কিংবা বাড়ীওয়ালা প্রতিরোধ সংস্থা) স্থাপন করা দরকার এবং এই সংঘের কার্যকর সমিতি তৎপর হইলে বাড়ীওয়ালাদের নির্য্যাতন, জুলুম এবং অন্যায় দাবি হইতে অসহায় ভাড়াটিয়াদের অবশ্যই রক্ষা করিতে পারিবেন। প্রস্তাবটি ভাড়াটিয়াদের ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

আরো স্থান চাই

জনসংখ্যার বিষম চাপে পশ্চিম বাঙ্গলার নিশ্বাস বন্ধ হইবার মত হইয়াছে—ইহার কিছু সমাধান হইতে পারে ধলভূম (বাঙ্গলা ভাষী এবং বাঙ্গালী প্রধান) এবং মানভূমের বৃহৎ একটি বাঙ্গলা ভাষী অঞ্চল ফেরৎ পাইলে—দয়ার দান হিসাবে নহে, ন্যায্য দাবির জোরে। ভারতের সর্ব্বত্রই যখন আবার ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিদাওয়ার কথা উচ্চারিত হইতেছে তখন বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলা কেন হাত গুটাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিবে?

এ বিষয় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী দলের নিকট হইতে কিছু আশা করা দুরাশা মাত্র। তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি নিজ নিজ পার্টির স্বার্থ রক্ষা এবং শক্তি বৃদ্ধির খেলায় মত্ত—কাজেই বাঙ্গালী জনগণকেই আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবি আদায়ের সক্রিয় সজোর পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অঞ্চলগুলি বিহার এবং আসাম হইতে পৃথক করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন চালাইতে হইবে। প্রত্যেক রাজ্যই যে সময় নিজ নিজ স্বার্থ, কেবল রক্ষাই নহে, সম্পদ বিত্ত বৃদ্ধির প্রয়াসে সক্রিয়, সেই সময় পশ্চিম বাঙ্গলা যদি নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ভাগ্যে আরও বহুগুণ এবং বিবিধ প্রকার অবিচার এবং দুঃখ অবধারিত।

বাড়ী ফ্ল্যাট ভাড়ার বিজ্ঞাপন

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শহর কলিকাতা হইতে মধ্য এবং সীমিতবিত্ত বাঙ্গালী বিতাড়ন এবার পূর্ণ উদ্যমে সুরু হইয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে এ শহরে আজ বাড়ী কিংবা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া বা করা কার্যত অসম্ভব হইয়াছে। দুই-তিন কামরার ফ্ল্যাটের ভাড়া ২৫০৲ ৩০০৲। ৩৫০৲। ৩৪০৲। ৩৫০৲।৪০০৲।৪৫০৲।৫০০৲ হইতে ৭৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে—সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন হইতে ইহা জানা যায়। ৪।৫ কামরার ফ্ল্যাটের ভাড়া ১২০০ হইতে ১৮০০৲ টাকা পর্যন্ত বিজ্ঞাপনদাতারা দাবী করিতেছেন। এই পরিমাণ বাড়া ভাড়াই যদি স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়, তাহা হইলে সাধারণ বাঙ্গালীকে শহর হইতে বাধ্য হইয়া বিদায় লইয়া বস্তি কিংবা কাছাকাছি বনাঞ্চলে (যদি থাকে) বাস করিতে হইবে।

গত কিছুকাল হইতে কলিকাতা এবং প্রায় সকল কাছাকাছি অঞ্চলেই বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির একটা বিষম মরশুম পড়িয়া গিয়াছে। শুনিলে হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না যে—কলিকাতার নেহাৎ অখ্যাত এবং একান্ত দরিদ্রজন অধ্যুষিত অঞ্চলেও একটি ছোট ঘর, একখানি বারান্দার (এবং কমন বাথরুম ও পায়খানা) জন্য বাড়ীওয়ালা ১০০৲ টাকা ভাড়া দাবি করিতেছে এবং একান্ত দায়ে পড়িয়া লোকে তাহা ভাড়া লইতে বাধ্য হইতেছে। এমন কি যে-সব ভাগ্যবান, বহুকাল ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিয়া—গরীব ভাড়াটিয়ার

সকল দুঃখকষ্ট এবং বাড়ীওয়ালার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাও হঠাৎ বাড়ীওয়ালা হইয়া নিজ বাড়ীর অংশ বিশেষ (একতলা বা দোতলার ১।২ খানি ঘর) ভাড়া দিয়া পরমানন্দে ১০০৲।১৫০৲ টাকা আদায় করিতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। কথায় বলে, 'বিড়াল বনে গেলে বন-বিড়াল হয়'—একদা-ভাড়াটিয়া, বর্তমানে বাড়ীওয়ালারাও আজ তাহাই হইয়াছেন। একবার রক্তের স্বাদ পাইয়া আজ তাঁহাদের রক্ত পিপাসা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে।

শুনিয়াছি কলিকাতায় রেণ্ট-কণ্ট্রোল এবং রেণ্ট্ কণ্ট্রোলার আছেন। এই সংস্থা এবং সংস্থার কর্ত্তার কাজ কি এবং কাজ যদি থাকে তবে কাহার স্বার্থে বা হিতার্থে? সরকারী ফতোয়ায় প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের সরকার বাহাদুর মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই না কি করিয়াছেন এবং করিতেছেনও। বাড়ী ভাড়া কি বাড়ীওয়ালার খুসীমতই চলিতে থাকিবে? সরকার বাহাদুর হয়ত বলিবেন বাড়ীর মালিক যদি বেশী ভাড়া দাবি করেন, তবে তাহা রোধ করিবার উপায় নাই। ভাল কথা। কিন্তু এই যুক্তির প্রতিযুক্তি হইবে—আমার সঞ্চিত কয়েক মণ চাউল বা গম আমি যদি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ২০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতে চাই তবে তাহাতে সরকার বাধা দিবেন কি? সরকার যদি বাধা দেন আমি বলিব আমার মাল আমি আমার দামে ছাড়িব, জোর করিয়া ত কাহাকেও আমার নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল কিনিতে বলিতেছি না। এই অজুহাত বা যুক্তি কি গ্রাহ্য হইবে? অবশ্যই না।

প্রশাসন—শাসন V.S. প্রশাসিত জনগণ

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকারের প্রশাসন-মেসিনের বিবিধ গলদ, অনাচার, অবিচার সম্পর্কে গত ১৮ বৎসর ধরিয়া বহু কথা, বহু সমালোচনা এবং সংবাদপত্রে বহু বহু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে—কিন্তু প্রশাসনরূপী নারায়ণ শীলা নির্ব্বাক, অনড়! একটি মন্তব্য এখানে দেওয়া অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হইবে, দেশশুদ্ধ লোক জানে বাঘে ছুঁইলে যেমন আঠারো ঘা তেমনই সরকারী দপ্তরে, সদর ও মফঃস্বলের যে কোনও সরকারী অফিসে বড় মেজ ছোট আমলাদের হাত হইতে দরকারী কাজকর্মের ফয়সালা হইতে হয়রানির এক শেষ। ইহাই নিয়ম, ব্যতিক্রম কালে-ভদ্রে। এ-নিয়ম হয়ত চলিতেছে ব্রিটিশ আমল হইতে, কিন্তু এ-নিয়মের অত্যাচার অনাচার হাজারগুণ বাড়িয়াছে গত আঠারো বছরে। ইহার একটি কারণ এখনকার তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কল্যাণরাষ্ট্রে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের বহর বাড়িয়াছে, চৌহদ্দি বিস্তৃত হইয়াছে শহরে ও গ্রামে সর্ব্বত্র, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি স্তরে। চাল ডাল নুন হইতে এমন জিনিস নাই যাহা আমলাতন্ত্রের নির্দ্দেশ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির বাহিরে। এখন স্বরাজ এবং আমলা রাজের মধ্যে জোড় মিলাইতে প্রাণান্ত। নূতন কথা নয়, দেশের যাঁহারা ভাগ্যনিয়ন্তা, কল্যাণরাষ্ট্রের আদর্শকে রূপদান যাঁহাদের সংকল্প তাঁহারাও দিনের পর দিন বলিতেছেন প্রশাসনিক ব্যবস্থা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার ফলেই কুশাসন।

সংসদীয় এষ্টিমেট কমিটি হালে যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তাহাতে রহিয়াছে প্রশাসন সম্পর্কে বহু আক্ষেপ, বিরুদ্ধমত এবং সতর্কবাণী। কমিটির মতে ইংরেজ আমলে যাহা ছিল পুলিসী রাজত্ব—আজ তাহাই 'কল্যাণরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় কল্যাণের কোন মনোহর চিত্র লোকে দেখিতে পাইতেছে না! এবং সেই কারণেই আমাদের এই রাষ্ট্র 'শাসকদের পক্ষে কল্যাণরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত হয়! কমিটি বলেন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই ধারা চলিতে থাকিলে সরকারী নীতি অনুযায়ী উন্নয়নের কাজকর্ম বাধা পাইবে এবং ইহার ফলে সামাজিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। এবং—

বিক্ষোভ ইতিমধ্যেই নানাভাবে দেখা দিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী আমলাতন্ত্রের গড়িমসি, জনসাধারণের সহিত স্বচ্ছন্দ সহানুভূতিশীল যোগাযোগের অভাব। সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য জনসাধারণের অভিযোগ তাড়াতাড়ি তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া।

ফাইল ও ফিতা, মান্ধাতার আমলের নিয়মকানুনের কড়াকড়ি এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের পালিশকরা, কেতা-দুরস্ত (বহু ক্ষেত্রে অভদ্র) ব্যবহার এ-গুলিও প্রশাসনিক অনর্থ কম সৃষ্টি করে না। ভারতের প্রশাসন-যন্ত্রের হাড়-হদ্দ জানেন এমন একজন বহুদর্শী ব্যক্তি শ্রী কে. পি. এস. মেনন লিখিয়াছেন, আমলারা তাঁহাদের পদাধিকারগুণে(?) সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান খাটাইতে অপারগ।

একটি হাস্যকর উদাহরণ, পেনসনভোগীকে তাঁহার পেনসন আনিতে হইলে প্রতি মাসে এই মর্ম্মে একখানি সার্টিফিকেট পেশ করিতে হয় যে তিনি উহার আগের মসে জীবিত ছিলেন। মার্চ্চ এবং এপ্রিল দুই মাসের পেনসন আনিতে গিয়া পেনসনভোগী একখানি

মাত্র সার্টিফিকেট পেশ করেন এই মর্শ্মে যে, তিনি মার্চ্চ মাসেও জীবিত ছিলেন। ওই সার্টিফিকেটের জোরে তিনি এপ্রিল মাসের পেনসন ঠিকই পাইলেন, কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসে জীবিত থাকার সার্টিফিকেট দেন নাই বলিয়া মার্চ্চ মাসের পেনসনপ্রাপ্তি আটকাইয়া গেল। সরকারী আপত্তির যুক্তি, মার্চ্চ মাসে বাঁচিয়া থাকিলে কী হয়, উহার আগের মাস ফেব্রুয়ারীতেও যে তিনি বাঁচিয়া ছিলেন তাহার প্রমাণ কী?

এই প্রকার বিচিত্র কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, চোখ কান বন্ধ রাখিয়া কিতাবাঁধা কাজ চলিতেছে সর্ব্বত্র—সরকারী দপ্তরে, অফিসে, ডাকঘরে, রেল ষ্টেশনে। ইহার উপর রহিয়াছে অভদ্রতা অসৌজন্য, উদাসীনতা। বিলাতী বিধানে, সরকারী কর্ম্মচারী মাত্রেই "পাবলিক সারভেণ্ট", কাজেই "পাবলিক" অর্থাৎ সাধারণ কেহ কোন কাজে গেলে "পাবলিক সারভেণ্ট" জিজ্ঞাসা করেন, "হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু?" অর্থাৎ আমি আপনার জন্য কী করিতে পারি? আমাদের দেশে বড় মেজ সেজ ছোট যে-কোনও আমলার কাছে ধর্ণা দিলে তিনি যদিও বা কৃপা করিয়া কথা কানে তোলেন তবে কড়াস্বরে হাঁক দিবেন, "হোয়াট ডু য়ু ওয়াণ্ট?" অর্থাৎ "কী চাও হে?"

ভাব দেখিয়া মনে হয় সরকারী কর্ত্তারা সবাই এক একটি জমিদার—এবং 'পাবলিক' তাঁহাদের প্রজা!

"জনসাধারণের প্রতি সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোভাব এবং আচরণ ছাড়াও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরও গুরুতর ত্রুটি অধিকাংশ সরকারী কর্ম্মচারীর দায়িত্ববোধ এবং কর্ম্মনিষ্ঠতার অভাব। অফিস সাজাইয়া ফাইল চালাচালি কিংবা জীপ ও মোটর হাঁকাইয়া তদারকি, ইহা দ্বারা কল্যাণরাষ্ট্রের বহুবিধ হাতেকলমে কাজ একেবারেই সম্ভব নয়।

শ্রীমোরারজী দেশাইএর সভাপতিত্বে গঠিত প্রশাসন-সংস্কার কমিশন কল্যাণরাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি নিখুঁত প্রশাসনযন্ত্র গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া শুনিতেছি। কিন্তু এই কমিশনের সাজসজ্জা ইত্যাদির কেতামাফিক সমারোহের যে প্রাথমিক বর্ণনা দেখিতেছি তাহাতে আশঙ্কা হয়, গতানুগতিক ব্যবস্থার ঝাড়পোঁছের বেশী কমিশন কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন না। আমলাতন্ত্র তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংস্কারের জন্ত বহু কমিটি আগেও বসিয়াছে, সুপারিশ কাজে লাগাইবার পাঁয়তাড়াও হইয়াছে বিস্তর, কিন্তু ফল হয় নাই। লর্ড ওয়েভেল বলিয়াছিলেন, কোনও বিষয়ে কমিটি, কমিশন নিয়োগ মানেই ধামা-চাপা দেওয়া। সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রের সংস্কার-উদ্দেশ্যে রকমারি উদ্যোগ সম্পর্কে কথাটি হয়তো মিথ্যা নয়।

আরও কিছু বলা দরকার—গত কিছুকাল হইতে প্রশাসন এবং প্রশাসকদের বিবিধ ব্যাপারে যে প্রকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং যাহার ফলে দেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যহ একটা-না-একটা হৈ-হল্লা এবং হট্টগোল প্রায় রুটিনে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে আরও কিছুদিন চলিতে থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হয়ত ভিয়েটনাম-ভিয়েটকংএর পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে।

প্রশাসনযন্ত্র যাহাই হউক—প্রশাসক যখন বিপক্ষ কিংবা বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের হুমকির নিকট নতি স্বীকার করেন তখন বুঝিতে হইবে প্রশাসকের মনোবল এবং মর‍্যাল প্রায় অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে! পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ জনের অবস্থা (দৈহিক এবং মানসিক) এমনই হইয়াছে যে—বর্ত্তমান সরকারের পরিবর্ত্তন সকলেই মনে মনে চাহিতেছে। জনগণের ধারণা—যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন আসুক না কেন, বর্ত্তমান অবস্থার অপেক্ষা তাহা কোন অংশেই হীনতর হইতে পারে না।

প্রশাসন-যন্ত্র পরিচালকগণ মুখে যাহাই বলুন—মনে তাঁহারা জানেন—বাঙ্গালী জনসাধারণের চোখে আজ তাঁহারা কোথায়! বাণী বিতরণ, আদর্শ প্রচার—সবই অতি উত্তম, কিন্তু বাণী-বিশারদ যাঁহারা আদর্শ প্রচার করেন জনগণের উদ্দেশ্য—নিজেদের জীবনে তাহা পালন করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। ইহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কেবল বিরুদ্ধপক্ষই নহে, সাধারণ জনগণ সমেত সরকারী-পার্টি অর্থাৎ কংগ্রেসী বহু নেতা, কর্ম্মীও আজ কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী প্রশাসক-দের নিকট হিসাব দাবি করিতেছে। আজ শাসন-গদিতে অধিষ্ঠিত নেতাদের।

—যে দেখে সে আজ মাগে
যে হিসাব
কেহ নাহি করে ক্ষমা!

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের প্রস্তাব

গান্ধীভক্ত এবং সর্ব্ববিষয়ে সৎ নিঃস্বার্থ দেশসেবক, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া জাতীয়

সরকার গঠনের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। মেদিনীপুরে এক মহতী জনসভায় ডঃ ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন :

খাদ্য সংকট ও দুর্নীতি জাতির জীবনের সর্ব্বস্তরে আজ এক ভয়ংকর সংকটের সৃষ্টি করেছে। এই সংকটের মোকাবেলা করা কোন একটি রাজনৈতিক দলের সামর্থ্যের বাইরে, কেননা, কোন দলই জনগণের ততখানি আস্থা অর্জ্জন করতে পারেননি। এই অবস্থায় দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হ'লে সকল দল এবং দলের বাইরের নির্ভরযোগ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত। আজ আমাদের পার্লামেণ্টে এইরূপ লোক আছেন যাঁরা দলের নেতা কিংবা নির্দ্দলীয় জননেতা। এঁদের মধ্য থেকেই প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই ভাবেই দলমত-নির্ব্বিশেষে দেশের উত্তম মনোভাবাপন্ন সমস্ত লোকের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা সরকার আকৃষ্ট করতে পারবেন।—

ডঃ ঘোষ সরকারের হাতে অধিকাধিক ক্ষমতা দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন, ক্ষমতা এইভাবে কেন্দ্রীভূত হইলে তাহাতে লোকের অসহায় ও নির্ভরতা বুদ্ধি আরও বাড়িবে এবং অত্যধিক ক্ষমতার অহংকারে সরকারী যন্ত্র হইবে আরও দুর্নীতিদুষ্ট। বেসরকারী ব্যবসায়ীরা দুর্নীতিপরায়ণ হইলে তবু কিছুটা সংশোধন করা সম্ভব,—কিন্তু অতিমাত্রায় ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের দুর্নীতি চক্রকে রোধ করিবে কে?

সরকারের হাতে রাজ্যের খাদ্য সরবরাহের সমুদয় দায়িত্ব দিবার যে প্রস্তাব বামপন্থী মহল করিয়াছে তাহারই পটভূমিতে ডঃ ঘোষ উক্তরূপ বিশ্লেষণ করেন।

ডঃ ঘোষ তাঁর ভাষণে সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া বলেন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণ তাঁহাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ হেতু এই আন্দোলন সুরু করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; পরবর্ত্তীকালে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাহাতে যোগ দিয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু দেশের বর্ত্তমান এই দুঃসহ অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী,—আমাদের নিষ্ক্রিয়তাই ত্যাগের স্থলে লোভকে বড় করিয়া, দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া ধনীর প্রাসাদকে মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে দিতেছে। এখন শুধু কথা নয়,—সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত কাজের দ্বারা এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব।

ডঃ ঘোষের নতুন পরিচয় দিবার কিছু নাই। দেশের জন্য যে ত্যাগ তিনি করেন, তাহা হয়ত অদ্যকার তথাকথিত আপসে-বন-গিয়া নেতারা না জানিতে পারেন, কিন্তু আমরা ভুলি নাই। দেশের এবং জাতির স্বাধীনতা ও কল্যাণের জন্য সরকারী মিণ্টের উচ্চতম পদ এবং উচ্চ বেতন পরিত্যাগ করা দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ডঃ ঘোষের পক্ষে কোন দ্বিধা-বাধার সৃষ্টি করে নাই। জীবনে পার্থিব বিত্ত বৈভবের সকল সুযোগই তিনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে পরিহার করিয়া গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দেন।

স্বাধীনতার পর বিভক্ত বাঙ্গলায় তিনি প্রথম মুখ্য-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া দুর্নীতি দূর এবং খাদ্যে-ভেজাল বন্ধ করিতে সর্ব্বাঙ্গীন প্রয়াস করেন। কিন্তু জনকল্যাণের জন্য এই প্রয়াসই তাঁহার পদত্যাগের হেতু হইল। বলিতে বাধা নেই—খুব সম্ভবত স্বর্গত: ডঃ রায়েরও কিছুটা হাত বা যোগসাজস ডঃ ঘোষকে হটাইবার চক্রান্তে ছিল—দুষ্ট (কিন্তু সত্যবাদী) বহুলোকে একথা বলে।

পশ্চিম বাঙ্গলার প্রথম মন্ত্রীসভায় অদ্যকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনকে ডঃ ঘোষই স্থান দান করেন। ডঃ ঘোষের পদত্যাগের সময় কিন্তু শ্রীসেন, স্বর্গত কালী মুখার্জ্জি প্রভৃতি পদত্যাগের পথে যান নাই। নেতার প্রতি আনুগত্য ছিল একমাত্র শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়ের। তিনি দরিদ্র কিন্তু মন্ত্রিত্বত্যাগে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। এখন তিনিও বেকার!

ডাঃ ঘোষের প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করিবেন—এক-মাত্র কংগ্রেস পার্টি ছাড়া। কংগ্রেসী যাঁহারা কেন্দ্র এবং রাজ্য মন্ত্রীসভায় আছেন, তাঁহাদের মধ্যে দু'চারজন ছাড়া আর সকলেই বিতাড়িত না হওয়া পর্য্যন্ত গদি আঁকড়াইয়া থাকিবেন। বাহিরে চাকুরির ক্ষেত্রে গুণানুযায়ী যাঁহাদের মাসে একশত টাকা আয় করিবার যোগ্যতাও নাই, তাঁহারা কেমন করিয়া এবং কিসের জন্য গাড়ি, বাড়ী, উচ্চ বেতন এবং পরের পয়সায় এমন বিলাসবহুল নবাবী জীবন ত্যাগ করিবেন?

আর কংগ্রেস? ডাঃ ঘোষ বলিলেন বলিয়াই কংগ্রেস সরকারী দপ্তর হইতে চলিয়া যাইবে ডঃ ঘোষের পরামর্শ মত একটা 'ন্যাশ্‌নাল-গভর্ণমেণ্টের' হাতে দেশ-শাসনের ভার দিয়া! কংগ্রেস ক্ষমতা ছাড়িলে, যাহারা নেপথ্যে থাকিয়া কংগ্রেস চালায়, কংগ্রেসের ইলেকসন-খরচার জন্য কোটি কোটি টাকা (কোথা হইতে, কোন সূত্রে পাওয়া—জিজ্ঞাসা করিবেন না!) 'দান' করে (অবশ্যই গোপন সর্ত কিছু থাকে)—তাহাদের কি হইবে?

'পারমিট' না পাইলে নেপথ্যচারীরা কংগ্রেসকে আর এমন করিয়া প্রেম্‌সে অর্থ জোগাইবে কি? ক্ষমতায় আসীন না থাকিলে কংগ্রেসের 'আমদানী' বন্ধ হইবে এবং এই আমদানী বন্ধ হইলে বহু বহু বেকার কংগ্রেসী নেতার বিলাসবহুল সংসার খরচা চলিবে কিসে? 'আমদানী' যে অর্থের কোন অডিট রিপোর্ট এবং হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হয় না—সে-অর্থ দু'একজনের ইচ্ছামত খরচ করার মধ্যে বিরাট এক মজা আছে বর্তমানের কংগ্রেস এই 'বিরাট মজা'র জমিদারী প্রাণ থাকিতে অন্যের হাতে দিতে পারিবে না।

দাঁড়াইল কি? ডঃ ঘোষের প্রস্তাব যতই যুক্তিসঙ্গত এবং নীতিগ্রাহ্য হউক না কেন বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকার তাহা বিবেচনার যোগ্যও মনে করিতে পারে না:

অতএব ডঃ ঘোষের প্রস্তাবিত 'ন্যাশ্‌নাল গভর্ণমেণ্ট' আপাতত চুলা নামক যোগ্যধামে প্রেরিত হইল।

আগামী নির্বাচনের পর এবিষয়ে আবার চিন্তা করা যাইতে পারে—অবশ্য সবই সর্ব্বশ্রী কামরাজ অতুল্যের মেজাজের উপর নির্ভর করিবে।

ভেজাল প্রতিরোধ?

কিছুদিন পূর্ব্বে দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে বিশেষ একটি প্রখ্যাত 'মাখন ও ঘি উৎপাদক' সংস্থার মাখন ও ঘি—ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় চতুর্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ মামলার রায় দান কালে মন্তব্য করেন "এই মাখন ও ঘি উৎপাদক সংস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ভোগ করেন—এবং এই জনপ্রিয়তার কারণে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা এই সংস্থার মাখন ও ঘি ক্রয় করেন। এ জন্য আমি এ কেস্ সম্পর্কে নরম মনোভাব গ্রহণ অনিচ্ছুক।" বিচারে সংস্থার অর্থদণ্ড হয় দুই হাজার করিয়া টাকা। সংস্থার শাখা ম্যানেজার এবং ভেজাল মাখন ও ঘি-বিক্রেতার—প্রত্যেকের হাজার টাকা করিয়া জরিমানা হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে প্রত্যেককে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মামলাটি হইল এই—কিন্তু কোন্ বিশেষ কারণে ভেজাল মাখন ও ঘি উৎপাদক সংস্থার নাম প্রকাশ করা হইল না তাহা বুঝা শক্ত। ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করিলে খুচরা সামান্য বিক্রেতার এমন কি ফেরিওয়ালার নামও সাড়ম্বরে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ছোটদের বেলায় যাহা হয়, বড়দের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম কেন?

বহুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত এক শুদ্ধ বার্লি প্রস্তুত কারকের বেলাতেও এই ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। কোন এক প্রদর্শনীর ষ্টল হইতে 'শুদ্ধ বার্লি' পরীক্ষায় দেখা গেল বার্লি 'শুদ্ধ' নহে, অর্থাৎ সোজা বাঙ্গলায় যাহাকে বলে খাঁটি ভেজাল। এই 'শুদ্ধ বার্লি' প্রস্তুতকারক সংস্থার ভেজাল-নিরোধক আইন বলে হাজার টাকা জরিমানা হয়—কিন্তু পরদিন একটি বিশেষ ইংরেজী দৈনিক (ষ্টেটস-ম্যান) ছাড়া অন্য কোন দৈনিকে এই মামলার রিপোর্ট এবং জরিমানার বিষয় কোন সংবাদই প্রকাশিত হইল না। ইহার পরিবর্ত্তে উল্লিখিত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকাটি ছাড়া কলিকাতার অন্যান্য প্রায় সকল দৈনিকেই ১০×৪ কলম এবং আরও বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখা গেল। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের জোরে 'খাঁটি ভেজাল' বার্লির ভেজাল উবিয়া গিয়া পূর্ণ খাঁটিত্ব বজায় রাখা হইল! অথচ কলিকাতার এই সকল দৈনিক পত্রিকা জনসাধারণকে নীতি উপদেশ দিতে এবং ভেজাল প্রতিরোধে সংঘ-বদ্ধ হইতে সদাসর্ব্বদা প্ররোচিত করিয়া থাকেন!

যে ভাবেই হউক আর বুদ্ধির দাঁও দেখা যাইতেছে কেহই ছাড়েন না—তফাৎ: কেহ মারে গণ্ডার আর কেহ বা ছাগশিশু!

—:•:—
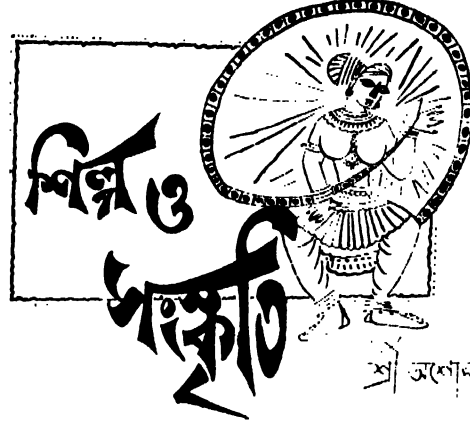
নির্বোধের স্বীকারোক্তি

কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমার মনোহারিণী বান্ধবীর কাছে পুরুষের অন্তরের চেহারাটা অতি সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে যেত। তিনি ছিলেন সেই জাতীয় একরোখা মহিলা যার সংস্পর্শে এলে যে-কোন পুরুষ নিজের আত্মিক আধিপত্য তাঁর হাতে বিসর্জন না দিয়ে নিস্তার পেতেন না। তিনি বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে প্রচুর চিঠিপত্র লেখালেখি করতেন, অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্কদের উপদেশ এবং সাবধান-বাণীতে তটস্থ ও জর্জরিত করে তুলতেন, আর সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার ব্যাপারে পরিচালক এবং নির্দেশকের ভূমিকায় কাজ করতে। এই ধরনের মহিলারা অন্যের মনের উপর নিজেদের ইচ্ছাশক্তি আরোপ করে তাদের জীবনকে নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালিত করে, এক ধরনের ক্ষমতালিপ্সাকে চরিতার্থ করেন। এঁরা বোধ হয় মনে করেন মানুষের আত্মিক মোক্ষলাভের এবং মুক্তির উপায় বাৎলে দেবার জন্যই পৃথিবীতে এঁরা জন্ম নিয়েছেন। এই বিশেষ মহিলাটি এই সময় বোধ হয় নিজেকে আমার জীবনের ত্রাণকর্তা হিসাবে মনে মনে নিজেকে ঠিক করে নিয়েছিলেন—ভাবছিলেন আমার মত একটি পণ্ডিত আত্মাকে কি ভাবে তিনি মোক্ষলাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মহিলা এদিকে আবার ছিলেন অত্যন্ত ফন্দিবাজ—কথাবার্তায় বুদ্ধির প্রখরতা বিশেষ দেখতে পেলাম না, কিন্তু বুঝলাম মেয়েলী ঔদ্ধত্যে তার মনটা ভরা।

তিনি চেষ্টা করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় নিয়ে—যথা পৃথিবী, মানব-প্রকৃতি, ধর্ম—গভীর ভাবে আলোচনা করতে। তাঁকে চটিয়ে দেবার জন্য সব ব্যাপার নিয়েই আমি ঠাট্টা সুরু করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে আমার চিন্তাধারাটাই হচ্ছে মরবিড। "মরবিড! কি যে বলেন, আমার আইডিয়াগুলো মরবিড? আমার ত মনে হয় ঠিক তার উল্টো—এমন তাজা এবং সদ্যপ্রসূত প্রাণবন্ত আইডিয়াগুলোকে জরাজীর্ণ চিন্তাধারা বলে মতপ্রকাশ করতে আপনার মুখে বাধল না? বরং আপনার মতামত-গুলোকেই ত আমার মৃত অতীতের ধ্বংসস্তূপের আবর্জনা বলে মনে হচ্ছিল এতক্ষণ। ছেলেবেলায় ওসব কথা অতি সাধারণ লোকের মুখেও বার বার শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। ওগুলো একেবারে রাবিশ—আমি ভেবে পাচ্ছি না কি মনে করে ঐসব পুরণো পচা মতামতকে আপনি নতুন এবং সাম্প্রতিক বলে চালাতে চাচ্ছেন। স্পষ্ট কথা শুনে দুঃখিত হবেন না—টাটকা ফল বলে আপনি যা আমাকে উপহার দিতে এসেছেন, আসলে তা হচ্ছে বিশ্রীভাবে কলাই-করা টিনের পাত্রে রক্ষিত পুরাণো পচা ফল। এ সব ফলে আমার দরকার নেই—আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। আপনি নিশ্চয় এখন বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাই।" মহিলা এতদূর বিরক্ত হলেন যে বিদায় সম্বর্ধনা পর্যন্ত না জানিয়ে উত্তেজিত ভাবে স্থানত্যাগ করলেন—আত্মসম্বরণ করবার ক্ষমতাও তখন তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মহিলা চলে যাবার পর পার্কে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হলাম। তাদের সঙ্গেই গল্পগুজবে সন্ধ্যাটা কাটল।

পরের দিন সকালে—তখনও ওই মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর উত্তেজনাটা আমার স্তিমিত হয়ে আসে নি, এমন সময় মহিলার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। চিঠিটা আত্মশ্লাঘায় ভরা, আমার প্রতি প্রচুর গালমন্দ আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন তিনি নিজের সহনশীলতা গুণে এবং আমার প্রতি কৃপাবশতঃ আমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছেন। আমার আত্মিক স্বাস্থ্যহানির নিরাময়তায়

জন্য তিনি বিশেষভাবে উদগ্রীব একথাও জানিয়েছেন এবং লিখেছেন সেই কারণেই তিনি দ্বিতীয় বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, তাঁর সঙ্গে আমারও গিয়ে তাঁর বাক্‌দত্তের বৃদ্ধা মাকে দেখে আসা উচিত।

আচার-ব্যবহারে আমি অত্যন্ত ভদ্র এই বলে আমার একটা গর্ব আছে। সুতরাং নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলাম—ভাবলাম সহজে যাতে মহিলার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি সেই চেষ্টাই করব। মনে মনে সংকল্প করলাম এবার যদি ধর্ম সম্বন্ধে, জাগতিক বা অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনা সুরু হয় তবে আমার দিক থেকে আমি একটা নিরাসক্তির ভাব দেখাব।

বিস্মিত হয়ে গেলাম মহিলাকে দেখে। তিনি পশমের টাইট-ফিটিং পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসেছেন—জায়গায় জায়গায় ফার বসিয়ে পোশাকটিকে পরিপাটি করা হয়েছে। মাথায় দীর্ঘ আকারের পিক্‌চার হ্যাট, অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। এমন কোমল সহৃদয়তার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন যে, মনে হ'ল তিনি যেন আমার বড় বোন। আলোচনার সময় আমাদের ভেতর মতানৈক্য হ'তে পারে এ ধরনের বিষয়বস্তু তিনি যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চললেন। মোট কথা এবার সবদিক থেকেই তাঁকে মনে হ'তে লাগল অত্যন্ত চার্মিং। আমাদের দু'জনের আত্মা—কারণ একে অন্যকে খুশী করব এই সঙ্কল্প নিয়েই আমরা এবার এসেছিলাম—মিলিত হ'ল সহৃদয়তাপূর্ণ কথাবার্তা বলবার জন্য। বিদায় নেবার আগে সত্যি সত্যিই এবার দু'জনের অন্তরে একটা নির্ভেজাল সহানুভূতির ভাব উন্মেষিত হ'ল।

মহিলার বাগদত্তের বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা করবার পর আমরা ঠিক করলাম কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেরিয়ে বেড়াব। কারণ সে সময়টা ছিল বসন্তকাল। বসন্ত কোমল সৌন্দর্যের ঋতু। গ্রীষ্ম বা শীতের ভেতর একটা পৌরুষ ভাব মিশ্রিত থাকে, কিন্তু বসন্তে প্রকৃতি এবং পরিবেশের ভেতর একটা পবিত্রভাবের আস্বাদন পাওয়া যায়। আকাশ, বাতাস এবং পারিপার্শ্বিকের ভেতর থেকে যেন একটা মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি ভেসে এসে আমাদের প্রাণটাকে আকুল করে তুলছিল। আলোছায়ার সংমিশ্রণে এবং খেলায়, আশেপাশের গাছের পাতার মর্মরধ্বনিতে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি হচ্ছিল। বসন্তের সৌন্দর্যের ভেতর তীব্রতা থাকে না—থাকে মনমাতানো মাধুর্য আর একটা অদ্ভুত সংযমের ভাব। কি বাতাসের বেগে, কি সূর্যকরজালে, কি আবহাওয়ার ভেতর কোন কিছুই প্রকটভাবে ফুটে ওঠে না। এই জন্যই বসন্ত ঋতু সৌন্দর্য-রসিকদের কাছে এত প্রিয়।

এই সুন্দর পরিবেশে মহিলার সঙ্গটাকে মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছিলাম—উপভোগ করছিলাম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে। টাইট-ফিটিং পোশাকের আবরণ ভেদ করে আভাসে-ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল তাঁর অনুপম দেহ-সৌন্দর্যের ছন্দময়তা। আমার বার বার মনে হচ্ছিল প্রকৃতি দেবী যেন এই নারী-দেহকে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে সৃষ্টি করবার জন্যই তরঙ্গায়িত ভঙ্গিমায় গড়ে তুলেছেন—কিন্তু সেই উচ্ছল তরঙ্গরাশি লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চলভাবে এই নারী-দেহে বন্দীভাবে বিরাজ করছে। সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা সুগঠিত নারী-দেহে, এই জন্যই সত্যিকার শিল্প-রসিক সুন্দরী নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছন্দ-নৃত্যের চরম রূপ দেখতে পান।

এর পর কি কারণে জানি না ইচ্ছা হ'ল মহিলাকে একটু জব্দ করতে—আমার হঠাৎ মনে হ'ল তিনি হয়ত আমায় নিয়ে খেলা করছেন—কারণ পুরুষদের নিয়ে পুতুল-নাচ করানোটা মেয়েদের চিরন্তন অভ্যাস। খুব গোপনতার ভাব দেখিয়ে আমি বললাম যে, একজন মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য আমি প্রায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেছি। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যাও ছিল না। কারণ সে সময়টায় একজন বান্ধবীর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশছিলাম।

আমার কাছে একথা শোনবামাত্র মহিলার ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেল। এমনভাবে কথাবার্তা বলতে সুরু করলেন যেন তিনি আমার ঠাকুরমা স্থানীয়। মেয়েটির প্রতি তাঁর মমতা যেন উথলে উঠতে লাগল—সে কি জাতের মেয়ে, দেখতে কেমন, সমাজের কোন্ স্তর থেকে আসছে, অবস্থা ভাল কি না এই সব নানা প্রশ্নে আমাকে জর্জরিত করে তুললেন। আমিও এমন ভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিলাম যার ফলে সহজেই তাঁর মনে জেলাসী দেখা দেয়।

কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার এবং কথা বলবার তীব্র ইচ্ছাটা তাঁর ক্রমশঃ কমে আসছে। মনে মনে বেশ হাসি পেয়ে গেল আমার। আমার জীবনে নিজেকে আমার ভাগ্য-নিয়ন্তারূপে প্রতিষ্ঠিতা করতে চাইছিলেন মহিলা। কিন্তু যেই শুনলেন এক্ষেত্রে তাঁর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন অমনি আমার সম্বন্ধে তাঁর হঠাৎ-জেগে ওঠা তীব্র আগ্রহটা যেন স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল।

আমার এন্‌গেজমেন্টের কথাটা বলে এই মহিলার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ভেতরটায় যেন একটা তুষার-প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিলাম—ফলে সেদিন বিদায় নেবার সময় এই মহিলার হৃদয়ের উত্তাপটা অনেকটাই যেন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল।

পরের দিন যখন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল আমাদের একমাত্র আলোচ্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল প্রেম, প্রণয় এবং আমার তথাকথিত বাক্‌দত্তার বিষয়ক কথাবার্তা।

এক সপ্তাহ দু'জনে মিলে নানা জায়গায় গেলাম—থিয়েটার দেখতে, কনসার্ট শুনতে এবং সুন্দর সুন্দর জায়গার কাছাকাছি রাস্তা ধরে হেঁটে বেড়াতে। ক্রমাগত সান্নিধ্যের যা ফল হয়, এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে মেশাটা আমার একটা অভ্যাসের মত হয়ে দাঁড়াল। এ অভ্যাসের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার সমস্ত ক্ষমতা যেন আমি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছিলাম। অ-সাধারণ জাতের মেয়েদের সঙ্গে আলাপে-আলোচনায় একটা সেন্‌সুয়াল চার্মের অনুভূতি হয়—পরস্পরের ভেতর এক ধরনের আত্মিক-সংগম ঘটে এবং একের অন্তর অন্যের অন্তরকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করতে থাকে।

এরপর নিত্যনৈমিত্তিক রীতিতে একদিন সকালে যখন ঐ মহিলার সঙ্গে দেখা হ'ল, বেশ বুঝতে পারলাম তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। বাক্‌দত্তের কাছ থেকে সদ্যপ্রাপ্ত একটি চিঠিই তাঁকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল। তাঁর প্রেমিক হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠে এই পত্রাঘাত করেছিলেন। মহিলা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাঁরই অসতর্কতার জন্য এ ব্যাপারটা ঘটেছে এবং এজন্য তিনিই সম্পূর্ণভাবে দোষী। বাক্‌দত্ত ভদ্রলোকটি তাঁর প্রিয়াকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে এ ধরনের খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে মেলামেশা করা চলবে না। তিনি এ কথাও লিখেছেন যে আমাদের এই অবাধ মেলামেশার ভেতর তিনি একটা অত্যন্ত অশুভ পরিসমাপ্তির পূর্বলক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। "এ ধরনের নোংরা জেলাসির কোন মানেই হয় না"—দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন এই ধরনের একটা ভাব দেখিয়ে মন্তব্য করলেন মহিলা। "আপনার পক্ষে এই ধরনের অনুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক—কারণ "প্রেম" শব্দটির সত্যিকার তাৎপর্য এখনও আপনার অজানা"—বললাম আমি। এবার অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে 'প্রেম' শব্দটিকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করলেন মহিলা।

বললাম—"দেখুন প্রিয়দর্শিনী! প্রেমের ভেতর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মনের কোণায় একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। প্রেমাস্পদের উপর নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করবার। এই মালিকানা হারিয়ে ফেলবার ভয় থেকেই ঈর্ষার উদ্ভব হয়।" "মালিকানা! এই ধরনের চিন্তাধারাটাই ন্যক্কারজনক।" —বললেন মহিলা।

প্রেমিক এবং প্রেমিকা যদি দু'জনেই দু'জনকে পজেস্ করতে চান, তা হ'লে তার ভেতর দোষের কি আছে?

এ ধরনের প্রেমের ব্যাখ্যাকে মহিলা মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাঁর মতে প্রেমের ভেতর থাকা দরকার একটা নির্মালিকানার ভাব, কারণ প্রেম জিনিষটা হচ্ছে একটা উচ্চস্তরের জিনিষ, পবিত্রতায় ভরা এবং বিশ্লেষণের দ্বারা যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

আসলে বাগদত্তের প্রতি মহিলার কোন ভালবাসাই ছিল না, ভদ্রলোকটি কিন্তু মহিলার প্রেমে প্রায় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। আমার এই ধরনের কথায় মহিলা প্রথমটায় ভয়ানক রেগে উঠলেন, পরে অবশ্য স্বীকার করলেন যে ঐ বাগদত্ত ভদ্রলোকটিকে তিনি একেবারেই ভালবাসতে পারেন নি।

"কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি তাঁকে বিয়ে করবার কথা চিন্তা করছিলেন?" "কি করব, আমি বুঝতে পারছিলাম আমি রাজী না হ'লে ভদ্রলোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে।" বেশ উপলব্ধি করলাম এ ক্ষেত্রেও মহিলার ভেতরকার সেই পরিত্রাতা সত্ত্বাটিই তাঁর পথনির্দেশ করে দিচ্ছিল। উদ্‌ভ্রান্ত আত্মার পরিত্রাণ করাটাই তাঁর জীবনের ব্রত—এই ধরনের একটা চিন্তা তাঁকে প্রায় বাতিকগ্রস্ত করে ফেলেছিল।

কথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলা ক্রমশঃ রেগে উঠছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তখন বা তার আগে কোন সময়েই তিনি এনগেজ্‌ড হন নি।

কথায় কথায় এরপর পরিষ্কার হয়ে গেল যে এন্‌গেজমেন্টের ব্যাপারে দু'জনেই আমরা দু'জনের কাছে মিথ্যে কথা বলে এসেছি। ফলে এখন থেকে আমরা অনেক সহজভাবে মিশবার সুবিধা পেলাম।

আর কোন ঈর্ষার কারণ না থাকাতে আমরা এবার নতুন করে মন-দেওয়া-নেওয়ার খেলা সুরু করলাম। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেম করবার সময় আমাদের ভেতরকার কৃত্রিমতাটা অনেকটা সরে গিয়েছিল। আমি চিঠি লিখে জানালাম যে আমি তাকে ভালবাসি। সে ঐ চিঠিটা তার ফিয়াঁসের কাছে পাঠিয়ে দিল। ফলে

ঐ লোকটি আমাকে যথেষ্ট গালাগাল দিল, অপমান করল—অবশ্য চিঠির মাধ্যমে। আমি তখন মহিলাকে বললাম আমাদের দুজনের ভেতর একজনকে বেছে নিতে। মহিলা কিন্তু তা করল না, কায়দা করে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল। তার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। সে চাইছিল আমাকে, ঐ ভদ্রলোককে এবং আরও যতজন পুরুষকে পাওয়া সম্ভব হয় সবাইকে—তার অনুরক্ত এড্‌মায়ারার করে রাখতে। আসলে সে ছিল ফ্লার্ট, নর-খাদক এবং পুরোপুরি একজন পরিত্রাণভ্রষ্ট।

হয়ত অন্য কোন সুযোগ্যা সঙ্গী না পাওয়াতেই আমি এই মহিলার প্রেমে পড়ে গেলাম। আর এ্যাটিকে সঙ্গীহীন অবস্থায় একক জীবন কাটাতে কাটাতে আমি নারীসঙ্গের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম।

তার শহরে থাকবার মেয়াদ শেষ হয়ে এল। এই সময় একদিন তাকে আমার লাইব্রেরীতে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তার চোখ ঝলসিয়ে দেবার ইচ্ছাতেই তাকে এখানে ডেকেছিলাম—আমি ভেবেছিলাম এই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ পরিবেশে আমাকে দেখলে সে হক্‌চকিয়ে যাবে। বুঝতে পারবে আমি ঠিক সাধারণ স্তরের মানুষ নই। তাকে নিয়ে প্রত্যেক গ্যালারীগুলো ঘুরিয়ে দেখালাম—যাতে সে বুঝতে পারে বইপত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কত গভীর। নানাশ্রেণীর বই, পুঁথি, পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধেও অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। মনে হ'ল শেষটায় সে উপলব্ধি করল জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে সে কত তুচ্ছ—এই ধরনের অনুভূতির ফলে সে বেশ বিব্রত বোধ করতে লাগল এইবার। আমাকে বললে—তুমি সত্যিই খুব জ্ঞানী এবং পণ্ডিত লোক। হেসে জবাব দিলাম—তা ত বটেই।

পুরানো বন্ধু সেই অপেরা গায়ককে অর্থাৎ সেই বাগদত্তকে উদ্দেশ করে বললে—বেচারী বৃদ্ধ মূকাভিনেতা!

বেচারী মূকাভিনেতা কিন্তু তখনও আমার জীবন থেকে অপসারিত হন নি। তিনি চিঠির মারফৎ আমাকে গুলী করে মারবার ভয় দেখাচ্ছিলেন। আমার প্রতি দোষারোপ করছিলেন যে আমি তাঁর ভাবী বধূকে চুরি করে নিয়ে গেছি। আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করলাম যে এক্ষেত্রে চুরির প্রশ্ন ওঠে না—কারণ ঐ মহিলাকে নিজস্ব সম্পত্তি মনে করবার অধিকার তিনি পেলেন কোথা থেকে? এরপর পত্রাঘাত করা তিনি বন্ধ করলেন বটে, তবে বেশ বুঝতে পারলাম নীরবতা অবলম্বন করেই তিনি আমাকে ভয় দেখাতে চান।

মহিলার এখানে থাকবার দিন শেষ হয়ে এল। যাবার ঠিক আগে সে খুব উদ্দীপনাপূর্ণ এক চিঠি লিখে আমাকে জানাল অপ্রত্যাশিত ভাবে বড় রকমের সৌভাগ্যের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আমার জীবনে। সে না কি আমার নাটকটি কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী লোককে পড়ে শুনিয়েছিল—এইসব লোকেদের আবার রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজারদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। নাটকটি খুব ইমপ্রেস করেছে ঐ সব প্রভাবশালী লোকেদের—তারা আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। মহিলা বিকেলে দেখা করে ডিটেল্‌সে খবর দেবেন আমাকে এ সম্বন্ধে।

নির্দ্ধারিত সময়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমি তার সঙ্গে শপিং করবার জন্য বেরোলাম—যাবার আগে সে শেষ কিছু কেনাকেটা করে নেবে। মহিলা একটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিল—অর্থাৎ আমার নাটকটি ঐ সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভেতর সেনসেশন ক্রিয়েট করেছে। মহিলাকে বাধা দিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এসব ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা জিনিষটা আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। সে কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল আমাকে তার মতবাদে কনভার্ট করতে। তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না নিয়ে আমি এ বিষয়ে আমার মানসিক অসন্তোষ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করলাম। অপরিচিত লোকেদের বাড়ীর দরজায় দরজায় ঘোরা, তাদের সঙ্গে আসল মনের কথা গোপন করে তাদের তুষ্টিসাধন হয় এমন সব বিষয়ে আলোচনা করা—সমস্ত পরিকল্পনাটাই আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে হ'তে লাগল। ভিক্ষুকের মত প্রভাবশালী লোকেদের কাছে গিয়ে তাদের কৃপা ভিক্ষা করে বেড়াবো—এ কখনও আমার দ্বারা সম্ভব! আমি যখন জোরগলায় আমার মনের কথা বলছি মহিলা হঠাৎ এক যুবতী, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া (অন্ততঃ দেখে তাই মনে হয়) তরুণীকে দেখে থেমে পড়ল। তরুণীর সাজসজ্জা ছিল অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ—গতিভঙ্গিতে একটা কোমল সৌন্দর্যের আভাস ফুটে বেরুচ্ছিল।

আমার বান্ধবী এই তরুণীটির পরিচয় দিল ব্যারোনেস এক্স বলে—মৃদুস্বরে ব্যারোনেস দু'চারটে কথা আমাকে বললেন—রাস্তার গোলমালে সে কথাবার্তার বেশীর ভাগই আমি বুঝতে পারলাম না। আমি কোনরকমে কি একটা জবাব দিয়েছিলাম, এখন মনে নেই। বেশ বিরক্ত বোধ করেছিলাম—কারণ আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম

আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যই আমার ধূর্ত সঙ্গিনী আগে থেকে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

অল্পক্ষণ বাদেই ব্যারোনেস চলে গেলেন। অবশ্য তার আগে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। ব্যারোনেসের বয়স পঁচিশ বছরের কম হবে না—অথচ চেহারা দেখলে মনে হয় কিশোরী, আর মুখের ভাবটা ত শিশুর মত। সব মিলিয়ে তাঁকে মনে হয় স্কুলের ছাত্রী, মুখের চারপাশে সোনালী রংএর কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ কাঁধ দু'টিতে একটা রাজকীয় ভাব, ফিগারটি ঢেউ-খেলানো, মাথা নোয়ানোর ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হয়ে পড়ছিল একটা দৃপ্ত স্পষ্ট সম্রাজ্ঞীর মত আত্মম্ভরিতা এবং আত্মসচেতনতার ভাব।

আর এই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ব্যারোনেস—যিনি আসলে সন্তানের জননী হ'লেও কুমারীর মত দেখতে—তিনি না কি আমার নাটকটি পড়েছেন এবং পড়ে বিরক্ত বা মর্মাহত হন নি। এও কি কখনও সম্ভব?

ব্যারোনেস বিয়ে করেছেন একজন ক্যাপ্টেন অফ দি গার্ডস্‌কে—তাঁর একটি বছর তিনেকের মেয়ে আছে—থিয়েটার সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও থিয়েটারে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব—স্বামী এবং শ্বশুরের পদমর্যাদা এবং সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকটা চিন্তা করে এ কাজ করা তাঁর পক্ষে খুব সহজ ছিল না। সম্প্রতি তাঁর শ্বশুর সরকারের তরফ থেকে 'জেন্টলম্যান-ইন-ওয়েটিং-এর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

যে মহিলার সঙ্গে প্রেম এবং প্রণয়ে আনন্দে এবং স্বপ্নের জাল বুনে সময় কেটে যাচ্ছিল তারও পরিসমাপ্তি ঘটল এইবার। অবশেষে আমার প্রেমিকা একদিন ইশারে চেপে বললেন—এবার সে তার পূর্বপ্রেমিকের কাছে ফিরে যাবে। মূকাভিনেতাটি এই মহিলার ব্যাপারে তার স্বত্বাধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে নিশ্চয়ই। হয়ত মহিলাকে লেখা আমার চিঠিগুলো নিয়ে দু'জনে হাসিঠাট্টা করে মজা অনুভব করবে—যে মজাটা আমরা করতাম তার চিঠিপত্র নিয়ে, মহিলা যখন এখানে ছিল। জাহাজে ওঠবার আগে পরম স্নেহভরে মহিলা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল এবং আমার থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল যে কয়েক দিনের ভেতরই আমি গিয়ে ব্যারোনেসের সঙ্গে দেখা করব।

যাই হোক ঐ মহিলার সঙ্গে যে সম্বন্ধটা গড়ে উঠেছিল তার প্রভাবটা কাটিয়ে উঠতে বেশ কষ্ট অনুভব করছিলাম। সমস্ত অন্তরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। শুকনো কাটখোট্টা বোহেমিয়ান জীবনটাই এক সময় অভ্যাসের মত হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমার মরুভূমি-সদৃশ জীবনে ওয়েসিসের মত আবির্ভূত হয়েছিল ঐ মূকাভিনেতার বাক্‌দত্তা। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দিবাস্বপ্ন দেখে বেশ দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। ভদ্রমহিলাটির বন্ধুত্বপূর্ণ এবং নিষ্পাপ সাহচর্যে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের নির্জনতা যেন মধুর রসে ভরে উঠেছিল। সত্যিই আমি খুব নিঃসঙ্গ ছিলাম—কারণ পরিবারের সবার সঙ্গে আমার মতের মিল হ'ত না এবং সেই কারণেই তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতাম না। বোহেমিয়ান জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে হোম লাইফের প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ আমি ভুলতে বসে-ছিলাম—সেটাকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছিলেন এই অতি সাধারণ কিন্তু ভদ্রস্তরের মহিলাটি।

এরপর একদিন সন্ধ্যা ছটায় গিয়ে ঢুকলাম ব্যারোনেসের বাড়ীর সদর দরজায় - বাড়ীটি ছিল নর্থ এভিনিউতে। ভারী আশ্চর্য বোধ করছিলাম। এ বাড়ীটা হচ্ছে আমার বাবার পুরোন বাড়ী—যেখানে আমার শৈশবের দুঃখের দিনগুলো কেটেছে, কৈশোরে যেখানে সব রকমের ঝড়-ঝাপটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এ বাড়ীতেই আমার মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবং পরে তাঁর স্থান নিতে আসেন আমাদের সৎ-মা। হঠাৎ খুব খারাপ লাগতে লাগল, ইচ্ছা হ'ল পালিয়ে যাই। আমার যৌবনের এবং কর্মজীবনের আদিপর্বের বেদনাভরা দিনগুলোর বিষয় চিন্তা করতে মোটেই ভাল লাগছিল না। দুঃখের তাপে মনটা ভরে গেলেও, নিজেকে সামলিয়ে নিলাম এবং ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেল বাজালাম।

ঘণ্টাধ্বনি ভেতরের দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনছিলাম আর কেমন মনে হচ্ছিল হয়ত বাবা এসে দরজাটা খুলে আমার সামনে দাঁড়াবেন—যেমন বহুবার ঘটেছে আমরা যখন এ বাড়ীতে থাকতাম।

একটি চাকর এসে দরজা খুলে দিয়ে তখনই চলে গেল ভিতরের দিকে আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা করতে। কয়েক সেকেণ্ড বাদেই ব্যারণ এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন এবং অন্তর থেকে আমাকে স্বাগত জানালেন। দেখে মনে হ'ল তাঁর বয়স হবে বছর তিরিশ, দীর্ঘ, শক্তিশালী দেহের গঠন, চলন-বলন ভাবভঙ্গিতে এ্যারিস্টো-ক্রেশী ফুটে বের হচ্ছে। তাঁর দু'টি গভীর নীল আঁখি-তারকায় ঈষৎ বিষাদের ভাব মেশানো। ঠোঁট দু'টিতে একটা অদ্ভুত হাসির রেখা দেখলাম—এ হাসি যেন তাঁর জীবনের গভীর তিক্ততাবোধের অভিজ্ঞতাকেই পরিস্ফুট

করে তুলেছিল, বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে জীবনে তিনি অনেক ব্যর্থতা, হতাশা, কার্যক্রমের অসার্থকতা এবং বিভ্রান্তির ফলে পদে পদে এগিয়ে যাবার পথে বাধা পেয়েছেন।

এঁদের ড্রয়িংরুমটি—যেটি আমার বাবার আমলে আমরা ডাইনিংরুম হিসাবে ব্যবহার করতাম—কোন বিশেষ ষ্টাইলে ফারনিশড হয় নি। ব্যারণের কোন এক আদি পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত জেনারেল—এই ঘরটিতে বহু ছবি টাঙ্গান ছিল ব্যারণের অন্যান্য পূর্বপুরুষদের—অনেকেই তাঁদের ছিলেন আর্মির কর্তাব্যক্তি, কেউ কেউ আবার ইউরোপের প্রখ্যাত তিরিশ বছরের যুদ্ধের সময়কার। অত্যন্ত পুরাণো কালের ফার্নিচারের পাশেই আধুনিক কালের আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছিল এ ঘরটিতে।

অল্পক্ষণ বাদেই ব্যারোনেস এসে হাজির হলেন—তিনিও খুব সহজ, সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছিল তাঁর ভেতর একটা আড়ষ্টতার ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে—তিনি যেন কি কারণে বিব্রত বোধ করছেন। ফলে আমিও আমার আচরণে বা কথাবার্তায় সহজ হ'তে পারছিলাম না। কিন্তু এর পরেই কাছাকাছি অন্য একটি ঘর থেকে কয়েকজনের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম—বুঝতে পারলাম ব্যারনেসের অন্যান্য ভিজিটারস এসেছেন—এ ভাবে তাঁর অসুবিধা করবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। পাশের ঘরে ওঁরা তাস খেলছিলেন—আমাকে নিয়ে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। ওখানে চারজন উপস্থিত ছিলেন—দি জেণ্টলম্যান ইন ওয়েটিং, একজন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন, ব্যারনেসের মা এবং আণ্ট।

এর পর বয়স্কেরা যেই হুইষ্ট খেলতে বসলেন, আমরা তরুণের দল গল্প করতে সুরু করলাম। ব্যারণ বললেন যে ভাল পেইনটিং-এর প্রতি তাঁর বেশ দুর্বলতা আছে। তাঁর কাছে থেকে আরও শুনলাম যে ভূতপূর্ব রাজা চার্লস দি ফিফ্‌টিনথ তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়ে ডাসেলডর্ফে পাঠিয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার একটা মিল দেখা দিল—কারণ ঐ রাজাই আমাকেও একটা বৃত্তি দিয়েছিলেন—তবে আমার বৃত্তিটা ছিল সাহিত্য-বিষয়ক।

আমরা অনেক বিষয়েই আলোচনা করলাম—পেইনটিং, থিয়েটার, আমাদের দু'জনেরই পৃষ্ঠপোষক রাজা চার্লস দি ফিফ্‌টিনথ সম্বন্ধে। আমাদের স্বচ্ছগতিতে মাঝে মাঝেই বাধা পড়ছিল হুইষ্ট প্লেয়ারদের অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্যে। না বুঝে-শুনে এক একবার সদ্‌ইচ্ছা নিয়েই এঁরা আমাদের আলাপে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে এমন সব বোকা কথা বলে ফেলছিলেন, যারপর আলোচনার গতিটা কিছুতেই অব্যাহত থাকতে পারে না। এই অ-সম-মানস গোষ্ঠীতে বসে থাকতে আমি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম এবং যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। ব্যারণ এবং ব্যারনেস দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন—ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের গোষ্ঠীর বাইরে আসা মাত্রই তাঁদের ভেতর থেকেও বাধ-বাধ ভাবটা চলে গেল। তাঁরা আমাকে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে পরের শনিবারে তাঁদের বাড়ীতে এসে নৈশ আহার করবার নিমন্ত্রণ জানালেন। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে অল্পক্ষণ এই দম্পতির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিদায় নিলাম—এখন মনে হচ্ছিল আমরা যেন কতকালের পুরাণো বন্ধু।

ক্রমশঃ

সে অনেকদিনের কথা। ইংরেজ তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপে আমাদের দেশে রাজত্ব করছে। স্বদেশী করলেই লোকগুলোকে জেলে পুরছে। লালমুখ গোরারা 'বন্দেমাতরম' শুনলেই লাঠি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে। কোন্‌টা অপরাধ, কোন্‌টা নয়—এ ঠিক করবার আগেই পুলিশের হাতে নির্যাতীত হ'তে হ'তো তখন।

কত যুবক যে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। পুলিশ কিছুতেই তাদের ধরতে পারছে না। এরকম তখন প্রায়ই হ'ত। এক দেশ থেকে আর দেশে, জঙ্গল পেরিয়ে নদী পেরিয়ে ছুটছে ত ছুটছেই। আহার নেই, নিদ্রা নেই—তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে চলেছে। চতুর্দিকে পুলিশ—যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। ছেলেরা জোট বেঁধে আর চলতে পারল না। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন কে কার খোঁজ রাখে। এমনি দু'টি পলাতক ছোকরা উপায়ান্তর না দেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশ নিশানা করতে পারলো না।

অবিশ্রান্ত সাঁতার কেটে চলেছে তারা—জানে না কোথায় যাচ্ছে—যেখানে হোক যাওয়া চাই। অবশেষে শুনল তারা বরিশালের এক গ্রামে এসে পড়েছে। যুবক দু'টি ভাবলে হয়ত এবারে তারা নিরাপদ হ'তে পারবে। কিন্তু বিপদ এখানেও দেখা দি'ল। তবে সুবিধা ছিল, সারা পূর্ববঙ্গ খাল-বিলে ভরা। এঁকে-বেঁকে খালগুলো গিয়েছে এ গ্রাম থেকে সেগ্রামে। পুলিশ এসে পড়বার আগেই তারা এক ডিঙি নিয়ে খালের ভিতর ঢুকে পড়ল। এক খাল থেকে আর এক খালে—শাখার পর শাখা, যেন গাছের অসংখ্য ডাল। খালের দু'ধারে বাঁশঝাড়গুলো নুয়ে পড়ে খালটাকে রেখেছে ঢেকে।

অনেক কষ্টে সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা এক গাঁয়ে এসে ডিঙি বাঁধলে। খানিকটা হেঁটে গিয়ে দেখতে পেলে একটা কুঁড়ে ঘর থেকে ক্ষীণ আলো বেরুচ্ছে। ডাকাডাকি করতে একজন স্ত্রীলোক ঘোমটা টেনে দরজা খুললে। ল্যাম্পের আলোয় সকলেরই মুখ দেখা যাচ্ছিল। মেয়েটি বললে, কাকে খুঁজছ তোমরা?

—আমরা খুব বিপদে পড়েছি, আজ রাত্রের মত আমাদের আশ্রয় দিন দিদি!

'দিদি' সম্বোধনে দিদির প্রাণ গললো। তা ছাড়া স্বদেশী যুগে এরকম পলাতক ছেলের দলকে আশ্রয় দান নতুন নয়। তারা এতে অভ্যস্ত।

—কোথায় বাড়ী তোমাদের?

—সব বলছি, আগে দরজা বন্ধ ক'রে দিন।

মেয়েটি হেসে তাদের ভিতরে নিয়ে এল।

তারা ভিতরে এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় হাত-পা ছেড়ে শুয়ে পড়ল।

মেয়েটি হেসে বলে, কদিন খাওয়া হয় নি?

—আজ কি বার?

—ও আম'র পোড়াকপাল, বারেরও ঠিক নেই! আজ শুক্রবার।

—বুধবার থেকে শালারা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কে খেতে দেবে দিদি। খিদে পেলে আকণ্ঠ নদীর জল খেয়েছি!

দিদি ছুটে গিয়ে ঘর থেকে দুবাটি মুড়ি নিয়ে এ'ল। বললে, আগে খেয়ে নাও, পরে কথা।

পেটটা ঠাণ্ডা ক'রে যুবক দুটি তাদের পকেট থেকে দু'টি রিভলভার বের করলে। বললে, দিদি, এই দুটো রেখে দিন। আপনাকে নিশ্চয় সার্চ করবে না।

পিস্তল দুটি নিয়ে দিদি হাসতে হাসতে ঘরের ভিতর চলে গেল।

দুপুর বেলায় আহারাদি সেরে ছেলে দু'টি লম্বা ঘুম দিলে। প্রথম দু'দিন কিছু হ'ল না। তৃতীয় দিনে পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করলে। বললে, দু'জন আসামী এই বাড়ীতে ঢুকেছে আমরা খোঁজ পেয়েছি।

—বেশ খুঁজে দেখুন।

তারা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে কিছুই পেলে না। বললে,

কিছু মনে করবেন না—বুঝতে পারছি ভুল 'ইনফরমেশন'।

পুলিশ চলে গেলে, ছেলে দুটি বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল। বললে, দিদির সাহস দেখে অবাক হ'য়ে গেছি। এরকম মেয়ে দেশের কাজে নামলে অনেক কিছু করতে পারে।

দিদি হেসে বলে, রক্ষা করো ভাই, সবাই মিলে কাজে নাম্‌লে তোমাদের বাঁচাবে কে?

—তা বটে।

দিদির রক্ষণাবেক্ষণে দিনসাতেক তাদের কেটে গেল। যাবার কথা উঠতেই দিদি শিউরে ওঠে! বলে, কি ক'রে যাবে ভাই? বেরুলেই যে ধরা পড়বে।

—কিন্তু একদিন ত বেরুতে হবেই।

—নাই বা বেরুলে। দিদির কাছেই থেকে যাও না।

—তা কি হয় দিদি। যে-কাজে নেমেছি সে-কাজ সম্পূর্ণ না করে আমাদের আর ফিরবার উপায় নেই।

অনেকদিন দিদির আদরে থেকে গেল তারা। বললে, মনে থাকবে চিরদিন। কলকাতায় যদি কখন যান দেখা করবেন। দিদি বলেছি, ভাইদের ভুলে যাবেন না।

—দেশ উদ্ধার করে তখন কি আর দিদিকে মনে থাকবে?

—আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক দিদি, যদি সে সুদিন কখন আসে তখন আপনার কথাই আগে মনে পড়বে। তবু আমার এই আংটিটা রেখে দিন—ভুলে গেলেও মনে পড়বে।

দিদি সযত্নে আংটিটা তুলে রেখে দিলে।

সেইদিনই রাত্রির অন্ধকারে ওরা বেরিয়ে পড়ল। পাথেয় দিদির আশীর্বাদ আর চোখের জল।

* * * *

তারপর কতদিন হয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হ'ল। কত ঝড়-ঝাপ্‌টাই না চলে গেল। দেশ ভাগ হ'ল। যারা থাকতে পারল না, তারা এদেশে চলে এল। দিদিও এল শ্যামবাজারে। এরপরই সুরু হ'ল চারদিকে হাহাকার! পঞ্চাশের মন্বন্তরে এককালীন অনেক লোক মরেছে। কিন্তু এখন মরছে প্রতিদিন ধরে। আঠার বছরে মৃত্যুর আর হিসেব নেই। সরকার বলে অনেক, করে না কিছুই। ক্ষমতা নাই, বড়াই আছে। আর আছে বড় বড় কথা। আঠার বছর ধরে তারা বলে চলেছে। স্বদেশী যুগের বক্তা—বক্তৃতা করতেই তারা ভাল জানে! বলে, চাল আমরা মজুত করে বণ্টন করব। আবার পুরানো দিনের র‍্যাশন চালু হ'ল। কিন্তু মুষ্টি-ভিক্ষা! পেট ভরে না। বলে, অভ্যেস বদলাও, গম খাও। দুয়ে মিলিয়েও সপ্তাহ চলে না। লোকে কালোবাজার থেকে আড়াই টাকা কিলো চাল কেনে। চাল নাই কে বলে? প্রচুর চাল আছে। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে সরকার জানে। সরকার হাসে আড়ালে, মহাজন হাসে প্রকাশ্যে। পেটের জ্বালায় লোক ক্ষেপে ওঠে, সরকার মিটিং করে। বক্তৃতায় আবার মানুষ ভোলে—আঠার বছরে ভুল আজও ভাঙল না। বলে, আসুন, সবাই মিলে আমরা ভাগ করে খাই। দেশকে বাঁচাতে হ'লে চাই ত্যাগ। চালের অভাব তরি-তরকারিতে পূরণ করুন। কাঁচকলা অতি উপাদেয় খাদ্য। এক কাঁচকলা দিয়েই কত রকমের খাবার তৈরি করা যায়। তাঁরা রাজভবনে তৈরি করে গণ্যমান্যদের একদিন খাইয়েও দিলেন। চালু হ'ল রেষ্টুরেন্টে কাঁচকলার চপ, কাটলেট, কোর্মা।

কাঁচকলার দর বেড়ে গেল। বলে, মন্ত্রীকলা।

শ্যামবাজারে ব'সে দিদিও শোনে অনেক কথা। এরা কি তার সেই ভাই? কিন্তু নাম ত ভুল হবার কথা নয়। এরাই না একদিন সর্বস্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল? আজ মন্ত্রী হয়ে সব ভুলে গেল?

দিদির চোখে জল এল। মা বললেন, শুধু কেঁদে কি হবে? যা না, দেখা ক'রে আয় না?

দিদি লাফিয়ে উঠল। হাঁ, তাই সে যাবে। কিন্তু মন্ত্রীর দরজায় কি পৌঁছুতে পারবে?

এল মন্ত্রীর দরজায়। কিন্তু ভিতরে যাবার হুকুম নেই। রক্ষীরা বাধা দেয়।

বলে, আমি তার দিদি, আমাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু প্রহরী ছাড়ে না।

দিদি আংটিটা বের করে প্রহরীর হাতে দিলে। বললে, এই আংটি দেখালেই বুঝতে পারবে।

প্রহরী আংটি নিয়ে ভিতরে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বললে, স্যার চিনতে পারলেন না।

দিদির মাথায় কে যেন সজোরে লাঠি মারলে। আংটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

শ্যামবাজারের বাড়ীতে এসে যখন পৌঁছুল তখন রাত্রি হয়েছে। ঘরের রেডিওটায় তখন ঘোষণা হচ্ছে: মন্ত্রীমশায় 'খাদ্য বাঁচাও' সম্বন্ধে কিছু বলবেন। তারপর

গলা শোনা গেল। সেই:কণ্ঠস্বর": 'খাদ্য-আন্দোলন' করে কোন লাভ নেই। চাল কোথায়? সরকার যথা-সাধ্য চেষ্টা করছেন। দেশকে আজ বাঁচাতে হ'লে সকলকেই স্বার্থত্যাগ করতে হবে। যা জোটে সকলে মিলে ভাগ করে খাব—এই কথাই আজ সকলকে মনে রাখতে হবে। সরকার অনাহারে কাউকে মরতে দেবে না—এ বিশ্বাস রাখুন।"

দিদি ছুটে এসে সুইচ্‌টা 'অফ্' করে দিলে।

মা এসে বললেন, কিরে, দেখা হ'ল?

—আর ভাবতে হবে না মা, রাশিয়া থেকে চাল আসছে।

বিবর-বিদীর্ণ-বিষ

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

এই সূর্য প্রত্যক্ষের সাক্ষী হয়ে আর
ছড়াবে না আয়ু আর জীবনের পথে—
পৃথিবীও ঘূর্ণমান চক্রলীলা ভেঙে
দাঁড়াবেই স্থির হয়ে;
তবু ত ঈশ্বর—
মনের বঞ্চনা পেয়ে বিশ্বাসের ছায়া
প্রতিবিম্বিত করে উঠবেই জলে।

অকস্মাৎ পাপজীবী প্রৌঢ়া বসুন্ধরা
বিবর-বিদীর্ণ-বিষ দু'হাতে ছড়িয়ে
মানুষের সর্বদম্ভফলপ্রসূ বীজ
রেখে দেবে পরাজয়-পিষ্ট গ্লানি নিয়ে—
সেদিনের ভাগ্যবান-মহান-সুন্দর
কোন এক মহাপ্রাণ পদপ্রান্তে। তাই—

এখনও কবিতা লেখা—
কখনও কখনও
তীব্র হয়ে দেখা দেয় প্লাবনের মরণের
অথৈ সে জলে।
সে এক জীবন !!

পণপ্রথা—সমাজের একটি ব্যাধি

'সম্ভ্রান্ত পরিবারের দীর্ঘাঙ্গী, অতীব সুন্দরী, গৌরবর্ণা, সূচীশিল্পে নিপুণা, সুগায়িকা ও এম. এস-সি পাশ অধ্যাপিকা (২৪) পাত্রীর জন্য পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী ও গাড়ি আছে।'

উপরের লেখাটা যে বিজ্ঞাপন তা বুঝতে আমার আপনার কারোরই কোন অসুবিধার কথা নয়। একটি সর্বগুণসম্পন্না মহিলা তার গুণের পসরা সাজিয়ে বিয়ের বাজারে বসেছেন পাত্রস্থ হবার জন্য—নারী-জীবন সার্থক করবার জন্য। জীবনের এই ক'টি বছর তিনি অত্যন্ত সযত্নে একটি একটি করে গুণের অধিকারী হয়েছেন—তারপর এক সময় বিয়ের বাজারের পণ্য হয়েছেন।

এর পরের ঘটনা আমরা প্রায় সবাই জানি। মহিলাটি এবার বিভিন্ন ব্যক্তির সম্মুখে বারংবার নিজেকে উপস্থিত করবেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বার বার তাঁর গুণগুলিকে পরখ্ করে দেখবেন—তারপর কোন সময় হয়ত কোন ব্যক্তির সুনজরে পড়বেন। হাসি ফুটবে মহিলার মুখে, আত্মীয়-স্বজনের মুখে।

তারপরেই সুরু হবে মূল্য নির্ধারণ। বহুগুণসম্পন্না মহিলাটি কিন্তু শুধু তাঁর গুণ দিয়েই পাত্রপক্ষকে কিনতে সমর্থ হবেন না,—কিনবার ন্যায্য মূল্য হ'ল টাকা অর্থাৎ পণ। ভারতীয় সমাজের একটি দূষিত ব্যাধি এই পণপ্রথা।

বহু যুগ হ'তে এই পণপ্রথা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচলিত। এ এক জগদ্দল পাথর সমাজের বুকের উপর বহুদিন যাবৎ চেপে আছে, বিড়ম্বিত করছে সমাজকে, বিষাক্ত করছে জীবনকে; অবহেলিত, অপমানিত হচ্ছে নারীত্ব, মনুষ্যত্ব। দু'টি জীবনের মিলনের মধুরত্ব; দু'টি মিলিত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসিগান, সুন্দর সার্থক ও শুভ সমাজ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বার বার ব্যাহত করেছে এই পণপ্রথা।

কতশত ভারতীয় নারীর চোখের জলে সিক্ত হয়েছে এই জগদ্দল পাথর, কত অসহায় পিতামাতার দীর্ঘশ্বাস অজানিতে ঝরে পড়েছে, কত মেয়ে যে লজ্জা ও গ্লানির বোঝা নামাতে আত্মহত্যা করেছে তার হিসাব পাওয়া ভার—তবুও এই পাথরটি আজও অনড়। আজও এই বিংশ শতাব্দীতে, মানুষ যখন সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছে বলে গর্ববোধ করে, যখন বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে, শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেকে আধুনিক বলে জাহির করে, তখনও এই পণপ্রথা সমাজের দেহে বিরাট একটি দূষিত ক্ষতের মত রয়েছে। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো সমাজকে রোগমুক্ত করতে পারে নি। আজও এই সমাজে নারী হয়ে জন্মানো অপরাধ। আজও নারীত্ব এখানে অবহেলিত, অপমানিত। পুরুষের তৈরী এই সমাজ-ব্যবস্থায় আজও নারীকে মূল্য গুণে দিতে হয় স্বামী লাভের জন্য। না, সে মূল্য মনের মাধুরী মেশানো প্রেম নয়, কষ্টে অর্জিত গুণাবলী নয়—মূল্য দিতে হয় টাকায়, সোনায়, সম্পদে। হায় মহাত্মা রামমোহন! দেখেছ কি তোমার প্রচেষ্টাকে এরা কবর দিয়েছে?

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল মানুষ, উদার-নৈতিক মানুষ এগিয়ে এসেছেন সমাজকে এই দূষিত ব্যাধিমুক্ত করতে। কখনও একক ভাবে, কখনও দলবদ্ধ ভাবে চেষ্টা চলেছে এই পণপ্রথা নিবারণের। আংশিক সাফল্যও এসেছে কোন কোন সময়ে—কিন্তু ব্যাধি সমূলে বিতাড়িত হয় নি। বর্তমানে আইন পাশ হয়ে গিয়েছে, পণপ্রথা এখন বে-আইনী বলে স্বীকৃত। কিন্তু ঐ টুকুই। সরকারী নথিপত্রে এবং আইন পুস্তকের পাতায় লিপিবদ্ধ এই আইনটির ব্যবহার খুবই সীমিত, নেই বললেই চলে।

কারণ, শুধু আইন করে প্রথাকে বিলোপ করা সম্ভবপর নয়, তার জন্য চাই সামাজিক মানুষের ঐকান্তিক উদার প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টার অভাব সর্বক্ষেত্রেই। তাই আইনও কার্যকরী হচ্ছে না।

বর্তমান আধুনিক যুগেও বিবাহ একটি সমস্যা এবং সমস্যাটি বেশ জটিল। বর্তমান যুগেও পিতামাতা কন্যার বিবাহকে দায় হিসাবেই গণ্য করেন। আজও তাই কন্যাদায়গ্রস্ত কথাটি প্রচলিত। প্রত্যেক পিতামাতাই সাধ্যাতীত রকমের চেষ্টা করেন প্রত্যেক মেয়েকে সুশিক্ষিতা করে তুলতে। কারণ, বিয়ের বাজারে এটি অন্যতম ছাড়পত্র। কিন্তু বহু অর্থব্যয়ে, বহু কষ্টে মেয়েকে শিক্ষিতা ও বিবিধ গুণের অধিকারিণী করে তুললেই পিতামাতার ঝামেলা মেটে না। সুশিক্ষিতা মেয়ের উপযুক্ত পাত্রও সন্ধান করতে হয়। আর আজকাল তরি-তরকারি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যেমন আগুন দাম তেমন পাত্রের বাজারের অবস্থাও তাই। একটি উপযুক্ত, শিক্ষিত, বেশী অর্থ উপার্জনক্ষম পাত্র কিনতে মেয়ের বাবাকে প্রভূত অর্থ গুণে দিতে হয় যৌতুক হিসাবে। আর তারও সঙ্গে মেয়েকে গা সাজিয়ে গহনাদি দিতে হয়, আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে দিতে হয় ভাবী কন্যাগৃহটি। উপযুক্ত পাত্রের পিতাও ছেলের জন্য চড়া দাম হাঁকেন। মনে হয় এতদিন ছেলের ভবিষ্যৎ তৈরী করতে যা অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন, তা কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করে নেবেন। অনেক সময় আধুনিক পাত্রপক্ষকে বলতে শোনা যায়, "পণ নেওয়াটা আজকাল অসভ্যতা, তা ওটা দিতে হবে না। কিন্তু তার বদলে ছেলেকে জমি দেবেন, গাড়ি দেবেন ইত্যাদি।" সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বাড়ীর কথাও তোলা হয়। সুশিক্ষিত, সুসভ্য আধুনিক ছেলেরাও কিন্তু এই অতীত ঘৃণিত ব্যবস্থার প্রতিবাদে কোন সময়ই অগ্রণী হন না। তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে এর ফলে ভাবী বধূ তথা সারাজীবনের বন্ধুটির মনে কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। ভাবী সংসারটির প্রতি, ভাবী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার বদলে যে ঘৃণা জন্ম নেয়, একথা তাঁরা ভেবে দেখেন না। এটুকুও বোঝেন না যে শ্রদ্ধা না থাকলে আগামী জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও উজ্জ্বল করে গড়ে তোলা যায় না। আর সমাজকে উন্নত করাও যায় না। বিবাহ শুধুমাত্র জৈবিক প্রবৃত্তি মেটানোর জন্যই নয়, এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যদি ধরা যায় জীব সৃষ্টির প্রয়োজনেই বিবাহ, তবে সৃষ্টিকে সুন্দর করতে হ'লে, মহৎ করতে হ'লে চাই সুন্দর সাবলীল বিবাহিত জীবন এবং জীবনের সুরুতেই যদি ক্ষোভ থেকে যায় তবে সুন্দর স্বাভাবিক জীবন গড়ে তোলা কখনই সম্ভবপর নয়।

আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা বাবা-মাকে দায়মুক্ত করবার জন্য অনেক সময় নিজেরাই পাত্র নির্বাচন করে থাকেন—কিন্তু সব সময়ই তা সফল পরিণতির দিকে এগোতে পারে না। কারণ বোধ হয় একটিই—সমাজ-ব্যবস্থা। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রখর। তাই দুটি ভিন্ন জাতের মেয়ে ও ছেলের মধ্যে হৃদয়ের যোগসূত্র গ্রথিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই জীবনে জীবন যোগ করা সম্ভবপর হয় না। তার উপর দেখা যায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা অধিকাংশই উদার নন—বরঞ্চ বিয়ের ব্যাপারেও তারা বেশ ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন। তাই প্রাক-বিবাহিত জীবনে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা চালালেও অনেক ছেলেকেই দেখা যায় পিতামাতার নির্বাচিত কন্যার পাণিপীড়ন করতে। কারণ বোধ হয় একটিই—শুধু চড়া দামই পাওয়া যায় না, আগামী দিনের পাথেয় হিসাবে বহু সম্পদও পাওয়া যায়। তাই পণপ্রথা নিবারণে ও বিবাহকে সমস্যামুক্ত করতে তাদের চেষ্টা একেবারেই নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মেয়েদের কি এই দূষিত ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব সমাজের একেবারেই নেই? নিশ্চয়ই আছে আজ মেয়ে হয়ে সমস্ত মহিলা-জাতের কাছে আমার আবেদন, এই ঘৃণিত সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করবার জন্য এগিয়ে আসুন। আমরা যেন কোন সময়ই নিজেদের এভাবে অপমান করবার সুযোগ আর না দিই। শুধুমাত্র নারী-জীবনকে সার্থক করবার জন্য যেন এই ঘৃণিত প্রথার বলি না হই। সমাজ-গঠনের অধিকার আমাদেরও আছে। আসুন আমরা সেই অধিকারকে কাজে লাগাই। দায়িত্ব গ্রহণ করি—সুন্দর, সুস্থ, সাবলীল সমাজ তৈরী করবার। আমরা এমন সমাজ তৈরী করব, যে সমাজে মেয়ে হয়ে জন্মানো অপরাধ নয়, বিড়ম্বনা নয়। আশা করছি সমাজকে পণপ্রথামুক্ত করতে ভারতীয় মহিলা-সমাজ বৃহত্তর আন্দোলন সুরু করবেন—এবং আমি সেই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য মুহূর্ত গুণছি।

গায়ত্রী দত্ত

দাদাজী

যাঁদের করি নমস্কার– (দুই)

অমর মুখোপাধ্যায়

"ছি, ছি! একি করলেন বাবা! আপনি ত জানেন যে আমরা বৈষ্ণব। আমার ছেলের মুখে মা-কালীর পুজোর বেলপাতা তুলে দিয়ে আপনি অন্যায় করেছেন"—কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন ফুলঠাকরুণ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখ থেকে তার দাদুর দেওয়া পুজোর বেলপাতা টেনে বার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। খুব রেগে গেলেন ফুলঠাকরুণের বাবা শ্যাম ভট্টাচার্য। অভিশাপ দিলেন মেয়েকে—"তা হ'লে, তুই জেনে রাখ যে এই ছেলেকে নিয়ে তুই জীবনে সুখী হ'তে পারবি না। আরও জেনে রাখ যে তোর ছেলে কালে বিধর্মী হবে।' বাবার কথা অব্যর্থ—ফুলঠাকরুণ জানতেন। এই অভিশাপে কাতর হয়ে পড়লেন তিনি। বাবার দু' পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি সুরু করলেন। শ্যামবাবু নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন—'আমি যা বলেছি সে-কথা ফিরিয়ে নিতে পারব না। তবে, এও বলছি যে তোর ছেলে জ্ঞানে, গুণে অসাধারণ মানুষ হবে।'

শ্যামবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। ফুলঠাকরুণের ছেলে বড় হয়ে তথাকথিত হিন্দুধর্মের কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনিই রচনা করেছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রথম অধ্যায়।

এখন, তোমরা নিশ্চয়ই চিনতে পারছ ঐ ছেলেটিকে এবং তার মা'কে। ইনিই রাজা রামমোহন রায়,—ভারতের প্রথম মুক্তি-পথ-প্রদর্শক। আর, তাঁর মাতা শ্রীমতী তারিণী দেবী—ডাকনাম ছিল 'ফুলঠাকুরাণী।'

রামমোহনের বাবা চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলে জ্ঞানী হোক, গুণী হোক—দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করুক। তাই, রামমোহনের যখন মাত্র ন'বছর বয়স, তখন তিনি রামমোহনকে পাটনায় পাঠালেন, 'আরবী' 'পারসী' শিক্ষা করবার জন্য। পরে, সংস্কৃত শিখবার জন্য কাশী পাঠালেন। তখন রামমোহনের বয়স বার বছর। মাত্র ষোল বছর বয়সেই রামমোহন আরবী, পারসী ও সংস্কৃত ভাষার একজন সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

বহু শাস্ত্র পাঠের ফলে রামমোহনের মনে ভিড় করতে লাগল নানা প্রশ্ন, নানা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে একখানি বই লিখে ফেললেন। বইটির নাম—'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী', পুত্রের এই নূতন ধর্মমতে পিতা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, বিরক্তও হলেন। বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হ'ল রামমোহনকে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করলেন রামমোহন। শিখলেন আরও অনেক ভাষা। পাঠ করলেন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ। শেষে, ভারতবর্ষ ছেড়ে তিব্বতে পাড়ি দিলেন। দুঃসাহসিক সে অভিযান। দুর্গম পথ। হিংস্র জন্তু ও দস্যুর ভয় তুচ্ছ করে নির্ভীক-চিত্ত ও বলিষ্ঠ-দেহী রামমোহন তিব্বতে পৌঁছলেন। কিন্তু, সেখানেও ধর্মের নামে নানা ব্যভিচার! অসহ্য। প্রতিবাদ করলেন রামমোহন। তিব্বতীরা ক্ষেপে গেল। রামমোহনকে তারা হত্যা করবেই। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন তিব্বতী রমণী তাঁর জীবন রক্ষা করল। সেই থেকে রামমোহন নারী জাতিকে শ্রদ্ধা করতেন দ্বিগুণভাবে।

দীর্ঘ চার বছর পরে ফিরে এলেন রামমোহন। মা-বাবা আদর করে বুকে তুলে নিলেন। কিন্তু, রামমোহনের বুকে তখন আগুন জ্বলছে। পুড়িয়ে দিতে হবে সমাজের কু-প্রথা ও গোঁড়ামির যত আবর্জনা। মত-বিরোধ হ'ল আবার পিতার সঙ্গে। এবার, বাবা ছেলেকে বার করে দিলেন বাড়ী থেকে। বললেন—'যে আমার ধর্মকে অসম্মান করে তার স্থান আমার বাড়ীতে

হবে না।' কিন্তু, যে-ধর্ম মানুষকে অপমান করে, কু-প্রথার চিতায় দগ্ধ করে, অজ্ঞানের অন্ধকারে ফেলে রাখে সে-ধর্ম রামমোহন কেমন করে মেনে নেবেন। তাই, পিতার আদেশ মাথায় নিয়ে মাথা উঁচু করেই বেরিয়ে এলেন রামমোহন।

চোখের ওপর ভেসে উঠল একটা ছবি। ভয়ঙ্কর ছবি। জগন্মোহনের পিতা জলছে। আর, সেই চিতায় তার বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এই জগন্মোহন ছিলেন রামমোহনের বড় ভাই। রামমোহন তখন ছোট। তার প্রতিবাদও তাই ক্ষীণ। কিন্তু, আজ? সেদিনের সেই চিতার আগুনে ফোটান কিশোর রামমোহনের চোখের জল আজ অগ্নেয়গিরির গলিত লাভা হয়ে সেই সতীদাহ-প্রথার বিরাট অব্যবস্থাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। গেলও তাই। 'সতীদাহ' বন্ধ করলেন রামমোহন। সমাজের একটা প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

শ্যামবাবুর অভিশাপ রামমোহন-জননী ফুলঠাকরুণের কাছে যত সত্য হয়েই উঠুক না কেন বাংলা দেশের লাঞ্ছিতা মাতৃজাতির কাছে তা যে কতবড় আশীর্বাদ হয়ে আছে দেশের ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে।

জেনে রাখ

ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী ভাইস্-চ্যান্সেলার

—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

খ) জাতীয় মহাসভার প্রথম বাঙ্গালী সভাপতি,

—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ) কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙ্গালী 'মেয়র',

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

ঘ) প্রথম বাঙ্গালী বাংলা হাইকোর্টের বিচারপতি

—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

ঙ) প্রথম বাঙ্গালী ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করেন,

—ইন্দ্রলাল রায়

আচার্য জগদীশচন্দ্র

মিহির ভট্ট

গাছেরা বলে না কথা
(তাতে) নেই কারও মাথাব্যথা
মূক ওরা ভাষাহীন তাই সবে জানে।
গাছেদেরও প্রাণ আছে কেই বা তা মানে!
সে এক কিশোর ছেলে
কখনো আপন ভুলে
কান পেতে গাছেদের কথা যেন শোনে।
কতশত লতা পাতা
উঁকি দেয় হেথা-হোথা
কত কথা বলে তারা সবুজের বনে।
আরও কতো দিন ধরে
সে যে শুধু ঘুরে ঘুরে
সবুজে সবুজে খোঁজে বারতা প্রাণের।
কখনো আপন মনে
ঘুরে ঘুরে বনে বনে
লিখে চলে স্বরলিপি ওদের গানের।
সে এক সোনালী দিন
বাজিল 'বাণীর' বীন্
'লজ্জাবতীর' লাজ গান গেয়ে ওঠে।
গাছেরও যে আছে প্রাণ
লতারাও গায় গান
সেই গানে গানে তাঁর হাসি ওঠে ফুটে।
শুধু তাঁর সাধনায়
জড় যা', তা' প্রাণ পায়
তারি ভাষা শোনাল সে জগৎ সভায়।
জগদীশ বসু তিনি
আচার্য, বিজ্ঞানী;
অবুঝ, সবুজ হ'ল যাঁর সাধনায়।

তিমি

হিমাংশু ঘোষ

জীব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। অ-দেখাকে দেখার এবং অ-জানাকে জানার একটা প্রবল আগ্রহ মানুষের। অবশ্য এই আগ্রহ নিছক খেয়াল নয়। এর পিছনে রয়েছে মানুষের স্বার্থ—তার প্রয়োজন। এইস্বার্থের তাগিদেই তাকে জানতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে তার পরিবেশকে। এই জানার পথেই সে জানতে পেরেছে তার প্রতিটি গাছপালা, প্রতিটি প্রাণী। যেমন জেনেছে এককোষী ক্ষুদ্রতম জীব অ্যামিবাকে, তেমনি জেনেছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জীব তিমি, তিমি-মাছকে।

জীব-বিজ্ঞানে চিংড়িমাছ যেমন মাছ নয়—পোকা বিশেষ, তেমনি তিমি মাছও মাছ নয়—জলচর জীব। স্তন্যপায়ী প্রাণী। মানুষ, বনমানুষ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতির মত তিমির বাচ্চারাও মা-এর দুধ খেয়ে বড় হয়। প্রথমে তিমি স্থলচর প্রাণী ছিল, পরে জীবন ধারণের সুবিধার্থে সমুদ্রবাসী জলচর জীবে পরিণত হয়েছে।

তিমির কথা পড়লে বা শুনলে মনে হবে যেন ঠাকুমার কোলে বসে রূপকথার গল্প শুনছি—এমনি অদ্ভুত এর কাহিনী। তিমি দুই প্রকারের, দন্তবিহীন নীল ও সদন্ত কালো তিমি। নীল তিমি আকারে সর্ববৃহৎ, ১০০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ এবং ৩০০০ মণ পর্যন্ত এর ওজন। অর্থাৎ একটি তিমি ওজনে ২৭টি হাতীর সমান। এই তিমির শুধু জিবের ওজনই ৬৭ মণ পর্যন্ত হয়। পেটভর্তি খাবার খেতে হ'লে ২৭ মণ খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন, সদ্যোজাত একটি তিমি-শিশু প্রায় ২৪ ফুট লম্বা হয় এবং ১০০ মণ ভারী। এই শিশু তিমি প্রতিদিন ৮ মণ করে মায়ের দুধ খায়। তিমি বুদ্ধিমান জীব। ছোটজাতের তিমিকে পোষ মানানো যায়। এই পোষা তিমিকে দিয়ে মানুষ ডিঙ্গি নৌকা টানিয়েছে। তিমির যেমন বৃহৎ শরীর তেমনি প্রচণ্ড শক্তি। বড় বড় বরফের চাঁই অনায়াসে উল্‌টে দেয়। পূর্বে অনেক জাহাজ, বড় বড় তিমির কবলে পড়ে জলের তলায় তলিয়ে যেত। তিমি ঘণ্টায় ১০।১২ মাইল বেগে বিচরণ করতে পারে।

প্রবাদ আছে মরা হাতী লাখ টাকা, কিন্তু মরা তিমি লাখ লাখ টাকা। তিমির মাংস তেল হাড় প্রতিটি জিনিস মানুষের প্রয়োজনে লাগে। মাছ বা ছাগলের যকৃৎকে (liver)- আমরা চলতি কথায় "মেটে" বলি। এই মেটেতে অনেকগুলো ভিটামিন আছে—বিশেষ করে ভিটামিন "এ"। একটি তিমির মেটেতে যে পরিমাণ ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায় তা পেতে হ'লে প্রায় ২০০০ মণ মাখনের প্রয়োজন হবে। তিমির মাথা থেকে স্পার্মাসেটি (একপ্রকার মোম) এবং অন্ত্র থেকে অম্বর (যা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়) নামক পদার্থ পাওয়া যায়। যার ফলে তিমি-শিকার একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার তিমি শিকারীদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছে। ভাবলে অবাক লাগে যে দেড়মণ দু'মণ ওজনের মানুষ কিভাবে ৩০০০ মণ ওজনের তিমিকে অবলীলাক্রমে হত্যা করছে, —প্রতিষ্ঠা করছে তার শ্রেষ্ঠত্বকে। এই তিমি-শিকারকে উপলক্ষ্য করে অনেক মজার কাহিনী গড়ে উঠেছে—তারই একটি এখানে উল্লেখ করে তিমির কথা শেষ করব। পূর্বে তিমি-শিকারীরা নৌকো করে বর্শা নিয়ে তিমি শিকার করত। ঐ বর্শার পিছনে লম্বা দড়ি বাঁধা থাকত। একবার একদল শিকারী দুটো নৌকো করে একটা তিমিকে আক্রমণ করল। নিকটেই তাদের জাহাজ তৈরী ছিল। একজন শিকারী প্রথম নৌকো থেকে তিমিটিকে বর্শাবিদ্ধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় নৌকোর শিকারীরাও তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু তিমির লেজের ঝাপটায় তাদের নৌকো উল্টে গেল এবং সকল আরোহীরা জলে পড়ে গেল। এদের মধ্যে একজনকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। যাক্ কয়েক ঘণ্টা পরে কিন্তু সেই তিমিকে হত্যা করা হয়েছিল এবং পরে যখন সেই তিমিরের পেট চিরা হ'ল তখন দেখা গেল যে সেই হারানো মানুষ অজ্ঞান অবস্থায় তিমির পেটে শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি তাকে জাহাজে তুলে তার চিকিৎসা করা হ'ল। বেশ কয়েকদিন সে পাগলের মত আচরণ করেছিল। পরে অবশ্য সে আবার সুস্থ মানুষের মত জীবন-যাপন করতে পেরেছিল। ঐ ব্যক্তির নিকট জীবন্ত তিমির পাকস্থলীর কিছু কিছু কথা আমরা জানতে পেরেছি।

টাকার মূল্য

এমন দিন ছিল যখন টাকার মূল্য ছিল এক ভরি ১১/১২ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্যের মূল্যের সমান। বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থা ছিল ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত সংযুক্ত। পাউণ্ডের মূল্য ছিল স্বর্ণের মূল্যের সহিত বাঁধা। অর্থাৎ এক গিনি ছিল এগার আনা ওজনের ১১/১২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণের এবং তাহার মূল্য ঐ অনুপাতে স্বর্ণমূল্যের সহিত উঠিত-নামিত। পরে প্রথম মহাযুদ্ধের-অবসানের প্রায় দশ বৎসর পরে, ইংলণ্ডের পাউণ্ড স্বর্ণমূল্যের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিয়া শুধু সরকারী ভাবে চালিত ক্রয়বিক্রয় ও বিনিময়ের প্রতীক বা মাধ্যম মাত্র হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ তাহার নিজস্ব মূল্য কিছু রহিল না। ভারতের টাকাও ক্রমশঃ সরকারী বিনিময়াস্ত্র হইয়া রৌপ্যের সম্পর্ক ত্যাগ করিল। টাকার সহিত পাউণ্ডের, তথা বিশ্বের সকল অর্থের সহিত সম্বন্ধ কোন নির্দ্দিষ্ট হারে কখন চিরস্থায়ীভাবে বাঁধা রাখা যায় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কখন কখন পাউণ্ড ৬৷০/৭ টাকা মূল্যেও পাওয়া গিয়াছে। পরে সেই মূল্য বৃদ্ধি হইয়া দশ টাকায় দাঁড়ায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উহা ১৩৷৵০ দরে বাঁধা হয়। এই বিনিময়-হার প্রায় আঠার বৎসর এই ভাবে আছে। যদিও টাকার আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে এবং বর্ত্তমানে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় সে ক্রয়শক্তি টাকায় ৵০, ৵১০ পয়সায় দাঁড়াইয়াছে তাহা হইলেও আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা বিনিময় হার ১৩৷৵০ পাউণ্ড হিসাবেই বাঁধা রহিয়াছে। টাকার ক্রয়শক্তি হ্রাস হওয়ার কারণ ভারত সরকারের রাজস্ব অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিবার অভ্যাস। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার; সকলেই অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে কোন সুনীতি অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যথেচ্ছা ব্যয় করিবার অজুহাত সর্ব্বদাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অথবা ঐ জাতীয় কোন কল্পনাজাত।

যে অর্থনীতি সর্ব্বদাই কর্জ্জার উপর চলে, তাহার পরিণতি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না। কোনও না কোন সময় তাহা অপরের পাওনা মিটাইবার ক্ষমতা হারাইয়া দেউলিয়া হইয়া যাইবে এ কথা অভ্রান্ত সত্য। ভারতের স্বাধীনতার যুগের প্রারম্ভে প্রায় তাহার তহবিলে ৩০০০ তিন হাজার কোটি টাকার বিদেশী অর্থ মজুত ছিল। পণ্ডিত নেহরুর রাজত্বে সেই অর্থ সম্পূর্ণরূপে খরচ করিয়া ঋণ গ্রহণ নীতির আরম্ভ হয়। সেই ৩০০০ কোটির কত ভাগ ভারতের নূতন নূতন কারখানার গঠনে ব্যয় করা হইয়াছিল ও কতটা যথেচ্ছা অপব্যয় করিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা সহজেই হিসাব করিয়া বাহির করা যায়। বর্ত্তমানে ভারতীয় সরকার বিদেশী ঋণের সুদ ও আসল শোধ করিতে অক্ষম। তাঁহাদিগের রপ্তানি ব্যবসা ক্রমে বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বিদেশী অর্থের আয় কমিয়া আমদানি দ্রব্যের মূল্যের ও ঋণের সুদ ও আসলের দাবি মিটান অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এই কারণে অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে কাহার কাহার মতে বিদেশী অর্থের সহিত টাকার বিনিময়ের হার পরিবর্ত্তন করিয়া এরূপ করা প্রয়োজন যাহাতে বিদেশী ব্যবসায়ীগণ সহজে ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন। অর্থাৎ এক পাউণ্ডে যদি ১৩৷৵০ পাওয়া যায় এবং ১৩৷৵০ আনাতে যদি ১৯৩৯-এর তুলনায় মাত্র ২৲ টাকায় দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা হইলে এক পাউণ্ড দিয়া কেহ অত অল্প বস্তু ক্রয় করিয়া ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। সেই জন্য এক পাউণ্ডে ২০।২৫ টাকা পাইবার ব্যবস্থা করিলে তবে ভারতের রপ্তানি ব্যবসা ঠিকভাবে চলিতে পারিবে; এবং সেইরূপ ব্যবস্থা করাই এখন প্রয়োজন হইয়াছে।

কালোবাজারে যে বিদেশী মুদ্রা বিক্রয় হয় তাহার মূল্য আজকাল ২০.২৫ টাকা পাউণ্ড হিসাবে লোকে দেয় বলিয়া শুনা যায়। স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদির মূল্যও পূর্ব্বের তুলনায় ৭।৮ গুণ বাড়িয়াছে। বিদেশে বাড়িয়াছে দুই-আড়াই গুণ। এই কারণে বিদেশী অর্থের ক্রয়শক্তি পূর্ব্বের তুলনায় এখন শতকরা ৪০ ভাগ আছে বলিয়া ধরা যায়। ভারতীয় টাকার ক্রয়শক্তি যদি ১৫।২০ ভাগ মাত্র বজায় থাকে তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে ভারতীয় টাকার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় হার পরিবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক। এবং ইহা করিলে

যদিও আমাদিগের অনেক অসুবিধা প্রথমে হইবে, তাহা হইলেও শেষ অবধি ইহাতে জাতীয় অর্থনীতির মঙ্গল হইবে।

ভারতের আমদানি ব্যবসা বাৎসরিক ৬০০।৮০০ কোটি টাকার হয় ধরা যাইতে পারে। টাকার মূল্য যদি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে, তাহা হইলে ৬০০।৮০০ কোটির পরিবর্ত্তে আমাদিগের জাতীয় খরচ ৯০০।১২০০ কোটি টাকা হইবে। লোকসান হইবে ৩০০।৪০০ কোটি টাকা। রপ্তানি ব্যবসাতে সস্তায় মাল বেচিয়া ধরা যাউক আরও ৩০০।৪০০ কোটি টাকা লোকসান হইল। কিন্তু সস্তায় মাল পাইয়া বিদেশের লোকে আরও অধিক ভারতীয় বস্তু ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে সেই ব্যবসায়ের লাভ আশাতীত হইতে পারে। অর্থাৎ যদি আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাড়িয়া আমদানি-রপ্তানি ১৫০০।২০০০ কোটি পরিমাণ হয় তাহা হইলে সেই ব্যবসার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি নূতন ভাবে সবল হইয়া উঠিয়া প্রগতির পথে চলিতে আরম্ভ করিবে। বর্ত্তমান নির্জীব অবস্থার অবসান হওয়ার পথ খুলিয়া যাইবে। অতএব ১৩৵০ পাউণ্ডের শেষ হইলে ভারতের অর্থনীতির উন্নতির আশা হইবে। প্রথমে ইহাতে যে সকল অসুবিধা হইবে তাহা সামলাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার প্রধান উপায় হইবে সকল মানবের শ্রমশক্তি পূর্ণরূপে ব্যবহার করা এবং সেই ব্যবহারের ব্যবস্থায় রপ্তানি কারবারের কথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা। বিগত আঠার বৎসর এই শ্রমশক্তি ব্যবহার করা হয় নাই। শুধু ঋণ করিয়া পয়সা উড়ান হইয়াছে। রপ্তানি ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া বিদেশী মাল আমদানিও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের অর্থনীতি এইভাবে এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে ভারতের দেউলিয়া হইতে বিশেষ বিলম্ব নাই বলিয়া মনে হয়। এখন যদি ভিন্ন পথে চলা সম্ভব হয়, কংগ্রেস-রাজ থাকা সত্ত্বেও, তাহা হইলে তাহার মূল মন্ত্র হইবে: ১) অপব্যয় নিবারণ, ২) পরি-কল্পনাগুলির লাভের পথে চলার ব্যবস্থা, ৩) শ্রমশক্তি ব্যবহার প্রচেষ্টা এবং ৪) আন্তর্জাতিক অর্থ বিনিময় হার পরিবর্ত্তন। এই সকল ব্যবস্থা এক সঙ্গে করা প্রয়োজন। কিছু করিয়া কিছু না করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

সাধারণ নির্ব্বাচন ও কংগ্রেস দল

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন আসছে বছর ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে ইতিমধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তার মানে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের আর মাত্র নয় মাস সময় বাকী আছে। তাই সব রাজনৈতিক দলগুলিই নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এখন থেকেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

কংগ্রেস দল স্বাধীনতার সুরু থেকেই সমগ্র দেশের ওপর এ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করে আসছেন। এবারও মোটামুটি কংগ্রেসই যে পুনরায় ক্ষমতার গদীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন সে বিষয়ে খুব যে একটা গভীর সন্দেহের কারণ আছে এমন মনে করবার কারণ নেই। তবু কংগ্রেস দলের উচ্চ পর্য্যায়ের নেতৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার লক্ষণ খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে; মনে হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এঁরা এঁদের দলের প্রবল নির্ব্বাচন সাফল্যের সম্বন্ধে যতটা নিঃসন্দেহ ছিলেন, এখন যেন ঠিক ততটা আত্মবিশ্বাস আর তাঁদের নেই।

তার অবশ্য কতকগুলো কারণ ইতিমধ্যে ঘটেছে। আজ জওহরলাল নেহরুর সক্রিয় নেতৃত্ব আর কংগ্রেস দলের অধিকারে নেই। নেহরুজীর জীবদ্দশায়, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট যিনিই হোন না কেন—দলের ওপর তাঁর সার্ব্বভৌম ও অবিসম্বাদী নেতৃত্বের প্রবল প্রভাব দলের সকল স্তরেই বিশেষ ভাবে স্পষ্ট ও প্রবল ছিল। ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ও রাজনৈতিক আদর্শবাদের দলাদলি কংগ্রেসের মধ্যে নেহরুজীর জীবদ্দশায় ছিল না একথা বলা চলে না। কিন্তু এ সব কাড়াকাড়ি ও দলাদলির প্রভাব কংগ্রেসের মূল সংগঠনের গোড়ায় আঘাত করতে পারে নি। আজ নেহরুর ব্যক্তিত্বের প্রভাব-মুক্ত কংগ্রেস দলে এই কাড়াকাড়ি ও দলাদলি শুধু যে প্রকট হয়ে উঠেছে তা নয়, কতকগুলি রাজ্যে স্পষ্ট ভাবেই বিরোধী কংগ্রেস সংগঠনেরও সৃষ্টি হয়েছে। কেরালায় এটি পূর্ব্বেই খুব স্পষ্ট ও প্রবল হয়ে উঠেছিল। উড়িষ্যার কংগ্রেস দলেও অনুরূপ ভাঙন কিছুদিন ধরে প্রবল হয়ে উঠেছে। যদিও এখনও স্পষ্ট জানা যায় নি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহতাবের নেতৃত্বে ওড়িষ্যার বিরোধী কংগ্রেস দল সরকারী কংগ্রেস দলের সঙ্গে সরাসরি প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় নামবেন কি না। তবুও এঁদের সক্রিয় বিরোধিতা সরকারী কংগ্রেস দলের নির্ব্বাচন সাফল্যে কোন বিশেষ আঘাত করতে সমর্থ হবে কি না সে সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নি। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যকংগ্রেস সংগঠনের প্রাক্তন এবং বর্ত্তমানে বিতাড়িত সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সম্প্রতি বাংলা কংগ্রেস নামে যে বিরোধী সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে, সেটি ইতিমধ্যে খুব স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেছে যে আগামী নির্ব্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের তরফ থেকে এবং সরকারী কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পশ্চিম বাংলার সবগুলি নির্ব্বাচন কেন্দ্রেই প্রার্থী দাঁড় করান হবে। তবে এই দলের নির্ব্বাচন আয়োজনে কোন বিশেষ বামপন্থী দলের সঙ্গে কিংবা সম্ভাব্য কোন বামপন্থী জোটের সঙ্গে কোন প্রকার নির্ব্বাচন-চুক্তি সম্পাদিত হবে কি না সেটা এখনও জানা যায় নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কংগ্রেস দল থেকে অজয় মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর নবগঠিত বাংলা কংগ্রেসের সহযোগী নেতাদের ইতিমধ্যে সরকারী কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে বলে প্রচারিত হয়েছে।

অজয়বাবু ও তাঁর বাংলা কংগ্রেসের সহযোগীদের সরকারী কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কারের কি ধরণের

প্রতিক্রিয়া নির্ব্বাচন সাফল্যের ওপর হবে সেটা এখন থেকে স্পষ্ট বল্পনা করা খুব সহজ নয়। যদি এঁরা কোন প্রবল বামপন্থী দলের সঙ্গে কিংবা কোন সম্ভাব্য সম্মিলিত বামপন্থী জোটের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ব্বাচন সহযোগিতা-মূলক কোন চুক্তিতে রাজী না হন, তা হ'লে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে এঁরা সরকারী কংগ্রেস দলের সঙ্গে কতটা যুঝে উঠতে পারবেন, সেটা সন্দেহজনক। এঁদের সরকারী কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করবার যে আয়োজন প্রচারিত হয়েছে, তা থেকে স্বতঃই অনুমান করে নেওয়া স্বাভাবিক যে অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সংগঠন নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে গভীর আত্মবিশ্বাসী। তবে এইরূপ সিদ্ধান্তের আর একটা কারণও এই হ'তে পারে, যে নিজেদের প্রবল শক্তির ওপর এভাবে আত্মবিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সংগঠনের নেতারা আশা করছেন যে এই রাজ্যে মোটামুটি কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও অজয়বাবু ও তাঁর দলকে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদী সংগঠন দ্রুত গড়ে উঠতে সুরু করেছে, এভাবে সরকারী কংগ্রেস সেটাকে নষ্ট করে দেবার আশা করছেন।

রাজনৈতিক চালের প্রয়োগের বিশেষ স্বরূপটি স্বভাবতঃই অনেকটা 'স্থান, কাল ও পাত্রের' সংযোগের ওপর নির্ভর করে। তাই মোটামুটি একই ধরনের সমস্যা সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল রাজ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রয়োগের আয়োজন দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রতিবাদী 'বাংলা কংগ্রেসকে' সমূলে সরকারী কংগ্রেস সংগঠন থেকে উচ্ছেদ করবার আয়োজন করা হচ্ছে, কেরলে অনুরূপ প্রতিবাদী 'বিপ্লবী কংগ্রেসকে' নানাভাবে সরকারী কংগ্রেসের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করবার জন্য নানারূপভাবে তাঁদের প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে এই প্রবল প্রতিবাদী গোষ্ঠীকে নির্ব্বাচনে সহযোগিতা করবার জন্য সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভায় তাঁদের সংখ্যা অনুযায়ী আসন দেবার প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও না কি এঁদের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদন করা এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠে নি। অন্যপক্ষে নাম্বুদ্রিপাদের বাম-কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে এঁদের একটা নির্ব্বাচনী রফা হওয়ার সম্ভাবনাও না কি একেবারে অসম্ভব নয়।

এ ত গেল পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা ও কেরলের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা। উত্তর প্রদেশে ত বহুদিন ধরেই কংগ্রেসের মধ্যে মন্ত্রীপক্ষীয় ও রাজ্য কংগ্রেসপক্ষীয় দু'টি প্রবল ও প্রতিদ্বন্দ্বী দল গড়ে উঠেছে। আগামী নির্ব্বাচনে এঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধটা কি রকম দাঁড়াবে সেটা ঠিক এখন পর্য্যন্ত স্পষ্ট নয়। পূর্ব্বে জওহরলাল নেহরুর এবং তাঁর মৃত্যুর পরে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে মোটামুটি জোড়াতাড়া দিয়ে কংগ্রেস সংগঠনের সামগ্রিক সম্বদ্ধতা রক্ষা করে চলা সম্ভব হয়েছিল। এঁরা দু'জনেই ছিলেন উত্তর প্রদেশ-বাসী এবং এঁদের সমগ্র জাতির ওপর প্রবল প্রভাব অনিবার্য্যভাবে এঁদের নিজ রাজ্যে দলের মধ্যে একটা মোটামুটি ঐক্য বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল। এখন এঁদের অভাবে এই মোটামুটি ঐক্যটুকুও বজায় রাখা সম্ভব হবে কি না সন্দেহ।

এ ত গেল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলির কথা এবং তার কি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আগামী নির্ব্বাচন সাফল্যের ওপর হওয়া সম্ভব, তার কথা। তা ছাড়া আছে বামপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির কথা। আজ পর্য্যন্ত প্রতিবাদী দলগুলি যে কংগ্রেসের নির্ব্বাচন-সাফল্যের ওপর কোন বিশেষ আঘাত হান্‌তে সমর্থ হন নি, তার প্রধান কারণ এ সকল প্রতিবাদী দলগুলির অসংখ্য সংখ্যা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ থাকতে পারে যে গত নির্ব্বাচনে সমগ্র দেশে সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে যে মোট সংখ্যক ভোট গণনা করা হয়েছিল তার মাত্র ৪০ শতাংশেরও কম ভোট কংগ্রেসের পক্ষে ছিল; তা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যাধিক্যে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে এবং রাজ্য বিধান সভাগুলিতে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচিত হয়ে দেশের শাসনভার পুনঃপ্রাপ্ত হন। এর প্রধান কারণ অসংখ্য প্রতিবাদী দলের নির্ব্বাচন প্রার্থীদের পক্ষে ৬০ শতাংশেরও বেশী ভোট ভাগ হয়ে গিয়ে কংগ্রেসকে প্রবল সংখ্যাধিক্যে জয়ী করে দেয়। এবারও প্রতিবাদী দলের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম নয়, বরং কম্যুনিষ্ট দল 'বাম' ও 'দক্ষিণ' দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে এদের সংখ্যা অন্ততঃ আর একটি বাড়বে। গত বছর নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে একটা প্রতিবাদী 'জোটের' আয়োজনের কথা শোনা গিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেটি কার্য্যকরী হয় নি। এবারও অনুরূপ একটি জোটের কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সেটি কতদূর সফল হবে জানা নেই।

তবে এরূপ একটি নির্ব্বাচনী জোট সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারলে কংগ্রেসকে যে বিশেষ বেগ পেতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পরে দেশ যে সঙ্কটাবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে

তার ফলে বিকল্প শাসন সংগঠনের সম্ভাবনা যদি কার্য্যকরী হবার কোন স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়, তবে কংগ্রেস দলের নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান সংখ্যাধিক্য অনেক কমে যেতে বাধ্য; এমন কি ক্ষেত্র-বিশেষে হয়ত সংখ্যালঘুত্বেও পর্য্যবসিত হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নয়। তবে এর জন্য যেটা নিতান্ত আবশ্যক প্রাথমিক প্রস্তুতি, সেটি নির্ব্বাচকদের মনে এই প্রতীতি জন্মান যে তাঁদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বিকল্প শাসন সংগঠন রচনা করবার মত ঐক্য প্রতিবাদী বামপন্থী দলগুলির মধ্যে রয়েছে। আর সেই প্রতীতি জন্মাবার একমাত্র উপায় একটা কার্য্যকরী এবং সক্রিয় জোটের দ্বারা এই প্রতিবাদী দলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা।

বস্তুতঃ দেশের সাধারণ লোকের যে কংগ্রেস অধ্যুষিত শাসন সংগঠনের ওপর আস্থা আজ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ডিমোক্র্যাসীকে ইংরাজীতে rule by consent. অর্থাৎ জনসাধারণের সক্রিয় স্বীকৃতিপুষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তার মানে জনসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত স্বীকৃতি, তাদের ওপর শক্তির প্রয়োগের নয়, এই শাসন সংগঠনের মূল ভিত্তি। কিন্তু গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর যখন কংগ্রেস শাসনাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তার পর থেকে গত চার বৎসরে সরকারের শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে বারে বারে গণ-বিক্ষোভ জ্বলে উঠেছে এবং সেই বিক্ষোভ একমাত্র দমনের দ্বারাই শান্ত করা সম্ভব হয়েছে। দমন-নীতি ডিমোক্র্যাসীর পরিপূরক নয়, পরিপন্থী। এই বিক্ষোভের মূল কারণগুলি অপসারণ করে জনস্বীকৃতির ওপর কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার কোন প্রকার প্রয়াসের কার্য্যকরী আয়োজন এখন সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান কংগ্রেস-অধ্যুষিত শাসন সংগঠনের আয়ত্তের বাহিরে চলে গেছে। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা পুনরায় লাভ করা কংগ্রেস দলের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব না হ'লেও যে নিতান্তই কঠিন হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এই অবস্থায় প্রতিবাদী দলগুলি এবং কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে কংগ্রেসের প্রতিবাদী অংশগুলি যদি বিকল্প সরকার গঠন করবার মত সার্থক জোটে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, তবে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সম্ভাবনাও সম্পূর্ণ অসম্ভব না হ'তে পারে।

এই অবস্থার জন্য কংগ্রেস সরকারই যে সম্পূর্ণ দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শাসন-প্রয়োগে এঁরা দেশের ও জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণের চেয়ে যে দলীয় স্বার্থকে এবং গোষ্ঠী স্বার্থকেই রক্ষা করবার বেশী প্রয়াস করেছেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এঁরা গত ১৮।১৯ বৎসরে দিয়েছেন। গোষ্ঠী-পোষণ, আত্মীয়-পোষণ এবং জনকল্যাণের নামে এমন ধরনের আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করবার আয়োজন এঁরা করে এসেছেন যে আজ এই দরিদ্র দেশের জনসাধারণ সামান্য যেটুকু অন্ন-বস্ত্র দ্বারা তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও লজ্জানিবারণ করে আসছিলেন সেটুকুও এঁদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের অতীত হয়ে গিয়েছে।

সাধারণ লোক রাজনীতি ও সামাজিক আদর্শবাদ নিয়ে মাথা ঘামান না। সামান্য অন্ন-বস্ত্র, আশ্রয়, কঠিন রোগে মোটামুটি চিকিৎসা, সামান্য আয়োজনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, এটুকু হ'লেই তাঁরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর সাধারণ লোকের জীবন-মান উন্নত করবার অজুহাতে কংগ্রেস সরকার যে ধরনের পরিকল্পনামূলক আর্থিক উন্নয়নের আয়োজন দেশের ওপর চাপিয়ে চলেছেন, তার ফলে একদিকে যেমন সরকারের অনুগ্রহভাজন মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠীর আর্থিক সংস্থান ও তজ্জনিত আর্থিক ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের সাধারণ লোকের সামান্য প্রাণধারণের উপযুক্ত সংস্থা-টুকুরও অভাব ঘটে চলেছে। প্ল্যানিংয়ের স্বরূপ ও প্রয়োগবিধিই যে বিশেষ করে এই অবস্থার জন্য দায়ী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে এই বিষয়টুকুর বিশদ আলোচনা করবার প্রয়াস করা হবে।

* * *

রাসায়নিক সার ও বৈদেশিক সাহায্য

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার সরকারী শিল্পনীতি বিষয়ক যে প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন তার অন্যতম অংশে বলা হয়েছিল যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শিল্পের ভবিষ্যৎ সংগঠন অথবা সম্প্রসারণ একমাত্র সরকারী ব্যবস্থাপনায় হ'তে পারবে। এই নির্দ্দিষ্ট শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম যে শিল্পটির উল্লেখ ছিল, সেটি হ'ল রাসায়নিক সার শিল্প। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর একটি সঙ্কল্প এই ছিল যে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে যে সকল শিল্প সংগঠিত হ'তে পারবে তাতে বিদেশী অংশীদারদের অংশ মোট অংশের অর্দ্ধেকের কম হ'তেই

হবে। বিদেশী সহযোগিতায় শিল্প স্থাপনার ক্ষেত্রে অর্দ্ধেকের বেশী ভারতীয় পুঁজির অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তটি ভারতে অধিকতর বিদেশী পুঁজি লগ্নীর সহায়ক হবে এই আশায় পূর্ব্বেই রদবদল করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে রাসায়নিক সার-শিল্প একমাত্র সরকারী মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত হতে পারবে এই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তটিও বাতিল করা হ'ল বলে মনে হয়। কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা দেশের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট মোচনের প্রয়োজনে একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এর জন্য রাসায়নিক সারের সরবরাহ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা আশু জরুরী হয়ে পড়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশে নূতন সার কারখানা স্থাপন করা এই কারণে আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার জন্য যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন সেটি সংগ্রহ করা কিছুদিন ধরে খুবই মুস্কিল হয়ে পড়েছে। গত তিন বছরে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও তার দ্বারা যে বিদেশী মুদ্রা রোজগার হয়েছে তার পরিমাণ চল্‌তি হিসাবের (current account) ঘাটতি (deficit) মেটাবার পক্ষেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আর আমাদের বিদেশী মুদ্রার তহবিলের পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনা কালের প্রথম দিক থেকেই কমে কমে এখন একেবারে সঙ্কটজনক ক্ষীণতায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

ফলে আমাদের লগ্নীযোগ্য আমদানীর (capital goods imports) প্রয়োজন মেটাবার জন্য এবং শিল্পগতি অব্যাহত রাখবার জন্য যে একান্ত আবশ্যক কলকব্জা (spares) এবং কাঁচা মাল আমদানীর প্রয়োজন তার জন্য সমগ্র তৃতীয় পরিকল্পনাকাল ধরে আমরা বিদেশী সাহায্যের জন্য প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে রয়েছি। এই বিদেশী সাহায্যের ধারা স্বাভাবিক কারণেই বেশ খানিকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। গত বৎসরের ভারত-পাকিস্থান জঙ্গী হামলার সময় থেকে এই সাহায্যের ধারা প্রায় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। তাসখন্দ চুক্তির পর আশা করা গিয়েছিল যে এই অবরুদ্ধ বিদেশী সাহায্যের ধারা আবার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের তরফ থেকে পরিকল্পনা রূপায়ণের অসাফল্যের কারণ সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি যে রিপোর্ট গত বৎসর পেশ করেছিলেন তাতে বৃহত্তর চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিকল্পনার প্রয়োগগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নেবার একান্ত আবশ্যকতার কথা বলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি যে ভবিষ্যৎ পুঁজি লগ্নীর আগে অনিবার্য্য প্রাথমিক প্রয়োজন, সেকথা খুব স্পষ্ট করে বলা হয়। এই রিপোর্টে বলা হয় যে তিনটি পর পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী যে প্রভূত পুঁজি লগ্নী করা হয়েছে তার সফল-উৎপাদন প্রতিক্রিয়ার অভাবই ভারতের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক মূল্য-বৃদ্ধির এবং আর্থিক তথা খাদ্যসঙ্কটের প্রধান কারণ। এই সকল তথ্য প্রকাশের ফলে সাহায্যকারী বিদেশী রাষ্ট্রগুলি ভারতকে সাহায্য দান সম্পর্কে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন বলে মনে হয়। বিশেষ করে সরকারী মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে লগ্নীর তুলনায় এই উৎপাদন সাফল্যের অভাব যে অত্যন্ত বেশী হয়ে পড়েছে সেকথা বিদেশী সাহায্য-দানকারী রাষ্ট্রগুলির কাছে এখন খুব স্পষ্ট হয়েছে।

ফলে সরকারী ব্যবস্থাপনায় শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিদেশী সাহায্য পাওয়া খুবই মুস্কিল হয়ে পড়েছে বেশ কিছুদিন ধরেই। সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রস্তাবিত বোখারো ইস্পাত কারখানা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক আলোচনা বহুদূর অগ্রসর হবার পরও মার্কিনী সাহায্য পাওয়ার আশা বাতিল হয়ে যায়। পরে একটি যুক্ত ইঙ্গ-মার্কিন সংস্থার সহায়তায় এই কারখানা নির্ম্মাণের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় এবং অবশেষে সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় এই কারখানা নির্ম্মাণের চুক্তি পাকা হয়। রাসায়নিক সার কারখানা স্থাপন কৃষি প্রগতির জন্য একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে কিন্তু সরকারী প্রযোজনায় এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন নূতন কারখানা নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ এই আশু প্রয়োজনের তাগিদে ভারত সরকার তাঁদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত মুলতুবী রেখে বিদেশী শিল্প-সংস্থার হাতে বিশেষ সুবিধা-জনক সর্ত্তে দু'টি নূতন সার কারখানা স্থাপনের অধিকার অর্পণ করেছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত সরকারের দু'টি মূল পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেল; সংরক্ষিত শিল্প এলাকায় বিদেশী ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার অনুপ্রবেশের স্থান করে দেওয়া হ'ল; এবং বিদেশী সহযোগিতার পরিবর্ত্তে ভারতীয় শিল্পে বিদেশী মালিকানার ক্ষেত্র প্রসারিত করে দেওয়া হ'ল।

কোন কোন মহলে সরকারের এই সিদ্ধান্তটিকে ভারতে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্তটিকে বাতিল করে দেবার সামিল বলে সমালোচনা করা

হয়েছে। কেহ কেহ এমনও তীব্র মন্তব্য করেছেন যে বিদেশী মুদ্রার আশায় এভাবে ভারতের আর্থিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করা হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে; বলা হয়েছে যে এই সার কারখানা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের ফলে সরকারের মূল সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের আদর্শের কোন রদবদল হয় নি, এটি একটি নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন সাধনকল্পে একটি সাময়িক সিদ্ধান্ত মাত্র।

সে যাই হোক, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা আমাদের আর্থিক অস্তিত্বের প্রয়োজনেও—কেবল মাত্র আর্থিক উন্নয়নের জন্য নয়—যে, আমরা কতটা পরিমাণে বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি তা সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হ'ল। বস্তুতঃ যে সকল পাশ্চাত্ত্য প্রয়োগবিধির অনুকরণের ওপরে প্রথম থেকেই আমরা আমাদের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামো রচনা করে আসছি, তাতে এরকম ফলই অনিবার্য্য ছিল এবং এখনও আমরা যে ভাবে এই উন্নয়নের প্রণালী রচনা করে চলেছি তাতে আমাদের বর্ত্তমান পরনির্ভরশীলতা যে ক্রমেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং তার থেকে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে কখনও যে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা নেই একথাও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর্থিক উন্নয়ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা এখন এমন একটা স্থানে এসে পৌঁছেছে যে বর্ত্তমান সঙ্কট অনিবার্য্য ভাবে আরও গভীরতর আকার ধারণ করতে বাধ্য একথা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও পরিকল্পনার পথ থেকে সরে দাঁড়াবার উপায় একরকম সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

আসল কথা দেশের অর্থব্যবস্থার মূল কাঠামো এবং তার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন একটি পশ্চিমী শিল্পপ্রগতি ও আর্থিক উন্নতির ভক্ত ও অনুকরণপ্রিয় কয়েকটি তথাকথিত বিশেষজ্ঞের হাতে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা এবং তার রূপায়ণের প্রয়োগবিধি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়ে ক্রমে গত ১৫।১৬ বৎসরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে প্রভূত নূতন লগ্নী সত্ত্বেও আনুপাতিক উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে নাই; বেকারের সংখ্যা কমে নাই—ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় বেড়ে চলেছে; সকল প্রকার পণ্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি অভাবনীয় পরিমাণ উচ্চতায় উঠেছে; দরিদ্র জনসাধারণ আরও গভীরতর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হচ্ছে। কেবলমাত্র একটি মুষ্টিমেয় সংখ্যার ধনীগোষ্ঠী আরও প্রভূত পরিমাণে আরও ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। এদেরই স্বার্থে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের পরিপন্থী জেনেও পরিকল্পনা রূপায়ণের বর্ত্তমান গতিপথ পরিবর্ত্তন করবার ক্ষমতা সরকারের নাই, কেননা এদের অর্থানুকূল্য ব্যতীত ক্ষমতার গদীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবার এঁদের আর কোন উপায় নেই।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

শ্রীগৌতম সেন

গত ১৬ই এপ্রিল শান্তিনিকেতনের শেষ ঋষি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল। এ শুধু মৃত্যু নয়, আধুনিক ভারতীয় শিল্পরীতির অন্যতম প্রবর্তক নন্দলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতন হইতে পুরাণো দিন বিদায় লইল।

শিল্পাচার্য নন্দলাল তাঁর শান্ত সৌম ঋষিসুলভ ব্যক্তিত্ব লইয়া অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ভারতবর্ষের শিল্প ও সাংস্কৃতিক জগতকে প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর মুঙ্গেরের খড়্গপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় খড়্গপুর ও দ্বারভাঙ্গায়।

কুড়ি বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করার পর কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে এবং বিশেষ ভাবে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে শিল্পচর্চা সুরু করেন। ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। এবং ১৯১৯ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষ হন।

শুধু অধ্যক্ষই নন—শান্তিনিকেতনই ছিল তাঁহার সাধনক্ষেত্র। এই শান্তিনিকেতনের মাটি তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। এ কি শুধু মাটির মায়া? তিনি বলিতেন, "এখানকার চারদিকের বস্তু সব দেখে আগের চেয়ে শতগুণ বেশী সুখ পাই। এখনও যে মনে তাজা আছি এইটাই তার মাপকাঠি।" বহু প্রতিষ্ঠান হইতে আচার্যের ডাক আসিয়াছে, তিনি অন্যকে পাঠাইয়া দিয়াছেন কিন্তু নিজে যান নাই। প্রভূত অর্থের লোভেও নয়। সামান্য টাকাতেই শান্তিনিকেতনে জীবন কাটাইয়া গেলেন। শান্তিনিকেতনের প্রতি এমনি ছিল তাঁর টান। সাধক-শিল্পীর মত আপন গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন আত্মসমাহিত। অর্থের আকাঙ্ক্ষা নাই, যশকেও বোধ হয় তুচ্ছ করিয়াছিলেন। প্রাণ-প্রাচুর্যে কঠোর তপস্বী ছিলেন তিনি।

তিনি বলিতেন, "দেখ কোন কাজ যখন করি, তখন সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে ঐ কথাই বাজে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাবনা যায় না। ছবি করার সময় এত ভাল লাগে যার জন্যে অনেক সময় রাত্তিরে বিছানা থেকে উঠে ছবিখানা দেখতে হয়।"

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "সব আর্টিষ্টের মধ্যেই আছে একজন ক্রিটিক। আঁকবার সময় সে কেবলই বলে, না, এটা হ'ল না। কি যে হলে ঠিক হয়, কেমন ক'রে তা করা যায়, সে সব কথা বলতে পারে না। কিন্তু হচ্ছে না যে তা ঠিক বলে দেয়।"

শান্তিনিকেতনের কলাভবনের বহু কৃতী ছাত্র আজ ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে শিল্প-বিদ্যালয়ে কাজ করিতেছেন। তাঁদের কাছে কলাভবন ও নন্দলালের সান্নিধ্য জীবনের বড় প্রিয় বস্তু। নন্দলাল সার্থক শিক্ষক।

তাঁর সম্বন্ধে চারু রায় একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "রেখা এবং ছবির ফিনিশের সম্বন্ধে নন্দলালের একটা অসাধারণ সুরজ্ঞান ছিল। আমরা অনেক সময়ে ধরতেই পারতাম না ছবিটা কখন শেষ করা উচিত।...কখন কোথায় ছবির সুরের শেষ হবে সেটা নন্দলাল যেমন ধরতে পারত সে ক্ষমতা একমাত্র গুরু অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো তাব চেয়ে বেশী দেখি নি। বর্ণসুষমার সৃষ্টিতে হয়ত নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি তবে রেখাঙ্কনের দক্ষতা তার মত কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। এঁরা গুরু শিষ্য উভয়েই কম রং ব্যবহার করতেন কিন্তু এঁদের ছবির এফেক্ট হ'ত সম্পূর্ণ আলাদা।"

একথা অবনীন্দ্রনাথও স্বীকার করিতেন। তাঁর আঁকা 'পার্বতী' চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঃ বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, খুব সুন্দর ছবি হয়েছে। নন্দলাল আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।"

মানুষ হিসাবেও নন্দলাল ছিলেন সাদা-মাটা মানুষ। খাঁটি স্বদেশী ছিলেন তিনি। তাঁর আচার-আচরণই ছিল স্বতন্ত্র। এমন নিরহংকার শিল্পী খুব কমই দেখা যায়। বহুবার তিনি স্বেচ্ছায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের মণ্ডপসজ্জার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। ১৯৫১ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৭ সালে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারত সরকারও তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দান করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি 'ললিতকলা আকাদেমী'র সভ্য নির্বাচিত হন। বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতেও তাঁহাকে সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হয়।

তাঁহার ছবির কথা ভুলিবার নয়। কত ছবিই না তিনি আঁকিয়াছেন। তার অধিকাংশই 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছে। তাঁর 'শারদা', 'জগাই-মাধাই', 'অজ্ঞাতবাসে অর্জুন,' 'উমার ব্যথা', 'কালী,' 'শিবের তাণ্ডব নৃত্য,' 'পার্বতী,' 'ডাণ্ডী অভিযান,' 'উমার তপস্যা'-র তুলনা হয় না।

নন্দলালের শিল্পকীর্তি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এবং বিভিন্ন ভবনের দেয়ালে আজও মূর্ত হইয়া আছে। শেষ জীবনে তিনি ছবি আঁকার চাইতে স্কেচের দিকেই নজর দিয়াছিলেন বেশী।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন পাশ্চাত্ত্য প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল —একমাত্র ছবির ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম কেন ঘটিল তাহা ঐতিহাসিকেরা স্থির করিবেন কিন্তু নব্য রীতির ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল।

নন্দলাল শুধু মাত্র একটি যুগের ছিলেন না। তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি জাতীয় আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া আধুনিক ভারতীয় শিল্পরীতির আন্দোলন—সব কিছুর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। তাঁর জীবনাবসান মানে ভারতের শিল্প-সাধনার একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান।

পাঞ্চশস্য

মেগনেটিক কালি

ছবিতে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাগুলি নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন, আন্তর্জাতিক হরফে একটু হেরফের করে লেখা। নীচের দিকে আরো কতকগুলি চিহ্ন রয়েছে, যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি নানা সংকেত তাতে বোঝানো হচ্ছে। এই বিচিত্র সংখ্যাগুলি চিহ্নগুলি কালিতেই লেখা বটে, কিন্তু এই কালি সাধারণ কালি নয় মেগনেটিক কালি, অর্থাৎ যে কালি চুম্বকধর্মী। লাল নীল সবুজ বেগনি কালির ত অভাব নেই নানারকম, তবে আবার এই নূতন ধরনের কালি কেন? আসল কথা, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ কালিতে যা লেখা হ'ত, আজ তা আর কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আকাশ-পাতাল ভাবছেন নিশ্চয়ই, কি জানি কি সেই কাজ। শুনলে আরও অবাক হবেন, এ কাজ নিতান্তই সাধারণ আপনাদের সবারই পরিচিত ব্যাঙ্কের কাজে,

12345

67890

মশাই ব্যাঙ্কের কাজ। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নাকি সাধারণ কালিতে আর চলছে না, আমাদের দেশে না হলেও পশ্চিমী দেশগুলিতে। ব্যাঙ্কের কাজ টাকাপয়সা, প্রতিটি দিনে প্রতিটি ঘণ্টায় তাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের কোটি কোটি টাকা লেনদেন করতে হয়, হিসাবটা পয়সার হিসাবে সবসময় সম্পূর্ণ রাখতে হয়—অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি আর্থিক পরিস্থিতি যাচাই করে কাজ করতে হয়। তাই কাজ করা শুধু নয়, তা তাড়াতাড়ি করা এবং সে সঙ্গে নির্ভুল ভাবে করা। ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই কাজ ক্রমশ জট পাকিয়ে উঠছে। ব্যাঙ্ক তাই কম্প্যুটারের শরণ নিয়েছে। কম্প্যুটার কার্ডে প্রয়োজনীয় তথ্য ম্যাগনেটিক কালিতে লেখা হয়ে ওঠে। ম্যাগনেটিক, কারণ এই লেখা চোখে দেখার দরকার নেই, তার বদলে মেশিন তা পড়ে নেবে। কম্প্যুটার এভাবে জমাখরচের খাতা লিখবে, যোগ-বিয়োগ করবে, ব্যাঙ্কের লেজার খাতা মুহূর্তের মধ্যেই 'আপ-টু-ডেট' করে তুলবে। এ সবের মূলে ঐ ম্যাগনেটিক কালি।

মহাভারতে আছে বিরাট রাজের পক্ষে যুদ্ধার্থী ছদ্মবেশী অর্জুন তাঁর তোন পিতামহ ভীষ্ম আর আচার্য দ্রোণের পাদবন্দনা করেছিলেন। গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত যে তীরের ঘায়ে বড়ো বড়ো রথী মহারথী ধরাশায়ী হয়ে পড়েন তা পাদপদ্মে গিয়ে লাগলেই অভিবাদন জানানো যায় কি না আমার সন্দেহ আছে। তবে এমনও হতে পারে যে কুশলী ধনুর্ধরের তীর লক্ষ্যে পৌঁছবার সময় ফুলের মত কোমলভাবে এসে লেগেছিল। Soft landing বা mild landing এর মূল কৌশলও এখানে। রওনা হবার সময় যতো বেগেই ছুটুক পড়ার সময় তা পড়বে খুবই আলতোভাবে

প্লেন থেকে যারা লাফ দেয় soft landing-এর এই কৌশলটা তাদের রপ্ত করে নিতে হয়। অভিকর্ষের টানে পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ক্রমশ অধিক বেগে নীচের দিকে নামতে থাকে। মাটির যখন খুব কাছাকাছি, কুশলী মানুষ তখন খুলে ধরে ছত্ররূপী প্যারাশুট। হাওয়ায় আটকিয়ে তখন নামার গতি হয় মন্থর, ফলে আক্ষরিক অর্থে "পপাত ধরণীতলে" হলেও আঘাতের ভয় থাকে না।

সফ্‌ট্ ল্যাণ্ডিং

মহাকাশ অভিযানে এই mild বা soft landing এর কৌশলটাই অন্যভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ধরুন, যন্ত্রপাতি বোঝাই করে চাঁদের দিকে রকেট ছোড়া হ'ল, চাঁদে গিয়ে পৌঁছলও শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাতে আখেরে লাভ কতটুকু। চাঁদের কঠিন দেহের আঘাতে সমস্ত যন্ত্রপাতি-সহ মহাকাশযান নিমিষেই খানখান হয়ে যাবে, যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় তথ্যের বেশির ভাগ সরবরাহ করার ফুরসৎ পাবে না। কিন্তু এ সমস্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি যদি ধীরে সুস্থে চাঁদের দেশে বসিয়ে দেওয়া যেত, চাঁদের কত অজ্ঞাত খবরই না কত সহজে জানা যেত। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-ব্যবস্থা তখন চাঁদের মাটিই খোঁড়া সুরু করত, তারপর সুরু হত নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা—সমস্তই "আপন মনে"। পৃথিবী থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে সমস্তই আমরা ঘরে বসে জানতাম! আঃ। সমস্ত ব্যাপারটা যেন ভাবাই যায় না। এর সবই সম্ভব। যদি এর জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় soft landing। যন্ত্রপাতি যাতে নামতে পারে অটুট ভাবে চাঁদের বুকে, বলাবাহুল্য, এ পথেই মানুষ একদিন চাঁদে যাবে।

খেলাধূলার আসরে

জুলে রিমে কাপ ও ফিফা

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত

অন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মসিয়ে জুলে রিমে একদিন গর্ব্বভরে ঘোষণা করেছিলেন ফুটবলের জগতে সূর্য্য অস্ত যায় না। তাঁর এ বক্তব্য সম্বন্ধে আজ আর কারও দ্বিমত নেই। সত্যই ক্রীড়া-জগতে ফুটবলের মত জনপ্রিয় খেলা আর নাই। এই একটি মাত্র খেলায় খেলবার জন্য খেলোয়াড়দের অকৃপণ ভাবে অর্থ বিতরণ করা হয় এবং মাত্র একটি বছরের জন্য দক্ষিণা সাতের কোঠায় উঠে যায়। চিলিতে অনুষ্ঠিত বিগত বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ জুলে রিমে কাপ প্রতিযোগিতায় চারটি কোয়ার্টার ফাইন্যাল, দুইটি সেমি ফাইন্যাল এবং ফাইন্যাল খেলায় দর্শনী পাওয়া যায় দু'কোটিরও বেশী। এ টাকা অবশ্য দিয়েছিলেন ফুটবল-প্রেমিক জনসাধারণই, ফুটবলের এমনই জনপ্রিয়তা।

এ ত গেল বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের কথা। সমগ্র বিশ্বে বর্ত্তমানে নব্বইটির অধিক জাতীয় ফুটবল ফেডারেশন স্ব স্ব দেশে ফুটবলের উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে উষর-তপ্ত মরুভূমিতে, ঘনবর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যে প্রাচ্য মহাদেশের কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে, প্রচণ্ড শীতে তুষার-হিমেল বায়ুর মধ্যে মেরু প্রান্তরের তুন্দ্রা প্রদেশে ফুটবলের পদধ্বনি শুনা যায়। সমগ্র পঞ্চমহাদেশে জাতীয় ক্রীড়ার উপরেও বর্ত্তমানে ফুটবলের স্থান। আবার অনেক রাষ্ট্র ফুটবলকেই জাতীয় ক্রীড়া হিসাবে মেনে নিয়েছে। আজ সমগ্র বিশ্বে এ জনপ্রিয়তার পর স্বাভাবিক ভাবেই জুলে রিমের ঘোষণা মনে পড়ে যায়—সত্যই ফুটবলের জগতে সূর্য্য অস্ত যায় না।

বর্ত্তমানে "ফিফাই" (ফেডারেশি ও ইন্টারনাজিউন্যাল ড ফুটবল এসোসিয়েস) একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান—যারা পেশাদার ও অপেশাদার খেলোয়াড়দের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে দুইটি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে। এই দুটি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতি চতুর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত হয়। অপেশাদারদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশ্ব-চাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। কেবলমাত্র আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিয়মানুযায়ী অপেশাদার খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কোন পেশাদারী ক্রীড়ায় বা জুলে রিমে কাপের যে কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলে সেই খেলোয়াড় আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পরিচালিত অলিম্পিক ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ৩৭-এ উপধারা অনুযায়ী অপেশাদার খেলোয়াড়দের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"অপেশাদার খেলোয়াড় তাকেই বলা হবে যে সদা-সর্ব্বদা কেবলমাত্র নিজের আনন্দের জন্যই খেলাতে অংশ গ্রহণ করেছে অথবা করে এবং যোগদানের ফলে কেবল-মাত্র শারীরিক, মানসিক অথবা সামাজিক দিক দিয়েই উন্নতি হতে পারে এবং যার পক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় কেবলমাত্র দৈহিক অথবা মানসিক আনন্দ ব্যতীত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে বা অন্য কোন ভাবে বাস্তব দিক থেকে লাভবান হয় না। অবশ্য এ ছাড়াও প্রতিযোগী যে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য সেই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুনও মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।"

"ফিফার" অপেশাদার সংজ্ঞা এতটা কঠিন নয় এবং এজন্য মাঝে মাঝে পেশাদারিত্বের সংজ্ঞা নিয়ে আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সঙ্গে "ফিফার সংঘাত বেধে যায়। প্রধানতঃ এই কারণেই দুইটি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

টোকিওতে অষ্টাদশ অলিম্পিক কমিটির চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলা আরম্ভের বহু পূর্ব্ব থেকেই অষ্টম বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-জুলে রিমে কাপ প্রতিযোগিতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যায়। আগামী মাসের মধ্যেই অষ্টম বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের মূল প্রতিযোগিতা ইংলণ্ডে সুরু হয়ে যাবে। ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে চতুর্দ্দশ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর ইংলণ্ডে

এটিই হবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা। প্রস্তুতি পুরাদমে চলছে এবং মাঝে মাঝে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রস্তুতি-পর্ব্বের কিছু কিছু খবর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ-জুলে রিমে কাপের এটি অষ্টম প্রতিযোগিতা হলেও প্রকৃতপক্ষে "ফিফার" আইন-কানুন অনুযায়ী এই প্রতিযোগিতা বর্ত্তমানে ৬২ বছরে পদার্পণ করল। "ফিফা" জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই একটি ফুটবলের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার প্রারম্ভও ঐ দিন থেকে নীতিগত ভাবে মেনে নেওয়া হয়।

জুলে রিমে কাপ

"ফিফা—ফেডারেশিওঁ ইন্তারনাজিউন্যাল দ্য ফুটবল এসোসিয়েস্"

ফিফার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমে সে যুগের ফুটবল খেলার ধারা ও বিভিন্ন ফুটবল সংগঠন সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফুটবলের বহুল প্রচলন ছিল। প্রধানতঃ এই খেলা ফুটবল ও রাগবীর সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হ'ত ও প্রচুর হৈ-হট্টগোলের জন্য সাধারণতঃ সমাজের উচ্চস্তরের অথবা অভিজাত পরিবারের যুবকরা এ খেলা পরিহার করেই চলতেন।

ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশেও ফুটবলের যথেষ্ট প্রচলন থাকলেও ইংলণ্ডে ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ফুটবল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এ সময়ে ফুটবলের কোন সুসংবদ্ধ নিয়ম-কানুন ছিল না। ফলে দু'টি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'লে নিয়ম-কানুন এবং তার ব্যাখ্যা নিয়ে মাঝে মাঝেই মাঠের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা, এমন কি হাতাহাতি সুরু হয়ে যেত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য ১৮৪৬ সালে কেম্ব্রিজে কয়েকটি দল একত্র হয়ে সর্ব্বসম্মতভাবে ফুটবলের আইন-কানুনের জন্য কয়েকটি ধারা ও উপধারা বিধিবদ্ধ করেন। ১৮৬৩ সালে লণ্ডন ফুটবল এসোসিয়েসন গঠিত হয় এবং এই বৎসরই বিশ্ববিখ্যাত "ফুটবল এসোসিয়েসন" আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭১-৭২ সালে "এফ এ" কাপের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রথম বছর থেকেই অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইতিমধ্যে স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েলসেও ফুটবল এসোসিয়েসন গঠিত হয়।

১৮৮২ সালে ফুটবলের আইন-কানুন নিয়ে স্কটিশ, ওয়েলস ও আইরিশ ফুটবল এসোসিয়েসনের মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। বিভিন্ন এসোসিয়েসনে ফুটবলের খেলার পদ্ধতি নিয়ে স্পষ্টতঃই দু'টি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা ফুটবলে হাতের সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে রাগবী এসোসিয়েসন গঠন করেন আর যাঁরা ফুটবলে কেবল মাত্র পায়ের সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তাঁরা ফুটবল এসোসিয়েসনে যোগদান করেন। ফুটবলের নতুন নামকরণ হয় "এসোসিয়েসন সকার ফুটবল।"

এফ. এ. স্কটিশ, ওয়েলস ও আইরিশ এসোসিয়েসনের মধ্যে এসোসিয়েসন সকার ফুটবলের আইন-কানুন সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা হয় না। শেষ পর্য্যন্ত এফ. এ. আইন-কানুন সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করেন। ফুটবলে এটিই প্রথম আন্তর্জ্জাতিক সংগঠন। [ক্রমশঃ

—•—

বুদ্ধ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

শ্রীদীপককুমার বড়ুয়া

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূচনায় যে কয়েকজন সংস্কারমুক্ত বাঙালী মনীষীর উপর বুদ্ধদেবের অপরিসীম প্রেম, অসাধারণ প্রতিভা ও বজ্রকঠিন আত্মপ্রত্যয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্বামী বিবেকানন্দের নাম স্মরণীয়। তথাগতের মৈত্রী, করুণা এবং আধ্যাত্মিক সাফল্য বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম-সাধনাকে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত করেছিল। মহান বুদ্ধের মতই বিবেকানন্দ পার্থিব জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে অবলম্বন করলেন সন্ন্যাসীর পূত জীবনধারা। তাঁর বক্তৃতা, রচনা ও কর্মের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে তিনি ছিলেন ভগবান বুদ্ধের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। দৈনন্দিন পড়াশোনার মধ্যেই তিনি হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মূল ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করেছিলেন। 'বোধি' অর্থ পরিপূর্ণ জ্ঞান। তাই 'বুদ্ধ' শব্দটি তাঁর নিকট কেবলমাত্র একজন বিশেষ ব্যক্তির দ্যোতক নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে কোন ব্যক্তি নিজের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম। তাঁর এই ধারণা প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থসম্মত। স্বামীজীর প্রশস্ত হৃদয়ে বুদ্ধের অম্লান আদর্শ চিরদিন জাগরূক ছিল এবং তা জীবনে বাস্তবায়িত করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বুদ্ধের মানবতাবোধ তাঁকে এত অভিভূত করেছিল যে তিনি বলেছেন: "আমি বুদ্ধের দাসানুদাসেরও দাস ···স্বয়ং ভগবান হয়েও তিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেন নি, আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি কোলে টেনে নিয়েছেন।" বুদ্ধ-প্রসঙ্গে অনেকবার তিনি এভাবে সেই মহান ঋষির প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: "বুদ্ধ তাঁর কাছে শুধু যে আর্যশ্রেষ্ঠ ছিলেন তা নয়, উপরন্তু তিনি ছিলেন পৃথিবীর একজন সুস্থ পূর্ণ মানব।" বুদ্ধের প্রতি এই সুগভীর শ্রদ্ধাবশতই জীবন-সায়াহ্নে প্রখ্যাত জাপানী ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় এসে তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। যখনই তিনি বুদ্ধ-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তখনই ভক্তিতে তাঁর কণ্ঠ আপ্লুত হয়েছে। আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে গৌতম বুদ্ধের অতুলনীয় হৃদয়াবস্তার এক-নিযুতাংশও যদি তিনি পেতেন তবে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

বুদ্ধের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অনাত্মা, নাস্তিকতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন। তবুও গৌতম বুদ্ধের মত তিনি কখনই সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব, জটিল আচার অনুষ্ঠান, জাতিভেদপ্রথা, পরজন্মে স্বর্গবাসের প্রলোভন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জীবহত্যা অনুমোদন করেন নি। বুদ্ধের আদর্শেই নিপীড়িত মানবাত্মার সেবায় বিবেকানন্দ নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তথাগতের অসামান্য জীবপ্রেমই ছিল তাঁর সকল চিন্তা, প্রচেষ্টা ও কর্মপ্রেরণার উৎস। তাঁর হৃদয় করুণার উপাদানে গঠিত বলেই তিনি ছিলেন আজীবন বুদ্ধপূজারী।

বুদ্ধ-চরিত্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "আমি সেই গৌতম বুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবান্ লোক দেখতে চাই যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না··· তিনি বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন" অন্য একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: "তাঁর (বুদ্ধের) মেধা এবং হৃদয় উভয়ই ছিল বিরাট—তিনি সমুদয় মানবজাতি এবং প্রাণিকুলকে প্রেমে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং কি উচ্চতম দেবদূত, কি নিম্নতম কীটটির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।"

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভগবান বুদ্ধ একজন মহান বৈদান্তিক ছিলেন। সেজন্য তিনি মনে করতেন যে বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত-পক্ষে বেদান্তের একটি শাখা মাত্র। এই কারণে শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলা হয়। বুদ্ধ যা বিশ্লেষণ করেছিলেন শঙ্কর তা সমন্বয় করলেন। বিবেকানন্দ মনে করেন: "বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তগ্রন্থে এবং অরণ্যের মঠগুলিতে লুক্কায়িত সত্যগুলিকে যাঁরা সকলের গোচরীভূত করতে চেয়েছেন, বুদ্ধ সেই সকল সন্ন্যাসীর একজন।" তাই বৌদ্ধধর্মকে একটি স্বতন্ত্র ধ

বিচ্ছিন্ন ধর্ম বলে স্বামীজী মানতে রাজী নন। বৌদ্ধধর্ম তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের পরিপূরকরূপেই প্রতিভাত হয়েছিল।

সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধের অহিংস অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ বিবেকানন্দের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি লিখেছেন : "বুদ্ধ কখনও কারও কাছে মাথা নোয়ান নি—বেদ, জাতিভেদ, পুরোহিত বা সামাজিক প্রথা কারও কাছে নয়। যতদূর পর্যন্ত যুক্তিবিচার চলতে পারে, ততদূর নির্ভীকভাবে তিনি যুক্তিবিচার করে গেছেন।" লোক-শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই সকলকে আত্মবিশ্বাসী হতে সবচেয়ে বেশী শিক্ষা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের মহানুভবতা, অদম্য কর্মক্ষমতা দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের প্রতি মমত্ববোধ, সামাজিক বৈষম্যের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহস এবং নির্ভীকতার মূলে ছিল বুদ্ধের আদর্শ। সেজন্য তাঁকে বুদ্ধের একজন আধুনিক শিষ্য বলা যেতে পারে। স্বামীজী নিজেই বলেছেন : "বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দ মনে করেন যে "বুদ্ধই খ্রীষ্ট হয়েছিলেন।" তিনি জানতেন বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট বিরাট দু'টি শক্তির আধার, প্রচণ্ড বিশাল ব্যক্তিত্বের দ্বারা পৃথিবীকে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন : "পৃথিবীর যেখানেই সামান্য জ্ঞান আছে, সেখানেই মানুষ বুদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টের নামে মাথা নোয়ায়।" যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন ইহুদী আর গৌতম ছিলেন হিন্দু। কিন্তু ইহুদীরা যীশুকে পরিত্যাগ করেছেন এবং এমন কি ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছেন, অপরপক্ষে হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়ে অবতার-রূপে এখনও তাঁর পূজা করেন। এই দুই মনীষীর তুলনা-মূলক বিচারপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন : "বুদ্ধ ছিলেন কর্ম-পরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত, কিন্তু উভয়ে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ বার বার বুদ্ধকে একজন আদর্শ কর্মযোগী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে কেবল বুদ্ধই কর্মযোগের শিক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করে আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন। কারণ মহাপুরুষদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলেছেন 'ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। তাই-ই তোমাদের মুক্তি দেবে এবং সত্য যাই-ই হোক না, সেই সত্যে পৌঁছে দেবে। এজন্যই স্বামীজী আজীবন ভগবান বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তাই বুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি এত ভাবপ্রবণ।

পুস্তকপরিচয়

Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politic—by Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee. With a foreword by Dr. Radha Kumud Mukerjee. Firma K. L. Mukhopadhyay. 6/1 Banchharam Akrur Lane. Calcutta-12. Price Rs. 12.00.

রাজনীতির বহু আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-এ আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার পর থেকে জাতীয় জীবনে এসেছে শৈথিল্য। যাঁদের সাধনা ও আত্মাহুতি আমাদের নিত্যস্মরণীয় হওয়া উচিত ছিল, তাঁদের সম্বন্ধেও আমরা অনেকেই অজ্ঞ বা উদাসীন।

শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী বহুদিন ধরে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের, বিশেষ করে' যে পর্বকে আমরা স্বদেশী আন্দোলন আখ্যা দিয়েছি সেই পর্বের, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রাচীনদের মুখ থেকে এবং বহু দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করে তাঁরা অনেক বিস্মৃতপ্রায় মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করেছেন। বিচার এবং বিন্যাসেও তাঁরা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের কয়েকখানি গ্রন্থ ইতিপূর্বে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; আকাদেমি পুরস্কারও তাঁরা পেয়েছেন।

১৯০৫ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক যুগসন্ধিকাল। পুরাতন কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন' পন্থা ত্যাগ করে নবীন নেতৃবৃন্দ এই সময়ে সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করেন। অরবিন্দ তাঁদের প্রেরণা ও মন্ত্রদাতা। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' কাগজে ১৯০৬-'০৮-এর মধ্যে তিনি যে-সকল ইংরেজী প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাই অবলম্বন করে এই অধ্যাপক-দম্পতি তাঁর রাজনৈতিক মত ও আদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। ঐ পত্রিকা থেকে শতাধিক প্রবন্ধও তাঁরা সংকলন করে' দিয়েছেন।

নানা কারণে আমাদের রাজনীতি আজও ঘোলাটে। এই ব্যবহারিক ধর্মকে বিশুদ্ধ নীতি বা দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে জড়াতে গেলে বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী। মশাটিও মারবে না, বা এক গালে চড় খেলে আর এক গাল এগিয়ে দেবে, এ-সব ধর্মকথা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অরবিন্দের মত এ বিষয়ে পরিষ্কার। তিনি বলেন: "তাপস ব্রাহ্মণের অপ্রতিরোধ নীতি রাজনীতিতে আরোপ করলে বর্ণ-সংকর বা কর্ম-বিভ্রান্তি ঘটে, তাতে সামাজিক নীতি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।" হিংসা-অহিংসাও এক্ষেত্রে হবে স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী। 'কূটনীতিও সফল হয় তখনই, যখন বিফল হ'লে বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে।" মৈমনসিংহ—জামালপুরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কালে দুর্বৃত্তদের ক্ষমা করে বা নীতিবাক্য শুনিয়ে তিনি মীমাংসার স্বপ্ন দেখেন নি; বলেছেন: "বাঙ্গালী যদি আজ এমন জরাগ্রস্ত হয়ে থাকে যে মেয়েদের সম্মান রক্ষার জন্যও লাঠি ধরতে পারে না, তবে অমন কলঙ্কের বোঝা নিয়ে পৃথিবীর ভার না বাড়িয়ে তার নিশ্চিহ্ন হওয়া ভালো।"

এই পৌরুষের ধর্মই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে একদিন "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি" বলেছিলেন, তাঁর বাণী উদ্দীপ্ত করুক আমাদের জাতীয় চিত্তকে। মুখোপাধ্যায় দম্পতিকে ধন্যবাদ, তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে আমাদের ঐতিহাসিক গৌরব রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গান্ধীজীবন: শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট প্রেস প্রাইভেট লিঃ, এ-১২৭ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য, ১৫৲ টাকা।

'গান্ধীজীবন' একখানি মহাকাব্য। গ্রন্থকার গান্ধীজীর সমগ্র জীবন অধ্যায়টিকে মহাকাব্যের রূপ দিয়াছেন; ভালই করিয়াছেন। জাতীয় বীরের লোকোত্তর কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া মহাকাব্য রচনার নিদর্শন আমাদের দেশে নূতন নয়; পৃথিবীর অন্য দেশেও আছে। তাছাড়া গান্ধীজীর জীবনই হইল মহাকাব্য। কাব্যছন্দে বা পদ্যে গান্ধী-চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেই তাহা মহাকাব্য হয় না, মহাকাব্য লিপিবার মতো জীবন হওয়া চাই। মহাকাব্যের প্রকৃত সত্তা আত্মিক স্থিতির প্রতিফলনেই। মানুষের সৃষ্টির চরম ও পরম রূপ হচ্ছে মহাকাব্য।

গান্ধীজীবন ষোলটি সর্গে সমাপ্ত। কর্মজীবন হইতে সুরু করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনকে গ্রন্থকার ছন্দে ছন্দে লীলায়িত করিয়া গিয়াছেন। অদ্ভুত তাঁহার প্রকাশভঙ্গি, অপূর্ব হইয়াছে তাঁহার ভাব-ব্যঞ্জনা। স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-কাব্য তিনিই রচনা করিতে পারেন যিনি সত্যকার কবি। কালীপদবাবু জাত-কবি, বর্তমান যুগে মহাকাব্য কেহই লেখেন না, সেদিক দিয়া কালীপদবাবু যুগকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজীবনের মর্মকথা হইল তাঁহার ধর্মজীবন

"গান্ধী জাগিছে আত্মমগ্ন ধীরতায় নিশ্চল
মুখমণ্ডলে অপার শান্তি আলোক সমুজ্জ্বল
যথা অবৃষ্টি নিশ্চল মেঘে মেঘে
তরঙ্গহীন সমুদ্রে যথা প্রশান্তি থাকে জেগে·····"

গান্ধীজীর অন্তরের দিক ধর্মকেই ধারণ করিয়া আছে। গান্ধীজীবন মহাকাব্যে গান্ধীনীতির মূলকথাই প্রকাশ পাইয়াছে। এদিক দিয়া মহাকাব্যের রচয়িতা ধন্যবাদার্হ।

সঙ্গীতের আসরে: দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

"সঙ্গীতের আসরে" দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তখন হইতেই ইহার সম্বন্ধে সাধারণের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। সঙ্গীত ক্ষেত্রে যেসব গুণীরা আমাদের দেশে নাম করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কথা আজ বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। কেহ তাঁহাদের কথা লিখিয়াও যান নাই। হয়ত কালে ইঁহাদের সকল চিহ্নই একদিন লুপ্ত হইয়া যাইত। গ্রন্থকার যে ভাবে তাঁহাদের জীবন-কথা ও সাধনার কথা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দরদী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আশা করা যায়, আর ইঁহাদের আমরা হারাইব না।

এই গ্রন্থে যাহা আছে তাহা গ্রন্থকারের কথাতেই বলি: "বইয়ের অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে আসরের নায়ক-নায়িকাদের জীবনকাল অনুসারে. আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের প্রথমে এই সব শিল্পীদের জন্ম। ঘটনাস্থল বেশির ভাগ বাংলা দেশ, পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি সঙ্গীত কেন্দ্র ও সেখানকার কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞদের কথাও আছে।"

দিলীপবাবু নিজেও সঙ্গীতবিদ্ তাই সঙ্গীতের মর্মকথা ভাল করিয়াই জানেন। তা ছাড়া, নিজে ঐ রসের রসিক না হইলে গায়ক সম্বন্ধে অমন সূক্ষ্ম বিচারবোধ থাকে না। 'সঙ্গীতের আসরে' প্রকাশ করিয়া তিনি রসবেত্তার পরিচয়ই শুধু দিলেন না, তিনি আমাদের মহৎ উপকার করিয়া গেলেন, একটা জাতির সংস্কৃতিকে রক্ষা করিলেন।

দিলীপবাবুর ভাষা সুন্দর, বলিবার ভঙ্গিটিও মনোরম নহিলে অতি-সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এতখানি আকৃষ্ট হয় কি করিয়া? পড়িতে বসিলে আর শেষ না করিয়া উপায় থাকে না। গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই যে জন-সমাদর তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝা যায় আমাদের দেশের লোক যথার্থ গুণীর সম্মান দিতে জানে। গ্রন্থকারের সযত্ন প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে ইহাই আনন্দের কথা।

শ্রীগোতম সেন

যেতে যেতে: বারীন মৈত্র, জয়দীপ প্রকাশনী, ৮।১ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাত টাকা।

শ্রীযুক্ত বারীন মৈত্রের 'যেতে যেতে' ভ্রমণ সাহিত্যে একখানি বিশেষ গ্রন্থ যা আর পাঁচখানির ভিড়ে হারিয়ে যাবে না। শ্রীযুক্ত মৈত্র পথের নেশায় পথে নেমেছেন, পশ্চিম বাংলার দূরের এবং কাছের নানা তীর্থে, দেবালয়ে, মেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন উদাসীন রাহী হয়ে—সেই উদাসীন মনের অন্তরালে রয়েছে মাটি ও মানুষকে চিনে নেবার ইচ্ছা। সাগরের তট থেকে লাল মাটি-কাঁকরের রুক্ষ প্রান্তর, শ্যামায়মান ধান ক্ষেত থেকে নিশ্ছিদ্র অরণ্যভূমির নিবিড় অন্ধকার সর্বত্র গেছেন তিনি একটি বিছানার বাণ্ডিল বগলে করে। পরকে করেছেন আপন দূরকে করেছেন নিকট; বাউল কবি আর্তনাদ করেছেন, 'আমি কোথায় পাব তারে?' লেখক সেই 'বিশেষ'-কে অসংখ্য অযুত নির্বিশেষের মধ্যে চিনে ফেলেছেন; এতে তিনি যে সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান, মেলা পূজার্চনার বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে একদিকে যেমন নিপুণ তথ্য বিবৃত হয়েছে, তেমনি আবার তথ্যের অতিরিক্ত একটি সহজ শিল্পরসও উপলব্ধির সামগ্রী হয়ে দেখা দিয়েছে। দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে তিনি ঘটনাকে দেখেছেন, আর মনের মধ্যে তাকে ধরে রেখেছেন নিতান্ত ব্যক্তিগত 'ইমেজের' আকারে। কিন্তু সেই সীমায়িত ব্যক্তিগত ছায়াছবিগুলি লেখার গুণে পাঠকেরও আত্মীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। বইখানি পড়তে পড়তে আমরাও যেন লেখকের সঙ্গে পায়ে-চলা পথ ধরে বেরিয়ে পড়ি। দেশের মাটিকে নতুন করে চিনতে পারি। অযথা তথ্যভারে ভারাক্রান্ত ভ্রমণপঞ্জী এটা নয়, প্রত্নতাত্ত্বিকের লেখনী কণ্ডূয়নও নয়। অধ্যাপকসুলভ পাণ্ডিত্যের বিষয়ও এ গ্রন্থের ফলশ্রুতি নয়। চোখের দৃষ্টি ও মনের রং মিশে গিয়ে দেশ ও কালের যে অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে তাকে শুধু ভ্রমণ সাহিত্য বললে সবটা বলা হ'ল না। পথে পথে চলতে গিয়ে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কত মানুষের, কত কাহিনীকে তিনি ঝুলিতে ভরে নিয়েছেন। তারা কেউ কেউ মুখের হাসির মতো উজ্জ্বল, কেউ বা চোখের জলের মতো ম্লান। লেখক ভিড়ের মধ্যে 'মনের মানুষটিকে' খুঁজে বেড়িয়েছেন, অতন্দ্র রাত্রির অজাগর মুহূর্তে শান্তার আকাশ চাঁদোয়ার তলে বসে মনে করেছেন, পাশের ওই বাউলটি বুঝি সেই অধরা, দ্বিপ্রহরের অগ্নিঝরা বৈশাখে পথে চলতে চলতে ভেবেছেন—ওই বুঝি সেই ব্যক্তি। গঙ্গাসাগরের চলোর্মিমুখর সৈকতভূমি, উত্তর রাঢ়ের রুক্ষ প্রান্তর, বুড়োমুন মেলার বীভৎস উল্লাস অজস্র মানুষের মধ্যে কোথায় সেই বিশেষ মানুষটি? গ্রন্থের শেষ পংক্তিতে অনেক পথ পার হয়ে, অনেক লোকের সঙ্গ পেয়ে সবশেষে তিনি 'মনের মানুষ'কে খুঁজে পেয়েছেন, বাউলের ভাষায় "আমি তারেই খুঁজি যে রয় মনে—আমার মনে।" মনের মানুষ মনেই রয়েছে,—তবু তাকে খুঁজতে যেতে হয় জনারণ্যের মাঝখানে, মেলাতলায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে।

এই অপূর্ব পথপরিক্রমা শেষ করে মনে হয়, বাংলা দেশকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখলাম এবং সহসা কোথা থেকে উদাসী হাওয়ার ক্ষেপামি এসে আমাদের মত সহস্রকর্মজালজড়িত 'ঘরোয়া' মানুষকে পথের নেশা ধরিয়ে দিল।

এ গ্রন্থ একাধারে দেশবর্ণনা, রোমাঞ্চ, আখ্যানকাব্য; কিন্তু বস্তুকে ছাড়িয়ে শূন্যগর্ভ কল্পনা আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে নি। আশা করব শ্রীযুক্ত মৈত্র মনের মানুষকে মনের মধ্যে পেলেও আবার হয়তো তার সন্ধানে পথে নামবেন। কারণ তাকে তো আমরা 'হস্তামলকবৎ' চাই নে, তাকে খুঁজে বেড়াতেই ভালবাসি। সে ভালবাসার স্বাক্ষর রয়ে গেছে 'যেতে যেতে' গ্রন্থে। লেখায়, রেখায়, ছবিতে এ গ্রন্থ আবালবৃদ্ধ সকলের মনোহরণ করবে—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

অভিনয়-দর্পণ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শিল্পী শ্রীগোপেশ চক্রবর্তী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ প্রথম খণ্ড	আষাঢ়, ১৩৭৩	তৃতীয় সংখ্যা

অর্থের অবস্থা

ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন আমাদিগের বিদেশী অর্থের তহবিলে প্রায় ৩০০০ তিন হাজার কোটি টাকা ছিল। অর্থাৎ আমরা জাতীয়ভাবে বিদেশের লোকেদের নিকট ঐ পরিমাণে পাওনাদার ছিলাম। কংগ্রেস রাজত্বে বহু বৎসর ধরিয়া ঐ টাকাটি প্রথমত পূরা উড়ান হয় ও পরে যথেষ্ট উড়াইবার পয়সা না থাকায় বিদেশে কর্জ্জা করিয়া টাকা উড়ান চালু রাখা হয়। টাকা উড়ান হয় বলা যদি অনুচিত মনে হয় তাহা হইলে গত আঠার বৎসর বিদেশে যত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহার হিসাব উত্তম রূপে পরীক্ষা করা হউক ও দেখা যাউক যে কোন্ কোন্ সময় কত কত টাকা কি কারণে কি উদ্দেশ্যে ও কি ভাবে ব্যয় করা হইয়াছে। টাকা কর্জ্জা করিয়াও তাহার কত অংশ জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হইয়াছে ও কত অংশ অনন্ত শূন্যে হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে তাহাও দেখা হউক। দেখা হউক, কেননা না দেখিলে উল্টা কথা বুঝাইয়া দিবার পথ খোলা থাকিয়া যাইবে এবং অর্থ অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হইবে না। এবং অর্থ অপচয় বন্ধ না করিলে আরও দুই-চারিবার ভারতীয় টাকার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় হার হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। আরও হইতে পারে ভারতীয় অর্থনীতির চরম অবস্থা ও টাকার ক্রয়শক্তির অন্তিম পরিণতি। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতির যে সমাজতান্ত্রিক গতি ও পরিকল্পনার ধারা তাহার মূলে এখনও সমাজের অভাব পূরণ, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও বিশেষ চেষ্টা করিয়া সুসংযতভাবে সকল অপচয় নিবারণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে স্থির-নিশ্চয় পদক্ষেপে গমন-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না। দেখা যাইতেছে শুধু অপচয়; অদূর ও সুদূর ভবিষ্যতের অভাবহীন সমাজ গঠনের কল্পিত আশার বাণী ও সমাজের কষ্ট উপার্জ্জিত অর্থ ব্যক্তির নিকট আইনের সাহায্যে আদায় করিয়া সেই অর্থ ও ঋণ করিয়া সংগৃহীত যাহা কিছু সকলই চির পুরাতন ব্যয়ের স্রোতে ঢালিয়া দেওয়া।

ভারতীয় সমাজতন্ত্র প্রধানত ও প্রথমত একটা অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা। কারণ সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দলের কবলে থাকায় সমাজের সাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার পরহস্তে তুলিয়া দেওয়াই বর্ত্তমান রাষ্ট্রের সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি। রাষ্ট্রীয় অধিকার কাহারও সাক্ষাৎভাবে ব্যবহার করিবার উপায় নাই। সে অধিকার রাষ্ট্রীয় দলের প্রতিনিধিবর্গের জন্যই রক্ষিত। প্রতিনিধিগণ আবার রাষ্ট্রীয় দলের নির্ব্বাচিত প্রতিভূ এবং তাঁহারা দলের নেতাদিগের আদেশে উঠেন-বসেন।

না উঠিলে-বসিলে তাঁহাদিগকে স্কন্ধে হস্ত স্থাপনান্তর পথে বিতাড়িত করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় অধিকার এই দেশের সমাজতন্ত্রে কয়েকজন মাত্র পালের গোদার হস্তে একান্তভাবে জমা থাকে। তাঁহারা যথেচ্ছা দেশ, দেশবাসী ও দেশের বৈভব তছনছ করিতে পারেন। এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে অর্থনৈতিক বিষয়েও ঐ পালের গোদাদিগের মতলবই হুকুমের সামিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। একাধিপত্য দুর্নীতির চূড়ান্ত এই বিশ্বাসে মানুষ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। একাধিপত্য বা অল্প-সংখ্যক লোকের হস্তে আর্থিক শক্তি আবদ্ধ থাকিলে শোষণ পদ্ধতি পূর্ণ উদ্যমে চলে বলিয়া ধনিক গোষ্ঠীর অপসারণ করা আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির ফলে যদি দেখা যায় সেই অল্প কয়েকজন লোকের যথেচ্ছাচারই সমাজের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ও ফলে কোটি কোটি লোকের অবস্থা সেই বেতন বা মজুরীর দাসত্বে শোচনীয় হইতে আরও শোচনীয় হইতেছে তাহা হইলে সেই প্রকার সমাজতন্ত্রের দ্বারা মানব স্বাধীনতা বা মানব প্রগতির প্রসার হইবে বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় দল গঠন করিলেই যদি তাহা ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তে পরিণত হইয়া সাধারণের শোষণে নিযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় দল গঠন আইনত দণ্ডনীয় করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। সাধারণকে বঞ্চনা করিয়া অল্পসংখ্যক লোকের সুবিধার চেষ্টা করা মহাপাপ। সেই পাপের শাস্তি যে কেহ যে ভাবেই ঐ প্রকার চেষ্টা করিবে, তাহাকেই দেওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় দল বা সেই দলের সভ্য বা নেতৃবর্গ এই পাপ করিলে যাহাতে তাহারা শাস্তি হইতে অব্যাহতি না পায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। বর্তমানে রাষ্ট্র গঠন, স্বাধীনতার প্রসার, অর্থনীতিকে ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে গড়িয়া তোলা প্রভৃতি যে কোন মানব প্রগতি-সহায়ক কার্য্যই আমাদিগের দলপতিগণ করিতে যাইতেছেন, তাহাতেই দেখা যাইতেছে তাঁহারা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের পথে যাইয়া পড়িতেছেন। নানানভাবে জাতীয় অর্থ ব্যয় করা হইতেছে ও তাহার ফলে জাতির তহবিলে কোনও আমদানি বা আয় লক্ষিত হইতেছে না। কোন বিরাট কার্য্য সংস্থার সৃষ্টি হইলেও সেই রূপ লোকসানের পথ খুলিয়া যায়, কয়েকজন জাতীয় প্রতিনিধি স্বদেশে বা বিদেশে সফরে যাইলেও সেইরূপই শুধু খরচ দেখা যায়। জাতীয়ভাবে প্রায় যাহা কিছুই করা হইতেছে তাহাতেই ব্যয়বাহুল্য ও আয়ের অনটন লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় কার্য্যের শাখাপ্রশাখা সর্ব্বত্র সুদূর বিস্তৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা মাসে মাসে বেতন পাইতেছেন তাঁহাদিগের কার্য্যের ফলে জাতীয় তহবিলে কিছু আমদানী হইতেছে কি না তাহা কেহ দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন না। চেষ্টা করিলে দেখিতেন শুধু অর্থের বহির্গমন। আগমন বিশেষ দেখা যায় না। এইরূপ অবস্থায় অর্থনৈতিক রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন। অর্থাৎ সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বকর্ম্মে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কথা সকল সময়ে জাতিকে অত্যন্ত সজাগভাবে মনের সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে। শত সহস্র কোটি টাকা আয়-ব্যয় আজ জাতির নেতৃবর্গের জলভাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা দুই চার দশ কোটি টাকা খরচ করাকে কিছুই মনে করেন না। অভাব হইলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া বিভিন্ন বৃহৎ বৃহৎ জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে সেই তথাকথিত বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করিয়া অভাব দূর করা হইয়া থাকে। ইহার নাম ডিফিসিট ফাইন্যান্সিং অর্থাৎ জাতির অজ্ঞাতসারে জাতির সম্পদ হস্তগত করিয়া ব্যয় করার পদ্ধতি। আর আছে বিদেশীর নিকট জাতির ভবিষ্যৎ রোজগার বন্ধক রাখিয়া ঋণ জোগাড় করা ও সেই ঋণের টাকা ব্যয় করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনাজাত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা। উভয় পথে চলার একই বিপদাশঙ্কা। অর্থাৎ ঋণের অর্থ যদি উপযুক্ত ও ফলপ্রসূ-ভাবে ব্যয় করা না হয় তাহা হইলে জাতি ক্রমশঃ ঋণের বোঝা বহন করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। এবং ঋণ বাড়িয়া চলিতে থাকিলে ও তাহার অনুপাতে আয় না বাড়িলে কোনও না কোন সময় অপরের পাওনা দিবার অক্ষমতা বা দেউলিয়া অবস্থা ঘটা জাতির পক্ষে অনিবার্য্য। ভারত যে ভাবে রাজস্ব ও ঋণের টাকা খরচ করিয়া চলিতেছে এবং সেই খরচের অনুপাতে

জাতীয় আয় বা মূল্য উৎপাদন কার্য্য যেভাবে যতটা হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না, তাহাতে মনে হয় ভারতের আর্থিক অবস্থা অবনতির পথে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে। এখন যে আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের হারে ভারতের টাকার মূল্য শতকরা ৫০।৬০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইল তাহা টাকার ক্রয়শক্তি হ্রাসের জন্যই করিতে হইয়াছে। এখন যদি সরকারী অপব্যয় বন্ধ করার চেষ্টা না হয় এবং জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে অতঃপর টাকার অবস্থা আরও খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এখন প্রয়োজন যে সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেখানে যত টাকা ব্যয় করা হইবে সেইখানেই কার্য্যে বা বস্তু উৎপাদনে উপযুক্ত-প্রমাণ মূল্য বা উপভোগ্য সম্পদের সৃষ্টি হইতেছে কি না তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। অযথা বেতন বা মজুরী উপার্জ্জন বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। এবং বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে কড়া নজর দেওয়া দরকার। যে ব্যক্তি বা যে সকল ব্যক্তি কোন কারণে বা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিয়া জাতীয়ভাবে আমাদের লোকসান হয় নাই। যে সকল কারবার বা ব্যবসা খোলা হইবে, সেইগুলির দ্বারা জাতীয় লাভ কতটা হইতেছে তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকারী খরচ, স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই হউক, খরচ হইলেই তাহার পরিবর্ত্তে কি পাওয়া যাইল ও তাহা খরচের অনুপাতে লাভজনক কি না সর্ব্বক্ষণ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। জাতীয় অর্থনীতি বাস্তব জিনিস। কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে উল্টাপাল্টা বুঝাইয়া দেশের মহা উন্নতি হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে বলিয়া খরচের উপর খরচ বাড়াইয়া দুনিয়ার বাজারে বেইজ্জত হইয়া ঘোরা-ফেরার নাম আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠা নহে। অধমর্ণ ব্যক্তি হউক বা জাতিই হউক তাহার সম্মান কখনও উত্তমর্ণের নিকট অম্লান থাকে না। ভারতের নেতাদিগের এই কথা এখনও বুঝিয়া চলিবার সময় আছে। কিছুদিন পরেই আর সে সুবিধা থাকিবে না।

অনুতাপ পরিতাপ অনুশোচনা

মানুষ ভুল করিলে বা কোন পাপকার্য্য করিলে তাহার মনে যে নিজের গৌরবহানিকর চিন্তার উদয় হয় তাহাকে উপরোক্ত ত্রিবিধ আখ্যায় বর্ণনা করা হয়। অনুতাপ, পরিতাপ ও অনুশোচনা লজ্জা অনুভব করার মতই মনোভাব। কিন্তু সেই লজ্জার মূলে থাকে মানুষের নিজের অক্ষমতা বা অজ্ঞানতা বোধ, কিংবা তাহার নিজ অন্যায় স্বীকারেচ্ছা। যে মানুষ নিজের দোষ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক অথবা দোষ করিয়া তাহার সাফাই গাওয়াই যাহার অভ্যাস, সে মানুষের মনে কখনও অনুতাপ জাগ্রত হয় না। ভারতের রাজকার্য্য যাঁহারা বিগত ১৮ বৎসর চালাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা অনুতাপ পরিতাপ বা অনুশোচনায় বিশ্বাস করেন না। ১৮ বৎসর ভারতীয় অর্থনীতি লইয়া যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করিয়া আজ তাঁহারা ভারতীয় অর্থের মূল্য আন্তর্জ্জাতিক বাজারে যতটা কম ধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন ততটা মূল্যহীনতা আধুনিককালে ভারতীয় অর্থের কখনও হয় নাই। কিন্তু এই টাকার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য হ্রাস করা ভারত সরকার নিজেদের গৌরবহানিকর বলিয়া না মানিয়া একটা বড় গলায় প্রচার করিবার মত বিষয় বলিয়াই প্রায় ধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া তাঁহারা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেন একটা যুদ্ধ-জয় করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইতেছে। যে সকল কারণে তাঁহারা টাকার মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এখন সেই সকল কারণ দূর করার চেষ্টা করিতে হইলে পূর্ব্বের ভুলের জন্য অনুতাপ করা প্রয়োজন। কিন্তু যদি অনুতাপের পরিবর্ত্তে শুধু নিজেদের কর্ম্মক্ষমতার সম্বন্ধে আস্ফালনই লক্ষিত হয় তাহা হইলে রাজকার্য্যের ধারা বদলাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা একটা বড় ভয়ের কথা। যাঁহারা ভুল করিয়া লজ্জা অনুভব করিতে রাজি নহেন, বরঞ্চ ইতিপূর্ব্বে আর কোন কোন কম্যুনিষ্ট বা অপর জাতীয় স্বৈরাচারী দেশ "ডিভ্যালুয়েশন" করিয়াছেন তাহা আওড়াইয়া গৌরব অনুভবেই ব্যস্ত, সেই সকল লোকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

মহাজাতির স্বরূপ

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে বিভিন্ন ফুলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ পূর্ণরূপে উপভোগ ও উপলব্ধি করিবার

শ্রেষ্ঠ উপায় ফুলগুলিকে ছেঁচিয়া বা সিদ্ধ করিয়া একত্র মিশাইয়া দেওয়া নহে ; ফুলের তোড়া বাঁধিয়া বা ফুলগুলির স্বরূপ বজায় রাখিয়া সেগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে তবেই তাহার যে সমবেত সৌন্দর্য্য দেখা যাইবে তাহাই ফুলগুলির প্রকৃত সৌন্দর্য্য। ফুলগুলিকে সিদ্ধ করিয়া বা একত্র কুটিয়াও সেগুলির সৌরভ রক্ষা করা চলিবে না। সেগুলিকে পৃথকভাবে রাখিয়াও তাহাদের সৌরভ পূর্ণ সংরক্ষিত হয় ; এবং ফুলের নিজত্ব বজায় রাখিলেই তবে তাহার সুবাস সুরক্ষিত থাকে। ভারতের সকল জাতিগুলিকে ঐরূপে গায়ের জোরে একত্র মিলিত করিয়া দিয়া এক মহাজাতি গঠন করাও কোন সভ্যতা বা কৃষ্টি প্রগতির উপায় নহে। সকল জাতি, ভাষা, রীতিনীতি, শিল্পকলা, আচার-ব্যবহার, প্রভৃতি নিজ নিজ স্বরূপ রক্ষা করিয়াও একটি বৃহত্তর কৃষ্টি সমন্বয়ের সৃষ্টি করিতে পারে ; যাহার মূল প্রেরণা একই চিন্তার ও রস অনুভূতির উৎস হইতে উদ্ভূত এবং সেই কারণে পরস্পরবিরোধী নহে। বিভিন্ন পুষ্পের একত্র বিন্যাসের ফলে যে নূতনতর রূপের ও রসের সৃষ্টি হয় তাহার বৈচিত্র্য অধিকতর প্রসারিত ও সংরক্ষণযোগ্য। এই কারণে মহাজাতি গঠন চেষ্টা করিতে গিয়া যাঁহারা জাতিগুলির পার্থক্য সবলে দলন করিয়া একতার সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। সকল জাতির নিজ নিজ স্বরূপ রক্ষা করিয়া যে মহাজাতি গঠিত হয় তাহাই সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক দিয়া অধিক বিচিত্র ও বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে যে যাহারা সংখ্যালঘু তাহাদিগকে দলন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিত মিলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই সকল কৃষ্টিনাশক অত্যাচার স্বাধীনতাবিরুদ্ধ এবং কোন স্বাধীন জাতির পক্ষে এই প্রকার পীড়ন সহ্য করা উচিত নহে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি আজ ফন্দিবাজি নীচ স্বার্থসিদ্ধির বিষদুষ্ট। স্বাধীন মানবের যে মুক্তির গৌরব, ভারতে আজ তাহা ম্লান হইতে ম্লানতর হইতেছে। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন।

বিপ্লব ঘটে কেন ?

বিগত কয়েক বৎসরে সারা পৃথিবীতে প্রায় দেড়শত বার নানা প্রকার বিপ্লব, বিদ্রোহ ও আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে। এই জাতীয় গোলযোগ ঘটিলেই রক্ষণশীল জাতিগুলি কম্যুনিষ্টদিগকে দোষ দিবার চেষ্টা করেন ও প্রমাণ করিতে বসিয়া যান যে কম্যুনিষ্টগণই সকল বিপ্লবের মূলে আছেন ও থাকার কারণ বিপ্লবের ভিতর দিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার চেষ্টা। উপরোক্ত বিপ্লব, বিদ্রোহ প্রভৃতির ভিতরের খবর হইতে দেখা যায় যে ঐগুলির মধ্যে শতকরা আন্দাজ চল্লিশটির কম্যুনিষ্টদিগের সহিত কোন সংযোগ ছিল। বাকিগুলি কম্যুনিজম বর্জ্জিত ভাবেই ঘটিয়াছিল এবং কোন কম্যুনিষ্ট জাতিই সেইগুলির সহিত যোগাযোগ করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। ইতিহাস পাঠ করিলেও দেখা যায় যে রাজদ্রোহ ও দেশের ভিতরের আপোষের লড়াই কম্যুনিজমের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের বড় বড় বিপ্লবগুলির সহিত কম্যুনিজমের কোনও সম্পর্ক ছিল না ; কারণ সেই সকল যুগে মানুষ অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেও তাহারা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের দ্বারা কোনও নূতন রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে নাই। এই জাতীয় আদর্শবাদের মাত্র একশত বৎসর হইল পৃথিবীতে চলন হইয়াছে। এবং এখনও দেখা যাইতেছে যে মানুষ অবিচার ও উৎপীড়নের প্রতিকার করিবার জন্য বিপ্লব ও বিদ্রোহে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। কোন নূতন আদর্শবাদের প্রেরণায় বিপ্লব ঘটিলেও সে সকল ঘটনার সংখ্যা শতকরা চল্লিশটির অধিক নহে। সুতরাং জাতীয় জীবনে বিপ্লবমুক্ত থাকিতে হইলে প্রথমত চাই সমাজে ও শাসনক্ষেত্রে অত্যাচার, অবিচার ও সকল প্রকার উৎপীড়ন নিবারণ করা। কারণ তিনটি বিপ্লবের মধ্যে দুইটি হয় অন্যায়ের প্রতিকার চেষ্টায়, অপরটি হয় নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু দেশে ন্যায়, সুবিচার ও ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলে নূতন আদর্শের আদর ততটা সহজে হইতে পারে না।

বাংলা ভাষা বাঙ্গালীর আত্মরক্ষা

ভারতের সকল ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার খ্যাতি

ও গৌরব সর্ব্বজনস্বীকৃত। একমাত্র মহাকবি রবীন্দ্র-নাথের রচনা ঐশ্বর্য্যের জন্যই পৃথিবীতে বাংলা ভাষার আদর বহু শত বৎসর ধরিয়া চলিবে এবং মহাকবির সঙ্গে সঙ্গে আরও যে সকল ক্ষমতাশালী সাহিত্যিক বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্যও বাংলার সাহিত্য সম্পদ অমূল্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়। বাঙ্গালী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ইংরেজের সহিত লড়িয়াছিল, সে কথা পরে অহিংস সমরের প্রচার-কার্য্যের ধাক্কায় ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা-গণ বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকিলেও শত বিপ্লবীর আত্মদানের মর্য্যাদা কোন জাতিই কখন সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিতে পারে না। বাঙ্গালী আজও ভারতীয় মহাজাতির ও নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে ও চিরকাল থাকিবে। ভারতীয় এবং বাংলার কংগ্রেস দল কিন্তু বাংলা ও বাঙ্গালীর ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিগত মর্য্যাদা রক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টা করেন না। বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব মানিতে কংগ্রেস দলের খুবই অনিচ্ছা আছে বলিয়া দেখা যায়। এমন কি বাংলার অনেকগুলি জেলা, যথা সিংহভূমি ও মানভূমির অধিকাংশ এখনও অন্য প্রদেশের সহিত জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে; সেই সকল অঞ্চল যে বাংলা দেশ ছিল এ কথা চাপা দিবার চেষ্টা কংগ্রেস সরকার গভীর ভাবে করিয়া থাকেন। যথা, ধানবাদ জেলা (মানভূম) যে আবহমান কাল হইতেই হিন্দী এলাকা, ইহা প্রমাণ করিবার ও বাংলা ও বাঙ্গালীর নাম সেই জেলা হইতে মুছিয়া দিবার চেষ্টা ঐ অঞ্চলের গেজেটিয়ার পুস্তকে পূরাপূরি করা হইয়াছে। বাংলার খয়ের খাঁ কংগ্রেস নেতাগণ এই বিষয়ে নির্ব্বাক। চাকুরিরক্ষা প্রয়োজনীয় হইলেও চাকুরির খাতিরে দেশের সর্ব্বনাশ করা বা কেহ করিলে তাহা মানিয়া লওয়ার একটা সীমা থাকা উচিত। আজ যে বাংলা দেশের সহিত গায়ে গায়ে সংযুক্ত বাঙ্গালীর নিজের পূর্ব্ব-পুরুষের ভিটায় তাহাকে হিন্দীর ধাক্কা খাইয়া বরদাস্ত করিতে হইতেছে তাহার কোন প্রতিকার চেষ্টা বাংলা দেশের কংগ্রেস নেতাগণ করিতেছেন না। এই অপমান সকলে মাথা নীচু করিয়া মানিয়া লইতেছেন; কারণ না লইলে বিহার প্রদেশের নেতাগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবেন এবং বাংলার কংগ্রেসী নেতাদিগের ভারতের দরবারে প্রতিপত্তির হানী হইবে। বাংলা দেশে যে সকল কংগ্রেস বিপরীত দল আছে সেই সকল দলের লোকেরাও এই বিষয়ের বিশেষ কোন প্রতিবাদ করেন না। কারণ তাহা করিলে তাঁহাদিগেরও বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের বন্ধুগণ ক্ষুব্ধ হইবেন। এই সকল দল গড়িবার ও দল বাঁচাইবার নীচতার খাতিরে আজ বহু বাঙ্গালীকে নিজ ভাষা ও কৃষ্টির সর্ব্বনাশ নীরবে মানিয়া লইতে হইতেছে। বাঙ্গালীর পক্ষে বাধ্য হইয়া নিজ পুত্রকন্যাকে হিন্দীতে লেখাপড়া করাইবার ব্যবস্থা করান অত্যন্তই পীড়াদায়ক। বিশেষ করিয়া যদি কিছু দূরেই বাংলা এলাকায় পরিবারের অপরাপর শাখার বালক-বালিকাগণ নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভ করে তাহা হইলে বাঙ্গালী আরও অধিক করিয়া পরদাসত্বের অবমাননা বোধ করিতে বাধ্য হয়। এ কথা ছাড়াও ঐ সকল হিন্দী-অধিকৃত অঞ্চলে বাঙ্গালীর অবস্থা "দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের" .মত। নিজবাসভূমে পরবাসী হওয়ার নিদর্শন ইহা অপেক্ষা প্রকটতর কি হইতে পারে। "ধনবদ" বা ধানবাদ জেলায় যদি বহু পুরাতনকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী পরিবারের দাবি তিনশত মাইল দূরের আগত ভোজপুরীদিগের অপেক্ষা কম হয় -তাহা হইলে সেই সকল পরিবারের বাঙ্গালীদিগের মনে অশান্তির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। হিন্দী ভাষাভাষীদিগের এই জাতীয় অধিকারের বা দাবির কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই সকল বাংলা দেশের অংশ ব্রিটিশ শাসকগণ বাঙ্গালীকে সাজা দিয়া শায়েস্তা করিবার জন্যই বিহারের সহিত জুড়িয়া দিয়াছিল। কংগ্রেসের এ বিষয়ের স্বীকারোক্তিও আছে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বকালের। স্বাধীনতা পাইবার পরে কংগ্রেসের নেতাগণ কথাগুলি আর মানিতে চাহেন না। শুধু তাহাই নহে, নানান প্রকার স্থায়ী প্রচার-কার্য্যের জোরে মিথ্যাকে হিটলারি মতে সত্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা কংগ্রেস-নেতাগণ করিতে অপারগ নহেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল কার্য্যের নীরব সমর্থন করিবার জন্য বাংলা দেশে নেতার

অভাব নাই। ব্রিটিশ আমলে বহু বাঙ্গালী পরিবার ও চাকুরে-গোষ্ঠী দেশশত্রুদিগের সাহায্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। সেই সকল গোষ্ঠীর লোকেরা অথবা সেই জাতীয় লোকেরাই আজ কংগ্রেসী মতে দেশসেবা করিয়া বাংলার সর্ব্বনাশ সাধনে যত্নবান। চাকুরিতে বা অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষমতাকে অনেক বাঙ্গালী চিরকালই বাধ্যতামূলক শ্রদ্ধা দেখাইয়া আসিতেছে। আজ হয়ত দেশের ভিতরেই দল বিশেষের "সাম্রাজ্যবাদের" সমর্থন ও সাহায্য তাহারাই করিবে।

ক্ষয়িত-মূল্য টাকায় ব্যবসা

বিদেশী অর্থের বিনিময়ে টাকা এখন বিদেশীরা প্রায় দেড়গুণ অধিক পাইতেছেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের পক্ষে ভারতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া রপ্তানি করা অধিক লাভজনক হইতেছে। সেই কারণে ভারতের রপ্তানি ব্যবসা কিছু বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু তাহাতে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয় সেইগুলির মূল্য হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ বিদেশীরা পূর্ব্বের তুলনায় অধিক মূল্যে চা বা চিনি ক্রয় করিলেও তাহাদিগের পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা ঐ দ্রব্যগুলি সস্তায় সংগৃহীত হইয়া যাইবে। সুতরাং ঐ দ্রব্য অথবা যাহা কিছুই রপ্তানি হইতে পারে সেই সকল দ্রব্যেরই চাহিদা বাড়ার ফলে মূল্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা এবং মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। যে সকল বস্তু বিদেশ হইতে আমদানি হয় সেইগুলি পূর্ব্বের তুলনায় দেড় গুণ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে। অতএব সেই সকল বিদেশী বস্তু অথবা বিদেশী বস্তুর ব্যবহারে তৈয়ারী স্বদেশী বস্তুগুলিরও মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং হইতেছে। যাহা রপ্তানি হয় না এবং যাহা সম্পূর্ণ এ দেশের মাল-মশলায় প্রস্তুত হয় সেই দ্রব্যগুলির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া উচিত নহে বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি সংক্রামক ব্যাধি। পাঁচটা জিনিসের দাম বাড়িলেই আর দশটা জিনিসের দাম বাড়িয়া যায়। এই বিষয়ের মূলে আছে মানুষের মনের আগ্রহ, যাহাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের খরচ বৃদ্ধি হইলেই মানুষ নিজ বিক্রয় বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। পুস্তক, ঔষধ, সাবান, বস্ত্র, বাইসাইকেল, মোটর গাড়ি কিংবা ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই চাউল ও তৈলের মূল্য বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহাই ঘটিতেছে বলিয়া সর্ব্বত্র জনরব। যদিও ভারত সরকার মূল্য বৃদ্ধি আটকাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়। আমদানি খুব সহজ করিয়া দেওয়া হইতেছে, কারণ সহজ করিয়া দিলেও লোকে সম্ভবত বিদেশী মাল আমদানি করিতে সক্ষম হইবে না এবং সহজ করিয়া দিলে কেহ কেহ মাল আনাইতে পারিবে। পুস্তক, সংবাদপত্র ও পত্রিকা প্রভৃতি বাহির করিবার খরচ অনেক বাড়িয়া যাইতেছে ও আরও যাইবে। ইহাতে জনশিক্ষার অবনতি ঘটিবে। এই সকল অভাব-অভিযোগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যদি জাতীয় অর্থনীতি জোরাল হয় তাহা হইলে সকলের কষ্ট সহ্য করা সার্থক হইবে। কিন্তু সরকারী অর্থ অপচয় ও অযথা ব্যয় বন্ধ না করিলে তাহা হইতে পারিবে না।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ভারতীয় টাকার দেশের ভিতরের ক্রয়শক্তি বহু বৎসর ধরিয়া কমিয়া আসিতেছে। সেই ক্রয়শক্তির সহিত তাহার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের হারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। ইহা করার উদ্দেশ্য দেশের রপ্তানি কারবার বাড়াইয়া বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন বৃদ্ধি করা ও সেই বর্দ্ধিত ভাবে উপার্জ্জিত বিদেশী অর্থ দিয়া ভারতের বিদেশের ঋণের সুদ ও আসল দেওয়া এবং বিদেশী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা। রপ্তানি কারবার বাড়াইতে হইলে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয় সেইগুলির সরবরাহ বাড়ান প্রয়োজন এবং অধিক বিক্রয় হইলেও সেইগুলির মূল্য বৃদ্ধি নিবারণ করা আবশ্যক। কোন কারণে মূল্য বৃদ্ধি নিবারণ সম্ভব না হইলে সরকারী তরফ হইতে সেই সকল দ্রব্য উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে রপ্তানি করিতে হইবে। আমদানি মালের বিক্রয়ও ঐ প্রকারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সাধারণের নিকট করা প্রয়োজন। যে সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে দেশের ক্ষতি হয় সেইগুলিকে অল্পমূল্যে বেচিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইবে

সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে সখের জিনিসের মূল্য অধিক বাড়াইয়া দিয়া। আভ্যন্তরীণ মূল্যের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইবে যদি উৎপাদন কার্য্যও নিয়ন্ত্রিত ভাবে চালান যায়। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি এখন হইতে আরও গভীর ও ঘনিষ্ঠ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। তাহা না হইলে অর্থনীতির স্বাস্থ্যরক্ষা সম্ভব হইবে না। কিন্তু এই কার্য্য করিতে হইলে তাহা শুধু কথায় হইবে না। কর্ম্মশক্তির সংহত ও সংযত ব্যবহার করিতে না পারিলে কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব হইবে।

আমাদের অর্থনীতি

ভারতের বিরাট বক্ষের উপরে বহু যুগ হইতে কয়েক লক্ষ গ্রাম প্রতিষ্ঠিত আছে। আর আছে কয়েক সহস্র শহর। গ্রামগুলির চারিদিকে অরণ্য পর্ব্বত, ক্ষুদ্রবৃহৎ নদী, হ্রদ ও জলাশয় এবং অসংখ্য শস্যক্ষেত্র ও ফলের গাছের বাগান। কোথাও কোথাও চা, কফি, বাদাম, কমলালেবু, আম, প্রভৃতির গাছ রোপণ করিয়া ব্যবসা করা হয় এবং জলে মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থাও আছে দেখা যায়। পশুপালন ও নানান প্রকার কুটির-শিল্প গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বকালে আরও অধিক ছিল, কিন্তু ব্রিটিশের ব্যবসা লোলুপতার ধাক্কায় অনেক কুটির-শিল্প বিগত শতাব্দী হইতে নষ্ট হইয়া যাইতে আরম্ভ করায় বর্ত্তমানে সেগুলির সংখ্যাহানি হইয়াছে। শহরগুলিতে প্রধানত ব্যবসা শিক্ষা ও রাজকার্য্য লইয়াই লোকের বসবাস এবং কোন কোন শহরে আজ-কাল কারখানাও হইয়াছে। অনেক শহরই কিছু কিছু আধুনিকতার দাবি করিতে সক্ষম এবং কোন কোন মহানগরী বিশেষ করিয়াই যন্ত্রবিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভারতের অর্থনীতি বা ঐশ্বর্য্য উৎপাদন, বণ্টন ও সম্ভোগের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ঐ সকল অসংখ্য ও সুদূর-বিস্তৃত গ্রামগুলির মধ্যেই ভারতের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার শতকরা ৭৫ ভাগের অধিক অংশ জড়িত ও আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। শহর বা কারখানার কেন্দ্রগুলিতে আর্থিক প্রচেষ্টার অল্প অংশই নিবিষ্ট আছে। অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতি এখনও শস্যক্ষেত্র, অরণ্যজাত, কিংবা খনিজ বস্তুর উপরই অধিক নির্ভর করে; যদিও আমরা কারখানা, মহাশিল্প ও যন্ত্রবিজ্ঞানের সাধনায় পূর্ণভাবে আত্মদান করিয়া আধুনিক যান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পনায় বিভোর। উপার্জ্জন হইতেছে কিন্তু সেই জমি, জলাশয়, খনি কিংবা অরণ্যের বৃক্ষগুলি হইতেই। আমরা যে সকল বিরাট বিরাট দপ্তর খুলিয়া শত সহস্র বেতনভোগী-দিগকে একত্র করিয়া অনুশীলন, আলোচনা, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা ও প্রচেষ্টার চূড়ান্ত করিতেছি তাহার ফল কি হইতেছে তাহা আমরা প্রায় চোখে দেখিতে পাই না এতই অল্প। এই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার ফল আমরা আজ আমাদিগের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার ও হৃতগৌরব অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই। জনসাধারণের শেষ পয়সাটি অবধি রাজস্ব হিসাবে গ্রাস করিবার চেষ্টা ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঋণ করিয়া বেড়াইয়া ভারত সরকার আজ অপদস্থ হইয়াও নির্লজ্জভাবে সেই এক পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। অফিস, দপ্তর, কমিটি, ডেলিগেশন ও মিথ্যা আড়ম্বরের শেষ নাই। এবং এই সকল কার্য্যে বহু অর্থব্যয়ও সমানে চলিয়াছে। প্রগতির অভিনয়ের শেষ না হইলে ভারতের নিঃসম্বল দেউলিয়া অবস্থা কেহ ফিরাইয়া অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের আজ ঋণের সুদ দিবারও ক্ষমতা নাই বলিয়া মনে হয় এবং আসল শোধ করিবার ক্ষমতা যে নাই তাহা সর্ব্বজনজ্ঞাত। অথচ দেশবাসীকে আশার কথা শুনাইয়া তাহাদিগের মনে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা মিথ্যা বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়া রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করা হইতেছে। মানুষ যখন কাহাকেও বিশ্বাস করে ও পরে দেখে যে সে বিশ্বাস ভিত্তিহীন ও অমূলক তখন তাহার মনে একটা এমন ক্ষমাশূন্য ক্রোধের ভাব জাগিয়া উঠে যাহা মানব-চরিত্রে অতিমন্দ ভাব জাগ্রত করিয়া মানুষকে অমানুষ করে। এইজন্য মিথ্যার সাহায্য মানব-মনে বিশ্বাসের সৃষ্টি করা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ভুল পন্থা। বিশেষ করিয়া সাধারণতন্ত্রগত রাষ্ট্রে এইরূপ কার্য্য অমার্জ্জনীয়। সাধারণকে সত্য অবস্থা জানাইয়া দিয়া নূতন পথে জাতীয় অর্থনীতি পরিচালিত করিলে দেশের বা দেশের নেতাদিগের কোনও অমর্য্যাদা হয় না। এই

কারণে আমরা সব সময়েই যাহা সত্য তাহাই শুনিতে চাই। আমাদিগের সভ্যতা ও জীবনযাত্রা এখনও সহজ সরল পথে চলিতেছে। পাশ্চাত্ত্য ঐশ্বর্য্য-ভারাক্রান্ত ভোগবহুল সভ্যতা না আসিলে আমরা ভগ্নহৃদয় হইব না। আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা প্রথমে; ঐশ্বর্য্য অন্বেষণ পরে।

নেতৃত্বে অক্ষমতা

বাঙ্গালী যুবশক্তি বর্ত্তমানে ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষমতা দেখাইতেছে। স্বাস্থ্য ও দৈহিক বিক্রমেও বাঙ্গালী অন্যান্য জাতির তুলনায় কোন দীনতাদোষদুষ্ট ভাব দেখাইতেছে না। সমুদ্র-সন্তরন, পর্ব্বত আরোহণ ইত্যাদি বিশেষ কঠিন কার্য্যে বাঙ্গালী ক্ষমতা দেখাইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বিভিন্ন ক্রীড়াতেও বাঙ্গালীরা সফল হইয়া থাকে দেখা যায়। শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য তাহা হইলে বাঙ্গালীর যথেষ্ট আছে স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধি ও শিক্ষার অভাব তাহাদিগের কখন ছিল না, এখনও নাই। সৌন্দর্য্য ও রস অনুভূতিতে বাঙ্গালী কাহারও অপেক্ষা কম যায় না। কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে ও আরও বহু ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নিজগুণ দেখাইয়াছে ও দেখাইতেছে। মানব হিসাবে তাহা হইলে বাঙ্গালী অক্ষম নহে! অথচ এত গুণ থাকিলেও জীবন-যুদ্ধে বাঙ্গালী অনেক স্থলেই পরাজিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? সৈন্য যদি সক্ষম, সবল ও সুযোগ্য হয় তাহা হইলে তাহার পরাজয় হইলে বুঝিতে হইবে তাহাদিগের নেতৃত্ব ঠিকমত হয় নাই। সেনাপতিদের দোষে সুদক্ষ সেনাদিগের পরাজয় হইতে পারে। এই কারণে বাঙ্গালীদিগের বর্ত্তমানে নেতা পরিবর্ত্তন অতি আবশ্যক। সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি বাঙ্গালী কার্য্যক্ষেত্রে সক্ষম না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহাকে ঠিক পথে ঠিক ভাবে লইয়া যাওয়া হয় নাই। পথ-প্রদর্শক জ্ঞানী ও গুণী হইলে মানুষ গন্তব্য-স্থানে ঠিক পৌঁছায়। নেতার বুদ্ধি-বিভ্রম কিংবা স্বার্থান্ধতা দোষ থাকিলে অনুচরদিগের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ হইবে এবং নেতারাই তাহার জন্য দায়ী। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভদ্র পরিবারের বাঙ্গালী যুবকেরা কারখানায় কাজ করিতে সহজে রাজি হইত না। তাহাদিগকে বুঝাইয়া কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া আজ বহু সহস্র বাঙ্গালী যুবক কারখানায় উচ্চ বেতনে কাজ করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশের নেতাগণ শক্তি, সৎসাহস ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়াতে বাংলার জনগণের বহু উন্নতি হইয়াছিল। আজ বাংলায় বাম, দক্ষিণ বা মধ্যম পথ দেখাইয়া বাংলার সন্তানদিগকে যাঁহারা পথ হারাইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া-ফিরিতে বাধ্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের নেতৃত্বের অবসান প্রয়োজন। নয়ত বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের উন্নতির কোনও আশা নাই। বহু বাঙ্গালী যুবক আজকাল বিদেশে চলিয়া যান ও সেই সকল দেশেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিয়া যান। ইহাতে প্রমাণ হয় যে তাঁহাদিগের কর্ম্মশক্তি বিদেশীদিগের সহিত তুলনায় অল্প নহে, সমান সমানই। অথচ সেই সকল যুবকেরই নিজ দেশে উপযুক্ত কার্য্য জোটে না।

———

নাটকে ট্র্যাজেডির চরমোৎকর্ষ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিয়োগান্ত নাটকের শ্রেষ্ঠ পরিণতি দেখা যায় নিয়তি বা চরিত্রের পরিবর্তে ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্নিহিত দুর্ভেদ্য রহস্য ভাগ্যনিয়ন্তা হ'লে। অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারেন না। তাঁরা নিয়তি ভাগ্যনিয়ন্ত্রী, না চরিত্র ভাগ্যনিয়ন্তা—ট্র্যাজেডিকে অবলম্বন করে কেবল সেই মীমাংসায় ব্যাপৃত হন। আজকাল নিয়তি ও চরিত্রের সঙ্গে পরিস্থিতির ভাগ্যনিয়ন্তা হবার কথা শোনা যাচ্ছে। অনেকে এই তৃতীয় destiny বা ভাগ্যনিয়ন্তার রহস্য ঠিক বুঝতে পারেন না। এ-প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

ট্র্যাজেডিতে হয় fate is destiny, নয় character is destiny—এই ধারণা মোটে ঠিক নয়। তৃতীয় আর একটি শক্তি—Insoluble mystery of events—বিয়োগান্ত নাটকের পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং করে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য অবস্থা সমান সমান হলে—Other conditions being the same—যে ট্র্যাজিক নাটকে এই ঘটনাপ্রবাহ ভাগ্যনিয়ন্তা, তাতেই ট্র্যাজেডির চরমোৎকর্ষ দেখা যাবার সম্ভাবনা।

নাটকে ট্র্যাজেডির চরমোৎকর্ষ দেখা গেছে গ্রীক বা অনুরূপ কোন প্রাচীন নাটকে, নয় যাতে নিয়তি ভাগ্যনিয়ন্ত্রী—fate is destiny। কিংবা, অতি আধুনিক নাট্যধারাতেও দেখা যায় নি সে বাঞ্ছিত বিকাশ। যে আধুনিক নাটকে character is destiny বা চরিত্র ভাগ্যনিয়ন্তা, তাতে ট্র্যাজেডির পূর্ণ পরিণতি অসম্ভব। শেক্‌স্‌পিয়ার এবং তাঁর অনুগামীদের রচনায় ট্র্যাজেডির চরমোৎকর্ষ দেখা গেছে। তার কারণ, তাঁরা গ্রীক নাটকের অন্ধনিয়তি এবং আধুনিক নাটকের অতিমাত্র আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র—কোনটিকে ভাগ্যনিয়ন্তার মর্যাদা দেন নি। শেক্‌স্‌পিয়ার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই জন্যেই যে, তিনি ট্র্যাজেডির পূর্ণ সাফল্যের অন্তর্নিহিত রহস্যটি ধরতে পেরেছিলেন। পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তি বা আত্মমগ্ন চরিত্রের বদলে বিশ্বব্যাপী প্রাণপ্রবাহের দ্রুত ধাবমান ঘটনাবলীকে তিনি হতভাগ্য মানবের ভাগ্যনিয়ন্তা বলে চিনে নিয়েছিলেন।

নিয়তি ভাগ্যনিয়ন্ত্রী হ'লে ট্র্যাজেডির যে রসাস্বাদ সম্ভবপর, তার মান কখনই খুব উঁচু হতে পারে না। আর চরিত্র ভাগ্যনিয়ন্তা হ'লে ট্র্যাজেডির দ্বারা পাঠক বা দর্শকচিত্তে আদৌ সহানুভূতির আধিক্য সম্ভবপর কি না সন্দেহের বিষয়। উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টির জটিলতা দূর হবে।

মানুষ যদি দেবনির্দিষ্ট অদৃষ্টের দ্বারা ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ পরিচালিত হয়, তা হ'লে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জন্যে আমরা নিশ্চয় দুঃখ ও সহানুভূতি বোধ করি। কিন্তু ট্র্যাজেডির সে-বোধ খুব তীব্র নয়। যাকে আগে থেকে মেরে রাখা হয়েছে, যে-পরিণতি সম্পর্কে পীড়িত মানুষটির কোন কিছু করার উপায় নেই, তাকে দেখে সে-পরিণতির জন্যে দুঃখবোধ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু জ্যোতিষীর ভাগ্যগণনা অনুসারে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতের জন্যে তার পরিজনদের জন্যে আমরা যে দুঃখবোধ করি, নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত ট্র্যাজেডিতে তার চেয়ে বেশি দুঃখ বোধ না করার কথা। ভাবলে বোঝা যায়, গ্রীক নাটকে যে ভাবে মানুষকে নিয়তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছে, তাতে সে আর মানুষ থাকে নি, মারিওনেৎ (Marionnette) বা পুতুল-নাচের পুতুলে পর্যবসিত হয়েছে। তাতে মানুষের গৌরব বাড়ে নি, মনুষ্যত্বের শোচনীয় অবমাননা হয়েছে, ট্র্যাজেডিও দৈব কর্তৃপক্ষকে ভয় করতে শিখিয়েছে মাত্র। তার ফলে ট্র্যাজেডি প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছে দুঃখদায়ক রচনা, মামুলি শোকাতুর করুণরসাত্মক রচনা। ট্র্যাজিক আসলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্যাথেটিক!

কিন্তু দুঃখদায়ক নাট্যরচনা হলেই ট্র্যাজেডি হয় না, হওয়া উচিত নয়। ট্র্যাজেডির মধ্যে আনন্দানুভূতিও আছে। দুঃখের মধ্যেও মহৎ আনন্দের অনুভূতি ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য। অদৃষ্ট সর্বময় ভাগ্যনিয়ন্তা হ'লে সে আনন্দ পাওয়া দুষ্কর। বিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার আইসখুলস (Aiskhulos)—যাঁর লাতিন নাম Aeschylus, আইস্‌কিলুস্‌, ইংরেজী উচ্চারণে এস্কাইলাস—তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রোমেথেয়ুস (Prometheus) নাটকে উৎকৃষ্ট কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কবিত্ব সত্ত্বেও সম্পূর্ণ দৈব-নিয়ন্ত্রিত তাঁর ট্র্যাজেডিতে সেই দুঃখ উপলব্ধি হয় যা কলকাতার জনাকীর্ণ রাজপথে গাড়ি চাপা পড়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাণ হারিয়েছেন শুনলে হয়—আহা! এত বড় মানুষটার কপালে শেষে এই ছিল!

মানষের কল্যাণার্থে দেবরোষ উৎপাদন করেছিলেন বলে তবু প্রোমেথেয়্যুস আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। কিন্তু সোফোক্লেসের নাটকে ওইদিপোউস (Oidipous) বা ইডিপাস তাঁর বীভৎস ও ভয়ানক পরিণতি সত্ত্বেও আমাদের সে-সহানুভূতি পান না। ভাগ্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রবল সংঘর্ষ না হ'লে ট্র্যাজিক নাটকের রস জমতে পারে না। জন্ম থেকেই বলিপ্রদত্ত ছাগের মত যথানির্দিষ্ট সময়ে বলি হয়ে গেলে পাঁঠাবলির গান জমতে পারে, উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি হয় না। ভাগ্য ইডিপাসকে নিয়ে পুতুলনাচের ইতিকথা লিখলে আমাদের কাষ্ঠহাসি হেসে বলতে হয়: সবই ত আগে থেকে ঠিক করা ছিল! সোফোক্লেস তাঁর বর্ণনা ও ভাষার ইন্দ্রজালে মাতিয়ে দিলেও তাঁর ঐ নাটকে ভাল ভাবমোক্ষণ বা Katharsis হয় কি না, সন্দেহ। যে-নাটক দেখে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় মনে হয় "পাষাণভার চাপিয়া ধরে হৃদয়ে বারবার," তাকে স্বয়ং আরিস্তোতলেসের ভাষায় যুগপৎ করুণা ও ভীতির উদ্বোধক তথা অন্তরের পুঞ্জীভূত ভাবগ্লানির নিঃসারক বলা যায় না।

কোন লোক নিজের চরিত্রের কৌণিকতার জন্যে দুঃখ বা বিপর্যয় ভোগ করছে দেখলে সহানুভূতির সঙ্গে বিরক্তিও আসতে পারে: লোকটা একটু সামলে-সুমলে চললেই ত পারে! বিংশ শতাব্দীর "চরিত্রই ভাগ্যনিয়ন্তা" —মতবাদের নাটকগুলিতে এই দোষ প্রবল। আধুনিক যুগে প্রাণপণ প্রচার সত্ত্বেও উনিশ-বিশ শতকের হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬), জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০), জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩৩), ইউজিন ওনিল, নোএল কাউয়ার্ড প্রভৃতি নাট্যকার শেক্সপিয়ারের উৎকর্ষ আয়ত্ত করতে পেরেছেন, এ কথা প্রমাণিত হয় নি। সে প্রচেষ্টায় শ নিছক ভাঁড় ব'লে প্রমাণিত হয়েছেন যার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছিলেন:

"If his extravagant comparison of himself with Shakespeare had to be taken in dull earnest with no smile in it, he would be either a witless ass or a giant of humourless arrogance—and Bernard Shaw could be neither."

সুতরাং আধুনিক নাট্যকারদের শিরোমণিকেও নিছক ভাঁড়ামি ক'রে ভিন্ন শেক্সপিয়ারের সমকক্ষ বলা যায় না।

অদৃষ্টপ্রধান বা চরিত্রপ্রধান নাটকে ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত রসনিষ্পত্তি হয় না, তা হ'তে পারে কেবল ঘটনাপ্রধান নাটকে। নাটক মানেই সংঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘটনাপ্রবাহ—তা সে ভাবজগতেই হোক বা বস্তুজগতেই হোক। সুতরাং ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হবে ঘটনাবলীর অন্তর্লীন রহস্যের উন্মোচনে।

চরিত্রপ্রধান নাটকের সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, অপ্রশমিত দুর্বৃত্ত বা unmitigated villain-কে নিয়ে ট্র্যাজেডি হয় না অথচ চরিত্রের সামান্য ত্রুটির জন্যে বিরাট ট্র্যাজেডিও দেখান যায় না, দেখাতে গেলে চরিত্রগত ভিন্ন অন্য কারণে ট্র্যাজেডি হচ্ছে, এটা দেখাতে হয়। সংশোধনের অযোগ্য দুর্বৃত্ত চরিত্র ট্র্যাজেডির ফলভোগী হ'তে পারে না। কারণ, তেমন লোকের পতনে আমাদের চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। আবার An enemy of the people নাটকের নায়কের চরিত্রও কোন মহৎ ট্র্যাজিক উপলব্ধির সহায়ক নয়। সামান্য একটু বাক্‌সংযম বা মনোভঙ্গির পরিবর্তনে যেখানে ট্র্যাজেডি এড়ান যায় আর সে-ট্র্যাজেডিও স্থায়ী কোন দুঃখ নয়, সেখানে উচ্চাঙ্গের নাট্যরস পাওয়া অসম্ভব। নোংরা চরিত্রের দুঃখ অসংযত ভাববিলাস মাত্র। শ্রীযুক্তা ওয়ারেনের দুঃখ বা খেদ ব্যঙ্গরসিকের কৌতুকের উপাদান ছাড়া আর কিছু নয়।

মহৎ চরিত্রের সামান্য ভুলের জন্যে, অল্প একটু দুর্বলতার দোষের ছিদ্রপথে নির্মম ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হয়ে তাঁর জীবনতরণী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে আমাদের মনে প্রকৃত অনুকম্পা ও অকৃত্রিম আতঙ্কসঞ্জাত প্রগাঢ় সহানুভূতির উদ্রেক হয়। অনুকম্পা মানবসুলভ দুর্বলতার জন্যে, আতঙ্ক আমাদেরও ঘটনাপ্রবাহের তাড়নায় অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুরূপ পতনের সম্ভাবনা আছে বলে। এই বাস্তব উপলব্ধিজাত গাঢ় সহানুভূতিবোধই ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ রসোপলব্ধির উৎস। মহৎ চরিত্রের জীবন পরিণতি দেখে আমাদের মনে সঞ্চিত রসানুভূতির উৎস থেকে অনুকম্পা ও ভীতির প্রবল অভিঘাতে কারুণ্যের নির্ঝরিণী প্রবাহিতা হয়। এরই নাম Katharsis, দেহের নয়, মনের। যে-নাটক পড়লে বা দেখলে চিত্তগুহায় ঐ করুণারসধারা উৎসারিতা হয়, কেবল তাকে ট্র্যাজেডি বলা চলে। চিত্তে ঐ করুণ রসের উপলব্ধি মনে ভীতি ও সমব্যথার সঙ্গে এক বিচিত্র আনন্দের অনুভূতিও সঞ্চারিত করে চিত্তবিগলন প্রক্রিয়ার দ্বারা সমকালেই। সেই জন্যে আমরা নিজেরা নির্দয় প্রকৃতি না হয়েও অপরের মহৎ দুঃখে, মহৎ পতনে, নিদারুণ বৈফল্যে করুণাজাত আনন্দও লাভ করি ভীতি ও অনুকম্পাকে উপলক্ষ্য ক'রে। আনন্দ পাই যার পতন হ'ল তার প্রতি আক্রোশে নয়, মনে যে-করুণা স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয় তার প্রসাদে। ভীতি ও অনুকম্পা আসে পতিতের দুঃখে, আনন্দ আসে নিজ চিত্তের নির্মলতার জন্যে। এই নির্মলতা

চরমে ওঠে যখন, তখনই জীবনের মহিমার পূর্ণ উপলব্ধি থেকে ট্রাজেডির চরমোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। ট্রাজেডির চরমোৎকর্ষ মানে লুক্রেশীয় আনন্দ উপভোগ নয়, জীবনের বিচিত্র রহস্য উপলব্ধি ক'রে আতঙ্কে মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে পরক্ষণে গভীর অনুকম্পায় কাতর হওয়া এবং তার পর নিজের ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ক্ষণকালের জন্যেও উঠতে পারার জন্যে জীবনের মহিমায় মুগ্ধ বিস্ময়ে ও আনন্দে প্লাবিত হওয়া। দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এ-আনন্দ ধারণা করতে পারতেন না। তাঁর মনোভাব ছিল: বাপ্ রে, কি বাঁচাই বেঁচে গেছি! কিন্তু শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির পাঠকের বা দর্শকের মনে হবে: আহা, ওকে যদি বাঁচান যেত!

শেক্সপিয়ার এই শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির রচয়িতা। তিনি চরিত্রের দুর্বলতাকে আশ্রয় ক'রে অপ্রতিরোধ্য ঘটনা-প্রবাহ বা জীবনরহস্য কেমন ক'রে নাটকের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, তা দেখিয়েছেন। গ্রীক নাটকে নিয়তি চরিত্র ও ঘটনাকে তার হাতের যন্ত্রে পরিণত করে। যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত শক্তিরা সেখানে সর্বেসর্বা। অতিআধুনিক নাটকে চরিত্র পরিবেষ্টন বা ঘটনা-সংস্থান রচনা করুক বা না করুক, তার আপন স্বভাব তার পারিপার্শ্বিক বিদীর্ণ করে সজ্ঞানে আপন পরিণতি নির্বাচন করবে। গ্রীক নাটকে Determinism ও আধুনিক নাটকে Free will-এর জয় ঘোষণা করা হয়েছে। শেক্স্‌পিয়ারের নাটকে নিয়তি একেবারে গ্রীক নাটকের মত চরিত্র নিরপেক্ষভাবে ঘটনা সংস্থান রচনা করে না। কিংবা চরিত্রও পরিবেষ্টন নিরপেক্ষভাবে আপন সত্তাকে জাহির করে না। সুতরাং নিরপেক্ষ রসবোদ্ধার মতে, শেক্স্‌পিয়ারের নাটক এক অনবদ্য, অভূতপূর্ব সৃষ্টি যার তুলনা গ্রীক বা বুদ্ধিপ্রধান নাটকে নেই। এই নাটকে জীবনের ভয়াল বাস্তব রূপটিই দেখানো হয়েছে। এই ধরনের নাটকে জীবনের খরস্রোত চরিত্রটিকে তার কোন দুর্বলতা বা দোষ (সামান্য বা অসামান্য যাই হোক), কোন কৃতিত্ব বা বুদ্ধিমত্তা (তার উৎকর্ষ যে শ্রেণীরই হোক), অথবা অনুরূপ কোন লক্ষণ আশ্রয় করে এক বিচিত্র পরিণতি দেয়। ঐ পরিণতির ওপর ঐ চরিত্রের পরে আর কোন হাত থাকে না—সে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে যায়।

শেক্স্‌পিয়ারীয় নাটকে চরিত্রের প্রকৃত দায়িত্ব একবারই আসে। নিজেকে দুই বিপরীতমুখী পথের মোড়ে অবস্থিত দেখে কোন্‌টি সে নির্বাচন করবে, সেই সিদ্ধান্ত করার সময় সে স্বাধীন। ভাল বা মন্দ, এটি বা ওটি, যে কোন পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা চরিত্রকে মঞ্জুর করা হয়েছে, এই জন্যে তাঁর নাটকে চরিত্র নিয়তির একান্ত অধীন নয় গ্রীক নাটকের মত। গ্রীক নাটকে চরিত্র যাই করুক, নিয়তির কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই। অন্ধ দুরদৃষ্ট তার পেছনে তাড়া ক'রে আসবেই। কিন্তু শেক্স্‌পিয়ারের নাটকে চরিত্র নিজের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাগ্যপরিবর্তনকর সিদ্ধান্তটি গ্রহণের সময় একান্ত স্বাধীন; ঠিক সিদ্ধান্ত করার দ্বারা সে ভাগ্যকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়। যেখানে সে ভুল সিদ্ধান্ত করে, সেখানে পরে তাকে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে আক্ষেপ করতে হয়। কেবল ভাগ্যকে দোষ দিয়ে সে রেহাই পায় না এবং সে-চেষ্টাও করে না। ঐ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি করে একবার একটি জীবনপথ নির্বাচন করার পরই সে অপ্রতিরোধ্য এক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর তার আর ফিরে আসার উপায় থাকে না। একটা বিশেষ দুর্বলতার জন্যে একটি চরিত্র জীবন-প্রবাহে যখন একবার ভেসে যেতে আরম্ভ করে, তখন সে আর শত চেষ্টাতেও ফিরতে পারে না। চরিত্র যে নাটকে ভাগ্যনিয়ন্তা, সেই আধুনিক নাটকে কিন্তু চরিত্রটি ইচ্ছা করা মাত্র ভুল সংশোধন করতে পারে। প্রতিকূল ঘটনাসমূহ চক্রান্ত করে শেক্স্‌পিয়ারের নাটকের নায়ককে যেন সবই ভুল বোঝায়। ঠিক সেই দুর্বলতা হয় ত অন্য চরিত্রকে কোন বিপদেই ফেলে না। কিন্তু এর ওপর যেন ভাগ্য বিরূপ; একটা উপলক্ষ্য খুঁজে পেয়ে তার নিষ্ঠুর আনন্দের যেন আর অবধি নেই। তবু ভাগ্যকে দোষ দেওয়ার পথও বন্ধ; কেন না, চরিত্র নিজের দুর্বলতা বুঝে নির্বাক হয়ে থাকে। ম্যাকবেথ, রাজা লিআর এবং করিওলেনাস-এর কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

ওথেলো যে স্বভাবসন্দিগ্ধ, তা নয়। কোন মুর-কন্যার সঙ্গে বিবাহ হ'লে সে তাকে খুন করত না। সুতরাং শুধু চরিত্রের দুর্বলতা ট্রাজেডির জন্যে দায়ী, একথা বলা যায় না। ওথেলো তার অসাধারণ প্রাপ্তিতে এত বিচলিত ছিল যে, সে নিজের সৌভাগ্যকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করে। ইআগো সেই দুর্বলতার সুযোগে যে ষড়্‌যন্ত্র-জাল প্রসারিত করে তাতে যে কোন সহসা-প্রাপ্তিবিহ্বল যুবক ধরা দিতে পারত। শেক্স্‌পিয়ার ওথেলোর অন্তর্নিহিত যে দুর্বলতাকে অবলম্বন করে তাকে অনিবার্য ঘটনাচক্রে আবর্তিত করলেন, সেই দুর্বলতাও ঘটনারহস্যজাত, ওথেলোর স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। দেসদেমোনার প্রণয়লাভরূপ বিচিত্র ঘটনাই তাকে সন্দিগ্ধ ও বিস্ময়ে বিচারমূঢ় করে তুলেছিল। সেই ঘটনাবৈচিত্র্যই তাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে ভুল বুঝিয়ে ট্রাজিক পরিণতি নিয়ে আসে। নিজেদের এই রকম

সামান্ত ক্রটির জন্তে চরিত্রদের ক্রূর ও করাল জীবনস্রোতের খরপ্রবাহে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিকারহীনভাবে ভেসে চলা শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির লক্ষণ। হ্যামলেট, রোমিও, জুলিয়েট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, লিআর প্রভৃতি চরিত্রের ট্রাজেডিতে যে প্রগাঢ় সহানুভূতিবোধের উদ্রেক হয় তার কারণ, এরা কেউ মূলত লোক খারাপ না হয়েও বিচিত্র ঘটনাবর্তে পড়ে বিধ্বস্ত হ'ন। এ সম্বন্ধে সমালোচক-শ্রেষ্ঠ ব্রাডলি বলেছেন :—

"The dictum that with Shakespeare" character is destiny" is no doubt an exaggeration and one that may mislead. For many of his tragic personages if they had not met with peculiar circumstances, would have escaped a tragic end and might even have lived fairly untroubled lives."

মানুষ নিষ্ঠুরা নিয়তির হাতের পুতুলমাত্র নয়; আবার, সে নিজের কাজের দ্বারা জেনে-শুনে বিপর্যয় ডেকে আনে, তাও নয়। সে ভাবে এক, হয় আর। এর নাট্যরূপ যিনি দিতে পারেন তিনি জীবনপ্রবাহের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখনীতে ট্রাজেডি চরম উৎকর্ষ খুঁজে পায় জীবনের জটিল, কুটিল দ্বন্দ্বকে রূপায়িত ক'রে।

এখন যুব সংঘ, ছাত্র সংঘ, তরুণ সংঘে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ছাত্র শক্তি, তরুণ শক্তির কথা ঘন ঘন পড়িতে ও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সব সংঘের নেতারা বালক ও যুবকদিগের বাস্তবিকই দলবদ্ধ করিতে ও কোন ভাল কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। তাঁহার স্বয়ং কোন কল্যাণ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কিনা তাহাও জিজ্ঞাস্য। কারণ, স্বয়ং অসিদ্ধ যিনি, তিনি অন্যের সিদ্ধিলাভের সহায় হইতে পারেন না। উত্তেজনার ও হুজুগের সৃষ্টি যে হইয়া থাকে তাহা খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরের হেড লাইনে বোঝা যায়।···যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও ভদ্রলোকদের কৈশোর আছে, যৌবন আছে, তাঁহাদিগকে আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহার যেরূপ সুযোগ ও অবসর তদনুসারে গ্রামে নগরে বাসগৃহে মাঠে ঘাটে রাস্তায় অফিসে কারখানায় দেশের মূর্তি দেখুন, দেশের লোককে চিনুন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার জন করুন, নিজে ভাল হইয়া তাঁহাদের হিত সাধন করুন।···

দেশ সেবায় নানা পথ ও উপায় আছে। আমাদের দেশ অজ্ঞের দেশ, ত্রস্তের দেশ, অসুস্থের রুগ্নের দেশ, অত্যাচারিতা নারীর দেশ, দরিদ্রের দেশ।

আমাদের যাহার যেদিকে প্রবৃত্তি শক্তি সুযোগ আছে, তাঁহাকে সেইদিকে খাটিতে হইবে। কিন্তু কিছু করিতে হইবে, কেবল কথা শুনিলে ও শুনাইলে চলিবে না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

শ্রীকৃষ্ণধন দে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিডন বাগানের উত্তরদিকে একটা সরু গলিতে শম্ভু শীলের একতলা পুরণো বাড়ী। খানছয়েক ঘর ও একটা দালান নিয়ে চটা-ওঠা ঝুপ্‌সো বাড়ীখানা যেন হাঁপানী রুগীর মত ধুঁকছে। আশেপাশে দালান বাড়ী আর নেই, পাশেই বস্তী। সেখানে খোলা আর টিনের ছাউনি-করা চালার মত খুপ্‌রি খুপ্‌রি সারি সারি ঘর। সেগুলোতে মুটে-মজুর, কারিগর ও কারখানার লোকজনেরাই থাকে বেশীর ভাগ। দিনের বেলায় কোনরকমে চুপচাপ থাকে, কিন্তু সন্ধ্যের পরই সেই পাড়ার ঝিমুনি-রূপ বদলে যায়। হঠাৎ আঁৎকে-ওঠার চমক নিয়ে পাড়াটা যেন রগ্‌-চটা পাগলের মত ঝগড়াঝাঁটি বকাবকি গালাগালি সুরু করে দেয়। কখন কখন বেতালা গানবাজনাও চলে। শম্ভু শীল অনেক সময় জালাতন হয়ে বাড়ী বদলাতে চান, কিন্তু পৈত্রিক বাড়ীর মায়া কাটাতে পারেন না। বিশেষতঃ বটতলার বইয়ের কারবার করতে গেলে দূরে যাওয়া চলে না।

শম্ভু শীলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী পদ্মবাসিনী বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। তাঁর তিন মেয়ে। বড় রাইবিনোদিনীর বয়স একটু বেশী হয়েছে, বছর উনিশ হবে। মেজ বিরাজমোহিনী বছর সতেরয় পড়েছে। আর ছোট মেয়ে ভবতারিণীর বয়স বছর পনের। সেকালে ও-সব মেয়ে থাকলে সমাজ চোখ রাঙিয়ে শাসন করত। কিন্তু শম্ভু শীল তাতে দমে যান নি। মেয়েগুলোর আর বিয়ে হবে না, এইটেই ভাবত তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা।

এই বৈশাখেই তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে এনেছেন নয়নতারাকে। গরীব ঘরের মেয়ে, রোগাটে গড়ন, গায়ের রং কটা। ছেটবেলায় বাপ-মা হারিয়ে হুগলীতে মামার সংসারেই মানুষ। তবে সেকালের তুলনায় কিছু লেখাপড়া শিখেছে সে। বিপত্নীক পুস্তক ব্যবসায়ী শম্ভু শীলকেই উপযুক্ত পাত্র ভেবে মামা তাঁরই হাতে বাইশ বছরের ভাগনী নয়নতারাকে গছিয়ে দিয়েছে।

নতুন বউ নয়নতারা স্বামীর ঘর করতে এসেই কেন জানি না ভালবেসে ফেললে তিন সতীন-মেয়েকে। ওরা প্রথম দিনেই রাগ করে এড়িয়ে চলল সৎমাকে। রাইবিনোদিনী ত ঘরে খিল দিয়ে রইল, সৎমায়ের মুখ দেখবে না বলে। মেজমেয়ে বিরাজমোহিনী তার পিসীর বাড়ী হাতীবাগানে চলে গেল। ছোটমেয়ে ভবতারিণী দিদিদের দেখাদেখি অসুখের ভান করে সারাটা দিন বিছানায় শুয়ে রইল।

তিন মেয়ের তিনখানা ঘর পাশাপাশি হ'লেও আলাদা। একেবারে ওদের নিজস্ব। নয়নতারা কিছুতেই রাইবিনোদিনীর ঘরের খিল খোলাতে না পেরে ভবতারিণীর ঘরে শেষে এসে ঢুকল, বলল—"কি অসুখ করেছে মা তোমার?"

ভবতারিণী কথা না বলে পাশ ফিরে শুল। নয়নতারা তার পাশে বসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে: কৈ, জ্বর ত নেই!

নয়নতারার হাতটা ঝাপ্‌টা মেরে সরিয়ে দিয়ে ভবতারিণী বললে: কে তোমাকে ডাক্তারী করতে

ডেকে এনেছে? আমি এখন ঘুমুব—যাও, আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

নয়নতারা হেসে ফেলে বললে: বেশ ত, ঘুমোও না, কিন্তু সকাল থেকে কিছু খাও নি মা, এই দুধ আর সন্দেশ খেয়ে ফেল।

—কৈ দেখি তোমার দুধ সন্দেশ? খুব ঝাঁঝালো স্বরে কথাটা বললে ভবতারিণী।

নয়নতারা হাসিমুখে দুধের বাটি ও সন্দেশ এগিয়ে দিলে ভবতারিণীর দিকে। ভবতারিণী সন্দেশ ও দুধের বাটিটা নয়নতারার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে মেঝের। দুধ-সন্দেশ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

মুহূর্তের জন্ম নয়নতারার মুখ কালো হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার ভবতারিণীর পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে মৃদুহেসে বললে: রাগ করতে আছে কি মা? তুমি যে আমারই মেয়ে।

—ছাই মেয়ে! গুমরে উঠল ভবতারিণী।

—তোমার আমি মেয়ে হতে চাই না—চাই না—তুমি এক্ষুণি চলে যাও আমার ঘর থেকে।—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভবতারিণী।

নয়নতারা এবার ভবতারিণীর হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে: সত্যিই কি তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ মা?

এবার ভবতারিণী চুপ করে থাকে। নয়নতারা বলে: আচ্ছা বেশ, আমি চলে যাব—কিন্তু তার আগে তুমি কিছু খাও, সত্যি বলছি, তুমি খেলেই আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। আমি আবার দুধ-সন্দেশ আনি।

নয়নতারা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভবতারিণী হঠাৎ উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে দুম্ করে খিল লাগিয়ে দিলে।

বাইরে দুধ-সন্দেশ নিয়ে এসে অনেক সাধ্যসাধনা করেও যখন ভবতারিণীর ঘরের খিল খোলা গেল না, তখন নয়নতারা বলল: বেশ, আমিও তবে না খেয়েই থাকব।

বহুক্ষণ নয়নতারা দরজার সামনে বসে রইল। সন্ধ্যার একটু পরেই ভবতারিণী দরজা খুলে দেখে নয়নতারা চুপ করে দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

ভবতারিণী এবার মুখ খোলে—তুমিও সারাদিন খাও নি না কি? এত আদিখ্যেতা কিসের বল ত? বাবা এলে বলে দোব।

—তোমার বাবা একটু রাত্তিরে ফিরবেন, আমার মামার কাছে হুগলীতে গেছেন—

—আমি খাই নি বলে তুমিও না খেয়ে থাকবে? আমি যদি না খাই, আমার ইচ্ছে, আমার খুশী। তুমি খাবে না কেন? ম্লান হাসি হেসে নয়নতারা বলে, আমারও ইচ্ছে, আমারও খুশী।

—তা বলে তুমি খাবে না? একদম কিচ্ছু খাবে না? ঢং দেখে আর বাঁচি না!

—খেতে পারি তুমি যদি খাও—

সারাটা দিন না খেয়ে ভবতারিণীর পেটও খিদের চুঁই-চুঁই করছিল। সে কি ভাবল কে জানে! বলল: বেশ আমি খাচ্ছি—তোমাকেও কিন্তু আমার সামনে বসে খেতে হবে।

নয়নতারা এবার হেসে ফেলে, বলে: আগে কিন্তু আমি তোমাকে খাওয়াব।

—বেশ, কিন্তু তুমি তারপরে খাবে ত ঠিক?

—ঠিক।

মামার বাড়ী থেকে আসবার সময় এক হাঁড়ি সন্দেশ সঙ্গে এনেছিল নয়নতারা। সে উঠে গিয়ে একটা রেকাবিতে গোটা আট-দশ সন্দেশ নিয়ে এল। বাড়ীতে দুধ আর ছিল না—শুধু সন্দেশ এনে ভবতারিণীর কাছে আবার বসল নয়নতারা।

—দাও আমি খাচ্ছি—তোমাকে খাওয়াতে হবে না।

—না, আমি তোমাকে খাইয়ে দোব—তুমি যে আমার মেয়ে!

—ঈস্! ভবতারিণী আর যেন কোন আপত্তি করল না। যত্ন করে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে নয়নতারা সন্দেশ খাওয়াতে লাগল। ভবতারিণী বাধা দিল না।

হঠাৎ বাইরে পদধ্বনি শোনা গেল। রাইবিনোদিনী এসে সামনে দাঁড়াল, একটু ঝাঁঝাল স্বরে বলল: কি হচ্ছে রে ছোট্‌কি?—সৎমায়ের মোহিনী মায়ায় গলে গেলি যে!

ভবতারিণী কোন কথাই বলল না। নয়নতারা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল—তুমিও ত সারাদিন কিছু খাও নি মা, এবার কিছু খাও—

সে আমি বুঝব 'খন! আমি ত ছোট্‌কি নই, যে সৎমায়ের হাতে বিষ খাব—

—ছিঃ, ও কথা কি বলতে আছে মা! আমি কেন বিষ খাওয়াতে যাব? তুমি রাগ করেছ বলে এ সব কথা বলছ। আমাকে ভালবাসতে পারলে কোন দিন কি এ কথা বলতে পারবে?"

—তোমাকে ভালবাসতে যাব কেন শুনি? তুমি আমাদের কে? কেউ নও, কেউ নও—

এবার অভিমানে হঠাৎ কেঁদে ফেলে রাইবিনোদিনী। চোখের জল যেন বাধা মানতে চায় না। নয়নতারা উঠে দাঁড়ায়, রাইবিনোদিনীকে বুকের কাছে টেনে নেয়। বলে, "ঠিক বলেছ মা, এখন হয়ত কেউ নই—কিন্তু পরে কেউ হতেও ত পারি।—আঁচল দিয়ে রাইবিনোদিনীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে: সারাদিন খাও নি, এখন খাবে এস, তারপর আমাকে যা' খুশী বোলো। এস মা—

রাইবিনোদিনীর তবুও ঝাঁঝ যায় না, সে নয়নতারাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কঠোর স্বরে বলে: আমার বাবার সংসারে আমি নিয়ে খেতে জানি। তোমার হাত-তোলা খাবার আমি নোব কেন?

নয়নতারা তখনি উঠে গিয়ে সন্দেশের হাঁড়িটা এনে রাইবিনোদিনীর সামনে রেখে মৃদু হাসি হেসে বললে: বেশ ত, নিজেই যা ইচ্ছে তুলে নিয়ে খাও, এ সব ত এখন তোমাদেরই জিনিষ।

ব্যঙ্গ স্বরে রাইবিনোদিনী বলে: হাঁ, আমাদেরই সুখের জিনিষ!

রাইবিনোদিনী সন্দেশের হাঁড়ি স্পর্শ করে না। নয়নতারা তার হাতটি ধরে বলে: আমি যদি চলে যাই, আর কোনদিন না আসি, তা হ'লে কি তোমরা সুখী হবে?

রাইবিনোদিনী বলে: সে কথা আমরা বলতেই বা যাব কেন? আর এখন সে কথা তুলে লাভই বা কি! তোমার যা ইচ্ছে করতে পার, আমরা বাধা দেব না।

নয়নতারা বলে: সত্যি? আমার যা ইচ্ছে করব, সত্যি তুমি বাধা দেবে না?

রাইবিনোদিনী একটু উগ্রস্বরে বলে: না।

এবার হঠাৎ হেসে ফেলে নয়নতারা, বলে: তবে এই সন্দেশটা খাও—বললে যে বাধা দেবে না—

রাইবিনোদিনীর মুখে সন্দেশটা গুঁজে দেয় নয়নতারা। ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলে রাইবিনোদিনী। একটু হাঁ করে নয়নতারার হাত থেকে সন্দেশটা খায়। নয়নতারা নিজের আঁচলে তার মুখখানি মুছিয়ে দেয়।

হাতীবাগানের পিসির বাড়ী থেকে তখনি ফিরল বিরাজমোহিনী। চেয়ে দেখে, রাইবিনোদিনী আর ভবতারিণী সৎমায়ের কাছে বসে সন্দেশ খাচ্ছে। সে কোন কথা না বলে সটান নিজের ঘরে ঢুকে যায়—ঘরের মধ্যে থেকেই গর্জে ওঠে—ধিক্ তোদের! গলায় দড়ি জোটে না? ঐ সন্দেশ আবার খায় না কি?

রাইবিনোদিনীর অভিমান তখন অনেকটা কেটে গেছে। অপ্রস্তুতের অবস্থা একটু সামলে নিয়ে সে বিদ্রূপের স্বরে বলে: গলায় একসঙ্গে সন্দেশ আর দড়ি চলে না যে! তাই আগে সন্দেশটা খেয়ে নিচ্ছি—পরে ধীরে-সুস্থে দড়িটা গলায় দেব 'খন।

নয়নতারা উঠে গিয়ে বিরাজমোহিনীর কাছে দাঁড়ায়, বলে: তুমিও কিছু মুখে দেবে এস ত মা। রাগ করতে আছে কি!

—বাপের নতুন বিয়ের সন্দেশ খাব বৈ কি, তা আর খাব না! ঝাঁঝিয়ে ওঠে বিরাজমোহিনী। তারপর হঠাৎ যেন কান্নায় ফেটে পড়ে, বলে: ঐ সন্দেশ—ও দুটো মুখপুড়ীর বড্ড ভাল লেগেছে কি না, তাই গিল্‌ছে!

বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে বিরাজমোহিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

নয়নতারা তার পাশে বসে, বলে: ছেলেবেলায় মা হারিয়েছিলাম, এখন তোমরাই হ'লে আমার মা। তা ছাড়া বাড়ীতে ঝি-চাকরাণীও ত দরকার—আমাকে সে রকম একটা কিছু ভাবতেও ত পার।

—ভাবলে অনেক কিছু ভাবা যায়, কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছি, সেটাকে একটা কিছু ভেবে নিয়ে তেতো সত্যিকে ত চাপা দেওয়া যায় না!

নয়নতারা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে: তেতো সত্যিকেও ত মিষ্টি করে নিতে পার মা! তোমরা যে আমারই মেয়ে—

এবার বিরাজমোহিনী একটু আশ্চর্য হয়। সৎমায়ের কথাবার্তার মধ্যে একটা সুরুচি, একটা স্নিগ্ধতার আভাস যেন সে দেখতে পায়। হঠাৎ একটা প্রচ্ছন্ন অনুতাপ জেগে ওঠে তার মনে। দোষ যদি হয়ে থাকে, সেটা ত বাবারই। সৎমায়ের দোষ কোথায়? মনটা এবার একটু নরম হয় বিরাজমোহিনীর।

নয়নতারা তার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বলে: আমার উপর রাগ অভিমান যা ইচ্ছে করতে পার, কিন্তু

খাওয়ার উপর রাগ-অভিমান কি ভাল? তুমি কিছু না খেলে আমাকেও যে উপোস করে থাকতে হবে মা!

বিরাজমোহিনী চুপ করে থাকে। একটা আন্তরিকতা, একটা স্নেহস্নিগ্ধ মন সে যেন নয়নতারার মধ্যে দেখতে পায়। নয়নতারা এবার সন্দেশের থালাটা এগিয়ে আনে তার দিকে।

বিরাজমোহিনী বলে: আচ্ছা, তোমার কথায় একটা মুখে দিচ্ছি—

একটা সন্দেশ তুলে খায় বিরাজমোহিনী।

—আর একটা খাও!

—না, পিসীর বাড়ীতে খেয়ে এসেছি।

নয়নতারা আর একটা সন্দেশ বিরাজমোহিনীর মুখে তুলে দিতেই সে সেটাও খেয়ে ফেলে।

বাইরে চটি জুতার শব্দ। শম্ভু শীল ফিরে এসেছেন হুগলী থেকে। হাতে দুটো বড় ইলিশ মাছ।

নয়নতারা ও মেয়েরা দালানে এসে দাঁড়ায়।

মাছ দুটো দালানের এক পাশে রেখে শম্ভু শীল একবার কটাক্ষে নয়নতারাকে দেখেন, তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বলেন: গঙ্গার ইলিশ, বুঝলে কি না, চোখে পড়ল, তাই কিনে ফেললাম। দামটা কিন্তু বুঝলে কি না বেশী নিয়েছে।

ভবতারিণী বললে: কত দাম বাবা?

—তিন আনা করে একটা, দুটো ছ' আনা নিয়েছে, বুঝলে কি না, যে খদ্দেরের ভিড়!

নয়নতারা আধ-ঘোমটার আড়ালে একটু হেসে রাইবিনোদিনীর দিকে চেয়ে চাপাগলায় বললে: তোমরা গাদা-পেটি একসঙ্গে রাখ, না, আলাদা আলাদা করে কুটে নাও, তা ত জানি না। মাছটা কি তুমিই কুটবে?

রাইবিনোদিনীর অনিচ্ছা ছিল না, সে বঁটি এনে মাছ কুটতে বসল। ভবতারিণীও তার পাশে বসে মাছ কোটা দেখতে লাগল। নয়নতারা বিরাজমোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে উনান ধরাতে গেল।

দৃশ্যটা এক রকম ভালই লাগল শঙ্কিত শম্ভু শীলের। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি তাঁর নিজের ঘরটিতে গিয়ে জামা খুলে এক গ্লাস জল খেয়ে জোরে জোরে তাল-পাখার হাওয়া খেতে লাগলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে রাত্রি দশটা বেজে গেল। শম্ভু শীল পানটি মুখে দিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার বস্তির উপর গাঢ়ভাবে নেমে এসেছে। বস্তির রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের তেলের বাতিটা পাড়ার কোন্ দুষ্টু ছেলে কখন ইট মেরে ভেঙে দিয়েছে। অন্ধকার গলিটাতে শুধু দুটো নেড়ি-কুত্তা ছুটোছুটি করছে।

বাতাসে একটা ভাপসা গন্ধ। বস্তির কোন একটা ঘরের টিনের খোলা দরজাটা হাওয়ায় দুলে দুলে মাঝে মাঝে বিশ্রী শব্দ করছে। দিনের থেমে-যাওয়া কোলাহল রাত্রির আঁধারে যেন গড়ে তুলেছে একটা রহস্যের আভাস। বস্তির বুকে এখন চেপে বসেছে একটা দুঃস্বপ্ন। তাই শোনা যাচ্ছে এলোমেলো বাতাসের একটানা সুরে তার হঠাৎ-জাগা অদ্ভুত কাৎরানি।

শম্ভু শীল অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। তাঁর মনে পড়ল কত অতীতের কথা। অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে মিশিয়ে তিনি ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারবেন কি না সেটাও ভাবছিলেন তিনি।

রাত্রি বেড়ে চলছিল। বাড়ীটা যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি এবার ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন। তিন মেয়ের তিনখানা ঘরের দরজা বন্ধ। নয়নতারা গেল কোথায়? এবার এগিয়ে গেলেন তিনি ছোট মেয়ে ভবতারিণীর ঘরের দিকে। সে ঘরটার এক কোণে একটা ছোট্ট চিমনি মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল। সেই আলোতে পাল্লা-ভাঙা জানালা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, ভবতারিণী আর নয়নতারা পাশাপাশি তক্তপোষে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। একটি ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কতকটা শান্তমনে তিনি আবার নিজের ঘরটিতে ফিরে এলেন।

ক'দিন পরে।

হাতীবাগানের পিসী কি একটা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন এদের তিন বোনকে। নয়নতারা বাদ পড়েছে।

শম্ভু শীল প্রেসের কি একটা বিশেষ কাজে সকাল থেকেই বাড়ীছাড়া। বলে গেছেন, ফিরতে তাঁর দেরি হবে। নয়নতারা রেঁধেবেড়ে নিয়ে সদর দরজায় খিল দিয়ে একলাটি চুপ করে রাইবিনোদিনীর ঘরে তক্তাপোষে বসে রইল। কিছু ভাল লাগছিল না তার। যে কোন একটা বই পড়বার জন্যে সে রাইবিনোদিনীর ঘরের তাকে সাজানো কয়েকখানা বই দেখতে গেল। শম্ভু শীলের বইয়ের কারবার, তাই প্রত্যেক বোনের ঘরেই কিছু-না-কিছু বই। অবশ্য উঁচু ধরনের বই নয়, মজার গল্প ও উপন্যাস। এই সব বই তিন বোনে পড়ে

পড়ে সংসারের অনেক কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করে ফেলেছে বোধ হয়।

নয়নতারা আবিষ্কার করল রাইবিনোদিনীর বালিসের নীচে একখানা 'বিদ্যাসুন্দর'। পাতা উল্টে এখান-সেখান থেকে পড়ে নয়নতারা ভাবল: ছি, ছি, এ সব বই রাইবিনোদিনী পড়ে কি করে, তারপর তাকের উপর থেকে বই পাওয়া গেল,—"প্রেমপত্রলিখন প্রণালী," "প্রেমের হরতন," "সুরেন্দ্রবিনোদিনী," "বেগমী বেলা" প্রভৃতি নায়ক-নায়িকার প্রেম-সম্বন্ধীয় বই। নয়নতারা একটু উৎসুক হয়ে খুঁজতেই রাই-বিনোদিনীর তোষকের নিচে আবিষ্কার করল কয়েকখানি খাম—খামের উপরে একটা ছোট পাখার ছবি আঁকা, পাখীর মুখে একখানা চিঠি, নিচে হরফে লেখা—"যাও পাখী বল তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।" একটা খামে সদ্যলেখা একখানা চিঠিও দেখতে পেল নয়নতারা। একবার ভাবল, চিঠিখানা পড়বে কি পড়বে না। ঔৎসুক্য বেশি হওয়াতে সে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল—

প্রাণের বিনোদ,

তুমি আমাদের বাটীতে আসা ছাড়িয়া দিয়াছ কেন? মাঝে মাঝে বাবার নিকট পূর্বে ত আসিতে। তুমি ত জান, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমাদের পাশের বাটীর ব্রজমোহিনী দিদির ঠিকানায় তুমি আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলে তাহা আমি পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে ত একমাস পূর্বের কথা। সত্যই কি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইলে? বাবা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন। আমি সেই আশাতে আজিও বাঁচিয়া আছি। তুমি আমার সব। পত্রের উত্তর দিতে ভুলিও না। ব্রজমোহিনী দিদির ঠিকানাতেই পত্র দিবে। কদাচ আমাদের বাটির ঠিকানায় দিবে না। ইতি

একান্ত তোমারি সেবিকা
রাইবিনোদিনী

নয়নতারার নয়ন দু'টি এবার কপালে উঠ্‌ল। ব্যাপার ত সোজা নয়! গোপনে প্রেম! ছি ছি, এসব কি কাণ্ড!

রাইবিনোদিনীর ঘরে আরও বেশি কিছু আবিষ্কার করতে নয়নতারার সঙ্কোচবোধ হ'তে লাগল। সে বেরিয়ে এসে এবার মেজ মেয়ে বিরাজমোহিনীর ঘরে ঢুকল। একবার মনে মনে ভাবল, কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

এ ঘরখানিতেও তাকে বই সাজানো। বইগুলির নাম দেখে নয়নতারা বুঝতে পারল বিরাজমোহিনীও ঐ একই পথের যাত্রী। "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা", "সংসার চক্র", "সংসার শর্বরী", "হরিদাসীর গুপ্তকথা", "সরল কোকশাস্ত্র", "বনেদীঘরের কেচ্ছা"—এই ধরনের আরও বই। নয়নতারা ভাবল,—দেখি ওর তোষকের নিচে কোন চিঠি-পত্তর আছে কি না।

চিঠি পাওয়া গেল। সেই "যাও পাখী"-মার্কা খামে যত্ন করে লেখা চিঠি। কিছু কিছু বানান ভুলও আছে। নয়নতারা পড়ল—

হৃদয়েশ্বর বিনোদ,

তোমার পত্রখানি আমাদের পাড়ার গোপাল পণ্ডিতের স্ত্রীর নিকট হইতে পাইয়াছি। আমি তোমাকে আমার মনের কথা আর কি জানাইব? তুমি যে আমাকে কতখানি ভালবাস তাহা আমি জানি। শুনিতেছি বাবা তোমার সহিত দিদির বিবাহ দিবেন। আমি তাহা হইলে কি করিব জান? নিশ্চয়ই আফিং খাইয়া মরিব। দিদির সঙ্গে বিবাহে তুমি কিছুতেই মত দিবে না। তোমাকে না পাইলে আমি কোন্ প্রাণে বাঁচিয়া থাকিব? গোপাল পণ্ডিতের স্ত্রীর কাছে সত্বর আমার চিঠির উত্তর দিবে। দেখ কেউ যেন না জানতে পারে। তুমি আমার জীবন-সর্বস্ব। ইতি—

আমি তোমার—তোমার—তোমার
বিরাজমোহিনী।

নয়নতারা ত অবাক্। একই বিনোদকে তা হ'লে দু'বোনেই প্রেম নিবেদন করছে। ব্যাপার ত সোজা নয়!

ঔৎসুক্য বেড়ে গেল এবারে। দেখা যাক্ ছোট মেয়ে ভবতারিণী কোন্ পথে যাচ্ছে। নয়নতারা ঢুকল এবার ভবতারিণীর ঘরে।

তাকের উপর কতকগুলো বই এলোমেলো ভাবে রাখা। তার মধ্যে নয়নতারা আবিষ্কার করল—"আরব্য উপন্যাস", "পারস্য উপন্যাস", "বড় ঘরের গুপ্তকথা", "খুনের পরে খুন", "ভীষণ রক্তারক্তি", "নরনারীর প্রেমালাপ", "গোপালভাঁড়ের কৌতুক" প্রভৃতি।

বালিশের তলায় "যাও পাখী"-মার্কা খাম নেই বটে, কিন্তু রয়েছে একখানি গানের খাতা। যাত্রাদলের নানা গীতাভিনয় বই থেকে বেছে বেছে কতকগুলি গান লেখা। একখানি গানের নিচে ভবতারিণীর নিজের হাতে লেখা

—"ঠিক যেন আমার মনের কথা।" গানখানি পড়ল নয়নতারা—

"প্রেম যে পরম ধন,
এ জগতে সেই ধন্য পেয়েছে যে প্রণয়রতন ॥
প্রেম কি সহজ কথা, হৃদয়ে হৃদয় সমর্পণ ॥
অলি প্রেমপিপাসায়, জুড়াতে এ প্রেমজ্বালায়,
বলে দাও কোথা পাব প্রেমিক সুজন ॥
এ জনম বৃথা গেল, প্রেমিক যদি না এল,
কেমনে করিব শান্ত দুরন্ত যৌবন ॥
প্রেম যে পরম ধন ॥

এবার হাসি পায় নয়নতারার। তিনটি বোনই বেশ পেকে উঠেছে। মা-হারা মেয়েরা, বাপ বইয়ের কারবার নিয়ে ব্যস্ত, শাসন বা সাবধান করবার কেউ নেই। তা ছাড়া বাড়ীতে অনেক রকমের ভালমন্দ বই গাদা করা থাকে। তার মধ্যে থেকে কৌতূহলী হয়ে মনের মতন বই বেছে নেওয়া অতি সহজ। এই ভাবেই এদের দিনও কেটেছে, ভেতরে ভেতরে প্রেমও গজিয়েছে।

একবার নয়নতারা ভাবল, কর্তাকে বলে দিয়ে সাবধান করালে কেমন হয়? কিন্তু তাতে কি সুফল হবে? আরও হয়ত মেয়েরা বিগড়ে যাবে। বিশেষতঃ সৎমায়ের উপরে তাদের যেটুকু সদ্ভাব এখন জন্মেছে, সেটুকুও নষ্ট হবে। তার চেয়ে ওদের এখন থেকে একটু চোখে চোখে রাখা, যাতে আর বাড়াবাড়ি না হয়। ভবতারিণীর ঘর ভাল করে খুঁজেও তার কোন প্রেমপত্রের সন্ধান পেলে না নয়নতারা। বিনোদ বা আর কেউ এখানে নিরুদ্দেশ।

* * *

সন্ধ্যার ঠিক আগেই ফিরে এলেন শম্ভু শীল। নয়নতারাকে হাসিমুখে বললেন: আজ সারাটা দিন বুঝলে কি না, একলাটি তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না?

নয়নতারা মৃদু হেসে বলে: কষ্ট হবে কেন? তবে একলাটি থাকতে ভাল লাগে নি। বাড়ীটা যেন নিঝুম হয়ে গেছে।

কথাটা এবার নিজেই পাড়লেন শম্ভু শীল: এবার আর নিঝুম থাকবে না নতুন বৌ—বড় মেয়েটার বিয়ের কথা হচ্ছে, বুঝলে কি না, শোভাবাজারের অদ্বৈত বড়ালের ভাইপো বিনোদবিহারীর সঙ্গে। অদ্বৈত লোকটার খুব পয়সা, নিজের ছেলেপুলে নেই, ঐ ভাইপো বিনোদই বুঝলে কিনা, সব সম্পত্তি পাবে। অদ্বৈতর অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করে। ছোটবেলা থেকেই বুঝলে কি না আমি বিনোদকে দেখছি। সে এসেছেও ক'বার আমাদের বাড়ীতে। ছেলেটি রূপেগুণে সব দিক দিয়ে বুঝলে কি না ভাল। এখন মা জগদম্বার কৃপায় ওদের চার হাত এক করে দিতে পারি বুঝলে কি না, তবেই বুঝি একটা কাজের মত কাজ হ'ল।

নয়নতারা বলে: মেজমেয়েরও ঐ সঙ্গে একটা বর খুঁজে নাও না। ওরও ত বিয়ের বয়স হয়েছে।

—হয়েছে মানে? পেরিয়ে গেছে বল!

একটু ঝাঁঝের সঙ্গে কথাটা বলেন শম্ভু শীল, "আমি সমাজকে বুঝলে কি না, একটু চোখ রাঙিয়ে চলি, তাই এত বড় বড় মেয়ে বাড়ীতে রাখতে পেরেছি, নইলে—"

—আমি বলি এক সঙ্গেই বড় মেয়ে আর মেজমেয়ের বিয়ে দিলে কেমন হয়?—কথাটা একটু সাবধানে বলে নয়নতারা।

—পাত্র ত দুয়ারে এসে বসে নেই যে টেনে এনে বিয়ে দেব—বুঝলে কিনা, খুঁজতে হবে, নতুন বউ, খুঁজতে হবে। যাক, পরশুদিন অদ্বৈত বড়াল আসবেন আমার বড় মেয়েকে দেখতে আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝলে কি না, আশীর্বাদও করে যাবে। ক'জন আসবে তারা, সেটা জেনে নিয়ে খাবারদাবারের যোগাড় ত করতে হবে!"

নয়নতারা মৃদু হেসে বলে: সে সব ঠিক হয়ে যাবে'খন।

—তোমার খাটুনি বুঝলে কি না, একটু বাড়বে, কি বল? একটু হেসে কথাটা বলে যেন নয়নতারাকে আপ্যায়িত করতে চাইলেন শম্ভু শীল।

* * *

কথাটা ছড়িয়ে পড়ল, অদ্বৈত বড়ালের ভাইপো বিনোদের সঙ্গে বড় মেয়ে রাইবিনোদিনীর বিয়ে হবে।

অদ্বৈত বড়াল লোকটা একরোখা, একটু খিটখিটে স্বভাবের। তাই কোন কিছুতে অসন্তুষ্ট না হন তিনি, এইটেই শম্ভু শীলের একান্ত চেষ্টা। উদ্যোগ-আয়োজন ভালই করে রাখলেন শম্ভু শীল।

অদ্বৈত বড়ালের আসবার আগের দিন।

রাত প্রায় একটা। শম্ভু শীলের বাড়ীর কোথাও সাড়াশব্দ নেই। সমগ্র পল্লীটা যেন শিশুর মত নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশের এক কোণে চাঁদের ফালি। ঘোলাটে অন্ধকার। এলোমেলো বাতাসের মৃদু শব্দ। কেমন একটা মিশ্র গন্ধ।

বড় মেয়ে রাইবিনোদিনীর ঘরের দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। সে জেগেই ছিল, দরজার কাছে এসে ভিতর থেকে বলল: কে?

—আমি বিরাজ, দরজাটা একবার খুলবি দিদি ?

—খুলছি, এই বলে দরজা খুলে দেয় রাইবিনোদিনী।

বিরাজমোহিনী ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

—কেন রে ? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে রাই-বিনোদিনী।

—তোর সঙ্গে কথা আছে দিদি—এই বলে বিছানায় রাইবিনোদিনীর পাশে বসে বিরাজমোহিনী।

—আলোটা জ্বালব ?

—না, থাক।

—কি কথা রে ?

এবার হঠাৎ ফুঁপিয়ে চাপাকান্না কেঁদে ওঠে বিরাজ-মোহিনী। রাইবিনোদিনী তাকে বুকের কাছে টেনে নেয়।

—দিদি, আমি ম'লে তারপর তুই বিয়ে করিস।

রাইবিনোদিনী চুপ করে বসে থাকে। খোলা জানলা দিয়ে হঠাৎ এক ঝাপটা হাওয়া এসে আলনার কাপড়গুলো দুলিয়ে দিয়ে যায়। বাইরের মিশ্র গন্ধটা যেন নিবিড় হয়ে ওঠে।

এবার রাইবিনোদিনী ধীরে ধীরে বলে: আমি গোপাল পণ্ডিতের বউয়ের কাছে সব শুনেছি বোন। তোর কি একান্ত ইচ্ছে, তোর সঙ্গেই বিনোদের বিয়ে হয় ? সত্যি কথাটাই বল না।

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বিরাজমোহিনী। এবার রাইকমলিনী আঁচল দিয়ে তার মুখখানি মুছিয়ে দেয়, তারপর চুপ করে বসে থাকে।

কতক্ষণ কেটে যায়। বিরাজমোহিনী ডাকে—দিদি !

কোন উত্তর পায় না সে। আবার ডাকে—দিদি !

রাইবিনোদিনী বলে: তুই আমার ছোট। কিন্তু আগে এসব কথা আমাকে বলিস নি কেন ?

—এখন এর কোন উপায় কি নেই দিদি ?

রাইবিনোদিনী চুপ করে থাকে। হঠাৎ প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারে না। একটু পরে কি যেন ভেবে ম্লান হাসি হেসে ধীরে ধীরে বলে: উপায় আছে বৈ কি বোন্। তাই হবে রে—তাই হবে—তুই সুখী হ, এই আমি চাই।

—দিদি !

—কেন রে ?

—তোর কি হবে ?

আবার ম্লান হাসি হেসে ফেলে রাইবিনোদিনী। বলে: তোর অত ভাবনা কেন বল ত ? আমি বলছি, বিনোদের সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে।

—দিদি !

রাইবিনোদিনীর বুকে মুখ লুকিয়ে বিরাজমোহিনীর চোখের জল যেন থামতে চায় না। এমনি কেটে যায় কতক্ষণ।

—এখন নিজের ঘরে যা, রাত অনেক হয়েছে।

—দিদি ! কথা যেন আটকে যায় বিরাজমোহিনীর। তারপর হঠাৎ সে রাইবিনোদিনীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে, বলে: আমায় ক্ষমা করিস দিদি !

—তা ত করেছি বোন। এখন যা। আমাকে একটু নিরিবিলি থাকতে দে।

—কথা দিলি ত দিদি ? ঠিক ?

—দিলাম।

এবার হঠাৎ বিরাজমোহিনী নত হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে রাইবিনোদিনীর পায়ের ধুলো নেয়। রাই-বিনোদিনী অঙ্গুলিতে তার চিবুক স্পর্শ করে।

ধীরে ধীরে দরজা খুলে বিরাজমোহিনী বাইরে আসে।

* * *

আজ শোভাবাজারের অদ্বৈত বড়াল আসবেন রাইবিনোদিনীর সঙ্গে বিনোদের বিয়ের কথা পাকা করতে, সেই সঙ্গে আশীর্বাদটাও সেরে যাবেন তিনি, সময় দিয়েছেন সকাল ৯টায়।

শম্ভু শীল দোকানে যান নি। সকাল থেকেই বাজারহাট, কেনাকাটাতেই ব্যস্ত রইলেন তিনি। নয়নতারা মেয়েদের নিয়ে নানা ব্যবস্থা করতে লাগলেন। হাতীবাগান থেকে পিসীও এলেন।

নয়নতারা এ বাড়ীতে আসবার পর একটি দিনও পিসী আসেন নি এ বাড়ীতে। এখন বাধ্য হয়ে এসেছেন ভাইঝির বিয়ের তাগিদে। তিনি আসতেই নয়নতারা তাঁকে প্রণাম করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পিসী আড়চোখে নয়নতারাকে দেখে নিলেন, কোন কথা বললেন না, কোন আশীর্বাণীও নয়। শুধু ভবতারিণীর দিকে চেয়ে বললেন—বেশ সুখেই আছিস তোরা দেখছি !

ভবতারিণী একটু মুখফোঁড় মেয়ে, চট করে পিসীকে বললে: ভাল কেন থাকব না পিসী, মা ত আমাদের খুব ভালবাসে।

হাতমুখ নেড়ে পিসী বলেন: তা আর জানি নে, ঐ যে কথায় বলে, 'তোমায় আমায় ভালবাসা যেন মোছলমানের মুর্গী পোষা।' তা বেশ, মা বলে ডাকতে শিখেছিস, লজ্জারও মাথা খেয়েছিস, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হ'তে পারে!

নয়নতারা চোখের ইঙ্গিতে ভবতারিণীকে চুপ করে থাকতে বলে সেখান থেকে সরে গেল।

একটু পরেই রূপো-বাঁধানো হরিণের শিংয়ের ছড়ি-হাতে অদ্বৈত বড়াল এলেন জন-চারেক সহচর নিয়ে। হাতে গোটা চারেক রঙ-বেরঙের আংটি। শম্ভু শীল তটস্থ হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। শম্ভু শীলের ঘরের মেঝেতে একখানা গালিচা পাতা ছিল, তার উপরে গোটা চারেক গোল গোল কোল-বালিস। অদ্বৈত বড়াল বসতেই শম্ভু শীলের দোকানের চাকর রূপোর গড়গড়ায় রূপোর নল লাগিয়ে তাঁর পাশে রাখল। অদ্বৈত বড়ালের লম্বা ঝুল সার্টের উপর পাকানো চাদরের মালা, গলায় সোনার মোটা গার্ড-চেন। আধপাকা গোঁফের দুই প্রান্ত মোম মাখিয়ে সুঁচলো করা, মাথায় টেরি, জরিপাড় ধুতি, পায়ে পম্পসু। পকেট থেকে একটা সোনার চেন দেওয়া বড় গোলাকার ঘড়ি বার করে সময় দেখে অদ্বৈত বড়াল বললেন: ন'টার মধ্যেই সব কিছু শেষ করতে হবে শীলমশায়, নইলে বারবেলা পড়ে যাচ্ছে।

শম্ভু শীল বিনীতভাবে বললেন: সব ঠিক আছে, তবে, বুঝলে কি না, আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন। মুখ হাত পা ধুয়ে একটু, বুঝলে কি না, মিষ্টিমুখ করে নিন, তারপরে করণীয় সব কাজ ত হবেই।

হঠাৎ যেন চটে উঠ্‌লেন অদ্বৈত বড়াল। জেদী লোক তিনি, অধৈর্য হয়ে বললেন: আগে কাজ, তার পর অন্য কিছু। আপনি আপনার বড় মেয়েকে শীগ্‌গির আনবার ব্যবস্থা করুন শীলমশায়।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য—বলে শম্ভু শীল অন্দরে গেলেন।

বড় মেয়ে রাইবিনোদিনীকে সাজাবার ভার নিয়েছিল ভবতারিণী আর নয়নতারা। গোলাপী বেনারসী ও নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে, বড় খোঁপায় সোনার প্রজাপতি-ফুল এঁটে দিয়ে পায়ে চারগাছা করে সরু ডায়মণ্ডকাটা মল পরিয়ে দিয়ে রাইবিনোদিনীর দিকে চেয়ে নয়নতারা বললে: চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে।

কি একটা কাজে নয়নতারা একটু বাইরে যেতেই রাইবিনোদিনী বলে: বিরাজ কোথায় রে? তাকে ত দেখছি না।

ভবতারিণী বলে: তা বুঝি জান না বড়দি, আজ সকাল থেকে তার পেটের কি জানি কেন যন্ত্রণা হচ্ছে, চুপ করে নিজের ঘরে শুয়ে আছে। কারুর সঙ্গে কথা কইতে পারছে না। এঁরা চলে গেলেই বাবা হরিশ কোবরেজকে ডেকে আনবে।

রাইবিনোদিনী এবার ভবতারিণীকে বলে: আমাকে ভাল করে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজিয়ে দে না, ঠিক বিয়ের কনের মত!

ভবতারিণী হেসে ফেলে, বলে: বড়দির যেন তর সইছে না। আজকেই কনে সাজবার ইচ্ছে?

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। মৃদু হেসে ওঠে রাইবিনোদিনী—আর দেখ, বড় গোড়ের মালাটা গলায় পরিয়ে দে।

একটু আশ্চর্য হয় ভবতারিণী। দিদির যেন আজই সাত-তাড়াতাড়ি! বিয়ের সাজ যেন আজই চাই!

পায়ে আলতা পরিয়ে, হাতের চেটোতে আলতা মাখিয়ে, গালে ও ঠোঁটে আলতার ছোপ ধরিয়ে, ভবতারিণী রাইবিনোদিনীর মুখের সামনে মোটা কাঠের ফ্রেমে আঁটা আয়নাটা তুলে ধরে, বলে: দেখ না, ঠিক যেন কনেটি! দোব নাকি দি'দি এখনি কাজললতা হাতে?

—যাঃ, অত কাজ্‌লামি ভাল নয়।

ভবতারিণীকে কোন একটা অছিলায় সরিয়ে দিয়ে এবার রাইবিনোদিনী উঠে বিরাজমোহিনীর ঘরে যায়। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বলে: বিরাজ, ওঠ, দেখ্‌ না আমি কেমন আজকের মত কনে সেজেছি!

চোখ চেয়ে ঘরে আর কাউকে না দেখে বিরাজ গর্জে ওঠে: মিথ্যুক!

রাইবিনোদিনী বিরাজমোহিনীর পাশে বসে, বলে: হলেমই বা মিথ্যুক, একদিনের জন্যও ত কনে সাজতে পেয়েছি ভাই!

—তার মানে?—যেন ক্ষেপে ওঠে বিরাজমোহিনী।

—তার মানে অতি স্পষ্ট, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।

—তোর ও বিয়ে আমি ভাঙ্‌চি দাঁড়া! আমি আজই পাড়ার গোপাল পণ্ডিতের বৌকে দিয়ে আফিং আনিয়ে খাব। তখন দেখবি।

—তা থাস, হেসে ফেলে রাইবিনোদিনী।

—তোর কোনদিন ভাল হবে না বলছি, তুই কাল রাত্রে মিথ্যে কথা বলেছিলি, তোর নরকেও স্থান হবে না, আমার অপঘাত মৃত্যুর পাপ তোকে লাগবে, লাগবে, লাগবে—এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বিরাজমোহিনী।

—তা লাগলেই বা! আমি ও-সব ভাবি না। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, এইটুকুই জানি, তোর কথাতে কিচ্ছু হবে না, দেখে নিস।

—উঃ, আর সহ্য করতে পারছি না, বেরিয়ে যা দিদি, বেরিয়ে যা আমাকে একলা থাকতে দে, আমাকে একলা থাকতে দে। তোর আর মুখ দর্শন করতে চাই না। যা, দূর হ'।

বাইরে থেকে শম্ভু শীলের চাপা গলার স্বর শোনা যায়—রাই কোথায় রে? ওঁরা যে এখনি দেখতে চান।"

রাইবিনোদিনী ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে বাপের সামনে দাঁড়ায়। শম্ভু শীল একবার মাত্র মেয়ের দিকে চেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠেন, নাঃ, অপছন্দ করবার কিছু নেই।

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অদ্বৈত বড়ালের ঘরে যান। গালিচার সামনে একখানি পশমের ফুলতোলা আসন পাতা। সকলকে প্রণাম করে তার উপরে বসে রাইবিনোদিনী।

মেয়ে দেখে আনন্দিত হন অদ্বৈত বড়াল ও তাঁর সঙ্গীরা। শম্ভু শীলকে অদ্বৈত বড়াল বলেন: আগামী সপ্তাহেই আমি আমার ভাইপোর বিয়ে দিতে চাই শীলমশায়, বিলম্ব করতে চাই না। আচ্ছা, এস ত মা, আমার দিকে একটু সরে এস ত।

বোধ হয় কোন অলঙ্কার পরিয়ে দিতে চাইছিলেন অদ্বৈত বড়াল।

রাইবিনোদিনী নিশ্চল।

—শুনতে পাচ্ছ না মা? একটু সরে এস না আমার দিকে।

রাইবিনোদিনী তবুও নড়ে না।

এবার একটু বিরক্ত হয়ে ওঠেন অদ্বৈত বড়াল, আমাকে উঠে গিয়ে পরিয়ে দিতে হবে না কি?

রাইবিনোদিনী যেমন আসনে বসেছিল, তেমনি বসে রইল।

একজন সহচর চাপাগলায় টিপ্পনী কাটলেন—কালা নয় ত?

আর একজন বললেন: বোবাও ত হ'তে পারে।

অদ্বৈত বড়াল এবার চটে গেলেন। একটু রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করলেন: তোমার নাম কি? স্পষ্ট করে বল।

কথা কয় না রাইবিনোদিনী। শম্ভু শীল ত হতভম্ব।

অদ্বৈত বড়াল এবার শম্ভু শীলের দিকে রাগতভাবে চেয়ে বললেন: এসব কি কাণ্ড শীলমশাই? কালা ও বোবা মেয়েকে সাজিয়ে-গুছিয়ে চালাতে চান এই অদ্বৈত বড়ালের কাছে?

দারুণ উৎকণ্ঠায় হাত কচলাতে কচলাতে শম্ভু শীল নিবেদন জানান, না, না, কালাবোবা কেন হবে আমার মেয়ে? বুঝলে কি না, ওর এখন হঠাৎ মাথার ঠিক নেই বোধ হয়, তাই আপনার কথা—।

একজন সহচর বললেন: "ও বাব্বাঃ, আবার মাথাও বেঠিক!

অদ্বৈত বড়াল রেগে গিয়ে বললেন: ঠকাবার আর জায়গা পান নি শীলমশাই? শেষে এই রকম মেয়ে গছিয়ে এই ঝুনো অদ্বৈতকে ঠকাবার চেষ্টা?

কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে বললেন: কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি ঠকে ফিরে যাব না। আমি জেদী লোক। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, বিফল মনে যে বাড়ী ফিরে যাব, সেটি হচ্ছে না। আমি আপনার মেয়েকে বউ করব বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শী সকলকে বলেও এসেছি—আমি আমার কথা রাখবই রাখব। এই কালাবোবা মেয়ে ছাড়া আপনার আরও ত মেয়ে আছে. নিয়ে আসুন আপনার মেজ মেয়েকে, তাকেও একবার যাচাই করে নি।—যান, এখুনি যান, সময় বয়ে যাচ্ছে।

শম্ভুশীল বিনীতভাবে জানালেন: তাকে যে সাজানো হয় নি। বুঝলে কি না, তা ছাড়া সে এখন—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গর্জে উঠলেন অদ্বৈত বড়াল: সাজানো হয় নি, তাতে কি? যেমন অবস্থায় আছে, যেমন কাপড়টি পরনে আছে, ঠিক সেই অবস্থায় নিয়ে আসুন—সে ত আর কালাবোবা নয়—আমি আজ আশীর্বাদ করে যাবই—যাব। অপরের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সইতে পারব না! যান্ নিয়ে যান আপনার এই বোবাকালা মেয়েকে—আর নিয়ে আসুন আপনার মেজ মেয়েকে।

কিসে যে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলেন না শম্ভু শীল। তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মত রাইবিনোদিনীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তার পর আবার এগিয়ে গেলেন মেজমেয়ে বিরাজমোহিনীর ঘরের দিকে।

খবরটা মুহূর্তমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাড়ীতে। পিসী ত রাইবিনোদিনীকে গাল পাড়ছিলেন : হতচ্ছাড়ি! উনুনমুখী! পোড়াকপালী! মানসম্ভ্রম সব গেল! কি হয়েছিল তোর রে চোখ-খাকী?

রাইবিনোদিনী শুধু বললে : কি জানি পিসী, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়ে যেন বেহুঁস হয়েছিলাম।

—"নিজের বরাতটাই নষ্ট করে ফেললি?—গর্জাতে লাগলেন পিসী—আর কি তোর বিয়ে হবে? বড় বোনের বিয়ে হ'ল না, মেজ বোনের বিয়ে! শয়তান সমাজ শুধু ভাঙ্গতেই জানে, গড়তে জানে না।

মেজমেয়ে বিরাজমোহিনীকে আটপৌরে কাপড়পরা লজ্জাহীন অবস্থাতেই তাড়াতাড়ি আনতে হ'ল অদ্বৈত বড়ালদের সামনে। যা-কিছু প্রশ্ন করলেন তিনি, বিরাজমোহিনী সে সবের ঠিক ঠিক উত্তর দিল। মেয়ের রূপ মন্দ নয় দেখে অনেকটা নরম হয়ে অদ্বৈতবড়াল পকেট থেকে একটা সোনার সাতনরী হার বের করে বিরাজমোহিনীকে পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বাড়ীতে শাঁখ বেজে উঠল। শাঁখটা প্রথমেই বাজিয়েছিল রাইবিনোদিনী।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

অন্ধকার পৃথিবীর এই রহস্যময় রূপটা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিল রাইবিনোদিনী। আকাশ বুঝি ঠিক এই সময়েই নেমে আসে একবার পৃথিবীর বুকে, তাই যেন নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় তার। এক এক সময়ে অস্ফুট গোঙানিতে ভরে যায় মন্থর বাতাস, দুঃস্বপ্নে শিউরে ওঠে গাছের ঘুমন্ত পাতা, চমকে ডেকে ওঠে রাতজাগা পাখী। রাইবিনোদিনী ভাবে, আজ পৃথিবীর সব সৌন্দর্য যেন কদর্য হয়ে গেছে, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে আসল রূপটি তার। এ যেন আর এক পৃথিবী—এখানে কোথা থেকে একটা দুঃসহ বেদনার স্রোত এসে যেন সবকিছু ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। এই রাত্রি যেন কত অসীম, কত নিষ্ঠুর। এ পৃথিবী যেন তার আর আপনার নয়, নিরুদ্দেশ-যাত্রার খড়কুটোর মতই সে কোথায় যেন ভেসে চলেছে।

হঠাৎ আকাশের এক কোণে একটা উল্কা খসল। এবার হেসে ফেলল রাইবিনোদিনী। উল্কাটা যদি বেঁকে এসে তার মাথায় পড়ত তা হ'লে কি চমৎকারই না হ'ত! নাঃ, এ অস্বস্তি কি শেষ রাতটুকু জাগলেই যাবে? একটু ঘুমুবার চেষ্টা করা যাক।

রাইবিনোদিনী বিছানায় এসে বসল। হঠাৎ সে শুনতে পেল দরজায় মৃদু টোকার শব্দ।

কতকটা আন্দাজ করে, ধীরে ধীরে দরজা খুলতেই তার নজরে পড়ল বিরাজমোহিনী চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে।

—আয়, ভেতরে আয়।

—দিদি! চাপা কান্নায় যেন ফেটে পড়ে বিরাজমোহিনী।

—কেন রে? শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে রাইবিনোদিনী।

—এ তুই কি করলি দিদি?

—দিদির যা করা উচিত, তাই করেছি।

—তোর সারা জীবনটা যে নষ্ট হয়ে গেল!

—নষ্ট হয়ে গেল, এ কথা কে বলেছে তোকে? ফুল গাছ দেখেছিস ত তার একদিকের ডাল কেটে দিলে অন্যদিকেও আবার ডাল গজায়, তাতে ফুলও ধরে। তুই অত ভাবছিস্ কেন বল ত!

—এ তোর মিথ্যে মনবোঝানো কথা দিদি!

—না রে না। জীবনের ত অনেক দিক আছে, তারই একটা ধরে থাকব।

—দিদি!

—কি রে?

—তুই যদি কথা কয়ে তাদের বলিস যে, তুই বোবা ন'স, কালা ন'স, তা হ'লে কি তারা তোকে আবার নেয় না?

এবার স্নিগ্ধ হাসি হেসে বিরাজমোহিনীকে জড়িয়ে ধরে রাইবিনোদিনী, বলে : এই কথাটা আমাকে শেখাতে তুই রাতে না ঘুমিয়ে আমার কাছে এসেছিস? তা শিখে রাখলাম। তোর বিয়ের পরে বাসরঘরে না-হয় সকলকে জানিয়ে দোব আমি বোবা নই, কালা নই।

— দিদি!

—কি রে?

—তুই বিষ খেয়ে মরবি না বল। কথা দে।

—দূর, মরতে যাব কেন? এমন ত কত হয়, তা বলে মরতে যাব? তুই আমাকে হাসালি বিরাজ।

হঠাৎ বাইরে কার মৃদু পদশব্দ। দু'জনে চমকে ওঠে! কে যেন অন্ধকারে ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢোকে।

—কে? প্রশ্ন করে রাইবিনোদিনী।

—আমি মা।

তাড়াতাড়ি চিমনিটা জেলে রাইবিনোদিনী আর

বিরাজমোহিনী দু'জনে আশ্চর্য হয়ে বলে: তুমি যে এখানে এলে মা?

নয়নতারা বলে: ঘুম ত আসে নি, রাতের আঁধারে শুনলাম, কারা যেন ফিস্ ফিস্ করছে, ভাবলাম নিশ্চয়ই তোমরা দু'জন। তাই এলাম এখানে। বিরাজ যে তোমার ঘরে আসবে, এটা জানতাম।

—মা!

—কি বলবে বল।

—তুমি কি করে জানলে যে বিরাজ এখন আমার ঘরে এসেছে? নয়নতারা মৃদু হাসে, বলে: আমি ত তোমার পিসী নই, যে তোমাকে গালাগালি দিয়ে কর্তব্য শেষ করব? তোমাকে এক সঙ্গে সান্ত্বনা ও আশীর্বাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাই না যে মা। তাই এলাম।

রাইবিনোদিনী ও বিরাজমোহিনী দু'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

তিনজনে এবার বিছানায় বসে। কতক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। বাইরের রাতের অন্ধকার ক্রমশ: ফিকে হয়ে আসে। আকাশে দু'একটা চিল অশরীরী ছায়ার মত এখানে-ওখানে ঘুরপাক খায়। শীতল বাতাসে মাটির গন্ধ যেন উগ্র হয়ে ওঠে। মৃদু কলরব ভেসে আসে চিৎপুরের বড় রাস্তা থেকে। কারখানার লোকেরা এবার দল বেঁধে চলেছে রাস্তা দিয়ে। জাগছে—মহানগরী জাগছে। একটা বিরাট সরীসৃপ যেন গা-মোড়া দিয়ে হাই তুলে চোখ মেলছে, তার নখরে নখরে ঊষার মৃদু আলোর ঝলকানি। অন্ধকারের ছায়াপুরী থেকে ধীরে ধীরে যেন মুক্তিলাভ করছে পথঘাট, ঘর-বাড়ী, গাছপালা, আকাশদিগন্ত। জাদুকর যেন পর্দা সরিয়ে বলছে: অচেনার মধ্য থেকে আবার এনেছি চেনাকে, অজানার মধ্যে থেকে আবার এনেছি জানাকে। মহানগরীর জাগরণী রূপ দু'চোখ ভরে দেখে নাও।

নয়নতারা এবার উঠে দাঁড়ায়, রাইবিনোদিনীর ডান হাতখানি ধরে, বলে: আমার কাছে মন ত লুকোতে পার নি, তাই ধরা পড়ে গেলে! দুঃখের দেবতাকে বুঝি এমনি করেই পূজা দিতে হয় মা!

নয়নতারার চোখ ছল ছল করে ওঠে। দু'বোনে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নয়নতারার দিকে। নয়নতারা এবার নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিৎপুরের ও-অঞ্চলে কালীপুজোর খুব ধুম। বাগবাজারের মা কালী, গরাণহাটার মা কালী, শোভাবাজারের মা-কালী, নিমতলার মা-কালী, হাতীবাগানের মা-কালী ত আছেই, তার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর মা-কালী, ঠনঠনের মা-কালী ও সিমলেপাড়ার মা-কালীরও খুব জমজমাট পুজো হয়। ছাগবলির সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ভক্তের "মা" "মা" রব আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। মায়ের কৃপাক্ষেত্র দক্ষিণে কালীঘাট থেকে উত্তরে বরানগর, কাশীপুর, আলমবাজার, দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। বটতলার কাছে সিমলেপাড়ার কালী-পুজোয় মোষ-বলিও হয়। বাজির রকমারি কারসাজি দেখানোর ভার পড়ে পাড়ার মাতব্বরদের উপর। ছটাকে তুবড়ি থেকে একসেরী তুবড়ি পর্যন্ত দেখা যেত। গলায় রক্তজবার মালা ও লাল রংয়ের চেলী-পরা, কপালে রক্তচন্দনের ছাপ-দেওয়া পুরুত ঠাকুরেরা কালী-স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নান করেন।

ঢাকের প্রতিযোগিতাও কম নয়। ঢাকীরা দল বেঁধে প্রায় সারারাত ঢাক পিটুত। সারা উত্তর কোলকাতা জুড়ে হৈ-চৈ। ঘুম ত ভয়েই পালাত। শোনা যায় মধ্য কোলকাতার মাড়েদের বাড়ীর কালীপুজোর সময় হাজার ঢাকের বাদ্যিতে সাহেবেরা কানে আঙুল দিয়ে পাড়া ছেড়ে দূরে পালাতেন। রাণী রাসমণির উপর কালীপুজোর রাত্রি শুধু ঐ রকম হাজার ঢাক বাজাবার অনুমতি দিয়ে ফেলেছিলেন লাটসাহেব।

কালীপুজোয় তান্ত্রিকমতে মদ্য-মাংসের এলাহিকাণ্ড চলে চিৎপুরের ধনীদের বাড়ীতে। কালীপুজোর উপকরণই তান্ত্রিকমতে ঐ "কারণ"। অনেক পাড়ার ভদ্রলোকের ছেলেরা সেজেগুজে দল বেঁধে রামপ্রসাদী গান গাইতে গাইতে এ পাড়া-ও পাড়া ঘুরে বেড়ায়।

কালীপুজোর পরই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া "ভাই দ্বিতীয়ে", বা "ভাই-ফোঁটা।" ঐ দিনটা ভগ্নীপতির বাড়ীতে খুব জাঁক। রূপচাঁদপক্ষী ত গানই বেঁধে ফেললে—"শালা—পুজোর দিন এসেছে, বোনাই ভেবে সারা।" বড় লোকের বাড়ীর বড় কথা। বাবুর্চি আর বাঁকুড়ার রাঁধুনে বামুন মিলে দেশীবিদেশী খানা তৈরীর সে কি সমারোহ। ভাই ফোঁটার দিন 'শালা' চেনা যায় পথেঘাটে, যেমন জামাই ষষ্ঠীতে জামাই চেনা যায়। বটতলার পাশ দিয়ে আস্তাবলের ধার ঘেঁষে যে রাস্তাটা পুবদিকে গেছে সেটা হ'ল চিৎপুরের নামজাদা পল্লী সোনাগাছি। এখানকার অধিবাসিনীদেরও ছোটবড় আভিজাত্য আছে। শ্রেণীর নামও ভিন্ন ভিন্ন, রোক্কী, পিয়ারী,

ও আমেরী। রোজকী যেন দিন-মজুর, দিন আনে দিন খায়। পিয়ারী যেন বাঁধা আয়ের মধ্যে পিয়ারের ছাক-গেরস্থ। আর আমেরী হ'ল উঁচু পর্যায়ের অধিবাসিনী, মোহর ছাড়া কথা কয় না। নাচ, গান, ভব্যতা সবই তার প্রথম শ্রেণীর। বড়লোকেরা বিবেকরা আটপৌড়ে বউয়ের একঘেয়েমি থেকে দু'দণ্ডের জন্যে সরে এসে আমেরী রূপোজীবিনীদের কাছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, দুটো টপ্পা, দুটো ঠুংরী, দুটো গজল আর পালিশকরা প্রেমের বোলচাল শোনে। সন্ধ্যার পর আমেরীদের দরজায় ল্যাণ্ডো বগী ক্রহাম প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বড় লোকের বাগান-বাড়ীতেও ডাক পড়ে এদের।

সোনাগাছি গলিটা দুপুর বেলায় নিস্তব্ধ। ফেরিওলা ছাড়া ও পথে ও-সময়ে, বড় একটা কেউ যায় না। মাঝে মাঝে রূপোর ঘুন্টি গলায় দু'চারটে পশমী পোষা-কুকুর দরজার কাছে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ ডেকে ওঠে। সোনাগাছি গলিটা চলেছে কিছু সোজা, কিছু বাঁকা। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যেন পথিককে বাঁধতে চায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে গলিটা ঢুলে ঢুলে ঝিমুচ্ছে। যেন রাতজাগা-মুজরো-উলী একটু জিরিয়ে নিচ্ছে পরের আসরে গাইবার জন্যে। একতলা দোতালা বাড়ীগুলো ফিস্‌ফিসিয়ে বলছে—এখন দিনের আলোয় আমাদের রূপ দেখে যেন হেসো না বন্ধু, সাঁঝের পরে কত লোক, কত গাড়ি এসে দাঁড়াবে আমাদের সামনে—তখন যেন হিংসে ক'রো না। কত বেলফুলের মালা বিকুবে, কত গানের সুর উঠবে, কত নূপুর বাজবে,—কত ব্যথার পসরা ফুলের পসরা হবে। এই ত চিৎপুরের সেই সোনাগাছি!

বাড়ী-উলী। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন।

একদিন এরও যৌবন ছিল, রূপ ছিল, ভ্রমর ছিল।

বাড়ী-উলী বলে, দেখ ত ডালিম, দুপুরবেলায় দরজা ঠেলে কে?

ডালিম বলে: আর পারি নে বাপু! ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তুই যা কেয়া।

কেয়া বলে: আ মরণ! বুঝি সেই পোড়ারমুখো সরকার বুড়োটা! হাড় আমার জ্বালিয়ে খেলে!

শেষে ঘুঙুর গিয়ে দরজা খুলে দেয়, তারপর অবাক হয়ে বলে: ও মা, এ কে গো!

ছেলেটির বয়স বছর সতেরো-আঠারো, রং ফর্সা, একটু রোগা, মুখখানিতে কিশোরশ্রী ঢল-ঢল, কেমন লজ্জা-লজ্জা অপ্রতিভ ভাব।

বোধ হয় গলি ভুল করেছে।

ঘুঙুর বলে: কি চাও?

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলেও না, চলেও যায় না। দরজার পাশ থেকে একটু উঁকি মেরেই হেনা চেঁচিয়ে ওঠে: ওলো কেয়া, ও ডালিম, ও বকুল, ও থাকো, শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়—ঘুঙুরের কাণ্ড দেখবি আয়!

সিঁড়িতে অনেকগুলি মেয়ের পায়ের শব্দ, ছেলেটি কেমন যেন ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়।

তার মুখের দিকে চেয়ে ঘুঙুর একটু হেসে বলে: তুমি কে?

ছেলেটি আস্তে আস্তে বলে: আমি নিখিল।

ঘুঙুর হঠাৎ যেন চুপ করে যায়।

চার-পাঁচটি মেয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়, বলে: ও মাগো মা, তাড়িয়ে দে ঘুঙুর, তাড়িয়ে দে—পালক না গজাতেই আকাশে ওড়বার সাধ! তরুণীরা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

নিখিলের মুখখানা যেন কালো হয়ে যায়—সে তাড়াতাড়ি বলে: আমি যাই।

অপ্রস্তুত নিখিলের হাতখানি ধরে হঠাৎ সকলের সামনে দিয়ে ঘুঙুর সিঁড়িতে ওঠে।

তরুণীরা হেসে লুটোপুটি। বাড়ী-উলী হেঁকে বলে: আগে ওর পকেটে কি আছে দেখ ঘুঙুর, তারপর সেটা হাতিয়ে নিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে তাড়িয়ে দে।

ঘুঙুর সে কথায় কান দেয় না।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘুঙুর বলে: কোথায় থাক তুমি?

—সালকে।

—সালকে? প্রতিধ্বনি করে যেন ঘুঙুর। তারপর নিখিলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে: অতদূর থেকে এসেছ?

মুখখানি একটু নত করে নিখিল বলে: হাঁ।

—কি কর তুমি?

—বিদ্যাবতী স্কুলে পড়ি।

—এখানে তোমার কি দরকার, সত্যি ক'রে বল ত?

নিখিল চুপ করে থাকে, লজ্জায় তার ফর্সা মুখখানি একটু লাল হয়ে ওঠে।

ঘুঙুর বলে: তোমার দিদি আছে?

—আগে ছিল, এখন আর নেই।

—ওঃ, মারা গেছে বুঝি?

—না, সে অনেকদিন আগের কথা, দিদি আমার দিদিমার সঙ্গে অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে এসেছিল, দিদি কোন্ বড়লোকের বাড়ীর বৌয়ের পাল্কী-শুদ্ধ ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান দেখছিল, সে সময়ে ভিড়ের মধ্যে দিদি কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

ঘুঙুর চুপ করে কথাটা শোনে, তারপর ধীরে ধীরে বলে: তোমার দিদি আর ফিরে আসে নি?

—শুনেছিলাম এসেছিল দিদি ক'দিন পরে, মা জানতে পারে নি। কিন্তু জাত যাবার ভয়ে আমার জ্যেঠামশাই তাকে আর বাড়ী ঢুকতে দেয় নি। দিদি কাঁদতে কাঁদতে তারপর কোথায় যেন চলে গেল।

—কতদিন আগে বল ত? একটু যেন আশ্চর্য হয়েই ঘুঙুর কথাটা বলে।

—আমার বয়স তখন সাত কি আট, আর একটু বয়স হ'লে সব কথা মায়ের মুখ থেকে শুনেছিলাম।

—ও:। ঘুঙুর যেন আনমনা হয়ে যায়, তারপর বলে: আগে আর কোনদিন এরকম জায়গায় এসেছ?

নিখিল বলে: না।

—তবে আজ এলে কেন?

—পরেশ দা শিখিয়ে দিয়েছে।

—পরেশ দা কে?

—আমাদের পাড়ায় থাকে, খুব ভাল হারমোনিয়ম বাজাতে পারে।

—তুমি ও-সব বদ্‌লোকের সঙ্গে মেশ কেন? বিরক্ত হয়েই যেন ঘুঙুর কথাটা বলে।

নিখিল চুপ করে থাকে।

ঘুঙুর বলে: এখানে না এলে ভালই করতে।

নিখিলের ফর্সা কিশোর মুখখানি আবার লজ্জায় রাঙা হয়।

ঘুঙুর এবার তার হাত দু'টি ধরে বলে: তোমার দিদির নাম কি ছিল বল ত?

—পারুল।

ঘুঙুর এবার একদৃষ্টে নিখিলের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বলে: দিদিকে মনে আছে তোমার?

—ভাল মনে নেই, আমি তখন ছোট ছিলাম কিনা।

খাটের পাশে একটা ছোট টেবিলে একটা হুইস্কির বোতল ছিল, নিখিল সেদিকে চেয়ে হঠাৎ বলে ওঠে: ওটাতে কি আছে?

ঘুঙুর তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বোতলটা আলমারিতে তুলে রেখে বলে: ওষুধ।

—তোমার অসুখ? নিখিল যেন একটু শঙ্কিত হয়েই কথাটা বলে।

—হ'লেই বা আমার অসুখ! একটু হেসে কথাটা বলে ঘুঙুর। তারপর নিখিলের আর একটু কাছ ঘেঁষে বসে বলে: অত ঘামছ কেন? হাওয়া করব?

নিখিল বলে: না।

—কিছু খাবার খাও, স্কুল থেকেই ত আস্‌ছ।

—আজ যে স্কুলের ছুটি, ভাই-ফোঁটা কি না।

—ও:—ঘুঙুরের চোখে যেন জল আসে। তার পর উঠে গিয়ে দরজার পাশ থেকে ডাকে: বিন্দি, ও বিন্দি—

বিন্দি ঝি এসে দাঁড়ায়। মাঝবয়সী মোটাসোটা গড়ন, চিবুকে ও ভ্রূ'র মাঝখানে উল্কির দাগ। নিখিলের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসি হাসে।

ঘুঙুর নিজের বাক্স থেকে একটি টাকা বার করে তার হাতে দেয়, বলে: মোড়ের দোকান থেকে ভাল খাবার আনগে।

বিন্দি অবাক হয়ে একবার ঘুঙুর, একবার নিখিলের দিকে চায়। তারপর ঠোঁট উল্‌টে একটু মৃদু হেসে চলে যায়।

নিখিলের মুখখানি যেন শুকিয়ে যায়, গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে।

ঘুঙুর বলে: আহা, কখন্ দুটো ভাত খেয়ে বেরিয়েছ।

নিখিল যেন কেমনতর হয়ে যায়। সে চুপ করে বসে থাকে, সর্বাঙ্গ ঘেমে ওঠে।

বিন্দি খাবার নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

আলমারি থেকে হাতে-বোনা পশমের আসন বার ক'রে মেঝেয় পাতে ঘুঙুর। তারপর পাথরের প্লেটে খাবার সাজিয়ে বলে: বসে পড়।

নিখিল নড়ে না।

ঘুঙুর এবার তার হাত দু'টি চেপে ধরে, হেসে বলে: খাও লক্ষীটি, আজ খেতে হয়।

নিখিল তবুও চুপ করে বসে থাকে।

ঘুঙুর এবার নিখিলের খুব কাছ ঘেঁষে বসে, বলে: কিছু মুখে দাও, নইলে ছাড়ব না।

নিখিল অগত্যা খেতে বসে।

—সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে থাক, কেমন? ঘুঙুর স্নিগ্ধ স্বরে কথাটা বলে।

—না, আমি এখন বাড়ী যাব।

ঘুঙুর বলে : আমি শুনতে পারি, সব কথা শুনে বলে দিতে পারি, বুঝলে ? এই ধর, তোমাদের বাড়ীর কথা, যেমন—

নিখিলের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, সে একটু হেসে বলে : তুমি জ্যোতিষী না কি ?

ঘুঙুরও হেসে ফেলে, বলে : এখানে জ্যোতিষ চর্চ্চাও হয় যে।

নিখিল এবার উৎসাহিত হয়ে বলে : আচ্ছা বল ত, আমাদের বাড়ীর সামনে কি আছে ?

—নিমগাছ।

নিখিল অবাক হয়ে যায়। সত্যিই ত তাই।—আচ্ছা, আমাদের বাড়ীর উত্তর দিকে কি আছে বল ত ?

—দুটো নারকোল গাছ।

নিখিলের বিস্ময় বেড়ে ওঠে, বলে : আমাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই ডানদিকে কি আছে বল ত ?

—পাতকুয়ো।

নিখিলের মুখে যেন কথা নেই, আশ্চর্য জ্যোতিষী ত !

নিখিল এবার বলে : আচ্ছা বলত, আমাদের বাড়ীর কুকুরের নাম কি ?

—টেবি।

এবার নিখিলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, বলে : না, হয় নি। ওর নাম রুবি। টেবিটা আজ ক'বছর হ'ল মরে গেছে, তারি বাচ্চা এ।

ঘুঙুর বলে : জ্যোতিষীদেরও অমন একটু-আধটু ভুল হয়।

নিখিল বলে : আচ্ছা বল ত—

একটি ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘুঙুর বলে : থাক্‌গে আবার কোথাও হয়ত ভুল হবে !

নিখিল ঘরের কোনে-থাকা হারমোনিয়মটা দেখছিল।

ঘুঙুর বলে : তুমি গান গাইতে পার ?

নিখিলের এবার একটু সাহস হয়, বলে : ভাল পারি না, তবে গত বছর সরস্বতী পুজোয় গেয়েছিলাম।

ঘুঙুর এবার নিখিলের হাতখানি চেপে ধরে, বলে : —বেশ ত, গাও না।

—আমি হারমোনিয়ম বাজাতে জানি না, শুধু গলায় গাইব ?

—বেশ ত, আমি হারমোনিয়ম বাজাব।—এবার ঘুঙুর হারমোনিয়মটা তার কোলের কাছে টেনে নেয়।

নিখিল গান ধরে :

"বাগ্‌দেবি, বীণাপাণি, শ্রীচরণে দাও স্থান,
চাহ মা করুণাচোখে কর মা আশিস্ দান—"

হঠাৎ জানলার পাশে কারা খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে : এখানে ও আবার কি রকম গান হচ্ছে ঘুঙুর ?

নিখিল থেমে যায়। ঘুঙুর রেগে উঠে গিয়ে বলে : তোরা এখানে আড়ি পাতছিস না কি ? চলে যা সব—

তার পর নিখিলের দিকে চেয়ে বলে : তুমি গাও, ওদের কথা শুনো না—

নিখিল কিন্তু আর গায় না। তাদের স্কুলের হেড পণ্ডিতের লেখা গান ও যে ! মনে অভিমানও হয়।

ঘুঙুর বলে : তবে আমার গানই একটা শোন, ঘুঙুর গায়—

> কি করে রাখব তোমায়
> আমার বুকের আড়ালে,
> চাঁদ হয়ে হায় হৃদ্-আকাশে
> মনের জোয়ার বাড়ালে !
> চোখের জলের মালাখানি
> নেবে না হায়, তাও জানি,
> কোন্ ভুলে আজ সে মালা হায়
> আমার গলায় পরালে !

নিখিল চুপ করে শোনে, অপূর্ব আনন্দে তার সারা অন্তর ভরে যায়। সে বলে : তোমার গলা ত খুব ভাল, আমার মেজো বৌদির চেয়েও ভাল।

ঘুঙুর হেসে বলে : তোমার মেজো বৌদি বুঝি খুব ভাল গাইতে পারে ?

নিখিল বলে : তোমার মত এত ভাল নয় !

হঠাৎ কোথায় টং টং করে পাঁচটা বাজে। নিখিল বলে : এবার আমি যাই।

—আর একটু থাক না।

ঘুঙুর বিন্দি ঝিকে ডেকে বলে : দেখ্ বিন্দি, রাম-অওতারের পানের দোকান থেকে খানিকটা গোলা খয়ের আন্ত।

বিন্দি একটু আশ্চর্য হয়ে চলে যায়।

নিখিলের দিকে চেয়ে ঘুঙুর বলে : আমাকে কি তোমার ভাল লাগল ?

—খুব।

—তোমার পারুল দিদি তোমাকে খুব ভালবাসত, নয় ?

—হাঁ, তখন আমি ছোট ছিলাম কি না।

—আর এখন হলে ?

—নিশ্চয়ই খুব ভালবাসত।

বিন্দি একটা ছোট্ট কলাপাতার টুকরায় একটু গোলা খয়ের নিয়ে ঘরে ঢোকে। টেবিলের উপর সেটা রেখে সে চলে যায়।

ঘুঙুর নিজের ডান হাতের মাঝ আঙুলে খয়ের মাখিয়ে বলে: সরে এস।

নিখিল আশ্চর্য হয়ে বলে: কেন?

—আজ তোমাকে জয়টীকা পরাব।

—কেন?

—আজ যে দিতে হয়। ছলছল চোখে ঘুঙুর বলে।

নিখিল ভাবে, এখানে এলে বুঝি ফোঁটা পরতে হয়। এই বুঝি এখানকার নিয়ম। কৈ পরেশ দা ত সে কথা বলে নি।

নিখিলের মাথাটি বুকের কাছে টেনে এনে ঘুঙুর পরম যত্নে ফোঁটা পরিয়ে দেয়, বলে: যমের দুয়ারে কাঁটা দিলাম, কি বল?

নিখিল অবাক হয়ে ঘুঙুরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ঘুঙুর বলে: ফোঁটা ত পরলে, এখন আমার একটা কথা রাখবে?

—কি?

এবার ঘুঙুর নিখিলের হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়, বলে: আবার আমার কাছে আসবে ত?

নিখিল চুপ করে থাকে। ঘুঙুরের চোখ দু'টি জলে ভরে ওঠে। জানলা দিয়ে পশ্চিমের আকাশের খানিকটা দেখা যায়। মেঘের বুকে সোনার রং। উড়ন্ত পাখী। ঝিরঝিরে বাতাস। মায়াবী অতীতের স্বপ্ন। রাস্তায় ফেরিওলার ডাক—চাই বেলফুল!

হঠাৎ ঘুঙুর যেন চমকে ওঠে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমশঃ নিচে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়ছে। সেদিকে চেয়ে থেকে কি ভাবে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ নিখিলকে বলে: তোমাকে আমার কাছে যে আবার আসতে বলেছি, সে-কথা ঠিক নয়। তুমি আর কখনও এ-সব জায়গায় এস না, আমার কাছেও নয়।

নিখিল ঘুঙুরের মুখের দিকে চেয়ে বলে: আচ্ছা।

—কথা রাখবে ত?

—রাখব।

নিখিলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ঘুঙুর বলে: আমাকে ভুলে যাবে না?

—না। এবার তবে যাই।

—এখনি চলে যাবে? আর একটু থাকো না।

নিখিল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ঘুঙুরের দিকে। হঠাৎ ঘুঙুর উঠে পড়ে, বলে: না, না, আর থাকতে হবে না। এস আমার সঙ্গে।

পরম যত্নে নিখিলের হাতটি ধরে ঘুঙুর নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

বারান্দা থেকে কেয়া ও ডালিম হেসে ওঠে। বাড়ীউলী হেঁকে বলে: ক'টাকা পেলি ঘুঙুর?

নিখিল থমকে দাঁড়ায়। পকেট থেকে টাকা বার করে ঘুঙুরের হাতে দিতে যায়, বলে: ভুলেই গিয়েছিলাম, পরেশ দা বলেছিল টাকা দিতে হয়।

ঘুঙুর হাত সরিয়ে নেয়, বলে: কোনদিন আর পরেশ দা'র সঙ্গে মিশ না। বুঝলে?

—আচ্ছা। কিন্তু তুমি টাকা নেবে না কেন? সত্যি এ তুমি নেবে না?

—না, তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম। তুমি জলখাবার খেও। আমি ত তোমার কাছে টাকা চাই নি।

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ঘুঙুর এবার পরম আগ্রহে নিখিলের হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। নিখিলকে শেষ দেখা দেখে।

হাত ছাড়িয়ে নিখিল ধীরে ধীরে চলে যায়।

ঘুঙুর ফিরে আসতেই ডালিম বলে, ও কি লো, চোখে জল কেন?

ঘুঙুর কিছু না বলেই নিজের ঘরটিতে চলে যায়। তারপর বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। কেয়া এসে ঘরে ঢোকে।

চট্ করে চোখের জল বাঁ হাত দিয়ে মুছে ঘুঙুর হারমোনিয়ম নিয়ে বসে, বলে: আয় না কেয়া, তোর সেই নতুন গানটা শিখে নি—

হঠাৎ মেয়েগুলো হেসে লুটোপুটি খায়। ঘুঙুরও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার এবার বেশ ছড়িয়ে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

নিত্যকৃষ্ণ বসু স্মরণে

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী

সুপরিচিত "সাহিত্য" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত "সাহিত্যসেবকের ডায়েরী" একদা বাংলা দেশের সাহিত্য-রসিক সম্প্রদায়কে গভীর ভাবে আনন্দ দিতে সমর্থ হ'লেও ডায়েরী-লেখক নিত্যকৃষ্ণ বসুর (১৮৬৫-১৯০০) নাম সাহিত্যজগতে বর্ত্তমানে বিলুপ্তির পথে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই থেকে বর্ত্তমান খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধানও অবশ্য একটি কারণ। পূর্ব্বোক্ত তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরের মাসে সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল) সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মন্তব্য করেছেন—"তাঁহার পবিত্র চরিত্রগৌরব, উদার সমবেদনা ও গভীর সখ্যপ্রেম এ জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। প্রতিভাশালী কবি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প হইলেও বঙ্গসাহিত্যে বরণীয়।" তিনি কবিকে "দুঃখের কবি" বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে, তাঁর মাত্র তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে একটি একাঙ্ক গদ্য-নাটক (মনোড্রামা) এবং একটি গল্প-গ্রন্থ! সুতরাং সাহিত্য-রসিক প্রবন্ধকার, দুঃখবাদী কবি, গল্পলেখক এবং একাঙ্ক নাট্যজাতীয় রচনাকার—সর্ব্বক্ষেত্রেই নিত্যকৃষ্ণ বসুর পদচারণা আছে। তবে তিনি পাঠক-হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখবার বিনিময়ে যে মূল্য দিতে সমর্থ এবং যে মূল্য গ্রহণে পাঠকসমাজের আপত্তি নেই—তা তাঁর কবিত্বের ও প্রবন্ধকারত্বের মূল্য।

নিত্যকৃষ্ণ বসুর জীবনীর উপাদান পাওয়া যায় না। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধারকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, এফ.এ. পাশের পর থেকে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল অধোগতিপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এর অন্য কোন রকম অর্থ নেই। কারণ ২৪শে শ্রাবণ (১৩০১)-এর ডায়েরীতে তিনি বলেছেন—"সেই সময় হইতে কত ঝড় এই মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কত সময়ে এই প্রয়োজন-শূন্য জীবনের বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু কবিতা আমাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে বিষাদের জলদরাশি অপসারিত করিয়া তাহার প্রশান্ত সান্ত্বনাময় সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি হৃদয়গুহায় প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছে। আমি তাহারই স্বর্গীয় আশ্বাসে এই দুর্ভর জীবনকে এতদূর টানিয়া আনিতে পারিয়াছি।" নিত্যকৃষ্ণের এই উক্তি থেকে জানা যায় এ তাঁর পাঠ্য বিষয়ে অনীহা নয়, নিয়তির অমোঘ বিধানের ক্রীড়নক হয়ে তাঁর স্বপ্রকৃতির মধ্যে ফিরে আসতে না পারারই ফল। এফ-এ পরীক্ষার পূর্ব্ব থেকেই তাঁর সাহিত্য-রসিক মন উচ্ছ্বসিত। "কি শুভক্ষণেই ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Excursion কাব্যের প্রথম সর্গ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল! আমার প্রাণের সেই পুরাতন অনাদৃত উৎস নব ভাবে নব গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।" কবি তখন থেকেই ইংরেজী কবিদের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্ত্তীকালে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্পও সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ-জনিত। তিনি ২৬শে শ্রাবণের (১৩০১ সাল) ডায়েরীতে লিখেছেন—"Wordsworth, Shelley, Keats এবং Coleridge আমার সাহিত্য-জীবনের আদিগুরু।" কারণ তাঁরা রোমান্টিক। রোমান্টিক কবিরাই কবিকে আকর্ষণ করেছেন তীব্রভাবে। তাই শেক্সপীয়রের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন—"মহাকবি সেক্সপীয়র সকল প্রথারই সমাদর করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে সকল স্থলে Romantic পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার সেইগুলিই বেশি ভাল লাগিত।" এই রোমান্টিকতার প্রতি প্রীতিবশেই বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীকেও কবির ভাল লেগেছে। বিহারী-লালের "সারদামঙ্গল" কাব্যগ্রন্থ ক্রয়ের ঘটনা তাঁর জীবনে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ক্রয়ের ঘটনা!

কবির "মায়াবিনী" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে। "মায়াবিনী" ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের প্রভাবসঞ্জাত। ১২৯৩ সালের 'নব্যভারত' পত্রিকায় চৈত্র সংখ্যায় এই কাব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"আমরা স্বর্গচ্যুত; সংসার আমাদের বিদেশ। এখানে থাকিয়া সংসারে ডুবিয়া আমরা প্রকৃতিরাজ্যের কথা বিস্মৃত হই। এবং শোভাময় প্রকৃতির পূজা করিলে, অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত থাকে; ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই ভাব লইয়া মায়াবিনী লিখিত। লেখা বেশ পরিপাটী।"

কবি নিত্যকৃষ্ণের কবিতায় সমসাময়িক কবিদের প্রথানুসারিতা যাই থাক না কেন, মিষ্টত্ব তাঁর কবিতাকে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের কবিতার ভিড়ে পৃথক মূল্য

দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "সাহিত্য" পত্রিকায় (পৌষ, ১৩০৩) প্রকাশিত "প্রকৃতির পূর্ব্বরাগ" কবিতাটি থেকে উদ্ধৃত করি।—

"কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনা-রাশি!
কার আশে রয়েছি বাঁচিয়া!
নীরব মায়ের কোলে সুখের শৈশব-হাসি
কোথা সেই হাসিবে আসিয়া
কেমন শিরীষ-সম কোমল মু'খানি তার!
কেমন সে নয়ন-কমল!
আগাগুলি বাঁকা-বাঁকা চিকণ কেশের ভার;
ওষ্ঠ দু'টি রক্তিম তরল!"

নিত্যকৃষ্ণের গদ্য পদ্য বিভিন্ন জাতীয় রচনা "সাহিত্য", "জন্মভূমি", "নব্যভারত" ইত্যাদি মাসিক পৃষ্ঠায় মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে! গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পূর্ব্বে উল্লিখিত অন্য দু'টি রচনার একটির নাম "প্রেমের পরীক্ষা"। এর প্রকাশ কাল ১২৯৯ সাল। বিজ্ঞাপনে নিত্যকৃষ্ণ বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধিধারী একজন যুবক সুহৃদ গ্রন্থকারের নিকট নিজ-জীবনের যে রহস্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র মনোড্রামা বিরচিত হইল।" নিত্যকৃষ্ণের অন্য গ্রন্থটির নাম "ভবানী"। এটি একটি গল্পগ্রন্থ। প্রকাশ কাল ১৩২৬ সাল। গল্পটি প্রথমে "সাহিত্য" পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। তবে শেষোক্ত গ্রন্থ দু'টি তাঁর খ্যাতিতে তেমন সহায়তা করে নি।

কবি তাঁর "উদ্দামসঙ্গীত" কবিতায় (সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩০৪) এক স্থানে বলেছেন—

"অতিশয়
শ্রান্তিভরে আজি মোর উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
চাহে অবসর, চাহে সাঙ্গ করিবারে
এ সংগ্রাম, দুরাশার দুষ্ট-পারাবারে
জীর্ণ তরী বাহি নিত্য উত্থান-পতন!"

তাঁর শ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় অকালে অবসর গ্রহণ করেছে। সমাজপতির লেখনী বেদনার্তভাবে প্রকাশ করেছে, "দুঃখের কবি তাঁহার চিরাভীষ্ট শান্তিলোকে নিরবৃত্তি লাভ করুন, সন্ধুজনের ইহাই আন্তরিক কামনা।"

সমাজপতির কামনা পূর্ণ হোক! কিন্তু পাঠক-সমাজের কি এই কবি-সাহিত্যিকের কাছে ঋণ স্বীকারের দায়িত্ব নেই?

কিছুদিন হইতে এরূপ দু'একটা কথা শোনা যাইতেছে, যে, বাংলা দেশের অমুক লেখকের আগে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ও গণিকারা ভারতীয় বা বঙ্গীয় সাহিত্যে স্থান পায় নাই। এরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। আমরা সাহিত্যের বিস্তৃত জ্ঞানের দাবী করিতে পারি না, কিন্তু ঐরূপ মন্তব্যের বিপরীত দু-একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের নায়িকা বসন্ত-সেনা গণিকা ছিলেন। কবি কঙ্কন মকুন্দরাম প্রণীত 'চণ্ডীকাব্যে' কালকেতু, ফুল্লরা, খুল্লনা, প্রভৃতি অভিজাত বা 'ভদ্র' শ্রেণীর লোক ছিলেন না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে নিম্নশ্রেণীর পুরুষ ও নারী আছে। তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে নিম্নশ্রেণীর অনেক পুরুষ, নারী এবং বারবিলাসিনীও আছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকে নিম্নশ্রেণীর লোক আছে। 'সধবার একাদশী'তে অধিকন্তু গণিকা আছে। তাঁহার অন্য নাটকগুলিও এইসব দিক দিয়ে বিবেচ্য।

'গণসাহিত্য', 'প্রগতি সাহিত্য', ইত্যাদি নামে অভিহিত সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল তথ্যের দিক দিয়ে দু একটা কথা বলিলাম।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৫

"ধিক্কার"

সমর বসু

রজতকে ধাক্কা দিয়েই লোকটা এগিয়ে গেল। রজত বেশ বিরক্ত বোধ করল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। কেননা লোকটা ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। মুখটাকে কাঁচুমাচু ক'রে রজতের দিকে একবার তাকিয়ে, সামনের 'লাইটপোষ্টের' গায়ে জড়ানো 'আগুন-দড়িটা' মুখের কাছে টেনে নিয়ে লোকটা একটা বিড়ি ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রজতের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। ভাবখানা, কিছু যেন বলতে চায় রজতকে। ধাক্কা দেওয়ার দরুন হয়ত ক্ষমা চেয়ে নিতে চায়।

ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে, রজত রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেননা বিড়ির গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না। লোকটা একটু এগিয়ে গেলে তবে রজত চলা সুরু করবে। পাশাপাশি ওর সঙ্গে হাঁটা যাবে না। এক সময় ও নিশ্চয়ই কথা বলবে, এবং সেই সঙ্গে খানিকটা বিশ্রী ধোঁয়া আর দুর্গন্ধ এসে রজতের নাক-মুখ ভরিয়ে দেবে। রজত তা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। অথচ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একথা তাকে বলা যাবে না যে, বিড়িটা দয়া করে নিবিয়ে ফেলুন, ওর গন্ধ আমার সহ্য হয় না। আর বললেও সে-কথায় ও কানই দেবে না। ট্রেন-পথে যেতে যেতে রজত লক্ষ্য করেছে, "Should other passengers object please do not smoke"—কথাগুলো কত অর্থহীন। সুতরাং রজত কিছুতেই ওকে অনুরোধ করতে পারবে না। তার চেয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। লোকটা এগিয়ে গেলে তবে আবার চলা সুরু করবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝোলানো আগুন-দড়িটাকে দেখতে লাগল রজত। খেয়ালই রইল না যে, সেই লোকটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রজত এক মনে দেখতে লাগল, দড়িটার শেষ প্রান্তে আগুন জ্বলছে। চারপাশটা কালো মাঝখানটা একটুকরো লাল মাণিকের মত ধক ধক করছে। একটু একটু ক'রে পুড়ছে, বাতাসের দোলায় কিংবা লোকেদের নাড়াচাড়ায় নিবে যাচ্ছে না। ধুঁকতে ধুঁকতে ঠিক জ্বলছে।

রজত সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে দেখতে লাগল, কত লোক এল—বিড়ি ধরাল, সিগারেট ধরাল, ধরিয়ে চলে গেল। সকলেই জানে দড়িটা ঠিক ঐখানেই ঝোলানো আছে। আর জানে দড়িটার মুখে আগুন আছে। সেই আগুন ওদের ক্লান্তি দূর করবে, চলার শক্তি জাগাবে, ওদের নিবে-যাওয়া চেতনাকে আবার প্রজ্বলিত করবে। দড়িটার কাছে ওরা সবাই এক। ওদের প্রয়োজনেই দড়িটা। দড়িটার প্রয়োজনে ওরা কেউ নয়।

—দড়ির আবার প্রয়োজন আছে না কি?—নিজের প্রশ্নেই নিজে চমকে উঠল রজত। কিন্তু পরক্ষণেই স্থির হ'ল, কিছু বাঁধবার জন্যেই দড়ির জন্ম। কিন্তু ঐ দড়িটা কি কাউকে বাঁধতে পারছে! ঐ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কতদিন ধ'রে ও নিজেই বাঁধা পড়ে আছে। আরও কতদিন থাকবে কে জানে!

কিন্তু একদিন ত ও শেষ হয়ে যাবে। পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওর পুড়ন্ত লতানে শরীরটা। তখন ঐ বিড়ি-মুখো মানুষগুলো কি করবে। ঐ ল্যাম্পপোষ্টটার কাছে এসে দড়িটাকে দেখতে না পেয়ে মনের দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়বে! না রাগে অস্থির হয়ে থুঃ থুঃ ক'রে বিড়িটাই ফেলে দেবে মুখ থেকে!

বয়ে গেছে ওদের চুল ছিঁড়তে, বিড়ি ফেলতে। এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়াবে কি না সন্দেহ। কোথাও আর একটা ঐ-রকম দড়ি ঝুলছে কি না, তাই খুঁজতে খুঁজতে ওরা আরও এগিয়ে যাবে। একবার পিছন ফিরে তাকাবেও না। দড়িটাকে ওরা কেউ মনে রাখে না কি!

মনে রাখত, যদি কোনও দিন কোনও অঘটন ঘটত। অর্থাৎ যদি কোনও দিন ওদের জামার হাতাটাকে, কিংবা ধুতির প্রান্তভাগকে, ঐ দড়িটা ক্ষুব্ধ আক্রোশে পুড়িয়ে দিতে পারত, তা হ'লে ওরা নিশ্চয়ই দড়িটাকে মনে রাখত। ভুলতে পারত না। যতদিন পোড়াটা থাকত অন্তত ততদিন। তার পরেও হয়ত অনেক দিন।

কিন্তু দড়িটা তা করে না। ও শুধু নীরবে পুড়তে জানে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে জানে না। সব কিছু পুড়িয়ে দিতে জানে না। ওর যে দাহিকা শক্তি আছে, এ-কথাও যেন ও ভুলে গেছে। নিজের দেহের তাপে অপরকে তপ্ত করে ও যেন তৃপ্তি পায়। গভীর তৃপ্তি। নিজে ধুঁকছে, তবু অপরকে বাঁচিয়ে রাখছে, তাইতেই আনন্দ।

এতক্ষণে সেই লোকটা নিশ্চয়ই অনেকদূরে চলে গেছে। চুষতে চুষতে মুখের বিড়িটাকে বোধ হয় শেষ করে ফেলেছে। তার পরও কত লোক এল,—চলে গেল। কিন্তু রজতের কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। নিজেকে কেমন যেন অবলম্ব ব'লে মনে হচ্ছে। একটা গভীর বেদনায় তার সমস্ত চেতনা ক্রমশ যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, দ্রুত প্রবহমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে রজত ঐ দড়িটার কথাই ভাবতে লাগল।

নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরী, ঐ পাকানো মোটা দড়িটা যে সম্পূর্ণ একটা নিশ্চেতন পদার্থ, এ-কথা কিন্তু রজতের একবারও মনে হ'ল না। মনে হ'ল না, ওটা কোনও বিড়ি ব্যবসায়ীর ব্যবসায় চালানোর একটা রীতি মাত্র। ও যে শুধু পুড়ছে, পুড়ে পুড়ে বিড়িমুখো মানুষগুলোকে খুশী করছে, এই কথাই ভাবতে লাগল রজত। ভাবতে ভাবতে এক সময় খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

রজত নিজে বিড়ি খায় না। এই মুহূর্তে কথাটা মনে হ'তেই রজত গর্ববোধ করল। ঐ লোকগুলোর থেকে রজত যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এই কথা ভেবে, রজতের খুব আনন্দ হ'ল। মনে হ'ল ও ঠিক সাধারণ মানুষ নয়। একটু বিশিষ্ট, একটু অন্য ধরনের।

রজত যদি বিড়ি খেত, তা হ'লে হয়ত কোনও না কোনও দিন, ঐ দড়িটার কাছে রজতকে যেতে হ'ত। এবং ওকে শোষণ করতে হ'ত। ওর দেহের উত্তাপ নিঙড়ে নিয়ে নিজের শীতল চেতনাকে উষ্ণ করতে হ'ত। কিন্তু রজত বিড়ি খায় না।

শুধু বিড়ি কেন! কোনও নেশাই ওর নেই। এমন কি চাও খায় না, পানও না।

ভাবতে ভাবতে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল রজতের। মা তাকে নেশা করতে বারণ ক'রে দিয়েছিল। কোনও নেশা নয়। নেশা মানুষকে কুরে কুরে খায়। মস্ত বড় একটা গোটা মানুষ, ক্রমশ একেবারে শেষ হয়ে যায়। নেশা মানুষের সর্বনাশ করে। নেশার ওপর মায়ের তাই রাগ ছিল বরাবর।...কিন্তু বাবাকে মা কিছু বলতে পারত না।

বিড়ি-সিগারেট নয়; বাবা মদ খেত। মায়ের কাছ থেকেই রজত সব শুনেছিল। বাবা মদ খেত, বাইরে বাইরে থাকত, বাড়ীতে আসত মাঝে মাঝে। যে-দিন আসত সেদিন যেন একটা ঝড় বয়ে যেত বাড়ীতে।

আবছা আবছা সে-সব কথা রজতের মনে পড়ে। রজত তখন খুব ছেলেমানুষ। প্রথম প্রথম সে জানতই না যে লোকটা তার বাবা। এক-একদিন রজতের জন্য বিস্কুট লজেন্স নিয়ে আসত। রজতকে কোলে ক'রে আদর করত, চুমো খেত। আর ঠিক সেই সময় মা কোথা থেকে ছুটে আসত, বাবার কোল থেকে রজতকে কেড়ে নিয়ে খুব ধীর গলায় বলত, ওর গায়ে তুমি হাত দিও না। দোহাই তোমার, ওকে বাঁচতে দাও।

মায়ের কথা শুনে বাবা হেসে উঠত; কি বিকট সেই অট্টহাসি! ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। বাবার সেই প্রচণ্ড হাসির শব্দে, মা ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত। আর একটিও কথা বলতে পারত না। কাঁদতে কাঁদতে রজতকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যেত।

মায়ের এত কষ্ট, কিন্তু বাইরের কেউই তা জানতে পারত না। দিনে-রাতে সব সময়ই মায়ের চোখ থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ত। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে মুছত। কখনও বা মুছত না। পাড়া-পড়শিরা, কেউ এলে, মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে হাসিমুখে ওদের সঙ্গে গল্প করত। কিংবা বলত আজ শরীরটা ভাল নেই ভাই। জ্বর জ্বর হয়েছে, তাই অবেলায় শুয়ে আছি। কখনও বা বলত, বিদেশ-বিভূঁয়ে মানুষটা একা পড়ে থাকে, তাই মাঝে মাঝে ভাবনা হয়; কাজকর্ম ভাল লাগে না। চুপচাপ শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিই। কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না। বেশি দিনের ছুটি-ছাটা না পেলে ত আসতে পারে না।...সেই সব কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পড়শিরা চলে যেত। মা কিন্তু গুম হয়ে বসে থাকত। সন্ধ্যেবেলায় রজতকে খাইয়ে-দাইয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ত। কিছু মুখেও দিত না। রজত জিজ্ঞেস করলে বলত, আজ উপোস, কিছু খেতে নেই, তুই ঘুমো।

ছায়া-ছায়া সে-সব দিনগুলোর কথা রজত এখনও ভুলতে পারে নি।...স্কুল থেকে এসে মায়ের পাতের ভাত খেতে খেতে গল্প শুনত রজত। তার পর সন্ধ্যে হ'লেই পড়তে বসত। পড়তে পড়তে কোনও কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়ত। আর স্বপ্ন দেখত...বাবা এসেছে,...মাকে বলছে—চল, তোমাদের নিতে এলাম।... তার পর আচমকা ঘুম ভেঙে যেত। কান খাড়া করে শুনত, বাইরের দরজায় কে যেন খট্ খট্ করে শব্দ করছে। শুয়ে শুয়েই রজত বুঝতে পারত অনেক রাত হয়েছে। বাইরে নিশ্চয়ই চোর এসেছে। ভয়ে ভয়ে মাকে ডাকতে গিয়ে দেখত—মায়ের জায়গা খালি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকত রজত।

চোখ চাইতে পারত না। কিন্তু বুঝতে পারত, মা যেন বাইরের দরজা খুলল। চোরের মতন মায়ের পিছু পিছু কে যেন ঘরে ঢুকল। সেই সময় রজত চোখ খুলত। হ্যারিকেনের অল্প আলোয় দেখতে পেত, চোর নয়, বাবা এসেছে। কিন্তু বাবাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। লম্বা কালো কোট-পরা, মাথায় পাগড়ি—ঠিক যেন পুলিস। মায়ের সঙ্গে ফিস ফিস করে কি সব কথা বলত! আলমারি খুলে মা টাকা বার করে দিত। তার পরই বাবা চলে যেত।

রজত কাঠ হয়ে শুয়ে থাকত, উঠতে পারত না। তেষ্টায় বুক ফেটে যেত, তবুও মায়ের কাছ থেকে জল চাইত না। রজত মাকে জানতেই দিত না যে, ওসব দেখে ফেলেছে। ঐ ভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়ত রজত।

মা কিন্তু ঘুমুতে পারত না। বাবা চলে যাবার পর, মা আর বিছানায় আসত না। ঠাকুর ঘরে চলে যেত। সেখানে বসে বসে কাঁদত। গুন্ গুন্ করে কি সব বলত। রজত শুনতে পেত, কিন্তু বুঝতে পারত না।

তার পর রজত যখন আরও বড় হ'ল, তখন মাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এত টাকা কোত্থেকে তুমি পাও মা! আর ঐ লোকটাকে অত টাকা দাও কেন? না দিলে কি করবে ও, তোমায় ধরে মারবে। ইস, মারলেই হ'ল। আমি থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আসব না। মজা টের পাইয়ে দেব।

রজতের মুখটা চেপে ধরে ধমক দিয়ে মা বলেছিল, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। ওসব খোঁজে তোর কি দরকার।

মুখ বন্ধ করলে কি হয়, মনটাকে ত মা বাঁধতে পারে নি। রজত মনে মনে রোজই কামনা করত, ঐ লোকটা যেন তাড়াতাড়ি মরে যায়। খুব তাড়াতাড়ি। আর যেন ওকে এ বাড়ীতে না আসতে হয়।

মনের মধ্যে এই সব ভাবনা গুমরে গুমরে উঠত। কাউকে কিন্তু কিছু বলতে পারত না রজত। অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও না। কারোর সঙ্গে ভালভাবে মিশতেই পারত না। খেলাধুলো ছেড়ে একা একা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াত।

স্কুলে মাষ্টারমশাইরা বলতেন—রজত খুব শান্ত ছেলে। পড়াশোনায় যেমন ভাল, আচার-ব্যবহারেও ঠিক তেমনি ধীর-স্থির। তোমরা সবাই রজতের মত হবার চেষ্টা করবে।

মাষ্টারমশাইদের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে রজতের কিন্তু একটুও আনন্দ হ'ত না। কেমনা, একদিন রজত যখন ঐ সব কথা মাকে বলেছিল, মায়ের তখন আনন্দ হয় নি। শুম হয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময় মা কেঁদে ফেলেছিল। তার পর চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

মাষ্টারমশাইদের কথা শুনে মাকে কাঁদতে দেখে রজতের মনে হয়েছিল, মাষ্টারমশাইরা যা বলতেন, তা বোধ হয় সত্যি নয়। রজতের চেয়েও ভাল ছেলে ক্লাসে ছিল। রজতের বাবা বাড়ী আসত না বলে মাষ্টার-মশাইরা বোধ হয় ওকে একটু বেশি স্নেহ করতেন। তাই বোধ হয় একটু বাড়িয়ে বলতেন। নইলে মা ঐ সব কথা শুনে কেঁদে উঠবে কেন!

তার পর থেকেই ক্লাসেও রজত কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলত না। মাষ্টারমশাইরা কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দিত, অন্য কোনও কিছু জানতে চাইত না।

এই ভাবে সকলকার কাছ থেকেই ক্রমশ পৃথক হয়ে গেল রজত। নানা রকমের দুশ্চিন্তার ওর কিশোরমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। অনেক কথা ভেবে ভেবে এবং সেই সব কথা কাউকে না বলতে পেরে, রজত অসুখে পড়ল।

সেই সময় রজত জানতে পেরেছিল, মামার বাড়ী থেকে মায়ের নামে মাসে মাসে টাকা আসে। অথচ মামারা কেউ আসতেন না। মা না কি তাঁদের নিষেধ করে দিয়েছিল। বলেছিল, তোরা আর এর মধ্যে আসিস নে। আমার কর্মফল আমাকেই ভোগ করতে দে!

রজত জানত তার মামারা খুব বড়লোক। সেখানে গেলে অনেক সুখে তারা থাকতে পারবে। তবুও মা কেন যে সেখানে গিয়ে থাকতে চাইত না, এ কথা রজত কিছুতেই বুঝতে পারত না। কিন্তু তাই বলে মায়ের ওপর একটুও রাগ হ'ত না রজতের। মনে হ'ত মা যখন যেতে চাইছে না তখন নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। সেই ভেবে রজত নিজেকে শান্ত করত। মামাদের কথা আর ভাবত না।

তার পরও অনেক দিন কেটে গেছে। রজতের অসুখ সেরে গেছে। রজত আবার স্কুলে বেরিয়েছে, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই লোকটা আর আসে নি।

রজত তাকে আর আসতে দেখে নি। অথচ রজত কতদিন, সেই লোকটাকে ধরবে বলে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটিয়েছে।

একদিন মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল রজতের। বিছানার ওপর উঠে বসে দেখল, মা নেই। ঠাকুর-ঘর থেকে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে রজত ঠাকুর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, গিরিধারীলালের ছবির সামনে বসে মা হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে। ছোট ছেলেদের মত কাঁদতে কাঁদতে কি সব বলছে। রজত যে এসেছে জানতেই পারে নি।

রজত চিৎকার করে বলল, মা, ও মা ! শোবে চল।

মা তবু ও কান্না থামাল না।

রজত তখন মাকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সে চিৎকার বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। ভয় পেয়েই মা বোধ হয় উঠে দাঁড়াল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে খোকা, তোর বাবা কবে আসবে রে !

রজত জোর গলায় বলল, আর কোনও দিনই আসবে না।

—ওরে অমন কথা বলিস নিরে, অমন কথা বলতে নেই।

মাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রজত বলল—এখন রাত অনেক বাকি ! তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

—ঘুম আর হবে না রে !

রজত মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মায়ের পাশেই শুয়ে পড়েছিল। বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রজতের কথাই ঠিক হয়েছিল। বাবা আর আসে নি। বাবার কি একটা অসুখ করেছিল। তাই তার বন্ধুরা সকলে মিলে বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। মায়ের কাছেও কোনও খবর পাঠায় নি। হাসপাতালেই বাবা মারা গেল। দু'দিন পরে সে সংবাদ মায়ের কাছে যখন এল, মা তখন উঠোনে আছড়ে পড়ল, পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তিন দিন মা কি অজ্ঞান হয়েছিল। মামার বাড়ী থেকে কতলোক এল, ডাক্তার এসে মাকে পরীক্ষা করলেন, ওষুধ দিলেন, ইন্‌জেকশন্ দিলেন, তারপর মায়ের জ্ঞান ফিরল।

বড়মামাবাবু বললেন, এখানে আর তোমার থাকা হবে না। এবার তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব।

মা, ফ্যাল ফ্যাল করে মামাবাবুর দিকে চেয়ে রইল। গরুর মত বোবা চোখ দুটো থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ধরা গলায় মা বলল, তা হয় না, আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। আমাকে দেখতে না পেয়ে ও যদি এসে ফিরে যায়।

কিন্তু মায়ের কোনও ওজর-আপত্তি টেঁকে নি। মামাবাবু এক রকম জোর করেই মাকে নিয়ে গেলেন।—জ্ঞান হবার পর সেই প্রথম মামার বাড়ী এল রজত।

মামাদের মস্ত বড় বাড়ী। কত ঘর। ঘরগুলো কেমন রঙ্‌চঙ্-করা। কত জিনিষপত্তর দিয়ে সাজানো। উঠোনে তারের খাঁচায় খরগোস—বিলিতী ইঁদুর। কত রকমের পাখি, কাঁচের চৌবাচ্চায় রঙ-বেরঙের মাছ। কিন্তু রজতের কিছুই ভাল লাগত না। মামার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা, কেউ ভাল করে কথাই বলত না রজতের সঙ্গে। রজতের মনে হ'ত ওরা যেন সেখানে বিশ্রী বেমানান। মাও সেটা বেশ বুঝতে পারত। তাই সব সময় চুপচাপ থাকত। কারোর সঙ্গে মিশত না। একপাশে একটা ঘরে রজত আর তার মা থাকত। সে ঘরে বিশেষ কেউ আসত না। ঠাকুর এসে খাবার দিয়ে যেত। মামীরাও বিশেষ কোনও খবর নিতেন না। বড়মামাবাবু যা মাঝে মাঝে আসতেন। এসে মায়ের সঙ্গে গল্প করতেন। মা কোনও কথা বলত না। মাঝে মাঝে শুধু হুঁ হাঁ করত। করেই চুপ হয়ে যেত। মামাবাবু বোধ হয় বিরক্ত হয়েই উঠে যেতেন।

সেই মস্ত বড় ঘরে ওরা একা থাকত। দুজনে মিলে একা।

বন্ধ ঘরে বসে বসে রাতদিন মা যেন কি ভাবত। ভগবানকে ডাকত। কাঁদত। আর কখনও কখনও রজতকে আদর করত। তারপর ক্রমে রজতের সঙ্গেও কথা বলা কমিয়ে দিল। খাওয়া-দাওয়া ছিল না বললেই হয়। চেহারাটা ক্রমশ পাকানো দড়ির মত হয়ে গেল। চোখ দুটো গালের মধ্যে ঢুকে গেল। জীবন্ত কঙ্কাল হয়ে মা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকত। জ্বরজারি কিছু নেই তবুও মা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না।

সেই সময় একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রজতের। রাত তখন অনেক। মা শুয়ে শুয়ে ছটফট্ করছে। মায়ের মাথায় হাত দিয়ে রজত বুঝতে পারল মায়ের খুব জ্বর হয়েছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বসে বসে মায়ের মাথায় হাত বুলোতে লাগল রঞ্জত। বাইরে বেরিয়ে মামাবাবুকে ডেকে আনতে সাহস হ'ল না।

হঠাৎ মা চীৎকার করে উঠল—বসে আছিস কেন, যা দরজা খুলে দিয়ে আয়। ও যে, অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছে। যা, ওঠ্। তবু বসে রইলি!

রঞ্জত কিন্তু উঠল না। আলোও জালল না। অন্ধকারের মধ্যে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চোখ বুজে বসে রইল।

আঁচলটা রঞ্জতের কোলের ওপর তুলে দিয়ে মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, চাবিটা খুলে নিয়ে ওর হাতে দিয়ে বল, আলমারির চোর-কুঠরিতে সব আছে। যা দরকার যেন নিয়ে যায়। আর.শোন, ওকে একটু বলতে বল। বাকি রাতটুকু ও যেন এইখানেই থাকে।—বলতে বলতে মায়ের গলাটা ঘড়ঘড় করে উঠল। দড়ির মত পাকিয়ে যাওয়া শরীরটা ধুঁকতে ধুঁকতে স্থির হয়ে গেল।…

ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল রঞ্জতের। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—আবার কে একজন এসে দড়িটাকে মুখের কাছে টেনে নিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি তার মুখ থেকে দড়িটা কেড়ে নিয়ে রঞ্জত তাকে পোষ্টের গায়ে চেপে ধরল। আগুনটা নিবে যেতে দড়িটা ছেড়ে দিল।

—এ কি করলেন! নিবিয়ে দিলেন কেন! জামা পুড়ে গেছে বুঝি।—কে যেন ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

জামা পোড়ালে কি আর নেবাতাম, পোড়াচ্ছে না বলেই ত নিবিয়ে দিলাম। ও শুধু পুড়তেই জানে।—কথাগুলো কিন্তু রঞ্জত বলতে পারল না।—হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে 'পেভ্মেণ্ট' ছেড়ে রাস্তায় নামল।…

বঙ্গভূমিকে রাষ্ট্রীয় হিসাবে তিন টুকরা করা হইয়া থাকিলেও, সমগ্র ভারতে যেখানে যত বাঙালী আছেন, তাঁহাদিগকে বাঙালীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা অ-বাঙালী কাহারও ক্ষতি বা অনিষ্ট করিতে চাই না, কিন্তু সর্বত্র ভারতীয় নাগরিকের সমান অধিকার চাই। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংহতি পুনঃস্থাপন আমাদের সাধ্যাতীত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় সংহতি এই প্রকারে যতটুকু রক্ষিত হইতে পারে, তাহা রক্ষা করা চাই।

সাংস্কৃতিক সংহতি পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিতে হইবে। বাঙালী মহিলা পুরুষ যিনি যেখানে আছেন তাঁহাকে বাংলা বলিতে হইবে, বাংলায় চিঠি লিখিতে হইবে, সাহিত্যিক শক্তি থাকিলে বাংলা পদ্য বা গদ্য উভয়ই রচনা করিতে হইবে, বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইবে, বঙ্গের সঙ্গীত ও ললিতকলায় অনুরাগী হইতে হইবে, এবং শক্তি থাকিলে স্বয়ং গায়ক বাদক চিত্রকর বা ভাস্কর হইতে হইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৭

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১১) পিছন থেকে সঙ্গত

দরদী কথাসাহিত্যিক জরাসন্ধ তাঁর রচিত একটি গল্পের পটভূমি বর্ণনা করবার সময় মন্তব্য করেছেন—

'ময়মনসিংহ গীতিকবিতার দেশ। তারও মূলে আছে প্রকৃতির অজস্র বদান্যতা। বাংলার রত্ন-ভাণ্ডারে বিক্রমপুর দিয়েছে মনীষা, বরিশাল দিয়েছে স্বদেশপ্রেম আর ময়মনসিংহ দিয়েছে পল্লীকাব্য।'

বেশ সুন্দরভাবে লেখক কথাটি বলেছেন। বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে এই তিনটি স্থানের অবদানের কথা।

কিন্তু বিবৃতিটি ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে মনে খটকা লাগে। উক্তিটি কি সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ? এমন ভাবে মন্তব্য করা হয়েছে, যেন বাংলার সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে গীতিকবিতা, মনীষা ও দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে ওই তিনটি জেলার দানই সর্বশ্রেষ্ঠ। ওই তিনটি বিষয়ে বাংলার অন্য কোন অঞ্চলের নাম বা অবদানের কথা যেন প্রথমে মনে আসে না।

সুদূর অতীতে, আজ থেকে প্রায় আটশ' বছর আগে, বিক্রমপুরে পণ্ডিতপ্রবর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে উনিশ-বিশ শতক পর্যন্ত বহু মনীষীর আবির্ভাব, ময়মনসিংহের পল্লী অঞ্চলের মাধুর্যে ভরা গীতিকবিতা এবং বিশ শতকে বরিশালের স্বদেশব্রত বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকবে, সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ সব বিষয়ে এইটিই শেষ কথা নয়। বাংলার ইতিহাসের অপক্ষপাত ছাত্রের কাছে ওই তিন বিষয়ে ওই তিনটি জেলার অবদান কখনই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হবে না। বাংলাকে এমন খণ্ডভাবে বিচারের কথা কোন নিরপেক্ষ সংস্কৃতি-সেবীর মনে আসে কি? এমন বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের দিকে দেখবার ইচ্ছা জাগবে কেন?

বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় কোন স্বাধীন অঞ্চলে সম্পূর্ণ নয়, খণ্ডিত। বাংলার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কখনও সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র ভৌগোলিক স্থানের মিলিত অবদানে তার পরিপূর্ণতা। বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের নানা অংশের ধারার সম্মিলিত রূপ নিয়ে তা গঠিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

ওই তিনটি ক্ষেত্রে উক্ত তিন অঞ্চলের নাম পূর্ব-পশ্চিম মিলিতভাবে অবিভক্ত বা অখণ্ড বাংলায় প্রথমেই মনে আসবে কেন? ওই সব বিষয়ে আরও অঞ্চল আছে অতি সমৃদ্ধ অবদান নিয়ে।

সারা বাংলা দেশ জুড়ে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জগৎ। নানা স্থানের সম্মিলিত অবদানে তার মানসক্ষেত্র শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। তার নানা-মুখী সেই সম্পদের পরিচয় ছড়িয়ে আছে জেলায় জেলায়, অঞ্চলে অঞ্চলে। সংস্কৃতির এক একটি বিভাগ কোন একটি জেলার সঙ্কীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ নয়। কোন আঞ্চলিক গণ্ডীতে তার কোন শ্রেষ্ঠ প্রকাশ খণ্ডিত নেই। বেশী দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করে সংক্ষেপে দু-একটি নিদর্শন দেওয়া চলে, কারণ রচনাটি সমালোচনা হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এক কথায় বলতে গেলে, দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে মেদিনীপুর; মনীষার ক্ষেত্রে হুগলী, ২৪-পরগণা, বর্ধমান; গীতি-কবিতা ও পল্লীকাব্যের ক্ষেত্রে কুমিল্লা, ঢাকা, উত্তর রাঢ় ইত্যাদি অঞ্চলের নাম কোন দিন বিস্মৃত হবার নয়। এদের মধ্যে কোন্ বিষয়ে কোন্ অঞ্চল শ্রেষ্ঠ তার বিচার করবেন কে?

এ সমস্ত স্থানের দানের কথা স্বীকার না করে মাত্র ক'টি অঞ্চলের উল্লেখ ওইভাবে হ'লে একদেশদর্শিতা প্রকাশ পায়। ময়মনসিংহের গীতিকবিতার কথা অনেকের প্রথমে মনে হয় এইজন্যে যে তা বিস্তর উদ্ধার করেছেন চন্দ্রকুমার দে এবং সে সব প্রচার করেছেন দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয়। চন্দ্রকুমার দে'র তুল্য উৎসাহী ব্যক্তি যদি অন্যত্র কাজ করতেন তা হ'লে অঞ্চলের অবদানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যেত। পূর্বোত্তর প্রান্তে কুমিল্লা, ঢাকা ইত্যাদি এবং পশ্চিমে উত্তর রাঢ়ের গীতিকবিতার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের বহু নিদর্শনই এখনও অপ্রকাশিত।

বর্তমান নিবন্ধে বিক্রমপুরের ঘনিষ্ঠ অঞ্চল ঢাকার কথা আলোচ্য। সেজন্যে জনপ্রিয় সাহিত্যিকের ওই মন্তব্যটি মনে হয়েছিল। ঢাকার মনীষার ক্ষেত্রে অবদানের কথা

অবশ্য এখানে আলোচনা করা হবে না, তবে সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত হ'ল এখনকার প্রসঙ্গ।

মনীষার মতন অতখানি প্রবীণ ও ঐতিহাসিক না হ'লেও ঢাকার সঙ্গীত-চর্চার কথা উল্লেখ করবার যোগ্য। বিশেষ সেতার, তবলা, ও পাখোয়াজ বাদনের ক্ষেত্রে। দেখা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতেই ঢাকা অঞ্চলের শিল্পীরা অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা ভাল। ঢাকা সঙ্গীতকেন্দ্র হিসেবে খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকেন্দ্র ছিল না। সে বিষয়ে ত্রিপুরার গৌরব সবচেয়ে বেশি। সঙ্গীত-চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র বলতে ত্রিপুরার নাম সর্বাগ্রে। ত্রিপুরার দরবারী সঙ্গীত-চর্চায় পরিচয় সংক্ষেপে দিতে গেলেও একটি পৃথক অধ্যায়ের প্রয়োজন। এ নিবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে দু' এক জায়গায় ত্রিপুরার কথা উল্লেখ করা হবে মাত্র।

ঢাকা এবং বিশেষ করে ভাওয়ালের প্রসঙ্গই এখানে মুখ্য।

বাংলার যে ক'টি সঙ্গীতকেন্দ্রে সেতার-চর্চার ধারা সবচেয়ে প্রাচীন, ঢাকা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু সেতারবাদনও এই নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক নয়।

তবলার সঙ্গেই বিষয়টির সম্পর্ক। পাখোয়াজের সঙ্গেও না। তবে প্রসঙ্গত ঢাকার পাখোয়াজ বাদকদেরও কিছু উল্লেখ থাকবে। কারণ তবলা ও স্বগোত্র—পাখোয়াজ দু'টিই সঙ্গতের যন্ত্র। তা ছাড়া, এমন কোন কোন সঙ্গতী ঢাকায় ছিলেন, যাঁরা দু'টি যন্ত্রেরই সাধক। যেমন, গৌরমোহন বসাক, প্রসন্ন বণিক্য প্রভৃতি

ঢাকায় রাগসঙ্গীত চর্চার এই সব ধারার পরিচয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই পাওয়া যায়। অন্যান্য যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের মতন সেখানকার তবলা-বাদনও ওই সময় থেকে বেশ ভালভাবে হ'তে থাকে।

ঢাকার পাখোয়াজ-চর্চার গৌরবময় যুগও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তবলার কথা আরম্ভ করবার আগে সেখানকার গুণী পাখোয়াজীদের নাম উল্লেখ করে রাখা যাক। পরে আর পাখোয়াজের প্রসঙ্গ আসবে না।

ঢাকা অঞ্চলের গুণী পাখোয়াজ বাদকরা সকলেই বসাক পদবীধারী। যথা—উপেন্দ্রনাথ বসাক, রামকুমার বসাক, গৌরমোহন বসাক, সতীশচন্দ্র বসাক প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বোধ হয় উপেন্দ্রনাথ বসাক। গৌরমোহনও একজন নেতৃস্থানীয় পাখোয়াজ শিল্পী হিসেবে নাম করেন। উপরন্তু তিনি তবলা-বাদকও।

ঢাকার তথা সমগ্র বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাগুণী প্রসন্ন বণিক্যের প্রথম গুরু হলেন গৌরমোহন বসাক। প্রসন্নকুমার গৌরমোহনের কাছে বিশেষ করে পাখোয়াজ শিখেছিলেন এবং তবলাও। উত্তরজীবনে প্রসন্নকুমার তবলার সাধনাতেই বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং বহু-বিখ্যাত তবলাবাদকরূপে সুপরিচিত হন। যেমন প্রচুর ছিল তাঁর বোলের সংগ্রহ, তেমনি সাধা-হাতের কলা-নিপুণ বাদক ছিলেন তিনি। কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রেও তিনি অনেক সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন, জানা যায়। তবলায় তাঁর দ্বিতীয় গুরু হলেন আতা হোসেন। আতা হোসেনের পরিচয়-কথা পরে দেওয়া হবে।

প্রসন্ন বণিক্য শুধু সঙ্গতকার হিসেবে নয়, তিনি আরও স্মরণীয় থাকবেন তাঁর দু'টি বইয়ের জন্যে। তাঁর 'তবলা তরঙ্গিণী' ও 'মৃদঙ্গ-প্রবেশিকা' নামে বই দু'খানি শিক্ষার্থীদের বেশ প্রয়োজনীয় বলা যেতে পারে।

ঢাকার স্বনামধন্য সেতারী ভগবান দাসের বাজনার সঙ্গে সঙ্গতে প্রসন্নকুমারের প্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করত বলে কথিত আছে। তাঁরা দু'জন ছিলেন প্রায় সমবয়সী।

প্রসন্নকুমারের তবলায় অনেক শিষ্যও হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের ঢাকার বিখ্যাত তবলাগুণী কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (রায় বাহাদুর) প্রথম তবলা-শিক্ষকও বণিক্য মশায়। প্রসন্নকুমারের অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে রামগোপালপুরের হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (Musicians of India, Pt. I—পুস্তকের লেখক), আসাম-গৌরীপুরের রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া, হেমচন্দ্র, রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

প্রসন্নকুমার কিংবা গৌরমোহন বসাকের সঙ্গীত-চর্চার কাল যে ঢাকার তবলাবাদনের আদিযুগ তা নয়। তাঁদের আগেকার পর্যায়ের তবলাবাদকরাও ছিলেন। কিন্তু কোন্ সময়টি যে এ অঞ্চলে তবলাবাদনের ক্ষেত্রে আদিতম যুগ এবং কে বা কারা এ বিষয়ে পথিকৃৎ তা সঠিক জানা যায় নি।

যখন থেকে ঢাকা শহরে তবলা চর্চার কথা নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে, তার প্রথম ধারায় এই ক'জন গুণীর

নাম পাওয়া যায়। বর্ণনার সুবিধার জন্যে তাঁদের উল্লেখ করা যাক প্রথম পর্যায়ের বলে। কারণ তাঁদের চেয়ে পূর্ববর্তী তবলাবাদনের ধারার সন্ধান এ অঞ্চলে নির্ভর-যোগ্য ভাবে পাওয়া যায় নি।

এই পর্যায়ে সমধিক বিখ্যাত এবং গুণী তবলাবাদক রূপে তিনজনের নাম উল্লেখ্য। তাঁরা ভিন্ন অন্য তবলা-বাদকও নিশ্চয় ছিলেন, কিন্তু তিনজনই সমসাময়িককালের নেতৃস্থানীয়রূপে স্মরণীয় আছেন। তাঁরা হলেন সাধু ওস্তাদ, সুপ্পন খাঁ এবং দ্বারকানাথ সফরদার।

ঢাকার প্রথম পর্যায়ের সবচেয়ে সুপরিচিত এই তবলিয়া ত্রয়ীর মধ্যে দ্বারকানাথ সফরদার ঢাকার সন্তান ছিলেন। কিন্তু প্রথম দু'জন, সাধু ওস্তাদ এবং সুপ্পন খাঁ সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তাঁরা বহিরাগত এবং অবাঙ্গালী। তবে তাঁরা দু'জনই ঢাকায় তাঁদের প্রায় সমগ্র সঙ্গীতজীবন অতিবাহিত করেন।

তিনজন গুণীর সঙ্গীতজীবন ও বাস্তব জীবনের বিষয়েই অতি অল্প তথ্য পাওয়া যায়। তাঁদের সকলের ওস্তাদের নাম বা কোন্ অঞ্চলের বাদ্যরীতির তাঁরা ধারক কিংবা তাঁদের সঠিক জীবনকাল এসব তথ্যই অজ্ঞাত আছে।

তাঁদের মধ্যে আবার দ্বারকানাথ সফরদারের শিষ্য গঠনের কথাও কিছু জানা যায় না। তিনি উত্তম তবলাবাদক ছিলেন এই কথাই প্রচারিত আছে মাত্র।

সুপ্পন খাঁরও গুণী লোক ও ভাল বাজিয়ে বলে নাম ছিল। তাঁর পিতা মিঠন খাঁ ছিলেন খ্যাতিমান তবলাবাদক। কিন্তু সুপ্পন খাঁ না কি পিতার কাছে শিক্ষার সুযোগ পান নি, তাঁর ওস্তাদ ছিলেন হোসেন বখশ ও অন্যান্য গুণী।

সুপ্পন খাঁ না কি সঙ্গতকার হিসেবে খুব সুবিধা করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সংগ্রহ বেশ ভাল ছিল। একক বাদনে বোলগুলি বাজাতেন বেশ। লহরা বাজাবার রেওয়াজ অবশ্য সেকালে ছিল না।

তিনি কয়েকজনকে শিখিয়েছিলেন, জানা যায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বেশি তালিম পান ঢাকার একরাম-পুর অঞ্চল-নিবাসী কেলু চক্রবর্তী (ঠাকুর) আর সবচেয়ে হাত ভাল ছিল বোধ হয় ঢাকার তাঁতিবাজার পাড়ার বাসিন্দা শশীমোহন বসাকের। দুর্গাদাস লালা এবং স্থানীয় এক জমিদার ও রইস, সৌখীন বাদক খাঁ বাহাদুর আলাউদ্দিন আহমদও সুপ্পন খাঁর আর দুই শিষ্য।

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলের ঈষৎ পশ্চিমে বাবুর বাজারের কাছে খর্বাকৃতি, শ্মশ্রুধারী সুপ্পন খাঁ বাস করে গেছেন।

সাধু ওস্তাদ নামে সুপরিচিত তবলাগুণীর সম্পূর্ণ নাম ছিল সাধুচাঁদ চন্দ।

নামটি বাঙ্গালীর মতন শোনালেও সাধু ওস্তাদ না কি অবাঙ্গালী ছিলেন এবং অন্য স্থান থেকে এসে ঢাকা-বাসী হয়েছিলেন। তবলা-বাদক হিসেবে তিনি ছিলেন সঙ্গীত ব্যবসায়ী। ঢাকা অঞ্চলের তিনি বিখ্যাত তবলাশিল্পী হন, নিজের পরিবারে তবলা-চর্চার ধারা প্রবর্তন করেন এবং অনেক শিষ্যকেও শিক্ষা দেন। তাঁর পূর্বনিবাস কিংবা তাঁর ওস্তাদের নাম পরিচয় সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই জানা যায় নি।

সাধু ওস্তাদের দুই পুত্রই—মহাতপচাঁদ চন্দ ও গোলকচাঁদ চন্দ—তবলাবাদক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাতপচাঁদ পিতার শিক্ষা লাভ করেন কিন্তু কনিষ্ঠ গোলকচাঁদ পিতার এক শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের (তাঁর ডাক-নাম পুটু) শিষ্য। গোলকচাঁদের এক শিষ্য ছিলেন জয়দেবপুরের ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধু ওস্তাদের বংশে এমনিভাবে তবলা-চর্চার ধারা দেখা যায়।

নিজের পরিবার ভিন্ন সাধুচাঁদ অন্যান্য শিষ্যও গঠন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান হলেন ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। রাজেন্দ্রনারায়ণই এই আখ্যায়িকার নায়ক, তাঁর প্রসঙ্গে পরে আরও জানাবার আছে। সাধু ওস্তাদের সম্বন্ধে এবং আর এক জন তবলাগুণীর কথা এখানে আর কিছু বলে নেওয়া যাক।

রাজেন্দ্রনারায়ণ ভিন্ন সাধু চন্দের আর একজন সৌখীন কিন্তু কৃতী শিষ্য ছিলেন—সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী সারদাপ্রসাদ ছিলেন ভাওয়াল পরগণারই কাসিমপুরের জমিদার এবং রাজেন্দ্রনারায়ণের চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ সাধু ওস্তাদের কাছে তিনি রাজেন্দ্রনারায়ণের চেয়ে আগে থেকে তালিম নিতেন। সাধু ওস্তাদকে রাজেন্দ্রনারায়ণ যেমন জয়দেবপুরে, তেমনি সারদাপ্রসাদ কাসিমপুরে নিয়ে গিয়ে রাখতেন ভালভাবে শেখবার জন্যে।

সাধু চন্দ এইভাবে ঢাকা অঞ্চলের সঙ্গীতসমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হন। ঢাকা শহরের কাহেরটুলি নামে পল্লীতে স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

ঢাকার তবলা-চর্চার প্রথম যুগের এই তিনজন সমসামরিক গুণীর মধ্যে সাধু ওস্তাদেরই নাম-ডা

বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ছিল এবং শিষ্যগৌরবও তাঁর সমধিক।

এই ত্রয়ীর আরও একজন সমসাময়িক কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন গৌরমোহন বসাক। আগেই বলা হয়েছে যে, পাখোয়াজ ও তবলা দুই যন্ত্রেই তিনি সঙ্গতের সাধনা করতেন। ঢাকা শহরের নবাবপুর অংশ সঙ্গীতচর্চা বিশেষ তবলাচর্চার জন্যে বিখ্যাত ছিল সেকালে। সেখানে পাড়ায় পাড়ায় সঙ্গীতসেবক ও সঙ্গীতসাধকদের অবস্থান ছিল। গৌরমোহনও ছিলেন সেই নবাবপুরের একজন বিশিষ্ট ও সুপরিচিত বাসিন্দা।

গৌরমোহনের শিষ্যদের মধ্যে প্রসন্নকুমার বণিক্যের খ্যাতিই সবচেয়ে বেশি। আনন্দমোহন নামে গৌরমোহনের পুত্রের কথা জানা যায়, তিনিও সঙ্গতকার-রূপে নাম করেছিলেন। কিন্তু তিনি না কি পিতার কাছে বেশি শিক্ষার সুযোগ পান নি—ঢাকা এবং কলকাতা দু' জায়গাতেই তাঁর অন্য সঙ্গীতগুরু ছিলেন।

ঢাকা অঞ্চলে তবলাবাদনের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় গুণীবৃন্দ এবং তাঁদের শিষ্যদের এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অর্থাৎ যাঁরা প্রায় স্থায়ীভাবেই ঢাকায় বসবাস করেন।

কিন্তু তাঁরা ছাড়াও আরও কয়েকজন ওস্তাদ ছিলেন যাঁরা মাঝে মাঝে আসতেন ঢাকায়। আসর, মজলিস উপলক্ষ্যে মুজরো নিয়ে সঙ্গত করে যেতেন। আমন্ত্রিত হতেন এখানকার কোন দরবারে। এমন কি, ঢাকার কোন কোন শিক্ষার্থী তাঁদের বারো মাসের ডেরায় গিয়ে তালিম নিতেন। আবার মাঝে মাঝে এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে অংশ নেবার ফলে স্থানীয় বাদকরা তাঁদের বাদনরীতির সঙ্গে পরিচিত থাকতেন। এই ভাবে ঢাকার সঙ্গীতজগতের সঙ্গে একটা পরোক্ষ যোগাযোগ থাকত সেই সব ওস্তাদদের।

এমনি একজন গুণীর নাম আতা হোসেন। তিনি উনিশ শতকের ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ তবলিয়া ছিলেন। আসলে আগ্রার লোক, হোসেন বখ্‌সের পুত্র। কিন্তু আতা হোসেন তাঁর সঙ্গীতজীবনের বেশির ভাগই কাটিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে, সেখানকার নবাব দরবারের বাদক নিযুক্ত থেকে।

বহু বছর আতা হোসেন অবস্থান করেছিলেন মুর্শিদাবাদে এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে। ঢাকার প্রসন্ন বণিক যে উত্তরজীবনে তাঁর শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাও মুর্শিদাবাদে। এখানে আতা হোসেনের আর একজন শিষ্যও হন। তাঁর নাম কাদের বখ্‌স এবং তিনি সুপ্রাচীন বয়সে আজও বর্তমান।

কলকাতার এক কৃতী তবলাবাদক—বিশ শতকের প্রথম পাদকে বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন এবং কৌকব খাঁর বাজনার সঙ্গে সঙ্গত করতেন, অবনীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আতা হোসেনের তালিমও পেয়েছিলেন, শোনা যায়।

আতা হোসেনের জন্ম হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে।

তাঁর সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, তিনি তবলাবাদকরূপে ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেখানে গুণপনার পরিচয় দিয়ে অতি সম্মানলাভ করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উৎসবের সময়ে এবং সেই উপলক্ষ্যে বিলাত যান তিনি।

মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে নিযুক্ত থাকবার সময়ে আতা হোসেন সাগর পাড়ি দেন। তখনকার প্রসিদ্ধ সরোদবাদক এনায়েৎ হোসেন খাঁর সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে নেওয়া হয় তাঁকে। সরোদী এনায়েৎ হোসেন ভাওয়াল রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের দরবারের বাদক ছিলেন, তাঁর কথা পরে বলা হবে।

এই দুই বাদকের ইংলণ্ড যাবার কালটা হ'ল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। ভারতবর্ষের বাজিয়েদের পক্ষে সেকালে বিলাত যাওয়া এক অসাধারণ ব্যাপার ছিল। সেখানকার বাসিন্দাদেরও ভারতীয় বাদকদের বাজনা শোনা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, সন্দেহ নেই।

আতা হোসেনের সাধা হাতের অত্যন্ত দ্রুত লয়ের সঙ্গত ইংলণ্ডের আসরে অসামান্য চমক সৃষ্টি করেছিল, শোনা যায়। এই অভূত-দর্শন বাজনার বিদ্যুৎগতি সেখানকার শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দিয়েছিল। বাজনার শেষে শ্রোতাদের অনেকে উঠে এসে বাদকের হাত এবং যন্ত্রটিকে বিশেষ করে পরীক্ষা করে দেখেন ব্যাপারটি বোঝবার জন্যে। যন্ত্রের চামড়ার ওপর বাদকের হাত কি করে এত জলদে চলছে,হাতের সঙ্গে বাজনাটা মুহুর্মুহু কি করে এমন মিলে যাচ্ছে, এ তত্ত্ব তাঁদের ধারণার অতীত। তাঁরা শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি খাটিয়ে বাদকের হাত নিয়ে হাতে ঘষে দেখলেন কিছু রাসায়নিক (Chemical) দ্রব্য মাখানো আছে কি না—যার ফলে এমন ঘন আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু বাদকের হাতে তেমন কিছু লেপন করা নেই দেখে হতাশ হলেন এবং আরও বেড়ে গেল তাঁদের বিস্ময়ের মাত্রা। তা হ'লে

কেমিক্যাল বা অন্য কোন কিছুর সাহায্য না নিয়েই বাদক এমন আশ্চর্য দক্ষতায় বাজিয়েছেন!

এই হ'ল রাগসঙ্গীতে ও তার সঙ্গতে অপরিচিত তখনকার ইংলণ্ডের শ্রোতাদের আতা হোসেন খাঁর তবলা শোনার গল্প।

তবু খাঁ সাহেবের বয়স তখন অন্তত ষাট বছর। তাঁর যৌবনকালের বাজনা শুনলে বিদেশী শ্রোতাদের আবার কি ধারণা হ'ত, কে জানে।

এ দেশেও আতা হোসেনের তৈরি হাতের বাজনার জন্যে রীতিমত খ্যাতি ছিল। তাঁর সেই বড় বড় আঙুল তখনকার আমলের বড় মুখের তবলায় সৃষ্টি করত গম্ভীর ধ্বনির ছন্দ-বৈচিত্র। সেকালের সেই বড় মুখের তবলার আওয়াজের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতন। এখনকার বেশির ভাগ (যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহার্য) তবলার যেমন মুখ ছোট হয় এবং সেজন্যে খুব চড়া পর্দায় (তারা গ্রামের সা-তে) বাঁধা হয়, সে যুগে তার চলন ছিল না। তখনকার বড় মুখের তবলা বাঁধা হ'ত মুদারা গ্রামের কোমল গান্ধার কিংবা বড় জোর পঞ্চমে। যেমন কণ্ঠসঙ্গীতে তেমনি যন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতাতেও। সেসব তবলায় বাদকরা হাতের তালুর কাজ অনেক বেশি দেখাতেন এবং এখনকার তুলনায় ধেরে ধেরে ইত্যাদি বোলের প্রাচুর্য ছিল।

আতা হোসেন সেকালের তবলা বাদন পদ্ধতির এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে দীর্ঘকাল অবস্থানের সময় ঢাকার সঙ্গীত-কেন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর সংস্রব ছিল, এসব কথা আগেই বলা হয়েছে।

আতা হোসেনকে ভাওয়াল-রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ একাধিকবার আনিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীত দরবারে। কিন্তু খাঁ সাহেবের কাছে রাজেন্দ্রনারায়ণ তালিম নেননি। তাঁর ওস্তাদ ছিলেন একমাত্র সাধু চন্দ্র। আতা হোসেন ভাওয়াল দরবারে সাময়িকভাবে বাজিয়ে যেতেন এবং রাজেন্দ্রনারায়ণের বাজনা শুনে তারিফ করতেন। তাঁর বাজনার প্রশংসা করে বলতেন যে, ধনী লোকদের মধ্যে এমন বাজনা বেশি শোনেন নি তিনি।

ভাওয়াল দরবার সেকালে শুধু পূর্ববঙ্গে নয় অখণ্ড বাংলা দেশের সঙ্গীত-জগতেও একটি বিখ্যাত আসর ছিল। তবে সে কথা এখনকার সাধারণের তেমন জানিত নেই, যেমন সুপরিচিত আছে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার বৃত্তান্ত। ভাওয়াল নামটি এখন সর্বসাধারণের মধ্যে ওই উপন্যাসোপম মামলাটির জন্যে বেশি প্রসিদ্ধ মনে হয়। তাই সেই সম্পর্কেই রাজেন্দ্রনারায়ণের পরিচিতি দিয়ে তাঁর ও ভাওয়াল রাজ্যের প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাক। সাম্প্রতিককালের যে রেকর্ড স্থাপনকারী মোকদ্দমার জন্যে ভাওয়ালের প্রসিদ্ধি সেই সূত্রে সুপরিচিত সেখানকার মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণের পিতা হলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়।

কিন্তু রাজেন্দ্রনারায়ণ মাত্র বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করে যান নি। তিনি সঙ্গীত-চর্চায় অনেক সময় অতিবাহিত করতেন তা নয়, অতিশয় বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। বলতে গেলে, ভাওয়াল রাজবংশের মধ্যে বিদ্যা ও সঙ্গীতের সেবায় অন্য কেউই আত্মনিয়োগ করেন নি তাঁর মতন। ভাওয়াল রাজ্যের সুনামও যাঁদের আমলে সবচেয়ে বেশি হয়েছিল তিনি তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট।

সমৃদ্ধ ভাওয়াল জমিদারি খুব কম দিনের নয়। জয়দেব রায়চৌধুরীই ত হ'লেন রাজেন্দ্রনারায়ণের সাত পুরুষ আগেকার। ভাওয়াল রাজ্যের কেন্দ্র যে জয়দেব-পুর গ্রাম তা তাঁরই নামানুসারে হয়েছে। জয়দেব রায়চৌধুরীর আমলের আগে গ্রামটির নাম ছিল 'পীড়াবাড়ি'। তিনিই সে নাম বদল করে নতুন নাম-করণ করেছিলেন। তাঁরও আগে ৫,৬ পুরুষের নাম পাওয়া যায়, যদিও সমৃদ্ধি ছিল না তাঁদের সকলের সময়ে। জয়দেব থেকে নিম্নতম ষষ্ঠ পুরুষ কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী জমিদারিটিকে অনেক দিক থেকেই সুশৃঙ্খল করবার প্রয়াস পান। এবং এই কাজে তিনি পরম সহায়ক লাভ করেন বিখ্যাত বাগ্মী ও সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ম্যানেজাররূপে পেয়ে।

সেকালের সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ অনেক গুণের আধার ছিলেন। বাগ্মিতার জন্যে যেমন তাঁর প্রসিদ্ধি, হয়ত তার চেয়েও বেশি 'বান্ধব' পত্রের সম্পাদকরূপে। তারপর তাঁর কর্ম ও গঠন-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হ'ল তখনকার ভাওয়াল রাজ্যের পরিচালন ব্যবস্থা। কালীনারায়ণ সুযোগ্য ব্যক্তির হাতেই জমিদারির ভার দেন।

কালীনারায়ণের মৃত্যুর পরে তাঁর একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ যখন উত্তরাধিকারী হলেন কালীপ্রসন্ন তখনও রয়ে গেলেন ম্যানেজার। দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ তিনি ভাওয়ালের ম্যানেজার ছিলেন। ঘোষমশায়ের প্রখর বাস্তব বুদ্ধি যেমন একদিকে জমিদারির বৈষয়িক

প্রবৃদ্ধি করে তেমনি তাঁর সাহিত্য-কর্মে অনুরাগ রাজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক উন্নতির সহায়ক হয়। কালীপ্রসন্ন এবং রাজেন্দ্রনারায়ণের (সরকার থেকে তিনি রাজা খেতাব পান) জন্যে জয়দেবপুরে যে 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' স্থাপিত হয়, তার প্রসিদ্ধি কম ছিল না তখনকার কালের এই সমগ্র অঞ্চলটিতে। এই সভা থেকে যেমন অনেক ভাল বই প্রকাশে সাহায্য করা হ'ত, তেমনি অনেক লেখকও পুরস্কৃত হতেন। শিল্প সাহিত্য কাব্য রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে সঙ্গীতের পরই প্রিয়বস্তু। পূর্ববঙ্গে সংস্কৃতচর্চার প্রধান প্রতিষ্ঠান সারস্বত সমাজের তিনি ছিলেন একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এইসব সাংস্কৃতিক কাজে তাঁর দানের অন্তরালে কালীপ্রসন্নের প্রভাব কাজ করেছিল।

সাহিত্য কাব্য সংস্কৃত-চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রধান শিল্প-কর্ম ছিল সঙ্গীতচর্চা। এখানে তিনি স্বয়ং শিল্পী। শিল্পীর উৎসাহদাতা মাত্র নন। শুধু পৃষ্ঠপোষকও নন।

সঙ্গীতের সেবকরূপে রাজেন্দ্রনারায়ণের দুই পরিচয়। সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক। বাংলার জমিদারশ্রেণী ও ধনীদের মধ্যে যে অল্প ক'জন হাতে-কলমে সঙ্গীত চর্চা করে গেছেন, ভাওয়াল-রাজ তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন।

সঙ্গীত-প্রেমী ও পৃষ্ঠপোষকরূপে রাজেন্দ্রনারায়ণের নাম সেকালের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিল। এবং তাঁর সূত্রে দেশের পূর্ব প্রত্যন্তে হ'লেও ভাওয়াল দরবারের নামও।

এ দরবারে অনেক ভারত-বিখ্যাত গুণীর গান-বাজনা হয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে নানা কলাবৎ যোগ দিয়েছেন এখানকার আসরে। বেশির ভাগই তাঁদের অবস্থান অবশ্য সাময়িক। তবলা-গুণী আতা হোসেনের কথা এ প্রসঙ্গে আগে বলা হয়েছে। তা ছাড়া, পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত দরবার ত্রিপুরার উত্তর ভারতের যত গুণী যেতেন তাঁদের অনেকেই উপস্থিত হ'তেন ভাওয়ালে। বহু ওস্তাদের ত্রিপুরা দরবারে বার্ষিক বৃত্তির বরাদ্দ ছিল, অনেকে উপস্থিত মতও বিদায় নিতেন। সেই সব শিল্পীদের অধিকাংশই ভাওয়ালে আসতেন। ত্রিপুরায় আসা-যাওয়ার পথে। এমনিভাবে রাজেন্দ্রনারায়ণের দরবারে উচ্চশ্রেণীর গান-বাজনা হ'ত।

তা ছাড়া তিনি কয়েকজন কলাবতকে নিযুক্ত রাখতেন নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে এবং নিজে তাঁদের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবার কারণেও। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হবেন সরদী এনায়েৎ হোসেন খাঁ এবং রবাবী-বীণ্‌কার কাসিম আলি খাঁ। সমসাময়িক ভারতবর্ষের দু'জন শ্রেষ্ঠ গুণী। একজন সরোদযন্ত্রের প্রথম যুগের অন্যতম বাদক এবং শেষোক্ত ব্যক্তি তানসেন বংশের এক উজ্জ্বল রত্ন।

সরোদী এনায়েৎ হোসেনের বাদকরূপ বিলাতে যাওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ সরোদ-চর্চার জন্যে তাঁর নাম আরো এই কারণে স্মরণীয় যে, তিনি এই যন্ত্রবাদনের প্রথম যুগের একজন সুবিখ্যাত বাদক। উত্তর ভারতে সরোদ যন্ত্রের প্রথম প্রচলন হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বা তার কিছু পরে। সেই আদি পর্বের সরোদ-গুণীদের মধ্যে নিয়ামৎ উল্লা খাঁ (ওস্তাদ করামৎ উল্লা খাঁ ও কৌকব খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা), গোলাম আলী খাঁ (ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁর পিতামহ), মজ্‌ক্ল খাঁ, এনায়েৎ হোসেন খাঁ প্রভৃতি গণ্য ছিলেন। তাঁদের সকলের জীবনকালের সন্ তারিখ সঠিক জানা না গেলেও তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক, তবে পরস্পরের বয়সে তারতম্য থাকতে পারে। তাঁদের সকলেরই সঙ্গীতজীবন উনিশ শতকের সৃষ্টি। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা সরোদ যন্ত্রে সাধনা করে গেছেন এবং তাঁদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি দিন বাংলা দেশে ছিলেন এনায়েৎ হোসেন খাঁ। বাংলা দেশে অর্থাৎ রাজেন্দ্রনারায়ণের ভাওয়াল দরবারে।

এনায়েৎ হোসেন দীর্ঘকাল ভাওয়ালে অবস্থান করলেও, লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এ দেশে তিনি কোন বাঙালী শিষ্য গঠন করেন নি। সেযুগের বেশির ভাগ পশ্চিমা সঙ্গীত ব্যবসায়ীর মতন তিনিও পত্তন করেছিলেন আত্মজদের নিয়ে গঠিত একটি সঙ্গীতজ্ঞ (এক্ষেত্রে সরোদবাদক) পরিবার। নিজ বংশের ধারাতেই তাঁর বিদ্যার চর্চা রক্ষিত হয়, বংশের অতিরিক্ত কাউকে এই বিদ্যা দান করা ঘটে ওঠে নি। প্রায় সব সরোদী পরিবারের মতন এই বংশও জাতিতে পাঠান। এঁদের পূর্বপুরুষরা কাবুল থেকে ভারতে আসেন এবং আদিতে তাঁরা ছিলেন কাবুলী-রবাব-বাদক।

এনায়েৎ হোসেনের পিতা হসেন আলী ছিলেন কাবুলী রবাবে ভারতীয় রাগ-বাদক এবং যুক্ত প্রদেশের রোহিলখণ্ড অঞ্চলের (রামপুরের নিকটস্থ) অধিবাসী। এনায়েৎ হোসেন এই বংশে প্রথমে সরোদ যন্ত্রের চর্চা

প্রবর্তন করেন। এনায়েৎ হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র পরবর্তী-কালের স্বনামধন্য সরোদী ফিদা হোসেন।

এনায়েৎ হোসেনের সঙ্গীত শিক্ষা পিতার কাছে বিশেষ হয় নি। তানসেনের পুত্রবংশীয় বাসৎ খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী মহম্মদ খাঁ'র (বড়কু মিঞা) কাছে তিনি কিছু শিখেছিলেন, এনায়েৎ হোসেনের উত্তর-পুরুষরা একথা বলেন। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানা যায় না। তাঁর পুত্র হলেন সাকায়েৎ হোসেন খাঁ সরোদী। এবং সাকায়েৎ হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাখাওৎ হোসেন সুবিখ্যাত কৌকব খাঁর জামাতা হয়ে এই বংশকে নিয়ামৎ উল্লা খাঁর ঘরাণার সঙ্গে যুক্ত করে-ছিলেন। তবে সেসব কথা এনায়েৎ হোসেনের পরের কালের কথা।

এনায়েৎ হোসেনকে রাজেন্দ্রনারায়ণ নিজের দরবারে নিযুক্ত রাখেন তাঁর সঙ্গে নিয়মিত তবলা সঙ্গত করবার জন্যে। এনায়েৎ হোসেনের সরোদ বাজনার সঙ্গে সঙ্গত করে রাজেন্দ্রনারায়ণ বড় আনন্দ পেতেন।

যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত করতেই ভালবাসতেন তিনি। গানের সঙ্গে কখনোই বাজাতেন না। সেই জন্যেই কোন গায়ককে নিযুক্ত করেন নি সঙ্গতের রেওয়াজের জন্যে।

তা ছাড়া তিনি বিলম্বিত লয়েও বাজাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। দ্রুত লয়ে বাজাতে স্ফূর্তি পেতেন এবং সেজন্যে যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গতেই ছিল তাঁর একান্ত আগ্রহ। আর এনায়েৎ হোসেনের দ্রুত লয়ের শরদ বাদনের সঙ্গে তিনি তা চরিতার্থ করবার সবচেয়ে সুযোগ পেতেন। সবচেয়ে বেশি বাজাতেনও এনায়েৎ হোসেনের সঙ্গে।

এনায়েৎ হোসেনও রাজেন্দ্রনারায়ণের মনের ঝোঁক বুঝে খুব বাড়িয়ে বাজাতেন। লয় বাড়াতেন আর বলতেন,—বাড়ুন, বাড়ুন, রাজা আরো বাড়ুন।

রাজেন্দ্রনারায়ণও যথাযোগ্য জলদে সঙ্গত করে যেতেন। সরোদী যত লয় বাড়াতেন, সঙ্গতকারও তত। বড় মজা পেতেন রাজা।

এমনিভাবে চলত আর জমত তাদের প্রায় প্রতি-দিনের আসর।

কিন্তু তাঁর আর একজন নিযুক্ত কলাবৎ কাসিম আলী খাঁ'র সঙ্গে বাজনাটা হ'ত অন্য রকম। আর তাই নিয়েই এই গল্প। সে এক অদ্ভুত আসরের দৃষ্টান্ত। তার পরিচায়ক এই শিরোনামাটিও সেজন্যে এমন অদ্ভুত হয়েছে।

রবাব ও বীণা বাদক কাসিম আলী খাঁ'র নাম অমর হয়ে আছে আমাদের সঙ্গীত-জগতে। তাঁর সম-সাময়িকদের মধ্যে যন্ত্রে এত বড় সঙ্গীত-প্রতিভা অতি অল্প ছিলেন। তানসেনের পুত্র-বংশীয় জাফর খাঁর পৌত্র এবং কাজাম খাঁ'র পুত্র তিনি। ঘরাণা ধ্রুপদ ও রাগালাপ এবং রবাব ও বীণা সাধনার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। সেকালের অবাঙালী এবং পেশাদার ওস্তাদদের ক্ষেত্রে যেমন হ'ত, তাঁরও তেমনি তালিম পাওয়া আর তালিম দেওয়া সবই নিজের ঘরে।

খুব কম বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গীত-জীবন আরম্ভ হয়েছিল। পিতা কাজাম আলী ও পিতৃব্য স্বনামধন্য বীণকার সাদিক আলী খাঁ'র কাছে তালিম নিতে থাকেন রবাব ও বীণায়। তারপর মেটিয়াবুরুজ দরবারে অবস্থান করবার সময়ে তাঁর খুল্ল পিতামহ বাসৎ খাঁকে পেয়ে-ছিলেন এবং তাঁর কাছেও যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগ পান। এইভাবে প্রথম জীবনে পশ্চিমে, বারাণসীতে (তানসেন বংশের একটি ধারার পরবর্তীকালের ভদ্রাসন) এবং পরে কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে কাসিম আলীর সঙ্গীত-জীবন গড়ে ওঠে।

বংশের ধারায় এবং চর্চা ও সাধনায় এই হ'ল কাসিম আলী খাঁ'র সঙ্গীত-জীবনের প্রথম পর্বের পরিচয় ও পটভূমি।

শিষ্য তাঁর বিশেষ কেউ ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর কাসিম আলী কাশী থেকে চলে আসেন কলকাতায়। প্রথমে নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারে নিযুক্ত থাকেন। তারপর বাংলার আরও নানা দরবারে বিভিন্ন সময়ে ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। শেষ পর্বই ভাওয়ালে কাটে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি শিষ্য গঠন করেন নি কোথাও। হয়ত তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজনকে এই সব স্থানের কোথাও পান নি বলেও তা হ'তে পারে।

অকৃতদার কাসিম আলীর নিজের যেমন কোন বংশ ছিল না, তেমনি দূর বাংলা দেশের নানা জায়গায় থাকবার কালে কোন অল্পবয়সী আত্মীয়ও থাকবার সুযোগ পান নি তাঁর কাছে। সে জন্যেও বোধ হয় তাঁর শিষ্য গড়া হয়ে ওঠে নি।

তা ছাড়া, তিনি ছিলেন যেমন গুণী, তেমনি গর্বিতও। প্রথম যখন বৃত্তিভোগী বীণকার হয়ে নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারে এলেন এবং সেখানে নিজ বংশের প্রবীণ গুণী বাসৎ খাঁকে পেয়ে তাঁর কাছে

বহু রাগ ও ধ্রুপদের ঘরাণা সঞ্চয় লাভ করে সাধনা সম্পূর্ণ করতে থাকেন, সে দরবারে তখন উদীয়মান সরোদী নিয়ামৎ উল্লা খাঁও ছিলেন। নিয়ামৎ উল্লা মেটিয়াবুরুজ দরবারে চাকুরিও করতেন আবার তালিম নিতেন বাসৎ খাঁ'র কাছে। কাসিম আলী নিয়ামৎ উল্লার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সঙ্গীত-বিত্তায়ও তখন প্রবীণতর। নিয়ামৎ উল্লার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও খুব ছিল মেটিয়াবুরুজে। অনেক সময়ে একই সঙ্গে থাকতেন। অবিবাহিত এবং সংসার-বিমুখ কাসিম আলীর সাংসারিক অনেক বিষয়ে তদারক করতেন, কেনা-কাটা করে দিতেন নিয়ামৎ উল্লা।

কাসিম আলী দিনের পর দিন নিয়ামৎ উল্লার সামনে রিয়াজও করে যেতেন, যা আর কারুর উপস্থিতিতে করতেন না। কারণ এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাই নিয়ামৎ উল্লার বিষয়ে ইঙ্গিত করে যদি কেউ তাঁকে বলতেন—আপনি যে নিয়ামতের সামনে এত বাজান, ও ত সব জিনিষ উড়িয়ে দেবে।

কাসিম আলী তখন নিজের অর্জিত বিত্তা সম্পর্কে অহমিকা প্রকাশ করে উত্তর দিতেন—কত ওড়াবে ওড়াক না। আমার এত জিনিষ আছে যা কোনদিন শেষ করতে পারবে না ও।

মেটিয়াবুরুজের পরে এক সময় কাসিম আলী পঞ্চকোট রাজ্যে ছিলেন। পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে (এখনকার পুরুলিয়া জেলায়)। সেখানে খাঁ সাহেব থাকবার সময় কাশীর ধ্রুপদ-গুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর গুণপনার পরিচয় পান এবং তাঁর 'সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন' পুস্তিকায় তার বিবরণ প্রকাশ করেন। মুখোপাধ্যায় মশায়ের সেই লেখা থেকে জানা যায় যে, কাসিম আলী শুধু যন্ত্রী ছিলেন না। একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ-গায়কও ছিলেন আগেকার আমলের অনেক যন্ত্র-সাধকের মতন। উপরন্তু তিনি গান করতেন নিজেরই সুর-যন্ত্রের সঙ্গতে, যার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

বিষয়টি কৌতূহল-উদ্দীপক। সেজন্যে প্রয়োজনীয় অংশ 'সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন' (১৩ পৃষ্ঠা) থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল—"প্রথমে কাশীপুরের রাজবাটীতে যাই। সেখানে কাসিম আলী খাঁ (রবাবী) ছিলেন। সন্ধ্যার সময় খাঁ সাহেবের সুরশৃঙ্গার বাজনা হইল। শ্রোতৃগণের মধ্যে রাজা এবং আমরাই কয়জন। খাঁ সাহেব একঘণ্টা আলাপ করিয়া গান করেন এবং বিষ্ণুপুরের একজন মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বাজান। বীণার সঙ্গে গান বলে আলী খাঁ'র শুনিয়াছিলাম, আর এই শুনিলাম। পরে আর শুনিতে পাই নাই। পরদিন প্রত্যুষেই খাঁ সাহেব রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনিও প্রাতে আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমাদের গান হইল ও খাঁ সাহেব বীণাতে সঙ্গত করিলেন। আমরা 'হরি মন সুমিরণ' ললিত রাগের গান করিলাম। খাঁ সাহেব বড়ই খুসী হইলেন এবং তিনিও 'সঘন বন ছায়ো' ললিতের ধ্রুপদ গান করিলেন এবং বীণাতে সঙ্গত করিলেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে খাঁ সাহেব বৈকাল বেলায় বীণায় আলাপ করিলেন ও সাময়িক রাগে গান করিলেন।"

হরিনারায়ণের এই বইখানিতে কাসিম আলী খাঁ ও যদু ভট্টের একটি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, যা ত্রিপুরার রাজ-দরবারে ঘটেছিল বলে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু 'সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন' পড়লে মনে হয় ঘটনাটি পঞ্চকোটের ব্যাপার। যদু ভট্টের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই এই প্রসঙ্গ হরিনারায়ণ স্বয়ং পঞ্চকোট-রাজের মুখে শুনেছিলেন বলে তাঁর বিবৃতির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তিনি এইভাবে ঘটনাটির কথা বলেছেন (উক্ত পুস্তিকার ১৬-১৮ পৃষ্ঠায়): 'সন্ধ্যার পর আহারান্তে রাজার সহিত রামদাসবাবুর (শ্রীরামপুরের রামদাস গোস্বামী, ধ্রুপদী রসুল বখসের শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং হরিনারায়ণের সঙ্গীতগুরু—বর্ত্তমান লেখক) সঙ্গীত সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন হইল।...যদু ভট্টজী নামে একজন গায়ক সেখানে ছিলেন; তাঁহার কণ্ঠ ভাল ছিল এবং তিনি অসাধারণ মেধাবীও ছিলেন। কিন্তু ভাল মাথা থাকিলেই যে কাহারও নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন না, ইহা হইতে পারে না। রাজা এই সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়কে একটি ঘটনা শুনাইলেন। যদু ভট্ট কোন সময়ে দরবারী কানাড়া গান করিতেছিলেন এবং কাসিম আলী খাঁ শুনিতেছিলেন। গান শেষ হইলে খাঁ সাহেব বীণাতে ঐ রাগ আলাপ করিয়া একখানি গান করিলেন, স্পষ্ট দেখা গেল, দুইজনের গানে বহু ভেদ। ভট্ট মহাশয় খাঁ সাহেবকে বলিলেন, 'আমাকে বীণা শিখান।' খাঁ সাহেব বলিলেন, নিজ বংশ (অওলাদ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও বীণা শিখাইবার আদেশ নাই। তবে তুমি সেতার কিংবা গান শিক্ষা করিতে পার।' ভট্ট মহাশয় বলিলেন, 'আমি বীণাই শিখিব।' ইঁহারা উভয়েই রাজ-দরবারে থাকিতেন; খাঁ সাহেব যখন দরবারে বাজাইতেন, তখন ভট্ট মহাশয় রাজকর্মচারিদিগের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া সেই বাজনা অভ্যাস করিতেন; পাঁচ-ছয় মাস

এইরূপে কাটিয়া গেল ; খাঁ সাহেব···মধ্যে মধ্যে রাজার বিনানুমতিতেই তাঁহার নিকট আসিতেন। কোন সময়ে ভট্টজী সেতার বাজাইতেছিলেন এবং রাজা শুনিতেছিলেন ; এমন সময়ে খাঁ সাহেব হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্ট মহাশয় তন্ময় হইয়া সেই তানগুলি—যেগুলি লুকাইয়া শিখিয়াছিলেন, বাজাইলেন। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট্টজী, এই তানগুলি কোথায় শিখিলেন ?' ভট্টজী বলিলেন, 'এগুলি আমাদেরই ঘরের।' খাঁ সাহেব বলিলেন, 'এ বিষ্ণুপুরের ঢঙ নহে, আপনি উড়াইয়া (চুরি করিয়া) লইয়াছেন।' খাঁ সাহেব এই কথা বলিয়া রাজাকে বলিলেন, 'আপনার চাকরদের জিজ্ঞাসা করুন, ভট্টজী তাহাদের ঘরে লুকাইয়া থাকেন কি না এবং আমি যখন বাজাই, তখন সেগুলি তিনি লুকাইয়া অভ্যাস করেন কি না ?' অবশ্য ভট্টজী ধরা পড়িয়া গেলেন ;···রাজা এইরূপ কথোপকথনের পর আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'গুরু সমীপে থাকিয়া গুরুর সেবা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর।'···

উত্তর-জীবনে কাসিম আলী খাঁ ত্রিপুরার রাজদরবারেও অবস্থান করেন। সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের শিবপুর গ্রামের বাদ্যকর বৃত্তিজীবী সদু খাঁ (ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ'র পিতা) কাসিম আলীর শিক্ষা পান ব'লে কথিত আছে। কিন্তু তা নামে মাত্র এবং সেজন্যে সদু খাঁকে কাসিম আলীর শিষ্য বলা যায় না। কারণ, সদু খাঁ ওস্তাদজীর কাছে না কি পান ইমন ও ছায়ানটের একটি করে গৎ মাত্র—আলাপ বা রাগপদ্ধতি নয়।

ত্রিপুরার দরবার থেকে কাসিম আলী যান ভাওয়াল-রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের আশ্রয়ে। (এখানে তিনি এনায়েৎ হোসেন খাঁ'র মতন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিলেন। কাসিম আলী খাঁর হাতের যন্ত্রও ভাওয়াল-দরবারে রক্ষিত ছিল তাঁর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ।)

কাসিম আলীর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব কি রকম ছিল, তার কিছু পরিচয় এই সব খণ্ড চিত্র থেকে পাওয়া গেল।

এ হেন কাসিম আলী খাঁ ভাওয়াল-দরবারে নিযুক্ত হয়েও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন নিজের মেজাজ, মর্জি আর সাঙ্গীতিক সত্তা।

শোনা গেছে যে, রবাব ও বীণা যন্ত্রে তিনি বেশি সাধনা করলেও এবং সুরশৃঙ্গার ইচ্ছা মতন বাজালেও উত্তরজীবনে তাঁর বেশি ঝোঁক পড়েছিল বীণাবাদনে। যেমন প্রথম জীবনে রবাব তাঁর রাগ চর্চার প্রিয়তর মাধ্যম ছিল। ভাওয়াল-রাজার আসরে, ত্রিপুরার দরবারের মতন, তিনি বীণাই বাজাতেন বেশি।

বীণায় রাগালাপ ক'রে উপসংহারে তারপরণ বাজাতেন। রাগের আলাপচারির সময় সঙ্গত চলে না, কিন্তু তারপরণে সঙ্গতের প্রয়োজন। বীণাযন্ত্রের তারপরণে সুযোগ্য সঙ্গত হয় মৃদঙ্গে বা পাখোয়াজে। তারপরণের সঙ্গে তবলা সঙ্গতের চলন নেই।

যেমন ধ্রুপদ গানে, তেমনি বীণার সঙ্গে সঙ্গতের অধিকারী পাখোয়াজ। এক্ষেত্রে তবলার আভিজাত্য গুণীসমাজে স্বীকৃত নয়। তারপরণের সঙ্গতে যে সব বোল পাখোয়াজে বাজে তা তবলাতেও ওঠানো যেতে পারে। তবু ব্যাপার হ'ল ধ্বনির ধরন-ধারণ নিয়ে। তবলার নিক্কণ পাখোয়াজের মেঘ-মন্দ্র ধ্বনির তুলনায় ধ্রুপদীরা ও বীণকাররা চটুল মনে করেন। তাই পাখোয়াজের গম্ভীর নিনাদেই সঙ্গত হয়ে থাকে বীণার তারপরণ। কাসিম আলী খাঁও সেই রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

এদিকে রাজেন্দ্রনারায়ণের সাধ ও সাধনা তবলায়, পাখোয়াজে নয়। এ যন্ত্র তিনি কখনও বাজান নি। এবং তিনি কাসিম আলীর সঙ্গে সঙ্গত করতে চান। বিশেষ যখন খাঁ সাহেব নিযুক্তই রয়েছেন দরবারে। সুতরাং তিনি ওস্তাদজীর বীণার সঙ্গে তবলা নিয়েই বাজাতে বসতেন।

এ তাঁর নিজস্ব সভা হ'লেও রীতিমত আসর। কাসিম আলী ত নিজের ঘরের মধ্যে বাজাচ্ছেন না। তাই রীতি-নীতি আদব-কায়দার নড়চড় বরদাস্ত হয় না তাঁর।

খাঁ সাহেব তবলিয়া রাজাকে প্রথম প্রথম নিরস্ত করতে চাইতেন। তাঁর তবলা সঙ্গতের তোড়জোড় দেখে আপত্তি জানিয়ে বলতেন, 'আপনার তবলার সঙ্গত আমি জানি না।'

রাজেন্দ্রনারায়ণও ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। তিনি জানিয়ে দেন যে, বাজনা তিনি বন্ধ করবেন না। কি ক্ষতি তবলা বাজালে ?

শেষ পর্যন্ত কাসিম আলী বলতেন, 'বেশ, বাজান আপনার যা খুসি। কিন্তু আমি আপনার দিকে মুখ করে বাজাব না। দেয়ালের দিকে ফিরে বসব আমি।'

সত্যিই তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে বসে বাজিয়ে যেতেন বীণা। আর তাঁর পিছনে বসে রাজেন্দ্রনারায়ণ তবলায় সঙ্গত করতেন।

এমনি ভাবে চলত দিনের পর দিন অসহযোগী কাসিম আলীর বীণায় তারপরণের সঙ্গে ভাওয়াল-রাজের তবলা সহযোগিতা।

এমন পিছন থেকে নিয়মিত সঙ্গতের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় নি।

(১২) ওস্তাদের মুরেঠা

আসরে এ একটা দেখবার মতন বস্তু ছিল। এমন অনন্ত সাজ। চেহারায় ও বেশভূষায় স্পষ্টতই বাঙালী। কিন্তু মাথায় পরিপাটি করে চড়িয়েছেন পশ্চিমা পাগড়ি।

যাঁরা এই মুরেঠার রহস্য জানেন না, তাঁরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন গায়কের দিকে। যাঁরা জানেন, তাঁরা আর ওই নিয়ে মাথা ঘামান না। মন দিয়ে তাঁর গান শুনতে বসেন। অতিশয় দরাজ আর সুরেলা সেই গলায় গান। বিশেষ যদি তিনি শোনান চৌতালে আড়ানার সেই জমাটি গানখানি—হে যদুনাথ।

গানটি তানসেনের রচিত ধ্রুপদ। উদাত্ত কণ্ঠে উত্তরাঙ্গ-প্রধান আড়ানার এই গান গেয়ে কত ভাল ভাল আসর যে সেকালে মাৎ করতেন, তা তখনকার শ্রোতারা অনেকেই জানতেন। এক একটি রাগে এক একজন গায়ক সিদ্ধ হন, অনেক সময়ে দেখা যায়। ইনিও তেমনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন আড়ানার সাধনায়। আর তানসেনের রচনা তাঁর প্রিয় ওই গানখানি অনেক আসরেই গাইতে অনুরুদ্ধ হতেন, এমন খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

গায়কের নাম বিনোদ গোস্বামী। ওজস্বী কণ্ঠে ধ্রুপদ গানের জন্যে তখনকার দিনে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আগেকার অনেক সঙ্গীতগুণীরই মতন তাঁর নাম একালের দরবার পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি নানা কারণে। তাই নামটি এখনকার সঙ্গীতজগতে একরকম অপরিচিত বলা যায়।

পাখোয়াজ-গুণী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যের এক অগ্রজ ছিলেন সন্তোষচন্দ্র নামে। তিনি ধ্রুপদ গায়ক। সন্তোষচন্দ্রের সঙ্গীতগুরু হলেন বিনোদ গোস্বামী। দুর্লভচন্দ্র তাই গোস্বামী মশায়ের সঙ্গীত-জীবন খুব ভালভাবে জানতেন।

বিনোদ গোস্বামীর গান অনেকদিন তিনি শুনেছেন, অনেক আসরে বাজিয়েছেন তাঁর সঙ্গে। গোস্বামী মশায় যে কত বড় গুণী ছিলেন তাঁর সে বিষয়ে সাক্ষাৎ ধারণা ছিল। আর সে সব গানের রীতি-নীতি ধরন-ধারণ, গায়কের ব্যক্তিত্ব সবই তাঁর স্মৃতির পটে মুদ্রিত হয়েছিল বরাবরের জন্যে।

তাই বহুদিন পরেও, সে ধ্রুপদী যখন ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন এবং দুর্লভচন্দ্রও যখন প্রাচীন হয়েছেন, তখনও তিনি তাঁর গানের প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে উঠেছেন—'সে কি গলা ছিল রে! হে যদুনাথ গানটা কি চমৎকার যে গাইতেন। ওই গান ত তোরাও করিস, কিন্তু গোস্বামী মশায়ের গান মনে পড়লে মনে হয় যেন গানটাকে ভেঙচি কাটছিস! তাঁর ওই আড়ানার গানটা শুনে মোরাদ খাঁ'র মতন ধ্রুপদী এক আসরে কি তারিফই করেছিলেন।'

এই ব'লে বিনোদ গোস্বামীর সেই আসরের গল্পটা শোনাতেন। এক আসর লোকের সামনে নিজের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়ার সেই নাটকীয় ঘটনা। সে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের প্রথম দিকের কথা। তখন তাঁর যুবক বয়স। সঙ্গীতশিক্ষার্থী। নাম-ডাক হয় নি। সঙ্গীতজ্ঞ মহলে বিশেষ কেউ চিনত না তাঁকে। কিন্তু সেই আসর থেকেই খ্যাতির সোপান বেয়ে ক্রমশঃ উঠতে থাকেন।

সে আসরের ঘটনাটা বলবার আগে তাঁর জীবনের কথা কিছু জানিয়ে রাখা যাক।

অমন গুণী গায়ক হয়েও তিনি কিন্তু সঙ্গীত-ব্যবসায়ী বা পেশাদার হন নি পশ্চিমা কলাবতদের মতন। সেকালের বেশির ভাগ বাঙালী সঙ্গীতসেবীদের মতন অপেশাদার ছিলেন।

তাঁর বৃত্তি ছিল কথকতা। ভাল কথক ছিলেন এবং তাইতেই তাঁর সাংসারিক অভাব মিটে যেত। সে-যুগের বাংলার আসরে এমন কয়েকজন শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁরা ছিলেন একাধারে গায়ক ও কথক। তবে বিনোদ গোস্বামী ভিন্ন বেশির ভাগ গায়ক-কথকরা টপ্পা অঙ্গে গাইতেন। গোস্বামী মশায়ের মতন ধ্রুপদী অথচ কথক এমন বেশি শোনা যায় না।

যেমন রাণাঘাটের সুকণ্ঠ গায়ক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চন্দননগরের গুণী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা তাঁদের অনেক আগেকার বিখ্যাত শ্রীধর কথক প্রভৃতি সকলেই ছিলেন টপ্পা-গায়ক এবং কথক। কেউই তাঁরা ধ্রুপদ-গায়ক ছিলেন না বিনোদ গোস্বামীর মতন।

তাঁর সঙ্গীতের চর্চা কম বয়স থেকেই আরম্ভ হয়। ছেলেবেলাতেই প্রকাশ পায় যে তাঁর গানের গলা ভাল। বর্ধমান জেলার বোঁয়াই গ্রামে জন্ম। কলকাতায় প্রথম গান শেখেন আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে। সেই প্রথম রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা।

তারপর একনিষ্ঠভাবে সাধনা করে চলেন—সুকণ্ঠের, সুরের। পরে মুরাদ খাঁ'র শিষ্য হন।

মুরাদ খাঁ সেকালের এক গুণী পশ্চিমা ধ্রুপদী, বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে অনেকদিন অবস্থান করে-

ছিলেন। তিনি কোন্ সঙ্গীতকেন্দ্র থেকে বাংলায় আসেন তা জানা যায় না। আর মনে হয়, একাধিক মুরাদ খাঁ বা মুরাদ আলী খাঁ এসেছিলেন বাংলা দেশে। বিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ (যিনি তানসেনের পুত্র-বংশীয় হায়দর খাঁ'র প্রশিষ্য এবং ঘসিট খাঁ'র শিষ্য বলে কথিত আছে)—যাঁর শিষ্য ছিলেন যদুনাথ রায়, কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ঘোষ, আশুতোষ রায় প্রভৃতি—এবং বিনোদ গোস্বামীর এই দ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু মুরাদ খাঁ সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি। শ্রীরামপুরের ধ্রুপদগুণী রামদাস গোস্বামীর প্রথম ওস্তাদও ছিলেন জনৈক মুরাদ খাঁ, তবে তাঁর একটি (নিজ গুণে উপার্জিত?) উপাধি ছিল, 'ডাণ্ডেবাজ'। বিনোদ গোস্বামীর উক্ত দ্বিতীয় ওস্তাদ মুরাদ খাঁ এই বিচিত্র পরিচয় বহন করতেন কি না এবং রামদাস গোস্বামীর প্রথম সঙ্গীতগুরুর সঙ্গে অভিন্ন ছিলেন কি না, সঠিক জানা যায় নি। তবে এই শেষোক্ত দু'জন হ'তেও পারেন একই ব্যক্তি।...

সে যা হোক, মুরাদ খাঁ'র তালিমের পরও আরও গুরুকরণ করেছিলেন গোস্বামী মশায়। আরও দু'জন ধ্রুপদাচার্যের শিক্ষা সুদীর্ঘকাল যাবৎ গ্রহণ করেন। বলতে গেলে, প্রায় সারা জীবনই শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি।

মুরাদ খাঁ'র পরে প্রথম কয়েক বছর বেতিয়া ঘরাণার এক নেতৃস্থানীয় গুণী শিবনারায়ণ মিশ্রের কাছে তাঁদের ঘরাণা ধ্রুপদ শিখতে লাগলেন। বছরের পর বছর কলকাতায় তালিম নিলেন তাঁর কাছে।

তার পর বারাণসীর অন্য এক প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী কামতাপ্রসাদের কাছে নতুন সম্পদ আহরণ আরম্ভ করলেন। কামতাপ্রসাদও দীর্ঘকাল কলকাতায় ছিলেন এবং রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। কামতাপ্রসাদ বিশেষ করে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গানের জন্যে খ্যাতিমান হন। এবং গোস্বামী মশাই কয়েক বছর খাণ্ডারবাণী রীতিই শিক্ষা করেন তাঁর কাছে।

এমনিভাবে সুদীর্ঘকালের শিক্ষা ও সাধনায় বিনোদ গোস্বামীর সঙ্গীতজীবন, তাঁর ধ্রুপদ গানের রীতিনীতি গড়ে ওঠে।

তাঁর যে আসরটির উল্লেখ আগে করা হয়েছে, যে আসর থেকে তিনি প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন সেটি ঘটেছিল তাঁর দ্বিতীয় ওস্তাদের কাছে শিক্ষার সময়ে। অর্থাৎ তখন তিনি মুরাদ খাঁ'র শিষ্য। মুরাদ খাঁর অধীনে কিছুদিন যাবৎ শিখতে আরম্ভ করেছেন।

সেই সময় তিনি একদিন কলকাতার একটি আসরে গেছেন ওস্তাদজীর সঙ্গে। নিজে গাইবার জন্যে নয়, মুরাদ খাঁ'র গান শোনবার জন্যে এবং তাঁর শিষ্য হিসেবেই গিয়েছিলেন। ওস্তাদ যেমন ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে যান, তানপুরা ছাড়া ইত্যাদি কাজের জন্যে।

ভাল আসর এবং ধ্রুপদের আসর। কয়েকজন বড় ধ্রুপদী, তাঁদের একাধিক ভারতবিখ্যাতও, সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। মুরাদ খাঁ ভিন্ন আছেন রসুল বখ্স ধ্রুপদী (আলী বখ্সের ভ্রাতা এবং রামদাস গোস্বামীর ওস্তাদ) প্রভৃতি।

স্থানীয় দু'একজনের গানের পর রসুল বখ্স হঠাৎ বিনোদ গোস্বামীকে গাইতে বললেন। আগেকার আমলে এ রকম হ'ত অনেক আসরে। তরুণ শিল্পীদের প্রবীণেরা আত্মপ্রকাশের এমন সুযোগ দিতেন।

রসুল বখ্সের শিষ্টাচারের আহ্বান শুনে একটু বিব্রত বোধ করলেন মুরাদ খাঁ। এত বড় বড় গায়কের সামনে এত বড় আসরে বিনোদ কি গাইতে পারবে? সে গান কি ভাল লাগবে এঁদের?

তাই তিনি রসুল বখ্সের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেবার জন্যে বললেন—ও এখন খুব বেশি শেখে নি, যা সকলকে শোনানো যায়। মাত্র কিছুদিন শিখছে।

কিন্তু তবু রসুল বখ্স উপরোধ করতে লাগলেন গাইবার জন্যে।

তখন মুরাদ খাঁ শিষ্যকে জনান্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, গাইতে সাহস হবে?

তিনি বললেন, ওস্তাদের হুকুম পেলে একবার চেষ্টা করতে পারি। ভয়ের কি আছে?

এ কথায় মুরাদ খাঁ তাঁকে অনুমতি দিলেন।

বিনোদ গোস্বামী তখন উদাত্ত কণ্ঠে আড়ানার সেই গানখানি ধরলেন—হে যদুনাথ...।

উত্তরাঙ্গে গানটি আরম্ভ করতেই সমস্ত আসর সচকিত হয়ে উঠল! সকলের অবাক্ দৃষ্টি পড়ল অপরিচিত এই যুবকটির ওপর।

বড় বড় গায়কদের পর্যন্ত আশ্চর্য করে দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন। সপ্রতিভ ভাবে, অটুট তাল-লয়ে, 'সুরিলি' গলায়।

স্বয়ং মুরাদ খাঁ বিস্মিত হলেন সবচেয়ে বেশি। তিনি এতখানি আশা করেন নি, যদিও জানতেন ছোকরার এলেম আছে।

খানিক আগেও যিনি অল্পশিক্ষিত বলে আসরে পরিচিত হয়েছিলেন এখন তাঁর শিক্ষিত পটুত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রোতারা।

গান শেষ হ'তে রসুল বখ্‌স সবার আগে গায়ককে সাবাস দিয়ে তারিফ করলেন। অন্য সকলেও প্রশংসা করতে লাগলেন খুব।

আর মুরাদ খাঁ একটি দেখবার মতন পুরস্কার দিলেন। নিজের মাথা থেকে আগুন-রাঙা পেঁচদার পাগড়িটি খুলে নিয়ে শিষ্যের মাথায় পরিয়ে দিলেন সস্নেহে সগর্বে। আর আশীর্বাদ করে বললেন, 'আজকের এই বিশেষ দিনটা মনে রেখ। আমার মুরেঠা মাথায় চড়িয়ে আসরে গাইতে যেও।'

আসরে একটি স্নিগ্ধ আনন্দ পরিবেশ সৃষ্টি হ'ল। ধন্য ধন্য রব শোনা গেল কোন কোন শ্রোতার মুখে। শিষ্যকে ওস্তাদ নিজের মাথার পাগড়ি খুলে দিয়েছেন এমন সুন্দর দৃশ্য তাঁরা কখনও দেখেন নি!

ওস্তাদের সেই স্নেহের আদেশ কোনদিন গোস্বামী মশায় অমান্য করেন নি বা ভুলে যান নি। জীবনের শেষ পর্যন্ত, যতদিন যত আসরে গাইবার জন্যে উপস্থিত হয়েছেন, বরাবর দেখা গেছে তাঁর মাথায় সেই টকটকে লাল মুরেঠাটি।

...বলপ্রয়োগ আর 'হিংসা' এক জিনিষ নয়। আত্মরক্ষার জন্যে বলপ্রয়োগে, দুর্ব্বলের সাহায্যের ও রক্ষার জন্যে বলপ্রয়োগে হিংসার লেশমাত্র নাই ততক্ষণ যতক্ষণ না বল যার উপর বা বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে তাকে মেরে ফেলা, জখম করা বা অন্য প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করা না হচ্ছে, কিংবা সেরূপ অভিপ্রায় সেই বলপ্রয়োগে না থাকছে। আত্মরক্ষার জন্যে, আবশ্যক হলে, আততায়ীকে বধ করা পর্যন্ত আমরা অবৈধ মনে করি না। তবে একথা ঠিক যে, কেউ যদি আক্রান্ত হলেও, আত্মরক্ষার জন্যে আবশ্যক সাহস ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও এবং আততায়ীকে বধ করা ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য উপায় না থাকলেও, বরং নিজের প্রাণ দেন তবু আততায়ীর প্রাণ বধ করেন না, বা করতে চান না, তাঁর সাত্ত্বিকতা স্বীকার করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে করুন যদি কোন দুর্বৃত্ত কোন নারীর সতীত্ব নাশ করবার উপক্রম করে, এবং তাকে বধ করা ছাড়া সেই দুষ্কর্ম্মে বাধা দেবার অন্য উপায় না থাকে, তা হলে তাকে বধ করা বৈধ এবং বধ না করাই অধর্ম্ম এবং তার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে দেওয়া অহিংসা নয়, ঘৃণ্য কাপুরুষতা।...

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৮

পরিবর্ত্তন

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

প্লেন থেকে নেমে অবধি দেবযানী দেখছে কলকাতায় কত পরিবর্ত্তন হয়েছে! মাত্র পাঁচটি বছর। এই পাঁচ বছরেই এত পরিবর্ত্তন? দু'দিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে এই পরিবর্ত্তনই চোখে পড়তে লাগল। পরিবর্ত্তনের কোনটা সুখপ্রদ, কোনটা বা বেদনাদায়ক। ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের দৌলতে সহরের ছবিই গেছে বদলে। কত নতুন সুন্দর সড়ক হয়েছে। নামকরণ হয়েছে সরণী বলে। সহরতলীগুলিকে জাতে তোলা হয়েছে বরং তারাই এখন হয়েছে পাঙ্‌ক্তেয় পুরতঃ। আধুনিক রুচিসম্পন্নজন সাবেকী বনেদী সহর পরিত্যাগ করে এই সদ্যজাত সহরে এসে ভীড় করেছে। কত অরণ্য কেটে নগর বসান হ'ল, কত জলাভূমি ও ধানজমিতে গজিয়ে উঠল ইমারতশ্রেণী। আবার স্মৃতিজড়িত কত প্রাচীন সৌধ ধূলিসাৎ হয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে দেবযানী ব্যথা পেতে লাগল। সব চেয়ে বেদনা পেল যখন সে দাঁড়াল গিয়ে হেয়ার স্কুলের দক্ষিণে। কোথায় সেই বহু স্মৃতিজড়িত সেনেট হল? তার জায়গায় স্তরে স্তরে উদীয়মান উত্তুঙ্গ প্রাসাদ।

এই সেনেট হলেই প্রসূনের সঙ্গে তার প্রথম দেখা। এই সেনেট্ হল্‌কেই প্রদক্ষিণ করে ছেলেমেয়ে পড়ুয়াদের কতই না, বলতে গেলে, লুকোচুরি খেলা! হ্যাঁ, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাটাও সময়ে সময়ে চলত এই এম. এ. ক্লাসে উঠেও। খেলায় থাকে হারজিত, থাকে মান-অভিমান। অতীতকে ভাবতে ভাবতে বর্ত্তমান সম্বিৎ ডুবে গেল দেবযানীর।

সম্বিৎ তার ফিরে এল হঠাৎ পিছন থেকে আচমকা কার করস্পর্শে? ফিরেই অবাক।

"আরে, অণিমা যে! কি আশ্চর্য্য, আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

"ইস্? সত্যি? কি ভাবছিলে?"

"ভাবছিলাম, কোথায় তুমি আছ জানতে পারলে বেশ হ'ত। কিন্তু তুমি ত বদলাও নি বিশেষ এই পাঁচ বছরে।"

"বদলাও নি তুমিও। তবে হ্যাঁ, সুদূর বিদেশে থাকার দরুন বিদেশীনী মার্কা কেশবিন্যাসটি বেশ প্রকট।"

"প্রকট! মানে পছন্দ নয়?"

"নিশ্চয় পছন্দ। তোমার মাথার বাহার কি পছন্দ না করে পারি? তবে এটাকে কি খোঁপা বলব? টেলিফোন খোঁপা? না, খোড়া সূর্য্যমুখী?"

"নে নে, বাজে কথা রাখ্ ত এখন। বল, কোথায় থাকিস্। এতকাল পড়ে দেশে ফিরেছি, তোকে হঠাৎ পেয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে! সহজে ছাড়ছি না আজ তোকে। তুই সব বুঝিয়ে দিবি আমায় এই পরিবর্ত্তিত সহরের রহস্য। আচ্ছা, এটা কি হ'ল? সেনেট্ হলের জায়গায় এটা কি গগনবিহারী প্রাসাদ?"

"এটা হয়েছে ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী।"

"লাইব্রেরী! সাধু, সাধু! পড়াশুনার আয়োজন ত পেল্লয়, এখন সেই অনুপাতে পড়ুয়া এক পাল পেলে হয়।"

"যা বলেছিস্ ভাই!"

"সেনেট্ হল্‌টা ছিল আমাদের কত স্মৃতিজড়িত।"

"সত্যি ভাই। আর একটা স্মৃতিজড়িত স্থানের এই দশা ঘটেছে। তোর মনে আছে নিশ্চয় আমরা দল বেঁধে চৌরঙ্গীর সেন্ট্ পল্‌স্ গির্জ্জাটার উত্তরে বিরাট ঘন দেবদারু সারির তলায় বসে কত জটলা করেছি, মুখে করেছি তর্জ্জন-গর্জ্জন, হাস্যপরিহাস, আর ডালমুট চর্ব্বণ। সেই জায়গা —মানে সেই আকাশচুম্বী দেবদারু পংক্তিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে বসেছে প্ল্যানেটেরিয়াম্। গাছগুলোকে যখন কাটছিল তখন আমার চোখে জল আসছিল। মনে পড়ছিল অ্যাডিসন্ এমনি দুঃখেই স্পেক্‌টেটারে লিখেছিলেন 'সেভেন্ সিস্‌টার্স' নামে নিবন্ধটি যখন কাঠুরিয়ারা কাটতে এল সাত পুরুষের সাতটি বিরাট পাইন বৃক্ষ।"

"তাই না কি? প্ল্যানেটেরিয়াম বসেছে সেখানে? ওদিকটায় এখনো যাওয়া হয় নি আমার। আচ্ছা, তোর সঙ্গে এখন থেকে ঘুরব। বল, কোথা থাকিস্। ওমা? এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। বিয়ে হয়েছে দেখছি। আলগোছে একটুখানি সিঁদুরের অ্যাপলজি সিঁথির এক কোনে ছুঁইয়ে রেখেছিস। যাঁকে বেঁধেছিস্, তাঁকেও আলগোছে আলতো ভাবেই রাখিস্ নি ত?

"বন্ধনটা আমাদের আলতো কি পোক্ত দেখবি চল না।

এই ত এসেই পড়েছি প্রায় আমার বাড়ীর কাছে কথা বলতে বলতে।"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল—সুকিয়া ষ্ট্রীট কলকাতা থেকে লুপ্ত হয়ে গেল? যে সুকিয়া সাহেব ছিলেন কলকাতা ও হাওড়ার একজন দানবীর, সেই নাম হ'ল লুপ্ত?"

"যা বলেছিস্ ভাই। হ্যাঁ, যখন রাস্তাটার নাম বদল হবার কথা চলছিল তখন সুনীতি চাটুয্যে কত লিখলেন খবরের কাগজে সুকিয়া সাহেবের দয়ার কথা, দানের কথা বর্ণনা ক'রে, কিন্তু—"

"ঐ ত? কাগজে লিখেই খালাস! তাতে কখনও কাজ কিছু হয়? আঘাত করতে হয় গিয়ে সিংহদ্বারে সিংহবিক্রমে, তবে ত কাজ হয়। একটা কাজ আমার মনে হয় করা দরকার এই যে, যত রাস্তার নাম যত লোকের নামে হয়েছে, সেই সকল লোকেদের ছোট ছোট জীবনকথা লিখে রাখা উচিত, অন্ততঃ কর্পোরেশনের লাইব্রেরীতে। তবে না জানবে যত সব নবাগত ছোকরা কাউন্সিলাররা বিগত জনের ইতিহাস। তবেই নাম বদলাবার আগে দশবার ভাববে তারা। আর জীবনীগুলি ঐতিহাসিকদের কাজেও বেশ লাগবে।"

"আরে রাখ তোর ঐতিহাসিক গবেষণা। এই ত সবে পদার্পণ করেছিস্ দেশে। দেশকে এখনও চিনিস্ নি ত। এ সবই রূপচাঁদের খেলা। সেও রূপেয়া বদল কর নাম। যাক্ গে ওসব কথা এখন। আমরা এসে পড়েছি, এই আমাদের বাড়ী। আয়, চলে আয় সোজা আমার সঙ্গে।"

[দুই]

এম্. এ. ক্লাসের আরম্ভ, সে এক উন্মাদনার যুগ। অজানা ছাত্রছাত্রী সব। অজানার মাঝে আছে রহস্য, আছে আনন্দ-আতঙ্ক, আছে আশাতীত সম্ভাবনা। হ্যাঁ, মেয়েদের মহলে আতংকই সৃষ্টি করেছিল কিছুকাল প্রগলভ, দুর্দান্ত, উদ্ধত যে ছেলেটি, তার নাম প্রসূন। মেয়েদের সঙ্গে তখনো তার আলাপ হয় নি, অথচ পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে নেপথ্যে কিন্তু তাদের শুনিয়েই চালাত তার মন্তব্য-রাশি—"না, জুতোর রংটার সংগে শাড়ীর আঁচলটা মোটেই ম্যাচ করে নি" বা "আজকের প্রসাধন মানে মেক-আপ একেবারে মারভেলাস—যেন সিনেমা-ষ্টার" অথবা "হ্যাঁ, গোধূলি লগ্নের সাজ বটে, তবে এখুনি কেন?" ইত্যাদি।

দেবযানী রাগে জ্বলতে থাকে। অথচ রাগের অণুতে অনুরাগের আকর্ষণও যেন সঞ্চিত হতে থাকে নিভৃতে। সহপাঠিনীদের সঙ্গে পরামর্শ চলত—এর একটা বিহিত কি করা যায়? এমন সময় যে মেয়েটি সুরাহা করে দিল তার নাম ঝর্ণা। একদিন ক্লাস ছুটির পর যেই প্রসূনের ক্রতপদ সহপাঠিনীদের দিকে এগিয়ে আসছে এবং মুখের কিছু মন্তব্য যুক্তির অপেক্ষা করছে এমন সময় ঝর্ণা সকলকে চমক লাগিয়ে এক কাণ্ড ক'রে বসল: প্রসূনের একেবারে সামনে গিয়ে বলে বসল, "দেখ প্রসূন! আজকের কবিতাটার লাস্ট ষ্ট্যানজাটার মানে কি যে বললেন প্রফেসর বোস কিছুই বুঝলাম না। তুমি একটু বুঝিয়ে দেবে? চল না সেনেট হলের পাশে ঐ গাছতলায় গিয়ে একটু বসি আমরা।"

কথাটা বলার একটা উপযুক্ততা ছিল বটে। কারণ ক্লাসের বাইরে প্রসূন যেমন প্রগলভ ও দুর্দান্ত, ক্লাসে যতক্ষণ ব'সে থাকে ঠিক তার উল্টো—একেবারে নিবিষ্টমন এবং শান্তচিত্ত। তন্ময় হয়ে তখন প্রফেসরের বক্তৃতা শুনত এবং পড়ার মধ্যে ডুবেই যেত। তাছাড়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে খাস সাহেবদের কাছে ইংরেজী শিখেছে ব'লে ভাষাটার উপর খুব দখল করতে পেরেছে। আর একটা কথা, ছেলেটি ক্রিশ্চান ব'লে ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজীটা তার রপ্ত।

তবে হ্যাঁ, একেবারে সরাসরি নাম ধরে ডাকা ও 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করা সকলকে ও প্রসূনকেও অবাক ক'রে দেবার মত বই কি। সাধারণ দৃষ্টিতে সকলেই ঝর্ণাকে শান্তশিষ্ট স্বল্পভাষী নম্র মেয়ে বলেই জানে। কিন্তু অন্তরে সে তেজস্বিনী আর অন্তর্দৃষ্টি তার স্বচ্ছ। সেই দৃষ্টিতে সহজেই সে পরিষ্কার চিনে নিতে পারে গুণী লোকের বাইরের ভেক আবরণ ভেদ ক'রে অন্তরের রত্নরাজি। প্রসূনের মূল্য সেই দৃষ্টিতেই বুঝে নিয়েছে ব'লেই তার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বেই তাকে শ্রদ্ধা করেছে এবং সহপাঠীর বন্ধুত্ব দাবি করেছে। তাই 'তুমি' বলতে বাধা হ'ল না, কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে বলায় সংকোচ হ'ল না। তাছাড়া এটাও সে বুঝেছিল যে প্রসূন দূরে আছে বলেই ঢিল ছুঁড়ে মারতে পারছে, তাকে কাছে একবার টেনে আনলে পর কিছু ছুঁড়বার অবকাশ বা প্রয়োজন আর থাকবে না।

হ'লও তাই। সেইদিন থেকে ওদের মধ্যে সহজ সৌহার্দ্য জমে উঠল। প্রসূন তার বিগত প্রগলভতার জন্যে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। এটা সে অন্তরে বুঝল যে ঝর্ণার কাছে তার হার মানতে হয়েছে। বুঝল, এই আয়তকাজল-আঁখি, এই সুস্থ সতেজ দেহ, এই শান্তকোমল তরুণীর অন্তরালে অন্তহীন সম্পদ লুকিয়ে আছে। তার কাছে নিজেকে খুবই খাটো ব'লে মনে

হ'তে লাগল। তাই প্রসূনের বাইরের মূর্তিটাই গেল বদলে। মুখর যুবক কতকটা নীরব হয়েই থাকত সেই দিন থেকে। স্বর গাম্ভীর্যে গেল ভ'রে এবং গভীর সুরেই কথা কইতে সুরু ক'রে দিল বিশেষ ক'রে ঝর্ণার সঙ্গে। কিন্তু একটা হাল্কা কথা প্রায়ই প্রসূনের মুখে ইদানীং ঝর্ণা শুনত: কলমকে আর শুধু কলম বলত না, কাউন্টেন পেনও বলত না, বলত ঝর্ণা-কলম। শুনতে ঝর্ণার বেশ ভালই লাগত। প্রসূনের মুখে কথাটা শুনেই অন্য মেয়েদের দিকে একটু যেন গর্ব্বভরা দৃষ্টি হেনে ঈষৎ হাসত।

দু'টি শাখা-নদী যেমন ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হ'তে ও এগিয়ে যেতে থাকে, এই দু'টি তরুণ-তরুণীর অবস্থাও অনুরূপ হয়ে দাঁড়াল। ওদিকে দেবযানীর দৃষ্টি তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং সে-ই এটা লক্ষ্য করল যে দু'টি নদনদীর মিলন আসন্নপ্রায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাদের এই আসন্ন মিলনসম্ভাবনা দেবযানীর অন্তর-বীণার কোন্ নিভৃত একটি তারে গিয়ে হঠাৎ যেন আঘাত করল এবং তাতে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল। তার মনটা যে তার অজ্ঞাতেই চঞ্চল অবাধ্য শিশুর মত কল্পনার কোন্ নিরালা কক্ষে গিয়ে কখন উপনীত হয়েছে তা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। এবং আবার কি বিহিত করা যায় তাই ভাবতে লাগল। বহুকাল আগেকার পড়া একটা উদাসী পংক্তি হঠাৎ মনে জেগে উঠল।

"কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোনে।"

বিহিত একটা জুটেই গেল এবং আশ্চর্য্য ভাবেই জুটল। দেবযানী উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিদ্যার্থিনী। তাই এম. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হবার আগে থেকেই বিদেশ যাবার স্কলারশিপের জন্যে নানা জায়গায় নানা ভাবে চেষ্টার জাল ফেলে রেখেছিল। এবং ঠিক এই সময় একটা স্কলারশিপ জুটে গেল। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চলে গেল। সেই যে গেল সুদূর বিদেশে, সেখানে তিনি বছর অধ্যয়নের পর ডিগ্রি নিয়ে আবার বছর দুই রিসার্চ করে থিসিস্ লিখে ডক্টরেট নিয়ে সে ফিরেছে।

[তিন]

একচক্ষু হরিণের মত সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষ যেদিক পানে পরম নিশ্চিন্ত ছিল সেই দিক থেকেই অকস্মাৎ আক্রান্ত হ'ল। সারা ভারতে সাড়া পড়ে গেল। রণাঙ্গনে যাবার তরে রণসজ্জায় সজ্জিত হবার আবেদনের সাড়া। কলকাতায় প্রশস্ত সব সরণি ধরে জওয়ানদের মার্চ্চ-পাষ্টের দৃপ্ত যুবকদের চিত্তদোলায় সাড়া দিল। পথে পার্কে প্রান্তরে সভা জটলা বসতে থাকল। বক্তৃতায় জওয়ানদের দলে দলে যোগ দেবার জন্যে আবেদন বা আমন্ত্রণ। কলেজের ছাত্রমহলে দারুণ চাঞ্চল্য—উন্মাদনা বললেও চলে। উন্মাদনা-উৎপাদক রণগীত সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে সেনেট্ হলটাকে প্রতিধ্বনিত করে তুলল—

"পুত্রভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন?

*　　*　　*

চল্ রে চল্ সব ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান"

প্রসূন একদিন সটান মিলিটারি অফিসে গিয়ে নাম দিয়ে এল। যুদ্ধে যাবে বলে সে প্রস্তুত। সেখান থেকে সেদিন হষ্টেলে না ফিরে চলে গেল লেকের দক্ষিণ দিকের একটা বটগাছের তলায়, যেখানে প্রায়ই ঝর্ণা ও সে গিয়ে জোটে স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়। জায়গাটা বেশ একটু নির্জ্জনও।

গিয়ে দেখে ঝর্ণা আগে থেকেই সেখানে বসে আছে। আজ তার মুখখানায় সে আনন্দদীপ্তি নেই, আছে চিন্তাক্লিষ্ট ম্লানিমা। প্রসূন কাছে আসতেই হাতখানা বাড়িয়ে তার হাতটাকে বেশ একটু শক্ত মুঠোয় চাপ দিয়ে বললে, "বস"। যদিও তাদের মধ্যে আগেই অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে—অনেক বোঝাপড়া। যদিও পুরুষের মহৎ প্রেরণায় ও সদিচ্ছায় সমধিক মহতী নারী ক্লেশচিত্তে হ'লেও সর্ব্বান্তকরণেই সায় দিয়েছে, তবু তার এখনকার ঐ শক্ত মুঠোটা যেন অবুঝ শিশুরই মত বলতে চায়—'যেতে নাহি দিব'।

প্রসূন বসলে পর ঝর্ণা শুধাল "তোমাদের ব্যাচের সকলেই এক জায়গায় থাকবে?"

"তা ঠিক জানি না। তবে হ্যাঁ, ট্রেনিং ক্যাম্পে যত দিন থাকব সব এক জায়গাতেই।"

"কবে যেতে হবে?"

"যেতে হবে কালই।"

"কালই?" এই কথাটা বলেই হঠাৎ ঝর্ণা হাতটা বাড়িয়ে প্রসূনের বুকপকেটে একটা ফাউন্টেন্ পেন্ গুঁজে দিতে দিতে বললে, "এই নেও ঝর্ণা-কলম। তোমার ঝর্ণা রইল তোমারি বুকে। এই কলমে লিখো আমার চিঠি।" এই বলেই চকিতে একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়েই তার ব্যথাতুর মাথাটি ক্ষণিকের তরে প্রসূনের বুকে গুঁজে দিল। প্রসূন আদর ক'রে তার গালে হাত বুলতে গিয়ে দেখে তার গাল বেয়ে অশ্রুবন্যা বয়ে চলেছে। সেই

রক্তাপ্লাবিত ওষ্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আবার বললে "চিঠি লিখো কিন্তু।" প্রদ্যুম্নের আঁখিও শুষ্ক ছিল না বেশীক্ষণ। ঝর্ণার মুখখানি ধরে চুম্বন করতে গিয়ে নিজের অশ্রুর কয়েক ফোঁটা ঝর্ণার অশ্রুর ধারায় মিশে একাকার হয়ে গেল। মহৎ কর্ত্তব্য ও মরমী প্রেম? এ দু'য়ের আশ্চর্য্য দ্বন্দ্ব—সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! পরমাশ্চর্য্য এই মানবচিত্ত!

ঝর্ণা হঠাৎ মুখ তুলে আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে চুপ ক'রে প্রদ্যুম্নের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে দিল—তাকিয়েই রইল কিছুক্ষণ। নীরব ভাষায় সে অন্তহীন অর্থ!

[চার]

চলেছে বীর জওয়ানদের সারি থাকে থাকে বিসর্পিত পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে। দু'পাশে স্তরে স্তরে চা-বাগানের কদমছাঁটা সবুজ সৌন্দর্য্য। উঠতে উঠতে আরও উঠে গিয়ে পথের হ'ল অবসান। তখন সুরু হ'ল নিবিড় বনের মধ্যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। চরম বিপদের পথেও পা বাড়াতে অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চোখ এড়াতে চায় না। কখনও গিরি-গুম্ফা, কোথাও উত্তুঙ্গ উপত্যকা, কোথাও বা আকাশচুম্বী পার্ব্বত্য বিটপী। ঘন নিবিড় ছায়ায় বনের হরিণ ও খরগোস জওয়ানদের পদশব্দে সচকিত হয়ে পলায়মান। সুপ্ত সুন্দর সারা বনরাজি সুখস্বপ্নোত্থিত হয়ে যেন ভাবতে থাকে এতকালের শান্তি কারা আজ এসে দিল ভঙ্গ করে! বনের পাখী গাছের ডালে ডালে বসে গান থামিয়ে অবাক হয়ে নিচের দিকে তাকায়।

তারপর একটা গিরিশ্রেণী লঙ্ঘন করেই রণাঙ্গন। বিবিধ বিকৃত গর্জ্জন আকাশ ভেদ করে শূন্যে কোথা উধাও। গোলা-গুলী কোন্ অদৃশ্য প্রদেশ থেকে এসে ছিট্‌কে পড়তে লাগল শিলাবৃষ্টির মত! কারও হস্তপদ, কারও বা মস্তক নিমেষে নিমেষে উড়ে যেতে লাগল। আর্ত্তনাদ—মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ! তারই সঙ্গে সেনাপতির উৎসাহ-বাণী সেনাদলকে আবার উত্তেজিত করতে থাকে। জওয়ানদের কোন সারি যায় এগিয়ে, কোন দল-বা ছত্রভঙ্গ হয়ে পেছু হটতে বাধ্য হয়।

এমনি ভাবে কয়েকদিন যুদ্ধের পর আহত জওয়ানদের ভীড় জমেছে পশ্চাতের সামরিক হাসপাতালে। প্রদ্যুম্ন প্রচণ্ড আঘাতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে দিন চারেক সেখানে। ডাক্তার নার্স সকলেই চিন্তিত। পাঁচ দিন পরে ভোর পাঁচটায় প্রথম চোখ মেলল প্রদ্যুম্ন। সেবাপরায়ণা নার্স'টি নির্নিমেষ নয়নে প্রদ্যুম্নের প্রথম আঁখি মেলার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রদ্যুম্নও চোখ মেলে তার দিকে যে তাকাল—তাকিয়েই রইল। তারপর অস্ফুট স্বরে বললে, "তুমি এখানে, ঝর্ণা?" ঝর্ণা একটু ভয় পেল—প্রদ্যুম্ন না উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাই কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "হ্যাঁ, আমি এসেছি তোমার সেবা করতে। এইবার তুমি ভাল হয়ে উঠবে। কিন্তু কথা বলো না এখন।"

একটু পরেই ডাক্তার এসে পড়লেন, প্রদ্যুম্নকে পরীক্ষা করবার পর একটু চিন্তিত হয়েই নার্স'কে ইসারা ক'রে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, "অবস্থাটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। এ যেন দীপ নিববার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের প্রজ্জলন। এর চাই এখন রক্ত। আর খুবই শীগ্‌গির চাই তবে যদি বাঁচান যেতে পারে। কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে আজও ত রক্ত এসে পৌছল না। কি যে করা যায় কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আচ্ছা, আমার রক্ত দিলে কি চলবে?" নার্স শুধল।

"তুমি! তুমি দেবে রক্ত? আচ্ছা এস ত এদিকে একবার দেখি। তোমার রক্তটা আগে পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে।"

[পাঁচ]

অণিমা চায়ের পাট শেষ করে দেবযানীকে নিয়ে গেল সোজা ছাদের ঘরে। খুব নিরিবিলি, সেখানে কারও যাবার সম্ভাবনা কম। দেবযানী এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ পরিচর্য্যাদির চাপে কিছু অস্বস্তি বোধ করছিল। এখন একটু গুছিয়ে ব'সে বললে, "আচ্ছা অণিমা! এইবার বল ত প্রদ্যুম্ন আর ঝর্ণার কথা সব।"

"ওদের সম্বন্ধে তুই কতটা জেনেছিস্ তাই আগে বল্ শুনি।"

"আমি যা জানি তা প্রভাসের এক চিঠিতে। জানিস্ ত প্রভাস ছিল প্রদ্যুম্নের বিশেষ বন্ধু। তাই বেশ গুছিয়ে মর্ম্মস্পর্শীভাবে চিঠিটা লিখেছিল। লিখেছিল ঝর্ণার শিরা থেকে চলতে থাকল রক্তের স্রোত প্রদ্যুম্নের শিরায়। ডাক্তারের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রদ্যুম্নের দিকেই কিছু বেশীক্ষণ। যখন দৃষ্টি ফিরল ঝর্ণার দিকে তখন ক্ষোভের সঙ্গে বুঝলেন—সর্ব্বনাশ হয়েছে, একজনকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে আর একজনেরও অন্তিম অবস্থা। ঝর্ণার অন্তিম অবস্থাটা মুমূর্ষুপ্রায় প্রদ্যুম্নও কি ক'রে যেন বুঝে ফেলল। ব্যথিতচিত্ত হলেও যেন কিছুটা আনন্দদীপ্ত হয়েই হাত বাড়িয়ে ঝর্ণার একখানি হাত ধরে বললে, "মিলন আমাদের ঝর্ণা? মহামিলন।' ঝর্ণা তখনও সংজ্ঞা হারায় নি। সেও

ক্ষীণকণ্ঠে সায় দিল, 'একসাথে মহাযাত্রী।' তারপরই দুইটি জীবনপ্রদীপ পর পর নিবে যায়। এই ত লিখেছে প্রভাস। সেই চিঠিতেই শেষের দিকে লিখেছে যে বিস্তারিত খবর সে দিতে পারল না, কারণ সব খবর তখনও কলকাতায় এসে পৌঁছায় নি। আর সে তার পরদিনই চলে যাচ্ছে বালাজীয়ে ওকালতি করতে। আমি যেন আর কারও কাছে বিস্তারিত খবর জানতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি আর কাউকে চিঠি লিখি নি।"

অণিমা সব শুনে জোরে একটা নিশ্বাস শুধু ছাড়ল। একটু চুপ ক'রে থাকবার পর বললে, "ঠিকই প্রায় জেনেছিস্ তবে—।" তারপর আবার চুপ করেই রইল অনেকক্ষণ। দেবযানীর মুখেও আর কথা ফুটছিল না। হঠাৎ অণিমা বলে উঠল, "আমি, ভাই, যাব এখন একটা উন্মাদ-আশ্রমে। এই লিলুয়ার কাছেই আশ্রমটা। আমার এক বন্ধু পাগল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দেখতে যাই তাকে। তুই যাবি আমার সঙ্গে? চল না একটু বেড়িয়ে আসবি। আমাদের গাড়িতে করেই যাব আসব। দেরি হবে না। এখন ত কাজ নেই তোর কিছু?"

"না, কাজ কিছু নেই। আজ ঘুরে বেড়াব বলেই ঠিক করেছি। তোকে পেয়ে ভালই হ'ল। চল্ যাই।"

[ছয়]

উন্মাদ আশ্রমে পৌঁছেই কর্ত্তৃপক্ষকে অণিমা জানাল, "আমরা দেখতে এসেছি মেঘ ও রৌদ্রকে।" গাইড তৎক্ষণাৎ তাদের নিয়ে চলল প্রশস্ত একটা উঠান পেরিয়ে। আগে আগে গাইড্, ওরা বেশ পিছনে। চলতে চলতে দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, "মেঘ ও রৌদ্র কথাটার মানে কি হ'ল?"

"মানে আমার বন্ধুটি কখনও পরম আনন্দে উৎফুল্ল আবার কখনও থাকে চূড়ান্ত ম্রিয়মান। তাই এখানকার ডাক্তার ঐ নাম দিয়েছেন। তিনি আরও অনেক পাগলকে এই রকম অদ্ভুত একটা করে নাম দিয়েছেন তাদের পাগলামীর রকম বুঝে বুঝে।"

শুনে দেবযানী বললে, "ডাক্তার দেখছি সাহিত্যিক ধরনের।"

"যা বলেছিস্ ভাই।"

'মেঘ ও রৌদ্র' গরাদ দেয়া জানলার কাছে গিয়ে যখন দাঁড়াল, তাকে দেখেই দেবযানী একেবারে স্তম্ভিত। অণিমার হাতখানি খপ ক'রে শক্ত ভাবে ধরে ভীতচকিত অস্ফুট বিকৃত চাপা স্বরে বলে উঠল, "এ কে? এ কি প্রসূন? অণিমা!"

অণিমা তখন দেবযানীকে এক হাতে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "হ্যাঁ, ভাই। তুই শেষ পর্য্যন্ত জানতে পারিস নি সব। ওদের সেই মহামিলনের মহাযাত্রা পর্য্যন্ত ঠিকই লিখেছিল প্রভাস। কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ডাক্তার ভেবেছিলেন দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রসূন সেরে ওঠে। তার দেহ দাহ করা হবে, না সমাধিস্থ করা হবে সেইটে সমাধান করতে বেশ দেরি হ'তে লাগল, এই সময়ের মধ্যে ডাক্তার বিস্ময়ে তার পুনর্জীবনের লক্ষণ দেখতে পেলেন। এবং দেখতে দেখতে প্রসূন বেঁচেই উঠল। অবিশ্যি তখন বাঁচিয়ে তোলবার সকল প্রকার সামর্থ্য প্রয়োগ হয়েছিল। কিন্তু বেঁচে উঠে যখন বুঝল ঝর্ণার মৃত্যু হয়েছে এবং তারই জন্যে হয়েছে মৃত্যু, তখন বেচারী পাগল হয়ে যায়।"

অণিমারা কাছে যেতেই প্রথমটায় প্রসূন মুখ তুলে তাদের দিকে তাকায় নি অনেকক্ষণ। ঐ সময়টায় মধ্যে অণিমা সংক্ষেপে ঐটুকু বিবৃতি দিয়ে যায়। যখন প্রসূন মুখ তুলে তাকাল তাদের দিকে—একদৃষ্টে তাকিয়েই রইল কিছুক্ষণ। অণিমা চেঁচিয়ে বললে, আমরা এসেছি প্রসূন! তুমি কেমন আছ?"

কোন সাড়া না পেয়ে আবার বললে, "আমি অণিমা, আর এই যে দেবযানী এসেছে, চিনতে পারছ?" প্রসূন কোন জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়েই রইল। চিনতে পারল কি পারল না তা বোঝা গেল না। একটু পরে চোখ বুজল। আর বিড়্ বিড়্ ক'রে বলতে লাগল সে যেন তার উৎব্যক্ত চিন্তাকণা, "রক্ত দিয়েছ তুমি আমার জন্যে, পাপীর জন্যে দিলে প্রাণ! তুমি আমার ত্রাণকর্ত্তা, তুমি আমার যীশু।"

আবার চুপ কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখ মেলে নিজহাতের শিরা টিপে ধ'রে বলতে লাগল, "এই যে তোমার রক্ত—আমার হৃদয়-রক্ত সবই যে তোমারি। আ-া-া-া! তুমি যে আমার বুকের মাঝে।" এই কথাগুলো বলতে বলতে প্রসূনের মুখখানা অপূর্ব্ব আনন্দদীপ্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল এবং চুপ ক'রে কিছুক্ষণ চোখ বুজেই সেই আনন্দ যেন সম্ভোগ করতে লাগল। কিন্তু তার একটু পরেই মুখের ছবি হঠাৎ গেল বদলে। চোখ মেলে অনুসন্ধিৎসু ও সন্দিগ্ধভাবে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল এই বলে, "কথা বলছ না যে? আছ সত্যি কি আমার বুকের মাঝে? বল গো বল, ওগো বল"—শেষ কথাগুলো ভীষণ বিকৃত চীৎকার ক'রে বলল এবং তা শুনতে পেয়ে আশ্রমের ডাক্তার ছুটে এলেন আর অণিমাদের চ'লে যেতে ইসারা করলেন। দেবযানী

রুমাল দিয়ে চোখের কোলটা একটু মুছে নিয়ে অণিমার পিছন পিছন গিয়ে মোটরে উঠল।

গাড়িতে গিয়ে বসবার পর দু'জনের মুখে অনেকক্ষণ বিশেষ কোন কথা নেই। তারপর গঙ্গার পোলের উপর দিয়ে যখন চলেছে তখন সাগরমুখো গঙ্গার দিকেই দৃষ্টি মেলে অণিমা বলতে লাগল আর দেবযানী মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে চলল—"দেখ দেবযানী! ঐ যে ডাক্তারবাবুকে দেখলি, যাঁকে তুই বলছিলি সাহিত্যিক ধরনের, তাঁর একটু ইতিহাস আছে। উনি আগে কলকাতায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন আর ভালই পসার ছিল। সেই সময় ওঁর স্ত্রীর মাথাটা খারাপ হ'তে থাকে। কিন্তু ভাল ক'রে চিকিৎসা বা ব্যবস্থা করবার আগেই হঠাৎ তিনি আত্মহত্যা করে বসেন। সেই থেকে উনি প্র্যাক্‌টিস্ ছেড়ে দিয়ে ব্রত নিয়েছেন এই উন্মাদ আশ্রমের সেবায়। প্রত্যেককে উনি খুব যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করেন যার যেমন অবস্থা তাই বুঝে বুঝে।"

দেবযানী অসম্ভব গম্ভীর হয়ে চুপ ক'রে শুনল।

[সাত]

ক'দিন পর উন্মাদ আশ্রমের ডাক্তারবাবুর হাতে বেয়ারা একটা কার্ড এনে দিল। কার্ডখানা হাতে নিয়ে পড়লেন "দেবযানী পুরকায়স্থ, ডি লিট (হার্ভার্ড)"। একটু আশ্চর্য হয়ে বেয়ারাকে বললেন নিয়ে আসতে।

দেবযানী এসে ডাক্তারবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "বসুন বসুন, এ কি, প্রণাম কেন? আমি ত ঠিক চিনতে পারছি না। দেখছি আপনি বিদুষী। আচ্ছা, আপনিই কি সেদিন এসেছিলেন মিসেস অণিমা দত্তর সঙ্গে?"

দেবযানীকে হঠাৎ দেখে সত্যি আজ চিনবার কথা নয়। তার সে চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আজ তার আলুলায়িত কেশ, আর বেশ তার অবিন্যস্ত। সে জবাব দিলে, "হ্যাঁ, আমিই এসেছিলাম সেদিন আমার বন্ধু অণিমার সঙ্গে। আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু আমি আপনার গুণমুগ্ধ। আপনি যে-সেবার কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন তা জগতের সকল সেবার সেরা। আপনার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে। আপনি বললেন আমি বিদুষী। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আমার সকল বিদ্যাই ব্যর্থ। আমি যদি লিটারেচারে মন না দিয়ে চিকিৎসা ও সেবাবিদ্যা কিছুটা আয়ত্ত করতাম তবে আজ জীবনকে সার্থক মনে হ'ত। এখন আমার অনুরোধ এই যে আপনি যদি দয়া করে আমাকে আপনার শিষ্য করে নেন আর আপনার সেবাকাজের একটু অংশ আমাকে দেন তবে কৃতার্থ হয়ে যাই। আমিও চাই এই উন্মাদ আশ্রমের সেবায় আমার জীবনের অন্ততঃ কিছুটা অংশ উৎসর্গ করতে। আর একটা কথা, আপনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করবেন। আর নিজের মেয়ের মতই জানবেন আমাকে।"

এই বলে দেবযানী তার বহুকালের চাপা অন্তর ব্যথা ও গোপন কথা এই অপরিচিত জনের কাছে উজাড় করে দিল যা আজ পর্য্যন্ত কাউকেই কিছু বলে নি—অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না। সন্তাপক্লিষ্ট সেবাব্রত পবিত্র ডাক্তারবাবুকে পরম আপনার জন বলেই মনে হ'ল। ব্যথিত জনই ব্যথার ব্যথী, এই কথাটা শুভ্র ফুলের মত দেবযানীর অন্তরে যেন ফুটে উঠল।

ডাক্তারবাবু সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলেন। পরে বললেন, "শোন দেবযানী! প্রসূনের প্রকৃতিস্থ হবার আশা আছে বলে মনে হয় না। তোমার ও আমার সমবেত চেষ্টায় হয়ত তাকে এই ভাবাপন্ন করে দিতে পারি যে, সে জানবে—সে নিরন্তর ঝর্ণারই সঙ্গলাভ করছে এবং সেই আনন্দেই সে ডুবে থাকবে। তুমি কি পারবে দেবযানী, তা সইতে?"

দেবযানী অশ্রুপ্লাবিত আঁখি মুদ্রিত করে এবং কম্পিত কণ্ঠে বললে, "খুব পারব ডাক্তারবাবু! আমি তাই চাই। আমি চাই প্রসূনের প্রসন্ন পরিতৃপ্ত মূর্ত্তি কায়েমী ভাবে দেখতে, আর চাই কিছু তার সেবা করে জীবন ধন্য করতে। আর কিছু চাই না ডাক্তারবাবু। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই না, বিলীন করে দিতে চাই নিজেকে।"

এই পর্য্যন্ত বলে ডাক্তারবাবুর পায়ে পড়ে আর একবার প্রণাম করতেই তিনি পরম স্নেহে দেবযানীকে ধরে তুলে তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি রোজই আসবে?"

আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে দেবযানী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জবাব দিল, "হ্যাঁ, রোজ বিকালে ঘণ্টা দুই করে এখানে কাটিয়ে যেতে পারি।"

[আট]

কলকাতার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে দেবযানী অবাক হয়েছিল, কিন্তু তার নিজের জীবনেরই এত বড় একটা পরিবর্ত্তন যে আসন্ন অপেক্ষায় ছিল তা কি সে জানত? যাকে একবার 'নয়নের জলে বিদায়' করেছিল সে যে

আবার এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে পরলোক হ'তে ফিরে এসে তার চিত্তকে অধিকার করে বসবে তা কে ভাবতে পেরেছিল? শুধু কি তাই? পরিবর্ত্তন আরও কিছু হ'ল এবং তা সে কিছুদিন পরেই: যে সাহিত্যকে দেববানী সাময়িক ভাবে সেদিন ধিক্কার দিয়েছিল ডাক্তারবাবুর কাছে, সেই সাহিত্যই দাওয়াই রূপে দেখা দিল কিছুদিন পর। সাহিত্যপিপাসু প্রসূনকে মাঝে মাঝে সাহিত্যরস পরিবেশন করতে তার মস্তিষ্কের উপকারই হ'তে লাগল। দেববানী পাঠ ও ব্যাখ্যা করত, প্রসূন তন্ময় হয়েই শুনত যেমন সে শুনত আগে কলেজের অধ্যাপকের বক্তৃতা। ডাক্তারবাবু নিরীক্ষণ করে বলতে লাগলেন, "প্রসূনের বিবাহের ভাবটা দেখছি খুবই কমে আসছে, লক্ষণ ভাল বলেই ত মনে হচ্ছে—দেখা যাক্ কত দূর কি হয়।"

নানা দেশের বিবাহ উৎসব

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

সারা পৃথিবীতেই বিবাহ একটি আনন্দের ব্যাপার। দু'টি নর-নারীর জীবন একসূত্রে গাঁথা হয়, একটি নতুন সংসার গড়ে ওঠে। আর এই অনুষ্ঠানটি নিয়েই আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আমোদ-আহ্লাদ করে। পৃথিবীর নানা প্রদেশের নানা জাতির মধ্যে এই বিবাহ উৎসবের নানা রূপ দেখতে পাওয়া যায়, এমনকি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে বিবাহের স্ত্রী-আচারে বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। নারীরা এক এক স্থানে এক এক রকম করণ-কারণ করে থাকে।

পার্ব্বত্য-জাতির মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি দেশের অন্য অধিবাসীদের রীতিনীতি থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। এখানে ভারতের কয়েকটি পার্ব্বত্য জাতির বিবাহের অনুষ্ঠানের বিষয় বলছি। ভারতের মধ্যপ্রদেশে বহু পার্ব্বত্য জাতির বাস। তারা হ'ল কোল, ভীল, বনজারা, কোর্খু, ভুঁইয়া, কোরবা, সাঁওতিয়া, গোণ্ড ইত্যাদি।

কোর্খু জাতির ছেলেমেয়ের বিবাহ মা-বাপেই স্থির করে। বিবাহে পুরোহিতের দরকার পড়ে না, জাতির পঞ্চায়েৎ বিয়ের দিন স্থির করে এবং তিনদিনব্যাপী কনের বাড়ীতে বিয়ের অনুষ্ঠান ও উৎসব চলে। পুরোহিতের বদলে সাতজন সধবা কনেকে সাতপাক ঘুরতে সাহায্য করে এবং এজন্য তারা এক-একখানা করে শাড়ি উপহার পায়। নববিবাহিত দম্পতিকে আত্মীয়-স্বজন টাকা-পয়সা ও বাসনপত্র উপহার দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে।

এদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তবে বিধবা-বিবাহে কোন ধূমধাম হয় না। বিধবা তার দ্বিতীয় স্বামীর নাম ধরে পঞ্চায়েতের সামনে হাতে চুড়ি পরে এবং স্বামীর দেওয়া নতুন শাড়ি পরে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে সমাজের মাতব্বরদের প্রণাম করে। তার পর স্বামী বিধবার ডান কান ছুঁয়ে দিলেই সমাজে এই বিবাহ স্বীকৃত হয়।

ভুঁইহার জাতে বাল্যবিবাহ নেই, পাত্রপাত্রী পূর্ণবয়স্ক হ'লে বিবাহ হয়। মামাত পিসতুত ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ প্রথার প্রচলন আছে। বরের পিতা বিবাহ স্থির করে। প্রথমে বরের পিতা দুই বোতল মদ ও নগদ সাত টাকা নিয়ে কনের বাড়ী রওয়ানা হয়। বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা হ'লে বরের পিতা কনের পিতাকে সেই দুই বোতল মদ ও সাত টাকা ভেট দিয়ে কনেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসে। দশ-পনের দিন কন্যা ভাবী পতির সহিত বাস করে, এই সময়ের মধ্যে যদি উভয়ের মধ্যে ভালবাসা না হয় তবে কনে নিজ বাড়ীতে ফিরে যায়। আর যদি উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রেমে পড়ে তবে বরের পিতা বর-কনেকে নিয়ে আবার কনের বাড়ী যায় এবং কনের পিতাকে দু'বোতল মদ ও নগদ পাঁচ টাকা ভেট দেয়। সেই সময় সবার সামনে বর কনের হাতে চুড়ি পরিয়ে দেয়।

যদি কনের পিতা ইচ্ছা করে তবে নিজ বাড়ীতে দু'চার দিন বর ও বরের পিতাকে রেখে খাতির করে এবং পরে বলে এবার তুমি বেটা-বৌকে নিয়ে যেতে পার, তবে পাঁচ-ছয়দিন পর আবার ফেরত পাঠিয়ে দিও।

বরের পিতা উত্তরে বলে এখন কনেকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তবে সুবিধে মত বিয়ে দেব। বর-কনেকে নিয়ে বাপ নিজের বাড়ীতে চলে যায়, কনের সঙ্গে এবার

কনের বোনও আসে। এবার তারা বাড়ী পৌছলে একটা বড় কাঠের পিঁড়ির উপর বর-কনেকে দাঁড় করিয়ে বরের মা ও বোন তাদের পা ধুইয়ে দেয়। তারপর বর-কনেকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গৃহদেবতাকে প্রণাম করায়।

ছ'দিন ধরে জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে ভোজ খাওয়ান হয়, ছয় দিনের দিন কনেকে সঙ্গে নিয়ে বর ভাবী শ্বশুরবাড়ী যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় কিছু মদ, কিছু শস্য ও একটা ধুতি, এগুলো শ্বশুরকে দেয়। দু'চারদিন থেকে বর বাড়ী ফেরৎ আসে। এবার বরের পিতা বরকে ধুতি ও কিছু কাপড়-চোপড় উপহার দেয়।

এসব ব্যাপার হ'ল বিবাহের পূর্ব্বাভাস। বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হ'লে বিবাহের বন্দোবস্ত করা ও কত খরচপত্র হবে সেটার হিসাব করা হয় পাঁচজন মিলে। তারপর নিজের জ্ঞাতির মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি এক বোতল মদ, কিছু তিল, কিছু সর্ষে আর হলুদ সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়ী যায় এবং সেখানে কবে মণ্ডপ বাঁধা হবে, কোন্ তিথিতে বিয়ের দিন স্থির হবে সে সমস্ত কথা পাকা করে আসে।

বিয়ের দিনে বরাত কনের বাড়ী যাত্রা করে। বরাত হ'ল বরপক্ষের শোভাযাত্রা। বরাতের সঙ্গে কিছু মদ ও একটা টাকা এবং কনে ও তার বোনের জন্য শাড়ী, মা'র জন্য নগদ দুই টাকা ও কনের মামার জন্য একটা ধুতি যায়। বরাত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হ'লে গ্রামের লোক ও কনের বাড়ীর লোকেরা এসে বরপক্ষকে খাতির করে কনের বাড়ী নিয়ে যায়। ঘরের দরজায় এসে দুই বেয়াই গলা জড়িয়ে কোলাকুলি করে এবং দু'জনে দু'জনকে এক একটাকা নজর দেয়। বারান্দায় কম্বল বিছানো থাকে, তার উপর গিয়ে দুই বেয়াই বেশ অন্তরঙ্গভাবে বসে।

কনের পিতা বরকে মণ্ডপে নিয়ে যায়, কনের বোন কনেকে নিয়ে সেখানে বসে। বর হলদে রংএর ধুতি ও কুর্ত্তা, এবং কনে হলদে রংএর শাড়ী পরে, কনের মাথায় ঘোমটা থাকে না। কনের ভাই-বৌ এসে বর-কনের কাপড়ে গিট বেঁধে দেয়। এই গাঁট বাঁধার জন্য ভাই-বৌকে এক টাকা দেয়। এরপর প্রথমে ভাই বৌ, তারপর কনে ও সর্ব্বশেষে গাঁটছড়া বাঁধা বর বিয়ের মণ্ডপ পরিক্রমা করে আবার মণ্ডপের ভিতর যথাস্থানে বসে পড়ে। বরের বড় ভাই বা কনের মামা কনের মাথায় চাদর দিয়ে ঘোমটা দিয়ে দেয়। ভাই-বৌ একটা থালাতে খিচুড়ি এনে বর-কনেকে খাইয়ে দিলেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়। বর-পক্ষের আনীত মদ, ধুতি শাড়ী কনের মা ও ঠাকুরমাকে দেওয়া হয়। রাত্রে ভোজের পর বর-কনে নিজের বাড়ী চলে আসে, বর-কনে বাড়ীতে ফিরে এলে আর কোন স্ত্রী-আচার হয় না, শুধু বরপক্ষকে ভোজ খাওয়ান হয়।

নেপালী বিয়েতে বেশ বৈচিত্র্য আছে। নেপালীদের মধ্যে গুর্খা ও নেয়ার জাতই প্রসিদ্ধ। গুর্খারা অতি সাহসী ও যোদ্ধা বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে, আর নেয়ার জাতি নানাবিধ কলাবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যের জন্য বিখ্যাত হয়েছে। এই নেয়ার জাত হ'ল অনেকটা আমাদের দেশের বৈদ্যদের মত। তারা ব্রাহ্মণের একটু নীচে এবং ক্ষত্রিয়ের কিঞ্চিৎ উপর পর্য্যায়ে পড়ে। এই নেয়ার জাতির বিবাহ ব্রাহ্মণ ও গুর্খা থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে হয়।

নেয়ার নারীদের মধ্যে কেউ বিধবা হয় না। কারণ বাল্যকালেই তাদের বিষ্ণু দেবতার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। দেবতা অমর, কাজেই নারীদের বৈধব্যদশা ঘটে না। নেয়ার নারীদের বাল্যে বিষ্ণুর সঙ্গে বিয়ে হলে ও পরে তারা যখন প্রাপ্তবয়স্কা হয় তখন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করে তাদের সাধারণমতে বিয়ে দেওয়া হয়। বিষ্ণু-বিবাহের একটি ছোট্ট কাহিনী আছে, যে এক নেয়ার বিধবার করুণ কান্নায় দেবী পার্ব্বতীর মন বিচলিত হ'ল, তিনি সেই বিধবার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করে বললেন আজ থেকে কোন নেয়ার নারী বিধবা হবে না, সবাই বিষ্ণুর সঙ্গে পরিণীতা হবে। দেবী এই আদেশ দিয়ে অদৃশ্য হন ও সেই থেকে নেয়ারীদের মধ্যে বিষ্ণু-বিবাহের প্রথার প্রচলন হ'ল।

নেপাল অতি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য। নেপালীরা ধর্ম্মপ্রাণ। তারা বারোমাসের নানা দেব-দেবীর পূজা গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত করে থাকে। বিষ্ণুর সহিত নেয়ার বালিকাদের বিবাহ তারা খুবই নিষ্ঠার সহিত পালন করে, নেয়ারী কন্যা যখন আট বা নয় বছরে পা দেয় তখন ধুম-ধামে এই বিয়ের উৎসব হয়। বিবাহ-মণ্ডপ বাঁধা হয়, ব্রাহ্মণ আসে, শুভলগ্নে একটি থালায় সোনার বিষ্ণুমূর্ত্তি, অথবা তাঁর প্রতীক বিল্বফল রাখা হয়। সুসজ্জিতা কন্যাকে মণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করে। কন্যা তিনবার সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি বা বিল্বফলকে প্রদক্ষিণ করে মাল্যদান করে। এই বিবাহে লোকজন নিমন্ত্রিত হয়। যথারীতি শাস্ত্রসম্মতভাবে ও আড়ম্বরের সহিত এই বিবাহ-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মনোমত পাত্রে বিয়ে স্থির হলে বিয়ের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বরপক্ষ সুপারি, ফল ও মিষ্টি নিয়ে কনের বাড়ী রওয়ানা হয়, সঙ্গে ব্রাহ্মণ থাকে। ব্রাহ্মণ কন্যার হাতে

সুপারি দিয়ে কপালে কুঙ্কু ও হলুদের টিকা বা তিলক আঁকে। এই উৎসবকে বলে "গোরে কাই"।

তারপর হ'ল "লাখা" উৎসব। পুরী বা লুচি এক হাত দেড় হাত বড় করে তৈরী করা হয়, তার নাম হ'ল "লাখা"। বরের বাড়ী থেকে বড় বড় পঞ্চাশটা লাখা তৈরী করে বিয়ের চার-পাঁচ দিন আগে পাঠানো হয়। প্রথমে কনের মামাকে, তারপর কনের কাকাকে ও পরে বাকী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের হাতে এই লাখা দিয়ে এই বিয়েতে যোগ দিতে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয় বরপক্ষ থেকে। কনের বাড়ীতে দুইদিন ভোজ চলে। কনে সেজেগুজে পালঙ্কে বসে থাকে। কনের পাশে এক টুকরী সুপারি থাকে। কনে প্রত্যেক আত্মীয়ের হাতে দশটি করে সুপারি দেয়। এর অর্থ হল আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য পরিবারভুক্ত হ'তে যাচ্ছি।

বিয়ের আগের দিন রাতে বরাত আসে। এই বরাতে বরযাত্রীদের সঙ্গে অন্ততপক্ষে দু'জন তিব্বতী আসবে, আর যদি কোন তিব্বতী নাও আসতে পারে, তবে বরপক্ষীয় দু'জন লোকই তিব্বতী পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসে। এর কারণ হ'ল, তিব্বতে স্বর্ণখনি আছে এবং তিব্বতীরা বহু সোনার মালিক এবং অবস্থাপন্ন, কাজেই বরপক্ষের সঙ্গে দু'জন তিব্বতীয় থাকলে কনেপক্ষ আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে বর বেশ অবস্থাপন্ন লোকই হবে।

বরাতের সব লোককে কনেপক্ষ খাওয়ায় না। শুধু রাত্রে যারা সেখানে থাকবে তাদের ভোজ খাওয়ায়। পরদিন সকালে শুভলগ্নে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, পুরোহিত এসে যথাবিধি পূজা ও মন্ত্রপাঠ করে, বরের বিয়ের পোশাক হ'ল চুড়িদার পাজামা ও শাদা লংকোট, মাথায় নেপালী টুপি। পোশাক হ'ল লাল রংএর শাড়ী।

বরকনে বিয়ের মণ্ডপে এসে দাঁড়ায়, কনে বরকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে বরের গলায় মালা পরায়। বর লকেটসমেত লাল পুঁতির মালা কনের গলায় বেঁধে দেয়। বরের পিতা এসে কনের পায়ে সোনার বা রূপোর নূপুর বেঁধে দেয়, এর অর্থ হ'ল আজ থেকে তুমি আমাদের বন্দিনী।

কোন কোন পরিবারে কনেকে বরের বাড়ীতে নিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে পাল্কী এলে কনের বাপ মেয়েকে পিঠে তুলে নিয়ে পাল্কীতে বসায়। বরের বাড়ী পাল্কী পৌঁছলে কনে হেঁটে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বরের মা তার হাতে চাবি দেয়, মানে আজ থেকে এই পরিবারের ভার তোমার। কনেকে ভেতরে বা উপরে নিয়ে যাওয়া হয়, শুভমুহূর্তে বর ও কনেকে একটা বড় কাঠের পিঁড়িতে বসায়। ব্রাহ্মণ এসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতায় একত্রে পূজা করে, সামনে ধূপ দীপ জ্বলে। কনে তিনবার বরকে প্রদক্ষিণ করে বরের গলায় মালা পরায়, বরও কনের গলায় পুঁতির মালা বেঁধে দেয়। প্রকাণ্ড এক থালায় বহু রকমের খাদ্য সজ্জিত থাকে ও পাশে থাকে মদ, বর ও কনে একত্রে তা থেকে কিছু কিছু তুলে খায়। খাওয়ার পর কনে বরপক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের হাতে দশটি করে সুপারি দেয়, তার অর্থ হ'ল আজ থেকে আমি তোমাদের পরিবারভুক্ত হলাম।

চতুর্থ দিন সকালে "সপপিয়াকেও" বা "চুল আঁচড়ান" উৎসব। সকাল বেলা কনের পিতা কনের জন্যে শাড়ী আয়না চিরুণী ও প্রসাধনের সমস্ত সামগ্রী, ও মাটির পাত্রে করে একপাত্র মিষ্টি বরের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। শুভমুহূর্তে ব্রাহ্মণ এসে বরকে নির্দেশ দেয় কি কি করতে হবে। ব্রাহ্মণের নির্দেশমত বর কনের চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে বেঁধে দেয় ও মাথার অলঙ্কার হাতের বালা কানের ইয়ারিং সব পরিয়ে কনের সিঁথিতে রক্তচন্দনের রেখা এঁকে দেয়। এই অনুষ্ঠান হবার আগে বরকনে একত্রে দেবীপূজা করে নেয়।

চতুর্থ দিন বরের বাড়ীতে খোয়া সোয়েও, অর্থাৎ মুখ দেখা উৎসব হয়। রাত্রে কনের পিতামাতা ভাইবোন এবং আত্মীয় স্বজন এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়।

বরপক্ষ থেকে কনের বাড়ীতে কনের জন্য শাড়ী ও মিষ্টি আসে। এই সঙ্গে বর-কনে কনের বাড়ীতে যায় এবং বর সেখানে শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের হাতে দশটি করে সুপারি দেয়, তার মানে আজ থেকে আমি তোমাদের আপনজন হলাম। বরকে তখন সবাই উপহার দেয়। তারপর বরকনেকে নিয়ে কনের সব আত্মীয়-স্বজন সবাই কনের বাড়ীতে আসে। কনে শ্বশুরবাড়ীর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকে। তাকে বৈঠকখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রথমে শ্বশুর তারপর শাশুড়ী, এভাবে সব আত্মীয়-স্বজন একে একে বধূর মুখ দেখে অলঙ্কার ও টাকা-পয়সা উপহার দেয়, উৎসব সমাপ্ত হয়।

বিয়ের পর বর কনেকে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে দেয়, কনে সেসব অতি যত্নে রক্ষা করে, এবং যদি তার আগে মৃত্যু হয় তবে স্বামী স্ত্রীকে সে সব অলঙ্কারে ও সুগন্ধি তেল দিয়ে প্রসাধন করে সজ্জিত করে দেয় দাহ করবার পূর্ব্বে। নেবার জাতে ডিভোর্স আছে, এবং ডিভোর্স হ'লে স্ত্রী সমস্ত অলঙ্কার এবং জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে যায়।

বিদেশী বিয়েতে যে অনুষ্ঠান হয় তার কতক সাদৃশ্য দেখতে পাই আমাদের দেশের বিয়েতে। রুমানিয়ানরা

খ্রীষ্টান, রবিবারে তাদের বিয়ে হয়, কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকেই উৎসব সুরু হয়ে যায়। সেদিন বর ও কনের বাড়ীতে বিয়ের কেক্ বানাবার ধুম লেগে যায়। শনিবারে বর তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে কনের বাড়ীতে আসে। এবং সেখানে নিতবর কনের উদ্দেশ্যে লেখা কবিতার একটি অংশ আবৃত্তি করে। তখন কনেকে কনের সখী নিয়ে আসে, সঙ্গে থাকে বিয়ের কেক এবং একপাত্র জল। কনে প্রথমে বর ও তারপর বন্ধুবান্ধবদের হাতে এক এক টুকরো কেক কেটে দিয়ে জল ছিটিয়ে দেয়। এরপর বর তার নিজ বাড়ীতে ফিরে গিয়ে কনের জন্ত ফ্রক এবং অন্তান্ত উপহার-সামগ্রী পাঠিয়ে দেয়, এবং তার পরিবর্ত্তে কনের বাড়ী থেকে বরের বাড়ীতে যৌতুক যায়। পরের দিন বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কনের সখীরা কনেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে কনের চুলে একটি রৌপ্যমুদ্রা গুঁজে দেয়, যাতে সে কখন অভাবে না পড়ে। দু'টি সুদৃশ্য ফুলের মুকুট তৈরী হয়। পুরোহিত বর ও কনের মাথায় সেই মুকুট পরিয়ে দেয় এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে বরকনে সেই মুকুট বদল করে। তখন পুরোহিতের হাত ধরে বর-কনে হাত ধরাধরি করে উপাসনা বেদীর চারদিকে একটি বিশেষ গীত গেয়ে তিনবার প্রদক্ষিণ করে। বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'লে দর্শকরা একমুঠি কিসমিস, বাদাম ও মিষ্টি সুখী দম্পতির উপর ছুঁড়ে দেয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণরূপে।

মিশরের বিয়ের পদ্ধতিতে একটু বৈচিত্র্য আছে। আমাদের দেশের মতই মা বাপ ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করে, তবে একদল লোকও আছে ঘটকের মত। তাদের বেশ টাকা-পয়সা দিলে তারা ভাল ভাল সম্বন্ধ এনে হাজির করে। বিয়ের পাত্রী মনোনীত হ'লে পাত্রীর বাড়ীতে একটা ভোজ হয়, এবং পাত্রীর পিতা বা জ্যাঠা নির্দ্ধারিত বরপণ দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। এর পর থেকে আট দশ দিন ধরে কন্তার জন্ত কিছু-না-কিছু উপহার বর পাঠাতে থাকে, এবং তৎপরিবর্ত্তে কনের বাড়ী থেকেও বরের বাড়ীতে বরের জন্ত দান-সামগ্রী যেতে থাকে। বরের বাড়ী থেকে কনের বাড়ী যাবার রাস্তা নিশান এবং আলোক-মালায় সজ্জিত থাকে, বর রোজই তার বন্ধুবান্ধবদের ভোজ দেয়।

ওদিকে কনেকে নিয়ে তার সব আত্মীয়-স্বজন সহরের স্নানাগারে যায়, সেখানে কনের স্নানপর্ব্ব শেষ হ'লে তাকে আবার পিতৃগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। কনের বাড়ীতে ভোজ হয় এবং আত্মীয়-স্বজন সবাই কনেকে উপহার দেয়। কনে একটা মেন্দীর ডাল নিয়ে একে একে সব নিমন্ত্রিতদের সামনে দাঁড়ায় এবং তারা তাতে মুদ্রা ঝুলিয়ে দেয়। বাড়ীতে গায়িকারা গীত গায়, এই উৎসবের নাম হ'ল মেন্দী বা হেনা রাত্রি।

পরদিন কনেকে নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। যদি কনে শহরে মেয়ে হয় তবে সে গাধার পিঠে বসে চলে আর যদি গ্রামের মেয়ে হয় তবে উটের পিঠে এক সুসজ্জিত পাল্কীতে বসে চলে। যদি কনের পিতা অবস্থাপন্ন হয় তবে এই কনে নিয়ে শোভাযাত্রা বিশেষ জাঁকজমকে করা হয়। সুদীর্ঘ শোভাযাত্রার সারি সারি সুসজ্জিত উট থাকে, তাদের পিঠে বসে আত্মীয়-স্বজনরা চলে। কোন কোন সময় কনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী দু'তিনজন কনের সঙ্গে একই পাল্কীতে বসে উটের পিঠে চড়ে যায়। সঙ্গে বাদ্যকরের দল বাদ্য বাজাতে বাজাতে চলে, এবং সবার পেছনে গ্রামবাসীরা পায়ে হেঁটে আসে। কখন কখন মরুভূমির ভিতর দিয়ে এই শোভাযাত্রা চলবার সময় বর থেমে থেমে কনের উদ্দেশ্যে নানা ভঙ্গি করে গান গাইতে থাকে প্রাণের আনন্দে, এবং কনে ও পাল্কীর পর্দা একটু ফাঁক করে মুগ্ধনয়নে বরের হাত-পা নাড়া দেখে এবং গান শুনে খুশী হয়।

বরের দোরগোড়ায় শোভাযাত্রা থামলে প্রথমে কনেকে নামিয়ে তার মহিলা আত্মীয়াদের সঙ্গে একটা তাঁবুতে নিয়ে যায়, সেখানে তাদের সমাদরে খাওয়ান হয়। ইতিমধ্যে আলো বাদ্য ভাওসহ খুব সমারোহে বন্ধুবান্ধবরা বরকে মসজিদে নিয়ে যায়। বর ফিরে এসে দেখতে পায় কনে তার বাড়ীতে এসে তার অপেক্ষায় বসে আছে। তখন বরকনে প্রথম দু'জনে দু'জনার মুখ দর্শন করে। যদি কনেকে বরের পছন্দ না হয় তবে বর জোরে জোরে বলবে সে কনেকে ত্যাগ করতে চায়, এবং বরের সে ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়।

পরের দিন অফিসে গিয়েই বাসবী অনিমেষকে বলল।

জানেন, আপনার জন্য মা'র কাছে কাল আমি ভীষণ বকুনি খেয়েছি।

অনিমেষ হাসল, মাঝে মাঝে আপনাদের বকুনি খাওয়া উচিত। বেয়াড়াপনা একটু কমে।

কেন, কি বেয়াড়াপনা আপনি দেখলেন?

তিনদিন ছুটির পরে অফিসে এলেন, তাও কাজে না বসে ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করছেন।

অনিমেষের হাসি অম্লান।

একটু বিব্রত হ'লেও, বাসবী সামলে নিল। বলল, সত্যি, খুব বকুনি খেয়েছি। আপনাকে দরজা থেকে বিদায় করে দেবার জন্য। মা বলেছে, আমরা গরীব তা ত আপনি জানেনই, কাজেই গরীবের সংসারে আপনাকে টেনে আনলে আপনারও অমর্যাদা হ'ত না, আমাদেরও মাথা হেঁট নয়।

এবার অনিমেষ বেশ একটু শব্দ করেই হাসল।

আপনার মাকে বলবেন একদিন যাব আপনাদের বাড়ী। তখন গরীব বলে পার পাবেন না, ভূরিভোজন করে তবে আসব।

মনে মনে শঙ্কিত হলেও, বাসবী মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, কিন্তু সে কবে? কবে আপনি যাবেন?

মাথা নীচু করে চিঠিতে সই করতে করতে অনিমেষ বলল, আপনার বিয়ের দিন। দেখবেন, নিমন্ত্রণ না করলেও ঠিক গিয়ে হাজির হব, আর এক পেট খেয়ে আসব।

এমন একটা উত্তরের জন্য বাসবী আদৌ তৈরী ছিল না। ঠিক এমন সুরে কথা অনিমেষ এর আগে কোনদিন বলেও নি। তবে পরিহাসটা মারাত্মক নয়, শালীনতা-বর্জিত নয়, তাই বাসবী উত্তর দেবার লোভ সংবরণ করতে পারল না।

নিজের সীটে যেতে যেতে বলল, তা হ'লে আর আপনার বরাতে আমাদের বাড়ীতে খাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বাসবী ভেবেছিল অনিমেষ এ কথায় একটা জুতসই উত্তর দেবে কিন্তু অনিমেষের তরফ থেকে কোন উত্তর এল না। বোধ হয় সে কাজে ডুবে গেছে। বাসবীর সঙ্গে বাকযুদ্ধে মাতবার তার অবকাশ নেই।

বাসবীর টেবিলেও অনেক কাজ জমেছিল, একটু পরে কাজের চাপে সেও বাইরের সব কিছু ভুলে গেল। নিশিবাবু বার দুয়েক ছুটো ফাইলের খোঁজে এসেছিল, ফাইল দেবার সময় তার সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলেছিল ওই পর্যন্ত।

কাজ প্রায় শেষ করে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে খেয়াল হ'ল একটা বেজে চল্লিশ। তার মানে দশ মিনিট হ'ল টিফিন হয়েছে।

একবার ভাবল নিজের টেবিলেই টিফিন শেষ করবে কিন্তু কি ভেবে বাইরে বেরিয়ে এল। তিনদিন কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হয় নি। কথা হয় নি। অফিসের অনেক খবর তার মারফৎ পাওয়া যায়।

অনিমেষ নেই। বোধ হয় লাঞ্চে বেরিয়েছে।

বাসবী টিফিনের প্যাকেট নিয়ে কৃষ্ণার কামরায় ঢুকল।

কৃষ্ণা টিফিন করছিল, বাসবী কাছে গিয়ে বলল সঞ্জয়, কুরুক্ষেত্রের খবর কি?

কৃষ্ণা হাসল, জবর খবর।

বাসবী টিফিনের প্যাকেটটা খুলে পাশে বসে পড়ল।

কি ব্যাপার?

সেতুবন্ধনের খুব জোর চেষ্টা চলছে।

সেতুবন্ধনের ? বাসবী অবাক গলায় প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব চেষ্টা করছেন।

বাসবী স্বীকার করল, কিছু বুঝতে পারছি না ভাই। একটু পরিষ্কার করে বল।

কৃষ্ণা টেলিফোনের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, আমার সহায় ওই যন্ত্রটি। যা-কিছু শুনেছি ওরই মাধ্যমে। মাঝে মাঝে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজের কামরা থেকে ফোনে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। ডাকাডাকির হাঙ্গামা এড়াবার জন্ত। আজ সকালে বলছিলেন, তাই শুনলাম।

কি বলছিলেন ?

যা বলছিলেন, তার সারাংশ হচ্ছে এই। কাল বিকালে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ীতে তিনি ম্যানেজারকে আর বেলাদেবীকে ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য দু'জনের মধ্যে আপোষে নিষ্পত্তি। মনে হ'ল, ম্যানেজার মিটমাট করে নিতে রাজী যদি অবশ্য বেলাদেবী তাঁর বাইরের জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। তাই ম্যানেজিং ডিরেক্টর ম্যানেজারকে বোঝাচ্ছিলেন, বেলাদেবী আজকাল যা করে বেড়াচ্ছেন, এ না কি ম্যানেজারের ওপর আক্রোশবশত। ম্যানেজারের সংসারে ফিরে এলে, বেলাদেবী সংযত জীবন যাপন করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

দু'-এক মুহূর্ত বাসবী কোন কথা বলল না। বোধ হয় কিছু বলা উচিত হবে কি না মনে মনে ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, শুনেছিলাম দু'জনের ছাড়াছাড়ি হবার কারণই নাকি ছিল বেলাদেবীর অসংযত জীবন যাপন ?

কি জানি ভাই। বড় ঘরের ব্যাপার, আমাদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। বেলাদেবীর অনুযোগ ম্যানেজারের মন না কি ভীষণ সন্দিগ্ধ। সামান্ত ব্যাপারকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অসামান্ত করে তোলেন। তিনি চান স্ত্রীকে একেবারে পর্দানশীন করে রাখতে।

কৃষ্ণা হঠাৎ গলার স্বর বদলাল, যাকগে ভাই, ওঁদের ব্যাপার, ওঁরাই বুঝবেন। তোমার মা কেমন আছেন ?

একটু ভাল। যা'র শরীর খারাপের খবর তুমি শুনলে কোথা থেকে ?

তুমি দু'দিন আস নি, তাই তিন দিনের দিন নিশিবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম।

আর কি বললেন নিশিবাবু ?

কৃষ্ণা আড়চোখে বাসবীর দিকে চেয়ে দেখল। বোধ হয় এমন একটা প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করল। পরে বলল, নিশিবাবু বললেন, ম্যানেজার না কি তোমাদের বাড়ীতে তোমার মাকে দেখতে যাবেন। গৌরকে সঙ্গে যাবার জন্ত বলে রেখেছেন, কারণ তিনি বাড়ী চেনেন না।

বাসবী দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। সবেগে। কত দ্রুত এ অফিসের সংবাদ একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে চলে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয় অফিসের প্রত্যেকটি কেরাণী জেনে গেছে গতকাল অফিসের পর অনিমেষ রায় বাসবীর কুঞ্জে গিয়েছিল। উপলক্ষ্য বাসবীর মার শরীরের খোঁজ নেওয়া। লক্ষ্য কি, তাদের অজানা নয়।

এ নিয়ে সারা অফিসে তরঙ্গ ওঠা মোটেই বিচিত্র নয়। এ অফিসে অসুখ বিসুখ ত আরও অনেকের বহুবার হয়েছে, কই ম্যানেজারের ত বাড়ী গিয়ে খোঁজ নেবার এত উৎসাহ দেখা যায় নি। ম্যানেজারের আগ্রহ বুঝি আয়তলোচন আর গৌরাঙ্গীর প্রতি ?

বাসবী মুক্তির একটা চেষ্টা করল।

তুমি যে বললে গতকাল ম্যানেজার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ী গিয়েছিলেন, তা হ'লে আমার বাড়ী গেলেন কখন ?

দোহাই তোমার বাসবী, কৃষ্ণা দুটো হাত জোড় করল, আমি কিছুই বলি নি। দুটোই শোনা কথা, দুটোই তুমি অগ্রাহ্য করতে পার।

বাসবী দ্রুত চিন্তা করে নিল। এ কথা গোপন থাকবে এমন আশা কম। গৌরের মারফৎ সবই জানাজানি হয়ে যাবে। সবাই জানবে ম্যানেজার বাসবী সেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাসবী নেমে এসে দেখা করেছিল। ম্যানেজারকে ওপরে নিজেদের সংসারে নিয়ে যায় নি।

নিয়ে না যাবার কারণ আবিষ্কারেরও অভাব হবে না। নিজের সংসারের কাছে হয়ত হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে, তাই বাসবী নিজে নেমে এসেছিল।

তার চেয়ে যা ঘটেছিল সেটা কৃষ্ণাকে বলে ফেলাই সমীচীন।

ম্যানেজার কাল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ী যাবার পথে আমার ওখানে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণার ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বাসবী কথাগুলো বলল। অনেকটা যেন স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে।

তোমার ওখানে?

হ্যাঁ, বোধ হয় দেখতে গিয়েছিলেন আমার মা সত্যি অসুস্থ না আমি বিনা কারণে তিনদিন ডুব দিয়েছি।

কৃষ্ণা কিছু বলল না, কিন্তু তার চোখ-মুখের ভঙ্গিতে এটুকু বোঝা গেল, যে ম্যানেজার যে বাসবীকে সন্দেহ করে তার বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল, এ কথা সে মোটেই বিশ্বাস করছে না।

একটা কাজ আমি কিন্তু ভারি অন্যায় করে ফেলেছি কৃষ্ণা।

কি?

ম্যানেজারকে ওপরে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার ছন্নছাড়া দারিদ্র্য-জর্জর সংসারে তাঁর মত লোককে নিয়ে যেতে সঙ্কোচ হ'ল। অবশ্য আমরা যে লক্ষপতি নই, সেটা তাঁর জানা, তবু একেবারে আচমকা অগোছাল সংসারে তাঁকে নিয়ে যেতে পারলাম না ভাই। অবশ্য দু'একবার তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেতে রাজী হলেন না। বললেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ী তাঁকে যেতে হবে।

তা হ'লে আর তুমি কি করবে? কৃষ্ণা নিতান্ত যেন কিছু একটা বলতে হবে, এই ভাবে কথাগুলো বলল।

কিন্তু আমার মনে হয়, একটু জোর করে অনুরোধ করলে ঠিক তিনি যেতেন, আর সেটাই করা আমার উচিত ছিল।

কৃষ্ণা আর কিছু বলল না। টিফিন শেষ হয়ে গেছে। বাসবী উঠে দাঁড়াল।

ঠিক বাসবী যখন কামরার বাইরে পা দিচ্ছে, তখন কৃষ্ণা কথা বলল।

এমন কথা যা বাসবী কখনও আশাও করে নি। অন্তত কৃষ্ণার কাছ থেকে।

কিছু যদি মনে না কর বাসবী একটা কথা বলব।

বল।

তুমি অনিমেষবাবুর জীবন থেকে সরে দাঁড়াও। তুমি সরে দাঁড়ালে হয়ত ওদের মিলন সহজ হবে। বেলাদেবী পুরণো সংসারে ফিরে আসবেন।

একটা কালনাগিনী ফণা বিস্তার করে বুকের মাঝখানে ছোবল মারলেও বোধ হয় বাসবী এতটা বিচলিত হ'ত না। এতটা বিমূঢ় নয়।

উত্তর দিতে গিয়েও বাসবী থেমে গেল। একটা ফোন এসেছে। কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফোন না এলেও বাসবী কোন উত্তর দিত না। উত্তর দিয়ে লাভ নেই। কৃষ্ণা যে কথাটা বলল, অফিসের অধিকাংশ লোকেরই হয়ত সেটা মত। তারাও তাই ভাবে। এক সঙ্গে এক মোটরে যাওয়া-আসা, তারপর অফিসের কাজে বাইরে যাবার জন্য ঠিক বেছে বেছে বাসবীকে সঙ্গিনী করা, এসব কারোরই চোখ এড়ায় নি।

ভাগ্য ভাল বাসবীর যে সে এ অফিসে যোগ দেবার আগেই অনিমেষের সংসার ভেঙেছে। নয়ত ঘর ভাঙার দায়টাও তার ওপর এসে পড়ত।

বাসবী নিজের কামরায় ফিরে এল।

অনিমেষের চেয়ার খালি। সে এখনও ফেরে নি।

ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটা বাসবী চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিল।

কাল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ীতে বেলাদেবীর সঙ্গে পুনর্মিলনের একটা আশ্বাস পেয়েছে তাই বুঝি অনিমেষ সকাল থেকে এত প্রফুল্ল-চিত্ত। পরিহাসের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। বাসবীর বিয়ে নিয়ে রসিকতা।

যদি সেতুবন্ধন হয় দু'জনের মধ্যে, তা হ'লে বাসবী অন্তত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। কলঙ্ক থেকে মুক্তি, অপবাদ থেকে পরিত্রাণ।

একটা মেয়ের সম্বন্ধে কত সহজে বাইরের লোক একটা ধারণা করে বসে। মেয়েরাও বাদ যায় না। কয়েক দিন কারও সঙ্গে বেড়ালে, কিংবা ঘনিষ্ঠভাবে কথা

বললেই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় যে নিবিড়তর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে।

মেয়েদের মনে এত সহজে রঙ ধরে যারা ভেবে নেয়, তারা মেয়েদের বোঝে না। নারী-মনের বিচিত্র রহস্য সম্বন্ধেও কিছু জানে না।

দরজার শব্দ হ'তে বাসবী মুখ তুলে দেখল। পর্দার ফাঁকে চোখ রাখল। অনিমেষ ফিরছে।

এতক্ষণ বাসবী চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে-ছিল। কাজে হাতই দেয় নি। এবার ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

সুখী হোক অনিমেষ। শান্তি পাক। পুরণো মানুষটাকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধুক। এতে পরোক্ষে বাসবীরই মঙ্গল।

তবু মাঝে মাঝে বাসবীর বুকের ঠিক মাঝখানে একটা যন্ত্রণার আভাস। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই হৃদয়তন্ত্রী মোচড় দিয়ে ওঠে।

বাসবী নিজের মনের মধ্যে ডুবুরি নামাল। নিজের নগ্ন অন্তর যাচাই করল নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। না, কোথাও অনিমেষের ছায়া নেই।

অনিমেষের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ আছে, তার প্রতি আনুগত্য, হয়ত এত অল্প বয়সে এত উন্নতি করার জন্য প্রচ্ছন্ন, ঈর্ষা, কিন্তু প্রেমের ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই। এক মুহূর্তের দুর্বলতা পরমুহূর্তেই বাসবী কাটিয়ে উঠেছে। অসম্ভব কোন কল্পনা মনেও ঠাঁই দেয় নি।

মিস সেন।

অনিমেষের আচমকা ডাকে বাসবী সোজা হয়ে বসল। তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল অনিমেষের সামনে।

কিছু বললেন?

বলছিলাম, আপনার মা ত এখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন নি। যদি প্রয়োজন বোধ করেন আপনি একটু আগেও চলে যেতে পারেন।

মুখে বাসবী কোন উত্তর দিল না। ঘাড় নেড়ে নিজের চেয়ারে ফিরে এল।

হঠাৎ এত বদান্যতার কারণ? কারণ অবশ্য বাসবীর অজানা নয়। এখন অনিমেষের যা মনের অবস্থা, কয়েক ঘণ্টার ছুটি ত সামান্য কথা, প্রয়োজন হ'লে মেখোরা আর সময়কক্ষ অনায়াসেই দান করে দিতে পারে।

বাসবী ফাইলের পাতায় মন বসাবার প্রাণপণ চেষ্টা করল।

চারটের সময় বাসবী একবার ভাবল উঠে পড়বে। অনিমেষ ত বলেই দিয়েছে। শুধু যাবার সময় অনিমেষকে একবার বলে গেলেই হবে।

তাড়াতাড়ি বাড়ী যাওয়ার যে বিশেষ প্রয়োজন এমন নয়। সকালে বাসবী বিকালের তরকারি রান্না করে এসেছে। যাবার সময় দোকান থেকে পাউরুটি কিনে নিয়ে যাবে।

আর একটা কথা মনে হ'তেই বাসবী ভ্রূ কোঁচকাল। এমন ত নয়, বেলাদেবী অফিসে আসবে অনিমেষের সঙ্গে দেখা করতে? সেই জন্য কামরা খালি থাকা দরকার। তাই অনিমেষ বাসবীকে তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে অনুমতি দিয়েছে।

কারণ যাই হোক, ফাইল গুছিয়ে বাসবী উঠে পড়ল। এখন বের হ'লে অন্তত ভীড়ে ঠেলাঠেলি করতে হবে না। আরামে বাড়ী যেতে পারবে। সেটুকুও আজকালকার দিনে বড় কম লাভ নয়।

যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে বাসবী অনিমেষকে বলল, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি তা হ'লে।

অনিমেষ একবার মুখ তুলে দেখল। হাসির রেখা টানল মুখে। বলল, আসুন।

দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বাসবী ট্রাম পেয়ে গেল। একেবারে খালি নয়, তবে লেডিজ সীট খালি। প্রবেশ-মুখেও ঠেলাঠেলি করতে হ'ল না।

ভ্যানিটি ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে বাসবী বসল।

এরপর হয়ত বেলাদেবী মাঝে মাঝে অফিসে আসবে। অনিমেষের কামরায়। বাসবীর সঙ্গে দেখা হবে, কথাবার্তাও, কিন্তু তখন আর কথার মধ্যে ঈর্ষার হুল থাকবে না।

ভালয় ভালয় দু'জনের মিলন হয়ে গেলে কথাটা বাসবী মাকে বলতে পারবে। মা'র মনে যদি সন্দেহের বাষ্পও থাকে, সে বাষ্প অপসারিত হবে।

কেমন আছেন?

আচমকা প্রশ্নে বাসবী ঘাড় ফেরাল। মেয়েটি কখন তার পাশে এসে বসেছে, খেয়াল করে নি। কিন্তু এক নজরেই মেয়েটিকে চিনতে পারল।

দীপালী। দীপকের বোন।

ভাল। আপনি এখানে?

আমি একটা সেলাইয়ের স্কুলে আসি। কাজ শিখতে। সপ্তাহে চার দিন।

ও। বাসবী নিস্পৃহভাবে উত্তর দিয়ে জানলার বাইরে চোখ ফেরাল। হৃদ্যতা করার কোন প্রয়োজন নেই। সুযোগ পেলেই হয়ত ভাইয়ের মর্যাদা আর অধুনা-অর্জিত ঐশ্বর্যের কথা শোনাবে।

আপনার সঙ্গে ত বাবার একদিন দেখা হয়েছিল?

নিরুপায়। বাসবীকে মুখ ফেরাতে হ'ল। উত্তরও দিতে হ'ল।

হ্যাঁ। একদিন ফেরার সময় ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় রাস্তার ওপর দেখা হয়ে গিয়েছিল।

বাবা বলছিলেন। একদিন আসুন না আমাদের বাড়ী। বাবা আর মা প্রায়ই আপনার কথা বলেন।

আমার কথা?

হ্যাঁ, আপনার উপকার আমরা কেউ ভুলি নি। কখনও ভুলব না।

বাসবী চুপ করে রইল। কোন উত্তর দিল না। এসব মামুলি কথার কোন উত্তরের দরকার হয় না।

দাদাও বলে আপনার কথা।

এইবার বাসবী কৌতূহলী হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু বলল না। যদি কিছু বলার থাকে, দীপালীই বলুক।

দীপালীই বলল।

দাদা আপনার সঙ্গে প্রথম দিকে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছে, পারে নি। একদিন বোধ হয় আপনাদের বাড়ীতেও গিয়েছিল, আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি।

বাসবী এবারেও কোন কথা বলল না। এসব কথার কোন উত্তর তার দেবার নয়।

দীপালীর কিন্তু থামবার কোন লক্ষণ নেই। প্রথম আলাপে এ মেয়েটিকে যথেষ্ট স্বল্পভাষীনী বলে মনে হয়েছিল, আজ প্রাচুর্য বুঝি প্রগলভতাও এনে দিয়েছে।

বাবার কাছে ত সব শুনেছেন।

এইবার বাসবী কঠিন করল মুখের রেখা। দু'টি ভ্রূ'র মাঝখানে খাঁজ পড়ল।

কি শুনেছি?

দাদা আর আগের মতন নেই।

বাসবী মুখ ফেরাল। কঠোর, উগ্র কণ্ঠে বলল, পয়সা হ'লে সবাই বদলে যায় দীপালীদেবী। আমার পয়সা হ'লে আমিও বদলে যেতাম।

দীপালীর মুখ পলকে বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারল না। নতমুখে চুপচাপ বসে রইল।

তারপর, যখন বাসবী ভাবল, সারাটা পথ দীপালী আর কোন কথা বলবে না, তখন দীপালী খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট সুরে বলল, পয়সা? জানি না দাদা কত টাকা মাইনে পায়, এভাবে চলবার মতন যথেষ্ট আয় তার আছে কি না। কিন্তু একদিন যে দাদা টিউশনির দু' মুঠো টাকা এনে আগে মা'র হাতে সব তুলে দিত, একাদশীর দিন আমি কি খেয়েছি খোঁজ করত, সে দাদা আর নেই। এখন দাদা যে-খেলায় মেতেছে তাতে ঝড়ের আগে কুটোর মতন একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এসব কথা আমায় বলে লাভ কি বলুন? কোথায় কার ছেলে, কার ভাই বাঁধা সড়ক ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে অঙ্গে ধুলো মাখছে সে দেখার দায়িত্ব ত আমার নয়।

কাগজে-কলমে আপনার কোন দায়দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু মনের দিক থেকে একটা দায়িত্ব আছে বৈ কি।

বাসবী রীতিমত চমকে উঠল।

মনের দিক থেকে?

হ্যাঁ, আপনি মুখ ফিরিয়ে না থাকলে দাদার এ অবস্থা হ'ত না। দাদার ডায়েরী থেকে আমি সব কথা জেনেছি।

কথা শেষ করেই দীপালী উঠে দাঁড়াল। একটি কথাও না বলে, বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে, ভীড় কাটিয়ে নেমে গেল।

এমন একটা নাটকীয়তার জন্ত বাসবী মোটেই তৈরী ছিল না। প্রথমেই তার ভয় হ'ল, ট্রামে অন্ত লোক

কথাগুলো শুনে ফেলে নি ত। অবশ্য কথাগুলো দীপালী এমন সুরে বলেছে যাতে শুধু বাসবীই শুনতে পায়।

ট্রামের বেশীর ভাগ লোকই নিজেদের কথায় মত্ত। দু'একজন সীটে হেলান দিয়ে নিমীলিত-চক্ষু। নিদ্রিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। এমন একটা শ্রুতিমধুর কথা কানে গেলে তারা আড়চোখে বাসবীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত, সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই।

কথাগুলো আর কারও কানে যায় নি। এই তপ্ত সীসার তরলতার সবটুকুই বাসবীর কানের মধ্যে পড়েছে।

কি লিখেছে দীপক তার ডায়েরীতে? এমন কি কথা যেটা পড়ে দীপালীর ধারণা হ'ল তার দাদার উঞ্ছ-বৃত্তির জন্ম দায়ী বাসবীর বিমুখতা। বাসবী ধরা দেয় নি বলেই, দীপক অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে।

একটু একটু সবটুকু বাসবী ভাবতে সুরু করল। দীপকের সঙ্গে আলাপ হবার প্রথম পর্যায় থেকে। একদিন শুধু দীপককে যেন একটু দুর্বল মনে হয়েছিল, কিন্তু বাসবী সে দুর্বলতার প্রশ্রয় দেয় নি। বরং প্রয়োজনের চেয়ে একটু কঠোরই হয়েছিল।

তার চাকরির জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, তার বাড়ীতে গেছে, দু'একদিন ভালভাবে কথা বলেছে, তাতেই দীপক আকাশকুসুম চয়ন করতে আরম্ভ করেছে। বাসবীকে স্মরণ করে নিজের খাতায় হিজিবিজি এঁকেছে।

এত সহজলভ্য বাসবী। বাসবীদের কুক্ষিগত করা এত অনায়াস-সাধ্য।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল বাসবীর। মনে হ'ল কে যেন সাঁড়াশী-প্রতিম দু'টি মুষ্টি দিয়ে সবলে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এক তিল বায়ু বুকের মধ্যে প্রবেশ করতে দেবে না।

কি করবে বাসবী! এভাবে সপ্তরথী মিলে অনবরত যদি তীক্ষ্ণতম আয়ুধ নিক্ষেপ করে তাকে লক্ষ্য করে, তা হ'লে কি করে বাসবী বাঁচবে!

জানলার ওপর বাসবী আস্তে আস্তে মাথাটা রাখল। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে যদি ঘুমাতে পারত বাসবী। অনেকদিন ধরে।

খুব আস্তে, রাস্তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে বাসবী বাড়ী ফিরল। বাড়ীর সামনে এসে একবার মুখ তুলে দেখল। না, মা বারান্দায় নেই। অবশ্য এত সকালে বাসবীর ফেরার কথা নয়। তাই বোধ হয় মা এসে দাঁড়ায় নি।

কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তরলা দরজা খুলে দিল। মা পাশের ঘরেই ছিল, তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল।

কি রে, এত সকাল সকাল এলি?

কথাটা মা আর শেষ করতে পারল না। বাসবীর মুখের দিকে চেয়েই থেমে গেল। সারা মুখ কাগজের মতন সাদা। নীরক্ত ওষ্ঠাধর। বেতসপাতার মতন দেহটা অল্প অল্প কাঁপছে।

কি হয়েছে রে বাসী?

মা ছুটে এসে বাসবীকে আঁকড়ে ধরল।

কি হয়েছে বল? মুখচোখ এমন ক্যাকাসে হয়ে গেছে কেন?

বাসবী মা'র কাঁধে মাথাটা রেখে অস্পষ্ট জড়ানো কণ্ঠে বলল, একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা হয়ে গেছে মা।

দুর্ঘটনা? কোথায় রে? কার?

ঠিক আমার বয়সী একটা মেয়ে বাস চাপা পড়েছে। একটা চাকা তার বুকের ওপর, আর একটা মাথার ওপর দিয়ে গেছে। বল মা, মেয়েটা কখনও বাঁচতে পারে? মেয়েটার সব যন্ত্রণা যেন আমি ভোগ করছি।

মা কোন কথা বলল না। সাবধানে মেয়েকে ধরে একেবারে বাথরুমে নিয়ে গেল। তার মাথাটা নীচু করে কল খুলে তার তলায় ধরল। জলের ধারা চুল বেয়ে ঘাড় বেয়ে, গড়িয়ে পড়ল।

আঃ, খুব আরাম লাগছে বাসবীর। মনে হচ্ছে পুঞ্জীভূত উত্তাপ দ্রবীভূত হচ্ছে। সারা শরীরে শীতল একটা শিহরণ। সব জ্বালা, সব যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে।

ব্লাউজে জল লাগতেই বাসবী মাথাটা সরিয়ে নিল। কলটা ধরে চুপচাপ দাঁড়াল। ইতিমধ্যে মা গামছা নিয়ে এসেছে। গামছা নিয়ে বাসবীর সিক্ত চুলের রাশ থেকে জল মুছে নিচ্ছে। বাসবী যখন ছোট ছিল, পর-নির্ভর, তখন যেমন করে মা তাকে ধুইয়ে-মুছিয়ে দিত।

বোঝা হয়ে গেলে মা বাসবীর হাত ধরে তাকে তক্তপোষের ওপর বসিয়ে দিল।

একটু পরেই বাসবী সুস্থ হ'ল। এমন একটা ব্যাপারে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল, ভেবেই লজ্জা পেল।

বাসবী ত চেয়েছিল, এমন একটা ব্যাপারই ঘটুক। অনিমেষ রায় থেকে সুরু করে অফিসের সবাই জানুক যে বাসবী দীপকের প্রতি আকৃষ্ট। দু'জনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক একটা আছে। এই ভেবে অনিমেষ তাকে মুক্তি দেবে। তার ওপর মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করবে না। অফিসের লোকরাও অনিমেষের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কুৎসা সৃষ্টির প্রয়াস করবে না।

অনিমেষকে আর বাসবীর ভয় নেই। এত দিন সে ভুলই বুঝেছিল। তার মন বেলাদেবীর কাছেই বাঁধা। সাংসারিক ঝড়ে, বিক্ষোভে সে সম্পর্কে সাময়িকভাবে হয়ত ফাটল ধরেছিল, কিন্তু সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নি। বাসবীকে পাশে নিয়ে ঘোরা, অফিসের পরে তার সঙ্গ কামনা করা, এসব শুধু বেলাদেবীর প্রতিই তার আকর্ষণের প্রকারভেদ। বার বার বাসবীর মধ্যে অনিমেষের মন বেলাদেবীকেই খুঁজেছিল।

দীপকের সঙ্গে পরিচয়ের পরমায়ুই শুধু নয়, পরিচয়ের নিবিড়তাও অনেক কম। ক'দিন দেখা হয়েছে হাতের আঙুল গুনে বাসবী বলে দিতে পারে। এত স্বল্প পরিচয়ে কেউ ভালবাসার জাল বুনতে পারে, এটা বাসবীর অসম্ভব মনে হ'ল।

কি এমন কথা লিখেছে দীপক তার ডায়েরীতে যেটা পড়ে দীপালী অমন একটা ধারণা করে ফেলল।

দীপক নিজেকে নিবেদন করল কবে, যে প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন তুলেছে।

এটাও বাসবীর কাছে আশ্চর্য মনে হ'ল।

দীপকের আহ্বানে যদি সে সাড়া না দিয়েই থাকে, তা হ'লেই দীপক নিজের জীবন নিয়ে এমনই ছিনিমিনি খেলবে! উদাসীন থাকবে নিজের সংসারের প্রতি? উচ্ছৃঙ্খল দিনযাপন করবে?

এমন ত নয়, দীপকের মনের কথাটা তার বাবাও জানে, জানতে পেরেছে? এমন একটা কথা, যার সঙ্গে একমাত্র পুত্রের সুখ দুঃখ জড়িত, সেটা-সংসারে আলোচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেই জন্যই বুঝি সেদিন রণজিতবাবু ওভাবে বলল, দীপকের জীবনের মোড় ফেরাতে একমাত্র বাসবীই পারে।

সব পারে বাসবী। বেলাদেবী আর অনিমেষের জীবনে নতুন করে রাখীবন্ধন করতে, দীপককে রসাতলের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে।

সব পারে, শুধু নিজের অন্ধকার চূর্ণিত জীবনে একটি আলোর কণা আনতে পারে না, নিজের সংসারকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে পারে না।

নে, দুধটুকু খেয়ে নে বাসী।

মা দুধের কাপ বাসবীর মুখের কাছে ধরল।

হাত দিয়ে বাসবী দুধের কাপটা সরিয়ে দিল।

তুমি যে আমাকে সত্যি সত্যি রোগী বানিয়ে তুলতে চাও মা? কি হয়েছে কি আমার?

শরীরটা খারাপ লাগছে, গরম দুধটা ভালই লাগবে।

না মা, আমি ভাল আছি। আমি সামলে নিয়েছি নিজেকে। অফিসে কাজ-করা মেয়ের অত সহজে বেসামাল হ'লে চলে না মা। অনেক মৃত্যু, অনেক আঘাত পার হয়ে তবে জীবনের দরজায় পৌঁছতে হয়।

মাঝে মাঝে বাসবীর কথা মা বুঝতে পারে না। কেমন যেন হেঁয়ালীভরা অস্পষ্ট কথাবার্তা। আগে কিন্তু বাসবী এমন কথা বলত না। বাড়ীর মানুষটা বেঁচে থাকবার সময়, বাসবী যখন সংসার বাঁচাবার সংগ্রাম সুরু করে নি, তখন।

এখন বাসবী অনেক বদলে গেছে। শুধু বদলেই যায় নি, অনেক সরে গেছে সংসার থেকে। সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু মাসান্তে কয়েক মুঠো টাকার। অবশ্য আপদ-বিপদে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে কোন দায়-দায়িত্ব মাথা পেতে নেয়।

কিন্তু আগের মতন মা'র পাশে বসে কথা বলে না, গল্প করে না। সর্বদাই কি যেন ভাবে। সকালে ত কথা বলবার সময়ই পায় না। অফিস যাবার তাড়াতেই ব্যস্ত থাকে। রাত্রে ফেরে ক্লান্ত, বিষণ্ণ সত্তা, দুর্যোগগ্রস্ত জাহাজের নাবিকের মতন।

মা দুধের কাপটা নিয়ে সরে গেল। সিঁড়িতে

কোলাহল শোনা গেল। চীৎকার করতে করতে খোকন আর রুবি ফিরছে।

দিদিকে দেখেই দু'জনে থমকে দাঁড়াল। এত তাড়াতাড়ি তাকে বাড়ীতে আশা করে নি। কিন্তু এই অপ্রস্তুত ভাব কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপরই রুবি ছুটে এসে দিদির কোলে মুখ লুকাল।

দিদি, তোমার বিয়েতে কিন্তু আমি নিতবর সাজব।

খোকন একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, কি বোকা, মেয়েরা বুঝি আবার নিতবর হয়? আমি নিতবর হব।

কেন হবে না? মেয়েরা চাকরি করতে পারে আর নিতবর হ'তে পারে না?

রুবির দু'চোখে জল। অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠ।

বাসবী বুঝতে পারল পার্কে বেড়াতে গিয়ে কোন সমবয়সীদের সঙ্গে এ নিয়ে হয়ত কথা হয়েছে। কিংবা আশেপাশের বাড়ীতে বোধ হয় বিয়ের আয়োজন চলছে, সেই প্রসঙ্গে নিতবরের আলোচনা শুনেছে দু'জনে।

দু'হাতে রুবির মুখটা তুলে ধরে বাসবী বলল, তুমি নিতবর হ'তে যাবে কোন্ দুঃখে?

তবে? রুবি সম্মেহদীপ্ত দু'টি চোখ তুলে দিদির দিকে দেখল।

তুমি কনে হবে, নিজের বিয়ের দিন।

যাঃ। কি অসভ্য।

রুবি নিজের আরক্ত মুখটা দিদির কোলের মধ্যে গুঁজে দিল।

সে রাত্রে বাসবী অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট করল। এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা। এক সমস্যা থেকে আর এক সমস্যা। সে চিন্তার যেমন শেষ নেই, সে সমস্যারও সমাধান নেই।

দিনের আলোয় দীপককে যত দুষ্কৃতকারী, দুর্বিনীত বলে মনে হয়েছিল, রাতের অন্ধকারে তার পাপ, তার অন্যায় যেন অনেক লঘু বলে মনে হ'ল।

কাউকে ভাললাগা অপরাধ নয়। মনের এই অনুভূতি দীপক পথে-ঘাটে সরব ঘোষণা করে নি। হয়ত সুযোগ পেলে, পরিবেশ অনুকূল হ'লে, একান্তে কথাটা বাসবীকে বলত। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আট বছরে গৌরীদানের যুগ বহুদিন পার হয়ে গেছে। সব সময়ে অভিভাবকদের মাধ্যমে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, এমন নয়। নারী আর পুরুষ দু'জনেই মন গড়ে ওঠার বয়স পর্যন্ত একাকী থাকে। কাজেই মন-জানাজানির ভূমিকা তাদের নিজেদেরই নিতে হয়।

নিজের ডায়েরীতে গোপনে দীপক যদি কিছু লিখেই থাকে, তা হ'লে সে কি খুব মারাত্মকভাবে দোষী? এটা তার নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের কারও সেখানে উঁকি দেওয়াই বরং ঘোরতর অপরাধ।

বাসবী ডায়েরী লেখে না। কোন দিন লেখে নি। কিন্তু তার হৃদয়ের গোপন স্তর উন্মোচিত করে কেউ যদি অদৃশ্য লিপি পড়ার চেষ্টা করে, সেটা কি খুব শোভন হবে! ডায়েরীর পাতায় ত হৃদয়ই প্রতিবিম্বিত হয়। অন্তরঙ্গ একটা মানুষের পরিচয় ফুটে ওঠে প্রতি ছত্রে। এ ব্যাপারে অন্য কারও অহেতুক কৌতূহল থাকাই অন্যায়।

কিন্তু দীপক কি জানে না, সংসারের কঠিন নিগড়ে বাসবীর হাত-পা বাঁধা। হৃদয়ও ত অখণ্ড নেই, হাজার টুকরো করে সংসারে, অফিসে ছড়ান। এমন একটা প্রস্তরীভূত, নিশ্চেতন মেয়েকে দীপক কামনা করে কিসের লোভে?

বাসবী উঠে বসল। উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তার সুপ্ত বিবেক সচেতন হয়ে উঠল। স্পর্ধা দীপকের। তার ধারণা, বাসবী অফিসে চাকরি করে বলে, তার কোন মর্যাদা নেই, সম্মান নেই, নিজের ডায়েরীতে তাকে নিয়ে যা-ইচ্ছা লেখা চলে।

দীপকের সঙ্গে দেখা হ'লে তার এই ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে হবে।

আর একটা কথাও বাসবীর মনে হ'ল। তার সারাটা জীবন বুঝি এই ঝুটো সম্মান রক্ষার কাজেই কাটবে? কে কোথায় তার নামে কি বলে বেড়াচ্ছে, কে তার ডায়েরীর পাতায় কালি ছিটাচ্ছে তাকে লক্ষ্য করে?

এই অর্বাচীন খেলা খেলতে খেলতে বাসবীর কপালের দু-পাশের চুলে রূপালী রং দেখা দেবে। গালে, কপালে সময়ের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। যে জীবনের উদ্দেশ্য

ছিল দীপশিখার মতন প্রোজ্জ্বল হবার, সে জীবন শুধু একটা দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হবে।

তখন এই অপবাদ, নীরব নিবেদন সব অর্থহীন হয়ে যাবে।

বাসবী নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলো।

সে-রাতে রণজিতবাবুর কথায় সে এতটা বিচলিত হয় নি, আজ দীপালীর কথা তাকে রীতিমত চঞ্চল করে তুলেছে।

মনে হয় দীপকের বাড়ীর সকলের ধারণা দীপকের সঙ্গে বাসবীর সাক্ষাতটা মোটেই আকস্মিক নয়। এত স্বল্পায়ু পরিচিতের ওপর নির্ভর করে একটি মেয়ে একটি পুরুষের জন্ত এতটা করে না।

সম্ভবত তাদের আলাপ বহুদিনের। হয়ত কলেজ-জীবন থেকে। মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা চলছে বহুদিন ধরে। একটা প্রতিশ্রুতি সম্ভবত দু'জনে সস্নেহে লালিত করছিল যে অবস্থা ভাল হ'লে দু'জনে দু'জনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবে।

তারপর যেমন হয়। আচমকা ঝড়ের ধুলোয়, দুর্যোগের অকাল বর্ষণে সে প্রতিশ্রুতি ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোথাও তার সামান্ত রেখাটুকুও পাওয়া যায় না। অন্তত বাসবীর দিক থেকে তাই হয়েছে। দীপক ব'লে কোন মানুষ কোনদিন তার জীবনে ছায়া ফেলেছিল, এমন কথা তার স্মরণে নেই।

তাই দীপককে অন্তরের বেদনা গোপনে কাদির আঁচড়ে রূপ দিতে হয়েছিল।

এটাই হয়ত দীপালীর ধারণা। দীপকের ডায়েরীর ছত্রে ছত্রে হতাশাসের সুরের মধ্যে সে এমন একটা কাহিনীরই গন্ধ পেয়েছে। রণজিতবাবুকেও হয়ত এই কথাই বুঝিয়েছে।

বাসী, বাসী।

মা প্রথমে মেয়ের নাম ধরে ডাকল। সাড় নেই মেয়েটার। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অথচ বেলা হয়ে গেছে। এখন না উঠিয়ে দিলে অফিস যেতে দেরি হয়ে যাবে।

মা এগিয়ে এসে বাসবীর বাহুমূল ধরে নাড়া দিল।

ধড়মড় করে বাসবী উঠে পড়ল।

অস্ফুট, ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বলল, তুমি বিশ্বাস কর মা, ডায়েরীর কথা আমি কিছু জানি না। কে কোথায় গোপনে কি লিখল, তার দায় কি আমার?

মা বাসবীকে ধরে সজোরে নাড়া দিল।

কি হয়েছে বাসী, তুই এমন করছিস কেন? কিসের ডায়েরী?

বাসবী চোখ মেলে চাইল। শাড়ীর আঁচল দিয়ে দুটো চোখ মুছে নিল।

রাত্রির অন্ধকার আর নেই। দিনের আলো প্রকট। রাত্রির বিবরে যে সরীসৃপ চিন্তার রাশ সুযোগ পেয়ে দংশন করতে উদ্যত হয়েছিল, প্রকাশ্য আলোয় ধারে-কাছে তারা কেউ নেই।

কিসের ডায়েরী বাসী?

মা আবার প্রশ্ন করল।

বাসবী ঢোক গিলল। মনে মনে উত্তরটা একবার গুছিয়ে নিল, তারপর বলল, অফিসের ডায়েরী মা। অফিসে সকলের একটা কাজের ডায়েরী থাকে ত।

গোপনে লেখার কথা কি বলছিলি? তোর দায়ই বা কিসের?

বাসবী চিন্তিত হ'ল। আধতন্দ্রায় কি বলেছে, কতটা, তার স্মরণ নেই, কিন্তু উত্তর একটা তাকে দিতে হবে। উত্তরের জন্ত মা একেবারে সামনে অপেক্ষা করছে।

দেখ না মা, অফিসের ডায়েরীতে কে সব হিজিবিজি লিখেছে, তার জন্ত আমার কি দায়? ডায়েরীটা আমার কাছে থাকে, কাজেই জবাব দেবার দায়িত্ব আমার।

কে জবাব চাইল?

কেউ চায় নি এখনও। ম্যানেজার চাইতে পারে।

বলে দিবি তুই কিছু জানিস না। তুই কিছু করিস নি।

তাই বলব মা।

বাসবী আর অপেক্ষা করল না। অপেক্ষা করার অসুবিধা আছে। এক কথা থেকে আর এক কথা, এক মিথ্যা থেকে আর এক মিথ্যার জের টেনে যাওয়ার মধ্যে বিপদ যথেষ্ট।

বাসবী উঠে বাথরুমে চলে গেল।

শুধু মুখ-হাত ধোওয়াই নয়, বাসবী একেবারে স্নান

সেরে বের হ'ল। সারা রাত্রির ক্লেদাক্ত চিন্তায় দেহটাও যেন অশুচি হয়ে গিয়েছিল। জলের ধারায় নিজেকে বাসবী পরিশুদ্ধ করল।

অফিস যাবার আগে পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে রইল। কি জানি মা আবার কি প্রশ্ন করে বসে। অসতর্ক মুহূর্তে, তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে কতটুকু বলেছে বাসবীর খেয়াল নেই।

কিন্তু মা কিছু বলল না। অন্তত এ সব কথা একটিও নয়।

একটু তাড়াতাড়িই বাসবী অফিসে এল। এত সকালে সে কোনদিনই আসে নি। নিশিবাবু পর্যন্ত এসে হাজির হয় নি। বেয়ারাগুলো এখনও চেয়ার-টেবিল ঝাড়ামোছা করছে।

বাসবী নিজের কামরায় ঢুকল।

মা'র প্রশ্নবাণ থেকে মুক্তি পাবার এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

চেয়ারে বসে বেয়ারাকে ডাকল। বেয়ারা আসতে এক গ্লাস জল চাইল।

সবে গ্লাসে চুমুক দেওয়া শেষ করে হাজিরা খাতায় বাসবী নাম সই করছে, এমন সময় দরজায় শব্দ হ'ল।

চোখ তুলে বাসবী দেখল অনিমেষ কামরায় ঢুকছে।

অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ে বেয়ারাকে কি জিজ্ঞাসা করল, তারপর যা করল, তাতে বাসবী রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেল।

নিজের চেয়ারের দিকে না গিয়ে অনিমেষ সোজা বাসবীর সীটের দিকে এগিয়ে এল। একেবারে পর্দার এপারে।

এতদিন বাসবী একসঙ্গে এ কামরায় বসছে, অনিমেষ কোনদিন নিজের সীমানা লঙ্ঘন করে নি। দরকার হ'লে বাসবীকে ডেকে পাঠিয়েছে।

অনিমেষ টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতে বাসবী উঠে দাঁড়াল। চেয়ার ছেড়ে।

আপনি আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন?

অফিসের কাজ হলে নিয়ম মাফিক আপনাকে ঠিকই ডেকে পাঠাতাম, কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, তাই নিজেই আপনার দরবারে এসেছি।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বুকের দ্রুত কম্পন বাসবী রোধ করতে পারল না। কারও ব্যক্তিগত কিছু শুনতে হ'লেই তার ভয় হয়, কি জানি কি শুনতে হবে। নিজের সমস্যারই বাসবী সমাধান করতে পারল না, নিজের হাজার দুঃখ বেদনা যন্ত্রণায় জড়ানো জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারল না কোনভাবে, পরের সমস্যা, পরের জীবনের কাহিনী শোনার তার কি অধিকার আছে!

তা ছাড়াও ভয়ের আরও কারণ আছে।

পরের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষীণ তন্তুতে তার নিজের জীবনও যদি জড়িয়ে যায়, তা হ'লে কি করবে বাসবী? একবার নয়, একাধিকবার এমন একটা সম্ভাবনা থেকে সে বহু কষ্টে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করেছে।

এ কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

বাসবী বসল।

বসল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না। কি জানি নিশিবাবু যে কোন মুহূর্তেই ভিতরে আসতে পারে। তা ছাড়া বেয়ারারা ত পারেই।

সবাই ভাববে কি ব্যাপার, ম্যানেজার সাহেব নিজের সিংহাসন ছেড়ে কেরানীর টেবিলে যে? কিসের এত অন্তরঙ্গতা!

আপনার একটা মতামত চাই।

আমার মতামত! বাসবী বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর?

আপনার কথা মেনে নিয়েই বলছি, সেতুবন্ধনে কাঠ-বেড়ালীরও অবদান ছিল।

বেশ বলুন।

আপনাকে ত আগেই বলেছি বেলাকে আমি নিজে যাচাই করে ঘরে তুলেছিলাম। আমাদের পূর্বরাগের পরমায়ুও কম ছিল না।

বাসবী বুঝতে পারল, অনিমেষ নিজের দাম্পত্য জীবনের ছেঁড়া তারেই সুর তোলার চেষ্টা করছে। সুর উঠবে কি না বাসবীর জানা নেই, কিন্তু অনিমেষের অক্লান্ত সাধনা চলবেই।

এভাবে আমাদের আলাদা থাকাটা আমাদের পরিচিত সমাজের কেউই ভাল চোখে দেখছে না। তা ছাড়া এতে আমার মর্যাদাও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আমাদের

দু'জনকেই যাঁরা চেনেন তাঁরা কিছুদিন যাবত ভাঙা ঘর জোড়া দেবার একটা প্রয়াস করছেন।

দু'হাতের ওপর নিজের থুঁতনিট রেখে বাসবী চুপচাপ বসে রইল। অনিমেষ বোধ হয় জানে না, যেটুকু সে বলছে, ইতিমধ্যে বাসবী তার চেয়ে অনেক বেশী কিছুই জানে।

বাসবী কিছু একটা বলবে এই প্রত্যাশায় অনিমেষ চোখ তুলে বাসবীর দিকে চেয়ে রয়েছে। বাসবীর কিছু একটা বলা হয়ত প্রয়োজন।

অনিমেষের দিকে না দেখে, অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বাসবী খুব মৃদুকণ্ঠে বলল, যদি বিরাট কোন বাধা না থাকে তা হ'লে আপনারা পরস্পরের কাছে ফিরে এলেই ত পারেন। এটা সম্ভব হ'লে, আপনাদের সমাজের লোকরা কেন, আমরাও খুব খুশী হব।

অনিমেষ দু' এক মুহূর্ত মাথা নীচু করে কি ভাবল। আঙুল দিয়ে বাসবীর টেবিলের ওপর অদৃশ্য আঁচড় কাটল, তারপর মাথা নীচু করেই বলল, ফিরে আসবার চেষ্টা নানাভাবেই করা হয়েছে। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই, বরং এই সামাজিক গ্লানি থেকে আমি মুক্তি পাই। কিন্তু বেলাকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল।

মুশকিল ?

মুশকিল মানে, তার কার্ট লাইফের প্রতি আকর্ষণ। সে স্বীকার করেছে যে নিজেকে সংযত করা তার অত্যন্ত প্রয়োজন, এভাবে বিভিন্ন সঙ্গী নিয়ে বিভিন্ন হোটেলে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো আমাদের দু'জনের মর্যাদার পক্ষেও হানিকর। কিন্তু মাঝে মাঝে সে বের হ'তে চায়! তার মত, এটা না কি স্বাধীনতা। আমার ধারণা, এটা স্বৈরাচার। বাধা এইখানেই।

কিন্তু আপনি ত বেলাদেবীকে নিয়ে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর বেরোতে পারেন। রাত্রের খাওয়াটা না হয় হোটেলেই সারবেন।

আগেও আমি তা করেছি মিস সেন, কিন্তু প্রত্যেক দিন আমার পক্ষে বের হওয়া সম্ভব নয়। আমার অফিসের কাজ থাকে, আমাকে ট্যুরে যেতে হয়, সেই সময় বেলা পুরোণো বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীতে হাট বসায়, তাদের দু' একজনকে নিয়ে হোটেলেও যায়। প্রথম প্রথম আমি তেমন কিছু মনে করি নি, ভেবেছিলাম বেলা গার্হস্থ্য-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, এসব দোষ তার কেটে যাবে। কিন্তু দোষ ত কাটলই না, বরং বেড়েই গেল। শেষকালে এমন হ'ল বন্ধুর বন্ধুর সঙ্গে তাকে এখানে-ওখানে দেখা যেতে লাগল। আমার পরিচিত লোকেরা আপত্তি জানাল, আমাকে কঠোর হ'তে বলল। বাধ্য হয়েই বেলাকে ডেকে বলতে হ'ল। দু' একদিন চুপচাপ রইল, আবার কিছুদিন পরে যে-কে সেই।

অনিমেষ দম নিল। একটানা এতগুলো কথা বলে তার সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাসবীর আশ্চর্য লাগল। কাঠবেড়ালীর উপমা সত্বেও বুঝতে পারল না, এত সব কথা তাকে বলার কি উদ্দেশ্য! বাসবী কি করতে পারে ?

ম্যানেজিং ডিরেক্টরও তাকে ডেকে সেতুবন্ধনের আভাস দিয়েছিলেন। তখন সে কথার বাসবী অন্য অর্থ করেছিল। ভেবেছিল তিনি বুঝি বাসবীকে সাবধান হ'তে নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি বাসবীর মনের গোপন কোণে অনুরাগের কোন মেঘ পুঞ্জিত হয়ে থাকে, তা হ'লে বাসবী সে মেঘ অপসারিত করুক, কারণ অনিমেষের দিক থেকে সাড়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এভাবে অনিমেষ এত কথা তাকে বলছে কেন? এমন একটা ব্যাপারে সে কি করতে পারে ?

কাউকে হয়ত বলা প্রয়োজন, এভাবে ভারাক্রান্ত হৃদয় বহন করতে অনিমেষের কষ্ট হচ্ছে, তাই সে সব কিছু উজাড় করে দিচ্ছে বাসবীর সামনে।

অনিমেষ এটুকু জানে সারা অফিসের মধ্যে এ বিষয়ে বাসবীই সবচেয়ে নিরাপদ। এ সব কথা নিয়ে সম্ভবত সে কারও সঙ্গে আলোচনা করবে না, কোন ব্যঙ্গোক্তি নয়, চুপচাপ শুনে যাবে।

আমার কি মনে হয় জানেন ?

অনিমেষ হঠাৎ কথা বলল।

বাসবী কোন উত্তর দিল না। শুধু দু'টি ভ্রু তুলল।

বেলা যদি কোন ভাবে আঘাত পায়, তা হ'লে হয়ত সে আবার ঘরের জীবন খুঁজবে।

কথাটা বুঝতে বাসবীর বেশ সময় নিল। যেটুকু বুঝল, সেইটুকুই অনিমেষের বক্তব্য ছিল কি না সেটা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না।

বিস্মিত কণ্ঠ থেকে শুধু প্রশ্ন বের হ'ল, আঘাত?

হ্যাঁ, আঘাত। এমন আঘাত যাতে তার বাইরের জীবনের নেশা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। যে উন্মাদনা, রক্তের কল্লোল তাকে সংসারের গণ্ডী থেকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরের জগতে আছড়ে নিয়ে ফেলছে, সে উন্মাদনা, কল্লোল একেবারে স্তিমিত হয়ে যাবে।

অনিমেষকে এত উত্তেজিত হতে বাসবী এর আগে কখনও দেখে নি। এমন কি হ'ল এই অল্প সময়ের মধ্যে যার জন্য শান্ত, স্থিতধী মানুষটা এত প্রমত্ত হয়ে উঠল।

যে আঘাতের স্বরূপ অনিমেষ বর্ণনা করছে, বেলা যদি তেমনই আঘাত পেয়ে অনিমেষের সামনে এসে দাঁড়ায় তা হ'লে পারবে অনিমেষ ধুলো ঝেড়ে, কলঙ্ক মুছে আবার তাকে নিজের পাশে স্থান দিতে। এত উদারচিত্ত, এত হৃদয়বান হ'তে পারবে অনিমেষ!

ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর পড়তেই অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আড়চোখে বাসবীও ঘড়ির দিকে দেখল। সাড়ে দশ। তার মানে প্রায় আধ ঘণ্টা দু'জনে মুখোমুখি বসে কথা বলেছে। সৌভাগ্যের কথা, এতটা সময়ের মধ্যে বেয়ারা কিংবা নিশিবাবু কেউ ভিতরে ঢোকে নি।

অনিমেষ ফিরতে গিয়েই থেমে গেল। বাসবীর আচমকা প্রশ্নে।

আমার একটা কথা ছিল।

বলুন।

এর মধ্যে কি আপনার বেলাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

উত্তর দেবার আগে অনিমেষ একবার বাসবীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল, তারপর বলল, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ীতে যা দেখা হয়েছিল, তারপর আর হয় নি। কেন বলুন ত?

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন দেখা হয়েছিল।

না, দেখা হয় নি, তবে আর একজনের মারফৎ খবর পাঠিয়েছে।

খবর?

হ্যাঁ, কোন চুক্তি করে বেলার পক্ষে আমার কাছে ফিরে আসা না কি সম্ভব নয়।

কি চুক্তি?

এই বাইরের জীবন ত্যাগ করার চুক্তি।

কথা শেষ করে অনিমেষ আর দাঁড়াল না। নিজের চেম্বারে ফিরে গেল।

সারা দিন কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বাসবীর মনের সামনে অনিমেষের ব্যথাম্লান মুখের ছবি ভেসে উঠল। ছলছল দু'টি চোখ, অবসাদে অবশ দু'টি ঠোঁটের প্রান্ত।

সবটাই বাসবীর যেন অবিশ্বাস্য মনে হ'ল। বাইরের জীবনের আকর্ষণ কি এত বেশী, যার জন্য এক নারী দয়িতের ব্যগ্র আলিঙ্গন তুচ্ছ করতে পারে? না কি, এর মধ্যে অন্য কোন রহস্য নিহিত। সব কথা অনিমেষ বলে নি। বলতে পারে নি।

বেলাদেবীরও হয়ত কিছু বলার থাকতে পারে। বহ্নিলোভী পতঙ্গের মতন বাইরের জীবনে কেন তার এত সাধ? নিজের পাখা দগ্ধ হবে জেনেও এই অগ্নি-পরিক্রমায় কি হেতু?

একান্তে কোনদিন যদি বাসবীর সঙ্গে বেলাদেবীর সাক্ষাৎ হয়, নিভৃতে কথা বলার সুযোগ, তা হ'লে বাসবী জিজ্ঞাসা করবে। অবশ্য বেলাদেবী তার সঙ্গে এ ধরনের আলোচনায় সম্মত হবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। ঈর্ষার নীলচোখে সব কিছুই বেলাদেবী বক্রভাবে দেখবে।

নিশিবাবু এসে দাঁড়াতে বাসবীর চেতনা হ'ল।

একটা চিঠি লেখার জন্যে সাদা প্যাড টেনে নিয়েছিল। কাপুর এ্যাণ্ড কোম্পানীকে কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় একটা চিঠি। কিন্তু তাদের একটা লাইনও লেখা হয় নি। তা বলে প্যাডের কাগজটিও নিষ্কলঙ্ক নেই। সারা পাতা জুড়ে অনিমেষের নাম। পাশে পাশে দু'একবার বেলার নামও আছে।

সেদিকে চোখ পড়তেই বাসবী বিব্রত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি প্যাডটা লুকিয়ে ফেলল ফাইলের তলায়, কিন্তু নিজের অপ্রস্তুত মুখের রেখাগুলো লুকাতে পারল না।

আমাকে রিজেন্ট ট্রেডার্স-এর ফাইলটা একটু দেবেন। কতকগুলো টেণ্ডার দিয়েছে। মালিকের নামটা একটু দেখে নেব।

বাসবী ক্যাবিনেট খুলে ফাইলটা বের করে দিল।

এ সব ফাইল নিয়ে নিশিবাবু এ কামরার বাইরে যায় না। যা-কিছু দেখবার এখানে বসেই দেখে। বাসবীর সামনে।

দু'একবার বাসবী বলেছে, ফাইলটা আপনি নিয়ে যান না। আপনার কাছেই ত থাকবে। কাজ হ'য়ে গেলে আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন।

নিশিবাবু ঘাড় নেড়েছে, না, না, অফিসের নিয়মবিরুদ্ধ কিছু করা উচিত নয়। এ সব ফাইল এ কামরার বাইরে যাবে না। কি দরকার বলুন নিয়ম ভঙ্গ করে। এখানে দেওয়ালেরও চোখ-কান আছে।

বাসবী আর কিছু বলে নি। চেয়ে চেয়ে মানুষটাকে দেখেছে। রসকষহীন জাতকেরাণী। অফিস-সর্বস্ব। এর দিগন্তে আর কিছুর অস্তিত্বই নেই। নিজের বাড়ীর কথা নিশিবাবুর মুখে বাসবী বিশেষ শোনে নি। কেমন তার সংসার, ছেলেমেয়ের সংখ্যা কত, তারা কি করে এ সব নিয়ে কোনদিন আলোচনা হয় নি। অথচ অফিসের কাজকর্মের জন্ত এই লোকটার সঙ্গেই বাসবীকে বেশী মেলামেশা করতে হয়।

ফাইলটা দেখে নিয়ে ওঠবার সময় নিশিবাবু কথা বলল। অনুচ্চ কণ্ঠে।

একটা নিমন্ত্রণ আসছে তা হ'লে?

পর্দার ওপারে অনিমেষ। কর্মব্যস্ত। মাঝে মাঝে তার কাশির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

বাসবীও কণ্ঠ চড়াল না। মৃদুগলায় বলল, কিসের নিমন্ত্রণ?

পর্দার ওপারে আড়চোখে চেয়ে দু'টি চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে নিশিবাবু বলল, পুনর্মিলনের।

কথাটা বলেই নিশিবাবু আর দাঁড়াল না। হন্ হন্ করে কামরার বাইরে চলে গেল।

বাসবী রীতিমত অবাক হ'ল। নিশিবাবুর শরীরের মধ্যে কোথাও আর একটা চোখ আছে বোধ হয়। সেই চোখ দিয়ে সব কিছু দেখতে পায়। কিংবা এমনও হ'তে পারে বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে অনিমেষ নিশিবাবুকেও সব কথা বলেছে।

আর ভাবতে পারে না বাসবী। এ বিষয় নিয়ে ভাবতে তার ভাল লাগে না। মিলন হোক দু'জনের। অনিমেষ শান্তি পাক। বেলাদেবী গৃহকোণের জীবনে সান্ত্বনা পাক, এ ছাড়া এই মুহূর্তে বাসবীর আর কিছু কাম্য নেই।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বাসবী উঠে পড়ল। অনিমেষ তখনও বসে রয়েছে। কাজে মত্ত।

বাসবী পাশ কাটিয়ে যাবার সময় অনিমেষ ডাকল।

শুনুন, বাড়ী যাবার তাড়া আছে না কি?

বাসবী দাঁড়িয়ে পড়ল, তাড়া আর কি, তবে সময়ে না গেলে লেডিজ ট্রাম পাওয়া মুস্কিল।

অনিমেষ চেয়ারে টান হয়ে বসে বলল, আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন আমার মোটরে উঠবেন না, না হ'লে আপনাকে একটু এগিয়ে দিতে পারতাম।

বাসবী কয়েক পা ফিরে এল। চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়াল, তারপর বলল, যখন আপনাদের সব গোলমাল মিটে যাবে। বেলাদেবী বিকালে আপনাকে নিতে আসবেন, তখন উঠব আপনার মোটরে। একটু এগিয়ে দেবেন। না কি, তখন আর আমাকে প্রয়োজন হবে না? অবাঞ্ছিত তৃতীয় ব্যক্তি বলে বর্জন করবেন?

ছি, ছি, কি বলছেন আপনি, হঠাৎ অনিমেষ নিজের ডান হাতটা বাসবীর দিকে প্রসারিত করে দিল, আপনার কথা আমি কোনদিনই ভুলব না।

কোন কিছু না ভেবেই বাসবী নিজের একটা হাতও বাড়িয়ে দিল। অনিমেষ হাতটা আগ্রহভরে চেপে ধরল। মুহূর্তের জন্ত, তারপর ছেড়ে দিল।

অন্তবার, এর আগে এমন স্পর্শে মাদকতা ছিল, বাসবীর স্নায়ুকোষে বিদ্যুৎশিহরণ জেগেছিল. কিন্তু আজকের এই ছোঁয়া প্রাণহীন, নিতান্ত যান্ত্রিক।

অনুভূতির কেন্দ্র মানুষের মন। মন বদলালে অনুভূতিও তার তীব্রতা হারায়। অবশ্য অনিমেষের সঙ্গে ঠিক এই রকম একটা সম্পর্কই বাসবীর কাম্য ছিল।

অনিমেষ আর বাসবী সমস্তরের যে নয়, সেটা বাসবীর চেয়ে বেশী করে আর কে জানে! সখ্যতা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু এমনই এক অনাবিল, মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে ত কোন বাধা নেই।

আজ চলি।

বাসবী মৃদু হেসে বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে কেরাণীরা তখনও কয়েকজন চলেছে। কারও গতি দ্রুত, কারও শ্লথ। কেউ কেউ মুখ তুলে বাসবীর দিকে দেখল। দু'একজন পরিচিতির হাসি হাসল। তাদের পিছন পিছন আস্তে আস্তে পা ফেলে বাসবী সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল।

ঈর্ষা হ'ল বাসবীর। এরা ভাল আছে। রোজকার অফিসের কাজটুকু করে দিয়েই এরা খালাস। আর কোন চিন্তা নেই। অপরের মিথ্যা কুৎসা থেকে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাবার আশঙ্কায় সর্বদা তটস্থ থাকতে হয় না। কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত দুঃখবেদনার ছায়া তাদের জীবনকে নিপীড়িত করে না। বাসবী যদি পারত এই গড্ডালিকা-স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে।

বাসবী।

পিছনে নিজের নাম শুনে বাসবী ফিরে দাঁড়াল। কৃষ্ণা নামছে।

কি ব্যাপার, তোমার এত তাড়াতাড়ি ছুটি মিলল?

ম্যানেজারকে বলে বেরিয়ে এলাম। ছ'টার শোতে সিনেমা যাব।

বাসবী ভ্রূ কুঁচকে কৃষ্ণাকে দেখল। কৃষ্ণা সিনেমা যাবে বলে নয়, এই কথাটা বলার সময় তার মুখে-চোখে অপূর্ব এক কমনীয়তা লক্ষ্য করল বাসবী। নববধূর লজ্জার সগোত্র।

একলা?

কৃষ্ণা একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল। একটা হাত বাসবীর কাঁধে রেখে খুব আস্তে বলল, সব কথা তোমায় আর একদিন বলব বাসবী। কালই বলব, কেমন?

বাসবীকে অতিক্রম করে কৃষ্ণা তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

কোন চেষ্টা করে নয়, বাসবীর গতি নিজের থেকেই আরও মন্থর হয়ে গেল।

আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণার হাবে-ভাবে সবই দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। এতদিন পরে বুঝি কৃষ্ণার দিগন্তে সূর্যোদয়ের আভাস জেগেছে। ভ্রমর এসেছে মনের আঙিনায়।

অতর্কিতে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলল বাসবী, তারপরই সাবধান হয়ে গেল।

জনস্রোত ঠেলে ঠেলে পথ চলতে সুরু করল। ডিঙি নৌকার মতন জল কেটে কেটে।

এরপর কৃষ্ণারও বলবার অন্তরঙ্গ কথা থাকবে। সব কথা হয়ত সে বলবে না। সব কথা কেউ কাউকে বলেও না। কিন্তু কাউকে যদি কিছু বলে ত বাসবীকেই বলবে। সারা অফিসে তার মনের কথা বলবার লোক এই একটি।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাসবীকে শুনতে হবে। অনিমেষের কথা, কৃষ্ণার কথা।

এতদিন কিন্তু কৃষ্ণা একটি কথাও বলে নি। হয়ত পথের বন্ধু। পথ চলতেই আলাপ। সেই আলাপ ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত হয়েছে। একটি একটি করে দল মেলে শতদলে পরিণত হওয়ার মতন, একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাহিনী কৃষ্ণা বলবে। একটু একটু করে।

মনে পড়ল বাসবীর। এই কৃষ্ণাই একদিন বলেছিল তার শ্যামল রঙে কারও আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা কম।

এমনও হ'তে পারে বিয়ের পর কৃষ্ণা হয়ত চাকরি করবে না। করার প্রয়োজন হবে না। যে মানুষটি তার জীবনে এসেছে, গৃহকোণের দীপশিখাই তার প্রত্যাশা। হাজার মানুষের ভীড়ে, প্রাণ-ধারণের গ্লানির মধ্যে নিজের দ্বিতীয় সত্তাকে সে ধূলিধূসর হ'তে দেবে না।

হঠাৎ বাসবীর খেয়াল হ'ল।

নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে ট্রাম-ষ্টপেজ ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে এ সে কোথায় চলে এসেছে? আলোক-মালায় সজ্জিত এক প্রমোদ-গৃহের সামনে। ফুটপাথে অপেক্ষমান ঘন জনতার মাঝখানে।

নিজের মনের চেহারা দেখে বাসবী শিউরে উঠল। কৃষ্ণা সিনেমায় যাবে, তার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনা হয়ে বাসবীও এক সিনেমা-গৃহের সামনে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এখানে কেউ তার জন্ত অপেক্ষা করবে এমন প্রতিশ্রুতি বাসবী পায় নি। তাকে ঘনিষ্ঠ হবার আমন্ত্রণ জানাবে এমন কোন হৃদয়ের সন্ধান এখনও বাসবীর অগোচর।

এ উৎসব তার জন্ত নয়। তাকে এক কাণা গলির রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জনাকীর্ণ সংসারে ফিরে যেতে হবে। অনেকগুলো ক্ষুধাকাতর মুখ যেখানে অপেক্ষা করছে। নিজেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দিতে হবে তাদের মধ্যে।

তবু এত তাড়াতাড়ি ফিরতে বাসবীর ইচ্ছা হ'ল না। এ পাশে অবারিত ময়দানের অবাধ দাক্ষিণ্য। অল্প অল্প বাতাস বইছে। শরীর স্নিগ্ধকর।

ফুটপাথ ধরে বাসবী হাঁটতে সুরু করল।

ট্রাম-বাসের ভীড়টা একটু কমুক। আরও একটু সময় অতিবাহিত হোক। প্রশমিত হোক মনের চাঞ্চল্য, তারপর বাসবী বাড়ী ফেরার কথা ভাববে।

কয়েক পা এগিয়েই বাসবী থেমে গেল।

চৌরঙ্গীপাড়ার মাঝামাঝি এক হোটেলের সামনে। অত্যুজ্জ্বল আলোর নীচে যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে চিনতে একটুও ভুল হ'ল না বাসবীর।

সঙ্গোপনে এই মহিলার মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ বাসবী কয়েকদিন থেকেই খুঁজছিল। এতদিনে সেই সুবর্ণ সুযোগ এসেছে।

বুকের মৃদু স্পন্দনকে রোধ করে বাসবী দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। কাছাকাছি যাবার আগেই বিপর্যয়।

সবুজ রংয়ের ছোট একটা মোটর এসে দাঁড়াল সোপান-প্রান্তে। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

মোটরের শব্দে বাসবী চোখ ফেরাল। বেলাদেবীর দিক থেকে মোটরের দিকে।

পরিচ্ছন্ন সুটপরা যে লোকটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল, সেও বাসবীর অজানা নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বাসবী তাকে নিরীক্ষণ করল।

বেলাদেবী এগিয়ে এল। কয়েক পা। সহাস্ত মুখে আগন্তুকের দিকে চেয়ে কি বলতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাসবী ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটির সামনে। বেলাদেবীকে সম্পূর্ণ আড়াল করে।

শুধু দাঁড়ানই নয়। একটা হাত প্রসারিত করে অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে লোকটির একটি হাত জাপটে ধরল। মৃদু উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে বলল, এই, বেশ লোক যা হোক, আমি কতক্ষণ তোমার জন্ত অপেক্ষা করছি। এত দেরি করলে কেন? এস, শিগ্‌গির এস আমার সঙ্গে।

লোকটিকে কোন কথা বলার অবসর না দিয়েই বাসবী তাকে টানতে টানতে ফুটপাথে নিয়ে এল। রাজপথে জনস্রোত একটুও কমে নি। কিন্তু বাসবী অবিচল, কোনদিকে দৃকপাতও করল না। লোকটির একটি হাত দৃঢ়ভাবে নিজের হাতে সংবদ্ধ করে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতেই আড়চোখে একবার প্রস্তরীভূত আর একটি নারীমূর্তির দিকে দেখল। রক্তশূন্ত মুখ, নীলচে অধরোষ্ঠ, দু'চোখে হতাশার ছায়া।

এমন একটা আঘাত দেবার কথাই কি অনিমেষ চিন্তা করেছিল? যে আঘাত পেলে বেলাদেবী বাইরের অন্তঃসারশূন্ত লালসাময় জীবন থেকে পশ্চাদপসরণ করে সাংসারিক জীবনে ফিরে যাবে। বিতৃষ্ণা আসবে প্রজাপতি-জীবিকায়।

লোকটিকে কুক্ষিগত করে বাসবী রাস্তার এপারে চলে এল। নির্জন ময়দানের প্রান্তে। অনেকগুলো সাহেব নিবিড় জটলা যেখানে পথের আলোর প্রতিটি রেখাকে আড়াল করে রেখেছে।

ছি ছি, এ কি সুরু করেছেন আপনি? শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, নীতি সব ভাসিয়ে দিয়ে কোন নরকের অন্ধকারে নেমে চলেছেন?

দীপক হতবাক, কর্তব্যবিমূঢ়।

জানেন, যে মহিলার আওতা থেকে আপনাকে ছিনিয়ে আনতে বাধ্য হলাম, তিনি আমাদের ম্যানেজার অনিমেষ রায়ের স্ত্রী। কি লাভ একজনের ঘর ভেঙে? তা ছাড়া আপনার কি সুখ এই যাযাবর বৃত্তিতে? এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে কোনদিন শান্তি পাবেন, এ আশা দুরাশা। ঈশ্বর মানুষকে সুদিন দেন, এভাবে ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করার জন্ত নয়।

খোঁপা ভেঙে পিঠের ওপর পড়েছে। বিস্ফারিত দু'টি চোখে অগ্নিশিখার দীপ্তি, মন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গিতে এতগুলো কথা বলে বাসবী সারা দেহ কাঁপিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। উত্তেজনায় সুগঠিত দু'টি বুক ছন্দে ছন্দে স্পন্দিত হ'ল।

একটা হাতে তখনও দৃঢ়ভাবে দীপকের হাত ধরা।

এতক্ষণ পরে দীপক কথা বলল। এগিয়ে এল বাসবীর দিকে। একটা হাত রাখল বাসবীর কাঁধে।

আমি ক্লান্ত বাসবী। আমি পথ হারিয়েছি। তুমি আমায় গ্রহণ কর। আমি সমর্পণ করছি নিজেকে। আমাকে তুমি উন্নত কর, তোমার স্পর্শে উজ্জীবিত করে তোল।

বাসবীর দেহটা আর একবার কেঁপে উঠল। মনে হ'ল, দীপকের ছোঁয়ায় তার অস্থি, মজ্জা, স্নায়ুতে তরল আগের প্রবাহের স্রোত বইছে। এত বড় একটা প্রলোভনের সামনে তার নিজের অস্তিত্বটুকুও ভেঙে যেন চুরমার হয়ে গেল।

চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে বাসবীর চোখের সামনে নিজের সংসারের বিচ্ছিন্ন রূপটা ভেসে উঠল। অসহায়, ক্ষুধার্ত মুখের সার।

বাসবী শিউরে উঠে দু'পা সরে গেল। দীপকের হাতটা ছেড়ে দিল। নিজের কাঁধ থেকে দীপকের হাতটাও সরিয়ে দিল।

সমস্ত শরীর বেদনায় মুচড়ে গেল, তবু হাসি ফোটাল মুখে। এ হাসি যেন কান্নার শরিক। ব্যথার পারাবার পার হয়ে ঠোঁটের প্রান্তে এসেছে।

না, না, এ কি বলছেন আপনি। আমি আপনার যোগ্য নই। তা ছাড়া আমি অন্যের বাক্‌দত্তা, অন্যের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বাসবী আর দাঁড়াল না। একবার পিছন ফিরেও দেখল না। দ্রুত পায়ে ময়দানের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করল।

অপেক্ষা করে করে দীপক ফিরে যাবে। হয়ত উচ্ছৃঙ্খল নৈশ জীবনে, কিংবা নতুন করে জীবন শুরু করবে।

যাই করুক। বাসবী আর পারবে না। নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে দু'হাতের অঞ্জলিতে রক্ত নিয়ে তর্পণ করতে তার স্পৃহা নেই, সাধ্য নেই।

একটা মানুষের অন্তিম নিশ্বাসের কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একটা সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুর সংসারের কাছে সে বাক্‌দত্তা। নিজের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার কথা ভাববার তার অবসর নেই।

দীপদণ্ড থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বাসবীর দেহে পড়ল। ময়দান শেষ হয়ে আসছে। এবার রাজপথ।

আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে বাসবী অশ্রু, অশ্রুর দাগ মুছে ফেলল। দীপকের স্পর্শটুকু মুছে ফেলতে পারলেই বোধ হয় ভাল হ'ত, কিন্তু সেটা আর সম্ভব নয়।

তা হ'লে নিজেকে বাসবীর সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে হবে।

[সমাপ্ত]

—•—

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সংহতি—হিন্দীতেই

পরম-দেশভক্ত, ভারত-সংহতি রক্ষায় নিবেদিত দেহমন স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণবিধিস্রষ্টা, এবং যাহার ফলে প্রায় ৭৫০ জন স্বর্ণকার অকালে স্বেচ্ছায় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে অমরলোকে, হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, দেশের লোক অর্থাৎ ভারতবর্ষ যদি হিন্দীকে 'জাতীয় ভাষা' বলিয়া গ্রহণ না করে, তাহা হইলে দেশের সংহতি বিনষ্ট হইবে অচিরে! গত ৭ই মে এলাহাবাদে এই মহাপ্রাণ, শীর্ণদেহী কিন্তু মনোবলে ভীম এই বিষম সত্য, তথা তথ্য, প্রচার করেন—হিন্দীর উন্নতিবিধানকল্পে এক আহূত সভায়। এই মহাসত্য প্রচারের কোন অধিকার তাঁহার আছে কি না জানি না, কিন্তু দেশের জন্ত, জাতির জন্ত যাঁহারা সদা চিন্তামগ্ন এবং শয়নে-স্বপনে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগাযোগ ঘটিতেছে মানব ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে, তাঁহাদের শাশ্বত অধিকার আছে অভাগা হীনমতি আমাদের হিতবাক্য শুনাইবার। মোরারজির কথার যুক্তিও বিষম! যে-হেতু তাঁহার মতে ভারতের ২০ কোটি লোক হিন্দীভাষী (ভাষী না বলিয়া শ্রোতা বলাই ঠিক হইত!), অতএব বাকি ৩০ কোটি লোককে হিন্দী অবশ্যই শিখিতে হইবে এবং স্বীকার করিতেও হইবে যে হিন্দী আমাদের রাষ্ট্র তথা রাজভাষা! ভারতীয় সংহতি রক্ষার জন্ত মোরারজি 'প্রেস্‌ক্রপশীত'—হিন্দী দাওয়াই, আশা করা যায় বাঙ্গালা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, আসামী এবং ভারতের অন্তান্ত সকল অহিন্দীভাষীই (মোরারজীরা) এই নব্য দাওয়াই সানন্দে সেবন করিয়া ভারতীয় সংহতিকে দৃঢ়, সবল এবং কালবিজয়ী করিতে সকল-প্রয়াস পাইবে।

বিহারে বাঙ্গালা ও বাঙ্গলা-ছাত্রদের বিরুদ্ধে শিক্ষা অভিযান।

দিন কয়েক পূর্ব্বে সংবাদে জানা গিয়াছে যে বিহারের মুজাফ্‌ফারপুর মালটিপারপাস্ জিলা স্কুলে হতভাগ্য বাঙ্গালী ছাত্রদের পড়াইবার জন্ত বাঙ্গালী-পণ্ডিতের বদলে এমন একজন হিন্দী-পণ্ডিত নিযুক্ত করা হইয়াছে—যিনি বাঙ্গলার অ আ ক খ পও জানেন না! এই বিত্তালয়ে বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা কমপক্ষে ২০০। দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুরের মাল্‌টিপারপাস্ জিলা স্কুলেও ঠিক এইরূপ ঘটে—অর্থাৎ বাঙ্গালী-পণ্ডিত বিতাড়িত হইয়া হিন্দী-পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন। ফলে এই বিত্তালয়ের প্রায় ২০০ বাঙ্গালী ছাত্রকে বাধ্য হইয়া বিত্তালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। মুজাফ্‌ফারপুর বিত্তালয়ের বাঙ্গালী ছাত্রদের কপালে ইহাই ঘটিবে, কিংবা ইতিমধ্যেই হয়ত ঘটিয়া থাকিবে।

বাঙ্গালী-ছাত্রদের বাঙ্গলা শিখিবার এবং পড়াইবার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিহার সরকারের এই জেহাদ কেন তাহা বলা শক্ত। বিহারের যে সকল জিলাতে বাঙ্গালী সংখ্যাগুরু—সেই সকল স্থানেও বাঙ্গালী ছাত্রদের বিবিধ প্রকার চাল এবং চাপ দিয়া বাঙ্গলা লিখা-পড়া শিক্ষা হইতে বিরত করিবার বিবিধ কৌশল-উপকৌশল চলিতেছে বিগত প্রায় ১৪।১৫ বৎসর ধরিয়া। শুনিয়া থাকি ভারতীয় সকল নাগরিকের সমান অধিকার। কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে বিহারে বাঙ্গালী ছাত্ররা কি ভারতীয় নাগরিক নহে? হিন্দী না শিখিলে কি ইহারা 'বিহারী'-ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না? শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া মাতৃভাষায় শিক্ষা দান এবং লাভ বিষয়ে কেবল শিক্ষাবিদ নহে, নেহাৎ অশিক্ষা-বিদ্‌রাও বড় বড় আদর্শ কথা অহরহ বলিয়া থাকেন—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলিতে বাঙ্গালী ছাত্রদের এ-অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কাহার আদেশে এবং কোন্ বিশেষ গণতন্ত্রী গদার বলে?

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা এবং অন্তান্ত ইউনিভারসিটিতে হিন্দীভাষী ছাত্রদের বাঙ্গলা শিখিতে বাধ্য করা হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের অধীন বিত্তালয়গুলিতে হিন্দী (এবং অন্ত ভাষা) ভাষী ছাত্রদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় কেবল শিক্ষালাভ নহে, পরীক্ষা দিবারও সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আছে। এখানে হিন্দীভাষী ছাত্ররা 'বিদেশী' কিংবা বিমাতাসন্তান বলিয়া বিবেচিত হয় না। বিহার কি এই সু-ব্যবহারের পাল্টা জবাব দিতেছে ঘৃণিত হীন বাঙ্গালী বিদ্বেষের দ্বারা?

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এ বিষয়ে কি কোন কর্ত্তব্যই

নাই, না, প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যাপারে (তাহা যতই অন্যায় এবং বিভেদমূলক হউক) কোন কথা বলা / হস্তক্ষেপ করা তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে ?

মোরারজী নামক শীর্ণদেহী দুর্নীতিবান ব্যক্তিটি হয়ত বিহারে বিভালয়ের বাঙ্গলা বিতাড়নের দ্বারা হিন্দী প্রবর্তন-প্রচলনের এই উত্তম উপায়ের সমর্থক হইবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যদি হিন্দী-রাষ্টার অধ্যাপক অপসারিত করিয়া হিন্দী-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে কি হইবে ?

হইবে আর কিছুই নয়, কেন্দ্র-উপকেন্দ্র হইতে বহু হিন্দীভাষী নেতা-উপনেতা মুক্ত-কচ্ছ অবস্থায় দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের বেয়াদবী দমন এবং দণ্ডবিধানের জন্য বিষম কলরোলে নন্দাজীর আনন্দ অবশ্যই বিঘ্নিত করিবেন এবং নিরানন্দ নন্দা—'কভি নেহি চলেগী' বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের এবং প্রশাসকের কর্ণ-বিমর্দন করিতে বিমানপথে ঝড়ের বেগে কলিকাতায় হাজির হইবেন !

হিন্দীওয়ালাদের আর সবুর সহিতেছে না। পাছে হিন্দী সিংহাসন লাভে বঞ্চিত হয়—এই আশঙ্কায় তাহারা ঝটপট কার্য্যোদ্ধার করিতে অতি তৎপর হইয়াছে। কিন্তু সাবধান ! চীন-পাক মিতালীও তৎপর, যে-কোন মুহূর্ত্তে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। সংহতির নামে হিন্দীর জবরদস্তি এখন না করাই ভাল, কারণ, অহিন্দীভাষী এমন বহুজন আছে যাহারা 'হিন্দীরাজের' বিরুদ্ধে যাইবেই।

পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন শৈথিল্যমুক্তি প্রচেষ্টা

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্য্যন্ত তাহা হইলে স্বীকার করিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে শৈথিল্য রহিয়াছে এবং তাহা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। এ-জ্ঞান বিলম্বে হইলেও আশার কথা। তবে আশা করি কমিটি-কমিশন নিয়োগ করিয়া প্রশাসন যন্ত্রের গোলকে হট্টগোলে পরিণত করা হইবে না।

রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বর্ত্তমানে যে শৈথিল্য ও ঢিলেমি দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করার জন্য সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা হিসাবে প্রশাসনের সর্ব্বোচ্চ স্তর মন্ত্রিসভাকে আরও সক্রিয় ও সচল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ হইয়াছে।

মন্ত্রিসভার মতামতের অপেক্ষায় বহু প্রশাসনিক কাজ অনাবশ্যক বিলম্বিত হয়। মন্ত্রিসভার উপর হইতে কাজের চাপ হাল্কা করার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রশাসনের সকল ব্যাপারেই যাহাতে মন্ত্রিসভার মতামতের প্রয়োজন না হয়, তাহার জন্য বিভিন্ন ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রিসভার সাতটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। ঐ সব কমিটি নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত ব্যাপারে যে সব সিদ্ধান্ত লইবেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাহা অবিলম্বে কার্য্যকর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হইয়াছে: (১) কৃষি; (২) জল সরবরাহ; (৩) ভোগ্যপণ্য; (৪) টেষ্ট রিলিফ ও খয়রাতি সাহায্য; (৫) সি এম পি ও; (৬) পরিষদীয় ব্যাপার এবং (৭) পরিবার পরিকল্পনা।

রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, এইভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ত্বরান্বিত হইবে আশা করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঐ সিদ্ধান্তের ফলে কাজের সুবিধা হইবে এবং তৎপরতা বাড়িবে।

বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর দিবেন: কৃষি—সার, বীজ ও কৃষি উৎপাদন যন্ত্র সরবরাহ, ক্ষুদ্র সেচ এবং বন্যা নিরোধ ব্যবস্থা; জল সরবরাহ—পানীয় জল সরবরাহের সামগ্রিক সমস্যা; ভোগ্যপণ্য—বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য, বিশেষত: কেরোসিন, সরিষার তৈল ও বেবি ফুড নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা; খয়রাতি সাহায্য—গ্রামাঞ্চলে কম ক্রয়ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ সাহায্য দান, ডোল এবং ক্ষেত্রবিশেষে খাজনা মকুব; সি, এম, পি ও—বৃহত্তর শহরাঞ্চলে পয়ঃপ্রণালী জলনিকাশী ব্যবস্থা; পরিষদীয় ব্যাপার—বিধানমণ্ডলীর সভা আহ্বান, সরকারী প্রস্তাব পেশ জনস্বার্থে জরুরী প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ এবং পরিবার পরিকল্পনার—কার্য্যক্রম স্থির করা।

এইসব ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করার ফলে মন্ত্রিসভার অধীনে কৃষি সাব-কমিটি প্রভৃতি অন্যান্য যে সব সাব-কমিটি চালু ছিল তাহা বাতিল হইল।

ইতিপূর্ব্বে এই প্রজাকল্যাণ রাষ্ট্রে বহুপ্রকার পরিকল্পনা, কমিটি, কমিশন প্রভৃতির কথা শুনা গিয়াছে—কিন্তু মানুষের আশামত ফল লাভ হয় নাই বিবিধ কারণে। 'কমিটি'তে কতখানি প্রকৃত কাজ হয়, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে এবং তাহা অকারণ নহে। কথায় বলে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'—'কমিটি'তে যদি যদি ৭।৮ জন সদস্য থাকেন, তাহা হইলে এই প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা অহরহ প্রমাণিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক কত ভোল্টেজ শক্তিসম্পন্ন কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন জানা নাই—কিন্তু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কমিটির হাতে তাঁহার সর্ব্ব কর্তৃত্ব

ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন—এ কথায় খটকা লাগিতেছে। ইতিমধ্যেই দুষ্টবুদ্ধি কিন্তু সত্যসন্ধানী বহু ব্যক্তি বলিতেছেন যে 'কমিটি' যাহাই স্থির করুক বিভাগীয় মন্ত্রী তাহা বাতিল কিংবা ধামাচাপা দিতে পারিবেন পদাধিকারবলে।

নব-পরিকল্পিত কমিটিগুলিতে সদস্যগণ সবেতন না অবৈতনিক হইবেন? সরকারী উচ্চ-মার্গীয় অফিসার যদি কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েন, তিনি কি তাঁহার নিয়মিত বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত ভাতা পাইবেন? প্রত্যেকটি কমিটির জন্য কি তাপনিয়ন্ত্রিত আপিস কক্ষ ব্যবস্থা করিতে হইবে? এই প্রশ্নগুলি এই কারণে করিতেছি যে, সরকারী কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বেই উদ্যোগ-পর্ব্বেই জলের মত অর্থব্যয় হইয়া যায় অযথা, অকারণ এবং টাকাটা গৌরী সেনের ট্যাঁক হইতে আসে বলিয়া কাহারও মাথাব্যথার কোন কারণ কখনও ঘটে না।

নব-গঠিত কমিটিগুলি যদি প্রশাসনিক যন্ত্রকে সক্রিয়-তৎপর করিতে পারে তবে সাধারণ করদাতা সুখী হইবে। সরকারী দপ্তরে, বিশেষ জরুরী কাজের তাড়নায়, যাহাদের বাধ্য হইয়া যাইতে হয় তাহাদের অর্থদণ্ড (বাঁ-হাতে) ছাড়াও অন্যান্য যে-সকল নির্য্যাতন এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করিতে হয়, কমিটি-গুলি যদি তাহার কিছু সুরাহা করিতে পারে, লোকে কৃতজ্ঞ হইবে। সরকারী কোষাগারে টাকা জমা দিতে গিয়াও লোককে ঘুস দিয়া টাকা জমা দিতে হয়—এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর দিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে এ-বিষয়ে আর বেশী কিছু মন্তব্য করা অনাবশ্যক। কমিটিগুলির কাজের নমুনা দেখিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তার স্ব-বা বিপক্ষে অবশ্যই জনমত যথাকালে প্রকট হইবে।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আর এইটুকু মাত্র বলা প্রয়োজন যে, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আশা করি তাঁহার মন্ত্রীসভার বিভাগীয় মন্ত্রীদের কমিটির কার্য্যকলাপে এবং সিদ্ধান্তে অযথা কর্ত্তৃত্ব এবং ক্ষমতা প্রয়োগ-প্রদর্শন হইতে অবশ্যই বিরত রাখিবেন। টিমের ক্যাপটেন পাকা এবং শক্ত হইলে তবেই টিমের খেলোয়াড়রা খেলিবে ভাল।

কল্যাণরাষ্ট্রে পল্লী-বাঙ্গলার মনোরম চিত্র!

কিছুদিন পূর্ব্বে রাজ্য-পরিসংখ্যান বুরো (West Bengal Statistical Bureau) পল্লী-বাঙ্গলার যে নয়নাভিরাম রঙিন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সুখী না হইবে এমন বাঙ্গালী কেহ নাই। এই সন্ত-প্রকাশিত চিত্রের সঙ্গে ইংরেজ আমলের রিক্ত, শোষিত, সর্ব্ববিষয়ে দরিদ্র এবং বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্য-জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাথমিক ব্যবস্থাদি হইতে বঞ্চিত গ্রাম-বাঙ্গলার কি এবং কতখানি তফাৎ তাহা বুঝা শক্ত!

ভাল পথ-ঘাট, রেল-সংযোগ, যানবাহন-ব্যবস্থাই গ্রামীণ উন্নতির প্রথম সহায়ক। কিন্তু আজও যখন ঐ সরকারী তথ্যে আমরা দেখিতে পাই, পশ্চিম বাঙ্গলার ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে শতকরা মাত্র ১·৪ ভাগ অর্থাৎ মাত্র ৫৩২টি গ্রামের কাছে-পিঠে রেল-ষ্টেশন আছে, তখন গ্রাম-বাঙ্গলা যে পথে উন্নতির মুখ দেখিবে, সে যে এখনও তার নাগালের অনেক বাহিরে, এ কথা বুঝিতে দেরি হয় না। সরকারী তথ্য দেখার দরকার নাই, বাস্তবে আমরা কি আজও দেখিতে পাই না, পশ্চিমবঙ্গে এখনও হাজার হাজার এমন গ্রাম আছে, যেখানে আলপথ ছাড়া রাস্তাঘাট নাই, আর নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশনে যাইতে হইলে কমপক্ষে দশ-পনেরো মাইল পথ পায়ে হাঁটিতে হইবেই? মরণাপন্ন রোগীকে চিকিৎসার জন্য ডুলিতে তুলিয়া নিরুপায় গ্রামবাসীদের মাইলের পর মাইল আলপথে হাঁটিয়া পার হইয়া তাহার পর ট্রেণে শহরের হাসপাতালে যাইতে হয়। গ্রামবাসীদের আজও ইহাই নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা।

তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার পরেও আজ যখন শুনি এ রাজ্যে প্রতি দু'শোটি গ্রামে মাত্র পাঁচটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, তখন সেটা যে একটুও গৌরবের কথা নয়, একথা কে অস্বীকার করিবে? আর বাস্তব অভিজ্ঞতাও ত আমাদের এখানে রোজ দেখাইয়া দিতেছে, অনেক চিকিৎসা-কেন্দ্রের বাড়ী আছে, কিন্তু ডাক্তার নাই, অপরিহার্য্য ওষুধ-পত্র সাজ-সরঞ্জামের নাম-গন্ধ নাই। সরকারী কণ্ট্রাক্টর মাত্র গতকাল হাসপাতালের যে বাড়ী তৈরী করিয়া দিয়া টাকা পকেটস্থ করিয়া বিদায় লইল, পর দিনই দেখা গেল, তাহার ছাদ দিয়া বৃষ্টির জল পড়িতেছে রোগীদের সারা অঙ্গে!

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ পাকা করিবার জন্য শিক্ষার অপরিহার্য্যতার কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু সরকারী তথ্যেই যখন দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে এখনও শতকরা ৪০টি গ্রামে শিশুদের প্রাইমারি স্কুল নাই, তাহাদের প্রাইমারি স্কুলে পড়িতে হইলে অন্ততঃ ৪।৫ মাইল পথ চলিয়া অন্য গ্রামে যাইতে হয়, তখন সমাজ-তন্ত্রের বুনিয়াদ কি ভাবে পাকা হইবে, আমরা বুঝিতে পারি না। শুধু প্রাথমিক শিক্ষাতেই নয়, দুঃখ ও লজ্জার ছবি গ্রাম-বাঙ্গলার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও আজও

গ্যাস-সংযোগ করা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ গ্যাস কানেকসনের প্রাথমিক ব্যয় ৫০০৲ টাকারও বেশী পড়ে, কাজেই সাধারণ গৃহস্থ ইচ্ছা থাকিলেও ঘরকন্নার কাজে গ্যাস লইতে পারে না। এক ধাক্কায় ৫০০ টাকার মত খরচ কয়জন গৃহস্থ করিতে পারে জানি না। যাঁহারা বিত্তবান, তাঁহারা গ্যাস অপেক্ষা ইলেক্‌ট্রিক্ ষ্টোভ, কুকিং-রেঞ্জ প্রভৃতি প্রশস্ততর বলিয়া মনে করেন এই কারণে যে, গ্যাসের সরবরাহ সকল সময় যথাযথ থাকে না। অনিশ্চয়তার ঝক্কি সাধ করিয়া কেহ লইতে চাহে না, বিশেষ করিয়া পয়সার ভাবনা না থাকিলে।

এই সরকারী গ্যাসের কারবার পরিচালনার জন্য অফিসার এবং কেতাদুরস্ত ব্যয়বহুল অফিস ভবন প্রভৃতির কোন ত্রুটি কোথাও নাই—ত্রুটি কেবল মাত্র একান্ত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং সেইমত কর্ম্মব্যবস্থার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। অফিসার কর্ম্মচারী এবং কোম্পানীর অন্যান্য লোকদের দোষ দিয়া লাভ নাই। ইহারা জানেন যে গ্যাস বিক্রয় করিয়া লাভ হউক বা না হউক—তাঁহাদের বেতনাদি এবং বাৎসরিক ইন্‌ক্রিমেণ্টের কোন ব্যাঘাত কিছুতেই হইবে না। অতএব—বৃথা চিন্তা—পরিশ্রম করিবার দরকার কি? সরকারী বড় কর্ত্তারাও নির্ব্বাক—প্রায় নট্-নড়নচড়ন নারায়ণ শীলা।

অচল সরকারী সংস্থাগুলিকে সচল রাখিবার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ প্রতি বছর নিয়মিত বৃদ্ধি করা হইতেছে। বিধান সভায় আপত্তি উঠিলে তাহা পার্টি-সভ্যদের স্বর্গীয় মেজরিটি ভোটে বাতিল হইতে বাধ্য। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। রাজ্য সরকার পরিচালিত প্রায় সব কয়টি ব্যবসায় একই পথে চলিতেছে এবং বছরের পর বছর লোকসানের বিষম অঙ্ক প্রচণ্ডভাবে স্ফীত হইতেছে।

এই বিষয়ে আমাদের একটিমাত্র প্রস্তাব এই যে, সরকারী প্রচেষ্টা প্রয়াসগুলিকে "A West Bengal Govt.' Undertaking" না বলিয়া সংস্থার নামের নিচে "Under taker ; West Bengal Govt."—এই প্রকার লিখিলেই শোভন, সুন্দর এবং সত্যম্ হইবে।

বারান্তরে রাজ্য সরকার 'আণ্ডারটেকিত' আরও দু'-একটি কারবারের লাভ-লোকসানের কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পশ্চিমবঙ্গে ভেজালের কারবার

এই রাজ্যে চাল, ডাল, মসলা, সরিষার তেল, দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি সব রকম খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত হয়ই অধিকন্তু রোগীর ব্যবহার্য্য ঔষধপত্রেও ভেজাল চলে। ব্যবসায়ীরা লাভের জন্যই সব রকম পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করিয়া থাকে। এজন্য তাহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেও কৃপণতা করে না। তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনিয়া ভেজালের কারখানা স্থাপন এবং এই কারখানায় ভেজাল সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য উচ্চ-বেতনে শিক্ষিত টেকনিসীয়ান্ নিযুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে ভেজালের কারবার এত ব্যাপক হইয়াছে যে, ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে নির্ভেজাল ঘি বা দুধ পাওয়া অসম্ভব বলিলেই চলে। বাজারে পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি বহু ঔষধ আছে যাহা চিকিৎসকেরা জটিল রোগে ব্যবহারের জন্য নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু অনেক সময়ে এই সব ঔষধের ভেজাল ধরা পড়িয়াছে। শিশিবোতলওয়ালাদের নিকট হইতে এই সব ঔষধের খালি শিশি ক্রয় করিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপদেশমত এই সব ঔষধের অনুকরণে ভেজাল ঔষধ তৈয়ার করিয়া তাহা বাজার প্রচলিত দামেই বিক্রয় হয়। খাদ্যদ্রব্য ঔষধ ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কারণেই বর্ত্তমান এই ভেজালের কারবার প্রভূত লাভজনক হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বারো টাকার কমে এক কিলো ঘি পাওয়া যায় না। এই ঘিয়ে বনস্পতি মিশাইয়া বিক্রয় করিলে প্রতি কিলো ঘিয়ের জন্য অন্তত তিন-চার টাকা বেশী লাভ হয়। জিরা, গোলমরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদির মূল্য খুবই চড়া। এই সব মসলার সহিত আগাছার বীজ মিশানো হয় এবং উহাতেও লাভ কম হয় না। বর্ত্তমানে হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, জিন ইত্যাদি মদের মূল্য অত্যন্ত বেশী, উহার সহিত ভেজাল মিশাইতে পারিলেও প্রচুর লাভ। বর্ত্তমানে চালের বাজারদর যেরূপ চড়িয়াছে তাহাতে প্রতি কুইণ্টাল চালে ১০।১৫ সের কাঁকর মিশাইলে লাভ বাড়িয়া যায়। পাথর গুঁড়া করিয়া এই কাঁকর তৈয়ারি করিয়া তাহা চালের ব্যবসায়ীদের নিকট নিয়মিতভাবে বিক্রীত হইতেছে—সম্প্রতি তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার গোয়ালারা (সরকারী গোয়ালাও বাদ যায় না!) দুধে কত কৌশলে ভেজাল মিশায় তাহা কাহারও অবিদিত নাই।—

পশ্চিমবঙ্গে আজ কোন্ সামগ্রীতে ভেজাল নাই, তাহা আবিষ্কার করিতে হইতে হইলে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ একান্ত আবশ্যক—তবে কমিটির সমস্ত

নিয়োগ-কালে দেখিতে হইবে অতি সতর্কতার সহিত, যেন কোন "ভেজাল" ব্যক্তি এই কমিটির সদস্যরূপে নিযুক্ত না হয়েন।

কলিকাতার প্রায় সর্ব্বত্র—এমন কি বহু ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবেও ভেজালের ক্রিয়া কারবার চলিতেছে। ভেজাল খাদ্য এবং ঔষধাদি সেবনের ফলে কত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে প্রত্যহ অকালে নরক ধরাধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গের পথে প্রয়াণ করিতেছে তাহার সংখ্যা পরিসংখ্যানবিদদের পক্ষেও দেওয়া অসম্ভব। ভেজাল কারবারীদের নরহত্যাকারীদের সমপর্য্যায়ে অবশ্যই নিক্ষেপ করা যাইতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কর্তৃপক্ষ ভেজাল কারবার বন্ধ করিবার জন্য আন্তরিকভাবে কোন চেষ্টা করিতেছেন না। যাহারা নরহত্যা করে তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং আদালতের বিচারে তাহাদের হয় ফাঁসি, না হয় কারাদণ্ড হয়। কিন্তু ভেজালের কারবার চালাইয়া যাহারা রোগীর মৃত্যু ঘটাইতেছে এবং সুস্থ সবল ব্যক্তিদের আয়ু ক্ষয় করিতেছে তাহাদের ধরিবার জন্য সমুচিত কোন চেষ্টাও নাই এবং ধরা পড়িলেও তাহাদের বিশেষ কোন শাস্তি হয় না। যে ব্যক্তি ভেজালের কারবার চালাইয়া মাসে পাঁচশত টাকা লাভ করিতেছে সে কদাচিৎ কখনও ধরা পড়ে এবং ধরা পড়িলেও তাহার দশ-বিশ টাকা মাত্র জরিমানা হয়। বহু ভেজালের কারবারী নানারূপ অসৎ উপায়ে রেহাই পাইয়া যায়। সুতরাং রাতারাতি বড়লোক হইবার সহজ পথ ভেজালের এই লাভজনক ব্যবসাটি দিন দিন প্রসারলাভ করিতেছে।

গভর্ণমেণ্টের উচিত—যাহারা ভেজালের কারবার করে তাহাদিগকে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া, যাহার ফলে দুষ্ট কারবারী এই পাপব্যবসায়ে যত লাভ করিয়াছে তাহার সর্ব্বাংশ উদ্গিরণ করিতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যবসায়ের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া।

বর্ত্তমানে যাহারা ভেজালের কারবার চালাইতেছে তাহারা ধরা পড়িলেও সামান্য জরিমানা দিয়া অব্যাহতি পায়। ফলে ভেজালের কারবারের যে লাভ হয় তাহাতে হাত পড়ে না। যতদিন গভর্ণমেণ্ট ভেজালের কারবারীদের প্রাণদণ্ড কিংবা ২৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা না করিবেন ততদিন এই অনাচার কিছুতেই বন্ধ হইবে না। যে ব্যবসায়ে প্রত্যহ দশ টাকা লাভ হয় এবং ছয় কি দশ মাস পরে ধরা পড়িলে মাত্র দশ টাকা জরিমানা হয় সেই ব্যবসা কঠোরতম দণ্ড ব্যবস্থা ছাড়া প্রতিরোধ করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু উপরি-উক্ত ব্যবস্থা যাঁহারা গ্রহণ করিবেন—তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে 'প্রশাসনিক' ভেজাল দূরীকরণ। একথা অনেকেই জানেন যে—যাঁহারা ভেজাল কারবারের রাজচক্রবর্ত্তী, বিশেষ করিয়া ঘি, মাখন, সরিষার তৈল, আটা-ময়দা, বনস্পতি প্রভৃতি সর্ব্বজন অবশ্য-ব্যবহার্য্য খাদ্য-সামগ্রী—সেই সব কোটিপতি শেঠ—এবং শেঠদের প্রতি সরকারী একটা গোপন স্নেহ-মমতার সদা-প্রবাহিত গোপন প্রবাহ আছে। কেবল সরকারকেই দোষ দিব না, ভেজালের দায়ে কোন কোটি-পতি শেঠ ধরা পড়িয়া যখন আদালতে দণ্ডিত হয়েন, মামলার সংবাদপত্রে প্রকাশিত রায়ের রিপোর্টে—ঐ দণ্ডিত কোটিপতি শেঠের নাম কেন গোপন রাখা হয়। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেই বাঙলা একটি অতি-সুখ্যাত এবং দৈনিক (বড় বড়) পত্রে অতি বিজ্ঞাপিত মাখন প্রস্তুতকারী ভেজালের দায়ে কলিকাতার একটি আদালতে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও পরের দিন কলিকাতা জাতীয়তার ধ্বজাধারী বিখ্যাত ইংরেজি এবং বাঙলা—(এবং অবশ্যই হিন্দী) সংবাদপত্রগুলিতে ঐ মাখনের কারবার কিংবা কারবারের মালিক—কোন নামই বাহির হইল না! প্রকাশ করা হইল কেবলমাত্র—কোন একটি মাখনের প্রস্তুত কারবারীর—মাখনে ভেজাল প্রমাণিত হওয়ার অপরাধে এত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে—! ব্যস! এইমাত্র!! এমন কি ঐ ভেজাল মাখনের ব্রাণ্ডটিও প্রকাশ পাইল না।

খাদ্য এবং ঔষধে ভেজাল দমনে অন্যান্য দেশে—(মরক্কো, মিশর, রাশিয়া প্রভৃতি) বহু প্রাণদণ্ডের দৃষ্টান্ত আছে—যাহার ফলে ঐ সকল দেশে ভেজাল দমিত হইয়াছে শতকরা ৯৫ ভাগ অন্তত পক্ষে।

কিছুদিন পূর্ব্বে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, এ-দেশে কেবল খাদ্যশস্য নহে, অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় পণ্যেও ভেজাল চালান হয়। ভেজাল নিবারণের জন্য রাজ্য সরকারগুলির হাতে যে উপযুক্ত ক্ষমতা আছে সে কথারও উল্লেখ তিনি করেন। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি সকল ক্ষেত্রে এই ভেজাল-নিরোধ ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ না করেন, সে-অবস্থায় কেন্দ্রের কি কোন কর্ত্তব্যই নাই? স্থানীয়

সামান্য হাঙ্গামা দমন করিতে কেন্দ্রীয় হোম মিনিষ্টার বিমানযোগে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া মুখ্যমন্ত্রীর উপর হুকুম চালাইতে ত কোন দ্বিধা হয় নাই। কেন? আর একটি কথাও বলা যায়—ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁহার প্রথম (এবং হয়ত শেষ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্ব (৬ মাসের) কালে কলিকাতার কয়েকটি বিখ্যাত ময়দা-কলের (অবাঙ্গালী শেঠ মালিকানার) ময়দায় ভেজাল দমন করিতে গিয়া মন্ত্রিত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন এবং ইহা ঘটে বর্ত্তমানের কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী কংগ্রেসী নেতার সক্রিয় সহযোগিতার কল্যাণেই!

অনাচার দমন করিতে দু-তিন বৎসর পূর্ব্বে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিগত জীবনে সৎ পুলিশ কমিশনারকেও—কলিকাতার কার্য্যভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কালো এবং ভেজাল কারবার ও কারবারীদের পীঠস্থান বহুখ্যাত এলাকার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দারোগাকে (ও সি) স্থানীয় শেঠ এবং শঠদের চাপে অন্যত্র বদলী করা হইল! প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তথা কর্ত্তব্যেকঠোর—ক্রিয়াকর্মের পুরস্কার যদি ইহাই হয়—নেহাত গাধা ছাড়া আর কেহই কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হইবে কি? কথায় বলে Physician heal thyself! অসুস্থ, রোগগ্রস্ত চিকিৎসক যেমন অন্যের চিকিৎসা করিতে অপারগ হয়—প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শাসকবর্গ এবং উচ্চস্তরের অফিসাররা জানেন--ব্যবসায় ক্ষেত্রে কালো-কারবার এবং ভেজাল বন্ধ করিবার প্রয়াসে—এই সবের "ম্যানেজিং এজেন্ট" শেঠদের দিকে হাত বাড়াইলে, কেন্দ্র তাঁহাদের টিকি ধরিয়া টান দিবে, যাহার ফলে তাঁহাদের ক্ষমতার আসনে টিঁকিয়া থাকা হইবে অসম্ভব। অতএব অযথা ঘোলাজল আরো ঘোলা করিবার বৃথা প্রয়াস না করিয়া—'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখাই ভাল! দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন বাণী বিতরণের দ্বারাই যতটা হয়—হউক। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী যখন যুবকদের হাঁক দিয়াছেন, দেশকে অগ্রগতির পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার জন্য! জয় জোয়ান !!

—* • *—

শিক্ষা ব্যতিরেকে জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত ও ভাব সম্যকরূপে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কত কুসংস্কার আপনা আপনি অন্তর্হিত হইতেছে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত লোকদের মন কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের দুর্গস্বরূপ। এই দুর্গ ভূমিসাৎ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৩

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

৬ই এপ্রিল—১৯৪০

আজকে সকালে উঠে চা খেতে বসে খবরের কাগজ খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম খবরের কাগজ এখনও আসে নি—মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম। সকালে একলা নিঃসঙ্গ ভাবে চা' খাওয়া যে কতটা বিরক্তিকর তা বলা কঠিন। খবরের কাগজ খানিকটা সঙ্গ হিসেবে কাজ করে—বিশ্বের সত্য-মিথ্যা খবরের বোঝা নিয়ে সে সকাল বেলায় সবার মনের ওপর জাঁক করে বসে। কত লোকের মনে কত রকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তার খবর খবরের কাগজের সম্পাদকেরাও রাখেন না!

খবরের কাগজ এল। জর্মণ সাবমেরিন ডুবল কি না ডুবল সে কথা খুব বড় নয় আমার কাছে—ইংরেজ হাউই জাহাজের খবরও আমার কাছে বড় নয়। জিন্না মিঞার ইঞ্চি মেপে ভারতবর্ষ খণ্ড করার ইচ্ছেটাও আমার কাছে বড় নয়—সুতরাং চোখ বুলিয়ে গেলাম শুধু কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল—Passing away of C. F. Andrews—A friend of India and the poor—মনের ভেতরটা ধক্ করে উঠল!—যদিও জানতাম হাসপাতালে এণ্ড্রুজ সাহেব আছেন, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছেন হাসি মুখে। দ্বিতীয়বার operation হবে কিন্তু অত কথা জেনেও এমন করে মনের ভেতর নাড়া দিয়ে উঠল যে, খবরের কাগজ আর পড়া হ'ল না! কিন্তু কেন? কেন এত গভীর ভাবে এণ্ড্রুজ সাহেবের কথা মনে বাজল?—সে কথাই ভাবতে বসলাম। তাঁর সঙ্গে আমার মনের আদান-প্রদান বিশেষ হয় নি। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় ওঁর কাছে কিছুদিন পড়েছি! সাদাসিধে দাড়িওয়ালা খদ্দর-পরা মানুষটি—হাসি হাসি চোখ—ঘুরে বেড়াতেন শান্তিনিকেতনে এখানে-সেখানে, বিনয়ী নম্রভাব। আমরা উদ্ধত যুবকের দল অনেক সময় ওঁকে নানা কারণে বিরক্ত করেছি, কথার অবাধ্য হয়েছি, সে-কথা আজকে অনেক দিন পর, পনের বছর পর, আবার স্মরণ করছি। খবরের কাগজে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক বার তাঁর নাম দেখেছি তাঁর, কাজের বিবরণ পড়েছি। ইংরেজ তিনি কিন্তু বিশ্বের বন্ধু তিনি, দীনবন্ধু তিনি। অমিয়বাবু (চক্রবর্ত্তী) এখানকার Art Society-তে বলতে এলেন—তাঁর কাছে এণ্ড্রুজ সাহেবের ওপর অস্ত্রোপচার হয়েছে জেনেছিলাম। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে ইংরেজ ডাক্তারের কাছে কি কষ্টটাই পেতে হয়েছে—সে খবরও উনি আমায় দিয়েছিলেন। অনভিজ্ঞ ইংরেজ ডাক্তার না জেনেশুনে তাঁকে মৃত্যুর দ্বারে নিয়ে যায়—সে বিষয় সন্দেহ নেই। ভগবানের ইচ্ছের ওপর কার হাত আছে? এণ্ড্রুজ সাহেব সব সহ্য করেছেন হাসি মুখে, মৃত্যুর সময়েও সেই একই কথা তাঁর মুখে শোনা গেছে—Thy will be done! তাতেই শান্তি পেয়েছেন!

মৃত্যু যে নিকটে এসেছে তা এণ্ড্রুজ সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন অমিয়বাবুর হাতে উনি সেই জন্যেই শেষ সময় তাঁর মনের ভেতরকার কথাটা লিখে তুলে দিয়েছিলেন:

—"During these days of waiting since the decision was taken that I should have this operation, my thoughts have all the

while been with God and I know that whatever happens His will will be done."

"I have been wonderfully helped in thus keeping 'Shanti' by thought of Gurudeva and all I have learnt at Shantineketan also by Mahatma Gandhi and what I have learnt from him all these past years. Above all, from the loving spiritual visits in the hospital, from day to day, of the Metropolitan whose christian faith has marvelously sustained me through all these days of very great suffering and bodily weakness. He has become in these days dearer to me than ever he was before. I have found how absolutely his heart is one with mine in his love for India and for all the world.

"God has given me in my life the greatest of all gifts, namely, the gift of loving friends. All this moment, when I am laying my life in His hands, I would like to acknowledge again. What I have acknowledged in my books this supreme gift of friendship, both in India and in other parts of the world. For, while I have written so far about those who are near me here in India I have been all the while equally conscious of the supreme loving friends in my own dear land of England where spiritual help I have been receiving along with constant letters and telegrams. I have also had the same spiritual help from friends who have remembered me in other parts of the world.

"While I had been lying in the hospital I trust that my prayers :and hopes have not been merely concerning my own sufferings which are of the smallest importance today in the light of the supreme suffering of the whole human race."

"I have prayed every moment that God's Kingdom may come and His will may be done on earth as it is always being done in Heaven."

ছোটবেলার থেকে কাজকে ধর্ম বলে জেনেছি। ধার্ম্মিক বলতে যা বুঝায় তা আমি নই। কিন্তু এণ্ডরুজ সাহেব যে কথা বলে গেছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি! তিনিও কাজকেই ধর্ম্ম বলে জেনেছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস। মানুষের ধর্ম্ম কাজ—দেশের কাজ। নিজের শক্তিকে উজাড় করে, নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের জন্ত ঢেলে দেওয়াই মনুষ্যত্ব! ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা আজকের দিনে এণ্ডরুজ সাহেবের জন্ম নয়। ওঁকে তিনি নিজের শান্তিময় কোলে নিয়েছেন। প্রার্থনা—আমরা যারা পৃথিবীতে রইলাম তাদের জন্ত—প্রার্থনা আমার নিজের জন্য।

আমাদের তোমার কাজে খাটিয়ে নাও। অলস করে রেখো না, নির্ভীক হতে শেখাও। তোমার ওপর নির্ভর করা কাপুরুষতার চিহ্ন যেন না হয়। বীরের মন নিয়েও যেন তোমার ওপর নির্ভরতা থাকে—সুখের দিনে যেন তোমায় না ভুলি—দুঃখের দিনে তুমি ত সবারই বন্ধু!

শান্তিনিকেতনে ফুট সাহেব

ফুট সাহেব কর্ম্মী মানুষ। তিনিই দুন স্কুল গড়ে তুলেছেন। অসম্ভব তাঁর কাজ করবার ক্ষমতা। ফুট সাহেব জানতেন, রবীন্দ্রনাথ দুন স্কুলকে সম্পূর্ণ ভারতীয় স্কুল বলে মনে করেন না। সুতরাং তিনি যখন শান্তিনিকেতন দেখতে গেলেন, আঁটঘাট বেঁধে গেলেন। লিওনার্ড এলম্‌হার্ষ্ট সাহেবের সঙ্গে ফুট সাহেবের ভাব ছিল। তাঁর কাছ থেকে পরিচয়পত্র এনে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেবের কাছে। ফুট সাহেব যখন শান্তিনিকেতন গেলেন তখন গুরুদেবের শরীর বড় একটা ভাল ছিল না। তিনি সবার সঙ্গে দেখা করছিলেন না। ফুট সাহেব এসে উত্তরায়ণে অতিথি হয়েছিলেন—একই বাড়ীতে। অথচ, প্রথম দু'দিন তাঁর সঙ্গে গুরুদেবের দেখাই হ'ল না। ধীরেন দা (সেন) তখন শিক্ষা ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর ওপরই ভার ছিল ফুট সাহেবকে ঘুরিয়ে দেখাবার। ফুট সাহেব শান্তিনিকেতন দেখে খুব যে উচ্ছ্বসিত হলেন তা' নয়। যেদিন ফুট সাহেব চলে যাবেন সেইদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সেখানে আমার প্রবেশাধিকার হয় নাই। সুতরাং তাঁদের আলোচনা কি হয়েছিল তা

আমি জানিনে। ফুট সাহেবও আমাকে কোনদিন কিছু বলেন নি এ বিষয়ে। একবার শুধু বলেছিলেন— শান্তিনিকেতনে গাছের তলায় ক্লাস হয়, ব্যাপারটা খুব ইনটারেষ্টিং বটে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় অমনোযোগী সন্দেহ নাই। ভিজিটররা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—পড়ুয়াদের সেদিকে নজর থাকে, মাষ্টারের কথায় নয়। কথাটা সত্য হলেও আমি বলেছিলাম, ওসব অভ্যাসের ব্যাপার। বাইরে গাছতলায় বসে পড়া ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। এদের ঘরের মধ্যে পড়াশুনা হবে না, হাঁপিয়ে উঠবে।

ফুট সাহেব কথাটা মানেন নি। শান্তিনিকেতন সম্পর্কে তাঁর বহুকালের কৌতূহল। এলম্‌হার্ষ্ট সাহেব শান্তিনিকেতনের প্যাটার্ণে ডাটিংটন হল-এ যখন স্কুল খুলেছিলেন ডেভনশায়ারে, সেই স্কুলেও না কি উনি গিয়েছিলেন। সে স্কুলেও ত কো-এডুকেশন। বিলেত যখন যাই, সে স্কুল দেখবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল।

ছাত্রদের হিট্‌লার-প্রীতি

ইতিহাসের ক্লাসে ছেলেরা মাঝে মাঝে একটু পলিটিক্স-চর্চ্চা করবার সুযোগ পেত। যুদ্ধ লাগবার সঙ্গে সঙ্গে পলিটিক্স চর্চ্চা একটু বেশী আরম্ভ হ'ল। ডিবেটিং সোসাইটিতে ত প্রায়ই 'ন্যাশনালিজম' চর্চ্চা হ'ত। যুদ্ধ লাগবার আগে থেকে উঁচু ক্লাসের দু' চারটি ছেলের হিট্‌লার প্রীতি ছিল, ক্রমে সেটা এত বেশী হ'ল যে ইংরেজ মাষ্টারদের কাছে তারা অসহ্য হয়ে উঠল। ইংরেজ মাষ্টারদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে ছেলেরা 'হোম ওয়ার্কের' খাতার উপর 'স্বস্তিকা' এঁকে রাখত। ইংরেজ মাষ্টাররা তাই দেখে ক্ষেপে উঠত আর নালিশ করত হেড মাষ্টারের কাছে। ফুট সাহেব ছাত্রদের ডেকে দেখা করতেন। জিজ্ঞাসা করতেন—"তুমি না কি প্রো-নাৎসি?" একদিন একটি ছেলে উত্তরে বলেছিল, "না, আমি প্রো-নাৎসি নই, আমি এ্যান্টি-ব্রিটিশ। আমি চাই না ইংরেজরা ভারতবর্ষে আধিপত্য করে!" এই থেকেই প্রায় সুরু হ'ল! হেড মাষ্টার ও ইংরেজ মাষ্টাররা ছেলেদের যতই উপদেশ দেন, ছেলেরা ততই বিগড়ে যায়। একদিন আবার একটি ছেলে জর্ম্মনদের খুব প্রশংসা করল ডিবেটিং সোসাইটিতেই বোধ হয়। তাই শুনে হেড মাষ্টারের হ'ল ভীষণ রাগ। তিনি একটা লম্বা প্রবন্ধ লিখলেন। সেটা ছাপা হ'ল, সবাইকে বিলি করা হ'ল। এ্যাসেমব্লীতে সিংহ-বিক্রমে গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি সেটা পড়লেন। তার ভাবার্থটা, যতদূর স্মরণ হচ্ছে—এই রকম: "জর্ম্মনরা, নাৎসীরা পশু, তারা

রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্ত ধন' হইতে

পৃথিবীর কলঙ্ক—তারা গ্যাংগ্রিন রোগের মত সাংঘাতিক ...তাদের কেটে-ছেঁটে সমূলে বাদ দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ থেকে যারা এই স্কুলে নাৎসীদের প্রশংসা করবে, তারা যেন এই স্কুল থেকে চলে যায়, কেননা নাৎসী আইডিয়েল শিক্ষা দেবার জন্য আমরা এই স্কুলে সমবেত হই নি"...ইত্যাদি।

ছেলেরা হয়ে গেল সব চুপ! মাষ্টাররা (ভারতীয়) আরও চুপ! চাকরি যাবে যে! আমি এই সময় একটি গান্ধীজীর ছবি আঁকায় মন দিলাম।

ক্ষণিকের সংসার

১৯৪০ সালের জুনমাস। ছুটি আরম্ভ হ'ল ১৮ই জুন। এই ছুটিতে ঘুরে বেড়ানর কথা মনেও আনতে পারি নি।

মনোরমা কলকাতায় ছোটদির বাড়ীতে আছে মার্চ মাসের গোড়া থেকেই। ছেলে পিলে হবার জন্ম মেয়েরা সাধারণত যায় বাপের বাড়ী। কিন্তু মনোরমাকে পাঠাতে হয়েছিল ছোটদির বাড়ীতে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বহুদিন আগেই গত হয়েছিলেন। কাশীতে শ্বশুর মশায়ের প্রকাণ্ড বাড়ী ও গাড়ি আছে সন্দেহ নেই, তিনি নিজেও ডাক্তার মানুষ; কিন্তু বাড়ীতে তখন কোন স্ত্রীলোক ছিল না। তিনি তখন তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে বাস করতেন। 'রিটায়ার্ড' জীবনের খানিকটা সময় কাটে ডাক্তারী করে, খানিকটা যায় রোটারী ক্লাবের মিটিং করে আর কিছু সময় কাটে কাশী ক্লাবে টেনিস, বিলিয়ার্ড খেলে, 'অল ইণ্ডিয়া ডকটরস্ এ্যাসোসিয়েশনের' কাজ করে। সুতরাং তাঁকে আর বিব্রত করা ঠিক হবে না ভেবে ছোটদির বাড়ীতেই মনোরমাকে পাঠান ঠিক করেছিলাম।

ছুটি আরম্ভ হতেই হন্তদন্ত হয়ে কলকাতা পৌঁছুলাম। কাছেই একট. নার্সিং হোমে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সময় মত সেখানে পৌঁছতে হবে মনোরমাকে। কলকাতায় পৌঁছোবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই নার্সিং হোমে শ্যামলীর জন্ম হ'ল। তখন দু'মাস আমার ছুটি বাকী। নোতুন সংসার, সে এক নোতুন অভিজ্ঞতা! প্রথম সন্তান হবার সময় মেয়েদের যেমন নোতুন মাতৃত্বের অভিজ্ঞতায় তারা অভিভূত থাকে! পুরুষদের পিতৃত্বের অভিজ্ঞতা—সেও বড় কম নয়! মনের মধ্যে সে কী উদ্বেগ! অকারণে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে সময় কাটান। শ্যামলীর জন্মের পর মা ও মেয়েকে ছোটদির বাড়ীতেই নিয়ে আসা হ'ল। তারপর আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা আরম্ভ করতে হ'ল; কিন্তু অকারণে নয়। ভাড়া বাড়ীর খোঁজে। কত ঘুরলাম, কিন্তু কলকাতা সহরে মনের মত ছোট-খাট একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বার করা, সেকী সোজা কথা! শেষটায় বালিগঞ্জে একটি ফ্ল্যাট পছন্দ হ'ল। দোতলায় তিনটি ঘর। সেইখানে দু'মাসের জন্ম পাত্‌লাম সংসার। মাকে মেজদার বাড়ী থেকে নিয়ে এলাম। মনটা অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। বাজার করি নিজেই। কোথায় তোলা উনুন, বঁটি, শিলনোড়া—সংসারের টুকিটাকি হরেকরকম জিনিষ। ওষুধপত্র, সব কিনে আনি। সেখানে এমনি করেই কাটতে লাগল আমার ছুটির দিনগুলো। পুলিন আসে মাঝে মাঝে, রমেনবাবুও আসেন। আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা বালিগঞ্জের দিকে থাকেন তাঁরাও আসেন। ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। মেঝেতে বিছানা বিছিয়ে সবাই শুই। মাদুর বিছিয়ে আঁকতে বসি ছবি, সময় পেলেই। অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেলেছিলাম সেবারে। তার মধ্যে বেশীর ভাগই ভাল ছবি বলে উৎরে গেল, সেগুলো পরে বিক্রীও হয়ে গিয়েছিল। দেরাদুন ফিরে যাবার আগে সে সব ছবির প্রদর্শনী করলাম পুলিনের হিন্দুস্তান পার্কের বাড়ীতে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদল, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে পুলিনের বাড়ীতে বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা হ'ল একদিন। তারপর ছুটি ফুরোল। আগষ্টের শেষে কলকাতায় ভাড়াবাড়ীর সংসার তুলে চলে গেলুম দেরাদুন। এবারে একলা নয়, দোক্‌লাও নয়, ক্ষুদে মানুষটিও সঙ্গে!

আবার ঘানিতে লেগে গেলাম! স্কুলের কাজ, সংসারের কাজ! ক্ষুদে শ্যামলীকে কোলে নিয়ে কাটে অবসর সময়। তারই ফাঁকে আঁকে ছবি আঁকি, মূর্তিও গড়ি। রাত্রে খাবার পর ভিজে নরম মাটি দিয়ে ছোট ছোট মূর্তি; ঠিক মূর্তি নয়—পুতুল গড়ি। মনোরমা বসে দেখে মেয়ে কোলে করে। শেষটায় সেও আরম্ভ করল আঁকতে। দিন কাটে এমনি করে। সময় সময় গানের ঝরণায় বাড়ী মাত করে রাখি! মনোরমাও গায়, শ্যামলীকে গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। মনে হ'ত "এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না"—! কিন্তু সব সময় কি তা যায়? গেল কৈ?

সুখের সংসার বাঁধতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে ছিল অন্য রকম। আকস্মিকভাবেই তিনি তাঁর কাছে টেনে নিলেন মনোরমাকে।

* * *

মিড-টার্ম ব্রেক

বেপরোয়া হয়ে ভবঘুরের মত দেশ বিদেশে বেড়ালেই কি সব সময় শান্তি পাওয়া যায়? শান্তি পাবার উদ্দেশ্যেই কি মানুষ সব সময় ঘুরে বেড়ায়? মনের মধ্যে চিরন্তন পথিক বাস করে, সেই পথিকের কথা গুরুদেব তাঁর লেখায় বলেছেন। চিরদিন তিনি পথের নেশায় 'পাথেয়' অবহেলা করেছেন। কাজের মধ্যে তাঁর পথিক যখন বাইরে যার হবার অবকাশ পায় নি, তাঁর চঞ্চল মন তখন গান গেয়েছে

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী,"...অথচ তিনিই আবার সারা রাজ্যি ঘুরে এসে আপন ঘরের জানলা দিয়ে দেখলেন ঘাসের ওপর শিশির কণার দোদুল দোলা! ঘরের দুয়ারে এরা আগেও ত দোলা খেয়েছে! দেখেন নি ত এদের আগে!

লম্বা ছুটিতে আমাদের মন চায় বহুদূরে কোথাও যেতে। কিন্তু ছুটি যখন অল্প দিনের হয় তখন নজর পড়ে কাছের নাগালের মধ্যে কোথাও। দুন স্কুলে 'মিড্-টার্ম ব্রেক'গুলো করেন। মেলাতে হাজার হাজার লোকের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সেখানে গিয়েছি। ঢালুতে নদীর কোলে পাথরের সিঁড়ি-পথ নেমে গেছে। সামনে একটা প্রকাণ্ড পুন্নাগ গাছ আকাশের দিকে ডাল পালার ঊর্দ্ধবাহু মেলে যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্ত দু'চার জন যায় সে পথে। দু'চারটি ভিখারীও তাই বসে থাকে সে পথের ধারে; দু'চারজন দু'এক পয়সাও দেয়। মন্দিরটা প্রায় একটা গুহার মধ্যে, সেখানে পাথর চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ে।

বিমর্ষ

যদি না থাকত, তবে দেরাদুনের আশে পাশের সৌন্দর্য্য হয়ত আমাদের অজানাই থেকে যেত। সময় কি পেতাম তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবার? স্কেচ বই আর ক্যামেরা নিয়ে দু'চার দিনের ছুটিতে ঘুরি এইসব জায়গাগুলিতে। কখন ছেলেদের সঙ্গে, কখন একলা নিজের মনে।

তপকেশ্বর

বেড়াতে বেড়াতে কতোবার গিয়েছি 'তপকেশ্বর'। আমাদের স্কুল মাত্র মাইল পাঁচেক হবে হয়ত। যতোবার গিয়েছি ততবারই ভাল লেগেছে। প্রতি বছর শীতের সময় সেখানে মেলা বসে। শিবের মন্দির পাহাড়ের গায়ে, দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ছোট্ট পাহাড়ী নদী। দু'চার সাধু, সন্ন্যাসী কি শীত, কি গ্রীষ্ম সেখানে বাস

ঘন্টা ঝুলছে মন্দিরের দরজার সামনে। ঘণ্টা বাজিয়ে দু'চার আনা শিবের সামনে প্রণামী রেখে মানত করে। পুত্রহীনা চায় সন্তান, অনূঢ়া কন্যা চায় মনের মত মানুষ। শেষ যেবার সেখানে যাই, সে বেশি দিনের কথা নয়! একটি বন্ধুর ছোট্ট ছেলে গেল অকালে ঝরে। তারই দেহ কোলে করে নিয়ে যাওয়া হ'ল সেই তপকেশ্বরের নদীর ধারে, পাহাড়ের গায়ে খোঁড়া হ'ল তার শয্যা। নির্জন পাহাড়ের কোলে তাকে মাটি চাপা দিয়ে আমরা চলে এসেছিলুম। কি জানি কেন, তারপর আর ওদিকে যাওয়া হয় নি।

লচ্ছিওয়ালা

মাত্র দশ বার মাইল দেরাদুন থেকে। বহুবার গিয়েছি সেখানে। তর তর করে পাহাড়ী নদী ছুটে চলেছে,

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এঁকে এঁকে চলে পথ, বহু দূরে। দুপাশে হরেক রকমের বিচিত্র জঙলী গাছ, কুঁচ গাছ থেকে ঝরছে রাশি রাশি কুঁচ।

লচ্ছিওয়ালার কথা মনে হলেই মনে পড়ে মটরুদার কথা, ক্যাপটেন নাগের কথা, শ্যামলীর ছিপ নিয়ে মাছ ধরার চেষ্টার কথা।

মটরুদার সঙ্গে গিয়েছিলুম যেবার, লটিদি ও মনোরমাও সঙ্গে ছিলেন। মটরুদার পুরোণ ফোর্ড ভি. এইট নিয়ে বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে নদী পর্য্যন্ত নামতে আমাদের সে কী অবস্থা। মটরুদার সঙ্গে ছিল বাঁশী, নদীর কলতানের সঙ্গে বাঁশীর মেঠো সুর, মাঝে মাঝে……সে সব দিন কি ভুলবার!

ক্যাপটেন নাগ মিলিটারী ডাক্তার। মিলিটারী ট্রাক নিয়ে তিনি আসতেন। তাইতে গিয়েছিলাম আমরা একদল। সেই দলে শ্যামলী আর বন্ধুরাও ছিল। ছিপ ছিল সঙ্গে, অনেকগুলো মাঝারী গোছের মাছও ধরা পড়ল সেদিন। শ্যামলীর সে কী স্ফুর্ত্তি। বাড়ী গিয়ে মাছভাজা খাবে বলে নয়, সে মাছগুলোকে নাকি পুষবে। ভাজা খাবার কথায় তার চোখে জলের ধারা দেখা দিল। লচ্ছিওয়ালা, ধারাওয়ালা, রাইওয়ালা—জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সর্পিল পথ গেছে চলে, অদূরেই হিমালয়। অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!

সহস্র ধারা (সালফার স্প্রিং)

রাজপুরের পথ থেকে একটা কাঁচা পথ নেমে গেছে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। সহস্র ধারায় যেতে হলে সেই পথে যেতে হ'ত। সালফার স্প্রিং আছে সেখানে। পিকনিকের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা। রোজই সেখানে অনেকেই যায়। কেউ যায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের টানে, কেউ যায় রোগ সারাতে সেখানকার জলে স্নান করে। যুদ্ধের সময় সেই সহস্র ধারার কাছে একটি পাহাড়ী লোক চায়ের দোকান করেছিল। পাহাড়ের বুকে বড় বড় পাথরের বুক দিয়ে ঝর ঝর ধারায় জল পড়ে। তারই কাছে বসেছিলাম আর চা-ওয়ালা শুনিয়েছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনী। সেই চা-ওয়ালাকে আজ মনে আছে। তারপর যতোবার গিয়েছি তার কথা মনে হয়েছে, কিন্তু তাকে আর দেখিনি। সে চলে গেছে শুধু মনের মধ্যে একটা স্মৃতির তুলির আঁচড় টেনে দিয়ে।

রবারস্ কেভ

দেরাদুন থেকে খুব দূরে নয়। প্রথমবার স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে গিয়েছিলাম সাইকেলে চড়ে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম সাঁতার কাটবার 'ড্রয়ারস্'। জলের মধ্যে সে কি ঝাঁপা-ঝাঁপি। পাথরের উঁচু দেয়াল দুপাশে, তার মধ্য দিয়ে নেমে আসছে জলের ধারা। স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় যেন।

চক্রাতার পথে

দেরাদুন থেকে ত্রিশ বত্রিশ মাইলের মধ্যে দেখবার মত অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। চক্রাতার পথে 'আম্বারী, রামপুর মণ্ডী, কলসী (যেখানে অশোক পিলার আছে)—সবই গঙ্গার ধারে। ডাক বাংলোতে, ছোটখাটো খালি বাড়িতে কিম্বা তাঁবু নিয়ে এসব জায়গায় অনেকবার থেকেছি দু'চার দিন করে। গঙ্গার স্রোতে গা ভাসিয়ে সাঁতার কাটা থেকে আরম্ভ করে রাফ্‌টিং (Refting) মাছ ধরা, রোদে বালিতে শুয়ে অলস ভাবে সময় কাটানো; প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে তিন চার দিনের মত একেবারে সব কিছু ভুলে থাকা! তারপর আবার ফিরে এসে কাজের মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহ পাওয়া যায়।

আবার মুসুরী পাহাড় থেকে হেঁটে পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে কিংবা হিমালয়ের ছোটোখাটো চুড়োগুলো উঠবার চেষ্টা ছেলেদের নিয়ে, তাও মাঝে মাঝে করেছি। প্রতি বছরেই দু'বার দল বেঁধে নতুন উদ্যমে তাদের 'মিডটার্ম ব্রেক' করেছে। ছুটির আনন্দ পুরোপুরি লুটে নিতে পারে তারা এই ছুটিগুলোতেই। হলই বা ছুটি মাত্র তিন চার দিনের। লম্বা ছুটিতে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বড় বড় সহরে ঘুরে বেড়ানোতে ঠিক এই আনন্দ পাওয়া যায় না মোটেই। প্রকৃতির সঙ্গে চেনাশোনা হয় মানুষের এমনি করেই। সব মানুষেরই চোখ থাকে; কিন্তু সবার সে দৃষ্টি কোথায়?

দেরাদুন হরিদ্বারের পথে অনেক জায়গা আছে বেড়াবার

ও ক্যাম্প করবার মত। হৃষিকেশ লছমন ঝোলার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। লছমান ঝোলা থেকে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাওয়া যায় আরও অনেক জায়গায়। পথে পথে কত ঝরণা, সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম। কর্মক্লান্ত দেহমন সে সব জায়গায় দুদিনেই আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ধনৌরী

দেরাদুন থেকে রুড়কী হয়েও হরিদ্বার যাবার রাস্তাটা বড় সুন্দর। রাস্তার পাশে পাশে খাল চলে গেছে বহুদুর। রুড়কীর কাছে ধনৌরী বলে একটা জায়গা—সেখানে বহুবার গিয়েছি। প্রকাণ্ড 'কেনাল' পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তারই

কাপড়ের উপর পলাশ ফুল

জল আবার নানান দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রামে গ্রামে। কৃষ্ণচূড়া আর অমলতাসের গাছে পর্যাপ্ত ফুল ফোটে, সারা রাস্তা লাল-হলুদ সবুজে রঙিন। শিমুল পলাশের অভাবও নেই পথে ঘাটে, ঋতুতে ঋতুতে রঙ বদলায়। যার চোখ খুলেছে সেই ত সে সব দেখে বেড়ায় মনের আনন্দে, 'পথে চলা সেই ত তোমায় পাওয়া :—

চাঁদবাগ

দুন স্কুল। জায়গাটার নাম চাঁদবাগ। দুন স্কুলের স্কুল বিল্ডিং, চারটে হাউস, অর্থাৎ হোস্টেল (এক এক হাউসে প্রায় পঁচাত্তর জন করে ছাত্র থাকে), প্রশস্ত খেলার মাঠ, সুইমিং ট্যাংক, স্কোয়ার কোর্ট, টেনিস কোর্ট, মাষ্টারদের কোয়ার্টার, এ্যাসেমব্লী হল, ক্ল্যারিকেল স্টাফদের কোয়ার্টার, চাকর খানসামাদের কোয়ার্টার, স্কুলের হাসপাতাল, আর্ট স্কুল, মিউজিক স্কুল—সবই এই চাঁদবাগের মধ্যে। এ একটা ছোট্ট পৃথিবী! হেডমাষ্টার হোচ্ছেন হর্তাকর্তা বিধাতা।' তাঁকে ঘিরে মাষ্টার ছাত্র চাপরাসী মালী—যত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরছে!

ওয়ার ফণ্ড

১৯৪২ সালের গোলমালের পর ছেলেরা ছুটি থেকে স্কুলে ফিরে এসে 'ওয়ার ফণ্ডে' আর চাঁদা দিতে চাইল না। পকেট খরচ ছেলেদের খুবই সামান্য। তার থেকে বেশ বড় একটা অংশ ছেলেদের 'ওয়ার ফণ্ডে' দিতে হত। এই চাঁদা বন্ধ হওয়ায় ফুট সাহেব ছেলেদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন। গান্ধীজী, জওহরলাল—সবাই তখন জেলে। দেশের তখন দুর্দ্দিন। ক্যাপ্তেন ছাড়া জাহাজের মত দেশের অবস্থা তখন। যে সব ছেলে স্পষ্ট ভাষায় হেড মাষ্টারকে আর চাঁদা দেবে না বলল; তাদের গার্জেনদের কাছে উত্তেজিত হয়ে তিনি চিঠি লিখে দিলেন। কোন কোন গার্জেন তাঁদের ছেলেদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লিখলেন। একটি ছেলে, সে একজন বাঙালী আই. সি. এস অফিসারের ছেলে, তার কথা মনে আছে। সে ছেলেটিকে নাকি ফুট সাহেব বলেছিলেন—"তোমার

বাবা ত গভর্ণমেন্টের চাকর, তোমার ত যুদ্ধের ফণ্ডে চাঁদা দেওয়া উচিত।" ছেলেটি তার বাবাকে সে কথা জানিয়ে চিঠি লেখে। ছেলেটির বাবা কলকাতা থেকে একদিন স্কুলে এসে হাজির। তিনি ফুট সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন, নানান কথাবার্ত্তা হ'ল। ছেলের এডুকেশনে বাপের প্রফেশনকে টেনে এনেছেন কেন—একথা তিনি ফুট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন। ছেলেটির বাবার কাছেই আমি একথা শুনেছি। ফুট সাহেব অবশ্য এবিষয়ে আমাকে কিছু বলেন নি।

নিরুলাজী

নিরুলা বলে সে সময় একজন বক্সিং ও সাঁতার শেখাবার মাষ্টার ছিলেন। ভদ্রলোক অবিবাহিত যুবক, স্বপাক খেতেন! খদ্দর পরতেন এবং খাঁটি গান্ধীভক্ত। আমার সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। ছেলেদের মধ্যেও তাঁর অনেক চেলা ছিল। অনেক ছেলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। নিরুলা সত্যই খুব উঁচুদরের মানুষ অন্তত আমি যতদূর জানি। ফুটসাহেব নিরুলাজীকে একটু সন্দেহের চোখে দেখতেন। মাষ্টাররা নিজেদের কাজ ঠিক নিয়মমত করবে, এটা তিনি চাইতেন। কিন্তু ছেলেরা কোন মাষ্টারকে বেশী পছন্দ বা ভক্তি করবে, সেটা বোধ হয় তিনি চাইতেন না। হেডমাষ্টারের চেয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা আর কেউ যদি পেয়ে যায় তবে হেডমাষ্টারের পক্ষে স্কুল চালানো মুস্কিল হয়ে যেতে পারে যে! সুতরাং সেই মাষ্টারের সমূহ বিপদ! নিরুলা-জীকে শেষ পর্য্যন্ত এই স্কুল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। বিদায় নেবার আগে আর একটি ব্যাপার হয়েছিল, যার জন্য নিরুলাজীকেই অনেকে দায়ী মনে করেন।

ভ্রমর

ব্যাপারটা হল এই—ভ্রমর রণজিৎ সিং বলে একটি ছেলে (ইউ, পি,র ছেলে) খুব স্বদেশভক্ত হয়ে পড়েছিল। সে নিরুলাজীকে গুরু বলত। ছেলেরা ভ্রমরকে খুবই ভালবাসত! ভ্রমরেরও ছেলেদের উপর একটা আধিপত্য ছিল। ভ্রমরের দলের ছেলেরা একবার ঠিক করল যে তারা "জালিয়ানওয়ালাবাগ-ডে" পালন করবে। সেদিন সকাল বেলা দেখা গেল, সব ছেলেরা ডান হাতে একটি করে লাল ফিতে লাগিয়ে এসেছে। ভ্রমর হচ্ছে এর লীডার। সকলেই এই লাল ফিতে লক্ষ্য করল—বিশেষ করে ইংরেজ মাষ্টাররা। এ্যাসেমব্লীতে যখন ছেলেরা লাল ফিতে হাতে পরে ঢুকল, ফুটসাহেব প্রার্থনা পড়বার পর বললেন যে, স্কুলের ইউনিফর্ম্ ছাড়া আর কিছু পরবার নিয়ম নেই, সুতরাং ঐ লাল ফিতে যেন তারা এ্যাসেমব্লীর পরই খুলে ফেলে। এ্যাসেমব্লীর পর কেউ কেউ খুলে ফেলল। কিন্তু বেশীর ভাগ ছেলে খুলে ফেলবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ভ্রমরকে ঘিরে ধরল। হেডমাষ্টার ব্যাপারটা দেখলেন। তিনি ভাবতেন চাঁদবাগ এষ্টেটের একমাত্র ডিক্‌টেটর তিনি। তাঁর অর্ডার সত্ত্বেও একটি ছাত্রের অর্ডারের জন্য ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরেছে। ছেলেটির উপর গিয়ে পড়ল তাঁর রাগ! ভ্রমর ছেলেটি চৌকষ ছিল বলা চলে। শরীর চর্চায় তার দেহ ছিল পুষ্ট, হিন্দী কবিতা লিখত, খেলার মাঠেও ভাল, পড়াশুনাতেও চলনসই। মোটের উপর ছেলেটির কোন খারাপ রিপোর্টই ইতিমধ্যে পাওয়া যায় নি কোনো বিষয়েই। এইবার হঠাৎ তার সব রিপোর্টই গেল খারাপ! ছেলেটির বাপের ত চক্ষুস্থির! গত চার বছর ছেলেটি সব বিষয়েই ভাল রিপোর্ট পেয়েছে, আজ তার চরিত্র দুর্ব্বল, চলন-বলন খারাপ হয়ে গেল, হল কি তবে ছেলের? অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর দেরী হল না। ছেলেটিকে বোঝালেন যে 'সিনিয়র কেমব্রিজ' পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে না হয় বিদায় নিয়ে এস। কিন্তু স্কুলের হেডমাষ্টার, তার হাউসমাষ্টার আর তাকে স্কুলে রাখতে চান না। হঠাৎ কোন কথাবার্ত্তা নেই, ছেলেটিকে একদিন বিকেলের ট্রেনে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে ফেললেন ফুটসাহেব। অন্য ছেলেরা কি করে যেন জানতে পেয়ে গেল ব্যাপারটা। তখন 'টয় টাইম' চলছে, অর্থাৎ 'স্টাডি টাইম'। কে কার কথা শোনে; দলে দলে সব ছেলেরা সব হাউস থেকে বেরিয়ে ছুটেছে হেডমাষ্টারের বাড়ির দিকে। হেডমাষ্টারকে তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে তারা ভ্রমরের বিষয়ে জেরা করতে সুরু করেছে। চোখ রাঙিয়ে ছেলেদের বাগ মানানো মুস্কিল দেখে তিনি কাষ্ঠহাসি হেসে ছেলেদের স্টাডিতে ফিরে যেতে বললেন। প্রিফেক্টদের ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে, সব বুঝিয়ে বললেন আশা দিয়ে। ছেলেরা সব উত্তেজিত হয়ে রইল। ভ্রমর চলে গেল বাড়ি।

তারপর চলল ভ্রমরের বাপের সঙ্গে কুটসাহেবের চিঠিতে মার-প্যাঁচ। কুটসাহেবকে একগুঁয়ে বলেই জানতাম, তিনি সহজে হার মানেন না। কিন্তু ভ্রমরের বাবা কিছু একটা প্যাঁচ খেলেছিলেন সন্দেহ নেই। ভ্রমর শেষ পর্য্যন্ত ফিরেই এল।

ভ্রমর ফিরে এল। কিন্তু তার উপর অর্ডার হল স্কুলের কোন ব্যাপারে সে লীড নিতে পারবে না! তার ডিবেটিং সোসাইটিতে বলা নিষেধ, লিটরেরী সোসাইটিতে যোগ দেওয়া বা কবিতা পড়া নিষেধ, খেলার মাঠে ম্যাচ খেলা বারণ;—অর্থাৎ যে সব কাজে নিজেকে সামান্য পরিমাণেও জাহির করা যায়, তা' সবই তার বারণ! ভ্রমরকে দুই সাহেব মিলে প্রায় পাগল করে দেবার বন্দোবস্ত করেছিল।

যতই দিন যেতে লাগলো ততই বুঝতে লাগলাম, এই স্কুলে সবই বেশ 'এফিসিয়েন্ট' ভাবে হয়। ছেলেগুলো শিক্ষাও ভাল পায়। খেলাধূলা, চাল-চলন-বলন সবই চোস্ত ভাবে শেখে। কিন্তু কেউ এরা 'স্ট্রাইকিং' বা 'জিনিয়স' টাইপের হয় না। সবই 'এফিসিয়েন্ট মীডিওকর' এর দল এরা। বেশীর ভাগ ছেলে ইংরেজ মাষ্টারদের ও হেডমাষ্টারের মন জুগিয়ে চলে। না চলেও উপায় কি? হেডমাষ্টারের রেকমেণ্ডেশনের দরকার হবে ভবিষ্যতে! সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই ধড়িবাজী ও ধামা ধরতে শিখে ফেলে। যাই হোক, এফিসিয়েন্ট মীডিওকরের বড় অভাব আমাদের দেশে; সুতরাং ভাববার কিছু নেই!

'পায়ের ধুলো না প্রণাম'

মাষ্টার ও ছাত্রের সম্পর্কটা এখানে একটু অদ্ভুতভাবে গড়ে উঠেছে। ঠিক পুরণো গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নয়, আবার পুরোপুরি সাহেবীও নয়। ছেলেরা কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত সেটা ঠিক করতে পারে না। আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই বড়দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার রীতি আছে। যদিও ইদানীং অনেকেই পা' ছুঁয়ে প্রণাম করাটা পছন্দ করেন না। দুন স্কুলের অনেক ছেলেরাই বাড়িতে বাপ মাকে ও গুরুজনদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে থাকে কিন্তু তাঁরা যখন স্কুলে আসেন তখন অনেক ছেলেই তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে না। সেটা খানিকটা বোধহয় লজ্জায়—সাহেবীয়ানায় নয়।

আমার মনে আছে, দেরাদুন জেল থেকে বেরিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল দুন স্কুল দেখতে এসেছিলেন। সে সময় তাঁর আত্মীয়, নেহেরু পরিবারেরই একটি ছেলে পড়ত। তার সাথে পণ্ডিতজীর দেখা হল খেলার মাঠে। জওহরলালের সঙ্গে কুটসাহেব ও আমি ছিলাম। ছেলেটি জওহরলালকে দেখে প্রণাম করবে, কি নমস্কার করবে, কি হ্যাণ্ডশেক করবে কিছু ভেবে না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জওহরলাল এগিয়ে এসে ছেলেটির পিঠে হাত রাখলেন ও কথা বললেন।

আমি একবার এক ইংরেজ মাষ্টারকে বলতে শুনেছি, "অমুক ছেলেটা 'বারবারাস' ফ্যামিলী থেকে এসেছে, ছেলেটা পা ধরে প্রণাম করে তার বাবা মাকে! আর বাবা মাও কেমন, ছেলেটাকে পা ছুঁতে দেয়।"

পা ছুঁয়ে প্রণাম করা ভাল কি খারাপ এই নিয়ে নানা লোকের নানা মত। মত প্রকাশ করা সহজ, কিন্তু বহু
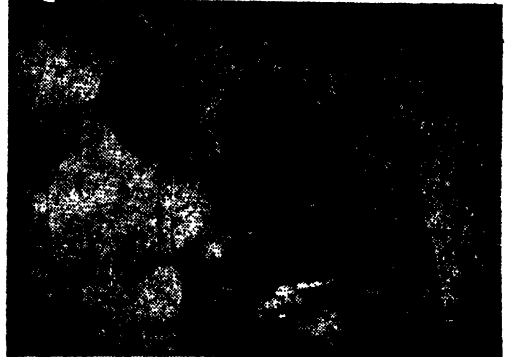
পণ্ডিত নেহরু মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন

কালের সংস্কারকে এক নিমেষে তুলে দেওয়া সহজ নয়। গুরুজনদের প্রণাম করা তাঁদের কাছে হীনতা স্বীকার করা নয়। স্থান, কাল, পাত্রবিশেষে মাথা নত করতে জানে না যারা, মাথা উন্নত রাখতেও তারা জানবে না কোন দিন!

মাষ্টারদের সাপ্তাহিক সভা বা Chambers

প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার স্কুলে আধ ঘণ্টা ব্রেকে মাষ্টারদের কমনরুমে মিটিং হয়, হেড মাষ্টার সেই মিটিঙে আসেন। ছেলেদের বিষয় আলোচনা বা অন্যান্য নানান

বিষয়ে পরস্পরের কাছে বা বলবার থাকে তা' এই মিটিংএ বলা যেতে পারে। মিটিংএ মুখ গম্ভীর করে বসে হেড মাষ্টারের বক্তব্য শোনাই অবশ্য সব মাষ্টারদের কাজ। হেডমাষ্টার শোনেন কম, বলেন বেশী! তিনি বলেন আর দু'চার জন মাষ্টার হুঁ হাঁ করেন। ব্যস, বেশী বললেই বিপদ। হেডমাষ্টার চটতে পারেন। আর চটলে যদি চাকরী যায়! হাউস মাষ্টারের পোষ্ট থাকি হলে তাকে যদি হাউস মাষ্টার না করেন! Chambers-এ ছেলেদের বিষয়ে কথাবার্তার কয়েকটা নমুনা দেওয়া যাক:

—'ভরত সিং ছেলেটাকে নিয়ে আর পেরে উঠছি না'—

—'হ্যা ছেলেটা একটা ইডিয়ট'...

—'ছেলেটাকে বাড়ী ফেরৎ পাঠানোই উচিত'—

—'না, আর একটা চান্স দিয়ে দেখা যাক'—

—'অলরাইট, সত্যি ত, আমাদের এই স্কুলটাতে রিফর্মেটরী স্কুল নয়'—

—'ওসব ছেলেরা এখানে থাকলে অন্য ছেলেরা খারাপ হয়ে যাবে যে'—

ব্যস, অন্য কথা উঠলো।

—'একটা ভাল ফিল্ম এসেছে টাউনে'—

—'তুমি দেখেছ?''

—'হ্যা, কালকে রাতের শো'তে গিয়েছিলাম।'

—'নামটা শুনে মনে হচ্ছে ভাল—'

একটি ইংরেজ হাউস মাষ্টার বললেন—"হ্যা, আমিও দেখেছি"—

—'অ্যাজ এ হিষ্ট্রি মাষ্টার—আই রেকমেণ্ড—'

—'অলরাইট, রবিবার তিনটার শো'তে সব ছেলেদের সিনেমাতে যাবার ব্যবস্থা করা হোক'—

হেড মাষ্টার বললেন,—এই টার্মে ছুটি কবে কবে হবে—ক্যালেণ্ডারে ঈদ হচ্ছে ২১শে, (উর্দু মাষ্টার মুসলমান, তাঁর দিকে তাকিয়ে)—২১শে না হয়ে ২২শে ছুটি হলে চলে না?"

উর্দু মাষ্টার। "না, চাঁদ না দেখা গেলে ঠিক করে বলা যাবে না'

—'অলরাইট, ২১শে কিংবা ২২শে—দেয়ালী দেখছি ২৭শে ২৮শে—এক মাসে এতগুলো ছুটি হতে পারে না—লেট আস্ হ্যাভ আওয়ার দেওয়ালী নেক্‌ষ্ট মনথ—সেকেণ্ড? —কারও আপত্তি আছে কি?"

সব চুপ!

অলরাইট, নেক্‌ষ্ট মনথ, সেকেণ্ড। এনি আদার ম্যাটার টু বী ডিস্কাস্ড!—হ্যা, আমি দেখছিলাম অনেক বড় ছেলে দাড়ি কামায় না। কারুর কারুর বেশ বড় দাড়ি হয়েছে—বে গুড সেন্স—"

মাষ্টাররা হেডমাষ্টারের রসিকতায় সবাই হৈ হৈ করে হাসলেন। কেউ কেউ এতক্ষণে কথা বললেন, "ইয়েস, হেড মাষ্টার, গুরুবচন ইজ অওয়ুন"—

হেডমাষ্টার। "বাট্, Is'nt he a sikh?"

—"ইয়েস্, ইয়েস হেডমাষ্টার, বাট, হি হ্যাজ এ ব্রোথ।"

—"ছেলেদের জন্য সেফটি রেজার রাখতে বলা হোক—স্কুল ষ্টোরে—"

—"বেশ, বেশ, কোন্ ব্লেড রাখা হবে ষ্টোরে—আই রেকমেণ্ড 'জিলেট ব্লু'—"

—'ইয়েস্ ইয়েস, 'জিলেট ব্লু' ইজ বেষ্ট"—

—'অলরাইট, 'জিলেট ব্লু"—

এই ত গেল মাষ্টারদের মিটিং। অবশ্য এর চেয়েও যে দরকারী কথাবার্তা হয় না তা নয়। তবে হেডমাষ্টারের হিটলারী ভাবটা এতই বেশী যে, তাতে মিটিংটা বাঘ-ছাগলের মিটিংএর মত। এমনি করেই স্কুলটা চলে। স্কুলের পেট্রন কে? ইংরেজ আমলে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন স্কুলের চেয়ারম্যান, স্বাধীন ভারতে, ভারতের প্রেসিডেণ্ট।

ইংরেজ প্রীতি না ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স

ইংরেজ আমলে দুন স্কুল খোলা হয়। বিলিতী আমলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এক রকম—স্বাধীন ভারতে তার বদল এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। বহুদিনের পরাধীনতা আমাদের মেরে রেখেছে। স্বাধীন ভারতের স্পষ্ট ছবি আমরা ক'জনই বা দেখতে পাই। নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি আমরা, তাই বিদেশীদের উপর এই নির্ভরতা। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশরক্ষার ভার আমাদের নিজেদের উপর পড়েছে। স্বাধীন ভারতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী

ভারতীয়, প্রেসিডেন্ট ভারতীয়, সভাভ্যগণ সবাই ভারতীয়! জুটছে না কেবল পাবলিক স্কুলের হেডমাষ্টার। অবশ্য, দুন স্কুলের ছাত্রদের অভিভাবকরা বেশীর ভাগই চান বিলিতী হেডমাষ্টার, হাউস মাষ্টার। মনের কতখানি দৈন্যদশা হলে এই রকম আকাঙ্ক্ষা মানুষে করে তা বলবার নয়। আমি স্বীকার করি ইংরেজদের অনেক গুণ! কিন্তু ভারতীয়দেরও গুণের অভাব নেই!

একদিন একটি মহিলা—একজন উচ্চপদস্থ I. C. S. অফিসারের স্ত্রী—তাঁর ছুটি ছেলে পড়তো দুন স্কুলে—আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে গল্পচ্ছলে বললেন—"অমুক হাউসের হাউস মাষ্টার ভাল না।" বলা বাহুল্য একমাত্র ভারতীয় হাউস মাষ্টারকেই তিনি 'মীন' করলেন। তিনি নাকি ভাল করে হাউস মাষ্টারী করতে পারছেন না। আমি তাঁর কথা শুনে প্রথমে একটু হেসেছিলাম মাত্র। তাতেও তিনি যখন থামলেন না, বলতে লাগলেন—"আবার ইংরেজ হাউস মাষ্টার আনা উচিত দুন স্কুলে।" তখন আমি হেসে বললাম—"ইংরেজদের আবার আমাদের উপর রাজত্ব করতে ডাকলেও ত হয়, আমার মনে হয় আমরা নিজেরা ভাল করে চালাতে পারছি না।' ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। এবারে আমি চোখা বাণ ছুড়লাম। বললাম—'ভারতীয় মেয়েদের চেয়ে বিলিতী মেয়েরা বেশী 'এডুকেটেড', তারা দেখতে শুনতে, কাজে কর্ম্মেও ভাল! আবার কেমন স্মার্ট! ভারতীয় ছেলেরা যদি বিলিতী মেয়েদের বিয়ে করে তবে নিশ্চয়ই দেশের পক্ষে ভালই হয়। তা হ'লে তাদের ছেলেমেয়েরা ভাল শিক্ষা পাবে তাদের বিলিতী মায়ের কাছ থেকে। কি বলেন?" এইবার ভদ্রমহিলা বুঝলেন, আমি বোধ হয় ঠাট্টা করছি। বললেন—'তবে দেশের মেয়েদের কি হবে? তারা করবে কি?' বললাম—'তারাও বিলিতী ছেলে বিয়ে করতে পারে, নয়ত যাবে চুলোয় এবং সেই ত তাদের আসল জায়গা!'—

আর্থার ফুট

ফুট সাহেব দুন স্কুলের প্রথম হেডমাষ্টার। ফুট সাহেবের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল। তিনি আমায় স্নেহ করতেন, তাঁর সঙ্গে আমার তর্কবিতর্কও হয়েছে এবং সাময়িক ভাবে পরস্পরের প্রতি বিরক্ত হয়েছি। আবার কিছুদিনের মধ্যে আকৃষ্টও হয়েছি পরস্পরের প্রতি। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুট সাহেবের কর্ম্ম-জীবনের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়েছে। তাঁর মধ্যে আত্মনির্ভরতা, একনিষ্ঠতা, কর্ম্মতৎপরতার এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সব গুণগুলির সমাবেশ দেখেছিলাম। বিপদের দিনে তিনি সর্ব্বদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, শুধু আমার নয়, ওঁর দ্বারা যতটুকু সম্ভব সকলকেই সহযোগিতা করেছেন। অথচ এই লোকটির বাইরের আবরণ বড় শক্ত মনে হতো। তাঁর অন্তরের এই কোমলতার পরিচয় সকলে জানত না।

দুন স্কুলে মাত্র এক বছর কাজ করার পর যখন আমি বিদেশ যাত্রা করি, তখন আমার হাতে যথেষ্ট পাথেয় ছিল না। ফুট সাহেব তখন নানান ভাবে আমায় সাহায্য করেছিলেন। গোয়ালিয়রে প্রদর্শনী করে ও মূর্ত্তি গড়ে যা টাকা আমার কাছে জমেছিল, তাতে বিলেত যাতায়াতের খরচ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সেখানে এক বছর থাকবার মত খরচ আমার কাছে ছিল না। ভরসা ছিল মনে যে, ছবি বিক্রী করে কোন রকমে চলে যাবে। এই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিদেশ যাত্রা যে খুব নিরাপদ নয় তা আমি জানতাম; তবু আশা ছিল যে দরকার হলে ফুট সাহেব আমায় স্কুল থেকে ধার দেবেন। দুন স্কুলের কাজে যোগ দিয়ে আমি কতকগুলি মূর্ত্তি গড়ি। তার মধ্যে ফুট পত্নীর মূর্ত্তিও একটি। বিলাত যাবার কিছু আগে একদিন ফুট সাহেবের কাছ থেকে একটি বন্ধ খাম আমার কাছে এল। সেটি খুলে দেখলাম, তার ভেতর একটি ছোট্ট চিঠি এবং আমার নামে একটি দু'শ টাকা চেক্। টাকা কেন পাঠিয়েছেন জানবার জন্ত তাড়াতাড়ি চিঠিটি পড়লাম। পড়ে আশ্চর্য ও আনন্দিত হলাম সন্দেহ নেই। তিনি লিখেছিলেন,—'আমার স্ত্রীর মূর্ত্তির দাম স্বরূপ এই টাকা আমি তোমায় পাঠাচ্ছি। আমার ইচ্ছা তুমি লণ্ডনে পৌঁছে এই মূর্ত্তিটি আমার স্ত্রীর মাকে আমার হয়ে উপহার দাও। মূর্ত্তিটি নিয়ে যাবার খরচ অবশ্য আমি বহন করব।" তাঁর সহৃদয়তায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, কারণ মূর্ত্তিটা স্ব ইচ্ছায় আমি গড়েছিলাম। বিলেত যাবার সময় তিনি নিজে আমায় তুলে দিলেন ট্রেনে। সঙ্গে এনেছিলেন অনেকগুলি

পরিচয়-পত্র। বিদেশে যাতে আমার কম খরচে চলে তার জন্য বহু ব্যক্তির কাছে আমার পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন।

বিলেত থেকে ফিরে এসে আবার কাজে লাগলাম। খরচান্ত হয়ে ফিরেছিলাম। চুপচাপ তাই কাজে লেগেছিলাম। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ বিকানীর থেকে Col Hakshar আমায় চিঠি লিখলেন। তাঁর সঙ্গে আমার গোয়ালিয়র থাকতে আলাপ হয়েছিল। তিনি বিকানীরের প্রাইম মিনিষ্টার হয়ে গিয়েছিলেন। বিকানীরের মিউজিয়ম ও আর্ট ইনষ্টিটিউটের জন্য প্রিন্সিপ্যাল ও কিউরেটরের কাজ আমি নিতে রাজি আছি কিনা জিজ্ঞাসা করে তিনি চিঠিখানা লিখেছিলেন। মাহিনা যা দেবেন বলেছিলেন, সেটা দুন স্কুলের কাজের মাহিনার চেয়েও বেশী। সেই কারণে সেই দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয়েছিল। ফুট সাহেবকে এ বিষয় জানালাম। তিনি বিমর্ষ হলেন। বললেন—"তোমাকে বাধা দেবার অধিকার ত আমার নেই, তবে আমার মনে হয় তুমি টেটে কাজ করে সুখী হবে না। সব চেয়ে ভাল,—তুমি বিকানীর ঘুরে স্বচক্ষে সব কিছু আগে দেখে এস। তারপর মনস্থির কর।" গেলাম বিকানীর। সব দেখে শুনে সত্যিই মন সায় দিল না। ফিরে এসে ফুট সাহেবকে বললাম, শুনে তিনি খুশী হলেন। সেই সময় মাষ্টারস্‌ কমনরুমে আমার ছবির প্রদর্শনী করেছিলাম। তিনি দু'খানা ছবি কিনলেন খুশী হয়ে।

বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে গরমের ছুটিতে গিয়েছিলাম নৈনিতালে। ফিরলাম যখন, ফুট সাহেব নিজের খরচায় বেশ বড় একটা পার্টি দিয়েছিলেন। বিয়েতে আমার বাড়ীর কেউ যোগ দিতে আসতে পারেন নি। ফুট সাহেব সে সময় আমার পাশে থেকে বড় ভাইয়ের মত সব বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন। তারপর স্ত্রী-বিয়োগের সময় তাঁর আন্তরিকতায় তিনি আমায় চিরঋণী করে রেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে সে সময় যে রকম আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েছি তার খবর অনেকেই জানেন না। শুধু আমাকেই নয়,—আমার মত অনেকেরই রোগে-শোকে, বিপদে প্রাণপণে তাঁকে সাহায্য করতে দেখেছি। ফুট সাহেবের মধ্যে যথার্থ পাদরীর ভাব একটা ছিল, যদিও তাঁর বাইরের শক্ত ও সবল আচরণে সেটা সকলের নজরে পড়ত না।

মেদিনীপুরের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় ফুট নিজে দু'তিন বার ছুটিতে ছেলেদের নিয়ে অক্লান্ত ভাবে রিলিফের কাজ করেছেন। তাঁরই উৎসাহে আমিও একবার দুন স্কুলের ছাত্রদের রিলিফ পার্টির সঙ্গে মেদিনীপুর, কাঁথি ও জনপুট গ্রামে সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম। একদিকে তিনি যেমন সেবাপরায়ণ ছিলেন, অন্য দিকে তাঁর বজ্রকঠোর ব্যবহারে অনেকে স্তম্ভিত হয়ে যেত। ছেলেরা পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি বিধান করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

একবার একটি মাষ্টার, তাঁর ভাইয়ের অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি নিয়ে বন্ধুর বিয়েতে তিন-চার দিনের জন্য লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন। কথাটা ফুট সাহেবের গোচর হলে মাষ্টারটিকে ক্ষমা করতে পারেন নি। তৎক্ষণাৎ মাষ্টারটিকে স্কুল থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে যেতে বলেন, এবং পরে তাকে অন্য জায়গায় কাজে ঢোকাবার চেষ্টা করেন। মাষ্টারের কাজে মানুষকে wrecklessly truthful and honest থাকতে হবে সর্বদা তিনি বলতেন। চার শ' জোড়া চোখ (স্কুলে তখন চার শ' ছাত্র) সব সময় আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তা ভুললে চলবে না।

এই মাষ্টারটি সম্পর্কে আমার সঙ্গে ফুট সাহেবের অনেক তর্কবিতর্ক হয়। মাষ্টারটি অন্যায় করেছিলেন তা আমি পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করি, কিন্তু দোষগুণ নিয়ে মানুষ। মাষ্টারটির অনেক সদ্‌গুণও ছিল সে কথাও অস্বীকার করতে পারা যায় না। তা ছাড়া আমার বক্তব্য ও জিজ্ঞাস্য ছিল —ভদ্রলোক কেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন? ফুট সাহেবকে স্বীকার করতেই হয়েছিল যে ভীতিই তার প্রধান কারণ। মাষ্টারটি ফুট সাহেবকে ভয় করত এবং তিনি যে বন্ধুর বিয়েতে ছুটি দেবেন না তাঁর ধারণা জন্মেছিল। ফুট সাহেবের বাইরের কঠিন আবরণের ভেতরে কোথাও যে কোমল অংশ আছে তা মাষ্টারটির জানা ছিল না। আমি ফুট সাহেবকে বলেছিলাম, যদি তিনি মাষ্টারটিকে ক্ষমা করতেন ও নতুন উদ্যমে কাজে লাগতে বলতেন, তবে কি সেটা খুব অসঙ্গত হত? ফুট সাহেব একথায় হেসে বলেছিলেন—'তা হলে লোকে আমায় দুর্ব্বল মনে করত এবং পরে অনেকে হয়ত এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিত।' আমি অবশ্য তাঁর এই উত্তরে সায় দেই নি। বলেছিলাম, 'আপনার নিজের মন দুর্ব্বল, সেই কারণে আপনি

মাষ্টারটিকে ক্ষমা করতে পারেন নি। যদি ক্ষমা করতে পারতেন তবে হয়ত ভদ্রলোকের জীবনটা বদলে দিতে পারতেন। মাষ্টারটি হয়ত চিরজীবন বিশ্বস্ত 'কোলিগ' হয়ে কাজ করত আপনার সঙ্গে।" ফুট সাহেব আমার কথা খানিকটা মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু তবুও হেসে বলেছিলেন, 'হয়ত তা হতে পারত, অস্বীকার করি না, কিন্তু নাও হতে পারত।"

আলমোড়ায়

১৯৪১ সালের গরমের ছুটিতে ফুট সাহেব ও তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে আলমোড়ায় গিয়েছিলেন। আমি দেরাদুনেই ছিলাম। স্ত্রীবিয়োগের পর মনটা ভাল না থাকায় ছুটিতে কোথাও যাই নি। আলমোড়া থেকে বার বার আমাদের চিঠি লিখে তিনি সেখানে আসতে বলেন। পরে অকৃতকার্য্য হয়ে সালেম আলী যখন আলমোড়া যান তখন তাঁকে বলেন আমাকে ধরে নিয়ে আসতে। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলমোড়ায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে থাকি কিছুদিন। সেই সময় তাঁরা নানান উপায়ে আমাকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতেন।

বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের 'কালচার সেণ্টার' তখন আলমোড়ায় পুরোদমে চলছিল। প্রায়ই আমরা সেখানে গিয়ে নাচের ক্লাসে বসে নাচ দেখতাম। বিদেশী শিল্পী ব্রুষ্টার দম্পতী তখন আলমোড়ায় ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। বহুদিন তাঁদের কাছে গিয়ে শিল্পচর্চ্চায় আমাদের সময় কাটত। আলমোড়ায় সেই ছুটির দিনগুলি আমার আবার নূতন জীবন এনে দিয়েছিল। তার জন্য আমি ফুট সাহেবের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।—৪২ সালের জুলাই মাসে যখন দেশে দুর্দ্দিন, চারিদিকে ধরপাকড়, সেই সময় ফুটসাহেব স্ত্রী-পুত্রদের আবার আলমোড়ায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজে দেরাদুনে থেকে যান। সে ছুটিতে আমিও কোথাও যাই নি। ফুট সাহেব সে সময় আমার বাড়ীতেই অতিথি হন। সে সময় দেশের পলিটিক্যাল ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার তুমুল আলোচনা চলত। বিকেলে চায়ের পর আমরা প্রায়ই বেড়াতে বের হতাম। কখনও কখনও প্রেমনগরে 'ইনটারনী ক্যাম্পে' কনসার্ট শুনতে যেতাম। জর্ম্মন কয়েদীরা সেখানে থাকত। সংখ্যায় চার পাঁচ হাজারের কম নয় তারা। তারাই কনসার্ট 'অরগ্যানাইজ' করত। বিখ্যাত জর্ম্মন গায়কদের সুর তারা কনসার্টে বাজাত।

অনুকূল বাতাসে বা অল্প প্রতিকূল বাতাসে সংস্কারের পাল তুলিয়া জীবনস্রোতে ভাসিয়া যাইতে অধার্ম্মিক লোকেও পারে, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে সকল বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া শক্ত হাতে হাল ধরিয়া থাকা কেবল প্রকৃত ধার্ম্মিকের পক্ষে সম্ভবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৩

ভারতে স্থপতির ধর্ম ও আদর্শ

শ্রীগোবিন্দ মোদক

প্রাণীজীবনের প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। তার পর প্রশ্ন আসে আশ্রয়ের। স্থাপত্য শতধারূপে আমাদের সে প্রয়োজনটি অনন্ত অতীত থেকে মিটিয়ে আসছে। শুধু আশ্রয় নয়—জীবনশক্তির ধারাকে অব্যাহত রাখতে নয়, আমাদের শিল্পীসত্তার পূর্ণবিকাশে, এমনকি মননশক্তির প্রস্ফুটনে স্থাপত্য যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তা অনস্বীকার্য্য।

"It is the mother of all arts"। "It is abstract of all the arts. It is the art of organising space not only functionally, but also beautifully."

স্থপতি এই শিল্পের স্রষ্টিকর্তা। কল্পলোকের মূর্তি লাবণ্যসুষমাময় করার এবং তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পুরোহিত—স্থপতি। স্থপতির এই ধর্ম নানারূপে, নব নব ভঙ্গিমায়, বিচিত্র বর্ণসুষমায় কালান্তরে উদ্ভাস্থ্য হয়ে প্রচারিত হয়েছে ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমের প্রান্তবিন্দু পর্যন্ত। ভারতীয় স্থপতির সে মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বসভ্যতার উষালগ্ন থেকে। মহান ভারতীয় স্থাপত্যের অম্লানসুন্দররূপের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারতীয় স্থপতির হৃদয়ের অন্তঃস্থলে একান্ত দিব্যরূপে।

ভারতীয় স্থপতিরা কি প্রকৃতই কোন 'মহান স্থাপত্যে'র স্থষ্টি করেছেন অতীতে? তাঁরা কি যথার্থরূপে স্থপতির 'ধর্ম' অর্থাৎ 'কর্তব্য' পালন করেছেন নিষ্ঠাভাবে? আধুনিককালের ভারতীয় স্থপতিরাও বা সে পথে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন, এ প্রবন্ধে তারই আলোচনা।

'মহান স্থাপত্য' কাকে বলব? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে নীচের বিষয়গুলির বিবেচনা প্রয়োজন। (১) ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে কি না। (২) মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে কি না। (৩) সৌন্দর্যের তৃষ্ণা-বাড়িয়ে দেয় কি না এবং সৌন্দর্যের প্রতি কোন আকুতি জাগায় কি না। (৪) যথাযোগ্য স্থানে মালমশলার সার্থক প্রয়োগ হয়েছে কি না। (৫) স্কুল স্কুলের মতই, হাসপাতাল হাসপাতালের মতই, দুর্গ দুর্গের মতই, বসতবাড়ী বসতবাড়ীর মতই প্রভৃতি দেখতে হয়েছে কি না। যদি কোন স্থাপত্যে এ সবেরই সন্ধান পাওয়া যায়, তা হ'লে বুঝতে হবে স্থপতির ব্রত, স্থপতির ধর্ম—আদর্শ সার্থক ও সফল হয়েছে; সৃষ্টি হয়েছে মহান স্থাপত্যকলার।

প্রাচীন ভারতে স্থপতির ধর্ম ও আদর্শ :

সুপ্রাচীনকাল থেকে ক্ল্যাসিক্যাল যুগ পর্যন্ত ভারতীয় স্থাপত্য নানা বর্ণ ও ভঙ্গিমায় প্রস্ফুটিত রূপ নিয়ে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন ভারতের স্থপতিদের সৃষ্টির প্রতি আমাদের প্রথম অভিযোগ আসে বৈচিত্রের অভাব নিয়ে। দেশে ও বিদেশে এই অভিযোগও আছে, ভারতীয় স্থাপত্যে চূড়ান্ত অলঙ্করণ ও তার অপপ্রয়োগ রয়েছে। অর্থাৎ স্থপতিরা পুনরাবৃত্তি ও অতি-অলঙ্করণ প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁদের সৃষ্টি সে কারণে অপ্রয়োজনের সঙ্গে সখ্যতা করেছে যথার্থ যথার্থ রূপের আরাধনা থেকে দূরে সরে গিয়ে। স্থপতির ধর্ম থেকে তাঁরা বিচ্যুত হয়েছেন। কিন্তু এ অভিযোগ যথার্থ নয়। প্রথম যুগের সৃষ্ট মন্দিরগাত্রে আমরা খুব কম অলঙ্করণই দেখতে পাই। ক্ল্যাসিক্যাল যুগে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিমিত ভাস্কর্য ও অন্যান্য অলঙ্করণ প্রয়োগ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে স্থপতি অতি-অলঙ্করণের মাধ্যমে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। কিন্তু এই ভুল তাঁরা বুঝেছেন এবং তারই ফলস্বরূপ আমরা তাঁদের আবার পরিমিতির মধ্যে ফিরে আসতে দেখি। তবে প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা যেতে পারে যে, সে সময় হিন্দুধর্মের মর্মবাণী জনসাধারণের মাঝে প্রাঞ্জলরূপে ব্যাখ্যানের ভার পড়েছিল স্থপতিদের ওপর ও তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন স্থাপত্যে ঐ অলঙ্করণের মধ্যে। প্রাচীন ভারতীয় স্থপতিদের শুদ্ধধর্মাচরণের প্রমাণ দেবে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত প্রাচীন ভারতের মন্দির স্থাপত্য ও পৌরস্থাপত্যের নিদর্শনসমূহ।

গুহামন্দির

সৌন্দর্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের গুহামন্দির ও আশ্রমসৌধে 'space'কে সুষ্ঠুভাবে 'organise' করা হয়েছে। গুহাস্থাপত্যের ক্রমবিকাশ সারল্য থেকে বিভূতির পথে। লোমশ ঋষি গুহা

'লোমশ ঋষি গুহা'—বারাবার পর্বত (বিহার)

(অশোক যুগ) কানহেরী মন্দির, কার্লে গুহামন্দির প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে ভাস্কর্য অলঙ্করণ অতি নিপুণভাবে সারল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সঙ্কীর্ণতায় ঘেরা হৃদয়কে মহত্ত্বের প্রতি উদ্বোধিত করার যে প্রয়োজনে মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল, এই স্থাপত্যে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

স্তূপ ও মঠ-সঙ্ঘারাম

পৃথিবীর স্থাপত্যের ইতিহাসে স্তূপের গঠনভঙ্গিমা অনন্য। "It is a glorified, beautiful, enlarged funeral mounds"। চৌক বা বৃত্তাকার ভিত্তির ওপর চতুর্দিকে রেলিংঘেরা এবং উপরে ছত্র লাগান স্তূপগঠন পরিকল্পনা সর্বসার্থক। এখানেও 'space'কে নিপুণভাবে 'organise' করা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রয়েছে বারহুত, অমরাবতী, নাগার্জুনকুণ্ডাতে।

"We must admit that the stupas which stand out against the sky, give a splendid contrast between plain and ornate surfaces." ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত দ্বিতল সন্ন্যাসী নিকেতনটি এর এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রথম যুগের দ্রাবিড় মন্দির

দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যকলা ভারতীয় স্থপতিদের এক মহত্তম অবদান। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের আকৃতিভঙ্গীমার সম্পূর্ণ নূতনতম, সৃষ্টিপ্রচেষ্টা এখানে সার্থক সুন্দর। উত্তর ভারতের স্থাপত্যকলা থেকে স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় গঠিত হয়েও স্থপতির প্রতিভার স্পর্শে এই স্থাপত্যকলা প্রোজ্জ্বল। দক্ষিণ ভারতের শুধু

দ্রৌপদীর রথ—মামল্লপুরম (মাদ্রাজের কাছে)

দ্রৌপদীর রথ মন্দিরের আলোচনাতেই বোঝা যাবে স্থপতি কেমন নিপুণভাবে সহজের মধ্যে নূতনত্বের ও সৌন্দর্যের সমন্বয় করেছেন একই সঙ্গে। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এই ছাদের পরিকল্পনা যুগপৎ ব্যবহারিক ও সৌন্দর্যের দিকে অতুলনীয়। অলঙ্কারের স্বল্পতম ব্যবহারে, কেবলমাত্র গঠনসৌকুমার্যেই স্থাপত্য যে কত মোহনীয় হ'তে পারে, স্থপতি তা আমাদের দেখালেন। স্থপতির প্রতিভার স্পর্শে, সারল্যের অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে আর যেসব মন্দির 'Great Architecture' হিসেবে আমাদের বিস্মিত করে আজও দাঁড়িয়ে আছে, তা হচ্ছে—'অর্জুন রথ', 'ধর্মরাজার রথ', 'মামল্লপুরের মন্দির'।

মধ্য্যা মন্দির

ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের স্থাপত্যরীতির কোন প্রভাব না নিয়েও সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে পরিকল্পিত উড়িষ্যার অনেক স্থাপত্যে ভারত আত্মার মর্মবাণী অনুরণিত হচ্ছে। ভুবনেশ্বরে সরকারী যাদুঘরে রাখা গুপ্তযুগের স্তম্ভটির মত অনেক স্থাপত্যেই স্থপতি সার্থক ভাবে অতিঅলঙ্করণের দিকে ঝুঁকে পড়েন নি। সালঙ্কৃত স্থাপত্যেও স্থপতি আমাদের এক ঐশ্বরিক আনন্দলাভের দিকে নিয়ে গেছেন। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য শুধু দৃষ্টি-সুখ অলঙ্করণের জন্য নয়, অতি-প্রাঞ্জলরূপে ভারতীয় দর্শনের মর্মবাণী অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে উন্মোচিত করেছে। এখানেই স্থপতির ধর্ম, স্থপতির কর্তব্য সার্থক।

পরবর্তীযুগের দ্রাবিড় মন্দির

মন্দির-সংলগ্ন পুকুরের চারদিকে স্তম্ভসারিযুক্ত পথ, স্থপতির প্রতিভার একদিকে যেমন ব্যবহারিক দিকে কার্যকরী হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রশান্ত, গম্ভীর রূপ-রেখায় অপরূপ হয়ে উঠেছে। এখানকার মন্দিররাজির মধ্যে 'অন্ধকার'-এর সৃষ্টি 'ভয়'কেকেন্দ্র করে হয়েছে। ধর্মের এই মূলকথাটি স্থপতি প্রয়োগশিল্পের মাধ্যমে সুন্দররূপে প্রকাশ করেছেন। এখানে স্থপতির আর এক ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মকেন্দ্রিক এই প্রয়োগ পরিকল্পনা, স্থাপত্যশৈলী, স্থপতির শুভ কর্তব্যবোধের পরিচয়।

প্রাক্‌মোগল ও মোগল স্থাপত্য

ভারতের পশ্চিম দেশ থেকে আফগান, তাতার, মোগল জাতির আগমনে ভারতে আর এক নব্যস্থাপত্য-শৈলীর সংযোজনা হয়েছে। ১৫শ শতাব্দীর আগে এই আক্রমণের ফলস্বরূপ কোন উল্লেখযোগ্য প্রাক্‌মোগল স্থাপত্যকলার সৃষ্টি এদেশে হয় নি। প্রাক্‌মোগল যুগের লাবণ্যময় অভূতপূর্ব এক স্থাপত্য সৃষ্টি—কুতুবমিনার। ঐস্লামিক স্থাপত্যকলার সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্যকলার এ এক মিলন। যেন যাবনিক ও হিন্দু সুর—ইমন ও কল্যাণ-রাগের সমন্বয়ে 'ইমনকল্যাণ'। শুধু অলঙ্করণই নয়, গঠন পরিকল্পনাতেও কুতুবমিনারে হিন্দু প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'corbelled arch'-এর কথা বলা যেতে পারে, যা হিন্দুস্থপতিরা প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে জেনেছিলেন। গিয়াসুদ্দিন তোঘলকের Tombটি দুরাক্রম্য করার প্রয়োজনেই যে-ভাবে হেলান দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছে, তাতে স্থপতির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতে হয়। আদম খাঁর Tombও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মোগল যুগে ভারতের স্থপতিরা প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রথম দৃষ্টি দিয়ে যে পূর্ণতার পথে এগিয়েছেন, যে নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। 'ট্রাকচারে' যে ছন্দ, কাব্যরূপ, খিলান-দেওয়া তোরণ, পথ যে সুষমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা সবদিক দিয়ে অপূর্ব। মহৎ স্থাপত্য বলতে যা বোঝায়, মোগল স্থাপত্যে তার সুপরিচয় রয়েছে। শুধু ফতেপুর সিক্রিই যে মৌলিকত্ব, যে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে তা সহজে বিশ্বে কোথাও দেখা যায় না। এখানে প্রতিটি গৃহই বৈচিত্র্যময়। প্রতিটি গৃহেই স্থপতি স্রষ্টা হিসেবে, শিল্পী হিসেবে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। 'পাঁচমহলে' স্থপতি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তা আজও দুর্লভ। প্রয়োজনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে কত সহজে 'মহৎ স্থাপত্য' হতে পারে, এ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রথম ও পরবর্তীযুগের পৌরস্থাপত্য—

ভারতীয় স্থপতি শুধু মন্দির স্থাপত্যকেই নানা বৈচিত্র্যে প্রাণবন্ত করেন নি, গৃহস্থাপত্য ও নগরপরিকল্পনাতেও তাঁরা সুন্দরের পথে, সার্থকতার পথে এগিয়েছেন। প্রাচীন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতায় স্থপতি প্রয়োজনের সঙ্গে সৌকুমার্যের যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন তা বিস্ময়কর। নগর পরিকল্পনা অপূর্ব। পথ ও শহরের নর্দমা যেভাবে ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি দিয়ে সুগঠিত ও প্রশস্ত করা হয়েছে, তা স্থপতির প্রজ্ঞার স্বাক্ষর। স্থপতি অপরূপ 'স্নানাগার' নির্মাণ করেছেন প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই। বহিরাগত আর্যদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় পরবর্তী কালের কোন গৃহস্থাপত্যের পরিচয় নেই, কিন্তু পাথরের খোদাই অনেক চিত্র থেকে তদানীন্তন-কালের গৃহস্থাপত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা তখনকার কালে অপ্রত্যাশিত ও অভিনব। গৃহ মাটি,

'প্রাচীন গৃহ'—(বারহুত স্তূপের রেলিং-এ রিলিফ কাজ থেকে চিত্রিত)
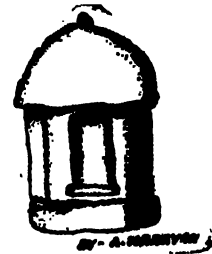
বাঁকান বাঁশ ও খিলান আকৃতির 'ধাম' দিয়ে তৈরী হয়েছে। মাথা ছাওয়া হয়েছে খড় বা পাতা দিয়ে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, স্থপতি সহজপ্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করে কেমন ভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। আরও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, অধুনা অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত স্থপতিরা কম খরচ ও সৌন্দর্যের জন্য অনুরূপ স্থাপত্যকলার প্রয়োগ করছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তাঞ্চলে আজও। "The structures which existed in Gupta period, undoubtedly be considered as masterpiece for 'organising space' with beauty and convenience." ইল্লোরা ও নালন্দায় গৃহস্থাপত্য নির্মাণে স্থপতি ব্যবহারিক প্রয়োজনের ওপর দৃষ্টি দিয়েও অপরূপ করে তুলেছেন শুভকর্তব্যবোধে। এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচীন স্থপতিরা সহজলভ্য দ্রব্য, ব্যবহারিক সুবিধা (জলবায়ুর ওপর নির্ভর ক'রে) ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বাংলা, গুজরাট, জৌনপুর, গোলকুণ্ডা ও অন্যান্য অংশে যে স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন স্থাপত্যশৈলীর সৃষ্টি করেছেন, তা প্রকৃত মহান বলে আজও সর্বত্র অব্যাহত। আধুনিক স্থপতিরা ভারতে 'বাংলো' ধরনের যে গৃহনির্মাণ করেন, তা আকবরের আমলেই সৃষ্ট হয়েছে। প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থপতি আকবরের বাসগৃহ ও তাঁর কক্ষসমূহ এমনরূপে ও এমন স্থানে গঠন করেছিলেন যে, তাতে সম্রাটের পক্ষে বাস করা সম্মানীয় ও সহজে মন্ত্রীদের ডেকে কাছে পাবার সুবিধা ছিল। সাধারণ বায়ু চলাচল, গরম বায়ু নিকাশন ও স্থানীয় জলবায়ুর উপর লক্ষ্য রেখে স্থপতি যে পরম রমণীয় স্থাপত্য সৃষ্টি করেছেন তা আজও অম্লান। শুধু দিল্লী বা আগ্রাতেই নয়, জয়পুরে স্থাপত্যবিশারদ শ্রীবিদ্যাধর ভট্টাচার্য গৃহস্থাপত্যে ও নগর-পরিকল্পনায় যে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন তা আজও শিক্ষণীয়। আবাসগৃহ ছাড়া অন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনেও ভারতীয় স্থপতিরা মহান স্থাপত্যকলার সৃষ্টি করেছেন ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। বারাণসীর স্নানঘাটগুলি প্রয়োজনকে যথাযথ মিটিয়েও সৌন্দর্যের জন্য ভারতের গৌরব বস্তু হয়ে আছে আজও। এখানকার অলঙ্কারগুলি যে প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে সংযোজিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সুন্দরের সৃষ্টি মানেই যে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য এ কথার মূর্ত প্রতিবাদ বারাণসীর ঘাটসমূহ। স্থপতি এখানে 'প্রয়োজনে'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েও 'সৌন্দর্য'কে বিসর্জন দেন নি কোথাও।

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই, কি মন্দির স্থাপত্য—কি গৃহ, বিদ্যায়তন ও পৌরস্থাপত্যসব কিছু 'Functionally correct'। মন্দিরগুলি এমনি ভাবে নির্মিত হয়েছে যাতে আঞ্চলিক পূজাপদ্ধতি ও শাস্ত্রানুযায়ী ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন সাধিত হয়। স্থপতি যথাযোগ্যস্থানে যথাযোগ্য দ্রব্যব্যবহার করেছেন অর্থাৎ কোন দ্রব্য দিয়ে সাধারণতঃ কোন 'False treatment' নেই। সর্বোপরি, তা ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটিয়েও রসিক সাধারণের নয়নলোভা হয়েছে। স্থপতির ধর্ম—রূপের আরাধনা করা, প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন করা, নব নব বৈচিত্র্যের সার্থক উদ্ভাবন করা এবং সহজলভ্য বস্তুর সার্থক প্রয়োগ করা। এসব বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে প্রাচীন ভারতে স্থপতির ধর্ম—কর্তব্য—আদর্শ সার্থকরূপে প্রতিপালিত হয়েছে।

আধুনিক ভারতে স্থপতির ধর্ম ও আদর্শ—

ইউরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে স্থাপত্যের ঐতিহ্যধারার প্রবাহ রুদ্ধ হয়েছে। স্থপতি প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন অতিমাত্রায়, সৌন্দর্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না দিয়ে। ইউরোপীয় যুগের প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় স্থপতিরা ভিক্টোরিয়া যুগের অন্ধ-অনুকৃত স্থাপত্য সৃষ্টি করেছেন ভারতের প্রধান শহরে শহরে। এমন কি নূতন দিল্লী গঠনের সময়েও ভারতের নব্যস্থপতিরা ৫০০০ হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যময় মহান ভারতীয় স্থাপত্যের কোন সাহায্য না নিয়ে 'Neo Roman Style'-এর আশ্রয় নিলেন। গায়ক, সাহিত্যিকদের মত স্থপতির আদর্শও ঐতিহ্য আশ্রয়ী না হ'লে কোন সৃষ্টি মহৎ সৃষ্টি'র সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। সে কারণে ইউরোপীয় যুগের প্রথম অধ্যায়ে স্থপতিরা বিদেশী শিল্পজ্ঞানকে মূলধন করায় প্রাথমিক ভাবে ধর্মচ্যুত হলেন; আদর্শচ্যুত হয়ে অর্থের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের নব নব অধ্যায়ে কিন্তু স্থপতি এক আদর্শকে কেন্দ্র করে অন্য আর এক আদর্শের সৃষ্টি করেছেন; রাজন্যবর্গের নির্দেশে ও তাঁদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদেরই নির্দেশমত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে, কিন্তু কোথাও স্বকীয়তা বিসর্জন দেন নি। স্থপতি কোথাও গোলামি করে আদর্শচ্যুত হন নি। কিন্তু ইউরোপীয় যুগে স্থপতিদের এই ধর্মচ্যুতির ফলস্বরূপ আমাদের এখনও এমন সব বাড়ীতে বাস করতে হচ্ছে যাতে বিশিষ্ট কোন স্থাপত্যশৈলীর ছাপ নেই, বা অসুন্দর

ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে অসুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বাড়ীগুলির নাম করা যেতে পারে—কলিকাতা টাউন হল (তাজমহল নির্মাণের প্রায় সমান খরচে নির্মিত), চুঁচুড়ায় ডাচদের আবাসিক নিবাস (বর্তমান চুঁচুড়া কোর্ট), রবার্ট ক্লাইভের অফিস বাড়ী (বর্তমান এ. জি. বেঙ্গল অফিস, কলকাতা), পি. ডব্লিউ. ডি-র কোয়ার্টার্স। নতুন দিল্লী গঠনের সময় স্থপতিরা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন বিদেশী ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হ'লে বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর প্রতিবাদ করেন। নতুন দিল্লী অন্ধ-অনুসৃত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মাণ করা যে নিতান্তই অনুচিত ও মহান ঐতিহ্যময় ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শ অনুসারে করা যে সঙ্গত, এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বুঝেছিলেন ও তুমুল প্রতিবাদ তুলেছিলেন—E.B. Haevel, Joseph King, M. P, J. Begg, F. R. I. B. A, George Bernard Shaw, William Rothenstein, Sir Bradford Lasely প্রভৃতি। এমন কি বিলাতের মর্নিং পোষ্ট, ২২শে জানুয়ারী, ১৯১৩ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে লিখলেন—

"That the imposition upon a country of a foreign style is bound to have a paralysing effect on its creative output.........tne truth of which we have ourselves proved upto the hilt by our own melancholy experience. Yet this is the action we meditate in regard to India."

ভারতীয় স্থপতিদের এই আদর্শচ্যুতির প্রতি তদানীন্তনকালের বিখ্যাত স্থপতিরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

ভারতীয় স্থপতিরা সে সতর্কবাণী গ্রাহ্য করেন নি আজও। সমকালীন ভারতীয় স্থপতিরা আদর্শচ্যুত হয়ে বর্তমানে বাহ্যিক অলঙ্করণের দিকে অকারণে ঝোঁক দিয়েছেন বিশেষ ভাবে। এই অনুকরণে তাঁরা এতই অন্ধ যে, বাংলা দেশে বাড়ীর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকেও বায়ু চলাচল রোধ করে প্রায় নিশ্ছিদ্র জালির কাজ বা পাতলা কংক্রীট-স্ল্যাব দিয়ে খোপের সারি বসাতে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। বাইরের দিকের জানলার চতুর্দিকে দু' ফুট চওড়া ও তিন ইঞ্চি পুরু কংক্রীট-স্ল্যাবের ফ্রেমের মধ্যে কোন্ যৌক্তিকতা খুঁজে পান আধুনিক স্থপতিরা? ভারতের মত দূর্যোতপ্ত দেশে পাশ্চাত্ত্য অনুকৃত বৃহৎ আয়তনের কাঁচের জানলা, কোন্ ব্যবহারিক প্রয়োজনে স্থপতিরা ব্যবহার করেন? এ ছাড়া এই আধুনিক স্থপতিকুল আবাসগৃহের বাইরের দিকে কোন বারান্দা না দিয়ে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে গৃহের অভ্যন্তরে খোলা জায়গা (বারান্দা) রাখার যে ব্যবস্থা করেন তাতে ব্যবহারিক জ্ঞানের দৈন্য ও অন্ধ অনুকরণের পরিচয় রয়েছে। এরা এত অক্ষম, চিন্তাহীন অনুকারী হয়ে পড়েছেন যে, রাইওডিজেনিরিওর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাড়ীটির বাহ্যিক স্থাপত্য রূপটি কলকাতার 'টেলিফোন ভবনে' হুবহু লাগাতে লজ্জাবোধ করেন না। এ ধরনের স্থাপত্যকলায় সৌন্দর্য, ব্যয়সংকোচ, বা প্রয়োজনীয়তার প্রতি কতটা লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা বিচার্য। অনেক সময় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যে ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্ন তুলে পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যের আদর্শ অনুকরণের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু জালির কাজে-ঘেরা ও লম্বা পাতলা অসংখ্য স্ল্যাব শোভিত পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যে কোথাও ব্যয়-সংকোচের লক্ষণ পাওয়া যায় না। এমন কি লে, কারবুশ্যে ও চণ্ডীগড় নির্মাণের সময়ে প্রাচীন ভারতীয় স্থপতিদের উদ্ভাবিত গৃহ ঠাণ্ডা রাখার স্থাপত্যকৌশল বিস্মৃত হয়েছেন। ভারতের ঐতিহ্য-আশ্রয়ী লম্বাবহির্বারান্দা ও চাজার কাছে তাঁর প্রয়োগ-করা 'Sunbreaker' ও 'large perforated screen' অনেক কম কার্যকরী। কারবুশ্যের মত আধুনিক ভারতীয় স্থপতিগোষ্ঠীও বিস্মৃত হয়েছেন যে, এই ধরণের স্থাপত্যে ময়লা সহজে জমে, পায়রা বাসা করে, মেরামতের খরচাকে অকারণ বাড়িয়ে দেয়। স্থাপত্যের গঠনভঙ্গিমা ছাড়াও আধুনিক স্থপতিরা স্থাপত্যে রং প্রয়োগ ব্যাপারে বিদেশের আদর্শ গ্রহণ করছেন অন্ধভাবে। মনের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে স্থাপত্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিগূঢ়; আর রং-এর বৈচিত্র্যময় সুষ্ঠু প্রয়োগ সে সম্বন্ধকে মধুরতম করে। কিন্তু অধুনা ভারতে স্থপতিরা সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে সর্বত্র অতি-উজ্জ্বল ও ঘোর বর্ণের রং-এর ব্যবহার করছেন। পাশ্চাত্ত্যের রৌদ্রহীন মেঘলা আবহাওয়ায় সে রং নির্বাচন যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু ভারতের মত প্রখর রৌদ্র-স্নাত দেশে ওরূপ চড়া রং-এর অন্ধ ব্যবহার নিতান্তই হাস্যকর। কলকাতার 'রবীন্দ্র স্মরণী' এর এক উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত।

সমকালীন স্থপতিরা অনেকে মনে করেন, আধুনিক যুগের জীবনধারাকে অগ্রাহ্য করে, স্বল্পতম আয়তনের ভূখণ্ডে অধিক সংখ্যক লোকের বাসস্থানের পরিকল্পনা বিস্মৃত হয়ে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক গৃহনির্মাণ কৌশলকে

অস্বীকার করে ভারতীয় ঐতিহ্য-আশ্রয়ী স্থাপত্যকলার আদর্শ অনুসরণ করা জাতির অগ্রগতির পরিচয় নয়—তাতে বরং আমরা বিশ্বপ্রগতির সঙ্গে তাল না রাখতে পেরে ক্রমশঃ অন্ধ সংস্কৃতিমোহে পশ্চাদ্‌মুখী হ'তে থাকব। এ প্রসঙ্গে তাঁরা আরও অভিযোগ করেন, বহুতলবিশিষ্ট কংক্রিটের সৌধ নির্মাণ যেখানে অনিবার্য সেখানে ভারতীয় ঐতিহ্য-আশ্রয়ী স্থাপত্যকলার প্রয়োগ কি করে সম্ভব। অর্থাৎ তাঁদের ধারণা, আমাদের দেশে বহুতল-বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ পরিকল্পনার কোন কারিজ্ঞান ও তদুপোযোগী সৌন্দর্য-সৃষ্টির রীতি-পদ্ধতির অভিজ্ঞতা কোন কালে ছিল না। কিন্তু ভারতের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র 'মানসার' এ সুউচ্চ সুন্দর গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা ও আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। "পুরাতনকে হুবহু পুনঃ-স্থাপনার কথা একেবারেই নয়। প্রাচীনের ভিত্তিতে, ভারতের প্রয়োজন ও আদর্শকে অবহেলা না করে, প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও সামাজিক পরিবেশকে বিচার করে, যুগোপযোগী বাসগৃহ, সর্বজনীন সৌধ-আবাস নির্মিত হলে সুস্থ-সবল, জাগ্রত, জীবন্ত জাতির পরিচায়ক হয়"—(ও. সি. গাঙ্গুলী)। আজকের ফরাসীরা তাঁদের স্থাপত্য ঐতিহ্য বিলুপ্তির আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন বিখ্যাত "মারে" (MARAIS) উৎসবের মধ্য দিয়ে। আজকের ফরাসীরা ভাবতে আরম্ভ করেছেন অন্তরভরে—যা শুধু প্যারিসেই পাওয়া যায়, যা দিয়ে প্যারিস হয়েছে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, সেই প্যারিসের স্থাপত্য ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে রাখতে। ফ্রান্সে স্থাপত্য ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা কয়েক বছর লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়াতেও সেই প্রচেষ্টা দেখতে পাই যুদ্ধের পর। ১৯৪৬ সালে পোল্যাণ্ডের ওয়ার্শ শহরকে ঐতিহ্য-আশ্রয়ী নতুন শহররূপে গড়ে তোলার তাঁদের কি আন্তরিক চেষ্টাই না দেখেছি। 'গ্রেট আর্কিটেকচার' কোনকালে পৃথিবীতে পরানুকরণে সৃষ্ট হয় নি। স্থাপত্যের মধ্যেই জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি-সভ্যতা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন গ্রীসে জ্যামিতিক পরিশীলনকে কার্যকরী করে গড়ে-তোলা মন্দিরগুলি তাঁদের গভীর মননশীলতার গাম্ভীর্যময় প্রতিচ্ছবি। রোমকদের খিলান, গোম্বুজের আকৃতি, সভাগৃহ, ক্রীড়াঙ্গন, স্নানাগার, উদ্যান ও উদ্যানগৃহ স্থপতিদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। বিরাট অগ্নিকাণ্ডের পর লণ্ডন শহরে রেনসাহেবের প্রতিভাস্মৃতি নিয়ে যে নতুন গৃহগুলি আজও দাঁড়িয়ে আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করছে তা ইংলণ্ডীয় স্থাপত্যেরই গৌরবজনক ঐতিহ্য-আশ্রয়ী নবতম সৃষ্টি। শীতের দেশের শহর আধুনিক বার্লিন ও লণ্ডনে অরণ্য আছে। শীতের রিক্ত পরিবেশের ভূমিশোভা অটুট রাখার এ এক ঐতিহ্য-আশ্রয়ী স্থাপত্যকলা। আমরা এই ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে, প্রয়োজনের কথা অগ্রাহ্য করে, পারিপার্শ্বিকতার কথা বিবেচনা না করে নিছক সাহেবী হওয়ার মোহে কারখানার মত বাড়ী ও তার পরিবেশ রচনা করছি, তা অক্ষমতার পরিচয়। ভারতীয় স্থপতিরা আজ সৃজনশক্তি হারিয়েছেন। তাই পাশ্চাত্য স্থাপত্যকলার পিঠে ভর দিয়ে না দাঁড়ালে আর তাঁদের উপায় থাকে না। আর এই লজ্জা ঢাকার জন্যেই তাঁরা প্রাচীনের সব কিছুর প্রতি অবাস্তবতার, আধুনিক প্রয়োজন ও সারল্যের ধুয়া তুলেছেন—পাশ্চাত্ত্যের কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন। তাই ভারতীয় সমকালীন স্থপতিদের স্মরণ রাখা উচিত, "স্থাপত্যে অলঙ্করণ নিতান্তই গৌণ, কাংশন বা প্রয়োগ সৌকর্যই প্রধান গুণ"—কারবুশ্যের এই মত অভ্রান্ত সত্য নয়। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে স্থাপত্যের দিক নির্ণয়ে যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে তাও বর্তমান ভারতীয় স্থপতিদের জানা কর্তব্য। প্রাচীন ভারতের স্থপতিদের অনুসৃত স্থাপত্যরীতি প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমেরিকার অন্যতম পথিকৃৎ স্থপতি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট স্থাপত্যে প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্যের কথা বিবেচনা করা অপরিহার্য মনে করেন। স্থাপত্যে আধুনিক রুচি অনুযায়ী সুন্দ মণ্ডন তিনি নিতান্তই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। প্রাচীনের ভিত্তিতে নূতনের সৃষ্টিই ভারতীয় স্থপতির ধর্ম, অনুকরণের নয়। "অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় আর কিছুই নেই, কিন্তু অন্ধ অনুকরণ আত্মঘাতী"—(বঙ্কিমচন্দ্র)।

"The religion of Indian Architect was not to extract beauty from nature, but to reveal the life within life, the reality within unreality, the soul within matter"—(Srish Ch. Chatterjee) এ কথা বোঝার আজ আমাদের সময় এসেছে। স্বধর্মাচরণ ব্যতীত কোন মহৎ স্থাপত্যের সৃষ্টি হ'তে পারে না। ভারতীয় আধুনিক স্থপতিরা এ চিন্তা থেকে বহু দূরে সরে এসেছেন আজ। তাঁরা তাঁদের যথার্থ ধর্ম—আদর্শ ও কর্তব্য থেকে বহু দূরে সরে এসেছেন। তারই ফলস্বরূপ আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, টি-বোর্ডের বাড়ী, অবন মহল, এসিয়াটিক সোসাইটি, রবীন্দ্র স্মরণী, টেলিফোন ভবন, বাসন্তী দেবী কলেজের মত অসার্থক ও অসুন্দর স্থাপত্য-সৌধকে আমাদের

সমাজের মাঝে প্রতিষ্ঠা হতে দেখছি। স্থাপত্য ছাড়া শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা অন্ধ অনুকরণে যে ফসল ফলাচ্ছি সে প্রবণতার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন সম্প্রতিকালের বিদগ্ধ বিদেশী পণ্ডিতরা। কয়েক বছর আগে মেক্সিকোর পয়লা নম্বর শিল্পী আলফেরো সিকিরস কলকাতায় এসে বললেন—"ভারতের সব শিল্পের ঐতিহ্য মহান, সেই ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় বর্তমানকালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভারতীয় সমকালীন শিল্পীরা যদি শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন, তবেই তা হবে সার্থক সৃষ্টি।" রাসকিন বলেছেন—"ভারতের স্থাপত্যের আদর্শ এখনও অনির্বাপিত অগ্নিশিখার ন্যায় আহিত আছে, এখন পুরাতন হ'লেও তা জাগ্রত, জীবন্ত ও নূতন...আমি মনে করি স্থাপত্য শীর্ষস্থান অধিকার করে অগ্রদূত না হলে সমস্ত শিল্পই দুর্বল হয়ে পড়বে। এটা সম্ভব কি অসম্ভব সে প্রশ্ন ওঠে না। সম্ভব না হ'লে সমস্তরূপ বিদ্যা ছেড়ে দেওয়া ভাল। শুধু তাতে সময় ও অর্থ নষ্ট হবে এবং যদি শতবর্ষব্যাপী চেষ্টা হয় বা অগণিত অর্থব্যয় হয় তবুও তাতে খাঁটি কিছু হবে না।" এই সেদিন বিখ্যাত পোলিশ চলচ্চিত্র শিল্প সমালোচক জেঝি তোয়েপলিৎজ আমাদের শিল্পীদের ধর্ম ও আদর্শের দিক নির্ণয় উপলক্ষ্যে বললেন, "ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রচলিত ধারার পরিবর্তন প্রয়োজন। চিত্রায়ণ যদি ভারতীয় ভাবধারার সাথে একতালে হয়, তা হ'লে ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশ্বজনীন খ্যাতি অর্জন করবে।" হিন্দী ছবি সম্বন্ধে বলেন, ইহা ভারতীয় হলেও জাতীয় নয়। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও আমাদের এই সব অভিমত গ্রহণীয়। স্থপতির আদর্শ জাতীয় হওয়া চাই। প্রসিদ্ধ রুশ সমালোচক সেমিয়ন ত্যুলায়েভও তাই বলছেন—"ঐতিহ্যকে, ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার ও বর্জন করে কোনও নতুন সৃষ্টি কিংবা কোনও নতুন ঐশ্বর্য মহিমার আভাস দেওয়া শিল্পে (চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি) সম্ভবপর নয়।" যে সব স্থপতি বিজাতীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণে যুক্তি দেখান, তাঁদের প্রখ্যাত ইংরেজ কলা-সমালোচক হার্বার্ট রীডের মতামতও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলি। তিনি বলছেন—"বর্তমানকালে আধুনিকতার নামে যে সব কলাসৃষ্টি আমাদের স্বীকৃতির দাবি করছে, তার মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগ শিল্প (স্থাপত্য, চিত্র প্রভৃতি) কেবলমাত্র হুজুগের প্রেরণায় রচিত এবং গতানুগতিকতার অনুসরণ মাত্র। আর উহা একান্তরূপে তুচ্ছ, নগণ্য এবং নিষ্কর্মতার ফল।" (Studio—Jan, 1964)।

স্থপতিরা যখন কোন সুন্দর আদর্শকে নষ্ট করতে বসেন তখন তাঁরা দেশের যে কতদূর ক্ষতি করেন তা বলা যায় না। একটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের চেয়ে জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কাজ। ভারতবর্ষের স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে তত্ত্বভিত্তিক রূপ ও অলঙ্করণের অপূর্ব সমন্বয়ে। বর্তমানের যুগোপযোগী করে মহান ভারতীয় স্থাপত্যকে নূতনরূপে পরিকল্পিত করাই আধুনিক ভারতীয় স্থপতির ধর্ম ও আদর্শ। আধুনিক স্থপতিদের কর্তব্যপথ নির্ণয়ে আজ দরকার গভীর ও স্থির মনন ও দূরবিস্তারী স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের অতীত তার অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বর্তমান ও ভাবীকালের স্থপতি তাকে অবহেলা করে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণ করবে না তাকেই নতুন গৌরবে নবরূপে বরণ করে বিশ্বজনের কাছে তাঁদের এক নবতম মহান আদর্শের কথা ঘোষণা করবে তা আজ বর্তমান স্থপতিদেরই উত্তর দিতে হবে।

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

পরের শনিবার ঠিক তিনটের সময় নর্থ এভিনিউর বাড়ীটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ওঁরা এমনভাবে আমাকে রিসিভ করলেন যেন আমি ওঁদের কতকালের পুরাণো বন্ধু—বিনা কুণ্ঠায় এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আমি ওঁদের বাড়ীতে প্রবেশাধিকার পেলাম। পারস্পরিক একটা বিশ্বাসের ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ডিনারটাও খুব উপভোগ করে খাওয়া গেল। ব্যারন তাঁর বর্তমান চাকরিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাজা অলকারের নতুন শাসন-ধারায় একটি দল খুব বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ব্যারন ছিলেন এই দলের লোক। এর আগে কিং অলকারের দাদা যখন দেশের রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন অসম্ভব জনপ্রিয়। দাদার মৃত্যুর পর ছোটভাই সিংহাসনে বসলেন—কিন্তু দাদার জনপ্রিয়তায় তিনি মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করতেন। তাই রাজা হয়েই দাদা রাজ্য শাসনের জন্য যে সব পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সবের প্রতি অবহেলা দেখাতে লাগলেন। আগের আমলের রাজার বন্ধুরা, যাঁরা ছিলেন দিলখোলা—আমুদে শ্রেণীর লোক, সহনশীলতা এবং প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যাঁরা ছিলেন বিখ্যাত, তাঁরা নতুন রাজার সান্নিধ্য থেকে এবার দূরে সরে দাঁড়ালেন। পার্টি-পলিটিক্সে অবশ্য যোগ দিলেন না, কিন্তু এক ইণ্টালেকচুয়াল অপোজিশনের সৃষ্টি করলেন। অতীতের রাজনীতিক পরিবেশ নিয়ে ব্যারনের সঙ্গে আলোচনা করবার সময় অনুভব করলাম আমাদের দু'জনের একই ধরনের মতামত এবং মনোভাব—সুতরাং আমরা একে অন্যের অত্যন্ত কাছের মানুষ।

ব্যারনেস আসলে ফিনল্যাণ্ডের লোক, সুইডেনে নবাগত, সুতরাং এদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি এতটা অভিজ্ঞ নন যে, আমাদের কথাবার্তায় যোগ দেবেন। নৈশাহারের পর তিনি পিয়ানো বাজিয়ে আমাদের গান করে শোনালেন। ব্যারন এবং আমি সঙ্গীতের সমঝদার না হ'লেও এ গান সত্যিই অন্তর থেকে উপভোগ করলাম। এত তাড়াতাড়ি সময় কেটে যেতে লাগল, কি বলব।

অকস্মাৎ যেন আমাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল—এর ফলে অল্প সময়ের জন্য একটা অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। অতীতের বহু স্মৃতি এসে আমার মনটাকে ভারী করে তুলল; আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য কথা বলবার শক্তি হারিয়ে ফেললাম।

আপনার হ'ল কি? ব্যারনেস জিজ্ঞেস করলেন।

এ বাড়ীটায় প্রেতাত্মারা বসবাস করছে—আমার মনে হচ্ছে অনেকদিন আগে, বহুযুগ আগে, আমি নিজেও এখানে থাকতাম—সেই হিসাবে আমার আত্মার বয়সও কম হ'ল না। এই প্রেতাত্মাগুলোকে কি এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না? আমার দিকে মাদকতাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ব্যারনেস প্রশ্ন করলেন। তাঁর মুখে একটা মাতৃত্বের ভাবও ফুটে উঠেছিল এই সঙ্গে।

হেসে উঠে ব্যারন বললেন, সেটা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওঁর মনের ব্যথায় ভরা চিন্তাভাবনাগুলোকে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা শুধু একজনেরই আছে। আমার দিকে চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ চোখের ইঙ্গিত করলেন ব্যারন—তারপর প্রশ্ন

করলেন—সরলভাবে বলুন দেখি, আপনি আর মিস্ সেল্মা কি এন্‌গেজড হয়েছেন ?

এ আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ব্যারন। ওই মহিলার সঙ্গে এতাবৎ আমার যা ঘটেছে তাকে এক কথায় বলতে হয় লাভল লেবার লষ্ট।

সে কি ! তিনি কি অন্য কোথাও ধরা দিয়েছেন ? প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের কথাটা মুখভাব থেকে অনুমান করে নেবার চেষ্টা করলেন ব্যারন।

সহজভাবেই বললাম—উনি অন্যের বাক্‌দত্তা।

সত্যিই একথা জেনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। ওই মহিলার মত গুণী মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। আর আমি জোর করে বলতে পারি আসলে উনি আপনাকেই ভালবাসেন। এরপর আমরা তিনজন এক সঙ্গে মহিলার সেই বাকদত্ত অপেরা-সিঙ্গারকে প্রাণভরে গালাগাল দিলাম। আমাদের সবারই বক্তব্য ছিল এক—লোকটি ঐ মহিলাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করবার চেষ্টা করছে। ব্যারনেস আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এই কথাটা বারবার বলতে লাগলেন যে শেষ পর্যন্ত ওদের বিয়ে ভেঙে যাবে এবং সব গোলমালের অবসানে আবার আমি সেলমাকে ফিরে পাব। শুনলাম অল্পদিন বাদেই ব্যারনেস ফিনল্যাণ্ড যাচ্ছেন—ওখানে গিয়ে তিনি সেলমার কাছে আমার হয়ে ওকালতি করবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন। সেলমা অন্তর থেকে যে বিয়েতে রাজী নয়, কারও সাধ্য নেই তাকে জোর করে সে বিয়েতে রাজী করায়। এ বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন বললেন ব্যারনেস।

ফেরবার জন্য যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন সাতটা বাজে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী বারবার আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন সন্ধ্যাটা ওঁদের সঙ্গে কাটাবার জন্য। ওঁদের এই আগ্রহের আতিশয্যে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল এই দম্পতি বোধ হয় নিজেদের সঙ্গটাকে উপভোগ করতে পারেন না—একে অন্যের সান্নিধ্যে বোবড ফিল করেন। অবশ্য ওঁদের বিয়ে হয়েছে মাত্র তিন বছর এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে ওঁরা একটি কন্যা সন্তানও লাভ করেছেন। ওঁরা আমাকে জানালেন যে বাইরে থেকে ব্যারনেসের একজন কাজিন আসবার কথা—তাঁর সঙ্গে ওঁরা আমার আলাপ করিয়ে দেবেন এবং আমাকে পরে বলতে হবে মেয়েটিকে আমার কেমন লাগল। আমরা যখন এই সব কথা বলছি তখন ব্যারনের কাছে একটি চিঠি এল। খামটি ছিঁড়ে ফেলে, তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে নিয়ে, অস্ফুট মন্তব্যের সঙ্গে সেটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন ব্যারন। চিঠিটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ব্যারনেস মন্তব্য করলেন : "সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।" তারপর একবার প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে ফের বলতে সুরু করলেন : আমার নিজের কাজিন। অথচ তার বাবা-মা আমাদের বাড়ীতে তাকে থাকতে দিতে রাজী নয়, কারণ লোকে না কি এ নিয়ে কুৎসা রটাচ্ছে। এটা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার, ব্যারন মন্তব্য করলেন। মেয়েটিকে এখনও শিশুই বলা চলে, সুন্দর, নিষ্পাপ শিশু, নিজের বাড়ীতে কখনও সুখের মুখ দেখতে পায়নি, আমাদের এখানে থাকতে ওর ভাল লাগে, আর আমরা ত ওর অত্যন্ত নিকটাত্মীয়···তাই নিয়ে যে লোকে কি বলে কুৎসা রটায় ! সত্যিই এসব বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। এসব কথা শুনে আমার মুখে-চোখে একটা সন্দেহের হাসি ফুটে উঠেছিল কি না মনে নেই। সাপার খেয়ে ওদের বাড়ী থেকে বেরলাম, তখন প্রায় রাত দশটা। ওঁদের বাড়ী থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার সব ঘটনাবলী এসে আমার মনের কোনায় উঁকি দিতে লাগল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম বাইরে থেকে দেখে এদের দু'জনকে খুব ঘনিষ্ঠ মনে হ'লেও ভেতরে ভেতরে এঁরা ঠিক কপোত-কপোতীর মত সুখী দম্পতি নন। আজকে ওঁদের ওখানে যখন ছিলাম তখন ওঁদের দু'জনের চোখের চাহনি, ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্কতা, এসব আমার নজরে পড়েছে। কিছুই না শুনে এবং না জেনে আমি বেশ অনুভব করতে পারছিলাম যে এই দম্পতির অন্তরে একটা বিষাদের ভাব রয়েছে, এমন কিছু গোপন দিক আছে যা জানতে পারলে তৃতীয় ব্যক্তি ভয়ে শিউরে উঠবে।

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম কেন এঁরা এই বিশ্রী নির্জন সহরতলীতে এসে স্বেচ্ছায় এই নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন ? ব্যারনেসের কথাটাই বিশেষভাবে আমার মনকে আকর্ষণ করছিল। ওঁর চরিত্রে বহু বিপরীত ধরনের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ আমার চোখে পড়েছিল। কোমলহৃদয়া, মরমী অথচ আবার সময় সময় রূঢ়, উচ্ছল, সরলভাবে মনের কথা বলেন অথচ আবার সময় সময় গম্ভীর হয়ে যান এবং তখন মনে হয় তিনি অত্যন্ত নিষ্প্রাণ এবং উদাসীন। আবার এক এক সময় খুব সহজেই বিরক্তি বোধ করেন, এসব দেখে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল মহিলা অত্যন্ত খামখেয়ালী ধরনের—একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করে সেখানেই সব সময় বিচরণ করতে ভালবাসেন যেন। মহিলা যে বিশেষ বুদ্ধিমতী, একথা বললে কিন্তু ভুল বলা হবে, তবে লোকের মনের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি তাঁর আছে। তাঁর দেহের সুলমঞ্জস বিন্যাস আমার দেহমনে একটা মাদকতা এনে দিয়েছিল। তাঁর সর্ব অঙ্গে যেন ছন্দময়তার দীর্ঘ এবং

দুঃখ ঢেউগুলো শিহরণের সৃষ্টি করছিল ক্ষণে ক্ষণে। কখন কখন তাঁকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, আবার মাঝে মাঝে মুখভাব কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছিল. আবার অল্প পরেই সারামুখে এমন একটা প্রাণবন্ত উচ্ছলতার ভাব ফুটে উঠছিল যার স্পর্শ আমার আত্মিক সত্তাকে চঞ্চল করে তুলছিল।

ও বাড়ীতে যে সত্যিকার কর্তা কে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। স্বামীর পেশা সৈনিকবৃত্তি, আদেশ দিতেই তিনি অভ্যস্ত, কিন্তু শরীর তাঁর দুর্বল, মনে হ'ল এ গৃহে তাঁর ভূমিকা হচ্ছে আনুগত্যের, অবশ্য ইচ্ছাশক্তির অভাবে যে তিনি নিজেকে অবনমিত করেছেন তা নয়, মনে হয় সব বিষয়েই তিনি কেমন উদাসীন। তাঁরা দু'জনে দু'জনের বন্ধু—কিন্তু প্রেমিকের সম্পর্ক তাঁদের ভেতর গড়ে উঠতে পারে নি। আমার সঙ্গে সখ্যতা হওয়ায় তাঁরা যেন চেষ্টা করে তৃতীয় ব্যক্তির সামনে নতুন করে তাঁদের অতীত জীবনের প্রেমের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে আনন্দ পাবার চেষ্টা করছিলেন। এরপরে যখন ওঁদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হলাম, আমি বেশ বুঝতে পারলাম ওঁরা পূর্ব প্রেমের স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছেন, এখন নিজেদের সাহচর্যটা তাঁদের একঘেয়ে লাগে, এবং এই জন্যই এরপর ওঁরা বারবার আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন ওদের মাঝে—যাতে আমার উপস্থিতিতে ওই একঘেয়েমিটাকে এড়ানো সম্ভব হয়।

ব্যারনেসের ফিনল্যাণ্ড যাবার আগের সন্ধ্যায় তাঁকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে গেলাম। জুন মাসের এই সন্ধ্যাটি ছিল অত্যন্ত মনোরম। কোর্টইয়ার্ডে ঢুকেই আমার চোখে পড়ল যে বাগানের রেলিং এর পেছনে ব্যারনেস দাঁড়িয়ে আছেন। এরিসটোলোফিয়াস গুল্মের তলায় তাঁর অলৌকিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত মূর্তিটি দেখে ক্ষণেকের জন্য শিউরিয়ে উঠলাম। তাঁর পরনে ছিল সাদা কর্ডের সুতীর পোশাক, তাতে চমৎকার এমব্রয়ডারী করা। লতাগুলোর সবুজ পাতাগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছিল তাঁর ফ্যাকাশে মুখের উপর। তাঁর নিকষ কালো আঁখি তারকা দু'টি খুব উজল দেখাচ্ছিল।

আমি যেন প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলাম। মনে হ'তে লাগল এক অশরীরী দেবীমূর্তির অলৌকিক আবির্ভাব ঘটেছে আমার দৃষ্টিপথে। আমার সহজাত ভক্তি করবার প্রবৃত্তিটা—যেটা অনেকদিন ধরে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে গা ঢাকা দিয়ে ছিল—হঠাৎ জেগে উঠল। ভেতরে ভেতরে তীব্র ইচ্ছা হচ্ছিল মনের এই ভাবটা বাইরে প্রকাশ করতে। এক সময় আমার অন্তরের যে জায়গাটা ধর্মভাব দিয়ে ভরা ছিল, কিছুদিন থেকে সে স্থানটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। এই শূন্য স্থানটা অধিকার করে বসল নতুন ধরনের ভক্তি প্রকাশ করবার ব্যাকুলতা। ঈশ্বরকে সরিয়ে দিয়েছিলাম—তাঁর স্থান এসে অধিকার করল নারী। আমার মনে হ'তে লাগল এ নারী শুধুমাত্র একটি শুভ্র আত্মা—পবিত্র নিষ্পাপ আত্মা—এ যেন একই সঙ্গে কুমারী এবং মাতা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট মেয়েটি। আমি সেখানে দাঁড়িয়েই ব্যারনেসের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম এছাড়া আর আমার গতি ছিল না। তিনি যা ঠিক সেইভাবেই, অর্থাৎ সেই পরমক্ষণে তাঁকে আমি যে দৃষ্টিতে দেখেছিলাম, সেইভাবেই তাঁকে আমার পূজা নিবেদন করলাম। তাঁকে আমি দেখেছিলাম জননী রূপে, দেখেছিলাম বধূরূপে—অস্পষ্টভাবে অনুভব করছিলাম তিনি একজন বিশেষ লোকের বধূ; একটি বিশেষ শিশুর জননী। তাঁর অন্য কোন ধরনের পরিচয় পাবার এতটুকু ইচ্ছাও আমার মনে আসে নি। তাঁর স্বামীর অবর্তমানে তাঁকে পূজা করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাটা আমি কিছুতেই চরিতার্থ করতে পারতাম না—সে ক্ষেত্রে তিনি হতেন বিধবা এবং কোন বিধবাকে ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করছি এ কথা ঠিক ভাবতে পারি না। যদি তিনি আমার হতেন—আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতেন? ·····না। এ ধরনের চিন্তাও আমার পক্ষে ছিল অসহ্য। আর তা ছাড়া আমাকে বিয়ে করলে এই বিশেষ লোকের স্ত্রী হিসাবে এবং বিশেষ শিশুর জননী রূপে, আর এই বাড়ীর কর্ত্রী ভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন না। তিনি যা—ঠিক সেই ভাবেই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি, অন্য কোন ভাবে তাঁকে আমি দেখতে চাই নি।

কিন্তু কেন এ ধরনের চিন্তা আমার মনে আসছিল? এই বাড়ীটির পূর্বস্মৃতি আমার অতীত জীবনের দুঃখ-ভরা দিনগুলোর সঙ্গে জড়িত বলেই কি এসব চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল। অথবা আমার মত অতি সাধারণ স্তরের লোকের সমাজের উচ্চশ্রেণীর কারোকে দেখলে মনে যে সহজ শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে, এ কি তাই। (ষ্ট্রীনবার্গের মা ছিলেন বারমেড, সারাজীবন এটা তাঁর পক্ষে একটা অবসেশনের মত হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই ষ্ট্রীনবার্গ তাঁর আর একটি আত্মজীবনীমূলক বইয়ের নাম দিয়েছেন দি সান অভ্ এ সারভেণ্ট।)

এ ভাবটা হয়ত আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে যখন মহিলা নিজের উচ্চস্থান থেকে নেমে আসবেন। এর আগে ধর্মের প্রতি আমার যে একাগ্র অনুরাগ ছিল, তা আকর্ষণ করে নিলেন এই ব্যারনেস। আমি তাঁর কাছে নিজেকে

আহুতি দিতে চাইছিলাম, চাইছিলাম দুঃখ-বেদনা এবং শান্তি পেতে, কোন উচ্চাশা বা পুরস্কারের লোভ আমার ছিল না—আমি জানতাম আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আমি পাব আমার পূজার ভেতর দিয়ে, আত্মবিসর্জনের মহিমায় এবং শান্তির দাহিকাশক্তির দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধিতে।

ব্যারনেসের সঙ্গে দু' চারটে কথা হল। তিনি আমাকে বললেন অল্প সময়ের জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হচ্ছে। তবুও স্বামী এবং মেয়েটির থেকে দূরে থাকতে হবে এই চিন্তাটাই তাঁর পক্ষে অসহ হয়ে উঠেছে। আমাকে বারবার অনুরোধ জানালেন অবসর পেলেই যেন এঁদের কাছে চলে আসি এবং ফিনল্যাণ্ডে যতদিন তিনি থাকবেন তখন যেন তাঁকে ভুলে না যাই। আমাকে এই সান্ত্বনাও ব্যারনেস দিলেন যে ওখানে গিয়ে তিনি আমার স্বার্থসিদ্ধির দিকটাও দেখবেন। আপনি ত সেলমাকে খুবই ভালবাসেন—বোধ হয় সমস্ত অন্তর দিয়ে—কি বলেন? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের উপর দৃঢ়দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ব্যারনেস।

এ কথা কি আপনাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে? এই ভাবের মিথ্যা উত্তর দিয়ে মনটা কিন্তু বিষণ্ণতায় ভরে গেল। কারণ এখন একথা আমার নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল যে সেলমার সঙ্গে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল সে একটা ক্ষণস্থায়ী হালকা ধরনের ব্যাপার—নিছক সময় কাটাবার জন্যই যেন ওটার দরকার হয়েছিল। যাই হোক এই ধরনের আলোচনা এড়িয়ে যেতে চাইলাম। ভয় হ'ল ভাবাবেগের বশে কথায় কথায় ব্যারনেসের প্রতি আমার আসল মনোভাব ব্যক্ত হয়ে পড়তে পারে। জিজ্ঞেস করলাম তাঁর স্বামী কোথায়। ব্যারনেস মুখ তুলে আমার দিকে চাইলেন। হয়ত—অনেক পরে অবশ্য এ সন্দেহ আমার মনে এসেছিল—তিনি ভেতরে ভেতরে এই ভেবে আনন্দ পাচ্ছিলেন যে তাঁর সৌন্দর্য আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। এও হ'তে পারে সেই সময়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাকে তিনি নিজের ভয়াবহ শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছেন।

হাসতে হাসতে বললেন, আমার সঙ্গটা আপনার এক-ঘেয়ে লাগছে বুঝতে পারি নি। এরপর গলা তুলে স্পষ্টকণ্ঠে স্বামীকে ডাকলেন, ব্যারন সে সময় উপরের তলায় নিজের ঘরে ছিলেন। জানলা খুলে ব্যারন এসে তার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি। একটু বাদেই তিনি বাগানে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর পরনে ছিল গার্ডসদের সুন্দর ইউনিফর্ম, এই পোশাকে তাঁকে ভারি সম্ভ্রান্ত এবং সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বেশ আহারের পর ব্যারন প্রস্তাব করলেন যে, ষ্টীমারে আমরা পরের দিন ব্যারনেসের সঙ্গে শেষ কাস্টম স্টেশন অবধি যাব। আমি রাজী হওয়াতে ব্যারনেস খুবই খুশী হলেন বলে মনে হ'ল।

পরদিন রাত্রি দশটায় আমরা ষ্টীমারে এসে মিলিত হলাম, জাহাজ ছাড়তে অল্পই দেরি ছিল। সে রাত্রিটা বেশ পরিষ্কার ছিল, সারা আকাশ থেকে যেন কমলা রঙের আভা ফুটে বেরচ্ছিল। আমাদের সামনে নীল, শান্ত, নিস্তব্ধ সমুদ্র।

ধীরে ধীরে জাহাজটি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে চলল বনানীভূমির পাশ কাটিয়ে—দিনের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছিল কিন্তু তখনও অন্ধকার নামে নি। সারারাত্রি আমরা নানা গল্প-গুজবে কাটালাম। ইচ্ছে করেই ঘুমোলাম না, এর ফলে প্রত্যেকেই ক্রমশঃ সেন্টিমেণ্টাল হয়ে উঠলাম। আমাদের এই বন্ধুত্বটাকে চিরন্তনের স্তরে উঠিয়ে নিতে হবে এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছলাম। মনে হ'ল আমাদের ভবিতব্য যেন আমাদের তিনজনকে এক জায়গায় এনে মিলিয়েছেন—অস্পষ্টভাবে তখন থেকেই উপলব্ধি করছিলাম একটা ভয়াবহ বন্ধনে সারা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের তিন জনের জীবন বাঁধা পড়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম রাত্রি জাগরণের ফলে আমার চেহারাটা অত্যন্ত কদাকার দেখাচ্ছিল। এর কিছু আগে আমার ইণ্টারমিটেণ্ট ফিভার হয়েছিল—অসুখ সেরে গেলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারি নি এঁরা দু'জনে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছিলেন যেন আমি একটি অসুস্থ শিশু। ব্যারনেস তাঁর রাগটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন, আমাকে খানিকটা মদ্যপান করালেন এবং সমস্ত সময়টা একটা কোমলতাপূর্ণ মাতৃত্বের ভাব নিয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। আমি যেন নিজেকে এই দম্পতির হাতে ছেড়ে দিলাম। ঘুমের অভাবে প্রায় বিকারগ্রস্ত রুগীর মত আমার অবস্থাটা হয়ে উঠেছিল। আমার অন্তরের রুদ্ধ আবেগগুলো যেন ভেতরে ভেতরে উথলে উঠতে লাগল। কোন মহিলার কাছ থেকে কোমল সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার এর আগে আমি কখনও পাই নি। যাঁদের ভেতর মাতৃত্বের ভাব আছে শুধু সেই শ্রেণীর নারীর কাছ থেকেই এ ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমার অন্তর থেকে এই মহিলার প্রতি আমার শ্রদ্ধার বাণী এবং আনুগত্যের ভাবা প্রক্ষিপ্ত হতে লাগল, আসলে তখন ঘুমের অভাবে আমার মনটা অতিরিক্ত রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। আমার তখন মনে হচ্ছিল আমার মাথাটা যেন একেবারে হাল্কা হয়ে

গেছে—এর ফলে আমার কাব্যিক কল্পনাশক্তির রাশগুলোও যেন আলগা হয়ে পড়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনা বাধায় আমি কথা বলে চলেছিলাম। প্রেরণা পাচ্ছিলাম এক-জোড়া নিকষ কালো চোখের থেকে—যে চোখ দু'টি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল। আমি অনুভব করছিলাম আমার দুর্বল দেহ যেন আমার কল্পনার অগ্নুত্তাপে পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল। আমার দৈহিক অস্তিত্বের কথাটা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছিলাম।

সকাল তিনটে বাজল, এইবার আমাদের বিদায় নিতে হবে। জাহাজ এখন প্রায় আসল সমুদ্রবক্ষে পড়েছে। বড় বড় ব্রেকার্স গুলো পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে গুরু-গর্জনের সৃষ্টি করছিল।

জাহাজ কিছুক্ষণের জন্ত থামল। এবার আমাদের নামতে হবে। ব্যারন দম্পতি উভয়ে উভয়কে চুম্বন করলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল দু'জনের অন্তরটা উত্তেজিত এবং দুঃখভারে পীড়িত। ব্যারনেস আমার হাতটা নিজের দুই হাতের ভেতর নিয়ে গভীরভাবে এবং আবেগভরে চাপ দিলেন। তাঁর দুই চোখে জল টলটল করছে। স্বামীকে অনুরোধ করলেন আমার যত্ন নিতে, আর আমাকে আবেদন জানালেন তিনি বাইরে থাকার দিনগুলোতে এসে তাঁর স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্‌টায় চোখ রাখতে। আমি মাথা নুইয়ে তাঁর হাতে চুম্বন করলাম—এ চিন্তা একবারও মাথায় এল না এ কাজটা করা আমার ঠিক উচিত হচ্ছে কি না। ভুলে গেলাম যে আমার মনের গোপন চেহারাটা এদের সামনে এভাবে খুলে ধরছি। এরপর আমরা সিঁড়ি বেয়ে তীরে নেমে এলাম। জাহাজের রেলিংএর ধারে ব্যারনেস দাঁড়িয়ে রইলেন—আমরা নীচে। আস্তে আস্তে জাহাজের প্রপেলার চলতে সুরু করল—জাহাজটিও তীর ছেড়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল। ব্যারনেস জাহাজের ডেকের থেকে এবং আমরা দু'জন তীরে দাঁড়িয়ে রুমাল নেড়ে ওয়েভ করতে লাগলাম। দূরে সরতে সরতে ক্রমশঃ জাহাজটা ছোট হয়ে যাচ্ছিল, শেষে এক সময় গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে ফিরে তাকালাম—মনে হ'ল ব্যারন যেন দুঃখের আবেগে কান্নায় ফেটে পড়বেন। কোনরকমে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। সহরে ফেরবার জন্ত এবার আমরা পা চালালাম।

স্ত্রী কয়েকদিনের জন্ত বাইরে যাচ্ছেন, তাতে ব্যারনের এতটা দুঃখ হ'ল কেন? মনে মনে ভাবছিলাম, রাত্রি জাগরণের ফলেই কি এতটা ভাবাহত হয়ে পড়েছিলেন ব্যারন? না, ভবিষ্যতে যে দুর্ভাগ্য তাঁর জীবনে আসছে সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন? অথবা স্ত্রীর সঙ্গে এই অল্প কয়েকদিনের বিরহটাও তাঁর পক্ষে অসহনীয় মনে হচ্ছিল? কিন্তু ভেবে ভেবেও এ বিষয়ে কোন সদুত্তর খুঁজে পেলাম না। (ক্রমশঃ)

বাস্তবিক রাজনৈতিক সংস্কারের মানে কি? মানে এই যে কেহ উৎপীড়িত হইবে না, কাহারও প্রতি অবিচার হইবে না, সকলে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার পাইবে, রাজ্য-শাসনকার্য্যে যোগ্যতানুসারে সকলের ক্ষমতা থাকিবে, ভাল হইবার ও সুখী হইবার পথে কাহারও পক্ষে কৃত্রিম বাধা-বিঘ্ন থাকিবে না। এই আদর্শের ভিত্তি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকট অনন্ত প্রেম ও ন্যায়পরায়ণতা এবং মানবের ভ্রাতৃত্বের উপর স্থাপিত তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭

বসে আছি

শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাদলের নিস্তব্ধ আকাশে,
ধরিত্রীর সন্ধ্যা নেমে আসে।
অবিরাম ঝর ঝর বারি ঝরে
ধীরে ধীরে স্তব্ধ বক্ষ পরে।
মনে হয় যেন কত যুগ যুগান্তর
এমনিই নিরন্তর
ধ্যান মৌন কোন এক বিরহী যক্ষের
অশান্ত বক্ষের,
পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি
নিমীলিত দু'টি চক্ষে আসি
অবিরাম ধারায় ধারায়
ঝরিতেছে ছন্দহীন চির মৌনতায়।
আর আমি মুগ্ধ ঐ বাতায়ন পাশে
যেন কার আশে,
কত যুগ কত জন্ম জন্মান্তর হ'তে
অনন্ত কালের স্রোতে;
অবগাহী—
এমনিই ব'সে আছি পথ চাহি,
আপনা হারায়ে ঐ প্রকৃতির মুগ্ধ স্তব্ধতায়
চির প্রতীক্ষায়।

মৌন

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

অনন্ত কালের বুকে চির মৌনব্রত
নিস্তব্ধ নির্বাক ধ্বনি ওঁকারের মত—
ব্যাপ্ত ছিল দিক্-বিদিকে স্তব্ধ চারিধার
তারই মাঝে মহা সৃষ্টি জন্ম নিল'তার।

সে কোন্ মুহূর্ত্ত—শুভ কর্ণে দিল আনি
মৌন-ভঙ্গ বিধাতার দীর্ঘশ্বাসখানি
দিগন্ত বিস্তৃত ব্যোম্ শূন্য বক্ষ তার—
পূর্ণ করে প্রতিধ্বনি লক্ষ শতবার।

কোটি সূর্য্য গ্রহ তারা, তূর্য্য ধ্বনি সহ
উচ্চারিল বেদমন্ত্র নিত্য অহরহ,
সেই হতে শব্দ ব্রহ্ম দিগন্ত ছড়ায়
প্রকৃতির অঙ্গ, মজ্জ, রয়েছে জড়ায়।

মৌনতারে শ্রেষ্ঠ মানি যবে মুনিগণ
চিন্তাশূন্য, বাক্‌শূন্য, ধ্যানমগ্ন মন
নিবেদিল নিঃশব্দে নিস্তব্ধের পায়,
শান্ত, সৌম্য, পূর্ণানন্দ আশিসিল তায়।

দাদাজী

আশুতোষ

অমর মুখোপাধ্যায়

রোগা ছেলে পড়েই আছে সদাই বিছানায়,
রোগ বেড়ে যায় তবু, শুধু পড়ার ভাবনায়।
রাত্তিরেতে লেখাপড়া একেবারেই মানা—
চিকিৎসকের কথা ওটা, সবার আছে জানা।
মন মানে না, যখন বাড়ী ঘুমিয়ে অচেতন,
রাত্রি গভীর, মোমবাতিটি জ্বলল কি কারণ ?
সেই ছেলেটি তখন দেখি বইটি হাতে নিয়ে
ধীরে ধীরে চেয়ারটি নেয় আলোর কাছে গিয়ে
সবার চোখের আড়ালেতে চলল সাধনা,
ডাক্তারী ঐ বাঁধন দিয়ে যতই বাঁধ না,
জ্ঞানের আলোয় যাদের জীবন উজল হয়ে আছে,
ছোট-খাট নিষেধ-মানা বিফল তাদের কাছে।
ঐ ছেলেটি বড় হ'ল—অনেক বড়, দেশে।
স্যার আশুতোষ হলেন তিনি দেশকে ভালবেসে।

——

বাদল সুরু

শ্রীত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায়

চুপ চাপ বসে থাকো
যেও নাকো বাইরে,
মেঘে মেঘে আঁধিয়ার
যে দিকেতে চাইরে।

বাজ পড়ে কড়-কড়
দাও দাও কানে হাত,
ঝড় বহে সন-সন—
যেন নেমে এলো রাত।

জল পড়ে তীর বেগে
গায়ে ছুঁচ বেঁধে তার,
আষাঢ়ের ঘন ঘটা
বাদলের অভিসার।

মরা গাছ প্রাণ পেল,
মাছেদের উৎসব,
ব্যাঙ ডাকে—দিল খুস—
কি বেজায় কলরব।

সাঁওতাল পল্লীতে
মাদলের ওঠে সুর,
দিন নেই, রাত নেই
সুরু হ'ল—ঝুর-ঝুর।

"শিকার, একটি খেলা"

অনিল চক্রবর্তী

শিকার একটি খেলা। এ খেলায় মাত্র দু'জন খেলোয়াড়। একজন শিকারী আর একজন শিকার। শিকার বলতে অবশ্য বাঘ শিকারকেই বোঝায়। অন্য শিকার ছেলেখেলা। এ খেলায় ভুল বা সাহসের অভাব মানেই মৃত্যু, তাই এত গল্প। আর সে গল্পে ছেলে-বুড়োর সমান আগ্রহ।

জঙ্গলে বাঘের মত সুন্দর প্রাণী নেই। তার বুদ্ধিমত্তা এবং ধূর্ততা বিস্ময়কর। তাকে আমরা ভয় করি কারণ বাঘে মানুষ খায়, অথচ এ ধারণাটা কতই না ভুল। স্বাভাবিক অবস্থায় বাঘ কিন্তু মানুষখেকো নয়। 'করবেট' সাহেব এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বাঘের স্বাভাবিক মেনুতে আছে বনের পশু। বুড়ো বাঘ বা আঘাত খেয়ে অশক্ত বাঘের মেনুতেই মানুষ একটি সুখাদ্য। এহেন একটি মানুষখেকো বাঘের গল্প নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

মাদ্রাজ এবং মহীশূর রাজ্যের এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নীলগিরি পর্বতমালা মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় সারি সারি তপস্বীর দল ঊর্দ্ধমুখে তপস্যামগ্ন। এই পর্বতমালার পাদদেশে রয়েছে জঙ্গল আর জঙ্গল। হাতী, বাঘ, বাইসন, হরিণ আর কত রকমের না পাখী এই জঙ্গলে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। অল্প কয়েক ঘর মানুষের বাস। মাইল পঞ্চাশ এলাকা জুড়ে মাসছয়েক একটি মানুষখেকোর উৎপাতে সমস্ত এলাকাটি বিপন্ন। সরকারী তরফ থেকে শিকারীদের আহ্বান করা হয়েছে। শিকারীর দলও যথারীতি সাড়া দিয়েছে। আমি গিয়েছিলাম বাঙ্গালোরে বেড়াতে। অপূর্ব এক সুযোগ মিলল শিকারে সাথী হবার। বাঙ্গালোর থেকে সোজা জীপে করে আমরা যে ডাকবাংলোটায় আশ্রয় পেলাম তার আধ মাইল পর থেকেই সুরু হয়েছে দুর্গাবনের ঝোপ। মাঝে মাঝে ফাঁকা তারপর আবার জঙ্গল। গতকাল ঠিক সন্ধ্যার সময় একটি গরুর গাড়ি বাঁশ বোঝাই করে ফিরছিল। গাড়ির চালক আপনমনে গুন গুন করতে করতে মাঝে মাঝে গরু দু'টিকে দিচ্ছিল তাড়া। বাঘের ভয় সে করে নি কারণ বাঘটি এই অঞ্চলটিতে নবাগত। বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল সে অনেকটা রাস্তা গাড়ীটার পিছু পিছু এসেছে। তার লক্ষ্য ছিল চালক, কিন্তু কোথা দিয়ে আক্রমণ করবে তা ঠিক করতে পারছিল না। কারণ লোকটির সামনে দুটি গরু আর পিছনে বাঁশের আড়াল। অবশেষে বাঘটি একটি বিচিত্র পথ বেছে নেয় আক্রমণের। পাশ কাটিয়ে ঠিক গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে বলদ দুটোকে দেয় ঘাবড়ে। একটি জোয়ালের দড়ি ছিঁড়ে পালায়, অন্যটি ভয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। এই সুযোগে অসহায় মানুষটিকে টেনে নিয়ে যায় কিছু দূরের জঙ্গলে। আমরা অর্ধভুক্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। কি ভয়াবহ দৃশ্য! আমার শিকারী বন্ধুটির ছিল দুর্জয় সাহস এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাকেও দেখলাম এই বছর তিরিশের যুবকের দেহটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠতে। কাছাকাছি কোথাও গাছ না থাকায় সেখানে মাচা বাঁধবার সুবিধা হ'ল না। অথচ সুযোগও বার বার আসে না। বাঘটা আবার ফিরে আসবে খেতে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখানে জমিটা ছিল সামান্য ফাঁকা, পাশে ছিল একটি খেজুর গাছ, স্থির হ'ল এই গাছের নীচে কতকগুলি দুর্গা ঝোপ বা ল্যান্টানা গাছ কেটে আড়াল তৈরী করে সারারাত অপেক্ষা করা। সূর্যাস্তের কিছু আগেই তিনজনে হাজির হলাম। দূরে পাহাড়-চূড়ায় শেষ সূর্যের রশ্মি নিবে এল। নেমে এল আঁধার। মিনিট থেকে ঘণ্টা সময় চলল এগিয়ে। চাঁদ আকাশে ছিল না। তারার আলোয় মাত্র কয়েক হাত দূর পর্যন্ত আবছা দেখা যাচ্ছে। শুধু নিজেদের বুকের ধুকপুক শব্দ ছাড়া চারিদিক নিঝুম। ডন্নক ডন্নক ঢনক্— আওয়াজটা তুলল একটি হরিণ। আওয়াজটা ভয়ের। অর্থাৎ কোন জন্তুকে সে দেখেছে। আমরা আরো সতর্ক হলাম। এর মিনিট পনেরো পরেই আমাদের কাছের ঝোপের ভিতর থেকে একটি হাড়-কাঁপানো ডাক। শিরায় বুঝি রক্তস্রোত শুদ্ধ হয়ে গেছে। একটু পরেই হাড় চিবুনোর মটমট আওয়াজ। তারপরই একঝলক টর্চের আলোয় দেখলাম একটা মাথা। শিকারীর রাইফেলের গর্জন পর পর দু'বার তারপর সব ঠাণ্ডা, শান্ত। পরদিন দেখলাম একটি গুলীতে তার একটি চোখ চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যায়। আর তাই এই প্রাণীটি হয়ে উঠে মানুষখেকো। মানুষের ক্রটিতেই সে মানুষের শত্রু হয়ে উঠেছিল।

যাঁদের করি নমস্কার (৩)

অপরেশ ভট্টাচার্য

দ'য়েহাটার সিংহ বাড়ীর নীচের তলায় স্যাঁৎসেঁতে এক কুঠুরী। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসেছে এক কিশোর। কিন্তু পড়বে কি! রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছে তার চোখে। আর এই ঘুমকে তাড়াবার জন্ত কতই না তার চেষ্টা। কখনও বা সরষের তেল দু'চোখে রগড়াচ্ছে; কখনও বা চলেছে অবিরত পায়চারি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এক সময় ঘুমে ঢলে পড়ল সে। পাশেই খোলা পড়ে থাকল বইগুলো। আর ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকলেন এক প্রৌঢ়। ছেলেকে ঘুমন্ত দেখে ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। একেবারে যেন খুন চড়ে গেল তাঁর মাথায়। ডাকাডাকি নয়, বকাবকি নয়—কিছু নয়। সামনেই ছিল একটা চেলাকাঠ—তাই তুলে নিয়ে লাগালেন দমাদম্ মার। আচমকা মারের চোটে চীৎকার করে জেগে উঠল সেই কিশোর—সামনেই দেখল চেলাকাঠ হাতে বাবাকে। বাবা কিন্তু তখনও সমানেই চালিয়ে যাচ্ছেন চেলাকাঠ। প্রচণ্ড প্রহারে অস্থির হয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল সেই কিশোর। আর এই আর্তচীৎকারে উপরতলা থেকে ছুটে এলেন এক বিধবা। বুকভরা স্নেহ নিয়ে তাকে বুকে আগলে দাঁড়ালেন তিনি। বাবাও সংযত হলেন। তার পরেও বাবার সঙ্গে এমনি করেই তার বহুদিন কেটেছে—কিন্তু কখনও আর এমন করে ঘুমিয়ে পড়ে নি। দিনে-রাতে ভীষণ পরিশ্রম করতে হ'ত তার। রাত দুটোয় ঘুম থেকে উঠে সুরু হ'ত পড়াশুনা। ভোরবেলা যেতো গঙ্গায়। স্নান-আহ্নিক সেরে বাজার করে নিয়ে ফিরতো দ'য়েহাটার একতলার সেই সেঁৎসেঁতে ঘরে। কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, কাঠ চেলা করা, রান্না করা, বাবা ও ভাইদের খাওয়ানো, এঁটো-কাটা পরিষ্কার করা—সবই তাকে করতে হত একা। আর কতই বা তখন তার বয়স! সব কিছু সেরে ছুটতে হ'ত বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথেও চলত পড়াশুনা।

রান্না করাটাই কি ছিল খুব সহজ! যেখানটায় ছিল রান্নার জায়গা—তার পাশেই ছিল একটা নর্দমা। কিলবিল করে কাতারে কাতারে উঠে আসত নর্দমার কীট। আর অনবরত জল ঢেলে ঢেলে সেগুলোকে হ'ত তাড়াতে। এক হাত থাকত উনুনে কাঠ দেবার জন্ত—আগুনকে জ্বালিয়ে রাখার জন্ত; আর এক হাতে জলের পাত্র—কীটগুলোকে তাড়াবার জন্ত।

সারাজীবন ধরেই এমনি করে তিনি এক হাতে জ্বালিয়ে রেখেছেন আগুন, জ্ঞানের আগুন, আর এক হাত রেখেছেন আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে। কিশোর বয়সে বাবার সেই শাসন বৃথা হয় নি। সেই যে তাঁর ঘুম ছুটে গিয়েছিল সেদিন, তারপর থেকে আর অমন করে ঘুমোন নি তিনি। জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে সারা বাংলা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘুমের জড়তা থেকে গোটা জাতটাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। দিনরাত নিরলস পরিশ্রম করে গেলেন জীবন-ভর। বৃথা হয় নি সিংহ বাড়ীর সেই বিধবার স্নেহ বর্ষণ। গোটা বাংলা দেশের বিধবাদের দুঃখ মোচনে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। একদিকে তিনি জ্বালিয়ে রেখেছেন শিক্ষার আগুন আর একদিকে তিনি তাড়াতে চেয়েছেন কুসংস্কারের দূষিত কীট। সার্থকও তিনি হয়েছেন।

সেদিন চেলাকাঠ দিয়ে শাসন করেছিলেন যিনি—তিনি সেই কিশোরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বুকে আগলে আড়াল করেছিলেন যিনি—তিনি সিংহ বাড়ীর বিধবা মেয়ে রাইমণি। আর সেদিনের সেই কিশোর, পরবর্তীকালের এক স্মরণীয় মহাপুরুষ। সেদিনের ভোরের আকাশের তারায় তারায় লেখা এক নাম—সে নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
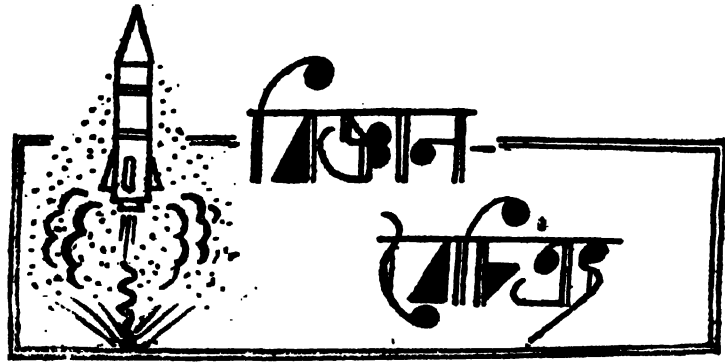
ধূমকেতুর আকৃতি ও প্রকৃতি

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সকাল ৭টায় সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কা নামে এক অরণ্যসংকুল অঞ্চলের আকাশ বেয়ে প্রকাণ্ড একটা আগুনের গোলা ছুটে যায়। তার পর সবাই শুনতে পায় বজ্রের মত প্রচণ্ড এক আওয়াজ। সেই সময় একটি মালগাড়ি যাচ্ছিল। আওয়াজ শুনে ইঞ্জিন ড্রাইভার ভাবল যে গাড়ীর পিছন দিকে বোধ হয় কতকগুলো ওয়াগন উল্টে গিয়েছে। সে ব্রেক কষে গাড়ী থামিয়ে দেয়। ঠিক সেই সময়ে সারা দুনিয়ার সমস্ত আবহকেন্দ্রের বায়ুচাপমান যন্ত্রে এক প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ ধরা পড়ে এবং ভূকম্পনমান যন্ত্রে ভূমিকম্পের আভাস পাওয়া যায়।

১৯০৮ সালের সেই অলৌকিক ঘটনার রহস্য আবিষ্কারের জন্য সেই অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীরা বহুবার গিয়েছেন। সেই অঞ্চলের মাটি পরীক্ষা করে আড়াই শো কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ম্যাগ্নেটাইটের (লৌহঘটিত ধাতু) গুঁড়া পাওয়া গিয়েছে। আমরা জানি যে উল্কার একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে ম্যাগ্নেটাইট। আরও অনেক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকরা ১৯৬২ সালে সিদ্ধান্ত করেন যে ১৯০৮ সালে যে আগুনের গোলাটি এক বাষ্পপুচ্ছ সমেত তুঙ্গুস্কার আকাশে এসে ফেটে যায়, সেটি কোন ধূমকেতুর কয়েক হাজার টন ওজনের একটি খণ্ড। ধূমকেতু আর উল্কার গঠন একই এবং তারা এক সঙ্গেই থাকে। নির্দিষ্ট ধূমকেতুর সহচর হচ্ছে নির্দিষ্ট উল্কাগোষ্ঠী এবং উল্কাগুলির জন্ম সেই ধূমকেতু থেকেই। ধূমকেতুর দেহ থেকে ভেঙে বার হয়ে বহু উল্কা প্রতি বছর পৃথিবীতে এসে পড়ে। ধূমকেতুর মর্মস্থল উল্কা দিয়েই তৈরি। ধূমকেতুর লেজ সবসময় সূর্যের উল্টো দিকে থাকে। সাইবেরিয়ার যেটি পড়েছিল তার বাষ্পের লেজ সূর্যের উল্টো দিকেই ছিল। সম্প্রতি ইকেয়াসেকি নামে ধূমকেতুটি সূর্যের

হ্যালীর ধূমকেতু

কাছে গিয়ে ভাঙতে সুরু করে। তেমনি সময় বিশেষে অবস্থাগতিকে কোন ধূমকেতু পৃথিবীতে এসে পড়তে পারে। তাতে ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ আকাশে প্রকাণ্ড একটা লেজওয়ালা শুকতারা বা প্রকাণ্ড সূর্যের

মত দেখালেও ধূমকেতুগুলি মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম জ্যোতিষ্ক-পরিবারের সদস্য। ধূমকেতুর গ্যাসভরা মাথার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে বড় হ'তে পারে, তার লেজ মহাশূন্যে লক্ষ লক্ষ মাইল ছড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু তার মধ্যে বিপদের বিশেষ কিছু নেই। ধূমকেতুর মাথার শিলা ও ধাতুঘটিত মধ্যমণিটি দেখায় নক্ষত্রের মত।' সেটিকে ঘিরে আছে অ্যামোনিয়া, মেথেন ইত্যাদি গ্যাস। সূর্য থেকে যখন বহু দূরে থাকে তখন ধূমকেতুর লেজ থাকে না। সূর্যের যত কাছে যায় ততই গ্যাসের খোলস সূর্যের তাপে ফেঁপে ফিনকি দিয়ে সূর্যের উল্টো দিকে লেজের মত লম্বা হ'তে থাকে। ধূমকেতুর মধ্যমণি আয়তনে বেশি বড় নয়। হ্যালির ধূমকেতুর মধ্যমণির ব্যাস মাত্র ৩০ কিলোমিটার। এটা খুব বেশি হ'ল। ১৯২৭ ও ১৯৩০ সালে ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বাল্‌দে দূরবীণ দিয়ে দু'টি ধূমকেতু পরীক্ষা করেছিলেন। সেই দু'টির ব্যাস মাত্র ৪০০ মিটার। পৃথিবীর তুলনায় ধূমকেতুর মধ্যমণির ঘনমান যৎসামান্য বলে পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহের কাছাকাছি এলেও ধূমকেতু সেই গ্রহের

হ্যালীর ধূমকেতু পৃথিবীর কক্ষপথ ভেদ করে যাচ্ছে

গতির উপর বিশেষ কোন প্রভাব খাটাতে পারে না। সূর্যের বেশি কাছে গেলে মধ্যমণির গ্যাসের আবরণ ফুলে-ফেঁপে ভিতরের জমাট-বাঁধা লৌহ ও শিলাখণ্ডগুলিকে (উল্কা) রাইফেলের গুলীর বেগে লেজ বরাবর ছুঁড়ে দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এইভাবে ধূমকেতুটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। ধূমকেতুর দীর্ঘায়িত উল্কাপূর্ণ পুচ্ছ সেই সময় পৃথিবীর কাছ-বরাবর এলেই উল্কাবৃষ্টি হবে।

ধূমকেতু গবেষণার ইতিহাস

আগেকার দিনে মানুষ ধূমকেতুর উদয় বা উল্কাপাতকে অশুভ ঘটনা বলে মনে করত। আজও ভারতের মত দেশ থেকে সেই ধারণা যে মুছে গিয়েছে এমন কথা বলা চলে না। পুরাকালে ধূমকেতু ছিল যুদ্ধ মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প—এই সব দুর্দৈবের অগ্রদূত। ১৩৭৮ সালে তাতার বাদশা তখৎতামিশ যখন রুশিয়া আক্রমণ করেন তার আগে এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল। তারপর ১৮১১ সালে নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের আগেও রুশিয়ার গগনে এক প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। লোকের ধারণা হয়েছিল যে, ধূমকেতুই ছিল সেই দুটি যুদ্ধের অগ্রদূত। ১৯১০ সালে হ্যালীর ধূমকেতুর লেজের মধ্য দিয়ে পৃথিবী যাবে, জ্যোতির্বিদেরা যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন বহু লোক গ্যাস থেকে বাঁচবার জন্য সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল, কিছু লোক ভয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু পৃথিবী যখন ধূমকেতুর লেজ ভেদ করে চলে গেল, কোন দুর্ঘটনাই ঘটল না। সাধারণ লোকে উল্কা বা ধূমকেতুকে যতই ভয় করুক, পণ্ডিতরা কিন্তু বরাবরই ধূমকেতুকে প্রাকৃতিক ব্যাপার বলেই বোঝবার চেষ্টা করে এসেছেন। উল্কা ও ধূমকেতুর উল্লেখ মিশরের খ্রীষ্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দীর পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। চীন ও কোরিয়ার সেই সময়কার লেখা-জোকাতেও এই দুটি জিনিষের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক দার্শনিক ডায়োজেনিস এ গুলিকে নক্ষত্রের মত মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক বলে উল্লেখ করেন।

ধূমকেতু নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন ১৬শ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক তিচো ব্রাহে। তাঁর উত্তরসাধন করেন কেপ্‌লার। কেপলার বলেছিলেন মহাজগতে ধূমকেতুর সংখ্যা মহাসাগরে মাছের মতই অসংখ্য। অবশ্য তাঁর ধারণা ছিল যে ধূমকেতুগুলি সোজা পথে চলে। সেই ভুল ধারণা যিনি প্রথম সংশোধন করেন তিনি হচ্ছেন ব্রিটিশ নাবিক-বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালী। তিনিই পুরাণো ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখান যে ধূমকেতুগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আবার ঘুরে আসে। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখান যে একই ধূমকেতু ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালে দেখা গিয়েছিল। সুতরাং ধূমকেতুটি নিশ্চয়ই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ৭৫½ বছরে একবার করে, এক ডিম্বাকার পথে। তবে সেই সময়ের মধ্যে এক-আধ বছর এদিক-ওদিক হ'তে পারে কারণ সেটি যখন বৃহস্পতি বা শনির মত বিরাট গ্রহের কাছ দিয়ে যায় তখন গ্রহ

দু'টির মহাকর্ষের ফলে তার গতিবেগে ও কক্ষপথে কিছু তারতম্য ঘটে। হ্যালীর হিসাব মত ধূমকেতুটি আবার দেখা গিয়েছিল ১৭৫৮ সালে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পরে। হ্যালীর ধূমকেতুর মাথার ব্যাস শনির ব্যাসের দ্বিগুণেরও বেশি (৩৭০০০০ কিলোঃ)।

যে ধূমকেতুটি যিনি আবিষ্কার করেন সেটির নামকরণ হয় তাঁর নামে কিংবা বলা হয় অমুক সালের ধূমকেতু।

অধিকাংশ ধূমকেতুর কক্ষপথ অত্যন্ত দীর্ঘ, এমন কি ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর কক্ষপথের চেয়েও অনেক বেশি দীর্ঘ। যেমন ধরুন ১৮৫৮ সালের ধূমকেতুটি সূর্য থেকে ২২৫০ কোটি কিলোমিটার দূরে চলে যায়। (সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্বের ৪ গুণ)। সূর্য থেকে অত দূরে গেলে তার গতিবেগ দাঁড়ায় রাস্তায় সাধারণ এক পথিকের মত। আবার সূর্যের যত কাছে আসে ততই সূর্যের মহাকর্ষের টানে তার বেগ বাড়ে সেকেণ্ডে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত, যে বেগ তাকে সূর্যের মধ্যে গিয়ে পড়া থেকে বাঁচায়। ১৮৫৮ সালের ধূমকেতুটির সূর্য প্রদক্ষিণ করে আসতে লাগে ২০০০ বছর। সেটি আবার পৃথিবী থেকে দেখা যাবে ৩৯তম শতাব্দীতে যদি তার আগে অন্য কোন গ্রহাণুর (অ্যাষ্টেরয়েড) সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেটি নষ্ট হয়ে না যায় কিংবা বৃহস্পতি ও শনির টানে তার কক্ষপথ পরিবর্তিত না হয়। এমন ধূমকেতু আছে যার সূর্যকে একপাক ঘুরে আসতে ১০ হাজার বছর লাগে। কিন্তু ঘুরে সে আসবেই, সূর্যের আকর্ষণ শক্তি এত বেশি!

ধূমকেতুর শতকোটি কিলোমিটার লম্বা লেজও আছে। সৌররশ্মির ক্রিয়ায় তৈরি হ'লেও লেজ এত লম্বা হয় কি করে, সে রহস্যের সবটুকু আজও জানা যায় নি। আলোকের চাপে লেজ কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু আলোকের চাপ ছাড়াও আরো কোন একটি শক্তি আছে যেটি আজও অজ্ঞাত। সূর্যের কাছ থেকে ধূমকেতু যত দূরে সরে যায় লেজটি যায় ততই মিলিয়ে। শেষ পর্যন্ত লেজ আর থাকে না। প্রসঙ্গত একটি ধূমকেতুর ভাগ্যের কথা বলি। সেটির নাম বোলার ধূমকেতু। সে ৭ বছরে একবার করে ঘুরে আসে। ১৮৩২ ও ১৮৩৯ সালে আবির্ভাব হবার পর বৈজ্ঞানিকরা ১৮৪৫ সালে যখন তার প্রতীক্ষা করছেন তখন ২৯শে ডিসেম্বর সে এসে হাজির। কিন্তু তারপরেই বৈজ্ঞানিকদের চোখের সামনে সেটি ছোট এবং বড় দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল, যেন একটি গ্রহের থেকে জন্ম হ'ল এক উপগ্রহের। আবার ১৮৫২ সালে বড়টিকে দেখা গেল যখন তখন ছোটটি ১৫ লক্ষ কিলোমিটার পেছিয়ে পড়েছে (পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের ৪ গুণ)। তারপর ১৮৫৯ এবং ১৮৬৬ সালে তাদের কাউকে আর দেখা গেল না, দেখা গেল ১৮৭২ সালে শুধু এক উল্কাপুঞ্জ হিসাবে। তারপর

সহরের আকাশে ধূমকেতু

পৃথিবী বহুবার বোলার ধূমকেতুর কক্ষপথ পার হয়েছে কিন্তু ঐ উল্কাপুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নি। এই হচ্ছে ধূমকেতু মাত্রেরই শেষ পরিণতি। ধূমকেতু মাত্রেরই জীবনকাল মহাজাগতিক মানদণ্ডে ক্ষণিকের মাত্র। নিত্য নতুন ধূমকেতুর জন্ম না হ'লে এতদিন মহাবিশ্বে কোন ধূমকেতুর অস্তিত্বই থাকত না। কিন্তু ধূমকেতুর জন্ম হয় কোথা থেকে? এ সম্পর্কে দু'টি অনুমিতি আছে:—

(১) গ্রহাণুর (অ্যাষ্টেরয়েড) বিস্ফোরণের ফলে তার খণ্ড-বিশেষ যদি দীর্ঘায়িত কক্ষপথে ঘুরতে সুরু করে তা হলেই সেটি ধূমকেতুতে রূপান্তরিত হয়।

(২) বৃহস্পতি ও শনিগ্রহে সম্ভবত বিরাট সব

আগ্নেয়গিরি আছে, যেগুলির অগ্ন্যুদ্গার থেকে বড় বড় শিলা ও ধাতুখণ্ড মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং সেই গুলিই ধূমকেতু হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বৃহস্পতির উপরই বৈজ্ঞানিকরা বেশি জোর দেন এই জন্য যে বেশির ভাগ উল্কাপুঞ্জের কক্ষপথ বৃহস্পতির কাছ দিয়ে গিয়েছে এবং অন্তত ৭০টি ধূমকেতুর কক্ষপথ সেগুলির সংলগ্ন এবং নির্দিষ্ট উল্কাপুঞ্জের সঙ্গে নির্দিষ্ট ধূমকেতুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে :—

উল্কাপুঞ্জের সঙ্গে ধূমকেতুর আত্মীয় সম্পর্ক

	উল্কাপুঞ্জ	ধূমকেতু
(১)	লিরিড	১৮৬১ (১)
(২)	গামা অ্যাকোয়ারিড	১৯১০ (২) হ্যালী
(৩)	ওরিয়নিড	
(৪)	পার্সিড	১৮৬২ (৩) সুইফ্‌ট টাটল্
(৫)	লিওনিড	১৮৬৬ (১) টেম্পেল
(৬)	বৃটিড	১৯৫১ (৪)
(৭)	ড্র্যাকোনিড	১৯৪৬ (৫)
(৮)	অরিজিড	১৯১১ (২)
(৯)	অ্যাণ্ড্রোমিডিড	১৮৫২ (৩)
(১০)	টরিড	১৯৫৪ (৭)

যোলার ধূমকেতু যখন ভেঙে উল্কাপুঞ্জে রূপান্তরিত হয় তখন সেই উল্কাগুলি অ্যাণ্ড্রোমেডিড উল্কাপুঞ্জের সঙ্গে মেশে, কারণ দুয়ের কক্ষপথ প্রায় একই।

আজ পর্যন্ত যে ৫২৫টি ধূমকেতুর কক্ষপথ জানা গিয়েছে সেগুলির মধ্যে ৪৪০টির কক্ষপথ দীর্ঘায়িত অর্থাৎ সেগুলি বহুকাল পরে পরে ঘুরে আসে। আর যেগুলির কক্ষপথ ছোট, সেইগুলিই মানুষ বার বার দেখতে পায় পুচ্ছবিশিষ্ট উজ্জ্বল তারার মত।

সৌরজগতের দূর কিনারায় যে সব ধূমকেতুর অবস্থিতি সেগুলির মধ্যমণি বরফের মত ঠাণ্ডা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন মহাজাগতিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে ধূমকেতুগুলি যখন সূর্যের দিকে যেতে আরম্ভ করে তখনই তারা অন্তিম দশায় এসে পৌঁছায়। সূর্যের তাপে তখন সুরু হয় ভাঙন-বিভাজন ও বাষ্পীভবন, প্রসারিত হতে থাকে পুচ্ছ। এই ভাবে ক্ষয় হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত সেগুলি হয়ে যায় অবলুপ্ত যেমন হ'তে দেখা গিয়েছে ইকেয়াসেকি ধূমকেতুকে গত বছরে।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য

সম্প্রতি ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের দ্বারা গৃহীত ভারতীয় মুদ্রা, অর্থাৎ টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্তটি (devaluation) ভাল বা মন্দ হউক এবং এই সম্পর্কে সরকারী নীতির যত কঠিন সমালোচনাই করা হউক না কেন, এটি এখন আর বাতিল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আর এই একটি মাত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে, অথচ বিষয়টি এমনই যে, এর সুদূর-প্রসারী ফলাফল সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ করবার পূর্ব্বে এটির সম্বন্ধে কোন খোলাখুলি আলোচনা বা পরামর্শ গ্রহণ বিপর্য্যয়কারী ফল প্রসব করতে পারে বলে এটির আয়োজন একান্ত গোপনে সম্পূর্ণ করা অবশ্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই কারণে এরূপ একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং প্রযুক্ত হবার পরে এর ভালমন্দ বিষয়ে আলোচনা নিতান্তই নিরর্থক প্রয়াস। ভালই হউক বা মন্দই হউক এটিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই এবং সে ক্ষেত্রে কি ভাবে এবং কতটা পরিমাণে এই সিদ্ধান্তটি দেশের এবং দেশবাসীর ভালর জন্ম প্রয়োগ করা যেতে পারে সেটিই একমাত্র বিধেয় চিন্তা। অবশ্য যাঁরা মনে করেন এ ভাবে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না তাঁরা পূর্ব্ব থেকেই তাঁদের মতামত প্রবল ভাবে প্রকাশ করতে সুরু করেছিলেন।

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করবার যে দু'টি আগের উদাহরণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, তাতে ভারতের আর্থিক কাঠামোটি যে অনায়াসেই এই চাপ পূর্ব্বে সহ্য করে নিতে পেরেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েক দশক পূর্ব্বে পাউণ্ড ষ্টার্লিংয়ের তুলনায় যখন টাকার বিনিময় মূল্য নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তখন এই মূল্যমান কি হওয়া সমীচীন, সেই প্রশ্নটি নিয়ে প্রবল এবং বিস্তৃত বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল, একথা আজও অনেকের মনে থাকতে পারে। সেটা তখন ভারতের ওপর ব্রিটিশ রাজের শাসনাধিকারের কাল। সরকারী মতে টাকায় ১৮ পেনী বিলাতী মুদ্রার মূল্য হওয়া উচিত এই মত প্রচারিত হয়; ভারতীয় ব্যাপারী ও শিল্পপতিরা মনে করেন টাকার বিলাতী মুদ্রায় এই উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে এই সুযোগে ভারতে বিলাতী রপ্তানী বাড়াবার সুযোগ করে নেওয়া হচ্ছিল। এর ফলে স্বদেশী শিল্পের প্রগতি ও প্রয়াস বিঘ্নিত হবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেন। তাঁরা তাই প্রস্তাব করেন বিলাতী মুদ্রায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য টাকা-প্রতি ১৮ পেনীতে নয়, ১৬ পেনীতে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু সরকারী মতই বহাল থাকে এবং টাকার মূল্য ১৮ পেনীতেই নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু তাতে ভারতে শিল্পপ্রগতির পরিধি সঙ্কুচিত হয় নি কিংবা তার গতি বিঘ্নিত হয় নি। এর পরে ১৯৪৯ সালে পাউণ্ড ষ্টার্লিংয়ের ডলার-মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়, ষ্টার্লিং-মূল্যের অনুসরণে ভারতীয় মুদ্রার ডলার-মূল্যও ৩০% কমে যায়। কিন্তু ভারতের আর্থিক কাঠামোটি এই মূল্যহ্রাসের চাপও বেশ অনায়াসেই সহ্য করে নিতে পেরেছিল।

সম্প্রতি নানাবিধ প্রয়োগের দ্বারা টাকার খানিকটা মূল্য হ্রাস করে নেওয়া যে জরুরী হয়ে পড়েছিল সেই কথাটা অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। খুব উঁচু আমদানী শুল্ক, কতকগুলি মালের ওপর লাইসেন্স ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করা, আমদানী-অধিকার বিধি (import entitlement), ট্যাক্স মকুব সার্টিফিকেট

(tax credit certificate) এবং অন্যান্য রপ্তানীবর্দ্ধক বিভিন্ন প্রয়োগের দ্বারা টাকার পূর্ব্ব বিনিময় মূল্য রপ্তানী বাজারে ভারতীয় মাল চালু রাখার পথে যে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল, সে কথা ফলতঃ স্বীকৃত হয়েই রয়েছিল। অনেকগুলি আমদানী-করা মালের বাজার-মূল্য যে আমদানী মূল্য ও আমদানী শুল্কের যোগফলের চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে চড়ে গিয়েছিল, সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। অন্ততঃ এ সকল ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাসের ফলে দাম আরও চড়ে যাবে এমন সমালোচনা বা আশঙ্কার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

কিন্তু তবুও সরকারী এবং বেসরকারী জনমত যে মূল্যহ্রাসের বাস্তব ফলাফল কি দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হ'তে পারে নি, সে কথাটিও খুবই স্পষ্ট। প্রথমতঃ এর ফলে সকল প্রকার আমদানী-মালের যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য এটি নিঃসন্দেহ; দ্বিতীয়তঃ বিদেশী ঋণের ও তৎসংলগ্ন সুদের বোঝা যে এর ফলে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, একথাও সত্য। এর দ্বারা এদেশে বিদেশী লগ্নীর ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ খানিকটা পরিমাণ বিঘ্নের সৃষ্টি হবে, কেননা এদেশে ইতিমধ্যে লগ্নীকৃত পুঁজি থেকে উদ্ভূত টাকার মুনাফা বিদেশে পাঠাবার সময় তার বিদেশী মুদ্রায় মূল্য আনুপাতিক পরিমাণে কমে যাবে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই যে, বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের ফলে সহসা যে আমাদের বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ মূল্যে বিশেষ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এমন ভরসার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যাচ্ছে না।

এই সকল বিভিন্ন দিক থেকে বিষয়টি বিচার করলে দেখা যাবে যে, টাকার বিদেশী মুদ্রায় বিনিময় মূল্য হ্রাস করে দেবার স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি প্রায় একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। এটা সত্য যে আমাদের আর্থিক কাঠামোয় প্রাণশক্তির যে অভাব কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন গতি শ্লথ হয়ে আসছিল, তেমনি আমাদের আমদানীর তুলনায় রপ্তানী আনুপাতিক পরিমাণে প্রসার লাভ করতে সমর্থ হয় নি। এই অবস্থায় যদি আমাদের বিদেশী উত্তমর্ণেরা ভবিষ্যতে আমাদের আরও ঋণ দেওয়ার সমীচীনতা সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হয়ে উঠতে থাকেন তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিছুদিন ধরে বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তারা এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব যে আমাদের কাছে পেশ করে আসছিলেন সেটা জানা কথা, এবং সেই সময় থেকেই যে আমাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমে শোচনীয়তর হয়ে উঠছিল, সেটাও অস্বীকার করা যায় না। গত দশ বৎসরে আমাদের দেশে পণ্যমূল্য মোটামুটি ৮০% গড়-পড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন; গত দুই বৎসরেই এই মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে ৩০%-এরও বেশী। এছাড়া টাকার সরবরাহ অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে আসছিল, উৎপাদনগতি ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছিল, এবং বিদেশী মুদ্রার সঙ্কট ক্রমেই কঠিনতর আকার ধারণ করছিল। এই অবস্থায় আমাদের সরকারকে বাধ্য হয়েই হয়ত টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করবার পরামর্শ অনুযায়ী বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে যে তাঁরা তাঁদের সুবিধামতন সময়ে সিদ্ধান্তটি চালু করতে পারতেন না, বা টাকার মূল্য হ্রাসের অনুপাতটি আরও খানিকটা কম করে, কতকগুলি ক্ষেত্রে এর ফলে যে অনিবার্য্য ক্ষতি এবং অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, সেটিকে কমিয়ে রাখতে পারতেন না, একথা দাবি করা চলে না।

বস্তুতঃ একথাটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত সকল বিষয়গুলি খুব বিস্তৃত এবং গভীর ভাবে বিচার করে আমাদের সরকারের কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণমাচারী অর্থমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয় কোন বিচার বিশ্লেষণে যে আদৌ নিযুক্ত হয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। বস্তুতঃ অর্থমন্ত্রণালয়ের অনেক কিছু বিচারই যে সাধারণতঃ উপযুক্ত সাবধানতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয় না তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গত বৎসরের ডেফিসিট ফাইনান্সিংয়ের পরিমাণটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় বাজেটে এর পরিমাণ মোট ১৬৫ কোটি টাকায় নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তব পক্ষে এর পরিমাণ শেষ পর্য্যন্ত এযাবৎ সর্ব্বোচ্চ অঙ্কে অর্থাৎ ৪৬৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অনুরূপ ভাবে কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর টাকার মূল্যহ্রাসের পরিমাণ সাবধানতার সঙ্গে এবং উপযুক্ত বিচার বিশ্লেষণের ফলে স্থির করেছেন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সে যাই হোক, বিষয়টি যখন এঁরা একবার স্থির করে ফেলেছেন, সেটিকে মেনে নেওয়া এবং তার সঙ্গে দেশের লোকের কর্ম্মধারাকে সামঞ্জস্য-বিধৃত করা ছাড়া দেশের লোকের এখন আর কোন উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে বিদেশী চাপের ফলে যে ভারত সরকার বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন এই সমালোচনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ কথা জানা আছে যে, কিছুদিন ধরেই বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্বব্যাঙ্কের উপদেষ্টা-

গোষ্ঠী মারফৎ আমেরিকা এ বিষয়ে ভারত সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন। এই চাপের উদ্দেশ্য যে ভারতের আর্থিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতকে শক্তিশালী এবং এতাবৎ সাহায্যদানকারী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ করে তুলবারই প্রয়াস মাত্র, এমন অভিযোগও কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ বিদেশী আর্থিক সাহায্য পাবার সম্ভাবনা যে টাকার মূল্য হ্রাস করবার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছিল এবং তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তিম বৎসর থেকে এ পর্য্যন্ত স্থগিত মার্কিনী অর্থ-সাহায্যের দ্বার এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হবার ঠিক দশদিন পর পুনর্মুক্ত হ'ল, এ সকল ঘটনা অনেকেরই মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করে। অন্যপক্ষে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে বেশ কিছুদিন ধরে বিদেশী বাজারে টাকার বেসরকারী ক্রয়ক্ষমতা বাস্তব পক্ষে অনেকটাই কম হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন যে টাকার মূল্য হ্রাসের বর্ত্তমান পরিমাণ দ্বারা সরকারী ভাবে এই বাস্তব অবস্থাটাই স্বীকার করে নেওয়া হ'ল। তাছাড়া এ কথাও বলা চলে, এতদিন ধরে ভারতকে এত প্রভূত পরিমাণ ঋণ দেবার পর এদেশের আর্থিক কাঠামোটিকে বিধ্বস্ত করে দেবার দুরভিসন্ধির দ্বারা আমেরিকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের কর্ত্তারা হঠাৎ প্রণোদিত হয়ে উঠবেন এমন অভিযোগ করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

এ বিষয়ে আগেই ভারত সরকার কেন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ রাজনৈতিক। বিশেষ করে আগামী বৎসরে সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন, এই অবস্থায় এরকম গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশঙ্কাজনক প্রতিক্রিয়া শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের পক্ষে মারাত্মক হবার সম্ভাবনা নিতান্ত সুদূরপরাহত নয়। তবু যে এই আসন্ন সময়ে শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন, তার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত না হলে বিদেশী অর্থ সাহায্য অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকত। এবং বিদেশী অর্থ সাহায্যের দ্বারা আমাদের শিল্পগুলির পূর্ণ উৎপাদন সম্ভাবনা সার্থক করে তুলতে না পারলে যে দেশের সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় একটি অনিবার্য্য বিপর্য্যয় ঘটতে বাধ্য সেটাও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণেই নির্ব্বাচন আসন্ন হওয়া সত্ত্বেও এবং এইরূপ একটি সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া প্রতিকূল হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও এই সময়ে ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তা ছাড়া টাকার মূল্য হ্রাস করবার সিদ্ধান্তটি বিদেশী অর্থ সাহায্যের সম্ভাবনা একদম না থাকলেও হয়ত শেষ পর্য্যন্ত অনিবার্য্য হয়ে উঠত। অতএব এই সিদ্ধান্তটি এখুনি গ্রহণ এবং চালু করে বিদেশী অর্থ সাহায্যের বনিয়াদ পাকা করে নেওয়া অধিকতর সুবুদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে হ'তে পারে। বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটির পরিমানিক অঙ্ক সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী গুরুতর হবার আশঙ্কা, সেটি খাদ্যশস্যের আমদানীর অতিরিক্ত আনুপাতিক খরচ। কিন্তু এই উচ্চতর আমদানী মূল্য সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের এবং কতকগুলি অবশ্যভোগ্য পণ্যের ভোগমূল্য যাতে ভোক্তার পক্ষে না বৃদ্ধি পায় তার জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের দ্বারা এ সকলের মূল্য পূর্ব্ব মূল্য রেখায় সীমিত রাখবার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। এর ফলে ভারত সরকারকে বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ কয়েক শত কোটি টাকা খরচ করতে হবে। এই অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন কি ভাবে মেটান হবে এবং সেই প্রয়োগটির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হ'তে পারে, সে অন্য বিচার।

কেহ কেহ বলেছেন যে পরিমাণে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করা হ'ল, সেটি ভারতের অভ্যন্তরে টাকার ক্রয়ক্ষমতা যে পরিমাণে কমেছে, সেই পরিমাণের অঙ্কে নির্দ্ধারিত হওয়া সমীচীন। এরূপ বিচারের কোন সঙ্গত কারণ নেই। কোন দেশের মুদ্রার বাস্তব বিনিময় মূল্য সেই দেশের খরচের (Cost structure) সীমার দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া সমীচীন—যে সকল দেশে আমরা মাল বেচি তাদের দেশের খরচের তুলনায়, আমাদের খরচ এই বিনিময়-পরিধি নির্দ্ধারণ করবে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল মালগুলি আমাদের সমগ্র রপ্তানী-বাণিজ্যের ন্যূনাধিক এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী অংশ অধিকার করে থাকে,—যথা পাটজাত রপ্তানী, চা, তৈলবীজ ইত্যাদি—সেগুলির বেলায় টাকার মূল্য হ্রাসের আনুসঙ্গিক অতিরিক্ত রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করায় এই অবস্থাটা সূচীত করে যে অন্ততঃ এই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান পরিমাণে টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করা খুব অতিরিক্ত মূল্য সঙ্কোচনের পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বিশেষ করে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মুদ্রামূল্য হ্রাস করা আর্থিক নীতির সংশোধনের ধারায় একটি পদক্ষেপ মাত্র, কোন অন্তিম লক্ষ্যের সূচনা নয়। এর প্রধান প্রয়োজনীয় পরবর্তী প্রয়োগ, দেশের আর্থিক কাঠামোর একটি কঠিন সংযমের ধারা প্রবর্ত্তন করা; এরূপ সংযম পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করা

সম্ভব হলে হয়ত আজ আর মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করবার আবশ্যক এতটা গুরুতর হয়ে উঠবার অবকাশ পেত না।

টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য হ্রাস করবার প্রধান লক্ষ্য দেশের আর্থিক কাঠামোর কতকগুলি মূল বিষয়ে দৃঢ় সংযমের ধারা প্রবর্ত্তন করা। প্রসঙ্গতঃ এ কথাও বলা চলে যে, এই সকল বিষয়ে পূর্ব্ব থেকেই সংযম প্রবর্ত্তিত হ'লে সম্ভবতঃ আজ এভাবে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করবার প্রয়োজন হ'ত না। এ সকল বিষয়ের কতকগুলির সম্পর্কে এই মূল্য হ্রাসের অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া হিসাবেই বাঞ্ছনীয় সংযম প্রবর্ত্তিত হবে; যথা বিদেশ থেকে পণ্য আমদানী করা এখন অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়বহুল হবে বলে কম আমদানী হবে; অন্যদিকে দেশে উৎপাদিত পণ্যের বেশ খানিকটা অংশ এখন রপ্তানীর দিকে চালিত হবে, কেননা দেশের ভেতরে এ সকলের ভোগব্যয়ের তুলনায় রপ্তানী করা অধিকতর লাভজনক হবে। এ সকল কারণে সম্ভবতঃ অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানী-বর্দ্ধক প্রয়োগগুলি কিংবা আমদানী-নিয়ন্ত্রণ বিধি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে পুরানো নিয়ন্ত্রণাদি প্রত্যাহৃত হওয়া সম্ভব বা স্বাভাবিক হলেও, আমাদের আর্থিক কাঠামোর গতি ও প্রকৃতি বাঞ্ছনীয় পথে চালিত করবার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে অর্থমূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পণ্যমূল্যমানে যে সকল নূতন চাপ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব সেটিকে রোধ করবার প্রয়োজনে নূতন এবং সার্থক সরকারী প্রয়োগ জরুরী হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা হয়। সেই অবস্থায় সম্ভবতঃ পুরাতন নিয়ন্ত্রণ-বিধিগুলি অনেকাংশে প্রত্যাহৃত হওয়া সত্ত্বেও নূতন ধরনের নিয়ন্ত্রণ-বিধি রচনা ও প্রবর্ত্তন সরকারের পক্ষে হয়ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তে পারে।

সম্প্রতি মূল্যমানে স্থিরতা রক্ষা করবার প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আসল যেই প্রয়োগটি সত্যকার গুরুত্বপূর্ণ সেটি সরকারী অর্থানুকূল্যে এবং মোটামুটি ১৫০।২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে খাদ্যশস্য, কেরোসিন, রাসায়নিক সার ইত্যাদির বর্ত্তমান মূল্যমান বজায় রাখা। রেশনিং চালু রেখে এবং বর্ত্তমান বৎসরের সম্ভাব্য খাদ্যশস্যের উন্নত পরিমাণ ফসল এই উদ্দেশ্য সাধনে অবশ্য সহায়তা করবে। কিন্তু সরকার এবং জনসাধারণ উভয় পক্ষকেই একটা বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে যে আসল উদ্দেশ্য এই সম্পর্কে কেবল-মাত্র অর্থমূল্য হ্রাসজনিত মূল্যচাপের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করা নয়, বস্তুতঃ আমাদের আর্থিক কাঠামোর একটি বাঞ্ছিত ও স্বয়ংক্রিয় ধারা প্রবর্ত্তনের দ্বারা মূল্যমানে স্থিরতা সম্পাদন করা।

আমদানী পণ্যের মূল্যমান অনিবার্য্যভাবে বাড়বে এবং এই বৃদ্ধির ফলে যদি এ সকল পণ্যের ভোক্তারা এ সকলের স্বদেশী সংস্করণ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হন বা ভোগসঙ্কোচ করেন, তবে এই বৃদ্ধির ফলে লাভ ছাড়া ক্ষতির আশঙ্কা নাই। সরকারী মালিকানায় ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরস্ প্রতিষ্ঠা করে কিংবা নূতন আইন বা অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তনের দ্বারা মূল্য স্থিরতা সম্পাদন করবার কথা শোনা যাচ্ছে, সেটা মোটামুটি রাজনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছু নয়। অতীতে অনুরূপ প্রয়োগের দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যায় নি; তা হ'লে ১৯৬৪ সালে মূল্যমান শতকরা ১২%এর অধিক এবং ১৯৬৫ সালে ১৬%এরও বেশী বাড়তে পেত না।

বস্তুতঃ ভবিষ্যতে স্থিরমূল্যাবস্থা প্রবর্ত্তন করা যে ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরস্ বা অনুরূপ প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব হবে না সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট। একমাত্র বাস্তব আর্থিক নীতি (fiscal and monetary) প্রবর্ত্তন ও প্রয়োগের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব। আমাদের প্রতি-রক্ষা ও পরিকল্পনা এ সম্পর্কে অধিকতর বাস্তবানুগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গত তিন বৎসরে আমাদের সত্যকার সঙ্গতি অতিক্রম করে এই দুইটি ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যয়বৃদ্ধি ঘটেছে এবং প্রধানতঃ এরই ফলে ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য চাপের দুষ্টচক্রের প্রতাপ প্রবল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই সকল ভুলগুলি সময়ে সংশোধন করতে না পারলে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে আমাদের আর্থিক প্রয়োগে যে সকল সুযোগ-সুবিধাগুলি বর্ত্তাতে পারা সম্ভব, সেগুলি আবার অনিবার্য্য ভাবে আমাদের আয়ত্তাতীত হয়ে পড়বে। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রকৃতি ও আকার নির্ভর করবে কতদূর আমরা এ সকল অতীত ভুলের কারণ স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি তার ওপর। দুঃখের বিষয় এখন পর্য্যন্ত যোজনা ভবনের কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন উপযুক্ত সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে এমন আশা এখনও দেখা যাচ্ছে না; তাঁরা আর্থিক স্থিরতার (economic stability) চেয়ে বৃহদাকার চতুর্থ পরিকল্পনার দিকেই এখনও ঝুঁকে রয়েছেন বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, যদিও দ্বিতীয় ও তৃতীয়, উভয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই ব্যয়ের (outlay) দিক থেকে পরিকল্পনানুযায়ী সম্পূর্ণ হয়েছে, সেটা হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই, যে মূল্যের ভিত্তিতে এই দুইটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল, তার থেকে অনেক উচ্চ মূল্যে; অর্থাৎ

এই উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যমান বৃদ্ধির অনুপাতে পরিকল্পনা রূপায়ণের সত্যকার সার্থকতা সঙ্কুচিত হয়েছে।

বস্তুতঃ পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের প্রথম থেকেই সমগ্র জাতি যে তার সত্যকার সঙ্গতি অতিক্রম করে করে অগ্রসর হয়ে চলেছিল সে বিষয়ে মতভেদের কোনই অবকাশ নেই। লগ্নী এবং ভোগ উভয় ক্ষেত্রেই যদি চাহিদা সত্যকার সঙ্গতি—অর্থাৎ উৎপাদন এবং বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের যোগফল অতিক্রম করে এখনও চলতে থাকে,—চতুর্থ পরিকল্পনার আকার-প্রকার সম্বন্ধে গত ৬ই জুনের পর থেকে এ পর্য্যন্ত প্ল্যানিং কমিশনের কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে যেটুকু আভাস পাওয়া গেছে, তা থেকে এই আশঙ্কাই সত্য বলে মনে হয়—তা হ'লে আবার যে পূর্ব্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি হ'তে থাকবে এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। বর্ত্তমান অবস্থায় এ সম্পর্কে সবচেয়ে জরুরী যা তা এই যে, আমাদের সত্যকার সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং দেশের আর্থিক কাঠামোয় অবিলম্বে সচলতা পুনঃ প্রবর্ত্তন করবার জন্য যে সকল প্রয়োগগুলি (projects) আশু এবং একান্ত জরুরী সেগুলিকে নিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনার একটি কেন্দ্রিক (Central Core) খসড়া অনুযায়ী প্রাথমিক উদ্যোগ সুরু করা এবং ক্রমে সঙ্গতি বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে পরিকল্পনার আয়তন এবং পরিধি বৃদ্ধি করে চলা। বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী ঋণের পরিমাণ টাকার অঙ্কে আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে বটে, কিন্তু পুঁজি পণ্যের (capital goods) ক্ষেত্রে এর ফলে কোন ইতর-বিশেষ হবার সম্ভাবনা অল্পই। তবু একমাত্র এই অজুহাতে বৃহদায়তন চতুর্থ পরিকল্পনার দিকে আবার ঝোঁকা—যার কিছু কিছু আভাস আমরা এখনই পাচ্ছি—প্ল্যানিং কমিশন এবং সরকারী দপ্তরগুলিতে চিন্তার গভীর দৈন্যেরই পরিচায়ক।

ডিভ্যালুয়েশনের ফলে আরও অনেক ক্ষেত্রেও নূতন অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে। তবে সরকারী বাজেট-সঙ্গতিতে (budetary resources) কোন বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হবার আশঙ্কা দেখা যায় না। অবশ্য সেটা মূলতঃ নির্ভর করবে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যে ডিভ্যালুয়েশন-জনিত যে সুবিধাগুলির সৃষ্টি হবে তার কতটা সুযোগ আমরা নিতে পারব তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ-নিরপেক্ষ (non-project) বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের ফলে আমদানী বাণিজ্যে যে সচলতা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হবার আশা দেখা যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ সংযম আমরা অভ্যাস করতে পারব সে সম্বন্ধেও আশু সচেতন হওয়া প্রয়োজন। উৎপাদনকারক আমদানী ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করবার কোন কথা বর্ত্তমান অবস্থায় আদৌ কল্পনা করা যায় না। এই সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরও অনেকগুলি বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক, সম্ভব হ'লে সে প্রয়াস ভবিষ্যতে করা যাবে। ইতিমধ্যে ডিভ্যালুয়েশনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার গতি ও প্রকৃতিও খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

মানুষকে উদ্যমহীন, জড় প্রকৃতি, অদৃষ্টবাদী করিয়া আদর্শ ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার ও সমাজগঠনে উৎসাহহীন ও অসমর্থ করে। জাতীয় পরাধীনতা মানুষকে ক্ষুদ্রাশয় ও পরার্থে মহৎকার্য্যে উদ্যমহীন করে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৩

ট্রেনে কোনরকমে দাঁড়াবার একটুখানি জায়গা ক'রে নিয়েছি। মানে, পা-দুটোর জায়গা, দেহ আছে কি নেই! সামনে-পিছনে-পাশে, সর্বত্রই নিয়ত চাপ অনুভব করছি—তবু, দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, নইলে প্রতিনিয়ত ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা! কোথাও কোন ফাঁক নেই, এমনিভাবে লোক দাঁড়িয়েছে! তবু এটা ফার্স্ট ক্লাশ! ক্লাশের বালাই ওরা নিজেরাই তুলে দিয়েছে। কেউ বাধা দেবার লোক নেই। চেকার নামক পোষ্য আছে বটে—তারা ভেণ্ডারের পিছনে পিছনে ছুটে বেড়ায়, তাতে দু'পয়সা উপরি রোজগার হয়। আগে ফার্স্ট ক্লাশের মর্যাদা ছিল, আজ দেশ স্বাধীন, কে কার মর্যাদা দেয়। ওরা ইচ্ছামত গদি কাটছে, প্রয়োজনের জিনিষ চুরি করছে—পুলিশ আছে, তাদের বাধা দেবার হুকুম নেই। যারা গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কাটে তারাই বেকুব!

এমনি ভিড় পাবেন মহিলাদের গাড়িতে। মহিলার ভিড় নয়, পুরুষের ভিড়! মেয়েরা অভিযোগ করে—ফাইলে জমা হয়।

মুখ বুজেই আমরা যাতায়াত করি। অফিসের সময় নয়, তবু ভিড়! ভিড় বেড়েছে কিন্তু গাড়ি বাড়ে নি। তাই আরামের পরিবর্তে মানুষকে কসরৎ ক'রেই যেতে হয়। বসে যারা আছে তারাও কসরৎ করছে—ছয় জনের জায়গায় দশ জন বসছে।

কিন্তু এমন অবস্থা ত চিরদিন ছিল না। সত্যিই একদিন ট্রেনে আরাম ক'রে যাওয়া যেত। মজলিসী-গল্প, সুখ-দুঃখের কথা, বাজারের তথ্য ও তত্ত্ব থেকে সংসার-বিধেয়ের আলোচনা, রাজনীতি-সিনেমা-থিয়েটার-ফুটবলের সঙ্গে নেতৃমাথাবীর ভাও বাৎলান পর্যন্ত গাড়িতে হ'ত। যাঁদের অবসর কম, তাঁরা খবরের কাগজটাও এই গাড়িতে বসেই পড়ে নিতেন।

খুড়ো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তে হি দিবসা গতা।' আজকের চেষ্টা, কোনরকমে দেহখানাকে গাড়ির ভেতরে চালান ক'রে দেওয়া, ব্যস্! তারপর তুমি আছ, আমি আছি আর চলন্ত গাড়ি আছে। বেঁচে থাকি নামবার চেষ্টা করা যাবে, না থাকি ঐ পর্যন্ত।

নামবার চেষ্টা যাঁরা করছেন, তাঁদের মুখ-চোখের অবস্থাও দেখলাম—একহাত এগোন ত দু'হাত পিছিয়ে যান। সেখানেও চলেছে দস্তুরমত লড়াই, কে আগে নামবে।

একজনের জামার অর্ধেকটা নেমে গেল। এই দুর্মূল্যের বাজার, দেখলেও গা-টা যেন কেমন করে!

ওদিকে মেয়েদের গাড়ি থেকে মেয়েরা নামছে। সেখানে পুরুষ ঠেলে তাদের কসরৎ করতে হচ্ছে। পুরুষরা হাসে, মেয়েরা কাঁদে।

কতদূর এলাম, কোথায় চলেছি কিছুই জানবার উপায় নেই! দৃষ্টি-পথ বন্ধ ক'রে লোক দাঁড়িয়েছে—একটুও ফাঁক নেই, শ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়! ওরই মধ্যে কি চীৎকার ক'রে উঠল, কে বুঝি কার পা মাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটার দোষ দেওয়া যায় না, পা-দুটোকে সে রাখে কোথায়?

কিন্তু মজা এই, অত ভিড়ের মধ্যেও লোকে বিড়ি ধরিয়ে নিচ্ছে! 'অন্ধকূপ-হত্যা' যদি নাও হয়ে থাকে—তবে এবারে হবে। অনেকেই দেখলাম, জানলার বাইরে শ্বাস নেবার জন্যে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যার পাশে জানলা নেই?

বিড়ি যাঁরা ধরিয়েছেন, দেখলাম, তাঁদের কাছ থেকে অনেকেই দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা করছেন। ধোঁয়ার

কষ্টের জন্যে নয়—প্রতি মুহূর্তে আশংকা আছে, জামায় অথবা গালে অগ্নি সংযোগের, দাঁড়ান-যাত্রী, বিপদ সব দিকেই। আবার একটু অন্যমনস্ক হ'লেই পকেট মার।

গাড়ির আইন-কানুনে অনেক কিছু নিষেধ আছে, কিন্তু কে ক'টা মানে? অনুরোধও আছে, হুমকিও আছে—

খুড়ো বললেন, অনুরোধটা এসেছে দেশী আমলে, আর হুমকিটা ছিল বিদেশী-শাসনে। কিন্তু কোনটাই আজকের মানুষ আমলে আনছে না। তারা আইনও মানে না, অনুরোধকেও তুচ্ছ করে। নিয়ম ভাঙাটাকেই ওরা বোধ হয় স্বাধীনতার পাব্‌লিসিটি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

খুড়ো বললেন, এরা স্বতন্ত্র ক্লাশ তুলে দিলেই পারে। বরং আসনগুলো তুলে দিলে আরও ভাল হয়। দাঁড়ান-যাত্রী গাড়িতে বেশি ধরবে।

একটা লোক নাম্‌তে গিয়ে পড়ে গেল। খুব খানিকটা হৈ চৈ হ'ল, কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। এদের মুখে খৈ ফোটে, হাত নড়ে না। তাই ত বর্তমান রীতি।

যা ভয় করেছিলাম তাই। হঠাৎ দেখি, আমার আদ্দির পাঞ্জাবীটার অর্ধেকখানি পুড়ে নেমে গেল।

ভদ্রলোক নির্বিকার-চিত্তে বিড়িতে একটি সুখ-টান দিয়ে বললেন, 'সরি!'

জ্বলন্ত বিড়িটা তার মুখ থেকে টেনে জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিলাম।

ভদ্রলোক চিৎকার ক'রে যেন মারতে এলেন।

বললাম, এটা থার্ড ক্লাশ নয়। এখানে সিগারেট-বিড়ি খেতে হ'লে অনুমতি নিয়ে খেতে হয়। দেখেছেন, আমার জামাটার অবস্থা কি করেছেন? আপনার বিড়ির চাইতে জামাটার দাম বেশী—

একজন আমাকে সমর্থন ক'রেই বোধ হয় বললেন, মুখ পুড়িয়ে বিড়ি না খেলেই নয়! লোকে দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না—লজ্জা করে না বিড়ি খেতে! পোড়া-দেশে কি সহবৎ-শিক্ষাও আইন ক'রে শেখাতে হবে, অনুরোধে হবে না?

খুড়ো বললেন, আমাদের দেশে অনুরোধে আবার কবে কোন্ কাজ হয়েছে? চাবুকে বাঘ বশ হয়। চাবুক ছেড়েছ কি মরেছ!

হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল। একটা দশ বছরের ছেলে কার পকেট থেকে কয়েকটা টাকা তুলে নিয়েছে। গোলমালটা তাকে নিয়েই।

একজন বললে, মুখ টিপলে এখনও দুধ বেরোয়, কোথায় বাড়ী, কার ছেলে তুই?

একসঙ্গে অতগুলো প্রশ্নে সে কেঁদে ফেললে। কেউ কেউ মারতে যাচ্ছিল, অনেকে নিষেধ করল।

একজন হেসে বললে, যা বাড়ী যা, হাত পাকিয়ে আসিস্।

অপর জন বললে, 'প্রাক্‌টিক্যাল্ ট্রেনিং'—হাত পাকাবার জন্যেই ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মেয়েদের ট্রেনিং নিতে হয় না। স্বামীর পকেট মেরে মেরে বাড়ী থেকেই ওরা তৈরি হয়ে আসে। তা ছাড়া, ওদের সুবিধাও আছে অনেক, যা পুরুষের নেই। টাকা সাফ্ ক'রে স্রেফ্ ব্লাউজের তলায় চালান দেয়। কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে, ব্লাউজের তলায় হাত ঢোকায়!

তা বটে। বড্ড রিস্কি।

খুড়ো বললেন, পকেটমারের কথা উঠল যখন তখন বলি শোন। পকেট মারে না কে? তুমিও মারছ, আমিও মারছি। দর্জিপাড়ার হীরু ঘোষালকে কে না জানে! সে এসে একদিন বললে, জ্ঞান দা, একটা মোটর কিন্‌বে? প্লাইমাউথ গাড়ি। খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে—নেবে ত বল, আমার হাতে আছে। টাকা অবশ্য আমি দিনি। পরে শুনেছিলাম, হীরু ঘোষাল একজনকে গছিয়েছে। লোকটার টাকাও গেল, গাড়িও গেল। যার যায় সে কাঁদে, যে পায় সে হাসে।

—

পুনরাবির্ভাব

("রেসারেকশন")

জ্যোতির্ময়ী দেবী

১৯৮৫ সাল। রাত্রি গভীর, দ্বিতীয় প্রহর তৃতীয় প্রহরে পা দিয়েছে। রাজঘাট। শ্মশান গান্ধীজীর। ফুলে ফুলে গাছে গাছে সবুজে আর রংয়ে মিলিয়ে চমৎকার সুরক্ষিত বাগান। কেননা এখনও দেশ-বিদেশের মন্ত্রীরা, দূতেরা, বিশিষ্ট মানুষেরা এসে মালা দেয় ত। রাজা আর প্রায় কোন দেশেই নেই। তাঁরাই রাজা, তাঁরাই সব।

সহসা শ্মশানের একটা দিক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত একটি আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

দু' একটা প্রহরী পাহারায় জেগে ছিল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ওখানে কি চোর এসেছে? চোর কি করবে? দুষ্ট লোকেরা জড় হয়েছে? কোন পরামর্শ করার মতলবে? না হয়ত ভৌতিক ব্যাপার।

সে কাঠ হয়ে বসে রইল। জানুয়ারীর শীত দিল্লীর। ভয়ে নড়তে পারল না।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। খড়মের আর লাঠির শব্দ বাঁধান রাস্তার ওপর এগিয়ে আসতে লাগল গেটের দিকে।

সামনে এসে পড়ল কয়েকজন মানুষ। চোর নয়। তবে? তার গায়ে ঘাম দিল।

মানুষ নয়! তবে? অপদেবতা! ভূত? লাঠি আর খড়মের শব্দ এগিয়ে এল।

বাপুজী! আর আরও কয়েকজন। পণ্ডিতজী!

সে ওঁদের জীবনে দেখে নি, তবে ছবি ত দেখেছে। চিনতে পারল।

হাতের সঙীন হাতে আটকে গেল। পায়ের জুতো ঘামে ভিজে গোবর হয়ে গেছে। সে নিঃশব্দ নির্বাক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

আগন্তুকরা গেট পার হয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘুমন্ত রাজপথে।

গান্ধীজী বললেন, 'তা হ'লে এখন দেশ খুব সমৃদ্ধ আর সুখী হয়েছে? আমাকে ওরা—সম্প্রতি যারা স্বর্গে গেছে তারা অনেক করে বললে, 'বাপুজী, একবার দেখতে চলুন'।

সঙ্গে ছিলেন প্যাটেলজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিতজী ছাড়াও অনেকে। নবাগত এতদিনে যাঁরা স্বর্গে গেছেন তাঁরা। আর ছিলেন বিধান রায়, আজাদ সাহেব, হরেন্দ্র মুখুজ্যে, সরোজিনী, নাইডু—আরও রাজ্যপাল মন্ত্রী কিছু জন। এবং কিছু শেঠ বণিক এবং কিছু বিরাট বিরাট শেঠ বণিক কোটিপতি সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহশ্রেণী। স্বর্গে পৌঁছেছেন কিছুদিন আগে।

নতুন দিল্লীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভি. আই পি. অধ্যুষিত অঞ্চল। ছোট-বড় বাগান-সম্বলিত কোয়ার্টার ভবনসমূহ। সুখ বিলাস ঐশ্বর্যের ব্যসনের পরাকাষ্ঠাময় আবাসগুলি। ৪০০ বছর আগের মোগল বাদশাদের বিলাস ভবন আজকের বৈজ্ঞানিক উপকরণের ঐশ্বর্যময় সম্ভারে নিষ্প্রভ।

উৎসুক মনে গান্ধীজী ও সাঙ্গপাঙ্গরা চলেছেন।

একজন দেখবেন স্বাধীনতার কৃতিত্ব। অন্যরা দেখাবেন সেই কৃতিত্ব-সম্ভার।

ভবনে ভবনে সব বিদেশী বিলাস সংগ্রহাবলীর পাশে পাশে সামনের আলমারিতে হিন্দী সাহিত্যাবলী। টেবিলে ছোট 'তকলী'…ক্ষুদ্র বৃহৎ চরকা (ধূলিমলিন)। এবং আলনায় বিবর্ণ খদ্দরের চুড়িদার এবং শেরওয়ানী সাজানো। ওগুলি বছরে দু'দিন দরকার হয়—২রা অক্টোবর আর ৩০শে জানুয়ারী—গান্ধীজীর জন্মোৎসব ও তিরোধান স্মারক দিনের জন্য। যাঁরা পরিদর্শনে বেড়াতে আসেন সহজেই যেন দেখতে পান তাই রাখা আছে।

ভিতরদিকের ঘরে বিদেশী সাহিত্যেভরা র‍্যাক ও আলমারি তাক, পাশে কাপড় ছাড়ার ঘরে বিদেশী পোষাক সম্ভার। দেশে দেশে ডেলিগেশনে যেতে হয় ত! এবং আরও সব বস্তু!…

গান্ধীজী মৃদু হাস্যে স্মারকোৎসব দর্শন করলেন। কৃতজ্ঞ ভারত! আহা! দেশ স্বাধীন হয়ে এতদিন ধরে তাঁকে স্মরণ করে চলেছে।

বললেন, 'চল, পুরনো দিল্লী লালকেল্লায় কিছু দেখে-শুনে আসি।

কাশ্মীরি গেট পার হলেন।

ওঃ! দেশে আর কুঁড়ে ঘর নেই। ছোট বাড়ী ঘর নেই। পথ অবশ্য খিজি কিন্তু পথে দীন-দরিদ্র নেই। সেই খাটিয়া পেতে শোওয়া-বসা মানুষ নেই। ভুট্টা পোড়া খাওয়া 'কুদরৎকা জেলিবা (স্বর্গীয় জিলাপী) (তুঁতফল) ক্রেতা-বিক্রেতা দরিদ্র হাসিমুখ দিল্লীওয়ালারা নেই। চাঁদনীচকে 'কচবালুওয়ালা' নেই। বিখ্যাত কলমী বড়া দৈ বড়া চটর পটর ওয়ালা নেই! এমন কি যমুনা পথযাত্রী 'রাম নাম সত্য হায়' যাত্রীরাও পথে নেই।

এক কথায় দেশে বুদ্ধদেবেরও আতঙ্ক উৎপাদক দরিদ্র দীন জরা মৃত্যু কিছু নেই। গান্ধীজী চমৎকৃত বিস্মিত আনন্দিত।

নৈশ আকাশে চারদিকে অট্টালিকা থেকে ভেসে আসছে নানা রংয়ের আলো। অপূর্ব সঙ্গীত। যন্ত্র-সঙ্গীত। এবং টেলিভিসন যন্ত্রের থেকে শোনা বিদেশী প্রমোদ লীলা কথা সুর। ভিতরে লোকেরা দেখছেন ছবি সহ।

গান্ধীজীকে পথে দেখে মোটা মোটা শেঠজী বংশধরেরা বেরিয়ে এসেছেন। করযোড়ে স্ব স্ব গৃহে আহ্বান করছেন। পর্দা তুলে বৈঠকখানা ড্রয়িংরুম ঘরের সম্পদ দেখাচ্ছেন।

গান্ধীজী খুসী মনে পরিচয় নিচ্ছেন! ও আপনি দেবলদাস গঙ্গামলের নাতি। আপনি? শীতলদাস শ্যামলদাসের ভাইয়ের পৌত্র?

আপনি শালিগরাম মহাদেবজীর দৌহিত্র জামাই? ও আপনি •চন্দ্রমল গোবিন্দদাসদের বাড়ীর? সকলেই মহা শেঠদের বংশধর।

তাঁরা স্মিতমুখে তাঁদের প্রপিতামহ পিতামহদের ১৯৩০শের ১৯৪২ শের আগের পরে পরের সব আর্থিক সহযোগিতার পরিচয় দিতে লাগলেন। কত তাঁদের অর্থ-দান স্বাধীনতা সংগ্রামে।

অনেকটা তাঁরাই স্বাধীনতা কিনে দিয়েছেন ত! এ কথাও আকার ইঙ্গিতে জানাচ্ছেন। অবশ্য স্বাধীনতার পরম "প্রসাদ" 'কালো' 'সাদা' 'আলোছায়ালোক' ভরে যা পেয়েছেন সিন্দুক ব্যাঙ্ক ভরে ভরে তুলেছেন সেটা অপ্রকাশ রেখেছেন।

টাকা? কালো সাদা? জপ-তপের টাকা? সে কথাতে গান্ধীজী কি ভাবছিলেন? খড়মের ঠক্‌ঠক্ লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। স্থূলোদর স্ফীতকায় পার্শ্ব-চরেরা তাঁর জীবিতকালের মতই তাঁর সঙ্গে এগিয়ে যেতে পেরে উঠছে না। কিছু পুষ্টকায় মন্ত্রী সদস্য সরকারী কর্মচারীও পাশে রয়েছেন। নানা বিভাগীয় মন্ত্রী। তাঁরা এই 'পুনরুত্থানের' খবর পেয়ে এসেছেন।

পথে দীন-দরিদ্র আতুর অনাথ নগ্ন ভিখারী সাধারণ মানুষ বোকা নির্বোধ মানুষ কেউ নেই। কেউ হাসিমুখে গামছা-গায়ে বা মেরজাই গায়ে এগিয়ে এসে 'বাপুজী নমস্তে' বলে গড় হয়ে প্রণাম জানাচ্ছে না।

কোথায় তারা? তারাও কি 'শেঠ মূর্তি' ধারণ করেছে! আহা! গান্ধীজী ভাবছেন। আহা, সুখী ভারত!

দিল্লীর নানা পথ ভ্রমণ শেষ হয়ে গেল।

গান্ধীজী বেশ প্রফুল্ল হয়েছেন যেন। বললেন, 'খুব উন্নতি করেছ ত তোমরা! দেখছি দেশে আর দীন-দরিদ্র নেই। আমি এতটা আশা করি নি এই ক'বছরে। কি করে করলে এমনটা?'

সহসা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হ'লে সেই সব গরীব দুঃখীরাই এমন ধনী হয়েছে? তোমাদের মত সম্পন্ন ভাবের জীবনযাত্রা করছে? তারা আছে কোথায়? দু' একজনকে ডাক। তাদের হাসিমুখ দেখি। তারা আমার রামরাজ্য পেয়েছে!'

সামনে এগিয়ে এলেন কলকারখানার জীবিত শিল্পমন্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, দেশের এই উন্নতি কলকারখানার দৌলতেই হয়েছে। আর কেউ গরীব নেই, গরীব আর আমরা দেশে রাখি নি। এই ত ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর মন্ত্রী মহাশয়া রয়েছেন। বহু বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা গরীব উচ্ছেদ করেছি।"

গান্ধীজী স্মিত মুখে মহিলা মন্ত্রীণীর মুখের দিকে চাইলেন, "সত্যি দেশের লোক এত সংযম ব্রহ্মচর্য শিখেছে? আমার ত তাই আদর্শ ছিল। মনে নেই Women & Social Injustice-এ এসব আলোচনা করেছিলাম। 'নবজীবনে' কত আলোচনা ছিল।"

মন্ত্রী মহাশয়া একটু হতচকিত হলেন। বললেন 'হাঁ সেটা পড়েছি আমরা। তবে আমরা আর গরীব জন্মাতে দিই না যে, সেটা অন্য উপায়ে।'

বিস্মিত গান্ধীজী। 'সে কি করে? জন্মাতে দাও না?'

'মানে এই যে গরীবের ঘরে সন্তান গর্ভে জন্মের সঙ্গেই তাকে ডাক্তারী করে মোটেই জন্মাতে দেওয়া হয় না আর।'

'অর্থাৎ নষ্ট করে দাও? ভ্রূণহত্যা! হায়! হায়! হায় রাম!'

মন্ত্রীজী লজ্জিত। 'কতকটা তাই। তবে তখন ত মাত্র সবে জন্মেছে! এটাতে সব মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীদের সম্মতি ছিল।

গান্ধীজী নীরব। তারপর বললেন, 'আর গরীব পিতামাতারা তাদের কোথায় সব গেল?'

সহাস্যে শ্রমমন্ত্রী বললেন, 'গরীবরা বারবার খাদ্য সঙ্কটের কয়েক বছর ধরে প্রায় সব অর্দ্ধাশনে অনশনে জীর্ণ হয়ে হয়ে মরেই গেছে। কিছু মরেছে নানারকম বেকার সমস্যায় কর্মহীন হয়ে। আত্মহত্যাও করেছে পেটের দায়ে বহু ছোট ছোট ব্যবসায়ী ব্যাপারী। যেমন সেবারের চীন আক্রমণের সময় স্যাকরা মরেছে। তার পর বিদেশী দুধের অভাবের সময় গোয়ালারা দুধের, খাদ্য-বিক্রেতারা 'হালওয়াইজাত' বাংলার ময়রারা—সবাই মরেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর পাকিস্তান হয়ে জেলেরা মরেছে অনেক। মাছের ব্যবসায় অভাবে। বহু কুমোর কাঁসারীরা মরেছে। পিতল কাঁসা মাটির বাসন লোকে আর কেনে না ত। বড় লোকেরা এখন ওসব ব্যবহার করে না। ঝি-চাকর শ্রেণীরা মরেছে। সম্পন্ন লোক হোটেলে খায় থাকে। আছে কিছু রাজমজুর। তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীর মজুর আর কলকারখানার মজুর। আর কাপড়ের সুতোর চিনির কলের মজুর ওষুধ কারখানার (বিব্রতভাবে) এই আবগারীর কারখানার মজুর। গরীব চাষীরাও খাদ্যসঙ্কটে লোপ পেয়ে গেছে। চাষের জমিতে কারখানা বসিয়েছি। তবু আমাদের ত ভোটের জন্য ওদের কিছু প্রয়োজন হয়। অবশ্য আমরা আজকাল মুসলমানদের ভোট খুব বেশী পাই। *ওখানে ত ফ্যামিলিপ্ল্যানিং এক বিবাহ আইন চলে না। ওরা খুব বেড়ে গেছে। আপনিও ত ওদের পছন্দ ও সমর্থন করতেন দেখেছি! বেপরোয়াভাবে শেষ কথাটা* বললেন।

গান্ধীজী স্তব্ধ। কিয়ৎকাল পরে বললেন, তা দুধের ব্যবসা কারা করছে? গয়লা নেই যদি? দেশের গোধনের সেবা কারা করে? গরু নেই দেশে দেখছি। চাষা নেই বলছ, খাও কি?

খাদ্যমন্ত্রী (সহাস্যে) আমরা সব গুঁড়ো দুধ বিদেশী দুধ দিয়ে চালাই। আর চাষ-বাস প্রথাও আর দেশে রাখি নি। গম চাল গুঁড়ো দুধ দুধের খাবার ক্রিমযুক্ত চকোলেট খাদ্য টিনের মাছ মাংস সৌখীন দ্রব্য সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প সব অন্য অন্য দেশ থেকে আনাই। কিছু টাকা বেরিয়ে যায় বটে, তবে গরীব পোষণের মহা ঝামেলা থেকে বেঁচে যাই। যন্ত্র-শিল্প আমরা ওদের কাছে সব কিনে কিনে আমাদের ছাপ লাগিয়ে স্বদেশী বানিয়ে নিই। ওরাও আপত্তি করে না। ওদের বিক্রী হ'লেই খুসী। গরু কিছু অবশ্য আছে। সে সব মুসলমানদের খ্রীষ্টানদের কসাইখানার জন্য রাখতে হয়েছে ওদের ভোট আমাদের ত কাজে লাগে।'

গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ মোড় ফিরলেন। এবং দ্রুত চলতে লাগলেন। সাঙ্গপাঙ্গরা ডাকলেন, 'বাপুজী' পার্লামেণ্ট হাউস কত বড় হয়েছে একবার দেখবেন না?

পথে সুবেশা বিলাসিনী চটুল নৈশনারী দল বিচরণ করছে। হৃষ্টপুষ্ট সকলেই। দীনহীন জনের জনতাহীন পথ। আলোয় ঝলমল করছে।

গান্ধীজী কোন্‌দিকে যাচ্ছেন?

'বাপুজী গাড়িতে উঠবেন? আমার নতুন মোটরে?' তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

গান্ধীজীর সঙ্গের স্বর্গীয় মন্ত্রীরা হাসলেন। তাঁদের গাড়ি লাগল না। বায়ুভূত দেহের গাড়ি কি প্রয়োজন।

দরিদ্রহীন ধনী ভারত! স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন সুন্দর নির্জন সুখী ভোগী ধনী ভারতের রাজপথ। সমৃদ্ধ হৃষ্টপুষ্ট শ্রেষ্ঠী বণিক ধনিকে পরিপূর্ণ। গান্ধীজীর রাম রাজ্য! ধ্যানের ভারতবর্ষ। কিন্তু গান্ধীজী পালাচ্ছেন কেন?

দেখতে দেখতে রাজঘাটের পথের দিকে এসে পড়লেন গান্ধীজী। পিছনে স্বর্গীয় বন্ধুদের সঙ্গীদের দলও আসছেন। এবং জীবিত সরকারী কর্মচারীরা প্রত্যুৎ-গমনের জন্য। জানুয়ারীর ভোরের কুয়াশায় বাগান আচ্ছন্ন হয়ে আছে কিছু দেখা যায় না।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ লাঠি আর খড়মের শব্দ বাগানের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। কে আসছে? কারা আসছে? দেখা যায় না। বোঝা যায় না কে এল এই শীতের ভোরে? রাজঘাটের শঙ্কিত আতঙ্কিত প্রহরীরা জেগে উঠে কাঠের মত দাঁড়িয়েছিল নীরবে।

ভোরের সাদা গভীর কুয়াশার মধ্যে সেই শব্দ দূরে দূরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে নীরব হয়ে গেল।

—

বাসে ট্রামে মহিলা—তাঁদের সমস্যা

পৌনে ৯টা প্রায় বাজে। খেতে খেতে হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। বাকিটুকু কোন রকমে গলাধঃকরণ করেই উঠে পড়লাম। তাড়াহুড়াতে ভালো করে মুখটিও ধোয়া হ'ল না। আলতো হাতে মুখটাকে মুছে নিয়েই স্লিপারটি গলিয়েই দৌড় দিলাম। লক্ষ্য ছিল সামনের পীচঢালা রাস্তাটার দিকে। 'খাওয়ার পর বিশ্রাম স্বাস্থ্যরক্ষায় অপরিহার্য'—কিন্তু তাত দূরের কথা, বরঞ্চ কোন রকমে খেয়ে প্রায় দৌড়ে রাস্তা শেষ করতে গিয়ে বাঁদিকের তলপেটে একটি ব্যথাও অনুভব করলাম। হাতঘড়িটির দিকে আর একবার তাকাতেই চমকে উঠলাম। ৯টা বাজতে এক মিনিট বাকী। সামনের বড় রাস্তায় তখন ৯টার বাস এসে গিয়েছে। মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জা ভুলেই দৌড়তে হল। বাসটিকে কোনরকমে দাঁড় করানোও গেল। কিন্তু দরজা জুড়ে ভীষণ ভীড়। অনুনয় করলাম, 'একটু সরুন, একটু ভিতরে যেতে দিন।' কিন্তু অফিসযাত্রী ভদ্রলোকদের কানে আমার অনুনয়টুকু কোন রকমেই পৌঁছল না। বাসটি ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। নজরে পড়ল জানালার ধারে "লেডীস সীট" নামাঙ্কিত স্থানটি জুড়ে ভদ্রলোকেরা বসে আছেন নিশ্চিন্ত আরামে। কোন এক অফিসযাত্রিণী যে বাসে উঠতে পারলেন না, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। চোখের সামনে দিয়ে বাসটিকে চলে যেতে দেখে অসহায় এক রাগে জ্বলে উঠলাম। কিন্তু উপায় নেই। Office-এ লেট হবে জেনেও পরবর্তী বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল।

প্রায় দশ মিনিট পর যখন আর একটি বাস এল, তখন কোনরকমে নিজেকে দরজার ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিয়েই থমকে গেলাম। ক্রুদ্ধ কয়েকটি পুরুষ-কণ্ঠ তখন তীব্র ভাবে আমাকে আক্রমণরত—"কেন যে office time-এ ঝামেলা করতে বাসে ওঠেন, বুঝি না। অন্য সময় বেরলেই হয়। নিজেদেরও অসুবিধায় ফেলেন, আমাদেরও।" প্রতিবাদ করবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। লজ্জায়, ঘৃণায় আফশোসে নিজেকে তখন মাটির সংগে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিল।

শুধু আমাকে নয়, অফিসযাত্রিণী এবং স্কুল-কলেজ-যাত্রিণীদের ঠিক একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন মন্তব্য আর বিদ্রূপ মনে জ্বালা ধরায়। কিন্তু প্রায়শঃই এ সমস্ত অবিবেচকের মন্তব্যের উত্তর দিতে আমাদের মত ভদ্রমহিলাদের প্রবৃত্তি হয় না। আবার বহু সময়ই ভদ্রের ছদ্মবেশে বহু অসভ্য ব্যক্তি সুযোগ সন্ধানের জন্য বাসে-ট্রামে থাকেন। তাঁরা অধিকাংশ সময়ই মেয়েদের প্রতি অশালীন ব্যবহার করে থাকেন। ব্যবহারটি চেষ্টাকৃতই, কিন্তু তবুও আমরা প্রতিবাদ করতে ভরসা পাই না। কারণ তা হ'লেই ভীড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠবে, "অতই যদি সতীত্ব হারাবার ভয় তবে ট্যাক্সিতে গেলেই হয়।"

বর্তমান কালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঘরকুনো বাঙ্গালী মেয়েকে ঘরের বাইরে টেনে বাহির করেছে। গৃহকোণকে সুখী ও শান্তির নীড় তৈরী করবার জন্য বাঙ্গালী মহিলারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে থাকেন। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি এমনই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে শুধু ঘরে পরিশ্রম করে, স্বামী-

সন্তানদের পরিচর্যা করে দিন কাটিয়ে দেওয়া কোন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মহিলার পক্ষেই সম্ভবপর নয়। নিদারুণ অর্থসংকট থেকে সংসারকে রক্ষা করা এবং সংসারের স্বাভাবিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে আজ তাই বাঙ্গালী মহিলারা পথে নেমে দাঁড়িয়েছেন। স্বামীর কর্তব্য এবং দায়িত্ব তাঁরা ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁদের অসুবিধা অনেক। একাধারে ঘর এবং কার্যক্ষেত্র সামলাতে গিয়ে অনেক সময়েই হাঁপিয়ে উঠতে হয়—কিন্তু তবু তাঁরা অধৈর্য হন নি। তাঁদের স্বাভাবিক সহনশীলতাই তাঁদের রক্ষা করেছে। সংসারের সুখে নিজেদের সমস্ত কায়িক পরিশ্রম হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন।

আমাদের মত অনুন্নত দেশে, অনুন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় বিবিধ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একাধারে সন্তান পালন, গৃহকাজ এবং বাইরের কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পেরেছেন। এটি কম গৌরব এবং প্রশংসার কথা নয়।

বর্তমান পরিস্থিতি মেয়েদের পথে নামতে বাধ্য করেছে সত্য। পুরুষের সংগে সংগে প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে মেয়েদেরও সৈনিক হ'তে হয়েছে। কিন্তু আজও আমাদের দেশে মহিলা-কর্মীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। সেই কারণেই, মহিলা-কর্মীদের বিবিধ ঝামেলা এবং বহু ঝঞ্ঝাট সহ্য করে কাজ করে যেতে হয়। অনেক সময়ই তাঁদের স্বাভাবিক সম্ভ্রম-টুকুও নষ্ট হতে দেখা যায়।

সরকারের একক চেষ্টাতে বোধ হয় এ সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। সমস্যা সমাধানে বাঙ্গালী পুরুষ-সমাজকেও সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কারণ বর্তমানে আমাদের, আমাদের মত চাকুরিজীবী মহিলাদের প্রধান সমস্যা কিন্তু এই বাঙ্গালী পুরুষ-সমাজ।

মেয়েদের এই যে উদ্যম, এই যে ভীড় ঠেলে অফিস-স্কুলে যাওয়া, এটি যেন কোনমতেই তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। যাঁরা নিজেদের খুব বেশী প্রগতিবাদী বলে চীৎকার করে থাকেন তাঁরাও বিভিন্ন সময় নারী-প্রগতির বিপক্ষে বহু কথা বলে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে বহু পুরুষকেই ব্যঙ্গোক্তি করতে শোনা যায়। আজকাল এট প্রবণতা যেন একটু বেশী। কারণটি বোধ হয় একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই পাওয়া যাবে। তা হ'ল, নারী-অগ্রগতি তাঁদের চোখে অসহ্য। সেই মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁরা ফিরে যেতে চান—যেখানে তাঁরা বেশ কায়দা করেই নারীকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান যুগ তাই মহিলা-অগ্রগতি তাঁদের মনে কিছুটা জটিল মানসিকতার সৃষ্টি করে। এককথায় তাঁরা প্রভুত্ব হারিয়ে বেশ ক্ষিপ্ত হচ্ছেন।

বর্তমান যুগের মহিলারা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন। তাঁরা তাই পুরুষের সংগে সমান তালে চলবার সংকল্প নিয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নারী আজ তার পুরুষ-নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। পুরুষের দাসত্ব কাটিয়ে আজ তাঁরা তাদের সংগে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী করছেন। বহুক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছেন। পুরুষের কাছে এটি একটি ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা জেনেছেন নারী-প্রগতির বন্যা তাঁরা রুখতে পারবেন না। সেই কারণে তাঁরা কিছু না পেরে মহিলাদের বিশেষ করে অফিসযাত্রিণীদের দিকে বিদ্রূপ ছুঁড়ে সুখী হ'তে চেষ্টা করেন। কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে আনন্দ পেতে চান।

কিছু সংখ্যক পুরুষ ত প্রায় জেহাদ ঘোষণা করতে চলেছেন—তাঁদের দাবী বাসে-ট্রামে মহিলাদের জন্য পৃথক সীট থাকা চলবে না। তাঁদের বক্তব্য নারী যদি এতই উন্নতি করে থাকতে পারে তবে তাঁদের মতই বা তাঁরা বাসে-ট্রামে ঝুলে যাবেন না কেন? (যদিও বহু মেয়েই আজকাল বিপদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়েই তা করে থাকেন।) তাঁরা মনে করেন মেয়েদের অসহায়ত্বের বড় প্রমাণ এই লেডীস সীট। ষ্টেট বাসে মহিলা এবং শিশুদের এক পর্যায়ে ফেলা হয়েছে—এতে তাঁরা উল্লসিত হন।

তাঁদের এই যুক্তিগুলো হয়ত মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা সুন্দর এবং স্বাভাবিক না হচ্ছে এবং যতদিন বর্তমান পুরুষ-সমাজ আরও একটু সভ্য এবং মহিলাদের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন না হচ্ছেন ততদিন বোধ হয় বাসে-ট্রামে লেডীস সীট তুলে দেওয়া একেবারেই সম্ভবপর নয়।

আজকাল সরকারের চেষ্টায় বিভিন্ন পথে অফিস টাইমে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট বাস চলাচল করছে। কিন্তু এতে সম্পূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান হয় নি। সমস্ত মহিলা কর্মীদের চাহিদা মেটে নি। সরকারকে আরও সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে পুরুষের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। তাঁরা যেন একটু চিন্তা করে দেখেন যে, মহিলারা অবসর

বিনোদনের জন্য কিংবা নিজের খেয়াল-খুশীতে পথে নামেন নি। পথে নামতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের পথে নামার পিছনে একটি বড় উদ্দেশ্যই বর্তমান। তা হ'ল পুরুষের বোঝাকে হাল্কা করে যোগ্য সাথী হওয়া।

তা না হ'লে ঘরে-বাইরে মহিলারা এত পরিশ্রম কখনই করতে পারতেন না। স্বামী, পরিবারের জন্যই তাঁরা হাসিমুখে সমস্ত দৈহিক ক্লেশ সহ করছেন, সহ্য করছেন শুধু সংসারের মুখে হাসি ফোটাতে—পরিবারকে সচ্ছল করতে। সমস্ত পুরুষ জাতির কাছে আজ আমাদের এই আবেদন—তাঁরা মহিলা-সমাজকে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন। সহানুভূতি এবং প্রগাঢ় উদারতা নিয়ে মহিলা-কর্মীদের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হোন।

অমর প্রেমকথা : শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশরী, ইউ, এন, ধর য়্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

কয়েকটি পৌরাণিক প্রেমের কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। সংস্কৃত কাব্য-নাটো এই গল্পগুলি দেখা যায়। পূর্বে এই ধরনের প্রেম-কাহিনী সুবোধ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন। তবে এগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গল্প। অনুবাদ বা ভাবানুবাদ যাহাই হোক, এ গল্প লিখিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার সহিত সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজন নহিলে ইহার ক্লাসিক মর্যাদা থাকে না। লেখক সেই সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। শুধু সঙ্গতি রক্ষাই নয়, ভাষা বেশ সুসমৃদ্ধ অথচ মধুর। লেখক কেবল কাহিনীটুকুই বলেন নাই, মূল রসের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এরূপ গল্প লেখা কঠিন। লেখক সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। বইখানি সকলেরই ভাল লাগিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আরাবল্লীর কাহিনী : জ্যোতির্ময়ী দেবী, মেরিট পাবলিশার্স, ৫১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

নাম শুনিয়াই বুঝা যায়, এই গ্রন্থখানি রাজস্থানের গল্পের সংকলন। গল্পগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখিকা জীবনের বহু বৎসর রাজস্থানে কাটাইয়াছেন, তাই গল্পগুলি এতটা বাস্তব হইতে পারিয়াছে। আর ইহাও সত্য কথা, তিনি ছাড়া ঐ দেশের গল্প শুনাইবেই বা কে?

জ্যোতির্ময়ী দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে আজ নূতন নয়। চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার বহু লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় স্বনামের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁর অধিকাংশ লেখার মধ্যে জীবনের বিচিত্র গার্হস্থ্য রস এবং বাঙালী ঘরের প্রতিদিনের কথা অতি সহজ ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠিক একই কারণে তাঁর 'আরাবল্লীর কাহিনী'কে রাজস্থানের প্রতিচ্ছবিরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি। তাঁর লেখা সার্থক হইয়াছে।

দেবতার চেয়ে বড় : রণজিৎকুমার সেন, মোহন লাইব্রেরী, ৩৫ এ, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

অবাঙালী নায়ক-নায়িকার প্রেমোপাখ্যান লইয়া এই উপন্যাসটি রচিত। কাহিনীর মধ্যে নূতনত্ব না থাকিলেও, প্রকাশভঙ্গিতে ইহা সুন্দর হইয়াছে। লেখক খ্যাতনামা, তাই ভাষাকে খেলাইতেও জানেন। এই লেখার মাধুর্যেই অবাঙালী পরিবেশটিও ভাল ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমের দুঃখের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায় যদি তার গর্ব করিবার মত কিছু থাকে। দয়ালকে লইয়া সেই গর্বই একদিন লক্ষ্মীবাঈ করিতে পারিয়াছিল। লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবন এইখানেই সার্থক হইয়াছে।

উপন্যাস পড়িতে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের এ বই ভাল লাগিবে।

দিগন্তের আলো : মৃণালকান্তি পাল, অন্নপূর্ণা লাইব্রেরী, কলিকাতা—৬। মূল্য চারি টাকা।

দিগন্তের আলো গল্পের বই। ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। কারণ উপন্যাসের পটভূমিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গল্প হিসাবে ইহাকে বিচার করিতে গেলেও, ইহার গল্পাংশও অত্যন্ত দুর্বল। কয়েকটি চরিত্র যাহা চিত্রিত হইয়াছে তাহাও অনভিজ্ঞ হাতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। লেখকের ভাষা আছে, চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে ঠিক সুরটি ধরিতে পারিবেন। তবে নূতন প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাকে ভালই বলিতে হইবে। আমরা লেখকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

হৃদয়ের স্বাক্ষর : জগদীশপ্রসাদ দাশ, অ্যালফা পিটা, কলিকাতা-১। মূল্য চার টাকা।

মনীষা আর অসীম এই দু'টি চরিত্রকে লইয়া উপন্যাসখানি রচিত। দু'জনই দুজনকে ভালবাসিয়াছিল, বিবাহও হইত কিন্তু ঘটনা-বৈচিত্র্যে নায়ক অসীমের জীবন অন্যদিকে মোড় লইল। অবশ্য তাই বলিয়া তাহাদের প্রেম কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অসীম সৈনিক সৈনিকের মতই সে মনীষার কাছে বিদায় লইল।

দু'টি চরিত্র লেখক সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। লেখকের লেখায় মুন্সিয়ানা আছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। গল্পের শেষ টানও লেখক টানিতে জানেন। ভাষা সুন্দর, প্রকাশভঙ্গি সুন্দর। বইটি সমাদর লাভ করিবে।

কিছু থাকে অদেখা : শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সেকাল একাল, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২'৫০।

কয়েকটি গল্পের সমষ্টি লইয়া গ্রন্থখানি গ্রথিত। গল্পগুলি সুখপাঠ্য। তবে সব গল্পই গল্প হয় না। গল্প লিখবার একটা 'টেকনিক' আছে। লেখকের ভাষা ভাল, ঐ টেকনিকের অভাব। বিশেষ করিয়া ছোটগল্প মোচড়ের উপর নির্ভর করে। যিনি এই শেষ টান টানিতে জানেন তিনিই বড় লেখক। বইখানি সাধারণের ভাল লাগিবে।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বসন্তের দূত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শিল্পী : সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ প্রথম খণ্ড	শ্রাবণ, ১৩৭৩	চতুর্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অর্থনীতির সুনীতির কথা

মানুষ যেখানেই থাকে ও তাহার কর্ম্ম ও কার্য্য যেভাবেই, যে উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হয়; সকল ক্ষেত্রে ও সকল সময়েই ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা তাহার সহিত জড়িত হইয়া যায়। চিকিৎসক যেখানে রোগীর জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন, শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেছেন, ধীবর মৎস্য ধরিবার কার্য্যে লিপ্ত অথবা চাষী চাষ করিতে থাকেন; সকল প্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টারই একটা ন্যায়-অন্যায়ের দিক থাকিতে পারে ও সাধারণত থাকে। ইহার কারণ এই যে মানুষের সকল কার্য্যই বিভিন্ন ভাবে অপরাপর মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে ও অপরের জীবনের সুখ দুঃখের বা ভাল-মন্দের কারণ হইতে পারে। কোন ধর্ম্ম-গুরুর শিক্ষার ফলে যদি কোন মানুষ সকল কর্ত্তব্য ভুলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন করেন ও ফলে যদি তাঁহার পরিবারের অসহায় বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও সন্তানেরা নিদারুণ কষ্টভোগ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মগুরুর শিক্ষার ফল যে একান্তভাবে ন্যায়ধর্ম্ম অনুগত হইয়াছে তাহা বলা চলে না। যাঁহার কর্ত্তব্য রন্ধন করা তিনি যদি রন্ধন না করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকেন তাহা ধর্ম্মের দিক দিয়া উত্তম বিবেচিত হইলেও যাঁহাদিগের খাওয়া বন্ধ হইবে তাঁহাদিগের মতে অন্যায় বলিয়া ধার্য্য হইবে। বহুলোকের সুখ-সুবিধা বলি দিয়া যদি কেহ মন্দির নির্ম্মাণ করান কিংবা অপর কোন উচ্চ আদর্শ-সংরক্ষক কার্য্য করান, তাহা হইলেও যোগবিয়োগ করিয়া দেখা প্রয়োজন হইবে যে, কত লোকের কি প্রকার উন্নতি-অবনতি বা লাভ-ক্ষতি সেই প্রচেষ্টার ফলে হইতে পারে। যদি লাভ ও উন্নতির অঙ্ক ক্ষতি ও অবনতির অঙ্কের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন হয় তাহা হইলে সেই মহান প্রচেষ্টা জনকল্যাণ বিরুদ্ধ বলিয়া বিচার করা হইবে। অর্থনীতির কথা সচরাচর মানুষে শুধু আর্থিক লাভ-ক্ষতি দিয়াই বিচার করিত। অর্থাৎ আর্থিক লাভ হইলেই তাহা উত্তম ও ক্ষতি হইলেই বিপরীত বলিয়া ধরাই আর্থিক প্রচেষ্টা বিচারের নিয়ম ছিল। এই নিয়ম বহুকালাবধি প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরে, যখন দেখা যাইতে লাগিল যে একের আর্থিক লাভের ফলে অপরের লোকসানের ভার বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছে, তখন মানব সমাজে সকল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টারই সমষ্টিগত ও সামাজিক লাভ-লোকসানের কথা আলোচনা হইতে সুরু হইল। পূর্ব্বকালে আর্থিক প্রচেষ্টাগুলি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ছিল এবং তাহার দোষগুণ বিচার করার কোন বিশেষ পদ্ধতি কেহ নিয়ন্ত্রিত করে নাই। কিন্তু বিগত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে আর্থিক প্রচেষ্টাগুলি ক্রমশঃ দানবীয় আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে ও সেইগুলির লাভের পরিমাণও গগন স্পর্শ করিতে লাগিল। এক একজন মানুষের কবলে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী নিদারুণ দারিদ্র্যে

নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, মানুষকে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে ক্রীতদাস করিয়া দেওয়া হইল ও অসংখ্য মানুষ অপর কোন মানুষের আর্থিক সুবিধার জন্য দেশ গ্রাম ও গৃহহারা হইয়া কারখানা বা বৃহৎ কৃষিকেন্দ্রে পশুর মতই চালান হইতে লাগিল। মানুষ চালান ও বিক্রয় করিয়ে ও ব্যবসাদারগণ লাভ করিতে লাগিল। অর্থনীতির এই সুনীতি বিরুদ্ধতা বহুমুখীভাবে চলিতে থাকায় সমাজদর্শনের দিক হইতে এই জাতীয় ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টার সমালোচনা স্বভাবতঃ প্রবল আকার ধারণ করিল। ক্রীতদাস প্রথা লইয়া যে আন্দোলন হয় তাহার ফলে মতবাদ ক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লব ও যুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নীলকুঠি, চা বাগানের কুলি, চিনির কারখানার আখের ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং আফ্রিকা-এশিয়ার রবার গাছের বাগানের শ্রমিকদিগের উপর ইয়োরোপের মালিকদিগের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী সর্বজন বিদিত। আর্থিক লাভের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জনের উদাহরণ ইহা অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নহে।

কিন্তু মানুষের আর্থিক প্রচেষ্টার প্রকটতম অঙ্গরূপে এই সকল অমানুষিক বিবেকহীনতার নিদর্শন মানব ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইলেও একথা মানিতে হইবে যে, পৃথিবীতে মানুষ অর্থকরী কার্য্য যত করিয়া থাকে তাহার অল্প অংশই এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। শত লক্ষ মানব যে যুগে যুগে নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্রগুলি চাষ করিয়াছে, নিজ নিজ বাসগৃহ গঠন ও সংস্কার করিয়াছে, জাল বা ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিয়াছে, দাহন বহন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অল্প সংখ্যক পশুপালন করিয়াছে, অথবা যাঁতায় গম পিষিয়াছে, ঢেঁকিতে ধান কুটিয়া চাউল করিয়াছে, ঘানিতে পিষিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়াছে, কুম্ভকার চাকা ঘুরাইয়া মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, অপর কর্ম্মীগণ বস্ত্রবয়ন, অলঙ্কার গঠন, ধাতুপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য মূল্যবান দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া মানবের জীবনযাত্রা সুগম করিয়াছে, অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সেই সকল স্থান-কালে সুদূর-বিস্তৃত সংখ্যাহীন অভিব্যক্তির মধ্যে প্রায় কোথাওই কোন দানবীয় আকারের বিবেকহীন শোষণ চেষ্টার প্রকাশ লক্ষিত হয় না।

সমাজে পূর্ব্বকালে যে সকল অল্প সংখ্যকব্যক্তি অর্থে বা শক্তিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে জনহিত, দান ও ধর্ম্মের প্রতি একটা শ্রদ্ধা দেখা যাইত যাহার জন্য সেই সকল যুগে বহু মন্দির ও ধর্ম্ম-সংস্থান গঠন, অন্ন ও জলছত্র স্থাপন, বৃক্ষ রোপণ, পুষ্করিণী ও কূপ খনন ইত্যাদি হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও যে হয় না তাহা নহে। রকেফেলার, কারনেগী ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশন প্রভৃতিতে বহু ধনিকের জনহিতের জন্য দান দেখা যায়। পৃথিবীতে বহু সহস্র চিকিৎসালয়, শিক্ষাকেন্দ্র, পাঠাগার, প্রদর্শনী, আতুর-অনাথাশ্রম প্রভৃতি ধনবানদিগের দানে চলিতেছে। এই কারণে রাজা-প্রজা অথবা প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধে নির্ভরশীল সভ্যতা হইলেই তাহাতে শুধু অন্যায় ও অপরের প্রাপ্য ছলে বলে- কৌশলে নিজ করায়ত্ত করিয়া ধনী আরও ধনী এবং শ্রমিক আরও গরীব হইবে একপ কোন রূপ যুক্তিতে নিতান্ত গ্রাহ্য না হইতে পারে। কারণ দান প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যখন রীতিনীতি বা নিয়মকানুনে পরিণত হয় তখন জাতীয় উপার্জ্জনলব্ধ সকল ঐশ্বর্য্য বণ্টনে অধিক সাম্য আনয়ন করা সহজ হইয়া আসে। জাতীয়-ভাবে অধিক ধনবান ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য আংশিকভাবে রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিয়া সেই অর্থে অপেক্ষাকৃত অল্পবিত্ত লোকের সাহায্য করার নিদর্শন সর্ব্বদেশেই দেখা যায়। ব্যক্তিগত ভাবে ঐশ্বর্য্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকিলেও অর্থনৈতিক সাম্য বৃদ্ধি করা অসম্ভব না হইতে পারে। অপরদিকে যে আদর্শ ও অর্থনৈতিক মতবাদের ফলে কোন কোন মানুষেরা ব্যক্তিগত ধন উৎপাদন, বণ্টন, সংরক্ষণ ও ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভাবে তাহা সম্ভোগ নিবারণ করিয়া আর্থিক সকল ব্যবস্থাই সমষ্টিগত ও সামাজিক ভাবে করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে সকল ব্যক্তির সমগ্র কর্ম্মশক্তির ও সকল উপাদান বস্তুর পূর্ণ ব্যবহার হয় বলিয়া যে ধারণা প্রচলিত করিবার চেষ্টা হয় তাহাও বহুক্ষেত্রে সত্য না হইতে পারে। কারণ সমষ্টিগত ও সামাজিক নিয়মানুযায়ীভাবে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া ততটা সহজে হয় না যতটা হয় ব্যক্তিগত ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে। এক ব্যক্তি ছিপ ফেলিয়া একটা মাছ ধরিয়া তাহা নিজে ভোগ করিতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে যদি ছিপ ফেলিবার পূর্ব্বে জাতীয় মৎস্য পালন সংস্থার নিকট চাকুরি বা হুকুমনামা লইয়া পরে মৎস্য ধরিতে হয়, তাহা হইলে ছিপ ফেলা হয়ত অসম্ভব হইবে।

অপরাপর বহু ক্ষুদ্রাকার অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টাই সামাজিক বা সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ করিয়া লইতে হইলে সে সকল কার্য্য হওয়া অসম্ভব হইবে। দুই-চারিটি লাউ, কুমড়ার গাছ লাগান কিংবা অল্প সংখ্যক বৃক্ষরোপণ, হাঁস মুরগী পালন, তরিতরকারি চাষ, দুগ্ধের কারবার, ছাগভেড়া প্রভৃতি পশু পালন আরও বহু কিছু দেখা যায় যাহা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির নিজ নিজ চেষ্টায় হইয়া থাকে। সমষ্টিগত ব্যবস্থায় এই জাতীয় উৎপাদন কার্য্য করা প্রায় অসম্ভব হইবে। এমন কি কুটির শিল্পের বহু ব্যবস্থাই একান্ত ব্যক্তিগত। আমাদিগের দেশে বেশীর ভাগ চাষই ক্ষুদ্রায়তন ও ব্যক্তিগত এবং তাহার মোট পরিমাণ জাতীয় ঐশ্বর্য্যের একটা বৃহৎ অংশ। এই কারণে সমষ্টিগতভাবে চাষের জিনিস জোগাড় করিয়া বিক্রয় করিতে যাইলে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বণ্টন ব্যবস্থার ব্যয় অধিক হইয়া যায়।

সুতরাং জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অল্প ব্যয়ে উৎপাদনক্ষম এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টাগুলির ব্যয় অনেক অধিক। রসুলপুরের বাজারে কুমড়া বিক্রয় যদি সমষ্টিগত ভাবে করা হইত তাহা হইলে কুষ্মাণ্ড উৎপাদন ও বণ্টন অসম্ভব হইত। চাউল, গম, ডাল প্রভৃতিরও উৎপাদন হইবে না যদি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহা করা হয়। এবং হইলেও "সরকারী" খরচার ধাক্কায় সকল বস্তুর মূল্য দশগুণ হইয়া দাঁড়াইবে। বৃহদায়তন কারবারগুলি সমষ্টিগত ভাবে গঠিত হওয়া সহজ এবং তাহাদিগের বস্তু উৎপাদন ব্যয় ব্যক্তিগত বা যৌথ কারবারের তুলনায় অধিক না হইতেও পারে। কিন্তু আমাদিগের অভিজ্ঞতা যাহা তাহাতে দেখা যায় যে, সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা অল্প ব্যয়ে হয় না। গঠনকালেও সেইগুলির মূলধন ব্যক্তিগত সম্পদের যৌথ কারবারের তুলনায় অধিক প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত বা যৌথ কারবারের পরিচালনায় অনেক অধিক সুব্যবস্থা দেখা যায়। ইহারও কারণ "সরকারী" বেতন উপভোগের সহজ ও সরল রীতি ও আমলাতন্ত্রের নিষ্কর্ম্মা অথবা দীর্ঘসূত্রী ধরনধারণ। ইহার উপর দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালের ব্যক্তিগত মালিকানার যে শোষণ দোষ ছিল, বর্ত্তমানে তাহা সমষ্টিগত অধিকারে গিয়া জমাটভাবে দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ যৌথ কারবারের মজুরী ও বেতনের হার সরকারী শ্রম মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক। বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, খেলাধূলার ব্যবস্থাও যৌথ কারবারের সরকারীর তুলনায় উত্তম। অতএব আমাদিগের যে অর্থ নৈতিক মতবাদ তাহার বিচার নূতন করিয়া বাস্তব অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া করা প্রয়োজন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জার্ম্মানীর বা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশিয়ার বর্ণনা পাঠ করিয়া ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতবর্ষের অর্থনীতির সূত্র রচনা বুদ্ধির কার্য্য হইবে না। সমষ্টিগত ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া বর্ত্তমান ভারতের মানুষের জীবনযাত্রা সহজ সরল ও অল্প ব্যয়সাধ্য করা অধিক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। যে সকল ক্ষেত্রে তাহা হইতে পারে সেই সকল ক্ষেত্রেও তাহা কার্য্যত হইতেছে না আমলা মহলের অলস আত্মম্ভরি অকর্ম্মণ্যতার জন্য। রাষ্ট্রক্ষেত্রের নেতাগণ আরও অধিক অকর্ম্মণ্য।

আলোচনার ফলে তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব্ব করিয়া সেই অধিকারগুলিকে সমষ্টিগত করিলেই যে সর্ব্বসাধারণের সকল আর্থিক অভাব দূর হইয়া যাইবে এবং অর্থ নৈতিক শোষণ অর্থাৎ মালিকের দ্বারা শ্রম-মূল্য গ্রাস বন্ধ হইবে এইরূপ আশা করিবার কোন নিশ্চয়তা নাই। সমষ্টিগত প্রচেষ্টার গঠন ও পরিচালনা বিশেষ ক্ষতিকর হইতে পারে। ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিমণ্ডলীর যৌথ কারবার অনেক স্থলেই "সরকারী" বা সমাজতান্ত্রিক কারবার অপেক্ষা অধিক উৎপাদনক্ষম এবং সেই সকল কারবার শ্রমিকদিগকে উৎপাদিত ঐশ্বর্য্যের ভাগও অধিক হারে দিতে সক্ষম। ব্যক্তিগত লাভের যে অংশ রাজস্ব হিসাবে লওয়া হয় তাহার তুলনায় সরকারী কারবারের লাভ অতিশয় অল্প। অর্থাৎ সরকারী কারবার অপব্যয়সঙ্কুল ও ক্ষতিকর হওয়া অসম্ভব নহে এবং জাতীয় মূলধন ও উৎপাদন শক্তি ও উপাদনসমূহ ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ব্যবহৃত হইলে জাতীয় লাভের সম্ভাবনা অধিক হইতে পারে। তাহা হইলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা হইল জাতীয় শ্রমশক্তি ও উপাদান বস্তুর পূর্ণ ও অপব্যয়বর্জ্জিত ব্যবহার পদ্ধতি। তাহার সহিত এই কথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে জাতির সকল ব্যক্তির বা অধিকাংশ ব্যক্তির শ্রমমূল্যের অর্থাৎ শ্রমোৎপাদিত ঐশ্বর্য্যের একটা বিরাট অংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে কি না। সমাজতন্ত্রের নামে এইরূপ অর্থ নৈতিক বঞ্চনা অসম্ভব নহে। ইহার কারণ, যে

ব্যক্তিগত লোভ, মোহ ইত্যাদির জন্য অতীতে মানুষ মানুষকে শোষণ করিয়া পৃথিবীর অধিক সংখ্যক লোকের অবস্থা পশুর অধম করিয়া তুলিয়াছিল ; সেই ব্যক্তিগত স্বভাবের দোষ আমলা এবং রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অর্থনীতি অথবা যে কোন নীতিরই প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তাহা হইলে ব্যক্তিগত আর্থিক অধিকার না থাকিলেও মানবসমাজে ব্যক্তির দুর্দশা সমষ্টিগত অধিকারের ক্ষেত্রেও চরমে পৌছাইতে পারে এবং পৌছায়। কোন আদর্শ বা ধর্ম্মমতের আড়ালে কোন পাপ লুক্কাইত রহিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে মত উত্তম হইলেও কার্য্য অধম হইতে পারে।

রুশের অর্থনীতি

রুশ দেশের আইন অনুসারে ঐশ্বর্য্য উৎপাদনের হাতিয়ার উপকরণ প্রভৃতি সকল বস্তু সামাজিক মালিকানার অন্তর্গত। ঐ দেশের উপরোক্ত আদর্শ উপলব্ধির জন্য বিগত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া বহু প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম দিনে আদর্শ উপলব্ধি হইতে বহু বাধার সৃষ্টি হয় ও রুশ দেশবাসীর বহু অভাব, কষ্ট ও নিদারুণ দুর্দশা সহ্য করিতে হয়। ইহার কারণ ছিল ব্যক্তিগত স্বল্পায়তন কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিকে গায়ের জোরে সমষ্টিগত করিবার চেষ্টা। পরে নিজেদের ভুল বুঝিয়া রুশ নেতাগণ সমষ্টিবাদ শুধু বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে নিয়োগ করিতে থাকেন ও ক্ষুদ্রায়তন কর্ম্মকেন্দ্রগুলিকে আদর্শবাদের ধাক্কা সহ্য না করিবার ব্যবস্থা করেন। লেনিনের মত ছিল সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং রুশের নূতন অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে অপরাপর ক্ষেত্রে সাফল্যের অভাব হইলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী হইয়াছিল। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও মাল-মশলা উৎপাদন চেষ্টা বিশেষভাবে করিয়া রুশীয় সরকার এই ক্ষেত্রে নিজ স্বাধীনতা যথাযথভাবে সুরক্ষিত করিয়া লন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, বিশেষ করিয়া ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটে। ইহার মধ্যে কৃষির উন্নতি চেষ্টা বিশেষভাবে করা হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সমবেত ভাবে যাহারা চাষ করিতেন তাঁহাদিগকে নিজ নিজ এলাকায় অধিকার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা সরকারী প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদিগকে যে সকল বাঁধাধরা নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সে সকল বাঁধাবাঁধি উঠাইয়া দেওয়া হইল। ১৯৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১৫০০০ কারখানার কারবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভুত্বের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্থানীয় সরকারের হাতে অর্পিত হইল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হাল্কা কাজের কারখানাগুলি সবই কেন্দ্রগত প্রাধান্যমুক্ত হইয়া যাইল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কারখানাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানমুক্ত করিয়া নিজ নিজ এলাকার ব্যবস্থাধীন করা আরম্ভ হইল। অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ও কারবার পরিচালনার জন্য ১০৮টি এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহক ও নির্দ্দেশ দিবার সভা খাড়া করা হইল। ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই সভাগুলির হাতে প্রায় সকল কারখানাজাত উৎপাদন কার্য্যের শতকরা ৭৩ ভাগ কাজের ভার অর্পিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সোবিয়েত দেশের মোট উৎপাদিত বস্তুর মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত হয় এবং সেই সকল উৎপাদন কার্য্য কেন্দ্রীয় আমলা দ্বারা আর করিবার চেষ্টা করা হয় না। আমলাদিগের কারবারী বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতা কত তাহা সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যদিও ঐ দেশের আমলাবৃন্দ সকলেই সমষ্টিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাহা হইলেও তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে সমাজ, সংঘ বা সমষ্টিগত অর্থনীতিকে ডুবাইয়াছিলেন। ব্যক্তির আর্থিক অধিকার, দাবি ও লোভ সংযত ও দমন করিলেও, ব্যক্তির স্বাধীন বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতাকে অস্বীকার করা যায় না। কোটি কোটি হস্ত যেখানে কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেখানে সেই কর্ম্মের সারথিগণ যদি বহুদূরে বসিয়া লাগাম টানিয়া কাজের চাকার গতি নির্ণয় করিতে যান ; তাহা হইলে কাজ হওয়া সহজ হইবে না। যেখানে কাজ তাহার নিকটে ঘনিষ্ঠভাবে কর্ম্ম-পরিচালকের অবস্থান প্রয়োজন। "লাল ফিতার" বাঁধনে সাম্রাজ্য নষ্ট হইতে পারে এবং সমাজ-তন্ত্রও অচল হইতে পারে। ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার এবং ব্যক্তির নীতিবোধের উপরেই বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। দুর্নীতি বা শোষণনীতি ছদ্মবেশে সমাজতন্ত্রে প্রবল ভাবে জাগ্রত থাকিতে পারে। নিয়মের চাপে মানুষের কর্ম্মশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই সকল কথা মনে রাখিয়া ব্যবস্থা করিলে তবেই কর্ম্মে সাফল্য সম্ভব হয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া রুশের

সমষ্টিগতভাবে জাতীয় অর্থনীতির অভিব্যক্তির যে অভিজ্ঞতা তাহার মধ্যে ভুল সংশোধনের তালিকা দীর্ঘ। সেই তালিকা দেখিলে বুঝা যায় সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির স্থান কতটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান।

চীনের সমষ্টিবাদ

চীনের বর্ত্তমান রিপাবলিকের যে মূলনীতির সূত্রমালা তাহার ১০৬টি ভাগ আছে। এই গুলিকে কনষ্টিটিউশনে আর্টিকল্‌স বলা হয়। আর্টিকল্ ৬ বলে যে জাতীয় অর্থনীতির যে অংশ সরকারী তাহা সমাজতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাই আর্থিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। খনি, জঙ্গল, জলময় স্থানগুলি, অকর্ষিত ভূমি ও আরও বহু উৎপাদনের উপকরণ জাতীয় সম্পত্তি। আর্টিকল্ ৭-এ বলা হয় যে সমষ্টিগতভাবে শ্রমজীবীদিগের সম্পত্তি হিসাবে গঠিত সমবায় চালিত আর্থিক প্রচেষ্টাগুলি অংশত সমাজতান্ত্রিক। আর্টিকল্ ৮-এ কৃষকদিগের নিজস্ব জমি থাকা জাতীয়ভাবে সমর্থিত বলা হয়। আর্টিকল্ ৮ ও ৯-এ কৃষি ও অপরাপর শিল্পের যন্ত্রপাতি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। আর্টিকল্ ১০-এ ধনপতিদিগকে ক্রমশঃ জ্ঞান ও নীতিবোধ শিখাইয়া সকল মূলধন শেষ অবধি সমাজের অধিকারগত করিবার কথা বলা হইয়াছে। চীন দেশে তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চীনের আদর্শবাদীগণ প্রথম হইতেই কম্যুনিজম্‌কে সংযতভাবে প্রচলিত করিয়া তথাকথিত বিপ্লবকে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত ছন্দ মিলাইয়া অগ্রসর হইতে দিয়াছিলেন। ফলে চীন দেশে নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনের ফলে কোনও প্রবল অশান্তি ও কলহের ঝড় বহিতে আরম্ভ করে নাই। এই আধাবিপ্লব যে পূর্ণ কম্যুনিজম্ হয় নাই এবং ইহাতে চীনের অর্থনৈতিক প্রগতি যে সহজ হইয়াছিল তাহা সহজবোধ্য। ইহা রিভিশনিজম্ কি না তাহা কে বলিতে পারে? সম্ভবত নহে, কেন না যে মতবাদ আরম্ভ হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা কি করিয়া "পরিবর্ত্তন দোষদুষ্ট" হইতে পারে?

ভারতের সমষ্টিবাদ

ভারতের সর্ব্বপ্রধান অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা হইল কৃষিকার্য্য। শতকরা ৭০ ভাগ লোক ভারতে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটায়। এই যে বিরাট কৃষি সম্পদ ইহার মূল্যবিচার সহজ নহে। জমি, যন্ত্রপাতি, পশু সম্পদ প্রভৃতির মূল্য কয়েক লক্ষ কোটি টাকা হইবে। ১২ লক্ষ বর্গমাইল জমির মধ্যে কতটা চাষের জমি তাহা ঠিক বলা যায় না। যদি শতকরা ৪০ ভাগ হয় তাহা হইলে ৩২০০০০০০০ একর অথবা প্রায় এক হাজার কোটি বিঘা হইতে পারে। ৫০০৲ টাকা বিঘা মূল্য ধরিলে ভারতের চাষের জমির মোট মূল্য ৫ লক্ষ কোটি টাকা বলা যাইতে পারে (৫০০০০০০০০০০০০ টাকা।) এই মহামূল্যবান সম্পত্তির আয় যাহা তাহা মূলধনের হিসাবে শতকরা ১ টাকা মাত্র হইতে পারে। কিন্তু শতকরা যদি ৫ টাকা আয় হয় তাহা হইলে শুধু কৃষির জমি হইতেই ভারতের জাতীয় বার্ষিক আয় ২৫০০০০০০০০০০ টাকা হইতে পারে। এই যে কৃষি-সম্পদ, ইহার মালিক, খাজনার দাবির হিসাবে, ভারত রাষ্ট্র। এই বিরাট সম্পদ যদি তাঁহারা যথাযথভাবে উৎপাদনশীল করিতে পারিতেন তাহা হইলে শুধু খাজনা হইতেই তাঁহাদিগের আয় যাহা হইত তাহাতে তাঁহাদিগের সকল আর্থিক পরিকল্পনার খরচ উঠিয়া যাইত। কিন্তু ভারত রাষ্ট্র, নিজ সমষ্টিবাদ চালাইয়াছেন শুধু লৌহ ইস্পাত, খনির তৈল, জাহাজ নির্ম্মাণ, খনি হইতে কয়লা প্রভৃতি আহরণ, প্লাষ্টিক, রাসায়নিক সার, রং, ঔষধ উৎপাদন কার্য্যের ভিতর দিয়া। ভারতের মোট কারখানার সংখ্যা প্রায় ১০০০০ (যেগুলিতে অন্তত ৫০ জন শ্রমিক কাজ করে ও বিদ্যুৎ বা অপর যন্ত্রজাত শক্তি ব্যবহার করা হয়।) ইহার মধ্যে প্রায় ২০০ শতটি রাষ্ট্রীয় ভাবে চালিত। এইগুলির মূলধন প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। ব্যক্তিগতভাবে চালিত কারখানাগুলির বার্ষিক উৎপাদন করা বস্তুর মূল্যই ১০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বহু বৎসর ধরিয়া বহু সহস্র কোটি টাকা ঋণ করিয়া ও রাজস্ব হিসাবে আদায় করিয়া ভারত রাষ্ট্র সমষ্টিগত কারবারে বিশেষ অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়েন নাই। শ্রমিক সংখ্যা, বেতনের হার, শ্রমিকদিগের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা; কোন কিছুতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় কারবারগুলি ব্যক্তিগত কারবারগুলির তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গ, রাজকর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রনেতাদিগের সকল সুবিধাই জনসাধারণ অথবা রাষ্ট্র দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিযুক্ত লোকদিগের তুলনায় বিশেষ করিয়া অধিক। সুতরাং ভারত রাষ্ট্রনেতাগণ যতই না প্রচার করুন তাঁহাদিগের আদর্শ ও মতবাদের কথা, তাহাতে কেহই মনে করিবে না

যে ভারতের সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্র জীবন্ত, জাগ্রত ও প্রগতিশীল।

প্রধানমন্ত্রীর সফর

সফরে যাওয়া ও বক্তৃতা দেওয়া ভারতের রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে একটা দুরারোগ্য ও মারাত্মক রোগের ন্যায় বাড়িয়া চলিয়াছে। সকল নেতাই ক্রমাগত বহির্দ্দেশে সফরে যান এবং সকল দেশের লোকের চিত্ত বিনোদনের কারণ হন। যদি কেহ কিছু ঋণ বা দান সংগ্রহ করিয়া আনেন তাহাতেও কাহারও পেট ভরে না; অধিকন্তু ভবিষ্যতের শোধের পালা স্মরণে অনেকের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই অতি সম্প্রতি আরব, ইউগোস্লাভিয়া ও রুশ দেশ ঘুরিয়া আসিলেন। তিনি যে যে বক্তৃতা ও ফতোয়া দিলেন তাহাতে ভারতের কোন লাভ হইল বলিয়া মনে হয় না কারণ অপর দেশের লোকেদের কাহারও কথা শুনিয়া চলা অভ্যাস নহে। তাহারা যাহা করিবে তাহাই করিবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মন্ত্রীরা চিঠি লিখিলেও যাহা করিত, সাক্ষাৎ দর্শন করিলেও তাহাই করিবে। ১০০ শত কোটি রুবল ঋণ পাইয়া ভারতের কি লাভ হইবে আমরা জানি না। সদ্ব্যয় হইলে লাভ হইবে। অপব্যয় হইলে ক্ষতি। একটা কথা মনে রাখিলে অপব্যয় কম হইতে পারে। যে অর্থ যে ভাবেই ব্যয় করা হইবে, কারবারী বিষয় হইলে তাহা হইতে লাভ হওয়া আবশ্যক। যদি কারবারী বিষয় না হয়, জনহিতের বিষয় হয়; তাহা হইলে তাহা হইতে কত লোকের কি প্রকার হিত হইল তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচর হওয়া প্রয়োজন।

ভিয়েতনাম

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ভিয়েতনাম দখল করে এবং তখন হইতেই ভিয়েতনামে স্বাধীনতা, মুক্তি ও কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে কয়েক শত বৎসর ভিয়েতনাম ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদিগের কবলে ছিল এবং কোচিন চীনা টংকিং, আনাম, কাম্বোডিয়া, চম্পা প্রভৃতি রাষ্ট্রের নামের অন্তরালে নাম-ভিয়েত দেশ নিজের নিজত্ব রক্ষা করিবার প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা অর্দ্ধ জাগ্রতভাবে রক্ষা করিয়া চলিত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতমিন্হ লীগ নামক একটি কম্যুনিষ্ট দল ঐ দেশে গঠিত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীরা ফরাসী রাজকর্ম্মচারীদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীন ইন্দোচায়না গঠন করে। ঐ বৎসরই তাহারা ভিয়েতমিন্হ আন্দোলনকে সজাগ হইয়া উঠিয়া সম্রাট বাও-দাইকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া, ভিয়েতনাম রিপাবলিক গঠন করিতে দেয়। এই রাজ্যের মধ্যে পড়ে টংকিং, আনাম ও কোচিন চীনা এবং হানয় হয় ইহার রাজধানী। ঐ বৎসরই ফরাসীগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিয়া ঐ দেশে নিজ শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেষ্টা করে ও ফলে তাহারা প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন্হ্ এর সহিত সর্ত্ত করিয়া ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনামকে ইন্দোচীন ফেডারেশনের অন্তর্গত বলিয়া মানিয়া লয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতমিন্হ্ সৈন্যগণ হানয় আক্রমণ করে ও সেই যুদ্ধ ৮ বৎসর কাল চলিতে থাকে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের মধ্যেই সম্রাট বাও দাই ভিয়েতনামকে ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। ফরাসীদিগের অধিকার এই দেশে কিছু কিছু সংরক্ষিত থাকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, কিন্তু পরে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীগণ ঐ দেশ ছাড়িয়া দেয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভা কনফারেন্সে ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি স্থির হয়। তাহাতে স্বাক্ষর করেন ফরাসী প্রধান সেনাপতি ও ভিয়েতনামের গণ-সৈন্য দলের প্রধান সেনাপতি। ঐ জেনেভা কনফারেন্সে স্থির হয় যে জুলাই, ১৯৫৬ সাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া সকল বিষয় যথাযথ নির্দ্ধারিত করা হইবে; কিন্তু নির্ব্বাচন কার্য্য কখন করা হয় নাই এবং ভিয়েতনাম বস্তুত দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাসনের অধীন রহিয়াছে।

উত্তর ভিয়েতনামে প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন্হের প্রভাব ও তিনি কম্যুনিষ্ট। তাঁহার মতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভিন্ন অস্তিত্ব থাকিবার কোন যথার্থ কারণ নাই এবং উভয় ভিয়েতনাম এক হইয়া কম্যুনিজম্ মানিয়া চলাই ভিয়েতনাম দেশের আদর্শ। এই কারণে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতকং আন্দোলন বা সশস্ত্র বিদ্রোহ চলিয়া আসিতেছে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতিগণ নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহা ন্যায্য কি না অথবা উত্তর ভিয়েতনামের ভিয়েতকংদিগকে সাহায্য করা এবং রুশ ও চীনের নিকট অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করা উচিত কি না এই কথা লইয়া মতবাদ আছে। মোটামুটি দেখা যায় যে,

উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিয়া চলিয়াছে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম ক্রমশঃ অধিকতরভাবে আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। ইহার ফলে উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদিগের সহিত আমেরিকার সৈন্যদিগের যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। হো চি মিন্‌হ এখন খোলাখুলিভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য যে দুই ভিয়েতনাম রাষ্ট্রকে এক করিয়া দেওয়া তাহা প্রচার করিতেছেন। ইহা ন্যায়সঙ্গত কি না তাহা বিচার্য্য। রুশ বা চীন এখন পূর্ণ ও প্রকাশ্যভাবে এই যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। হো চি মিন্‌হ নিজেই যুদ্ধ চালাইতেছেন ও চালাইবেন বলিয়া প্রচার করিতেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রনিয়ন্তাগণ উত্তর ভিয়েতনামের দুই রাষ্ট্রকে এক করিবার প্রচেষ্টার সমর্থন করেন না এবং তাঁহারা হো চি মিন্‌হের কার্য্যকলাপ অন্যায় ও গায়ের জোরে রাজ্য বিস্তার চেষ্টা বলিয়া মনে করেন। এই কারণে তাঁহারা আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ ন্যায্য বলিয়া ধার্য্য করিতেছেন।

বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র কি প্রকার আদর্শ বা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বিচার করা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই মতবাদ যুদ্ধের কারণ হইতেছে এবং রাষ্ট্র-সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা সত্য, ন্যায় অথবা আইনের অধিকারের ঊর্দ্ধে বলিয়াই কার্য্যত স্বীকৃত হইতেছে।

সৈন্যগণ অপরাধী কি না

কোন ব্যক্তি যদি চুরি, ডাকাইতি, গৃহদাহ কিংবা হত্যা-কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তাহাকে তখন অপরাধী হিসাবে সাজা দেওয়া যাইতে পারে; যদি প্রমাণ হয় যে সে নিজ ইচ্ছায়, সজ্ঞানে ঐ অপরাধের কার্য্য করিয়াছে। সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছায় কোন কিছু করে না। যুদ্ধের উদ্দেশ্যও বহুক্ষেত্রে তাহারা জানে না। সুতরাং তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া ধরিয়া সাজা দিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সৈন্যগণ হুকুমের উপর চলে। যে হুকুম দেয় সৈন্যের সকল কার্য্যের জন্য সেই দায়ী। হো চি মিন্‌হ্ যদি আমেরিকানদিগকে সাজা দিতে চান তাহা হইলে কোন সৈন্যকে সাজা দিলে তাহা অন্যায় হইবে। তাঁহার পক্ষে প্রেসিডেন্ট জনসনকে সাজা দেওয়াই ন্যায্য হইবে। জনসনকে না পাইলে যাঁহারা তাঁহার পরামর্শদাতা, তাঁহাদিগকেও সাজা দেওয়া যাইতে পারে। অপর পক্ষে হো চি মিন্‌হ্ স্বয়ং হুকুম দিয়া বহু লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, সে কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। আকাশ হইতে বোমা ফেলা ও জমিতে বসান কামান বা মর্টার হইতে গোলা বা বোমা নিক্ষেপ, হত্যা বা ধ্বংস কার্য্যের পক্ষে সমানই কার্য্যকর। আকাশ হইতে বোমা ফেলা বড় অপরাধ হইলে কামান দাগাও কম অপরাধ নহে।

যুদ্ধঘটিত ব্যক্তিগত অপরাধ যদি কোন রাষ্ট্রনেতা বা সেনানায়কের উপর আরোপ করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে সেই জাতীয় অপরাধেরও একটা স্বরূপ গঠিত হইয়া পড়িয়াছে বহুকালের ও বহু জাতির কার্য্য-কলাপের ভিতর দিয়া। বর্ত্তমান কালে যে সকল ব্যক্তিকে যুদ্ধঘটিত অপরাধের জন্য শাস্তি দিবার কথা উঠিয়া থাকে তাহাদের অপরাধ দেখা যায় অকারণে আন্তর্জ্জাতিক শান্তিভঙ্গ করিয়া পরদেশ আক্রমণ করিয়া মানবতার আদর্শ নষ্ট করা অথবা আক্রান্ত দেশের অসামরিক বাসিন্দাদিগকে হত্যা করা, দাস হিসাবে চালান দেওয়া প্রভৃতি যুদ্ধের সহিত সম্পর্ক-বর্জ্জিত পাপ কার্য্য করা। আরও দেখা যায় কেহ কেহ সাধারণ লোকের উপর তাহাদিগের জাতি, ধর্ম্ম, বা অপর কোন কিছু ধরিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে ও সেই সকল লোকেদের পরে যুদ্ধঘটিত অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। কোন বৈমানিক বোমা ফেলিয়াছে অথবা গোলন্দাজ তোপ দাগিয়াছে বলিয়া তাহাদের অপরাধী বলিয়া ধরা হইয়াছে বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। উত্তর ভিয়েতনাম যেরূপ ভিয়েতকংএর সাহায্যার্থে যুদ্ধে লিপ্ত আমেরিকাও সেইরূপ দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে যুদ্ধ না হইলেও পরোক্ষ ভাবে উভয়ে উভয়ের শত্রু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং যুদ্ধ না হইলেও আক্রমণ করা হইয়াছে অভিযোগটি কষ্টকল্পিত। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া যুদ্ধ চালান নূতন কথা নহে। চীনের তিব্বত বা ভারত আক্রমণ, পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ, রুশীয়ার হাঙ্গেরী আক্রমণ প্রভৃতি এই জাতীয় অন্যায় যুদ্ধের উদাহরণ। যুদ্ধ করাই প্রথমত একটা মহা অপরাধ। অকারণে, অল্পকারণে অথবা কল্পিত অভিযোগ হেতু যুদ্ধ করা আরও দোষাবহ। দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও উত্তর ভিয়েতনাম বর্ত্তমানে এক দেশ নহে। তাহাদিগের মধ্যে কোন ঘোষিত যুদ্ধ নাই। গুপ্তভাবে যুদ্ধ

কে প্রথমে চালাইয়াছে তাহা পরিষ্কার জানা যায় নাই। কোন্ কোন্ দেশ কাহাকে কি ভাবে কতটা সামরিক সাহায্য করিতেছে তাহা বলা যায় না। গুপ্ত অভিসন্ধির ও গোপন ভাবে যুদ্ধ চালানর শাখা-প্রশাখা অনেক। এক্ষেত্রে ন্যায় বা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের সততার কথা না উঠানই শ্রেয়।

আদর্শবাদ ও অপরাধ

কাহারও মতে যাহা আদর্শবাদ, অপর কেহ বলিতে পারে তাহাই অপরাধ, অধর্ম্ম, ঈশ্বর বিদ্বেষ বা মানবতাবিরুদ্ধতা। এই প্রকার ন্যায়শাস্ত্র-বর্জ্জিত মতবাদের ফলে ইতিহাসে দেখা যায় বহু খ্রীষ্টানদিগকে রোমানগণ সিংহ দিয়া খাওয়াইয়াছিল ও পরে ইয়োরোপে বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। ধর্ম্মযুদ্ধ "ঈশ্বরের" আদেশে হইয়া থাকে ও উভয় পক্ষের "ঈশ্বরই" সে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সকল প্রকার উন্মাদনা ও অন্ধতার মধ্যে যেগুলি মতবাদ ও আদর্শজাত সেইগুলিই মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানশূন্য ও বিচারশক্তিহীন করে। এই কারণে মতবাদ প্রবল হইতে হইতে ক্রমে মানবতাবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। আজ পৃথিবীতে মানুষের যত দুঃখ, দৈন্য ও প্রাণহানিকর অসহায়তা তাহার মূলে বহুক্ষেত্রেই আছে মানুষের মতবাদ। এইজন্য প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য অধর্ম্ম করার প্রেরণা লক্ষিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম্ম ও মতবাদের আড়ালে থাকে ছদ্মবেশী স্বার্থপরতা ও অপরের সম্পদ ও স্বাধীনতা হরণ চেষ্টা। অন্যায় ও অধর্ম্মকে এইজন্য কোনও আকারে বা উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইহার ফল সর্ব্বদাই বিষময়।

দেশবাসীর সাধারণ আকাঙ্ক্ষার কথা

বড় বড় কথা বলিয়া ও উচ্চস্তরের আলোচনা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের অবতারণা করিয়া সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অবস্থা বিচার না করিয়া তর্ক শেষ করিয়া দেওয়া, কার্য্যে অবহেলা ও কর্ত্তব্য বিস্মরণ অপরাধের দোষ ক্ষালন করিতে পারে না। যেক্ষেত্রে বিচার হইতেছে দেশের অর্থ অপব্যয় করা হইয়াছে কি না, চুরি-ডাকাইতি নিবারণ করা হইয়াছে বা হয় নাই, সাধারণের সম্পদ সংরক্ষণ করা ও আইনসাপেক্ষ ভাবে সকলের প্রাপ্য সকলকে দেওয়া হইয়াছে কি না; সেক্ষেত্রে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অপরাপর ক্ষেত্রে কি কি সুকার্য্য করা হইয়াছে তাহার ফিরিস্তি দাখিল করিয়া দিলে তাহাতে আসল কথাটা চাপা পড়িয়া যায় ও বিচার-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা প্রায়ই শুনি যে, আমাদের রাষ্ট্রনেতাগণ ভাসখন্দে কিভাবে মানবতার আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন, ভিয়েতনামে কেমন করিয়া শান্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন ও জাতি সভায় ভারতকে কি অপরূপভাবে নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনে চালিত রাখিয়াছেন ইত্যাদি। সাধারণ কথা হইল যে আমরা চাই সেই ব্যবস্থা যাহাতে দেশের লোকেরা সকলে পূর্ণভাবে রোজগারী কার্য্যে মোতায়েন হইতে পারেন, সকল বালক-বালিকার শিক্ষার সুবিধা হয়, দ্রব্যমূল্য হ্রাস হয়, রাজস্ব আদায় আলমগিরী পন্থা ছাড়িয়া মোলায়েম রূপ ধারণ করে, রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইতে পারে, ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব্ব না হয় ও সকল লোকের জীবনে নিরাপত্তার পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হয়। আরও যাহা কিছু পাইলে মানব জীবন সুখময় হয় ও মানব আত্মা উৎপীড়িত বোধ না করে তাহাও ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা। অপর দেশের সহিত সম্বন্ধে ভারতের আত্মসম্মান পূর্ণ রক্ষার ব্যবস্থাও আমরা চাই। এবং যে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে আমাদের এই সকল সাধারণ ও অবশ্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি পাওয়া সম্ভব হয় না, সেই পরিস্থিতি আমরা সহ্য করিতে পারি না। রাষ্ট্রনেতাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইল সাধারণ অভাব ও অভিযোগ দূর করা। তাহা না পারিলে তাঁহারা উচ্চতর আদর্শবাদের দোহাই দিয়া আমাদের দেশের ভবিষ্যত উত্তরোত্তর আরও খারাপ করিয়া তুলিলে আমরা তাঁহাদের সমর্থন করিতে পারি না। জীবনযাত্রার সাধারণ ধারা যথাযথভাবে চালিত থাকিলে তবেই উচ্চ আদর্শের আলোচনা সম্ভব হয়। সাধারণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিলে তবেই বড় কথার স্থান হইতে পারে।

অবতার-বাদ

ডক্টর মতিলাল দাশ

বুদ্ধদেব কালামগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে যা বলেছিলেন, সে উপদেশ অবিস্মরণীয় সত্য, জীবন-পথের একান্ত কল্যাণকর পাথেয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে উপদেশ আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে বিস্মৃত হই। তিনি বলেছিলেন, কোনও কথা শাস্ত্রে লেখা আছে বলেই বিশ্বাস করবে না, কোনও মহাপুরুষ বলেছেন বলেই মানবে—বহুদিন প্রচলিত আছে সে জন্যও সত্য বলে ধরবে না, সমস্ত বিচার্য্য বিষয়কে বুদ্ধির আলো দিয়ে যাচাই করবে, যুক্তি দিয়ে পরীক্ষা করবে, তখন যা তোমার কাছে সত্য বলে অনুভূত হবে, তাকেই গ্রহণ করবে।

বুদ্ধদেবের এই অনুজ্ঞার সমর্থন পাই বৃহস্পতির একটি বচনে। তিনি বলেছেন :—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়:
> যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করে কর্ত্তব্য ঠিক করা উচিত নয়, যে বিচার যুক্তিসম্মত নয়, তাতে ধর্ম্মহানি হয়।

উপরের যুক্তি-সমুজ্জ্বল সৎ পরামর্শ গ্রহণ করে বিচার করলে আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করব যে, অবতার-বাদ একটি অলীক কল্পনা। যাঁরা ভগবানের অবতার মানেন, তাঁরা প্রায়ই ধরে নেন যে, ভগবান মানুষের মত—তিনি এক বিশেষ লোকে বাস করেন—সেখান থেকে মানবের দুঃখ-কষ্ট নিবারণার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

কিন্তু এই অবতরণ কথার মূলেই বড় ধরনের ভ্রান্তি—ভগবানের মানুষী রূপ কল্পনা। এ বিষয়ে কবি য়েটসের একটি সুন্দর কবিতা আছে। তিনি বলছেন যে পুকুর ধারে চলছেন, তখন রাজহাঁস গলা বাড়িয়ে বলছে যে, এই পৃথিবী যিনি সৃজন করেছেন, তিনি একটি বড় রাজহাঁস। মাছেরা বলছে তিনি একটি বড় মাছ—সিংহ বলছে তিনি একটি বড় সিংহ। এই ভাবে সমস্ত প্রাণীরা মনে করল ভগবান তাদেরই মত। এই কল্পনা স্বাভাবিক, কিন্তু দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুরূপ নয়।

আমাদের দেশে বেদই অধ্যাত্ম জগতের দিগ্দর্শন করায় কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে অবতার-বাদ নেই। তার কারণ বৈদিক মতবাদে ভগবান অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা—

> সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্
> সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

যিনি পরম ভূমা—যিনি সমস্ত ব্যাপ্ত করে আছেন, তিনি কোথা থেকে কোথায় অবতরণ করবেন—তিনি ত কোনও বিশেষ লোকে থাকেন না—তিনি সর্ব্বলোকে সর্ব্বস্থানে।

ব্রহ্ম অপাণি পাদ, অমুখ, অশরীর, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অমুখ, ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, তাঁর পক্ষে মানুষ-দেহ গ্রহণ সম্ভবপর নয়। ভক্তেরা বলেন, সমস্ত অসম্ভব ব্রহ্মে সম্ভব, কারণ তাঁর অচিন্ত্যশক্তি। এ কথা স্বীকার করলেও, যাঁর অচিন্ত্যশক্তি, তাঁর পক্ষে মানুষের হীনতা স্বীকার করে জন্ম অবিশ্বাস্য।

অবতার-বাদের সবচেয়ে বড় সমর্থন পাওয়া যায় গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :—

> যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখনই যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, হে ভারত! আমি তখনই তখনই নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতার হয়ে আবির্ভূত হই। একথা গীতায় থাকলেও, একথা আদৌ সত্য নয়। ইতিহাসের পটভূমিকায় যদি এই কথার যথার্থতা যাচাই করা হয়, তা হ'লে দেখা যাবে অন্যায়কারীর অন্যায় সব সময় দুর্ব্বলকে নিপীড়ন করছে—বর্ব্বরতা, নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতা মানুষকে বারংবার পিষ্ট করেছে, কিন্তু কোনও ভগবানই তখন মানুষকে উদ্ধার করতে আসেন নি। স্পেনের ধনলোভী দুর্ব্বৃত্তেরা যখন নিরীহ দক্ষিণ আমেরিকায় সুসভ্য অধিবাসীদের নির্ম্মূল করে, তখন কোনও দৈবশক্তি তাদের বাঁচায় নি। হিটলার যখন জার্ম্মানীতে ধর্ম্মপরায়ণ ইহুদীর সর্ব্বনাশ করেছিল, তখন ভগবান অবতার হয়ে ইহুদী সাধুদের পরিত্রাণ করেন নি। আমাদের চোখের সামনেই পাকিস্তানে যে অমানুষিক অত্যাচার ঘটল, মানুষকে ঘরে বন্ধ করে পোড়ান হ'ল, শিশু, নারী নির্ব্বিশেষে যেখানে নারকীয় হত্যা ঘটানও

হ'ল, নারীর সতীত্ব নাশ করা হ'ল, তখন কোন ভগবানের অঙ্গুলি-হেলনের চিহ্ন আদৌ দেখা যায় নি।

ইতিহাসকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়লে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিকে অসত্য বলা ছাড়া উপায় নেই।

তারপর তথাকথিত দশাবতার হোক, বা ভাগবতের বাইশ অবতার হোক, সমস্ত অবতারই ভারতবর্ষে এসেছেন। ভারতবর্ষ বিশাল পৃথিবীর সামান্যতম অংশ। ভগবানের এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

অবশ্য গোঁড়াদের এক আয়ুন্তরী উত্তর আছে—ভারতবর্ষ ধর্ম্মভূমি, আর সব ভোগভূমি। কিন্তু এই সদুত্তর নহে, অন্য স্থান যদি সত্যই পশ্চাদ্পদ হয়, ধর্ম্মহীন হয়, তা হ'লে ভগবানের সেই সব দেশেই অবতার হওয়া উচিত।

তারপর অবতার যত জনই আসুন, পৃথিবী কখনও পুণ্যবানের উল্লাসে উল্লসিত হয় নি—দুস্কৃত ও দুর্বৃত্তের অভাব কখনও হয় নি—অশেষ কল্যাণ গুণোপেত সর্ব্বশক্তিমানের চেষ্টার তুলনায় ফল অতিশয় ক্ষণিক এবং স্বল্পই হয়েছে—সেই সামান্য কাজ মানুষেরই—পরমেশ্বর বললে পরমেশকে একান্ত ছোট করা হবে।

গীতায় বলা হয়েছে ভগবান অজ, অব্যয়াত্মা—সর্ব্বভূতের ঈশ্বর—তিনি নিজ মায়াকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হন। কিন্তু Immaculate conception কল্পনার কথা, পৃথিবীতে যাঁরাই এসেছেন তাঁরা সবাই নর ও নারীর যৌন সংসর্গজাত—মানুষের স্বাভাবিক ব্যাধিতে পীড়িত—জরা এবং মৃত্যুর বশীভূত—সেই তথাকথিত অবতারগণের জন্মে, কর্ম্মে ও জীবনধারণে আদৌ কোনও বিশেষত্ব নেই।

ভক্তেরা বলেন ভগবানের রূপ প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত। কিন্তু এই অপ্রাকৃত রূপ কেহ কখনও দেখে নি—কেহ কখনও অনুভব করে নি।

দশাবতারের চারিটি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহ মানুষের ইতিহাসের বাইরের জল্পনা। রামচন্দ্রকে অবতার বলা হয়, কিন্তু আদি-কবি বাল্মীকি রামায়ণে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন—তিনি তাঁর কাব্যের নায়ক দশরথ-সুত নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রকে গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মিকীর রাম মানুষ, ভগবান নহেন। কিন্তু পরে ভক্তিবাদ এবং অবতার-বাদের প্রাদুর্ভাব হ'লে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ভরে রামকে ভগবান করবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সেটা যে জোড়াতালি তা বিচক্ষণ পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন। পরশুরাম এবং বলরাম পুরাণকরদের কল্পনায় যে জীবন-যাপন করেছেন—তাতে অসুর নিধন এবং ধর্ম্মসংস্থাপন কিছুই হয় নি। কল্কি ত আসেন নি—তাঁর আগমন-কথা উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। বামন অবতারে ভগবানের লীলার জন্য তিনি দয়াবান হ'লে লজ্জিত হবেনই—কলিকে ছলনা করায় কোনও মাহাত্ম্য নেই। আর বুদ্ধদেব ত ভগবানকেই মানেন নি—তিনি ভগবানের উপাসনা করতেও বারণ করেছেন।

দশাবতারের স্বরূপ আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, অবতার-বাদ মিথ্যা ভিত্তি-প্রস্তরের উপর গড়া। অবতার-বাদের কল্পনা এসেছিল গুরুবাদের থেকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাস্য গুরুকে বড় করতে চান। এবং এই ভাবেই গুরুকে ভগবান করে তোলা হয়।

তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রামকৃষ্ণদেবের জীবনে। ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন মদ খেয়ে মাতাল হতেন, তখন আপন গুরুকে তিনি অবতার বলে প্রচার করতেন। গিরিশচন্দ্রের এই পাগলামি ও স্তাবকতা সরল-প্রাণ রামকৃষ্ণদেবকে পর্য্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। তবে ক্ষুরধার বুদ্ধি বিবেকানন্দ গুরুভাইদের আগ্রহাতিশয্য অগ্রাহ্য করে গুরুকে অবতার বলতে চান নি। লালা হংসরাজের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি বলেছিলেন গুরুকে অবতার বলে প্রচার করলে অতিশীঘ্র সম্প্রদায়ের বিকৃতি হয়, এরূপ আমার জানা আছে। আমার গুরু-ভাইরা রামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার করতে চাইছিল, কিন্তু আমি এই প্রচারের বিরোধী।

প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনই যে অবতার-বাদের উদ্দেশ্য, সে কথার একটি বাস্তব প্রমাণ—ভারতবর্ষে অন্ততঃপক্ষে বর্ত্তমানে অন্তত ২৫ জন অবতার আছেন। বহুলোকে এই কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। আমি এই ধরনের একজন অবতারকে চিঠি লিখি এবং তাতে বলি যে, তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে যে অবতার বলে প্রচার করছেন, এটি অত্যন্ত অন্যায়। এটি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার একটি কৌশলমাত্র। এই প্রবঞ্চনা যেন তিনি বন্ধ করে দেন। উত্তর দিয়েছিলেন তাঁর এক মাতব্বর শিষ্য। তিনি ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং নিজেও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি লিখেছিলেন—তিনি তাঁর গুরুকে সত্যই ঈশাবতার বলে বিশ্বাস করেন।

ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে নানা সমস্যায় জর্জ্জরিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কতবিধ বাধা ও বিঘ্ন আমাদিগের যাত্রাপথকে দুর্গম ও দুর্ব্বহ করে তুলেছে—অথচ এই ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে পঁচিশ-ত্রিশজন অবতার বর্ত্তমান রয়েছেন।

অবতারবাদ যে কতখানি মিথ্যা, কতখানি স্বাপ্নিক

কল্পনা তা এই বিষয়টি ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করলে যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে প্রতিপন্ন হবে। অবতার-বাদ আমাদের দেশের বিপুল সর্ব্বনাশ করেছে এবং বর্ত্তমানেও করছে। জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নেই —মানুষের সেই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে কতকগুলি পরান্ন-ভোজী লোকের ছলে এবং কৌশলে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতারিত হয়ে চলেছে। এই প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনার শেষ হওয়া উচিত।

অদ্বৈতবাদই হিন্দুসাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। জগতে একমাত্র একই আছেন, যে নানা দেখে, সে কেবল মৃত্যুর পর মৃত্যুতে মগ্ন হয়, ব্রহ্ম পরম অথচ একমেবা-দ্বিতীয়ম্। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু—ব্রহ্মছাড়া যা কিছু, সবই মিথ্যা।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।

কোটি কোটি গ্রন্থে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার সার আমি আধখানি শ্লোকে ব্যাখ্যা করে বলছি, ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহেন।

যা আজ আছে, কাল ছিল, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তাই সত্য, জগৎ চির চঞ্চল, আজ যা আছে, কাল তা নেই, কাল ছিল, আজ আছে, কিন্তু তা কখনও ভবিষ্যতে থাকবে না—এই অর্থে জগতের পারমার্থিক সত্তা নেই—জগৎ মায়া।

অদ্বৈত জীবকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলেছেন—জীবের উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই, বন্ধ নেই, মোক্ষ নেই, মুমুক্ষাও নেই—জীব স্বতঃই মুক্ত, কেবল অবিদ্যার আবরণে অবিদ্যার বিনাশে নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ, জীব আপন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করে।

কাজেই ব্রহ্মের অবতার হয়ে এসে জীবের উদ্ধার-সাধন কল্পনা অলীক, অসত্য এবং অসিদ্ধ। অতএব সব ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চনা এবং ভক্ত ব্যক্তি নিজেদের অবতার বলে প্রচার করে, তাদের সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ত্রিতাপের দাবদাহে পীড়িত মানুষ জ্ঞানের সাধনেই ফিরে পাবে পরম আনন্দের সাক্ষাৎ—সেই আনন্দ-দুলাল কুসংস্কারের বশে মানুষের বাণিজ্য-বুদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করে, জ্ঞান-সাধনের আদৌ চেষ্টা করে না—ভাবে পাদ-সংবাহন করেই মুক্তি লাভ হবে।

অহং ব্রহ্মাস্মি—আমিই ত ব্রহ্ম। অতএব ভক্তি করব কাকে? তত্ত্বমসি শ্বেতাকাতা!—হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই। এই ধারণাকে ধ্যানে ও নিদিধ্যাসনে সত্য করে তুলতে হবে—কাজেই এখানে কৃপার কাল ও স্থান বা অবকাশ নেই। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—সবই ঐশী সত্তা—সবই ঐশী-শক্তি, কাজেই অবতারকে পূজা, অবতারের উচ্ছিষ্ট সেবন, অবতারের কৃপা, অবতারের লীলা আস্বাদন এ সব কথার কোনই অর্থ নেই।

প্রতিটি মানুষ ভাগবত চৈতন্যে চৈতন্যবান্, কাজেই অন্যকে ভগবান গড়ে তুলবার প্রয়োজন আদৌ নেই। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি—যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন।

অদ্বৈতবাদের মতে সেই সাধনাই মানুষের একান্ত কাম্য। বাদরায়ণ তাঁর বেদান্তসূত্রে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন —কেবল বেদান্ত-বিহিত আত্মজ্ঞানেই পুরুষার্থ লাভ হয়। অতএব সেই বিদ্যা, সেই জ্ঞান লাভই করণীয়।

এই পরবিদ্যা লাভের প্রথম সোপান শমদমাদি। আজকালের ভাষায় চরিত্র গঠন—সুচরিত্র না থাকলে জ্ঞানের উন্মেষ হতে পারে না, চরিত্র-দীপ্ত হয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করতে হবে।

ব্রহ্মসূত্র বলেছেন—আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ। সেই পরমাত্মাকে নিজের আত্মারূপে জানতে হবে—সোঽহংভাবে উপাসনা করতে হবে। আত্মবিষয়ে শ্রুতি-বাক্য শুনতে হবে—পরে বারংবার তাই মনন করতে হবে এবং শেষে একান্তভাবে এবং একাগ্রভাবে তার চিন্তা করতে হবে। পুনঃপুনঃ করতে হবে—যতদিন না আত্ম-দর্শন ঘটে, যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তত-দিন এই করে চলতে হবে।

অতএব অবতরণের উপর দৃষ্টি না দিয়ে আমাদিগকে অধিরোহণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জীবনকে ঊর্দ্ধায়িত করতে হবে। যাতে স্বরূপে স্থিতি হয়, তারই জন্য কঠোর তপশ্চরণ করতে হবে। তৃষ্ণায় যে আকৃতি আমাদিগকে পীড়ন করছে, কামনায় সেই জ্বালা শেষ করে ব্রহ্মানুভূতির পরম প্রশান্তি পেতে আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মারাম হ'তে হ'লে জ্ঞানের সাধনাই করতে হবে। জ্ঞানের সবই অভীপ্সা ভাগ্যহত ভারতবর্ষকে জাগ্রত করুক, দীপ্ত করুক।

দেশ অন্ধকার থেকে আলোকে স্ফুরিত হোক, অসত্য থেকে সত্যে উজ্জীবিত হোক—দিব্য জীবনের দীপ্তচ্ছটায় ভাস্বর হয়ে উঠুক।

—•••—

"জীবনের স্বাদ"

শ্রীচিররঞ্জন দাস

অল্প কয়েকটা কথা।

কিন্তু তাতেই সুদামের দেহটা রাগে জলতে লাগল।

দাওয়ার উপর জলচৌকিতে ঠ্যাং তুলে বসে ছিল তুলসীর বাপ। পাকাঠির মত চেহারা, চামড়া শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। গর্তে-বসা চোখে চালাকির ঝিলিক। সুদামের মনে হয় একটা সাক্ষাৎ শয়তান দেখছে সে।

একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তুলসীর বাপ বলে, "টাকা-পয়সার হিসেব চুইক্যে দিয়ে মেয়ে লিয়ে যাও। কোন আপত্তি লাই আমার। লইলে—"

"লইলে কি ?" সরাসরি প্রশ্ন করে সুদাম।

মুখে কিছুটা ধূর্ততার হাসি মাখিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে তুলসীর বাপ বলে, "এক সন আগেই ত শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথা ছিল তুলসীর। মেয়ে ডাগর হইছ্যে, দানা-পানি পেটে পড়ে পড়ে বাড়-বাড়ন্ত হইছে, তার দাম ত আমাদের পাওনা।"

এদিকে মাছির মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কিছু লোক। সায় দিয়ে উঠল আর সকলে। সুদাম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাদের মুখ। আর এক বার দমকা জলুনি সুরু হ'ল তার বুকে। কিন্তু সে ভাবটা গোপন করে। বিনীত ভাবে বলে, "দেখুন, ব্যাপারডা হচ্ছে কি—টাকা-পয়সা ত এখন হাতে লাই। দিন-কালের যা অবস্থা পইড়েছে, তয় তা টাকা আমি দিয়া দিমু। এখন—"

"টাকা হাতে লাই ত। ঝিউরীডারে খাওয়াইবা কি ?"

"মিষ্টি মিষ্টি কথা খাওয়াইব আর কি ?"

উৎকট হাসির ঝড় ওঠে চারদিকে। আর সেই ঝাপটায় উঠে পড়ে সুদাম। বিন্দু বিন্দু ঘাম নাকের ডগায় জমতে সুরু করে। এই স্থূল রসিকতা আর অপমানের বৃন্তে নিজেকে গর্দভ বলে মনে হয়। ইচ্ছে করে একটা চড়ে পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসিয়ে দেয় ঐ ধূর্ত হারগিলেটার মুখে। চশমখোর, ঘাটের মড়া। ধর্ম বুদ্ধি বলতে কিছুই কি নেই বুড়োর পো'র !

দাওয়া থেকে ছিটকে নেমে পড়ে সুদাম। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়। আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় বুকটা।

তুলসীর বাপ চেঁচিয়ে বলে, "তয় টাকা দিয়েই ঝিউরীকে নিয়ে যেও।"

শুনেও যেন শোনে না সুদাম। শোনার কি আছে। কথা ত নয়, তীরের ফলা। বুকে এসে কোঁড়ে।

রান্নাঘরের কানাচে এসে মাথাটা রাগের বশেই একটু হেলাতে গিয়ে নজর আটকে গেল তুলসীর দিকে। বাঁশের বেড়ার ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের অপদগ্ধ মাঠে। চোখের তারায় যেন নিবিড় বেদনার ছায়া। কুঁচ ফলের মত লাল ঠোঁট দুটো যেন কোন অব্যক্ত আবেগে থর থর করে কাঁপছে। কি যেন বলতে চাইছে, কি যেন বুঝতে চাইছে, কি এক যন্ত্রণায় যেন স্থবির হয়ে আছে।

সুদাম দাঁড়াল একটু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তুলসীকে। সোমত্ত তুলসী। বেতসী লতার মত ছিপ-ছিপে গড়নে আসন্ন যৌবনের জোয়ার ভেসে আসছে। ইচ্ছে করে দুটো কথা বলে। একটু কাছে ডাকে। কিন্তু বুড়োর পো'র ঐ চোখা চোখা কথাগুলো একটা অলক্ষ্য প্রাচীর গেঁথে তুলেছে যেন। তুলসী নির্বাক। তুলসীর কোন দোষ নেই। সুদাম জানে তুলসীরা পুরুষ মানুষের হাতের পুতুল। কিন্তু এ যুক্তিতে মন মানে না। সুদাম ভাবে, তুলসী কি পারত না বাপের মুখের উপর তার হয়ে দুটো কথা বলতে ? দুটো ঝাল কথা শোনাতে দোষ কি ছিল ? তার সোয়ামীর ইজ্জত-টাকে তার নিজের ইজ্জত বলে সে ভাবতে পারল না কেন ?

আবার তাকায় সুদাম তুলসীর দিকে। দগদগে কাটা ঘায়ের মত জল জল করছে কপালের সিঁদুর। তুলসী নিস্পন্দ, ভাবলেশহীন। শুকনো রুক্ষ শূন্য মাঠটার মতই নিঃসীম শূন্য। কপালের ঐ রক্তিম সিঁদুর-ফোঁটার দিকে চেয়ে চেয়ে সুদামের মাথায় আগুনের বন্যা নামে। তার অক্ষম অবস্থাকে, পৌরুষকে, তার সব অধিকারবোধকে যেন নির্মমভাবে আঘাত করছে ঐ এয়োতির চিহ্নটা।

ছুটতে আরম্ভ করে সে। এই প্রাণহীন, স্নেহহীন, স্বার্থপর লোভের রাজ্য থেকে সে ছুটে পালাতে থাকে।

বাপ বলে, "আইন্‌ব না, অমন মেয়ে সোনকার ঘরে আইন্‌ব না, শালা কুত্তার জাত।"

মা কিছুক্ষণ তুলসীর বাপকে উদ্দেশ করে শাপ-শাপান্ত করে। তারপর গুম মেরে বসে-থাকা সুদামের কাছে এসে বলে, "তুই ঘাপচি মেরে বসে আছিস কেনে ? অন্য ঝিউরীর সাথে তোর ফের বে দেব।"

হাতে পাঁচটা পয়সা এইয়েছে বলে, সাপের পা দেখ্‌ছে। শালা বজ্জাত। তিনকুড়ি টাকা ত দেয়া হইছে, এক কুড়ির জন্যে আর তর সইল না?" খিঁচড়ে ওঠে বুড়ো নটবর। ভাঙ্গা চোয়াল উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

সুদাম কোন জবাব দেয় না। কেমন যেন মিইয়ে পড়ে সে। ঘর-বাড়ী, উঠোন, আত্মীয়জন কোন কিছুর প্রতি যেন আসক্তি থাকে না। সব কিছুই বেমানান, অর্থহীন বলে মনে হয়। আর সেই ভাবলেশহীন মৌনতার মাঝখানে যখন তুলসীর সেই সিঁদুরফোঁটার ছবিটা মনে ভেসে ওঠে, তখনই কেমন অস্থির হয়ে ওঠে সে। সমস্ত ঘটনার মাঝে মাঝে তীব্র আক্রোশে ফুঁসে ওঠে।

স্নান করতে গিয়ে পুকুর-ঘাটে শুনল নানা কথা।

শুনবে সে ধারণা তার অনেক আগেই হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সে তা এত নির্মম হবে তা কল্পনাও করে নি!

"মেয়ে না কি দেয় নাই গো।"

"তাই না কি ? তা ওডাও বা কিরকম পুরুষ ?"

"আরে ধুর, ওডা কি পুরুষ না কি। দেখ না কিরকম বেড়ালের মত মিইয়ে গেছে। ক্ষেমতা নেই।"

"বিয়া কইরাছিস, মেয়ে দেবে না, আবদার না কি ? ছিঃ ছিঃ, তুইও চোরের মত চইলে এলি ?"

"গলায় দড়ি দেওয়া উচিত অমন মরদের।"

"অহ কি আমার মরদ রে—"

"হেই চুপ—."

কিন্তু চুপ করার আগেই যেটুকু সুদামের কানে গেছে তাই যথেষ্ট। কানের ভেতর কে যেন গরম সিসে ঢেলে দিয়েছে। দেহের ভেতরে প্রতিটি তন্তে যেন সীমাহীন লজ্জা, ঘৃণা আর অপমানের জ্বালা দাউ দাউ করে জলছে।

কোন পথই নেই। ধার মেলে না কারও কাছে। পুরো আকালের বছর। মাঠ প্রান্তর বন্ধ্যা হওয়ার সাথে মানুষের প্রাণও যেন শুকিয়ে এসেছে। একটু হিমেল বাতাস, কি সামান্য জলবর্ষণে সে প্রাণে আবার অঙ্কুর ফুটবে তারও দিশা নেই। জমি গেছে জোতদারের পেটে দেড় পুরুষ আগে। দাঁত কামড়ে বাপ আটকে রেখেছে ভিটেটুকু। অনেক ঝড় এসেছে, অনেক দুরন্ত বাত্যা। নানান প্যাঁচেও ঠিক রেখে দিয়েছে ভিটেটুকু। কিছুতেই ছাড়ে নি। কিন্তু সে কালও ত আর নেই। তখন দু' মুঠো অন্ন পাওয়া যেত অপরের জমি চষে। অপরের জমি-জিরেতের ফসল ঝেড়ে এক ধামা ধান মিলত। আজ তাতেও বালি। ভাগীদার অনেক। জমি নেই কারো, সবাই ভাগচাষী, ক্ষেত-মজুর। মরশুমে প্রকৃতির কৃপায় নির্ভর। বাকী মাস যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাটি কেটে, মুনিষ খেটে, সহরে গঞ্জে জনমজুরী করে। ধুঁকে ধুঁকে এইভাবে বেঁচে থাকা। শিয়াল-কুকুরের মত যেন অপরের অনুগ্রহে। রোগে শোকে মৃত্যুর সাথে কোলাকুলি করে দাঁড়িয়ে থাকা। কিন্তু এতেও যেন ক্লান্তি আসে হতাশায়, আক্ষেপে মন জর্জরিত হয়ে ওঠে।

একটা গাছের নীচে বসল সুদাম। রৌদ্রের অগ্নি-হল্কা থেকে ছায়া-শীতল ছায়ায় একটু বসে সমস্ত ঘটনাটা তলিয়ে দেখতে চাইল। সামনে-পেছনে চারধারে কর্ষিত মাঠ। ঘাসগুলো নিদাঘী তাপে পুড়ে হলুদ হয়ে গেছে। বড় বড় মাটির চাঙ্গাগুলো স্থবির বৃদ্ধের মত

অনড় অথর্ব হয়ে পড়ে আছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল শুষ্ক, বিবর্ণ, সারহীন ছবিই ভেসে ওঠে, প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় না। সব কিছুই কঠিন নির্মম, সুদাম ভাবে, মানুষের জীবনও এরকম কঠিন। স্নেহ-পরশহীন নির্মমতার আবরণে ঢাকা। সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার অনুভূতি বোঝে না কেউ। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। স্বার্থকে কেন্দ্র করেই জীবন। নিক্তির ওজনের মত নিজের স্বার্থ মেনে নেয়।

আত্মীয়তা সম্পর্ক সব কিছুই ঐ নিক্তিতেই নিখুঁত ভাবে পরিমাপ হয়। নয়ত আপন শ্বশুর, তার কাছে ঐ কুড়ি টাকাই বড় হ'ল? মেয়ের জীবনটা বড় হ'ল না? জামাইর মনটা? আজকাল আকালের বছর না থাকলে সে কি গ্রাহ্য করত? ঐ এক কুড়ি টাকা? জীবনটাকে খত দিয়ে রাখলেও ঐ টাকা দিয়ে আসত না? কিন্তু পরিসর যে বড় ছোট। আকাশের চেহারা দেখে কেউ আর ভাগ-চাষের কথা বলে না। বলে রাখে না, সুদাম মণিপুরের মাঠে তোকে কাজ করতে হবে। সে সুযোগটা পেলেও ত কিছু টাকা আগাম পাওয়া যেত। ফাটা কপাল আর কাকে বলে। গাঁয়ে ঢুকতে কেমন লজ্জা করে সুদামের। মেয়ে-মরদ, বাচ্চা-বুড়ো কেমন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে তার দিকে। যেন এক মহা আশ্চর্য মানুষ সে, অথবা কোন মহাপাপ করে বসেছে। তাদের চোখে তারা যেন তার বিবেককে নিরন্তর খোঁচা দেয়। কালো কালো মুখের পটে যেন নানান ভাষা জেগে ওঠে। আড়ালে আবডালে ফিস-ফিসিয়ে তারা কথা বলে। ঠোঁট টিপে হাসে-কাশে। আত্মভোলা ভঙ্গিতে বিরহের গানের কলি ভাঁজে। তেতে ওঠে সুদাম, ইচ্ছে করে লাথি মেরে কোমড় ভেঙে দেয়। গলা টিপে ধরে কথা বলার শক্তি কেড়ে নেয়। বেজাতগুলোকে আচ্ছা শাস্তি দেয়। কিন্তু কিছুই পারে না সে। মনে ইচ্ছে জাগলেও সবলে তা প্রকাশ করতে পারে না। কেমন ব্যথাতুর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে চুপসে যায়। আর অলক্ষ্যে বয়সের যৌবনে, রক্তের পাকে পাকে রাগের বাষ্প জমা হয়।

বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতে বাপ নটবর চেঁচিয়ে ওঠে, "বিহান থেকে পই পই করে ঘুরছিস, ঘরে বাড়-বাড়ন্ত সে খেয়াল আছে?"

সুদামের মেজাজ ভাল ছিল না। বাপের কথাগুলোকে অত্যন্ত কর্কশ ঠেকল তার কানে। সেও চেঁচিয়ে উঠল, "তা আমি কি করব।"

"কি করবি তা আমায় বইল্যে দিতে হবে? যোয়ান দামড়া এ কথাটা শুধুইতে সরমে লাইগলো না?"

"মেলা চেল্লামিল্লি কইব না।" রাগে মুখ ফিরিয়ে নেয় সুদাম।

"মাইয়া মাইনষের নেশায় পাইছে। এখন কি আর মাথার ঠিক কিছু আছে!" বক্র স্বরে বলে নটবর, "তা এতই যদি সখ তা এক কুড়ি টাকা ফেইল্যে বৌ ঘরে আনলিই পারিস। থাল খটি বেইচ্যে ও দামড়া পেট ভরাতি আমি পাইরব না। মুরোদ ত আমার জানা আছে।"

"মেলা ক্যাচ্ ক্যাচ্ কইরো না। ও মেইয়ে আমি সাতদিনের মধ্যে ধরে আইনবই, এই আমি পণ করলাম, দেখে নিও।"

নটবরের চোখে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে আসে। কিছুটা শান্ত স্বরে এবার সে বলে, "টাকা জোগাড় হইছে না কি?"

"না।"

"তয়?"

"জোগাড় কইরতে কতক্ষণ।"

বয়সের উপর বিশ্বাস মানুষের। তাই সুদামের বয়সটাকে উড়িয়ে দিতে পারল না নটবর। ভাবল, হ'তেও পারে বা। জোয়ান মানুষ চেষ্টা করলে কি না হয়।

সারাটা দুপুর বিকেল তন্ন তন্ন করে ভাবল সুদাম। একটা উপায়, অন্তত চাইই চাই! এ ভাবে লজ্জায়, ঘৃণায় বিবেক পুড়িয়ে পুড়িয়ে বাঁচা যায় না। সংসারও প্রায় দানাপানি-বিহীন। বাঁধা বন্ধকের কথা চিন্তারও অতীত। আর সে সম্বল নেইও। একবার ভাবে, "মল্লিকবাবুর দোকানে রাতের বেলায় সিঁদ দিলে কেমন হয়?" পরক্ষণেই সঙ্কোচে, ভয়ে গায়ের লোমগুলো কাঁটা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ছিঃ ছিঃ, তা কখনও হয়। চুরির

পয়সায় বৌ ঘরে আনা। মান-সম্মান বলে কিছু নেই নাকি। এর চেয়ে বৌ ঘরে না আনাও ভাল। গলায় দড়ি দিয়ে গাছের ডালে ঝোলাও সহজ! তবে, তবে উপায়? শ্বশুরের মুখখানা স্মৃতিতে ভাসল আবার সুদামের। সেই গর্তে বসা চোখ, কাঠির মত হাড়গিলে চেহারা। অন্তরহীন চণ্ডালের মূর্ত প্রতীক। এই চণ্ডালেরই মেয়ে তুলসী। কত শান্ত, নম্র, আকুলতা মুখে। আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

বাপ যদি চণ্ডাল হয় তুলসী সাক্ষাৎ প্রতিমা। পটের প্রতিমা। টানা চোখ, টিকল নাক। রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে সুদামের। মগজের স্তরে স্তরে যেন কিলবিল করতে থাকে চিন্তা-পোকাগুলো। ঝিম ঝিম করে ওঠে। তীক্ষ্ণ চঞ্চু ফুটিয়ে ফুটিয়ে যেন অস্থির করে তোলে। ইচ্ছে করে টেনে টেনে লম্বা চুলগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তাতে যদি কিছুটা যন্ত্রণা কমে। নাঃ, এভাবে পারা যায় না, বাঁচা যায় না! একটু সহায় দরকার, উপায় দরকার। একটা কিছু যা হোক—তুলসীকে যে আনতেই হবে।

মাঠের রোদ মরে আসে। মাঠটা যেন গায়ে হলুদ দিয়ে অনন্তকাল ধরে পড়ে আছে। বাবলা গাছটার ছায়া লম্বা হ'তে হ'তে বহুদূর মিলিয়ে গেছে। সূর্য নিস্তেজ। সুদাম উঠে পড়ল। পায়ে পায়ে এগোল মাঠ-পথে। সমস্ত পৃথিবীটা কেমন মৌন। বিশেষ সাড়া-শব্দ কোথাও নেই। কোন উত্তেজনা, ব্যস্ততা কিছুই না। এই নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশে সুদাম শুধু যেন নিজের বুকের বিস্রস্ত ধুক্-ধুকানি অবিরাম শুনতে পেল।

দিন দুয়েক পর বুকের ধুকুধুকানি শুরু করে সুদাম যখন দাওয়ায় এসে বসল তখন সে অনেক শান্ত। কলা-বৌয়ের মত লম্বা ঘোমটা টেনে তুলসী মাটির ঘরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। মা বরণ করল মাথায় দুর্বো দিয়ে, শাঁখ ফুঁকিয়ে। গাঁয়ের বৌ-ঝিরা দিল উলু! রাঙা চেলির ফাঁক দিয়ে মুখখানাকে আবিরের মত লাল করে তুলসী লজ্জা-মাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল ড্যাব ড্যাব করে। এই নতুন জীবন, নতুন সংসার, নতুন মানুষের উচ্ছ্বসিত কোলাহলে মনে কেমন এক শিহরণ জাগতে লাগল। পাড়া-পড়শী সবার চোখে বিস্ময়। নটবরের চোখে বোবা প্রশ্ন। ঘুরে-ফিরে সে একবার তুলসীর কাছে দাঁড়ায়, তারপর উসখুস করে সুদামের কাছে। ঠোঁটের কোণ দুটো কাঁপতে থাকে। সুদাম এতগুলো টাকা পেল কোথায়? ব্যাটার মুরোদ আছে ষোল আনা। বুকের পাটা আছে। লক্ষ্মী প্রতিমাকে ঠিক এনে ফেলেছে ঘরে। কার ব্যাটা দেখতে হবে ত? বুকখানা গর্বে ফুলে ওঠে নটবরের। চর্মসার মুখে থ্যাবড়ানো হাসি ফোটে। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ দুটো উদাস হয়ে যায় তার। বাবলাতলায় বাতাসীকে চুপ-চাপ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন বিষাদে চঞ্চল হয়ে ওঠে অন্তর। এই উচ্ছ্বাস আনন্দ, হৈ চৈ, নববধূ বরণ থেকে কেমন যেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এক-পাশে ঠেলে রেখে দিয়েছে নিজেকে।

আহা, বেচারা। ছিদামটা যদি বেঁচে থাকত। কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠত ঘরখানা। বাতাসীর রক্ত-সিঁথিতে ঝলসে উঠত আগুনের মত সিঁদুর। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নটবর। মুখের বিষাদভাব আড়াল করে ডাকে, "অ বড় বৌমা। উইখানে ঠাই দাঁড়িয়ে রইছ কেনে? আহা এমন আনন্দের দিনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি না কি, এঁ্যা? ঘরে এস, ইদিকে অনেক কাজ-কাম পইড়ি রইছ্যে। হ্যারে সুদাম, তুই ডাক দে ওরে।"

সুদামের বুকে কেমন এক ধাক্কা লাগল। সত্যিই কি নির্বোধ সে। আনন্দের স্রোতে এত আচ্ছন্ন ছিল সে যে এদিকটা মোটেই ভেবে দেখে নি। বাতাসীর পাশে গিয়ে আচ্ছন্ন গলায় বলে সে, "এস বৌঠান।"

"না, ইখানে থাকতে দাও মোরে।"

"গোসা কইরো না বৌঠান।"

"গোঁসা কইরব কেনে আমি?"

"তয় আসবে না কেনে? বৌরে বরণ কইরবে না?"

বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে সুদাম। বাতাসীর চোখে যেন দীঘির নিটোল জল টলমল করে। কি করে সে সুদামকে বোঝাবে তার ব্যথা কোথায়? ব্যথার নিদারুণ খোঁচায় যে পাঁজরগুলো কাঁপে। বাতাসী তাকাল সুদামের মুখের উপর। অকুণ্ঠ আকুতির ছায়া তার মুখে। অবিকল সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ। তাকাবার ভঙ্গিটুকু পযন্ত ছিদামের মত। হু—হু করে ওঠে তার বুকের ভেতরে। বাঁধ ভেঙে যেন শোকের

বন্যা বেরুতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয় বাতাসী। মন্থর পায়ে এগিয়ে যায় ঘরে—যেখানে গাঁয়ের বৌ-ঝিদের সঙ্গে লজ্জায় মাখামাখি হয়ে ছিল তুলসী।

হুঁকোতে তামাকের স্বাদ নিতে নিতে নটবর এসে দাঁড়াল। গুরগুর করে শব্দ হচ্ছে মুখে আর মেঘের মত চাপ চাপ নীল ধোঁয়া মুখের গর্ত থেকে বেরিয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হচ্ছে। একটা মিঠে তামাক-পোড়ার গন্ধে বাতাস ভরপুর হয়ে উঠল। তারপর একথা-সেকথা বিক্ষিপ্ত ভাবে বলার পর অতর্কিতে আসল শরটি নিক্ষেপ করল সুদামের দিকে।

"এতগুলো টাকা পেলি কোথায় রে, এঁ্যা ?"

"পেলাম—"

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় সুদাম। সে জানে। খুব ভাল করেই জানে, এ কথার যা সত্য উত্তর তা এদের কাছে বজ্রের মত শোনাবে।

এই অভাব-অনটনের তীব্র গ্লানির মাঝখানে যে সামান্য আনন্দের কলতান উঠেছে তা নিমেষে বেসুরো হয়ে উঠবে। হৈ চৈ পড়ে যাবে সবার মধ্যে। সুদামকে চরম দায়িত্বহীন কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত মানুষ বলে মনে করে বসবে। এ সত্য একদিন প্রকাশ হবে ঠিকই, তবু যতক্ষণ পারা যায় গোপন রাখতে দোষ কি ? টাকার উৎস তাদের পরিবারের অলক্ষ্মী, অভিশাপ। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের সামিল।

নটবর সন্তুষ্ট হ'ল না সুদামের ঔদাসীন্যে। মনে মনে গিজ গিজ করতে লাগল। ছেলের এই একরোখা প্রকৃতির গালাগাল করতে লাগল।

কিন্তু প্রকাশ হ'ল তিন দিন পর। কথাটা প্রথম সুদামই বলল। কেননা তখন আর গোপন রাখার কোন উপায়ই নেই।

রান্নাঘরে তুলসীকে নিয়ে ভাত সেদ্ধয় ব্যস্ত ছিল বুড়ী মা। সুদাম তার কাছে গিয়ে বলল, "কাল আমি রওনা দেব মা। চারটি চিঁড়ে বেঁধে দিও কাপড়ে।"

"কুথাই যাবি তুই ?" অপার বিস্ময় মা'র চোখে।

"সে যেতি হবে বহদূর। পাখীরালা।" ব্যাপারটা যেন খুব সহজ এমনভাবে বলল সুদাম।

কপালে চোখ তুলে মা চেঁচিয়ে উঠল, "পাখীরালা! পাখীরালা কেন ?"

"পাখী ধরতে।" নির্বিকার সুদামের কণ্ঠস্বর।

"ও আমার কি হইবে রে—।" ককিয়ে ওঠে সুদামের মা। "আমি আগে থেকেই জানতাম, এমন কিছু একটা হবেই। হায় ভগমান, একি কয় সুদাম।"

সুদাম একটু হকচকিয়ে যায়। তারপরে বিরক্তি ঝরে তার কথায়, "তা এমন মড়া-কান্না জুড়ে দিলে কেনে —এঁ্যা ? চুপ করবে ত না কি ?"

কাঠের উনুনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে। লম্বা লম্বা রক্তিম শিখা প্রবল উল্লাসে যেন মাটির হাঁড়িটাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। উনোনটাকে মনে হয় শ্মশানের জ্বলন্ত চিতা। সুদামের মা'র কান্নায় নটবর, বাতাসী সবাই ছুটে এল। উনুনে ভাত পোড়ার গন্ধ নাকে গেল না কারো। ব্যস্ত-সমস্ত উদগ্রীব হয়ে শুধোয় নটবর, "কি হইছে ?"

সুদামের মা ঘামে ভেজা কপালে ডান হাতের পাতা দিয়ে চটাং চটাং করে কয়েকটা বারি দিয়ে গলার স্বর আর একগ্রামে তুলল, "ছিদাম রে—।"

ছিদামের নামে বাতাসীর চোখে জল এল। কিন্তু নটবর মুখোমুখি দাঁড়াল সুদামের।

সুদাম ততক্ষণে থমথম ভাবটা সামলে নিয়েছে। বলিষ্ঠ গলায়, নির্বিকার ভাবে সে বললে, "পাখী ধইরতে যাব।"

"তার মানে ?"

"হ্যাঁ!"

সুদাম দেখল নটবরের শুকনো মুখের চামড়ায় সারি সারি রেখা ঠিক ভাঁটার ম্লান নদীর ঢেউএর মত গড়াতে লাগল। চোখের আলো দপ্ করে নিভে গেল। বাসী, বিবর্ণ মরা ভাঁট ফুলের মত হয়ে গেল চোখ দুটো। কেমন এক অস্থির উত্তেজনায় সে অল্প অল্প কাঁপতে লাগল।

"তুই দাদন নেছিস গঞ্জের মহাজন থেকে ?"

"হ্যাঁ।"

"দাদনের টাকা দিয়া বউ আনছিস ঘরে ?"

"হ্যাঁ।"

"হায় ভগবান। তোর একটু কাণ্ডজ্ঞান নাই—এ কাম তুই করতে পারলি সুদাম?"

"তাতে কি হইছে, পাখী ধরব, গঞ্জে নি' যাব, মহাজনের দেনা শোধ হইবে। এ ত সহজ ব্যাপার, কোন ঘোর-প্যাঁচ নাই।" সুদাম সহজ করতে চায় ব্যাপারটাকে।

নটবর শান্ত হয় না তাতে। একটা অজানিত আশংকায় সে আচ্ছন্ন হয়ে আসতে থাকে, "তোর দাদাও একদিন গেছিল, সেও আর ফেরে নাই। ও বনে যাইস না, ওখানে গেলে কেউ আর ফেরে না। ওই বন, পাখী ধরা—সব অভিশাপ।"

"তা হয় না বাবা।"

নটবর এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, "লাজ করে না ঐ কথা বলতে? জোয়ান মদ্দ, সংসার ফেলে বনবাদাড়ে ছুটে যাস।"

সুদাম জবাব দেয়, "ছুটে যাই কি আমার পরাণের সাধে! গুষ্টির মুখে অন্ন জোগাবে কিডা? দাদনের টাকা আসবে কোন্ জমিদারী থেকে?"

সংসারে ছায়া নামে। ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। সবার অন্তরে চাপা বেদনা। নিদারুণ শঙ্কায় সবাই মৌন, নিশ্চল। সুদাম দেখে তুলসীর মুখের হাসিটুকুও কখন মুছে গেছে। প্রজাপতির মত উদ্দাম চাঞ্চল্য শিহরণ বেদনার গভীর ছায়ায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে দীঘল চোখে সে স্বপ্নের ফুল ফোটাত, সে ফুলের কুঁড়ি যেন অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেছে। তুলসী নিঃসার, প্রাণহীন। যৌবনের স্পন্দন যেন নিতান্তই ভীত-চকিত ভাবে ওঠা-নামা করছে। অমাবস্যার রাত্রির মতই সে থমথমে।

সুদাম ডাকে, "কি ভাইবছিস বৌ?"

একদৃষ্টে সুদামের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা গরম নিঃশ্বাস ছাড়ে তুলসী। সুদামের বুক জ্বালা ক'রে ওঠে। থোকা থোকা কালো চুলে আঙুল চালিয়ে সুদাম সোহাগ করে, "রাগ করিসনে বৌ। এ ছাড়া কোন পথ নাই। তোর বাপের কথা সহ্য হইল না, পাড়া-পড়শী সবাই তাচ্ছিল্য করে আবডালে, কেমন যেন গোঁ হইল। শেষে গঞ্জের ব্যাপারী থেকে দাদন নিলাম। আমার কোন বিপদ হইব না, ঠিক আমি ফির‍্যা আইসব।"

তুলসী চুপ করে রইল। চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। তারপর একসময় কাটা কাটা কথায় বলল, "আমি কার সাথে থাইকব।"

সুদামের রক্তে যেন টান লাগে। কে যেন অলক্ষ্য খোঁচায় মন ধরে টানে, সেও না, যেও না। এমন বোকামী ক'রো না। হেসে ফেলে সুদাম, "কেনে রে? মা আছে, বৌঠান আছে? ডর কিসের।"

দুস্তর চওড়া গাঙ। কূলের হদিশ দৃষ্টিসীমায় বিলীন। উত্তুঙ্গ ঢেউগুলো দাপাদাপি করে পরস্পরের গায়ে। খড়কুটোর মত ভাসতে থাকে ছোট্ট নৌকোখানা। সুদাম নদীর জলে চেয়ে থাকে। জল দোলে, নড়ে, সুদাম দোলে। ভাবনাগুলো দুলতে থাকে। গায়ে গায়ে ভেঙ্গে পড়ে। জোয়ারের গাঙ যেন প্রমত্ত যুবতীর যৌবন-জ্বালায় জ্বলে। কত খেলা তার, কত ছলনা। কখন ছল্ ছল্ ক'রে চলে। শুনলে মনে হয় মর্মবেদনায় অবিরাম গুমরে গুমরে কাঁদছে। কখনও উল্লাসে উত্তেজিত হয়ে সদম্ভে ফেনিল রূপ নিয়ে হাসে হি-হি করে। সবই ছল্ মায়া। মেয়েমানুষের চাতুরী-খেলার মত। মজতে নেই, ভুলতে নেই। মজলেই অন্ধ, ভুললেই মৃত্যু। জলের পাকে পাকে কত হাতছানি, স্রোতের তলে তলে নানা কৌশল। এ লোনা নদী—স্বভাব সাপের মত। যতই শান্তিতে শান্ত থাকুক। আর অশান্তে উন্মাদ হোক, কিছুতেই বিশ্বাস নেই। পেছন পেছন আসছে রাক্ষুসী। লোনা জলের রাণী। বোঝবার উপায় নেই, জলের তলে, পিছু পিছু, জলের সাথে দেহ মিলিয়ে-মিশিয়ে অবিকল জলদেবী সেজে। এগোচ্ছে, পিছোচ্ছে, পাশে পাশে চলছে। ল্যাজের ঝাপটায় জল সরাচ্ছে। লোনা জলে তীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত ঘষছে, মাজছে। দৃষ্টি ঠায় বাঁধা। একটু অসতর্কতা নেই, ভুল নেই। একটু সুযোগের অপেক্ষা কয়েকটা মুহূর্ত। একবার জলে হাত পড়ল, কি পা পড়ল—ব্যস্ আর নেই। সযত্নে দক্ষ কারিগরের মত সুচারু ভাবে কাটা পড়বে হাত। বোঝাও যাবে না। উপরে মিঠে, বাতাসের স্পর্শে শুধু জ্বলবে। তারপর

পচন ধরবে ক্রমে ক্রমে। রাক্ষুসী—জলের শয়তান। জারিজুরি খাটে না কোন। শুধু থাকতে হয় সতর্ক।

ছোট্ট নৌকো। হাল ধরেছে সুদাম। বৈঠা বাইছে কোরবান, দামু আর সনাতন। ছপ ছপ করে পড়ছে বৈঠা। জল কেটে ধীরে এগোচ্ছে। নৌকোর খোলে কয়েকটা বাঁশের খাঁচা, জাল আর আঠাকাটি। খাঁচার মধ্যে সবুজ টিয়াগুলো নির্জীব, নিষ্পন্দ, অবসাদগ্রস্ত। জবাফুলের মত লাল ঠোঁটগুলো ফ্যাকাসে। দুটো খাঁচা একেবারেই শূন্য। একটায় অবিরাম ঝটপট করছে একটা বন তিতির। ডানার ঝাপটায় যেন ভেঙে ফেলবে রুদ্ধ বন্দীশালা। ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে থাকে বাঁশের কঞ্চি। ডাক ছাড়ে বাতাস কাঁপিয়ে। মুক্ত জগত থেকে অতর্কিত অবরুদ্ধ হয়ে যেন সরবে জানাতে চায় বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। ভাঙতে চায় গণ্ডি। সুদাম হাসে। মনে মনে ভাবে, "শালারে আচ্ছা জব্দ করা গেছে।"

সনাতন বলছিল, "বন তিতির ধইরতে নাই।"

সুদাম চড়া গলায় জবাব দিয়েছিল, "ধুত্তোর ধইরতে নাই। গঞ্জের হাটে ইয়ার দাম পাঁচটা টিয়া পাখীর সমান হইবে জানিস।"

"হইলেই বা। দেবতা গোসা করেন ওতে।"

"গোসা করেন?" চোখ জ্বলে ওঠে সুদামের, "সারা বন-বাদাড়ে একটা পাখী নাই; তিতির কি দেবতার সম্পত্তি? তয় ইটাও বন ছেড়ে চলে গেলে পারত। রোখ চেপি গেল আমার ইটারে দেখে—একটা ভাল পাখী পাই নাই। এটাই আমার কাছে অনেক দাম হ।"

সুদাম তাকায় বন তিতিরটার দিকে। শুভ্র মেঘ-পুঞ্জের ছায়া তিতিরের কাঁচের মত চোখে। ডানার পালকগুলো বাঁশপাতার মত কাঁপছে বাতাস লেগে। অনেক—অনেক দূরে আকাশের কোলে চেয়ে আছে পাখীটা।

পাখীটার দিকে চেয়ে চেয়ে স্মৃতির কোঠায় ভেসে ওঠে বনের চিত্রটা। বিরাট বিপুল সবুজের স্বর্গ রাজ্য। গহন অরণ্য কুহেলী। শুধু গাছ আর গাছ। এত গাছ, সুদাম জীবনে কখনও দেখে নি। কত তার ধরন, কত বর্ণ, কত বৈচিত্র্য। গায়ে গায়ে জড়িয়ে, পরস্পরকে ঠেলে মহাশূন্যে ছত্রাকার হয়ে দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর গড়ে তুলেছে। কোন পথ নেই, পথের দিশাও না। মোটা মোটা শিকড় সাপের মত বিল্‌বিল্‌ করে মাটির উপর।

শক্ত মাটি, ঠিক লোহার মত, নখ বসে না। তার উপর ধারাল দূর্বা ঘাস ঘন হয়ে আবৃত। চলতে গেলে খোঁচা খেতে হয়, শিকড়ের ফাঁকে পা আটকে মুচড়ে যায়, রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়। অসংখ্য ডাল পথ আগলে দাঁড়ায়। সেগুলো ভাঙতে হয়, সরাতে হয়, কাটতে হয়। কিন্তু খুব সাবধানে, অত্যন্ত সতর্কভাবে। একটু বেখাপ্পা শব্দ হ'ল কি ব্যস্‌। উদ্দেশ্য নষ্ট। ডালে ডালে পাখী। অনেক দূরের শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু সামান্য বেসুরো শব্দে সব উড়ে পালাবে। তাই চলতে হয় সতর্ক হয়ে, বিড়ালের মত। কোন শব্দ উঠবে না চলাচলের। বুকে নিঃশ্বাস আটকে ফেলতে হবে, ছাড়তে হবে আলতো ভাবে। চোখ জ্বলবে বাঘের মত। যেখানে শিকার সেখানে চোখ। খুব ধীরে ধীরে এগুতে হয়। গাছে উঠতে হয় কাঠবেড়ালীর মত। বুক ঘষে ঘষে একেবারে মগ্‌ডালে। কিন্তু তাতেও বিপদ। হাঁ করে আছে মৃত্যু। সামান্য ত্রুটিতে, ভুলে রেহাই নেই। নানান রঙের পাখী। কত বিচিত্র কল-কাকলী তাদের। শীতের এই মরশুমে সব দেশ থেকে ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে মাছির মত। এ বনের মাদক নেশায় জমে যায়। অসীম শূন্যে চক্কর দেয়। কিন্তু আলোর পাশেই অন্ধকার। আলোয় চোখ ঝলসে গেলেই সর্বনাশ। কালোর ভয়াল জীবের মুখে পড়তে হবে। গাছের পাতায়, ডালে, মাটির কোকরে লতার মত ঝোলে, ঘুরে বেড়ায় পরম নিশ্চিন্তে। শিকার ধরে। একটু বেতালেই জড়িয়ে ধরবে পা। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দেবে অতর্কিত তীব্র ছোবল। মরণ জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে দম শেষ হবে এক সময়। নীল কঠিন দেহের উপর দিয়ে হিংস্র কুটিল লতা পরম উল্লাসে নেচে বেড়াবে।

সুদামের মনে পড়ে, এই বুনো তিতিরটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার বড় জলার ধারে। জলার আকাশের

ছবি ভাসা জলে মুখ দিতে গিয়ে থুঃ থুঃ করে ফেলে দিয়েছিল সে। এমন টলটলে জলে নোনতা স্বাদ সে কল্পনাও করে নি। জলার কোলে লম্বা লম্বা হোগলা আর বুনো ঘাসের জঙ্গলের দিকে বিরক্তি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। মনে মনে হিসেব করে নিচ্ছিল কোন দিকে যাবে। বুক শুকিয়ে আসছিল তৃষ্ণায়। এমন সময় একটা উৎকট চিৎকার। চমকে মাথার উপরটায় তাকাতে গিয়ে শেওড়া গাছের ডালে চোখ আটকে গেল।

বেশ বড় একটা তিতির। আনন্দে ঘাড় দোলাচ্ছে, এদিক, সেদিক তাকাচ্ছে। দেখেই কেমন একটা রোখ চেপে গেল সুদামের। ধরতেই হবে পাখীটাকে। বিড়ালের মত টিপি টিপি এগোল সে। কাঠবেড়ালীর মত তড়্‌তড়্‌ করে গাছে চড়ল। দৃষ্টি দিয়ে আটকে রাখল তিতিরটাকে। সরু ডালটায় বুক ঘষে ঘষে এগোতে লাগল।

ডান হাতে সন্তর্পণে এগিয়ে রাখল আঠাকাঠি। একেবারে কাছাকাছি এসে গেল তিতিরের। পাখীটা কি বোকা, এই মুহূর্তে কি বিপদ হয়ে বসে আছে। একটু ঘাড় ঘোরালেই দেখতে পাবে যমদূতকে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল সুদামের। আঠাকাঠি গায়ের কাছাকাছি আনতে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে লাফিয়ে উঠল পাখীটা। আর তখনই দেখে ফেলল সুদামকে। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে ঝাঁপ দিল তিতিরটা।

প্রবল আক্রোশে ফুঁসতে লাগল সুদাম। রাগে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। হাতের কাছে শিকার ছুটে পালাল। লজ্জা—লজ্জা। কি বেকুব সে। পাখীটার গন্তব্যস্থানটা একদৃষ্টে চেয়ে ছুটল সে। খেলা চলল শিকারী-শিকারে। মানুষে-পাখীতে। নেশা খেলা, মায়া খেলা। দুর্দাম রোখে ছুটল সুদাম। যেমন করে হোক ধরতেই হবে। এ পাখী না কি ধরতে নেই। নিকুচি করেছে নিয়মের। ঝুলি শূন্য। ফিরতে হবে কাল সকালে। কি নিয়ে যাবে গঞ্জের হাটে? গোটা ছয়েক টিয়া? কত দাম তার? দাদনের টাকা আসবে কোত্থেকে? রক্ত ছুটল মাথায় তার। জিততে হবেই।

তারপর সন্ধ্যা যখন হয়, বনের পাতায় পাতায় যখন অন্ধকার নামতে সুরু করে মৃদু মৃদু, সেই সময় ধরা পড়ল তিতিরটা। বিজয়ীর হাসি ঝিলিক দিল সুদামের ঠোঁটে। পাখীটাকে আঁকড়ে ধরে একটা চুমো খেল, বুকে জড়িয়ে ধরল। রগড়ে রগড়ে অনুভব করল তার উত্তাপ। ক্লান্ত, অবসন্ন তিতিরটা নিদারুণ শঙ্কায় কাঁপতে লাগল। অজানিত ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁত ঘষে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল সুদাম, "শালা শয়তানের বাচ্চা। কেমন জব্দ এবার।"

ঝটপট শব্দ উঠল একটা। চমকে উঠল সুদাম। কল্পনায় ছেদ পড়ল। চেয়ে দেখল, প্রাণপণে পাখা ঝাপটাচ্ছে তিতিরটা। নৌকোটা দুলছে ঢেউয়ের তালে। কোরবান, দামু, সনাতন বৈঠা মারছে অক্লান্ত ভাবে।

নদীর বুকে সূর্য হারিয়ে গেল। বাতাস ভারী, গর্জন উঠেছে সোঁ—সোঁ করে। আকাশ নীলিমা হারিয়ে ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে আসছে, মাতালের মত টলছে জল। অলক্ষ্যে কে যেন কালি ঢেলে দিল জলে। সমস্ত চরাচরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করল নিশ্ছিদ্র তিমির অন্ধকার।

খোলে হ্যারিকেনটা জ্বলছে মিট্ মিট্ করে। ক্যাকাশে মরা আলো-অন্ধকারে চোরের মত সন্ত্রস্ত। পাশেই নিবিড় শূন্যতা। নদীকে যেন নদী বলেই মনে হয় না। বিরাট সীমাহীন এক অন্ধ-গহ্বর বলে মনে হয়। সেই গহ্বর-পথের শেষ সীমায় পৌঁছানোর অফুরন্ত চেষ্টায় যেন সব মিল তারা। দামু, সনাতন টুকটাক্ কথা বলছে। সংসার, পরিজন, জীবন সব কিছুই উঁকি মারছে কথায়। সে কথায় সুখের স্পর্শ, দুঃখের বেদনা, হতাশার গ্লানি ঝরে। সুদাম শোনে নিশ্চুপ হয়ে। কোরবান নমাজ পড়া শেষ করল। খোলের উপর বাঁকা ভাবে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে সে বলল, "ব্যাপার কি সুদাম ভাই? বোবা হই গেলে না কি? মুখে কথা ফোটে না যে?"

সুদাম হেসে ওঠে। বোঝাতে চায় চুপ করে থাকলেও মনে মনে সে অনেক কথাই বলছে।

আকাশে অগণ্য জোনাকি পোকা। বহুদূর থেকে

যেন মিটিমিটি দুষ্টুমি করছে। সুদাম তাকাল, এক আকাশ তারার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। মন হারিয়ে যায়। কিন্তু হাতে হাল। বেসামাল হ'লেই গাড্ডা। সম্বিৎ ঠিক রাখতেই হয়। পাশের অন্ধ-গহ্বর, গহ্বর নয়—নদী। ভয়াল ভয়ঙ্কর হিংস্র রাক্ষুসী কাঙোটের আসর।

নৌকো চলে ঢিমে তালে। ভাঁটার খেলা সুরু হয়েছে। নৌকোর তলে—ক্য ক্য আওয়াজ হচ্ছে জলের। ঝিমিয়ে আসছে নদী। প্রতি মুহূর্তেই বিপদ। যে কোন জায়গায় চর জাগতে পারে। চরের বুকে পড়লে নৌকোর আয়ু শেষ। আঘাতে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাবে কাঠের পাটা।

সুদামের দাদার কথা মনে পড়ে। আজ থেকে তিন বছর আগে এই রকম একদিন হারিয়ে গেছিল সে। গোকুল, হারাণের সঙ্গে এসেছিল এই পাথারালায়। জীবিকার তাড়নায়। বনের মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল সে। হয়ত পাখীর নেশায় পড়ে গেছিল। বন থেকে বনান্তরে ছুটেছিল। হয়ত দিকের ঠাহর ছিল না। ভুল পথে ভিন্ন রাজ্যে চলে এসেছিল। তারপর আর পথ পায় নি। ঝোপ-ঝাড় ভেঙ্গে ছুটেছিল, খুঁজেছিল গোকুলকে, হারাণকে। পায় নি। ক্ষিধেয়, তেষ্টায় হয়ত শুকিয়ে ছটফটিয়ে মরেছে। মৃত্যুর কাৎরানি কেউ শোনে নি, শুধু গাছ থেকে গাছে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেছে। উৎকট আদিম উল্লাসে সেই যন্ত্রণার স্বরে ডানা ঝাপটেছে অন্ধ বাদুড়গুলো। কিংবা সাপের মুখে পড়েছিল। বেখেয়ালে চলছিল। বসিয়ে দিয়েছে বিষের ফলা। তীব্র বিষের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে নিস্তেজ হয়েছে ছিদাম।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সুদামের। সোজা হয়ে বসে। যেন চোখের সামনেই কিল্‌বিল্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউটে, লাউডগা, মেটে, কালনাগিনী। একটা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে। উক্! বুক থেকে কেঁপে কেঁপে দীর্ঘশ্বাসটা বের হয় সুদামের। দাদার হাসিমাখান মুখখানা যেন কঠিন যন্ত্রণায় কুঞ্চিত হয়ে ভেসে ওঠে চোখের পর্দায়। চোখ বোজে সুদাম।

উপরে আকাশে নক্ষত্রমালা। নীচে গভীর নোনা জল। আবছা কুয়াশার ছায়া চারধারে ব্যাপ্ত। সব কিছু মিলে-মিশে কেমন আশ্চর্য স্তব্ধতা। তুলসীর কথা আসে বার বার। টানা টানা চোখ, দীঘল নাক আর কুঁচ ফলের মত ঠোঁট। সমস্ত মুখে হরিণ চপলতা। তুলসী এখন ঘুমোচ্ছে। পাশে হয়ত মা, কিংবা বৌঠান। ঘরবাড়ী নিস্তব্ধ। ঝিঁ-ঝিঁ পোকাগুলো পালা করে ডেকে ডেকে ক্লান্তিতে অবসন্ন। হয়ত তুলসী জেগে, মনে অদম্য প্রতীক্ষা। কখন আসবে সোয়ামী। কখন শুনবে মাটির দাওয়ায় ভারী পদধ্বনি। দরজায় খুট্ খুট্ আওয়াজ। আগ্রহে উৎকর্ণ স্নায়ু। হয়ত বা তুলসী তাকে নির্মম নিষ্ঠুর ভাবছে। ভাবছে, তার হৃদয়ে মায়া-দয়া-ভালবাসা নেই। হাঙর বাপের মুখে খোলাম-কুচির মত টাকা ছুঁড়ে তাকে গর্বিত ভঙ্গিতে নিয়ে এল। আনন্দ বরণের দমকা বাতাসে উচ্ছ্বসিত করে তুলল। অথচ দুটো রাতও পুরোপুরি কাছে থাকল না। এটা নির্দয়তা ছাড়া কী? বাপকে জব্দ করারই একটা ফিকির। সুদামের মনে হয়, তুলসী হয়ত একটা চাপা আক্রোশে রাতের প্রহরগুলো কাটাচ্ছে। হয়ত বা আশংকার দোলায় মনে দোলাচল ঘটছে।

সুদাম গান ধরে, "ও আমার সোহাগী কইন্যা" নিঃসীম শূন্যতা ছিঁড়ে মেঠো সুর বাতাসের তরঙ্গে ভাসতে থাকে।

সনাতন ফিস্‌ফিসিয়ে দামুকে জিজ্ঞেস করে, "ব্যাপার কি, ঠিক পথে চলছি ত। দু' পহর হই গেল, এখনও কূল-কিনারের নাগাল নাই।"

দামু হেসে বলে, "গর্দভ—ভাটি পড়েছে খেয়াল আছে।"

গানের সুরে ভাসতে ভাসতে সুদাম বুঝি চলে যায় অন্তরের নিভৃত কোণে। যেখানে সযত্নে, একটা মেয়ের গভীর ভালবাসা, কামনা গুপ্ত।

অতর্কিতে সনাতন চেঁচিয়ে ওঠে, "না, ভাটির টান নয়। আমরা পথ ভুল করেছি ঠিকই। ভুল পথে যাচ্ছে নৌকা। হয়ত সমুদ্দুরের পানে।"

জলে বৈঠা খুঁচিয়ে জলের গতি নিরিখ করে কোরবান। আকাশের নক্ষত্র দেখে বুঝতে চায় দিক।

ভীতু সনাতন আবার চেঁচিয়ে ওঠে। দামু তার

কণ্ঠনালী চেপে ধরে বলে, "শালা চেঁচাবি ত নিকেশ করে দেব। ঠাহর করতে দে আগে।"

কোরবান ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "ঘূর্ণি স্রোতে পড়ি নাই ত আমরা?"

সুদাম কেমন নির্বিকার হয়ে গেছে। একটা আশংকা বাষ্পের মত জমা হচ্ছে বুকে। ম্রিয়মান স্বরে সে বলে, "হ'তেও পারে।"

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ। জলের গতি দেখে, চরিত্র বোঝে স্রোতের। দুরন্ত উল্লাসে ছুটেছে গাঙ্। বলা যায় না, কোথাও তলে তলে জমা হচ্ছে পলি, বা কোথাও তীর ভেঙ্গে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। বিপুল বেগে ঢুকছে জল সেই ফাটল-পথে অতলে। উপরের জলে তার কোন ছাপ নেই। কোন হদিশ নেই। রাক্ষুসীর এই চরিত্র। উপর থেকে, দূর থেকে কিছু বোঝার সাধ্য নেই। যেন কিছুই না, অথচ ভেতরে কত কিছু। নৌকো চক্কোর দেওয়াবে। যেন কত পথ অতিক্রান্ত। আসলে যেখানে, সেখানেই। একই বৃত্তের অভ্যন্তরে।

সুদামের মুখ শুকিয়ে এল জলের গতি দেখে। দুরু দুরু বুকে সে অস্ফুটে একটা কথাই উচ্চারণ করল, "হেই, সত্যিই আমরা ঘূর্ণি স্রোতে পড়ছি।"

একসাথে সবাই যেন আর্তনাদ করে উঠল। সনাতন দেহটা কুঁকড়িয়ে কাটা পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল। নিশ্চল দামু—কে যেন শক্তি তার কেড়ে নিয়েছে। কোরবান বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। আর সুদামের চোখের আলো নিভে গেল। অস্পষ্ট কুয়াশা যেন নিবিড় হয়ে চোখের পর্দায় জমা হয়ে সমস্ত দৃষ্টিশক্তি, চৈতন্য সব কিছুকে বিকল, ঝাপসা করে দিল। আকাশের জোনাকি নক্ষত্রগুলো খসে গিয়ে এলোপাথাড়ি উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে দুর্বার বেগে ছুটতে ছুটতে হারিয়ে যেতে লাগল। তুলসীর টানা টানা চোখ, দীঘল নাক আর কুঁচ ফলের মত ঠোঁট যেন স্মৃতি-পটে ঝাপসা হ'তে হ'তে কোন্ অতল তলে হারিয়ে গেল। কেবল উৎকট ভাবে হা করে সজাগ হয়ে রইল ভয়াল ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মৃত্যুর গহ্বর। চেতনায় কাদামাটি লেপে সুদাম হয়ে পড়ল অনড়, চলাচল শক্তিহীন স্থবির পঙ্গু।

সময় কাটল অনেক। নিষ্প্রাণভাবে জলছে নৌকোর খোলে হ্যারিকেনটা। একই বৃত্তে ঘুরছে নৌকো। চারজনের মুখে-চোখে পড়েছে হ্যারিকেনের ম্লান আলোর ছটা। উদ্বেগে আকুল, ভয়ে অসার। শুধু চোখে খেলছে সংশয়।

জ্বরো রুগীর মত বলল দামু, "আজ রাতে রওনা না দিলেই হ'ত। এমন বিপদের মুখোমুখি—"

"হায়, খোদা।"

"কি হইবে গো ভগমান।"

সংশয়, সন্দেহ আলোর কাঁপনে নাচে, দোলে। উন্মত্ত বিক্ষোভে দেহ কুঁকড়ে আসে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সনাতন বলে, "আমি জানতাম এমন হবে।"

সবাই তাকাল তার দিকে।

জোর দিয়ে বলল সনাতন, "জানতাম হবে। ঐ অলুক্ষণে পাখীটা যত গণ্ডগোলের মূল।"

পাপের খতিয়ান ঘাঁটছিল সবাই। সনাতনের কথাটা মনে ধরে সবার; সন্দেহ ঘনীভূত হয় আরও। সত্যিই ত, ও পাখী অলুক্ষণে, ও পাখী ধরতে নেই। বনদেবতা গোসা করে। দেবতার গোসায় অমঙ্গল হবেই হবে। সুদাম শোনে নি কথা। তার ফল এমন ভয়ঙ্কর ভাবে হাতে নাতে ফলল।

দামু বললে, "ও পাখী ছেড়ে দে সুদাম।"

সায় দিল কোরবান, "দেবতারে চটাতে নাই। ছেড়ে দে, দেবতার গোসা কমবে।"

আশ্চর্য কঠিন গলায় প্রত্যুত্তর দিল সুদাম, 'না।"

"না!" বিস্ময়ে হোঁচট খেল সকলে।

"ছেড়ে দে বলছি।"

আরও কঠিন স্বরে বলল সুদাম, "না! ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না।"

"নেকামি করিস না সুদাম।"

সুদামের চোখের পলকে ঘরবাড়ী, পরিবার আর দৈন্য জীবন। হৃদয়ে বাজছে গঞ্জের হাট, দাদনের টাকা। ঋজু কঠিনতায় স্থির থেকে সে বলে, "বোকামি না। পাখী ধরছি জানের লেগে। জান যায় যাক, পাখী ছাড়ব না।"

বিক্ষোভে কেটে পড়ে তিনজনে। মঙ্গল চায় না

সুদাম। নিজে মরবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও মারবে। একজনের পাপে তিনজনের ভোগান্তি। ঈর্ষায়, আক্রোশে গুমরোতে থাকে। হয়ত উদ্দেশ্য আছে কোন সুদামের। এত সহজে মরতে চায় কে? জীবনকে কে না ভালবাসে? চোখে চোখে কথা হ'ল ওদের, নীরব ভাষা। দ্রুত উঠে দাঁড়াল পাটায়। দামু হেঁকে বলল, "খুলে দে সনাতন খাঁচার মুখ।

রক্ত চলকে উঠল সুদামের। তন্ত্রে জ্বলল আগুন। চাপা ভারী গলায় বললে সে, "সাবধান। ভাল হবে না বলছি। খুনোখুনি হই যাবে।"

"ও শালার লোভের অন্ত নাই। ধর মণ্ডলের পো'রে। ও হারামিটাকে ছুঁড়ে ফেল জলে। আপদ যাক।" সাপের মত হিস্‌হিসিয়ে উঠল কোরবান। এগিয়ে এল তিনজনে।

কোথা দিয়ে কি হ'ল, সুদাম মাচা থেকে বৈঠাখানা মাথার উপর হঠাৎ উঁচিয়ে ধরে বজ্রনির্ঘোষ হুঙ্কার ছাড়ে, "খবরদার, এক পা এগোইছ ত, জান শেষ। রেহাই পাবে না কেউ।"

তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়ে মূর্তির মত। দুলতে থাকে নৌকো। হ্যারিকেনের আলো চোখে-মুখে-দেহে ছায়া-বাজির খেলা খেলে। উদ্ধত মারমুখী সুদামের সামনে ধীরে ধীরে কেমন নিস্তেজ হয়ে আসে তারা। পিছু হটে। বিবশ কণ্ঠে বলে সনাতন, "তয় এখন কি হইবে?"

সুদাম চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। কোরবান ডুকরে কেঁদে উঠল, "হায় খোদা, এ কি হইল। ঘরে বিবি-বাচ্চার কি হইবে?"

অতর্কিতে নৌকোর মুখ ঘুরে গেল। গাঙের বুক উল্লসিত। যৌবন-জ্বালায় উন্নত। যেন ফুলছে কাঁপছে, জলের ঢেউ বড় হচ্ছে। তাড়াতাড়ি জলে নামিয়ে কি বুঝতে চাইল সুদাম। উত্তেজনায় দেহের লোমগুলো কাঁপতে লাগল তার। কিছুক্ষণ চুপচাপ নিবিষ্ট নিরিখের পর মুখ তুলল সে। কেমন চঞ্চল মুখাবয়ব তার। চেঁচিয়ে উঠল সে। আশা-চঞ্চল কণ্ঠস্বর, "হেই দামু, সনাতন, কোরবান। ভয় নাই। জোয়ার আসছে। জলের তোড় বাড়বে। বৈঠা মার সবাই। চুপ থাকিস না।"

নিশ্চিত মৃত্যু জেনে সময় গুনছিল সবাই। সুদামের ডাকে চমক ভাঙল। দামু জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু কূলের ঠাহর পাবি কেমন করে?"

"একদিকে গেলে ঠাহর পাইবই। উই, ঐ তারাগুলো দিশা করে চল। জোয়ার আসছে, জোয়ারের তোড়ে ঘূর্ণি থেকে বেরুনো যেতে পারে। নে, নে, হাত লাগা।"

ত্রস্ত হাতে বৈঠা তুলে নেয় সবাই। ভয়, সংশয়, সন্দেহের ছায়াগুলো চোখের কোণ থেকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়। দৃঢ় প্রত্যয় জেগে ওঠে মনে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে কলা দেখাবার দুর্জয় ইচ্ছা জাগে। মৃত্যু যদি নিশ্চিতই হয় তবে তার সঙ্গে লড়তে দোষ কি। যে বনে পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি, যে জীবনচক্রে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পরোয়ানা তাকে তুচ্ছ করে যদি দুর্বার মনোবলে বাঁচতে যদি পারে, তবে এখন তাতে সংশয় কেন?

মরাটা সহজ কিন্তু বাঁচা কঠিন। মৃত্যুর কাছাকাছি এসে তারা যেন জীবনের স্বাদ পেল। বন-বিজয়ী, জীবন-জয়ী চারটে মানুষ আটটা বলিষ্ঠ হাতে জীবন জয়ের অস্ত্র তুলে নিল। মুখোমুখি হ'ল সবাই, কাছাকাছি। নৌকোর মুখটা জল থেকে কিছুটা উপরে উঠল। চোখে চোখে বিশ্বাস, প্রত্যয়, লড়াইয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষা বিনিময় হ'ল। তিমির রাত্রির বুক চিরে চেঁচিয়ে উঠল সুদাম, "গাজী-হো-বদর বদর।"

দুর-পাল্লার প্রতিযোগীর মত নৌকা ছুটল। দুর্দম বেগে। দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত হ'ল তাতে। বিরাম-হীন চলল। ঢেউ কেটে, স্রোতের টান ভেঙে। আক্রোশে ফুঁসতে লাগল গাঙ। ঢেউ-এর প্রাচীর তুলে মৃত্যু আবর্তে রুদ্ধ করে রাখার আকুল প্রচেষ্টায় মেতে উঠল।

লড়াই চলল প্রকৃতিতে মানুষে। আদিম লড়াই। অন্ধকারের বুকে যেন হিংস্র খেলা। ঢেউ এর বাধা ভাঙতে লাগল নৌকা।

"জোরে, আরো জোরে। থামবি না কেউ।" চেঁচিয়ে উঠল সুদাম।

শ্রান্তিতে যেন অবসন্ন হয়ে আসছে সবার পেশী। একটু বিরামের জন্ম উৎসুক। তিনরাত্রির জাগরণ যেন ব্যঙ্গ করে উঁকি মারছে চোখে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে আসছে। আসুক তবু থামা চলে না। এই শেষ উপায়, এতেই রক্ষে, নয় মৃত্যু।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় কেঁপে উঠল নৌকোটা। যেন শক্ত কিছুতে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে। চোখ খুলল সবাই আতংকে।

কিন্তু আচমকা এক দোলায় যেন দেহে তাদের বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাকিয়ে দেখল তারা! দেখল, প্রদোষের আরক্তিম আলোয় যেন স্নান করে উঠল আকাশ। রাত্রির নিদাঘী কালিমার ছিটে-ফোঁটা কোথাও নেই। আশ্চর্য আলোর মেলা। তাদের চোখ যেন ঝলসে এল। এত আলো তারা কখনও দেখে নি, আলোর এই অদৃশ্য রহস্য তারা কখনও দেখে নি। যেন সমস্ত প্রকৃতি প্রাণ খুলে হাসছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাদের। আর—আর—সেই আলোর প্রপাতে তারা দেখল বহু দূরে একটা সূক্ষ্ম দীর্ঘ রেখা। জীবনের স্বাদ যেন তাদের মনে টালবিহীনভাবে নড়ে-চড়ে বেড়াতে লাগল।

পেছনে আঙুল দেখিয়ে সুদাম বলল, "উইখানে রাক্ষুসী ঘূর্ণি খিদের জ্বালায় হাসফাঁস করছে। আর ডর নাই। কূল দেখছি আমরা।"

চারজনের নজরে পড়ে গেল বাঁশের খাঁচাটার দিকে। কাঁচের মত চোখ দিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে তিতির পাখীটা সুদামের দিকে। সেই মুহূর্তে সুদামের চোখের তারায় ভেসে ওঠে তুলসীর শঙ্কাজড়িত মুখখানা। যেন সে তার একান্ত নিকটে এসেছে এমন ভঙ্গিতে, ভালবাসার তাপ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে ওঠে, "বৌ, ডর নাই। আমি ফিরে এসেছি।"

নিজের জন্ম অধিকার লাভ করিতে হইলে যতটা ন্যায়বুদ্ধির প্রয়োজন, অন্যকে অধিকার দিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক ন্যায়বুদ্ধির প্রয়োজন। আমরা নিজেদের জন্ম অধিকার চাই স্বার্থসিদ্ধির জন্ম, অপমান ও অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, এবং দেশের হিত করিবার জন্ম। কিন্তু অপরকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে কিছু প্রভুত্ব, কিছু শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার, কিছু ক্ষমতা, কিছু আয়, কিছু অতিরিক্ত লাভ, কিছু সুবিধা ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে ন্যায়বুদ্ধি খুব প্রবল ও প্রখর হওয়া দরকার।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮

বাংলার বুলবুল সরোজিনী নাইডু

মীরা রায়

Hazlitt বলেছেন 'Man is a poetical animal'. প্রতি মানুষের অন্তরে অল্প-বিস্তর কাব্যানুভূতি আছেই। সেই অনুভূতি দেশ-কাল-পাত্রের সুসমন্বয়ের সুযোগ পেলেই কবিতার নৈবেদ্য সাজিয়ে কাব্যলক্ষ্মীর অর্চনায় কাব্যিক রূপসজ্জায় আত্মপ্রকাশ করে। কাব্যময়ী প্রকৃতি সম্পদে ভূষিতা এই রাঢ় বঙ্গদেশের মানস সরোবরে স্মরণাতীত যুগ থেকে বহু কবি শতদল মেলে ফুটে উঠেছেন। এই বাংলার সাহিত্য-কুঞ্জ বহু কবির কাব্য-গুঞ্জনে আজও মধুর ঝংকারে পরিপূর্ণ। বাংলার সেই মানস সরোবরে সরোজিনী নাইড়ু এমনিই এক শতদল। আজও তাঁর কাব্যগুঞ্জন বাংলার রসপিপাসু চিত্তে এমনিই মধুর ঝংকার তোলে। যদিও তাঁর এ কাব্য-সৌরভ বা কাব্য-গুঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে আমাদের পরিচয় রয়েছে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে, তবুও বাংলার মেয়ে সরোজিনী বাংলার কাব্যধর্মী অন্তরটি পরিপূর্ণ ভাবেই পেয়েছিলেন বলে বাংলার বাইরে থেকেও মাতৃভাষা ব্যতিরেকে সেই বঙ্গজনোচিত কাব্যধর্মী মনেরই স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর কাব্য-সৃষ্টিতে।

সরোজিনী নাইডুকে আমরা কর্মজীবনের ব্যাপ্তিতেই সমধিক প্রকাশ হতে দেখেছি। দেশসেবা, জনসেবার কাজে তাঁর সমুদয় জীবন উৎসর্গীকৃত। দেশপ্রেম, জনসেবা, আত্মত্যাগ, বিদ্যোৎসাহিতা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি সর্বগুণের একটি সুসমঞ্জস সংযোজন যে এই মহীয়সী নারীর চরিত্রে ঘটেছে এ সকলের পিছনে এ জীবনকে চিন্তায় সংবেদনশীল, কর্মে গতিশীল, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর করে উজ্জীবিত করে রেখেছিল তাঁর সরস কবিচিত্ত। ভারতের মনীষার আকাশে সরোজিনী নাইডু একটি উজ্জ্বল তারকা—ভারতের কৃষ্টিক্ষেত্রে এই নারী বাংলার মহান অবদান। ভারতীয় নারীত্বের চিরন্তন আদর্শের স্বপ্নসুন্দর প্রবহমান ধারা আমরা দেখতে পাই বহুমুখী সাধনায় লিপ্ত এই প্রতিভাময়ী নারী-চরিত্রে। তাঁর এই প্রতিভার একটি উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও কাব্য-প্রীতিতে। তাঁর চরিত্রে এইটাই পরম বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনকে অব্যাহত রেখেছিল তাঁর অন্তঃসলিলা কাব্য-রসের সঞ্জীবনী শক্তি।

কবি সরোজিনী কৈশোর কাল থেকেই কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। বিলাত যাত্রার আগেই তিনি কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্ণোদ্যমে কাব্য-সাধনা সুরু হয় পশ্চিমের নিসর্গ শোভার মধ্যে। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন-জীবনেই তিনি তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন 'The Golden Threshold'—এই কাব্যগ্রন্থটি ইউরোপের বিদগ্ধমহলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। এরপর ইটালীতে যখন তিনি গিয়েছিলেন, সেখানকার প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ তাঁর কল্পনাপ্রবণ চিত্তে কাব্যের বহু উপাদান জুগিয়েছিল, কিন্তু তাঁর মূল কবিতাগুলি ভারতীয় রীতিনীতি শিক্ষা সংস্কৃতিরই গভীর স্বাক্ষর বহন করছে। মনেপ্রাণে তিনি ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই কবিতা রচনা করেছেন। বিদেশী পরিবেশে বিদেশী ভাষায় তিনি যে ভারতীয় কাব্য রচনা করে গেছেন তা পরিপূর্ণ এ দেশীয় গীতিধর্মী এবং সেগুলি সব সুগভীর প্রাজ্ঞ মননশীলতার পরিচয় দাবি করতে পারে। সরোজিনী জীবনদর্শনে রূপরসবেত্তা ছিলেন, কঠিন কর্মময় জীবনের পশ্চাতে তাঁর এই রসগ্রাহী চিত্ত কোনদিনই আত্মহনন করে নি। রাজনীতির ধূলিমলিনতার মধ্যে থেকেও জীবনকে তিনি কাব্যকলার মনোরম স্পর্শে আরও মহৎ ও পবিত্র করে তোলবার প্রয়াসী ছিলেন, তাই রাজ্যপালের কর্মব্যস্ত জীবনে প্রবেশ করে তিনি সমসাময়িকদের বলেছিলেন 'আপনারা একটি গায়ক পাখীকে খাঁচায় পুরে রাখছেন'। এই গায়ক পাখী বা 'নাইটিঙ্গেল' আখ্যা তাঁকে মহাত্মা গান্ধী দান করেন। তাঁর এই সঙ্গীত ছিল জীবনের, সুন্দরের, সৎএর, পবিত্রের, এই ত্রয়ীর সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে।

সরোজিনী নাইড়ু ঐশী চেতনার গভীর আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর বুলবুল কণ্ঠ সেই ঐশী উপাসনায় গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল—এর বহু প্রমাণ তাঁর রচনায় পরিস্ফুট

আছে। কবির কাব্য-সাধনার সেইখানেই সার্থক পরিণতি লাভ করে যেখানে কবি ভগবৎসাধক এবং জীবন-সাধক—এই মহৎ পরিচয়ে মহিমমণ্ডিত হয়ে তাঁর কাব্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভারত আত্মার চিরন্তন বাণী ঐশী প্রশান্তিতে বিশ্বাসী তিনি, তাই তাঁর কণ্ঠে জেগেছে প্রশ্ন :

'Lord Buddha on thy lotus throne
With praying eyes and hands date
What mystic rapture dost thou own ?
Immutable and ultimate ?'

তিনি তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে জীবনের দুঃখবাদ বা বিষাদ-তত্ত্বকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। জীবন সংঘাতপূর্ণ, তার যে বেদনাময় সংবেদনশীলতা আছে তাও জীবনের পরম করুণ রসসৃষ্টিতে অপরিহার্য। এই রস কাব্য প্রেরণায় এক মহত্তম অংশের ভূমিকা গ্রহণ করে। সরোজিনী জীবনের সংঘাতকে স্বীকার করে নিয়ে তার বেদনায় এক চরম সত্যের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন, তাই বলছেন :

'Tomorrows unborn griefs depose,
The sorrows of our Yesterday.
Dreams yields to dream, stribe follows stribe.
And death unweaves the webs of life.'

দুঃখের কাছে নতি স্বীকার সরোজিনীর ছিল না। মৃত্যু ত অবধারিত সত্য, তবুও আশাবাদী আত্মপ্রত্যয়শীল কবি সরোজিনী প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তিকে স্বীকার করেছেন, প্রেমের শাশ্বত রূপ মঙ্গলময় ঐতিহ্য জীবনের পরপারেও বেঁচে থাকে মানবজীবনের এ এক মহতী আশার বাণী তিনি শুনিয়েছেন তাঁর If you are dead নামে কবিতাটিতে। তাঁর Life and Death কবিতাটিতেও প্রেমের মাঙ্গলিক রূপের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে।

সরোজিনী কবিতা-রচনায় মধ্যযুগীয় রোমান্টিক ভাব-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এর মাঝে তাঁর নৈসর্গিক সৌন্দর্য-পিয়াসী মনের এক ঐশ্বর্যশালী রূপের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর 'জেবেদির প্রতি হুমায়ুন' নামে যে কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গানুবাদ করেন। তার প্রতিটি লাইনে মানবচিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যোগসূত্র এবং সরোজিনীর কবি-চিত্তের নৈসর্গিক প্রীতির ভাবাবেগ সুসংহতভাবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর প্রথম কবিতা সংগ্রহ The Golden Threshold কাব্যগ্রন্থের বহু জায়গায় তাঁর জীবন সৌন্দর্য পিয়াসী চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্ময়ের কথা এই যে, বিদেশে এবং বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করলেও সরোজিনীর কবিতাবলীর বিষয়বস্তু ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারাতেই প্রভাবান্বিত ছিল। পাশ্চাত্ত্য কবিগণ তাঁদের কাব্য সাহিত্যে Neo realism-এর যে সূচনা করেন তার কিছুটা ছায়া সরোজিনীর কাব্যে পরিলক্ষিত হয় কিন্তু এর আঙ্গিক রূপসজ্জা ছিল ভারতীয় বেশবাসে। তিনি প্রকৃতিকে একান্ত করে ভাল-বেসেছেন, তাঁর সূক্ষ্ম কাব্যিক দৃষ্টির সামনে প্রকৃতি তার নতুন সত্তার খুলে ধরেছে, তাই অতি সাধারণ প্রকৃতির বস্তুনিচয়ের মাঝে এক অলৌকিকত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তিনি একটি পত্রে লিখছেন :

"I chiefly lie on the sofa and listen to the birds in my garden. The bulbul's nest in the orange tree and a blue king fisher comes from his moonday bath in the fountain and the honey birds are busy in the clematis and bignonia creepers."

তাঁর এই প্রকৃতি নিরীক্ষায় যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রেরণার উৎসই হ'ল তাঁর কাব্যিক চিন্তাধারা।

তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ The Birds of Time এবং The Broken Wings। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত কবিতাবলী সংগ্রহ করে Sceptered Lute নামে একটি কবিতার বই পরে প্রকাশিত হয়। এর প্রত্যেকটিতে আছে বাংলার ঐশ্বর্যশীল কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন আবেদন—কোনটিতে আছে হৃদয়ানুভূতির কোমল পেলবতা, রোমান্টিক মনের উচ্ছল আবেগ, কোনটিতে আছে প্রজ্ঞাদীপ্ত মননের সুসম্বদ্ধ গভীর অনুভূতির প্রকাশ। কয়েকটি কবিতায় ভাষার দুর্জ্ঞেয়তা থাকলেও সার্থক কাব্য সৃষ্টিতে অসামান্য অবদানসহ এদের আবির্ভাব ঘটেছে—ভাব-সম্পদে এরা সকলেই সম্পদশালী। সরোজিনী নাইডুর কবিতা পাঠে শুধু পরিণত চিত্তই তৃপ্ত হয় না, অপরিণত শিশুচিত্তের সরস খোরাক জুগিয়েছে এমন বহু শিশুদের কাব্যও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর শিশুদরদী চিত্তের এক মনোরম বিকাশ যে সব ছড়ার গান রচনায় প্রকাশ পেয়েছে সেটি তাঁর কাব্য রচনার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভাষার মাধ্যমে

চিত্রাঙ্কনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর এই সব ছড়ার গানে দেখতে পাওয়া যায়। শিশুদের জন্য কবিতা রচনায় এই চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা বিশেষ প্রয়োজন হয় শিশুচিত্তের কল্পনাকে পরিপুষ্ট করে উজ্জীবিত রাখার জন্য। তাঁর ছোটদের জন্য লেখা ঘুমপাড়ানী গান, ফসল কাটার গান, পাল্কী বাওয়ার গান ভাষার চিত্রাঙ্কনে এত সমুজ্জ্বল যে ঐগুলি শিশুচিত্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিণত চিত্তকেও অবস্থার বাস্তবতার মাঝখানে এনে উপস্থাপিত করে। তাঁর ঘুমপাড়ানী গান Cradle Song কবিতাটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের সঙ্গে পাঠকের চোখেও ঘুমের স্বপ্নমদিরা সৃষ্টি হয়—

'মণি আমার আলাই শুভরাতি
সোনার আলোর তারারা দেখ জ্বালায় কেমন বাতি
তোমার চারিদিকে
এনেছি যতনে স্বপন ছবি আঁকি—'

আমরা বড়রাও শিশুদের সঙ্গে সেই স্বপ্নের ছবি মানসচক্ষে দেখি এ ছড়ার সঙ্গে, আরও স্বপ্ন দেখি অনাগত ভবিষ্যৎকাল প্রত্যক্ষ করবে তাঁর মত মহীয়সী নারীর পুনরাবির্ভাব, যা আজকের সঙ্কটের দিনে জাতির জীবনে পরম আস্থা ফিরিয়ে আনবে, যাঁর জীবনের একমাত্র সত্যই হ'ল 'I have no fear in my faith'। আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ও প্রত্যয়ে বজ্র-কঠিন-বিশ্বাসী এক বিস্ময়কর সত্তার বুলবুল কণ্ঠ কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা-কুঞ্জে মধুস্রাবী হয়ে অমর হয়ে থাকবে।

মহৎ প্রকৃতির লক্ষণ এই যে, মহৎ মানুষ নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাকেই চিরন্তন ও স্থায়ী মনে করেন, এবং তাহারই অনুসরণ করেন; শুধু তাই নয়, মহৎ মানুষ বিশ্বাস করেন, যে, অন্য মানুষদের মধ্যেও এই শ্রেষ্ঠ জিনিষ আছে, এবং তাহাদের আত্মাকে জাগাইয়া দিতে পারিলে এই শ্রেয়ের প্রেরণাই তাহাদের জীবনের নিয়ামক হইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী আষাঢ় ১৩২৮

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৩) বিদেশিনীর অভিনন্দন

১৯১১ সাল। একটি স্নিগ্ধ শান্ত অপরাহ্ন বেলা।

গঙ্গার পশ্চিমধারে বিশ্ববিখ্যাত বেলুড় মঠ। তারই এক পুণ্য প্রাঙ্গণে এই সভার আয়োজন হয়েছে।

একটি বিশেষ সভা। কোন সাধারণ বক্তৃতার সভা নয়। তার মধ্যে একটি প্রধান অংশ আছে সঙ্গীতের। তা ছাড়া স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি আর কিছু অনুষ্ঠান।

বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ সভাটির ব্যবস্থা করেছেন বিশেষ করে মাদাম কাল্ভের সম্মানে।

মাদাম কাল্ভে। নামটি তখন আমাদের দেশে তেমন পরিচিত নয়। অন্তত এখানকার সঙ্গীতজ্ঞ মহলে। মাদাম কাল্ভের সে সময় এদেশে পরিচিতি প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা যারা জানতেন তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বলা যায়। মাদাম কাল্ভেকে তখন ভারতবর্ষে যাঁরা জেনেছিলেন, তাঁরা স্বামীজীর একজন ভক্ত শিষ্যা বলেই বেশি জানেন। স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' ইত্যাদি রচনার মাধ্যমেও অনেকে জানতে পারেন মাদাম কাল্ভের নাম।

তিনি ছিলেন সেকালের ইউরোপের একজন শ্রেষ্ঠা এবং স্বনামধন্যা গায়িকা। শুধু ইউরোপে নয়, আমেরিকা মহাদেশেও তাঁর তুল্য প্রসিদ্ধি অন্য কোন সঙ্গীতজ্ঞা তখন অর্জন করেছিলেন কি না সন্দেহ।

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে ভ্রমণকালে স্বামীজী যেমন অনেক মনীষী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, তেমনি ললিতকলার কোন কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরও। শেষোক্ত শ্রেণীর এমনি দু'জন হলেন মাদাম কাল্ভে ও শারা বার্নহার্ড। সমসাময়িক সঙ্গীত ও অভিনয় জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অন্যতম।

মাদমোয়াজেল কাল্ভের সঙ্গীত-প্রতিভা সম্বন্ধে স্বামীজীর অতি উচ্চ ধারণা ছিল। স্বামীজী স্বয়ং সুগায়ক ছিলেন, এবং সঙ্গীতের তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, সেজন্যে এ বিষয়ে তাঁর মতামত নির্ভরযোগ্য।

শ্রীমতী কাল্ভেকে তিনি সেকালের পাশ্চাত্ত্য জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠা অপেরা গায়িকা বলে যেখানে উল্লেখ করেছেন, তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ (১১শ মুদ্রণ, ১০৬-৯ পৃষ্ঠা) থেকে সে প্রসঙ্গটি এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল। এখানে, ইউরোপ ভ্রমণকালে কনষ্টান্টিনোপ্‌ল থেকে তাঁর স্বলিখিত বৃত্তান্তে স্বামীজী বলেছেন—

"সঙ্গের সঙ্গী তিনজন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাকলাউড, ফরাসী পুরুষবন্ধু মশিয়ে জুল বোওয়া, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদমোয়াজেল কাল্ভে।···মাদমোয়াজেল কাল্ভে আধুনিক কালের সবশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ টাকা, চার লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় খালি গান গেয়ে। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় পূর্ব হ'তে। পাশ্চাত্ত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম শারা বার্নহার্ড, আর সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কাল্ভে—দু'জনেই ফরাসী, দু'জনেই ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান ও অভিনয় আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন।···

মাদমোয়াজেল কাল্ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন,—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতি-শীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে। কাল্ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন।—রাজা, বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম মেল্‌বা, মাদাম এমা এমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকল আছেন; জাঁদরেজ কি, প্লাঁস প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কসকল আছেন—এঁরা সকলেই দুই-তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন।—কিন্তু কাল্ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্তব্য থেকে মাদাম কাল্ভের প্রতিভা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়।

তাঁর ও স্বামীজীর বিষয়ে আরও জানবার কথা এই যে, তিনি স্বামীজীর আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি শুধু শ্রদ্ধা-পরায়ণা ছিলেন না (কাল্ভের 'My Life' পুস্তকে যার

পরিচয় পাওয়া যায়), স্বামীজীর সুকণ্ঠের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।

একথা অনেকেই জানেন যে, বিশ্ববিশ্রুত মনীষী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ রমাঁ রলাঁ তাঁর রচিত স্বামীজীর জীবনী-গ্রন্থে বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রলাঁ স্বয়ং স্বামীজীর গান শোনেন নি। মাদাম কাল্‌ভে স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের বিষয়ে রলাঁকে জানিয়েছিলেন এবং সেই বিবৃতিতে আস্থা স্থাপন করে রলাঁ লেখেন—

"...and from the moment he began to speak, the splendid music of his rich deep voice* enthralled the vast audience of American Anglo-Saxons, previously prejudiced against him on account of his colour...'

স্বামীজীর যে কণ্ঠের বর্ণনা রঁমা রলাঁ মাদাম কাল্‌ভের মুখে শুনে এইভাবে করেছেন, তা' আমাদের দেশের সাঙ্গীতিক পরিভাষায় এক কথায় বলা চলে—জোয়ারিদার গলা। কাল্‌ভে গায়িকা ছিলেন বলেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন স্বামীজীর কণ্ঠের এই বৈশিষ্ট্য।

মাদামের নিজের কণ্ঠস্বরও বিশেষ ঐশ্বর্যময়ী ছিল। তাঁর কণ্ঠ-সম্পদের আর একটি দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা এই জানা যায় যে, সুদীর্ঘ সঙ্গীত-জীবনের মধ্যে কাল্‌ভের কণ্ঠস্বর কখনও কোন পীড়ায় আক্রান্ত হয় নি। কণ্ঠশিল্পীর পক্ষে এ বড় কম ভাগ্যের কথা নয়। অতি অল্প গায়ক-গায়িকাই এ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখী। মাদাম কাল্‌ভে তাঁর উক্ত আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে নিজের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

'During the forty years of my musical career, I have been entirely free from illness that affect the voice of a singer."

তাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত এই আত্মজীবনী পুস্তকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন রোসামণ্ড গিল্‌ডার।

('My Life' by Emma Calve. Translated by Rosamond Gilder.)

ইংরেজী অনুবাদক রোসামণ্ড গিল্‌ডার বইখানির প্রথমে কবি রিচার্ড ওয়াটসন গিল্‌ডার রচিত কাল্‌ভে সম্বন্ধে দু'ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এই লাইন দু'টি থেকে ধারণা করা যায়, মাদাম কাল্‌ভে ইউরোপের সঙ্গীত-সমাজে কি বিপুল গৌরবের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতকৃতি কি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিল!

"Sweetness & strength, high tragedy and mirth,"
And but one Calve on the singing earth."

পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গীত-জগতে যার এমন সম্মানের স্থান সেই মাদাম এম্মা কাল্‌ভে সেবার এলেন কলকাতায়। সে ১৯১১ সালের কথা। এখানে তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠান করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন নি। এ যাত্রা দেশ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন মাদমোয়াজেল। শুধু কলকাতা নয়, ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি দর্শনীয় জায়গায় তিনি উপস্থিত হন। আত্মজীবনীতে (২০২ পৃষ্ঠা) তিনি এ সম্পর্কে লেখেন—

'I..... proceeded on a long tour through India visiting Madras. Calcutta, Darjeeling, Delhi, Agra, Bombay.'

কাল্‌ভে গানের অনুষ্ঠান ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভারতবর্ষে আগমনও তেমনি পর্যটনের অঙ্গ। তবে সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ স্বামীর স্বদেশ বলে যে তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে নি তা বলা যায় না। স্বামীজীর প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ যেভাবে আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেছেন, তাতে এ কথাই মনে হয়। স্বামীজীর 'অলৌকিক' শক্তির সহায়তায় একবার নিজের জীবনের এক সঙ্কটময় অবস্থা থেকে উত্তরণের কাহিনী কাল্‌ভে যে ভাবে পুস্তক-খানিতে বর্ণনা করেছেন, তাতে স্বামীজীর জন্মভূমিতে একবার উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষ বেলুড় মঠে। স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতি-মণ্ডিত, তাঁর সমাধির ধারকভূমি এবং তাঁর কর্মসাধনার কেন্দ্রীয় পীঠস্থান বিশ্ববিখ্যাত বেলুড় মঠ।...

---

* He had a beautiful voice like a violencells (so Miss Josephine Macleod told me), grave without violent contrasts, but with deep vibrations that filled hall and hearts. Once his audience was held he could make it sink to an intense piano piercing two hearers to the soul. Emma Calve, who knew him, described it as "an admirable baritone, having the vibrations of a Chinese gong." (The Life of Vivekananda & Universal Gospel, p. 5—By Romain Rolland).

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের প্রায় আট বছর পরের কথা। কিন্তু তখনো তাঁর অপূর্ব প্রেরণায় মঠের সমগ্র পরিমণ্ডল যেন প্রাণবন্ত ও জাজ্বল্যমান হয়ে আছে।

স্বামীজীর বিদেশীয় ভক্তসমাজের মধ্যে একজন অতি বিশিষ্টরূপে কাল্‌ভের নাম তখন মঠের কর্তৃপক্ষের সুপরিচিত। সম্মানিত অতিথিকে তাই উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শনের জন্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। এবং তাঁর সঙ্গীতগুণের কথা বিবেচনা ক'রে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থাও।

সঙ্গীতের জন্যে বিশেষ করে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন অমৃতলাল দত্ত, সঙ্গীত-সমাজে হাবু দত্ত নামে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি স্বামীজীর জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং পরমহংসদেবের ভক্তরূপেও শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত সমাজে সকলের সুপরিচিত। স্বামীজীর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ এবং হাবু দত্তের পিতামহ কৃষ্ণপ্রসাদ ছিলেন দুই সহোদর। হাবু দত্ত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শিমুলিয়ার দত্ত বংশের পারিবারিক গৃহ ৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে আবাল্য বাস করেছেন। প্রথম জীবনে দু'জনের একসঙ্গে সঙ্গীতচর্চা যেমন হয়েছে, তেমনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে যাতায়াতও। পরে দুজনের জীবনধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বয়ে গেছে। কিন্তু সে সব পরের কথা, পরে কিছু কিছু উল্লেখ করা হবে।

এখন বেলুড় মঠে সেই অপরাহ্ণের প্রসঙ্গ। সেদিন মাদাম কালভের সামনে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে হাবু দত্তকে আনা হয়েছিল শুধু এই কারণে নয় যে তিনি স্বামীজীর আত্মীয়। প্রধান কারণ, তিনি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী, সেজন্যে বিদেশিনী সঙ্গীতসাধিকাকে ভারতীয় সঙ্গীত শোনাবার একজন সুযোগ্য পাত্র।

দত্ত মশায় সেদিন মাদামকে রাগসঙ্গীত শোনাবার জন্য এসরাজ যন্ত্রটি এনেছিলেন। কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রেই তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল এবং একাধিক যন্ত্রে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের রীতিমত সাধনা করেছিলেন। যেমন ক্ল্যারিওনেট, বীণা, সুরবাহার ও এসরাজ। উপরন্তু তিনি ছিলেন ধ্রুপদীও। তাঁর শিষ্যদের অন্যতম হরিহর রায় তাঁর কাছে ধ্রুপদের শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং উত্তরজীবনে 'গীত সঞ্চয়ন' নামে যে ধ্রুপদ গানগুলির স্বরলিপি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কোন কোন গান (যেমন তানসেন রচিত 'তুঁহি ভজো ভজো' নামে চৌতালের ইমন কল্যাণটি) তিনি হাবু দত্তের কাছে শিক্ষা সূত্রে লাভ করেন। তবে দত্ত মশায় প্রধানত যন্ত্র সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন এবং সেইভাবেই সুপরিচিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতাদের মহলে। বিশেষ ক্ল্যারিওনেট বাদক রূপে।......

অমৃতলাল সেদিন কালভেকে শোনাবার জন্যে কেন যে এসরাজ যন্ত্রটি নির্বাচন করেছিলেন, তার কারণ অনুমান করা হয়। এসরাজ ভারতীয় যন্ত্র বলেই সম্ভবত এটির কথা তাঁর মনে আসে ইউরোপের শিল্পীর সামনে বাজাবার জন্যে। নচেৎ তাঁর পক্ষে ক্ল্যারিওনেট নিয়ে সে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ক্ল্যারিওনেট বাদকরূপে সেকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি, তার পরিচয় পরে যথাস্থানে দেওয়া হবে। সেদিন ক্ল্যারিওনেট নিয়ে বসলে তিনি কালভেকে অবশ্যই সুরমুগ্ধ করতে পারতেন, তবু তিনি সাহায্য নেন নি এই বিলাতী যন্ত্রটির। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীর কাছে মাদাম যেমন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তেমনি যথার্থ ভারতীয় সঙ্গীতের পরিচয় তিনি ভারতীয় যন্ত্রের মাধ্যমে লাভ করুন, এমন কথা হয়ত দত্তমশায়ের মনে ছিল।

আর তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, বলা যায়। কারণ মাদাম কালভে সেদিনকার অনুষ্ঠান থেকে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা নিয়ে যান। এবং এই ছোট্ট সভাটির কথা অনেকদিন পর্যন্ত জাগরূক ছিল তাঁর স্মৃতিতে। তাই দেখা যায়, ঘটনাটির বহু বছর পরে, যখন তাঁর অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত সঙ্গীতজীবনের পরিণতিতে আত্মজীবনী রচনা করতে বসেন তখনও সুদূর বেলুড় মঠের সেই অপরাহ্ণটির কথা তিনি ভোলেন নি। শিল্পীর নাম তখন বিস্মৃত হয়েছেন, কি শুনেছেন তার আনুপূর্বিক বিবরণও আর লেখবার মতন স্মরণে নেই, মনে মুদ্রিত হয়ে আছে শুধু সেই অনুষ্ঠানের সামগ্রিক আবেদন। এসরাজ যন্ত্রটির নাম তাঁর জানা থাকবার কথা নয়, মনের মধ্যে রয়েছে তারের যন্ত্রের সেই অ-দৃষ্টপূর্ব এবং অভিনব অবয়ব, যাতে অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল। আর সেই সঙ্গীত, সেখানকার স্তোত্রপাঠ সব মিলিয়ে এবং তাদের প্রভাবে সৃষ্ট হয় যে অপরূপ পুণ্য পরিবেশ, তা-ই তার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত থাকে অম্লান স্মৃতিতে।

মাদাম কাল্‌ভে তাঁর 'My Life' বইখানিতে সেদিনের কথায় লেখেন—'At our feet the mighty Ganges flowed. Musicians played to us on strange instruments, weird, plaintive chants that touched the very heart......The afternoon passed in a peaceful, contemplative calm.'...

সেদিনকার সভায় হাবু দত্ত যতক্ষণ এসরাজে রাগালাপ করেছিলেন, কালভে বসে শুনেছিলেন গভীর মনোযোগের

সঙ্গে। সত্যকার শিল্পী দত্ত মশায়ের সুরসৃষ্টিতে তিনি যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁকে দেখে উপস্থিত সকলেই অনুভব করেন। এক দেশের সঙ্গীত আর এক দেশের সঙ্গীত-শিল্পীর প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে। অপরিচিত ভাষার কাব্যে গ্রথিত সঙ্গীত হ'লে হয়ত বিদেশিনীর অনুসরণ করতে অসুবিধা ঘটত। কিন্তু ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করে দূর দেশকে নিকটতর করবার একটি বিশেষ সুবিধা আছে যন্ত্রসঙ্গীতের। এবং তা-ই সেদিন কার্যকর হয়েছিল।

এই ঘটনার আগেকার অনেক আসরেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গীত-জগৎ পরস্পরের কাছাকাছি এসে রসাস্বাদনের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। যেমন, ১৮৮৪-এ কলকাতায় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার ডুএট শোনেন ইউরোপের King of Violin, প্রফেসর রেমিনী। তারপর ১৮৯৭-এ ইংলণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উৎসবে সরদী এনায়েৎ হোসেন ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সামনে *(আতা হোসেনের তবলা সহযোগিতায়) সরদ বাজান।* তার তিন বছর পরে ১৯০০ খ্রীঃ পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ব্যবস্থাপনায় প্যারিস প্রদর্শনীতে সরদী ভ্রাতৃদ্বয় "কেরামতুল্লা ও কৌকব খাঁর সরদ বাদন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই দেখা গেছে, ইউরোপের শ্রোতৃমণ্ডলী যন্ত্রের মধ্যস্থতায় ভারতীয় সঙ্গীতের গুণ গ্রহণ করেছেন। হাবু দত্তের এসরাজ বাদন প্রসঙ্গে মাদাম কাল্‌ভের প্রশংসা তারই আর এক দৃষ্টান্ত।

বাজনা শেষ হতে মাদাম সেদিন বাদককে যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন এবং এই ধরনের মন্তব্য করেন যে, সুরের ক্ষেত্রে তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল।

এই অভিনন্দন সাধারণ ভদ্রতাসূচক নয়, একথা সমবেত ব্যক্তিরা অনুভব করেছিলেন। এ অভিনন্দন সঙ্গীত বিষয়ে অনভিজ্ঞ কোন বিদেশী পর্যটকেরও নয়। সে যুগের ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠা অপেরা গায়িকার অভিনন্দন।

মাদাম কাল্‌ভে হাবু দত্তের এসরাজ বাদন শুনে যেভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর প্রশংসা সেদিন করেন, তাতে সে সভার বিবরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তত আমাদের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে এ একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিনের কোন উল্লেখ তখনকার পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না। সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এমনই উপেক্ষিত থাকত সেকালে। তাই সমসাময়িক কোন মুদ্রিত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। ঘটনাটির বিষয়ে জানা গেছে রামকৃষ্ণ মিশনের এক বিশিষ্ট কর্মী ও সন্ন্যাসী স্বামী শ্যামানন্দের সৌজন্যে। স্বামী শ্যামানন্দ সে সভায় উপস্থিত থেকে ঘটনাবলীর সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছিলেন এবং হাবু দত্তকেও ঘনিষ্ঠভাবে সে যুগে জানতেন। তা ছাড়া, তিনি কিছু কিছু সঙ্গীতচর্চাও করতেন তাঁর সেই তরুণ বয়সে। পরে তিনি (স্বামী শ্যামানন্দ) সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে জীবন উৎসর্গ করেন এবং পরবর্তীকালে অসাধারণ গঠন-নৈপুণ্যে রেঙ্গুন শহরের বিরাট সেবাসদন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে সন্ন্যাস-জীবন সার্থক করে তোলেন। শেষ বয়সে স্মৃতিচারণের সময়ে তিনি বর্ণনা করতেন মাদাম কাল্‌ভেকে হাবু দত্তের এসরাজ শোনাবার প্রসঙ্গ এবং দত্ত মশায়ের সঙ্গীতজীবনের আরও নানা বিচিত্র কথা। তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু পরে বিবৃত করা হবে।

হাবু দত্তের সেইসব খণ্ড কাহিনী বিশেষ মাদাম কাল্‌ভের প্রসঙ্গ শুনে মনে প্রথমেই একটি প্রশ্ন জাগে। তা হ'ল, সাগর-পারের এত বড় শিল্পী যাকে অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, স্বদেশে তিনি কি লাভ করেছিলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে যা জানা যায় তা বিশেষ সুখের স্মৃতির বা দেশের গুণ-চেতনার আশাপ্রদ পরিচায়ক নয়। নচেৎ হাবু দত্ত কেন এমন খেদোক্তি করতেন 'আমাদের মতন পরাধীন দেশে যেন কেউ সঙ্গীতচর্চাকে পেশা না করে। এদেশে গান-বাজনা নিয়ে জীবন কাটাতে গেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। আর স্বাধীন দেশে ? সেখানে গাইয়ে-বাজিয়েরা কি সম্মানের সঙ্গে রোজগার করে। তাদের জীবন নষ্ট হয় না !'

সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি কিংবা প্রতিষ্ঠা যে ছিল না, তা নয়। সে সব যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সঙ্গীত-ব্যবসায়ী অর্থাৎ পেশাদার। অথচ সেকালে সঙ্গীত-চর্চা পেশা হিসেবে উপযুক্ত অর্থকরী ছিল না। সুতরাং অনেক গুণীর মতন দত্ত মশায়কেও বরণ করতে হয়েছিল দারিদ্র্য এবং তার আনুষঙ্গিক নানা দুঃখকষ্ট, অসম্মান, অমর্যাদা। সেজন্যেই তাঁর কথাবার্তায় অমন আক্ষেপ আর অভিমান প্রকাশ পেত। আহত বোধ করত তাঁর স্পর্শকাতর শিল্পী-মন। যদিও তাঁর সঙ্গীত-জীবনের অধিকাংশ কাল অভাবের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে এবং সেজন্যে বহু বেদনা সহ্য করতে হয়েছে, তা অবশ্য তাঁর শিল্পী-সত্তার প্রকাশ ব্যাহত হয় নি।

একজন যথার্থ গুণী বলে সঙ্গীতজ্ঞ মহলে তাঁর সম্মান ছিল যথেষ্ট। আর যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি অতি বিশিষ্ট স্থান। বাঁশীর মোহিনী সুরে তিনি সাধারণ ও বিদগ্ধ সব রকমের শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। এবং তা অশিক্ষিত পটুত্ব নয়। প্রায় কিশোর বয়স থেকে

রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং একাধিক প্রথম শ্রেণীর কলাবতের শিক্ষাধীনে তাঁর সঙ্গীত-জীবন গঠিত হয়। আগেই বলা হয়েছে ধ্রুপদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট, এসরাজ ও বীণাযন্ত্রে তিনি সঙ্গীতের সাধনা করেছিলেন। তবে বোধ হয় তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল ক্ল্যারিওনেট।

এই বিলাতী যন্ত্রটির একক বাদন তখন আমাদের রাগ-সঙ্গীত ক্ষেত্রে প্রায় দুর্লভ ছিল। ক্ল্যারিওনেট শিল্পীরূপে সেজন্যে একরকম অনন্য ছিলেন হাবু দত্ত। ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ পদ্ধতির সূক্ষ্ম, মনোমুগ্ধকর প্রকাশ তাঁর বাঁশীতে শোনা যেত। অপরূপ সুমিষ্ট আর কারুকর্মময় ছিল তাঁর বাঁশীতে ফুৎকার। সেই সঙ্গে রাগের যথাযথ রূপায়ণের জন্যে ওস্তাদরাও তাঁকে বিশেষ পছন্দ ও প্রশংসা করতেন। তাই একাধিক ভারত-বিখ্যাত গুণী তাঁকে উপযুক্ত আধার দেখে যত্ন করে শিখিয়েছিলেন। আর স্বনামধন্য উজীর খাঁর তুল্য ওস্তাদের (যাঁর শিষ্য হ'তে পারাই ছিল শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতি সৌভাগ্যের কথা) তিনি ছিলেন এক প্রিয় শিষ্য। তাঁকে উজীর খাঁ শুধু কলকাতায় তালিম দেন নি, সঙ্গে করে রামপুরেও নিয়ে যান এবং সেখানে রামপুর নবাবের ঐকতান বাদন গঠন করবার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত করেন।

তাঁর ওই যে বাঁশী বাজাবার কথা হচ্ছিল—ক্ল্যারিওনেট রাগ সঙ্গীতের সব সূক্ষ্ম জিনিষ, মিড়ের নানারকম খোঁচ, খাঁচ বাঁশীতে তাঁর মতন করে ফুটিয়ে তোলা তখন আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেজন্যই বিশেষজ্ঞ মহলে ছিল তাঁর কদর। বীণা আর এসরাজে তিনি ওস্তাদদের তালিম নেন বটে, কিন্তু বাঁশীতেই সমস্ত তুলতেন। তাঁর মতন (বাঁশীতে) মিষ্টি ফুঁ সেকালে আর কারুর ছিল না, এমনি একটা প্রবাদ আছে। থিয়েটারে যে সময়টা ছিলেন তাঁর সেই মিষ্টি বাঁশীর সুর দর্শকদের কাছে ছিল এক প্রধান আকর্ষণ। সেসব কথা পরে আসবে।

হাবু দত্তের সঙ্গীত-জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যদিও সে তিনটি বিভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। প্রথমত পদ্ধতিগত শিক্ষা ও সাধনায় তিনি ছিলেন রাগ-সঙ্গীতের কৃতবিদ্য গুণী। যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীরূপে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রধানত ক্ল্যারিওনেট, বীণা ও এসরাজ বাদকরূপে, দ্বিতীয়ত পেশার প্রয়োজনে তাঁকে হতে হয় ঐকতান বাদনের সংগঠক ও পরিচালক। এ বিষয়েও তাঁর যশ কম ছিল না। শুধু কলকাতায় নয়, প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকেন্দ্র রামপুরে নবাবের ব্যাণ্ড পার্টি গঠন করে তিনি সেখানকার গুণীজনের সমাদর লাভ করেছিলেন, কারণ তাঁর ঐকতানের গৎগুলি হ'ত যথাযথ রাগের ভিত্তিতে গড়া। রাগসঙ্গীতে ঐকতান বাদনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণ করবার যোগ্য। কলকাতার পেশাদার থিয়েটারে যখন তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তখন সেখানেও এবিষয়ে মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন। তৃতীয়ত, এ ক্ষেত্রেও উপার্জনের তাগিদে, মঞ্চ-নাটকের সুর সংযোজকরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। কিন্তু এখানেও তাঁর কৃতিত্ব অল্প নয়। কারণ সে যুগের বাংলার রঙ্গমঞ্চ, বিশেষ নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রের পরিচালনাধীন থিয়েটারগুলি সঙ্গীতবিষয়ে রীতিমত সমৃদ্ধ ছিল রাগসঙ্গীতের ঐশ্বর্যে। গিরীশচন্দ্রের নাটকের গানে যাঁরা সুরযোজনা করতেন তাঁরা প্রায় সকলেই সৃজনশীল সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলেন। যেমন বেণীমাধব অধিকারী (বেণী ওস্তাদ নামে সুপরিচিত), দেবকণ্ঠ বাগচী, রামতারণ সান্যাল (গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য), শশিভূষণ কর্মকার, জানকীনাথ বসু প্রভৃতি। সেকালের বাংলার নাট্যজগতে সঙ্গীতের যে একটি গৌরবোজ্জ্বল স্থান ছিল, সেকথা বলা বাহুল্য।

অমৃতলাল দত্তের নাম এই তালিকায় একটি স্মরণীয় সংযোজন। তিনি গিরীশচন্দ্রের দু'খানি নাটকের গানে সুর দেন বলে জানা যায়। ক্লাসিক থিয়েটারে নাট্যাচার্যের 'অশ্রুধারা' (১৯০১) নাটিকার পরিচয় প্রসঙ্গে 'গিরীশচন্দ্র' জীবনীগ্রন্থের লেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'ইহার গীতগুলি সুপ্রসিদ্ধ অমৃতলাল দত্ত (হাবু বাবু) কর্তৃক সুরলয়ে সুগঠিত হইয়াছিল' (৬৬৪ পৃষ্ঠা)। নাটিকাটির অভিনেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুসুমকুমারী, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। তার তিন চার বছর পরে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরীশচন্দ্রের 'হরগৌরী' নামে সুর-সমৃদ্ধির জন্যে বিখ্যাত গীতিনাট্য-খানির গানগুলির সুরযোজক ও শিক্ষক ছিলেন অমৃতলাল। নাটকের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে তারাসুন্দরী, তারকনাথ পালিত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথনাথ পাল, কিরণবালা প্রভৃতি ছিলেন। এর গানগুলি বিশেষ মেনকার গীত ক'খানিতে দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত। মিনার্ভা থিয়েটারে সেই অভিনয়ের বহুদিন পরে মনোমোহন থিয়েটারে এই গীতিনাট্যখানি আবার নতুন করে অভিনয় আরম্ভ হয় ও দর্শকদের আকৃষ্ট করে রাখে অনেক রাত্রি ধরে। হাবু দত্তের সুরে গঠিত গানগুলিই ছিল 'হরগৌরী'র প্রধান আকর্ষণ।......

প্রসঙ্গত, উত্তর বাংলার রামপুর-বোয়ালিয়া বা রাজশাহীতে গিরীশচন্দ্রের সদলে কিছুকাল অভিনয় করার প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এই পুস্তকে অমৃত-

লালের কথা যে উল্লেখ করেছেন তা' এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল (৪৩২-৪৩৪ পৃষ্ঠা):

'সুপ্রসিদ্ধ ক্ল্যারিওনেট বাদক এবং সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) মহাশয়, রাজসাহী-তালন্দের জমিদার স্বর্গীয় ললিতমোহন মৈত্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ এবং যত্নে তাঁহার রামপুর-বোয়ালিয়ার প্রাসাদতুল্য ভবনে মধ্যে মধ্যে গিয়া অবস্থান করিতেন। ললিতমোহন বসু যেরূপ গীতবাদ্যপ্রিয়, সেইরূপ নাট্যানুরাগী ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালার ন্যায় রামপুর-বোয়ালিয়ায় একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ রূপ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন।

'গিরীশচন্দ্র যে বৎসর (১৩০৪, ফাল্গুন) ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করেন, সে বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। প্লেগের আতঙ্কে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় কলিকাতা বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে সহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হয়...এই সময়ে ললিতমোহন বাবু সুযোগ বুঝিয়া, হাবুবাবুর সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালা হইতে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহপূর্বক রামপুর-বোয়ালিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

'হাবুবাবু স্বয়ং গুণী ছিলেন, তাহার উপর গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ স্বামীর পরম আত্মীয় বলিয়া গিরীশচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ললিতবাবুর আগ্রহাতিশয্যে হাবুবাবু আসিয়া গিরীশচন্দ্রকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "ললিতবাবু আপনার সম্মান ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানে সম্মত এবং এ সময়ে আপনার কলিকাতা পরিত্যাগও বাঞ্ছনীয়।"

'ষ্টার থিয়েটারের সহিত গিরীশচন্দ্র তখন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, কলিকাতাতে এই হুলুস্থূল ব্যাপার, গিরীশচন্দ্র অগত্যা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তিন সহস্র মুদ্রা 'বোনাস' স্বরূপ পাইয়া রামপুর-বোয়ালিয়ায় গমন করিলেন। স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), ভূষণকুমারী, সুশীলাবালা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও যথাযোগ্য বেতন এবং অল্লাধিক 'বোনাস' পাইয়া ইতিপূর্বে রামপুর-বোয়ালিয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন।

'ললিতমোহনবাবু উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রঙ্গালয়-নির্মাণকার্য শেষ করিয়া আনিলেন। এদিকে গিরীশচন্দ্র দল সুগঠিত করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয়ার্থে প্রস্তুত করিলেন। থিয়েটারের নামকরণ হইল—"মার্ভাল (Marval) থিয়েটার।"

'প্রথম রাত্রে "বিল্বমঙ্গল" নাটক অভিনীত হয়।... খ্যাতনামা অভিনেত্রীগণ-সম্মিলনে অভিনয়ও যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল—দর্শকদের ভিড়ও সেইরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। পরম আগ্রহে বহুদূর হইতে বহু গ্রামের দর্শকগণ আসিতে থাকে—সমস্ত দেশে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়।

'অল্পদিন অভিনয়ের পর লালমোহনবাবুর অভিভাবকগণ বুঝিলেন যে ক্ষুদ্র সহরে টিকিট বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়া দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া থিয়েটার বন্ধ করিয়া দেন। এদিকে কলিকাতায় তখন প্লেগের আতঙ্ক অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রদায় নির্ভয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সহৃদয় ললিতমোহনবাবুর যত্ন এবং সদ্ব্যবহারে সম্প্রদায় পরম আনন্দে তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।"

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হাবু দত্তের গুণগ্রাহী উক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয় সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন বলেই হাবুবাবুকে সমাদর করতেন। পরে মৈত্র মহাশয় সুবিখ্যাত সরদ বাদক আমীর খাঁকে নিযুক্ত রাখেন তাঁর সঙ্গীত-সভায়। ললিতবাবুর পৌত্র এবং আমীর খাঁ'র শিষ্য রাধিকামোহন মৈত্র এখনকার সঙ্গীতসমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি।...

হাবু দত্ত এবং গিরীশচন্দ্র প্রসঙ্গে আর একটি সংবাদ উল্লেখনীয়। শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন থেকে বিপুল গৌরবে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় পদার্পণ করলে তাঁকে শিয়ালদা ষ্টেশনে যে সম্বর্ধনা করা হয়, সেই সভায় গীত গিরীশচন্দ্র রচিত গানখানিতে সুর-সংযোগ করেছিলেন অমৃতলাল।...

তাঁর সঙ্গীত-জীবনের যে তিনটি বিভাগ বা পর্বের কথা আগে বলা হয়েছিল তার প্রথমটি অর্থাৎ তাঁর রাগ সঙ্গীত-চর্চার পরিচয় এবারে দেওয়া যাক। প্রথমে রীতিমত শিক্ষার কথা। একাধিক প্রথম শ্রেণীর কলাবতের কাছে পদ্ধতিগত সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

শিমুলিয়ার দত্ত-বংশীয়দের যে ৩, গৌরমোহন মুখার্জীর বাড়ীতে তিনি শিশুকাল থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত বাস করেন, সেই গৃহের সঙ্গীত চর্চার জন্যেও খ্যাতি ছিল। এখানে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) পিতা, সঙ্গীতপ্রেমী বিশ্বনাথ দত্ত প্রতি শনিবার ও রবিবারে সঙ্গীতের আসর বসাতেন কলাবতদের নিয়ে। বিশ্বনাথ দত্ত প্রথম জীবনে ওস্তাদদের শিক্ষাধীনে স্বয়ং সঙ্গীতচর্চা করতেন এবং মধ্য-

প্রদেশের রায়পুরে আইনজীবীরূপে অবস্থান করবার সময়ে পুত্রকে প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা দেন। পরে কলকাতায় বাস করবার সময়ে ওস্তাদের অধীনে নরেন্দ্রনাথের রীতিমত ব্যবস্থা করেন বিশ্বনাথ। সেই সময় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অমৃতলালেরও সঙ্গীতশিক্ষার আনুকূল্য করেন।

সঙ্গীতজ্ঞ বিশ্বনাথ অমৃতলালের সঙ্গীত-বিষয়ে প্রবণতা ও শক্তি লক্ষ্য করে পুত্র নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই যে শিক্ষকের কাছে দু'জনের সঙ্গীতশিক্ষার বন্দোবস্ত করলেন, তাঁর নাম বেণীমাধব অধিকারী। বেণীমাধব বা বেণী ওস্তাদ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কলাবত আহম্মদ খাঁ'র শিষ্য। অমৃতলাল ও নরেন্দ্রনাথ একসঙ্গে বেণী ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন। শিক্ষকের বেতন এবং সঙ্গীত-চর্চার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদিও দুই শিক্ষার্থীকে দেন বিশ্বনাথ।

বেণী ওস্তাদের কাছে অমৃতলাল ও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শিক্ষার এইভাবে সূচনা হ'লেও পরে ভিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়। অমৃতলালের প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করে যন্ত্রসঙ্গীতে এবং নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ-সঙ্গীতে। তা ছাড়া, নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের সঙ্গে স্কুল জীবনের বিদ্যা সমাপ্ত করে কলেজে প্রবেশ করেন ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর জীবন সন্ন্যাসের পথে যাত্রা করে। কিন্তু অমৃতলাল একান্তভাবে সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেন স্কুলের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই এবং পরেও সঙ্গীত চর্চাই হয় তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। যে যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভা প্রকাশ পায় তার চর্চাও তরুণ বয়স থেকেই তিনি আরম্ভ করেন। এ বিষয়েও বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন তাঁর সহায়ক। অমৃতলালের প্রথম এসরাজ যন্ত্র তিনিই কিনে দিয়ে তাঁর সঙ্গীত-চর্চার পথ সুগম করে দেন।

বেণী ওস্তাদের কাছে কিছুকাল শিক্ষালাভের পরে এসরাজের বিখ্যাত গুণী কানাইলাল ঢেঁড়ীর শিষ্য হলেন অমৃতলাল। কানাইলাল ঢেঁড়ী গয়ানিবাসী হলেও কলকাতায় অনেক বছর তাঁর শিমুলিয়া অঞ্চলের আপন বাসগৃহে অবস্থান করেন। সেসময় ঢেঁড়ীজীর কাছে কলকাতায় আরো যাঁরা এসরাজ শিক্ষার সুযোগ পান তাঁদের মধ্যে উত্তরকালের বিখ্যাত এসরাজ-গুণী কালিদাস পাল এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর (দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র) অরুণেন্দ্রনাথ, (সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র) সুরেন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালের শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ্য)।

কানাইলালের কাছে হাবু দত্ত ভালভাবে তালিম পেয়ে সঙ্গীতজীবনে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়ে যান। ক্ল্যারিওনেট বাদনও তিনি এসময়ে আরম্ভ করেছিলেন এবং রাগসঙ্গীতের চর্চা করতেন এই বিলাতী বাঁশীতে।

অমৃতলালের তৃতীয় ওস্তাদ হলেন রামপুর ঘরাণার স্বনামধন্য উজীর খাঁ। যুক্তপ্রদেশের রামপুর রাজ্য থেকে উজীর খাঁ উনিশ শতকের নবম দশকে কলকাতায় এসে বছর দুয়েক বাস করেন। সে সময় তাঁর যে কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয় এখানে, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমৃতলাল। উজীর খাঁ'র তথনকার অন্যান্য বাঙালী শিষ্যদের মধ্যে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। আলাউদ্দিন খাঁ তখন উজীর খাঁ'র তালিম পান নি, তিনি তা' লাভ করেন আরও প্রায় বিশ বছর পরে, রামপুর রাজ্যে।

উজীর খাঁ'র কাছে শিক্ষার সময় অমৃতলাল বীণা যন্ত্রে সাধনাও আরম্ভ করেছিলেন। উজীর খাঁ'র ঘরাণা প্রধানত রাগালাপ ও ধ্রুপদ সঙ্গীতের। তবে তিনি আসরে যন্ত্র-বাদকরূপেই গুণপনা প্রদর্শন করে গেছেন। এখানে অবস্থানের সময় খাঁ সাহেব বাংলা দেশের ক'টি বিশিষ্ট গৃহে—যেমন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-সভায়, গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় ভবনের আসরে—তাঁদের ঘরের রাগপদ্ধতি বাজিয়েছেন সুর-শৃঙ্গার যন্ত্রে। হাবু দত্ত তাঁর কাছে রাগসঙ্গীতের যে তালিম পেয়েছেন তা বীণায় চর্চা করতেন এবং তাঁর ধ্রুপদ গানের উৎসও এখানে। তা ছাড়া, তাঁর ক্ল্যারিওনেটে তিনি রাগ সঙ্গীতের ঐশ্বর্য প্রকাশ করতেন তাও সেযুগে অভিনব ছিল। এবং শোনা যায়, উজীর খাঁও সেজন্যে তারিফ করতেন তাঁকে। বাঁশীতে সঙ্গীতকৃতির জন্যে না কি তিনি উজীর খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

উজীর খাঁ'র কাছে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া সম্বন্ধে এখানে একটি কথা উল্লেখ করে রাখা ভাল। তাঁর শিষ্য বা ছাত্র হওয়া এক দুর্লভ ঘটনা বলা চলে। কারণ খাঁ সাহেবের শিষ্য গঠন ব্যাপারে অতিশয় পরিমিতি বোধ ছিল। সাধারণ কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে তাঁর কাছে আমল পাওয়াই ছিল কঠিন। অভিজাত পরিবার অর্থাৎ আশানুরূপ সম্মানমূল্য দানে সমর্থ কিংবা প্রতিভাধর ভিন্ন যে কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে রাগবিদ্যা লাভের যোগ্য বিবেচিত হতেন না। সেকালের সঙ্গীত-ব্যবসায়ীদের পক্ষে, বিশেষ ভারতবিশ্রুত ঘরাণাদারদের পক্ষে এই রকম মনোভাব নতুন ছিল না, তবে উজীর খাঁ'র ক্ষেত্রে উন্নাসিকতা ছিল না কি আরও বেশি। যার আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায় আলাউদ্দিন খাঁ'র তাঁর কাছে শিক্ষালাভের প্রত্যাশায় দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায়। এইসব কারণে কলকাতায় উজীর খাঁ'র ছাত্র ছিলেন তিনজন মাত্র। শিষ্যসংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল দেখা

যায়—তাঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রতিভাধর হলেও একটি ব্যক্তিগত কারণে উজীর খাঁ'র শিক্ষার সুযোগ পান। অন্য দুজনই—পঞ্চেৎগড় জমিদার পরিবারের যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র এবং অমৃতলাল - বিশিষ্ট বংশের ধারকও ছিলেন সঙ্গীত-প্রতিভার সঙ্গে। উজীর খাঁ'র শিষ্য হবার মধ্যেই যে যোগ্যতার স্বীকৃতি আছে তা জানাবার জন্যে বিষয়টির উল্লেখ করতে হ'ল।

উজীর খাঁ পরে আবার যখন রামপুর নবাবের উদ্‌যোগে লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী রামপুর রাজ্যে ফিরে যান কলকাতা ত্যাগ করে, তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন দু'জন বাঙালী শিষ্যকে: তাঁরা হলেন—হাবু দত্ত ও যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র। তাঁর এই দুই প্রিয় শিষ্য ওস্তাদের সঙ্গে রামপুরে গিয়ে সেখানে কয়েক বছর থাকেন। যাদবেন্দ্র ছিলেন হাবু দত্তের চেয়ে ৫।৬ বছরের বয়োকনিষ্ঠ।

অমৃতলাল এবং যাদবেন্দ্র একই সঙ্গে রামপুরে বাস করতে যান বটে, কিন্তু দু'জনে দু'রকম ভাবে সেখানে গিয়েছিলেন। যাদবেন্দ্র উজীর খাঁ'র কাছে আরও শিক্ষার উদ্দেশ্যে ওস্তাদের ইচ্ছায় রামপুর প্রবাসী হন। কিন্তু হাবু দত্তকে উজীর খাঁ নিয়ে যান শিক্ষা ভিন্ন আরও একটি কারণে। তিনি শিষ্যের শুধু ক্ল্যারিওনেট ও বীণা বাদনের গুণগ্রাহী ছিলেন না, তাঁর ঐকতান বাদন সংগঠনের প্রতিভাও লক্ষ্য করেছিলেন। তাই খাঁ সাহেব তাঁকে নিয়ে যান নবাব দরবারে নিযুক্ত করে দেবার জন্যে।

উজীর খাঁ'র ব্যবস্থাপনায় হাবু দত্ত রামপুর নবাবের দরবারী ঐকতান বাদকের ভারপ্রাপ্ত হন। সেখানে ঐকতান বাদ্যের দল গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দেন হাবু দত্ত কয়েক বছর ধরে। এই সময়ে তিনি শুধু ঐকতান বাদন নিয়েই কালাতিপাত করেন নি, উজীর খাঁর কাছে শিক্ষাও পেয়ে আসেন। তিনি সেখানে ঐকতান বাদন সংগঠনে এবং তাঁর সুর-সৃষ্টিতে একটি আদর্শ স্থাপন করেন যা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল পরবর্তীকালে। এবং সংশ্লিষ্ট মহলের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোন কোন ব্যক্তির মতে, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ উত্তর-জীবনে যে 'মাইহার ষ্টেট ব্যাণ্ড' গঠন করেন তাতে হাবু দত্তের ঐকতান বাদনের কিছু প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। কারণ, যে রামপুর দরবারের ও সেখানকার থিয়েটার পার্টির ব্যাণ্ড হাবু দত্ত কয়েক বছর যাবৎ সংগঠিত ও পরিচালিত করেন, তিনি কলকাতায় ফিরে আসবার কয়েক বছর পরে আলাউদ্দিন খাঁ সেই একই চাকুরি করেন নবাব দরবারে। অর্থাৎ উজীর খাঁ'র কাছে রামপুরে শিক্ষা আরম্ভ করবার পর আলাউদ্দিন খাঁ নবাবের ব্যাণ্ড পার্টির পরিচালক নিযুক্ত হন এবং রামপুরে কয়েক বছর ধরে আলাউদ্দিন খাঁ নবাবের থিয়েটারের ব্যাণ্ড মাষ্টার ছিলেন। রামপুরে তাঁর এই ঐকতান বাদনের দল গঠন তাঁর পরবর্তীকালের বিখ্যাত মাইহার ষ্টেট ব্যাণ্ডের পূর্বসূরী। এখন কথা হ'ল এই যে, রামপুরে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে হাবু দত্ত যে ঐকতান বাদনের ধারা প্রবর্তন করেন যার সমস্ত সুরসংযোজনা রাগ-সঙ্গীতের কাঠামোতে গঠিত, যা কয়েক বছর ধরে রামপুরে সম্মেলক যন্ত্র-সঙ্গীতে একটি আদর্শ বা ঢোল প্রদর্শন করেছে, যে দলের কোন কোন যন্ত্রী হয়ত আলাউদ্দিনের দলেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পুরাতন ও নতুনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন, যার রচিত কিছু কিছু গৎ বা সুর রচনাও হয়ত ভেসে আসতে পারে পরের এই যুগে—তার সমস্ত প্রভাব মুক্ত হয়ে নিরঙ্কুশ ভাবে কি হঠাৎ দেখা দিতে পারে আলাউদ্দিন খাঁ'র রামপুরের ব্যাণ্ড পার্টি কিংবা তার পরিশীলিত রূপ মাইহার ষ্টেট ব্যাণ্ড? বিশেষ, রামপুর বাসের আগে কলকাতায় হাবু দত্তেরই সাগরেদ হয়ে আলাউদ্দিন যখন বেশ কিছুকাল যন্ত্রসঙ্গীতের রেওয়াজ করেন? কলকাতায় হাবু দত্তের পরিচালিত থিয়েটারের ঐকতান বাদনের সঙ্গেও ত আলাউদ্দিন গোড়া থেকেই পরিচিত ছিলেন।

হাবু দত্ত ও আলাউদ্দিন খাঁ'র ঐকতান বাদনের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের মতন এই প্রসঙ্গ কেন এসে গেল, তার আলোচনা আর একবার আসবে নিবন্ধের শেষে—ওস্তাদ আলাউদ্দিনের যন্ত্র-সঙ্গীতশিক্ষা ও স্মৃতিচারণের কথায়। এখানে তার ভূমিকা করা রইল।

রামপুর রাজ্যে হাবু দত্তের অবস্থানের মোদ্দা কথা এই, তিনি নবাবের ব্যাণ্ড পার্টি পরিচালনার চাকুরি ভিন্ন উজীর খাঁ'র শিক্ষাও পেয়েছিলেন—একথা বলতেন স্বামী শ্যামানন্দ, পরবর্তীকালে রেঙ্গুণ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে বিখ্যাত।

রামপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসবার পর উপার্জনের তাগিদে হাবু দত্তকে থিয়েটারের আশ্রয় নিতে হ'ল। ঐকতান বাদন পরিচালনা, নাটকের গানের সুর রচনা ও পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গীত-শিক্ষা দান এবং নেপথ্যে ক্ল্যারিওনেট বাদন সবই করেছেন প্রয়োজন অনুসারে। রাগ-সঙ্গীতের আসর থেকে সম্পূর্ণ বিদায় না নিলেও থিয়েটারই তাঁর কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তবে তিনি যেসব গানের সুর কিংবা ঐকতান বাদন ও বাঁশীর গৎ রচনা করতেন তা' বিচ্যুত হ'ত না রাগ-সঙ্গীতের কাঠামো থেকে। বেশির ভাগ তিনি ছিলেন ক্লাসিক ও মিনার্ভা থিয়েটারে—নাটকে সুর সংযোজনা করতেন, বাঁশীও বাজাতেন। বড়

নাটকের গানে সুর দিতেন সবের নাম জানা যায় নি, সেকালের দর্শকরাও অনেক সময় জানতেন না সঙ্গীত-পরিচালক কে। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, অভিনেতা-অভিনেত্রী ভিন্ন নাটকের অন্যান্য শিল্পী ও কর্মীদের নাম অপ্রকাশিতই থেকে যেত। সে যুগের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ সঙ্গীত-পরিচালকের নাম তালিকাবদ্ধ করবার প্রয়োজন অনুভব করতেন না। তাই এবিষয়ে অন্যান্য গুণীদের সঙ্গে হাবু দত্তের অবদানও বিলীন হয়ে গেছে বাতাসে! অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'গিরীশচন্দ্র' নামক মূল্যবান পুস্তকে তাঁদের কয়েকজনের নাম গিরীশচন্দ্রের নাটকগুলির প্রসঙ্গে মুদ্রিত করেছিলেন বলে কয়েকটি মাত্র নাটকের সুরসংযোজকদের কথা জানা গেছে! গিরীশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকের গানের এবং অন্যান্য নাট্যকারদের গানের সুরদাতাদের নাম বেশির ভাগই অজ্ঞাত। সেজন্যে হাবু দত্তেরও থিয়েটার-জগতে অনেক সুর সৃষ্টির পরিচয়ও বিলুপ্ত।

যেমন একটি কথা এ বিষয়ে জানা যায়। সিটি থিয়েটারের (মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে, রামকৃষ্ণ রায়ের সত্বাধীনে বীণা থিয়েটার নামে এটি বেশি পরিচিত হয়) উদ্বোধন হয় 'হরিলীলা' নামক একটি গীতিনাট্য পরিবেশন করে। এই গীতিনাট্যের রচয়িতা ছিলেন গিরীশচন্দ্র এবং নাটিকার সমস্ত গানে সুরসংযোজনা করেন অমৃতলাল। কিন্তু সঙ্গীত-পরিচালক বা সুরসংযোজকরূপে কোথাও তাঁর নাম প্রকাশিত হয় নি। অথচ 'হরিলীলা'র জনপ্রিয়তা হয়েছিল প্রধানত তার গীতাবলী ও তাদের সুরের জন্যে। এই গীতিনাট্যটি এত জনপ্রিয় হয় যে, আরও অনেক জায়গায় অভিনীত হয়ে সে যুগে প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করে। এমন কি দূর রামপুরেও 'হরিলীলা' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অমৃতলাল সেখানে বাস করবার সময়ে।…

হাবু দত্তের শিষ্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার আগে তাঁর ব্যক্তি জীবনের একটি বিষয় এখানে বলে রাখা যায়, যদিও তার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক নেই। তিনি প্রথম জীবনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেতেন, একথা আগে বলা হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি পরে আর সে যোগাযোগ রাখেন নি বটে—সঙ্গীত-চর্চার ভিন্ন খাতে তাঁর জীবন-ধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্যে—তবু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির একটি দিক তাঁর জীবনে বরাবরই ছিল এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ভক্তরূপে গণনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁর স্মৃতিতে যে বার্ষিক রামকৃষ্ণ উৎসবের অনুষ্ঠান হ'ত, তিনি তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। জন্মাষ্টমীর দিন এই রামকৃষ্ণ উৎসব হ'ত তাঁর বিশিষ্ট গৃহী শিষ্য রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে। উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল রামচন্দ্র দত্তের শিমুলিয়ার মধু রায় লেনের বাড়ী থেকে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের একটি শোভাযাত্রা। এবং হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রাটির পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব করে সমগ্র পথটি পরিক্রমণ করতেন। এই শোভাযাত্রা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হ'ত তাঁর ক্ল্যারিওনেট বাদনের জন্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট হাবু দত্তের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনার স্বামীজীর সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত কথিত বিবরণ তাঁর 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' (প্রথম খণ্ড, ৯-১০ পৃষ্ঠা) থেকে এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল:—'নরেন্দ্রনাথের মনে হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত আর দেহ রাখিবেন না। তবে এই সময়ে যাহাকে সম্মুখে পাইব তাহাকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করাইয়া মুক্তিলাভ করাইব। তিনি তাঁহার খুড়তুতো ভাই শ্রীঅমৃতলাল দত্তকে (সুপ্রসিদ্ধ বাদ্যাচার্য হাবু দত্ত) সঙ্গে লইয়া গেলেন।…লোকটিকে লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপনীত হইলেন এবং জোর করিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন যেন তিনি ইঁহাকে স্পর্শ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি বারংবার কহিতে লাগিলেন, "আমি মরতে বসেছি, এখন আর কাকেও ছুঁয়ে দিতে পারব না।" নরেন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। অবশেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হইলেন। লোকটি মেঝেতে বসিয়া রহিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাহার বক্ষস্থলে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। তখনই সেই লোকটা একেবারে সমাধিস্থ, স্থির, নিস্পন্দ, পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিল। প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক সময় এইরূপে রহিলে নরেন্দ্রনাথের মনে ভয় হইল। পাছে মাথার শির ছিঁড়িয়া যায় এইজন্য অনেক করিয়া তাহার চৈতন্য আনাইয়া নীচেকার বাগানে লইয়া গিয়া বলিলেন…। সেই লোকটি তখন অর্ধনিদ্রিতবৎ অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি খুব নেশায় বুঁদ ছিলুম—ঐ বুঁদ নেশাটা চাই।" তদবধি সেই লোকটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিপূজা না করিয়া কখনও অন্নগ্রহণ করিতেন না।'…

এই ঘটনার সময়ে হাবু দত্তের বয়স ছিল ২৭।২৮ বছর।…

তাঁর ব্যক্তি জীবনের কিছু বিবরণ এখানে দিয়ে দেওয়া যায় উপসংহারের। আগে তাঁর জীবন যে দারিদ্র্যের মধ্যে

অতিবাহিত হয়েছিল, সে কথা প্রথমদিকে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন উৎকৃষ্ট যন্ত্রীরূপে প্রসিদ্ধ হলেও উপার্জন উপযুক্ত ছিল না নানা কারণে। দত্ত পরিবারের আর্থিক বিপর্যয় ঘটায় যৌবনকাল থেকেই তাঁকে সঙ্গীত-চর্চাকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করতে হয়।

অবিবাহিত ছিলেন, তাই পারিবারিক বন্ধন বিশেষ ছিল না। জীবনটা কাটিয়ে যেন নিজের খেয়াল অনুযায়ী। নিজের গড়া পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একরকম সমাজছাড়া বনবাস। শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায় মানুষটির বেশভূষাও ছিল সাদাসিধে।

গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের এই বনেদী বংশ নানা রকমে বিধ্বস্ত হয়েছিল। মধ্য বয়সে হাবু দত্তকে বিদায় নিতে হয় পার্টিশান-হওয়া এই বাড়ী থেকে। তারপর নানা জায়গায় তাঁর অসংলগ্ন, বিশৃঙ্খল জীবন দেখতে দেখতে কেটে যায়।

গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট থেকে প্রথমে বাস করতে আসেন মানিকতলা স্ট্রীটে। সেখানে এক বছর থাকেন। তারপর যান মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে। সেখানেও বছরখানেক কাটে। তারপর শেঠের বাগান অঞ্চলের একটি বাড়ীতে কিছুদিন। শেষ বাস আহিরিটোলায়।

সনাইয়ের মুখুজ্যে পরিবারের এক শরিকের আহিরিটোলার বসত-বাড়ী। এখানে এই পরিবারের এক ব্যক্তির আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে হাবু দত্তের অন্তিম জীবন অতিবাহিত হয়। এ বাড়ীর সামনের দিকের একটি ঘরে যেদিন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে, তখন তিনি একেবারে নিঃস্ব।

কিন্তু সঙ্গীত-জগতে তিনি কি কিছু রেখে যান নি যার জন্যে তাঁর নামকে কেউ স্মরণ করে?

সঙ্গীতশিল্পীদের বিবরণ ত' সেকালে কিছুই রক্ষা করা হ'ত না, তাই পরবর্তীকাল তাঁদের সম্বন্ধে যত কথা জানবার তার অনেকখানিই জানতে পারে না। সেই বিস্মৃতির পরপার থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর শিষ্য গঠনের বিষয়ে। তাঁর শিষ্যদের কথা উল্লেখ করবার প্রসঙ্গে তাঁর বিষয়ে আর একটি কথা বলা যায়। তিনি ক্ল্যারিওনেট বাঁশী, এসরাজ ও সুরবাহার বাজাতেন, আগে বলা হয়েছে। তা ছাড়া তাঁর বেহালা, সেতার ইত্যাদি আরও ক'টি যন্ত্রে চর্চা ছিল এবং নানা যন্ত্রে শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের, যিনি চেয়েছেন যে যন্ত্র শিখতে।

তাঁর কাছে সুরেন্দ্রনাথ পাল শিখেছিলেন ক্ল্যারিওনেট ও বেহালা। সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী—ক্ল্যারিওনেট। শশিভূষণ দে (ইনি অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র প্রথম সঙ্গীতগুরু, খেয়াল-গায়ক শশিভূষণ দে নন। বেহালা-বাদক তারকনাথ দে'র ইনি পিতা)—এসরাজ, ক্ল্যারিওনেট ও বেহালা। হরিহর রায়—ধ্রুপদ গান। শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এসরাজ। নারায়ণ পাল (সেকালের খ্যাতনামা অভিনেতা মন্মথনাথ পালের ভ্রাতা) কয়েকটি যন্ত্রে শিক্ষালাভ করে ঐকতান বাদনে অভিজ্ঞ হন এবং পরে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দরবারী-বাদক নিযুক্ত হয়ে সেই ষ্টেটের military band গঠন করে যশস্বী হন। হাবু দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ (তনু বাবু) ও এসরাজ, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্রের বাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন জ্যেষ্ঠের শিক্ষায়। তা ছাড়া, হারু গুপ্ত, চুণীলাল মিত্র (মোহনলাল মিত্রের পুত্র) প্রভৃতিও তাঁর ছাত্র।

ছাত্রদের কথায় হাবু দত্তের একটি মন্তব্যের কথা জানা যায়। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেন—'সুর শেখানো যায়। তালও শেখানো যায়। কিন্তু লয় বহু দিনের অভ্যাসে তবে ছাত্র নিজে আয়ত্ত করতে পারে। লয় কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না।'

হাবু দত্তের ছাত্রদের মধ্যে উত্তর-জীবনে সবচেয়ে বিখ্যাত হন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। শীতল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই সময়ে তিনি হাবু দত্তের কাছে বিভিন্ন যন্ত্রে শিক্ষা করেছিলেন। শুধু যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা নয়, অন্য বিষয়েও তিনি দত্ত মশায়ের কাছে উপকৃত। মফস্বলে যাত্রার দলে শীতলবাবুর সঙ্গে খাঁ সাহেবের আলাপ হবার পর দু'জনে কলকাতায় আসেন ভালভাবে সঙ্গীত-শিক্ষার আশায়। প্রথমে খাঁ সাহেব গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে কণ্ঠ-সঙ্গীত শিখতেন। চক্রবর্তী মশায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে হাবু দত্তের কাছে শিখতে আরম্ভ করেন যন্ত্র-সঙ্গীত, একাধিক যন্ত্রে। কলকাতা সহরে আলাউদ্দিন তখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, সহায় সম্বলহীন। হাবু বাবু সে সময় তাঁর শুধু সঙ্গীতগুরুই ছিলেন না, (মিনার্ভা?) থিয়েটারে যন্ত্রবাদক হিসেবে ছাত্রের চাকুরিরও ব্যবস্থা করে দেন। হাবু দত্তের ঐকতান বাদনের সঙ্গেও আলাউদ্দিন খাঁ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এ সময়ে। (খাঁ সাহেবের উত্তরকালের ঐকতান বাদন গঠনের ওপর হাবু দত্তের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে)। সমগ্রভাবে যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়ে আলাউদ্দিন খাঁ যে ঋণী ছিলেন দত্ত মশায়ের কাছে, এ কথা বোঝা যায়—তবে কতখানি, তা বলা সম্ভব নয়। আর এ বিষয়ে কোন সমসাময়িক লিখিত বিবরণও নেই। এসব সম্পর্কে একটি

অপরূপ বিবৃতি আছে স্বয়ং আলাউদ্দিন খাঁ'র। খাঁ সাহেবের এই উক্তি থেকে দত্ত মশায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাবে কি না কিংবা তাঁর মতামত যথোচিত বা ছাত্রোচিত হয়েছে কি না এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে' সুধী পাঠক-পাঠিকাদের ওপরে সে বিচারে ভার ছেড়ে দেওয়া যাক।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বৃদ্ধ বয়সে অভাবিত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার তুঙ্গভূ মতে আরোহণ করে তাঁর অতীতকালের অন্যতম এবং বিস্মৃত সঙ্গীত-গুরুর দিকে এইভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন স্মৃতিচারণের সময় (তাঁর 'আমার কথা' পুস্তিকায় ১১ পৃষ্ঠায়):

'বিবেকানন্দের ভাই হাবু দত্ত। সিমলায় থাকেন। ...হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট, সেতার, অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের কন্সার্ট তৈরি করতেন। গেলাম তাঁর কাছে। "কী শিখবে, গান শিখবে?" "আজ্ঞে না যন্ত্র শিখব। বেহালা।" ইংরেজী বাণ্ড, সানাই শুনে বড় ভাল লাগত। শিখতে লাগলাম। হাবু দত্তের তৈরি কন্সার্টের সুর—ইমন। একেকদিন চার-পাঁচটা গৎ শিখি। একমাসে ওঁর খাতা শেষ করে দিলাম।'

অহমিকাময় এই বিবৃতির 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কথাটি ত আস্ত প্রমাদ (ন্যাশনাল কিংবা গ্রেট ন্যাশনাল দু'টিই আলোচ্যকালের অনেক আগে গতায়ু)। কিন্তু ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত না হয় এটি তাঁর 'বিস্মৃতি'ই বলা গেল! তবে ওই—'এক মাসে ওঁর খাতা শেষ করে দিলাম' উক্তির বিষয়ে কি মন্তব্য করা যাবে? ওস্তাদজীর সেকালের সতীর্থ শীতলবাবু আজ জীবিত থাকলে বলতে পারতেন খাঁ সাহেব দত্ত মশায়ের খাতা একমাসে শেষ করেছিলেন কিংবা প্রায় দু'বছর শিখেছিলেন তাঁর কাছে।

বিগত দিন—ভূত। তাই মাঝে মাঝে ভূতের নৃত্য দেখা যায়। সেকালে একটি কথা, অন্যান্য জায়গায় মত সঙ্গীত-সমাজেও চলিত ছিল—গুরুর ঋণ পরিশোধ করা যায় না। কিন্তু এ কালে দেখা যাচ্ছে যে, তা শোধ করা যায় সুদে-আসলে!

(ক্রমশঃ)

বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের অধিকাংশ লোকের সম্ভবতঃ এখনও এই জ্ঞান জন্মে নাই যে, নিজের বা নিজের পরিবারবর্গের সুখ ও কল্যাণ ছাড়া সমাজের ও জাতির সুখ ও কল্যাণ বলিয়া একটি জিনিষ আছে, সমাজের ও জাতির সুখ ও হিত ব্যতিরেকে নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ সুখ সুবিধা ও হিত হইতে পারে না, এবং আবশ্যক হইলে সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্য নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের স্বার্থ ও সুখ বলি দেওয়া উচিত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৮

রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়ঃ জন্মদিন

প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য

প্রান্তিক (১৯৩৮) থেকে আরম্ভ ক'রে রোগশয্যা, আরোগ্য, জন্মদিন ও শেষলেখা পর্যন্ত কালটিকে রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায় ব'লে গৃহীত হ'য়ে থাকে। বুধ-মণ্ডলীর মতে এই পর্যায়টি এক নবযুগের সূচনা করেছে। কারও কারও মতে, রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যেন একটু বেশী আধুনিক হবার চেষ্টা করেছেন: আবার, রবীন্দ্র-সমসাময়িক কোন কোন উগ্রপন্থী তরুণদল রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সাহিত্যকে "বুর্জোয়া" ব'লে উন্নাসিকতাও দেখিয়েছেন।

এই সকল মতদ্বৈধের মধ্যে প্রবেশ না করে সাদা চোখে যদি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলিকে তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলি থেকে একটু আলাদা করে দেখতে যাওয়া যায় ত প্রথমেই যে পার্থক্যটুকু চোখে পড়ে সে হ'ল, উপযুক্ত শব্দ-চয়ন-ক্ষমতা ও প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের অভিনবত্ব, পদ-বিন্যাসের অনায়াস ঋজুতা, ছন্দ-ভাঙ্গা ছন্দের গতিচ্ছন্দ, ও সঙ্গে সঙ্গে দুরবগাহ অনুভূতির একরূপ আর্য নির্লিপ্তি। নইলে, বিষয়বস্তু বা কাব্যজীবিতের দিক থেকে শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলি যে নূতন কোন কাব্য-সত্যের দর্শন প্রতি-পাদিত করেছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

বস্তুতঃ, যে-রবীন্দ্রকাব্যসত্যগুলি একের পর এক বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থের ভিতর দিয়ে প্রোথিত হ'তে হ'তে কবির নিগূঢ় অন্তরপ্রদেশে একরূপ 'সংস্কার'-রূপে অবস্থান করে এসেছে এবং যৌবন ও প্রৌঢ়ের পালা বদলের মধ্যেও সে-সংস্কার একরূপ সুখসংস্কৃত রূপ পেয়েছে মাত্র. ঠিক সেই কাব্য-সত্যগুলিই শেষ পর্যায়ে এসে মৃত্যুর নিকস-কঠিন কষ্টি-পাথরে পরীক্ষিত হয়ে অনেকটা অভিজাত শুদ্ধার "আটপৌরে" রূপ নিয়ে উপস্থিত হ'তে দেখা যায় প্রান্তিক ও প্রান্তিকোত্তর কাব্যগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

এখানেও দেখি কবির সেই স্বভাবানুগ মানব ও মর্ত, মৃত্যু ও অমর্ত্য, 'আমি' আর 'তুমি'র অভীক্ষণ, এখানেও সেই মিষ্টিক লীলাবাদ আর ক্লাসিক ঋষিবাদের অবাধ সঞ্চরণ, সেই 'প্রীতি' ও 'প্রেতি'র প্রবুদ্ধ পদ-পাতন। কবির স্বয়ং-উপলব্ধ শ্রেষ্ঠ অনুভবগুলির কোনটিরই অনুপস্থিতি ঘটে নি তাঁর বার্ধক্যের গোধূলি বেলায়।

অভিনবত্বের মধ্যে এই যে, উক্ত অতি-প্রিয় অনুভব ক্রিয়াগুলির কোন কোনটির সময়োপযোগী পরিশোধন, পরিবর্দ্ধন বা পরিমার্জন ঘটেছে, কিন্তু পরিবর্তন বা পরিবর্জন ঘটে নি কোনমতেই। খেয়া-গীতিমাল্য-গীতাঞ্জলি যুগের লীলাবাদ প্রান্তিক-সেঁজুতি-জন্মদিনে এসে উন্নীত হয়েছে উপনিষদের ঋষিবাদে: আবার, মানসীর 'প্রীতি' ও বলাকার 'প্রেতি' (স্থিতিতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব) উভয়েই এসে সাধু-সঙ্গম লাভ করেছে প্রান্তিক ও জন্মদিনের প্রশান্ত নির্লিপ্ত জ্যোতিঃসমুদ্রের নিস্তরঙ্গ গভীরে। এ যুগেরই প্রবাহিনী, আকাশ প্রদীপ, ছেলে-ভুলান ছড়া ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দেয় পূরবী, মহুয়া, বীথিকার কৌতুকপ্রিয় কবির প্রসন্ন মর্ত-প্রীতিটিকে। আবার, এই যুগেরই আরোগ্য বা নবজাতক শ্যামলী শেষসপ্তকের আধ্যাত্মিকতা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু, প্রকৃতই অবগাঢ়রূপে যে দুটি সত্য দেখা দিয়েছে এ যুগের শেষ লেখা কাব্য-গুলিতে তার একটি হ'ল মানব-প্রীতি, আর একটি অমর্ত্য-প্রীতি।

মানবপ্রীতি ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্রই। কিন্তু সেই মানব যত বেশী 'মানবিক' তত বেশী 'মানুষ' নয়। মাটির গন্ধ তাতে কম। সে শুধু মার্জিত, সাদা-মাটা নয়। কিন্তু মৃত্যুর উপান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ ও-পারের দিকে যত বেশী পা বাড়িয়েছেন এ-পারের মাটির মানুষ তত বেশী নিবিড় আত্মীয়তায় তাঁর আতিথ্য পেয়েছে। তার বিশ্বময় বৈরাগ্যের বীর্যবান অনুরাগে 'মূক যারা দুঃখে সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে'—তারাও উপেক্ষিত হয় নি। উপেক্ষিত হয় নি সুদূর পরবাসী স্বল্প-পরিচিত বিদেশীর দল।

> "বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে
> বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি
> আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
> অবারিত পায় অভ্যর্থনা।" (জন্মদিন, ৩ নং)

নৃত্যরত নটরাজের এক পদবিক্ষেপে রূপলোক ও

অন্য পদ বিক্ষেপে রসলোক যদি উন্মোচিত হয়ে থাকে ত রবীন্দ্র-জীবনে মৃত্যুরাজের এক পদবিক্ষেপে মর্ত্যলোক ও অন্য পদবিক্ষেপে অমর্ত্যলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

"দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবন প্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম।"

এমন কি, রোগশয্যায় রোগজর্জর দেহে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেও কবির এই দুই আলো কিন্তু নিষ্প্রভ হয় নি। এক আলো এসে যদি কবির 'অচেতন আমি'কে করে উত্তপ্ত উদ্বেল,—

"হে সংসার
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে—
বর্জন করো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত"

ত, অন্য আলো এসে পরক্ষণেই কবির 'সচেতন-আমি'-কে করে সজাগ—

"এ কি অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।"

'আরোগ্য' লাভ করতেই দুই আলোর বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তখন মৃত্যুই মুক্তি হয়ে উঠেছে :

"আজি মুক্তি-মন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিক-চিত্ত মম
সংসার যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম"

তারপর, 'জন্মদিনে' আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি যখন কবি শুনতে পেলেন, কবি তখন মুক্ত স্বর্গে সমাসীন।

"আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে
জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।"

কিন্তু তবুও, এই অমর্ত্য-লোক-চারী রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির মধ্যে 'দার্শনিক' জেগে থাকলেও তাঁর 'কবি'কে পরাস্ত করতে পারে নি। তাঁর 'কবি'টি বলেন, "সুন্দরের দূরত্বের কখনও হয় না ক্ষয়, কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।" —তাঁর 'দার্শনিক' বলেন,

"আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।"

পরিণাম অজানা হ'লেও সেই অজানার প্রতি কবির মনে কোন সংশয়ব্যাকুলতা আর নাই :

অন্ধতামস গহ্বর হ'তে
কিরিনু সূর্যালোকে
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে (সেঁজুতি)

বিস্মিত হয়ে আপনার পানে নূতন চোখে তিনি যে প্রত্যয়গুলি হেরিলেন সেগুলি বিশুদ্ধ উপনিষদ। তিনি দেখলেন :

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

তিনি দেখলেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

তিনি দেখলেন—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্॥

সৃষ্টি লীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
করো করো অপাবৃত, হে সূর্য, আলোক-আবরণ
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু
ভস্মে যার দেহ-অন্ত হবে,
যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া
সত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ (জন্মদিন, ১৩ নং)

অথবা,

মলিনিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্তলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রি-সম
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত। (জন্মদিন, ২৩ নং)

এইরূপে উপনিষদের ঋষি-বাক্যের মাঝেই রবীন্দ্রনাথ সমাধান খুঁজে পান জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের :

জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।
(জন্মদিন, ২৬ নং)

এই "প্রণত-সুন্দর-অবসানের" প্রশান্তিতে কবি বলেছেন সেই দেশে—

যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে।
(জন্মদিন ১২ নং)

পরিণাম সম্পর্কে এইরূপ দ্বিধাহীন নিঃসংশয়-চিত্ত কবির কিন্তু আজন্ম "চেয়ে-থাকা" বাসনার বিরাম নেই।

"প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।" (জন্মদিন)

এই অন্তর-পুরুষের চাক্ষুষ দেখা কবি পেয়েছিলেন কি?

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি
মেলে নি উত্তর।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি
পেল না উত্তর॥ (শেষ লেখা)

যদি পেতেন, রবীন্দ্রনাথ হতেন সাধক-শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-চৈতন্য। পান নি বলেই তিনি হয়েছেন কবি-শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-প্রেমিক। মৃত্যুতে তাঁর প্রেম পূর্ণ হয়েছে কিন্তু 'রহস্য' শেষ হয় নাই। রহস্যের আলো-আঁধারকে বাঁচিয়ে রেখেই তিনি কবির শিল্পীসত্তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে গেছেন। রহস্যের চাক্ষুষ উন্মোচন হ'লে সৃষ্টির অর্থ থাকে না কিছু—সৌন্দর্য হয় ব্যর্থ। তাই,

'কে তুমি
পেল না উত্তর।'

জন্মদিন:

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটি কয়েকটি কারণে বিশেষ মূল্যের দাবি রাখে। 'রোগশয্যা'য় রোগক্লান্ত কবির সঙ্কোচ হয়েছিল বুঝি তাঁর কল্পনা, ভাষা ও ছন্দ ক্ষীণ, আড়ষ্ট ও শিথিল হয়ে এসেছে।

"তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ তালে।"

'জন্মদিনে'ও দেখি নিজের রচনা-নৈপুণ্যের প্রতি সঙ্কোচকে কবি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

"করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহুব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।"

মজা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-সুলভ এ হেন বিনম্র বাচনভঙ্গিকে সত্য ভেবে নিয়ে একদল সমালোচক-পুঙ্গব রবীন্দ্রনাথের এ-যুগের রচনায় প্রতিভার দৈন্য খুঁজে পেয়েছেন। এই ধরনের অশিক্ষিত পটুত্ব যাঁদের, তাঁদের নিকট 'জন্মদিন' একটা মূর্তিময়ী challenge। অশীতিপর বৃদ্ধ কবির লেখনী-প্রসূত রচনার এই বিদগ্ধ যৌবন কোন কোন ক্ষেত্রে কবির যৌবনের অনেক ছন্দোময়ী রচনাকেও কিঞ্চিৎ লজ্জা দেবার স্পর্ধা রাখে। উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে জন্মদিনের ৮নং কবিতার। ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কবি লিখলেন:

সায়াহ্ন বেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টীকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিম সীমায়।"

এখানে যে মৃত্যুপরবর্তী অখণ্ড জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা সুস্পষ্ট চৈতন্যের পরিচয় পাই কেবল তাই নয়, কবি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারিণী শিল্পী প্রতিভারও একটা চমৎকার প্রমাণ পাই।

অথবা, ৭নং কবিতায় যেখানে মংপুর পাহাড়িয়ারা

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে হাতে এনেছিল পুষ্পমঞ্জরী ভক্তি-নিবেদনার্থ; কী অনবদ্য কাব্যসৃষ্টি করে সেই মুহূর্তটিকে ধরে রাখলেন কবি সৌন্দর্যের চিরন্তন স্মৃতিশালায়।

ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে—
প্রস্তর আসনে বসি'
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর—
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।
···নক্ষত্রখচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃ সম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান॥

এমন আরো অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে যার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, বৃক্ষ বৃদ্ধ হ'লেও ফুল বৃদ্ধ হয় না। মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য হারিয়েছিলেন কিন্তু সৃষ্টি হারান নি। 'অবিচিত্র ধরণী'; 'সাবিত্রী পৃথিবী'; 'পাবতী জনতা'; 'সমুচ্চ শান্তি'; 'নারায়ণী ধরণী': ইত্যাদি বিশেষণের অর্থপূর্ণ চমক, অথবা,

"তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন 'পরে।"

—এখানে 'প্রতিমা' শব্দের প্রয়োগচাতুর্য—কবির অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভার জলন্ত স্বাক্ষর।

'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থে দার্শনিক প্রত্যভিজ্ঞা ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কবিতা আছে যাতে কবির মনের অটুট চলতা অদ্ভুত যৌবশক্তির পরিচয় দেয়।

১৯ নং কবিতায় একের পর এক চিত্র এঁকে কবি ছেলেবেলার যে স্মৃতিচারণ করে গেছেন সেগুলিকে কালির আঁচড় না ব'লে তুলির আঁচড় বলা উচিত।

পুরাতন নীলকুঠি দোতলার 'পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত—
দিন আর রাত
আলো আর অন্ধকারে
সাথিহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত······
···প্রশস্ত সে ছাত
সেই আলো সেই অন্ধকারে
কর্মসমুদ্রের মাঝে নৈষ্কর্মদ্বীপের পারে
বালকের মনখানা মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক যেন।

২০নং কবিতায়, ভাষার সৃষ্টি, শব্দের শক্তি ও সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান—এইসব মিলিয়ে এক অদ্ভুত রূপছড়া বেঁধেছেন কবি বলাকা-যুগের ভঙ্গ-পয়ারের গতিচ্ছন্দ দিয়ে। এই কবিতাটি নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। শক্তির অপব্যবহারে বন্দী যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন তাকে সামলানো দায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। বোধ করি আধুনিক কবিতার বেপরোয়া শব্দ-ব্যবহারের উপর কবির এই দ্ব্যর্থক কবিতা। যার ইঙ্গিত ইউরোপীয় সমাজবাদকে লক্ষ্য করেও।

"দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপ—
উঠেছে অধীর হ'য়ে খেপে·

"মনে মনে দেখিতেছি, সারাবেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াডুম সাজে॥"

জন্মদিনের যুগ হ'ল বিগত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সৃষ্টিবিধ্বংসীকর যুদ্ধের যুগ। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে এই ব্যাধিগ্রস্ত কবির মনে যুদ্ধের ব্যাধি কীরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই সাক্ষ্য বহন করেছে ২১ নং ও ১৬ নং কবিতাগুলি।

"দামামা ঐ বাজে···
···শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এতো অপব্যয়,
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়···
পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি। (১৬ নং)

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন ক'রে
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
···(২১ নং)

কবির ভবিষ্যদ্বাণী যুদ্ধদগ্ধ নরনারীর পীড়িত প্রাণে আনে নূতন জীবনের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত।

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,

মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান" (২১ নং)

২২ নং কবিতায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ঘোষিত হয়েছে।

"সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদমাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।...
...সমুচ্চ আকাশ হ'তে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণদশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।"

"জন্মদিন" কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে বহুল প্রচারিত কবিতা হ'ল ১০ নং কবিতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ছাত্রমহলে যা "ঐক্যতান" নামে পরিচিত। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের যুগনির্দেশী আত্মসমীক্ষণ। বোধ করি এমনি একটি সমীক্ষণের প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রজীবনে —যার মূল্য কেবল রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পুরুষ ও তর্কবহুল একটি সাহিত্যাদর্শের সমাধানের জন্যও প্রয়োজন। কবিতা-হিসাবে শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাবৎ সকল কবিতা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাদ পৃথক ও বিচিত্র। আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে সাহিত্য-সমালোচনাকে কেন্দ্র করে অশীতিবর্ষ বয়সে যে একটি যুগনির্দেশকারী ধ্রুপদী কবিতা লেখা চলতে পারে—এর নজির তাবৎ বিশ্ব-সাহিত্যে আর একটিও নেই। জগতে এমন লেখক খুব কমই আছেন যিনি আপনার প্রতিষ্ঠিত-গৌরব থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সাহিত্য-বিচারকের তুলাদণ্ডে নিজের রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি নিরপেক্ষভাবে দেখবার সাহস রাখেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তা' দেখিয়েছেন এবং এমন ভাবে সেটা যুগোপযোগী করে সমকালীন সাহিত্যের দিঙ্‌নির্দেশ করেছেন যে তাতে তাঁর প্রতিষ্ঠা-গৌরব আরো অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে।

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।"

মানুষের হৃদয়ে অবাধে প্রবেশের অক্ষমতাকে বিনা ভূমিকায় কি গভীর স্বীকারোক্তির সঙ্গেই না প্রকাশ করেছেন কবি। অথচ, এই স্বীকারোক্তিকে একরূপ বিনয়জ্ঞাপন বা ভনিতা ভেবে নিয়ে কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে গৌরব দিতে গিয়ে বরং তাঁকে আরো ছোট করে দেখেছেন। যেখানে কবি বলেছেন,

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"—সেখানে এই শ্রেণীর সমালোচক মন্তব্য করেছেন—যে রবীন্দ্রনাথ পাঁচ পাঁচবার বিশ্ব-পরিক্রমা করেছেন তিনি জানবেন না ত আর কে জানবে? বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর মন্তব্য দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের পশ্চাতে যে বিশেষ একরূপ বাগর্থ থাকে তারই মর্মস্থানে আঘাত করা হয়। আসলে, রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অসঙ্কোচ স্বীকারোক্তির মাঝে একরূপ উদার সত্য দর্শন আছে। তিনি বলতে চেয়েছেন, পৃথিবী কেবল মাটি দিয়ে তৈরী নয়, পৃথিবী মানুষ দিয়ে গড়া। পৃথিবীর এই মাটির রূপ —তা সে যত বিচিত্র, যত দুর্গমই হোক না কেন, তাকে চেনবার বা জানবার বিভিন্ন উপায় আছে। কখন ভ্রমণের দ্বারা, কখন গ্রন্থপাঠ ক'রে, কখন বা কল্পনায়। কিন্তু,

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।

এই যে অন্তর মিশিয়ে মানুষের অন্তরের পরিচয় নেওয়া—সেটা অনেকগুলি কারণে কবির জীবনে সর্বত্রই সম্ভব হয়ে ওঠে নি। সেই কারণগুলির একটি হ'ল সামাজিক সংস্কার, অপরটি হ'ল বংশাভিজাত্য। এই জন্যই মানুষের রক্ত-মাংসের সাংসারিক রূপটি তাঁকে দেখতে হয়েছে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসে সংকীর্ণ বাতায়ন-পথ দিয়ে। এই অসম্যক চেনার বেদনাই কবিকে ভিতরে ভিতরে সুরের অপূর্ণতার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র-পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

এই ত্রুটিটুকু তাঁর সাহিত্যে ঘটে গেছে বলেই অনুতাপদগ্ধ কবি প্রতীক্ষা করে আছেন :

"নিজে যা পারিনি দিতে নিত্য আমি থাকি তারি
খোঁজে।"

সত্যদিদৃক্ষু কবি কোনরূপ প্রবঞ্চনা মনে না রেখে আগামী দিনের গণসাহিত্যকে সসম্মানে আহ্বান করেছেন :

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যাদর্শের প্রশ্ন না এসেই যায় না! গণ-সাহিত্যের নাম ক'রে এক শ্রেণীর চট্‌কদারি মজদুরী সাহিত্যকে কবি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। শিল্পের অসুন্দরকে কোনদিনই প্রশ্রয় দিতে পারেন নি কবি। কেননা, সাহিত্য বা শিল্পের সৌন্দর্য ভঙ্গিসর্বস্ব নয়, ভিত্তিসর্বস্ব। এবং এ ভিত্তির মূলাধার হচ্ছে সত্য-অভিজ্ঞতা। তাই,

"সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতিকরা চুরি
ভাল নয়, ভাল নয়, নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।"

এই সাবধানবাণী আধুনিক সাহিত্যের মান নির্ধারণের এক সুনিশ্চিত পথনির্দেশ।

'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের আর একটি দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানবপ্রীতি ও মহামানব পূজা এই দু'টি বোধ মৃত্যুপথযাত্রী কবির স্বভাবোচিত বিশ্বমানবিকতাকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিল। মহামানবের অসম্মান যে মানুষের অন্তরের মানুষকেই অসম্মান এই কথাটিকে কবি আরও একটু জোরের সঙ্গে বলেছেন ১৮ নং কবিতায়।

যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরই নিত্য পরিচয়।

এমন কি যে-মানব মহৎ উদ্দেশ্যে অকৃতার্থও হয়েছে জীবনে, জীবনেতিহাসের ক্রমবিকাশের খতিয়ানে তাঁদের অবদানও তুচ্ছ নয়; তাঁদের স্মরণেও মানব আত্মা অন্তরে অন্তরে পূজিত হন।

দলে দলে যাঁরা
উত্তীর্ণ হন নি লক্ষ্যে, তৃষ্ণা নিদারুণ
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
…শক্তি যোগাইছে (তাঁরা) অগোচরে
চিরমানবেরে
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার। (১৭ নং কবিতা)

ইরাবতীর তীরে

বিভা সরকার

পাঞ্জাবের গাঁয়ের চাষীর প্রায় সব প্রয়োজনই মেটায় তার ক্ষেতের মাটি। এই মাটিই তাকে রুটির গম জোগায়, আখের গুড় জোগায়, জামা-কাপড়ের জন্ম তুলো জোগায়। ফসল ঘরে তোলার আনন্দে তারা নাচে ভাংরা নাচ। বর্ষার নব-ঘনশ্যাম মেঘ দেখে উতলা কলাপী ময়ূরের মতই মন তাদের নেচে ওঠে—তারা মনের আনন্দে নাচে তিয়া নাচ। বর্ষার জল-ধারার দর্শন তাদের ভাগ্যে প্রায় দুর্লভ। আনন্দে উৎসবে নাচে গিদ্দা নাচ। গিদ্দা মানে হাতের তালি বাজানো—তালির তালে তালে নাচে আর গান করে কৃষক-বধূরা মনের উল্লাসে-তাই একে বলে গিদ্দা। গাঁয়ের ঘরে ঘরে আছে খোলমৌনী বা রিড়কনা। ঘরে ঘরে আছে চরকা। এই চরকার ওপর কতই না গান, কত না ছড়া। তারা চরকা ঘোরার তালে তালে গান করে আর সুতো কাটে। সেই চরকার মোটা সুতোয় গাঁয়ের জোলা কাপড় বোনে, খেস বোনে। গাঁয়ে গাঁয়ে আছে রংরেজ। তারা কাপড় রাঙিয়ে দেয় নানা রংয়ে। এমনি করেই হয়ত কত গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষের জীবন সুরু থেকে সারা হয়ে গেছে ঐ গাঁয়ের আওতায় মাটি-মায়ের দানে। সামান্ত তাদের প্রয়োজন, বলিষ্ঠ ধরন-ধারণ। লালিত্যে ও ললিত কলায় পিছিয়ে থাকলেও স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে তারা সুন্দর। গৌরবর্ণ উন্নত-নাসা দীর্ঘদেহী প্রিয়দর্শন মানুষগুলি আর্য রক্ত-ধারার সাক্ষ্য বহন করছে।

জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্ম তারা পরমুখাপেক্ষী নয়। তারা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। চিকিৎসার জন্ম আছে গাঁয়ের হকিম তার জড়ি বুটি গাছ গাছড়ার বিদ্যা নিয়ে।

গাঁয়ের গৃহিণীদের প্রত্যুষের প্রথম কাজ গো সেবা—তারপর দুগ্ধদোহন। তারপরই ছুটবেন তিনি দধি মন্থনে। আঙিনায় আঙিনায় যখন দধি মন্থনের ঘর ঘর রব উঠবে—অল্পবয়সী বউ-ঝিউড়িরা ততক্ষণে কাঠের আঁচে জাল দিয়ে রুটির জোগাড়ে ব্যস্ত হবেন। আটা যদি পেশা থাকে ভাল, না থাকে চক্কি বা যাঁতা ঘুরতে আরম্ভ হবে। নবীনারা বয়সের ধর্মে সব ভুলে গুন-গুনিয়ে গান ধরবেন শ্বশুর ভাসুর ভুলে যাঁতার ভন ভন শব্দকে ছাপিয়ে। এমনি করেই আরম্ভ হয় গাঁয়ের কর্মব্যস্ত দিন। গতি তাদের মন্থর ধীর স্থির। সহরের উদ্দামতার ধার তারা ধারে না। আপন আপন গণ্ডির মধ্যে তারা সীমিত।

পুরুষেরা 'হুক্কা পানি' গ্রহণ করে টাটকা ভাজা আটার রুটি আর ঘটিভরা মাখন-তোলা ঘোল বা লস্যি পানে পরম পরিতৃপ্ত মন নিয়ে ক্ষেতের কাজে বা আপন আপন জীবিকার তাগিদে বেরিয়ে পড়বেন। ছেলেরা বেরবে মাঠের পথে গোধন চরাতে। মাথায় পাগড়ির খুঁটে তারা বেঁধে নিতে ভুলবে না টাটকা রুটি, ভুলবে না লোটা ভরে লস্যি সঙ্গে নিতে আর পেট ভরে খেয়ে নিতে। জুটলো একটু গুড় কি একটা কাঁচা পেঁয়াজ তা হ'লে ত কথাই নেই সেদিন। তাদের মধ্যে আবার একটু বর্দ্ধিষ্ণু যাঁরা কাছাকাছির গাঁয়ে বা নিজের গাঁয়ে যদি 'মখতব' অর্থাৎ পাঠশালা থাকে যাবে সেখানে তখতি (কাঠের শ্লেট) ভাল করে গাজনী মিট্টিতে (তিলক মাটি) মেজে পরিষ্কার করে আপন আপন কায়দা (বই) নিয়ে। রাস্তায় তারা গান করবে, হল্লা করবে—ঘড়ি তাদের সূর্যদেব। সেই সূর্য-ঘড়ির পানে দৃষ্টি রেখে তারা সময় মত ঠিক জুটবে গিয়ে মখতব বা মদর্শায়। ভোরের সূর্য ততক্ষণে আকাশের অঙ্গন পথে এগিয়ে চলে যাবে—জমে উঠবে গাঁয়ের কুয়াতলা বা 'খুহি' নানা কলগুঞ্জনে। কেউ কাপড় কাচবে, কেউবা বাসন মাজবে। কেউ স্নান করবে, আবার কেউবা সন্তান-সন্ততিকে স্নান করাবে। পরনিন্দা পরচর্চা, আবার কাজের কথারও আদান-প্রদান চলবে সেখানে। সম্পূর্ণ প্রমীলার রাজত্ব তখন কুয়া-তলা। শুধু কুয়াতলাই বা বলি কেন, প্রায় সমস্ত গ্রাম-খানাই দৈবাৎ রুগ্ন বা বৃদ্ধ অক্ষম পুরুষ বাদে।

আলাপচারী হবে কারো বা ভিন গাঁয়ে থাকা প্রবাসী মেয়ের সুখ-দুঃখের। আবার নতুন করেও হবে কোথাও বা কুটুম্বিতা স্থাপনের খোশগল্প। পরস্পরের ভালমন্দ সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান হবে এমনি করেই সেই কুয়া-তলায়। কারো বা ঘরে গম বাড়ন্ত, কারো বা তুলো।

কারো বা চরকা বন্ধ হবার জোগাড়, কারো বা চক্কি। প্রতিবেশীরা পরস্পরের কাছে চেয়ে-চিন্তে লেনদেন করে নেবে এই ফাঁকে। সম্পূর্ণ মহিলা মহল যে তখন।

পঞ্জাবের লোক একেবারেই জলপ্রিয় নয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জলকে এড়িয়ে চলে। রোজ স্নানের বালাই বা কাপড় কাচার অনাচার নৈব নৈব চ। মাঝে মাঝে ন মাসে ছ মাসে সোরগোল তুলে যেদিন শির নহান, অর্থাৎ মাথার চুল ভেজানোর পর্ব পড়ে, সেদিন সত্যই স্নানযাত্রা। প্রথমে বেসন বা সাজিমাটি, তারপর জল, তারও পর ঘটি ঘটি লস্যি ঢেলে সমাপ্ত হয় সে পর্বের। তাদের মস্তক তাই চম্পক-গন্ধ বহন করে না বরং ঠিক তার বিপরীত। তাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগে, সয়ে যায়, নইলে করবে কেন। নব্যদের কথা স্বতন্ত্র।

মধ্যাহ্নে কেউবা গাছের ছায়ায় খাটিয়া পেতে একটু গড়িয়ে নেয় কেউবা চরকা পাতে। চরকা চলে হাতের জোরে, গল্প চলে মুখে মুখে। একটানা ভ্রমরার কল-গুঞ্জনের মত অদ্ভুত শব্দে উদাসী মধ্যাহ্নের আকাশ-বাতাস আরও উদাস করে একত্রে বসে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চরকাই কেটে চলে। তারপর মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য অপরাহ্নের আঙ্গিনায় পা বাড়ালে একে একে তারা উঠে পড়ে সেদিনের মত; চরকা পিঁড়ি পেঁজাতুলোর পেটি নিয়ে চলে যায় যে যার ঘরে। কিছুক্ষণ চারিদিক একটু স্তব্ধ হয়ে থাকে। ক্বচিৎ ভেসে আসে গ্রাম্য কুকুরের চিৎকার—হয়ত বা নিমডালে বসা এক-আধটা নিঃসঙ্গ কাকের কা কা রব। তারপরই ওঠে ঘরে ঘরে কাঠ কাটার শব্দ, কোনও আঙ্গিনায় চাক্কির ঘড়ঘড়ানি। এখানে-ওখানে শিশুর কান্না কলকোলাহল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের।

কিশোরী মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে মাঠের পথে, কেউবা তুলে আনে বথুয়া শাক, কেউবা সরষে শাক, কেউবা ছোলা শাক। মুলোটা শালগমটা লাউ-কুমড়োটা—যখন যা জোটে। যুবতীরা আর একবার চঞ্চল হয়ে ছোটে কুয়াতলায় কলস কাঁখে—"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল" বড় সর্বনেশে এ সময়টা কিন্তু উপায় নেই। প্রৌঢ়ারা সন্দিগ্ধ চোখে ঈর্ষাকাতর মনে ছটফটালেও বারণ করতে পারেন না। এখনি যে শ্রান্ত ক্লান্ত পুরুষেরা ফিরে আসবে ঘরে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত তারা কি একটু তাজা কুয়া থেকে তোলা ঠাণ্ডা জলও পাবে না!

আবার মন দেওয়া-নেওয়ারও এই ত ক্ষণ অবসর জল দেওয়া নেওয়ার অবকাশে। পুরুষেরাও যে দিনান্তের পর যাবে একবার কুয়াতলায় সারাদিনের শ্রান্তি বিনোদন করতে ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুয়ে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে জল ঢেলে দেওয়ার অবকাশে ঘোমটার আড়ে কেউবা চকিত চটুল চাহনিতে কর্মশ্রান্ত পুরুষকে বেপথু বিহ্বল করে ঘরে ফিরে আসবেন।

মধ্যদিনের সূর্য আপন গতিপথে সায়াহ্নের কূলে পশ্চিমদিগন্তের বুকে আলোর আবির ছড়িয়ে অস্তাচলে নামবে। ধরণীর বুকে জলে স্থলে কেঁপে উঠবে তারই মন-ব্যাকুল-করা ছায়া। সারাদিনের কর্মব্যস্ত মানুষ ঘরে ফেরার পথে পা বাড়াবে এই মধু মুহূর্তটিতে। আকাশের শূন্য পথে ফিরে যাবে আপন আপন দূর কুলায় কুলায় পাখির দল—শ্রান্ত ডানায় তাদের বিশ্রামের ব্যাকুলতা। গোধূলির ধূসর লগ্নে গ্রাম্যপথে ধূলি উড়িয়ে সারাদিনের পর ক্ষুধার্ত রাখাল ছেলের দল ফিরবে গাঁয়ের পথে। কণ্ঠ তাদের তৃষ্ণার্ত, হাতে তাদের শূন্য লস্যির লোটা। মোটা দেশী নাগরা কারও বা পায়ে কারও বা পিঠে ফেলা লাঠির শেষ প্রান্তে বাঁধা।

ক্বচিৎ বিজন বনের মহিমা মুখর করে দূর থেকে ভেসে আসে—"অল্লা হো অকবর, লা ইলাহা ইল ইল্লা, অসহ-দমন্ অসহদমন্ মহম্মদরুরসূলুল্লা, হৈ অল অল সলা, হৈ অল অল ফলা"—আজানের স্বর। মন্থর পায় পরিশ্রান্ত গোরুর পাল এগিয়ে চলে, তাদের কঠিন ক্ষুরের আঘাতে আঘাতে খটাখট শব্দ তোলে শুকনো প্রস্তর কঠিন রুক্ষ পথ। তাদের গলার ঘণ্টারব দূর থেকে শোনা যায়। চলার তালে তালে তারা বেজে চলে টুং টাং টুং টাং আর শ্রোতাদের শ্রবণে যেন ঘুমের আমেজ বিশ্রামের নেশা জাগিয়ে তোলে।

মন-ব্যাকুল-করা এ গোধূলি লগ্নে সবাই গৃহমুখী। তাদের ঘণ্টারব মিলিয়ে যেতে না যেতেই বেজে ওঠে মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা। দূর দূরান্তরে ভেসে যায় সে শব্দ-তরঙ্গ। বন্দনা মুখর করে তোলে চারিধার। মানুষের জীবনে একটি দিনের সমাপ্তি লিখিত হয় মহাকালের রোজনামচায়।

ফাল্গুনের এই ত সবে সুরু। বনবনান্তে পাতা ঝরানোর কান্না শেষ হয়ে গেছে। ডালে ডালে সবে জেগেছে কচি-পাতার মাতন। চৌধুরী সাহেবের ঘুম আসছিল না; বাংলো ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি রাবি নদীর বান্ধএর বুকে পর্যবেক্ষণের ইচ্ছায়। সবে এসেছেন তিনি রামচৌতরার এ 'সিধনাই' বান্ধে। নদীর এ মৌন মহিমা তাঁকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির বুকে কে যেন এক হাল্কা কুয়াশার মায়াঞ্চল পেতে রেখেছে।

অভিভূত হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছেন তিনি রাম-চৌতরার দিকে—জনপদ যা কিছু সবই লছমন চৌতরায়। রামচৌতরায় শুধু রামজীর মন্দির। সাধু-সন্ত ভক্তজনের ভীড় সেখানে। পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর অন্যতমা বা কনিষ্ঠতমা বলতে পারা যায় এই রাবি নদী। পাঞ্জাবের চারটি প্রধানতম সহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগরী লাহোর আর এদের মধ্যে অধুনা ক্ষুদ্রতম হলেও প্রাচীনতম মুলতানের এইটিই একমাত্র নদী। সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম ধ্বংস-নগরী "হরপ্পা" এইখানেই রাবীর কাছে মণ্টগোমারীতে। প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার জয়ধ্বজা উড়িয়ে ছিল সিন্ধু প্রদেশের Lar-ka-na সহরের "মহেঞ্জোদারোর" সঙ্গেই এই বিলুপ্ত নগরী "হরপ্পা" সগৌরবে—যার সময় কাল ৩৫০০—২৭৫০ বি. সি. ধরা হয়।

আমাদের আজকের ইতিকথা সে লুপ্ত নগরী নিয়ে নয়। আজকের ইতিকথা আমাদের রামচৌতরার ঘাটের কথা, এই জনপদের কথা। সুখ দুঃখ বিজড়িত কয়েকটি মানুষের কথা। এই ইরাবতী বা রাবির বুকে সিধনাই বা সোজা নদী বান্ধ-এর কথা।

এখান থেকে সাত মাইল উজানে আছে সীতাদেবীর মন্দির। নদী প্রকৃতির কোন্ খেয়ালে কে জানে এই সাতমাইল একেবারেই সোজা। মনে হয় মানুষের সযত্নে কাটা একটি বৃহৎ Canal বা নহর। কিংবদন্তী বলে—একদা বনযাত্রায় রামচন্দ্র এখানের প্রাকৃতিক শোভায় বিমোহিত হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিলেন। সম্বিত ফিরে দেখলেন সীতা নেই পাশে, উৎকণ্ঠিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে শুধালেন। লক্ষ্মণের কিন্তু ঠিক দৃষ্টি ছিল। পথশ্রান্ত সীতাদেবী ইরাবতীর এ স্নিগ্ধ মহিমায় মুগ্ধ হয়ে নদীতীরে বসে পড়েছিলেন বিশ্রামের ইচ্ছায়। উভয় সঙ্কট লক্ষ্মণের। রাম অনুগামী হয়েও লক্ষ্মণ তাই সীতার প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের জাগ্রত দৃষ্টি রেখেছিলেন। রামচন্দ্রকে সীতা কোথায় দেখানর জন্য তিনি নদীর উজানে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলেন। রামচন্দ্রের সীতাদর্শন সুবিধার জন্য নদী এই দীর্ঘপথ আনুগত্যে সোজা হয়ে যায়। প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলেন রাম—নদীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই থেকে এখানে নদীর জল আর কমে না, সদাই পরিপূর্ণ। সীতাদেবীর বিশ্রাম স্থানটিকে স্মরণ-ধন্য করে আজও বিরাজিত সীতাদেবীর মন্দির বা সীতাকুণ্ড—আজও পরম রম্য সে স্থান। রামচৌতরার মন্দিরে রাম সীতা লক্ষ্মণ বিরাজিত—লক্ষ্মণ চৌতরায়ও তাই কিন্তু সীতাকুণ্ডের সীতাদেবী আজও একাকিনী—এটি সে মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট যা আজও ভক্তজনের মনে সেই পুরাকাহিনীর, সেই কিংবদন্তীর সাক্ষ্য দেয়।

নদীর বাঁধের নীচের জল কমতে কমতে ফাল্গুনের শেষাশেষি প্রায় শেষ হয়ে যাবে। বাঁধের নীচের নদী এখন শুকনো, চড়া পড়ে রয়েছে। বরফ গলতে আরম্ভ হবে এর পর পাহাড়ে পাহাড়ে। চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে ঢল নামবে নদীতে। কখন যে উদ্দাম গতিতে এসে পড়বে সে জলস্রোত কে জানে! এখানের নদীগুলির এই ধারা। চৈত্রের শেষ থেকেই তাই একটি একটি করে পিন খুলে খুলে তাঁরা বান্ধের ওপরের জলভার কমাতে থাকবেন। বড় সাবধানে থাকতে হয় এই ক'টা মাস। এখন থেকেই তাঁদের দৃষ্টি সদা-জাগ্রত সজাগ। নদীর এখানে-ওখানে চড়া পড়লেও ব্রীজের নীচে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত মাঝনদীর জল এখনও এঁকে-বেঁকে ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলেছে। শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ তার অকৃপণ দানে চারিধার ছেয়ে দিয়েছে। শাদা আধভেজা বালির চড়া; আবছা অন্ধকার তীরভূমির গাছপালা দূরের লক্ষ্মণ-চৌতরার জনপদ মিলে-মিশে এক অপূর্ব মায়ালোক রচনা করেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দিগন্ত-বিস্তারি তারাছাওয়া নীলাকাশের পানে চেয়ে চৌধুরী-মশাই ভাবছিলেন, একেই কি বলে অমল ধবল জ্যোৎস্না! যেন রজত ধারায় বিশ্বভুবনকে ভরে দিচ্ছে। ছায়াছবির মতই প্রশস্ত ঘাটের বুকে রামজীর মন্দিরটি কি অপূর্বই না দেখাচ্ছে! পায়ে পায়ে ব্রীজের মধ্যখানে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। নদীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে তদ্গত হয়ে গেছেন। আজ কয়দিন হ'ল এসেছেন এখানে—দোরের পাশেই প্রকৃতি এমন রূপসম্ভার, এমন মায়াঞ্চল বিস্তার করে রেখেছে—কই তবু ত তিনি তাকিয়ে দেখেন নি! মানুষ বুঝি এমনই অন্যমনা যা পায় তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে নিতে জানে না! যা পায় না তারই জন্য তার নিত্যদিন হাহাকার। ঢেউয়ের নাচনে চাঁদের আলোয় যেন সহস্র জোনাকির ঝিকিমিকি। মুগ্ধ বিস্ময়ে তেমনই তদ্গত ভাবেই কখন এপারের বট অশ্বত্থের ছায়াচ্ছন্ন শ্মশানঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতেও পারেন নি। এই এখানের স্থানীয় শ্মশান। এত স্থান ছেড়ে নদীর এ জায়গাটিকে শ্মশান হিসাবে বেছে নেওয়ার অর্থ আছে বৈ কি! এ জায়গাটি ব্রীজের খুবই নিকট হওয়ায় গভীরতার দরুণ বারো মাসই জল পায় মানুষ। বিরল জনপদ। মৃত্যু-সংখ্যাও কম। অমন নদী-কিনারে যে যেখানে খুসী আপনজনকে দাহ করে চলে যেতে পারে—নিষেধও নেই

বাধাই বা দিচ্ছে কে, তবে রামচৌতরার জন্যই এখানের স্থান-মাহাত্ম্য। হিন্দুর মনে এ পরম পুণ্য স্থান। অনেকেই তাই ইচ্ছা জানিয়ে যান এ পরম স্থানে শেষ শয্যা নিতে। মাঝে-মধ্যে দৈবাৎ কেউ আসে—রামচৌতরার ঘাটে তাকে শেষ স্নান করিয়ে রামজীর আশীর্বাদ দিয়ে এখানে এনে শেষ গতি করে দেওয়া হয়। কেউ বা অস্থি এই রামচৌতরার ঘাটে এসেই বিসর্জন দিয়ে যান, কেউ বা তুলে নিয়ে যান নতুন মৃৎপাত্রে তুলসী-মঞ্জরী দিয়ে হিন্দুর পরম তীর্থ হরিদ্বারের হরকি পায়েরী কুণ্ডে বিসর্জনের ইচ্ছায়। যাদৃশী ভাবনা যস্য—মানুষের শ্রদ্ধাতেই যে দেবতার প্রকাশ!

সেই রাতের স্তব্ধতায় অকস্মাৎ চৌধুরীকে সচকিত করে দূরে-কাছে শেয়ালেরা ডেকে উঠল রাতের প্রথম প্রহর জানিয়ে। হঠাৎ তাঁকে চমকে দিয়ে জটাজুটধারী এক বিরাটকায় সন্ন্যাসী প্রেতাত্মার মতই অন্ধকার গাছের তলা থেকে বেরিয়ে শুকনো বালুতে ছায়া ফেলে ফেলে হন হন করে নদীর দিকে নেমে চলে গেল। আরও বিস্ময়ে শিহরিত কলেবরে পরপারের দিকে চেয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই নিঃসঙ্গ নিশীথ রাতে, কি এক অব্যক্ত শিহরণ সারা শরীর কাঁপিয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে যেন নীচে নেমে যাচ্ছে মনে হ'ল। তিনি কি সাহস হারিয়ে ফেলছেন? এই বিকট দর্শন লোকটি কি কোনও তমিস্র লোকের অধিপতি?—নিশাচর যত জীব নিয়ে তার নৈশ বিহারে মেতেছে? ঐ বিকটকায় জীবগুলো কি তারই চেলা-চামুণ্ডা?—রাতের এ তামসী প্রহরে যারা আপন তামস তপস্যায় জেগে আছে! একা শূন্য শ্মশানে শ্মশান জাগিয়ে বসে কি করছিল লোকটা?

হঠাৎ তাঁর মাথার ওপর ডানা ঝাড়া দিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা নিশাচর পাখী। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখলেন লম্বানাক ঘড়িয়ালগুলো মানুষের দূরাগত পদশব্দে সহজাত সাবধানতায় সচকিত হয়ে তীর ছেড়ে যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুর মতই একটার পর একটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙ্গে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আওয়াজ উঠছে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্। বহুদূর পর্যন্ত শূন্যতার ওপর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে শব্দ-তরঙ্গ। রাত্রির নির্জনতায় নির্ভয়ে তারা ডাঙ্গায় বা বালুর চড়ায় উঠেছিল চাঁদের আলোয়—বুঝিবা চাঁদের আলো উপভোগে। হয়ত ঐ কুৎসিত দেহের অভ্যন্তরে তাদেরও আছে এক কমনীয় কবি মন। এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজের মনের দুর্বলতায় হেসে উঠলেন তিনি। মুগ্ধ হয়ে গেলেন ঘড়িয়ালগুলোর সহজাত সাবধানতা দেখে। কিন্তু এতদূর থেকে তাঁদের পদশব্দ ওদের কাছে পৌঁছাল কেমন করে—এও এক বিস্ময় হয়ে রইল তাঁর মনে।

অন্যমনা তিনি ফেরার দিকে পা না বাড়িয়ে, এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে। রাতের সেই নিঃসঙ্গী প্রহরে একা রামচৌতরার নির্জন ধাপে গিয়ে বসলেন তিনি। সেই অনন্ত শূন্যতার নির্বাক প্রশান্তির মাঝেও তিনি চমকে দেখলেন ঘাট শূন্য নয়—ঘাটের অপর প্রান্তে ধ্যানমৌন হরিদাস বাবাজী বসে আছেন, বাহ্যজ্ঞানহারা আত্মস্থ তিনি ধ্যানলোকে। আধো আলো আধো ছায়ায় সেই মৌনের মুখে তিনি যেন পাঠ করলেন ভারত আত্মার শাশ্বত বাণী—ক্ষমা, মৈত্রী, প্রেম। করুণার জাগ্রত মূর্তি দর্শন করে আজ এই রাতের পরম লগ্নে তিনি ধন্য হলেন।

ভোগীর কাছে যে নিশা সুপ্তির তমিস্রায় তমসার রাজ্য, যোগীর কাছে তাই একান্ত ধ্যান মুহূর্ত। পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন যেন এ মহাসংযমী এই পরম লগ্নটিতে। নতুন চোখে আজ তাঁকে দর্শন করলেন চৌধুরীমশাই। মনে মনে প্রণাম করলেন। দিনের আলোয় সর্বজনের কলকোলাহলের মাঝখানে দিন দুই আগে এই মন্দিরে এসে ক্ষণিকের জন্য তিনি এঁর যে রূপ দেখেছিলেন সে রূপ আর পাঁচটা সাধু-সন্তেরই রূপ, কিন্তু আজ এই বিজন মুহূর্তে তিনি যাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য পেলেন ভাবরাজ্যে তিনি অন্য মানুষ। আজ এই বিশেষ লগ্নে তিনি যেন তাঁর রামজীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। বহুক্ষণ পর ধ্যানভঙ্গ হ'ল তাঁর। ধ্যানভঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি 'জয় রাম! জয় রাম!' বলতে বলতে। ফেরার পথে পা দিয়েই চমকে উঠলেন তিনি এক আগন্তুককে দেখে এত রাতে। দৃষ্টি তাঁর ক্ষীণ—ধ্যান করে করে চোখের দৃষ্টি আর স্বাভাবিক নেই। এর জন্য তাঁর বড় ক্ষোভ আছে বলেও মনে হয় না। কতবার কত ভক্তজনে অনুনয় করেছে তাঁকে মোড়ায় চক্ষু চিকিৎসালয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে। রাজি হন নি তিনি এ রামজীর মন্দির ছাড়তে হবে বলে। হেসে বলেছেন "এই আমার ভাল। তোদের বেশী দেখলে রামজীকে যে কম দেখতে পাব। এখন যে আমি আমার মানসচক্ষে সব সময়ই রামজীকে দেখছি!" বৃহৎ এক যষ্টি তাঁর নিত্য সঙ্গী। ঘাটের সামনেই তাঁর ছোট্ট কুঠরী। আশে পাশে আছে সাঙ্গ-পাঙ্গরা। এমন একান্ত মুহূর্ত কি সব সময় পাওয়া যায়। তাই বড় তৃপ্ত হয়ে ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু এমন অসময়ে এক জীবন্ত মানুষের সান্নিধ্য

তাঁকে সচকিত করে তুললে। প্রশ্ন করলেন তিনি—"কে? কে তুমি?" পরিচয় দিলেন চৌধুরী—চমকে সপ্রশ্ন-মনে কাছে এগিয়ে এলেন বাবাজী—"জয় রামজীকি! এ অসময়ে তুমি এখানে কেন সাহেব?" কণ্ঠে তাঁর বিস্ময়, কিছুটা বা উদ্বেগ। নদীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াবার এ ত মোটেই সমীচীন সময় নয়—নতুন আগন্তুকের পক্ষে ত একেবারেই নয়! কুমীর আছে, সাপ বিছে আছে, নানা বন্য জন্তু আছে সাবধান হওয়ায় দোষ কি? গৃহী সংসারী মানুষ তাঁর কি এমন বেহিসাবী হ'লে চলে!"

কাছে এসে বসলেন দু'জনে পাশাপাশি—নানা আলাপচারী হ'ল। শুব্ধ ঘাট যেন হরিদাস বাবাজীর মুখে মুখর হয়ে উঠল। "রামচৌতরার ঘাটে দূর দূরান্তর থেকে আসে ভক্তজন। চূড়াকরণের জন্য, পৈতের জন্য। পিণ্ডদানের জন্য, ভরা নদীতে শেষ অস্থি বিসর্জনের জন্য। বিবাহের পূর্বে রামজীর আশীর্বাদ ও পুতস্নান করাতে। আবার কপাল মন্দ হ'লে এই ঘাটেই এসে জোটে বৈধব্য সাজে সাজতে। নানাজন ছুটে আসে নানা ইচ্ছা নিয়ে এই ইচ্ছাময়ের চরণে। মানত মনস্কামনা নিয়ে। পথের মানুষের কলগুঞ্জনে ভরে ওঠে এ ঘাট। আবার কত মানুষ ছুটে আসে এইখানেই জীবনের শেষ ক'টা দিন রামসেবায় অতিবাহিত করে মরণে সেই পরমতমের সঙ্গে লীন হয়ে যাবার দুরাশায়!

এই নদীর স্রোত যদি কোনও দিন মুখর হয়—কত বিগত ইতিহাসের কত রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার সন্ধান পাবে মানুষ। মানুষের জীবনধারার কত বিভিন্ন স্রোত এল গেল। অনার্যদের সুউচ্চ সিন্ধু-সভ্যতার স্রোতধারায় আর্য সভ্যতার ধারা এই পাঞ্জাবের বুকেই প্রথম সেই কোন বৈদিক যুগে এসে মিলেছিল—ঘটেছিল হিন্দু সভ্যতার প্রথম উন্মেষ। অরণ্যে অরণ্যে নদী-কিনারে আর্য ঋষিরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের আশ্রম রচনা করে। প্রকৃতির নব নব রূপের পূজারী তাঁরা। তাঁরাই প্রথম জ্বেলেছিলেন পূত গার্হপত্য অগ্নি। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম তাঁদের কাছে উপাস্য হয়ে উঠেছিল যোগ্য কারণেই। তারপর এল গ্রীকরা, এল শক, হুন পার্থিয়ান, পাঠান, মোগল—এই ভারতের বুকে একে একে। বিভিন্ন সভ্যতার শিক্ষায়, আচার-আচরণে মিলেমিশে আপন স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রেখে সব সভ্যতার দানকে গ্রহণ করে আপন রংয়ে রাঙ্গিয়ে নিয়ে একটি একটি করে পাপড়ি মেলে আজ ভারতের হৃদয় কমল সহস্র দলে বিকশিত। আমার এই সর্বংসহা মাটিমা যে রাজ রাজ্যেশ্বরী। এই ভারতের মহাতীর্থ থেকেই একদিন সাম গান উঠেছিল—উঠেছিল সাম্য মৈত্রী প্রেমের মহাবাণী। সে বাণী আজও ভারতের দিকে দিকে স্পন্দিত হচ্ছে—শ্রুতিবানেরাই তা শুনতে পায়। সুন্দরকে দেখার জন্য দৃষ্টি চাই—দৃষ্টিবান ছাড়া সেই অপ-রূপের রূপ কি দেখা যায়। আমার প্রাণের ঠাকুর মহাপ্রভু যে এই অপরূপের প্রেমে পাগল হয়েই মহা-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে রূপে অরূপে বিলীন হয়ে গেছেন। বনের হরিতে নব কিশলয়ের শ্যামলিমায়, দিকে দিকে জেগে রয়েছেন আমার নব-দুর্বাদল শ্যাম রাম! বিমোহিত কথকঠাকুর বলে চলেছেন বাহ্যজ্ঞানহারা। দুই চোখে ঝরে পড়ছে তাঁর আনন্দাশ্রু—প্রেমাশ্রু। শুব্ধ মুগ্ধ হয়ে বসে আছেন শ্রোতা। আজ এই বিশেষ মুহূর্তে বিশ্বভুবন তাঁর কাছেও বুঝিবা লুপ্ত হয়ে গেছে—মহাশূন্যে আজ কি তিনিও আলিঙ্গন করতে চাইছেন সেই নবদুর্বাদল শ্যামরামের রাতুল চরণ?—কে জানে!

বজ্রের আলোতে

সীতা দেবী

মহানগরীর বুকের উপর দিয়ে খণ্ড প্রলয় বয়ে গিয়েছে। এখনও-রাস্তা ঘাটে সহজে মানুষ বেরোয় না, চারিদিক আবর্জ্জনায়, মৃতদেহে, ভাঙ্গাচোরা গাড়ি, দগ্ধ আসবাব-পত্রে ভরে আছে। দোকানপাট বেশীর ভাগ বন্ধ, অনেক দোকানঘরে লুটপাট হয়ে গেছে, সেগুলোর ভাঙ্গা দরজা-জানলা হাঁ ক'রে খোলা, হাওয়ায় বিকট শব্দ ক'রে দুলছে। গৃহস্থদের ঘরেও দরজা-জানলা বন্ধ, কোনমতে আলো-হাওয়া যাওয়ার পথ করে দেবার জন্য এক-আধটা কখনও খোলা হচ্ছে, আবার ভয়ে প'ড়েই যেন তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে। সন্ধ্যার পর রাস্তায় আলো জ্বলছে না, অনেক রাস্তায় দু'-একটা জ্বলছে, গলিগুলি সবই অন্ধকার। মানুষে যেন আঁধারে মুখ লুকিয়ে থাকতেই চাইছে, বাইরের জগতের ভয়াবহ দৃশ্য সে চোখ মেলে দেখতে চায় না। ভীষণ আঘাতে মৃতপ্রায় নগরী যেন নিঃশ্বাসও ভাল করে টানতে পারছে না, সে একেবারেই মৃত্যুসাগরে তলিয়ে যাবে, না আবার বেঁচে উঠে মাথা তুলে দাঁড়াবে তা এখনও স্থির হয় নি।

বালীগঞ্জের একটা দোতলা বাড়ীর অন্ধকার শোবার ঘরে একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে বিছানায় পড়ে এপাশ-ওপাশ করছে! তার মুখ ভয়ানক শুকনো, কে যেন একরাশ কালি মেড়ে দিয়ে গিয়েছে, চোখ ব'সে গেছে, খোলা চুল রুক্ষ হাওয়ায় উড়ছে। কাপড়-চোপড় ময়লা শ্রীহীন, অগোছাল, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, ভয়চকিত। যেন দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে সবেমাত্র জেগে উঠেছে।

সে সারাদিনই শুয়ে আছে। বাড়ীর মানুষগুলি এখনও ভয়-ব্যাকুল, শোকার্ত্ত। মাঝে মাঝে দু' একজন এসে মেয়েটিকে নাইতে খেতে অনুরোধ করে যাচ্ছে, তবে সে যে অনুরোধ রাখছে না তা দেখবার জন্যে আর দাঁড়াচ্ছে না।

একবাটি দুধ হাতে করে একজন প্রৌঢ়া মহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "ধীরা, দুধটুকু খেয়ে নাও। সারাদিন কিছু ত পেটে যায় নি।"

ধীরা বলল, "থাক মা, গিলতে পারব না গলায় লাগছে।"

মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, "এমন করলে বাঁচবে কি ক'রে মা?"

ধীরা বলল, "বেঁচে কি হবে মা?"

তার মা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "ভগবান না নিলে বাঁচতেই হবে। আগের জন্মের পাপ ছিল তোমার, তাই এ দুর্গতি হ'ল। কিন্তু এখনও আমরা বেঁচে রয়েছি। তুমি আমাদের মেয়ে, রক্ষা করতে পারি নি, কিন্তু ভাসিয়ে দেব না, লোকে যাই বলুক। ভাল ব্যবস্থা করব যতটা পারি। তুমি খাও একটু।"

ধীরা দুধের বাটিটা নিয়ে দু'চার ঢোক গিলল, তারপর আবার নামিয়ে রাখল। জিজ্ঞাসা করল, "বাবা কেমন আছেন?" তার মা বললেন, "খানিকটা ভাল, মাথার ঘাটা আস্তে আস্তে শুকচ্ছে।"

ধীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল 'আমরা কতদিন আর এ বাড়ীতে থাকব?"

মা বললেন, "হাঙ্গামা না চুকলে ত আমাদের পাড়ায় ফেরা যাবে না। তবু ভগবানের কৃপায় লুট পাট হয় নি আমাদের বাড়ীতে। পাশের বাড়ীর ওঁরা আগলে রেখেছেন। দু' চার জন আমাদের বাড়ীতে এসে রয়েছেন। কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল, কত লোক প্রাণ হারাল।"

ধীরা বলল, "এর চেয়ে আমি মরে গেলে ভাল হ'ত না মা?"

মা কিছু বলবার আগেই আর একজন মহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, "সে আর বলতে মা? তা কি আর করবে? অদৃষ্টে বাঁচা থাকলে আর কি করবে?"

ধীরার মা বললেন, "ছি, ঠাকুরঝি, ও এসব কথা এখন বল না।"

ঠাকুরঝি লজ্জিত হয়ে বললেন, "না, কি আর বলছি। তবে তোমার ত আর এই একটি নয়? আরও পাঁচটি আছে, তাদের মানুষ করতে হবে, বে-থা দিতে হবে।"

"সে যখন যা হয় দেখা যাবে, ধীরা তুমি একটু ঘুমোও। খাবেও না, ঘুমোবেও না, এতে শরীর

একেবারে ভেঙ্গে যাবে। চল ঠাকুরঝি আমরা যাই," ব'লে ননদিনীকে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এঁরা কলকাতার এক মুসলমান পাড়ায় থাকতেন। দাঙ্গার প্রথম দিনেই ধীরা গুণ্ডাদের দ্বারা অপহৃত হয়। পরদিন তাকে বালিগঞ্জের রাস্তায় প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় পাওয়া যায়। একদল হিন্দু ছেলে তাকে নিয়ে আসে, এবং বাপ-মায়ের সন্ধান করে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। অপহৃত সে যে রাত্রে হয়, সেই রাত্রে এক মুসলমান মহিলার সাহায্যে পাষণ্ডদের কবল থেকে সে বেরিয়ে পড়ে। কি করে জানি না, সে ভাল ক'রে এখনও বলতে পারে না, সে হেঁটে বালিগঞ্জের রাস্তায় এসে পড়ে। তারপর দু'তিন দিন তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রয়েছে। পরিবারসুদ্ধ সকলে পালিয়ে এসেছে মিলিটারি পুলিশের সাহায্যে। ধীরার বাবা মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। সকলকে প্রায় এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

একলা যখনই থাকে, সেই তিন-চারদিন আগের নারকীয় ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে ছায়াছবির মত নাচতে থাকে। এর পরেও সে বেঁচে আছে কেন? এরপর সে কতদিন বাঁচবে? এই ঘৃণিত জীবন নিয়ে সে কি করবে? মা তাকে ছাড়বেন না, আশ্বাস দেন, কিন্তু পরিবারের অন্যরা? আত্মীয় বন্ধুরা? কোথায় তার জায়গা হবে? কাদের মধ্যে সে থাকবে? কি করবে সে এই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে? আর তার মস্তিষ্কের ভিতর আগুনের রংএ এই যে বীভৎস চিত্র অঙ্কিত হয়ে গেল, এ কি কোনদিনও মুছবে, না চিরকাল এমনি জ্বলজ্বল করবে? সে কি কুষ্ঠরোগীর মত ঘৃণিত নিন্দিত হবে? মানুষ তাকে দেখলে চিরকালই মুখ ফেরাবে? কিন্তু কি তার অপরাধ?

আর একবার মা ফিরে এলেন ঘণ্টা খানিক পরে। ঘুমুতে পারছে না দেখে একটা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে ধীরা শুনল, কলকাতার অবস্থা এখন খানিকটা ভাল, দুই-চার দিনে স্বাভাবিক হবার সম্ভাবনা খানিকটা আছে। তাদের জিনিসপত্র কিছু কিছু পুরণো মুসলমান ড্রাইভার ছদ্মবেশে এসে দিয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয় নি বিশেষ কিছু। দারুণ পরিশ্রান্ত ছিল ধীরা, ওষুধটা পড়ায় কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠতে লাগল, কারা সিংহ গর্জ্জনের মত পাড়া কাঁপিয়ে হাঁক দিচ্ছে, "জয় হিন্দ," আবার দূরে পাল্টা চীৎকার শোনা যাচ্ছে "আল্লা হো আকবর"।

সকাল বেলাটা ভাল লাগল ধীরার কাছে। পরিষ্কার দিন, সহরের অবস্থা একটু ভালই বোধ হচ্ছে। রাস্তায় লোক চলাচলের দু' একটা গাড়ি ট্যাক্সি চলার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। বাড়ীর লোকদের প্রাণেও যেন একটু সাহস এসেছে, একটু সান্ত্বনা তারা কোথা থেকে পেয়েছে। পিসিমা বাজারে লোক পাঠাতে ব্যস্ত, পাশের বাড়ীর কার কাছে শুনেছেন, বাজারে আজ কিছু কিছু শাক তরকারি বিক্রী হচ্ছে। এ কদিন ছেলেমেয়েরা ডাল ভাত ছাড়া কিছু খেতে পায় নি। গোয়ালারা এ কদিন মারামারি করতেই ব্যস্ত ছিল, দুধ দিতে চাইছিল না, আজ বালতি ভর্ত্তি দুধ নিয়ে এসেছে। এ বাড়ীর কিছুটা সামনেই একটা খালি স্কুল বাড়ীতে আশ্রিত শিবির খোলা হয়েছে। দলে দলে ছেলেমেয়ে বালক-বালিকা লরীতে চড়ে আসছে। শিখরা প্রকাণ্ড বাঁশ আর লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তাদের পাহারা দিয়ে আনছে। গোয়ালারা চারিদিকে সতর্ক প্রহরীর মত ঘুরছে। তাদেরও হাতে বড় বড় লাঠি। বড় বড় বস্তায় করে চাল ডাল, তরিতরকারি আসছে এই আশ্রিত শিবিরের জন্য।

মা হঠাৎ বললেন, "চা খেয়ে নাও ধীরা, জুড়িয়ে যাচ্ছে যে?" ধীরার সমস্ত মন নিমগ্ন হয়েছিল সামনের দৃশ্যে। এই যে এত মেয়ে আসছে, এরা বেশীর ভাগই ত আসছে মুসলমান পাড়া থেকে। তার মত হতভাগিনী কতগুলো আছে এর মধ্যে? তারা কি ভাবছে, কি করছে? তার চেয়ে বেশী হতভাগিনীও অনেক থাকা সম্ভব এদের মধ্যে। যারা পিতা হারিয়েছে, পতি হারিয়েছে, পুত্র হারিয়েছে। যাদের নারীত্বকেও লাঞ্ছিত করে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে নর-পিশাচের দল। এরাও ত বেঁচে থাকবে? এদের জীবনকেও গড়ে তুলবে এরা নিজের চেষ্টায়। সে অত ভয় পাচ্ছে কেন? তার ত এখনও মা বাবা রয়েছেন। তাঁরাও ধীরাকে ভালবাসেন, তাকে ভেসে যেতে দেবেন না। তাদের পরিবার শিক্ষিত, অবস্থাও তাদের খারাপ নয়।

একরাত্রি ঘুমিয়ে তার মাথাটা একটু সুস্থ বোধ হচ্ছিল। নিজের শ্রীহীন মলিন চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। মায়ের কথামত উঠে গিয়ে সে চুলে তেল দিয়ে স্নান ক'রে এল। পরিষ্কার জামা-কাপড় প'রে চুল আঁচড়ে তার স্বাভাবিক চেহারাটা ক'দিন পরে যেন আয়নায় ফুটে উঠল। হাল্কা ধরনের গড়ন, মাথায় সাধারণ বাঙালী মেয়েদের চেয়ে যেন কিছু লম্বা। চোখ দুটি বড় সুন্দর, মুখের কাটটিও

ভাল। রং খুব ফর্সা নয়, তবে ফর্সাই। মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। মুখখানা নিখুঁত সুন্দর নয় কিন্তু লাবণ্যে ঢল ঢল করছে।

ছোট বোন নীরা বলল, "দিদি চুলে যা জট পড়িয়েছে, আঁচড়ে ঠিক করতে এক হপ্তা লাগবে।"

ধীরা বলল, "জট না ছাড়াতে পারলে কাঁচি দিয়ে কেটে দেব।"

নীরা বলল, "ই: বিধবা না হ'লে আবার বুঝি কেউ চুল কাটে?"

ধীরার বাবা আজ বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। মাথায় আজও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। চা খেতে টেবিলে এসে বসলেন। বললেন, "একটু বাইরে বেরতে পারলে ভাল হ'ত। অফিস, ব্যাঙ্ক এগুলো খুলেছে না কি কে জানে? টাকাকড়ি কিছুই কাছে নেই। তারপর ভাবছি কোন হিন্দু পাড়ায় বাড়ী দেখে উঠে যাব। ও বাড়ীতে আমি আর ফিরছি না।"

ধীরার মা বললেন, "বাড়ী কি আর অত চট করে পাওয়া যাবে?"

তাঁর স্বামী বললেন, "না হয় একটু দেরিই হবে। কিন্তু হোটেলে থাকতে হ'লেও ছেলেপিলে নিয়ে আমি ওখানে আর যাচ্ছি না। ও পাড়া যেন আমায় আর চোখে দেখতে না হয়।"

যাঁর বাড়ীতে এসেছেন তিনি ধীরার বাবার মামাতো বোন। তিনি চা ছাঁকতে ছাঁকতে বললেন, "হোটেলে যেতে হবে কোন্ দুঃখে? আমি কি তোমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি? যতদিন খুসি থাক। ঐ নেড়ে পাড়ায় আর যেতে হবে না।"

ধীরার মা বললেন, "কি ক'রে যে আবার সব গুছিয়ে তুলব তা ভেবে পাচ্ছি না। ছেলেমেয়েগুলোর পড়াশুনা সব শিকেয় উঠল। কবে বা ইস্কুল কলেজ খুলবে আর কবে বা ওরা পড়তে যাবে।"

আবার ভারি ভারি লরি আসার শব্দে তাদের মনটা সেইদিকে চলে গেল। আরও কত লোক এসেছে। তাদের পাড়ার চেনা লোকও যেন দু'চারজন এসেছে মনে হচ্ছে। নীরা ছুটে গেল দেখে আসবার জন্য। বাড়ীর চাকর এই সময় সামান্য কিছু তরি-তরকারি নিয়ে বাজার থেকে ফিরে আসায়, গৃহিণীও সেইদিকে প্রস্থান করলেন।

ধীরা বসে বসে ঝিমচ্ছে। তার দেহ একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে, সে বিশ্রাম চায়। মন আশ্রয় চায়, সান্ত্বনা চায়। কে দেবে সে সান্ত্বনা? বড়দের সঙ্গে কথা বলতেই তার মন চায় না। সভয়ে কেমন যেন পিছিয়ে আসছে। কে কি বলে বসবে কে জানে? শুধু নিজের বাড়ীর ক'জন লোক হ'লে তার এত খারাপ হয়ত লাগত না, কিন্তু এ যে পরের বাড়ী? এরা কি দৃষ্টিতে ধীরাকে দেখছে তা কে জানে? ধীরা সকলের দৃষ্টির মধ্যেই যেন ঘৃণা দেখতে পাচ্ছে। সে অস্পৃশ্য, তার ছোঁওয়া যেন কারও গায়ে না লাগে, তার ছায়া যেন কারও উপরে না পড়ে। অথচ কি সে করেছে? অন্যের যা অপরাধ তার জন্যে ধীরার কেন শাস্তি হচ্ছে?

অন্যদের সঙ্গে খেতে বসতে সে পারল না। তাকে হয়ত মনে মনে সবাই ঘৃণা করছে। তার মা তার ভাত ঘরে এনে দিয়ে গেলেন। সে খেতে পারল না। খানিক নাড়াচাড়া ক'রে থালাটা সরিয়ে রেখে দিল। তারপর পরিশ্রান্ত দেহে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যা হবার আগে আর উঠল না। মাও চাইছিলেন সে ঘুমিয়ে থাক, তাকে আর ডাকলেন না।

বাড়ী লোকে ঠাসা। কলকাতার বাড়ীতে সর্ব্বত্রই জায়গা যতখানি, মানুষ তার চেয়ে বেশী। তার উপর ধীরারা পাঁচ-ছয়জন এসে পড়েছে। ঘরে ঘরে ঢালা বিছানা ক'রে লোক শুয়ে পড়ছে। বিছানার অভাব পড়ছে, পরিধেয় কাপড়ের অভাব পড়ছে। ধীরাদের খানিক খানিক জিনিস এসে পড়েছে, তাই তাদের তত অসুবিধা নেই। কিন্তু একলা দু'দণ্ড কোথাও বসবার জো নেই, সর্ব্বত্র মানুষ, মানুষের ঘাড়ে ঘাড় ঠেকিয়ে যেন ব'সে আছে, দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথা কাউকে গোপনে বলবার উপায় নেই।

ধীরার মা হাঁপিয়ে উঠছিলেন। তাঁর সংসারের উপরে যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেছে। এখন এই ভাঙা-চোরা অর্দ্ধদগ্ধ জিনিষ দিয়ে তাঁকে আবার পরিবার গ'ড়ে তুলতে হবে, সংসার সাজাতে হবে। কিন্তু একটা আলোচনা করবার উপায় নেই, একটা পরামর্শ করবার জো নেই। চারদিকে ভীড়, চারদিকে উগ্র অশোভন কৌতূহল।

ধীরাকে নিয়ে মহা বিপদ। তার উপর যে নারকীয় অত্যাচার হয়ে গেল, এর ফলে সে ত অর্দ্ধমৃত হয়ে রয়েছে। কিন্তু সে ছেলেমানুষ, এখনও বুঝতে পারছে না ভাগ্যে তার আরো কত যন্ত্রণা থাকতে পারে। এখন শুধু মানুষের অশোভন কৌতূহল থেকে সে নিষ্কৃতি চায়। তার জীবন-পথের প্রথমেই এই যে কলঙ্কের বোঝা তার মাথায় সংসার চাপিয়ে দিল, এ নিয়ে সে কতদূর যেতে পারবে? পদে পদে তার কত চোরাবালি দেখা দেবে,

কত গুপ্ত শত্রু দেখা দেবে। এসব একদিনের ব্যাপার নয়। কি করবেন তিনি এই দানব-বিধ্বস্ত কুসুম কলিকাকে নিয়ে? কি করে বাঁচাবেন?

খেতে ব'সে স্বামীকে বললেন, "যত টাকা লাগুক, ছোটখাট একটা থাকার জায়গা শীগগির ঠিক কর। নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

স্বামী বললেন, চেষ্টা ত কর'ছ। তবে ভাল পাড়ার বাড়ীগুলির ভাড়া এখন চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এই ত মুস্কিল।"

স্ত্রী বললেন, "যাই চাক, তাই দেব। মেয়ের মুখের দিকে আমি আর চাইতে পারছি না। ওকে নিয়ে আমি কোথাও লুকোতে চাই চোখের উপর দেখছি মেয়েটা তিল তিল করে মরতে বসেছে।"

তাঁর স্বামী ম্লানমুখে চুপ ক'রে রইলেন। আবার একপাল লোক এসে ঘরে ঢুকল। কেউ দেখা করতে এসেছে, কেউ দেখতে এসেছে। কেউ বাড়ীর খবর এনেছে, কেউ শহরের খবর এনেছে। কেউ সাহায্যার্থে জিনিষপত্র এনেছে।

কলকাতা আস্তে আস্তে স্বাভাবিকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তবে এখনও মানুষের মনে দারুণ ভয়। কেউ সহজে বাড়ীর থেকে বেরোতে চায় না। গাড়ি ট্যাক্সি একবেলা রাস্তায় দেখা যায়, বিকেলের দিকে আর বেরোয় না। বাজার সকালে বসে, তার পরই বন্ধ হয়ে যায়, দোকান-পাটেরও সেই অবস্থা। ডাক্তারে রোগী দেখতে স্বদ্ধ বাড়ার বাইরে যেতে চায় না। রাস্তাঘাট এখনও আবর্জ্জনায় ভর্ত্তি। আলো জলে না এখনও সব জায়গায়।

তবে মানুষে ভয়ের তাড়ায় ঘর ফেলে, সর্ব্বস্ব ফেলে যে-সব জায়গা থেকে পালিয়েছিল, আবার আস্তে আস্তে সেইসব জায়গায় ফিরে যাবার চেষ্টা করছে। ক্রমাগত খবর নিচ্ছে সে-সব জায়গার অবস্থা কেমন, নির্ভয়ে সেখানে ফিরে যাওয়া যায় কি না কি তাদের আছে, কি তারা একেবারে হারিয়েছে। দু' চার বাড়ীতে মানুষ সাহসে ভর ক'রে আবার ফিরে গেছে। স্ত্রী কন্যা নিয়ে যেতে হয়ত সাহস পায় নি, পুরুষরাই গিয়েছে।

ধীরাদের বাড়ীর অনেক জিনিষপত্রই এসে পড়েছে। এতে ঠাসাঠাসি আরো বেড়ে গিয়েছে। সব রকম জিনিষ • ম টি • ঢেলে রেখে দেওয়া যায় না? কাজেই দু'চারটে আলমারি ও বাক্স প্রভৃতি জোগাড় করতে হয়েছে। ধীরার মা-বাবা আরো যেন মুষড়ে পড়ছেন। সামনে পথ দেখতে পাচ্ছেন না। অন্য ছেলেমেয়ে দু'জন ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ধীরা আগেরই মত। সদ্য মূর্চ্ছাভঙ্গের পর মানুষের যে অবস্থা হয়, তার অবস্থাও সেইরকম। সামনের দিকে তাকাতে তার ভয় হয়, জীবনটা নিয়ে কি সে করবে তা যেন ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। এ রকম দুর্যোগ যাদের জীবনে আসে সে-সব মেয়েরা কি ক'রে বেঁচে থাকে? সে জানে না, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় না। অতীতের দিকে তাকালে পিশাচের মুখ ছাড়া সে কিছুই দেখতে পায় না। একমাত্র মায়ের সঙ্গে কথা বলতে তার ইচ্ছা করে, কিন্তু মাকে কোন সময়ই একলা পাওয়া যায় না। তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তিনি ধীরার কাছে আসেন বড় কম। কবে তারা এই হট্টগোলের মধ্যে থেকে নিজেদের নিরালা বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবে? সেখানে গেলে হয়ত সে বুঝতে পারবে কি তার করা উচিত। মাত্র সতেরো বৎসর বয়স তার, এখনও ত অনেক কাল তাকে বেঁচে থাকতে হবে। সে কি আর সাধারণ মানুষের মত পড়াশুনো করতে পারবে, সংসারে থাকতে পারবে? আর সংসার করা? তার সমস্ত শরীর শিউরে কেঁপে ওঠে। সে জানে সে চিরকালের মত অপবিত্র হয়ে গেছে, ঘৃণিত হয়ে গেছে, কোন পুরুষ তাকে কোনদিন স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারবে না।

শহরের অবস্থা আরো একটু ভালোর দিকে অগ্রসর হ'ল। বাড়ীর পুরুষরা এবার ভরসা ক'রে বাইরে বেরোতে আরম্ভ করলেন। ছেলেমেয়েরাও স্কুল-কলেজ খুলেছে কি না খোঁজ করতে লাগল। পাড়ার মধ্যে যাদের স্কুল তারা যাবার চেষ্টাও করতে লাগল। দোকানপাট খানিক খানিক খুলল। বাজারে জিনিষপত্র কিছু কিছু আসতে লাগল।

ধীরাদের জন্যে বাড়ী খোঁজা খুব পুরোদমে চলতে লাগল। ধীরার মা নিরাপদ পাড়ায় যে কোনোরকম বাড়ীতেই যেতে রাজী, এমনি মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাঁর অবস্থা। ধীরার বাবা অবশ্য অন্য দিকগুলিও দেখছিলেন। তিনি পুরুষ মানুষ এবং বাইরেও এখন যেতে পাচ্ছেন, কাজেই ঘরের মধ্যের ভীড় তাঁকে ততটা অতিষ্ঠ ক'রে তোলে নি।

অবশেষে বাড়ী একটা পাওয়া গেল চলনসই রকম। নিতান্ত ছোট নয়, চার-পাঁচখানা ঘর আছে। তবে ব্যবস্থাগুলো ভাল নয়। যা হোক বালীগঞ্জের মধ্যেই, কাজেই নিরাপদ, এবং আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীর কাছেই। সবাই গিয়ে বাড়ী দেখে এল, এবং কলি ফিরান, ঝাড়-

পোঁচ করা, জল ঢেলে ভাল ক'রে ধোওয়া-মোছার ধুম পড়ে গেল। জিনিসপত্র পুরানো বাড়ী থেকে যতদূর উদ্ধার করা গেল, সব এনে নূতন বাড়ীতেই তোলা হতে লাগল। ঝি চাকর সব ক'জনই প্রায় পালিয়ে গিয়েছিল। ধীরার মা নানা কারণে পুরণো লোকদের আর চাইছিলেন না, তিনি আবার নূতন লোকই ঠিক করতে লাগলেন।

অবশেষে তারা নিজেদের নূতন বাড়ীতেই এসে উঠল। প্রথম দিন গেল বড় অসুবিধার মধ্যে, ঠিক সময় রান্না খাওয়া কিছুই হ'ল না। খাট-পালঙ্ক কিছুই সময়মত পাতা হ'ল না ব'লে সবাই মাটিতে বিছানা ক'রেই শুয়ে পড়ল। চারদিকে ধুলো জলকাদা। জিনিষপত্র সব অগোছালভাবে চারিদিকে ছড়ান।

পরদিন থেকে বাড়ী গোছান আরম্ভ হ'ল। ধীরা মা ও বোনের সঙ্গে সমানে কাজ করতে লাগল। কাজের মধ্যে একটু যেন সান্ত্বনা আর আশ্রয় পেল। অভ্যস্ত কাজের মধ্যে প'ড়ে নিজের আগেকার স্বাভাবিক জীবনকে একটু যেন ফিরে পেল। তার পড়ার বইগুলি, অন্ত বইগুলি সব বেশীর ভাগই পাওয়া গেছে, সেগুলি গুছিয়ে রাখল। নিজের কাপড়-চোপড়, নীরার কাপড়-চোপড় সব নিজেদের আলমারিতে গুছিয়ে রাখতে অনেকখানি সময় চলে গেল। তারপর বসবার ঘর ঠিক করা, শোবার ঘর ঠিক করা। বাড়ীটা ক্রমে তাদের সেই আগেকার বাড়ীর চেহারা ধরল।

বেশ বড় একটা ছাদ আছে, বেড়ান যাবে দরকার মত। তবে প্রায় গায়ে গায়ে লাগান সব বাড়ী, লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি চারিদিক থেকে যেন গায়ে এসে লাগে। ধীরা কথা বলতে চায় না, কিন্তু প্রতিবেশিনীরা সকলেই কথা বলতে ব্যস্ত। কোথা থেকে তারা আসছে, কি তাদের ক্ষতি হয়েছে, কেউ মারা গেছে কি না, সব তাদের জানা দরকার। নীরা যথাসাধ্যি উত্তর দেয়, ধীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ধীরার মা এমন ভাবে চলাফেরা করেন যে তাঁকে কোনো কথা কেউ জিজ্ঞাসা করবার অবকাশই পায় না।

দিন কাটছে একটা একটা ক'রে। ধীরা যে কলেজে পড়ত, সেটা অনেক দূর, এখান থেকে যাওয়া-আসা করা যাবে না। এ পাড়ার কোনো কলেজে তাকে ভর্তি হতে হবে। অন্য ভাইবোনরা এরই মধ্যে যেতে আরম্ভ করেছে, স্কুলে কলেজে।

ধীরার কথা আত্মীয়-স্বজনে জানে, প্রতিবেশী যারা ছিল আগে তারাও কেউ কেউ জানে। কিন্তু ধীরার মনে হয় বিশ্বসংসারের সবাই যেন জানে। সবাই দৃষ্টিতে ঘৃণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তাকে বিদ্রূপ করছে।

বাড়ীতে সে খারাপ ব্যবহার কারো কাছে পায় না, পেলে হয়ত আর বাঁচত না। মা তাকে আগের চেয়েও আদর করেন। বাবার ব্যবহারে সে কোনো তফাৎ বুঝতে পারে না। ভাইবোনরা আগের মতই আছে। তবু ধীরার মনে সারাক্ষণ ভয় আর সংশয়। পৃথিবীতে সে যেন জোর ক'রে একটা জায়গা দখল ক'রে রয়েছে। এটা তার স্থান নয়।

(২)

ধীরাকে অন্য কলেজেই ভর্তি করে দেওয়া হ'ল। এখনও খুব বেশী মেয়ে কলেজে আসছে না। কাছাকাছির যারা তারাই আসে। ধীরা দেখে আরাম পেল যে চেনা মেয়ে এখানে কেউই নেই। নূতন মেয়েরা আস্তে আস্তে আলাপ করতে অগ্রসর হ'ল। যতটা বাঁচিয়ে পারে ধীরা তাদের কথার উত্তর দেয়। আগেকার ইতিহাস বিশেষ কিছু বলে না। কিন্তু এই নিরন্তর উদ্যত কৌতূহল তাকে বড় পীড়া দেয়।

ক্রমে মেয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ধীরা একদিন দেখল একটি মেয়ে এসেছে, যে তাদের আগের পাড়ায় কাছাকাছি থাকত। ঠিক চেনা মেয়ে নয়, কিন্তু এরা আগে তারা পরস্পরকে দেখেছে। ধীরার চোখে দিনের আলো যেন খানিকটা কালো হয়ে এল। হয়ত এই মেয়েটি সবই জানে, সবই শুনেছে। সে হয়ত অন্য মেয়েদের কাছে বলবে ধীরার ইতিহাস। তারপর কেউ কি আর ধীরার সঙ্গে কথা বলবে, তার সঙ্গে মিশবে? শরীর খারাপের ছুতো করে সে সেদিন ক্লাশ শেষ হবার অনেক আগেই বাড়ী চলে এল।

পরদিন রবিবার ছিল। ধীরা মাকে বলল, "মা, আজ একবার গঙ্গাস্নানে যাবে?"

তার মা বললেন, "আজ ত কোন স্নানের দিন নয় মা?"

ধীরা বলল, "না মা চল, সবাই যে বলে গঙ্গা স্নান করলে শরীর পবিত্র হয় মন পবিত্র হয়।

মা তার কথা রাখলেন। মায়ের সঙ্গে গিয়ে স্নান করে এল ধীরা। কিন্তু এতে কোন শান্তিই পেল না সে, কোন সান্ত্বনাই পেল না।

তাদের জীবনযাত্রা এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বাইরের থেকে কোন ক্ষতচিহ্ন এখন দেখা যায় না। কিন্তু ধীরার মনে অনির্বাণ আগুন জ্ব'লেই চলেছে।

সে ভুলতে পারে না। শরীর তার সুস্থ হয়ে আসছে, কোন মারাত্মক ক্ষতি সেখানে হয় নি, কিন্তু মনের ভিতর সব উলট-পালট হয়ে গেছে। পৃথিবীর চেহারা আর আগের মত নেই। মানুষের রূপও আর আগের মত নেই। সে সকলকে ভয় করে, সকলের কাছ থেকেই সে আঘাতের আশঙ্কা করে। তার সাহস কেন সব চ'লে গেল? আগে ত সে ভীরু ছিল না?

বেশী করে পড়াশুনোয় মন দিতে চেষ্টা করে। সব সময় পারে না। কলেজের পাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই তাদের বাড়ীতে বেশী নেই। কিছু আছে। রামায়ণ মহাভারত ত আছেই। সেইগুলি ক্রমাগত উল্টে পাল্টে দেখে। সীতার মত যে মেয়ে তাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ধীরাকে কেউ অগ্নিপরীক্ষা দেওয়াতে পারে না? না হয় সে পুড়ে ছাইই হয়ে যাবে। তারপর ত সে পবিত্র হবে, শুদ্ধ হবে?

আজকাল শহরের অবস্থা স্বাভাবিকই দেখায় বাইরের থেকে। সব জায়গায় অবশ্য সব লোক এখনও যায় না। তাদের আগেকার বাড়ীর বাড়ীওয়ালা নাকি ডাকাডাকি করছেন, ভাড়া আরও কমিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু এঁরা আর সেকথা কানেও নিচ্ছেন না। জন্ম মৃত্যু বিবাহ, কোন অবস্থাতেই বন্ধ থাকে না। এদিক্-ওদিক্ থেকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ আসে, ধীরার মা কোথাও যায় না, মেয়েদেরও যেতে দেন না। ছেলেরা গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে আসে।

মামাতো বোন একটির বিয়ের খবর পাওয়া গেল। সেখানে একেবারে না গেলে চলবে না, কথা উঠবে নানা রকম। গায়ে হলুদের দিন ধীরার মা একবার নীরাকে নিয়ে ঘুরে এলেন। বললেন, "এলাম ত কোনমতে ফিরে। কত কথাই যে লোকে জানতে চায়। মিথ্যে কথা বলে বলে প্রাণ গেল। আবার বিয়ের দিন যাবার জন্যে সবাইকে নিয়ে, জেদ ধরেছে ওরা। না গেলেই আরও বেশী ক'রে কথা ওঠে। সামনে দেখলে তবু তত কিছু বলে না। ঘণ্টা খানিকের জন্যে যেতে পারবি ধীরা?"

ধীরা মাথা নাড়ল। সে যেতে চায় না। মায়ের কাছ থেকে সরে গেল সে। খানিক পরে মা যখন একলা ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল, "মা, ছুরি দিয়ে কেটে আমার জীবন থেকে এই কলঙ্কটাকে তুলে দেওয়া যায় না? আমি কি মরার দিন পর্য্যন্ত এটা বয়ে নিয়ে বেড়াব? আমি নিজে ত কোন পাপ করি নি?"

মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন, ধীরার কথার কোন জবাব দিলো না।

রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর কথা হচ্ছিল ধীরাকে নিয়ে। ধীরার বাবা বলছিলেন, "এ মেয়ের যে কি ব্যবস্থা আমি করব ভবিষ্যতের জন্যে ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছি না। হিন্দু সমাজের লোক আমরা, মেয়ে বিয়ে ক'রে ঘর সংসার করছে, এছাড়া কিছু ভাবা আমাদের অভ্যাস নেই। বিলেতে হ'লে তারা এসব নিয়ে অত ভাবে না। যুদ্ধের সময় ও সব দেশে কি না হয়েছে। পড়লেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু এসব সমস্যার সেখানে সমাধান আছে। যাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, সে-সব মেয়েরা ভেসে যায় নি। সমাজ সংসারে আছে, বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছে। আমাদের এদিকে ত বিয়ে হবেই না মনে হয়। যদি বা কেউ টাকা-পয়সার লোভে করে, বেশী লোক জানাজানি হলেই মেয়ের উপর অত্যাচার করবে, হয়ত ত্যাগ করবে। সেই জন্যে ত এ লাইনে কিছু ভাবতেও ভয় পাই। হয়ত ভাল করতে গিয়ে মন্দই করে বসব। তবু মনে হয় এখন, যে, ধীরা খানিকটা ভুলতে পেরেছে।"

ধীরার মা বললেন, "ভোলে নি কিছুই, এর মধ্যে ভুলবেই বা কি ক'রে? তবু চুপচাপ আছে, পড়াশুনো করবার চেষ্টা করছে। বিয়ে অবশ্য যদি বাংলা দেশের বাইরে কোথাও দেওয়া যায় ত হ'তেও পারে। বাঙ্গালী অনেক জায়গায়ই আছে ত? আর বিয়ে যদি নাই হয় ত তাকে চাকরি-বাকরি ক'রে খেতে হবে। সেটাও কলকাতার বাইরে হলেই ভাল। এই ভাবেই মেয়ের মনকে এখন গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। নীরাও ত বড় হ'ল, তার বিয়ের কথা পাড়লেই এই সব কথা উঠবে। বড় মেয়ের কেন বিয়ে হয় নি, সবাই জিজ্ঞাসা করবে। আর ধীরা ত নীরার চেয়ে দেখতে অনেক ভাল, সবাই অবাকও হবে যে ওর বিয়ে কেন আমরা দিলাম না।"

তাঁর স্বামী বললেন, "এমন ব্যাপার যে কারও সঙ্গে পরামর্শও করা যায় না। দিন ত একটার পর একটা গড়িয়ে চলেছে, কোন প্ল্যানও করতে পারছি না, কিছু ভেবেও ঠিক করতে পারছি না।"

ধীরার মামাতো বোনের বিয়েতে একবার তাকে যেতেই হ'ল মায়ের কথায়। কি সব কথা উঠেছে সে বাড়ীতে, ধীরাকে চোখে দেখলে সে-সব গুজব কমতে পারে। কাজেই সাজসজ্জা করে তাকে মা ও বোনের সঙ্গে উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'তে হ'ল। ছেলেমানুষের

মন, থেকে থেকে সব ভুলে নিজের আগেকার জীবনে ফিরে যেতে চায়, উৎসব আনন্দে মেতে উঠ্‌তে চায়, অন্য বালিকাদের মতই। আবার কে যেন বুকের মধ্যে ছুঁচ্‌ ফুটিয়ে তাকে মনে পড়িয়ে দেয় যে সে অন্যদের মত নয়। অদৃষ্ট তার কপালে অদৃশ্য পঙ্কতিলক পরিয়ে দিয়েছে।

অনেক লোকই তার বিষয়ে কিছু জানে না, তারা তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই মিশল, কথা বল্‌ল, এক সঙ্গে খেতে বস্‌ল। আবার কেউ কেউ কেমন যেন দৃষ্টিতে তাকে দেখছে, আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখছে, পরস্পরের মধ্যে কি সব বলাবলি করছে! রাগে আর অভিমানে ধীরার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কোথায় তার অপরাধ? সে নিজে কি কিছু পাপ করেছে? এই প্রথম তার মনে একটা বিদ্রোহ মাথা তুলতে লাগল, একটা রাগের ভাব এল।

চেহারাটা খানিকটা সেরেছে। মাঝে দেখলে মনে হ'ত যেন সে ন' মাস ছ' মাস রোগভোগ করে উঠেছে। মুখের চোখের সেই উদ্‌ভ্রান্ত চকিত ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে।

কলেজের জীবনটা এখন নিতান্ত খারাপ লাগে না। দু'চারজন মেয়ের সঙ্গে ভাব হচ্ছে। পড়াশুনোর দিকে মনটা একটু একটু যাচ্ছে। তাকে করে খেতে হবে ত? মা-বাবা ত চিরকাল বেঁচে থাকবেন না? আর বাবা এতটা বড়লোক নয় যে তার চিরকালের খাবার পরবার ব্যবস্থা ক'রে যাবেন।

ধীরার বিয়ের কথা এখন সোজাসুজি ভাবা যায় না, কাজেই নীরার বিয়ের কথাই তাঁরা বেশী করে ভাবছেন। একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও যে এখন ঢের হয়। ছেলের বিয়ের জন্যে ভাবনা নেই, তার বিয়ে হয়েই যাবে। পুরুষ মানুষের বিয়ে হ'তে কোন অসুবিধা হয় না।

নীরাকে দেখতে এক বাড়ী থেকে ঘটকী এসে হাজির হ'ল। নীরাকে খানিক সাজগোজ করিয়ে রাখা হয়েছিল, ধীরা আটপৌরে কাপড় প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

স্ত্রীলোকটি যে সময়ে আসবে বলেছিল, কপালক্রমে তার চেয়ে কিছু আগেই এসে উপস্থিত হ'ল। ধীরাই পড়ল প্রথম তার সামনে। তাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে স্ত্রীলোকটি বল্‌ল, "তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

ধীরা বলল, "আপনি বসুন, আমি মাকে খবর দিচ্ছি।"

মা এলেন। খানিক পরে নীরাকেও ডেকে পাঠান হ'ল। তাকেও ঘটকী ভাল করে দেখে নিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ মা, বড় মেয়ের বিয়ে হয় নি এখনও?"

ধীরার মা তাড়াতাড়ি কথা চাপা দেবার জন্য বল্‌লেন, "ওর অন্য এক জায়গায় বিয়ের কথা হচ্ছে।"

ঘটকী যাবার জন্য উঠল, তারপর বল্‌ল, "যদি সেখানে না হয় মা, তবে আমাকে খবর দিও। আমি ভাল সম্বন্ধ ঠিক করে দেব, এ মেয়ে খাসা দেখতে।"

নীরা শুনে বলল, "দেখলে কাণ্ড! দিদি ওরকম রাস্তা আলো করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আমায় কেউ পছন্দ করবে না।"

দিদি বলল, "আমি ত জানি না ভাই যে ঘটকী আসছে, তা হলে ওখানে কখনও দাঁড়াতাম না। এবার থেকে সাবধান হব, যাতে কারো চোখ না পড়ে আমার ওপর। আমি ত বিয়ে করব না।"

নীরার সাংসারিক জ্ঞান খুব বেশী নয়, সে বলল, "কেন ভাই, বিয়ে ত বাংলা দেশের সব মেয়েতেই করে।"

নীরাকে যেদিন দেখতে এল, সেদিন বাড়ীর লোক ক'জন বাদে আত্মীয়স্বজন কেউই উপস্থিত রইল না। কাউকে খবর দেওয়া হয় নি, সব খুব গোপনে গোপনে হচ্ছে, পাছে শুনে কেউ ভাংচি দেয়! ধীরা নীরাকে চুল বেঁধে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিল, তারপর একেবারে ছাদে উঠে চুপ করে বসে রইল।

বরপক্ষের লোকেরা এল, জলখাবার খেল, নীরাকে দেখল, নানারকম প্রশ্ন করল, গান শুন্‌ল। সব কিছুতে নীরা কোনমতে উৎরে গেল, তবে খুব ভাল করে নয়। খবর দেওয়া হবে বলে অতঃপর সকলে প্রস্থান করল।

নীরার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "পছন্দ হয় নি বোধ হয়। ঘটকীটার কাছে শুনেছিলাম ওরা বেশ সুন্দর মেয়ে চেয়েছিল। আমার নীরাকে কি আর সুন্দর বলা যায়?"

দিন কয়েক বাদে সেই ঘটকী ঠাকুরুণই আবার এসে উপস্থিত হলেন। বরপক্ষের এ মেয়েকে তত পছন্দ হয় নি, তবে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কথা কইতে তাঁরা এখনও রাজী আছেন। সেদিকটা যদি খুব লোভনীয় হয়, তা হ'লে হয়ত বিয়ে হতেও পারে। তবে ওঁদের সুন্দরী বৌ আনারই ইচ্ছা, এরা যদি ধীরাকে দিতে রাজী থাকেন তা হ'লে আর দেরি না করেই শুভকার্য্য হয়ে যেতে পারে।

ধীরার বাবা তখন বাড়ী ছিলেন না। মা যে কি বলবেন ঠিকই করতে পারলেন না। পাত্রটি মন্দ নয়, যদি ধীরার সঙ্গে হয়ে যায় সম্বন্ধ স্থির, তা মন্দ কি? কিন্তু পথে যে মহাভয়। আগ্নেয়গিরির ধারে বাস তাঁদের, কখন যে যমের দুয়ার হাঁ করে খুলে যাবে কিছুর ঠিকানা নেই।

ভেবে-চিন্তে ঘটকীকে বললেন, "যে মেয়ে দেখালাম, তার বিষয়েই এখন কথা চলতে থাক বাছা। বড় মেয়ের বিষয় কিছুই ত ঠিক করে বলতে পারছি না, আর এক বাড়ীতেও কথাবার্ত্তা চলছে কি না?"

ঘটকী ত বিদায় হ'ল। ধীরা কোথা থেকে কি করে কথাবার্ত্তাগুলো শুনল, কে জানে? মা নিজের ঘরে কি একটা কাজ করছিলেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, "মা, একটা কথা শোন।"

মা বললেন, "কি কথা রে?"

"ঐ ঘটকীটাকে তুমি কি বলছিলে মা? তোমরা কি ভেবেছ যে আমার বিয়ে দেবে?"

মা বললেন, "যদি ভাল বরে বিয়ে হয়, ত ক্ষতিটা কি? তোর সম্বন্ধে তা হ'লে ত আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

ধীরা প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠল, "মা, কি বলছ তুমি? আমাকে কোন ছেলে কখনও বিয়ে করতে চাইবে না জেনে-শুনে। তোমরা কি সব লুকিয়ে আমার বিয়ে দিতে চাও? এ কি কখনও লুকনো থাকবে? যখন তারা জানতে পারবে, তখন আমার কি দশা হবে তা কখনও ভেবেছ? আর প্রতারণা আমি করতে পারব না মা। যে সুখের লোভে এই পাপ আমি করব, সে সুখ কখনও আমার হবে না। যে পাপ করি নি, তার শাস্তি ত আমি পাচ্ছিই, আরও বেশী শাস্তি আমার হোক্ এই কি তোমরা চাও?"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "ঠিকই বলেছিস্ মা, লোভে পড়ে অন্যায় করতেই যাচ্ছিলাম। থাক্, এবিষয়ে আর কথা পাড়ব না।"

ধীরা আবার ছাদের উপরে উঠে গেল। এক কোনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে লাগল। বিবাহ, স্বামীর ভালবাসা পাওয়া, সন্তানের মা হওয়া, সবই জানে সে। কিন্তু এই সুখ স্বর্গের দ্বার ত তার জন্যে চিরকালের মত বন্ধই হয়ে গেছে। কিন্তু কি অপরাধে? পাপ করেছে অন্য মানুষে, শাস্তি কেন সে পাবে? অনেকক্ষণ অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়িয়ে সে নেমে গেল। পড়াশুনো করবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই পারল না। মনটা তার অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। থেকে থেকে একটা রাগ গুমরে উঠতে লাগল তার মনে। কার বিরুদ্ধে? অদৃষ্টের বিরুদ্ধে? না ভগবানের বিরুদ্ধে?

ধীরার বাবা অফিস থেকে ফিরে সব শুনলেন। বললেন, "কথাটা সে ঠিকই বলেছে। যদি কোন ছেলে সব জেনে শুনেও ওকে পছন্দ ক'রে বিয়ে করে তা হ'লেই ওর বিয়ে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিয়ে ওর হ'তে পারবে না।"

তাঁর স্ত্রী বললেন, "তেমন ছেলে কৈ? অত বড় মন ক'টা মানুষের বা হয়? যাক্, ভগবান যা করেন।"

নীরার বিয়েও তখন তখন হ'ল না সে বাড়ীতে। তাঁরাও সুন্দরী কনে খুঁজতে লাগলেন, মেয়ের মা বাবাও এমন সব পাত্রের খোঁজ করতে লাগলেন, যাদের খুব বেশী সুন্দরী না হ'লেও চলে। ধীরা আবার পড়াশুনোর মধ্যে বেশী করে মন দিতে চেষ্টা করল। তার পরীক্ষাটা ভাল করে দেওয়া দরকার, কারণ তাকে করে খেতে হবে। লেখাপড়াটা খালি বিয়ের বাজারে দর চড়াবার জন্যে, এই কথাই সে আত্মীয়াদের মধ্যে এত কাল শুনে এসেছে। কিন্তু সেখানের পথ ত তার বন্ধই হয়ে গেল চিরদিনের মত, কাজেই উপার্জ্জন করাটা তার দরকারই হবে। কি ধরনের কাজ হলে তার করতে ভাল লাগবে, সে বসে বসে ভাবে অনেক সময়। মেয়েদের ক'টা লাইনই বা খোলা আছে? তারা হয় স্কুল মাষ্টারের কাজ করে, নয় নার্স বা লেডী ডাক্তারের কাজ করে। আজকাল নানারকম নতুন লাইনে তারা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেরকম কাজ ক'টাই বা আছে? আর সে সব কাজ জোগাড় করাও ত শক্ত। নিজে ঘোরাফেরা করা তার পক্ষে শক্ত, এর অভ্যাস তার নেই। মানুষ জাতটার উপরেই তার আজকাল বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, বিশেষ করে পুরুষ মানুষের। কিন্তু কাজকর্ম্মের সব ব্যবস্থাই ত এঁদের হাতে। এঁদের দরজায় ধর্ণা দিয়ে না পড়লে সাংসারিক সুবিধা পাওয়া যায় কোথায়?

কি কাজ যে সে করতে চায় তা নিজেও খুব ভাল করে বোঝে না। শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে বিশেষ ভাল লাগবে না তার। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো ভীষণ অসভ্য আর দুষ্টু। তাদের চুপ করিয়ে রাখা যে কি কঠিন ব্যাপার তা ত ধীরা সারাক্ষণই দেখছে। আর ওদের কিছু শোনানই কি সহজ ব্যাপার না কি? অনিচ্ছুক মনকে ক্রমাগত ঠেলে ঠেলে কাজে ভিড়ন বড় দুরূহ কাজ। এসব ভাল লাগে না ধীরার। কাজ এমন হবে যে যাতে ক'রে আনন্দ হবে, ভাল লাগবে। একলা

বসে কিছু করতে পারত ত ভাল লাগত। কিন্তু সেরকম কাজ কিই বা আছে! সে যদি সাহিত্য-রচনা করতে পারত ত বড় ভাল হত। খুব ভাল যদি লিখতে পারত, সবাই পড়ে মুগ্ধ হয়ে যেত। বঙ্কিমচন্দ্রের মত, রবীন্দ্রনাথের মত। কিন্তু সেরকম কোন ক্ষমতা ত বিধাতা তাকে দেন নি।

আর একটা জিনিষ হয়ত সে পারে। ডাক্তার হ'তে পারে। তার খুব ইচ্ছে করে রুগ্ন মানুষকে সারাতে, লোকের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করতে, পৃথিবীতে মানুষের কষ্ট বড় বেশী। কিছুটাও যদি সে কমিয়ে দিয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, একটা মানুষে যা পারে, আর একটা মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করলে কি তা পারে না? সে কি পারে না ম্যাডাম কুরীর মত আবিষ্কার করতে? তিনিও ত রক্ত-মাংসের মানুষই ছিলেন? দরিদ্র ঘরের মেয়ে, বিদেশে এসে কত কষ্ট করে পড়াশুনো করেছিলেন? কিন্তু বাংলা দেশে এত সুবিধা তাকে কে করে দেবে?

বাংলা দেশে থাকতে তার ইচ্ছেও করে না। এমন জায়গায় চলে যেতে ইচ্ছে করে যেখানে কেউ তাকে চেনে না। তা হ'লে নূতন মানুষের সঙ্গে সে স্বাভাবিকভাবে আলাপ পরিচয় করতে পারে। তার বন্ধু হতে পারে। বন্ধুর চেয়েও বেশী কেউ হ'তে কি পারে না? ধীরা তাড়াতাড়ি মনটাকে সভয়ে সেদিক থেকে ফিরিয়ে নেয়।

কলেজে যাবার আগে একবার বাবাকে বলল, "বাবা, আমার ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছা করে। পড়তে পারি না?"

তার বাবা বললেন, "তা পারবে না কেন? Mathematics ত রয়েছে তোমার? তবে এখন থেকে চেষ্টা করতে হয়। ওখানে বড় ভীড়।"

ধীরা বলল, "দিল্লীতে পড়তে পারলে ভাল হ'ত। আমার এখানকার মেডিক্যাল কলেজে পড়তে ভাল লাগবে না। নূতন জায়গা দেখাও হ'ত।"

তার মা বললেন, "ওখানে চেনাশোনা লোক, আত্মীয়-স্বজন ঢের আছে। লিখে দেখলে হয়, কেউ কিছু ব্যবস্থা করতে পারে কি না। অবশ্য থাকতে হবে বোর্ডিংএই। অন্য লোকের বাড়ী থাকার সুবিধা হয় না।"

ধীরা বলল, "দেখ না মা লিখে। এখন থেকে চেষ্টা করলে হয়ত হয়েও যেতে পারে।"

তার মা বললেন, "আগে পাশ ত কর।"

ধীরা বলল, "পাশের আগেই ত সবাই চেষ্টা করে। আজকেই লেখ না মা? আমার মনে হচ্ছে, ওখানে আমি সীট পাব।"

মা হেসে বললেন, "আচ্ছা, দেখি।"

ধীরার দিনগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে উঠছে। সেই সকালে ওঠা, সামান্য একটু গৃহকর্ম্ম করা, নিজের পড়াশুনো করা, তারপর তৈরি হয়ে কলেজে যাওয়া, আর প্রফেসরদের লেকচার শোনা। মেয়েদের মধ্যে যাদের সঙ্গে ভাব আছে, তাদের সঙ্গে গল্প করা। ভাব খুব বেশী মেয়ের সঙ্গে নেই, সম্প্রতি শৈলবালা ব'লে একটি মেয়ে খুব উঠে-প'ড়ে লেগেছে তার সঙ্গে ভাব করবার জন্য। ক্রমাগত ছোটখাট উপহার দিচ্ছে, বই ধার দিচ্ছে পড়বার জন্যে, আবার তাদের বাড়ী যেতে নিমন্ত্রণ করছে, নিজে আসতে চাইছে ধীরাদের বাড়ী। ধীরা অবশ্য একদিনও যায়নি তাদের বাড়ী, তবে শৈল একদিন এসে বেড়িয়ে গেছে, নীরার সঙ্গে ভাব ক'রে গেছে। ধীরার মায়ের সঙ্গে খাতির জমাবার অনেক চেষ্টা ক'রে গেছে। ধীরা একটু অবাক হয়েছে এই মেয়েটির ব্যবহারে। এত ভাব এর আগে কেউ করতে চেষ্টা করে নি তার সঙ্গে। অবশ্য স্কুল-কলেজে এরকম ভাব মেয়েতে মেয়েতে হয়েই থাকে। দেখতে একটু ভাল হ'লে ত আর রক্ষাই নেই। ধীরার পাশে কেউ যে এতদিন পর্য্যন্ত লাগে নি, সেইটাই আশ্চর্য্য। নীরা ত এই নিয়ে তাকে সারাদিন জ্বালায়। এবং কলেজে জ্বালায় ক্লাশের মেয়েরা। ধীরার নিজের যে শৈলকে খুব বেশী কিছু ভাল লাগে তা নয়। মেয়েটা দেখতে কিছুই ভাল নয়। চেহারায় বা মুখের ভাবে এমন কিছুই নেই যা মানুষের চিত্তকে সহজে আকর্ষণ করে। আর বড় বাজে কথা বলে। তার প্রধান গল্পের বিষয় হচ্ছে, প্রেমে পড়া। মেয়েতে মেয়েতে ছেলেমানুষী নাটুকেপনা করা নয়, বেশ পুরোপুরি প্রেম যুবক-যুবতীদের মধ্যে। ধীরার মোটেই শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু শুনতেই হবে তাকে। শৈল নিজেও না কি প্রেমে পড়েছে, তবে ছেলেটির সঙ্গে তাদের দূর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় বাড়ীর অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিরা এই প্রেমের পথে অনেক কাঁটাগাছ রোপণ করেছেন। ওরা মেলামেশা খোলাখুলিভাবে করতে পায় না। তবে ফাঁকি দিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই করে।

ছেলেটির একটি ফোটোগ্রাফ এনে দেখিয়েছে ধীরাকে। আর একজন ছেলের ছবিও দেখিয়েছে। দ্বিতীয় ছেলেটি দেখতে ভালই।

ক্রমশঃ

বাউল

শ্রীবারীন মৈত্র

লোকে বলে ক্ষ্যাপা বাউল…

উত্তম দাস মিটি মিটি চোখে চায় আর হাসে শিশুর মতন। বলে, 'নেতাই ক্ষ্যাপার চ্যালা উত্তম ক্ষ্যাপা। তা ক্ষ্যাপা কইবে না কেনে? বাউলদের যে মাতন লাগে গো; সাধনটাই যে ক্ষ্যাপার।' বলে ব্রজরাণীর চিবুকটি হাতের আঙুলে ছুঁয়ে গুন গুন ক'রে গেয়ে ওঠে—

ব্রজরাণী রইলে ব্রজে,
আমি রই তার রসে মজে—
নিত্য তাহারই খোঁজে,
সাধন ভজন হয় দায়।
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে
সংসার তার নাহি সয়॥'

বলে, 'ভোলা মন' বলে একটা সুর তোলে: মুখ-চোখ দেখে মনে হয়, বাউল তার মনের কথাটি বলতে পেরেছে।

দীন দরবেশ বাউলের দল। ওরা মনের কথাটি বলতে পারলেই মশগুল হয়ে যায়। মহানন্দে মেতে ওঠে।

ব্রজরাণী মুখঝামটা দিয়ে বলে, 'মরণ তোমার গোঁসাই!' বলে আর দাঁড়ায় না। ঘরের কাজে চলে যায়।

সাত সকালে বনের পাখী জেগে ওঠে আর এদিকে ক্ষ্যাপা বাউলের আখড়ায় টুং টাং করে মন্দিরার ধ্বনিও ওঠে। তার সঙ্গে শোনা যায় ক্ষ্যাপার গান, 'রাই জাগো রাই জাগো—।'

গ্রাম-প্রান্তের সেই আখড়া ছেড়ে গ্রাম সারা গ্রামখানিতে ঘুরে আসে, 'রাই জাগো রাই বেলা হ'ল।'

এ সবই ক্ষ্যাপামি। বেশে-বাসে, আচারে-আচরণে, চলনে-বলনে চিরকাল বাউলের ওই একই ধারা। গোঁসাই গান করছে ত গানই করছে। শাস্ত্র আলোচনা হচ্ছে ত তার আর সমাপ্তি নেই। আপন গোষ্ঠীর মধ্যে তবু সকলে ওকে শ্রদ্ধা-ভক্তিও করে। সাধক লোক; তার ওপর বয়সেও প্রবীণ। স্ত্রী ব্রজরাণীও মানুষটাকে শৈশব হতেই দেখে আসছে; চিরকালই ও ক্ষ্যাপা; তবে লোকে ক্ষ্যাপা বাউল ছাড়া কি বলবে?

যাক, সে ক্ষ্যাপা বাউল আজ আর নেই; নদীর ধারে বৈষ্ণবদের সমাধি-ক্ষেত্রে ক্ষ্যাপা বাউল অনন্ত ঘুমে চির আচ্ছন্ন। শুক্ল দ্বিতীয়ার শেষ রাতের আবছা অন্ধকার। ব্রজরাণী সেই সমাধি বেদীটা স্পর্শ করে দাঁড়াল। হ্যাঁ, আজকের দিনটি সেই দিন। এই ফাগুনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হ'তে সেদিন সারা আখড়া জুড়ে লোকে লোকারণ্য: কোনদিকে কোন শব্দ নেই। কেবল সকলের মুখেই অখণ্ড হরিধ্বনি! ক্ষ্যাপা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে।

গভীর রাতে বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন মশাই এলেন। কিছুক্ষণ বসলেন মৌন হয়ে। বিখ্যাত কবিরাজ তিনি; সকলে তার মুখের চোখের প্রতিটি ভঙ্গি উন্মুখ হয়ে লক্ষ্য করছিল; কিন্তু কোন কথা বললেন না তিনি। খানিক পরে বাইরে এল পায়ে চটি জোড়া গলাতে গলাতে ছেলে অনন্ত দাসকে ডেকে বলেছিলেন, 'ডেকেছ এসেছি; কিন্তু বাবা বড় দেরি করে ফেলেছ যে।'

অনন্ত দাস করুণ চোখে চেয়েছিল কবিরাজ মশাই-এর মুখে। বলেছিল, 'তা কিছু ওষুধ ত দিলেন নাই।'

কবিরাজ মশাই-এর মুখটাই চোখে পড়েছিল ব্রজরাণীর। ঘরের লণ্ঠনের আলোর ম্লান রেখা পড়ছিল তার চোখে। উত্তরে সামান্য একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'বাবা, আমার ত কোন ওষুধ জানা নেই। ওষুধ আছে তোমাদের কণ্ঠে। কি আর করবে, হরিনাম কর।'

সকলে ভালবাসত উত্তম দাসকে। খোঁজ পেয়ে কলেজের মাষ্টার বিমলবাবু সহর থেকে ধরে এনেছিলেন হরিগতি ডাক্তারকে। ও অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার তিনি; এই শেষরাতে তুমুল হরিনাম সংকীর্ত্তন ধ্বনির মধ্যে তিনিও এসে প্রবেশ করলেন। ··সাময়িক হরিনাম বন্ধ হ'ল বটে। কিন্তু তিনিও যাবার সময় বললেন, 'বাউল বৈষ্ণবের ঘর; হরির নাম থামালে কেন? করো! তবে অত জোরে নয়—ধীরে ধীরে।'

সমব্যথা জানালেন। কলেজের মাষ্টারের সঙ্গে

কথোপকথন হ'ল ইংরাজীতে। আর কি হবে? গোঁসাই কণ্ঠে হরিনাম ধারণ করে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

সত্যিই হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল। ব্রজরাণীর চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভাসছে তার মুখখানা; সারা-জীবন ক্ষ্যাপা যে কেবল হেসেছে। মরণ কি তার হাসি কাড়তে পারে?

আজ সেই ফাল্গুনের দ্বিতীয়া: তার বিয়োগ-ব্যথার সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তটি আজ, ব্রজরাণী একটু বিচলিত হ'ল যেন। বেদীটার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে তাতেই ঠেসান দিয়ে বসে পড়ল অবসন্নের মত। পাশে একটি তুলসীমঞ্চ; তার পদতলে প্রণাম করল ব্রজরাণী। অদূরে ঢাল-পথ নদীর গর্ভে নেমে গেছে: উত্তরে রেলের ব্রীজ; তার তলে ব্রীজ গাঁথনির পরিত্যক্ত পাথরের ছোট-বড় চাঁই নদীপথ জুড়ে পড়ে আছে: ব্রজরাণী শুনল, সেখান থেকে নদীর যে কলধ্বনি আসছে, তার সুরে যেন সেই সুরটি বাঁধা—রাই জাগো গো রাই জাগো।

এদিক থেকেও গান আসছে এখনও অনন্তদাসের আখড়া থেকে। ব্রজরাণীর তা ভাল লাগে নি। একে অবসন্ন রুগ্ন দেহ তার, শরীর সোজা রাখতে পারে নি। অনন্ত আর তার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে টেনে এনে বসিয়েছিল বটে আসরের মাঝখানে; আসর তখন সবে জমেছে, সহরের অনেকে। এমন কি কলকাতা থেকেও খবরের কাগজের তরফ থেকে অনেক গণ্যমান্য লোক এনে পুত্র অনন্ত দাস সাধক বাউলের স্মৃতিতে মহোৎসব করছে: এই আসরেই সরকারী পোষকতায় বাউল সংস্থা সম্বন্ধীয় আলোচনা হবে। আখড়ায় একটি যথাসাধ্য সুন্দর মণ্ডপ খাড়া করা হয়েছে। সহর থেকে হ্যাজাক বাতি এনে সাজিয়ে-গুছিয়ে বেশ ভাল ব্যবস্থাই করেছে অনন্তদাস। সবই ঠিক। কিন্তু ব্রজরাণীর এসব ভাল লাগে নি। ছেলে একরকম জোর করেই তাকে আসরে উপস্থিত করল বটে; কিন্তু ওই রমরমা, ওই আলোর রোশনাই, ওই সুধীজন—সবাইকে দেখে ব্রজরাণীর কেমন সংকোচ হ'ল—অভিমান হল: আর সর্বোপরি কলকাতা থেকে আনানো গোঁসাই-এর বিরাট ছবিখানা যেন কেমন মনে করিয়ে দিল সব কথা। সরকারী তরফ থেকে সংস্থার প্রাথমিক কার্যারম্ভের জন্তে ক্ষ্যাপা বাউলের নামে শ' পাঁচেক টাকার তোড়াটি দেওয়া হ'ল তার হাতে; তার পরেই কেমন অবসন্নতা এসে যেন পা দুটোকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। সকলেই বুঝতে পারল নিশ্চয়ই; আর অপেক্ষা না করে অনন্তও তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। ব্রজরাণীর হাত থেকে টাকার তোড়াটি বোনের হাতে দিয়ে অনন্ত তার সঙ্গে ভেতরে পাঠিয়ে দিল মাকে। ঘোষণা হয়ে গেল, 'মা এ আসরে যোগ দিতে পারলেন না। শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।'

খারাপ লেগেছিল।

গোঁসাই-এর স্মৃতি তার জীবনে ক্ষীণ হবার নয়—মৌন হবারও নয়। আট বছর বয়সে সে মোহান্তের ঘরে এসে উঠেছিল; পরিপূর্ণ জ্ঞান তখন থাকবার কথা নয়। ছিলও না। কেবল সেই সব উদার মুক্তির দিনগুলি,—মনে পড়ে,—শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীর স্নেহে —তাদের কোলে চড়েই কেটে গেছে তার।

মনে আছে, তারপর যখন আরও বছর দশ-বার কেটে গেল—শাশুড়ী তখনও জীবিত। সারাদিনের সংযাত্রার সুরু করেন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে, হাতে মন্দিরা আর কণ্ঠে নামগান দিয়ে—; তখন পাড়ার এক বউ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, 'তা এতদিন কাটল; বোয়ের ছেলে-পিলে হ'ল নাই কেনে বৈষ্ণবী?"

ব্রজরাণী ঘাট থেকে আসতে আসতেই কানে নিল কথাটা; শুনে লজ্জা পেল। আরও লজ্জা পেল শাশুড়ীর উত্তরটা শুনে। তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'এ কি আর আমাদের ঘর মা? আমরা ত সাধন করি নাই। ছেলে যে আমার সাধু!' স্নেহের হাসি হেসেই বলেছিলেন। তারপর সেই ভাবেই বললেন, 'গৌরহরি! সব তাঁরই ইচ্ছা।'

বউটি আর কোন প্রশ্ন করে নি বটে; কিন্তু ব্রজরাণীর মনে এ প্রশ্ন অনেকদিন বেঁচে ছিল। সত্যি মোহান্ত ছিল অন্য প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু সাধু কি না ব্রজরাণী ত জানে না। স্বামী তার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়: হয়ত সে জন্যই সোজাসুজি এ প্রশ্নটা কোনদিন করে নি সে! তবু তখন থেকেই, সংসারের কাজের মধ্যে, গ্রামের ঘরে ঘরে ভিক্ষার মধ্যে, কীর্ত্তনের মধ্যে, কেবলই এই কথাটা মনে হ'ত ব্রজরাণীর, মোহান্ত কি সাধু?

কিন্তু গৌরাঙ্গের সবই লীলা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ব্রজরাণীর কোলে নবজাতকের রূপে নব গৌরাঙ্গ দেখা দিল। ভিক্ষায় যাবার সময় মোহান্ত প্রাণ ভরে গান গাইল। ঝোলার মধ্যে থেকে গাঁজার কাঠখানি বার করে তার ওপর গাঁজা কাটতে বসত সে আসন-পিঁড়ি হয়ে। নবজাতকের মুখের দিকে চেয়ে বলত, 'কি গো গৌরাঙ্গ…কীর্ত্তনে যাবে না?' ব্রজরাণীকে

বলত, 'তুমিও ত এখন যশোমতী মা। তবে আমিই যাই।' বলে গাঁজার সরঞ্জাম ঝুলিতে তুলে উঠে গুপীযন্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে অঙ্গ দুলিয়ে নেচে উঠত আর মুখে গাইত :

শোন ও আমার সাধের ননদিনী,
আমি এই কানেতেই শুনেছি তার
বংশীর ধ্বনি ;
যার নামে তুই কণ্ঠের বিষ,
আমার কানে নিত্য ঢালিস
সেই নামেতেই মধু ঝরে—
নিত্য বহে সুরধুনি ॥

—এক সময় নাচতে নাচতে বেরিয়ে যেত উত্তম দাস।...

এমনি একদিন ভিক্ষা হ'তে ফিরে এল মোহান্ত ঠিক দুপুরে। ব্রজরাণী এখন সঙ্গে যায় না ; নবজাতকটিকে নিয়ে শুয়ে থাকে দাওয়ার এক কোণে : ছেলেটির মুখের পানে অনিমিখে চেয়ে বলে,' মোহান্ত আর ভিক্ষে করে কি হবে গো ? আমার রতন মিলে গেছে।'

গ্রীষ্মের দুপুর ! ভিক্ষা হ'তে ফিরে দুয়ারের পাশে শতছিন্ন আলখাল্লাটি খুলতে খুলতে ক্লান্ত দেহে দাওয়াতে বসে পড়ল মোহান্ত। মাথার জড়ানো কাপড়টি নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে বৈষ্ণবীকে বলল, 'শুনছ ব্রজরাণী ; বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তা আদর করলেন। ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মা-ঠাকরুণ কাছে বসে পাতা পেড়ে দিলেন ; দু'টি সেবা করে যাও। সেবা করলাম। তারপর কি কইলেন জানো। বাবামশায় পাঁচ টাকার নোটখান হাতে দিয়ে বললেন, ক্ষ্যাপা, দক্ষিণাটা নাও। রাগ চড়ে গেল। বললাম, 'বাবামশায় টাকা ত নিতে নারব।' বাবামশায় বললেন, দক্ষিণা না লও টাকাটা ধর। তোমার ছেলে হইচে। তার জন্যে দিলাম।'

ক্ষ্যাপা সে টাকাও গ্রহণ করে নি। বলে এসেছে, 'মা যশোমতীর কোলে গোলকপতি—মুখ-খানি দিবেন ত—ঘরে চলুন বাবামশায়।' বলতে বলতে সোজা বেরিয়ে এসেছে পথের ওপর।

হা-হুতাশ করে নি ব্রজরাণী। নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়েছে হয়ত। মোহান্তর কিছুতেই আসক্তি ছিল না—কিন্তু রাগ ছিল ; ক্রোধে উন্মত্ত আচরণ করত কখনও কখনও। ব্রজরাণীও মোহান্তর কথার পৃষ্ঠে কোনদিন কোন কথা ব্যবহার করে নি। দুঃখ পেয়েছে সে নিঃশব্দে ; দীন-দুঃখীর ঘর, দারিদ্র্যও সে সহ্য করেছে অসীম। কিন্তু সে সব যেন বকের পাখার 'পরে বৃষ্টির বিন্দু। গায়ে লাগে নি ব্রজরাণীর। বড় হয়ে উঠেছে অনন্ত দাস ; মেয়ে বিশাখা ডাগর হয়ে উঠেছে ক্রমশ। মোহান্ত তার নেচেছে গেয়েছে—ভিক্ষায় বেরিয়েছে নাম সংকীর্ত্তন করতে করতে। নিত্যদিন তাদের গোবর-ন্যাপা আখড়ার দাওয়ায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পাখীর কাকলীর সঙ্গে ক্ষ্যাপা গেয়ে গেছে, 'রাই জাগো রাই বেলা হ'ল।'

সেই ক্ষ্যাপার ছেলে অনন্ত দাস।
সাধক উত্তম দাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সে ছেলে বেরিয়ে গেল। ছন্নছাড়া গৃহহারা হয়ে নয়। ভেতরে ভেতরে পাকা ব্যবস্থা করে বেরিয়ে গেল কলকাতায়। স্বাধীনোত্তর সরকার গ্রামীণ কৃষ্টি আর সংস্কৃতিকে মূল্য দিয়েছেন। অনন্ত দাস তাদের নজরে পড়ে গেল। কলকাতার হালচালের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে সে বেশ নিজের আস্তানাটি গুছিয়ে নিয়েছে ; গ্রাম-প্রান্তের এই সংসারটুকুর সঙ্গে সম্বন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে এল ক্রমশঃ।

ব্রজরাণীর বেদনাবোধ তারই জন্যে !
জাত ধরম নষ্ট করলি রে তুই !—

তবু বাপের কথা মনে রেখেছে অনন্ত ! আজকের এই ফাগুনের দ্বিতীয়ার শেষ রাতে উত্তম দাস দেহ রেখেছেন ; সেই দিনটি প্রতি বছর পালন করে আসছে অনন্ত দাস। ভাল করেছে। বাপকে সে ভোলে নি। পুত্রের কাজই করেছে। সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে, ভুলে গিয়ে ব্রজরাণী অনন্ত দাসকে দেখে তৃপ্তি পেয়েছে—শান্তি পেয়েছে। ছেলে সুখে আছে, সমৃদ্ধিতে আছে দেখে আনন্দ পেয়েছে মনে মনে। কিন্তু আজ কেন এমন হয়ে গেল। ক্ষীণমান অগ্নি যেন আবার সর্ব্বব্যাপী হয়ে জেগে উঠল। এই আলোর রোশনাই, উৎসবের ঘটা সব মিলিয়ে কেমন যেন সংকোচ আনল। অভিমান হ'ল ; তারপরেই টাকার তোড়াটি এসে পড়ল হাতে। এ কি ! এ কেন ? অবসন্ন মনের ওপর যেন কশাঘাত বাজল। পা দুটো কেমন বলহীন হয়ে এল ; শরীর সত্যই অত্যন্ত দুর্বল। তবু এমন হবার কথা নয়। ছেলে কি বুঝল কে জানে। তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল : আখড়ার কাজ যথারীতি সুরু হ'ল আবার। কলকাতার বাবুরা বক্তৃতা করলেন। আর ব্রজরাণী অপরাধীর মত তোড়াটা বুকে করে এসে ঢুকল ঘরে। বিশাখা সঙ্গে এসেছিল ; আরও কে কে ধরে ধরে তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। তাদের আনন্দ আর ধরে না, তাদের বাপের নামে টাকা এসেছে

বলে। কিন্তু সে যে কি কাঁপুনি। শয্যায় এলিয়ে পড়েও তা যেন থামে না।

তারপর রাত বেড়েছে, আখড়ার আলো, গান, কলরব আরও গভীর রাতে যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে কিছুটা। কিন্তু ব্রজরাণীর অন্তর-প্রবাহ কমল না বরং বেড়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে চোখের পাতা বন্ধ করতে পারল না সে। যেন স্পষ্ট দেখল, সশরীরে পাগড়ি মাথায় মোহান্ত তার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ জোড়া দিয়ে তাকে ভৎর্সনা করছে। বলছে, 'দ্যাও। দূর করি দ্যাও। ইটা কি এনিছ? টাকা? ফেলি দ্যাও।' স্পষ্ট দেখল বৈষ্ণবী ঘরের প্রদীপের ম্লান আলোটিতে উজ্জ্বল মোহান্তর চোখ দু'টি। ভীষণ ভয় পেল। যেন একটা ভূমিকম্পে সবকিছু টলমল করে উঠল। চোখের সামনে দেখল, মথিত সাগর থেকে মন্থনে মন্থনে উঠে আসছে একটি বিষের পাত্র। আর বিষের পাত্রটি দু'হাত পেতে সে গ্রহণ করছে আগ্রহভরে।

ধড়মড় করে তন্দ্রা ভেঙ্গে উঠে বসল ব্রজরাণী। আর নয়। তোড়াটি কাপড়ের তলে গোপন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। এদিকে কেউ জেগে নেই। নির্ভয়ে ব্রজরাণী চলে এল। কিছুদূরেই নদীতীরে বৈষ্ণবদের সমাধিভূমি। একটি সাদা পাথরের বেদীর নিভৃতে ক্ষ্যাপা বাউল অনন্ত সাধনায় নিমগ্ন। পাশে একটি তুলসীমঞ্চ। ফাল্গুনের শেষ রাতে আকাশের সামান্য আলোর আভাসে পথ চিনে চিনে ব্রজরাণী যেন আচ্ছন্নের মত এসে বসল সেই তুলসীমঞ্চে মাথা ঠেকিয়ে।

আখড়া এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তবু স্তব্ধ রাত্রি-শেষে কলরবহীন এই গ্রামপ্রান্তে ব্রজরাণী স্পষ্ট শুনতে পেল কীর্তনের সুর। মেয়ে বিশাখাই গাইছে। তার মত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এ অঞ্চলে কারও নেই। কিন্তু মন সেদিকে গেল না ব্রজরাণীর। টাকার পুঁটলিটা বুকের মধ্যে থেকে রূঢ়ভাবে আঘাত করছে বারবার। কিন্তু কি করবে ব্রজরাণী টাকার তোড়াটা নিয়ে? অন্তরের মধ্যে থেকে কান্নার ঢেউটা যেন উত্তাল হয়ে উঠল। অস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ স্বরে যেন ককিয়ে উঠল ব্রজরাণী; 'আমায় বলে দ্যাও মোহান্ত। আমায় পাপ করতে দিও না।' ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। ব্রজরাণী সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

মোহান্ত শিশুর মত আপনভোলা হাসি হাসছে। ঝোলার মধ্যে থেকে কাঠের খণ্ডটা বার করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে গাঁজা কাটছে আর বলছে, 'ব্রজরাণী, মানুষ কি আপন হয়? সে ছেলেই বল—আপনার কাছে আপনিই বল। উঠ! চোখের জল ফ্যাল কেনে?"

ব্রজরাণী বলছে, 'ওসব শাস্তরের কথা ছাড়ান দ্যাও।'

মোহান্ত হাসছে হো হো করে। বলছে, শাস্তর লয় গো—জীবনের কথন! রস কাঁচা আছে গো—এখনও পুরা জ্বাল খায় নাই।' তারপরেই গান ধরেছে :

'—মন যদি আপনার হত
রতন মাণিক চিনে নিত
তাঁবা দস্তায় হত না বড়
তাইতে তার এ দুর্দশা ঘটে গেল॥'

কিন্তু এ তন্ময়তা বেশিক্ষণের নয়।

ফাল্গুনের রাত ফর্সা হয়ে আসছে পুবদিগন্তে। এ সময় ঘুঘু ডেকে ওঠে। অকস্মাৎ এক একটা পাপিয়া সেই অসীম নৈঃশব্দের মধ্যে ডেকে ওঠে। না, তা ত নয়। ঘুঘুর ডাক এ নয়। ব্রজরাণী কান পেতে শুনল। কে যেন কথা কইতে কইতে আসছে এদিকে। যদি এদিকে আসে—তাকে দেখতে পায়? তা হ'লে!

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ব্রজরাণী। সামনে একটা ঢালপথ নীচে নদীর গর্ভে নেমে গেছে। সে পথ ধরে দ্রুত নেমে এল সে বনঝোপের আড়াল দিয়ে। নাঃ, সহসা এদিকে কেউ আসবে না। নাঃ, আর কারও কথাও কানে আসছে না।

নীলাভ কুয়াশায় ফাল্গুনের এই হিমেল শেষ রাতে নদীর উত্তরে ওই স্তব্ধ শালবনের থেকে বাতাস আসছে। ব্রাহ্মণীর তলে স্রোতপথে ওই পাথরখণ্ডগুলির থেকে নদীর কলতান আরও উচ্চৈঃস্বরে কানে আসছে।

ব্রজরাণী নির্ভয়ে এগিয়ে চলল। বাতাসের কণ্ঠে নদীর কলস্বরে মোহান্তর কথাগুলিই যেন কানে বাজছে, 'রাই জাগো রাই বেলা হ'ল।'

মোহান্তর রাই আজ জেগেছে।

জীবনের শেষ পরিণামের দিনে মোহান্তর রাই তার শেষ আদেশটি পালন করতেই চলেছে।

পাথরগুলোর ওপর উঠে দাঁড়াল বৈষ্ণবী। ভয়ে উত্তেজনায় শঙ্কায় বুকখানা ধড়ফড় করছে তার। কিন্তু কেমন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে বুক থেকে।

অঞ্জলিদানের ভঙ্গিতে ব্রজরাণী বিসর্জ্জন দিল টাকার পুঁটুলিটি।...আঃ! গৌরহরি। মোহান্ত তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক।

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

Mock Trial

এক একটি ঘটনা ঘটে যা স্কুলে খুব উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আমার কাছ থেকে যে দু'খানা ছবি ফুট সাহেব কিনেছিলেন তার একটি হচ্ছে আমার শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় আঁকা 'খান' ছবি আর দ্বিতীয়টি গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথ) একখানি পোর্ট্রেট। রবীন্দ্রনাথের ছবিখানি তিনি দুন স্কুলের লাইব্রেরীতে দান করেছিলেন। একবার গরমের ছুটির সময় আমি লাইব্রেরীতে বই আনবার সময় দেখি লাইব্রেরীয়ান ঘুমুচ্ছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল গুরুদেবের ছবিটার রঙ ঝাপসা দেখাচ্ছে। কাচের ওপর এক পরত ধুলো জমে আছে। চট্ করে একটা টেবিল সরিয়ে তাতে চড়ে ছবিটা নামালাম। তারপর সোজা সেটাকে নিয়ে আর্ট স্কুলে এলাম। বুক বাইণ্ডার মুমতাজ আর্ট স্কুলে কাজ করছিল, তাকে ছবিটা খুলে সাফ করতে বললাম। স্কুলের অফিসে লিখে দিলাম ছবিটা আমি নিয়ে এসেছি।—'ব্যাড্‌লি ফেসড্ এ্যাণ্ড ড্যামেজড্।' ছবিটা ত নিয়ে এলাম, কিন্তু ঝাড়া একটি বছর কেউ ছবিটার খোঁজও করল না। তারপর হঠাৎ একদিন তাঁদের হুঁস্ হ'ল যে ছবিটা লাইব্রেরীতে নেই। আমার কাছে খবর নিয়ে জানতে পারল, ছবি আমার কাছে আছে এবং উই ধরেছিল বলে আমি সরিয়েছি। কিন্তু ছবিখানা ফেরৎ দিতে রাজি হলাম না। ফুট সাহেব একদিন জিজ্ঞাসা করলেন ছবিখানার কথা। আমি বললাম—'ছবিটির যত্ন নেওয়া হয় নি। কেন যত্ন নেওয়া হয় নি, আমি লাইব্রেরী কমিটির কাছে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ চাই।'

ফুট সাহেব বললেন—'ছবিটার উপর তোমার কোন অধিকার নাই। সুতরাং তোমাকে কৈফিয়ৎ দেবার কথা উঠতেই পারে না।

আমি বললাম—'ছবিখানা Print নয় এবং সেটা আমার আঁকা original, সেটাই আমার কৈফিয়ৎ নেবার যথেষ্ট অধিকার।''

—Mock Trial-এর আয়োজন হ'ল!

খুব আয়োজনে Mock Trial হ'ল! Sir Theodore Tasker-কে বিচারক করে নিয়ে আসা হ'ল। তিনি তখন আই. সি. এস. প্রোবেশনর্স ক্যাম্পের ডিরেক্টার।

জজ সাহেব একটি ফুট রুল নিয়ে এসেছিলেন। সেইটে সবাইকে দেখিয়ে বলেছিলেন, দুন স্কুলে ফুট রুল থাকতে তাঁকে যে জজিয়তি করতে এখানে ডেকে আনা হয়েছে, তাতে তিনি আশ্চর্য্য হয়েছেন। বিচারে আমি Not guilty সাব্যস্ত হয়েছিলাম। "It was not a theft—thing was removed with good intention to avoid further damage'' কিন্তু "by law thing should be surely returned!'' আমাকে ছবিখানা

ফেরৎ দিতে আজ্ঞা করা হ'ল এবং ছবিখানা ভালভাবে রাখতে হবে সে বিষয়ে অপর পক্ষকে উপদেশ দেওয়া হ'ল। এই Mock Trial-এ অনেকে ভেবেছিল আমার অপমান হবে। তা ত হ'লই না বরং আমার সম্মান যেন একটু বেড়েই গেল। সরকারী আদালত সম্পর্কে ছেলেদের জ্ঞান হ'ল। এই Mock Trial-এর Mock-এর মধ্য দিয়ে অনেক লোকের অন্তরের যে 'Mock'-এর পরিচয় পেয়েছিলাম, সেটা লাভ কি লোকসান কে জানে!

ডুন স্কুলের কর্মীদের ডিয়ারনেস্ অ্যালাউন্স

যুদ্ধের বাজারে জিনিষপত্রের দাম যখন বেড়ে গেল তখন মাষ্টাররা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের জন্য অনুরোধ করলেন। এই নিয়ে বেশ খানিকটা আন্দোলন চলেছিল। হেডমাষ্টার রাজী হন নি প্রথমে এবং বলেছিলেন যে 'বোর্ড অফ গভর্ণারস্' রাজী হবেন না। মাষ্টারদের আরও বললেন যে, দিল্লীতে স্কুলের বোর্ডের মিটিংএ মাষ্টারদের নিজেদের প্রতিনিধি যেন যায়। মাষ্টাররা মিটিং করে ঠিক করল, আমাকে আর একজন মাষ্টারকে প্রতিনিধি করে পাঠাবে। গিয়েছিলাম আমরা দিল্লী। সেই মিটিংটা ফুট সাহেবের শেষ মিটিং; সুতরাং মার্টিন, যিনি ফুট সাহেবের যায়গায় হেডমাষ্টার হবেন, তিনিও গিয়েছিলেন। স্যার আকবর হায়দারী ছিলেন তখন বোর্ডের সভাপতি। মিটিংএ অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা মাষ্টারদের তরফে আমাকে বলতে হয়েছিল। ফুট সাহেব তাতে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর বিদায়ের মুখে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব প্রায় বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক মাষ্টারদের ডিয়ারনেস্ অ্যালাউন্স দেওয়া হবে সেই মিটিংএ সাব্যস্ত হ'ল। দিল্লী থেকে ফিরে এসে যখন সে কথা মাষ্টারদের জানালাম, তখন তাঁরা খুব খুশী।

ডুন স্কুলে মাউণ্টব্যাটিন দম্পতি

ফুট সাহেব ডুন স্কুল ত্যাগ করার কিছুকাল আগে লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটিন ডুন স্কুলে আসেন। সেই সময় ফুট সাহেব আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। 'Distinguished Visitors'-দের স্কুল দেখার নোটিশে দেখলাম—সময়াভাবে তাঁরা আর্ট স্কুল দেখতে আসবেন না। বুঝলাম ফুট সাহেব আমাকে আর প্রাধান্য দিতে চান না। চুপ করেই রইলাম। যাক্, এক ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা গেল। কিন্তু Stop Press Notice এল আবার আমার কাছে। আর্ট স্কুলের ছেলেদের কাজ কিছু স্কুলের মেন লাইব্রেরী হলে যেন সাজিয়ে রাখা হয়—"to give an idea to the visitors of the art school." আমি অর্ডার মত কিছু মূর্ত্তি ও ছবি লাইব্রেরীতে রেখে এলাম। Visitors-দের আসবার ঘণ্টাখানেক আগে ফুট সাহেব

এফ. জি. পিয়ার্স

আমার কাছে মুখ ভার করে এলেন। বললেন,—"I think, you should be there in the library when I take round the visitors!"

আমি বললাম, 'If this is an order from the Headmaster, yes I should be there'...

উনি চলে যেতে যেতে বললেন—yes, you should be there." মনে মনে অপমানিত বোধ করেছিলাম, সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করা!—চাকরি করছি—অর্ডার মানতেই হয়। লাইব্রেরীতে গিয়ে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণের মধ্যে অতিথিরা এলেন

লাইব্রেরী ঘরে। ফুট সাহেব আলাপ করিয়ে দিলেন—'এই আমাদের আর্ট মাষ্টার!"—আমার যে একটা নাম আছে সেটা আমি নিজেই 'হ্যাণ্ড শেক' করার সময় বললাম। কি আর করি! লেডী মাউণ্টব্যাটন মৃদু হেসে বললেন—'এই তোমাদের আর্ট রুম! আমি সুখ্যাতি শুনেছি তোমাদের আর্ট স্কুলের।'

হেসে বললাম,—'এটা আমাদের লাইব্রেরী। আমার দুর্ভাগ্য যে আর্ট স্কুলের environment-এ ছবি ও মূর্তি আপনাদের দেখাবার সুযোগ পেলাম না। আপনাদের সময় অল্প।"

লেডী মাউণ্টব্যাটন বললেন—"আর্ট স্কুল এখান থেকে কি খুব দূরে?' লাইব্রেরীর দরজা দিয়ে আর্ট স্কুল দেখিয়ে দিলাম। উনি তৎক্ষণাৎ সেদিকে পা বাড়ালেন। বললেন 'It is not very far. Let us go and see it there.' আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম যে, 'আপনাদের জন্য আরও অনেক জায়গায় সবাই অপেক্ষা করছেন—"সিডিউল" মতেই আপনাকে চলতে হবে'—

লেডী মাউণ্টব্যাটন বললেন—'বড় লজ্জার কথা, স্কুল স্কুলে এসেও সেখানকার আর্ট স্কুল দেখা হ'ল না! তোমার আঁকা ছবি আমার দেখার ইচ্ছে ছিল।'

এইবারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি আর কতদিন ভারতবর্ষে আছেন। যদি আপনি দিল্লীতে ছবির প্রদর্শনীর formal opening করতে রাজী হন, তবে সেখানে ছবির প্রদর্শনী করতে পারি!'

তিনি খুশী হয়ে বললেন—'সে ত আমার সৌভাগ্য!' তখনই প্রদর্শনীর দিন প্রায় ঠিক হয়ে গেল। চলে যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"Will be looking forward to see you in Delhi." ফুট সাহেব একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ফুট সাহেব ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার পর মহা সমারোহে দিল্লীতে প্রদর্শনী করেছিলাম। লেডী মাউণ্টব্যাটন সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন।

ফুট সাহেবের ফেয়ার-ওয়েল পার্টি

ফুট সাহেবের রাগ তখনও পড়ে নি। 'বোর্ড অব গবর্ণারস্'দের মিটিং-এ মাষ্টাররা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁর উপর দোষারোপ করেছিল, সেটা তাঁর মনে খুবই ব্যথা দেয়। ফুট সাহেব চলে যাবার দু'দিন আগে মাষ্টারদের লিখে জানালেন যে, তাঁদের কাছ থেকে তিনি 'ফেয়ারওয়েল প্রেজেণ্ট' নেবেন না বা তাঁদের পার্টিতেও যোগদান করবেন না। আমরা ত সবাই অবাক! এ কি ছেলেমানুষী। যাই হোক, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, অনেক অনুনয়-বিনয়ে

প্রতীক্ষারতা

মান-অভিমানের পর শেষকালে তিনি রাজী হলেন। খুব ঘটা করেই 'ফেয়ার-ওয়েল' হ'ল!

ডুন স্কুলের প্রথম বারো বছর

ফুট সাহেব দেশে চলে গেলেন। কিন্তু ডুন স্কুলের ইতিহাসে তাঁর নাম জড়িত হয়ে রইল, তাঁর সঙ্গে যারা কাজ করেছিলেন তাঁদের মনের সঙ্গেও। বার বছরের মধ্যে যত ছাত্র এসেছে-গেছে—সবার মনের মধ্যে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা আঁকা হয়ে আছে। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁর হাতেই ডুন স্কুলের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে।

লর্ড উইলিংডন এসেছিলেন স্কুলের প্রথম 'ফাউণ্ডার্স্ ডে' প্রিসাইড করতে। আমি সে ফাউণ্ডার্স ডে-তে উপস্থিত ছিলাম—১৯৩৫-এর অক্টোবরে। তারপর প্রায় প্রতি বছরই স্কুলের 'ফাউণ্ডার্স-ডে' হয়েছে। রথীমহারথীরা অনেকে এসেছেন প্রিসাইড করতে। ছাত্রদের কত রকম কথাই না তাঁরা বলে গেছেন উপদেশ দিয়ে।

জল ৮.৩

দেশ স্বাধীন হবার পর রাজাজী এসেছিলেন এই অনুষ্ঠানে প্রিসাইড করতে। তিনি বলেছিলেন কিছু নতুন কথা! তিনি বলেছিলেন—"স্কুলের আইডিয়াল বদলাতে হবে। কিন্তু স্কুল বন্ধ করলে চলবে না। এঞ্জিন

চলুক, কিন্তু সে চলার গতির সঙ্গে তাল রেখে কলকব্জা যা বদলাবার—তা বদলাতে হবে।"

তারপর পণ্ডিত নেহরুর প্রিসাইড করবার কথা ছিল একবার—তিনি আসেন নি, তাঁর যা বলবার তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্যার চিন্তামণি দেশমুখের হাতে। তাও শুনলাম মন দিয়ে।

তারপর এলেন একবার শ্রীহোমি মোদী—তাঁর বক্তৃতাও শুনলাম; এলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ—স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। তিনি মাষ্টার ও ছেলেদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আমরা ভারতীয়, আমাদের নিজেদের ভাষা আছে, নিজ নিজ দেশের সাহিত্য আছে, তার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করতে হবে। স্বাধীন ভারতে ডুন স্কুলে 'আইডিয়েল' বদলাতে হবে, যাতে ডুন স্কুলের ছেলেরা যথার্থ ভারতীয় হন। সবাই বক্তৃতা করে যায়—তা' এক কান দিয়ে ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বার হয়ে যায়। ডুন স্কুল চলছে তার পুরোণো 'মোমেণ্টামে'। বদলানো কি এতই সোজা! তাই চলুক তাতে ক্ষতি নেই।

ক্যাপটেন সাহেব

ক্যাপটেন সর্দার খান, বুড়ো মুসলমান,—হেডমাষ্টারের প্রথম সেক্রেটারী—অফিসের 'বারসার'। ১৯৩৫-এ যখন ডুন স্কুল আরম্ভ হয় তখন থেকেই ইনি কাজে ঢোকেন। ১৯৩৬-এ আমি যখন ডুন স্কুলে এলাম তখন ক্যাপটেন সাহেব আমার চাকর ঠিক করে দিলেন—মুসলমান চাকর। রোজ দু'বেলা তদারক করতে লাগলেন। তাঁর সাদা গোঁফ-দাড়ি, সাদা সাফা (পাগড়ি), সাদা সালোয়ার, দোহারা বেঁটে চেহারা। চাঁদবাগ এষ্টেটে এই লোকটি সর্বঘটে বর্ত্তমান সব সময়। কখনও মালীদের বকে ধমকে দিলেন, পথে যেতে যেতে কখনও চাপরাসীকে হুমকি দিয়ে কি অর্ডার করলেন, পর মুহূর্ত্তে সাদা গোঁফ দাড়িওয়ালা মুখে মধুর হাসি হেসে বললেন—'হ্যালো আর্টিষ্ট, কেমন লাগছে এখানে। আই হোপ ইউ আর হ্যাপী, কমফরটেবল' লোকটি সামান্য সেপাই থেকে ক্যাপটেন হয়েছিল ফৌজে।

ইংরেজ সাহেবদের সেলাম ঠুকে ও গোলামী করেও কিন্তু লোকটি সাহেবদের কতকগুলি গুণ আয়ত্ত করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, যার জন্য তাঁকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ঘড়ির কাঁটার মত তাঁর চাল-চলন ছিল, কথা দিলে কথা রাখতেন—তার অন্যথা হ'ত না। ছোট্ট নোটবুকে লেখা থাকত রোজকার যা করবার। কাজ ফেলে রাখা তাঁর ধাতে ছিল না। বয়স হয়েছিল, কিন্তু সেই আন্দাজে তাঁর শরীরে শক্তি ছিল প্রচুর। আমাকে ক্যাপটেন সাহেব অন্যের চেয়ে অনেক বেশী তোয়াজ করতেন। হয়ত তার কারণ, আমার সঙ্গে হেডমাষ্টারের বেশী সদ্ভাব ছিল বলে।

গানের মাষ্টার রাখা হবে হেডমাষ্টার আমাকে এসে বললেন। কেউ জানা লোক আছে কি না। ক্যাপটেন সাহেবও আমাকে ধরলেন একদিন যে, তাঁর জানা লোক আছে দেরাডুনেই, তার জন্য হেডমাষ্টারের কাছে সুপারিশ করতে হবে। অদ্ভুত লাগল তাঁর এই অনুরোধ। তাঁর জানা লোকটিকে আমি জানি না, শুনি না, কি করে সুপারিশ করব তাকে? অথচ ক্যাপটেন সাহেবও নাছোড়-বান্দা। এদিকে শান্তিনিকেতনের চেনা একটি মারহাটি গাইয়ের চিঠি আমি পেয়েছি। তিনি বামন শিরোধকর। চাকরির খবর হাওয়ার আগেই ছোটে সব জায়গায়। আমি সেই মারহাটি ভদ্রলোককে লিখে দিলাম হেডমাষ্টারের কাছে সোজা রেজিষ্ট্রি করে 'অ্যাপ্লিকেশন' পাঠাতে। তার কাছ থেকে চিঠি পেলাম। তিনি পাঠিয়েছেন লিখেছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে হেডমাষ্টার সব 'অ্যাপ্লিকেশন' নিয়ে আমার কাছে এলেন। বললাম তাঁকে, "আমার চেনা গাইয়ের অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছেন নিশ্চয়ই।" তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে দরখাস্ত পাওয়া গেল না। গেল কোথায় তবে সেটা? ফুট সাহেব বললেন, 'তোমার চেনা গাইয়েটি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, তিনি পাঠান নি এখনও, পাঠাবেন লিখেছেন নিশ্চয়ই। আনো দেখি তাঁর চিঠি।' চিঠিখানা খুঁজে নিয়ে এলাম। তাই ত, পাঠিয়েছেন বলেই ত লেখা! রেজিষ্ট্রি চিঠি পৌঁছোয় না ঠিক মত, সন্দেহজনক ব্যাপার নয় ত? আমার মনেও ঝিলিক দিয়ে যায় ক্যাপটেন সাহেবের কথা! তাইত, তবে কি—না না, মানুষকে অযথা সন্দেহ করা ঠিক নয়! হারিয়ে গেছে এ্যাপ্লিকেশন! ফুট সাহেব আমার হাত থেকে বামন শিরোধকরের চিঠিখানা নিয়ে পড়লেন আবার, বললেন, "এই চিঠিখানাই ফাইলে রাখলাম, এঁকেই লিখব কাজের জন্য!"

এর পর ক্যাপটেন সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল যখন, তখন আমারই লজ্জা করতে লাগল। কি জানি কেন মনে হ'ল, সন্দেহ জাগা উচিত ছিল না। ক্যাপটেন সাহেব এফিসিয়েন্ট বারসার ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। দোর্দণ্ড-প্রতাপে চলতেন তিনি। চাঁদবাগে এইটে এক টুকরো নোংরা দেখা যেত না তখন।

ক্যাপটেন সাহেবের টার্ম শেষ হয়ে গেল। তিনি চলেই যাবেন ঠিক হয়ে গেল। তাঁর ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে। চাঁদার নোটিশ বার হ'ল। ভাল উপহার দেওয়া হবে,—চা-পার্টি হবে! চাঁদা উঠাবার সময় দেখা গেল, সবাই ক্যাপটেন সাহেবকে যতটা 'পপুলার' মনে করত, ততটা 'পপুলার' তিনি নন। মেনন সাহেব—অঙ্কের মাষ্টার, তিনি এক টাকার বেশী চাঁদা দিতে প্রস্তুত নন।

ফুট সাহেব তাইতে চটে গিয়ে একটা নোটিশ জারী করলেন, যাতে তিনি রাগের মাথায় লিখে বসলেন—"ইট ইজ ভেরি মীন (mean) অফ দ্য মাষ্টার্স" ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্যাপটেন সাহেব পাঁচ বছর আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন, আমাদের অন্তত পাঁচ টাকা করে চাঁদা দেওয়া উচিত! মাষ্টাররা দু'চার জন রাজী হ'ল দিতে; কিন্তু মেনন সাহেবের ধনুক-ভাঙ্গা পণ, একটাকার বেশী দেবেন না! এক টাকা কি কিছু কম? আর হ'লই বা কম? যার যেমন সামর্থ্য…

ফুট সাহেবের নোটিশ পেয়ে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল দস্তুর মত। পাবলিক স্কুলের হেডমাষ্টার মানে কি হিটলার? আমাদের যা ইচ্ছে আমরা চাঁদা দেব, এতে হেডমাষ্টারের হিটলারী কেন? সন্ধ্যাবেলা সোজা ফুট

সাহেবের বাংলোয় গিয়ে হাজির হলাম। কোন ভনিতা না করে বললাম—'নোটিশটা withdraw করতে হবে আপনাকে। চাঁদা কম দেবার জন্য মাষ্টারদের 'মীন' বলবার কোন অধিকার নেই আপনার।" আশ্চর্য্য এই যে, ফুট সাহেব নোটিশটা Withdraw করলেন এবং মাষ্টারদের শিক্ষা দেবার জন্য নিজেই বেশ একটা মোটা চাঁদা দিলেন। হেডমাষ্টার গদগদ হয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন ক্যাপটেন সাহেবকে! ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল! হিন্দু মাষ্টারদের মধ্যে অনেকেই বললেন, "বাঁচা গেল, একজন কমুনাল মুসলমান ছাড়ল ডুন স্কুল! ডুন স্কুলে শতকরা পঁচানব্বুই জন চাকর-বাকর মুসলমান ঢুকিয়ে দিয়ে গেল, এর জের কিন্তু থাকবে বহুদিন!

বিলাতী হাউস-মাষ্টার

চারটি হাউস, অর্থাৎ হোষ্টেল। টাটা, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, জয়পুর। তাঁরা ডুন স্কুল আরম্ভ হবার সময় মোটা টাকা দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এই চারটি হাউসের হাউস-মাষ্টার চারজনই ইংরেজ ছিলেন প্রথম প্রথম। টাটা হাউসের হাউস-মাষ্টার ছিলেন ব্যারেট সাহেব। তিনি রাজকোটের রাজকুমার কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে চলে যান, সঙ্গে নিয়ে যান আর একটি ইংরাজ মাষ্টারকে এবং টাটা হাউসের মেট্রন মিস্ রাসেলকে। আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হই নি। আমার এক বন্ধু সত্যেন বিশীকে সেই কাজে যোগ দেবার জন্য লিখি এবং সত্যেন বিশী সেখানে কিছুকাল আর্টমাষ্টারী করেন।

ব্যারেট সাহেব চলে গেলে ফুট সাহেব আর একজন ইংরেজকে নিয়ে এলেন। তিনিও বেশীদিন টাটা হাউসে কাজ করেন নি। এই ইংরেজ মাষ্টারটির বয়স বছর ত্রিশেক এবং অবিবাহিত। তিনি এসে নতুন উৎসাহে টাটা হাউসের হাউস-মাষ্টারী আরম্ভ করলেন মাঝে মাঝে আর্ট স্কুলে আসেন, ছবি দেখেন, মাঝে মাঝে আঁকবার চেষ্টাও করেন। তাঁকে দেখতাম আর মনে করতাম এ আবার কেমন ইংরেজ সাহেব! ছেলেগুলো দেখি তাঁকে বিশেষ মান্যি করে না। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই তাঁকেও বিদায় নিতে হ'ল। বিলেতের এক উঁচুদরের স্কুলের মাষ্টার ছিলেন না কি তিনি। ভারতবর্ষের ডুন স্কুলে এসে ধরা কি করে রাখেন হেডমাষ্টার ছেলেদের অভিভাবক করে! হেডমাষ্টার তাঁকে নোটিশ দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাংলোয়। আমাকে খুলে বললেন সব ব্যাপার। আমি ত অবাক! এই ক্ষুদে টাকমাথা সাহেবের মধ্যে ভগবান এ কি অস্বাভাবিকতা ভরে দিয়েছেন! আমি চলে আসবার সময় বললেন, 'উনি চলে যাবেন দু'চার দিনের মধ্যে, কিন্তু আমি চাই তুমি ওঁর সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার কর। যে কয়দিন আছেন, যেন কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন!'

সেই সাহেবকে একদিন চায়ে ডাকলাম, আমার আঁকা একখানি ছবি উপহার দিলাম, খুব খুশী হলেন তিনি। বললেন, 'ডু আই ডিসার্ভ দিস্ ফাইন গিফ্‌ট্?'

বললাম—'হোয়াই নট?

বিদায় নেবার সময় আমার হাতখানা চেপে ধরে বলেছিলেন, "থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ্। আমি খুব খারাপ লোক নই, যতটা খারাপ বলে আমায় দোষারোপ করা হয়েছে—অন্ততঃ ততটা নই! এ মাউন্টেন ওয়াজ মেড আউট্ অফ্ এ মোল হীল!"

তিনি চলে গেলেন নিজের দেশে! হেডমাষ্টার ফুট নিজেই টাটা হাউসের হাউসমাষ্টার হলেন, একাধারে হেড মাষ্টার ও হাউস মাষ্টার। আবার সুরু হ'ল ইংরেজ মাষ্টারের সন্ধান।

মাষ্টার আসে আবার চলেও যায়

ইতিমধ্যে আরও দু'চার জন মাষ্টার কাজ ছাড়লেন, তাদের জায়গায় কাজে লাগলেন আবার নতুন লোক। যতই দিন যায়, প্রায়ই মাষ্টাররা কাজ ছেড়ে চলে যায়—নানান কারণে। আমরা যারা বহুদিন রয়ে গেছি, তাদের পক্ষে এ একটা লম্বা 'সফরের' মত। কত লোক যেন এই ডুন স্কুল ট্রেণে উঠছে, নামছে—যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে! তাদের কাউকে মনে রাখছি বন্ধুভাবে কেউ আবার তলিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে। ডুন স্কুলের এই চাঁদবাগ এষ্টেটে এই রকম ক্ষণিক যাত্রীর সংখ্যা অধিক। ছাত্রেরা আসে, পাশ করে চলে যায়। কিন্তু মাষ্টার যাঁরা এসে কাজে লেগেছেন, তাঁদের বেশীর ভাগই অল্প দিনের জন্যই এখানে বসবাস করবার সুযোগ পেয়েছেন। নানান ঝড়-ঝাপটায়

(soul) বাঁচিয়ে হয়ত নয়), তাঁদের পক্ষে এটা কম অভিজ্ঞতা নয়! একেই ত এ-একটা ছোট্ট পৃথিবী, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ! তার মধ্যে যদি সেই সব পুরণো মাষ্টারের দল থেকে যেত আমাদের ক'জনের মত আমরা এই সব নিত্য-নতুন মাষ্টারদের আমদানীর মধ্য দিয়ে। এই আঠারো বছরে কমপক্ষে অন্ততঃ সত্তর-আশী-জন মাষ্টারকে চাঁদবাগে বসে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছি, একি একটা কম কথা!

বৃষ্টিতে

সবাই, তবে জায়গাটা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়াত। চাঁদবাগ-রূপ কূপের মণ্ডুক আমরা সন্দেহ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে বহিরাকাশের আভাস পাই

রসিদ আহমেদ, বাকের আলী, আসরফ ইত্যাদি

রসিদ আমেদ, তরুণ যুবক, অবিবাহিত। ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরে স্কুল যখন প্রথম খুলেছিল, সেই সময় যোগ দিয়ে

ছিলেন। রসিদ রসিক ছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে হৈচৈ করা—ক্লাসে ও খেলার মাঠেও—পাবলিক স্কুলে যেমনটি দরকার। 'প্লে প্রডিয়ুস' করাতেও তাঁর ক্ষমতা ছিল, অভিনয়ও নিজে করতেন। মডার্ণ ও 'ইনটেলেকচুয়াল' হবার চেষ্টাও কম ছিল না। লাহোরের গভর্ণমেন্ট কলেজের ছাত্র ছিল সে। 'ডক্টর ফষ্টাস্' নামে একটি ইংরেজী প্লে সে প্রডিয়ুস করেছিল ছাত্রদের নিয়ে—সেই ডুন স্কুলের প্রথম অভিনয়। সে নিজে সেজেছিল ডক্টর ফষ্টাস। বেশ হয়েছিল। সেই সময় আমি তার মূর্ত্তিও একটা গড়েছিলাম। রসিদের জয়-জয়কার তখন। বেশী পপুলার হলেই পাবলিক স্কুলে সঙ্গে সঙ্গে বিপদ আসে। রসিদের বড়ো ভাই ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে কাজ করতেন। তিনি প্রায়ই রসিদের কাছে আসতেন। একদিন শুনলাম, ফুট সাহেব রসিদকে ডেকে বলেছেন—তার দাদা যেন তার কাছে ঘন ঘন না আসে। এই হ'ল সূত্রপাত! আর একদিন রসিদ গলায় 'টাই' না লাগিয়ে ছেলেদের ডাইনিং হলে ঢুকেছিল, ফুট সাহেব তাকে ডেকে বললেন টাই পরে আসতে। আরও কিছু খিটিমিটি লেগেছিল সন্দেহ নাই। রসিদকে যেতে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত। ভাগ্যি, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বোখারী সাহেবের সঙ্গে রসিদের আলাপ ছিল। বোখারী তখন চাকরি-দেনেওয়ালা অল ইণ্ডিয়া রেডিও, দিল্লী ষ্টেশনে কাজ করেন। দু'বছর মাত্র বোধ হয় রসিদ ডুন স্কুলে ছিল। দিল্লী রেডিও ষ্টেশনে কাজ নিয়ে সে চলে গেল। যাবার সময় কায়দা করে আর একটি মুসলমানকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। বাকের আলী, স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের বাড়ীতে তাঁর ছেলের টিউটর, সুতরাং কাজটা পেতে তার বিলম্ব হ'ল না। বাকের আলী যথার্থ মুসলমান। টাইপ্যাণ্ট পরলেও 'মডার্ণ' নন,—একেবারে তুর্কী টুপী-পরা সাচ্চা লোক। মোটা গলা, গাট্টাগোট্টা। গজল গাইত সে ভাল। প্রথম সপ্তাহেই তার পরীক্ষা হয়ে গেল।

ডুন স্কুলে মারধোর করবার নিয়ম নেই। কিন্তু বাকের আলীর চ'চড়ে মাথার টনক নড়ে গেল একটি ছেলের। মারা ছাড়া অন্য উপায় বোধ করি ছিল না বাকের আলীর হাতে। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি।

বাকের আলী গিয়েছিল হায়দ্রাবাদ হাউসে ষ্টাডি টাইমে। নতুন মাষ্টারকে একটু পরখ করে দেখতে চায় সব ছেলেরাই! একটি ছেলে খুব শক্ত একটি অংক তাকে বুঝিয়ে দিতে বলে। বাকের প্রথম প্রথম দাঁড়িয়ে অংকটি দেখছিলেন, পরে চেয়ারে বসতে যাবার সময় একটি ছেলে পিছনের চেয়ারটি টেনে সরিয়ে দেয়। তাতে বাকের আলী আচমকা মাটিতে পড়ে যান! সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের দল হো হো করে হাসির তুফান তোলে। এ অবস্থায় বাকের আলী আর কি করতে পারেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছেলেটিকে বিরাশী সিক্কার এক চড় লাগালেন। ছেলেটি ভাবে নি তার কাছে এমন ওজনের চড় মজুত আছে। রুখে সে বলল—'স্যার, ডুন স্কুলে মারার নিয়ম নেই।' তার উত্তরে বাকের আলী অন্য হাতে, অর্থাৎ বাঁ-হাতে ঠিক আগেরটির মত সমান ওজনে আরেকটি চড় মেরে বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর দু'হাতই সমান চলে। বলেন—'মারবার নিয়ম নেই, মাষ্টারকে বসবার সময় চেয়ার টেনে ফেলে দেবার নিয়ম আছে না কি?' পরে বাকের আলীকে নিয়ে ছেলেরা আর কোন রসিকতা করে নি। সব ঠাণ্ডা! বরং কতকগুলি ছেলে বাকের আলীর চেলা হয়ে গেল। গায়ের জোরের কাছে সবাই মাথা নীচু করে!

বাকের আলীও অবশ্য টি'কল না বেশীদিন। ফুট সাহেবের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে তিনি বিদায় হলেন। এবার তাঁর জায়গায় এলেন 'আসরাফ' সাহেব—অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। কাগজে বার হ'ল—'আসরাফ Man with a golden voice joined the Doon School! বুঝলাম, ভদ্রলোক পাবলিসিটি করতে জানেন। ইনিও থাকেন নি বেশীদিন, বিলেতে 'স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজে' চলে যান খুব সম্ভবত! এমনি করে একজন আসে, একজন যায়! চলছে প্রতিবছর একজিট আর এনট্রেন্স—ডুন স্কুলে। মিষ্টার লাল, বার এট্ ল, M. Ed. আসলেন—ছ' মাসেই গেলেন। বসির আলী বায়োলজি পড়াতেন, হকির খেলোয়াড়—তিনিও গেলেন। মেননও গেলেন। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, ডুন স্কুল হচ্ছে place of stepping stone.

এঁদের বদলে এসেছিলেন কয়েকজন ভাল লোক। সুলেমান ব্যাংলার—বেশ লোক! এক বছরও টি'কলেন

না, ফুট সাহেবের সঙ্গে বনল না। অনেক উপযুক্ত লোককেই ডুন স্কুল রাখতে পারে নি।

লাণ্ডন ক্লাফ্

ইংরেজ সাহেবদের মধ্যে যে সবাই খুব আনন্দে ছিল তা' নয়। লাণ্ডন ক্লাফ বলে একজন ডুন স্কুল আরম্ভ হিগিনবটমের মেয়ে। ক্লাফ, লোকটি রসিক, সঙ্গীতপ্রিয়, একটু রগচটা 'একসেনট্রিক' ছিলেন। গুণ ছিল তাঁর আরও অনেক। পিয়ানো বাজাতেন ভাল, অনেকগুলি ভাষাও জানতেন। বছর খানেকের মধ্যে হিন্দী শিখে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। ডুন স্কুলে অন্য কোন ইংরেজ

শ্রমরত:

হবার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন অবিবাহিত অবস্থায়। ডুন স্কুলে এসে তিনি প্রেমে পড়লেন। এলিজাবেথ হিগিন-বটমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এলিজাবেথ ডুন স্কুলে মেট্রনের কাজ করছিলেন। ইনি এলাহাবাদের ডাক্তার ক্লাফের মত হিন্দী বলতে শেখে নাই বহু বছর ভারতবর্ষে থেকেও। ক্লাফের ধরন-ধারণে ও চেহারায় একটু ক্লাউনের ভাব ছিল। মাথার এক জায়গায় একগোছা চুল পাকা ছিল, একটি পায়ে দোষ থাকায় একটু খুঁড়িয়ে চলতেন।

তবু, তাঁর খেলাতে, দৌড়-ঝাঁপে উৎসাহের কমতি ছিল না। টেনিস, স্কোয়াশ, এমন কি হকি-ফুটবলেও সমান উৎসাহে যোগ দিতেন। অথচ, ফুট সাহেবের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল, যা আমরা জানতে পারি নি। হঠাৎ এই ক্লাফ সাহেব ডুন স্কুল ছেড়ে দিল্লীতে পাবলিসিটি ডিভিসনের ডিরেক্টর হয়ে চলে গেলেন।

হাণ্টার বয়েড

হাণ্টার বয়েড বলে একজনকে ফুট চাকরি দিয়ে নিয়ে এলেন বায়োলজী পড়াবার জন্য। ইনি বিবাহিত এবং এর স্ত্রী হাসিখুসী ও মিশুকে ছিলেন। এগ্রিকালচারের সখ ছিল হাণ্টার বয়েডের। চাষ করবার জন্য ইস্কুল একজোড়া বলদ কিনে বসল, লাঙল চলতে লাগল, তিনি নিজেই চালাতেন কখনও কখনও। আর কিনে বসলেন একপাল ভেড়া। ভেড়াগুলো কেন কেনা হয়েছিল ঠিক বুঝতে পারি নি এখনও। হাণ্টার বয়েড ভেড়াগুলোকে বাঁশের বেড়া দিয়ে কখনও এখানে, কখনও ওখানে ঘিরে রাখতেন। জোর 'কম্পোষ্ট সার' তৈরী আরম্ভ হ'ল। ছেলেরা বায়োলজি ক্লাস না করে ঐ সব করতে লাগল। তারপর ভেড়াগুলো কোথায় গেল মনে নেই; সম্ভবতঃ বিক্রী করে দেওয়া হ'ল! হাণ্টার বয়েডও কাজ ছেড়ে চলে গেলেন—বোধ হয় দার্জিলিঙে!

আমার সঙ্গে একদিনে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও সবাই একে একে ছেড়ে গেলেন। ডক্টর ভাই গেলেন, আর. এল. মেহতা গেলেন। পুরণো আমরা তিন-চারজন আর কয়েকজন সাহেব ছাড়া সবাই নতুন এসে গেল। মেহতা ইংরেজী পড়াতেন ভাল, অক্সফোর্ডের চাল ছিল তাঁর। এখন তিনি স্কুল মাষ্টারী ছেড়ে বড় I.A.S. অফিসার।

সিদ্ধার্থাচারী

মিঃ মেহতার বদলে যিনি এলেন তিনি সিদ্ধার্থাচারী। ইনিও অক্সফোর্ড থেকে সোজা ডুন স্কুলে এলেন। প্রতিভাবান যুবক এই 'চারী'। তিনি ডুন স্কুলে 'চারী' নামে পরিচিত হলেন। ইনিও ডুন স্কুলে দু'তিন বছর ছিলেন মাত্র। চারী ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছিল বিলেতে। যতদূর স্মরণ হয়—চারীর নিজ মুখে শোনা—তাঁর বাবা বার্মা কিংবা ইন্দোনেশিয়াতে ব্যারিষ্টারী করতেন। আসলে তাঁরা ত্রিবাংকুরের লোক। ছেলেকে শিক্ষা দেবার জন্য কৈশোরেই বিলেত পাঠিয়েছিলেন। বিলেতের কোন স্কুলে ও অক্সফোর্ডে তাঁর শিক্ষা হয়। যুদ্ধের বাজারে তার বাবার সঙ্গে contact হারিয়ে যায়। ডুন স্কুলে চাকরি নিয়ে চারী বিলেত থেকে ফিরে আসে। ডুন স্কুলে যোগ দেবার সময় তাঁর বয়েস বাইশ কি তেইশ বছর মাত্র।

চারী যখন ডুন স্কুলে যোগ দেন, তখন আমি একলা কোয়াটারে ছিলাম। আমার মা ও শ্যামলী শিলেটে দিদির কাছে ছিলেন। চারী এসে আমার কোয়াটারে ছিল প্রায় বছর খানেক। সেইজন্য আমি তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিলেতে শিক্ষা পেয়ে স্বভাবতঃই সাহেবী ভাবাপন্ন হবার কথা; কিন্তু তা না হয়ে চারী দেশী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ফুট সাহেব এটা একেবারেই আশা করেন নি। ডুন স্কুলের কাজের এক মাস যেতে-না-যেতে চারী হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গায় চান করে কপালে তিলক কেটে রীতিমত ব্রাহ্মণ সেজে ফিরে এল। ক্লাসে ছেলেদের সে যখন-তখন স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে, তারা ভারতীয়, সাহেবী নকলনবিশী করে নিজেদের হীন প্রতিপন্ন করার কোন অর্থ নেই। সংস্কৃত ও হিন্দী শিখবার জন্য সে কয়েকজন মাষ্টার ঠিক করে নিয়মিত শিক্ষা আরম্ভ করল। দেরাডুনের ফেব্রুয়ারীর প্রচণ্ড শীত একটু কমলে সে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ক্লাসে যাওয়া সুরু করে দিল। ডুন স্কুলে গ্রীষ্মের সময় একমাত্র আমি পাঞ্জাবী পাজামা পরে ক্লাস করতাম। চারী আমাকে টেক্কা দিল; সে খদ্দরের ধুতি পরে ক্লাসে যেতে লাগল। ছেলেরা তৎসত্বেও তার ভক্ত হয়ে উঠল। ফুট সাহেব প্রমাদ গুণলেন—তিনি এতটা আশা করেন নি। অথচ কোনদিকেই চারীর দোষ খুঁজে পান না, চারী না কি পড়াতেও পারে খুব ভাল—ছেলেদের কাছেই শুনলাম। ছেলেদের দিয়ে প্রথম বছরই ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনয় করিয়ে ফেলল। ছেলেরা চারীকে পেয়ে খুব খুশী। এত পপুলারিটি সহ্য করা মুস্কিল।

কেলু নায়ারের নাচ হবে, কথাকলি নাচ! চারী নাচের আগে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। নিজেদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার আবশ্যকতা

যে কতটা দরকার, আমাদের সেইদিকে ডুন স্কুলের ছেলেদের নজর দিতে বললেন বার বার। বাঁদরের মত ইংরেজ ও বিলেতী সংস্কৃতির নকল করে পৃথিবীর লোকের কাছে হাস্যাস্পদ না হয়ে প্রকৃত ভারতীয় হয়ে পৃথিবীর লোকের কাছে সম্মানের পাত্র হওয়াতেই আনন্দ সব থেকে বেশী। ফুট সাহেব চারীর লেকচার শুনে নিরাশ হলেন বোধ হয়। অনেকের ধারণা জন্মাল যে আমার সঙ্গে থেকে চারী এই রকম উগ্র ভারতীয় ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। আমার সঙ্গে চারীকে থাকতে দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। যাই হোক নাই। কিন্তু ডুন স্কুলের পরম ক্ষতি হয়েছিল, সেকথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে। এমনি করেই একে একে ডুন স্কুল ছেড়ে গেছে ভাল ভাল লোক, তার খবর কেই বা রাখে।

লাহোরে একক প্রদর্শনী: ১৯৪১

১৯৪১ এর শীতের ছুটি। লাহোরে প্রদর্শনী করব নিজের ছবির। পাঞ্জাব 'লিটারেরী লীগের' সেক্রেটারী ছিলেন ডি. চৌধুরী। আমার ছবির একক প্রদর্শনী করতে তাঁরা রাজী হলেন তাঁদের নিজেদের হলে। লাহোরে

রবীন্দ্রনাথ

পরের টার্মে চারী নতুন কোয়ার্টারে চলে গেল। এবং এক ছুটিতে দেশে গিয়ে একটি নেহাতই ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করে ফেলল। কিছুদিন পরেই ফুট সাহেবের সঙ্গে সামান্য কি বিষয়ে চারীর মনোমালিন্য হ'ল এবং দিল্লীর পাব্লিসিটি ডিভিশনের কাজ নিয়ে সে ডুন স্কুল ত্যাগ করল।

আমি যতদূর চারীকে জেনেছিলাম। মাষ্টারীর জন্য লোকটি একেবারে 'আইডিয়েল', এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। মাষ্টারীর কাজ চারীর নিজেরও খুব ভাল লাগত। এবং ডুন স্কুল ছেড়ে যেতে তার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। চারীর কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া চারীর পক্ষে আর্থিক ক্ষতিকর হয় আগে কোনদিন যাই নি। সুযোগ পেয়ে গেলাম। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে লাহোরে রওনা দিলাম ছবির বোঝা নিয়ে। সুবিধা হ'ল রসিদ লাহোরে থাকাতে। সে সেখানকার অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টর। তার বাড়ীতেই গিয়ে উঠলাম। আগে থেকেই ঠিক ছিল রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে আধঘন্টা, দশ মিনিট করে তিনবার। আরেকদিন পনের মিনিটের একটি প্রবন্ধ, শিল্প-বিষয়ক। 'Early life of an artist' নাম দিয়ে নিজের কথাই লিখেছিলাম, সেইটাই পড়ে দিয়েছিলাম। পরে লেখাটি 'টিচিং' ও অন্যান্য পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ছবির প্রদর্শনী

করার চেয়ে রেডিওতে গান ও বলার জন্তই আমার উৎসাহ ছিল বেশী। গাইতে তখন আমার সত্যি ভাল লাগত, শোনাতেও।

মনে আছে, একদিন লাহোরের 'ওপন্ এয়ার থিয়েটার'এ কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে আমায় গাইতে অনুরোধ করা হল। আমি খুশী হয়ে রাজী হয়ে দুটো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে দিলাম। শ্রীমতী সতী দেবীও সেদিন গেয়েছিলেন—ঐ যিনি 'এ ত খেলা নয় খেলা নয়—এ যে হৃদয় দহন জ্বালা' গানটা বহুকাল আগে রেকর্ডে দিয়েছিলেন। লাহোর জায়গাটা তখন ছিল বেশ! আমার ত মনে হয়েছিল—'ল্যাণ্ড অব ওমর খৈয়াম'। মেয়েগুলো লম্বা ও ফর্সা, বেশীর ভাগই সালোয়ার কামিজ পরা, লজ্জার বালাই বিশেষ নেই, দেহে স্বাস্থ্য থাকলেও কমনীয়তা ও লাবণ্যের অভাব চেহারায়। তবু সুন্দরী তারা! 'লিটাটরি লীগের' হলে আমার ছবির প্রদর্শনী সাজানো গেল। গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ জি. ডি. সোন্ধী ছিলেন তখন। তিনি প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন। লাহোরের ফ্যাশান-দুরস্ত সোসাইটির ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা প্রদর্শনীতে এলেন। ছবির সংখ্যা অনেক ছিল, তবে ছবি বাছাই করা ছিল না। নানান রকম, —ভাল-মন্দ—সবই মিশানো ছিল। সোন্ধী সাহেব ও আরও দু'একজন কয়েকটি ছবি ও স্কেচ কিনলেন। প্রদর্শনী করবার ও লাহোরে যাওয়ার খরচটা উঠে গেল। খবরের কাগজে রিভিউ বার হ'ল। ছবির আলোচনা বিশেষ কিছু তেমন বার হ'ল না, সোন্ধী সাহেব প্রদর্শনী খুলবার সময় কি বললেন তারই বহরে ছবির সমালোচনা বেমালুম চাপা পড়ে গেল। আর তখন ছবির সমালোচনা করবেই বা কে? খবরের কাগজের রিপোর্টাররা তখনও অতটা শিল্প বিষয়ে সজাগ হয় নি। এখনকার দিনে অবশ্য প্রদর্শনী খুললে দিশী ও বিদেশী স্বল্পজ্ঞান আর্ট ক্রিটিকদের জ্বালায় ছবিগুলোর আসল মর্যাদা কেউ বুঝবার অবসর পায় না। তাঁদের মতামতের হেরফের নিয়ে খবরের কাগজে চিঠির পর চিঠি বার হতে থাকে।

প্রিন্সিপ্যাল সোন্ধী

প্রদর্শনীতে বহুলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বহু পুরাতন জানাশোনা লোকদের সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হ'ল এই প্রদর্শনীতে। প্রিন্সিপ্যাল সোন্ধীর বাড়ীতে একটি লাঞ্চ-পার্টিতে নেমন্তন্ন হ'ল। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সোন্ধী সাহেব 'সেলফ এক্সপ্রেশন' বিষয়ে কতকগুলি অদ্ভুত মতামত করেছিলেন সেদিন খাবারের টেবিলে মনে আছে। বলেছিলেন, 'দুন স্কুলে নানান রকম spare time activities আছে, যা ছেলেদের সেলফ এক্সপ্রেশনের পক্ষে ভাল। আমাদের গভর্ণমেণ্ট কলেজের তা নেই বটে, তবে ছেলেদের সেলফ এক্সপ্রেশন খানিকটা প্রকাশ পায় তাদের জামাকাপড়ে। গভর্ণমেণ্ট কলেজে ছেলেরাই সবচেয়ে ভাল এবং নতুনত্বপূর্ণ জামা-কাপড় পরে থাকে। হোক না বিলেতী নকল! তাতে ক্ষতি কি?

সত্যিই লাহোরের ফ্যাসানেবল্ সোসাইটি খুব বেশী বিলেতী অশনবসন নকলপ্রিয় ছিল; এখনও বোধ হয় আছে। এ রকমটি ভারতের আর কোন প্রদেশে নেই। নিজস্ব কিছু না থাকলেই কি এ রকম নকল স্পৃহা দৈন্যদশা হয়?

ভবেশ সান্যাল ও অন্যান্য শিল্পী

লাহোরের রিগেল বিল্ডিংএ সেসময় ভবেশ সান্যাল মশায়ের ষ্টুডিও ছিল। একটা ছোটখাটো আর্ট স্কুলের মত। লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্টস্-এর ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। সে কাজ ছেড়ে এই প্রাইভেট ষ্টুডিও করেন। গভর্ণমেণ্ট-চালিত মেয়ো কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল না। পুরাণো প্রবাসীতে তাঁর আঁকা ছবির প্রিন্ট দেখেছিলাম। অসিতদার (হালদার) মুখে তাঁর বিষয় অনেক কথা শুনেছিলাম। সাহস করে তাঁর সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠে নি। ভবেশ সান্যালের ষ্টুডিওতে অনেক তরুণ-তরুণী শিল্পীদের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর ষ্টুডিও দেখে খুব ভাল লেগেছিল। ভদ্রলোক বাংলা দেশের ছেলে লাহোরে এসে পাঞ্জাবী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দিব্যি ষ্টুডিও খুলে মনের আনন্দে আছেন দেখে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হয়েছিলাম। পাঞ্জাবে শিল্পজ্ঞান কি করে হ'ল যদি আলোচনা করা যায়, তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এই সব বাঙালী শিল্পীরাই তার সূচনা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র—সেখানে গিয়েছিলেন মেয়ো স্কুল অব আর্টসের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে বেশ কিছুকাল আগেই। ভবেশ সান্যালও সেই কলেজে কিছুকাল ছিলেন। আবদার রহমান চাঘতাই

প্রথমে কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের কাছেই শেখেন। আরেক-জন পাঞ্জাবী শিল্পী ও তাঁর ইংরেজ স্ত্রীর নাম না করলে অবশ্য অন্যায় হবে। তিনি হচ্ছেন রূপকৃষ্ণ ও মেরী রূপকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ বুক শপ—লাহোরের বিখ্যাত বইয়ের দোকান ছিল। এখনও সেটা আছে কি না জানি না। রূপকৃষ্ণ এই বইয়ের দোকানের মালিক ছিলেন। বই বিক্রী ও ছবি দুই কাজই তাঁর চলত পুরোদমে। স্ত্রীও আর্টিষ্ট, বড় বড় ক্যানভাসে ছবি আঁকেন। উগ্র মডার্ণ ছবি এঁকে নাম করবার প্রয়াস দু'জনের মধ্যেই ছিল। এই রূপকৃষ্ণ কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। এঁরা ছাড়া চুনোপুঁটি অনেক শিল্পীই বসবাস করত তখন লাহোরে। পাঞ্জাবী ফ্যাশনদুরস্ত অনেক মেয়েরাই ভবেশ সান্যালের ষ্টুডিওতে কাজ শেখবার জন্য যাতায়াত করত। লাহোরে মূর্তিকার বলে বিশেষ কেউ ছিল না তখন। ভবেশবাবু মূর্তিও গড়তেন ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে। মনে আছে, এঁরই ষ্টুডিওতে ধনরাজ ভকত বলে একটি ছেলে কাজ শিখতে আসত। ভবেশ সান্যালের কাছেই তার হাতেখড়ি। তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে, ছেলেটির হাত ভাল, খাটতেও জানে। লেগে যদি থাকে তবে উৎরে যাবে। সেই ছেলেটি সত্যই উৎরে গেছে এখন দেখা যাচ্ছে। সেই ধনরাজ ভকত আজকাল দিল্লীতে কাজ করে নাম করেছে। একেবারে গুরুমারা বিদ্যে যাকে বলে।

লাহোরে প্রদর্শনী করে ফিরে এলাম দেরাদুনে। তখনও ছুটি চলছে। শীত, বৃষ্টি বাদলা! একলা বাড়ীতে বসে বসে ছবি আঁকি। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা ছাড়া আর গতি নেই। নিঃসঙ্গ ছুটির দিনগুলো ছবি এঁকে, মূর্তি এঁকে কাটাতে লাগলাম।

উগ্রসেন

উগ্রসেন দেরাদুনের ধনী মহাজন। বিলেতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেছিলেন। দিলদরিয়া মেজাজের অথচ ব্যবসায়ী বুদ্ধিও রাখেন। দেরাদুনে জমিজমা, বহু ঘরবাড়ী তাঁর সম্পত্তি। কাজ তাঁকে করতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষা ও বাড়ানোই তাঁর কাজ। আমার কাছ থেকে তিনি ছবি কিনেছিলেন কতকগুলি। তাঁর মূর্তিও আমি গড়েছিলাম। মাঝে মাঝেই আমার কাছে এসে নতুন কি কাজ করছি দেখে যেতেন, বন্ধু-বান্ধব নিয়েও আসতেন প্রায়ই। এই ছুটির মধ্যে একদিন এসে হাজির। সহরের ময়দানের পাশের রাস্তার উপর তাঁর বাড়ী। যেখানে ওরিয়েন্ট সিনেমা, সেটাও তাঁর সম্পত্তি। সেই সিনেমার গায়ে প্রকাণ্ড দুটো রিলিফ কাজ করে দেবার জন্য তিনি আমায় বললেন। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। বাকী ছুটিটা মাচার উপর চড়ে রিলিফ মূর্তি দু'টি সিমেন্ট দিয়ে করে ফেললাম।

(ক্রমশঃ)

———

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববঙ্গ-প্রীতি

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের খুব স্নেহের ও প্রীতির চোখে দেখতেন। তাঁহার শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী ও বয়স্ক ব্যক্তি ও বয়স্কা মহিলা ছিলেন যাদের বাড়ী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। পূর্ব্ব বাংলার এক কোণে ছিলেন অনাদৃত-ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে বার বৎসরের বিধবা সুকুমারী দেবী। গুণগ্রাহী গুরুদেব তাঁর আলপনা দেওয়ার কথা শুনলেন শিক্ষক কালীমোহন ঘোষের নিকট। তাঁর কথা শুনেই গুরুদেব আগ্রহভরে তাঁকে এনে স্থান দেন কলাভবনের মধ্যে। আজ শান্তিনিকেতন যে আলপনার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করেছে তার মূলে রয়েছেন ঐ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীবালা। পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী শুনলে তাঁর যে কত আনন্দ হ'ত! শান্তিনিকেতনের প্রাচীন শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ কমলা দেবীর বাড়ী যশোহর জেলায়। কমলাদেবী গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। গুরুদেব প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার দেশ কোথায়?" কমলা দেবী যশোহর জেলায় বলায় তিনি শিশুর মত বলে উঠলেন,—"আরে, সে যে আমারও দেশ। জান বৌমা, আমার মামার বাড়ী, বাবার বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী সব তোমাদের দেশে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তুমি, নিশ্চয়ই রাঁধতে জান। চৈ কচু আর বড়ি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রাঁধতে পার?" যশোহর জেলার এক রকম লতা গাছের শিকড় চৈ। এটি রান্নায় দিলে স্বাদও বাড়ে, আর শরীরের পক্ষে উপকারী। গুরুদেব এই জিনিষটি বড়ই ভালবাসতেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের পিঠেপুলি মিষ্টান্নের খুব ভক্ত ছিলেন। শিক্ষক নেপালবাবুর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। গুরুদেব মাঝে মাঝে নেপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করতেন, "কি হে, তোমাদের পৌষ পার্ব্বণের আর কত দেরি?" তখন নেপালবাবুর বাড়ী থেকে কমলা দেবীর ও তাঁর শাশুড়ীর হাতে-গড়া নানারকম পিঠে তাঁকে পাঠাতেন। একবার হাসি নামে একটি মেয়ে এল পড়তে শান্তিনিকেতনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। ভর্তি হয়ে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল উত্তরায়ণে। নবাগতা ছাত্রীটি পূর্ব্ববঙ্গ অধিবাসিনী শুনে তিনি একটু হেসে বললেন, "দেখেছ মজা-পদ্মার এ পাড়ের কেহ এখানে আসে না। তা তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে, থাক এখানে।" পদ্মা-পারের মেয়েকে তিনি স্নেহ করতেন। হাসি খুব ভাল গাইতে পারতেন। শাপমোচন অভিনয়ের মহড়ায় হাসি সমবেত কণ্ঠের গানের দলে স্থান পেলেন। এহেন সময়ে হাসির আঙুলে বুনোকুলের কাঁটা ফুটল। ফলে অপারেশন করতে হ'ল। গুরুদেবের হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল হাসির হাতে। সব শুনে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করলেন তাঁকে না জানিয়ে ছুরি চালনার জন্য। তৎক্ষণাৎ বায়োকেমিক বাক্স খুলে হাসির আঙ্গুলের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন।

বরিশালের বানরিপাড়া গ্রামের গুহঠাকুরতা বংশের কিশোরী মেয়ে লাবণ্য এলেন শান্তিনিকেতনে। তিনি তাঁকে স্থান দিলেন তাঁর দুই মেয়ে বেলা ও মীরার সঙ্গে। গুরুদেব তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। গুরুদেব প্রভাতী জলযোগের সময় জননীর মত একটি বড় পাত্রে এক টিন বিলাতী দুধ, পরিজ, জ্যাম ও কলা প্রভৃতি ফল একত্র করে কাঁটা চামচের সাহায্যে সুন্দরভাবে মিশিয়ে তিন কন্যার পাতে পরিবেশন দৃশ্য যখনই লাবণ্যদেবীর মনে পড়ত, তখনই তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে উঠত। এই পূর্ব্ববঙ্গীয় বালিকা গুরুদেবকে পিতঃ সম্বোধনে চিঠি দিতেন, গুরুদেবও তাঁকে মাতঃ সম্বোধনে জবাব দিতেন।

১৯২৬ সাল। পূর্ব্ববঙ্গ সফরে বের হয়েছেন বিশ্বকবি। ঢাকা সহরে আসছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে। ঢাকায় তুমুল হৈ চৈ। কবিগুরুর যোগ্য সমাদরে যাতে কোন ত্রুটি না হয় সহরবাসী সেই আয়োজনে ব্যস্ত। সহস্রাধিক নরনারীর এক বিরাট শোভাযাত্রায় মহাসমারোহে তাঁকে নিয়ে এলো বুড়ি-গঙ্গার তীরে। নদীবক্ষে তুরাগ নামে সুসজ্জিত এক লঞ্চে তাঁর বাসস্থান রচিত হ'ল। একদিন 'তুরাগে' তিনি বসে আছেন তাঁর আরাম-কেদারায়। কয়েকটি ঢাকার মেয়ে তাঁকে ঘিরে বসে আছে, তিনি তাঁদের একটি গান শিখালেন "বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা নিয়ো হে নিয়ো।" গান শেখা শেষ হ'লে কৌতুক করে হেসে বললেন। "দেখ, তোমরা যেন আবার গেয়ো না, বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা।" মাথা দোলাচ্ছেন, বললেন, উঁহ

ঢাকাই মেয়েকে দেখছি, একেবারেই কাজের নয়, ঢাকাই মশায়া কিন্তু বড় কাজের, কি রকম নিরলস পদসেবা করছে।"

তিনি পূর্ব্ববঙ্গের মহিলাদের রন্ধনপটুতাকে খুব প্রশংসা করতেন, তাঁদের হাতের রান্না খেতে খুব ভালবাসতেন, একবার সুধীর কর মহাশয়ের মা কামিনীদেবী এলেন ফরিদপুরের সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে শান্তিনিকেতনে। একদিন গুরুদেব সুধীর কর মহাশয়কে বললেন, "ওহে, শুনলাম তোমার দেশ থেকে তোমার মা এসেছেন, খুব যত্ন করে যে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন তা ত তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।" সুধীর কর মহাশয় অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলেন, 'মা'র ইচ্ছা, তিনি আপনাকেও একদিন রেঁধে খাওয়ান।' গুরুদেব স্মিতহাস্যে বললেন, "উত্তম প্রস্তাব"। পরদিন কর মহাশয়ের মা সুক্তোনি, ঝিঙে পাতুরী, মাছের মুড়োর ডাল, কচি আমের পাতলা ডাল, মাছের ঝোল, পাটিসাপ্টা ও রসকুমারী প্রভৃতি রেঁধে গুরুদেবের খাবার জন্য নিয়ে গেলেন। গুরুদেব সেই সুক্তোনি, পিঠে পায়েস পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে প্রশংসা করলেন। গুরুদেব তাঁর রান্না খেয়ে এত খুশি হয়েছিলেন দেখে এর পর থেকে তিনি মাঝে মাঝে কিছু-না-কিছু রান্না করে পাঠিয়ে দিয়ে ধন্য মনে করতেন। রান্নার মধ্যে বেশির ভাগ নিরামিষ রান্না ও পূর্ব্ববঙ্গের পিঠেপুলি ক'রে দিতেন। তিনি তা খেয়ে খুব সন্তুষ্ট হতেন। ১লা বৈশাখের আগের দিন গুরুদেব বলে পাঠালেন, "কাল কয়েকটি বন্ধুবান্ধব খাবে, ঘি তেল আনাজপাতি চাল ডাল সব উত্তরায়ণ থেকে যাবে, কিন্তু রেঁধে দিতে হবে। কামিনীদেবী রান্নার জিনিষের অতিরিক্ত চেয়েছিলেন একটি নারকেল। সেই নারকেল দিয়ে রাঁধলেন অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন, তা ছাড়া তেতো সুক্ত, ঝিঙে পাতুরী, বিট গাজর দিয়ে ডালনা, লাউ-ঘণ্ট, চিংড়ে দিয়ে মুড়িঘণ্ট, মাছের রসা, কালিয়া, আমের অম্বল ইত্যাদি অনেক রকম। গুরুদেব বন্ধুস্বজন সঙ্গে নববর্ষে ফরিদপুরের পল্লীবাসিনীর হাতের সযত্ন রান্না খেয়ে বিশেষ পরিতৃপ্ত হলেন।

গুরুদেবের স্নেহধন্য ও স্নেহধন্যা যাঁরা তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গবাসী। রাণীচন্দ ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্রীদের একজন। তাঁর বাড়ী ছিল বিক্রমপুর। বিক্রমপুর থেকে কলকাতা এলেন মা'র সঙ্গে। বড়দা বিলাত থেকে দেশে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে এলেন শান্তিনিকেতনে। গুরুদেবকে এসে প্রণাম করলেন। তিনি মেয়ের মত তাঁকে স্নেহ-অঙ্কে টেনে নিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে বলে গুরুদেব আদর করে বলতেন 'পদ্মাপারের মেয়ে।' কখনও বা পদ্মানদীর গল্প করতেন তাঁর সঙ্গে। একদিন তাঁকে বললেন গুরুদেব, পদ্মাপারের মেয়ে, বল্ ত তুই কখনও জল এনেছিস কলসী কাঁখে করে। তিনি বলতেন 'হুঁ', কতবার, দিদিমা আমাদের দু'বোনকে দুটো ছোট ছোট পিতলের কলসি কিনে দিয়েছিলেন। গুরুদেব বলতেন, "এই সহুরে মেয়ে বিশ্বাস করে না, বলে' কলসি কাঁখে জল আনা, ও না কি কবিত্ব করে বলা। রাণী গুরুদেবকে শুনান তার বিক্রমপুরের মামাবাড়ীর বর্ষার কথা, মাছ ধরার রকমারী কৌশল, সুবচনী মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কথা। গুরুদেব একমনে শুনেন সুবচনী মঙ্গলচণ্ডি ব্রতকথা। মাঝে মাঝে দু'চোখ বড় বড় করে বলে ওঠেন, "হ্যাঁ, এমনতরো আশ্চর্য্য ঘটনা! গুরুদেব বিয়ে দিলেন তাঁকে অনিল চন্দ নামক একটি বিলাত-ফেরত ছেলের সঙ্গে। অনিল চন্দেরও পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী, সিলেট। গুরুদেব অনিল চন্দকে তাঁর "সেক্রেটারী" করেন। গুরুদেব মন্ত্র পড়লেন তাঁদের বৈদিক বিবাহে। রাণী চন্দ তাঁর স্নেহে ধন্যা হয়ে "গুরুদেব" বই লিখেন।

তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের স্নেহসিক্ত ভক্ত অনুরাগী জ্ঞানী গুণী সুধীজন প্রায় সকলেই ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের। তাঁর গুরুদেবের অসামান্য স্নেহের জন। তিনি তাঁদের স্নেহ করতেন, তাঁদের সঙ্গে কৌতুক করতেন, অন্যায়ে শাসনও করতেন।

———

'তিনমূর্তি' নিবাস : দিল্লীতে নতুন স্মৃতিশালা

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দেবালয় ত বটেই, আরও অনেক জায়গা এবং নিবাস আছে যেখানে গেলে সম্ভ্রম আর ভক্তিতে মাথা আপনি নেমে আসে। দিল্লীর তিনমূর্তি নিবাস তেমনি একটি স্থান চিহ্নিত হয়েছে ভারতের মানচিত্রে।

জওহরলাল একজন সংগ্রামী মানুষ। স্বাধীনতার সংগ্রাম, ভারত-সংগঠন সংগ্রাম, মৈত্রী ও বিশ্ব শান্তির জন্য সংগ্রাম। এই বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বের চাইতেও। এর মূল্যায়ন ঐতিহাসিক কিভাবে করবে তা বলতে পারি নে, তবে জওহরলাল ছিলেন মনেপ্রাণে ভারতেরই পথিক, সুতরাং 'পথে চলা সেই ত তোমার পাওয়া' যদি বিশ্বাস করি তবে আর কোন তর্ক মনে আসবে না। তার দোষ-ত্রুটি তলিয়ে যাবে কর্ম-যজ্ঞের হোমাগ্নিতে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯২৯-৩০ সালে তৈরী হয় এই তিনমূর্তি ভবন স্থপতি রাসেল সাহেবের তদারকিতে। উদ্দেশ্য ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ব্যবহার করবেন বসতবাটি হিসেবে। সামনে-পেছনে প্রকাণ্ড লন, ছোটবড় কত রকমের গাছ—দু'একটা বিদেশীও আছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ একর জমি। ভেতরটাও কম বড় নয়। একতলাতেই আছে ছ'টা শোয়ার ঘর, ছ'টা অফিস ঘর, একটা বসার ঘর, কেন্দ্রীয় হলঘর, ভেষ্টিবিউল, ক্লোকরুম। সামনে-পেছনে বারান্দা। দোতলায় শোয়ার ঘর আটটা, বসার ঘর দুটো, একটি পড়ার ঘর, একটি অফিস ঘর, দুটো খাওয়ার ঘর। আর একটা নাচের ঘর। নীচের তলার মতই সামনে-পেছনে বারান্দা।

বাইরে সবুজের সমারোহ, ভেতরে জমজমাট ব্যাপার, তবু বাইরের লোকের তাকানোও নিষেধ ছিল সেকালে। সঙীনধারী অতন্দ্রপ্রহরী সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে প্রায় দেড়যুগ ধরে। তারপর ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল উঠে এলেন ১নং মতিলাল নেহরু মার্গ থেকে এই তিনমূর্তি ভবনে। সেই থেকে ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে পর্যন্ত তিনি ব্যবহার করলেন তাঁর কর্ম ও চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে।

তাঁর জীবিতকালে হয়ত ভাবতে পারা যেত কত উদীয়মান রাজনৈতিকের স্বপ্নভূমি হয়ে উঠবে এই তিনমূর্তি ভবন। একদিন তারাও ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে এই বাসভবন থেকে। যেমনটি করে থাকে ইংরেজ প্রধানমন্ত্রীরা ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটের বাসভবন থেকে। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না। নতুন এক ঐতিহ্য গড়ে উঠল ৪,৭৫৪ বর্গফুট জোড়া ঐ দোতলা বাড়ীতে।

এই ঐতিহ্য বৃহত্তর ভারতের। লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু এই ভবনটি দেখবে ঘুরে ঘুরে। আজ ভাবাবেগে অনেকের প্রাণের ধারা অশ্রুজলে নির্গত হতে দেখেছি। হয়ত কাল বিবর্তনে এ বেগ ধীর ও প্রসারিত হবে। কর্মযোগী মানুষটাকে সহজভাবে মনে করতে পারবে। মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণা পাবে। প্রধানমন্ত্রীত্বটাই বড় কথা নয়। সবাই মিলে প্রধানমন্ত্রী হওয়াও যায় না। আসল কথা সমাজকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলা। তার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ক্ষমতা অর্জন করা। যে জনস্রোত এ ভবনটির মধ্যে প্রবাহিত হবে প্রতিদিন তার সামান্য মাত্র অংশও যদি কর্মে অনুপ্রাণিত হয় তবে এ ভবনকে স্মৃতিশালায় পরিণত করা সার্থক হবে।

নেহরু চরিত্রের বৈশিষ্ট মৈত্রীর প্রচেষ্টা। তারই প্রতীক মাঝের ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে তার পূর্ণাবয়ব আলোক-চিত্র নমস্কার করে স্বাগত জানাবার ভঙ্গিমায়। উপরে-নীচে সাজানো আছে নানা কলা-মূর্তি—স্বদেশী ও বিদেশী। নানা আলোক চিত্র পৃথিবীর বর্তমান ও অতীত কালের যুগস্রষ্টাদের, ভারতীয় অনেক সহযোগীর। ব্যক্তিগত ও পরিবারের সবার ছবি দেখতে পাওয়া যায়

বেশ কিছু। এগুলি মনকে তার আরও কাছে টেনে নিয়ে যায়। সেও ছিল আমাদের মতই রক্তমাংসের মানুষ। তথাপি নিজের ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারায় যুগান্তকারী পুরুষ। গঙ্গার মত সবার অন্তরে প্রবাহিত হয়ে কাল অতিক্রম করে নিত্যকালের হয়ে রইলেন। এ ছাড়া আছে বুদ্ধমূর্তি আর হিমালয়ের চিত্র—যা তাকে নানা-ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

তার অফিস ঘর—যেমন ছিল সেক্রেটারিয়েটে বিদেশী মন্ত্রণালয়। শোবার ঘরটি তারই ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাদাসিধে খাট। দুটো ছোট ছোট টেবিল। হাতের কাছে ঘড়ি। ভাঁজ-করা সবুজ কাপড়ের টুকরো। চোখে দিয়ে দৃষ্টির ক্লান্তি দূর করতেন। একটি কলম, টর্চ ও বোধিসত্ত্বের ছবি। গান্ধীজির ছবি এমনি ভাবে টাঙানো যে শোবার সময় ও ঘুম থেকে জেগে প্রথমেই তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আশে-পাশের দেয়ালে মা, আর কমলা নেহরুর ছবি; আর আছে তুষারাবৃত হিমালয়ের চিত্র।

করিডরের দু'দিকে বইয়ের গাদা। বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন সত্যিই কি জওহরলাল এত বই পড়তে পেরেছেন! কাজ ত অনেক! তবু পরিকল্পিত জীবনে অবসর আছে বৈ কি! তাকে উপভোগ করবার শক্তি অর্জন করতে হয়।

ঘরভর্তি দেশ-বিদেশের উপহার। দুনিয়া সফর করে ভারতকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন, এগুলি তারই সাক্ষ্য। তার নগদ মূল্য কতটা তা পরবর্তী কালের ইতিহাস বিচার করবে। মূল্যায়ন যাই হোক না কেন, তার প্রচেষ্টা চিরদিনই সহাবস্থান নীতির প্রয়োগ বলে স্বীকৃত হবে বলে বিশ্বাস করি। সত্যিই তাই মনে হয়েছিল—কেউ ত আমাদের পর নয়! আজকের পরমাণবিক যুগে যখন আমরা শূন্যে পদসঞ্চারণ করছি সাফল্যের সঙ্গে, চাঁদে পাড়ি দেয়ার বন্দোবস্ত করছি পাকাপাকিভাবে তখন পৃথিবীর বুকে দূরত্বের কথা চিন্তা করাও হাস্যকর। সবাই আজ ঘরের পাশের প্রতিবেশী।

শোয়া পড়ার মত কয়েকটা ঘরে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দরজায় চন্দ্রাকারের কাচ। ভেতরের সব দেখা যায়। ক্ষণিকের জন্য মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবশ্য একান্তই সাময়িক। কেননা সবাই যে এর মর্যাদা সমান ভাবে রক্ষা করবে তার কোন স্থিরতা নেই। আর তা যে করে না তার প্রমাণ ত ভুরি ভুরি।

দেখতে দেখতে যে প্রশ্ন মনে উদিত হয় তা হচ্ছে—যে দীপ ২৭শে মে ১৯৬৪ সালে নিভল তা কি সহস্র শিখায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে নি তার চিতাগ্নিতে, কর্মযোগের ধারা কি প্রবাহিত হবে না আমাদের এবং ভবিষ্যৎ মানুষের অন্তরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার শক্ত ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠায়। তা যদি না হয় তবে বৃথাই হবে 'জওহর জ্যোতি'র আড়ম্বর যা সারা ভারত পরিক্রমা করে এখানে এসে জ্বলতে থাকবে ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করতে।

———

রংয়ে রংয়ে রাঙালো পৃথিবী

বিভা সরকার

(পাওয়াই ডাইরেক্টরের উদ্যানে দাঁড়িয়ে)

পৃথিবীতে এত রং এত আছে আলো !
দিশাহারা হ'ল দৃষ্টি হৃদয় চমকালো—
আগুন লেগেছে বুঝি অসহ্য পুলকে !
খুলে গেল অন্তরের যত রুদ্ধদ্বার
মুহূর্ত্তে মিলাল বুঝি সব অন্ধকার
নন্দন কি নেমে এল এই মর্ত্ত্যলোকে ?
রাঙা সূর্য্য বিদায়ের আগে
প্রেয়সী এ প্রকৃতিরে চির অনুরাগে
মুঠি মুঠি বিলাইছে প্রাণের সোহাগ।
ক্ষয় ক্ষতি বেদনা ভাবনা
দৈনন্দিন জীবনের চিরন্তন দেনা
ক্ষণতরে আজ দূরে যা'গ।
ব্যাকুল বন্ধনহারা কিসের উচ্ছ্বাসে
বিশ্বের আনন্দ মূর্ত্তি
গুচ্ছে গুচ্ছে স্তবকে স্তবকে।
পুষ্পিত পুষ্পের শাখা
আবিরে কুঙ্কুমে ঢাকা
অপরূপ অস্ত সূর্য্যালোকে।

ধন্য বুঝি সেই মালাকার
যত্ন যার পেল পুরস্কার
অফুরন্ত জীবন উল্লাসে।
ফাগুন নয়ত তবু তুলি পুষ্পধনু
ধরিল অদৃশ্য তূণ আপনি অতনু
রতির আনন্দ বুঝি জাগে কলহাসে
রংয়ে রংয়ে রাঙা হ'ল পশ্চিম আকাশ
দিনান্তের সূর্য্য ঐ নামে অস্তাচলে
আবিরে ডুবিল যেন সমস্ত পৃথিবী,
রাঙা হ'ল আদিগন্ত পর্ব্বত শিখর
নদী স্রোতে তারই ছায়া কাঁপে থর থর
সেই রংয়ে রাঙা ফুল অপরূপ ছবি !
দিন আসে দিন যায় তবু তারি মাঝে
আনমনা কোনও দিন মধু ছন্দে বাজে
মন যেন খুঁজে পায় জীবনের মানে,
সুখ আছে দুঃখ আছে আলো অন্ধকার
নির্ভয়ে সমাপ্ত কর পথটি তোমার
হৃদয় ভরিয়া লও দেবতার দানে !

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিজ বাসভূমে—?

খাস্ বাঙ্গলায় অদ্যকার বাঙ্গালীদের কথাই বলিতেছি। স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্ত্ত হইতেই বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীকে সর্ব্বভাবে সর্ব্বদিক হইতে বঞ্চিত করিবার এই যে বিরাট চক্রান্ত দিল্লীর আম দরবারে চলিতেছে, এবং যাহার ফলে বাঙ্গলার বাহিরে কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের বে-পাত্তা হইতে হইয়াছে, এখন কেন্দ্রীয় দপ্তরখানায় সেই বাঙ্গালী-বিদ্বেষী চক্রীর দল, খাস বাঙ্গলাতেই বাঙ্গালীদের উদ্বাস্ত করিবার সকল আয়োজন প্রায় সমাপ্ত করিয়াছে। পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলিতে বাঙ্গলার ভাগ্যে কি জুটিয়াছে, নূতন করিয়া সবিস্তারে তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—ফরাক্কা বাঁধ, হলদিয়া তৈল শোধনাগার, কলিকাতার সারকুলার রেল, সি. এম. পি. ও-র যাবতীয় প্রস্তাব পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা ঘরেই জমা রহিয়াছে! বছরের পর বছর পার হইয়া গেল, আরও বছরের পর বছর অবশ্যই অতিক্রান্ত হইবে, পুরাণ ক্যালেণ্ডার বদল হইয়া নূতন ক্যালেণ্ডার আমরা বারবার দেখিতে থাকিব, কিন্তু নূতন বছরের নূতন তারিখ ছাড়া আর নূতন কিছুই চোখে পড়িবে না! এক হিসাবে দেখা যাইবে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী এখনও ১৯৪৭ সালের সীমানা পার হয় নাই, পার হইতে দেওয়া হয় নাই—! কৃষ্টি-প্রেমিক বাঙ্গালী এ-স্থিতাবস্থা অবনতশিরে মানিয়া লইয়াছে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বহু আশা, বহু আকাঙ্ক্ষা লইয়া দুর্গাপুর পত্তন করেন। তাঁহার আশা বাসনা এই ছিল যে, বাঙ্গালীরা এইখানে বিবিধ কল-কারখানা এবং প্রকল্পের নানা কর্ম্মে বাঁচিবার মত রুজি-রোজগারের যথেষ্ট অবকাশ পাইবে—এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বাস্তবে ইহার খানিকটা অন্তত সার্থক করিতে পারিতেন। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, অন্যান্যদের পক্ষে তেমনি এক মহা আশা আনন্দের কারণ হইল! একথা সত্য যে, দুর্গাপুরে কিছু কিছু বাঙ্গালী—এবং সুযোগ্য বাঙ্গালী—উচ্চ, মাঝারি, এবং ছোট ছোট নানা পদে প্রশংসনীয় ভাবে কাজ করিতেছিলেন—কিন্তু এইবার দুর্গাপুর হইতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত বাঙ্গালীদের বিদায় করিয়া পরিবর্ত্তে অবাঙ্গালী আমদানীর পাকা ব্যবস্থা হইতেছে—ইতিমধ্যেই এই বাঙ্গালী-বিতাড়ন (বা বঙ্গাল-খেদা) পুণ্যকর্ম্ম কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং গত কিছুকাল ধরিয়া বাঙ্গালী খেদানর যে নীতির গোপন প্রয়োগ হইতেছিল এইবার তাহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মাঝারি বা নিম্নস্তরের চাকুরির ক্ষেত্রেই নহে, এবার দুর্গাপুরে সর্ব্বোচ্চ পদে যে কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার, অর্থাৎ সংস্থা-প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদেরও সরাইবার পালা সুরু হইয়াছে।

দুর্গাপুর সার কারখানার প্রথম জেনারেল ম্যানেজার ডঃ সুবোধ মুখার্জ্জিই প্রথম বলি। একথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ডঃ মুখার্জ্জির জায়গায় অন্য কোনও অফিসার থাকিলে দুর্গাপুর সার কারখানা আদৌ প্রতিষ্ঠিত হইত কি না সন্দেহ। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এক বছর আগে ভিত্তি স্থাপন করিবার পরও এমন অনেক সঙ্কট আসে, যখন দুর্গাপুর পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ মুছিয়া দেওয়ার আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠে। (কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্কীর্ণ মনোভাবের কল্যাণে!)। কিন্তু ডঃ মুখার্জ্জির সতর্কতায় সে আশঙ্কা দূর হয়। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে ডঃ মুখার্জ্জিকে দুর্গাপুর হইতে সরাইয়া ট্রম্বে পাঠানো হইয়াছে। প্রকাশ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের একান্ত ইচ্ছা ছিল ডঃ মুখার্জ্জি দুর্গাপুরেই থাকুন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনিও অবস্থাকে স্বীকার করিয়াছেন। একজন অবাঙ্গালীকে বর্ত্তমানে এখানে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে পাঠান হইয়াছে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও মিশ্র ইস্পাত কারখানা—এই উভয় সংস্থারই জেনারেল ম্যানেজার এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, মিশ্র ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ডঃ ডি পি চ্যাটার্জ্জির নিকট হিন্দুস্থান ষ্টীলের হেড অফিস রাঁচী হইতে সর্ব্বশেষ যে নির্দ্দেশ আসিয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ওই কারখানায় যে কয়জন বাঙ্গালী এখন আছেন, তাহার বেশী যেন আর একজনকেও নিয়োগ

না করা হয়। দ্রষ্টব্য: এই কারখানার উঁচু পদগুলিতে অনেকেই অবাঙ্গালী। প্রকাশ, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীরণজিৎকুমার চ্যাটার্জ্জির বিরুদ্ধেও চক্রান্তজাল বিস্তারিত হইয়াছে—প্রতি পদে চেষ্টা চলিতেছে কীভাবে তাঁহাকে সরকারের কাছে এবং কর্ম্মীদের নিকট হেয় করিয়া দুর্গাপুর হইতে সরানো যায়। এই কারখানার আর্থিক উপদেষ্টার পদে পর পর কয়েকজন অফিসারকে পাঠান হইয়াছে, কোনও বারেই কোনও বাঙ্গালীকে পাঠানো হয় নাই!

এদিকে সরকার-পরিচালিত কয়লাখনির যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের দুর্গাপুরস্থ কারখানায় বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এ এন লাহিড়ী আগামী বৎসর সম্ভবত অবসর লইবেন। তাঁহার পর কে ওই পদ পাইবেন তাহার জন্য অবাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে তৎপরতা দেখা যাইতেছে এবং যাহা শুনা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় তাঁহাদেরই একজন ওই পদে অভিষিক্ত হইবেন।

অথচ এখানে সর্ব্বোচ্চ পদে যে-সব বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ নাই যে, তাঁহারা বাঙ্গালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা, অন্যান্য রাজ্য সরকার তাঁহাদের রাজ্যের লোকদের অন্তত সরকারী কারখানা-গুলির চাকরিতে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলা সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

বাঙ্গলাতে বাঙ্গালীর প্রতি এই ঘৃণ্য অবিচার দেখিয়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হয় না! বঙ্গ-সম্রাটের দোষ নাই, তাঁহার সক্রিয় চোখটি সদাই কেন্দ্রীভূত! সত্যই অ-তুল্য নেতা!

বাঙ্গলার মুখ্য-শাসক তাঁহার 'মিত্রো' এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রধান 'ফ্রেণ্ডস্'দের তাঁহার প্রীতি-প্রেম জানাইতে সংবাদপত্র এবং সরকারী ধামা আকাশবাণীর সহায়তা অহরহ পাইয়া থাকেন, কিন্তু বাহিরে প্রেম বিতরণের সময় ভাগ্যহত বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীদের কথা কি তাঁহার মহাসাগর অপেক্ষাও বিরাটতর হৃদয় সমুদ্র হইতে লোপ পায়! সত্য কথা বলিতে অপরাধ নাই—ভারতের অন্য কোন রাজ্যের মুখ্য-শ্রী নিজ রাজ্যের প্রতি এমন অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে ভরসা পান নাই! স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গবাসীদের কল্যাণকল্পে পরিকল্পিত (এবং কিছু কিছু আরব্ধ)—প্রায় সব পরিকল্পনাগুলি ধীর গতিতে স্রোতের জলে ভাসিয়া বাঙ্গলার সীমানা পার হইয়া অন্যরাজ্যে স্থিতি লাভ করিতেছে!

পেট্রল-ভিত্তিক মিশ্র শিল্প কারখানা স্থাপন

হলদিয়ার ভাগ্যে কি আছে এখনো কেহ বলিতে পারে না। এই সংক্রান্ত প্রধান প্রকল্পটি আজ পর্য্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনের ফাইন্যাল পরীক্ষার অপেক্ষায় রহিয়াছে—তারিখ পড়ে নাই—কিন্তু ইহার অন্য দুইটি আনুসঙ্গিক ইউনিট দক্ষিণ ভারত অথবা অন্য কোন রাজ্যে স্থাপন করিবার প্রবল প্রচেষ্টা চলিতেছে—এবং এই পবিত্র পুণ্য প্রয়াস সার্থক হইবার পথে কোন বাধা হইবে না—এই আশাই আমরা করিতে পারি। কিন্তু মনে রাখিবেন—তৃতীয় পরিকল্পনায় পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক যে পাঁচটি মিশ্র শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় তার সবগুলিই বম্বে এলাকায় স্থাপন করা হইতেছে, ইহার মধ্যে প্রথম প্রকল্পটিতে (ইউনিয়ন কারবাইড লিমিটেডে) শীঘ্রই উৎপাদন আরম্ভ হইবে।

বলা বাহুল্য, মহারাষ্ট্র সরকারের তদারকি এবং তৎপরতার কারণেই রাজ্যের এ সমৃদ্ধি লাভ! ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অমাত্যবর্গ প্রথমে চিন্তা করেন রাজ্য স্বার্থের কথা, তাহার পর ভাবেন ভারতের বৃহত্তর কল্যাণের কথা। কিন্তু আমাদের এ পোড়া রাজ্যের মন্ত্রী, মহামন্ত্রী এবং কংগ্রেসী নেতৃত্ব বহুকাল যাবৎ ভারত-সংহতি এবং সমগ্র ভারতের কল্যাণ-স্বপ্নেই বিভোর। ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জাতি এবং পশ্চিম বাঙ্গলার স্বার্থ চিন্তা তাঁহাদের নিকট মহাপাপ এবং মানসিক ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক!

অনেকে আশা করেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনায় হলদিয়ায় পেট্রল ভিত্তিক মিশ্র রাসায়নিক শিল্প (কারখানা) স্থাপিত হইবে (হইতে পারে বলাই ভাল)। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত তিনটি এই প্রকার কারখানার মধ্যে হলদিয়া একটি। প্রথমটি হইবে (১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে) বিহারে বারাউনিতে এবং দ্বিতীয়টি হইবে (প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে) দক্ষিণ ভারতের কোন স্থানে। এই দুইটি যে 'অবশ্যই' হইবে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। কিন্তু হলদিয়ায় প্রস্তাবিত কারখানাটি (১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার) এখন পর্য্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনা এবং দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে! হলদিয়ায় আরো দু' একটি কারখানা স্থাপনের কথা শুনা যাইতেছে—হয়ত সম্ভাবনাও আছে—যদি অন্য কোন রাজ্য ইহাতে বাগড়া না দেয় এবং কেন্দ্রের বাঙ্গলা-বিদ্বেষী চক্র শেষ মুহূর্ত্তে সব উলট-পালট না করিয়া দেয়।

আজ হলদিয়ার বহু কিছু নির্ভর করিতেছে বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রীর তদ্বীরের উপর। তাঁহার অবাঙ্গালী 'মিত্রো'দের উপর শ্রীসেনের প্রভাব কতখানি তাহা আমরা জানি না।

হিন্দী-সলাকার সমিতি

দিল্লীর এক সংবাদে কিছুদিন পূর্ব্বে জানা গিয়াছে যে, হিন্দীকে যথোচিত তৎপরতার সহিত ভারতের রাজ-ভাষার সম্মান দিয়া সিংহাসনে বসানো হইতেছে না বলিয়া হিন্দী-সলাকার সমিতির সভ্য, শেঠ গোবিন্দদাস, প্রকাশবীর শাস্ত্রী এবং আরো কয়েকজন (হিন্দীভাষী এবং উৎকট হিন্দীপ্রেমিক) সমিতি হইতে পদত্যাগের হুমকি দিয়াছেন এবং ইহার ফলে শ্রীনন্দা হইয়াছেন নিরানন্দ এবং শ্রীমতী গান্ধী চিন্তিত! এই উৎকট এবং জবরদস্ত হিন্দীওয়ালাদের একমাত্র দাবী এই যে—ভারতের অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলির অহিন্দী ভাষী প্রজাদের এবিষয়ে কিছু বলিবার নাই, কারণ কেন্দ্রীয় হিন্দী ভাষী মন্ত্রীগণ এবং পার্লামেণ্ট সদস্যরা যখন একবার স্থির করিয়াছেন হিন্দী রাজতক্তে বসিবে, তখন অন্য কাহারও আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। মাত্র ১৩১৪ কোটি ভারতীয়ের ভাষাকে বাকি ৩৫ কোটিকে অবনত মস্তকে এবং সানন্দ চিত্তে স্বীকার করিতেই হইবে। সুখের এবং আশার কথা এই সমিতিতে এমন বহু সদস্য আছেন যাঁহারা দেশের এই সঙ্কটকালে ভাষা লইয়া মাতামাতি, হটুগোল এবং শেষ পর্য্যন্ত দেশব্যাপী একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি কাম্য বলিয়া মনে করেন না। ইঁহারা সমিতির সদস্য হিসাবে সংখ্যাগুরু হইলেও—হিন্দীর বিরুদ্ধে বেশী কিছু বলিতে, এমন কি অকাট্য যুক্তি দিতেও—কেন জানি না—দ্বিধা-সঙ্কোচ-ভয় বোধ করেন।

এই অবস্থায় সদা-বিরসবদন নন্দা বিষম এক মুস্কিলে পড়িয়াছেন এবং এই মুস্কিল আসান করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় প্রয়াস প্রার্থনা করিয়াছেন। সমিতির হিন্দী-ভাষী-সদস্যদের উৎকট এবং প্রায়-অসভ্য আস্ফালন দেখিয়া শ্রীনন্দার মনে হইতেছে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত হিন্দী-সলাকার সমিতি—

হিন্দী-সৎকার সমিতিতে পরিণত হইবে! বিষণ্ণবদন শ্রীনন্দা নিজেও হিন্দী বিষয়ে অতি বিষম উৎসাহী এবং আইনে হিন্দী রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও—চোরা-পথে কেন্দ্রীয় সরকারী কাজ-কর্ম্মে হিন্দীর বে-আইনী অনুপ্রবেশ ভালভাবেই চালাইয়া যাইতেছেন। ভারতীয় রেল দপ্তর বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দীকে অতি এবং অসৎ প্রাধান্য দিতেছে। ইঞ্জিনের গায়ে বহু পূর্ব্ব হইতেই 'পূ-রে' (পূর্ব্ব রেলওয়ে), 'দ-পূ রে' (দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ে) এবং অন্যান্য ভারতীয় সকল রেলওয়েতে এই বিচিত্র কাণ্ড চলিতেছে। অহিন্দী-ভাষী রাজ্যস্থিত রেল ষ্টেশন-গুলিতে প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে হিন্দীতে—তারপর অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে আঞ্চলিক এবং সর্ব্বনিম্নে ইংরেজী হরফে ষ্টেশনের নাম লিখা হইয়াছে। এ-রাজ্যেও ইহা দেখা যাইতেছে এবং ইহার প্রতিক্রিয়াও সুরু হইয়াছে—হিন্দী নামের উপর বিশুদ্ধ আলকাতরার শ্রীপোঁচ! জোর করিয়া অহিন্দীভাষী রাজ্যে এ-ভাবে স্থানীয় লোকদের এ অপমান প্রচেষ্টা কেন? হিন্দীভাষী রাজ্যে—বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী বিহার রাজ্যে—যে-সকল স্থানে গরীব বাঙ্গালী সংখ্যাগুরু, সেই সকল স্থানের রেল ষ্টেশনগুলি হইতে বাঙ্গলা নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—কেন এবং কার হুকুমে, কে জবাব দিবে?

কেন্দ্রীয় মালিকগুষ্ঠি যদি এই ভাবেই হিন্দীর প্রবর্ত্তন এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা প্রয়াস করেন অন্যের ন্যায্য দাবি এবং ইচ্ছা অবহেলা করিয়া তাহা হইলে হিন্দীকে তাঁহারা ভারতের সংহতি-সংহার এক বিষম 'এ-বোমায়' পরিণত করিবেন। হিন্দীভাষী নেতারা মনে করিয়াছেন তাঁহারাই ভারত-ভাগ্য-বিধাতা এবং জনগণমন অধিনায়ক। এ-নির্ব্বুদ্ধিতা ভাঙ্গিতে খুব দেরি হইবে না। হিন্দী-প্রতিরোধ বিষম আন্দোলন এবার কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতেই সীমিত থাকিবে না—এ আগুন পূর্ব্ব এবং উত্তর ভারতের অঞ্চল বিশেষেও জ্বলিয়া উঠিবে। ফলে আর একবার ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য সীমানা নির্দ্ধারণ করা হইবে অতি আবশ্যক: এবং পশ্চিম বাঙ্গলাকে ধলভূম, মানভূম এবং সিংভূম অঞ্চল-গুলিও ফেরত দিতে বিহার বাধ্য হইবে। জোর করিয়া যাহারা খণ্ডিত বাঙ্গলাকে আরও খণ্ডিত করিয়াছে, তাহাদের জানিয়া রাখা ভাল, চিরদিন কেহ জবরদখলী অধিকার রাখিতে সক্ষম হয় না। পশ্চিমবঙ্গের এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। হিন্দীর প্রসঙ্গে এত কথা বলা আশা করি কাহারও কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

আর একটি কথা বার বার বলা দরকার। আমাদের কেন্দ্রীয় মালিকরা লজিকের সুযুক্তি অগ্রাহ্য করিতেই অভ্যস্ত। তবে প্রয়োজন হইলে, যে যুক্তির বাস্তব প্রয়োগে অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র এবং অধুনা পাঞ্জাব রাজ্য স্থাপিত হইল (এবং বিদর্ভও হইবে)—সেই যুক্তি যদি পশ্চিমবঙ্গ

প্রয়োগ করিতে পারে, সিদ্ধির পথে বিশেষ বাধা হইবে না। ইহাই আমাদের মত হীনবুদ্ধি ক্ষীণদেহীদের স্থির বিশ্বাস।

কলিকাতায় জাহাজের জন্য কর্ম্মী আমদানী —

ভারতীয় জাহাজের এক শ্রেণীর মালিক (অবাঙ্গালী) ভারতীয় জাহাজ শিল্পের মূলে আঘাত করিতেছেন। গত কয়েক বছর ধরিয়া এই অবস্থা। তাঁহাদের নীতি: জাহাজ শিল্পে ক্ষতি হয় হউক, কলিকাতা পোর্টের স্বার্থ জাহান্নমে যায় যাউক, কিন্তু বাঙ্গালী তরুণ জাহাজীদের সমুদ্রগামী জাহাজে কাজ দেওয়া হইবে না!

বোম্বাই হইতে জাহাজী আমদানী করিয়া কলিকাতার জাহাজে কাজ দেওয়া হইতেছে। গাড়ি ভাড়া ও ভাতা বাবদ তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বে-হিসাবী ও বাজে খরচ হইতেছে, সময় মত অনেক ক্ষেত্রে সকলে হাজির হইতে পারেন না, তবু ঐ সব মালিকদের পরোয়া নাই। অবিচার কয়েক বছর ধরিয়াই চলিতেছে, আর্জি, আবেদন কোন কিছুতেই অন্যায়ের প্রতিকার আজিও হয় নাই। এইসব কথা জাহাজী ইউনিয়নের একজন মুখপাত্র সখেদে বলিয়াছেন।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন, কলিকাতার জাহাজীদের পক্ষে অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে হইতে বর্ত্তমানে চরমে পৌঁছিয়াছে। কলিকাতা বন্দরে জাহাজীরা পূর্ব্বে ব্রিটিশ জাহাজে কাজ পাইতেন। এখন ভারতীয় জাহাজ শিল্পে যতই সম্প্রসারিত হইতেছে, ততই কলিকাতার জাহাজীদের কাজ পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। ইদানিং কলিকাতার জাহাজীদের কর্ম্মক্ষেত্র একান্তভাবেই সঙ্কুচিত। অথচ কলিকাতার জাহাজীদের কর্ম্মক্ষমতা এবং দক্ষতার মান পৃথিবীর যে কোন দেশের জাহাজী-দের মান অপেক্ষা ন্যূন নয়।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং-কে যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন: কলিকাতার জাহাজীদের প্রতি যে অবিচার হইতেছে, ন্যাশনাল শিপিং বোর্ডের সদস্য হিসাবে বার বার তিনি সেকথা বলিয়াছেন। এক সভায় বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয় জাহাজের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজী কলিকাতায় নাই। শ্রীমজুমদার এই ধরনের কথায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। কলিকাতার জাহাজীদের কোন কোন রোষ্টারে কাজ পাওয়ার জন্য ১১ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ষ্টুয়ার্ডরাও জানেন না, কবে তাঁহাদের কাজ জুটিবে।

ভারতীয় জাহাজের অবাঙ্গালী মালিকদের এই বিচিত্র বাঙ্গালী বিদ্বেষ ও বর্জ্জন নীতি এখানকার বাঙ্গালী জাহাজীদের মধ্যে অসন্তোষ এবং ক্ষোভ ক্রমশ তীব্রতর হইতেছে। অবিলম্বে অবস্থার প্রতিকার না হইলে কলিকাতার জাহাজী ইউনিয়ন চরম পন্থা গ্রহণে বাধ্য হইবেন। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব্ সীম্যান অব্ ইণ্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিকাশ মজুমদার বোম্বাইয়ের ডিরেক্টর জেনারেল অব্ শিপিং-কে সম্প্রতি এক চরম পত্র দিয়াছেন। শ্রীমজুমদার বলিয়াছেন: কলিকাতার জাহাজীদের স্বার্থবিরোধী নীতি অবিলম্বে পরিবর্ত্তিত না হইলে কলিকাতার জাহাজীরা ঐ সব জাহাজকে ব্ল্যাকলিষ্ট করিতে বাধ্য হইবেন এবং ইহাতে তাঁহারা কলিকাতা পোর্টের এবং ডকের শ্রমিকদের সহায়তা পাইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

কেবল জাহাজীর পক্ষেই নহে, কলিকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী শিল্পপতি এবং মিল-মালিকরা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীদের প্রতি চরম বৈষম্য-মূলক আচরণ চালাইয়া যাইতেছে বছরের পর বছর— কিন্তু না রাজ্য সরকার, না শ্রমিক-দরদী পেশাদার ইউনিয়ন লীডারগণ—এ ব্যাপারে প্রায় কোন উচ্চবাচ্য করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না।

কলিকাতায় স্থিত বহু বিদেশী, বিশেষ করিয়া ইংরেজ, ব্যবস্থা-বাণিজ্য সংস্থায়—পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, ইউ-পি প্রভৃতি রাজ্য হইতে লোক আমদানী করিয়া উচ্চ পদগুলির শোভা বর্দ্ধন করা হইতেছে নিয়মিতভাবে এবং বহু ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারাই। এবং ইহা করা হইতেছে পুরাতন যোগ্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারী/ অফিসারদের দাবি অবহেলায় অগ্রাহ্য করিয়া প্রয়োজন হইলে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

একদিকে এই বিষম অবস্থা, অন্যদিকে—

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি নির্ব্বাণের পথে !

কাঁচামালের অভাব, বিদেশী-মুদ্রায় অনটন, আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্যবৃদ্ধি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অগ্রিম অর্থদানে বিধিনিষেধ—প্রধানত এই চারিটি কারণে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির আজ নাভিশ্বাস !

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়াও এই শিল্পের উপর পরোক্ষে পড়িবে এবং ইহার ফলে এই শিল্প প্রসারের পথ ব্যাহত হইবে— বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌দের এই আশঙ্কা।

সমগ্র দেশে প্রায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি ক্ষুদ্র শিল্প রেজেষ্ট্রিভুক্ত—একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ছয় হাজারের মত। এই শিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীসংখ্যা সাত লক্ষ। এই

ক্ষুদ্র শিল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন যন্ত্রপাতির শতকরা ৩৭ ভাগ উৎপাদন করে। প্রায় ১০ থেকে ১১ কোটি টাকা এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। রেজেস্ট্রি করা নয় এইরূপ ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য।

অর্থনীতিবিদ ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত: একদা বিদেশ হইতে যে সব জিনিষ আমদানী হইত, তাহার অধিকাংশ এখন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন করে এবং রপ্তানি বাণিজ্যেরও বহুলাংশ এই প্রতিষ্ঠানগুলিই যোগান দিয়া থাকে। অথচ কাঁচামাল ও অর্থের অভাবে এই সব শিল্প আজ চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। যোজনা কমিশন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যদি এদিকে নজর না দেন, তাহা হইলে এই শিল্পের বাঁচিবার উপায় নাই।

কাঁচামালের দুর্ভিক্ষ

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর প্রতিরক্ষা শিল্পের অনেক জিনিষ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে কেনার প্রস্তাব হয়। মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং আরও কয়েকটি রাজ্য প্রতিরক্ষা ও ডি জি এস ডি বিভাগ হইতে কোটি কোটি টাকার অর্ডার তাঁহাদের রাজ্যের শিল্পগুলিকে বণ্টন করিয়া দেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইরূপ কোন অর্ডার প্রতিরক্ষা বিভাগ হইতে লয়েন নাই এবং ফলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সরাসরি কোন অর্ডার পান নাই।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে কাঁচামালের দুর্ভিক্ষের ফলে হাওড়ার বহু শিল্প বন্ধ হইবার মুখে। এই শিল্পগুলি 'জিঙ্ক', 'কপার', 'গান মেটাল' প্রভৃতি পাইতেছে না—যাহা পায়, তাহার দাম অস্বাভাবিক বেশি। কালোবাজারের দরে ওই সব কাঁচামাল কিনিয়া প্রতিযোগিতায় টেঁকা অসম্ভব। ইহাদের মূলধনও সীমিত। রপ্তানি ক্ষেত্রেও এই সব শিল্পের অসুবিধা আছে। ইহারা উৎপন্ন মাল সরাসরি রপ্তানি করিতে পারে না—বাধা-নিষেধ আছে।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অপমৃত্যু হইলে কলিকাতা এবং হাওড়ায় প্রায় ৪.৫ লক্ষ লোক নূতন করিয়া বেকারীর সংখ্যা স্ফীত করিবে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ধরিলে এই সংখ্যা ১০।১২ লক্ষ দাঁড়াইয়া যাইবে। এমত অবস্থায় আমাদের রাজ্য বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী কিছু চিন্তা করিতেছেন কি না জানা নাই—করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। মন্ত্রী মহাশয়ের শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে জ্ঞানের এবং বিদ্যা-বুদ্ধির বহর কি, তাহাও কাহারও জানা নাই। আর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইলেই ভারপ্রাপ্ত বিষয়ের সম্পর্কে জ্ঞান থাকিবে এমন কোন নিয়ম বা বাধ্যবাধ্যকতাও মন্ত্রীদের বেলায় নাই। প্রাণী বা জীব বিশেষ বহুমূল্যবান বস্ত্রের ভার বহন করে—পৃষ্ঠদেশে বাহিত বস্ত্রাদির মূল্য জানিবার কথা তাহার নয়। ভার বহন তাহার কাজ, সে ভার মাত্র বহন করে।

পূর্ব্বে আমরা একবার বলিয়াছিলাম, অন্য রাজ্যের কর্তারা দিল্লীর দরবার হইতে তাহাদের রাজ্যস্থিত ক্ষুদ্র শিল্প-মালিকদের প্রয়োজনের বেশী মালের কোটা আদায় করিয়া দেন। শিল্প-মালিকগণ প্রয়োজনের বেশী কাঁচামাল (তামা, সিসা, ইস্পাত প্রভৃতি) যাহা কেন্দ্র হইতে লাভ করেন, সেই অতিরিক্ত অংশ পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে কালোবাজারী মূল্যে বিক্রয় করে! এ কথা বহু জনেরই জানা আছে।

শুনিয়াছি ক্ষুদ্র শিল্প-মালিকরা বহুবার বহুভাবে রাজ্য সরকারের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সামান্য ব্যাপারে রাজ্যদেবতাদের কৃপাবারি বর্ষিত হয় নাই। প্রফুল্লবদন, অতুল্যকর্ম্মী রাজ্য সরকার বৃহত্তর কর্ম্মে, বিশেষ করিয়া ভারতের সংহতি রক্ষার কারণে, সদা চিন্তিত রহিয়াছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া সামান্য শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষার কারণে তাঁহারা তাঁহাদের অমূল্য সময় ব্যয় করিবেন কেন বা কখন?

পশ্চিমবঙ্গের 'ক্রনিক' অর্থ নৈতিক অধোগতি—

বিগত কয়েক বছর ধরিয়াই এ রাজ্যে অর্থনৈতিক অধোগতি চলিতেছে—অবিরাম। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা এবং রাজ্য সরকারের এক সমীক্ষায়—ইহারই প্রবল সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। প্রথম দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (বার্ষিক) এবং অগ্রগতির হার যেখানে শতকরা ৩.৫ ভাগ, সেইখানে পশ্চিমবঙ্গের হার শতকরা ২.৬ ভাগ মাত্র! একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখিতে পাই:

> —পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের ব্যাপারে প্রায়ই তুলনা করা হয় মহারাষ্ট্রের সঙ্গে। মহারাষ্ট্রের সমৃদ্ধির বার্ষিক হার ঐ দশ বছরে হয় শতকরা ৫.৭ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ।
>
> পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতির হারের সঙ্গে যদি অন্য কয়েকটি সমতুল রাজ্যের অগ্রগতির হার তুলনা করা হয়, তা হ'লে এ রাজ্যের পশ্চাৎবর্ত্তিতা আরও প্রকট হয়ে পড়ে। আলোচ্য দশ বছরে কৃষি এবং শিল্পোৎপাদনে ভারতের গড়পড়তা অগ্রগতির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা

৩'১ এবং ৫ ভাগ। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা •'৮ এবং ৩'২ ভাগ। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও গুজরাট প্রভৃতি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। কৃষি-শিল্পে মহারাষ্ট্রের অগ্রগতির হার যথাক্রমে শতকরা ৪'৮ এবং ৭'২ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৪'৩ এবং ৭'১ ভাগ এবং গুজরাটে ৩'৮ এবং ৫'১ ভাগ।

কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি বা সমৃদ্ধির হার হতাশাব্যঞ্জক। পশ্চিমবঙ্গে এ শম্বুক গতি এখনও চলেছে। নতুন শিল্প গড়ে তোলা বা পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণের উৎসাহে ভাঁটার টান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এটাই সমস্যা-জর্জ্জর পশ্চিমবঙ্গে সঙ্কট বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

শিল্পের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ যেমন পিছিয়ে পড়ছে তেমনি কৃষি ও খাদ্যসামগ্রী—যেমন চাল, ডাল, সরিষার তেল, মশলাপাতি, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির জন্য এ রাজ্য ক্রমশ বেশি করে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক সময় পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে ছিল। এখন শুধু মহারাষ্ট্র কেন, মাদ্রাজের সঙ্গে তুলনাতেও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে। ১৯৬২ তে সারা ভারতের জন্য মোট ১১০০ শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুর হয়। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পায় মাত্র ১৮৪, মহারাষ্ট্র ২৭৫ এবং মাদ্রাজ ৭৪। ১৯৬৩-তে মোট ৯৪৯-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পায় ১৬৯, মহারাষ্ট্র ২৪৫ এবং মাদ্রাজ ৮০। ১৯৬৪-তে মোট ৭৬১-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ১০১, মহারাষ্ট্র ১৮৩ এবং মাদ্রাজ ১৪৪। গত কয়েক বছর ধরে মাদ্রাজের শিল্প-সমৃদ্ধির হার খুবই সন্তোষজনক। মহারাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে আরও দু'-একটি রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে থাকছে শুধু পশ্চিমবঙ্গ!—

রাজ্য সরকারের মতে (বিবিধ বণিক সভার কর্ত্তাদেরও এই মত) লোকের উৎসাহ এবং আগ্রহের অভাবেই শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের এই নিদারুণ পশ্চাৎ-বর্ত্তিতা। কিন্তু এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে শিল্প সংগঠন এবং সম্প্রসারণের কারণে উপযুক্ত অবস্থা এবং অনুকূল আবহাওয়া সৃজন রাজ্য সরকারের হইলেও এই দায়িত্বকর্ত্তব্য তাঁহারা কতখানি পালন করিয়াছেন?

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-সংগঠন এবং প্রসারণের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব বণিক সভাগুলির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে প্রস্তাবগুলি:—

(১) শিল্পগঠনে উদ্যোগী লোকদের হাতে প্রয়োজনীয় বিবিধ সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় এজেন্সি গঠন, (২) দিল্লিতে একজন লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ, (৩) শিল্পায়নের নানাবিধ কাজে সহায়তা করার জন্য একটি শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন গঠন, (৪) উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন, কাঁচামাল, জমি, যন্ত্রাংশ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

কিন্তু উপরের প্রস্তাবগুলির মধ্যে এজেন্সি গঠন সম্পর্কে সরকারের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। লিয়াজোঁ অফিসার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার রাজি। উন্নয়ন করপোরেশন গঠনের জন্য চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়। কিন্তু মূলধন, কাঁচামাল, জমি ও যন্ত্রাংশের যোগান এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে বলিয়া বণিক সভাগুলি মনে করেন। এ মহলের ধারণা মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বিদেশে এদেশজাত শিল্পদ্রব্যাদির চাহিদা বাড়িবে সত্য কিন্তু বিদেশ হইতে কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ প্রভৃতির আমদানি মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং সরকার যদি এ ব্যাপারে উপযুক্ত সাহায্যের মনোভাব না গ্রহণ করেন তাহা হইলে শিল্প-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে তিমিরে থাকিবে সে তিমিরেই।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের অগ্রগতিও আশানুরূপ নয়। পশ্চিমবঙ্গে একর প্রতি চাল উৎপাদন অন্ধ্র, কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশূর, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য অপেক্ষা অনেক কম। ১৯৫৯-৬০ সালে সারা ভারতের গড়পড়তা একর-প্রতি চাউল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮০৮ পাউণ্ড। পশ্চিমবঙ্গের ছিল ৮৫৫ পাউণ্ড। অন্ধ্র, কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশূর ও রাজস্থানে ছিল যথাক্রমে ১,১১৪, ১,২২৮, ১,৩৩২, ১,২১১ এবং ১,০৩৪ পাউণ্ড। অবশ্য ইহার পর পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৯৬৫ পাউণ্ড।

উপরের হিসাব বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার। বণিক সভার মতে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা লাভ করিতে হইলে চাউলের উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াইতে হইবে।

সরিষার তেলের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গকে অন্য রাজ্য, বিশেষ করিয়া উত্তর প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ রাজ্যে উৎপন্ন হয় ১৬ লক্ষ মণ এবং বাহির হইতে আমদানি হয় ১২ লক্ষ মণ। প্রচুর পরিমাণে সরিষাও আমদানি করিতে হয়।

ডালের ব্যাপারেও একই অবস্থা। এ রাজ্যে বছরে

উৎপন্ন হয় ৩'২৫ লক্ষ টন। বাহির হইতে আনিতে হয় ৩'৭১ লক্ষ টন। এ রাজ্যের প্রয়োজন বছরে ৮ লক্ষ টন। মোট ১৫ লক্ষ একর জমিতে ডালের চাষ হয়। জমি বাড়াইয়া এবং দু'বার আবাদ করিয়া ডালের চাহিদা মেটান কিছুটা সম্ভব বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

মাছের চাহিদা যাহা উৎপাদন তাহা অপেক্ষা অনেক কম। ১৯৬১ সালের লোক গণনার হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মাছের চাহিদা বছরে ৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৮০ টন। এ রাজ্যের উৎপাদন বছরে ১ লক্ষ ২২ হাজার টন। অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ মাছ রাজ্যে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য রাজ্য হইতে মাছ আমদানির পরিমাণ ২৯ হাজার ৪৬০ টন। মাছ আমদানির এই পরিমাণ ১৯৫৯ সালের। মাছ আমদানি করিয়াও সমস্যা মিটে না। বাঙালীর প্রধান খাদ্য-সামগ্রীর কোনটিরই সমস্যা এখনও মিটে নাই।

উপরে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যাহা বর্ণিত হইল, অদূর ভবিষ্যতে তাহার কোন উন্নতি কোন দিকে হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ করিয়া কৃষির ব্যাপারে। সরকারী মহল এবং তাহার সঙ্গে কংগ্রেসী কর্তারাও পশ্চিমবঙ্গে একটি মাত্র চাষের প্রভূত উন্নতি দেখাইতেছেন এবং তাহা হইল হিতবাণী এবং বাজে-কথার চাষ! সারহীন মগজ হইতে প্রত্যহ নানাবিধ অসার কথার ফসল গত কিছুকাল হইতে অপরিমিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম আইনী হিন্দী পরিভাষা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশংসা করিব—করিতে বাধ্য হইলাম। কেন?

কিছুদিন হইল কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা (আইনবিষয়ক) কমিশনের পক্ষ হইতে রাজ্যগুলিতে দুই শত আইনবিষয়ক ইংরাজী শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দের এক তালিকা পাঠান হয়। ভাষার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি রক্ষার পরিকল্পনা অনুসারে ওই তালিকাটি সব আঞ্চলিক ভাষায় গ্রহণের জন্য অনুরোধও জানানো হয়। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের মহাকরণে রাজ্যের আইন বিভাগের মুখপাত্র মন্তব্য করেন যে, বেশীর ভাগ হিন্দী প্রতিশব্দ 'ভ্রান্তিমূলক' এবং ওইগুলির দ্বারা যথাযথ আইনগত অর্থ প্রকাশ হয় নাই। সুতরাং বাংলা ভাষায় ওই তালিকা গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

বাংলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত কোন কেন্দ্রীয় আইন অনূদিত হয় নাই। শুধু বাংলা কেন, একমাত্র হিন্দী ছাড়া আর কোন ভাষাতেই হয় নাই। হিন্দীতে অন্ততপক্ষে ১৫টি কেন্দ্রীয় আইনের অনুবাদ করা হইয়াছে। ১৯৬২ ভারতীয় সরকারী ভাষা (আইন-বিষয়ক) কমিশনের উপর ইংরেজীতে রচিত পুরাতন আইনগুলি অনুবাদের ভার অর্পিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারী ভাষা (আইন-বিষয়ক) কমিশন এ পর্য্যন্ত চৌদ্দ-পনেরটি রাজ্য আইনের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত একটিও ছাপা হয় নাই। আরও কিছু আইনের বাংলা অনুবাদ শেষ হইলে সবগুলি একসঙ্গে ছাপার ব্যবস্থা হইতে পারে।

ভারতের সংহতি রক্ষার অন্য সব ব্যবস্থাই পূর্ণ হইয়াছে—বাকি কেবল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড সমেত) সম্পূর্ণ হিন্দীতে রূপান্তরিত করার কাজ।

এই প্রসঙ্গে হিন্দী পণ্ডিতদের অপূর্ব্ব রচনা-শক্তি তথা অনুবাদ পারদর্শিতার সামান্য একটি উদাহরণ (হয়ত অনেকেই জানেন) দেওয়া যথাযথ বিবেচিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান:

"মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে…"

একজন খ্যাতনামা হিন্দী কবি অনুবাদ করেন:

"পটক দে মেরা শর (শীর?)
তেরে চৈন্দরি কো গরদা পর।—"

শুনিয়াছিলাম হিন্দী শ্রোতার দল এই হিন্দী রবীন্দ্র-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অশ্রু-বিগলিত নেত্রে গানের আসর ত্যাগ করেন এবং বাঙালী শ্রোতারা ইহাকে ডি এল রায়ের হাসির গান ভাবিয়া উচ্চ হাস্যরোলে সঙ্গীতের আসর প্রায় ফাটাইয়া দেন!

হিন্দী পণ্ডিতদের এই প্রকার অনুবাদ-শক্তির আরও বহু বহু নমুনা দেওয়া যাইতে পারে যদি প্রয়োজন হয়।

আমরা বুঝিতে পারি না—কেন এবং কি মহৎ প্রেরণায় কেন্দ্রীয় কর্তারা (তথা কংগ্রেসী হাই কমাণ্ড)—ইংরেজীকে হটাইবার জন্য এমন একটা অভদ্র, অযথা এবং ক্ষতিকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইংরেজী যদি পরাধীনতার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে ইংরেজী যাহাদের ভাষা সেই আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আমাদের কর্তারা এত মাথা খুঁড়িতেছেন কেন? বিদেশের খাদ্য ভিক্ষা করিয়া

যাহাদের পেট ভরাইতে হইতেছে সেই তাহাদের নিকট বিদেশী ইংরেজী ভাষা এমন অখাদ্য হইল কেন?

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী (কেন্দ্র) মিঃ চাগলার কয়েকটি মন্তব্য স্মরণে রাখা দরকার। মিঃ চাগলা বলিতেছেন (এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যিনি হিন্দী লইয়া অত্যধিক মাতামাতি করার বিরুদ্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন):—

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ইংরেজি থেকে অতি তাড়াতাড়ি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয়। পঠিতব্য বিষয়ের গ্রন্থ যতদিন ভারতীয় ভাষায় লিখিত না হয় এবং বিজ্ঞানের গ্রন্থাদির প্রামাণ্য সংস্করণ মাতৃভাষায় ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করা না হচ্ছে, ততদিন শুধুমাত্র ইংরেজি হঠাইবার জন্য মাতৃভাষায় সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষাদান একটা রাজনৈতিক শ্লোগানই থাকিবে।

ভারতীয় ভাষায় উচ্চতর শিক্ষার প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাবের ফলে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া আমাদের থাকিতে হয়। ডিভ্যালুয়েশনের কোপে বইয়ের বাজার আজ আগুন। কারণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পরমাণুবিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোন বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলেই ইয়োরোপ বা আমেরিকার লেখকদের দ্বারস্থ হইতে হয় আমাদের। ইহাতেই বুঝা যায়, উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সংযোগ কত ঘনিষ্ঠ ও অপরিহার্য্য। স্বাজাত্যবোধের নামে নিম্নস্তরের শিক্ষা নিশ্চয়ই আমরা চাই না। শিক্ষানিয়ামকরা যেন এই প্রয়োজনীয় কথাটি নীতি প্রয়োগের সময় মনে রাখেন—

বিদেশী ইংরেজদের সকল ঠাট আমরা কেবল বজায়ই রাখি নাই—স্বাধীনতার পর ইংরেজীয়ানা হাজার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই—বিশেষ করিয়া ইংরেজের দোষগুলি। আশ্চর্য্যের কথা—বিদেশী আমলের দোষগুলি বর্জ্জনের কোন প্রয়াস না করিয়া বর্ত্তমান শাসকবর্গ বিদেশীদের কল্যাণে ভাল যাহা লাভ করিয়াছি সেইগুলিকেই বিশেষভাবে দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য প্রচণ্ড হট্টগোল সৃষ্টি করিয়া দেশের সুস্থ আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছেন। মনে হইতেছে, কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ, শিক্ষার বদলে অশিক্ষা, শান্তির স্থলে অশান্তি এবং জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে 'ভ্যালুর' নামে 'ডিভ্যালুয়েশন' কায়েম করাই অদ্যকার ভারত-ভাগ্যবিধাতাদের কাম্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া দেশ এবং জাতিকে অবনতি এবং দুর্দ্দশার অতল তলে প্রেরণ করিবার পুণ্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন!

কর্ত্তামহল একদিকে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন গুঁতার চোটে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন—কিন্তু অন্য আর দিকে অহিন্দী ভাষাগুলিকে (যাহা হিন্দী অপেক্ষা হাজারগুণ সমৃদ্ধ এবং উন্নত) উৎখাত করিয়া সবার উপর হিন্দী সত্য—সংহতির নামে ভারতে সংহতি-সংহার পরিকল্পনা কার্য্যকর করিতে আদাজল খাইয়া ব্রতী হইয়াছেন। কন্‌সেমব্লীতে চেয়ারম্যান রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাষ্টিং ভোটে গৃহীত প্রস্তাব—'হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইল—' ইহাই হইবে চিরকালের সত্য? কথায় কথায় সংবিধান পরিবর্ত্তন সংশোধন হইতে বাধা নাই—কিন্তু হিন্দীর বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন-করা আর চলিবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চির বিষণ্ণ-বদন শ্রীনন্দা ইহা ঘটিতে দিতে পারেন না।

জয় হিন্দী!!

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

এরপর দু'দিন নিঃসঙ্গভাবে কাটালাম। গ্রন্থাগারের নির্জন পরিবেশের জন্য আমি যেন ভেতরে ভেতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। এখানকার সেলারস—যেখানে একসময় মিউজিয়ামের স্মারচারগুলি সাজানো থাকতো—আমাকে যেন আকর্ষণ করছিল। রকেকো রীতিতে গঠিত বড় ঘরটা রাশি রাশি পাণ্ডুলিপিতে একেবারে ঠাসা ছিল। দীর্ঘ সময় এই লাইব্রেরীতে কাটালাম। এলোমেলো ভাবে পুরাণো কাল সম্বন্ধে যা-কিছু হাতের কাছে পেলাম পড়তে লাগলাম—উদ্দেশ্য ছিল অতীতের ভেতর মন সংযোগ করে বর্তমানকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করব। কিন্তু যতই পড়ি, দেখি বর্তমান এসে অতীতের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কুইন ক্রিষ্টিনের চিঠিপত্র—অনেকদিনের আগেকার লেখা সব চিঠি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলো পর্যন্ত হলদে হয়ে এসেছে, আমার কানে যে প্রেমের গুঞ্জনের অনুরণন সৃষ্টি করছিল, আমার মনে হচ্ছিল যেন ব্যারনেসের মুখনিঃসৃত হয়েই সে সব ভালবাসার কথা আমার শ্রুতিপথে এসে বর্ষিত হচ্ছিল।

কৌতূহলী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ পরিহার করবার জন্য যে রেস্তোঁরাতে সচরাচর যেতাম, সেখানে যাওয়া বন্ধ করলাম। আমার এই নতুন সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের মনে একটা পাশবিক অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জেগেছে তা চরিতার্থ করবার জন্য কোন রকম আলোচনা করবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা আমার মনে আসছিল না। খালি এই কথাটাই ভাবছিলাম যে এখন থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সব কিছুর ধরা-ছোঁয়ার স্পর্শ থেকে বাইরে রাখতে হবে—কারণ যে পবিত্র আত্মিক বন্ধনের সম্পর্ক আমার এবং ব্যারনেসের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তার ফলে অন্য সব রকমের সম্বন্ধের থেকে মুক্ত হয়ে আমি নিজেকে এই মহীয়সী নারীর প্রতিই আত্মসমর্পিত সত্তা হিসাবে অনুভব করছিলাম।

তৃতীয় দিনে রাস্তার থেকে ড্রামের ধ্বনি এবং শোঁপার ফিউন্যারাল মার্চের করুণ সঙ্গীত শুনতে পেয়ে আমার আত্ম-সমাহিত ভাবটা কেটে গেল। ছুটে রাস্তার ধারের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম তাঁর গার্ডসদের নিয়ে মার্চ করে চলেছেন ক্যাপ্টেন অর্থাৎ ব্যারন। আমার জানলার দিকে তিনি চোখ তুলে তাকালেন, নড করে এবং মৃদু হাসির সঙ্গে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে আমাকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁরই আদেশমত ব্যাণ্ডে তাঁর স্ত্রীর প্রিয় সঙ্গীতটি বাজানো হচ্ছিল। যারা বাজাচ্ছিল তারা অবশ্য বুঝতে পারছিল না যে ব্যারনেস, ব্যারন এবং আমার প্রতিই পরোক্ষে এইভাবে তারা সম্মান প্রদর্শন করছিল এই মিউজিকটি বাজিয়ে। এর প্রায় আধঘণ্টা বাদে ব্যারন লাইব্রেরীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাকে পাণ্ডুলিপির ঘরে নিয়ে গেলাম। ব্যারনকে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল—আমাকে জানালেন যে তিনি স্ত্রীর চিঠি পেয়েছেন এবং চিঠির বক্তব্যও আমাকে শোনালেন। সব খবরই একরকম ভাল। ব্যারনেস আমার জন্যও একটি নোট্ দিয়েছিলেন। আমি উন্মুখ আগ্রহে চিঠিটা পড়তে লাগলাম। আমার ভেতরের উত্তেজনা যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সেজন্য খুবই সপ্রতিভ

থাকবার চেষ্টা করলাম। ব্যারনেস আমাকে লিখেছেন যে তাঁর স্বামীর ভালমন্দের দিকে আমি নজর রাখছি। এজন্য তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। আরও জানিয়েছেন যে তাঁকে বিদায় দেবার সময় আমার মনে যে কষ্ট হয়েছে সেজন্য তিনি মনে মনে একটু গর্বই অনুভব করেছেন। আমার গার্জেন এঞ্জেল অর্থাৎ সেলমার ওখানেই তিনি রয়েছেন। তাঁদের পরস্পরের সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। এরপর সেলমার চারিত্রিক সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করে ব্যারনেস মন্তব্য করেছেন যে তাঁর মনে হচ্ছে আমার এবং সেলমার সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত একটা মিলনাত্মক পরিণতিতেই পৌঁছবে। এইখানেই চিঠির শেষ।

তা হ'লে এই গার্জেন এঞ্জেলটি সত্যি সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছেন! এই মন্সটারটি! সেলমার কথা ভাবতে গেলেই এখন আমার মনটা বীভৎস রসে ভরে উঠছিল। একরকম বাধ্য হয়েই তার প্রেমিকের ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য কি আমাকে সারাজীবন ধরে একটি নিম্নশ্রেণীর ফার্সের প্রধান ভূমিকায় প্লে করে যেতে হবে? পুরাণো একটা প্রবাদ বাক্যের একটা নির্মম সত্য উক্তি বারবার এসে আমার হৃদয়ে আঘাত হানতে লাগল—আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত আঙুল পুড়ে যাবার ভয় থাকে। নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গিয়ে বিরক্তিতে এই ঘৃণ্য, গায়ে-পড়া-গোছের মহিলার কথা ভাবছিলাম—তার চেহারাটা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। তাঁর চোখ দু'টি ছিল মঙ্গোলিয়ানদের মত, বাদামী রং-এর মুখ, হাত দু'টি লালচে। পুরুষদের প্রলোভিত করবার জন্য তার ভাবভঙ্গি, তার সন্দেহজনক আচার-ব্যবহার দেখে আমার বন্ধুবান্ধবেরা অনেক সময়ই অবাক হয়ে ভাবতেন এ মহিলা ঠিক কোন্ শ্রেণীর নারী—এসব কথা বেশ স্পষ্টভাবে আমার মনে হচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ বিরক্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা ত আর বাইরে প্রকাশ করে বলতে পারি না। চুপ করে ধৈর্য ধরে রইলাম। আমি যখন ব্যারনেসের চিঠি পড়ছিলাম, ব্যারন টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে এসে বসলেন। টেবিলের উপর বহু পুরাণোকালের বই এবং ডকুমেন্টস ছড়ানো ছিল। ব্যারনের মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল সাহিত্য-বিষয়ক ব্যাপারে নিজের অজ্ঞতা এবং দৈন্য সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন। ঐ সব বইগুলো সম্বন্ধে কোন আলোচনার কথা তুলতে গেলেই তিনি নিষ্প্রাণভাবে জবাব দিচ্ছিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই খুব ইন্টারেষ্টিং!" সমাজে তার স্থান, প্রতিপত্তি, সাজসজ্জার আড়ম্বর—আর এসবের পাশে আমি কত নগণ্য—নিজেদের ভেতরের বৈষম্যটাকে কমিয়ে আনবার জন্য আমি আমার বিদ্যার ঐশ্বর্যটাকে প্রকট করে তুলে ধরবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এর ফলে ব্যারনের অস্বাচ্ছন্দ্য যেন আরও বেড়ে যাচ্ছিল। এ যেন সেই চিরন্তন, লেখনী এবং তরবারির ভেতরকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মনে মনে বলছিলাম এ্যারিস্টোক্রেসি নিপাত যাক, সাধারণ লোক সামনের সারিতে এগিয়ে আসুক। ব্যারনেস কি আগে থেকেই অবচেতন মনের অবস্থায় অনুমান করতে পেরেছিলেন যে বুদ্ধির কৌলিন্য বংশজাত কৌলিন্যের থেকে সব দিক দিয়ে সেরা। সুতরাং তাঁর সন্তানের পিতা হবার যোগ্যতা থাকবে বৈদগ্ধ্যের শ্রেণীজাত কোন পুরুষের—এই আশাটাই কি তখন থেকে মনে মনে পোষণ করেছিলেন ব্যারনেস।

যাই হোক এই সময়টায় ব্যারনের আমার সঙ্গটা দরকার ছিল—স্ত্রীর বিরহে তিনি যে দুঃখভোগ করছিলেন আমিও যে তার অংশীদার, একথা তিনি নিশ্চয় মনে মনে অনুভব করছিলেন—তাই আমাকে তাঁর সঙ্গে নৈশ আহার করবার জন্য, নিমন্ত্রণ করলেন।

কফি পানের পর ব্যারন প্রস্তাব করলেন এবার আমরা দু'জনেই ব্যারনেসের চিঠির জবাব দেব। তিনি আমাকে কাগজ-কলম এনে দিলেন এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বাধ্য করলেন তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লেখবার জন্য। বেশ কষ্ট করে কয়েকটি মামুলী কথা লিখলাম—ভয় হচ্ছিল লিখতে গিয়ে অজান্তে আসল মনের কথা না প্রকাশ হয়ে পড়ে। লেখা শেষ করে চিঠিটা ব্যারনের হাতে দিলাম পড়বার জন্য। ভণ্ডামি-মিশ্রিত গর্বের সঙ্গে ব্যারন জবাব দিলেন 'আমি অন্যের চিঠি পড়ি না।'

'আমিও পরস্ত্রীকে চিঠি লিখতে হ'লে আগে চিঠিটা ঐ নারীর স্বামীকে পড়িয়ে নিই।' এবার ব্যারন আমার চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন, তাঁর ঠোঁটের কোনায় একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল, আমার চিঠিটা নিজের চিঠির খামে ভরে, খামটা সেঁটে দিলেন ব্যারন।

বাকী সপ্তাহটা আর ব্যারনের সঙ্গে দেখা হ'ল না। পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাস্তার কর্ণারে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। এবং গল্পগুজব করবার জন্য আমরা ক্যাফেতে গিয়ে হাজির হলাম। ব্যারন কয়েকদিনের জন্য গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ওখানে স্ত্রীর সেই কাজিনের সঙ্গে কয়েকদিন বেশ ভালই কেটেছে সময়টা। ব্যারনের

চরিত্রের উপর ঐ মহিলার প্রভাব লক্ষ্য করে তাঁর সম্বন্ধে মনে মনে একটা ধারণা করে নিতে আমার কোনই অসুবিধা হ'ল না। বেশ অনুভব করছিলাম মহিলার সঙ্গ পেয়ে এই ক'দিনেই ব্যারনের মন থেকে ঔদ্ধত্য এবং বিষাদের ভাবটা চলে গেছে। তাঁর মুখের উপর একটা উচ্ছলতা এবং সংযমহীনতার ছাপ পড়েছে। কথাবার্তা বলার ধরনটাও একটু রুচিবিগর্হিত বলে মনে হচ্ছিল, এমন কি তাঁর কণ্ঠস্বরও যেন বদলে গেছিল। মনে মনে বললাম: 'এ লোকটি দুর্বল চরিত্রের মানুষ, ভাবের আবেগে সদা দোদুল্যমান—একটি পরিষ্কার স্লেটের মত, যার উপর যে-কোন তরলচিত্তের মেয়ে ইচ্ছামত যা খুশী রেখা কাটতে পারে—তা সে রেখাগুলোর কোন অর্থ থাকুক বা না থাকুক।

এরপর ব্যারন কমিক অপেরার নায়কের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। ঠাট্টা, তামাসা এবং মজাদার গল্প বলতে সুরু করলেন তিনি—বেশ বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মনটা তখন ফূর্তিতে ভরে উঠেছে। কিন্তু ইউনিফরম বাদ দিলে ব্যারনের ভেতর যে আকর্ষণীয় কিছুই নেই একথা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। সাপারের পর ঈষৎ পানোন্মত্ত অবস্থায় ব্যারন যখন প্রস্তাব করলেন যে তাঁর কয়েকজন নারী বন্ধুর ওখানে গিয়ে কিছুটা আমোদ-বিলাসে সময় কাটালে হয়, তখন আমার তাঁর সঙ্গটা সত্যিকার বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছিল। নেকপিস, স্যাশ এবং ইউনিফর্ম বাদ দিয়ে ব্যারনকে দেখলে তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হবার মত কোন কিছুই ছিল না।

মদ্যপান করতে করতে ব্যারন এমন একটা অবস্থায় এলেন যখন লজ্জা-সঙ্কোচবোধও হারিয়ে ফেললেন। এবার নিজের বিবাহিত জীবনের সব গোপন কথা আমাকে বলতে সুরু করলেন। আমি বিরক্তিভরে তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলাম এবং বাড়ীতে ফিরে যেতে চাইলাম। ব্যারন আমাকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর স্ত্রী নিজের অনুপস্থিতির সময় ব্যারনকে সব রকমের লাইসেন্স দিয়ে গেছেন। একথা শুনে আমার প্রথমটায় মনে হয়েছিল ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক—কি করে কোন স্ত্রী নিজের স্বামীর সম্বন্ধে এতটা উদাসীন হ'তে পারে। পরে ব্যারনেস সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হয়েছিল এবং ব্যারনের কথাটা আমার সেই ধারণাকেই যেন আরও দৃঢ়তর করেছিল—আমার মনে হয়েছিল ব্যারনেসের স্বাভাবিক প্রকৃতিটা ছিল ফ্রিজিড ধরনের। ক্যাফে থেকে তাড়াতাড়িই বাড়ী ফিরলাম। ব্যারনের দাম্পত্য-জীবনের নোংরা গোপনীয় কথাবার্তা শুনে আমার মনটা বিষিয়ে গেছিল, সমস্ত মাথা এবং কপালে আগুনের জ্বালা অনুভব করছিলাম।

একটা কথা ভেবে খুব আশ্চর্য লাগছিল। বাইরে থেকে দেখে মনে হ'ত এরা কত সুখী দম্পতি। অথচ তিন বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর ব্যারনেস মেয়েদের সম্বন্ধে স্বামীকে সব রকমের স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন, অথচ নিজের বেলায় তিনি কি এ জাতীয় কোন দাবি-দাওয়া রাখেন নি? এ ধরনের ব্যাপার সত্যিই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক—এ যেন হিংসা-মুক্ত প্রেম, ছায়াকে বাদ দিয়ে আলোর খেলা। না! এ কিছুতেই সম্ভব হ'তে পারে না। নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। ব্যারন আমাকে জানিয়েছেন যে ব্যারনেসের স্বাভাবিক প্রকৃতিই হচ্ছে কোল্ড। কে জানে এ কথায় ভেতর কতটা সত্যি আছে?

অবশেষে ব্যারনেস একদিন ফিরে এলেন। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, মনের আনন্দে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল বেড়াতে গিয়ে কুমারী জীবনের সঙ্গিনীদের সঙ্গে পুনর্মিলনে তিনি যেন আবার নতুন ভাবে প্রাণরসে ভরপুর হয়ে ফিরে এসেছেন।

তিনি আমার হাতে সেলমার লেখা একটা চিঠি তুলে দিলেন। চিঠিটাতে সেলমা প্রস্তাব করেছিল তাকে বিয়ে করবার জন্য। অসংবদ্ধ ভাবে অনেক উচ্ছ্বাসও সে লেখার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছিল—তবে চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে একটা অসরল কৃত্রিমতার ভাবও আমার নজর এড়াতে পারে নি। যে কোন ধরনের বিবাহ-বন্ধনেই তার কোন আপত্তি নেই বলে সে জানিয়েছিল—আসলে সে চাইছিল আমাকে অবলম্বন করে তার বর্তমান জীবনের থেকে মুক্তি এবং স্বাধীনতা। চিঠিটা পড়তে পড়তে নিজের মনকে ঠিক করে ফেললাম—এ ব্যাপারটার এবার একটা পরিসমাপ্তি ঘটান দরকার।

ব্যারনেসকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কি নিশ্চিত জানেন সেলমা ঐ সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে এন্‌গেজড হয়েছে কি না?

হ্যাঁ এবং না।

সেলমা কি তাকে কথা দিয়েছে?

না।

সে কি ওঁকে বিয়ে করতে চায়?

না।

তার বাবা-মা'র কি ইচ্ছা এই বিয়ে হয়?

না।

তা হ'লে সেলমা তাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে না কেন ?

কারণ·····আমি ঠিক বলতে পারি না।

সে কি আমাকে ভালবাসে ?

বোধ হয়—ঠিক বলতে পারি না।

সেক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে সেলমা স্বামী শিকার করতে বেরিয়েছে। তার মনে শুধু একটি চিন্তাই আছে—জবরদস্তি করে হাইেষ্ট বিভারকে গ্রহণ করবে। প্রেম বা ভালবাসা বলতে কি বোঝায় সে বিষয় তার কোন ধারণা নেই।

আপনি বলুন না প্রেম জিনিষটা কি ?

প্রেম হচ্ছে এক ধরনের ভাবাবেগ যা অন্যান্য সব ভাবাবেগের থেকে অনেকগুণ বেশী শক্তিশালী, প্রকৃতিজাত একটা শক্তি যাকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখা যায় না, যা বজ্রের মত ভয়ানক, উত্তাল বন্যাবেগের সঙ্গে তুলনীয়···

ব্যারনেস একাগ্র দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন, বন্ধুর খাতিরে আমাকে কড়া কড়া কথাও যেন শোনাতে ভুলে গেলেন। বিস্মিত কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনার প্রেম কি এই ধরনের ? একবার ইচ্ছা হ'ল তাঁকে সব কথা খুলে বলি। কিন্তু তার ফল কি হবে ?···আমাদের ভেতরের বন্ধনটা তা হ'লে মুক্ত হয়ে যাবে এবং যে মিথ্যা আমাকে আমার পৈশাচিক প্রবৃত্তির বাহ্যিক প্রকাশ থেকে রক্ষা করে এসেছে তার অপসারণে আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলব এবং ক্রমশঃ রসাতলের পথে এগিয়ে যাব। পাছে আরও কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়ে আমি ব্যারনেসকে অনুরোধ করলাম এ আলোচনা বন্ধ করতে। আমি বললাম যে আমি এখন মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি যে আমার নির্দয় প্রেমিকা মারা গিয়েছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে এখন আমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে ভুলে যাবার চেষ্টা করা। ব্যারনেস আমাকে অনেক রকম সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। অবশ্য একথা গোপন করলেন না যে ঐ সঙ্গীতজ্ঞ আমার একজন ভয়াবহ প্রতিপক্ষ। আরও চিন্তার কথা যে প্রতিপক্ষটি সেলমা যেখানে রয়েছে সেখানে থেকেই তার উপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করছে।

আমাদের কথাবার্তা ব্যারনের খুবই একঘেয়ে লাগছিল শুনতে—তিনি একটু বিরক্তিভরেই এ আলোচনার সমাপ্তি ঘটাবার জন্য রুক্ষস্বরে মন্তব্য করলেন—অন্যের প্রেমের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাওয়াটা বোকামিরই পরিচায়ক। এ কথা শুনে ব্যারনেসের সারা মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি আলোচনার ধারাটা অন্যদিকে ফেরালাম—যাতে কোন বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা না হয়।

যে বলকে একবার চালিয়ে দেওয়া হয়েছে সে এবার গড়িয়ে চলতে সুরু করল। যে মিথ্যার সুরু হয়েছিল আমার নিছক খামখেয়ালী থেকে, তা এবার বেশ ভালভাবে গড়ে উঠতে লাগল। এই অলীক প্রেমের ব্যাপারে অনেক কিছু কল্পনার জাল সৃষ্টি করে ব্যারনেসের কাছে আলোচনা করতে আরম্ভ করলাম। যে সব ফেয়ারী টেলসের সৃষ্টি করতাম তার হতভাগ্য প্রেমিকের রোলে নিজেকে ফেলতাম। অবশ্য এমন একটা অবস্থায় এসেছিলাম যে নিজের ব্যর্থ জীবনের যেসব পরম অধ্যায়ের কাহিনী তৈরী করতাম সেলমাকে কেন্দ্র করে—সে জায়গায় ব্যারনেসকে রাখলে অলীক আর অলীক থাকত না, সবকিছুই বাস্তবে পরিণত হ'তে পারত। নিজের জালে নিজেই ধরা পড়লাম। একদিন বাড়ী ফিরে দেখলাম সেলমার বাবা তাঁর কার্ড রেখে গেছেন। তক্ষুণি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। ছোটখাট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এমন ভাবে তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন যেন আমি তাঁর ভাবী জামাতা। আমার পরিবারের খোঁজ নিলেন, আমি কত রোজগার করি জেনে নিলেন, চাকরীতে ভবিষ্যতে কি হ'তে পারে সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করলেন। যেভাবে কথা বলছিলেন মনে হচ্ছিল যেন ক্রশ এগজামিনেসন করছেন। বুঝতে পারলাম যে ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভাবতে লাগলাম এইবার কি করব ? আমার থেকে অন্যদিকে তাঁর মন সরিয়ে দেবার জন্য তাঁর চোখে যাতে আমাকে খুব ছোট দেখায় সেইভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। ফিনল্যাণ্ড থেকে ভদ্রলোকের ষ্টকহমে আসার কারণটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল। হয়ত তিনি সঙ্গীতজ্ঞকে পছন্দ করছিলেন না এবং তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছিলেন। অথবা তাঁর মেয়ে মনে মনে আমাকেই গ্রহণ করবে বলে ঠিক করেছিল—শুধু আর একজন অভিজ্ঞ লোক তার পছন্দকে সমর্থন করলেই সে নিশ্চিন্ত মনে আমার গৃহিনী হ'তে পারবে বলে ভাবছিল।

আমি ভদ্রলোকের কাছে আমার সব খারাপ দিকগুলোই প্রকট করে তুলবার চেষ্টা করছিলাম। তাঁর সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সেই চেষ্টাই করতাম। এমন কি আমাদের দু'জনকে যখন মিলিত করবার জন্য ব্যারনেস নৈশ আহারে নেমন্তন্ন করলেন, আমি তাতে যোগ দিতে অসম্মতি জানালাম। এই ভাবেই ভাবী শ্বশুরমশাইয়ের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করাটা এড়িয়ে চলতে চাইতাম। ক্রমে ক্রমে

আমার ব্যবহারে তিনি বিরক্ত এবং ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। অনেক সময়েই জানাতাম যে লাইব্রেরীতে আমার গুরুতর কাজ আছে। শেষ পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্য সফল হ'ল, যতদিন থাকবেন ঠিক করেছিলেন তার অনেক আগেই তিনি ষ্টকহম ত্যাগ করে বাড়ীর পথে রওনা হলেন।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, যিনি শেষ পর্যন্ত মেমাকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন তাঁর এই সৌভাগ্যের জন্য আসলে তিনি কার কাছে ঋণী? বোধ হয় সে কথা তিনি জানতে পারেন নি, হয়ত মনে মনে কল্পনা করে গর্ববোধ করেছিলেন যে নিজের যোগ্যতার গুণে তিনি আমাকে হটিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

আমার এবং ব্যারনেসের ভাগ্যের উপর আর একটি ঘটনার প্রভাব এসে পড়েছিল। এ ঘটনাটা হ'ল ব্যারনেস এবং তার ছোট্ট মেয়েটির হঠাৎ গ্রামে বেড়াতে যাওয়া, এই সময়। ব্যাপারটা ঘটেছিল আগাষ্ট মাসের প্রথম দিকে। লেক মালারের পথে ছোট্ট গ্রাম ম্যারিয়াফ্রেডে শরীর সারাতে গেছিলেন ব্যারনেস—এই সময় আবার এখানে তার কা জন ছিলেন তার বাবা-মায়ের সঙ্গে।

ষ্টকহোম থেকে ফিরে এসেই এভাবে গ্রামে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার একটু অদ্ভুতই মনে হয়েছিল। কিন্তু ওঁদের নিজস্ব ব্যাপার—সুতরাং আমি এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করি নি। তিনদিন বাদে ব্যারন আমাকে চিঠি দিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তাঁকে অত্যন্ত চঞ্চল, নার্ভাস এবং অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, যে কোন মুহূর্তে ব্যারনেস ফিরে আসবেন বলে তিনি প্রতীক্ষা করছেন।

তাই না কি? বিস্মিতভাবে আমি জবাব দিলাম।

হাঁ...তাঁর নার্ভস আপসেট হয়ে গেছে। ওখানকার আবহাওয়া তাঁর ধাতে সইছে না। আমাকে একটা দুর্বোধ্য চিঠি লিখেছেন—পড়ে আমি একটু ভয়ই পেয়েছি। ওঁর খামখেয়ালী হাবভাব আমি অবশ্য কোনকালেই বুঝে উঠতে পারি না। যত সব উদ্ভট চিন্তাধারা ওঁর মাথায় আসে। এখন ওঁর ধারণা হয়েছে যে আপনি ওঁর উপর রাগ করেছেন।

আমি রাগ করেছি?

কোনই মানে হয় না! তবে উনি যখন আসবেন আপনি এ বিষয়ে কোন কিছু বলতে যাবেন না। উনি নিজেই আবার নিজের খামখেয়ালীপনা নিয়ে পরে লজ্জিত বোধ করেন। উনি আবার দেমাকী ধরনের ত—যদি বুঝতে পারেন ওঁর মনোভাবে আপনি অসন্তুষ্ট বোধ করছেন তা হ'লে আরও নানা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে বসবেন।

এবার আমি মনে মনে বুঝতে পারলাম যে আমাদের জীবনে একটা ভয়ানক সময় এসেছে। এখান থেকে এখন বোধ হয় আমার পক্ষে পালিয়ে যাওয়াই সবদিক দিয়ে ভাল হবে। তা যদি না করি তা হ'লে আমাকে এরপর এখানকার রোমান্স অভ্ প্যাসনের নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এঁদের বাড়ী থেকে ফের যখন নেমন্তন্ন এল আমি বাজে অজুহাত দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এর ফলে ভুল বোঝাবুঝির পালা সুরু হবে। ব্যারন আমার বাড়ীতে এসে হাজির হলেন—প্রশ্ন করলেন আমি কেন এই অ-বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করলাম। কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখাতে পারলাম না—আমার অস্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ নিয়ে ব্যারন আমার থেকে কথা আদায় করে নিলেন যে তাঁদের সঙ্গে আমাকে প্রমোদ-ভ্রমণে বেরুতে হবে।

ব্যারনেসকে দেখে মনে হ'ল অসুস্থ—বেশ ক্লান্তির ভাব দেখলাম—মুখেচোখে—বিবর্ণ মুখের পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দু'টি শুধু প্রাণবন্ত এবং জ্বলজ্বল করছিল। আমি বেশ গম্ভীর এবং উদাসভাব রেখেছিলাম আমার চালচলন এবং কথাবার্তায়। যত কম কথা বলে পারা যায় সেই চেষ্টাই করছিলাম।

জাহাজ থেকে নেমে একটি নামকরা হোটেলে গেলাম। এখানে ব্যারন তাঁর আঙ্কলের সঙ্গে দেখা করবেন কথা ছিল। খোলা জায়গায় আমাদের সাপার দেওয়া হল—এ সাপারটা কেউই আমরা উপভোগ করছিলাম না। সামনে লেক—তার পাশে পাশে কালো বিষণ্ণতায় ভরা পাহাড়ের শ্রেণী—আমাদের মাথার উপর লাইম গাছের শাখাগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছিল—গাছের গুঁড়িগুলো নিকষ কালো—এগুলোর বয়স বোধ হয় একশ বছরের ওপর।

সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমরা কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু নিজেরাই বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা কত একঘেয়ে লাগছে। আমার মনে হ'ল ব্যারন এবং ব্যারনেস একটু আগেই বোধ হয় ঝগড়া করে এসেছেন এবং এখন পর্যন্ত ব্যাপারটার মিটমাট হয় নি—কোন একটা সুযোগ পেলেই আবার নতুনভাবে দু'জনের গোলমাল সুরু হবে। এ ধরনের পরিস্থিতি হ'লে কি ভাবে রেহাই পাব সেই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ এবার ব্যারন তাঁর আঙ্কলের সঙ্গে টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলবার জন্য।

বেশ বুঝতে পারছিলাম এবার বিস্ফোরণ সুরু হবে। যেই ওঁরা চলে গেলেন ব্যারনেস আমার দিকে ফেলে উত্তেজিতভাবে বললেন—

জানেন কি, আমি এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসাতে গুষ্টভ (অর্থাৎ ব্যারন) আমার উপর রাগ করেছে ?।

না, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

তা হ'লে আপনি এ কথাও জানেন না যে গুষ্টভ আকাশকুসুম রচনা করছিলেন এই ভেবে যে প্রতি রবিবারে আমার সুন্দরী কাজিনের সঙ্গে অবসর যাপন করবেন।

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললাম—শুনুন ব্যারনেস, স্বামীর বিরুদ্ধে যদি আপনার কোন অভিযোগ থাকে, সে সব কথা তাঁর উপস্থিতিতে বলাটাই কি উচিত না ?

…কিন্তু কি বললাম ? আমার মন্তব্যটা অত্যন্ত পাশবিক, রূঢ় এবং বেখাপ্পা ধমকের সুরে উচ্চারিত হয়েছিল। যাকে বলেছিলাম তিনি হচ্ছেন স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহন্তা স্ত্রী—আর এই বলেছিলাম শুধু এই কারণে যে, ব্যারনকে তখন সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতিনিধি হিসাবে আমার মনে হচ্ছিল—সুতরাং কোন নারী তাকে অপমান করবেন এ আমার সইছিল না।

আপনার এতদূর সাহস এ ধরনের কথা আমাকে বলতে পারলেন।—বেশ চড়া গলায় বলে উঠলেন ব্যারনেস। তাঁর মুখভাবে বিবর্ণতা এবং বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। তিনি বললেন—আপনি আমাকে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে অপমান করলেন।

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি ব্যারনেস, এ বিষয়ে আমার মনে এতটুকু দ্বিধা নেই। আপনাকে সত্যিই আমি অপমান করেছি। চিরকালের জন্য আমাদের সমস্ত সম্পর্কের ছেদ হয়ে গেল। গুষ্টভ আসামাত্র তিনি তাঁর দিকে সরে গেলেন, যেন শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য—গিয়ে স্বামীর পক্ষপুটে আশ্রয় নিলেন। ব্যারন এক নজরেই বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কেন তা ঠিক ধরতে পারেন নি। পাশের একটি ভিল্লাতে দেখা করতে যেতে হবে বলে আমি বিদায় নিলাম।

কি ভাবে এরপর সহরে ফিরে এসেছিলাম মনে নেই। আমার পা দু'টি যেন একটি প্রাণহীন দেহকে বহন করে এনেছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা নিষ্প্রাণ দেহ—এই জড় দেহটা কোনরকমে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে।

একলা! আবার আমি একলা হয়ে পড়লাম, আমার কোন বন্ধু নেই, পরিবার নেই, পূজা নিবেদন করবার মত কেউ নেই। নূতনভাবে কারোর উপর দেবত্ব আরোপ করাও আর সম্ভব নয়। ম্যাডোনার ষ্ট্যাচুটি স্থানচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে গেল। সুন্দরী মূর্তির অন্তরাল থেকে নারী এসে আত্মপ্রকাশ করল, নারী—অন্তর যার হলাহলে ভরা—বিশ্বাসঘাতকতা যার রক্তে রক্তে, যার তীক্ষ্ণ নখর পুরুষ জাতিকে ক্ষতবিক্ষত করবার জন্য সদা-উদগ্রীব, যে মুহূর্তে এই নারী চাইলেন আমাকে বিশ্বাসের পাত্র হিসাবে বেছে নিতে, ঠিক তখনই তিনি তাঁর বিবাহিত সম্পর্কের প্রতি আঘাত হানছিলেন ; আর ঠিক তখনই পুরুষ হিসাবে নারী জাতির প্রতি মনটা আমার বিষিয়ে উঠল। এই মহিলা তাঁর স্বামীকে ও সেই সঙ্গে আমার অন্তরের পুরুষ সত্ত্বাকে অপমান করেছিলেন—সেইজন্যেই আমার ভেতরের পুরুষটা তাঁর স্বামীর পক্ষ নিয়ে এই নারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল। এ কথা অবশ্য ঠিক নয় যে, আমি নিজেকে খুব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলে মনে করি, কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে পুরুষ কখনও চোরের বৃত্তি গ্রহণ করে না—যতটুকু সে পায় তাই সে গ্রহণ করে। নারীই চুরি করে পেতে চায়—পাবার লোভে নিজেকে বিকিয়ে দিতেও তার আপত্তি হয় না – শুধু একক্ষেত্রে সে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে সমর্পণ করে—অর্থাৎ যখন সে স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহন্তা হয়। স্বৈরিণী স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করে—যুবতী স্ত্রীও তাই করে। বিশ্বাসহন্তা স্ত্রী স্বামীর প্রাপ্য যা চুরি করে নেয়, তাই তার প্রেমিকের কাছে নিবেদন করে।

এই মহিলাকে বন্ধুভাবে ছাড়া অন্য কোনভাবে আমি চাই নি। তাঁর সন্তান ছিল তাঁর রক্ষক—আমি তাঁকে জননীরূপেই দেখতাম। তাঁকে সব সময়েই দেখেছি তাঁর স্বামীর কাছাকাছি। সেইজন্যই কখনও কল্পনা করতে পারি নি যে তাঁকে নিয়ে স্থূল ধরনের আনন্দ-সম্ভোগে রত হব।

যাই হোক সব হারিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। নির্মম আঘাতে আমি যেন জরাজীর্ণ, আজ আমি একেবারে একলা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, কারণ ব্যারনেসের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই আমার আগেকার বোহেমিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। (ক্রমশঃ)

এরাও মানুষ ছিলো

পথচারী

পুজো আসছে⋯গরীবের আতঙ্কর পুজোর দিন এগিয়ে আসছে। ফুটপাথে দোকান বসেছে, হরেক রকমের জিনিষ⋯কাটা-কাপড়ের টুক্‌রো, ছেলেমেয়েদের জামা-ইজের, ব্লাউজ-সায়া, রুমাল-তোয়ালে⋯হাফ-সার্ট পা জামাও কেউ কেউ রেখেছে। শুধু নেই কাপড়⋯মিলের কাপড়। তাঁতের রঙিন শাড়ি ফুটপাথ আলো করে পুজোর বাজার রক্ষা করছে। বড় দোকানে খদ্দের নেই—তাদের দাম চড়া। কেউ ওঠে না সে দোকানে⋯কেবল পাশ দিয়ে যাবার সময়, রাগের যা একটিমাত্র ভাষা সেই 'শালা' শব্দটি প্রয়োগ করে চ'লে যায় দেখতে পাই। শব্দের অপ-প্রয়োগ! খুড়ো বলে, ওদের বিশেষণ ত্রি-ভুবনে নেই!

—কিন্তু খুড়ো, কাপড়গুলো গেল কোথায়?

খুড়ো বললে, সব মাটির নীচে, অর্থাৎ 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড কারেন্ট'⋯সেইখান থেকেই মাল 'পাচার' হয়ে যাচ্ছে। আর কেমন তাক্ বুঝে কোপ মেরেছে দেখেছ বাবাজি, পুজোর আগেই দিলে বোম্বে মিলের ষ্ট্রাইক্ করিয়ে। ভাবলে, লোকগুলো সব ছাগল—যা বোঝাব তাই বুঝবে।

—কিন্তু তাই ত বুঝতে হচ্ছে। 'প্রোডাক্‌সন' বেশী হ'ল ব'লে আমেরিকানরা লক্ষ লক্ষ টন ময়দা জমিতে ঢেলে দিলে, আর তারই পাশের প্রতিবেশী দেশগুলো সেবার না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরল! এর নাম বাজারের রাশ! কখনও ঢিল দিচ্ছে, কখনও টেনে ধরছে।

খুড়ো বার কয়েক হুঁ হুঁ বলে থেমে গেল।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে থম্‌কে দাঁড়ালাম। বাজারে মাল নেই, লোকের ভিড় আছে।

এমনি ভিড় দেখতাম দশ বছর আগে। কাপড়ের দোকানে তখন ঢোকে কার সাধ্য! ভাঙা গলায় দোকান-দারের বিরাম-বিহীন চীৎকারের মাঝেই নিজের প্রয়োজনের কথা সেরে নিতে হয়। তখন ছিল রকমারি শাড়ি আর তার পাড়ের বাহার। তখনকার দিনে পুজো ছিল উৎসব⋯সারা বছরের এই একটিমাত্র উৎসবে বাঙালী-প্রাণ যেন জেগে উঠত। আজ সে প্রাণ নেই, উৎসব আছে—মরা উৎসব! এই মরা উৎসবকে বাঁচিয়ে রেখেছে ঘরের-পাওনাদারেরা। অর্থাৎ ঘরের বৌ-ছেলে-মেয়েরা। চোয়ের কপ্‌নি লাভ! পুজোর নামে যা-কিছু পাওয়া যায়।

তাদেরই বা দোষ দেব কি। সারা বছর ধরে এই পুজোই ত আমরা দেখিয়ে আসছি—তারাও দিন গোণে, কবে আসবে সেই পুজো।

দিন সবাই গোণে⋯নতুন জুতো, কাপড়, জামা—যাদের একটু অবস্থা ভাল তারা ওরই মধ্যে আবার সোনার স্বপ্ন দেখে, দু-একটা নতুন গয়না কি হবে না!

ক্যালেণ্ডারের পাতায় আজো দিন-গণনা চলছে। দিন যাচ্ছে, কিন্তু দিনের সঙ্গে প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে! আজ পয়সা নেই, পয়সায় সঙ্গে আনন্দ নেই, সে প্রাণ নেই, কিন্তু অনুষ্ঠান আজো বেঁচে আছে!

খুড়োকে বললাম, এত ভিড় কেন? দোকানে ত মাল নেই?

—মালের জন্যে ত ওরা ছুটোছুটি করছে না—ওরা ঘরে এক মুহূর্ত টিঁকতে পারছে না, তাই দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে!

তাই বটে। সবাইকে দেখলাম, পথে এসে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে।

পথে পথে কিল্‌বিল্ করে ঘুরে বেড়ায় উলঙ্গ ছেলে-মেয়ের দল। তারা চেয়ে চেয়ে দেখে, তাদেরই সমবয়সী ছেলে-মেয়েরা নতুন জামা, জুতো বগলে করে ঘরে ফিরছে। সবাই বলাবলি করে পুজো আসছে। পুজো সকলেরই আসছে, কেবল পুজো নেই তাদের⋯তাদেরই সম্মুখে উৎসবের আলো জলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ওদেরও ত আছে মা-বাপ—ঠিক আর সবারই মত মা-বাবা। যাদের আদর ওদের মা-বাপের চাইতে কোন অংশে কম নয়। সন্তান ত সকলেরই সমান, তবে কেন এই পৃথক ব্যবস্থা! মা-বাপের চোখে জল আসে—সে জল অতি সংগোপনে তারা মুছে ফেলে।

দু'ধারের দোকানে নানা রং-বেরঙের প্রলোভন···উল্লাসে নৃত্য করতে গিয়ে তারা যায় থেমে। অমনি মনে পড়ে যায়, এ তাদের জন্য নয়।

ওরা ভাবে, সব মানুষ কি এক জাতের নয়? এক জাতেরই যদি—একই মাটির মানুষ যদি তবে কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই কেন? কেউ কালো, কেউ ফর্সা—কেউ কানা, কেউ খোঁড়া—কেউ জামা-কাপড় পায় আবার কেউ পায় না, কেউ ইচ্ছে মত খেতে পায় আর কারু ভাগ্যে পোড়া রুটিও জোটে না।

ওরা বলে, ছোটলোক, বড়লোক। কিন্তু কে করলে তাদের ছোট আর বড়? সে কোন্ ভগবান, যার স্নেহে এত পার্থক্য? সে কোন্ ভগবান, যে ওজন করে দিতে জানে না? সে কোন্ ভগবান, চোখে দেখেও যার প্রাণ কাঁদে না?

মানুষের ভগবানের মানুষের প্রতি দরদ থাকবে না, এই বা কেমন কথা!

প্রশ্ন করে তার মা'র কাছে, বাবার কাছে। কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর মেলে না। শুধু এই জানে, তাদের নেই। নেই যখন তখন অপরের কেড়ে নেবে না কেন? তোমার ত অত প্রয়োজন নেই—একজন একেবারেই বঞ্চিত থাকবে, আর অপরজন প্রাচুর্যের গৌরব করবে—এ নিয়ম কেনই বা থাকবে?

একটা ছেলে—অমনি এক উলঙ্গ ছেলে, সে কার হাত থেকে জামা কেড়ে নিয়েছে। ধরা পড়ে সে শুধু বলেছে, আমার নেই।

রাস্তায় লোক জমে যায়। নানা জনের নানা রসিকতা। কেউ বলে, বেড়ে ছেলে ত! ওর মা-বাপ এখন থেকেই তালিম দিচ্ছে!

একজন তার নিজের চোখে-দেখা ঘটনা আধঘণ্টা ধ'রে বলে গেল। দুধের ছেলে মশাই, বলে, সে কি করে তার পকেট থেকে দশ টাকার নোটখানা অতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তুলে নিলে তারই কৌতুককর কাহিনী।

যে ছেলেটার জামা কেড়ে নিয়েছে সে ত কাঁদতে লাগল। একজন পরামর্শ দিলে, ওকে নিয়ে থানায় যান মশাই—ও বিচ্ছু ছেলেকে প্রশ্রয় দেবেন না। যে জামা নিয়েছে, সে কিন্তু জামা ছাড়ে নি—দিব্যি বগল-দাবা করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একজন চেয়ে চেয়ে দেখছিল। সে এগিয়ে এসে বললে, আপনার ও জামাটার দাম কত মশাই?

অমনি পাশ থেকে একটা লোক বলে উঠল, কেন, আপনি দেবেন না কি?

আর একজন একটু গলা নামিয়ে শ্লেষ করলে, বললেই ত হ'ত মশাই এতক্ষণ, মিছি মিছি আমরা হয়রান হতাম না। পরিচয় দেবেন মশাই, পরিচয় দেবেন—নইলে আপনার লজ্জা ঢাকতে গিয়ে আপনি ছেলেটার ভবিষ্যৎ খাবেন।

জামার মালিক ভদ্রলোক বললেন, না হয় দামই দিলেম, কিন্তু অমন জামা কি আর পাব!

কতকগুলো ছোক্‌রা যাচ্ছিল। কথা শুনে বললে, লোকটা কি রে! দে শালাকে জুতিয়ে!

সারমেয়

পুষ্পদেবী, সরস্বতী

দেবীর বারে বারেই মনে পড়ে—কুকুরকে তার এত বিতৃষ্ণা এত ভয় কেন? সে কি মহাভারতে পড়ে নি? ধর্মরূপী সারমেয় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছিলেন। সে কি জানে না জীবে শিব আছেন? সে কি গীতায় পড়ে নি কুকুরে ও ব্রাহ্মণে সমজ্ঞানের শিক্ষা? তার কত আদরের সবু! তারি বউ লীলা। সেই কিশোরী লীলার মা ডাকে দেবীর বুক ভরা। সেই দেবী কি তুচ্ছ কুকুরের জন্যে লীলার সঙ্গে চির বিচ্ছেদ ঘটাবে? নানা ভাবে মনকে প্রবোধ দিয়েছে দেবী, বুঝিয়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে-কে সেই। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারে নি। একেই কি ডাক্তাররা এ্যালার্জি বলে? ডাক্তাররা মাথা-মুণ্ডু যাইই বলুক না কেন দেবীর এখন কি উপায় হবে?

সেই যে ছোট বেলায় একটা গল্পে পড়েছিল। "মুরিতে মেকুর" তারও যে মনের মধ্যে কুকুর নিয়ে প্রায় সেই রকমই একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এক ছাত্র বলেছিল মুরিতে মেকুর অর্থাৎ নর্দমায় বেড়াল। শিক্ষক ছাত্রকে কিছুতেই বেড়াল বলাতে পারেন না, শেষে বললেন বল ত ব-এ একার দিলে কি হয়? ছাত্র বলল বে। শিক্ষক বললেন ড় এ আকার দিলে কি হয়? ছাত্র বলল ড়া। শিক্ষক সন্তুষ্ট হয়ে বললেন আর ল দিলে? ছাত্র হাততালি দিয়ে বলে উঠল মেকুর স্যার মেকুর। শিক্ষকের শিক্ষকতার আনন্দ ধরাশায়ী হ'ল। এও দেবীর হয়েছে সব কথার শেষে যেমন করেই হোক সেই কুকুর!

লীলার কাঁদ-কাঁদ মুখ আর সবুর বিরক্ত-কঠিন মুখ যে তার পক্ষে কি কষ্টকর তা শুধু অন্তর্যামী নারায়ণই জানেন। এই সবুর হাসিমুখ দেখার জন্য কি করে নি সে? মনে পড়ে অতীত দিনের কত দুঃখময় কাহিনী। এই সবুকে পাচ মাস পেটে নিয়ে সে স্বামী হারিয়েছিল। তার দীর্ঘ জীবনের সেই ক্ষণবসন্তের কতটুকু বা স্মৃতি আছে? অতীত দিনের আনন্দ স্মৃতি ত শুধু সেই শিশু সবুর হাসি কলরবে ভরা যা মধুচ্ছবি তার আঁকা আছে। সেই সবু যার জন্যে হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে তারই পরাণ প্রতিমা বধুর জীবনে আজ সে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখে আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হয় দেবীর। মনকে তন্ন তন্ন করে সে বিচার করে। সত্যি কি তার মনে ঈর্ষার লেশ আছে লীলার প্রতি? সবুরই বা কি দোষ? সে ত বিয়ে করতেই চায় নি। বারে বারে বলেছিল কি হবে মা পরের মেয়ে ঘরে এনে। হয়ত সে এসে তোমার আমার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবে, বেশ ত আছি আমরা মা-ছেলের।

দেবী শোনে নি সে কথা, বলেছিল, "তুই আর আমার সাধে বাদ সাধিস নি সবু—এ ত আর আধুনিক ধিঙ্গি মেয়ে আনছি না? কত বড় বংশের মেয়ে এ। ওর মা'র প্রশংসা কত? শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী সবাইকে নিয়ে কেমন ঘর করছে? ওর দিদিমা স্বামীর জন্য নুনই ছেড়ে দিল আজীবন। ঐসব বাড়ীর মেয়ে এসেও যদি আমায় সুখী না করতে পারে, বুঝব আমার মনই নয় সুখী হবার মত। তখন কে জানত বল মেয়ে দেখতে গেলে কুকুর দেখতে হবে আগে? মেয়ের বাড়ী যাওয়াই দরকার মনে করেন নি তিনি। ওরা ত বিখ্যাত বাড়ী, ওদের আবার দেখবেন কি? তা ছাড়া সধবা বেলা কাজে-কর্মেও ত গেছেন তিনি, কি করে জানবেন বল যে কাজে-কর্মে কুকুরদের সরিয়ে দেয়া হ'ত। যে অঘ্রাণে বিয়ে হ'ল সে বছরও অষ্টমীর দিনে গেছলেন দুর্গাকে অঞ্জলি দিতে। ইচ্ছে ছিল যে রথ দেখাও হবে আবার কলা বেচাও হবে।

অথচ অষ্টমী বলে খাওয়ার জন্যে কেউ বলতে পারব না তখন এই কিশোরী লীলার চামর ঢোলানর ছবিটি দেখে আশান্বিত হয়েছিলেন। মনে হয়েছিল দেশে গোপীনাথের চাঁচরের সময় বধূলীলার এই ছবিটি দেখে দেশের লোক মুগ্ধ হবে। তখন কি কল্পনাও করেছিলেন যে বাড়ী থেকে ঠাকুর, এমন কি স্বামীর শেষ ছবিখানিও চলে যাবে তাঁর

পুজোয়? ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন দেবী। আবার ত্রস্ত হয়ে চোখ মোছেন, ওরা না দেখে ফেলে। কত কথাই না ছবির মত মনে আসছে—হীরে জহরতে মোড়া ফুলের কুঁড়ির মত লীলা যখন এসে দাঁড়াল, চোখের জলে তখন চোখ ভরে উঠেছে দেবীর। এমন সময় হঠাৎ ভউ ভউ আওয়াজে চমক ভাঙ্গে তাঁর। ভাবেন, ওমা এ কুকুর; কুকুর এলো কোথা থেকে? কী অলক্ষণ? ডাকেন, অ মধু মধু কোথায় গেলি এ সময়, দে না কুকুরটাকে তাড়িয়ে? সবু ডাকে মা—! চমকে উঠে দেখেন ছেলের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর—তার চোখের লক্ষ্য ধরে দেখেন কুকুর লীলার বুকে। বেনারসী শাড়ী মালা তার মধ্যে ছোট্ট একটা কালো বীভৎস মুখ উঁকি মারছে। বৌমত্রের আলপনায় দুধে-আলতার পাথরের ওপর বৌ তখন দাঁড়িয়ে। তখন ভাবার সময় নেই, দেবীর মনে হ'ল তার এই সাধ দেখে তার অদৃষ্ট বুঝি কুকুরের রূপ নিয়ে তাকে ভয় দেখাচ্ছে।

মাথাটা ঘুরে ওঠে। কোনরকমে নিজেকে সামলে বরণডালা নিয়ে এগিয়ে যান তিনি। হায় রে অদৃষ্ট! বারে বারেই মনে হয় ঘরের লক্ষ্মীকে বরণ না করে একটা কুকুরকে বরণ করছেন তিনি। তারপর থেকে দুঃখের কথা আর বলার নয়।

এদিকে লীলার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। অমন মেয়ে হয় না, কথায়-বার্তায় তার কোন খুঁত নেই। সব দোষ তাঁর কপালের। বৌ যখনই আসে এগিয়ে আসে পায় পায় ঐ কুকুর। আর সে যেন দেবীকে দেখলেই রাগে গর গর করতে থাকে। লীলার সঙ্গে প্রাণভরে একটা কথা কইতে পান না তিনি, মনে মনে ভাবেন কতক্ষণে লীলা এ ঘর থেকে যাবে, তবে বিদেয় হবে কুকুর। সেদিন যখন তিনি পুজোয় বসেছেন, এমন সময় সদ্যস্নাতা লীলা এসে বলল, মা-মণি আমি আপনার চন্দন ঘষে দোব? জপ করতে করতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানান তিনি। গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে লীলা চন্দন ঘষতে বসে। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা কুকুরটা এসে হাজির। বারে বারে চন্দনপিঁড়িটা শুঁকে লীলার পাশ ঘেঁষে বসে পপি। যতই মনকে শক্ত করার চেষ্টা করুক দেবী, কি করে কুকুরে-শোঁকা ঐ চন্দন দিয়ে নারায়ণ পুজো করবে? উঃ, এমন বিপদেও মানুষে পড়ে? আর সবুও হয়েছে তেমনি।

যে সবু দেবীর অপছন্দর জন্যে একদিন টেবিলে-চেয়ারে খায় নি সেই সবুর যেন এসব চোখেও পড়ে না। আজ তিন মাস হ'ল সবুর বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে কুকুরে শোঁকার ফলে কত দিন যে বাড়া ভাত তাকে ফেলে দিতে হয়েছে তার ঠিক নেই। অবিশ্যি লুকিয়েই তিনি ফেলেন, তবু কি একদিনও সে বুঝতে পারে না? এইত সেদিন বিধবার সারা দিনের একবারের পিণ্ডি কুকুরে ছোঁয়ায় ফলে ফেলে দিয়ে যেই তিনি শুয়েছেন, লীলা এক বাটি তেল নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ভয়ে ভয়ে বলে সত্যি মা মণি আপনার জ্বর হয়েছে, আমি বুঝতে পারি নি কেন তা হ'লে সাত সকালে ঠাণ্ডা জলে চান করলেন আপনি? একটু গরম তেল মালিশ ক'রে দেব পায়ে? মনের সব দুঃখ, সব বিরক্তি ভুলে মায়ায় ভরে উঠল দেবীর বুক, বললেন দাও মা। ওমা তক্ষুনি লাফ দিয়ে পপি উঠল তার বিছানায়। ভয়ে ঘেন্নায় সিঁটিয়ে পড়ে রইলেন তিনি কাঠ হয়ে। কিছু বলতেও পারেন না, সে এক মর্মান্তিক শাস্তি। সত্যি, এই বৌকে কি কুকুরের জন্য কড়া কথা বলতে পারেন তিনি? কিন্তু এবার ব্যাপার চরমে উঠল। লীলার দাদার বিয়ে। এরি মধ্যে তাদের বড় এ্যালসিসিয়ান কুকুর না কি পাড়ার একটি মেয়েকে কামড়ে তার মাকড়ি-শুদ্ধ কান ছিঁড়ে নিয়েছে। প্রকাণ্ড কুকুর, যখন না কি তার কানটা ছিঁড়ে নিয়েছিল তখন মেয়েটা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একটুও কাঁদে নি। লীলার কাছে এই গল্প শুনে দেবী বলেছিলেন, ওর কি আর দেহে প্রাণ ছিল? ভয়েই প্রাণ খাঁচাছাড়া। লীলা বলে, "ওমা তা কেন হবে? সেই কান ত প্লাষ্টিক সার্জারি করে কর হ'ল—তখন কি কান্না মেয়েটার। টাকা অবিশ্যি সব বাবাই দিয়েছে।" কথার সুরে মনে হয় টাকা যখন দিয়েছে তখন আর কান ছেঁড়ায় বাধা কি? লীলা বলেই চলে জানেন মা-মণি, আমার ঠাকুমার এক মেয়ে আছেন। মে বলে সত্যি কিছু তিনি ছোট্ট মেয়ে নন, নাতি-নাতনী হয়ে গেছে তাঁর। তাঁরও অদ্ভুত ভয় কুকুরের, যখনই আসে আমাদের বাড়ী, আগে থেকে খবর পাঠান কুকুর সরাও— এমন কি ছোট্ট পপি কি তার চেয়ে ছোট কুকুরেও তাঁ কি ভয়? ঘরে কুকুর দেখলেই তিনি খাটে উঠে দাঁড়াবেন। ঐ নিয়ে কত হাসাহাসি করি আমরা

হয়ত চেয়ারে বসে আছেন, চেয়ারেই পা তুলে বসবেন।

কত ঠাকুমা বোঝান অত তোর ভয় কেন রে? প্রত্যেক-বারই বলেন বাবাঃ, আর আসব না তোমাদের বাড়ীতে, যা কুকুর! চিঠি পত্রে তাঁর কত আন্তরিকতা ভরা কিন্তু বাড়ীতে এলেই যেন আলাদা মানুষ। যেন পালাতে পারলে বাঁচেন এমনি ভাব। আবার আমার পিসেমশাই জাষ্টিস লাহিড়ী অত সায়েব মানুষ ত তিনি? তারও কুকুর দেখলেই কি ভয়, বলেন তোমরা লিখে রেখেছ কুকুর থেকে সাবধান—এর মানে যে ভদ্রলোকেরা এস না। তা কেন হবে মা-মণি, যদি কামড়ায়ই কুকুর তা বলে বাড়ীতে কুকুর থাকবে না? ঐ যে অত আদরের বোন আমার তাকেও ত কুকুরে কামড়েছিল। ক'টা ইনজেকশন দেওয়া হ'ল, ব্যস।

অনেক ভেবেচিন্তে বাড়ীর ঠাকুর কালীঘাটে হিন্দু মিশনে পাঠিয়ে দেন দেবী। ভাবেন থাক কুকুরে শোঁকা নৈবেদ্য দিয়ে আর পুজো না করাই ভাল। কিন্তু অততেও হ'ল না শেষ রক্ষে। লীলার দাদার বিয়েতে ক'দিন ধরেই সবু লীলা সেখানে, বিয়ে বৌভাত সব চলছে। আজ না কি সখের থিয়েটার হবে। বাগানের মধ্যে ষ্টেজ বাধা হয়েছে, বাড়ীর ছেলে মেয়েরাই করবে। ছাদে কুকুরদের রাখার কথা হয়েছিল। কিন্তু ক'দিন ধরে শাঁখের আওয়াজে ডিউক নাকি ক্ষেপে রয়েছে ছাদে থাকতে চাইছে না তাই লীলা ছোট ছোট পাচটি কুকুরের সঙ্গে ডিউককেও পাঠিয়েছে তার শ্বশুরবাড়ীতে, সঙ্গে একটা চিঠি—

'মা-মণি দাদার বিয়েতে যদি এরা সর্বক্ষণ কাঁদে দাদার অকল্যাণ হবে ত? তাই এদের আপনার কাছে পাঠালাম, মধুকে বলবেন এদের একটু মাংস-ভাত করে দিতে। আর ডিউকটা ক্ষেপে আছে, হয়ত কিছু খেতেই চাইবেনা, আমার দুধটা ওকে দেবেন" চিঠি পড়ে শেষ করার আগেই ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়ে কুকুরের দল। সমস্ত বাড়ীর ভেতর সুরু হয় দাপাদাপি। সবু লীলা বাড়ী নেই তাই একমাত্র ভৃত্য মধুকে তিনি পাঠিয়েছেন শিবপুরে ননদের বাড়ীতে। ভয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খিল দেন তিনি, ততক্ষণে জানলা গলিয়ে ছোট কুকুর তিনটে ঘরে ঢুকে পড়েছে। আঁচড়ে-কামড়ে গা চেটে তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছে, এধারে ওঘরে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে ডিউক।

ফোন বাজছে দরজা খুলে ধরার সাহস নেই—ঐ যাঃ ঝন ঝন করে কি পড়ে ভাঙল কে জানে? কে যেন দরজা ঠেলছে। দরজা খুললেই বা কি হবে? তিনি না হয় বৌয়ের জন্ম ডিউককে সহ্য করবেন পাড়ার লোক সইবে কেন? মাথার কাছে টেবিলে সবুর বাবার ছবিতে আজই সকালে ফুলের মালা দিয়েছিলেন দাঁতে করে তা ছিঁড়ছে বাচ্চা কুকুরটা—যাক ছবিটাও পড়ে ভাঙল। মাথার ভেতর কেমন করতে থাকে দেবীর। মনে হয় জ্ঞান বুঝি আর থাকে না। সব ভুলে গেছেন দেবী সবুর মুখ লীলার মুখ মৃত স্বামীর মুখ, শুধু চারধারে বীভৎস কুকুরের মুখ আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর চারিধার।

দাদাজী

যাঁদের করি নমস্কার (৪)

অপরেশ ভট্টাচার্য

"না, না, চাই না, চাই না। ও আমার মা নয়—ও ত নকল মা"।—রুদ্ধ আবেগ ফেটে পড়ল বছর এগার বয়সের ছেলেটির।

ঠাকুরমা এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলোলেন। আদর করে বললেন—ওরে, ওই-ই ত তোর নতুন মা—তোর মা।

—"কক্ষনো নয়, ও আমার মা নয়, ও নকল মা, সেকি মা। আমি চাই না, চাই না।"

ঠাকুরমা হয়ত আবার কিছু বোঝাতে চাইছিলেন ছেলেটিকে। কিন্তু তার আগেই একটা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড ঘটে গেল। রুদ্ধ আবেগে ফুঁসছিল ছেলেটি। হাতে ছিল একটা রুল। আর তাই দুম্ করে ছুড়ে মারল ঐ নতুন বৌ-এর দিকে। ভাগ্যিস্ ওটা নতুন বৌ-এর গায়ে না লেগে গিয়ে লাগল একটা কলাগাছে! কি কাণ্ডটাই না হ'ত তা হ'লে! কিন্তু ততক্ষণে চারদিক থেকে সবাই হা হা করে ছুটে এসেছে।

"এ কি অলুক্ষুণে কাণ্ড রে বাবা! এ কি হতভাগা ছেলে রে বাবা!" হতভাগা ছেলেও ততক্ষণে কাণ্ড-খানার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তাই ছুটে একটা ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দিল খিল্ এঁটে। কিন্তু তাতেই কি আর জ্যেঠামশায়ের কাছ থেকে বাঁচা যায়!—"খোল্, শীগ্‌গির দরজা খুলে দে হতভাগা"—কঠিন গলায় কড়া হুকুম দিলেন জ্যেঠামশায়। এবং খুলতেও হ'ল দরজা। আর তারপরেই সুরু হ'ল মার। ভীষণ মার। পা থেকে জুতো খুলে দমাদ্দম্ মার লাগালেন। সে কি ভীষণ জুতাপেটা। নকলকে আসল বলে, বিমাতাকে মাতা বলে মেনে না নিতে পারার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে চলে আসতে হ'ল মামার বাড়ী কলকাতায়।

কিন্তু কেন এমনটি হ'ল? – ছেলেটির মা মারা যাওয়ার বছর খানেক পরেই বাবা আবার বিয়ে করেন। আর এই বিমাতাকেই তার মা বলায় ক্ষেপে ওঠে ছেলেটি। মায়ের আসনে বিমাতাকে বসাতে কিছুতেই সে রাজী হয় না। আর তাই এত ভুল্‌কালাম কাণ্ড! সেদিন যার মাকে চিনতে ভুল হয় নি, বিমাতাকে যে কিছুতেই মায়ের আসনে বসায় নি—সারা জীবন ধরেই কিন্তু সে একনিষ্ঠ ভাবে সেবা করেছে মাতৃভাষার। নিজের জিনিষ তা যত তুচ্ছ, যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন—অপরের মহামূল্যবান বস্তুর চেয়েও যে প্রিয় এই ছিল তাঁর সারা জীবনের ধ্যান-ধারণা। তিনিই বলেছিলেন—

"দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"—

কিন্তু এ ত গেল অনেক পরের কথা। অদ্ভুত এই ছেলেটির অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী। কলকাতায় একবার খুব মশা-মাছির উপদ্রব সুরু হ'ল। তখন তার বছর তিনেক মাত্র বয়স। অসুখ করেছে—তাই সারা-দিন বিছানায় বন্দী। শুয়ে শুয়ে আপন মনে বকে যায় ছেলেটি—মশা-মাছি তাড়াবার জন্য হাত-পাও নাড়তে হয় মাঝে মাঝেই। এমনি করে হাত-পা নাড়তে নাড়তে মাত্র তিন বছর বয়সের ছেলেটি একটা পদ তৈরী করে ফেলল হঠাৎ—

রেতে মশা, দিনে মাছি
এই তাড়্যে কল্‌কেতায় আছি।

—ভারী অবাক লাগে, না! মাত্র তিন বছর বয়সে মশামাছি নিয়ে পদ্য রচনা করেছিল যে ছেলেটি, পরবর্তী কালে সেই ছেলেটিই কিন্তু কবিতায় কবিতায় গোটা বাংলা দেশকে ভরিয়ে দিয়েছিল। আর কত রকমারি বস্তুই না ছিল তাঁর কবিতার বিষয়। কখনও কবির দলের টপ্পা লিখেছেন, কখনও বা বাঙালী সাহেব-মেমদের নিয়ে করেছেন ঠাট্টা-তামাসা। তবে সবচেয়ে বেশী কবিতা লিখেছেন বাংলা দেশে ও বাঙালী জাতির অতি সাধারণ জিনিস নিয়ে। বাঙালীর নানান রকম খাবারের উপর তাঁর অনেক কবিতা আছে। পিঠেপুলি, মাছ-মাংস আরও কত!

মাংস বাঙালীর খুব প্রিয় খাদ্য। তাই 'পাঁঠা' তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে গেল। আর ভারী মজারও ছিল সেগুলো। তিনি লিখলেন—

"শুধু খায় পেট ভরে পাঁঠা রাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি কাছে থাকে বাঁধা॥
সাদা কালো কটা রূপ বলিহারি গুণে।
পাত্ পাত্ ভাত মারি ভ্যা, ভ্যা রব শুনে॥

—এমনি আরও কত কবিতা তাঁর। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল 'সংবাদ প্রভাকর।' 'সংবাদ প্রভাকর' একটি পত্রিকা—আর তখনকার দিনের সবচেয়ে নামকরা পত্রিকা। এই পত্রিকায় লিখবার জন্ত তিনি যাদের উৎসাহিত করতেন ও যাদের লেখা তিনি সযত্নে এই পত্রিকায় ছাপতেন—পরবর্তীকালে তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখক হয়েছিলেন। তাঁরা কারা জান? তাঁরা হচ্ছেন—বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু—এঁরা। কেউ উপন্যাসে, কেউ কাব্যে, কেউ বা নাটকে বাংলা সাহিত্যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। আর যাঁর কথা এতক্ষণ ধরে বললাম—তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর লেখা কবিতাতেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচরে
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকরে।

—সমগ্র বাংলা সাহিত্য-অঙ্গন সেদিন যাঁর প্রভায় প্রভা পেয়েছিল, প্রতিভার প্রতিপালনে যিনি সেদিন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন—সেই 'চরাচর ব্যাপ্ত' ঈশ্বর গুপ্তকে আমাদের নমস্কার জানাই।

আশার দৌড়

অমর মুখোপাধ্যায়

রামছাগলের দৌড় হবে টাট্টু ঘোড়ার সাথে
কলিকাতার গড়ের মাঠে পুর্ণিমা এক রাতে।
'রেসে'র ঘোড়ার খাতির দেখে ছাগল ভাবে—কেন
এমন করে কাটাই জীবন, নেহাৎ ছাগল যেন!
পুর্ণিমা ত ঘনিয়ে এল; হঠাৎ সেদিন দেখা
রাজ্যপালের বাড়ীর কোনে দাঁড়িয়ে ছিলেন একা
ফিরু ধোবার বুড়ো গাধা, বয়স অনেক তার,
হেঁকে বলেন—"ছাগলবাবু, শোন না একবার।"
রামছাগলও এগিয়ে গেল, গাধা বলেন শেষে—
"আমার মাথায় নেইক কিছু প্রবাদ আছে দেশে।
তবু বলি, হঠাৎ কেন গো-ভূত চাপে ঘাড়ে?"
ছাগল তখন খোশমেজাজে লেজটি বারেক নাড়ে।
এধার-ওধার তাকিয়ে গাধা আবার বলেন হেসে—
"তোমায় স্নেহ করি আমি, বলছি ভালবেসে।
আমার কথা একটু শোন, ভূত ছাড়বে তবে।
শুনলে কথা, তোমার-আমার, সবার ভাল হবে।
নীল বরণের শিয়ালবাবুর গল্পটা ত জানা,
ময়ূর হওয়ার সাধে কাকের কপাল হ'ল কানা।
সেই খেয়ালের ভূতটা এখন তোমার ঘাড়ে চেপে
রেসের ঘোড়া হওয়ার আশায় তাই উঠেছ ক্ষেপে।
আমার মতে, যেমন আছ তেমন থাক ভাই।
নিজের ঘরের আদরটুকু পরের ঘরে নাই।"
ছাগল বলে—"গাধা তুমি, বুদ্ধি ত নেই ঘটে,
জেনে রেখ—মিথ্যে কথা, আজকাল যা রটে।"

হরির প্রথম ভাগ পরিচয়

জ্যোতির্ময়ী দেবী

নামটা তার হরিহর ছিল না। ছিল রসিকচন্দ্র কি রসময় দাস এমনি একটা নাম। বাড়ীর গৃহিণীর সে নাম ধরে ডাকাটা খুব মনঃপূত হ'ল না। চাকরিতে বহাল করেই তিনি তার নাম দিলেন হরিচরণ কিংবা হরিপদ।

এখন একটু আগের কথা বলি। তখন ১৩০৬ সাল, আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।

বাড়ীতে 'প্রবাসী' আসত। সেকালে ত আর অনেক মাসিক সাপ্তাহিক এবং সুনিয়মিত পত্রিকা-পত্র ছিল না। 'প্রবাসী'ই সেকালের বিদেশের প্রবাসের লোকের কাছে 'সবে ধন নীলমণি।' সারা মাসে যার সব পাতাই প্রায় পড়া হয়ে যায় চিবিয়ে গিলে। অবশ্য ব্রহ্মবাদ এবং গীতা পাঠ জাতীয় প্রবন্ধ বাদে।

সেবারে গরমের ছুটি। বৈশাখের প্রবাসী এসেছে। বিবিধ প্রসঙ্গ। নানা আলোচনা। গল্প উপন্যাস চিত্র-সমন্বিত সুশ্রী সুরূপ পত্রিকা।

যাই হোক সেই সংখ্যা কি কোন্ এক সংখ্যায় চোখে পড়ল এই গরমের ছুটিতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি গ্রামে দেশের বাড়ীতে যান, আর কিছুদিন থাকেন ত যদি গ্রামের একটি নিরক্ষর মানুষকেও অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেন ত দেশের নিরক্ষর সমস্যার একটি পথ বা উপায় খুলে যায়···। একটি ভাল কাজ হয়···ইত্যাদি।

এই ধরনের ইঙ্গিত ও আলোচনা আগেও দেখেছি কয়েকবার। কিন্তু কথাটা মনেও ছিল। কিন্তু আমরা থাকি প্রবাসে। কাজেই স্বদেশের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় সম্পর্ক প্রায় না থাকা। আর প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে কে কোথায় নিরক্ষর আছেন তাও জানা শক্ত। তা ছাড়া আমি ছাত্র-ছাত্রীও নই। বরং একটি ঘোর পর্দানসীন অন্তঃপুরিকা নারী।

যাই হোক তখন বাড়ীতে একটি উৎসব উপলক্ষ্যে বাঙ্গলা দেশের কিছুজন আত্মীয়-আত্মীয়া এসে পড়েছেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের দু'টি ভৃত্য। বাঙ্গালী ও উড়িয়া।

রাজস্থানী সন্ধ্যা। গরমের দিন। আলো তখনও শেষ হয়ে মিলিয়ে যায় নি আকাশ থেকে। সকলেরই বিছানা ছাতে সারি সারি খাটিয়ার পাতা। শুয়ে-বসে গল্প গান, হেরিকেনের আলোয় পড়াশোনা, সেলাই বোনা চলছে। আমার হাতে প্রবাসী।

হঠাৎ মাথায় খেলে গেল, 'বাঃ, হরিকে প্রথম ভাগ পড়াই না? বর্ণপরিচয়?'

২

ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রথম ভাগ শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে হেরিকেনের আলো এনে বসা হ'ল। তখন বিদ্যুৎ রাজস্থানে পৌছয় নি। বিদ্যুৎ নয়। মোটরও কম। গাড়ি ঘোড়া সেকেলে রাজস্থানী রথ গরুর গাড়ি একার দেশেই আমরা আছি তখনও।

বললাম, 'আয় হরি, তোকে 'অ আ' পড়াই।'

রাজস্থানী প্রবাসের সেকালের অন্তঃপুরে 'বয়স্ক শিক্ষা'র প্রথম পা ফেলা হল বোধ হয়।

বললাম, 'খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে, নয়ত খুড়িমার কাছে দিয়ে আয়।'

সে খুড়িমার চাকর।

ছাতশুদ্ধ ছোটবড় সকলেই কৌতুক ও কৌতূহলে ভরে উঠেছে। মজা দেখতে জমেছে হেরিকেনের আলোটির কাছে। আশেপাশের খাটে বিছানায় সব জড় হয়ে উঠে বসল। অত বড় একজনকে প্রথম পড়ান হবে! যার গোঁপের রেখা রয়েছে মুখে। কিশোরী খুড়িমাও ছেলেটি কোলে নিয়ে কাছে এসে বসলেন।

প্রায় একটি 'হাতে খড়ি' দেবার মত ঘোরাল ব্যাপার। সরস্বতী পূজার দিনের মত। (পূজা বাদে অবশ্য।)

প্রথম ভাগ খুললাম। হরির বয়স তখন ১৯৷২০ হবে।

সে সলজ্জ সঙ্কোচে এসে বসল। কি পড়বে?

প্রথম পাতা খুলে সারি সারি "অ আ ই ঈ' দেখালাম।

বললাম, 'হরি, 'এটা হ'ল অ। বল অ'।

এখনকার মত বয়স্ক শিক্ষা আগে 'কথা' শেখা তারপর বর্ণপরিচয় নয়। ঠিক আমাদের ছোটবেলার মতই বলছি, এটা 'অ'। ওটা 'আ'।

ও হরি! হরি বললে, 'হরি এটা হ'ল 'অ'। বল্ 'অ'।

পাশের দর্শক ও শ্রোতারা হেসে ফেলে। নিজেদের ছোটবেলা ত কারুর মনে নেই!

কিন্তু আমিও হেসে ফেলি। বলি, 'না রে শুধু বল 'অ'।

হরি সহজ মুখে এবারেও বললে, 'না রে শুধু বল 'অ'।

এবার ছাত খিল্ খিল্ হাসিতে ভরে ওঠে ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে এবং বৌদের। সে অপ্রস্তুত হয়ে চারদিকে চায়।

একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে এবার বললাম, এইটে 'অ'। এই যে এই অক্ষরটা। বেচারা 'অক্ষর' কাকে বলে তাও ত জানে না।

হরি ঠিক শ্লেটে 'দাগা' বোলানোর মত আমার কথা-গুলিই পুনরাবৃত্তি করলে এবারেও।

৩

যাই হোক ক'দিনের চেষ্টায় অ আ শেষ করে অচল অধমে পৌঁছলাম।

কোনদিন হরি ঠিক ঠিক অ আ চিনতে পারে, আর ঠিক ঠিক 'অ আ ই' বলে। আর কোনদিন আমার পড়ানোর কথাগুলি ধরেই সবশুদ্ধ বলে 'হরি এটা হ'ল' অ চ আর ল 'অচল'!

আর তারপর আমরাও হাসি। সেও হাসে।

তবু হাসি-কথার মধ্যেই এমনি করে কে জানে কতদিনে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-তে শেষ পাতার কাছে তার কাপড় কাঁথা কাচা অন্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে পৌঁছল।

এবার দ্বিতীয় ভাগ সুরু। ঐক্য বাক্য কুবাক্য আরম্ভ!

শ্লেটে লেখা অক্ষরে 'দাগা' বুলান শেষ করেছে সবে। একটি দু'টি অ, আ, ক, খ, বেঁকাচোরা অক্ষরে লিখতে শিখেছে সবে। 'অচল' 'অধম'কেও প্রায় চিনেছে।

যাঃ, হঠাৎ খুড়িমার কলকাতায় ফেরার সময় এসে পড়ল। হরি বিমনা। আমরাও দুঃখিত বিমনা হলাম।

বললাম, যাঃ, তুই ত সবই ভুলে যাবি। দ্বিতীয় ভাগটা শেষ হ'লে আর ভাবতাম না। একটু কষ্ট করলেই ছেলেদের গল্পের বই—মহাভারত রামায়ণ পড়তে পারতিস চিঠিও লিখতে পারতিস বাড়ীতে।

সে বিমর্ষ মুখে বললে, হ্যাঁ। লেখাপড়ার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা তার মনে জেগেছে। কম লোভ নয়। বাড়ীতে চিঠি লিখতে পারবে। রামায়ণ পড়তে পারবে।

বললাম, তা সেই-শ্লেটগুলো গুছিয়ে বাক্সতে রাখ। আর যখন সময় পাবি একটু 'অ আ'-গুলো লিখবি। আর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগটা পড়বি নিয়ম করে।

খুড়িমাও বললেন 'আচ্ছা আমিও একটু পড়া ধরে নেব তোর। আর বলে দেব।'

সে খুসীমনে ঘাড় নাড়ল। কিন্তু সে ছোট ছেলের চাকর। দুধের বোতল, বাটি, ঝিনুক জামা কাঁথা বিছানা নিয়ে ব্যস্ত। সেই সব গোছায় আর কথা শোনে। আর অবুঝ ছোটদের মত হাসে।

তারপর কত দিনের পর আমি কলকাতায় এলাম।

হরি দেশে গেছে। জিজ্ঞাসা করি খুড়িমাকে 'সে লিখতে-পড়তে আর একটু শিখেছে, না ভুলে গেল সব?

খুড়িমা জানেন না। পাঁচ কাজের মাঝে সেও আসে না পড়তে। ওঁরও মনে থাকে না তার পড়ার কথা। তারপর দেশে গেছে।

দেশ থেকে সে কবে ফিরল মনে নেই। আর আমিও আবার জয়পুরে ফিরলাম।

এর পর প্রায় ৮।৯ বছর বাদে আমাদের কাছে হঠাৎ সে চাকরির খোঁজে এসে দাঁড়াল।

খুড়িমা বিদেশে। সে সেখানে আর যাবে না। বিদেশ দূর।

দেশ আছে। জমি-জমা ক্ষেত-খামার আছে। বাড়ীঘর আছে। দেশ বাঁকুড়ায়। জানা লোক। আমাদের কাছে আমি রাখলাম। কিন্তু এতদিনে আমিও তার পড়াশোনার কথা ভুলে গেছি। জিজ্ঞাসা করি, দেশে কে কে আছে? বিয়ে হয়েছে?

সলজ্জে বললে, বিয়ে করেছে। অনেক টাকা 'পণ' দিয়ে ১৫০ না দু'শ কত। বৌ আছে তার মা-বাপের কাছে। ছোট বউ। নিজের মা-বাপ নেই। ভাই আছে।

আমি ব্যস্ত। সেও কাজে ব্যস্ত। নিজের নিজের কাজে চলে গেলাম।

৫

ও মা! দেখি ডাকে চিঠি এল। রসিকচন্দ্র দাস। কার চিঠি? মনে পড়ে গেল। ও হরি! হরির চিঠি। ওর নাম ত রসিকচন্দ্রই বটে।

কে লেখে চিঠি খামে? এবারে মনে পড়ে গেল ওর পড়ার কথা। তবে ও কি পড়তে শিখেছে আরও? চিঠি লিখতে পারে?

বাজারের থলে মুড়ি হাতে হরি ফিরল।

খুশী মনে চিঠিখানি ফতুয়ার পকেটে রাখল।

আমার আর মনে নেই। কিছু জিজ্ঞাসার কথা। শুতে যাচ্ছি ওপরে রাত্রে। হঠাৎ দেখি বাইরের ঘরে বসে হরি নিবিষ্ট মনে চিঠি লিখছে। দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে। সামনে সেই সকালের আসা চিঠিখানি।

অবাক হয়ে দাঁড়ালাম। হরি চিঠি পড়ছে! লিখছে!

বললাম, কার চিঠি? সকালে ওটা তোর চিঠিই ত দেখলাম। কার চিঠি এলরে?

লজ্জিতমুখে বললে, 'বৌ লিখেছে।'

'বৌ? গাঁয়ের মেয়ে সে লিখতে-পড়তে জানে?' অবাক!

বললে, "হ্যাঁ। পাঠশালায় পড়েছে তিনখানা বই।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তুই পড়তে পারছিস তার চিঠি? পড়া মনে আছে তোর?' খুসীমনে সে ঘাড় নাড়ল। বৌয়ের চিঠি! সে খুব লজ্জিত আমার কাছে বলতে সে কথা।

তার সাফল্যে আর আমারও সেই কত বছর আগের বয়স্ক শিক্ষার চেষ্টার এই আশ্চর্য্য সফলতায় অবাক ও আনন্দিত মনে আমি ওপরে এলাম। ও নিজে আপনি চিঠি পড়তে ও লিখতে পারছে! কারুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে না। এবং গ্রামের সেকালের লোকের মত পড়িয়ে বা লিখিয়ে নিতে হচ্ছে না!

গ্রামের কোন একটি পাড়ার যিনি মোড়ল, তাঁর চেয়ে বড় তিনি যিনি সমুদয় গ্রামের মোড়ল। গ্রামের কোন একটি জাতের যিনি সমাজপতি, তাঁর চেয়ে বড় তিনি যিনি গ্রামের দলপতি।

যাঁহারা প্রধানতঃ দলাদলিতে নেতৃত্ব করেন, তাঁহারা বড় নহেন; যাঁহারা হিত চিন্তা ও হিত সাধন করেন, তাঁহারা বড়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

কোটালিপাড়া কাহিনী

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রামায়ণ ও মহাভারতের কাল হইতেই বঙ্গরাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের বৃত্তান্ত অনুসারে দেখা যায় যে, রাজা বলি তাঁহার পঞ্চপুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্মক, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রকের মধ্যে নিজ রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই পাঁচ পুত্রের নামানুসারেই পাঁচটি রাজ্য অভিহিত হইয়া থাকে। মনে হয়, তৎকালীন বঙ্গ—বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাকিস্তানের (যাহা পূর্ব্ববর্ত্তীকালে "পূর্ব্ববঙ্গ" নামে অভিহিত হইত) অধিকাংশ অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। এই বঙ্গ নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

"বঙ্গ এক বৈচিত্র্যময় ভূভাগ—এর সর্ব্বত্র বহে চলেছে উদ্দাম স্রোতস্বিনী। সেগুলির জলরাশি ভূভাগটিকে বৎসরের কয়েক মাস জলমগ্ন করে রাখে। এই কারণে অন্যান্য অঞ্চলে যে সকল যানবাহনে আরোহণ করে স্থানান্তরে গমনাগমন করা যেত, এখানে সেগুলি ছিল অচল। অশ্ব ও রথ পিছনে রেখে আক্রমণকারীগণকে বিশেষ জলযানের ব্যবস্থা করতে হত। শুষ্ক অঞ্চলের আয়ুধ ও বাহন দিয়ে বঙ্গে যুদ্ধ চালানো যেত না। প্রকৃতিদত্ত এই দুর্ভেদ্যতার জন্য অপর চারটি জনপদের বিবর্ত্তন বঙ্গকে সহজে স্পর্শ করত না। একই কারণে জনপদটি ছিল আর্য ঋষিদের কাছে অগম্য—তাই অপবিত্র। কিন্তু সে অবজ্ঞা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। পূর্ব্বদিকে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর্যরা বঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'তে থাকে। অযোধ্যাপতি দশরথ তাঁর দ্বিতীয়া মহিষীর মানভঞ্জনের জন্য যেসব অঞ্চলের ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখান, বঙ্গ তাদের অন্যতম—

"দ্রাবিড়াঃ সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশীকোশলাঃ॥
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধ ন্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি! যদ্‌যদ্‌ মনসেচ্ছসি।" (১)

ক্রুদ্ধা মহিষীর মনস্তুষ্টির জন্য অযোধ্যাপতি বঙ্গ-মগধের ঐশ্বর্য্য এনে দিতে চাইলেও বঙ্গ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল না। মহাভারতের যুগে সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নামক দুইজন রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। ভারত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এই জনপদকে কতখানি স্পর্শ করেছিল তা বলা যায় না, কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য এর স্বাতন্ত্র্য পরবর্ত্তী যুগে খুব কম ক্ষুণ্ণ হ'ত। যে সব শক্তিশালী রাজবংশ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করেছে, বঙ্গ তাদের অধিকারের বাইরে না থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা কখনও বেশী প্রভাবিত হয় নি।" (২)

মহাভারতে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞের পরিকল্পনা রচনা করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতাকে ভারতের চারিপ্রান্তে পাঠাইয়া দেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের উপর পূর্ব্বাঞ্চল জয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়। বঙ্গেশ্বর সমুদ্রসেন তাঁহাকে বাধাপ্রদান করেন এবং পরাজিত হন। পরে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণার্থ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগদান করেন।

বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতখ্যাত বঙ্গরাজ্য পরবর্ত্তীকালে গঠিত সংযুক্ত বৃহত্তর বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ" নামে অভিহিত হইতে থাকে। সেই ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে ইহা উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, এই পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত কোটালিপাড়া পরগণা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটি প্রাচীন স্থান। ধারাবাহিকভাবে না হইলেও গত প্রায় ষোল-সতের শত বৎসরের ইতিহাস এই প্রাচীন অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত স্থানগুলির সহিত কোটালিপাড়ারও উল্লেখ আছে—ব্রহ্মপুর, বারাণসীপুর সহাশাল, মালিকাসরিৎ, পার্শ্বে কুকুদগ্রাম, কোটালি,

---

(১) বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ, ৩৮-৩৯ শ্লোক।

(২) শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "গৌড়কাহিনী" পৃষ্ঠা ৫-৬।

কণ্ঠনালী, বেণুবাটি, রণানদীর নিকট ডমুর, চেদীরনগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তেলিগ্রাম, ধূরগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুয়াগ্রাম, মাধবপার্শ্ব ও পিঙ্গলপত্তন। ইহা হইতেও কোটালিপাড়ার প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমিত হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেটেলমেণ্ট বিবরণ অনুযায়ী কোটালিপাড়ার আয়তন ৯৭,৭৯৪ একর বা ১৫১·৭২ স্কোয়ার মাইল। ঘর্ঘরা নদী উত্তর দিকের বাঘিয়ার বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ দিকে মধুমতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। ঘর্ঘরা নদীর নিম্নাংশের নাম শিলদহ।

বিশ্বকোষে কোটালিপাড়া সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—বাংলা বিভাগের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। ইহার মধ্যে ৭২টি গ্রাম ও ৭৪টি কিস্মত আছে। দশশালা বন্দোবস্তকালে ইহার সদর জমা ২২০০ টাকা ধার্য্য হয়। পাশ্চাত্ত্য বৈদিকগণের ১৪টি সমাজের মধ্যে একটি। ইহার মধ্যে ঘর্ঘর নামে একটি নদ প্রবাহিত। ইহার ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, পাঁচ-ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান নদীময় ছিল। মনসামঙ্গলে বিজয় গুপ্তের বাটীর বর্ণনায় আছে—

"পশ্চিমে ঘর্ঘর নদ পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর।।"

সম্প্রতি কোটালিপাড়ার পশ্চিমাংশে ঘর্ঘর নদের রেখামাত্র আছে। ঘর্ঘর নদের পার হইতে ফুলশ্রী গ্রাম প্রায় সাড়ে চার ক্রোশ পূর্ব্বে। ইহাতে অনুমিত হয়, তৎকালে কোটালিপাড়া ঘর্ঘর নদের গর্ভশায়ী ছিল। মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনে ইহার পাড়ে একটি মেলা হয়। অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া এখানে স্নান করে। প্রবাদ আছে, এক সন্ন্যাসী বর দিয়াছিলেন যে, "অপুত্রক স্ত্রীলোক মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এখানে স্নান ও গঙ্গাপূজা করিলে তাহার সন্তান হইবে।"

"মনীষী জীবনকথা"র লেখক ডঃ সুশীল রায় স্বর্গত মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-পদ্মভূষণ-মহাকবি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্মস্থান 'কোটালিপাড়া' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"এক কথায় বলিতে গেলে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নৈমিষারণ্য। সারা ভারতের মধ্যে এত ব্রাহ্মণের সমাবেশ আর কোথাও নাই। কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মলাভের অধিকারেই ব্রাহ্মণ নন, তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণ বংশে যাঁর উৎপত্তি, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কোটালিপাড়া এইরূপ ব্রাহ্মণেরই সাধনার তপোবন-বিশেষ। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ, পূর্ব্ববঙ্গে তেমনি বিক্রমপুর ও কোটালিপাড়া—এর মধ্যে 'কোটালিপাড়া' সমধিক প্রসিদ্ধ।"

পণ্ডিতপ্রবর ৺সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অদ্বৈত বেদান্তাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার "কাশ্যপবংশ-ভাস্কর" গ্রন্থে বলেন—"ইনি অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এক কোণে, বঙ্গদেশের অপরিচিত প্রান্তে বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও তৎকালীন বাখরগঞ্জ জেলার বাকুলা-চন্দ্রদ্বীপ সমাজের অন্তর্ভুক্ত, চতুর্দ্দিকে সলিলরাশি পরিবেষ্টিত দ্বীপে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ন্যায় কোটালিপাড়া পরগণার ঊনবিংশতি বা ঊনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।"

স্থানান্তরে কাশ্যপ বংশ-গৌরব পুরন্দরাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া শ্রদ্ধেয় উক্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন যে, "এই কোটালিপাড়া বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রতিষ্ঠিত একটি পরগণা বিশেষ। এইস্থানে পূর্ব্বে বর্ত্তমান বরিশাল জেলা বা বাখরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ও বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজার অধীন ছিল বলিয়া বাকুলা-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানটি চতুর্দ্দিকে সলিল-বেষ্টিত দ্বীপের ন্যায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও নানাবিধ গ্রাম্য ফল, পানীয় জল, অনায়াসলভ্য খাদ্যদ্রব্য এবং উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যের জন্য মহানুভব পুরন্দরাচার্য্যের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করে। তিনি রুচিকর ও মনোনীত এই দেশের প্রশস্ত ক্ষেত্রে 'ঊনবিংশতি' বা 'ঊনশিয়া' নামক গ্রামে বাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া পরম সুখে নির্ভয়ে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রচর্চ্চার সহিত সম্মানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য-শাখা ছিল। তিনি ধনসম্পদেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। নিষ্ঠাবান ও নানা শাস্ত্রকুশল আচার্য্য স্থানীয় এই ব্রাহ্মণেরা যে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার ফল ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে লাগিল। ধার্ম্মিক, সদাচারসম্পন্ন, নানা শাস্ত্রবিশারদ্ মনীষিগণ, তপোভ্রষ্ট

ঋষির ন্যায় এই পবিত্র বংশে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন।"

বিভিন্ন কুলপঞ্জী পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম ভারত হইতে একদল বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তৎকালীন বাকুলা-চন্দ্রদ্বীপ সমাজের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে আগমন করেন। ইঁহারা এবং ইঁহাদের বংশধরেরা পশ্চিম দিক্ হইতে অথবা 'পশ্চাৎ' অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া "পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ" নামে সুপরিচিত হন। পরবর্ত্তীকালে ইঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা সুবিস্তৃত কোটালিপাড়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এবং তৎসন্নিহিত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়েন। অতি সুদীর্ঘকাল বিদ্যা ও ব্রাহ্মণগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য, অনন্যনিষ্ঠ শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য কোটালিপাড়া পরবর্ত্তী কালে "দ্বিতীয় কাশী" রূপে খ্যাতিলাভ করে। প্রবাদ আছে যে, এস্থানে এক সময় দৈনিক এক লক্ষ শিবপূজা সম্পন্ন হইত এবং বাৎসরিক পাঁচশত দুর্গাপূজা ও দেড়শত বাসন্তীপূজা হইত। একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তৎকালে পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপ জন্মগ্রহণও করে নাই; বিক্রমপুর মাতৃগর্ভে অবস্থিত এবং ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধি ত আরও কয়েক শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের কথা; কিন্তু একাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে কোটালিপাড়া অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সমৃদ্ধি ও স্বীকৃতি—শুধু স্বীকৃতি কেন—প্রসিদ্ধিও ঐতিহাসিকভাবে অনস্বীকার্য্য।

ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাংলা দেশকে চারিটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট বিভাগে ভাগ করা যায়। পশ্চিমে বাংলার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। পূর্ব্ব বাংলা একান্তই নবভূমি এবং এই নবভূমি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা-মেঘনার সৃষ্টি। এই পূর্ব্ববঙ্গের কিছু অংশ অবশ্য পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত (যেমন—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ইত্যাদির কতক অঞ্চল)। অবশিষ্টাংশের প্রায় সমস্ত ভূমিই জলীয় সমতল ভূমি বা নবগঠিত ভূমি। এই ভূমি সর্ব্বত্র খাল-বিল ও সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন। এই নবগঠিত ভূমির আবার দুইটি বিভাগ সুস্পষ্ট। ইহার মধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের বহুলাংশের গঠন পুরাতন। এই সকল ভূখণ্ডের তুলনায় খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও সমতল চট্টগ্রাম নূতন।

যতদূর জানা গিয়াছে—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল সৃষ্ট হইয়াছে। তৎকালে এই জনপদের নাম ছিল—"নব্যাবকাশিকা"। ইহা সেই ভূমি যে ভূমি বা অবকাশ নতুন সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চল পূর্ব্ববঙ্গের পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা নবভূমির অন্তর্ভুক্ত।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার "বাঙালীর ইতিহাস" এ (আদিপর্ব্ব, পৃষ্ঠা ১০৪) লিখিয়াছেন, "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগীরথী-পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহ-পথের ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বুঝা যায়, এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী সমতটীয় ভূভাগে অর্থাৎ নদী দুইটির অসংখ্য খাড়িকাকে লইয়া কি তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে। যুগের পর যুগ এই দুইটি নদী এবং তাহাদের অগণিত শাখা-প্রশাখাবাহিত সুবিপুল পলিমাটি ভাগীরথী-পদ্মার মধ্যবর্ত্তী খাড়িময় ভূভাগকে বারংবার তছনছ করিয়া তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মণ্ডহারবারের সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, ২৪ পরগণার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য অথবা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন। আবার কখনও বা খাড়ি-খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের একাধিক তাম্রপট্টোলীতে "নব্যাবকাশিকা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে "নব্যাবকাশিকা" সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র। অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্ন জলাভূমি।"

ডঃ রায় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অমূল্য গ্রন্থে স্থানান্তরে (৪৫২ পৃঃ) লিখিয়াছেন—ফরিদপুর জেলার কোটালি-পাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাঁচটি এবং বর্দ্ধমান অঞ্চলে আবিষ্কৃত একটি—এই ছয়টি পট্টোলীতে তিনটি মহারাজাধি-

রাজের খবর পাওয়া যাইতেছে—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব। ইঁহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কি সম্পর্ক, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে তিনজনে মিলিয়া অন্যূন ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই রাজত্বের কাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, গোপচন্দ্রই ইঁহাদের প্রথম ও প্রধানতম এবং ইঁহাদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—কেন্দ্রস্থল ছিল বোধ হয় ফরিদপুর অথবা ত্রিপুরা অঞ্চলে। রাজ্যের ছিল দু'টি বিভাগ। একটি বর্ধমানভুক্তি, অপরটি "নব্যাবকাশিকা" সমৃদ্ধ জনপদ (নূতন অবকাশ) বা নব সৃষ্টিভূমি—ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল।"

ষষ্ঠ শতকেই "নব্যাবকাশিকা" সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল। অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্ন জলাভূমি। যেমন কোটালিপাড়ার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, ঠিক তেমনই কোন্ সময় হইতে "কোটালিপাড়া" নাম প্রচলিত হইয়াছে এবং "কোটালিপাড়া" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

"কোটালিপাড়া"র প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে "চন্দ্রবর্ম্মণকোট' বলিয়া একটি দুর্গের উল্লেখ আছে, সামরিক প্রয়োজনে এই দুর্গনগর গড়িয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। এই 'কোট' হইতেই বর্ত্তমান "কোটালিপাড়া" নামের উৎপত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। (কোট=দুর্গ, আলি=শ্রেণী এবং পাড় বা পাড়া= তৎসংলগ্ন জমিতে বসতি বা লোকালয়)। কেহ কেহ মনে করেন "কোটাল"—কোতোয়াল শব্দের অপভ্রংশ ; কিন্তু "কোটালিপাড়া"র প্রথমোক্ত অর্থই সুষ্ঠু এবং অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স—ফরিদপুর (১২২ পৃষ্ঠা) বলেন—"এখানে বিশেষভাবে রক্ষিত একটি দুর্গ আছে। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই দুর্গই এই স্থানের প্রধান আকর্ষণ। ইহার দেওয়ালগুলি ১৫ ফুট হইতে ৩ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং দুই হইতে আড়াই মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ। ইহার আয়তন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ইহা আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং আড়াই মাইল প্রস্থ। আবার কাহারও মতে ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়দিকেই দুই মাইল। যাহাই হউক না কেন, ইহা পূর্ব্ববঙ্গের বৃহত্তম দুর্গ। ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরের কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত দুই মাইল দৈর্ঘ্য এক বা দেড় মাইল প্রস্থ "গড় জরিপ" নামে যে দুর্গটি আছে—তাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। এইরূপ অনুমান করা হয়, "কোটালিপাড়া"র অর্থ (কোট=দুর্গ ; আলি=দুর্গের চারিদিকের দেওয়াল বা দেওয়াল-সংলগ্ন জমি ও পাড়া=লোকালয় বা বসতি) দুর্গের দেওয়াল সংলগ্ন জমিতে বসতি বা লোকালয়।"

বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স—ফরিদপুর (১৬ পৃষ্ঠা) বলেন—"কোটালিপাড়া দুর্গের দক্ষিণে তিন-চতুর্থাংশ মাইল দূরে অবস্থিত গুয়াখোলা গ্রামের সোনাকান্দুরি নামক মাঠে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তের সময়ের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা উভয়েই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া "বিক্রমাদিত্য" উপাধি ধারণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে স্কন্দগুপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। কোটালিপাড়া দুর্গ মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দুর্গ। ইহার উচ্চতা এখনও ১৫ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত এবং চারি বর্গমাইল ব্যাপিয়া ইহার অবস্থান। এই দুর্গ নির্ম্মিত হইলে ভারতবর্ষের একটি বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে ইহা অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।" কোটালিপাড়া বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইংরেজ আমলে কোটালিপাড়া কখনও বা পশ্চিমে খুলনা জেলার সহিত, কখনও বা দক্ষিণে বাখরগঞ্জ জেলার সহিত, কখনও বা উত্তরে ফরিদপুর জেলায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে 'কোটালিপাড়া' গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত।

ক্রমশঃ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

বিদেশী অর্থ সাহায্যের বোঝা

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার ফলে আনুষঙ্গিক যে সকল সমস্যাগুলি দেখা দেবে তার মধ্যে একটি জরুরী সমস্যা বিদেশী অর্থ সাহায্যের বোঝা, এ বিষয়ে গত মাসে আলোচনা করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে আমাদের বিদেশী ঋণের বোঝা মোটামুটি ৫৭·৫% বৃদ্ধি পাবে, আনুষঙ্গিক সুদের দায়ও আনুপাতিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে আমাদের বিদেশী ঋণের পরিমাণ যদি মোট ন্যূনাধিক প্রায় ৪০০০ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং এর বার্ষিক সুদের দায়—এটা গত বছর থেকেই দেয় হ'তে সুরু করেছে—সার্ভিসিং চার্জ সহ মোটামুটি প্রায় বার্ষিক ১৪০ কোটি টাকা এবং আসলের বার্ষিক কিস্তি প্রায় ৪০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে এই মোট ঋণের পরিমাণ টাকার মূল্যে এখন মোটামুটি প্রায় ৬৩০০ কোটি টাকায় ধার্য্য হবে। ফলে আনুষঙ্গিক বার্ষিক সুদের দায় বেড়ে দাঁড়াবে বৎসরে প্রায় ২২৯ কোটি টাকায় এবং আসলের কিস্তির পরিমাণ হবে এখন বার্ষিক প্রায় ৬৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ টাকার বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের এ পর্য্যন্ত বিদেশী ঋণের বোঝা মেটাতে বার্ষিক মোট প্রায় ৮৫৯ কোটি টাকা লাগবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়ায় বিদেশী সাহায্যের ন্যূনতম প্রয়োজন সমগ্র পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট ৪৮০০ কোটি টাকায় ধার্য্য করা হয়েছিল। চতুর্থ উন্নয়ন পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত আকার-প্রকার কি দাঁড়াবে তার একটা সঠিক নির্দ্দেশ এখনও পাওয়া যায় নি, কিন্তু যোজনা ভবনের আলাপ-আলোচনার যেটুকু ছিটে-ফোঁটা বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে তাতে মনে হয় এই কিস্তির পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়ার কিছুটা অদল-বদল হওয়া অনিবার্য্য হ'লেও তার মোটামুটি আর্থিক লগ্নীর পরিমাণে বিশেষ কোন তারতম্য ঘটবে না। বস্তুতঃ বিদেশী ঋণের আর্জি নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী অশোক মেহতা, অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরী, খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম যেভাবে ভিক্ষা পাত্র হাতে করে দেশে-বিদেশে ছুটোছুটি করতে সুরু করেছেন, তাতে এই ধারণাই আরও দৃঢ়মূল করে। অতএব ডিভ্যালুয়েশনের পূর্ব্বেকার হিসাব অনুযায়ী চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ যদি পূর্ব্বমূল্যে ৪৮০০ কোটি টাকায়ই বহাল থাকে, তবে বর্ত্তমান মূল্যে এর পরিমাণ এখন দাঁড়াবে ৭,৫৬০ কোটি টাকায়। এই ঋণের সুদের বার্ষিক পরিমাণ বর্ত্তমান হারে তা হলে দাঁড়াবে বার্ষিক ২৬৩ কোটি টাকা এবং আসল শোধের বার্ষিক কিস্তি ৭৫৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনাকালের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের বিদেশী ঋণশোধ বাবদ সুদ ও আসলের মোট বার্ষিক কিস্তির পরিমাণ—এ পর্য্যন্ত সমগ্র ঋণের যোগফল সমেত—দাঁড়াবে ১৮৮৮ কোটি টাকায়।

এই বার্ষিক হারে ঋণ শোধ করবার মত কতটা সঙ্গতি আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে বৃদ্ধি পাবে সেটা এখন বিচার করা প্রয়োজন। যোজনা ভবন থেকে প্রচারিত সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে, পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করে দেখেছেন যে প্রাথমিক খসড়া অনুযায়ী পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপায়ণ করা সম্ভব হলে, চতুর্থ পরিকল্পনার উন্নয়ন

গতি বার্ষিক ৬% হারে জাতীয় আয় বাড়াতে পারবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অতীতে এই প্রকার হিসাব বারংবার সম্পূর্ণ কাল্পনিক বা অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৫০-৫১ সালের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইটি পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির মোট বার্ষিক পরিমাণ ৫২% এ দাঁড়াবে বলে হিসাব করা হয়েছিল; বাস্তবপক্ষে এই দশ বৎসরের শেষে এবং ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে (সরকারী হিসাবে ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় সাধারণ পাইকারী মূল্যমান ৩৪% এর কিছু বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে স্বীকার করা হয়েছে) প্ল্যানিং কমিশন জাতীয় আয় মোট ৪২% বৃদ্ধি পেয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যে মোট ৩৬% বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছিল। বাস্তব পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত মোট পরিকল্পনাকালের মধ্যে এবং ১৯৬০-৬১ নয় ১৯৬৩-৬৪ সালের মূল্যমানে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ পরিকল্পিত ৩৬%-এর অর্দ্ধেকেরও কম দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের বার্ষিক পরিমাণ ১৯৬০-৬১ মূল্যমানে ১৫,০০০ কোটি টাকায় হিসাব করা হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষ হিসাব এখনও পাওয়া যাবার সময় হয় নি, কিন্তু অনুমান করা হয়েছে যে, ১৯৬৩-৬৪ মূল্যমানে এই অঙ্কটি মোটামুটি ১৭,৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরের তুলনায় মোটামুটি ১৭% বেশী। কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ১৯৬৩-৬৪ সালে সাধারণ পাইকারী মূল্যমান, সরকারী হিসাবে, ৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মূলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নির্দ্ধারিত পুঁজির ৯৮% (এটি পরিকল্পনা কমিশনের পণ্ডিতমণ্য সহ-সভাপতি অশোক মেহতা স্বয়ং স্বীকার করেছেন) লগ্নী হওয়া সত্ত্বেও সত্যকার বাস্তব হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উন্নতির বদলে কিঞ্চিৎ পশ্চাদাপসরণ ঘটেছে। এই সকল অতীত অভিজ্ঞতার ফলে পরিকল্পনা কমিশনের যে কোন হিসাব বা দাবি বাস্তব এবং সত্য বলে স্বীকার করে নিতে স্বদেশে এবং বিদেশে অনেকেই দ্বিধা করবেন।

তবু চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া অনুযায়ী রূপায়ণের ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার ৬% হবে এই হিসাব বাস্তব বলে স্বীকার করে নিলেও এর দ্বারা অতিরিক্ত আয়ের বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫০ কোটি টাকা। আমরা দেখিয়েছি যে বিদেশী ঋণ বাবদ আমাদের বার্ষিক দায় মোটামুটি ১৮৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়াচ্ছে। বস্তুতঃ এই হিসাব সম্পূর্ণ নয়; তবে বৃহত্তম অংশের সমষ্টি মাত্র। এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিদেশী ঋণের বার্ষিক বোঝা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করে বছরে মোটামুটি ৮৩৮ কোটি টাকা বেশী হবে।

তা ছাড়া এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিশেষ জরুরী কথা ভাববার আছে। আমাদের এই প্রচণ্ড ঋণের শোধ্য কিস্তি ও তৎসংলগ্ন সুদ বিদেশী মুদ্রায় শোধ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের দেনার কিস্তির পরিমাণ মত, সাধারণ আমদানীর মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করা এই দেনা শোধ করবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের বিদেশী ঋণের সুদ ও আসলের কিস্তি আমরা কেবল সম্প্রতি পরিশোধ করতে সুরু করেছি। গত কিস্তি আমরা আই ডি এ (IDA) থেকে অতিরিক্ত বিদেশী মুদ্রা ঋণ করে শোধ করেছি। অর্থাৎ আমরা ঋণ করে ঋণ শোধ দিয়েছি, কিংবা, অন্য ভাষায়, পুঁজি ভেঙ্গে খেতে সুরু করেছি।

টাকার বিনিময় মূল্য কমিয়ে দেবার অন্যতম কারণ, এর দ্বারা আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের আয়তন তথা আয় বৃদ্ধি ঘটবে, একথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। আসল কারণ অবশ্য যে এটি না করলে উন্নয়নের প্রয়োজনে বিদেশী ঋণ আর পাওয়া যেত না। অন্য পক্ষে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার মাত্র নয় দিনের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার জানিয়ে দেন যে, ভারত-সাহায্যকারী জোটের রাষ্ট্রগুলি মিলে বর্তমান বৎসরে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের জন্য ৯ কোটি ডলার প্রয়োগ-নিরপেক্ষ (nonproject) ঋণ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল করে যে টাকার আন্তর্জাতিক

বিনিময় মূল্য এই ভাবে প্রচণ্ড পরিমাণে কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্তের পেছনে যে আসল তাগিদটি কাজ করছিল সেটি পাকিস্তানী হামলার সময় থেকে অবরুদ্ধ বিদেশী অর্থ সাহায্যের দ্বারটি আশু পুনর্মুক্ত করা।

বস্তুতঃ টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, এ আশা কতদূর ফলবতী হবে সে সম্বন্ধে এখনও গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। অর্থ শাস্ত্রের কেতাবী সূত্র অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার মূল্য কমে যাবার ফলে আমদানী মালের মূল্য আনুপাতিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে; ফলে আমদানী মালের পরিপূরক পণ্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করবার তাগিদ বেড়ে যাবে এবং সেই কারণে আমদানীর মোট পরিমাণ কমে যাবে। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদক কাঁচামাল ও যন্ত্রাদি আমদানীর বাধা খানিকটা অপসারিত করে দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করা হবে এবং বিদেশী মুদ্রার তুলনায় টাকার মূল্য কম করে দেবার ফলে এই অতিরিক্ত উৎপাদন দেশের মধ্যে ভোগের জন্য বিক্রী করবার বদলে, অতিরিক্ত মুনাফায় বিদেশে কাটাবার তাগিদ বেড়ে যাবে। যে সকল পণ্য সাধারণতঃ আমরা বেশীর ভাগ রপ্তানী করে থাকি, সেগুলির ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত টাকার আমদানী বৃদ্ধি হবার লোভেও রপ্তানী বৃদ্ধির তাগিদ বেড়ে যাবে। ফলে আমাদের মোট রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চলতি হিসাবের বর্তমান ঘাটতি মিটিয়েও বিদেশী ঋণ ও তার সুদের কিস্তি শোধ করবার মত কিছু অতিরিক্ত বিদেশী আমদানী হবে বলে আমাদের রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা আশা করেন।

কল্পনা-বিলাসে সুখ থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা নেই। আমাদের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের মোটামুটি ৮০ শতাংশ এমন সব পণ্যের রপ্তানীর দ্বারা অধিকৃত যেগুলির চাহিদা স্থির (inelastic); অর্থাৎ মূল্যের ক্ষতি বৃদ্ধিতে সাধারণতঃ যেগুলির পারিমাণিক চাহিদার সাধারণতঃ উঠ্‌তি-পড়তি ঘটে না। অর্থাৎ টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে এ সকল মালের রপ্তানীর পরিমাণে যদি কোন বিশেষ বৃদ্ধি না ঘটে, তবে এই বাণিজ্য থেকে আমাদের আয় ৩৬·৬% কমে যাবে। গত বৎসরে আমাদের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্যের পরিমাণ ছিল ৮৪০ কোটি টাকা; এর মধ্যে ৬৭৫ কোটি টাকার মালের চাহিদায় মূল্যের ক্ষতি বৃদ্ধিতে সাধারণতঃ কোন আনুপাতিক ঘাটতি বাড়তি হবে এমন আশা করা যায় না; রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ব্বের অঙ্কে স্থির থাকলে বর্তমান মূল্যে আমাদের আয় ৩৬·৬% অর্থাৎ আনুমানিক ২৪০/২৫০ কোটি টাকা কমে যাবে। অন্যপক্ষে টাকায় এ সকল পণ্যের রপ্তানীর ধারা, বর্তমান মূল্যমানে আমাদের পূর্ব্ব আয়ের হারে বজায় রাখতে হ'লে আমাদের ৫৭·৫% অধিক মাল রপ্তানী করতে হবে। এটুকু করাও আদৌ সম্ভব হবে কি না, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার উপায় নেই; পরিমাণে এ সকল পণ্য এত অধিক রপ্তানী অতিক্রম করেও আরো তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করবার আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত বলে মনে হবে। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৮০% বা পাঁচ ভাগের চার ভাগ এমন সব পণ্যের রপ্তানীর দ্বারা পূরণ করা হয়ে থাকে যে, বিদেশের বাজারে এ সকল মালের চাহিদার প্রকৃতি স্থিরতাবাচক (inelastic), অর্থাৎ এ সকল পণ্যের মূল্যমানে ঘাটতি বাড়তির ফলে বিদেশের বাজারে এগুলির চাহিদায় সাধারণতঃ বিশেষ কোন উঠতি-পড়তি ঘটে না। গত বৎসর আমাদের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ টাকার মূল্যে ৮৪০ কোটি টাকা হয়েছিল বলে জানা গেছে; এই ধরনের পণ্য রপ্তানী থেকে অতএব আমাদের আয় হয়েছিল মোটামুটি ৬৭২ কোটি টাকা। গত বৎসরের পরিমাণেই যদি এখন এই সকল পণ্যের রপ্তানী চলতে থাকে, তা হ'লে আমাদের এই পরিমাণ বাণিজ্য থেকে এখন আমাদের আয় হবে মাত্র ৩৮২ কোটি টাকার মতন; আর এ সকল পণ্যের রপ্তানী থেকে যদি আমাদের পূর্ব্ব আয় বহাল রাখতে হয়, তবে এ সকল পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ দ্বিগুণেরও কিঞ্চিৎ বেশী বাড়াতে হবে। তার সম্ভাবনা কতটুকু আছে সেটার কোন সঠিক হদিস পেতে গেলে গত দশ বৎসরে দুনিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির ধারাবাহিকতা কখন, কি পরিমাণে এবং কি কি কারণে অদল-বদল ঘটেছে তার বাস্তব বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

এই সকল পণ্য ব্যতীত আর যে সকল পণ্য আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যটিকে পোষণ করে থাকে, গত বৎসরে তাদের মোট সমষ্টির রপ্তানীর পরিমাণ হয়েছিল, মোটামুটি ১৬৮ কোটি টাকা মাত্র। এই সকল পণ্যের রপ্তানী প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও বৎসরান্তে পরিমাণে কতটা বাড়ান যেতে পারে সেটা বিচারসাপেক্ষ। প্রথমতঃ বিদেশী মুদ্রায় এ সকল পণ্যের মূল্য কমে যাবার ফলে চাহিদা কতটা বাড়তে পারে সেটা বিচার করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বর্ত্তমান উৎপাদন আয়োজন ও উৎপাদন শক্তির (capacity and efficiency) অনুপাতে সেই অতিরিক্ত চাহিদা কতটা পরিমাণে আমরা মেটাতে সমর্থ হব সেটাও বিনা বিচারে সঠিক করে নিদ্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবু যদি অনুমান করে নেওয়া যায় যে এসকল পণ্যের রপ্তানী থেকে আমাদের আয় বর্ত্তমানের তুলনায় দ্বিগুণেরও কিছু বেশী বৃদ্ধি পাবে, তা হ'লেও টাকার মূল্য হ্রাসের দরুণ আমাদের উপর যে অতিরিক্ত প্রভূত আর্থিক বোঝা চেপে বসলো সেটাকে সম্পূর্ণ পরিমাণে সামাল দেবার সঙ্গতি এর থেকে সৃষ্টি হবার কোনই আশা নেই।

অন্যপক্ষে আমদানী বাণিজ্যের দিকটা বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রেও ত্রাস সঞ্চার করবার আশঙ্কার কারণ রয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি প্রচার করবার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও পরিবহন মন্ত্রী যথাক্রমে সাধারণ্যে যে সকল বিবৃতি প্রচার করেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল যে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদক কাঁচা মাল ও যন্ত্রাদির আমদানীর বিরুদ্ধে যে সকল বাধার প্রয়োগ এতাবৎ চালু ছিল সেগুলি যথাসম্ভব অপসারণ করে উৎপাদন গতিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার চেষ্টা করা হবে, যাতে উৎপাদন তথা রপ্তানী বৃদ্ধি অবিলম্বে ঘটাতে পারা সম্ভব হয়। অন্যপক্ষে বিদেশী ভ্রমণকারীরা টাকার মূল্য কমে যাবার ফলে অধিকতর সংখ্যায় আমাদের দেশে ভ্রমণ করতে আসবেন ও তার ফলে আমাদের বিদেশী মুদ্রায় আয় বৃদ্ধি পাবে। দেশে উৎপন্ন পণ্যাদির স্বদেশে ভোগব্যয়ের তুলনায় রপ্তানী থেকে উৎপাদনকারীর বেশী মুনাকা হবে, ফলে দেশে আপনিই ভোগসঙ্কোচ ঘটবে এবং সেই অনুপাতে রপ্তানী বৃদ্ধির সার্থক প্রয়াস বেড়ে যাবে। অন্যদিকে আমদানী পণ্যের দাম এত বেড়ে যাবে যে, এ ক্ষেত্রেও অনিবার্য্য ভাবে ভোগসঙ্কোচ ঘটতে বাধ্য। এ সকল যুক্তি কল্পনায় আপাতঃ যুক্তিযুক্ত মনে হ'লেও বাস্তব বিচারে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে প্রমাণিত হবে। আমাদের আমদানী বাণিজ্যের বৃহত্তম অংশ—এখন বহু বৎসর ধরে—অধিকার করে আসছে, প্রধানতঃ উন্নয়নবাচক পুঁজি মাল (Capital Goods) এবং তার পরই উৎপাদক কাঁচামাল এবং কলকব্জা চালু রাখবার উপযুক্ত যন্ত্রাদি (raw materials and maintenance imports)। গত কয়েক বৎসর ধরে, বিশেষ করে ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে এই দ্বিতীয় দফার পণ্যগুলির আমদানীর বিরুদ্ধেও কড়া বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে আসা হচ্ছিল। এই ক্ষেত্রে ডিভ্যালুয়েশনের ফলে সুবিধার বদলে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কাই বেশী।

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ গুরুতর বিষয়ের কোন উল্লেখ কেহ করেছেন বলে দেখতে পাই নাই। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনানুযায়ী কি সরকারী বা কি বেসরকারী মালিকানায় শিল্পোন্নতির যে ধারা আমরা অনুসরণ করে আসছি, তাতে তথাকথিত বিদেশী কুশলীদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বস্তুতঃ উন্নয়ন পরিকল্পনার আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভূমিকার ক্ষেত্রটি উত্তরোত্তর প্রসারিত হচ্ছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এটি যে কেবল মাত্র নূতন শিল্পগুলির ক্ষেত্রেই ঘটছে শুধু তা নয়, এদেশে অনেকদিন থেকে চালু বেশ কয়েকটি বৃহৎ শিল্পে—প্রধানতঃ বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে—তথাকথিত বিদেশী কুশলী নিয়োগের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এদের অনেকেরই বিদেশী মুদ্রায় পারিশ্রমিক নিদ্ধারিত করা হয়ে থাকে সেই সকল ক্ষেত্রবিশেষেও যে আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি বর্ত্তমান আর্থিক প্রয়োগটির ফলে ঘটবে সেটা বলাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির ধারাটিকে সংহত করে একটা স্থির মূল্যাবস্থার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই প্রয়োজন সাধনকল্পে

কতকগুলি প্রয়োগের উল্লেখ গত মাসের আলোচনা প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। তখনই আমরা বলেছিলাম যে কতকগুলি জরুরী ও মূল আর্থিক প্রয়োগ বাদ দিয়ে কেবল মাত্র প্রশাসনিক প্রয়োগের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। তা যদি সম্ভব হ'ত গত দশ বৎসরে দেশের সাধারণ পাইকারী মূল্যমান ৮০% অর্থাৎ চার-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পাবার কোন কারণ ছিল না এবং ডিভ্যালুয়েশনেরও তা হলে দরকার হ'ত না। ডিভ্যালুয়েশনের পর গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব রকমের ভোগ্য ও উৎপাদক পণ্যের মূল্য যে অনিবার্য্য ভাবে প্রভূত পরিমাণে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, সেকথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই ধারাটিকে যদি সংহত ও সংযত করতে না পারা যায়, তা হ'লে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা যে আরো কতটা শঙ্কাজনক হয়ে উঠবে সেটা কল্পনা করতেই ত্রাসের সঞ্চার হয়।

বস্তুতঃ যে কারণে ডিভ্যালুয়েশন করতে এঁরা বাধ্য হয়েছেন সেটা যে প্রধানতঃ বিদেশী অর্থ সাহায্যের দ্বার পুনর্মুক্ত করবার একটা সর্ত্ত মাত্র, সেটা স্পষ্ট এবং অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। বিদেশী সাহায্য না হ'লে আমাদের তথাকথিত উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু রাখা সম্ভব নয়। পনের বৎসর ধরে অনুসৃত উন্নয়ন ধারার ফলে দেশের আর্থিক বনিয়াদ আমাদের রাষ্ট্রনেতারা এমনই দুর্ব্বল করে তুলেছেন, যার ফলে আজ দেশ প্রায় দেউলে হয়ে পড়েছে। তবু এই উন্নয়ন-পরিকল্পনা পূর্ব্ব পথেই চালু রাখতে হবে এবং তার জন্ম চাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান পরিমাণে বিদেশী অর্থের ঋণ এবং দান। এই বিদেশী অর্থের কি ধরনের অপব্যবহার আমরা করে আসছি তার একটি প্রমাণ ডিভ্যালুয়েশন।

অন্যদিকে যে সকল রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে আমরা এই বিদেশী অর্থ সাহায্য প্রভূততম পরিমাণে পেয়ে আসছিলাম, তাঁরা আমাদের উন্নয়ন সম্বন্ধে কি ভাবতে সুরু করেছেন সম্প্রতি আমেরিকার সিনেটের বৈদেশিকী সম্পর্ক কমিটির (Senate Foreign Relations Committee) আলোচনা ও প্রস্তাবেও স্পষ্ট হবে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসন সিনেটের মঞ্জুরীর জন্য যে বিদেশী উন্নয়ন-সাহায্য বাবদ অর্থের মোট দাবি পেশ করেছিলেন, সিনেটের সংশ্লিষ্ট (বৈদেশিক-সম্পর্ক) কমিটি সেই মোট অঙ্ক থেকে উন্নয়ন ঋণ বাবদ প্রস্তাব থেকে ৪৫.৪ মিলিয়ন ডলার (৩৯ কোটি টাকা) এবং আনুসঙ্গিক সাহায্য (supporting assistance) বাবদ ৪৭.২ মিলিয়ন ডলার (৪০.৩ কোটি টাকা) ছাঁটাই করে দিয়েছেন।

এই ছাঁটাই করবার সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ এই যে, অনুন্নত দেশগুলিকে আর্থিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য দানের মোট বোঝার বৃহত্তম অংশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এতদিন পর্য্যন্ত বহন করে আসছেন। কিন্তু এসকল দেশগুলির (এবং ভারতবর্ষ এদের মধ্যে বৃহত্তম অংশের সাহায্য পেয়ে এসেছেন) উন্নয়ন গতি ও প্রকৃতির ধারা থেকে আশঙ্কা করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই অর্থ সাহায্যের সার্থক ব্যবহারে গলতি থেকে যাচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্কের একটি বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে, নূতন নূতন যে সব অর্থের ঋণ এই দেশগুলিকে দেওয়া হচ্ছে, প্রতি এগার বৎসর অন্তর যখন সেই ঋণের আসলের কিস্তিবন্দী শোধ দেওয়া বর্ত্তমানের নির্দ্ধারিত মাত্র ২½% সুদ সমেত পরিশোধ করা সুরু হবে, তখন দেখা যাবে যে, এই সাহায্যকৃত দেশগুলির সমগ্র বিদেশী মুদ্রার (foreign exchange earnings) আয় এবং নূতন নূতন পুঁজি ঋণের (capital loans) সমস্তটাই তাদের বিদেশী ঋণের কিস্তি মেটাতে ব্যয় হয়ে যাবে। অনুন্নত দেশগুলিতে বিদেশী ঋণের বর্ত্তমান ধারা যদি বজায় রাখা হয় তা হ'লে সে সব দেশগুলির বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থাটুকু রক্ষা করতেই তাদের নূতন নূতন বিদেশী ঋণ এবং তার সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য থেকে তাদের আয়—এই সবটাই সম্পূর্ণ ব্যয় হয়ে যাবে।

(A recent World Bank study indicates that by the time new A. I. D. loans to developing countries begin to bear interest... at the present rate of 2½ per cent, the recipient countries will have to use all their foreign earnings plus aid capital to service their external debts...if debt service requirements continue to climb at present trends, and if total aid from advanced countries remains at present levels, the developing countries will have to use all the aid from the donors, plus all their own export earnings, just to stay where they are.—New York Times, June 19, 1966).

তুর্কদের হাত থেকে জেরুজালেমকে রক্ষা করবার জন্য প্যালেষ্টাইন বা লেভান্তে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রীষ্টান রাষ্ট্র থেকে দলে দলে বীর নাইট ও যোদ্ধারা সমবেত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল ওদেশে ছিলেন। এই সব ক্রুজেডার বা ধর্মযোদ্ধারা সবাই এক ভাষাভাষী না হলেও ওদের মধ্যে এমন একটা মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়েছিল, যার মাধ্যমে স্প্যানীশ, ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান, ইটালীয়ান, অষ্ট্রিয়ান, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষী যোদ্ধাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। লেভান্তের এই পাঁচ-মেশালী কথ্য ভাষাকে বলা হ'ত—লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা (Lingua Franca) অর্থাৎ ফ্রাঙ্ক বা পশ্চিমাদের ভাষা (ফিরিঙ্গি কথাটার উৎপত্তিও এই ফ্রাঙ্ক শব্দ থেকে।)

কোন রাষ্ট্রের সার্ব্বজনীন বা সাধারণ ভাষাকে বলা হয় 'লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা' (কথাটা আসলে ইটালীয়ান হলেও ইংরাজী শব্দকোষে স্থান পেয়েছে)।...আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) একটা বিশাল দেশ, কিন্তু অর্দ্ধেকের ওপর লোকেরাই বিদেশী, যাদের কারোরই মাতৃভাষা ইংরেজী নয়। নানা জাতের লোক এদেশে আস্তানা গেড়েছে, প্রথম ইংরেজ ঔপনিবেশিক পিলগ্রিম ফাদার্স'দের পর ডাচ, সুইস, জার্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, চেক, পোল, রুশ, স্প্যানীশ, ইটালীয়ান, নিগ্রো, ইহুদী, ক্রিয়োল, চীনা প্রভৃতি। নিজেদের মধ্যে যদিও তারা দিশি ভাষায় কথাবার্ত্তা চালায়, বাইরে মেলামেশার জন্য ব্যবহার করে ইংলিশ (যেমন মাদ্রাজ অঞ্চলে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালায়ালাম ভাষী লোকেরা একে অন্যের সঙ্গে ইংরেজী বলে)। তবে এ ইংরেজী ঠিক খাস ব্রিটেনের ইংরেজী নয়, ইয়াঙ্কি বা আমেরিকান ইংরেজী (যা অনেক সময় ইংরেজদের কাছেও দুর্ব্বোধ্য ঠেকে। যেমন, বিস্কুটকে ওরা বলে 'ক্র্যাকার' বা 'কুকি' রেল ষ্টেশনকে বলে 'ডিপো'; Take a taxi না বলে, ওরা বলবে Hop a cab ইত্যাদি)। এটাই মার্কিণ মুলুকের লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা।

কন্টিনেণ্টে কেবল ইংরাজী জানলে কাজ চালানো সম্ভব নয়, নিদেন পক্ষে ফরাসী ভাষাটা জানা চাই। ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসী, জার্মান বা ডাচদের ব্যাপক সংস্পর্শ বা Mass Contact নেই। দুটো বিভিন্ন রাষ্ট্র যতই কাছাকাছি হোক না কেন, উভয় দেশের লোকজনের মধ্যে যদি অহরহ দেখা সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তার সুযোগ-সুবিধা না থাকে, তবে এক রাষ্ট্রের লোকের কথা অপর রাষ্ট্রের লোকদের পক্ষে আদৌ বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না।

পর্ত্তুগীজেরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল ব্যবসা করতে, তখন তাঁরা আমাদের ভাষা শিক্ষা করে আসে নি, অথচ এদেশে থাকতে থাকতে এদেশের ভাষা শিখে নিয়ে দিব্যি কাজ কারবার চালিয়েছে। ওদেরও অনেক কথা শিখে নিয়ে, আমরা আপনার করে ফেলেছি। বাসন, বালতি, বৈয়াম, পিরিচ, চাবি, ফিতা, আতা (ফল), পিপা, মিস্ত্রি, ইস্ত্রি, পেরেক, সিপাই, ভাপ, জানলা, সাবান—এদের কোনটাই 'বাংলা কথা নয়', বাংলা ভাষার ইতিহাসে অনভিজ্ঞ সাধারণ লোক হয়ত সহজে একথা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

ইংরেজ ও ফরাসীরা, সাঁতরে পার হওয়া যায় এমন একটা প্রণালীর এপার ওপার বাস করে। অথচ প্যারির রাস্তার একজন ইংরেজের দুর্ভোগের অন্ত নেই, আকার-ইঙ্গিতে কথা বোঝানোর চেষ্টায়। একজন আসামীর (অহমিয়া) পক্ষে বার্মিজ ভাষা বুঝে ওঠা দুষ্কর। অবশ্য, সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের অনেক সময় দু'দেশের ভাষারই জ্ঞান থাকে। আরাকানী মগেরা চাঁটগেয়ে বাংলা কথা বুঝতেও পারে, বলতেও পারে কেউ কেউ, নেপালের প্রত্যন্ত প্রদেশের লোকদের পক্ষে হিমালয়ের অপর পারের ভোট বা তিব্বতীদের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করা খুব বেশী কঠিন নয়। এর কারণ এদের মধ্যে পরস্পরের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে আসার সুযোগ প্রচুর। এও দেখা যায় দুই ভিন্ন ভাষাভাষী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রদেশের ভাষাটা অনেক সময় দুই ভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট।

*

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা সাধারণ

আন্তর্জ্জাতিক ভাষার প্রচলনে সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হন একজন জার্ম্মান ধর্ম্মযাজক, শ্লেইয়ার (J. M. Schleyer), ১৮৭৯ সালে; কিন্তু তাঁর এই নবপ্রবর্ত্তিত সর্ব্বজাতীয় ভাষা Volapuk (ভল্ আপুক) ভাষাবিদদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করতে পারল না। এর আট বছর বাদে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক পোল চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ জামেনহফ (Dr. Zamenhoff) ভল্ আপুকের অনুসরণে একটি মিশ্র সার্ব্বজনীন ইউরোপীয় ভাষা রচনা করলেন, নাম দিলেন Esperanto ('এসপ্যারেন্তো' কথাটা স্প্যানীশ, অর্থ আশা)। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার কিঞ্চিদধিক সমোচ্চারণ-বিশিষ্ট ও সমার্থবাচক শব্দগুলি নিয়ে এই নতুন ভাষার সৃষ্টি। এর ব্যাকরণ খুবই সহজ, যথাসম্ভব জটিলতা ও বাহুল্যবর্জ্জিত। যদিও আজকাল এসপ্যারেন্তোর চল উঠেই গেছে, তবু প্রথম প্রথম এটা অনেকের কাছ থেকেই অনুমোদন লাভ করেছিল। এসপ্যারেন্তোর উদ্দেশ্য উক্ত ভাষায় রচিত জামেনহফের স্বরচিত কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে:

'Sur neutrala[1] lingua[2] fundamento[3]
Komprenante[4] unu la alien[5]
La popoloj[6] faros en konsento[7]
Uno[8] granden[9] rondon[10] familien[11]...'

[1 neutral 2 language 3 foundation 4 comprehending 5 one another 6 the people 7 in agreement 8 one 9 grand, big 10 circle 11 family].

[একই গণ্ডীভুক্ত একটা বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর পরস্পরের বোধগম্য সর্ব্বস্বীকৃত স্বাভাবিক ভাষার বুনিয়াদ]।

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ ও দীর্ঘস্থায়ী মেলামেশা নানাকারণে সম্ভব নয়। প্রথমত: ভিসা কাষ্টমসের বিধি-নিষেধ, দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক মত-বিরোধ। এসপ্যারেন্তো জন্ম নেবার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইউরোপে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ ও রাষ্ট্র বিপ্লব, আবহাওয়া ও পরিবেশকে এমন প্রতিকূল করে তুলেছিল যে নতুন ভাষার অঙ্কুরিত চারাটি বড় হয়ে, একটা বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে উঠতে পারে নি।

সম্প্রতি একজন ইটালীয় অধ্যাপক আরতুরো আলফান্দারী (Arturo Alfandari) ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা থেকে সংগৃহীত ষাট হাজার শব্দ নিয়ে, একটি সার্ব্বজনীন ভাষা গড়ে তুলেছেন, প্রায় পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে। আলফান্দারী একজন বহুভাষাবিদ— ইংরেজীতে যাকে বলে polyglot। তাঁর বয়স এখন ৭৫ বছর। বহুদিন হ'ল, দেশ ছেড়ে বেলজিয়ামের ব্রুসেলস নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এই নবাবিষ্কৃত ভাষার নাম 'নিও' (NEO)। নিও সম্বন্ধে প্রফেসর আলফান্দারী বলেন:

'It is not intended that Neo should substitute the existing languages: it could be considered as a second language after the mother-tongue of all nations.'

ব্রুসেলসের বহু স্কুলে ছেলেমেয়েদের এই নতুন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

*

কার্য্যোপলক্ষ্যে রাজধানী দিল্লী ও ভারতের অন্যান্য বড় বড় সহর বন্দরে, বিভিন্ন রাজ্যের লোকদের হামেশাই আনাগোনা চলছে। রাস্তাঘাটে, হোটেল ক্যাফিটেরিয়ায়, ব্যবসাক্ষেত্রে এইসব ভিন্ন দেশের লোকদের মধ্যে মেলামেশা, কথাবার্ত্তা ও খানাপিনা চলছে। প্রায় সব ক্ষেত্রে আজও ইংরাজী ভাষা লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে চলে আসছে। কলকাতায় কোন মাড়োয়ারীর সঙ্গে কোন বাঙ্গালীর কিছুটা বাংলা কিছুটা হিন্দী এবং খানিকটা ইংরাজীতে (স্থান, কাল আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী) কথাবার্ত্তা চলে থাকে (অবশ্য কলকাতা প্রবাসী মাড়োয়ারীদের অনেকেই বাংলা জানেন)। সেইরকম হায়দ্রাবাদে কোন শিখ ব্যবসায়ী কোন অন্ধ্র উকিলের কাছে তাঁর মামলার ব্যাপারটা খানিকটা তেলেগু, খানিকটা উর্দ্দু এবং খানিকটা ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিতে পারেন। যদি সর্ব্বজনগ্রাহ্য একটা সাধারণ ভাষার প্রচলন থাকত, তবে সেটা শিখতে ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করতে অনেকেই প্রয়াসী হতেন এবং ভাষাটিও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠত,—আমেরিকায় ইংরাজী ভাষা যেমন একটা নতুন সতেজ রূপ নিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র হ'তে আগন্তুক লোকদের কথার মিশ্রণে, তেমনি।

ভারতবর্ষের সাধারণ বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কে

বিশেষ অঞ্চলের ভাষাকে চালু করতে গেলে, অন্যান্ত অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের কাছ থেকে বিরুদ্ধাচরণের জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে। হিন্দী চালু করার ব্যাপারে, মাদ্রাজ অঞ্চলের বিক্ষোভ নেতাদের বিমূঢ় করে তুলেছে। সত্যিই বাঙ্গালী, অসমীয়া, ওড়িয়া, অন্ধ্র, তামিল ও কানাড়ীদের পক্ষে হিন্দী-বিরোধী মনোভাব কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন।

যে-সব প্রতিবন্ধকতায় ইউরোপে এসপ্যারেন্তোর প্রসার ও উন্নতি সম্ভব হয় নি, ভারতে সেইরূপ বাধা-বিপত্তির আশঙ্কা নেই, কারণ এখানে ভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যগুলি একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকায় যে কারণে ইয়াঙ্কি ইংলিশ, বিভিন্ন ভাষাভাষীর সহযোগিতায় ক্রমেই প্রশস্ত ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠছে, এখানেও সেইরূপ এক সর্ব্বজনগ্রাহ্য সাধারণ ভাষার ক্রমবিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই ভাষার রূপটা কেমন হবে? প্রশ্নটা জটিল সন্দেহ নাই, কিন্তু রূপ যাই হোক এবং সেই রূপায়ণের কাজ যতই সময়-সাপেক্ষ হোক, আসলে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে সংগৃহীত পদ ও বাচনভঙ্গি নিয়ে কোন মিশ্র সার্ব্বজনীন ভাষা রচনা করা আদৌ সম্ভবপর কি না সেইটেই বিচার্য্য। সরকার এ বিষয়ে এমন সব প্রখ্যাত ভারতীয় ভাষাবিদদের অভিমত গ্রহণ করতে পারেন, যাঁদের কোন বিশেষ একটি আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা কিংবা বিতৃষ্ণা নেই এবং যাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বাস্তবানুগ।

এসপ্যারেন্তো বা নিওর মত একটা সার্ব্বজনীন ভারতীয় ভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা কোন ভাষাবিদ্ করেছেন বা করছেন কি না জানি না, তবে হিন্দী, উর্দ্দু, বাংলা, ওড়িয়া, আসামী, মৈথিলী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ীর (এবং দরকার মত কিছু ইংরাজীও) সংমিশ্রণ সমন্বয়ে যদি একটা সার্ব্বজনীন ভাষা গড়ে তোলা যায় তবে তা সব রাজ্যেরই স্বীকৃতি পাবে এবং তার চর্চ্চায় লোকেরা অধিকতর মনোনিবেশ করবে বলেই আশা করা যায়। সবারই এর সাথে মমত্ব বোধ স্বাভাবিক। ব্যাকরণে যাদের তৎসম, বা তদ্ভব বা অর্দ্ধতৎসম শব্দ বলা হয়েছে, সেইরূপ সংস্কৃতজ শব্দের বেলায় চিন্তার বিশেষ কারণ নেই, পারসিক বা আরবী প্রচলিত শব্দ বা উর্দ্দুতে ব্যবহার হয়, তাদেরও অনেকটা বরদাস্ত করা চলবে কিন্তু ভাবনা হচ্ছে সংস্কৃতের দ্রাবিড় ভাষার শব্দগুলি সম্বন্ধে—যেগুলি উত্তর ভারতের লোকদের কানে বেশ একটু অদ্ভূত ও কটমটে লাগবে। বাচন ও প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে কোন তামিল, কানাড়ী বা মালয়ালাম শব্দ যা ইডিয়মে যদি সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ সমার্থবাচক শব্দ বা বাক্যাংশের চেয়ে লঘু, জোরালো এবং অধিকতর ভাব পরিস্ফুটনের সহায়ক হয় তবে সে জাতীয় শব্দ বা শব্দ-নিচয়কে এই ভাষার অন্তর্ভুক্ত করলে, ভাষার তেজ ও সরসতা বৃদ্ধিই পাবে। এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বাংলা ভাষায় তিনটি পর্ত্তুগীজ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার আছে:

কাবার (Port : ACABAR—অর্থ শেষ করে ফেলা)
রেস্ত (Port : RESTO—নগদ টাকাকড়ি)
টোকা (Port : TOCA—নকল করা, to note down)

অন্য কোন ভারতীয় ভাষার প্রতিশব্দে এদের অর্থকে এত অল্পে ও এত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

অনার্য্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে বহুকাল প্রতিবেশী হিসাবে বাস করায়, তাদের অনেক শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে এসে ঢুকেছে। এখন যে অপাংক্তেয় বা ঘৃণ্য তা আমাদের মনেই হবে না। এইরূপ গোটাকত, অষ্ট্রিক বা অনার্য্য শব্দ হচ্ছেঃ

খোকা, বেং, মাঠ, বোকা
চোঙা, ভিটে, লেপ, খোঁচা
ঠোঙা, মজা, বেঁটে, বালিশ

বাংলা ভাষায় মোট প্রায় দু'হাজার আরবী-ফার্সী শব্দ স্থান পেয়েছে। অনেককাল আগে মুসলমানী শাসকের অবসান হয়েছে, তবু সে আমলের অনেক শব্দ এখন আমাদের নিতান্ত আপনার হয়ে উঠেছে। কাগজ, কলম, দোয়াতের বদলে লেখ্যপত্র, লেখনী ও মস্যাধার লিখলে বা বললে, লোকের কাছে নির্ঘাৎ হাস্যাস্পদ হ'তে হবে। খালি, খুসী, চালাক, দাবি, দেরি, নরম, নকল, বদল, রং, রাজি, তাজা, কিনারা, চেহারা, দোকান, দরকার প্রভৃতি শব্দ তাদের গায়ের বিদেশী গন্ধটুকু সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে। মায়ের পেট থেকে পড়েই আমরা এ সব শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত এরা আমাদের মাতৃভাষারই সামিল। বৈদেশিক (outlandish) শব্দ সম্বন্ধে আমাদের bias কাটিয়ে ওঠা খুব এমন কঠিন কাজ নয়, তবে বেশ কিছু সময়-সাপেক্ষ ক্রমাগত ব্যবহারে অনেক উদ্ভট ও অপরিচিত শব্দও শেষটা আমাদের কাছে ঘরোয়া হয়ে ওঠে।

জুলে রিমে কাপ ও ফিফা

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত

(২)

ইতিমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও জাতীয় ফুটবল এসোসিয়েসন গঠিত হয়েছিল। এই সব জাতীয় ফুটবল এসোসিয়েসন বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আইন-কানুনের সমন্বয় এবং ফুটবলের উন্নতি বিধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ফেডারেশন গঠনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯০৪ সালের ২১শে মে উনিয়োঁ দ্য সোসিয়েতে ফ্রাঁসেজ দ্য স্পোর আত্‌লেতিক্‌স-এর প্যারীর রু সাঁ অনরেস্থিত প্রধান কার্যালয়ে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড এই ছটি দেশের আটজন প্রতিনিধি নিয়ে "ফেদারাসিয় আঁ্যাতারনাসিউন্যাল দ্য ফুটবল এসোসিয়াসিয়ঁ" সংক্ষেপে "ফিফা" প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাত্র ছটি দেশের আটজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই মহাসংঘটিই কালক্রমে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যে কোন কারণেই হোক ফিফার প্রথম সংগঠনের সময় ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েসন ফিফায় যোগ দেয় নাই। ফিফার উদ্যোক্তারা এফ. এ-র কর্তৃপক্ষকে ফিফায় যোগদানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

ফিফা সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিফা ফুটবলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চালাবার প্রচেষ্টা করতে থাকে। যে সভাতে ফিফা জন্মগ্রহণ করে সেই সভাতেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চালাবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই আইন-কানুন প্রণয়ন করে সুইস এসোসিয়েসনকে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু মাত্র ছয়টি এসোসিয়েসনের সমন্বয়ে গঠিত (এই এসোসিয়েসনও- কোথাও কোথাও একটি দু'টি ক্লাব নিয়ে গঠিত; স্পেন থেকে ত মাত্র একটি ক্লাবের—মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব—প্রতিনিধি ফিফায় ছিল) ফিফার এমন সামর্থ্য বা অর্থবল ছিল না যা দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে। ফলে সুইস এসোসিয়েসন ও ফিফার আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হয়।

১৯০৫ সালে এফ এ (ইংল্যাণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েসন) ফিফায় যোগদান করে। এফ এ কাপ পরিচালনায় ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে ১৯০৬ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পুনরায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পরিচালনার জন্য আইন-কানুন পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হয়। কিন্তু এবারের চেষ্টাও বিফল হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চলতে থাকে ও মাঝে মাঝে কোন কোন রাষ্ট্র একক ভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের বিফল চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু ফিফার প্রচেষ্টার পূর্বেই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফুটবল খেলা প্রচলিত ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এসোসিয়েসন সকার ফুটবল ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দু'টি রাষ্ট্রের দল নির্বাচনের জন্যই দীর্ঘ দিন ধরে অনেকগুলো খেলার অনুষ্ঠান করা হয় এবং প্রকৃত পক্ষে দু'টি দলকেই জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক দল বলা যায়। গ্রেট ব্রিটেন (ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড ও ওয়েলসের সম্মিলিত দল) এই খেলায় ফ্রান্সকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক আন্তর্জাতিক খেলায় বিজয় লাভ করে। আমেরিকায় সকার ফুটবল জনপ্রিয় না হওয়ায় ১৯০৪ সালে তৃতীয় অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফুটবল খেলা ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় নাই।

১৯০৬ সাল থেকে ফিফা অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মাধ্যমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আরম্ভ করার জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হয় ও দুটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠানই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ফুটবলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা পরিচালনা সম্বন্ধে একমত হয়। স্থির হয় ফিফার পরিচালনায় অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফুটবলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আরম্ভ করা হবে। ফিফা ঘোষণা করে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ১৯০৮ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অঙ্গ হিসেবে রোমে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইটালীর জাতীয় জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। ভিসুভিয়াসের ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতে পম্পাই নগরী ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর ইটালীতে দেখা দেয় চরম অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা। ইটালী নিজেদের শোচনীয় অবস্থা

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে জানায় এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির আবেদনে গ্রেট ব্রিটেন সাড়া দিয়ে চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়।

ইতিমধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ সালে এথেন্সে অনুষ্ঠিত প্যানহেলেনিক গেমসেও ফুটবল ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয়। অবশ্য গ্রীস এ সময় ফিফার সভ্য ছিল না এবং প্রতিযোগিতা পরিচালনার পূর্বে ফিফার অনুমতি গ্রহণ না করায় ফিফার রেকর্ডে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ডেনমার্ক, গ্রীস, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মিশ্র যুক্ত দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ও শেষ পর্যন্ত ডেনমার্ক গ্রীসকে ৯—০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ

দ্বিতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। ফিফার সভ্যসংখ্যা এ সময় ছিল ১২ তার মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস, সুইডেন ও ফ্রান্স এই পাঁচটি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স "এ" ও "বি" দু'টি দল প্রেরণ করায় ছয়টি দল বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় খেলায় অংশ গ্রহণ করে। গ্রেট ব্রিটেন তাদের উন্নত বিজ্ঞানসম্মত ক্রীড়াধারায় নিঃসন্দেহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল ছিল এবং সুইডেন ও নেদারল্যাণ্ডসকে যথাক্রমে ১২—১ ও ৪—১ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে উঠে। অপর পক্ষে ডেনমার্ক ফ্রান্সের 'এ' ও 'বি' দলকে যথাক্রমে ৯—০ ও ১০—১ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেনের সম্মুখীন হয়। প্যান হেলেনিক গেমসের বিজয়ী হল্যাণ্ডও এ সময়ে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল বলে পরিচিত ছিল এবং স্বভাবতঃই উভয়ের খেলা দেখিবার জন্য ষ্টেডিয়ামে প্রচুর জনসমাগম হয়। শেষ পর্য্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন ডেনমার্ককে ২—০ গোলে পরাজিত করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বপ্রথম গৌরবলাভ করে। তৃতীয় স্থান নির্দ্ধারণের খেলায় হল্যাণ্ড ২—১ গোলে সুইডেনকে পরাজিত করে অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

নামে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হলেও ফুটবলের জনপ্রিয়তা যে তখনও সীমাবদ্ধ ছিল তার প্রমাণ মেলে এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায়। একমাত্র এশিয়া বাদে বিশ্বের অন্য চারটি মহাদেশ থেকে ২২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলেও কেবল মাত্র ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কৌতূহলী ছিলেন।

তৃতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ

ফুটবলের তৃতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ১৯১২ সালের জুলাই মাসে পঞ্চম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ধীরে ধীরে ফুটবল ইউরোপে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী চোদ্দটি রাষ্ট্রের মধ্যে এগারটিই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে ফিনল্যাণ্ড ৩—২ গোলে ইটালীকে, অষ্ট্রিয়া ৫—১ গোলে জার্মানীকে, হল্যাণ্ড ৪—৩ গোলে সুইডেনকে পরাজিত করে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ফিনল্যাণ্ড ২-১ গোলে রাশিয়াকে গ্রেট ব্রিটেন ৭—০ গোলে হাঙ্গেরীকে ডেনমার্ক ৭—০ গোলে নরওয়েকে এবং হল্যাণ্ড ৩—১ গোলে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেনকে ৪—০ গোলে ও ডেনমার্ক হল্যাণ্ডকে ৪—১ গোলে পরাজিত করে দ্বিতীয় বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে মিলিত হয়। গ্রেট ব্রিটেন এবারও ডেনমার্ককে ৪—২ গোলে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের গৌরব অর্জন করে। পরাজিত দুটি সেমি ফাইন্যালিষ্ট দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ডকে ৯—০ গোলে পরাজিত করে এবার তৃতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে।

১৯১৬ সালের ষষ্ঠ অলিম্পিয়াড ও চতুর্থ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছিল জার্মানীর রাজধানীর বার্লিনে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। রণদেবতার বীভৎস হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কামানের বজ্র নির্ঘোষ আর অনল বর্ষণে ইউরোপে নেমে এল ধ্বংসের উন্মত্ততা। বিষবাষ্পের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল দিগ-দিগন্ত। অলিম্পিকের শান্তির বাণী, ফিফার যুবসমাজের মধ্যে সৌভ্রাত্রের আদর্শ কবিগুরুর ভাষায় "ব্যর্থ পরিহাসের" ন্যায় বার বার প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। নররক্তের রুধিরে, নরমেধ যজ্ঞে মেতে উঠল সমগ্র বিশ্ব। হত্যা ও ধ্বংসের বীভৎসতায় মধ্যে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল ষষ্ঠ অলিম্পিয়াড আর চতুর্থ বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ।

কর্ণ-কুন্তী ঃ বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার, প্রকাশক বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার, পোঃ বেলুড়মঠ, হাওড়া, মূল্য ২·৭৫ পঃ।

মহাভারতীয় কর্ণকুন্তী চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। ছন্দ, বর্ণনা, চরিত্র-বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। ঘটনার পারম্পর্যে মহাভারতীয় এই দুইটি মহান্ চরিত্র যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ তাঁহারও ইঙ্গিত এই কাব্যে সুস্পষ্ট। কাব্যের আঠারো সর্গে 'কুন্তীর বিলাপ' ও উনিশ সর্গে 'কুন্তীর মানসদ্বন্দ্ব' মানবীয়-আবেদনপূর্ণ। আধুনিককালে এরূপ একখানি কাব্য প্রকাশন বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্বতন রীতির প্রতি কবির আন্তরিক অনুরাগ ও নিষ্ঠার প্রশংসনীয় পরিচয়। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

নক্ষত্রের নীচে ঃ শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭. মূল্য দু' টাকা।

যুগচিন্তাকে ছোট ছোট কবিতার মধ্যে সংহত করে রাখাই আধুনিক কাব্যশিল্পের ধারা। কবি শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এ ধারা অনুসরণ করে সাফল্য অর্জন করেছেন। আলোচ্য কবিতাগ্রন্থটির প্রত্যেক কবিতায় কবির অনুভূতি ও কল্পনা এক সার্থক রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

কৃষ্ণলীলামৃত ঃ পথিক, প্রকাশক প্রশান্তকুমার দাশ, ৬৮।৪ যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা ২৮। মূল্য এক টাকা।

লেখকের 'নিবেদনে' প্রকাশ, তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের লীলাসমষ্টিকে আপন ভাষায় রূপ দিয়াছেন। ভক্ত ও ভাবুক না হইলে কেহ এরূপ সুন্দরভাবে ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করিতে পারেন না, সুতরাং লেখক যে শুধু আপন ভক্ত হৃদয়ের নির্মাল্য রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, সেই মহাজীবনের লীলামাহাত্ম্যেও পাঠককে অভিভূত করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের গৃহে গৃহে প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্যামসুধা ঃ শান্তিসুধা দাস, প্রকাশক শান্তিসুধা, দাস; ১৫১ মণিফিট, জামসেদপুর ৪। মূল্য দুই টাকা।

ভক্তিমতী লেখিকার প্রাণের উচ্ছ্বাস এই কাব্যগ্রন্থে সঙ্গীতে ও কবিতায় নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-সাধনার মূল তত্ত্বটি লেখিকা নানা রসানুভূতির মাধ্যমে অতিসুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দে লেখিকার যে যথেষ্ট দখল আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

ছোট ছোট ঢেউ ঃ সঞ্জয়, প্রকাশক সংবাদি প্রকাশ জলপাইগুড়ি। মূল্য দুই টাকা।

লেখকের কথায় প্রকাশ, তাঁহার পুস্তক "একটি অনাবিল কৈশর উপন্যাস।" আমাদের এই উপন্যাসখানি ভাল লাগিয়াছে। চিত্র ও চরিত্র বেশ পাকা হাতেই আঁকা হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক বর্ণনা কাব্যগন্ধী হইলেও, বেশ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়, উপন্যাসের চরিত্রগুলিও যেন বাস্তব। ছাপা বাঁধাই ভাল হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

হিমালয়ের চিঠি ঃ শটাকর্ণ, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। ছয় টাকা।

হিমালয় চির রহস্যাবৃত। ইহার কাহিনী কোনদিন শেষ হইল না; চির নূতন। কতজনে কতভাবে দেখিলেন, কত কথা লিখিলেন তবু বলা গেল না ইহাই শেষ কথা। 'হিমালয়ের চিঠি' পড়িতে সেই কারণেই ভাল লাগিল। চিঠির আকারে লেখা তাই গ্রন্থকার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখিতে পারিয়াছেন। লেখার মুন্সিয়ানার গুণে অতবড় বই পড়িতে কোথাও হোঁচট খাইতে হয় নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি চোখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে এই উপভোগের মাধুর্য তীর্থযাত্রা সহজ হওয়ায় চিরতরে নষ্ট হইয়া গেল। দুর্গম পথ আর পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিতে হয় না। এখন প্রায় বদরিকাশ্রম পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। ভাল হইয়াছে কি না জানি না, তবে হিমালয়ের রহস্য যেন অনেকখানি উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। বই লেখার প্রয়োজনও ফুরাইয়া গেল। তাই 'হিমালয়ের চিঠি'কে শেষ গ্রন্থ হিসাবে অভিনন্দন জানাই।

সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য তিন টাকা

এই আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনী ও তাঁহার বাণী সংকলিত হইয়াছে। বাণীগুলি ভক্ত শিষ্যের সহিত কথোপকথনচ্ছলে ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ উপদেশে অতি সাধারণ লোকেও উপকৃত হইবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে যেসব কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার মূল্যও অনেকখানি। বইখানি সকলেরই ভাল লাগিবে।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

পুরীর মন্দির

শিল্পী : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::
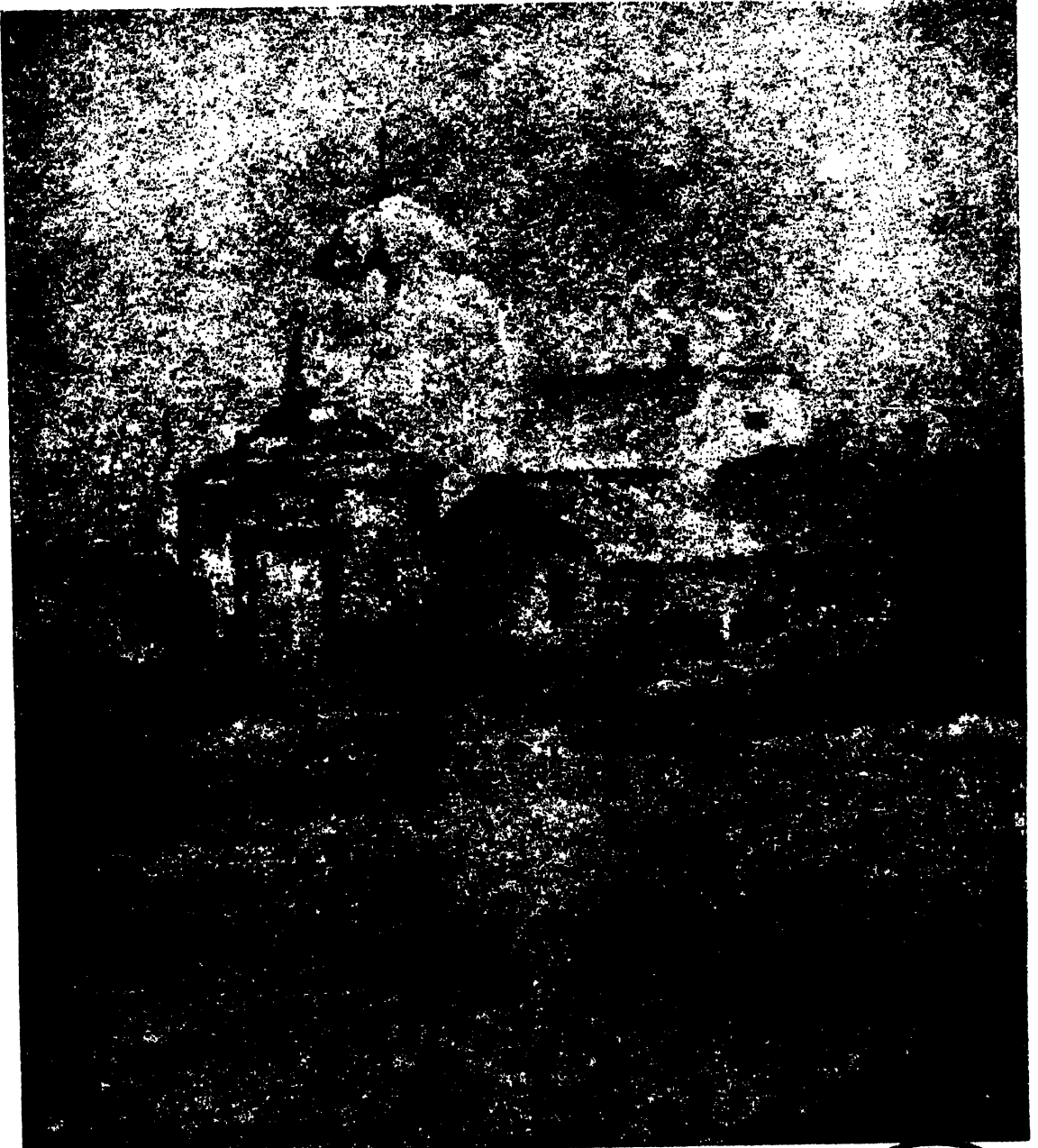
প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৭৩

পঞ্চম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুদ্ধ ও শান্তির কথা

ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলিতেছে। তাহার মধ্যে মানুষে মানুষে শত্রুতার বিষ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই মানসিক গরল বিরোধ ও যুদ্ধের ইতিহাসের অতি পুরাতন কথা। মানব সমাজের এক অতি পুরাতন আবেগ হইল এক জাতীয় অথবা এক দলের মানুষের অপর দল বা সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখা ও সেই কারণে এক গণ্ডির লোকের অপর গণ্ডিকে নিজেদের অধীনে আনিবার চেষ্টা। ধর্ম্ম, রাষ্ট্রমত, জাতি, নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি বহু কারণে মানব-সমাজগুলির মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয় এবং সেই কলহ ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া অপরাপর সমাজগুলিকে দলে টানিয়া আনিয়া শত্রুতার প্রসার আরও বিস্তৃত করিয়া তোলে। পূর্ব্বকালে যুদ্ধ হইত ধর্ম্ম লইয়া, ক্রুসেড ও জেহাদের মত, রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য, রোম ও কার্থেজ, গ্রীস ও ট্রয় কিংবা নেপোলিয়নের অভিযানের মত; এবং ব্যবসার জন্য, যথা ইংরেজের ভারত দখলের যুদ্ধগুলির মত। বর্ত্তমানের যুদ্ধও ঐ সকল কারণেই হইয়া থাকে। শুধু ধর্ম্ম, রাষ্ট্রমত বা আথিক লাভের স্বরূপ ততটা পরিষ্কারভাবে দৃষ্টি-গোচর হয় না। পাকিস্তানের পরদেশ দখল চেষ্টার মূল কারণ ধর্ম্মের নামে রাজ্য বিস্তার চেষ্টা। চীনের তিব্বত গ্রাস কিংবা অপরাপর দেশের দিকে হাত বাড়ানও রাষ্ট্র মতের দোহাই দিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার চেষ্টামাত্র। হান, টাং, মিং বা সুং সম্রাটদিগের লোভ ও মাওৎসে টুংএর লোভের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। পূর্ব্বকালের সম্রাটদিগের আত্মম্ভরিতা ও দম্ভ মাওয়ের তুলনায় কম ছিল বলিলে ভুল হইবে না। মাও পৃথিবীর সকল লোকের মুক্তির জন্য তাহাদিগকে চীনের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে চাহেন। পূর্ব্বযুগের সম্রাটগণও তাঁহাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিলে সকল মানব মোক্ষলাভ করিবে বলিয়া প্রচার করিতেন। যদি অর্থের কথা তোলা যায় তাহা হইলে আমেরিকার আর্থিক সাম্রাজ্য প্রসার ইতিহাসের কোনও ব্যবসা-অভিযানের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন বলা যায় না। ব্যবসার ও টাকার গোলাম সৃজন ও তাহার মধ্যেই কথন কথন গোলাগুলী বর্ষণ, আমেরিকার পৃথিবী বিজয়ের সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। আজকালকার শত্রুতার রীতি হইল গুপ্ত আক্রমণ ব্যবস্থা ও যুদ্ধ করিয়া তাহা অস্বীকার করা। অথবা বেনামীতে যুদ্ধ চালান।

উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম দুইটি দেশ। তাহাদিগের বিভাগ পাকিস্তান ও ভারতের বিভাগ অপেক্ষা অধিক বাস্তব পার্থক্যের উপর গঠিত। এই অবস্থায় উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা পাকিস্তানের ভারত দখল করিয়া এক মিলিত মহা-

পাকিস্তান গঠনের কল্পনারই মত। অর্থাৎ উত্তর ভিয়েতনামের ন্যায়তঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিপ্লব সৃজন চেষ্টা করিবার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। চীনের পক্ষে এই অপকর্মে উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করা একান্ত অনুচিত এবং রুশের পক্ষে তাহা আরও অন্যায়। আমেরিকার দক্ষিণ ভিয়েতনামে সৈন্যবাহিনী লইয়া যাওয়া কিংবা শত শত বিমান দিয়া দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেনাদিগকে সাহায্য করা যে মহা অন্যায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ রুশ ও চীন উত্তর ভিয়েতনামকে লুকাইয়া বা শুধু অস্ত্র সরবরাহ করিয়াই সাহায্য করিতেছে; কিন্তু আমেরিকা তাহার যুদ্ধকার্য্য খোলাখুলি করিতেছে। প্রকাশ্যে কেহ কোন দোষ করিলে মনে হয় যে সে নিজের দোষকে দোষ মনে করে না। লুকাইয়া পাপ করিলে অন্ততঃ পাপ সম্বন্ধে পাপীর লজ্জা আছে প্রমাণ হয়। এই কারণে আমেরিকার ভিয়েতনামে যুদ্ধ করা অধিক দোষাবহ।

এখন যদি বলা যায় রুশ, চীন ও আমেরিকা ভিয়েতনামের যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিলেই যুদ্ধ থামিয়া যাইবে, তাহা হইলে একথাও বলিতে হইবে যে, উত্তর ভিয়েতনাম যতক্ষণ দক্ষিণ ভিয়েতনামকে দখল করিয়া এক দেশ গঠন করিবার চেষ্টা করিবে ততক্ষণ যুদ্ধ নিবৃত্তি ঘটিবে না। এবং রুশ ও চীন গোপনে উত্তর ভিয়েতনামকে যুদ্ধের রসদ সরবরাহ করিতে থাকিবে। এবং এই সকল কথা আছে বলিয়াই আমেরিকাও যুদ্ধ থামাইবে না। তবে প্রকাশ্যে যুদ্ধ না করিয়া আমেরিকা হয়ত কোন গুপ্ত পন্থা অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে পারে। সুতরাং এই মহা জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ করিবার চেষ্টা একান্তই বাস্তব অবস্থা বোধের অভাব প্রমাণ করে। রুশ, চীন, আমেরিকা অথবা উত্তর দক্ষিণ ভিয়েতনাম, কেহই ভারতের উপদেশ শুনিতে চাহিতেছে না। ভারত কিন্তু কেহ কথা শুনিতে না চাহিলেও অকাতরে উপদেশ ও পরামর্শ বিতরণ করিতে ব্যস্ত। কোন কোন দেশ ভারতকে উস্কাইয়া আমেরিকাকে যুদ্ধ থামাইতে বলিতে প্ররোচিত করিতেছেন। কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত উত্তর ভিয়েতনামকে সেই সকল দেশ রসদ সরবরাহ করিয়া যুদ্ধ বিরতি ত সাহায্য করিতেছেন বলা যায় না। যুদ্ধ থামাইতে হইলে রুশ, চীন ও আমেরিকার সমবেত প্রচেষ্টার আবশ্যক। এবং ইঁহাদিগের পক্ষে প্রয়োজন হইবে উত্তর ভিয়েতনামকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দক্ষিণ ভিয়েতনাম দেশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করাইয়া লওয়ান। শুধু আমেরিকা যুদ্ধ থামাইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এই চিন্তা করার কোন সম্যক কারণ নাই। উত্তর ভিয়েতনাম যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামকে গ্রাস করিয়া কম্যুনিষ্ট প্রভাব আরও বিস্তৃত করিয়া দিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে শত্রুতার বিষ নষ্ট না হইয়া আরও বাড়িয়া চলিবে ও অদূর ভবিষ্যতে তাহার ফলে আরও ব্যাপকভাবে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এই কারণে ভিয়েতনাম যুদ্ধের মূলে আঘাত করা প্রয়োজন। যুদ্ধের কারণ থাকিতে যুদ্ধ বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মিলিতভাবে এক হইয়া থাকিবার অক্ষমতা। গায়ের জোরে এক করিয়া দিলে সে মিলন স্থায়ী হয় না। এই কারণে হো চি মিনহ-এর প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে চৈনিক পন্থার "মুক্তির দাসত্ব" প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে যুদ্ধ বিরতি হইবে না। চীন তিব্বতে যেভাবে "মুক্তি" আনয়ন করিয়া তিব্বতের সভ্যতা ও মানবতার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার পরে ঐ জাতীয় মুক্তি অপর কেহ আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

বড় কথা ও ছোট কাজ

ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে The Devil quoting scriptures, অর্থাৎ শয়তানের ধর্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করা কিংবা ভূতের মুখে রাম নাম। পাপাত্মাদিগের মুখ হইতে যখন সুনীতির বাণী নিঃসৃত হয় তখন উপরোক্ত কথাগুলি মানুষের মনে জাগিয়া উঠে। পরস্ব অপহরণ করিয়া যদি সেই দুষ্কর্মলব্ধ অর্থে কেহ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কতটা পুণ্য হয় তাহা বিচার করা কঠিন নহে। নিজের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া যদি কেহ শুধু অপরকে উপদেশ দিয়া দিন কাটাইয়া দেয় তাহা হইলে উপদেষ্টার কথার মূল্য কতটা থাকে তাহাও বিচার্য্য। একশত প্রকার অপরাধ করিয়া যদি কেহ একটা-দুইটা সৎকার্য্য করিয়াও ফেলে তাহা হইলে তাহার অপরাধ কতটা মার্জ্জনা করা যাইতে পারে? এক কথায় অসংখ্য অন্যায় যেখানে সর্ব্বত্র সকল কিছু বিষময় করিয়া রাখে, সেখানে দুই-চারিটি ন্যায়ের অভিব্যক্তি থাকিলেও বিষ কতটা কাটিয়া যাইতে পারে? দুষ্ট স্বভাব ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই

অবান্তর কথা তুলিয়া নিজেদের দোষের প্রতি যাহাতে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত না হয় সেই চেষ্টা করিয়া থাকে এবং সেই কারণে পাপীর মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে মধুর হইলেও কদাপি শুনিতে নাই। আজকাল আমাদিগের দেশে পাপীরও কমতি নাই এবং ধর্ম্মকথাও অতি বাড়ন্ত। দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ অসংখ্য। শাসনকার্য্যের পঙ্গু অবস্থা। দেশরক্ষা ও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হইতে অনেক নিকৃষ্টভাবে হইয়া থাকে। রাজস্ব আদায় অত্যধিক এবং সৎ লোকের উৎপীড়নের কারণ। রাজস্ব ব্যয় অপচয় দোষদুষ্ট। শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্ণভাবে হইবার কোনও লক্ষণ নাই। জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, আহার্য্য বস্তু সরবরাহ, উপার্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারণ, যানবাহন বাসস্থান প্রভৃতির আয়োজন; কোন কিছুই যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত, প্রতিষ্ঠিত বা সংরক্ষিত নাই। কিন্তু এই সকল কথা বলিলে উত্তর দেওয়া হয় যে, নেহরু এই দেশকে নিরপেক্ষ ও সামরিক দলবদ্ধতাবর্জ্জিত ভাবে গড়িয়া গিয়াছেন, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে বিশ্ব-শান্তির চরম ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং ভারত সরকার উচ্চ আদর্শ বহন করিয়া সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে চলৎশক্তি-হীন হইলেও সকল ভারতবাসীর পূজা ও তাঁহাদিগের সকল অমঙ্গল অভাব ও অপমানের ঊর্দ্ধে।

গরীবের অভিজাত ব্যাধি

অনাড়ম্বর ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বি ভোগে বিমুখ কোন কোন রাষ্ট্রনেতা ইচ্ছামত যত্রতত্র ভ্রমণ করিয়া নিজেদের খ্যাতি বিস্তার করিয়া বেড়াইলেও সকলেই জানেন যে, তাঁহারা কোন প্রকার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সেরূপ কার্য্য করেন না। তাঁহাদিগের সকল কার্য্যের ভিতরের উদ্দেশ্য একই; বাহিরের রূপ যাহাই হউক না কেন। অর্থাৎ তাঁহারা যদি নিমন্ত্রণের আকর্ষণে কোথাও গমন করিতে বাধ্য হন ও আহার-বিহার পূর্ণমাত্রায় চালাইয়া চলিতেও থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহারা কদাপি নেহরু ও লাল বাহাদুরের নির্দ্দেশ ভুলিয়া যাইতে পারেন না। বিশ্বশান্তির আদর্শ ও তাসখন্দ মীমাংসার সহিত ভোগ ভ্রমণ ও জাঁকজমকপ্রবল আতিথেয়তা গ্রহণ কিংবা জলুশ-জেল্লা সম্পন্ন আত্মবিজ্ঞপ্তির কোন ছন্দের অমিল নাই। ইহা ব্যতীত সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, দেবতার প্রতিনিধি পুরোহিতের যে সকল অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য প্রাপ্তি ঘটে সে সকলই বস্তুত দেবতার; পুজারীর নহে। এই জাতীয় নেতাগণ এই কারণে ভোগবিলাসের মধ্যে জড়াইয়া পড়িলেও তাহার কোন দোষ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ দেশমাতৃকার পূজারী যে নেতাগণ, তাঁহারা যেখানে যেভাবে যাহাই গ্রহণ করুন না কেন তাহা বস্তুত দেশমাতার চরণেই অর্পিত হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই জন্য সেবায়েতদিগের অনেক সময় অসুবিধা হয়; লোকে তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া ভুল বুঝে। ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সৃষ্টি সহজ-কার্য্য নহে। বনাম, বকলম ও ওকালতনামার আড়ালে দেবতার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর না হইলেও দেবতাকে অস্বীকার করা চলে না এবং পূজারীর স্কন্ধে দেবতার ঐশ্বর্য্যের বা খরচের ভার স্থাপন চেষ্টাও অন্যায়। আয়কর বিভাগ নেতাদিগের খরচ করিবার ক্ষমতার আড়ালে কোন গুপ্ত আয় দেখিতে পান কি না, আমরা চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখিবার আশা করি না। সম্ভবত রাজকর্ম্মচারীগণও আমাদিগের মতই অন্ধ। আসল কথা হইল মানুষ বা দেবতা যাহার জন্যই হউক ব্যয়বাহুল্য গরীবের পক্ষে অশেষ ক্ষতিকর। এই গরীব দেশে মানুষ পূজা সস্তায় করিয়া থাকে, তীর্থ ভ্রমণও বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া অল্প খরচে শেষ করে। উচ্চ আভি-জাত্যের অভিনয় অথবা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য ও শক্তির কেন্দ্রস্থল-গুলিতে বিচরণ করা বা তদ্দেশীয় নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য সন্ধান গরীবের শোভা পায় না।

ভারত ও আণবিক অস্ত্র

সামরিক শক্তিতে অর্থাৎ সৈন্যবলে অথবা মহাস্ত্রের অধিকারে শত্রুর তুলনায় দুর্ব্বল থাকা কোন জাতির পক্ষেই নিরাপদ নহে। যে সকল জাতির কোনও শত্রু নাই, যথা সুইৎজারল্যাণ্ড কিংবা সুইডেন, তাহাদিগের সৈন্যবল কিংবা মহাস্ত্র ধারণ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একাধিক মহাশত্রু পরিবৃত অবস্থায় যদি কোন জাতি সৈন্য ও অস্ত্রবল খর্ব্ব করিয়া শান্তিবাদের গৌরব অনুভূতিতে নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে সেই জাতির ভবিষ্যৎ গৌরবময় থাকিবার আশা অল্পই। ভারতের আণবিক অস্ত্র বর্জ্জন আদর্শবাদের দিক দিয়া উত্তম হইলেও বাস্তব অবস্থা বিচারে নির্ব্বুদ্ধিতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক।

কারণ চীন যদি উত্তরোত্তর একটার পর একটা আণবিক বিস্ফোরণ করিয়া চলে ভারত তাহা হইলে আণবিক অস্ত্র ধারণ না করিলে ভারতের মহা বিপদের সম্ভাবনা। চীনের পৃথিবী বিজয় অভিযানের সহায়ক পাকিস্তান ভারতের সর্বনাশ সাধনে সতত যত্নবান। সুবিধা পাইলেই মহা-পাকিস্তান গঠন করিবার জন্য ভারত ধ্বংস করিতে পাকিস্তান ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবে না। এবং ভারত ধ্বংস কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পাকিস্তান কোন উচ্চ আদর্শ মানিয়া চলিবে না। কিছুকাল যাবৎ পাকিস্তান সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে ভারত অতি শীঘ্র একটা আণবিক বোমা ফাটাইবে। এই মিথ্যা প্রচার পাকিস্তান কেন করিতেছে তাহা বুঝা কঠিন নহে। পাকিস্তান যাহারা গড়িয়াছে তাহারা পূর্ব্বকালে দাঙ্গা লাগাইবার সময় সর্ব্বদাই আগে আগে বলিত যে অপরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আত্মরক্ষার মিথ্যা অজুহাত সর্ব্বদাই যুদ্ধ আরম্ভের একটা পুরাতন পদ্ধতি। ভারত আণবিক বোমা ফাটাইবার ব্যবস্থা করিতেছে বলার অর্থ পাকিস্তান আণবিক অস্ত্র পাইয়াছে অথবা পাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। চীন পাকিস্তানকে দিয়া ভারত আক্রমণ করাইতে চাহে ইহা সকলেই জানে। চীন পাকিস্তানকে অসংখ্য ট্যাঙ্ক, বিমান ও অপরাপর অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে ও নিজে না পারিলে বিদেশী অর্থ দিয়া পাকিস্তানের অস্ত্র ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছে ইহাও এখন সর্ব্বজনবিদিত। এই অবস্থায় পাকিস্তানের পক্ষে আণবিক অস্ত্র সংগ্রহ করা সহজ। এবং ভারত আনবিক বিস্ফোরণ করিবে বলিয়া বেড়াইবার উদ্দেশ্যও নিজের আণবিক অস্ত্র সংগ্রহের সাফাই গাহিয়া রাখা মাত্র। এই অবস্থায় ভারতের কর্ত্তব্য অবিলম্বে আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ

ভিয়েৎনামে এখন দশ লক্ষাধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত। তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে কি না এ কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। মাসের পর মাস অবিরাম গতিতে যুদ্ধ চলিতেছে। আকাশ যুদ্ধরত বিমানের ছায়ায় অন্ধকার; বোমার বিস্ফোরণ, কামানের গর্জ্জন ও যন্ত্রবন্দুকের কর্কশ নিনাদে চরাচর প্রকম্পিত, লক্ষ লক্ষ সামরিক ও অসামরিক নরনারী শিশু হতাহত ও সহস্র সহস্র গৃহ অঙ্গারে পরিণত—এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ যে প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমেরিকা অতি প্রকাশ্যভাবেই যুদ্ধ করিতেছে। চীন ও রাশিয়া প্রকাশ্যে যুদ্ধে নামে নাই কিন্তু সাহায্য করিতেছে ও আরও করিবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে। রুশ ও চীন সৈন্য দিয়াও সাহায্য করিবে, যদি হো চি মিন্‌হ্‌এর তাহার প্রয়োজন হয়, একথাও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ভিয়েৎনামের ধানের জমিতে পৃথিবীর তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে এই আশঙ্কার বহু লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যুদ্ধ যদি হয় তাহা হইলে তাহা ঐ ধান্য ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে এইরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধ হইলেই যুদ্ধের আয়োজনে, সামরিক মাল-মশলা সরবরাহে ও সৈন্য সংগ্রহ, শিক্ষা ও পরিচালনার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য দূরে দূরে অপরাপর স্থানে বোমা বর্ষণ সুরু হয়। সুতরাং তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি হয় তাহা হইলে তাহা চীন, রুশ, আমেরিকা ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে বাঁধা দেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িবে। অর্থাৎ পাকিস্তান একদিকে চীনের দলে থাকিবে ও অপরদিকে আমেরিকার সহায়তা করিবে এবং বহু জাতির অবস্থাই বেইমানির বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়া কে কাহার শত্রু বা বন্ধু তাহার কোন স্থিরতা থাকিবে না। ঘন পরিবর্ত্তন-শীল সখ্য ও শত্রুতার আবর্ত্তে পড়িয়া জাতি সকল নিজ নিজ স্বরূপ ত্যাগ করিতে থাকিবে। এই অবস্থায় ভারত কি করিবে? এখন কি করিতেছে তাহার উপর এই কথার উত্তর নির্ভর করিবে। **যুদ্ধ হইলে বিদেশের আমদানি খাদ্য আর জুটিবে না।** তাহা হইলে কি হইবে? কোন্ পরিকল্পনার কি অবস্থা হইবে? আমলাতন্ত্র কি এই বিরাট দেশ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালাইয়া চলিতে পারিবে? কংগ্রেসের অহিংসার পূজারী সরল চিত্ত শক্তিহীন নেতাগণ কি বিক্ষুব্ধ মহাজাতিকে সংযত ও সংহতভাবে জাতি রক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন?

হিরোসিমা ও সাঁতারু মাওৎসে টুং

আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে হিরোসিমার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা। হিরোসিমায় ও পরে নাগাশাকিতে আণবিক বোমা ফেলিয়া

আমেরিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানকে দমন করিতে পারে। হিরোসিমাতে ঐ বোমা পড়িলে ৭৪০০০ লোক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ হারায় ও নাগাশাকিতেও ৭৪০০০ নরনারী শিশুর প্রাণনাশ ঘটে। আহতের সংখ্যা ১৫০০০০ প্রমাণ হইয়াছিল। আণবিক বিস্ফোরণের ফলে নিকটবর্ত্তী সকল ঘরবাড়ী জীবজন্তু বৃক্ষাদি ক্ষণিকের মধ্যেই ছাই হইয়া যায়; কারণ সেই বিস্ফোরণের অতি ভয়ানক উষ্ণতা লক্ষাধিক সেন্টিগ্রেডের মত হয়। যাহারা কিছু দূরে থাকে তাহাদিগেরও তীব্র দহন শরীরের চর্ম্ম খুলিয়া পড়ে ও উষ্ণ বায়ুর প্রকোপে ফুসফুস জ্বলিয়া যায়। আরও দূরে থাকিলে প্রাণনাশক আলোকরশ্মির তেজে রক্তের লোহিত কণিকা সকল নষ্ট হইয়া মানুষ শ্বাস গ্রহণ করিয়া শরীরে অক্সিজান লইতে পারে না ও পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক কথায় যাহারা মুহূর্তের মধ্যে ভস্মে পরিণত হইয়া যায় তাহাদিগের মৃত্যু তওটা ভয়ানক হয় না; যতটা হয় উত্তাপ ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের ফলে কষ্টভোগ করিয়া মরা। আণবিক যুদ্ধ এই কারণে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়; কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর শক্তিমান জাতিগুলি সকলেই আণবিক অস্ত্র সাজাইয়া রাখিয়া পরস্পরকে আতঙ্কিত করিবার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। ভারত শুধুই ঘুমাইয়া থাকিলে তাহার এই ক্ষেত্রে অপরকে অস্ত্রশক্তি দেখাইয়া নিরস্ত করিবার কোন উপায় থাকিবে না; নিজেকেই আতঙ্কে জড়বৎ হইয়া থাকিতে হইবে। আণবিক যুদ্ধের ভয় ও নিকটত্বের আশঙ্কা কত বাস্তব ও সুচিন্তিত সত্য-বিচারের উপর গঠিত তাহার একটা প্রমাণ চীনের রাষ্ট্রনেতা মাওৎসে টুং-এর আকস্মিক সন্তরণ প্রীতি। আণবিক বিষ জর্জ্জরিত আবহাওয়ায় প্রাণ বাঁচাইতে হইলে একমাত্র উপায় জলে নামিয়া পড়া, জলে ডুব দেওয়া ও সন্তরণ করিয়া কিছু সময় কাটাইয়া দেওয়া। চীন দেশে বড় বড় নদী আছে এবং যদি সকল লোকে সাঁতার কাটিতে পারে তাহা হইলে জলে নামিয়া পড়া সম্ভব হইতে পারে। মাওৎসে টুং সম্ভবত আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা অনুমান করিয়াছেন সেই কারণে নিজেও সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেশবাসী সকল লোককে জলের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া ফেলিতে উৎসাহ দান করিতেছেন। অনেকে ভাবিতেছেন যে মাওৎসে টুং অকারণ অহংকারে নিজ সন্তরণ ক্ষমতা প্রচার করিতেছেন কিন্তু বস্তুত চীনারা সর্ব্বত্র সাঁতার কাটা আরম্ভ করিয়া দিয়া নিজেদের আণবিক আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। ভারতের যে সকল স্থানের উপর আণবিক আক্রমণ সম্ভাবনা ঘটিতে পারে সেই সকল স্থানের জনসাধারণের প্রয়োজন হইলে যাহাতে যথেষ্ট জল পাওয়া যাইতে পারে সে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। জলাভাব থাকিলে আণবিক বিষ ধুইয়া ফেলা সম্ভব হইবে না। জলে নামিয়া পড়িতে হইলে বা জলধৌত আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হইলে জল প্রয়োজন। সন্তরণ শিক্ষা করিলে নদী বা সরোবরে নামিয়া পড়াও সম্ভব হইতে পারে। আণবিক আক্রমণ হইতে বাঁচিবার উপায় জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হওয়া আবশ্যক।

ভারত সরকারের উপর অনাস্থা

ভারত সরকার বিগত আঠার বৎসরকাল দেশের অভিভাবকতা করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই এবং দেশবাসীকে উচ্চহারে রাজস্ব দিতে বাধ্য করিয়া আরও দরিদ্র করিয়া দিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ প্রায়ই করা হয়। দেশের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ও সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া এখন লোপ পাইতে চলিয়াছে। শাসনকার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা ঢিলাভাবে চালিত। সাধারণের সুবিধার ব্যবস্থা, যথা ট্রেণ, বাস, জাহাজ, বিমান, ডাক, তার ও টেলিফোন প্রভৃতি পূর্ব্বের তুলনায় ধীরে ধীরে অকার্য্যকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। সরকারী বিভাগগুলিও নিজ নিজ কার্য্যে ক্রমবর্দ্ধিতভাবে অক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল অভিযোগ ও নিন্দার উত্তরে কার্য্যে তৎপরতা ও সাফল্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা কদাপি লক্ষিত হয় না। শুনা যায় ভারত সরকার কর্ম্মগৌরবে খ্যাতি ও সফলতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কারণ সস্তার সাধারণ কর্ত্তব্য তাঁহারা না করিয়া থাকিলেও বহুমূল্যবান কার্য্য সকল তাঁহারা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রমাণ তাসখন্দ মীমাংসা, ভিয়েতনামের শান্তির আয়োজন, নাসের-টিটো-কসিগিন সম্ভাব ইত্যাদি, ইত্যাদি। পেটের খোরাক না জুটিলেও মনের খোরাক দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে? খাওয়া, শোওয়া, বস্ত্র প্রভৃতির সন্ধানে ঘোরা মনুষ্যের

পরিচায়ক নহে। আমরা অগত্যা অভিযোগ তুলিয়া বিশ্ব-জাতি সভায় সম্মানিত দর্শকের আসনে বসিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে বাধ্য হইব। অভাব যদি মাঝে মাঝে সেই শান্তিকে আঘাত করে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া থাকিব। ঋণ, সুদ বা রাজস্বের ভারে ভারাক্রান্ত বোধ করিলে অনন্ত শূন্যে যে সকল গ্রহ-নক্ষত্র আছে সেগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভার সত্ত্বেও আনন্দের হাওয়ায় ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিব।

জাতীয় সঙ্গীত

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক" কবে কি উপলক্ষ্যে রচিত হইয়াছিল তাহা লইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেক অর্থহীন জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন বুদ্ধিমান ভাবিয়া বাহির করিয়াছিলেন যে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গানটি রচিত হইয়াছিল সুতরাং উহা তৎকালীন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে উদ্দেশ্য করিয়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন। ভারত ভাগ্যবিধাতা পঞ্চম জর্জ্জই ছিলেন কেননা আর কেহ ঐ ভাবে সম্বোধিত হইতে পারিতেন না। আর ভারতের জনগণের মন অধিনায়ক তিনি ব্যতীত আর কে হইতে পারেন? তিনি জনগণের মঙ্গলদায়ক ছিলেন। নিঃসন্দেহ। তাঁহার সিংহাসনের পাশে জনগণের ঐক্য ও প্রেমের সৃজন হইতে থাকিত সকলেই জানেন। আর দেখা যায় যে, পঞ্চম জর্জ্জের শঙ্খধ্বনি দ্বারা বিপ্লবকালে সকলকে সংকট দুঃখ হইতে ত্রাণ করা হইত। আর তিনি সকলের পথ-পরিচায়কও ছিলেন। অতঃপর শুভ্র-শ্মশ্রু-শোভিত মুখ সেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার মঙ্গল চক্ষুকে চির-জাগ্রত রাখিয়া জনগণের **স্নেহময়ী মাতার** ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সকলকে নিজ অঙ্কে রক্ষা করিলেন! যে রাজেশ্বর ভারত ভাগ্যবিধাতা, ঘুমন্ত ভারতবাসীকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন তিনি ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ না হইয়া যদি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর হন তাহা হইলে কষ্টকল্পনার বান ডাকাইয়া আবোল-তাবোল বকা চলে না। পঞ্চম জর্জ্জ যে পতন-উত্থানের বন্ধুর পথের যুগযুগের যাত্রীদিগের একান্ত পরিচিত চির-সারথি ছিলেন তাহাও মানিতে হইবে! এই অসম্ভব কল্পনার প্রলাপ যাঁহারা প্রায়ই বকিয়া নিজেদের বুদ্ধিহীনতা প্রমাণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে আমরা জানাই যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও কোন মানুষকে ভগবানের সহিত তুলনীয় করিয়া বর্ণনা করেন নাই। ভারত-পীড়নকারী ইংরেজের স্তুতিবাদ তাঁহার লেখনি হইতে কখনও বাহির হয় নাই। জনগণমন অধিনায়ক বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা ভগবানের নামেই সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষা যাঁহারা জানেন, বোঝেন, তাঁহারা পরিষ্কার বুঝিতে পারেন যে স্নেহময়ী মাতা ভারত ভাগ্যবিধাতা চির-সারথি রাজেশ্বর, ভগবান ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না।

হিন্দী

ভারতের একতা ও দেশসেবার মহৎ আদর্শ বিনাশ করিয়াছেন যে সকল রাষ্ট্র-কূট-চক্র পরিচালক ষড়যন্ত্রকারীগণ, তাঁহাদিগের বিভিন্ন ভারত উদ্ধার পন্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পন্থা হইল সকলে সমস্বরে হিন্দী ভাষায় কথা বলা। যে ক্ষেত্রে দেশের সর্ব্বত্র ভাষাভিত্তিকভাবে মাতৃভূমিকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য সৃষ্টি করা হইতেছে; যে ভারতে মারাঠি ও গুজরাটি এক রাজ্যে বাস করিতে পারে না ও পাঞ্জাবের হিন্দী-বাক্‌নেওয়ালেদিগের পৃথক রাজ্য সৃষ্টি করা হয়; সেই ভারতে সর্ব্বত্র দেবভাষা হিসাবে হিন্দীর স্থান কি করিয়া হইতে পারে? ভাষার পার্থক্যই যদি সকল পার্থক্যের মধ্যে প্রবলতম হয়, তাহা হইলে উত্তর প্রদেশের ভাষাকে সকল প্রদেশের স্কন্ধে চাপাইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। শিক্ষা ও জগৎ সভ্যতার আদর্শ রক্ষার জন্য যদি কোন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে ভাষা বিশেষ করিয়া হিন্দী হইতে পারে না। যদি কনষ্টিটিউশন পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতকে টুকরা টুকরা করা যায়, তাহা হইলে সেই কনষ্টিটিউশন বদলাইয়া হিন্দীর বাধ্যতামূলক প্রচার বন্ধ করা অত্যাবশক। ভাষা যদি সকলকে শিখিতেই হয় তাহা হইলে কোনও একটা বিদেশী ভাষা ও তৎসঙ্গে একটা ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিলে (মাতৃভাষা শিক্ষা ইহার উপরে অবশ্য-শিক্ষণীয় থাকিবে) জগৎ ও ভারতের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয়। ভারতীয় ভাষা হিন্দীও হইতে পারে অথবা তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, মারাঠি, বাংলা বা অন্য কোন ভাষাও হইতে পারে। বিদেশের ভাষার মধ্যে জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রুশিয়ান, ইংরেজী, চীনা বা জাপানী ভাষা চলিতে পারে অথবা স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, আরবি কি ফারসিও গ্রাহ্য হইতে

পারে। যাহাই হউক বহু অর্থব্যয় করিয়া ভাষা শিক্ষা যদি করিতেই হয় তাহা হইলে হিন্দী শিক্ষার দ্বারা যে কাহারও কোন বিশেষ লাভ হইতে পারে না, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

ভাষার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য যদি একটি প্রদেশকে কাটিয়া দুইটি কি চারিটি প্রদেশে ভাগ বা সংযোগ করা যাইতে পারে; তাহা হইলে জোর করিয়া মাতৃভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষাই কাহাকেও শিখিতে বাধ্য করা উচিত নহে। পাঞ্জাবকে ধর্ম্মের জন্য দুই ভাগ করা হইয়াছিল এখন ভাষার জন্য ভারতীয় পাঞ্জাবকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইল। বোম্বাইএর দুই ভাষার সংঘাতে বোম্বাই দুই টুকরা হইয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে পরিণত হইল এবং পরে ভাষার জন্য আবার মহীশূরের উপরে খড়্গ চালনার ব্যবস্থা হইতে পারে মনে হইতেছে। ভারতের বিশেষভাবে সুগঠিত ভাষা বাংলার কিন্তু কোন ইজ্জত নাই। বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন পাটনার লোক এবং বিগত প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভোজপুরী হওয়াতে বাংলা ভাষা মাগধী-ভোজপুরী নক্সার হিন্দী ভাষার উপশাখা বলিয়া পরিচিত হইবে মনে হয়। নতুবা বাংলা হইতে কাটিয়া মানভূম (ধনবাদ), সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অংশ বিহারে জুড়িয়া রাখা হইয়াছে কেন? অনেক নির্লজ্জ বাঙ্গালী নিজেদের মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ কিছুমাত্র অপমানকর মনে করেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিচরণকারী পরমুখাপেক্ষী পরের অনুগ্রহের কাঙাল বিশিষ্ট ব্যক্তি কয়েকজনকে দেখা যায়। বাঙ্গালীর কিন্তু এই সকল মাতৃভূমির শত্রুদিগকে দমন করিয়া নিজ দেশ ও দেশবাসীর সম্মান রক্ষায় মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। ভাষাভিত্তিক বাংলা দেশ গঠিত হইলে বাঙ্গালীর আর্থিক অভাবও অনেকটা কমিয়া যাইবে; কারণ তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা প্রচার চেষ্টার মূল প্রেরণা আর্থিক। ধর্ম্ম ও ভাষার পিছনে পিছনে সিঁদকাটি হস্তে চোরের দল সর্ব্বদাই ধাবমান হইতে থাকে দেখা যায়। বাংলা আজ বহু খণ্ডে বিভক্ত। "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল; এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান!"

দেশপ্রেম, দেশভক্তি ও স্বার্থান্বেষণ

দেশপ্রেম ও দেশভক্তি অতি উচ্চস্তরের মনোভাব। পৃথিবীর ইতিহাসে দেশভক্তির প্রেরণায় যত শত লক্ষ লোকে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, এমনকি প্রাণ অবধি অকাতরে দিয়াছে; অপর কোন আদর্শের আকর্ষণে তাহার এক চতুর্থাংশ লোকও ঐ প্রকার সর্ব্বহারা হইতে রাজী হয় নাই। ইতিহাসে যুদ্ধের পর যুদ্ধে, বিপ্লবের পর বিপ্লবে, পরাজয়ের পর পরাজয়ে ও শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে যুগে যুগে, দেশে দেশে, মানুষ ক্রমাগতই মাতৃ-ভূমির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়া আসিয়াছে। দেশভক্তি ধর্ম্মপ্রেরণারই মত উন্মাদনার আবেগে মানুষকে নাচাইয়া তোলে। শুধু আরো বেশী ও সর্ব্বব্যাপিভাবে। ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান যদি একশত লোকে করিয়া থাকে তাহা হইলে দেশের জন্য মানুষ প্রাণ দেয় হাজারে হাজারে। কিন্তু এই যে ধর্ম্মের উন্মত্ত আবেগ, ইহার ধারাই বহিয়া চলিয়া ক্রমশঃ অপবিত্র ও ঘৃণ্য রূপ ধারণ করে। ধর্ম্ম পূজারী ও পুরোহিতের কবলে পড়িয়া বহুক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনার একটা উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। দোষ ধর্ম্মের নহে—প্রবঞ্চকের। দেশভক্তি ও দেশপ্রেমও তেমনি আত্মত্যাগের মহান আদর্শে জলন্ত উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রবঞ্চকদিগের স্বার্থসিদ্ধির নীচ পন্থা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে দেশবাসীর অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবঞ্চকগণ ধীরে ধীরে নিজ নিজ পাপ অভিলাষ সিদ্ধ করিয়া লইতে থাকে। দেশবাসী অসহায়ভাবে সকল অভাব, সকল দুঃখ ও সকল কষ্ট সহ্য করিয়া পড়িয়া মার খাইতে থাকে। তাহাদিগকে কে রক্ষা করিবে, কেহ ভাবিয়া পায় না। শুধু ভাবে কি উপায়ে সেই পাপ-আবর্ত্ত হইতে তাহারা বাহির হইবে। একটা পাপ হইতে বাঁচিতে গিয়া আর একটা কঠিনতর পাপের মধ্যে গিয়া পড়িবে না ত? অল্প কিছু লোকে বুঝিতে পারে আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বনই মুক্তির একমাত্র পথ। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যেমন অন্যে কাহাকেও ভগবানের নিকটে পৌছাইয়া দিতে পারে না, শুধু নিজের ধ্যান, নিজের সাধনা ও নিজের ভক্তি দিয়াই মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমে পরমাত্মার নিকটে যাইতে পারে; দেশপ্রেম ও দেশভক্তির ক্ষেত্রেও তেমনি গুরুবাদ কার্য্যকরী হয় না। দেশের উন্নততম আদর্শ উপলব্ধি করিতে হইলে দেশবাসী সর্ব্বজনেরই প্রাণপণ করিয়া ও সর্ব্বান্তঃকরণে দেশের মঙ্গল চেষ্টা করিতে হইবে। অপরকে নেতা সাজাইয়া খাড়া করিয়া দিয়া নিজেরা সমাজদ্রোহিতা করিয়া চলিলে

নেতাগণও ক্রমে ক্রমে সমাজদ্রোহিতার লজ্জা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িবেন। দেশবাসী যদি পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া বা পরস্পরের ক্ষতি করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে থাকেন, তাহা হইলে দেশনেতাগণও ঐ একই প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িবেন। অধর্ম্ম, দুর্নীতি, মিথ্যা ও মানবতাবিরুদ্ধ কার্য্য যদি অবাধে মানিয়া লওয়া হইতে থাকে, তাহা হইলে লোকসভা বা অপর কোন সভায় উচ্চ আদর্শমালা আবৃত্তি করিয়া বা করাইয়া, উন্নততর আদর্শে সমাজ গঠন করা কখনও সম্ভব হইবে না। যাহাতে সর্ব্ব মানবের উপকার, সাহায্য ও মঙ্গল হয় তাহাই করা মানব-ধর্ম্মের উচ্চতম অভিব্যক্তি। যাহাতে কোনও মানবের কোন ক্ষতি বা দুঃখ হয় তাহা না করাও সেই মানবতার অপর প্রকাশ। যাঁহারা সর্ব্বদা নিজ সুবিধা ও লাভের জন্য অপরের অসুবিধা ও ক্ষতি করিয়া দিতে কোনও লজ্জা বোধ করেন না; তাঁহারা কাহারও নিকট কোনও উচিত ও ন্যায্য ব্যবহার আশা করিতে পারেন না। সকল ক্ষেত্রে যদি ন্যায় ও ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রেই সুনীতি বা সমাজ সংরক্ষণ চেষ্টা জীবন্ত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। সর্ব্বজনের চিন্তা, ব্যবহার ও অনুভূতি সমাজে একটা কর্ম্মের ধারার আবহাওয়ার সৃজন করে। এই আবহাওয়া উত্তম হইলে মানুষের কর্ম্মও উন্নত হয়।

সুপারিশ, পক্ষপাতিত্ব ও ঘুষ খাওয়া

নেহরুর রাজত্বে ও তৎপূর্ব্বে কংগ্রেস দলে সুপারিশ ও পক্ষপাতিত্ব প্রবলবেগে সচল ছিল। কাহাকেও তোলা হইতেছে ও কাহারও হইতেছে পতন; শুধু পণ্ডিত বা মহাত্মার সৌহার্দ্দ্যের ফলে; এইভাবেই দল গঠিত হইয়াছে ও পরে রাজত্ব চলিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার সাহায্যের মূল্য দেওয়া এবং কৃতজ্ঞতাজাত উপঢৌকন দানও চলিতেছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে যে চারিত্রিক অবনতি সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া দেশের মানুষের জীবনযাত্রা বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার মূলে রহিয়াছে সুপারিশ, পক্ষপাতিত্ব, সাহায্য লাভের পরে কৃতজ্ঞতার মূল্যদান ও যেখানে অন্যায় কার্য্যের কর্ত্তার কোন নেতৃত্বের অধিকার নাই, সেখানে উৎকোচ গ্রহণ। অর্থাৎ সাধারণ অফিস-দফতরে বসিয়া যাঁহারা অন্যায়ভাবে ইহার প্রাপ্য উহাকে দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উৎকোচ গ্রহণ করেন। উৎকোচ শুধু নগদ টাকায় হয় না। খানা খাওয়াইয়া, বিবাহের সময় গহনা বা মৎস্য সরবরাহ করিয়া, পুত্র কিংবা শ্যালককে চাকুরি দিয়া, ভাইকে ব্যবসার সুবিধা করিয়া দিয়া ও আরও বহুবিধ উপায়ে ঘুষ দেওয়া চলিয়া থাকে। এইভাবে স্বাধীনতা পাইবার পরে কংগ্রেস ও বিরুদ্ধ দলের বহু রাষ্ট্রনেতার পরিবারের বহু লোকের নানান প্রকার সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে ও বহুলোকের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে প্রাপ্যের অনেক অধিক এবং অন্যায়ভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় লাভ করিয়া। নেতাগণ যে সর্ব্বদাই অন্যায় কাজ করেন অ[illegible] বা সুবিধা লাভের কারণে এ কথাও বলা চলে না। সুপারি[illegible] ও পক্ষপাতিত্ব দোষ একটা মানসিক অসুস্থতার মতই মানুষে[illegible] কর্ম্ম ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখে। সেই অবস্থ[illegible] প্রাপ্ত হইলে নেতা বা সাধারণ লোকে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞা[illegible] হারাইয়া বিবিধ উপায়ে নিজের সুবিধামত যাহা ইচ্ছা তাহা[illegible] করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে লোক দেখাইয়া নিজের কঠো[illegible] ন্যায় জ্ঞান কোন অল্প দোষী ব্যক্তির নিগ্রহে ব্যক্ত করা[illegible] একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহা দেখিয়া কেহ[illegible] ভুলিয়া যায় না যে দেশের শাসন ও কর্ম্মনিয়ন্ত্রণ প্রণালী প্রবলতম ধারা অন্যায়ের, অনধিকারের পাওনার ও অধর্ম্মে[illegible] দাবিদাওয়ার। এই অবস্থায় দেশের উন্নতি কি করি[illegible] সম্ভব হইতে পারে? যে দেশে কাজ করিবার ইচ্[illegible] থাকিলেও কাজের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু কাজ না করি[illegible] লাভের সুবিধা রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর ভিতরে যথেষ্ট রহিয়াছে, [illegible] দেশের সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ নিরাশার গভীরে ডুবিয়া যায়[illegible] সেই অবস্থায় সমাজতন্ত্র বা সমষ্টিগত অধিকারের [illegible] আওড়াইলেও মানুষের অভাব যায় না ও শাসন পদ্ধতি[illegible] বিশ্বাস ফিরিয়া আসে না। নৈতিক সংস্কৃতি ব্যতীত অ[illegible] উপায়ে এই সামাজিক অসুস্থতার নিবৃত্তি হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে মহামানবের জন্ম হয় দুর্লভ শুভক্ষণে। প্রতিভার বহুমুখী অভিব্যক্তি, চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং কর্ম্মশক্তি ও মহত্বের একত্র সমাবেশ মহামানবের মধ্যেই দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও ক্ষমতার বিকাশ অনেক লোকের মধ্যে দেখা যাইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বগুণাধার হয় অতি অল্প লোকেই। ভারত দরিদ্র ও অল্পশিক্ষিত দেশ হইলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে কখনও পৃথিবীর অপরাপর দেশের পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। অপর দেশের তুলনায় ভারতে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের আবির্ভাব সংখ্যায় অল্প হয় নাই। সঙ্গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, নৃত্য, নাট্য, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন, চিকিৎসা, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি মানব-সভ্যতার যে কোন শাখা-প্রশাখাতেই আমরা যাই না কেন, ভারতের মানব সর্ব্বত্রই নিজ প্রতিভা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির যে সকল নিদর্শন বহু যুগ হইতে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতের মানুষ সকল অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য ও সঙ্কটের মধ্যে থাকিয়াও যুগে যুগে নিজ মনের উন্নত ভাব ও আবেগের পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে। ব্যাধিগ্রস্ত মানসিক অবস্থা উপস্থিত হইলেও তাহা কদাপি স্থায়ী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ বিগত কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারত সততই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমকে প্রাণে পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত রাখিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান কালে মানবজীবনে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হওয়াতে মানুষ নব নব প্রচেষ্টায় সেই সকলকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া লইয়াছে এবং সেই কারণে ইতিহাস, সভ্যতার ক্রমবিকাশ, সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও বিভিন্ন বিজ্ঞানে মানব মন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই যে বহু বিষয়ের ভিতর দিয়া মানব-প্রতিভার নানা পথে বিচিত্র গতি ও বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে ইহা হইতে সহজেই বোধগম্য হয় যে, এক মানবের পক্ষে বহুক্ষেত্রে নিজের জ্ঞান, কৃষ্টি ও সৃজন ক্ষমতা দেখান কত কঠিন, এবং যদি কেহ সেইরূপ বহুমুখী প্রতিভা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে মহামানব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

আজ পঁচিশ বৎসর হইল মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অভাবে আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবনের কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাহার প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। যৌবনে তিনি একই সময়ে বিচিত্র কবিতামালা গাঁথিয়া বাংলা ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিলেন এবং কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের সহায়তার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপন করিতেছিলেন। কয়েক সহস্র সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করা, নাট্যকার হইয়া অভিনয়ে অপরূপ ক্ষমতা দেখান, গীতিনাট্যের সহিত নৃত্যকলার সমন্বয়ে নৃত্য-গীতি-নাট্যের উদ্ভাবনা, ভাষার কশাঘাতে সুষুপ্ত জাতিকে জাগ্রত করিয়া কঠোর কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত করা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও দার্শনিক নিবন্ধ রচনা, ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করা, শিক্ষানীতি চর্চ্চা ও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার আয়োজন করিয়া প্রজ্ঞার আলোকে সকল বিদ্যার পথ আলোকিত করিয়া দেখান; শ্রীনিকেতনে দরিদ্র দেশবাসীকে জীবন আনন্দময় ও অভাবহীন করিয়া গড়িয়া তুলিতে শিখান; পল্লী সংস্কার ও কুটির-শিল্প প্রসার ব্যবস্থা করা ও মানব-জীবনে ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অসামান্য প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সকল দেশের চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোকেরা একথা মিলিতভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ অসামান্য লোক ও সর্ব্বগুণাধার। নূতন ধরনের গৃহ নির্ম্মাণ ও তাহা বিচিত্র আকৃতির ও নূতন শিল্প-কৌশলে গঠিত আসবাবে সজ্জিত করা, উদ্যানের পরিকল্পনা ও জীবনকে সুন্দর পরিবেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, তাঁহার পক্ষে সহজই ছিল কারণ তাঁহার মনের স্পর্শে ভাব ও বস্তু উভয়ই নবরূপ ধারণ করিয়া সুকৃষ্টি ও সুরুচির আলোক বিকিরণ করিত। পরিণত বয়সে তিনি নূতন প্রেরণায় চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের সংখ্যা ২॥

হাজারের কম হইবে না। সেই সকল চিত্রে যে অদ্ভুত কল্পনা ও ছন্দবদ্ধভাবে আকার ও বর্ণের একত্র সমাবেশ দেখা যায় তাহা অনন্যসাধারণ চিত্রাঙ্কন প্রতিভার পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন সৃজন শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার রচনার মধ্যেই তাহা পাওয়া সম্ভব। মানুষের অন্তরের অনুভূতি ও ভাবের আবেগের বিচিত্র অভিব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাহার কাব্যে প্রতিফলিত দেখা যায়। মনের ঐশ্বর্য্যের অপরিমেয় ভাণ্ডার খুলিয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করিলে। এই কারণে তাঁহার নিজের রচনাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া দেখান যাইতেছে যে, সেই মহামানবের মন কত সুদূরে, কত গভীরে, কত কল্পনাতীত পথে অবাধে বিচরণ-সক্ষম ছিল। বাংলার একান্ত নিজের কথা তিনি সহজবোধ্য ভাষায় যেমন বলিতে পারিয়াছেন আর কেহ তাহা পারে নাই। বাংলার গ্রামের বর্ণনা ও বাংলার সাধারণ লোকের প্রাণের কথা রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া পাঠকসমাজকে দিয়া গিয়াছেন তাহা বহুযুগাবধি বাংলার অতীতের ছবি ও মনোভাবের স্বীকারোক্তি বলিয়া সকলের নিকট রক্ষিত থাকিবে। বালিকা বধূকে গ্রাম হইতে সহরে পাঠাইয়া খোলা মাঠ ও তরুছায়ার পরিবেষ্টন ত্যাগ করিয়া ইটের দেওয়াল ও ছাদে আটকাইয়া রাখিলে তাহার যে মনের বেদনা তাহা কবির ভাষায় সর্ব্বকালের জন্য লিখিত হইয়া রহিয়াছে। বধূ বলিতেছে—

কলসী লয়ে কাঁখে, পথ সে বাঁকা—
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালোজলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।

... ...

পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা

... ...

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।

মৃদু ও কোমলকে ভুলিয়া কঠোর ও কঠিনকে ধরিলে ভাষার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য আকার ধারণ করে—

হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে ত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদ গর্জ্জনে
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে চূর্ণ হয়ে যায় টুটে
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল—

সরল সহজ বর্ণনা ও গল্প বলার মত সুন্দর ভাষায় কাব্য রচনাতেও কবি অশেষ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। গৃহস্থের ঘরের অভাব কবির গৃহেও দেখা দেয়, তাই কবির স্ত্রী বলিতেছেন :

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড ছাই ও ভস্ম :
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধ'রে এ কী ছেলেখেলা,
ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।

কবি তখন পত্নীর অনুরোধে রাজদরবারে গমন করিয়া অবস্থার উন্নতি চেষ্টা করিলেন। সেখানে বহু লোক রাজার অনুগ্রহ আহরণ চেষ্টা করিতেছেন। বৈয়াকরণ "বলি অঙ্কিত শিথিল চর্ম্ম, প্রখর মূর্ত্তি অগ্নিশর্ম্ম, ছাত্র মরে আতঙ্কে।"

কোন দিকে কোন লক্ষ্য না করে
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ করে,
মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে।

কবির যখন রাজার সম্মুখীন হইবার সুযোগ হইল তখন তিনি করিলেন প্রথমে বাণী বন্দনা। "প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে প্রসন্ন মুখ ছবি......"

তোমার হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহ কোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।

... ...

সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি,
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী
সুরের খাদ্যে জানো তো মা বাণী
নরের মিটে না ক্ষুধা
যা হবার হবে সেকথা ভাবি না ;
মা গো একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী
অমৃত-উৎস ধারা।
... ...
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদি কালের পান্থ যাহারা
তব সংগীত স্রোতে।

তারপরে কবি মানব-জীবনের ঘটনা, আবেগ ও ভাবের ধারার ইতিহাস কাব্যে বর্ণনা করিয়া চলিলেন। সভার সকলে স্তব্ধ ও মুগ্ধভাবে সেই কাব্যরসধারায় সিঞ্চিত হইতে লাগিলেন ও পরে—

পুলকিত রাজা, আঁখি ছল ছল—
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল,
দুবাহু বাড়ায়ে পরাণ উতল
কবিরে লইলা বুকে ;

রাজা কবিকে তিনি কি চাহেন জিজ্ঞাসা করিলে কবি বলিলেন —

"কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।"

ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাস ও পুরাণের উপাখ্যান-মালা কবির প্রেরণার রঙে রঞ্জিত হইয়া নব নব রূপে কতবার কতভাবে বাংলার পাঠক-সমাজের নিকট আসিয়াছে তাহার পূর্ণ পরিচয় অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নহে। বহু ভিন্ন ভিন্ন মত ও আদর্শের পরিচয়ও তাঁহার রচনায় আমরা পাইয়াছি।

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ মর্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী,
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্ব-মাঝে, মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ মন্দির তলে বসি একাকিনী
অন্তর বেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা সিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুম কপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী........ ...

কবির লেখনীর ইন্দ্রজালে দর্শন কাব্যের অঞ্চল ধরিয়া মানবপ্রাণের গভীরে প্রবেশ করিয়া নিজরূপ অঙ্কিত করিয়া আসিতে সক্ষম হয়। অবাস্তবের ভিতরে বাস্তব কেমন করিয়া জন্মলাভ করে ?

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে,
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।।

সৃষ্টির আরম্ভের বর্ণনা। আবার যদি পুনর্জন্মের কথা ওঠে তাহাও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ঘটিতে পারে। কোন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের ফলে নহে।

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধূলার 'পরে করি খেলা
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ন নীরে।।

সৃষ্টির মধ্যে যে প্রাণশক্তি তাহা বিভিন্নরূপে আবহমান

কাল হইতে ব্যক্ত হইতেছে। মানবজীবনে তাহার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরণীর শিরায় শিরায় সেই প্রাণশক্তি প্রবাহিত।

তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমন শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর। তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ। কুসুম মুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতা তৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।

মানুষ সৃষ্টিকর্ত্তার অনুকরণে, সৃজন গঠন ও কর্ম্মের আবেগে যাহা নির্ম্মাণ করে ও নিজ আকাঙ্ক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া যে ভাবে জীবনের সুন্দরতম দান হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, তাহা কবি নিজ অভিজ্ঞতায় অনুভব করিয়া বলেন

আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্ব্ব মাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক-সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গিতে·········

························

······ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—
যুগযুগান্তের মহা-মৃত্তিকা বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে। করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?

প্রকৃতির বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া মানুষ বৃহৎ বৃহৎ সহর নির্ম্মাণ করে। কবি তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তার দান মনে করেন না। নগরের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার দেখা যায় তাঁহার "নগর সংগীতে"—

ওই রে নগরী, জনতারণ্য শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য কত কোলাহল কাকলি।
কত-না অর্থ কত অনর্থ আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত্ত উঠিছে শূন্য আকুলি।

তাহা হইলে মানুষ নগরে যায় কেন? কোন্ মোহ, কোন্ মাদকতাজাত সেই নগরবাসের আকাঙ্ক্ষা?

হেরি এ বিপুল দহনরঙ্গ আকুল হৃদয় যেন পতঙ্গ
ঢালিবারে চাহে আপন অঙ্গ— কাটিবারে চাহে ধমনী।
হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য উছলি উছলি পড়িছে সদ্য,
আমি তাহা পান করিব অদ্য বিস্মৃত হব আপনা।

কবির মনের অনন্ত প্রসার। তাহার মধ্যেই নিপুণ হস্তে বাছাইকরা সুন্দর সুললিত মানব-মনে ও সৃষ্টির ভিতরে উন্নত, মহান, চমকপ্রদ, প্রাণবান, ও ভাবসমৃদ্ধ যাহা কিছু তাহা সাজান হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে যাহা পাওয়া যায় নাই, কল্পনা ও ধ্যান-উদ্ভাবিত আকারে তাহা আসিয়াছে। কবির মন ভাব, রস ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসার গবেষণাগার! অমৃতত্ব লাভের উপায় অনুসন্ধান করিয়াছেন তিনি কত শত পথে কত ভাবে গমনাগমন করিয়া। প্রথমে আহ্বা[illegible] করিয়া ডাকিলেন "আজন্ম সাধন, ধন সুন্দরী···কবিত কল্পনালতা"কে। তাঁকে অনুরোধ:

যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা। তরল অনন্দভরে
নির্ঝরের মতো—অর্দ্ধেক রজনী ধরি
কত-না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মুগ্ধ প্রাণ
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও তাই রব, প্রিয়া।

কিন্তু কাব্যরস তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে পূর্ণ প্রক[illegible] করিতে পারে না। তাই বারে বারে অজানা, অচে[illegible] অনন্তের পথে বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টা। চেত[illegible] অনুভূতি, চিন্তা ও মানস প্রয়াসের উপরে আর কিছু আ[illegible] তাহার স্পর্শ পাইবার আশায়।

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশা।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু, বিশ্রাম জানে না কভু,
আশা গেছে যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।

························

সেই মতো সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর ॥

ভারত সভ্যতার ইতিহাসে যে সকল ঘটনা এক একটি বিশেষ অবলম্বনের মত, সেইগুলি কবির প্রাণে বিশেষ ভাবের আবেগ সৃজন করিত। শা-জাহান তাজমহল নির্মাণ করান তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য। কবি সেই প্রেমের মূর্ত্তরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিলেন—

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।

শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল ॥

মমতাজ মহলকে পৃথিবীর মানুষ চিরকাল মনে রাখিবে শা-জাহানের এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। কবি বলিলেন—

চেয়েছিলে করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।

কবি তাঁহার কবিতায় শা-জাহানের প্রেমের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিয়া গিয়াছেন। তাজমহলের নির্ম্মাণ প্রেরণার কাহিনী কবির ভাষায় যেভাবে কথিত হইয়াছে তাহাও অতুলনীয়। পৃথিবীতে কত মন্দির, কত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু তাজের কল্পনাতে শা-জাহানের যে ভাবের আবেগ রহিয়াছে তাহাই ঐ সমাধি-মন্দিরকে একটি চিরবহমান প্রেমের উৎসে পরিণত করিয়াছে।

যে সকল মহা মহা প্রশ্নের কোন উত্তর কেহ দিতে পারে না, তাহার অর্থ বিচার চেষ্টা কবির নিকট বড়ই হাস্যকর। হিং টিং ছট্ অজানার ব্যঙ্গ নাম। তাঁহার অর্থ কবির ব্যঙ্গের ভাষায় আরও অর্থহীন।

আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আনব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'হিং টিং ছট্'।

রূপকের আশ্রয়ে সত্যের নিকটে আসা যায় কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। প্রশ্ন যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যায় শুধু তাহার নিকটতর ঘনিষ্ঠতার ফলে পূর্ণ পরিচিতির তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া যায়। কত লিখিয়া গিয়াছেন কবি কিন্তু দীর্ঘ জীবনের শেষেও তাঁহার সে তৃষ্ণা মেটে নাই।

কানে কানে ডেকেছিল মোরে
অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধ'রে
সচকিতে,
দেখে তবু পাইনি দেখিতে ॥
অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগালো হরষ,
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্ত্তেই
'তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন ঘাট হতে
এসেছ আলোতে।'
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ ;
ইঙ্গিতে জানিয়েছিল, 'আমি তারি দূত ;
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।'

ক্রমে অজানা নিকট হইতে আরও নিকটে আসিয়া যায়। সন্দেহ থাকে না যে শীঘ্রই 'পরীর দেশের বন্ধ দুয়ারে' করাঘাত করা সম্ভব হবে। কিন্তু মানব-জীবনের শত

বন্ধন ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ এক নূতন পথে যাওয়া কি সম্ভব হইবে; না পুরাতনই নূতন আরও নূতন হইবে চির-পুরাতন। আবার সেই প্রশ্ন যাহার উত্তর নাই। মৃত্যু নিশ্চয় কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি সে থাকে এত দূরে যে তাহার আসা মনে হয় অসম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর স্বরূপ ক্রমশঃ নিজেকে প্রকাশ করিয়া পূর্ণ পরিচয়ের পথ খুলিয়া দিতেছে।

নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে।

অমর কে? কোন ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষ নহে।

জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল।
বিজয় রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।
শূন্য পথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
... ...
প্রবল ইংরেজ;
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা,
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না॥

তাহা হইলে কে থাকিবে? মানবের মানবতা কাহার হস্তে চিররক্ষিত থাকিবে? তাহারাই থাকিবে যাহাদিগের যশ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি কিংবা অন্য বৃহদাকার আকাঙ্ক্ষা নাই।

বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
... ...
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
... ...
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে॥

উহারাই মানবতার চির অধিকারী। উহারাই থাকিবে। আর সকলে ক্রমে ক্রমে স্মৃতির আলোক-উদ্ভাসিত মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া বিস্মৃতির দূরত্বে নিজেদের মনুষ্যরূপ হারাইয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহা হইলে ব্যক্তির আত্মা, ব্যক্তির চেতনা, ব্যক্তির বিশিষ্টতার অভিব্যক্তি, ইহার কি কিছুই থাকিবে না? থাকিবে নিশ্চয় কিন্তু অপর আকারে, অন্য কোন অজানা প্রাণবানের স্বরে ও চরিত্রে: সেই-খানেই ব্যক্তির নিজরূপ সত্যরূপে অবস্থিত হইবে। জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সত্তা তাহার স্বরূপ জানিতে পারে না, কারণ—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে
... ...
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

সেই শান্তির মধ্যেই ব্যক্তির অমর আত্মা নূতন পরিবেশে নূতন গুণের আধার হইয়া পরিপূর্ণ চৈতন্যে অবস্থিত হইবে। সর্ব্বাত্মা সেই পরিবেশে একাত্মা। বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও আত্মবোধ থাকিতে পারে। কেমন করিয়া ইহার উত্তর আমরা জানি না। আজ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পচিশ বৎসর পরে আমরা তাঁহার মহামানবত স্মরণ করিতেছি। শুধু বাঙ্গালী নহে, বিশ্ববাসী তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে সর্ব্বগুণাধা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পূ অভিব্যক্তিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাব্যে, সাহিত্যে

দর্শনে, রাষ্ট্রনীতিতে; অর্থনীতি, দেশাত্মবোধ, ন্যায়জ্ঞান ও অপরূপ কল্পনাশক্তির তিনি বিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় বিচিত্র চরিত্র মহাশক্তিশালী পুরুষ। তাঁহাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিলে মানব-মন উন্নততর হয়। রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য প্রতিভা কোনো যুগে কোনো দেশে দেখা যায় নাই। দার্শনিক অনেক জন্মিয়াছেন, কবিত্ব শক্তিও অনেকের ছিল। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিয়াছেন বহু গুণী লোকে। ছবিও আঁকিয়াছেন, সঙ্গীতও রচনা করিয়াছেন বহু শত চিত্রকর ও সঙ্গীতকার। শক্তিশালী অভিনেতা, নৃত্যকলাবিদ প্রভৃতিরও অভাব নাই। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, প্রাচীন শাস্ত্র ও মতের ব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও মানব জীবনের অঙ্গকে অলঙ্কৃত শোভিত ও সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা বহু কর্ম্মীর জীবনেই দেখা গিয়াছে। কিন্তু একই নরদেহে এমন প্রাণশক্তি কি কখনও আবির্ভূত হইয়াছে যাহা শত হস্ত বাড়াইয়া মানব-জীবনের সকল অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া নিজ গৌরবে সকলকে সুন্দর ও উন্নত করিয়া গিয়াছে? এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমরা সেই অখণ্ড শক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাইয়াছি। তাই আজ সেই মহাপুরুষকে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তার অত্যাশ্চর্য্য সৃজন-ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছি।

মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যে আত্মহারা ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয় সে মানুষ নামের অযোগ্য; যে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, সে উচ্চতর শ্রেণীর অধিকারী; যে গত্যন্তর নাই জানিয়া স্থির চিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করে, সে মানুষ নামকে কলঙ্কিত করে না। কিন্তু মানুষের মত মানুষ তিনি যিনি মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, নিরুদ্বেগ থাকেন, এবং আপনার কথা না ভাবিয়া অপরের প্রাণরক্ষায় জন্যই ব্যস্ত হন।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

স্মৃতিশাস্ত্রে সেকালের বিচারব্যবস্থা

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল রাজতন্ত্রশাসিত দেশ। সেখানে রাজাই ছিলেন দেশের সর্বময় প্রভু। রাজ্য-শাসন বিষয়ে তাঁর নির্দেশ ছিল অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয়। মন্ত্রী, অমাত্য ও ব্রাহ্মণাদি পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি রাজ্য শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। প্রজাদের কাছ থেকে রাজা কর গ্রহণ করতেন, বিনিময়ে তিনি প্রজাদের শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করে দিতেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ছিল রাজার মুখ্য কর্তব্য। তা ছাড়া সমাজে যে সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হ'ত সেগুলির ধর্মাধর্ম বিচার করে মীমাংসা করবার ভারও ছিল রাজার উপর। রাজা কিন্তু নিজের ইচ্ছামত বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রকারেরা যে সমস্ত নির্দেশ দিয়ে গেছেন সেগুলি মেনে নিয়েই তাঁকে বিচারকার্য পরিচালনা করতে হ'ত। প্রাচীন ভারতের বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে এবং বিচারকালে রাজার কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে এবং রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে মনুসংহিতার অনুশাসনই যে প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হ'ত তার প্রমাণ বিভিন্ন কাব্য-নাটকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বিচারকার্যে রাজা সর্বদাই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি যখন বিচারসভায় আসীন হতেন তখন তাঁর চারিদিকে বেদবিদ্যা-পারদর্শী ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রণা-কুশল অমাত্যগণ উপস্থিত থাকতেন। মহাভারতে নির্দেশ আছে—অর্থি-প্রত্যর্থীদের বিচারপ্রার্থনা শোনবার জন্ত রাজা সবসময় সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদের নিযুক্ত করবেন। কারণ তাঁদের দ্বারাই রাজ্য সুরক্ষিত থাকে।

"শ্রোতুঞ্চৈব ন্যসেদ্রাজন্ প্রাজ্ঞান্ সর্বার্থদর্শিনঃ।
ব্যবহারেষু সততং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্।"

[মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৬৯ অধ্যায়]

বিচারসভায় অবস্থানকালে বিচারের প্রথম পর্যায় অমাত্যরাই নিষ্পন্ন করতেন। অবস্থার জটিলতা দেখা দিলে রাজা নিজে বিচারভার গ্রহণ করতেন। অথবা রাজা সরাসরিও বিচার করতে পারতেন। কোনও অনিবার্য কারণবশতঃ রাজা যদি বিচারের কাজ নিজে পরিদর্শন করতে সমর্থ না হতেন তবে কোনও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে সাময়িকভাবে তাঁর পদে অভিষিক্ত করতেন।

"যদা স্বয়ং ন কুর্যাৎ তু নৃপতিঃ কার্যদর্শনম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্যদর্শনে॥

[মনু, অধ্যায় ৮]

সেই ব্রাহ্মণ তিনজন ব্রাহ্মণসভ্যের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। যে সভায় এইরকম তিনজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের সাহায্যে রাজপ্রতিনিধি কোনও কুশলী ব্রাহ্মণ রাজকার্য পরিচালনা করেন তাকে মনুসংহিতায় 'ব্রহ্মসভা' বলা হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কয়েকজন পক্ষপাতশূন্য বণিক্‌ও রাজসভাসদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন।

রাজার সামনে যে সমস্ত বিচার্য বিষয়ের উপস্থাপনা হ'ত তাকে মনু আঠারো ভাগে ভাগ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে মামলা-মোকদ্দমা সাধারণতঃ এই সকল বিষয় নিয়ে হ'ত। যেমন (১) ঋণাদান (ঋণের টাকা আদায় করা), (২) নিক্ষেপ (কারো কাছে গচ্ছিত দ্রব্যাদির উদ্ধার করা), (৩) অস্বামিবিক্রয় (নিজের অধিকার-বহির্ভূত দ্রব্য অন্যের কাছে বিক্রয় করা), (৪) সম্ভূয়সমুত্থান (অংশীদারদের সঙ্গে মিলে বাণিজ্যযাত্রা প্রভৃতি), (৫) দত্তাপ্রদানিক (কাউকে কোন জিনিষ দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া), (৬) বেতনাদান (বেতন, মজুরি প্রভৃতির আদায়), (৭) সংবিদ্ব্যতিক্রম (কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থার লঙ্ঘন), (৮) ক্রয়বিক্রয়ানুশয় (ক্রয়বিক্রয়-সম্বন্ধীয় বিবাদ), (৯) স্বামিপালবিবাদ (প্রভু ও পশুপালকদের মধ্যে কলহ), (১০) সীমাবিবাদ (ভূমির সীমাসম্বন্ধীয় বিবাদ), (১১) বাক্‌পারুষ্য (গালাগালি), (১২) দণ্ডপারুষ্য (মারামারি), (১৩) স্তেয় (চৌর্যবৃত্তি), (১৪) সাহস (জোর করে সম্পদ্ প্রভৃতি লুট করা), (১৫) স্ত্রীসংগ্রহণ (স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষের সম্পর্ক), (১৬) স্ত্রীপুরুষ ধর্মবিভাগ (পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার নিয়ে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কলহ), (১৭) দ্যূত (পাশা খেলা), (১৮) সমা (পণ রেখে পশুপাখীর যুদ্ধ)।

[মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়]

মোটামুটি এই আঠারটি বিবাদের বিষয় সম্বন্ধেই সেকালে রাজার ধর্মসভায় বিচার করা হত।

বিচারসভায় কোনও নীচবৃত্তিসম্পন্ন ও অশিক্ষিত ব্রাহ্মণকে রাজপ্রতিনিধিরূপে নিয়োগ করার নিয়ম ছিল না। কোনও শূদ্রজাতীয় লোক যদি সর্বগুণসম্পন্ন ও ধর্মজ্ঞ হতেন তা হ'লেও রাজসভায় তার কোনও অধিকার থাকত না। এ যুগে জাতিভেদ প্রথার কঠোর অনুশাসনের দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হ'ত। তাই রাজসভায় কোন শূদ্রজাতীয় লোক রাজার সাহায্যকারী হ'লে রাজা লোকসমাজে নিন্দাভাজন হতেন। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্মপ্রবক্তা নৃপতেঃ নতু শূদ্রঃ কথঞ্চন॥ (মনু, ৮)

রাজা বিচারোচিত বেশভূষায় দেহ আচ্ছাদিত করে একাগ্রচিত্তে দিক্‌পালগণকে প্রণাম নিবেদন করে বিচারের কার্য আরম্ভ করতেন। বিচারকার্য পরিচালনার সময় রাজা সব সময় ধর্মকে আশ্রয় করতেন। মনু বলেছেন—বরং সভায় না যাওয়াও ভাল, কিন্তু সভায় উপস্থিতকালে সব সময় সত্য কথা বলা উচিত। সভায় উপস্থিত থেকে মৌনতা অবলম্বন করলে বা মিথ্যা কথা বললে রাজাকে পাপী হ'তে হয়।—

"সভাং ন বা প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বা সমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী॥"
(মনু, ৮ঃ ১৩)

ধর্ম ও অধর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই ক্রমানুসারে বিচারপ্রার্থীর আবেদন বিবেচনা করতেন। রাজার নিয়োজিত মন্ত্রী সভার প্রাথমিক কাজগুলি করতেন। বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের মধ্যে কোনও একজনের প্রতি যদি মন্ত্রী পক্ষপাতিত্ব করেন তবে মন্ত্রীকৃত এই অপরাধ রাজাকেও স্পর্শ করে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় উল্লিখিত আছে যে, রাজার কোনও প্রতিনিধি যদি অন্যায়ভাবে বিচার করেন, তবে অপরাধী ব্যক্তির যে শাস্তিবিধান হবে রাজা রাজপ্রতিনিধির প্রতি তার চেয়ে দ্বিগুণ বেশী দণ্ডবিধান করবেন। গৌতমসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে শাস্ত্রকার বলেছেন—"যদি বিচারকার্যে কোন রকম সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে বেদবিদ্যানিপুণ ব্রাহ্মণগণের মত নিয়ে সন্দেহের নিরসন করবেন। কারণ এতেই রাজার মঙ্গল।

মনুও নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাজা এবং রাজকর্মচারীগণের একেবারে নির্লোভ হওয়া উচিত। বিচারাসনে আসীন হয়ে বিচারপ্রার্থী লোকেদের বাহ্য চিহ্ন লক্ষ্য করে রাজা তাদের মনোগত ভাব জানবার চেষ্টা করবেন। কারণ লোকের আকার, ইংগিত, গতি, কাজ, আলাপ-আলোচনা, চোখ এবং মুখবিকারের দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানা সম্ভব।—

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্ত্র বিকারৈশ্চ গৃহ্যতে অন্তর্গতং মনঃ॥ (মনু)

বিচার পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। অথচ বিনা ব্যয়েও বিচার সম্ভব নয়। তাই অপরাধী ব্যক্তিদের যে অর্থদণ্ড হ'ত তার থেকে এই ব্যয় সংগৃহীত হ'ত। "অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ অপলাপ করিলে পর বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি, বাদীর কথিত ধন বাদীকে এবং তত্তুল্য ধন রাজদণ্ড দিবে। আর যদি বাদী উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী নিজ উল্লিখিত দাবিকৃত ধনের দ্বিগুণ ধন রাজদণ্ড দিবে।"—

"নিহ্নবে ভাবিতোদদ্যাৎ ধনং রাজ্ঞে চ তৎসমম্।
মিথ্যাভিযোগী দ্বিগুণমভিযোগাদ্ধনং হরেৎ॥
(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা : ২য় অধ্যায়)

মনু অধার্মিক ব্যক্তিকে তিন রকমে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নির্দেশ করেছেন। যথা—(১) নিরোধ অর্থাৎ কারাগারে নিক্ষেপ, (২) বন্ধন অর্থাৎ শৃঙ্খল দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখা এবং (৩) শরীরের অঙ্গচ্ছেদ রূপ নানাপ্রকার শারীরিক দণ্ড ও হত্যা।

"অধার্মিকং ত্রিভির্ন্যায়ৈর্নিগৃহ্ণীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
নিরোধনেন বন্ধেন বিবিধেন বধেন চ॥ (মনু, ৮)

শাসনব্যাপারে মনু প্রভৃতি ঋষিরা যে বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিতেন, রাজা সেই অনুসারে কাজ করতেন। একই অপরাধে সাধারণ লোকের যে দণ্ড হ'ত, রাজার তা থেকে সহস্রগুণ বেশী দণ্ড বিহিত ছিল। মনু বলেছেন—

'কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥'
(মনু, ৮.৩৩৬)

অর্থাৎ যে অপরাধে সাধারণ লোকের একপণ দণ্ড হবে, রাজা নিজে যদি সেই অপরাধ করেন, তবে তাঁকে এক হাজার পণ দণ্ড দিতে হবে। এই হ'ল সাধারণ ব্যবস্থা।

যে কোন জাতীয় লোকের সম্পত্তি অপহৃত হোক্ না কেন, রাজা অপহরণকারীর কাছ থেকে ঐ পরিমাণ ধন

পেলে তা প্রথমোক্ত ধনাধিকারীকে ফিরিয়ে দিতেন। আর যদি অপহরণকারীর কাছ থেকে ঐ ধন পাওয়া না যায় তবে রাজা নিজের ধনাগার থেকে স্বত্বাধিকারীকে উপযুক্ত অর্থ দান করতেন—

'চৌরহৃতং ধনমবাপ্য সর্বমেব সর্ববর্ণেভ্যো দদ্যাৎ।
অনবাপ্য চ স্বকোশাদেব দদ্যাৎ॥'

(বিষ্ণুসংহিতা, ৩ : ৪৫)

মনু বলেছেন - অপহরণকারীর কাছ থেকে প্রাপ্য ধন যদি রাজা স্বত্বাধিকারীকে প্রত্যর্পণ না করেন তবে চৌর্যাপরাধের সমস্ত পাপ রাজার উপর পড়ে।

কয়েক শ্রেণীর লোকের উপস্থাপিত বিচার অসিদ্ধ ছিল। এঁরা হলেন—মত্ত, উন্মত্ত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত ইত্যাদি প্রকারের অপরিণত-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ।—

'মত্তো
অসম্বদ্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি॥'

(যাজ্ঞবল্ক্য, ২ : ৩১)

রাজা বিচারকার্যে যে সমস্ত অমাত্যকে নিয়োগ করতেন, নিপুণ গুপ্তচর নিয়োগ করে তাদের আচরণ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হতেন। এই সমস্ত বিচারকদের মধ্যে যাঁরা সৎ বলে বিবেচিত হতেন তাঁরা মর্যাদা অনুযায়ী সম্মানিত হতেন, এবং যাঁরা অসাধু বলে প্রতিপন্ন হতেন, তাঁরা নিজ নিজ অপরাধ অনুসারে দণ্ডিত হতেন। যে সমস্ত বিচারক অসাধু উপায়ে উৎকোচ গ্রহণ করতেন, রাজা তাঁদের সর্বস্ব গ্রহণ করে তাঁদের রাজ্য থেকে নির্বাসিত করতেন। "উৎকোচজীবিনো দ্রব্যহীনান্ কৃত্বা প্রবাসয়েৎ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

রাজার কাছে বিচারে যারা অপরাধী প্রমাণিত হ'ত তাদের জন্য নানারকমের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই শাস্তির ব্যবস্থাকে শাস্ত্রকারেরা দণ্ড আখ্যা দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। যেমন, ঋণ গ্রহণ করে যদি তা ফিরিয়ে না দেওয়া হ'ত তবে রাজা অধমর্ণকে পাঁচপণ দণ্ডে দণ্ডিত করতেন। আর অধমর্ণ যদি ঋণ গ্রহণ করেও তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করত এবং উত্তমর্ণ যদি উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দ্বারা অধমর্ণের মিথ্যা কথা প্রমাণিত করতে পারতেন তবে রাজা অধমর্ণকে একশ পণ দণ্ড ব্যবস্থা করতেন।

গচ্ছিত দ্রব্যবিষয়ক বিচার-বিধিতে বলা হয়েছে যে, গচ্ছিত দ্রব্য যে ব্যক্তি ফিরিয়ে না দেয়, আর যে কোন কিছু গচ্ছিত না করেও দাবি করে, রাজা ঐ দু' শ্রেণীর লোককেই নিজের ইচ্ছামত শাস্তি দেবেন। অথবা গচ্ছিত দ্রব্য অনুযায়ী অর্থদণ্ড করবেন।

বেতন নিয়ে কোনও ভৃত্য যদি অঙ্গীকৃত কাজ না করে, তবে বেতনের দ্বিগুণ অর্থ স্বামীকে দিতে হ'ত। যদি কোনও ব্যক্তি বেতন নির্দিষ্ট না করে ভৃত্যকে দিয়ে কাজ করাতেন তা হ'লে স্বামীর লব্ধধনের দশভাগের একভাগ ভৃত্যকে দিতে হ'ত। আর ভৃত্য যদি তার কাজের দ্বারা স্বামীর অধিক লাভ করিয়ে দিত তা হ'লে ভৃত্যকে তার বেতন ছাড়াও কিছু অর্থ স্বামীকে দিতে হ'ত। তা না করলে রাজা শাস্তির বিশেষ ব্যবস্থা করতেন।

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ২ অধ্যায় ১৯৭-১৯৯)

বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারের বিচার-কার্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। কোনও লোক তার কন্যার কোনও ত্রুটি গোপন করে সম্প্রদান করলে রাজা তার শাস্তিরূপে ছিয়ানব্বই পণ দণ্ডবিধান করতেন। যদি কোন অসৎ লোক অপর কোন ব্যক্তির কন্যার দোষের কথা প্রকাশ করে এবং পরে যদি তা প্রমাণ করতে না পারে তা হ'লে রাজা তার প্রতি একশ' পণ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করতেন।

(মনুসংহিতা ৮ : ২২৪-২২৫)

যদি কোন ব্যক্তি আগে ভাল মেয়ে দেখিয়ে বিবাহের সময় অন্য মেয়েকে উপস্থিত করে, তখন বর ইচ্ছা করলে উভয় কন্যাকেই বিবাহ করতে পারতেন, অন্যথায় কন্যাকর্তা নিজের অন্যায়ের জন্য দণ্ডনীয় হ'ত।

বাক্‌পারুষ্য (কঠোর বাক্য প্রয়োগ) এবং দণ্ড-পারুষ্য (কঠিন দণ্ড প্রয়োগ) বিষয়ক বিচার পদ্ধতি নিয়ে শাস্ত্রকারেরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোন ক্ষত্রিয় কোনও ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের দণ্ড হ'ত একশ' পণ, বৈশ্যের ঐ অপরাধে দেড়শ' পণ দণ্ড হ'ত আর শূদ্রকে ঐ অপরাধের জন্য হত্যা করা হ'ত। অপর পক্ষে ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হ'ত, বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশ পণ আর শূদ্রকে গালি দিলে মাত্র বার পণ দণ্ডস্বরূপ দিতে হ'ত।

(মনুসংহিতা, ৮ : ২৬৭-২৬৮)

কোন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে কঠিন কথা বলে তবে তার জিহ্বা ছেদন করার রীতি ছিল। নাম ও জাতি তুলে কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে কটু কথা বললে তার মুখে জলন্ত লৌহদণ্ড পুরে দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। শূদ্র গর্বিত ভাবে ব্রাহ্মণকে ধর্মের উপদেশ দিলে রাজা তার মুখে ও কানে গরম তেল ঢেলে দেবেন—এ রকম

বিধান বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়—"দর্পেণ ধর্মোপদেশ-কারিণো রাজা তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলমাস্যে।" (বিষ্ণু-সংহিতা, ৫ অধ্যায় : ২৪)। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র অথবা গুরুকে যে গালি দেয় তার একশ' পণ দণ্ডের বিধান আছে। মাতা বা ভগ্নীর নাম উচ্চারণ করে গালি দিলে তার পঁচিশ পণ দণ্ডবিধান করা হ'ত।

(যাজ্ঞবল্ক্য, ২ অধ্যায় : ২০৮)।

শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতীয় কোন ব্যক্তিকে হাত দিয়ে প্রহার করলে রাজা তার হস্তচ্ছেদ করতেন এবং পদাঘাত করলে রাজা তার পদচ্ছেদন করতেন।—

পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরণ্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি॥

(মনুসংহিতা, ৮ : ২৮০)

শূদ্র যদি দর্পভরে ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসত, তবে রাজা তার কটিদেশ গরম লোহার দ্বারা অঙ্কিত করে দেশ থেকে তাকে নির্বাসিত করতেন। আর যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু নিক্ষেপ করে তবে রাজা তার ওষ্ঠাধর ছেদন করতেন।

গাছপালা, পশুপাখীকে যন্ত্রণা দিলে অন্যায়কারীকে ইচ্ছানুসারে দণ্ড দেওয়ার বিধান ছিল। সে যুগে বেত্রাঘাত দণ্ডও প্রচলিত ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র পিঠে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ ছিল; মাথায় বেত্রাঘাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। —"পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।" মনু, ৮ : ৩০০।

রাজ্যে চৌর্যবৃত্তি নিবারণের জন্য রাজাকে বিশেষ যত্নবান হ'তে হ'ত। কারণ চৌর্যবৃত্তি নিরোধের দ্বারাই রাজার যশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেকালে সুবর্ণ চোরকে লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত করার বিধান ছিল। আঘাতের দ্বারা যদি চোরের মৃত্যুও হ'ত তবু তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। শস্য চুরি করলে চোরের শারীরিক দণ্ড হ'ত। ব্রাহ্মণের গরু চুরি করলে এবং যজ্ঞের পশু হরণ করলে চোরের পা-এর অর্দ্ধেক কেটে দেওয়ার বিধান ছিল।

নরহত্যার অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীকে প্রাণদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদের দ্বারা শাস্তিদানের প্রথা ছিল। অথবা কোন অঙ্গচ্ছেদন করে তাকে বলদ দ্বারা নিহত করার রীতিও প্রচলিত ছিল। গুপ্তভাবে কেউ নিহত হলে সে বিষয়ে তদন্তের বিশেষ বিধিব্যবস্থার সম্বন্ধে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু গোপন ভাবেই হোক আর প্রকাশ্য ভাবেই হোক আততায়ীকে বধ করলে হত্যাকারীর কোন দোষ হ'ত না।

যে লোক রাজনিন্দুক এবং যে রাজার গুপ্তমন্ত্রণা পরের নিকট প্রকাশ করে দেয় তার জিহ্বাচ্ছেদন করা হ'ত।

বিশাল রাজ্যের অধিপতি হলে রাজার পক্ষে তাঁর রাজ্যের সর্বত্র লক্ষ্য রাখা সম্ভব হ'ত না। তাই রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তাদের অধিপতি নির্বাচন করা হ'ত। প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে একজন করে অধিপতি থাকতেন, তারপর দশটি গ্রামের একজন, কুড়িটি গ্রামের একজন, তার উপর একশ'টি গ্রামের একজন এবং সবার উপরে হাজারটি গ্রামের একজন অধিপতি রাজা নিয়োগ করতেন—

গ্রামস্যাধিপতিঃ কার্যো দশগ্রাম্যাস্তথা পরঃ।
দ্বিগুণায়াঃ শতস্যৈবং সহস্রস্য চ কারয়েৎ॥

(মহাভারত : শান্তিপর্ব ৮৭ অ. ৩)

গ্রামে কোন অশান্তি উপস্থিত হলে গ্রামাধিপতি নিজে যদি তার মীমাংসা করতে সমর্থ না হন, তবে তিনি তা দশগ্রামাধিপের কাছে জানাতেন, তিনি অসমর্থ হলে বিশগ্রামাধিপতির কাছে আবেদন করতেন। এইভাবে বিশগ্রামাধিপতি শতাধিপকে এবং শতাধিপ সহস্রাধিপকে জানাতেন।

(মহাভারত : শান্তিপর্ব, ৮৭ অ. ৪-৫)

রাজার নিযুক্ত আর একজন হিতকারী ও কর্মঠ মন্ত্রী সকল অধিপতিদের কাজ পরিদর্শন করতেন। এ বিষয়ে মনুসংহিতাকার বলেছেন—

তেসাং গ্রাম্যাণি কার্যানি পৃথক্ কার্যানি চৈব হি।
রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ॥

(মনু : ৭ অ. ১২০)

এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরের গ্রামাধিপতিরা স্ব স্ব ক্ষমতার কেন্দ্রে শাসন কাজের পরিচালনা করতেন এবং ছোটখাট বাদ-বিবাদের মীমাংসা করতেন। কিন্তু জটিল বিবাদের মীমাংসা ও দণ্ডদান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের কোনও হাত ছিল না, এ বিষয়ে রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। বস্তুতঃ, রাজা ও সর্বার্থদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত বিচারক।

প্রাচীন ভারতের বিচারবিধি সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্র-কারদের গ্রন্থে যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা সে যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে কতটা অনুসৃত হ'ত তার বিশদ বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে রাজারা যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারদের নির্দেশিত পথ থেকে

সাধারণতঃ বিচ্যুত হতেন না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তা যদি হ'ত তবে ঐ সব শাস্ত্রের অতটা জনপ্রিয়তা হ'ত না। সংস্কৃত কাব্যনাটকের কোনও কোনও স্থানেও রাজার মনু প্রভৃতির নির্দেশিত বিচার-বিভাগীয় অনুশাসন মেনে চলার বিবরণ পাওয়া যায়। শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে নায়ক চারু দত্ত যখন ঘটনাচক্রে বিচারকগণের বিচারে নারী হত্যার অপরাধে অপরাধী বলে প্রমাণিত হলেন তখন রাজা পালক তাঁকে দণ্ডদান করে বললেন—"যেহেতু অর্থলোভে বসন্ত সেনাকে হত্যা করেছে, অতএব সেই আভরণাদি তার গলায় বেঁধে, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দক্ষিণ-শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাকে শূলে চড়ানো হোক্। যে কেউ এইরূপ অকার্য করবে তারই এইরূপ অপমানজনক দণ্ড হবে।" শকুন্তলা নাটকে চোর অপরাধে ধৃত ধীবরকে রাজরক্ষীরা শাস্তির যে ভয় দেখিয়েছিল তা শাস্ত্রকারদের নির্দিষ্ট বিধানের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়। তবে রাজারা যে সকল সময় সকল অবস্থাতেই শাস্ত্রকারদের নির্দেশ মেনে চলতেন না, একথা বলাই বাহুল্য। তা যদি করতেন তবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বলে কিছুই থাকত না। 'উত্তররামচরিত' নাটকের নায়ক রামচন্দ্র বিনা অপরাধে সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন কেবলমাত্র প্রজাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। এর থেকে বোঝা যায় প্রজাদের সন্তোষ বিধানই ছিল যথার্থ রাজার মুখ্য লক্ষ্য, এবং এর জন্য রাজাকে এমন অনেক পথ অবলম্বন করতে হ'ত যার কোনও নির্দিষ্ট বিধান থাকত না। তবে মোটামুটি রাজারা যে মনুসংহিতার নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতেন তার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থানে মেলে। মহাকবি কালিদাস মহারাজ দিলীপের রাজত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদা মনোবর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ ॥

অর্থাৎ—সুনিপুণ সারথি-পরিচালিত রথের চাকা যেমন গতিপথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় না, তেমনি দিলীপের প্রজাগণও তাঁর শাসন-প্রভাবে মনুর সময় থেকে প্রচলিত চিরাচরিত আচারপদ্ধতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ত না।

———

"বিশ্বমানব" বলিয়া যে একটি ধারণা ও আদর্শ আছে, তাহা এই জন্য বিরাট ও মহৎ যে কত রকমের কত প্রকৃতির কত বিভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট মানুষের খণ্ড আদর্শ ও ধারণা তাহার অঙ্গীভূত। প্রত্যেক বিশেষ মানবের মধ্যেই বিশ্বমানবের অভিব্যক্তি ; বিশ্বমানব বলিয়া স্বতন্ত্র একটা জিনিষ নাই। একত্ব মানে একঘেয়ে অভিন্নত্ব নয়।

এক একটি জাতি বিশ্বমানবের একএকটি বড় অঙ্গ। এই এক এক অঙ্গের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও অন্তর্বৈষম্য লুপ্ত না হইলে বিশ্বমানবের ঐক্য সুদূরপরাহত।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২০

বজ্রের আলোতে

শ্রীসীতা দেবী

(৩)

সেদিন কলেজে যাবার খানিক পরেই একটা ঘণ্টা ছুটি ছিল ধীরার। শৈল এসে কাছ ঘেঁসে বসল তার। কমন্ রুমে গোটা কয়েক নূতন মাসিক পত্র এসেছে, ব'সে ব'সে ধীরা সেগুলি উল্টোচ্ছিল। শৈল বলল, "তোর গল্প পড়া রাখ দেখি এ'দিকে ত গল্পের নায়িকা হ'তে চলেছিস্।"

ধীরার হৃৎপিণ্ডটা যেন আছাড় খেয়ে পড়ল। কি বলে এ? কি হয়েছে? কোন কথা শুনেছে কি? জিজ্ঞাসা করল, "কেন রে? সে আবার কি?"

শৈল বলল, 'একজন তোর সঙ্গে ভীষণ প্রেমে পড়েছে।"

ধীরা তার পিঠে একটা কিল মেরে বলল, "এতও বাজে বকতে পারিস! আমাকে দেখছেই বা কে আর প্রেমেই বা পড়ছে কে?"

শৈল বলল, "দেখতে আটক কি? তুই ত আর বোরখা পড়ে বেড়াস্ না? কলেজ থেকে ফিরবার সময় আমার সঙ্গে দেখেছে। এখন আমার পিছনে লেগেছে, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। করবি আলাপ?"

ধীরা বলল, "তোর কি মাথা খারাপ না কি? আমাকে দেখেছিস কোনদিন কোন অনাত্মীয় ছেলের সঙ্গে আলাপ করতে? আর মা-বাবার অনুমতি ছাড়া আমি কারও সঙ্গে আলাপ কখনও করি না।"

শৈল বললে, "বাবা রে! সতী-সাবিত্রী একেবারে! আমরা ত কত ছেলের সঙ্গে আলাপ করেছি, তা আমরা কি একেবারে খারাপ হয়ে গেছি? এই না তুই সেদিন মুনীন্দ্রের ছবি দেখে বলেছিলি যে বেশ ভাল দেখতে? আমি কিন্তু তাকে ব'লে দিয়েছি।"

ধীরার মুখটা সাদা হয়ে উঠল, বলল, "তোমার পেটে পেটে এত কুবুদ্ধি জানলে আমি ও সব ছবি টবি দেখতেও যেতাম না, আর সে বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তাও তোমার সঙ্গে বলতাম না। তুমি দয়া ক'রে আর ওসব কথা আমায় বল না। কথা না বলতে ভাল লাগে ত কথাও আর বল না।"

শৈল বলল, "ইঃ রাগ দে'খো না মেয়ের! বেশ বাবা, তোমার সঙ্গে বলবই না কথা। আমার কথা বলবার ঢের লোক আছে।" ব'লে সে গট্‌গট্ ক'রে সেখান থেকে চ'লেই গেল।

ধীরার মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। এত মেয়ে থাকতে শৈলটা তাকেই বা বেছে বার করল কেন? সে দেখতে ভাল ব'লে? ভাল দেখতে মেয়ে ত আরও কত আছে। না, সে কি কিছু শুনেছে ধীরার নামে? কোন কারণে কি তার মনে হয়েছে যে ধীরা ঐরকম মেয়ে? সহজেই ফাঁদে পা দেবার মত মেয়ে? কলকাতার শহর, কথা এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় গড়ান কিছুই অসম্ভব ব্যাপার নয়। ভদ্রলোকের ঘরের ভদ্র মেয়ে ব'লে জানলে কি ধীরার কাছে এই রকম প্রস্তাব কেউ করত? ধীরার মনে দারুণ একটা আশঙ্কা জেগে উঠতে লাগল।

মাকে কিছু বলবে কি না এখনই স্থির করতে পারল না। কলেজে শৈল সেদিন তার সঙ্গে কথাই বলল না। এতে একটু আশ্বস্ত হয়ে ধীরা বাড়ী ফিরল। হয়ত শৈল তাকে নিষ্কৃতিই দেবে এরপর।

কিন্তু আশ্বস্ত হওয়ার ভাবটা তার বেশীক্ষণ রইল না। সন্ধ্যার সময় পড়তে বসবে ব'লে বই-খাতা নাড়ানাড়ি করতে গিয়ে সে দেখল, একখানা বইয়ের মলাটের মধ্যে কি যেন ঢোকান রয়েছে। সে নিজেও ওখানে কিছু রাখে নি? মলাটটা খুলে সে জিনিসটা টেনে বার করল। একখানা চিঠি। দামী পুরু চিঠির কাগজ, সুগন্ধ বেরোচ্ছে ভুর ভুর ক'রে তার থেকে। সেই যে মুনীন্দ্র নামক ছেলের ছবি শৈল তাকে দেখিয়েছিল, তারই লেখা চিঠি। রীতিমত প্রেমপত্র। মুনীন্দ্র ধীরাকে দেখে পাগল হয়ে গেছে। এত সুন্দর মুখ সে কখনও দেখে নি। সে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাকে প্রেম নিবেদন করতে চায় শৈল ধীরাকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারে, সেখানে মুনীন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা হ'তে পারে। কারও বাড়ী যদি সে নাও যেতে চায়, ত সিনেমায় দেখা হতে পারে, কফি হাউসে দেখা হতে পারে। দেখা না করলে মুনীন্দ্র আর প্রাণ রাখবে না। সর্ব্বশেষে একটু ভয় দেখানোর চেষ্টা আছে। ধীরা যদি

অনুরোধ না রাখে, তাকে রাস্তা থেকে ধ'রে নিয়েও যেতে পারে। প্রলোভন দেখানোর চেষ্টাও আছে। মুনীন্দ্র বড় লোকের ছেলে, ধীরা যা চায় তা সে পেতে পারে।

হঠাৎ ঘরের ভিতর ভূত দেখলে মানুষ যেমন আঁৎকে ওঠে ধীরাও তেমনি আঁৎকে উঠল। তার হাত থেকে চিঠিটা মাটিতে প'ড়ে গেল। টেবিলের উপর মাথা রেখে সে কেঁদে উঠল, "মা, মা."

মা যেন কি কাজে তখন ঐ দিকে এসেছিলেন। মেয়ের অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনে তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন, ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে খুকি, কি হয়েছে?"

ধীরা বলল, "মা, ঐ দেখ চিঠি, কলেজে কে আমার বইয়ের মধ্যে রেখে গিয়েছে। আবার কি বিপদ আসছে আমার।"

মা চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়লেন। বললেন, "চিঠি প'ড়ে মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন এসব ফন্দি তাদের চলছে। শৈল কে? আমাকে আগে কিছু খুলে বলিস্ নি কেন?"

যা-কিছু এ বিষয়ে জানে সবই ধীরা খুলে বলল। তার মা বললেন, "তোর বাবার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি। মনে হচ্ছে বেশ অনেক মানুষ এর মধ্যে আছে। কোনমতে অসাবধান হওয়া চলবে না। আমাদের ত এমনিতেই যা অবস্থা। কয়েক দিন যাস্‌নে কলেজে।"

কলেজে যাওয়া বন্ধ করল ধীরা। বাবা, মা, অনেক পরামর্শ করলেন। অন্য কলেজে যাওয়া উচিত কি না, তাতে কোন লাভ হবে কি না। পরীক্ষার সময় ত এগিয়ে আসছে, আর ক'টি দিনের জন্যে অন্য কলেজে গিয়েই বা কি হবে? বাড়ীতে প'ড়ে প্রাইভেট পরীক্ষাই দিক না হয়। মা বললেন, "শুধু একটা পরীক্ষা দিয়ে ত আর ওর জীবনটা শেষ হয়ে যাবে না? চিরদিন এই রকম উৎপাত চলবে ওর উপর যতদিন না বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। কি করব বুঝতে পারছি না। আবার কি দুর্য্যোগ ঘনিয়ে আসছে কে জানে? একমাত্র বিয়ে দিয়ে বিদেশে কোথাও পাঠিয়ে দিলে এর হয়ত সমাধান হয়, কিন্তু সে রকম সম্বন্ধ জোগাড় ক'রে দেবে কে? যাকে বলব সেই সন্দেহ করবে।"

ধীরার বাবা বললেন, "আর তুমি ত বলছ খুকি বিয়ে করতেও চায় না। তার মত না থাকলে কি ক'রে বিয়ে দেব তার? এ ত আট বছরের মেয়ে নয়?"

ধীরার মা সুবালা বললেন, "ওর ডাক্তারী পড়ানোর ব্যবস্থাই কর। এ পরীক্ষাটা এখানে দিক, তারপর দিল্লী চ'লে যাক্। সেখানে বোর্ডিংএ থাকবে, অত লোকের চোখে পড়বে না। বছর পাঁচ ত ঐ পড়া পড়তেই চ'লে যাবে। তারপর পড়া শেষ ক'রে পাশ করে যদি, ত বিদেশেই চাকরি করবে। যদি নিজে বিয়ে করতে চায় করবে।"

ধীরার বাবা বললেন, "সে হলে ত বেঁচে যাই। যে জাতের যে দেশের ছেলে হোক্, ভদ্র ছেলে হলেই আমি মত দেব। হিন্দু হোক্ বা না হোক্, তাতেও আমার এসে-যাবে না।"

সুবালা বললেন, "ভগবান কি আর সে সুদিন কখনও দেবেন? কি পাপের ফলে আমার সোনার মেয়ের এ দশা হ'ল? নইলে কত ছেলে ওকে মাথায় ক'রে নিয়ে যেত।"

ধীরার বাবা বললেন, "আগের জন্মের পাপের শাস্তি। এ ছাড়া আর কি হবে? ও ত এ জন্মে কোন পাপ করেই নি, আমি বা তুমিও জেনে-শুনে কোন পাপ করি নি।"

কিন্তু কলেজে না গিয়েই কি নিষ্কৃতি আছে? ডাকে চিঠি আসতে আরম্ভ করল। পাড়ার এক প্রৌঢ়-ভদ্রমহিলা হঠাৎ গায়ে প'ড়ে আলাপ পরিচয় করতে লেগে গেলেন ধীরাদের সঙ্গে। ধীরার মা নূতন লোকজনের সঙ্গে আলাপ আজকাল করতেনই না, কিন্তু এ মহিলার আগ্রহ এত বেশী যে, তার স্রোতে সুবালার ওজর-আপত্তি সব ভেসে গেল। ঐ মহিলা দু-একদিন আলাপ হবার পরই নানারকম খাবার ফল সব উপঢৌকন পাঠাতে লাগলেন। নানারকম ক'রে সাহায্য করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঝি-চাকর খুঁজে দেওয়া, জিনিষপত্র কিনে দেওয়া, তাঁর বাড়ী যাবার নিমন্ত্রণ, তাঁর গাড়ি চ'ড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবার চেষ্টা, সব অবিশ্রাম চলতে লাগল। নীরা বলল, "অত ভাল আবার ভাল নয়। আমরা এত উপকার ওঁর কাছে নিতে গেলামই বা কেন?"

ধীরা বলল, "এমনিতে ত কথাবার্ত্তায় খুব ভাল, কিন্তু সাজ-সজ্জাটা কেমন যেন। মায়ের চেয়ে বড় বৈ ছোট হবে না, অথচ কিরকম সাজেন দেখ। আর কি পরিমাণ makeup ব্যবহার করেন, যেন চুনকাম-করা দেওয়াল।"

নীরা বলল, "বাড়ীতে থাকেন ত একলা নিজে একটা পুঁটে মেয়ে নিয়ে। অথচ চাকর-বাকর কতগুলো দেখ না? আর সারাক্ষণ লোক আসছে বড় বড় গাড়ি চ'ড়ে, আর তাদের যা সাজগোজ! ওঁর স্বামী ত বার

মাসই বিদেশে, ওরা তবে কার সঙ্গে আড্ডা দিতে আসে? ঐ ছোট্ট বিনিটার সঙ্গে?"

ধীরা বলল, "কে জানে বাবা, বুঝতে পারি না। আমার ভদ্রমহিলাকে কিছু ভাল লাগছে না।"

ভদ্রমহিলার নাম তারা জানে না, সবাই মিসেস্ মৌলিক বলে, তারাও তাই বলে। খুব মোটা গোছের একজন কর্ত্তা মাঝে মাঝে বাড়ী আসেন, আবার দু'চারদিন বাদে জিনিষপত্র গুছিয়ে চ'লে যান। বাড়ীটার সামনে ছোট একটা বাগান আছে, যতদিন থাকেন, সেইখানে ব'সে মাটি খোঁড়েন আর ফুল গাছের তদারক করেন।

মাঝে আবার তাঁর কন্যা বিনির জন্মদিন উপস্থিত হ'ল। ভদ্রমহিলা নীরা ধীরা দু'জনকেই নিমন্ত্রণ ক'রে বসলেন। কোন ওজর-আপত্তি শুনলেন না। বললেন, "খালি কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে আসবে। এতে আর আপত্তির কি আছে? আর সন্ধ্যার আগেই ত চ'লে আসবে।"

ধীরার মায়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না মেয়েদের পাঠাবার, কিন্তু কিছুতেই তিনি অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। ভাবলেন সঙ্গে বাড়ীর ঝি মঙ্গলাকে দিয়ে দেবেন, আর মেয়েদের খুব ভাল ক'রে ব'লে দিলেন যেন একঘণ্টা পরেই চ'লে আসে।

মিসেস্ মৌলিক আবার ব'লে গিয়েছেন, বেশ ভাল ক'রে সাজিয়ে মেয়েদের পাঠাতে। অনেক সব বড়-লোকের মেয়েরা আসছে কি না। অগত্যা ধীরা আর নীরাকে খানিক সাজতেই হল। অবশ্য নীরার তাতে কোন আপত্তি ছিল না। ধীরা নিতান্ত মায়ের কথাতেই সাজল।

মিসেস্ মৌলিকের বাড়ী পৌঁছে দেখল, বেশ কিছু লোকজনের আবির্ভাব হয়েছে। নিতান্ত কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ের ব্যাপার নয়। খুব সুসজ্জিত দু'তিনজন যুবকেরও আগমন হয়েছে। ছোটরা খেলা করছে, ঐ যুবক ক'জন ব'সে গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ করছে।

নীরা-ধীরা একেবারে ছোটদের দলে পড়ে না, কাজেই তারা গিয়ে মিসেস্ মৌলিকের কাছেই বসল। তিনি আবার সকলের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কাউকেই তারা নামেও চিনল না। এক একটা নমস্কার করে, কোনমতে খানিকক্ষণ ব'সে থেকে এবং কিছু জলযোগ ক'রে তারা ত ঝিয়ের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এল।

ধীরা বলল, "বাবাঃ, কি অপূর্ব্ব পার্টি! ব'সে থেকে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। মুখও খুলবার জো নেই। কার সঙ্গে বা কি কথা বলব? কেন যে আমাদের 'হংসমধ্যে বকো যথা' হবার জন্যে ডাকা, তাও জানি না।"

নীরা বলল, "আর ঐ ত ছিরির খাওয়া! আমাদের অত সাজান ড্রয়িংরুম নেই বটে, কিন্তু মানুষকে ডাকলে, আমরা ওরকম অদ্ভুত খাওয়া খেতে দিই না।"

বাড়ী আসার পর সুবালা তাদের কাছে সব বর্ণনা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "ঠাকরুণটির মতলব বোঝা ভার। আমার মেয়েদের না ডাকলেই চলত না এমন কিছু নয়। ওরা কিছু বিনির খেলার সাথী হবার মত নয়। বড় বেশী আত্মীয়তা করতে আরম্ভ করেছেন। আমাদেরও উল্টে কিছু করতে হয়, কিন্তু এখন ত ওসব দিকে মন যায় না।"

ধীরার বাবা খানিক পরে অফিস থেকে ফিরে এসে বললেন, "মৌলিকদের বাড়ী খুব ধূম হচ্ছে দেখলাম। মেয়েরা ফিরে এসেছে ত? কয়েকটা লোক দেখলাম ওদের বাড়ী যাদের একেবারে সুনাম নেই। কলকাতায় notorious একেবারে। ধীরা-নীরাকে আর ওদের বাড়ী যেতে দিও না।"

কলেজে শৈল আবার ধীরার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা আরম্ভ করেছে। কথা দিয়েছে আর মুনীন্দ্রের নাম সে করবে না। ছেলেটা ভাল নয়। এমন স্বভাব-চরিত্র জানলে সে নিজেই কখনও ওর সঙ্গে আলাপ করত না। মুনীন্দ্র না কি এখন অন্য শিকারের খোঁজে আছে।

এরপর একদিন তাদের কলেজে এক ভারি বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল। একটি মেয়ে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল। তারপর চেঁচামেচি, থানা পুলিশ। অনেকদিন পরে মেয়েটির খবর পাওয়া গেল পাঞ্জাব থেকে। তাকে কে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর চলল মকদ্দমা।

এইবার ভয় পেয়ে সুবালা ধীরাকে কলেজ থেকে ছাড়িয়েই নিলেন। আর ক'টা দিন বা? বাড়ীতে প'ড়েই পরীক্ষা দিতে পারবে। দিল্লীতে যাতে সে ডাক্তারী পড়তে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করবার জন্যে জানাশোনা সকলকেই চিঠি লেখা হ'তে লাগল।

কলেজ ছেড়ে দেওয়াতে একদিকে ধীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার পিছনে লাগতে আর কেউ আসবে না। তবে আরও একলা হয়ে গেল সে। নীরা ছাড়া একটাও লোক রইল না তার কথা বলবার। মা সারাদিন নিজের কাজে থাকেন, বাবাও তাই। আর ছোট

ভাইটা ত কথাবার্ত্তা এখনও বলতেই শেখে নি বলা চলে। তবে পরীক্ষার সময়, পড়াশুনো করতেই তার ঢের সময় চ'লে যায়।

কলেজ ছাড়ায় অবশ্য শৈলর উৎপাত কমেই গেল। তবু একদিন সে বাড়ীতে এসে হানা দিয়ে গেল। বলল, "শেষে রাগ ক'রে কলেজই ছেড়ে দিলি ভাই? আমি না হয় গোটাকয়েক অন্যায় কথাই বলেছিলাম। কাজে অন্যায় ত কিছু করি নি? প্রফেসররা রোজ তোর কথা জিজ্ঞেস করেন, পড়ায় অতটা ভাল ছিলি তুই।"

বাড়ীতে এসেছে যখন, তখন বাধ্য হয়ে কয়েকটা কথা বলতেই হ'ল তার সঙ্গে। তবে ধীরা কোনই উৎসাহ দেখাল না। শৈলও এরপর আর এলো না তাদের বাড়ী।

মিসেস্ মৌলিক অবশ্য তখনও হাল ছাড়েন নি। আসা-যাওয়া চালিয়েই যেতে লাগলেন। ধীরাদের নিয়ে গড়ের মাঠে, লেকে বেড়াতে যাবার অনেক চেষ্টা করলেন। একদিন নিয়ে গেলেনও। কিন্তু ধীরার বাবা আগে থাকতেই লেকে গিয়ে ব'সে আছেন দেখে ভদ্রমহিলার দলের যুবকবৃন্দ আর এগোলেন না। ধীরার বাড়ীর লোকদের মনে সন্দেহের উদয় হচ্ছে দেখে, মিসেস্ মৌলিকও আর বেশীদূর অগ্রসর হলেন না।

পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। টেষ্ট হয়ে গেল। ধীরা বেশ ভাল করেই পাশ করল। কলেজে আর যেতে হ'ত না, তা আগেই ত সে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। পড়ার সাহায্য করার জন্যে একজন বুড়ো প্রফেসরকে মাস দুই-তিনের জন্য জুটিয়ে আনা হ'ল। নীরা এবারে ফার্ষ্ট ইয়ারে ঢুকেছে। কলেজের গল্প মাঝে মাঝে তার কাছে শুনত ধীরা, আর তার মনটা খারাপ হয়ে যেত। যা হোক কতগুলো বন্ধু-বান্ধব ত জুটেছিল? বাড়ীতে কথা বলবার লোক নেই, বাইরেও কোথাও যাবার উপায় নেই। যেন কারাগারে বন্দীর জীবন। তবে যদি ভাল ক'রে পাশ করে তা হ'লে একটা নূতন জায়গায় যেতে পারবে বটে। মানুষ সেখানে সবাই নূতন হবে, শহরটাও নূতন। মানুষগুলো তাকে একেবারে চিনবে না, তার বিষয়ে একেবারে কিছুই জানবে না, এটা একটা আরামের কথা বটে। ধীরাকে সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে না। লোকের সঙ্গে ভাব করতেও তার ভয় করবে না। তারপর মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে ত বাঁচা যায়। মানুষের জীবনে সম্ভাবনার ত শেষ নেই? সে যদি এই ভয় আর সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারে, তা হ'লে তার জীবনে ঢের কাজের সুযোগ আসতে পারে। লোকের কত কাজে লাগতে পারে, দেশের কত কাজে লাগতে পারে। তার দেহের উপরে একবার দানবের স্পর্শ পড়েছিল বলে সে কি চিরদিনের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে? কখনও না, তার নিজের অপরাধে ত কিছু হয় নি? একটা দিক অবশ্য তার নারী-জন্মের ব্যর্থই হবে, সে কখনও পত্নী হবে না, মা হবে না। ধীরার মনটায় একটু একটু ক'রে বিদ্রোহ জাগতে আরম্ভ করেছে, রাগও বাড়ছে। অন্যের দুষ্কৃতির জন্যে সে শাস্তি পাবে কেন?

পরীক্ষা হয়ে গেল। ভালই দিয়েছে সে। তবে এখনও ত ফলাফল জানতে ঢের দেরি। তবে সে পাশ করবে ধ'রে নিয়েই তার দিল্লী যাওয়ার সব আয়োজন আস্তে আস্তে হতে থাকল। ওখানের যে সব বন্ধুদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছিল, তাঁরা আশা দিলেন যে কলেজে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা ধীরার বেশ ভালই রয়েছে। বোর্ডিং-এ জায়গাও পাওয়া যাবে। বহুদিন দিল্লী প্রবাসী এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ধীরাকে তাঁর বাড়ীতে রাখবারও প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। ইনি ধীরার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু, তবে সুবালা এতে রাজী হলেন না। আর কারও বাড়ী-টাড়িতে কাজ নেই, বোর্ডিংই ভাল। ভদ্রলোক নিজে হয়ত খুবই ভাল, কিন্তু তাঁর বাড়ীর অন্য সব মানুষ কেমন তা কে জানে? তাঁরই এক মেয়ে আবার ধীরার সঙ্গে পড়বে। এমনিতেই একটু যাওয়া-আসা হবে সে বাড়ীর সঙ্গে। ধীরা একেবারে নির্ব্বাসিতা মনে করবে না নিজেকে। দু'চারদিনের ছুটিতে তাঁদের বাড়ী গিয়ে ধীরা থেকে আসবে, এটাও তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল। একটু বাংলা কথা কইতে পারবে, বাংলা রান্না খেতে পারবে, ওদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়েও আসতে পারবে।

খুব উৎসুকভাবে ধীরা দিনগুলি কাটাতে লাগল। কবে তার পরীক্ষার ফলটা বেরোয়। ইতিমধ্যে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ক'রে যা যা কাপড়-জামা দরকার সব তৈয়ারি করাতে লাগল, নিজের জন্য নূতন স্যুটকেস-হোল্ড-অল প্রভৃতি সব কেনা হ'ল। অনেক দিন পরে মেয়ের মুখে হাসি ফুটতে দেখে সুবালার মনে যেন খানিকটা শান্তি এল। এই মেয়েটি তাঁর প্রথম সন্তান, সবচেয়ে প্রিয়। এরই এমনি ক'রে কপাল ভাঙায় তিনি বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার যদি ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরার সামনে একটা পথ খুলে যায়, তা হ'লে তিনি ত বেঁচে যান।

পরীক্ষার ফল বেরোল। ধীরা ভাল ক'রেই পাশ করেছে। এবার তার যাত্রার আয়োজন করা যেতে পারে। তবে ধীরার বাবা তখনই ছুটি পেলেন না বলে একটু দেরি হয়ে গেল। তবু জিনিষপত্র তার গোছান হতে লাগল, চিঠি লিখে দিল্লীতে শেষ ব্যবস্থাগুলো করা হতে লাগল। নীরা খুব নাকে কাঁদতে লাগল, "দিদির কি মজা। কেমন সব দেখে নেবে। আর আমি কলকাতায় প'চে মরব।"

ধীরা বলল, "আমি যেন বেড়াতেই যাচ্ছি আর কি? পড়তে পড়তে জিব বেরিয়ে যাবে না? আর কেমন সুন্দর dissection করতে হবে, আরও কত কি চমৎকার কাজ।"

অবশেষে ধীরার বাবা ছুটি পেলেন। যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হ'ল সব। গোছান-গাছান হয়ে গেল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে একরকম খুশী মনেই ধীরা চলল দূর দেশে। মা, বাবা, ভাইবোনকে ছেড়ে যেতে একেবারে যে কষ্ট হ'ল না তা নয়, তবে সামনে একটা নূতন জীবন যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তার আনন্দটাও কম ছিল না তার মনে। একটা ঘোর দুঃস্বপ্ন থেকে সে যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠছে।

(৪)

দিল্লী অবধি পথটা তার বেশ ভালই গেল। কলকাতার বাইরে সে বেশী যায় নি। বাংলা দেশের বাইরে যাওয়া এই তার প্রথম। একটু ভয় ভয় করছিল, সঙ্গে মা বা বোন কেউ নেই। বাবার সঙ্গে পুরুষদের গাড়িতেই চলল সে। অসুবিধা অনেক রকম হ'ল, কিন্তু তা সে গায়েও মাখল না। কত রকম, কত দেশের লোকের সঙ্গে তারা চলেছে, ভাষাও অনেকের বুঝতে পারছে না। তবে মানুষগুলি, বিশেষ ক'রে যাত্রীদের মধ্যে যুবক যারা, তারা তাকে একটু খাতিরই দেখাচ্ছে। ভীড়ের মধ্যেও ধীরার ভাল বসবার জায়গা জুটে গেল। আর একজন মহিলা যাত্রিণী এক যুবক পুত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ছেলেরই ইঙ্গিতে বোধ হয় ধীরাকে শোবার স্থান করে দিলেন। খাবার-দাবারও দু'-চারজন দিতে চাইল তা ধীরার বাবা সেগুলি গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না।

দিল্লী এসে পড়ল। ভবতোষবাবু কন্যাসহ উপস্থিত ছিলেন ষ্টেশনে। মেয়েটির নাম বিভা, বেশ সপ্রতিভ, চটপটে মেয়ে। দেখতে চলনসই। ধীরাকে দেখেই তার ভয়ানক ভাল লেগে গেল। হাত ধ'রে সে সেই যে ধীরার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল, আর বাড়ী এসে থাকবার আগে থামলই না।

তাদের বাড়ীতে মানুষ খুব বেশী নয়। মা, বাবা, আর তিনটি ভাই বোন। বিভাই বড়, ভাইরা ছোট ছোট। একটি যুবককেও দেখা গেল, বিভার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই জয়ন্ত। অনেক সময়ই এ বাড়ীতে থাকে, আবার মাঝে মাঝে দেশে চ'লে যায়। কি একটা ছোটখাট ব্যবসা আছে তার এখানে।

প্রথম দিনটা ত পথশ্রম দূর করতেই কেটে গেল। স্নানাহার সেরে সেই যে ধীরা ঘুমুতে আরম্ভ করল, প্রায় সন্ধ্যা হবার মুখে তবে উঠে বসল। দিনের আলোর অল্পই বাকি, কাজেই বাইরে যাবার কোন চেষ্টা আর সেদিন হ'ল না। ধীরার বাবা ভবতোষবাবুর সঙ্গে গল্প করতে বসলেন, ধীরা আর বিভা কলেজের হাজার খুঁটিনাটির বিষয়ে ভাবতে লাগল।

পরদিনই বিভা আর ধীরা চলল কলেজে ভর্ত্তি হতে। বোর্ডিংএ চ'লে যাবে ধীরা আর তিন-চার দিন পরে। যে ক'দিন তার বাবা এখানে থাকবেন, সে ক'টা দিন সে বিভাদের বাড়ীতেই থাকবে।

একেবারে নূতন ধরনের জায়গা, কলকাতার কলেজের সঙ্গে যেন কিছুই মেলে না। মানুষগুলিও বাঙ্গালী নয়, অন্ততঃ চোখের দেখায় কাউকেই বাঙ্গালী ব'লে মনে হয় না। সে আর বিভাই কি খালি বাঙ্গালী? কে জানে?

সব ঘুরে ঘুরে তারা দেখল। ধীরার হোষ্টেলের চেহারাটাও দেখা হয়ে গেল। অদ্ভুত লাগছে তার। একেবারে সব নূতন যে? পুরণো জীবনের চেনা মানুষ আর একটাও থাকবে না ধীরার চারিধারে। প্রথম প্রথম কি একলাই না লাগবে তার! তবু ভাল লাগছে। কলকাতার জীবনের সেই দম-আটকান ভাবটা এরই মধ্যে অনেকটা কমে এসেছে। আর নূতন বন্ধুবান্ধবও হবে ত তার? এরই মধ্যে বিভার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে।

দিল্লী দেখার সময় বা সুবিধা খুব যে বেশী ছিল তা নয়। তবু মাঝে একটা রবিবার পড়াতে জয়ন্তের সাহায্যে নূতন দিল্লী ও পুরণো দিল্লীর কিছু কিছু বেড়ান হয়ে গেল। এই ছেলেটি খুব জোগাড়ে, আর খাটতেও পারে খুব। চেহারাটা রোগাই, কিন্তু কাজ ক'রে বেড়ায় সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত। পরের জন্যে খাটতে তার কোনদিন আপত্তি হয় না। বিভা বলল "জয়ন্তদা না থাকলে আমরা বোধ হয় জড়পুঁটলির মত

ঘরে ব'সে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারতাম না। আমার ভাইগুলো ত এখনও মানুষ নামের যোগ্যই হয় নি। আর বাবাকে বোমা মারলেও তাঁর বই আর তাঁর crossword puzzle ছাড়িয়ে কেউ ওঠাতে পারবে না। ভাগ্যে এই ব্যক্তি ছিল।''

সারাদিন বেড়িয়ে ধীরা আজও খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেশী রাত অবধি গল্প করতে পারল না, শুয়ে প'ড়ে ঘুমিয়ে গেল।

ধীরার বাবা এরপর কলকাতা ফিরে যাবার জোগাড় করতে লাগলেন। ধীরা আগেই হষ্টেলে চ'লে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ তার বড় একলা লাগল। কিন্তু কলকাতার থেকে আসবার সময়ই সে মনকে তৈরি ক'রে এনেছিল। মন খারাপ সে কিছুতেই করবে না। ভাগ্য তাকে যদি একটা সুযোগ দিয়েই থাকে, মানুষের মত হয়ে বাঁচবার, সেটা সে হেলায় নষ্ট করবে না। তাকে শক্ত হতে হবে, উৎসাহ করে কাজ করতে হবে। ন্যাকা কান্না কেঁদে লোকের মন গলিয়ে আদর নেবার অদৃষ্ট তার নয়।

চিরকালই একটু লাজুক প্রকৃতির ছিল ধীরা, কিন্তু সেটা এখন জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলতে লাগল সে। ক্লাশের মেয়েদের অনেকের সঙ্গে যেচে ভাব করল সে। চলতে-ফিরতে একলা কলকাতায় একেবারেই অভ্যস্ত ছিল না, এখানে এসে সেটাও একটু একটু অভ্যাস করতে লাগল। অন্য প্রদেশের মেয়েগুলি বাঙালী মেয়েদের চেয়ে বেশী সপ্রতিভ আর সাহসী, তাদের সাহচর্য্যটায় ধীরার উপকারই হ'ল। মায়ের আঁচল-ধরা মেয়ে ধীরার বাইরের চেহারায়ও যেন একটা নূতন রূপ ফুটে উঠল। মনের কুণ্ঠা ও ভীরুতা ক্রমেই ক'মে আসতে লাগল।

বিভার সঙ্গে রোজই দেখা হয়। ছুটির দিনগুলো ধীরা তাদের বাড়ী গিয়েই কাটায়। হষ্টেলে যে-সব দিন দেখা করতে আত্মীয়-স্বজনরা আসেন, সে-সব দিনে তার কাছে প্রায়ই বিভা আর জয়ন্ত আসে। মাঝে মাঝে বিভার মা-বাবাও আসেন। জয়ন্ত ছেলেটিকে ঠিক বুঝতে পারে না ধীরা। সে এক একদিকে এত সপ্রতিভ, এত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, আবার দু'একটা জায়গায় কেমন যেন কুণ্ঠিত ও লাজুক। ধীরা যে দু' চারদিন বিভাদের বাড়ী থাকে, জয়ন্ত বাড়ীর আবহাওয়াটা যেন হাসিতে গল্পে হালকা ক'রে রাখে, আবার থেকে থেকে দারুণ গম্ভীর হয়ে কোথায় যেন সরে যায়।

বিভাকে একদিন ধীরা বলল, "তোর জয়ন্তদা এমন অদ্ভুত কেন রে? একদিকে এত হাসিখুসি, অথচ এক একটা কথায় এমন গম্ভীর হয়ে যান যে ভাবনা হয় কোথাও offence দিলাম না কি?"

বিভা বলল, "ঐ রকমই ছোটবেলা থেকে। ওর ধারণা যে ওর মত অপদার্থ জগতে নেই। লোকে যে ওকে at all সহ্য করে সেটাও লোকের কাজে লাগে ব'লে। তা যদি না লাগত তা হ'লে ওকে বোধ হয় সবাই ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিত, এই ভাবে আর কি!"

ধীরা বলল, "অত বিনয় আবার ভাল নয়। আজকালকার দিনে নিজের জায়গা নিজেকে ক'রে নিতে হয়, ঠেলাঠেলি ক'রে। লজ্জায় পিছিয়ে থাকলে কি আর চলে?"

বিভা বলল, "তা ত চলেই না, বিশেষ ক'রে যদি পুরুষ মানুষ হয়। মেয়েদের তবু দু'চারটে এমন asset আছে যার গুণে ধাক্কাধাক্কি না ক'রেও সংসারে বেশ ভাল জায়গা পাওয়া যায়।"

ধীরা বলল, "সে আবার কি asset রে?"

বিভা তাকে এক ঠেলা দিয়ে বলল, "আহা ন্যাকা, জান না কিছু। রূপ গো, রূপ। যা তোমার আছে আর আমার নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন না 'চাঁদ মুখের জয় সর্ব্বত্র।' দেখ না দু'জনে একসঙ্গে ত ভর্ত্তি হলাম, তা রূপসী তুমি এরই মধ্যে সকলের বন্ধু হয়ে গেলে, আর কাল থ্যাদা আমিকে ঘরে-বাইরে কারও দরকার নেই।"

বিভার কথাগুলো হালকা ভাবেই বলা, কিন্তু কোথায় যেন তার মধ্যে গভীরতর কি একটা সুরও বেজে উঠল। ধীরা বলল, "কি যে বাজে বকিস তুই। কার সঙ্গে আবার তোর ভাব হয় নি শুনি? আর বাড়ীতে আবার কে তোমায় ঝাঁটা মারতে গেল?"

"ঝাঁটা কেউ মারে নি। তবে তোমার চেয়ে আমার মূল্য যে সকলেরই কাছে কম, তা কি আর আমি বুঝি না? মা-বাবার কথা বলছি না অবশ্য। তাঁদের কাছে ত সবচেয়ে অক্ষম আর কুৎসিত যে সন্তানটা, সেটাই সবচেয়ে প্রিয় হয়। এই রকম ত শুনি। তবে আমারও ত মানুষের মন? সেও বন্ধুত্ব চায়, ভালবাসা চায়। Adoration নাই পাক, admiration একটু-আধটু চায়।"

ধীরা কথাগুলো মনে মনে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল না। তবু বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল, "জানি না বাপু। বাইরের চেহারাটাই কি আর সব? আর adoration বল, admiration বল, এ সব কি আর

শুধু মানুষের বাইরের সৌন্দর্য্য দেখে হয়? ওগুলো মানুষের গুণে মুগ্ধ হয়েই হয়। চেহারার সৌন্দর্য্য ক'দিনই বা থাকে, আর তার জন্যে যে ভালবাসা মানুষে পায়, তাই বা ক'দিন থাকে?"

বিভা তাকে একটা চিমটি কেটে বলল, "যাও যাও, আর পাদ্রীর মত sermon দিতে হবে না। ও সব আমি ঢের শুনেছি। রূপ সব নয় ঠিকই। তবে মানুষের মনকে সবচেয়ে বেশী টানে ঐ জিনিষটিই। চেহারা দেখেই যদি মানুষ প্রথমে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হ'লে গুণের পরিচয় সে নেবে কখন?"

বিভা বলল, "কার কথা ভেবে অত ঝাল ঝাড়ছিস বাপু? এখানের বন্ধুরা ত আমারও যতখানি বন্ধু, তোরও ততখানি। আর তারা ত সবাই মেয়ে।"

বিভা বলল, "মেয়েরা মেয়েদের রূপে মজে না ভেবেছিস? বৃথাই এতদিন স্কুল-কলেজে পড়লি। আমি ত দশ বছর বয়স থেকে কলেজের এবং স্কুলের উঁচু ক্লাশের মেয়েদের admirer হয়ে হয়ে ঝানু হয়ে গেছি। পয়সাই কি কম খরচ করেছি তাদের পিছনে? স্কুলে আমাদের এক সুন্দরী টিচার ছিলেন রীতাদি বলে, তাঁর জন্যে ফুল কিনে ত টিফিনের পয়সা মাসের মধ্যে কুড়ি দিন উড়ে যেত। নিজের জন্মদিনে পাওয়া টাকা দিয়ে তাঁর জন্যে চকোলেট আর বই কিনতাম। লাভের মধ্যে খেতাম তাঁর কাছে বকুনি, এবং প্রেসেন্টগুলো অনেক সময়ই ফিরিয়ে দিতেন।"

ধীরা হাসতে হাসতে বলল, "ভাল রে ভাল। আমি বাপু তোমার চেয়ে চালাক মানুষ। কারও রূপে মজে টিফিন খেতে ভুলি নি কখনও। ছোট মেয়েগুলো টফি, চকোলেট দিয়েছে অনেক সময়, সেগুলোও খেয়েছি।"

বিভা বলল, "তোমার কপাল ভাল। সুন্দর হয়ে জন্মেছ, ক্রমে রূপটা বাড়ছে বই কমছে না। অনেক পাওনা তোমার এখনও বাকি। আমরা এখনও যা, পরেও তা। মা-বাবা টাকা-পয়সা দিয়ে কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে, থাকব তার কাছে ঘরের একটা ঘটি-বাটির মত। কাজে লাগব ঠিকই, তবে তোমাকে দেখে লোকে যেমন মূর্চ্ছা যাবে, আমাকে দেখে তা কেউ যাবে না এবং আমাকে দেখে কারও কবিতা লিখতে বা ছবি আঁকতে ইচ্ছা করবে না।"

ধীরা হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। বিভা বলল, "তোমার আবার কি হ'ল? এতক্ষণ ত বেশ ঠাট্টা-তামাশা করছিলে? আমরা বাপু সোজাসুজি মানুষ, এত ঘন ঘন mood বদলায় না আমাদের।"

ধীরা বলল, "হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল যে ক্লাশের অনেক কাজ বাকি রয়েছে, বেশ ব'সে ব'সে গল্প করছি।"

বিভা উঠে পড়ল, বলল, "একটা ঘন্টা মোটে ছুটি ছিল আজ। তা তোর সঙ্গে বক্ বক্ করে কেটে গেল। নিজের বিষয়ে ভাববার অনেক কথা পেলি আজ। ইচ্ছে করলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খানিক নিজের চেহারাটা দেখিস। আমার বক্তৃতার মানেটা বুঝতে পারবি।" ব'লে চ'লে গেল।

ধীরাও বইখাতা তুলে নিয়ে ঘরে চ'লে গেল। বেশ কাটছিল দিনগুলো। অতীত জীবনের বিভীষিকাটা অনেকটাই পিছনে প'ড়ে গিয়েছিল, সেটাকে সে জোর ক'রেই ভুলে যাবার চেষ্টা করছিল। পেরেও ছিল খানিকটা। কিন্তু বিভার কথাতে সেটা আবার যেন মাথা তুলে জেগে উঠল। সত্যি বটে বিভার কতগুলো কথা। ধীরার সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি স্বভাবের জন্যে আদর ত সে সারাক্ষণই পাচ্ছে। কিন্তু এ আর জীবনের কতটুকু? সবচেয়ে বেশী ক'রে নারী যে ভালবাসা চায় তা ত তার কপালে কখনও জুটবে না? এগোবে কাছে অনেক মানুষ, কিন্তু তাদের ত জোর ক'রে ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রতারণা করে এত বড় জিনিষের অধিকারিণী ধীরা হ'তে পারবে না।

বিকালে চুল বেঁধে, কাপড়-চোপড় বদলে ফেলে ধীরা খানিকক্ষণ আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই চেহারাটা তার বদলে যাচ্ছে। সেই বিমর্ষ মুখ আর ভয়ত্রস্ত চোখ কোথায় গেল? মা বলতেন ধীরার রং উজ্জ্বল শ্যাম, এখন শ্যামলতাটা কমেছে, উজ্জ্বলটা যেন উজ্জ্বলতর হয়েছে। শরীরটাও ভরে উঠছে। এ ধীরা ত সে ধীরা নয়। সেই লাজুক ভীতু মনটাই বা কোথায় গেল? কলকাতায় ব'সে ব'সে ভাবত, কি ক'রে সে মাকে ছেড়ে থাকবে? এখন ত বেশ পারছে। নিজেকে নিজে সকল দিক দিয়ে চালিয়ে নিতে আর ত কোন অসুবিধা বোধ হয় না। ডাক্তার হয়ে কাজে ঢুকতে ত এখনও বছর চার প্রায় বাকি। ততদিনে তার বয়স হয়ে যাবে তেইশ-চব্বিশ বছর। তখন আর ভয়-ডর কিছু থাকবে না। স্বাধীন হতে পারবে দেহে আর মনে। প্রেম তার জীবনে আসুক বা নাই আসুক, কারও মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে থাকতে হবে না।

আচ্ছা বিভা কাকে মনে ক'রে এতগুলো কথা ব'লে গেল? সে কি ওর জয়ন্তদা? ধীরার মাঝে মাঝে এই ছেলেটির সম্বন্ধে সন্দেহ হ'তে আরম্ভ হয়েছে। বড় বেশী কাজে লাগতে চায়, বড় বেশী কাছে আসতে চায়।

বিভার সঙ্গে আগে ওর খুবই ভাব দেখত ধীরা। এখন খানিকটা যেন পিছিয়ে যাচ্ছে দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে। বিভা তাকে দাদা বলে বটে, তবে সত্যিই খুব নিকট সম্বন্ধ নেই তাদের মধ্যে। খুব দূর সম্পর্কেরই দাদা, আর বাল্যকাল পার হবার পর তবে তারা পরস্পরকে চিনেছে। এমন ত আজকাল কত হয়। বিয়েও হয়ে যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রে। তাদের কলেজেরই দু'জন মেয়ের হয়েছে।

বিভা কি জয়ন্তকে ভালবাসে? ধীরা জানে না। জয়ন্তেরই বা মনের ভাব কি? আগে ও খুব ঘুরত বিভার পিছনে পিছনে; এখন কি তার মন অন্য দিকে ফিরেছে? বিভা কি সেই কথারই ইঙ্গিত করছিল? কিন্তু সে রকম কোনও ভাব ত ধীরার মনে নেই? মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে যে ভাবে সে মেশে, জয়ন্তের সঙ্গেও ঠিক তেমনই মিশেছে। সে যে পুরুষ, আর ধীরা যে মেয়ে তা কোন সময়েই তার মনে পড়ে নি।

বিভা বেচারী কি তাকে দোষী করছে? ধীরার কি করা উচিত এখন? ওদের বাড়ী আর যাবে না? জয়ন্তের সঙ্গে আর মিশবে না? কি ক'রে তা করা যায়? বাবা ত ভবতোষবাবুকেই তার local guardian ঠিক ক'রে গিয়েছেন। ধীরার যখন যা দরকার হয়, তাঁরাই করেন। ছুটির সময় সে তাঁদের বাড়ীই যায়। বাঙ্গালী ঐ একটি পরিবারের সঙ্গেই যা তার মেলামেশা। চেষ্টা করলেও ত তাঁদের সাহচর্য সে ছাড়তে পারবে না।

জয়ন্তকে অবশ্য একটু দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা সে করতে পারে, কিন্তু সেটা লঘু পাপে গুরুদণ্ড না হয়ে যায়। জয়ন্ত কোনদিন এমন কিছু বলে নি বা করে নি যেটাতে বিরক্ত হওয়া যায়। বিভা আর ধীরা একই রকম ব্যবহার তার কাছে পেয়েছে। তবে কথার সুরে বা চোখের দৃষ্টিতে যদি কিছু তফাৎ থাকে। কি যে করবে ধীরা তা ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারল না।

দু'দিন পরেই আবার বিভাদের বাড়ী যাবার কথা। ঠিক করল একরাশ বই নিয়ে যাবে, সমস্ত সময়টা বই প'ড়েই কাটিয়ে দেবে। গল্পসল্প করা বা সিনেমা যাওয়া কিছুর মধ্যে ভিড়বেই না।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, বেশীর ভাগ সময় ভাগ্য ব্যবস্থা ক'রে রাখে অন্য রকম। বিকেলবেলা গিয়েই শুনল জয়ন্ত টিকিট কিনতে গেছে। সন্ধ্যায় সিনেমায় যাওয়া হবে। জয়ন্তই দেখাচ্ছে, আজ তার জন্মদিন না কি আছে।

ধীরা একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। বলল, "আজ কিন্তু ভাই আমি বেরোব না বলেই স্থির করে এসেছিলাম। পড়াশুনো অনেক রয়েছে। দেখ না কতগুলো বই নিয়ে এসেছি। তা ছাড়া ভাল কাপড় একখানাও আনি নি। যাব কি প'রে?"

বিভা বলল, "যত সব ঢং। পড়া কি আমারই নেই না কি? দু'ঘণ্টা বাইরে থাকলে কি হবে? আর পরবার একখানা কাপড় কি আমি দিতে পারব না? ন্যাকড়া পরে ত আর বেড়াই না? ও বেচারা গরীব মানুষ, নিজের পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কিনছে, তুমি যেন নাক তুলে ব'লে ব'সো না যে যাবে না। তা হ'লে ভীষণ চটবে।

অগত্যা ধীরাকে রাজীই হ'তে হ'ল। জয়ন্তও খানিক পরে টিকিট কিনে নিয়ে এল। মেয়েরা সাজতে গেল। বিভার টানাটানিতে তার একখানা ঘোর নীল রংএর শাড়ী ধীরাকে পরতেই হ'ল। বিভা বলল, "যা দেখাচ্ছে ভাই, আমি পুরুষ হ'লে মরেই যেতাম। একেবারে 'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর'।"

ধীরা বলল, "তুই দে না বাপু একখানা শাদা-মাটা শাড়ী, তা হ'লে আর বৈষ্ণব পদাবলী আওড়াতে হয় না।"

বিভা বলল, "আরে না রে না। এ সব শাড়ী ত তোদেরই জন্যে। তোদের গায়ে উঠে ধন্য হয়ে যায় ওরা। আমরা জোর ক'রে পরি বৈ ত না?"

গাড়ি এসে গেল। অনেকগুলি মানুষকে ঠেলাঠেলি ক'রে বসতে হ'ল। বিভার ছোট দুটো ভাই সঙ্গে থাকাতে ধীরা একটু বেঁচে গেল। দু'জনে তারা তার দুদিকে ব'সে রইল। আর সিনেমা হলে ঢুকে বিভা নিজে তাড়াতাড়ি জয়ন্তের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল, কাজেই ধীরা জয়ন্তের চেয়ে খানিকটা দূরেই থেকে গেল। তবু interval-এর সময় তাকে চকোলেট আর বাদাম ভাজা খেতে হ'ল এবং কথাও অনেকগুলো বলতে হ'ল। চুপ ক'রে থাকাটাই সে পছন্দ করছে দেখে বিভা জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, মনে মনে পড়া মুখস্থ করছিস?"

ধীরা বলল, "করতে পারলে ত করতাম। যা ভীষণ গোলমাল চারদিকে।"

জয়ন্ত বলল, "আপনি বুঝি খুব চুপচাপ পছন্দ করেন? তা হ'লে ত আপনাকে জোর ক'রে নিয়ে এসে বিরক্তই করলাম। ছবিটাও বুঝি ভাল লাগে নি।"

ধীরা বলল, "ছবিটা ত আর গোলমাল করছে না? সেটা ভাল না লাগবে কেন?"

বিভা বলল, "থাম বাপু, এখনি ছবি আবার আরম্ভ হচ্ছে। ধীরা মৌনী সন্ন্যাসীদের দলে ভর্তি হয়ে যা এবার। কেউ কথা বলবে না, আর তোর খারাপও লাগবে না।"

এবার ধীরা দু'দিনের জন্যে এসেছিল। দ্বিতীয় দিনে বিভা বলল, "জয়ন্তদা একটা ভাল ক্যামেরা জোগাড় করেছে, সকলের ছবি তুলতে চায়। তোর দাঁড়াতে আপত্তি আছে?"

ধীরা বলল, "ছবি ত তাঁরই তোলা উচিত, জন্মদিনটা যখন তাঁর।"

বিভা বলল, "ওরটা আমি তুলব এখন সবার শেষে, আগে ত ওদের তুলে নিক।"

ধীরাকেও দাঁড়াতেই হ'ল, বিভাও তার ভাইদের সঙ্গে। প্রথমে দাঁড়াতে চায় নি। বিভা বলল, "কেন রে? আমরা ত সব প্যাঁচার মত দেখতে, তোকে contrast-এ কত ভাল দেখাবে।" সুতরাং না দাঁড়িয়ে ধীরার উপায় রইল না। জয়ন্তেরও ছবি তোলা হ'ল অবশ্য, তবে ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল, তা জানা গেল না। সে ছবির print কোনদিনই কারো হাতে এল না। ধীরাদের ছবি তাড়াতাড়িই এসে পড়ল, এবং ধীরার জন্য চ'চারখানা বিভাই এনে দিল। বলল, "দেখ্ কি সুন্দর হয়েছে। বাড়ীতে একখানা পাঠিয়ে দে। আর কেউ আছে না কি ছবির প্রত্যাশী?"

ধীরা বলল, "আমার জানা অন্ততঃ কেউ নেই।"

বিভা বলল, "না-জানা থাকতে পারে। তবে তাদের ভাবনা তারাই ভাববে। বাড়ীর জন্যেও তিন কপি দিয়েছে জয়ন্তদা। নিজের জন্যে কতগুলো রেখেছে তা কে জানে?"

ধীরা বিভার মন্তব্যের কোন জবাব দিল না। বিভার সারাক্ষণ চেষ্টা একটা কিছু কথা সে বার করবে ধীরার মুখ থেকে। কিন্তু কিছুই যে তার বলবার নেই, এটা সে বোঝাবে কি ক'রে বিভাকে?

চুপচাপ দিনগুলো কেটে গেলে হ'ত ভাল। পড়াশুনো কাজকর্ম ত ঢের ছিল। দুই-একটা রবিবার কাজের অছিলায় না গেলেও চলত। কিন্তু একটার পর একটা উপলক্ষ্য ঘটেই যেতে লাগল। এর পরের রবিবার আবার পড়ল বিভার বাবার পঞ্চাশতম জন্মদিন। সকলের ইচ্ছা এটা খুব ঘটা ক'রে হয়। ধীরার এটাতে যাওয়ার খুব যে ইচ্ছা ছিল তা নয়, কিন্তু না গেলে সবাই কি ভাববে? অগত্যা যেতেই হ'ল।

সারাদিন হৈ চৈ। আত্মীয় বন্ধু আরও দু'চারজন এসেছে। একদিক দিয়ে ভাল। বিভা বা জয়ন্তের সঙ্গে একলা মুখোমুখি দাঁড়াতে আজকাল ধীরার ভাল লাগে না। বিভা ক্রমাগত বাজে ব'কে যায় এবং জয়ন্ত বিষণ্ণমুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, এর কোনটাই ধীরাকে খুসী করে না। তার চেয়ে বরং অন্য লোকজন থাকলে সাধারণভাবে গল্পগাছা করা যায়।

বিকেলে বেড়াতে যাওয়া হ'ল, সেও সকলের সঙ্গেই। হুমায়ুনের কবরের কাছে খোলা জায়গা অনেকখানি। সবাই প্রাণ ভ'রে বেড়িয়ে নিল। এক জায়গায় ব'সে খানিক গান গাওয়াও হয়ে গেল। জয়ন্ত ভাল বাঁশী বাজায়, তার বাঁশীও শোনা হ'ল। হঠাৎ এক সময়ে সচেতন হয়ে ধীরা দেখল যে দলটা নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জয়ন্ত আর বিভা আর সকলকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে।

সে নিজে ছোট ছেলেমেয়ে কয়েকজনের সঙ্গে ঘুরছিল। ইচ্ছা ক'রেই বিভার থেকে দূরে দূরে থাকছিল। নইলে হয়ত মেয়ের রাগ হয়ে বসবে। যা মেজাজ হয়েছে আজকাল। বাড়ীর কর্তা-গিন্নী দু'চার জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক জায়গায় ব'সেই পড়লেন, তাঁদের আর ঘুরতে ভাল লাগছিল না।

অল্প পরেই দেখা গেল বিভা আর জয়ন্ত ফিরে আসছে। বিভা বেশ হন্ হনিয়েই আসছে। জয়ন্ত ধীরে-সুস্থে পিছন পিছন। কাছে এসেই বিভা বলল, "কি রে এত কাঠ খুকী হয়ে গেলি কি ক'রে? একেবারে যে চুনোপুঁটির সঙ্গ ছাড়ছিস্ না? জয়ন্তদাও একেবারে মর্মাহত হয়ে গেছে।"

ধীরা বলল, "তুই বড় বাজে ব'কিস ভাই। এই রকম সুরে কথা বলে তোর কি লাভ হয় বলত? তিলকে তাল করিস কেন? সামান্য একটা কি কথা, কি যে কথা তা জানিও না, তাই নিয়ে রেগে নাক ফুলিয়ে ব'সে রইলি। এতে আমার অপ্রস্তুত লাগে না? এইরকম যদি সব সময় করিস তা হ'লে আমার আর তোদের বাড়ী আসা চলবে না।"

বিভা কয়েকবার ঢোক গিলে নিজেকে খানিকটা সামলে নিল। বলল, "রাগ কি আর আমি তোর উপর করছি? মনটা খারাপ হয়ে গেলে সবাইকে কথা শোনাতে ইচ্ছে করে। তোর কোন দোষ নেই তা কি আর আমি জানি না? এ ত ভগবানের দোষ, তিনি

আমাকে এত plain করলেন কেন আর তোকেই বা এত সুন্দরী করলেন কেন? সুন্দর মুখ না হ'লে ছেলেদের পছন্দ হবে না তা সবাইকেই সুন্দর মুখ দিলেন না কেন? এত দুঃখ পাবার মত আমরা ত কোন পাপ করি নি?''

জয়ন্ত ইতিমধ্যে কাছে এসে পড়েছিল। বিভা আর ধীরার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "বিভা আবার কি বিষয়ে লেকচার দিচ্ছ? এখনি ত আমার ভদ্রতার অভাব সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা ক'রে এলে।"

বিভা একটু তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল, "বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন না যে 'সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র' সেই বিষয়ে বক্তৃতা করছি।"

"ভাল'' ব'লে জয়ন্ত সেখান থেকে চ'লে গেল।

ভীষণ বিরক্ত হয়ে ধীরা বলল, ''আমি সত্যিই আর তোদের বাড়ী আসব না ভাই।"

ক্রমশঃ

কোন জাতির অতীত গৌরব থাকিলে তাহাতে যেমন লাভের সম্ভাবনা আছে, ক্ষতির সম্ভাবনাও তেমনি আছে। লাভ এই হইতে পারে যে পূর্ব্বকৃতিত্ব স্মরণ করিয়া নিজেদের ক্ষমতায় লোকের বিশ্বাস জন্মে, এবং এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে সমগ্র জাতি আবার উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনা দুই দিক দিয়া:—লোকে কেবল পূর্ব্ব গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানে অবসন্ন ও ম্রিয়মান হইয়া থাকিতে পারে; কিংবা পূর্ব্ব গৌরবের বড়াই করিতে করিতে অন্তঃসারশূন্য ও অপদার্থ হইতে পারে।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৯

অতুলপ্রসাদঃ কবিমানস ও কবিতা

ব্রজমোহন মজুমদার

বাংলা সাহিত্যে অতুলপ্রসাদ একটি বিশিষ্ট নাম। কিন্তু এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, বৈশিষ্ট্যের অনুপাতে তাঁর আলোচনা, কাব্যের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির বিস্তৃতি এর অনেকটা কারণ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তদানীন্তন অনেক কবিরই পক্ষে এড়ানো সম্ভব হয় নি। এ মতের সত্যতা স্বীকার করেও বলা চলে যে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে অতুল সঙ্গীতের 'কায়া ও ছায়াগত' মিল সর্বাংশে প্রভাবজাত নয়। এ সুলভ সৌসাদৃশ্য অনেকটা কবি-মানসের সমধর্মিতাপ্রসূত। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে অতুল সঙ্গীতের পার্থক্য চোখে পড়লেও স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব অতুলপ্রসাদকে বহুলাংশে আচ্ছন্ন করেছে। 'দাশরথি ও নীলকণ্ঠের কিছু কিছু সুর ধ্বনিত' হ'তে দেখা যায় অতুল-কাব্যে। তাঁর কাব্য-সাধনা মরমী গীতি-কবির ঐতিহ্যবাহী হয়েও অভিনব, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁসের প্রত্যাশিত স্পর্শ তাঁর কাব্যে লেগেছে, তাই এক কোটিতে ঐতিহ্য থাকলেও আরেক কোটিতে নব জাগরণোত্তর আধুনিকতার অস্তিত্ব বহন করছে তাঁর কাব্য।

স্বতন্ত্র আস্বাদের আশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন অতুলপ্রসাদ। তাঁর কাব্যস্রোতে বাংলা কাব্য-তরঙ্গিনী তাই সমৃদ্ধা। তৎকাব্যের কুলনির্ণয়কালে Metaphysical কবিদের প্রসঙ্গ মনে পড়বেই। সপ্তদশ শতাব্দীতেই Herbert Vaughan প্রভৃতি কবি ধর্মশাস্ত্রোক্ত ভগবানের সুদূর নির্লিপ্ততায় সন্তুষ্ট না হয়ে কাছের প্রিয়জনের মত আস্বাদ করতে চেয়েছেন তাঁকে আর বাংলা তথা ভারতীয় কাব্যের একটি বিশেষ ধারাই ত দেবতাকে প্রিয় করার আরাধনায় রত। বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণ ও রাধার মানবীয় প্রেমগাথার রূপকের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে মানবের সাধনার সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে। শাক্ত পদাবলীতে জগজ্জননীকে বাঙালীর গৃহস্থ-কন্যা রূপেই চিত্রিত করা হয়েছে। দেবতাকে দূরের ঠাকুর নয়, আপন প্রাণের ঠাকুর করা হয়েছে এ দুই কাব্যে। অতুলপ্রসাদের কবিমানস এই ঐতিহ্যেই লালিত। অতুলপ্রসাদ ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী Metaphysical কবি। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর পার্থক্যটুকু লক্ষণীয়: রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত: গীতি-কবি হয়েও ভক্ত-কবি, অতুলপ্রসাদ মুখ্যত: ভক্ত-কবি হয়েও গীতি-কবি। অতুলপ্রসাদের কাব্যস্বরূপ তাই স্বতন্ত্র বিচারের দাবি রাখে।

আধ্যাত্মিকতা, ভগবৎ চেতনা তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ভগবানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হৃদয়োপলব্ধির মাধ্যমে, তাই শুষ্ক-তত্ত্ব জিজ্ঞাসার পদ্যরূপ না হয়ে আন্তর আবেগ-পুষ্ট কবিতা হয়ে উঠেছে তাঁর রচনা।

অন্তরের পূজা তিনি সংগোপনেই করতে চেয়েছেন। 'নাই বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ', 'দেবতা পরাণে মম রবে গোপনে',—অনুচ্চকিত গান, ভগবানের সংগে এমন নিভৃত-মধুর সম্পর্কই তাঁর কাম্য। দেবতার জন্য প্রতীক্ষা মধ্যে মধ্যে গীতি-কবি-সুলভ আকুলতায় পর্যবসিত: 'একা আমি জীবন-তরী বাইতে নারি', আর সে জন্যই তিনি অপেক্ষার অন্ধকারে বসে থাকেন, 'যদি আসে হেথা তরঙ্গ আঘাতি তব তরী।' তাঁর উপাস্য জীবনদেবতা কখনও শিব, (তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো), কখনও প্রকৃতি, (তুই মা আমার পরশমণি) কখনও বজ্রকঠোর. আবার কখনও কুসুম-কোমল। 'নিঠুর দরদী'র 'কাঁটায় ভরা বন' আবার 'প্রেমে ভরা মন'। কবির কাছে তিনি অজানা হলেও (হে অজানা, আমি তোমায় জানব কবে?) ইনিই কবির 'বেদনে বাঁধা জীবনবীণা ঝঙ্কারি' গান করেন, মন হরণ করে পলায়ন করেন। কবি ধরতে পারেন না। যাকে ধরতে চান তাঁকে পান না, সেই অধরাকে ধরার আকুতিতে, প্রিয়-দেবতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলায়, আত্মভাব-বিভোরতায় আপন অন্তরের বিষণ্ণ প্রকৃতির পটভূমিকায় তিনি রোমান্টিক গীতি-কবির স-গোত্র হয়ে উঠেছেন। যদি কবির প্রিয় অদৃশ্য দেবতা কোনদিন দৃষ্টি পথগামী হন, কবির ইতিকর্তব্যও নির্ধারিত: 'শূন্য ডালা দিব তব পায়' আর কবির প্রার্থনা: 'সে শূন্য-ডালা তুমি ভরিয়ো।' 'আমি ধূলিকণা হয়ে রব তব

পায়'এ দাম্পত্যও মধুর রসসিক্ত হয়ে উঠেছে অতুল-কাব্যে। জীবন-দেবতার সঙ্গে তাঁর মিলন-মুহূর্ত সদা-অপেক্ষিত বলেই রোমান্টিক কাব্যসুলভ এক অনিশ্চিত অস্পষ্ট বিষণ্ণ-ম্লান গোধূলি আলোকে অতুলপ্রসাদের কাব্যবৃত্তের পরিধি চিহ্নিত এবং সেখানের কেন্দ্রমণি মরমী সাধককেও চিনতে ভুল হবার কথা নয়। 'চর্যা-পদে'র পথ ধরে বাংলা গীতি-সাহিত্য ধর্মতত্ত্বের বাহনধর্মিতাকে বজায় করে আসছিল, অতুলপ্রসাদের কাব্য তাই প্রমাণ করল। অবশ্য তাঁর দেবতা কেবল তাঁরই দেবতা, তাঁর প্রাণ দেবতা এবং সে হেতুই গীতি-কবি হিসাবে তিনি আলোচ্য।

তাঁর রচনায় মানব-মানবীর প্রেমের কবিতা স্বল্প এবং থাকলেও তাতে ভগবৎ-চেতনার সৌরভ। গীতি-কবি-সুলভ গভীর বিষণ্ণ উপলব্ধিই তাঁকে জীবনতপ্ত প্রেম-কবিতা রচনায় অনুৎসাহী করেছে। (অবশ্য 'গীতিগুঞ্জ' গ্রন্থের ১২৯ সংখ্যক কবিতায় অভিমানের যে তপ্তশ্বাস শ্রুত তা অনেকটা মানবিক।) প্রেমিকার সঙ্গে মিলন-ক্ষেত্র হিসাবে রূঢ় পৃথিবী তাঁর কাম্য নয়, তাঁর আন্তর ইচ্ছা: 'মম মনের বিজনে আমি মিলিব তব সনে। জাগরণে যদি পথ নাহি পাও তুমি আসিও স্বপনে।' স্বপ্নলোকচারী এ রোমান্টিক কবি-ব্যক্তিত্ব বাংলা সাহিত্যে প্রসন্ন প্রশ্রয়ের দাবি রাখে।

রেনেশাঁসের হাওয়ায় লালিত অতুলপ্রসাদ। তারও ফলশ্রুতি তাঁর কাব্যের ইতি-উতি দৃষ্ট। তদানীন্তন যুগ-চরিত্র-চিহ্নিত তাঁর কাব্য। সার্বজনীন মানবপ্রীতি তাঁকে রেনেশাঁস-উত্তর আধুনিক বলে স্পষ্ট করেছে। সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারিত: 'জাতির গলায় জাতের ফাঁস, ধর্ম করছে সর্বনাশ।' স্বাজাত্যবোধ বা দেশপ্রেম যা উনিশ শতকীয় ভারতের নব জাগরণেরই আর এক লক্ষণ তাও তাঁর কাব্যে প্রায়শঃ দৃষ্ট। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি মোর বাংলা ভাষা'—মাতৃভাষার এই প্রশস্তিতে দেশপ্রেমের যেমন একদিক প্রকাশিত, ভারত লক্ষ্মীর বন্দনাগানে ('উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা,/দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।') তারই আর একটা দিক প্রতিফলিত। মাতৃ-ভূমির মুক্তিযজ্ঞে তিনি সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন: 'এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান/এসো হে পারসীক, বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান/মিল হে মায়ের চরণে'। (তুলনীয়: রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'।) 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে,'—'সাথে আছে ভগবান, হবে জয়'—পরাধীনতার বন্ধন মুক্তি প্রয়াস-কালে দেশবাসীর মনে ইত্যাদি বাণীর প্রেরণা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী গানের মধ্যেও তাই কবি অতুলপ্রসাদ অমর হয়ে থাকবেন।

তাঁর প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাতেও মানব-ধর্ম আরোপিত, যা রোমান্টিক কবিকুলেরই আর এক বৈশিষ্ট্য। আর তাঁর কাব্যে প্রকৃতি ত বিশ্বদেবতারই প্রতিভাস—দেবতার ত্রিভুবনব্যাপিতার প্রমাণই ঐ প্রকৃতি। এই ত অরূপের রূপের খেলা। অবশ্য তদাত্মক প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাও তাঁর রচনায় আছে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গীতিগুঞ্জ' গ্রন্থের ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭ সংখ্যক ঋতু পর্যায়ের কবিতাগুলির নাম করা যেতে পারে।) তাঁর বিশেষ কাব্য-প্রতীতি স্মরণে এ কথা বলা যায়, প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাতেও তিনি অবশ্য-আলোচ্য কবি।

স্বভাবকবি অতুলপ্রসাদ। কাব্যাঙ্গিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি তাঁর নেই, আপন মনে অকারণে আজীবন গান গেয়ে যাওয়াও তাঁর অভিপ্রেত, তাই নিরাভরণ ঋজু সারল্যই তাঁর রচনার সৌন্দর্য। রচনা গান বলে কবিতার ছন্দের শিকলেও তাকে সর্বত্র বাঁধা যাবে না। আধ্যাত্মিকতার সাধারণ পথে আপন মনের অজ্ঞাতেই তাঁর রচনায় রামপ্রসাদী উপমা-অলংকার, চিত্রকল্পের ব্যবহার দেখা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই', 'মন রে আমার তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়' ইত্যাদি পংক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কাল খেয়ার মাঝি', 'জীবন-জমিন', ভবের হাটে'র ইত্যাদি রূপকের শোভন-প্রয়োগ কিংবা 'নিঠুর দরদী'র মত বিরোধাভাস অলংকারের সুষ্ঠু ব্যবহার যে কোন প্রকরণ-সচেতন কবিরও ঈর্ষার কারণ হতে পারে। বক্তব্য হচ্ছে: ঘরোয়া সহজ চিত্রকল্পে ও রূপক প্রয়োগে কবিতার রসমূর্তি গঠনে অতুলপ্রসাদের অনায়াসসিদ্ধি অননুকরণীয়।

আলোচনায় মোটামুটি স্পষ্ট যে, আপন সাধনার রাজ্যে অতুলপ্রসাদ সাধক-কবি হলেও, প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায়, স্বদেশী গানে ও মানব-সম্পর্কিত কবিতায় উনিশ শতকীয় নবজাগরণভাবপুষ্ট অতুলপ্রসাদের যে ত্রিবিধ কবি-ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ে তা বাংলা সাহিত্যে বিরল দর্শন।

এ কথাটা মানতেই হবে: অতুলপ্রসাদের কাব্যা-

বেদন প্রধানতঃ গীতি-মাধ্যমে। সুরের বিমূর্ততার সঙ্গে তাঁর গানে কথার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম ঘটেছে। বাংলা-গীতি সাহিত্য-সাধক পঞ্চরত্নের মধ্যে তিনি এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বলা বাহুল্য অপর চারজন—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও নজরুল।

সব গান কাব্য হয় না। সুর দিয়ে ভাব ধরে যে ওস্তাদি কালোয়াতি তা গান হ'তে পারে, কাব্য নয়। অতুলপ্রসাদ সুর দিয়ে ভাব ধরেছেন সত্য, কিন্তু তাকে কথা দিয়েও বেঁধেছেন। এবং সেখানে তিনি কবি-গীতিকার, অন্য এক অর্থেও গীতি-কবি।

এ কথাটা বলতেই হবে : বিশেষ গীতি-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মত অতুলপ্রসাদও চিরন্তনী স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন। ফরমায়েসী কৃত্রিম কথায় সাজান, চটুল সুরে গীতি তথাকথিত আধুনিক গানের দৌরাত্ম্য যখন অসহ্য হয়, তখন 'কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা ?'-র কবিকে মনে পড়ে, বড় বেশী করে মনে পড়ে। বর্তমান শূন্যতাই প্রাক্তন পূর্ণতার প্রমাণ।

বাংলা গীতি-সাহিত্যে তথা সাহিত্যে তাঁর অবদান সেখানে স্বতঃস্বীকৃত, অতুলপ্রসাদ সেখানেই অতুলনীয়।

———

একপক্ষে ক্ষমতা ও অপরপক্ষে ভয়, ইহাতে মানুষ গড়ে না। চরিত্র গঠন এ উপায়ে হয় না। শিক্ষক যদি ছাত্রকে ভালবাসেন, তাহা হইলে ছাত্র স্বভাবতঃ শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তী হয় এবং তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণসকলের প্রভাবে ছাত্রের সদ্‌গুণসকলের বীজ অঙ্কুরিত ও ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২০

একটি প্রতিশোধের কাহিনী

শৈবাল চক্রবর্তী

ওই গালভাঙা কোমর দুমড়ে-পড়া লোকটাকে আমি চিনি। বছর কয়েক আগে একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে দিয়ে ওর চেহারা আমার মনের মধ্যে ছাপ ফেলে গেছে। সেই থেকে ওকে ভোলা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার এই অংশটায় যেখানে আমার যাতায়াত একটু বেশী ওকে আমি প্রায়ই দেখি। ·হয় পান খেতে কিংবা রাস্তা পেরোতে গিয়ে বাসের হর্ণ শুনে থতমত খেয়ে যাওয়া ওর চেহারা যেন ঘুরে-ফিরে আমারই চোখে পড়বে। যেই ওকে দেখা অমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুলভাবে আমার চোখে ভেসে উঠেছে সাত বছর আগে দেখা সুধীনবাবুর দোকানের সেই দৃশ্য। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতন ওই ঘটনাটা আমার মনের তলা থেকে হুস্ করে ভেসে ওঠে সব কিছুর ওপরে। এ থেকে আমার মনে হয় স্মৃতিগুলি পর-পর সাজানো থাকে এবং তাদের সঙ্গে জড়িত কোন কিছুর স্পর্শ পেলে তারা জেগে ওঠে। লোকটা সেই দিনের ঘটনাটা যেন আজও ওর সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অথচ ব্যাপারটা সামান্য, এই শহরের নানাবিধ দুর্ঘটনা দুর্নীতি এবং মহৎ অনুষ্ঠানাদির মধ্যে—তার যে কোন মূল্যই নেই সে আমি ভাল করেই জানি কিন্তু আকস্মিকতায় তা আমার সেই তরুণ মনের ওপর এক গভীর স্পষ্ট ছাপ ফেলে গেছে। জানি না আগামী দিনে আমার বয়স আরও বাড়লে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার জটিলতার জঙ্গলে আমি তাকে হারিয়ে ফেলব না কৃপণের ধনের মত তাকে তখনও পুষে রাখব, এখন যেমন রেখেছি।

ঘটনাটি চকিত, বিদ্যুৎ চমকে যাওয়ার মত এক মুহূর্তের। রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে সেই চায়ের দোকানটি, যার চা এবং ওমলেটের প্রসিদ্ধি সারা দক্ষিণ কলকাতায়, আপনারা হয়ত অনেকেই দেখেছেন। ছাত্রাবস্থায় সেখানে আমার নিত্য যাতায়াত ছিল। ওই দোকানের কাছেই একটি দু'ঘরওলা ফ্ল্যাটে আমি এবং আমার এক পিসতুতো ভাই থেকে পড়াশুনো করতাম। বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। স্ট্যাটিসটিক্স-পড়া আমার দাদা ছিল চা-রস থেকে বঞ্চিত। কাজেই আমাকে একা সকালে মুখ ধুয়ে সুধীনবাবুর দোকানে গিয়ে বসতে হ'ত। সেই তারুণ্যের প্রভাতে এক কাপ ধোঁয়া-ওড়া চায়ের দাম যে কি তা যাঁদের চায়ের নেশা আছে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন।

বলেছি সুধীনবাবুর দোকানের চা ছিল বিখ্যাত। সুধীনবাবুও খ্যাতনামা ছিলেন তাঁর মেজাজের জন্য। এমন রগচটা মানুষ সে বয়সে আমি আর দেখি নি। অত্যন্ত সামান্য কারণে এবং কখনও কখনও অকারণেও তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত এবং সে অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে এমন ভাষা বেরোত যে তা শুনলে তিনি আদৌ ভদ্রলোক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগত। অথচ পোষাকে বা চেহারায় তাঁকে অভদ্র মনে করবার কোন কারণ ছিল না। পাটভাঙা ধুতি এবং দু'টি বুক পকেট-ওলা সাদা হাফসার্টে তিনি সবসময় ধোপদুরস্ত থাকতেন। পায়ের জুতো, তাঁর পালিশ দেওয়া চকচকে এবং মাঝখান দিয়ে সিঁথি করে চুল অতি পরিপাটি করে আঁচড়ানো। অফিসে কাজকরা লোকেরাও সাধারণতঃ এতটা ফিটফাট থাকতে পারে না। দোকানের দরজার একপাশে তাঁর চেয়ার টেবিল সেখানে বসে তিনি খাবারের দাম নেন, ছোকরা বয়টিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। লোকে খাবে, তাদের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে চলে যাবে—ঝগড়া-ঝাঁটির কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। অথচ তাঁর টেবিলে পয়সা দিয়ে যাবার সময় এমন একজন খদ্দেরও যেত না যার সঙ্গে তাঁর একটু কথা কাটাকাটি না হ'ত। ওইখানে বসেই তিনি 'বয়কে' কাপ-ডিস তুলতে, টেবিল পুঁছতে বলছেন, পয়সা নিচ্ছেন হিসেব করে কিন্তু এক-জনের বেশী দু'জন খদ্দের একসঙ্গে তাঁর টেবিলে পয়সা ফেললেই তাঁর মেজাজ যেত বিগড়ে। তিনি চোখ পাকিয়ে দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'একটু তর সয় না না কি? ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন সব?' খদ্দেরের সামান্য অন্যমনস্কতা ও একটু জোরে হাসাও তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাত। ওমলেট ভাজতে ভাজতে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে শম্ভু বলত, 'বাবু আপনাকে কি দেব?' ভদ্রলোক এসেই হয়ত আনন্দবাজার খুলে বসেছেন, তাঁর চোখ সেখানে, অন্যদিকে মন নেই। সুধীনবাবু আড়-

চোখে একবার তাকাতেন তাঁর দিকে। শম্ভুর দ্বিতীয় ডাকেও তাঁর হুঁশ হ'ত না। ভদ্রলোক সম্পাদকীয়তে নিজেকে হারিয়ে বসে আছেন। সুধীনবাবু এবার চেয়ার থেকে উঠে তাঁর সামনে গিয়ে হাত দু'টি জোড় করে খুব বিনীত ভাবে বলতেন, 'আপনাকে কি দেবে?' বলা বাহুল্য ভদ্রলোক চমকে উঠতেন। উপস্থিত খদ্দেরদের মধ্যে কেউ কেউ হেসে ফেলল। ভদ্রলোক একটু গোবেচারীর মত হেসে অর্ডারটা দিয়ে ফেলে লজ্জা থেকে রক্ষা পেতেন। সুধীনবাবুর মুখে কিন্তু রসকষের চিহ্নমাত্র নেই। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে যাতে সবার কাণে যায় এমনভাবে বলতেন, 'যা বাব্বা, কাগজ পড়তে গিয়ে যে লোকে কালা বনে যায় তা এই প্রথম দেখলাম।'

মনে হ'ত দোকানে লোকজন আসাতে অন্য দোকানদারদের মত তিনি খুশী হতেন না বরং ভাবটা এমন দেখাতেন যে তাঁর দোকানে আসতে পেরে তারাই কৃতার্থ হয়েছে। কখনও কোন খদ্দেরকে আপ্যায়ন করতে বা সম্মান দেখাতে আমি দেখি নি তাঁকে। কেউ চার আনা কি আট আনার খেয়ে একটা টাকার নোট দিলেই তাঁর মুখ অপ্রসন্ন আষাঢ়ের মেঘ হয়ে উঠত। কিন্তু যদি একজন ওই রকম নোট দেওয়ার পরই আরও একজন এসে একটা নোট এগিয়ে দিত তাহলে সেই মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ চমকে উঠত এ বহুদিন দেখেছি। দুম্ করে দেরাজটা বন্ধ করে দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন, 'নাও, আমি যেন টাঁকশাল খুলে বসেছি। সব বাবুরা দিস্তে দিস্তে নোট নিয়ে আসছেন, আমাকে তাঁদের ভাঙ্গানি যোগাতে হবে।' খদ্দেরটি ভাল এবং ভীতু হ'লে ওই বাঘমুখ দেখেই সরে পড়ত আর কিছু বলত না কিন্তু একটু আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ না করে পারত না। 'সে কি, আপনার কাছে একটা টাকার ভাঙ্গানিও পাওয়া যাবে না? এ কেমন ধারা কথা…!' 'না, যাবে না।' সুধীনবাবুর সাফ জবাব। এরপর আর কি কথা চলে। লোকটি 'বা রে। আশ্চর্য লোক' ইত্যাদি স্বগতোক্তি করতে করতে প্রস্থান করত।

আমি নিজে খুবই অস্বস্তিবোধ করতাম এই সব দেখে। তখন আমার বয়স কম ছিল বলে স্বাভাবিক কারণে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার স্পৃহা ছিল প্রবল। কিন্তু এমনিতে আমি স্বভাব-ভীরু তাই মনের মধ্যে হাজার বিক্ষোভ দানা বাঁধলেও কাজে কিছু করে উঠতে পারতাম না। বসে বসে রাগে ফুঁসতাম। ইচ্ছে করত সুধীনবাবুর বিরুদ্ধে আরও পাঁচজনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে। কিন্তু দেখতাম প্রায় সবাই সুধীনবাবুর দোকানের ভাল চা আর বদমেজাজের সঙ্গে অভ্যস্ত। খদ্দের যা আসত, প্রায় সবাই বাঁধা, নিয়মিত দু'বেলা এখানে তাদের পায়ের ধুলো পড়ে। এদের মধ্যে জীবনে হতপ্রভ, পেছিয়ে পড়া, নিরুৎসাহ মানুষের সংখ্যাই বেশী; অল্প আলোর বাল্বের নীচে বাংলা কাগজে কর্মখালি দেখতে দেখতে এক কাপ চা নিয়ে এরা অনেকক্ষণ বসে থাকে কিংবা তিনদিনের দাড়ি গালে নিয়ে রেসের ছোট বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজেদের ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলে। ঠিক আমার মতন কাঁচা বয়স, সামনে ভবিষ্যতের রাস্তা খোলা এবং জীবনে ধাক্কা-না-খাওয়া লোক প্রায় কাউকেই দেখতাম না। এই মুমূর্ষু মানুষগুলির ওপর চোখ রাঙ্গিয়ে রাজত্ব করবার অপ্রতিহত সুবিধে ছিল সুধীনবাবুর।

তখন না বুঝলেও এখন বুঝতে পেরেছি যে সুধীনবাবুর সম্বন্ধে একটা ভয় আমার মনের মধ্যে বাদুড়ের ডানা মেলে রেখেছিল। ভদ্রলোকের শরীরে যে শক্তি ছিল তা বোঝা যেত এবং গলার আওয়াজ ছিল অত্যন্ত ভারী আর রাগলে চোখ-মুখও হ'ত তেমনি মেলায় কেনা মুখোশের মত পিলে চমকে দেওয়া। সুধীনবাবু বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। এই সব কারণে তাকে ভয় না করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। কোন দিন তাঁর সঙ্গে আমি একটার বেশী দুটো কথা বলি নি। আমি যে তাঁর দোকানের একজন নিয়মিত খদ্দের তা বোধ হয় সুধীনবাবুর নজরে পড়ে নি কোনদিন। তাঁর দোকানে কেউ আসুক, তাঁর খদ্দের বাড়ুক এ বোধ হয় তিনি চাইতেন না। আমার মনে হ'ত পাঁচটা লোককে পেয়ে তাদের গাল-মন্দ দিয়ে মুখের সুখ করার জন্যই সুধীনবাবুর এই দোকান খোলা।

আমার মত অনেকেই যে সুধীনবাবুর এইরকম ব্যবহারে অল্পবিস্তর অসন্তুষ্ট, বিরক্ত হ'ত তা বুঝতে পারতাম। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলত না। সেটা হয়ত তাঁর ভয়ে নয়ত শম্ভুর তৈরি চা ওমলেটের গুণে। তাঁর বন্ধু এবং অনেকদিনের পরিচিত যাঁরা তাঁদেরও সুধীনবাবুর মেজাজের আগুনে আঙ্গুল পোড়াতে হ'ত মাঝে মাঝে। একজন আসত কমলেশ বলে, একটু দিলদরিয়া মানুষ, তার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল বলেই মনে হ'ত। আর সে খেতও অনেক টাকার। কমলেশের অভ্যাস ছিল টেবিলে বসে, 'ওরে শম্ভু একটা ডিম দে', বলে হাঁক দেওয়া। সুধীনবাবু তা শুনে বলতেন, 'আচ্ছা

শুধু ডিম বল কেন, ভাজা কি সেদ্ধ তা বলতে পার না?' কমলেশ হেসে বলত, 'ও শম্ভু ঠিক জানে।' সুধীনবাবু এ জবাবে খুশী হতেন না বরং বিড়বিড় করে কি বলতেন। আরও একদিন দেখলাম শুধু ডিম বলতে সুধীনবাবু বেশ চটেমটে উঠলেন। কমলেশ নির্বিকার, সে টেবিল ঠুকে তবলা বাজাচ্ছে—গানের স্কুলে তবলার মাষ্টার ছিল সে। তিনবারের বার হল মজা। কমলেশ যথারীতি যেই বলেছে, 'ওরে শম্ভু, একটা ডিম আর দুটো টোষ্ট দ দিকি ঝটপট। অমনি সুধীনবাবু অতি সন্তর্পণে তাঁর চেয়ার থেকে উঠে বোয়ম থেকে একটি ডিম কাচের ডিশে রেখে তা কমলেশের সামনে টেবিল রেখে দিলেন। কমলেশ অবাক! তবলা বাজান বন্ধ করে সে বলল, 'এ কি?' সুধীনবাবু মুখে ভালমানুষীর মাখন মেখে বললেন, 'কেন, এই ত চেয়েছিলে তুমি। এটা কি ডিম নয়?' একটা হাসির হর্‌রা উঠল। কমলেশ অপ্রস্তুতের একশেষ। শম্ভুর মুখেও মিটিমিটি হাসি। সুধীনবাবুর কিন্তু হাসতে মানা। তিনি তাঁর বাঘ-মুখ নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মত।

এইবার আসা যাক আসল ঘটনায়। এই লোকটি সুধীনবাবুর অপরিচিত এবং সেদিন বোধ হয় ছিল তার এই দোকানে প্রথম পদার্পণ। কিন্তু সুধীনবাবু সেই প্রথম দিনেই তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন তা আমি কোনদিন ভুলব না। লোকটির চেহারার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই। ওরকম রোগে-ভোগা দুর্বল চেহারার লোক কলকাতায় অসংখ্য। লোকটা বেঞ্চের একধারে বসেছিল, বোধ হয় খুব ক্লান্ত ছিল, কেননা জোরে জোরে নিশ্বাস টানছিল। বেঞ্চের ওপর পা তুলে বসে কপালের ঘাম মুছে সে বলল, 'একটা চা দিস রে ভাই।' গলাটা আচমকা এবং জোরাল—যেন সে তার ইয়ার-বন্ধুদের আড্ডায় কথা বলছে। সুধীনবাবু তখনই রক্তচক্ষু নিয়ে তার দিকে একবার তাকালেন। ওইভাবে আকাটের মত শব্দ করে বেঞ্চে বসা এবং জোর গলায় চায়ের অর্ডার দেওয়া তাঁর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। লোকটা ইতিমধ্যে পাখার দিকে তাকিয়েছে। সুধীনবাবুর দোকানের পাখা একটি বিশেষ গতিতে ঘুরত। আবহাওয়ার পরিবর্তনে তার গতির কোন হেরফের হ'ত না। লোকটা হঠাৎ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে 'দূর দূর, এ যেন সেই মিরগি রুগীর মত চলছে' বলে রেগুলেটারটায় মোচড় দিয়ে সেটা একেবারে শেষ প্রান্তে ঠেলে দিল। পাখাটা যেন প্রাণ পেল, টেবিলের খবরের কাগজটা ফুলে উঠল। লোকটা ভাল করে 'আঃ' বলবার আগেই সুধীনবাবু তাঁর চেয়ার থেকে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠেছেন, 'এই যে নবাবপুত্তুর, পা-টা বেঞ্চি থেকে নামিয়ে ব'সো। এটা চায়ের দোকান, শুঁড়িখানা নয়।' লোকটা উত্তরে ভুরু কুঁচকে সতেজে বলল, 'তুমি' বলছ কেন? বলে আরও একটা পা বেঞ্চের ওপর তুলে বসল। সঙ্গে সঙ্গে এক কাণ্ড ঘটল। সুধীনবাবু তড়িৎ গতিতে তাঁর জায়গা থেকে উঠে লোকটার সামনে এসে বললেন, 'এই, ভাল হয়ে ব'সো বলছি।' তাঁর চোখ লাল এবং সে ভঙ্গি দেখলে অতি-বড় সাহসীরও বুক কাঁপবে। লোকটা তাঁর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি না ভদ্রলোক।' এরপরই আমি দেখলাম, সুধীনবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে সজোরে একটি প্রচণ্ড চড় মারলেন লোকটির গালে। আমরা সবাই স্তম্ভিত। চায়ে চিনি গুলতে গুলতে শম্ভুর হাত থেমে গেল এক কি আধ মুহূর্তের জন্যে। সুধীনবাবু ততক্ষণে তার ঘাড় ধরেছেন এবং তুলে দাঁড় করিয়ে এক ঠেলায় তাকে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, 'যা বেরো এখান থেকে। নবাবী করবি অন্য দোকানে গিয়ে।' লোকটার অবস্থা অবর্ণনীয়। মারের চেয়ে অপমানবোধে সে কাহিল হয়েছিল বেশী। কোনরকমে টাল সামলে দাঁড়িয়ে নিয়ে সুধীনবাবু কিংবা তাঁর দোকানের দিকে আঙুলে তুলে বলল, 'কি আমায় মারলে! মারলে তুমি···বেশ! তোমার ওই হাত যদি না আমি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছি তবে আমার নাম··· নয়।' লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে এমন ভাবে কান্নার বেগ সামলাচ্ছিল যে তার কথাগুলি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। সুধীনবাবুর আর তার দিকে নজর ছিল না। তিনি রেগুলেটারটা ঠেলে পুরনো জায়গায় এনে ঘটির জলে হাত ধুয়ে তাঁর জায়গায় এসে বসেছিলেন অবিচল গাম্ভীর্য নিয়ে।

এর বেশী কিছু ক'রতে পারল না লোকটা। নীরবে অপমান সয়ে পায়ে পায়ে সরে গেল সেখান থেকে। আমার যেন হাত মুঠো হয়ে আসছিল। দোকানে টিকতে পারলাম না। বাইরে সিগারেটের দোকানে গিয়ে দেখি লোকটা আধ-পাগলের মত চেহারা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে কৌটো খুলে বিড়ি ভরছে। আমার দেশলাই থেকেই একটা বিড়ি ধরিয়ে সাঁই সাঁই করে তাতে দুটো টান দিয়ে বলল, 'দেখলেন ত, দেখলেন ত লোকটার ব্যবহার! গায়ে জোর আছে বলে যা ইচ্ছে তাই করবে! ছোটলোক কোথাকার! ঠিক আছে আমিও ওকে দেখে নেব। কালীঘাটের সব গুণ্ডা আমার হাতধরা, যে হাতে আমায় মেরেছে ও, সেটা যদি আমি

ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে না দিয়েছি তবে আমার নাম…' বলে ও একটা নাম বলল। আমি বুঝতে পারছিলাম একথা শুনে তখনকার মত আমার বুক জুড়োল। এতদিনে ভগবান হয়ত এই লোকটার হাত দিয়েই সুধীনবাবুর সব অন্যায়ের শাস্তি পাঠিয়ে দিলেন। কল্পনায় সুধীনবাবুর কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাওয়া, কাঁপতে কাঁপতে মাপ চাওয়ার ছবি দেখে আমি তৃপ্ত, উল্লসিত হয়ে উঠলুম।

এরপর কয়েক বছর কেটে গেছে। অন্যান্য অনেক কিছুর মত এই সামান্য ঘটনাও আমি ভুলে যেতাম যদি না ওই লোকটা প্রায়ই আমার আসা-যাওয়ার পথ জুড়ে বসে থাকত। পরে আবিষ্কার করেছিলুম ভবানীপুরে যে হাইস্কুলে আমি পড়তাম তার উল্টোদিকে একটা মটরের কারখানাতে ও কাজ করত। সংসারে এতরকমের কাণ্ডকারখানা ঘটছে যে তার সব মনে রাখা সম্ভব নয় এবং সে চেষ্টাও আমি করি নি। নিজের অনেক ঝামেলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি এবং দুর্ভাবনা বেড়েছে বিস্তর। আগে কায়মনোবাক্যে বড় হতে চাইতাম কিন্তু সত্যি সত্যি বড় হয়ে দেখছি বিপদ এত বেশী যে, এই সিন্দবাদের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই বাঁচোয়া। এইরকম ছেঁড়া ছেঁড়া মন নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে-ফিরতে লোকটাকে যখনই দেখেছি তখনই ওর জন্যে আমার মনে অনুকম্পা জেগেছে। দেখেছি ও কিসের ভারে নুয়ে পড়েছে। বিড়িতে এখন আর তেমন জোর করে টান দিতে পারে না, বরং হাঁপায়। ওকে দেখে আমার ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলতে ইচ্ছে করেছে, 'কি মশাই, খুব ত প্রতিশোধ নিলেন। সুধীনবাবুর হাত-পা একেবারে গুঁড়িয়ে দিলেন বলতে গেলে। দেখুন গিয়ে তাঁর অবস্থা। দিব্যি তিনি রাজত্ব করছেন আগেরই দাপটে! কবছর ইস্কুল মাষ্টারী করে আমি বুঝেছি যে ভগবান-টগবান এখন বুজরুকি। দুধে জল মেশানোর সময় কেউ না দেখলেই হ'ল। জোলো দুধ খেয়ে যদি কেউ গয়লার বাপান্ত করে তবে তাতে তার গরু মরে না, ঘরেও বাজ পড়ে না। এই কয়েক বছরে অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ীর মত সুধীনবাবুও নিজের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন। আগের সেই ন্যাড়া দেয়াল আর নেই এখন সেখানে ঝুলছে কাশ্মীর সিমলার দৃশ্য, লাস্যময়ী চিত্রাভিনেত্রীর লুব্ধ ভঙ্গিমার ছবি। চায়ের কাপ এখন কুড়ি পয়সা হয়েছে, ডবল ওমলেট পঁচাত্তর। দুটো বয় অর্ডার যোগাতে হিমসিম খেয়ে যায়।

বেহালায় জমি কিনেছেন, শুনতে পাই ওই দোকান চালিয়েই। তা হ'লে কতটুকু ভোগান্তি হ'ল তাঁর আর তুই ত বেটা প্রায় ফুরিয়ে এলি আর যতটুকু দম আছে তোর ওই পুঁটিমাছের মত বুকে, বিড়ি টানতে টানতেই তা একদিন শেষ হয়ে যাবে। ঠিক সময় হলে পাজী লোক তার ফল পাবে কংস কি দুঃশাসনের মত, এ নীতিকথা এখন উল্টে গেছে। সেদিন যদি নিজের পেশী ফুলিয়ে সুধীনবাবুকে দু' চার ঘা ঝাড়তে পারতিস তবে তোকে আমি বাহাদুর বলতাম।

এ সব কথা নিজের মনেই ভাবতাম লোকটাকে দেখে দেখে কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যাতে লোকটার সঙ্গে আমায় কথা বলতে হ'ল। ঘটনা নয় দুর্ঘটনা। ওই সিনেমা হাউসটার সামনেই একটা সিমেন্ট-বোঝাই লরী ছুটে আসছিল দুদ্দাড়ে আর তার সামনে একটা বছর সাতেকের ছেলে পড়ি-কি-মরি করে রাস্তা পার হচ্ছিল। আমি দেখছিলাম নির্ঘাৎ মৃত্যু ভয়ংকর চেহারা নিয়ে ধেয়ে আসছে। একটা গেল গেল চীৎকার উঠল। রাস্তার ধারে বসে ওয়েল্ডিং করতে করতে ওই লোকটা হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীরের মত ছুটে গেল। এক মুহূর্তের জন্য ও যেন সবাইকে সার্কাস দেখিয়ে গেল। কেননা আমরা চোখের পলক ফেলে দেখি লরিটা ব্রেক কসে দাঁড়িয়ে, আর ছেলেটাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে ও ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে। চকোলেট হাতে ছেলেটা ত ভয়ে কাঠ! তার চোখমুখ শুকিয়ে গেছে।

আমি যখন ওপারে গেলাম তখন সেখানে ছোটখাট একটা ভীড় জমে গেছে। ফর্সা টুকটুকে ছেলেটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটা বলছে "খুব চকোলেট খাওয়া না? নিশ্চয় পয়সা চুরি করে খেয়েছিস? বল, কোথায় পয়সা পেলি?"

"খুব বাঁচিয়েছেন কিন্তু আপনি যা হোক। নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে এই রকম" পথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে যাওয়া একজন মন্তব্য করল।

"বাঁচিয়েছি কি মশাই, আর একটু হলেই আমার প্রাণটা ত গিয়েছিল।" ঘড়ঘড়ে গলায় লোকটা বলল পকেট থেকে বিড়ির কৌটো বার করে।

ভীড় সরিয়ে আমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ছেলেটাকে ভাল করে দেখার ইচ্ছে ছিল আমার। যেই আমার দিকে চোখ পড়ল তখনই ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল একেবারে।

লোকটা বোঁ করে আমার দিকে ফিরে বলল, "কি, চেনেন না কি ?"

"হ্যাঁ, ওর বাবার সঙ্গে আলাপ আছে।"

"কোথায় বাড়ী বলুন ত এদের ?"

"বাড়ী ঠিক চিনি না। রাসবিহারীর মোড়ে ওর বাবার চায়ের দোকানে আমার যাতায়াত আছে। দোকানটাই শুধু চিনি।

আমি আশা করেছিলাম লোকটা বিছের কামড় খেয়ে লাফিয়ে উঠবে, রাগের মাথায় ছেলেটার গালে একটা চড় কষিয়ে দেবে, অন্তত উল্টো দিকে হনহনিয়ে হাঁটা দেবে। কিন্তু সে সব কিছু না করে ও যা করল তাতে অবাক হওয়ার চেয়ে আমার গা জ্বলতে লাগল বেশী। আমি কথা শেষ করতেই, ও নীচু হয়ে ছেলেটার গালটা ধরে হেসে বলল, "তোর বাবাকে বলিস একদিন তোদের দোকানে গিয়ে বিনি পয়সায় চা খেয়ে আসব, বুঝলি খোকা ?" বলে তেমনি হাসতে হাসতে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল। সেদিন ওর কান্না দেখেছিলাম আজ দেখলাম হাসি।

লাইনোটাইপ

জুলফিকার

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলছি।

তখন এদেশে খবরের কাগজের আপিসের সামান্য মাইনের কম্পোজিটারেরা, নীচের স্বল্পালোকিত গুদামের মত প্রেস ঘরে, শরীর পাত করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কাঠের পায়ার ওপর হেলানো টাইপ কেসের উপর ঝুঁকে পড়ে ছোট্ট চিমটের সাহায্যে বিভিন্ন খোপ থেকে অক্ষর তুলে তুলে সাজিয়ে দেশ-বিদেশের নানারকম খবর প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

সে যুগে একখানা আট পৃষ্ঠার বেশী দৈনিক পত্রিকা কদাচিৎ চোখে পড়ত। তখনকার দিনে প্রায় সব প্রেসেরই অক্ষর ভাণ্ডার ছিল সীমিত। কাজেই এক-সঙ্গে ছাপা হবার মত দু'পাতার ম্যাটারে অনেকগুলো টাইপ আটকা পড়ায়, বাকী পাতাগুলো ছাপবার জন্যে, আগের দু পাতা ছাপা শেষ হয়ে যাবার পর, লোহার ফ্রেমে আঁটা চাপবাঁধা অক্ষরগুলোকে ভাল করে ধুয়ে, ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে, ক্রু ঢিল করে আলগা করবার পর চিমটে দিয়ে খুঁটে খুঁটে, যার যার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত। তারপর টাইপ কেস থেকে তুলে তুলে পুনরায় নতুন কম্পোজের কাজ সুরু হ'ত।

পুরাণো টাইপগুলো, এইভাবে দিনের পর দিন ক্রমাগত ব্যবহারে, ক্ষয়ে গিয়ে—'খ' হয়ে পড়ত 'থ'-এর মত, 'ট' হ'ত ঢ-এর মত, 'ধ' 'ব'-এর মত। অর্থাৎ মুচিরাম হয়ে পড়তেন ঘটিরাম। খবর জানবার আগ্রহে তখনকার পাঠকেরা আক্ষরিক ত্রুটিবিচ্যুতি অনেকটা উপেক্ষা করেই চলতেন।

সত্তর-আশী বছর আগে ইউরোপ বা আমেরিকার বেশীর ভাগ সংবাদপত্রের অবস্থা এর চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না। তবে টাইপের অবস্থা অনেকটা ভাল ছিল, এই যা।

সেকালের সাময়িক পত্রিকা বা ম্যাগাজিনগুলোর কলেবর ছিল ক্ষীণ, তাদের সংখ্যাও ছিল অল্প।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) মাত্র ছিয়াত্তরটি পাবলিক লাইব্রেরীতে তিনশর বেশী বই ছিল। আমাদের দেশের মত ওদের দেশেও একই বই ইস্কুলে ঠাকুরদার পর বাবা এবং বাবার পর নাতিও পড়ত।

* * *

টাইপরাইটার আবিষ্কার হবার পর থেকেই প্রেস ব্যবসায়ীদের মাথায় খেয়াল চাপল—তাই ত, কম্পোজিশনের জন্য এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব কি না—যার সাহায্যে খুব দ্রুত অক্ষরগুলো সাজিয়ে ফেলা যেতে পারে ?

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এই কম্পোজিং মেশিন তৈরীর প্রচেষ্টা চলছিল, প্রথম কম্পোজিং মেশিন বার করলেন, ইংল্যাণ্ডের ইয়ং ও ডেল্‌কাম্বার (Young and Delcamber)। বিলেতের TIMES কাগজ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই নবাবিষ্কৃত ক্যাষ্টেনবিয়েন যন্ত্রের সাহায্যে ছাপা হ'তে লাগল। ইংল্যাণ্ডে এরপর আরও দুই ধরনের কম্পোজিং মেসিন নির্মিত হ'ল—ফ্রেজার ও বাটারশ্লে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজেণ্ডার ম্যাকি আরও একটু উন্নত ধরনের যন্ত্র তৈরী করলেন—এর নাম হ'ল ওয়ারিংটন মেশিন। এরপর ১৮৭৬ সালে থর্ণের (Thorne) কম্পোজিং মেশিন প্যারীর একজিবিশনে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া সিমপ্লেক্স, ডাউ (Dow), এম্পায়ার প্রভৃতি আরও কয়েকরকম টাইপ-সেটিং যন্ত্র বাজারে বার হয়েছিল।

প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন তাঁর উপার্জিত বহু অর্থ এইরূপ একটা অক্ষর সংযোজন কল তৈরীর জন্যে ব্যয় করেন। এই যন্ত্রটি ছিল বিরাট। এর কমসে কম আঠার হাজার বিভিন্ন অংশ ছিল, তৈরী করতে মোট খরচা পড়েছিল দেড় লক্ষ ডলার। এই যন্ত্রটির নামকরণ হয়েছিল পেজ (Paige) কম্পোজিং মেশিন। এই বিশাল যন্ত্র দানবকে চালনা করতে পারতেন কেবল তার আবিষ্কর্তা মিঃ পেজ। তাঁর দুজন সহকারী কল চালানোর কৌশলটা আয়ত্ত করতে গিয়ে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলেন। হবারই কথা।...দুশো পাঁচশ নয়, আঠারো হাজার কলকজার পৃথক পৃথক ব্যবহারের কথা মনে করে রাখবার জন্য অমানুষিক স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন।

এই যন্ত্রটির সহজীকরণের জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টায়ও স্বল্প ব্যয়, দ্রুত অক্ষর সংযোজন কাজে কেউ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

টাইপগুলোকে তাদের নিজ নিজ ঘর থেকে উঠিয়ে সাজানো ও তারপর আলাদা করে যার যার খোপে ফিরিয়ে আনা—এই দুটোই হচ্ছে ছাপার কাজের গোড়ার ও শেষ কথা—প্রথমটা হচ্ছে কম্পোজিং, দ্বিতীয়টি ডিষ্ট্রিবিউটিং। থর্ণ ও সিমপ্লেক্স যন্ত্র এই দুই কাজই একসাথে হ'তে পারত। অন্যগুলোয় কম্পোজিশান ও ডিষ্ট্রিবিউশান পৃথক ভাবে হ'ত।

*

মার্কিন মুলুকে জেমস ক্লিফেন বলে একজন কোর্ট ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। আরও উন্নত ধরনের টাইপ-রাইটার তৈরী করে তারই সাহায্যে নথীপত্র আরও জলদি কপি করা যায় কি না—এই কথাটা তাঁর মাথায় ঘুরছিল।

পেটেণ্ট আফিসে গিয়ে ক্লিফেন প্রায়ই খোঁজ নিতেন ওদের সন্ধানে হালে নতুন মডেলের টাইপরাইটার তৈরী করেছেন, এমন কোন লোক আছেন কি না!

আবিষ্কারক ডেনস্‌মোর ও পোলকে তাঁদের উদ্ভাবিত টাইপ মেশিনকে উন্নততর করবার বিষয়েও ক্রমাগত উৎসাহিত করতে লাগলেন। অবশেষে ক্লিফেনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অর্দ্ধ সমাপ্ত একটা মেশিন তৈরী হ'ল, যেটা ঠিক মত চালু হ'লে আদালতের রেকর্ডগুলো আরও তাড়াতাড়ি ছাপতে পারা যাবে।

ক্লিফেনের কী-বোর্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও, যন্ত্রপাতির কাজে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যা হোক, নতুন যন্ত্রটা সঙ্গে নিয়ে তিনি বাল্টিমোর সহরে এলেন। এখানে দৈবক্রমে একজন তরুণ জার্মান কারিগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। এই যুবকটির নাম ওট্মার মারগেনথেলার (Ottmar Mergenthaler)। ভাগ্যান্বেষণে তিনি স্বদেশ ছেড়ে সুদূর মার্কিন দেশে এসেছিলেন।

সূক্ষ্ম পরিমাপ কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (Precision Instruments) একটা দোকানে তিনি কাজ করতেন। মারগেনথেলারের সঙ্গে ক্লিফেনের খুব শীঘ্রই বন্ধুত্ব জমে উঠল। একযোগে দুই বন্ধু কাজ সুরু করলেন। ক্লিফেন দেন পরিকল্পনা আর তাকে রূপায়িত করার ভার মারগেনথেলারকে।

মারগেনথেলারের প্রেস বা টাইপের কাজ জানা ছিল না বটে, কিন্তু যন্ত্র-বিষয়ক অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর, আর আর সত্যিকার উদ্ভাবনী প্রতিভাও ছিল তাঁর। তিনি হাত লাগিয়ে ক্লিফেনের যন্ত্রটাকে চালু করে তুললেন, তবে শেষ পর্যন্ত তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না।

তখন ক্লিফেন নতুন একটা যন্ত্রের কথা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন: আচ্ছা, এমন একটা মেশিন তৈরী করা যায় না, যার চাবি টিপে নরম ও পুরু কাগজ মণ্ডের (Papier Mache) পাতের উপর অক্ষরগুলোর ছাপ তুলে, তার মধ্যে গলিত ধাতু ঢেলে, এক একটা সাজানো অক্ষরের কাঠি (stick) নির্মাণ করা সম্ভব। এইরূপ অক্ষরের ষ্টিকগুলি পর পর সাজিয়ে একটা গোটা পাতা খুব সহজেই ছেপে ফেলা যেতে পারে। এ হচ্ছে ১৮৭৬ সালের কথা।

ক্লিফেনের প্রস্তাবিত পদ্ধতি মারগেনথেলারের ঠিক হ'ল না। তাঁর ধারণা, Papier Mache সিটের ওপর টাইপগুলোর ছাপ ঠিক সমান ভাবে পড়বে না, তা ছাড়া ওর গায়ে কিছুটা ধাতু আটকেও থেকে যেতে পারে। ক্লিফেন কিন্তু তাঁর গোঁ ছাড়লেন না।

শেষকালে তারই নির্দেশ অনুযায়ী মারগেনথেলারকে এই কাজে হাত দিতে হ'ল, কিন্তু যে আশঙ্কাগুলো তিনি করেছিলেন, সেগুলো সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়ে উঠল না।

*

এর পর জেমস ক্লিফেন তাঁর কতিপয় বন্ধু সহ টাকার ধান্ধায় ঘুরতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত দু'একজন শাঁসাল ব্যক্তিকে পাকড়াও করলেন। তাঁদের প্রদত্ত মূলধন নিয়ে কাজ চলতে লাগল। বছর দুই মন্দ কাটল না। জার্মান যুবা কারিগরটি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। কখনও ড্রইং বোর্ডের উপর ঝুঁকে পড়ে নক্সা আঁকছেন, কখনও বা লেদ মেশিনে যন্ত্রের কোন একটা অংশ তৈরী করতে ব্যস্ত।

এত খেটেও কাজ খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'তে পারল না। ওদিকে যাঁরা অর্থ যোগাচ্ছেন, তাঁদের অর্থ ও বিশ্বাস দুইই প্রায় নিঃশেষ হবার উপক্রম।

ওয়াশিংটনে কোম্পানীর একটা জরুরী সভা ডাকা হ'ল। এই সভায় চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে, financier যন্ত্রটির পিছনে আরও টাকা ঢালবেন, না কোম্পানীটা উঠিয়ে দেওয়া হবে।

মারগেনথেলার সভায় যোগ দিতে চলেছেন। হঠাৎ গাড়ির ভিতর তার মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল : আচ্ছা, পোজ্ঞিয়ার মাশির বদলে শক্ত ধাতুর ছাঁচের মধ্যে অক্ষর তৈরীর সীসা-মিশ্রিত ধাতু (শতকরা ষাট ভাগ সীসা, ৩০ ভাগ এন্টিমণি ও দশভাগ টিন) গলিয়ে ঢেলেই দেখা যাক না কেন ?···

যাক্, মিটিংএ স্থির হ'ল আরও কয়েকমাস সময় দেবার। ধাতুর ছাঁচ ব্যবহার করে সত্যিই আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল, কাটল আরও দু'বছর। ক্লিফেন ও মারগেনথেলার সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছলেন। নিউ ইয়র্কের TRIBUNE, ওয়াশিংটনের POST, এ ছাড়া আরও কয়েকটি সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীরা, র‍্যাণ্ড, ম্যাকনালী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রকাশকেরা 'দি ম্যাপ এ্যাণ্ড টেক্সট বুক হাউসের মালিকেরা এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাফল্যের ইঙ্গিত পেয়ে কোম্পানীর মোটা শেয়ার কিনতে সুরু করলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই।

ন্যু ইয়র্ক সহরের ট্রিবিউন পত্রিকার আপিসে বত্রিশ বছরের জার্মান যন্ত্রশিল্পী ওটমার মারগেনথেলার একটা যন্ত্রের সামনে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছেন পত্রিকার কর্তাব্যক্তিরা।

যন্ত্রটার মধ্যে ছিল কতকগুলো অক্ষরের ছাঁচ (matrices) বৈদ্যুতিক তাপে সীসামিশ্রিত ধাতু (Lead alloy) গলানর ব্যবস্থা—নল ও গিয়ার সম্বলিত একটা জটিল যন্ত্র।

মারগেনথেলার চাবি টিপলে কলটা চলতে লাগল। একটু পরেই খট করে একটা শব্দ হ'ল। একখণ্ড ধাতুর চকচকে ফলক বেরিয়ে এল। তার মাথায় উঁচু উঁচু সাজান অক্ষরে আটটা শব্দ।

ট্রিবিউনের প্রকাশক হোয়াইট ল রিড এই উষ্ণ ধাতু ফলকটি হাতে তুলে চীৎকার করে উঠলেন,

—"Ottmar you've done it,···A line o' type."

এই 'লাইন অব টাইপ' কথাটা থেকে নতুন যন্ত্রটার নামকরণ করা হ'ল 'লাইনো টাইপ'।

*

১৮৮৬ সালে এই যন্ত্রে ৯০টা কী বা টাইপরাইটারের মত টিপ-চাবি ছিল। এগুলোর সাহায্যে একটা খাড়া টিউবের মধ্যে রক্ষিত ছোট ছোট অক্ষরের ছাঁচগুলোকে (Matrices) নিয়ন্ত্রিত করা হ'ত। অপারেটর চাবি টিপলেই, আটকা ছাঁচগুলো ছাড়া পেয়ে গড়ানো নালী-পথে একটার পর একটা, এক লাইনে এসে বসত। এক জায়গায় অক্ষর ধাতুকে গলানর ব্যবস্থা ছিল। এই গলিত ধাতু-প্রবাহ ছাঁচগুলোর ফাঁকের ভিতর ঢুকে একটা নির্দিষ্ট মাপের (সাধারণতঃ খবরের কাগজের এক কলমের প্রস্থের সমান) অক্ষর-সম্বলিত ফলক ঢালাই করত। তারপর যান্ত্রিক লেভারের (lever) সাহায্যে ছাঁচগুলোকে তুলে ফের খাড়া নলটার মধ্য দিয়ে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা হ'ত। এইভাবে এই যন্ত্রে লাইনের পর লাইন ঢালাই করা হ'ত।

লাইনোটাইপে যে শুধু শ্রম ও ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভব হল, তা নয়, টন টন পুরাণো অক্ষরের ভারি কাঠের কেসগুলো বাতিল হয়ে গেল। আগে আট পৃষ্ঠা কাগজ ছাপতে, যতখানি জায়গা জুড়ে অক্ষরের ডালা বিছিয়ে বসতে হত কম্পোজিটারদের, সেই জায়গাটুকুতে আশি পৃষ্ঠার কাগজের ফর্মা তৈরী করা যেতে পারে। সবচেয়ে

বড় কথা হচ্ছে যে, প্রতিবারেই নতুন টাইপের ছাপা। আগের মত ভাঙ্গাচোরা (চলতি প্রেসের ভাষায় তাদের BF বলে) টাইপের কারবার নেই।

*

মারগেনথেলার এই যন্ত্রটির পেটেন্ট নেবার পর, ট্রিবিউন কিনল বারটা যন্ত্র। অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার কাছ থেকেও অর্ডার আসতে লাগল। প্রথম বছরেই একশ'টা যন্ত্রের কাটতি হ'ল।···যন্ত্রটা বাজারে বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কর্মীদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ বিক্ষোভ। তারা মনে করল, এইবার বুঝি তাদের নোকরি খতম। কিন্তু তাদের এ আশঙ্কা যে অমূলক, শীঘ্র তা বোঝা গেল। লাইনো মেশিন চালানর জন্য বহু লোকের দরকার। কাজেই বেশী বেতনে, আগের চেয়ে আরও বেশী লোক নিযুক্ত হ'ল এর কাজে।

এই যন্ত্রের আবির্ভাবে মুদ্রণ জগতে নবযুগের সূচনা হল। শ্রমিকদের খাটুনীর সময় কমে গেল। শ্রমের কষ্টও অনেকটা লাঘব হ'ল।···খবরের কাগজের সংখ্যা ও তাদের পাতাও বাড়ল, দামও কমল। মূল্য হ্রাস হওয়ায় কাটতিও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেল। মারগেন থেলার তাঁর এই নতুন যন্ত্রটি বাজারে ছাড়লেন, তার ঠিক আগে ন্যু ইয়র্কে প্রত্যহ ছত্রিশ লক্ষ কাগজ ছাপা হ'ত। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যেই মুদ্রিত সংবাদ-পত্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল বত্রিশ কোটির মত।

মারগেনথেলার তাঁর তৈরী কলটিতে কিছু কিছু ত্রুটি দেখতে পেলেন। কিছুদিন কাজ করবার পর, তাদের বিকল হয়ে যাবার (Breakdown) আশঙ্কা আছে বলে সন্দেহ হ'ল তাঁর। তিনি বাজারে যন্ত্রটির বিক্রি বন্ধ করে দিতে চাইলেন। যতক্ষণ না তিনি এর মজবুত ও সূক্ষ্মতর যন্ত্র নির্ম্মাণ করতে না পারছেন, ততক্ষণ তিনি চান না যে এটা কেউ কেনে। অর্থের চেয়ে সুনামের মর্য্যাদাই তাঁর কাছে অধিক।

এত বড় লাভের ব্যবসা, তাই কোম্পানীর অপর অপর ডিরেক্টারেরা মারগেনথেলারের প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। মারগেনথেলার তখন কোম্পানীর সাথে সম্বন্ধ ছিন্ন করবার ভয় দেখালেন।···তাঁর ছিল প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মন। যা হোক, বন্ধু ক্লিফেনের চেষ্টায় আবিষ্কারক মারগেনথেলারের সঙ্গে কোম্পানীর ডিরেক্টারদের সঙ্গে একটা রফা হ'ল শেষটায়। ওটমার তার শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিলেন, শুধু বিক্রির উপর রয়্যালটী থাকল তাঁর। এরপর তিনি নিজেই নতুন ব্যবসা খুললেন লাইনো যন্ত্রের কি করে যন্ত্রটাকে আরও সুন্দর ও ত্রুটিহীন করা যায়—সেই চেষ্টায় ওটমার প্রাণ-পাত পরিশ্রম সুরু করলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মারগেন-থেলার পূর্বাপেক্ষা ত্বরিতকর্মী ও স্বল্পব্যয়ী একটা যন্ত্র নির্মাণ করতে সমর্থ হলেন। এই নতুন যন্ত্রটাও তিনি আগের কোম্পানীকে বেচে দিলেন, এবারকার যন্ত্রটির মূল্য অত্যধিক হওয়ায়, সকলের পক্ষে এটা কেনা সম্ভব ছিল না। কাজেই বাজারে ছাড়া মালের কাটতি না হওয়ায় কোম্পানীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল।···তখন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ফিলিপ ডজের মাথায় এক ফন্দি এল: 'আচ্ছা, যন্ত্রগুলোকে ভাড়া খাটানো যায় না, তা হ'লে স্বল্পবিত্ত প্রকাশকেরা এর সুবিধা নিতে পারবেন।

এই পরিকল্পনা আশাতীত সাফল্য লাভ করল। ক্রমে আমেরিকার ছোট ছোট মফঃস্বল শহরগুলো থেকেও কাগজ বেরোতে আরম্ভ করল। ১৯০০ সালে মোট কার্যরত লাইনো টাইপের সংখ্যা প্রায় ৮০০০ গিয়ে দাঁড়াল। নতুন নতুন হরেক রকম পত্রিকায় বাজার ছেয়ে ফেলল—উদ্যান পরিচর্যা, রন্ধন, গৃহকর্ম, সেলাই, শিকার, ক্যাসান প্রভৃতি নানা বিষয়ের কাগজ।··· লাইনো টাইপের প্রচলনের ফলে বইও বেরোতে লাগল অসংখ্য—উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, বাণিজ্য ও আইন বিষয়ক গ্রন্থ, শিল্প ও চারু কলা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং বা টেকনিক্যাল বই। লাইব্রেরীগুলোতেও পুস্তকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অনেক নতুন গ্রন্থাগারও খোলা হ'ল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার হতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যেই আমেরিকার নিরক্ষরতা ১৭% থেকে ৫% এসে দাঁড়াল।

এরপর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় লাইনো যন্ত্রের কারখানা স্থাপিত হ'ল। খোলা হ'ল সেলস এজেন্সী। অপারেটদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থাও হল। ব্রুকলীনে মারগেনথেলারের লাইনো টাইপের কারখানায় বর্তমানে হাজারটি বিভিন্ন ভাষায় কি বোর্ড ও ছাঁচ তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৭৫,০০০ লাইনো যন্ত্রে কাজ চলছে অথচ গত বিশ বছরের মধ্যে কারোরই Breakdown হয় নি।

*

১৮৮৯ সালে ওটমার প্লুরেসীতে আক্রান্ত হলেন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ডাক্তারেরা তাঁকে New Mexico-এ পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। কোন কিছু ভাবনা মাথায় চাপলে তার শেষ না দেখে মারগেনথেলার

কিছুতেই শান্তি পেতেন না, আর একবার কাজে বসলে আহার নিদ্রা ভুলে যেতেন।...চেস্টে তিনি গেলেন বটে, সঙ্গে নিয়ে চললেন ড্রাফটসম্যানদের। সেখানে গিয়ে তাঁরা তাঁর নির্দেশ মত, নতুন নতুন নক্সা আঁকতে লাগল। হঠাৎ এর মধ্যে একদিন একটা অগ্নিকাণ্ডে তাঁর অনেকগুলো মূল্যবান ব্লুপ্রিণ্ট ও আত্মজীবনীর খসড়া (যা তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, শেষ করেন নি) ভস্মসাৎ হয়ে গেল, ভগ্ন মনোরথ ওটমার ফিরে এলেন বাল্টিমোরে।...১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মারগেনথেলারের নাম হয়ত আজ অনেকেই জানেন না, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁর নাম মুখে মুখে ফিরেছে সবার। পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কাজে ওঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৩) সঙ্গীতময় জীবন

রাণাঘাটের পাল চৌধুরী পরিবারের জলসাঘর। সেখানে সেদিন আসর বসেছে। যেমন প্রাসাদতুল্য ভবন, তেমনি সুসজ্জিত বিশাল জলসাঘর।

শুধু ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে নয়, নিয়মিত উচ্চ শ্রেণীর আসরের জন্যেও বিখ্যাত এই সঙ্গীত-সভা। সেকালের বাংলার যত ধনী বংশ সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এই শিল্পচর্চার শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছেন, রাণাঘাটের পাল চৌধুরীরা তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট।

পশ্চিমাঞ্চলের এত খ্যাতনামা সঙ্গীত গুণী এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন, এত সর্বভারতীয় কলাকার এ দরবারে বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত থেকেছেন যার দৃষ্টান্ত বেশি পাওয়া যায় না। বাসৎ খাঁর মতন বহুমান্য সঙ্গীত-সাধক থেকে আরম্ভ করে অনেকেই অলঙ্কৃত করেছেন পাল চৌধুরী ভবনের সঙ্গীত-সভা। সকলের নাম উল্লেখ করতে হলে তালিকা অতি দীর্ঘ হয়ে পড়বে। সেজন্যে তাঁদের আর নাম দেওয়া হ'ল না।

এখানে নিযুক্ত থেকে অনুষ্ঠান করা কিংবা সাময়িক ভাবে এসে আসরে সঙ্গীত পরিবেশন শুধু নয়। আরও একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে পাল চৌধুরী মহাশয়দের এই জলসাঘর। আগত ওস্তাদরা কর্তাদের ইচ্ছায় ও আগ্রহে একাধিক বাঙালী শিক্ষার্থীকে এখানে তালিম দিয়েছেন। এই সুযোগের সবচেয়ে সদ্ব্যবহার করেন বাংলার দুই সঙ্গীত-প্রতিভা। বামাচরণ ভট্টাচার্য ও নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রথম জনের কথা 'সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে এবং বক্ষ্যমান ধারায় 'হিন্দু না মুসলমান' অধ্যায়ে বলা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গ নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শিক্ষা যে এখানেই একান্তভাবে হয়েছিল, তা নয়। সে-সব কথা আলোচনা হবে যথাস্থানে।

এখন সেদিনের জলসাঘরের ছোট্ট ঘটনাটি দিয়ে নিবন্ধ আরম্ভ করা যাক।

খানিকক্ষণ আগে সে রাতের আসর বসেছে। জলসাঘরে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে আছেন নগেন্দ্রনাথ। এবং পশ্চিমা কলাকারদের মধ্যে বড়ে দুন্নি খাঁ।

তখনকার সঙ্গীত-জগতে দু'জন দুন্নি খাঁ ছিলেন। অন্য জনকে বলা হ'ত ছোটে দুন্নি খাঁ, ঠুংরির ওস্তাদ এবং লক্ষ্ণৌ-নিবাসী, কলকাতাতেও অনেকদিন ছিলেন। বিখ্যাত সরদী আমীর খাঁর শ্বশুর। তিনি নন, বড়ে দুন্নি খাঁ সেদিন রাণাঘাটের আসরে উপস্থিত।

খাঁ সাহেব দিল্লী থেকে আসেন। ছোটে দুন্নির যেমন ঠুংরিতে খ্যাতি, এঁর তেমনি খেয়াল আর টপ্পাতেও। নগেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে দুই অঙ্গের শিক্ষারই সুযোগ পান।

বিশেষ খেয়াল। সেদিনের আসরের আগে থেকে নগেন্দ্রনাথ বড়ে ঢুন্নির কাছে শিক্ষার্থী।

এ আসরের ঘটনাটি কিন্তু কোন কৌতূহল-উদ্দীপক কাহিনী বা কোন 'সঙ্গীত-যুদ্ধে'র বিবরণ নয়। কোন চমকপ্রদ নাটকীয়তাও এতে নেই। এ শুধু এক সানন্দ পরিবেশে সুরের আবাহন ও তার উপযুক্ত গুণ-গ্রহণের কথা। তরুণ শিল্পীকে প্রবীণ গুণীর সমাদর।

নগেন্দ্রনাথকে বয়সে তখনও যুবক বলা যায়। কিন্তু সঙ্গীতের জ্ঞানে ও শিল্পায়নে তিনি তখনই প্রাচীন।

আসরে সেদিন তিনি খেয়াল গাইছিলেন। তাঁর পরে গাইবার কথা ওস্তাদ ঢুন্নি খাঁ'র। তিনিও তখন অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে বসে গান শুনছেন।

নগেন্দ্রনাথ গাইছেন দরবারী কানাড়া। কণ্ঠ সুমিষ্ট, সতেজ ও দরাজ। অতি সুরেলা। মনোমুগ্ধকর সূক্ষ্ম কারুকর্মে ভরা। আর সে গলায় গান শুধু রাগের যথাযথ রূপায়ণ নয়। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু আবেদন। সঙ্গীতে রস-সৃষ্টির প্রেরণা।

তাঁর দরবারী কানাড়া শুনতে শুনতে মর্মজ্ঞ শ্রোতাদের সেই রকম অনুভবই জাগল। সঙ্গীতধারায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠল পাল চৌধুরীদের সেই জলসাঘর।

তারপর এক সময়ে নগেন্দ্রনাথের গান শেষ হল। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত হয়ে সাধুবাদ করলেন, সাবাস দিলেন তাঁকে।

তখন ওস্তাদ বড়ে ঢুন্নি খাঁকে তাঁর গান আরম্ভ করতে অনুরোধ করা হ'ল।

কিন্তু খাঁ সাহেব চমৎকার আপত্তি জানিয়ে বললেন—ভট্‌চাযের সুরে এখন ঘর ভরে আছে। আমি আজ গাইব না। এখন ও-ই গান করুক। আমি কাল গাইব।

নগেন্দ্রনাথের গান শেষ হ'তে তিনি যেমন অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি অভিনন্দন লাভ করলে ঢুন্নি খাঁ'র এই মন্তব্যটি। খাঁ সাহেবকে আর তারপর কেউ গাইতে অনুরোধ করলেন না।

সেই মনোরম পরিবেশে এবার টপ্পা আরম্ভ করলেন নগেন্দ্রনাথ।...

এই ঘটনার অনেক বছর পরের একটি আসর। নগেন্দ্রনাথ তখন পঞ্চাশোর্ধ।

এই আসর হয় কলকাতায়। গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায় পরিবারের যে ভবন মানিকতলায় (এখনকার বিবেকানন্দ রোডে) ছিল, তা তখনকার কলকাতার একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত-সভা হিসেবে সুপরিচিত। এই পরিবারের স্বনামধন্য শিকারী ও সুরবাহার বাদক জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জন্যেই সেকালের গোবরডাঙা গৃহের আসর সঙ্গীত-রসিকদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। আর নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গান কলকাতার যে ক'টি আসরে সবচেয়ে বেশি হয়েছে, গোবরডাঙা ভবন তার মধ্যে অন্যতম।

সেদিনকার আসর বসে সকালবেলা। সাধারণত আসরে নগেন্দ্রনাথের গান হ'ত শেষ দিকে। তাঁর মাধুর্যময় কণ্ঠে আসর এমন জমে যেত যে তার পর অন্য গায়কের গান গাওয়া অনেক সময়েই কঠিন হ'ত। তাই অন্যান্যদের গান হয়ে যেত আগে। সেদিনও যখন নগেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করলেন তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আসরে তিনি সাধারণত আগে খেয়াল গেয়ে শেষ করতেন টপ্পা দিয়ে। অনেক আসরে প্রথমে গাইতেন ধ্রুপদ, তারপর খেয়াল ও টপ্পা। শুধু টপ্পা প্রায় কোন আসরেই গাইতেন না। টপ্পা গান গাইবার বিষয়ে তিনি এই মত প্রকাশ করতেন যে, 'আগে ঘণ্টা দুয়েক (খেয়াল ইত্যাদি) অন্য গান গেয়ে গলা তেতে না উঠলে টপ্পার দানা ভালভাবে বেরোয় না। টপ্পা গাইবার জন্যে এমনি করে গলা তৈরি ক'রে নেয়া দরকার। আসরে হঠাৎ টপ্পা ফরমাস করলে ভাল করে গাওয়া যায় না।'

সে যা হোক, অনেক বেলায় গোবরডাঙা ভবনের আসরে সেদিন তিনি গান ধরলেন। প্রথমে ভৈরবীর খেয়াল। ভৈরবী তাঁর অতিপ্রিয় এবং এতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন এমন প্রসিদ্ধি আছে। শুধু যে ভৈরবীর অনেক গান তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল তা নয়, একাধিক চালের ভৈরবী শুনিয়ে তিনি মাৎ করে দিতেন আসর। এখানেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। একটি ভৈরবীর খেয়াল অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে গেয়ে আসরে সুর জমিয়ে দিলেন আর তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে, গলা তাতিয়ে নিলেন। তারপর আরম্ভ করলেন টপ্পা, ভীমপলশ্রীতে। ভীমপলশ্রীও তাঁর বিশেষ প্রিয় রাগ।

তাঁর ভীমপলশ্রীর টপ্পাও শোনবার বস্তু ছিল। এ আসরেও যখন ভীমপলশ্রী টপ্পা গাইতে লাগলেন, শ্রোতাদের মন ভরে গেল। গান শেষ হতে ঘর মুখর হয়ে উঠল তাঁর প্রশংসা ধ্বনিতে।

কিন্তু সেই সুন্দর আবহের মধ্যেও একটি বেসুর বাজল।

একজন বাঙালী গায়ক (নামটি জানা যায়নি) তাঁর কাছাকাছি কয়েকজনকে শুনিয়ে নগেন্দ্রনাথের গানের সমালোচনা করে বললেন—উনি ঈশ্বর দত্ত কণ্ঠ সম্পদের জন্যেই শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। কিন্তু তাঁর দুটি রাগরূপই ভুল।

কথাটা মুখে মুখে গুঞ্জরণ হ'তে হ'তে ভট্টাচার্য মশায়েরও কাণে গেল।

তিনি তা শুনেই মন্তব্যকারীকে তাঁর কাছে আসতে আহ্বান করলেন।

সে গায়ক তাঁর কাছে গিয়ে বসতে নগেন্দ্রনাথ দেখলেন তাঁর বয়স হবে ৩০-৩২ বছর। তাঁকে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—আমার গানে কোথায় ভুল হয়েছে?

—ভৈরবী আর ভীমপলশ্রী ঠিক দেখানো হয় নি।

শ্রোতারা অনেকেই আশ্চর্য হলেন, কৌতূহলীও। এত বড় গায়ককে সকলের সামনে মুখের ওপর ভুল বলে দিলে একজন! উৎসুক হয়ে তাঁরা লক্ষ্য করতে লাগলেন নগেন্দ্রনাথের দিকে—তিনি কি বলেন জবাবে! কেউ কেউ একটা বিবাদের সম্ভাবনা দেখে উৎফুল্ল হলেন। আবার কেউ কেউ ভাবলেন, আসরটা এবার মাটি হবে বুঝি তর্কাতর্কির চোটে।

আসরে এত লোকের সামনে এমন অপবাদ সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ কিন্তু ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হলেন না। ধীরভাবে বললেন—বাবা, তুমি আমার ছেলের মতন। তুমি বলছি বলে কিছু মনে ক'রো না। তুমি কত রকমের ভৈরবী আর ভীমপলশ্রী গাইতে পার, আগে বল ত।

সেই গায়ক আশ্চর্য হয়ে বললেন—কত রকমের আবার কি? ভৈরবী ভৈরবীই। ভীমপলশ্রীও একই রকমের ভীমপলশ্রী। দু' রকমের ভৈরবী কিংবা দু'রকমের ভীমপলশ্রী আমি স্বীকার করি না।

নগেন্দ্রনাথ হাসি মুখে বললেন—এইখানেই তোমার ভুল। রাগের যে রকমফের হ'তে পারে, এক ঘরের সঙ্গে আর এক ঘরের কিংবা এক জায়গার সঙ্গে আর এক জায়গার যে তফাৎ হয় তা তোমার জানা নেই। অথচ এক কথায় বলে দিলে—'ভুল'। তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম। অনেক কিছু এখনও জানতে-শিখতে বাকি আছে। কিছু তুমি জানতে না চেয়েই একেবারে 'ভুল' বলে দিলে। একটু বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেও পারতে, এ ভৈরবী এরকম কেন গাইলাম, ভৈরবী ত অন্যরকম শোনা যায়। আচ্ছা ওসব কথা যাক, এবার শোন। ভৈরবীর দু'রকম রূপই দেখা গেছে। আমি যে ভৈরবী আজ গাইলাম ধৈবত বাদী আর গান্ধারকে সম্বাদী করে সেটি মোটেই ভুল নয়। তাও ভৈরবীর এক রূপ, যদিও অপ্রচলিত তোমাদের ঘরে হয়ত তার চলন নেই। কিন্তু তাই বলে একে তুমি ভুল বলতে পার না। কোন ওস্তাদই একে ভুল বলেন না। তুমি এটা না জানতে পার। তেমনি ভীমপলশ্রী বা ভীমপলাশীর রূপেও প্রকারভেদ আছে। প্রথমে ভৈরবী শোন। এক রকম ভৈরবী ত শুনিয়েছি। এখন আর এক রকম ভৈরবী গাইছি।

এই বলে তিনি ভৈরবী গেয়ে শোনাতে লাগলেন যার বাদী মধ্যম আর সম্বাদী ষড়জ। ভৈরবীর এই রূপ সচরাচর শোনা যায় এবং এইটিই বেশি প্রচলিত।

ভৈরবী শেষ করে এবার তিনি ভীমপলশ্রীর প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন। আসরের প্রায় সমস্ত শ্রোতাই তখন বুঝতে পেরেছেন তাঁর যুক্তির সারবত্তা আর বক্তব্য।

ভীমপলশ্রীর কথায় নগেন্দ্রনাথ আবার গান ধরলেন। গান দিয়েই মীমাংসা করতে চাইলেন সঙ্গীত বিষয়ের সমস্যা। আর সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

গান গেয়ে তিন রকমের ভীমপলশ্রীর দৃষ্টান্ত দিলেন তিনি। তাদের একটির সঙ্গে আর একটির কি পার্থক্য তাও বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। আগেকার ওস্তাদদের গাওয়া ভীমপলশ্রীর সঙ্গে এখনকার চলিত ভীমপলশ্রীর কতখানি তফাৎ হয়ে গেছে দেখিয়ে দিলেন গানের উদাহরণ দিয়ে। বিশেষ করে তিনি ব্যাখ্যা করলেন হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ভীমপলশ্রীর সঙ্গে বাংলা দেশে প্রচলিত রূপটির বিভিন্নতা। ভিন্ন সাঙ্গীতিক পরিবেশে! কেমন করে একই রাগ ধীরে ধীরে কতখানি রূপান্তর গ্রহণ করেছে!

এমনি ভাবে সঙ্গীত সহযোগে তর্কের সমাধান এবং শ্রোতাদের আপনার বক্তব্যে বিশ্বাস জন্মাবার পর নগেন্দ্রনাথ সেই গায়কের উদ্দেশে বললেন—গানের আসর ঝগড়ার জায়গা নয় বাবা। আর যদি ঝগড়া করে গান বন্ধ করে দেওয়াই উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে সেজন্যে নিজেকে তেমনিভাবে প্রস্তুত করতে হয়। আসরে লড়বার উপযুক্ত হয়ে আসতে হয়। সমালোচনা বড় কঠিন জিনিষ।...

তারপর আর সেই প্রতিবাদী গায়কের বাক্‌স্ফূর্তি হয় নি!

এমনি আরও একটি বিতর্কিত আসরের কথা জানা যায়, যা থেকে রাগের গঠন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান ও ক্রিয়াসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ আসরটিও হয় কলকাতায়। সম্ভবত লালচাঁদ বড়াল মশায়ের বাড়ীতে। এটিও সকালবেলার আসর। এখানে নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন আরও কয়েকজন গুণী উপস্থিত ছিলেন—ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যন্ত্রী আফ্‌তাব উদ্দিন খাঁ প্রভৃতি। পশ্চিমাঞ্চলের একজন বড় ওস্তাদ সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, তাঁর নামটি জানা যায় নি। তবে তাঁর জন্যেই সাঙ্গীতিক বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল আসরে।

নগেন্দ্রনাথ তখন খেয়াল গাইছিলেন রামকেলিতে (রামকিরি বা রামক্রী)।

গানখানি তিনি তাঁহার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চমৎকার ক'রে গাইলেন এবং শেষ করতে আসরের অনেকেরই সাধুবাদ পেলেন।

কিন্তু সেই পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান গুণী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে নাটকীয়ভাবে বললেন—রাগে গলদ আছে।

আকস্মিক এই অপ্রিয় মন্তব্যে আসরের স্নিগ্ধ পরিবেশটি একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সকলে নগেন্দ্রনাথ ও ওস্তাদজীর দিকে চাইতে লাগলেন—এবার অসুরের উপদ্রব আরম্ভ হবে না কি?

নগেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন—রাগে কি ভুল আছে খাঁ সাহেব?

খাঁ সাহেব গর্বিত মুখে উত্তর দিলেন—রামকেলিতে কড়ি মধ্যম লাগালেন না। এই হিসেবে মস্ত ভুল।

নগেন্দ্রনাথ তখন দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন—আমি ভুল করি নি। যদি এ আসরে প্রমাণ হয় যে আমার ভুল হয়েছে, আমি তা হ'লে গানের জগৎ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নেব। আসরে গান গাওয়া একেবারে ছেড়ে দেব।

ভট্টাচার্য মশায়ের এই প্রতিজ্ঞা শুনে আসরে বেশ চাঞ্চল্য জাগল। একটা জমাট আনন্দের আশায় অনেকেই উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

নগেন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথমে নিজের সমর্থনে কোন যুক্তি বা প্রমাণ কিছু দিলেন না। তখন সেই ওস্তাদ সুবিধা পেয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলতে লাগলেন রামকেলির গলদের কথা।

ভট্টাচার্য মশায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরব হয়ে রইলেন। তারপর শুধু বললেন—আসরে আর যে সব গুণীরা রয়েছেন তাঁরা কি বলেন আগে শুনি। পরে আমার মত জানাব।

তখন উপস্থিত সঙ্গীতবিদদের মধ্যে আলোচনা হতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলেন না তাঁরা। শেষে সকলে নগেন্দ্রনাথকে তাঁর এ বিষয়ে মতামত জানাবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

নগেন্দ্রনাথ প্রথমে বললেন—রামকেলির দু'রকম রূপ ত প্রচলিত আছে ঘরাণা ভেদে। আমি দুরকমই জানি। তীব্র মধ্যম না দিয়ে যে রামকেলি গেয়েছি সে রামকেলি অপ্রচলিত বা ভুল নয়। তবে খাঁ সাহেব সেটা না জানতে পারেন। আর যে রামকেলিতে তীব্র (বা কড়ি) মধ্যম লাগে সেও শুধু অবরোহণে। আরোহণের সময় একেবারেই বর্জিত। অবরোহণে যেটুকু কড়ি মধ্যম লাগে তাও দুর্বল। কড়ি মধ্যমের কোন গুরুত্বই নেই রামকেলিতে, অনেক ঘরাণাতেই একথা স্বীকৃত। সুতরাং কড়ি মধ্যম না লাগালে রামকেলির রূপের কোন বিকৃতিই ঘটে না। কড়ি মধ্যম না থাকলেই সে রামকেলিকে ভুল বলার কোন অর্থ নেই।

এই পর্যন্ত বলে তিনি আর দু'টি রামকেলির গান শোনালেন। দু'টিরই অবরোহণে আছে কড়ি মধ্যমের দুর্বল প্রয়োগ। কড়ি মধ্যম যুক্ত রামকেলি দু'খানি গেয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, রামকেলিতে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার তাঁর অজানা নয়। আগে যে এরকম রামকেলি শোনান নি, সেটা ইচ্ছাপূর্বক। সেই রকম রামকেলি বহু ঘরাণাতেই প্রচলিত আছে। কেউ ভুল বলেন না তাকে।

পরিশেষে তিনি একটি ব্যক্তিগত মত এই রাগের ক্ষেত্রে জানান যে, কড়ি মধ্যমের ব্যবহারকে প্রাধান্য না দিলেও কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। কারণ রামকেলি একটি সন্ধি প্রকাশ রাগ। এখানে দুই মধ্যমের একটি গূঢ় তাৎপর্য থাকতে পারে। তাই একদিকে কড়ি মধ্যমে যেমন অস্তোন্মুখ যামিনীর শেষ সংকেত, অন্যদিকে তেমনি শুদ্ধ মধ্যমের তেজস্বিতায় যেন মার্তণ্ডদেবের আশু উদয়যাত্রার ঘোষণা।

নগেন্দ্রনাথের এই হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রয়োগ, তাঁর গোঁড়ামি-বর্জিত মন, রাগের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি এবং সাধনসিদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আসরের শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন। দু'রকমের রামকেলির নিদর্শন তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হতে দেখে পরিষ্কার ধারণা করতে পারলেন তাঁর বক্তব্য কি। খাঁ সাহেবও শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের মতামত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

আসরটির উপসংহার দেখা গেল সুরের সম্প্রীতির মধ্যেই। নগেন্দ্রনাথের মধুকণ্ঠের মতন তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের জন্যে উৎকট কিছু ঘটতে পারলে না। মধুরেণ সমাপ্ত হ'ল।...

নগেন্দ্রনাথ শুধু সঙ্গীতের ব্যাকরণ কিংবা শৈলীগত বস্তু নিয়ে চর্চা করতেন না। তিনি তার অন্তরঙ্গ রূপলোকে প্রবেশ করেছিলেন অন্তরের প্রেরণায়। তিনি একজন যথার্থ শিল্পী ছিলেন এবং সঙ্গীতের ভাবুকও। তাঁর দু'একটি কথা বা প্রাসঙ্গিক মতামত উল্লেখ করলে তাঁর সঙ্গীত-চিন্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

যেমন তিনি বলতেন—গান শুধু তান-লয়ের কান্দা নয়। সুরে নিজে ডুবে গিয়ে ডোবাতে হবে সমস্ত শ্রোতাদের। তবেই তা সত্যিকার গান।

তাল আর লয়ের গতির প্রসঙ্গ নিয়ে ছাত্রদের কাছে আলোচনা করতেন। তখন দেখা যেত, তালের চুলচেরা মাত্রা বিভাগ বিশেষ পছন্দ করতেন না তিনি। অনেক যথার্থ গুণীর মতন তিনিও মাত্রা নিয়ে মাথা ঘামাতেন

না। তালই আসল এ ক্ষেত্রে। তালের রহস্য ভাল করে বুঝলেই মাত্রাজ্ঞান আপনি এসে যায়।

শিষ্যদের শিক্ষা দেবার সময় তাই তিনি তালের ওপরই গুরুত্ব দিতেন। শেখাতেন, বোঝাতেন তালের গতি, প্রকৃতি, মর্মকথা। তাল বুঝলেই আর সব বোঝা হয়।

তিনি বলতেন—গানের বড় বিভাগ (অর্থাৎ তাল) শিখতে পারলেই ছোট বিভাগ (অর্থাৎ মাত্রা) আপনি আয়ত্তে আসে। খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে তিনি কথাটা বোঝাতেন—মনে করো ত্রিতালের চারটি বিভাগ (তিন তাল আর এক ফাঁক) যেন গরুর চারটি পা। গরু যখন চলে, তখন কি তার চারটে পায়ের পদক্ষেপে ছোট বড় হয়? চারটে পা-ই ত সমান তালে, তালে তালে পড়ে। ঠিক তেমনি ত্রিতালের ব্যাপার। গাইতে গাইতে আপনি ঠিক তালে তালে পড়ে যাবে। মাত্রার হিসেব রাখবার দরকার হয় না।

মাত্রা দিয়ে তাই শেখাতেন না কোন শিষ্যকে।

খেয়াল ও টপ্পার অতি বিচক্ষণ শিক্ষকরূপে এই সব ছিল তাঁর মতামত ও ধারণা। আর শিল্পী হিসেবে যেমন তেমনি শিক্ষকরূপেও বাংলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে তাঁর স্মরণীয় আসন ছিল। সমগ্রভাবে তিনি ছিলেন সমসাময়িককালের সঙ্গীত-জগতের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সত্যকার একজন আচার্য। অতি কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করে মহিমময় আসরে দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

সেকালের বাংলা দেশে সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কোথায় ছিল তা বুঝতে পারা যাবে তাঁর শিষ্যদের কথা মনে রাখলে। এখানে একটি কথা বলে রাখা যায় যে, সেকালের অনেক বাঙালী সঙ্গীতাচার্যদের মতন তিনিও ছিলেন অপেশাদার। আসরে গাইবার জন্যে তিনি যেমন দক্ষিণা নিতেন না, ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারেও তেমনি। এবং কোন কোন অভাবী শিষ্যকে অর্থ সাহায্য করতেন শোনা গেছে।

আগ্রহী সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের যেমন অকৃপণভাবে দান করেছেন সঙ্গীতবিদ্যা, তেমনি কুশলী ছিলেন তাদের উপযুক্ত ভাবে গঠিত করতে। এমন সযত্নে এবং নিপুণভাবে তিনি শিক্ষা দিতেন যে তাঁকে একজন আদর্শ শিক্ষক বলা যায়। শেখাবার সময় গানখানি ছাত্রের কণ্ঠে সঠিকভাবে তুলে না দিয়ে কখনও নিশ্চিন্ত হতেন না। আর যে গান কাউকে শেখান তার 'বন্দিশ' কখনও তিলমাত্র এদিক-ওদিক করতেন না তিনি। কোন গান কুড়ি বছর আগে একজনকে যেভাবে মূলের সঙ্গে অভিন্ন রেখে শিখিয়েছেন, কুড়ি বছর পরেও আর একজনকে শেখান তার বন্দিশ অক্ষুণ্ণ রেখে। সঙ্গীতের ঐতিহ্য সঠিকভাবে ধারণ ও রক্ষা করতে গেলে এমন নিষ্ঠাই দরকার।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আসরে আসরে পদ্মবাবু নামে সুপরিচিত) এবং নগেন্দ্রনাথ দত্ত। ভট্টাচার্য মশায়ের প্রিয়তম শিষ্য, ললিতকণ্ঠ পদ্মবাবু তাঁর সুশিক্ষার সুবর্ণ ফল। পদ্মবাবু যেমন কলাকুশলী ছিলেন, তেমনি অনুপম ছিল তাঁর কণ্ঠ-মাধুর্য। কণ্ঠসম্পদের জন্যে বাংলার যে ক'জন শিল্পী স্মরণীয় রয়েছেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট। এত উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরে এমন মিষ্টত্ব বৃহত্তর সঙ্গীতজগতেও দুর্লভ। অকাল মৃত্যু (৪২ বছর বয়সে) এবং কলকাতা থেকে দূরে বাস করার জন্যে বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি তেমন প্রসিদ্ধির সুযোগ পাননি। কিন্তু যারা তাঁর গান শুনেছেন তাঁরাই চমৎকৃত হয়েছেন তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে। রাণাঘাটের নানা আসরে গানে গানে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার তাঁর অনেক দৃষ্টান্ত গল্পকথার মতন অঞ্চলটিতে প্রচলিত আছে। তাঁর গান শোনবার সুযোগ যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কতখানি হয়েছিল, তার একটি উদাহরণ দেওয়া যায় এখানে। বাংলার আর একজন মধুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জিতেন্দ্রনাথ, সঙ্গীতজগতে কালোবাবু নামে বিখ্যাত। রমজান খাঁর শিষ্য কালোবাবুর তেলিনীপাড়ার বাড়ীতে পদ্মবাবুর এই গানের আসরটি হয়। এ আসরে তাঁর গান কেমন হয়েছিল একথা ত বাহুল্য। কিন্তু পদ্মবাবুর সেই গান শুনতে কালোবাবুর বাড়ীর প্রাচীরের ধারে এমন বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল যে তাদের চাপে সে প্রাচীরের ভগ্নদশা ঘটে। তার বেশ কিছুদিন পর পর্যন্তও কালোবাবু তা মেরামত না করে রেখে দেন সেই অবস্থায়। এবং সেই ভগ্ন প্রাচীরের স্মারকটি দেখিয়ে বলতেন, পদ্মবাবুর গান শোনবার জন্যে সেবার এমন ভিড় হয়েছিল, যে ওই পাঁচিলটা ভেঙ্গে যায়।

পদ্মবাবু সম্পর্কে স্বনামধন্য গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর একটি মন্তব্যও শোনবার মতন। পদ্মবাবুর তখন ১৯ বছর মাত্র বয়স। গান শেখা আরম্ভ হয়েছে তারও ক'বছর আগে, নগেন্দ্রনাথের কাছে। গুরুর সঙ্গেই সেবার কাশী যান। অঘোরনাথও তখন শেষ বয়সে কাশীবাসী। সেখানে তখন পদ্মবাবুর গান একদিন শোনেন। গান শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে নগেন্দ্রনাথকে বলে ওঠেন—ভট্চার্য, কি জিনিষই তৈরি করেছ!···

ভট্টাচার্য মশায়ের আর এক সুযোগ্য শিষ্য নগেন্দ্রনাথ

দত্ত খেয়াল ও টপ্পা গায়করূপে খ্যাতিমান ছিলেন কলকাতার আসরে, কর্মসূত্রে কলকাতায় অবস্থানের জন্যে। পদ্মবাবুর কণ্ঠমাধুর্য নগেন্দ্রনাথ দত্তের না থাকলেও গুণী হিসেবে তাঁরও সুনাম ছিল। তা ছাড়া শিক্ষক হিসেবেও কৃতিত্ব ছিল দত্ত মশায়ের। কলকাতা ও রাণাঘাটে তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি গুরুর সঙ্গীত-ধারাকে বিস্তৃত করেছিলেন। সঙ্গীত-রত্ন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কৃতী খেয়াল ও ঠুংরি গায়ক শচীন্দ্রনাথ দাসের (মোতিলাল) প্রথম সঙ্গীতগুরু ছিলেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত। তা ছাড়াও নগেন্দ্রনাথের (দত্ত) শিষ্যদের মধ্যে গোপাল দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ দত্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, বিজনকুমার বসু, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে প্রথম জীবন থেকেই শিখতে আরম্ভ করেন রাণাঘাটে। পরে কলকাতা বাসের সময় পরিণত বয়সে ওস্তাদ বদল খাঁ'র কাছে কিছুকাল শিখলেও ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ থেকে কোনদিন বিরত হন নি। কলকাতায় থাকবার সময় তখন তিনি যেমন বদল খাঁর কাছে শিখতেন, তেমনি প্রতি সপ্তাহ শেষে দেশে অর্থাৎ রাণাঘাটে যেতেন এবং শিখতেন ও সংগ্রহ করতেন ভট্টাচার্য মশায়ের পদতলে বসে।

পদ্মবাবু ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত দু'জনেই ছিলেন খেয়াল ও টপ্পা গায়ক। তাঁরা ভট্টাচার্য মশায়ের শিষ্যদের মধ্যে সঙ্গীত-জগতে অধিকতর পরিচিতি লাভ করেন সত্য, কিন্তু তাঁরা ছাড়াও কৃতী গুরুভাই তাঁদের আরও ছিলেন। তাঁরা হলেন নগেন্দ্রনাথের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। শেষোক্ত দু'জনের মধ্যে প্রমথনাথ (৩৮ বছরে) অকালমৃত্যুর জন্যে সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রসিদ্ধির বেশি সুযোগ পান নি; কিন্তু টপ্পা, বিশেষ খেয়ালে তিনি অতি সুকণ্ঠ গায়ক হয়েছিলেন। তাঁর মিহি গলায় মিড়ের সূক্ষ্ম কারুকর্ম ছিল শোনবার মতন। নগেন্দ্রনাথের তিনি হাতে-গড়া শিষ্য ছিলেন। স্বাভাবিক পরমায়ু লাভ করলে প্রমথনাথ স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতেন সঙ্গীত-জগতে।

নগেন্দ্রনাথের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ এই পরিবারে নগেন্দ্রনাথের পরে সবচেয়ে প্রতিভাবান গায়ক। অতিশয় দরাজ তাঁর গলায় গমকের প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য অলঙ্কারের অভাব ছিল না এবং হিন্দুস্থানী খেয়াল টপ্পায় একজন রীতিমত গুণী গায়ক ছিলেন। সেকালের রাণাঘাট, মাজিপোতা, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, উলা বা বীরনগর, যশোরের কিছু অংশ, বনগাঁ ইত্যাদি স্থানে গায়করূপে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। কারণ এই সব জায়গাতেই তাঁর গান বেশি হ'ত। তা ছাড়া ভাওয়াল রাজ দরবারে এবং কলকাতার কয়েকটি পরিবারের আসরেও শ্রোতারা পেতেন তাঁর গুণপনার পরিচয়। রীতিমত শিক্ষিত-পটু গায়ক হওয়া সত্ত্বেও, আজীবন সৌখীনরূপে মফস্বলে বাস করার জন্যে যথোচিত খ্যাতিমান তিনি হন নি। সঙ্গীত-চর্চাকেই জীবনের বৃত্তি হিসেবে অবলম্বন করে যদি কলকাতায় বসবাস করতেন তা হ'লে তাঁর নাম পরিজ্ঞাত থেকে যেত তখনকার বাংলার সঙ্গীত-জগতে। পারিবারিক প্রসঙ্গে তাঁর কথা পরে আবার আসবে।

এখানে ভট্টাচার্য মশায়ের অন্যান্য শিষ্যদের নামগুলিও উল্লেখ করে রাখা যায়। যথা—সৌরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (দৌহিত্র), সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (হাস্যরসের অভিনেতারূপে অধিকতর খ্যাতিমান), দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ চন্দ্র, অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চরণ কুণ্ডু, তরুণেন্দু ঘোষাল, সুধীর দাস, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

পদ্মবাবু থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত শিষ্যই রাণাঘাট অঞ্চলের নিবাসী ছিলেন, গুরুর মতন। সুতরাং বোঝা যায় যে, অঞ্চলটি ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গীত-জীবনের প্রভাবে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল। রাণাঘাটকে কেন্দ্র ক'রে সন্নিহিত অনেক দূর স্থানে পর্যন্ত সঙ্গীতাচার্যরূপে বিপুল গৌরবে অবস্থান করেন তিনি। নগেন্দ্রনাথ আমৃত্যু রাণাঘাটে বাস করার ফলে সমগ্র অঞ্চলটি সঙ্গীত-চর্চায় রীতিমত সমৃদ্ধ হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নিজেকে সেজন্যে বঞ্চিত করেন বৃহত্তর সঙ্গীত-জগতে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভে। তাঁর তুল্য আচার্য-স্থানীয় গুণী যদি কলকাতায় অবস্থান করতেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের সম্মেলনাদিতে যোগ দিতেন তা হ'লে সর্বভারতীয় সঙ্গীত-ক্ষেত্রে বাংলা দেশ আরও একজন যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের গৌরব লাভ করত।

ওস্তাদ রমজান খাঁ তাঁকে অনেকবার বলেছিলেন কলকাতায় বাস করতে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ রাণাঘাট ত্যাগ করে আসতে সম্মত হন নি।

রাণাঘাট তথা নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবন সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এখানে তাঁর আসরের প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য জানিয়ে রাখা যায়।

রাণাঘাটে তিনি বসবাস করলেও তাঁর গানের আসর আরও অনেক জায়গাতেই হ'ত, শুধু ওই অঞ্চলে নয়। কলকাতায় তাঁর গানের অনুষ্ঠান লালচাঁদ বড়ালের বাড়ী ও গোবরডাঙ্গা ভবনে হবার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। কলকাতায় তাঁর অন্যান্য আসরের মধ্যে জোড়াসাঁকোর হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মশায়ের বাড়ীর হোলির আসর,

ভবানীপুরের নাটোর ভবন, শঙ্কর উৎসব (বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন) উল্লেখযোগ্য। এই ক'টি আসরেই নগেন্দ্রনাথ কলকাতায় গেয়েছেন সবচেয়ে বেশি।

তাঁর অন্যান্য আসরের মধ্যে উল্লেখ করবার মতন হ'ল—গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারের ভবন, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী, উলার মুখোপাধ্যায় ভবন, রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদের গৃহ, ত্রিপুরার রাজদরবার, মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ) সঙ্গীত সভা, ভাগলপুরের শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নগেন্দ্রনাথের ভায়রাভাই) বাড়ী।…

আসরে তিনি খেয়াল ও টপ্পাই বেশি গাইতেন। কখনও কখনও ধ্রুপদ দিয়ে আরম্ভ করতেন অনুষ্ঠান। তাঁর সঙ্গীতের সঞ্চয় অপর্যাপ্ত হলেও সাধারণতঃ তিনি প্রচলিত রাগের গানই পরিবেশন করতেন। তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল ভৈরবী আর খাম্বাজ। ভৈরবীতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

ধ্রুপদেও তিনি অপ্রচলিত রাগের পক্ষপাতী ছিলেন না, তবে দেবগিরি, নটনারায়ণ ও দেওশাখ গাইতে শোনা গেছে তাঁকে।

উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বর্তমান শতকের প্রথম পাদকে বাংলার আসরে খেয়াল গান তিনি অনেক শুনিয়েছেন। তিনি এবং বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জনেই খেয়াল গুণী (লক্ষ্ণৌর) আহম্মদ খাঁ'র শিষ্য। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী খেয়াল গায়কদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ও বামাচরণের বয়োকনিষ্ঠ সাতকড়ি মালাকর মশায়ের নামও উল্লেখ করবার মতন। এই তিনজনের জন্যে বাংলার আসরে আসরে খেয়াল গান অনেকখানি জনপ্রিয় হয়েছে। এঁদের সমকালে আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীও খেয়াল শুনিয়েছেন আসরে। তবে তিনি ছিলেন মুখ্যত ধ্রুপদী। নগেন্দ্রনাথ ও বামাচরণের আগেকার যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী খেয়াল গায়ক ছিলেন (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক) গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, যদিও তিনি ধ্রুপদ ও টপ্পার সাধনাও করেছিলেন। চক্রবর্তী মশায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙালী খেয়াল গায়ক আর একজন ছিলেন—কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। তবে কার্তিকেয়চন্দ্রের সঙ্গীতজীবন বৃহত্তর বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রসারিত না হয়ে কৃষ্ণনগর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সঙ্গীত তাঁর জীবনে একান্ত সাধনও ছিল না।…

নগেন্দ্রনাথ খেয়াল গানের সঙ্গে টপ্পার জন্যেও রীতিমত খ্যাতিমান ছিলেন, এমন কি কোন কোন মতে, টপ্পা গানের জন্যে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল সমধিক। কেউ কেউ তাঁকে টপ্পার যাদুকর বলেও অভিহিত করতেন এবং বলতেন টপ্পাই ভট্টাচার্য মশায়ের forte।

বাংলা দেশে টপ্পা সাধনার যে ক'টি প্রধান ধারা আছে নগেন্দ্রনাথ তার একটির অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তা হ'ল, বারাণসীর ইমাম বাদীর টপ্পা-ধারা। ইমাম বাদীর দুই শিষ্য নগেন্দ্রনাথ ও (ইমাম বাদীর পুত্র) রমজান খাঁ বাংলা দেশে বহু শিষ্য গঠন করে এবং আসরে আসরে দীর্ঘকাল যাবৎ পরিবেশন করে এই ঘরের টপ্পা সুপ্রচলিত করেন। এত বিভিন্ন এবং গম্ভীর রাগে টপ্পা গান মহেশ ওস্তাদ আর রমজান খাঁ ভিন্ন আর বেশি কেউ শোনান নি বাংলা দেশে।

আসরে দেড় ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা খেয়াল গানের পরে টপ্পা শুনিয়ে নগেন্দ্রনাথ মাৎ করে দিতেন শ্রোতাদের। আসরের গায়করূপে তাঁর জনপ্রিয়তা অসামান্য হয়েছিল। 'আসর-জমানো গাইয়ে' যাদের বলা যায় তিনি ছিলেন তা-ই। দীর্ঘ দেহ, সুপুরুষ—আসরে সৃষ্টি করতেন উপযুক্ত পরিবেশ ও অবারিত সুরের পরিমণ্ডল। সৌম্য, সমাহিতভাবে তিনি গেয়ে যেতেন। মুদ্রাদোষের পরিবর্তে তাঁর ছিল মনোমুগ্ধকর মুদ্রা। কণ্ঠের অলঙ্কার, গানের ভাব আরও হৃদয়গ্রাহী হ'ত তাঁর হাত ও আঙুলের নানা বঙ্কিম ইঙ্গিতে, আন্দোলনে। সঙ্গীতের সৌন্দর্য তাতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেত।

গান গেয়ে শ্রোতাদের যেমন তৃপ্তি দিতেন, তেমনি পেতেন নিজেও। আসর সজীব হয়ে থাকত তাঁর উপস্থিতিতে। নানা জায়গায় তাঁর আসরের নাম আগে করা হয়েছে। তাঁর আরও এক আসর বসত, জলসাঘরে নয়—শিকার-শিবিরে। জঙ্গলের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে তাঁর কত গানের আসর হয়েছে। তিনি নিজে ছিলেন শিকারে উৎসাহী। তা ছাড়া, শিকারী ও শিকার-বিলাসী তাঁর সঙ্গীত সুহৃদদের উদ্যোগে এমন অনেক আসর বসেছে শিকারের আগে ও পরে। আকাশ-তলে উন্মুক্ত প্রকৃতির পটভূমিতে সেসব সময় তাঁর গানের ধারা উৎসারিত হ'ত। শিকারের শিবির পরিণত হ'ত সঙ্গীতের আসরে। শিকারপ্রিয় ও সঙ্গীতপ্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের সানন্দ সম্মেলনে।

রাণাঘাটের পাল চৌধুরী পরিবার ভিন্ন আর যাঁদের সঙ্গে সঙ্গীতের সূত্রে নগেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারের জ্ঞানদাপ্রসন্ন এবং (ময়মনসিংহ) মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী। জ্ঞানদাপ্রসন্ন ছিলেন উঁচুদরের শিকারী এবং সেই সঙ্গে সুরবাহার বাদকও। জগৎকিশোর সঙ্গীতজ্ঞ

এবং শিকার বিষয়েও উৎসাহী। তাঁদের দুজনের জন্তে, বিশেষ জ্ঞানদাপ্রসন্নের উদ্‌যোগে অনেক শিকারের শিবিরে নগেন্দ্রনাথের গানের আসর বসেছে। গারো পাহাড় অঞ্চলের শিকার-শিবির থেকে এদিকে নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলার জঙ্গলের কাছাকাছি নানা আসর হয়েছে শিকারের উপলক্ষ্যে। জ্ঞানদাপ্রসন্ন শিকার অভিযানে গেলে অনেক সময়েই সঙ্গীতজ্ঞদেরও নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে সুরবাহার বাদক মহম্মদ খাঁ (জ্ঞানদাপ্রসন্নের ওস্তাদ), নগেন্দ্রনাথ, সেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে নিয়ে এবং তিনি স্বয়ং মিলে তাঁবুর মধ্যেই গড়ে তুললেন জলসাঘর। বনগাঁর দিকে পারমাডনিয়া জঙ্গল, গাঙ্‌নাপুরের কাছে দেবগ্রামের জঙ্গল (দেবল রাজার ভিটার প্রসিদ্ধি যেখানে), রাণাঘাটের দিকে জঙ্গল সিদ্ধ্রাণী, মালিপোতার কাছাকাছিও তখন জঙ্গলের অভাব ছিল না—এই সব অঞ্চলে জ্ঞানদাপ্রসন্ন শিকারে আসতেন। এবং শিকারের শিবির পড়লে সেখানে সঙ্গীতের আসর বসত না এমন হয়েছে কদাচিৎ। আর আসর বসেছে অথচ নগেন্দ্রনাথ গান করেন নি এমন ঘটনাও খুব কম। এমনি করে শিকার-শিবিরেও তাঁর গান অল্প হয় নি।

সাধারণত নগেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী খেয়াল ও টপ্পা গানই গাইতেন আসরে। কিন্তু কখনও কখনও বাংলা টপ্পাও গাইতেন। তখন নিধুবাবু কিংবা মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে পিতা উমানাথ ভট্টাচার্যের কিংবা নিজের রচনাও শোনাতেন তিনি। তিনি গান কিছু কিছু লিখতেন এবং তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এককালে সেসব গান শোনা যেত।

নগেন্দ্রনাথের গান রচনার একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হ'ল—

ভীমপলশ্রী, মধ্যমান
লাগিল নয়নে, কি ক্ষণে মনে,
নবীন কিশোর সুন্দর ওই সে যমুনা পুলিনে॥
পদে পদে আরোপিয়ে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হিলায়ে
ইন্দীবর নিন্দিয়ে নীল বরণ,
আরো তাহে আঁখি শর সন্ধানে॥
আর ত গৃহে যাওয়া হল না,
বুঝি কুল রহে না মুরলি শুনে।
চলিতে চরণ বাধে চরণে॥

সঙ্গীতরচনায় বিষয়ে তাঁর পিতা উমানাথের নাম যে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর উত্তরাধিকার স্বরূপ নগেন্দ্রনাথ অনেক কিছু লাভ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভাও এই সূত্রে পাওয়া। উমানাথের প্রধান পরিচয় হ'ল, তিনি সেকালের বাংলার একজন বিখ্যাত কথক। তা ছাড়া তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক এবং গান রচয়িতা। সেকালের কথকরা সকলেই অল্পবিস্তর গানের চর্চা করতেন। কারণ কথকতার অঙ্গ ছিল গান। কিন্তু উমানাথ ছিলেন তার চেয়ে কিছু বেশী। তিনি একজন শিক্ষিতপটু গায়ক ছিলেন এবং অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতের চর্চা রীতিমতভাবে করেছিলেন। পরে জীবনের বৃত্তি হিসেবে কথকতা অবলম্বন করেন, কিন্তু সঙ্গীতচর্চা পরিত্যাগ করেন নি কোন দিনই। এবং নগেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে ১৭।১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন উমানাথের অন্য দুই পুত্রেরও সঙ্গীতশিক্ষা পত্তন পিতার কাছে। বলা যায়, উমানাথের দৃষ্টান্তেই পরিবারে সঙ্গীতচর্চা প্রচলন হয়। তাঁর পূর্বপুরুষ পর্যন্ত এঁরা এ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন মালিপোতা গ্রামের পণ্ডিত বংশ বলে।

রাণাঘাট থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে (রাণাঘাট-বনগ্রাম শাখায় গাঙনাপুর ষ্টেশনের কাছে) মালিপোতা গ্রামে এই পরিবারের পৈত্রিক নিবাস। ভট্টাচার্য তাঁদের উপাধি ছিল, কুল পদবী চট্টোপাধ্যায়।

উমানাথের পিতা গৌরীনাথ পর্যন্ত এই বংশের নৈয়ায়িক পণ্ডিত রূপে খ্যাতি ছিল। সেই সঙ্গে গৌরীনাথ কথকতার চর্চা প্রথম আরম্ভ করেন। সঙ্গীতের ধারা আরম্ভ হয় উমানাথের সময় থেকে।

বাল্যকাল থেকেই উমানাথ সুকণ্ঠ। অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে তিনি নদীয়া পাহাড়পুরে মাতামহের কাছে যখন বাস করতেন, তখন তিনি একদিন চূর্ণি নদীর ধারে বসে আপন মনে গান গাইছিলেন। এমন সময় নদীতে বজরা ভাসিয়ে চলেছিলেন উত্তরবঙ্গের কোন বর্ধিষ্ণু জমিদার। উমানাথের কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি বজরা থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। তারপর তাঁর মাতামহের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর শিক্ষার সব দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান উত্তরবঙ্গে। প্রায় ৭।৮ বছর সেখানে থেকে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে উমানাথ ধ্রুপদ গানও শিক্ষা করেন কলাবতের অধীনে।

তারপর তিনি উত্তর বাংলা থেকে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার কাছে চলে আসেন। এখানকার নন্দীগ্রাম আমগাছিয়া অঞ্চলে ক'বছর বাস করবার সময় তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার আর এক পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। তিনি রীতিমত টপ্পা চর্চার সুযোগ লাভ করেন এখানে। আগে থেকেই গুপ্তিপাড়া অঞ্চলে হিন্দুস্থানী টপ্পা অনুশীলনের একটি ধারা বর্তমান ছিল। বাংলার এক আদি টপ্পাচার্য, কালী মীর্জা

নামে সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গুপ্তিপাড়ার সন্তান। ১০।১২ বছর ধরে কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ইত্যাদি অঞ্চলে বাস ক'রে তিনি টপ্পা সঙ্গীতে কৃতবিদ্য হন। তারপর ফিরে এসে গুপ্তিপাড়ায় বাস করেন কিছু বছর। সেই সময় তাঁর প্রভাবে এ অঞ্চলে হিন্দুস্থানী টপ্পাচর্চা আরম্ভ হয় এবং তাঁর কয়েকজন শিষ্যও এখানে হয়েছিলেন। কালী মীর্জার সেই সেই শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম অম্বিকাচরণ। অম্বিকাচরণের পদবী কি ছিল তা অজ্ঞাত, তবে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথা জানা গেছে। উমানাথ উক্ত অম্বিকাচরণের কাছেই শিক্ষা করেন টপ্পা। এইভাবে কালী মীর্জার (যাঁর রাগবিদ্যার এক শিষ্য হয়েছিলেন স্বনামধন্য যুগপুরুষ রামমোহন রায়) টপ্পা সম্পদের উত্তরাধিকার কিছু পরিমাণে লাভ করেন। তা ছাড়া, সমসাময়িককালের বাংলায় টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও উমানাথের যোগাযোগ ছিল, মনে হয়। কারণ উমানাথের গান সংগ্রহের খাতায় মহেশচন্দ্র রচিত কয়েকটি বাংলা টপ্পা দেখা যায়। এমনও হ'তে পারে, মহেশচন্দ্রের কাছে টপ্পা শিখেও ছিলেন উমানাথ। তবে এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় নি।

এই পর্যন্ত উমানাথের সঙ্গীতশিক্ষার কথা। উত্তর-জীবনে তিনি কথকতাতেই আত্মনিয়োগ এবং তখনকার বাংলার একজন খ্যাতনামা কথক রূপে জীবনে সাফল্য অর্জন করেন। যশের সঙ্গে অনেক বিষয়সম্পত্তি ক'রে মালিপোতায় নিজের বিরাট বাড়ীতে বাস করতে থাকেন অতি সম্পন্ন গৃহস্থের মতন। বাংলার অনেক অঞ্চলে এবং বিহারেরও কোন কোন জায়গায় উমানাথের কথকতার আসর হ'ত। সেকালের বাংলার কথকতাপ্রিয় এমন কোন জমিদার পরিবার প্রায় ছিলেন না যেখানে উমানাথের কথকতা হয় নি। কথকতার মধ্যে মধ্যে তাঁর মাধুর্যময় কণ্ঠে ধ্রুপদাঙ্গ কিংবা টপ্পা অঙ্গের গান অতি আকর্ষণের বস্তু ছিল তাঁর শ্রোতাদের কাছে। এইভাবে কথক বৃত্তিধারী হয়েও উমানাথ সঙ্গীতের চর্চা বরাবর বজায় রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, পুত্রদের নিজে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়ে পণ্ডিত বংশকে রূপান্তরিত করেন সাঙ্গীতিক পরিবারে।

উমানাথ নিজে গান রচনাও করতেন, কথকতার পালা রচনার সঙ্গে এবং তা ছাড়াও। তাঁর রচিত গান পরে তাঁর পুত্র নগেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আসরে গাইতেন। উমানাথের লেখা দু'টি গান এখানে দেওয়া হ'ল। প্রথমটি ধ্রুপদাঙ্গের।

মুলতান, চৌতাল

রাম নব দুর্বাদল শ্যাম তাড়কানাশন নিখিল সুকৃতধন,
কাম নির্বাণ-ধাম সম যাম সব ॥
সীতানাথ অনাথনাথ ভরব পূর্বজাত কুশ লব তাত,
দশরথতনয় নিরূপম যশোরব ॥
অখিল জগত বন্দ্যো, করুণাময় গুণসিন্ধো,
তব শরণাগত বিজয় হৃদয় তিমির হর ॥
দুরিত ভাব রাবণাদ্য নিশাচর গণনাশন,
তারণ কারণ জানকী মনো রভসে রাঘব ॥

গৌরী, কাওয়ালী

শিবশঙ্কর বম্ বম্ ভোলানাথ,
কৈলাস শিখরপতি বৃষভাসনে গতি,
পাগল চঞ্চলমতি গায়ে বাঘছাল।
ছাই ভস্ম মাখা গায় শ্মশানে নেচে বেড়ায়,
ভাঙ্ ধুতুরা খায় গলে হাড় মালা॥
বিষপানে ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু সর্বক্ষণ,
শিরে জটা ফণীগণ হেরে যে গিরিবালা॥
নন্দী ভৃঙ্গী দুই পাশে কভু রোষে, কভু হাসে,
কভু ঘোর উল্লাসে, দেখে পঞ্চভূতের খেলা॥

উমানাথের গান রচনা-শক্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথও লাভ করেছিলেন।

উমানাথ সঙ্গীতের চর্চা নিজে যেমন বজায় রেখেছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর ওস্তাদ সংসর্গ। তাঁর মালিপোতার বাড়ীতে নামী কলাবন্তদের আসা-যাওয়া ছিল, অনেকের আসরও বসেছে। এ সম্পর্কে নাম পাওয়া যায় বড়ে দুন্নি খাঁ, শ্রীজান বাঈ, আহম্মদ খাঁ প্রভৃতি গুণীর। খেয়াল গায়ক আহম্মদ খাঁ একবার এ বাড়ীতে এসে মাস তিনেক ছিলেন। কথকতার সূত্রে রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বংশীয়দের সঙ্গে উমানাথের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। তাঁদের জলসাঘর থেকে তাঁর বাড়ীতে ওস্তাদদের আগমন ঘটেছে।

এমনিভাবে তাঁদের পরিবারে উমানাথ সৃষ্টি করেছিলেন সঙ্গীতের পরিবেশ। নিজের তিন পুত্রকে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা দেন কয়েক বছর ধরে। তাঁদের মধ্যে প্রতিভাবান নগেন্দ্রনাথ সবচেয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করে বৃহত্তর সঙ্গীত-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পান। তা ছাড়া উমানাথের কনিষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ তাঁর কম্র কণ্ঠের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন এ অঞ্চলে।

নগেন্দ্রনাথ পিতার কাছে অল্প বয়স থেকে ধ্রুপদ ও ধামার শিক্ষা করেন এবং কিছু টপ্পাও। ১১।১২ বছর বয়স থেকে উমানাথের সঙ্গে তাঁর অনেক কথকতার আসরে

উপস্থিত থাকতেন। এইভাবে তাঁর পিতার দৃষ্টান্তে কথকতার পাঠ আরম্ভ। উত্তর-জীবনে নগেন্দ্রনাথ কথকতাতেও জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে বেশি আত্মনিয়োগ করতেন না। সঙ্গীতই তাঁর চিরদিনের প্রিয় সাধন।

বাল্যকাল থেকে পিতার সঙ্গে কথকতার আসরে আসরে নানা জায়গায় যাতায়াতের ফলে নগেন্দ্রনাথের অনেক বিশিষ্ট পরিবারে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী জীবনে যে সব বিখ্যাত বাড়ীর আসরে নগেন্দ্রনাথের গান বেশি হয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পিতার সময় থেকে। যেমন রাণাঘাটের পাল চৌধুরী, উলা ও গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায় ভবন, ত্রিপুরার দরবার ইত্যাদি।...

পিতার কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার পর নগেন্দ্রনাথ কয়েকজন ভারতবিখ্যাত কলাবতের কাছে শেখবার সুযোগ পান। রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা নিবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে. পাঠক পাঠিকাদের স্মরণ থাকতে পারে। পৈত্রিক বাড়ীতেও ওস্তাদ সংসর্গ কিছু কিছু ঘটেছিল তাঁর: মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরীদের এবং উলা (বীরনগর) ও গোবরডাঙার দু'টি মুখোপাধ্যায় ভবন থেকেও তিনি একাধিক গুণীর কাছে ভালভাবে শিক্ষার সুযোগ পান।

তা ছাড়া আরও নানা সূত্রে বিভিন্ন কলাবতের শিক্ষা লাভ করেন তিনি। যাদের কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা সম্ভব হয় পিতার অধীনে শেখবার পরে, তাঁরা হলেন—আহম্মদ খাঁ, যদু ভট, ইমাম বাদী, বড়ে দুন্নি খাঁ ও শ্রীজান বাঈ। তাঁদের মধ্যে যদু ভটের সঙ্গ তিনি লাভ করতেন ত্রিপুরায় গেলে, সেখানে যদু ভট্ট জীবনের শেষ ক'টি বছর দরবারী গায়করূপে অবস্থান করেন। শ্রীজান বাঈয়ের কাছে ঠুংরি শিক্ষার সুযোগ নগেন্দ্রনাথ পান উলার মুখোপাধ্যায় পরিবারের আসরে এবং মুক্তাগাছাতেও। আহম্মদ খাঁ ও বড়ে দুন্নি খাঁকে বেশির ভাগ রাণাঘাটেই পেয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনের কাছেই তিনি তালিম পান খেয়ালের, শেষোক্তের কাছে টপ্পারও। বারাণসীর মহারাজার সভাগায়িকা ইমাম বাদীর (ইনি মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবারেও এক সময় ছিলেন, শোনা যায়) কাছেই নগেন্দ্রনাথ টপ্পা শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। সেই সুবাদে ওস্তাদ রমজান খাঁ'র সঙ্গে তাঁর একটি প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। রমজান খাঁ দীর্ঘকাল কলকাতায় বাস করবার সময় নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বহুবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে নানা আসরে। রমজানকে তিনি রাণাঘাটের আসরে গাইতেও নিয়ে গেছেন। দীর্ঘদিনের সংস্রবে রমজান খাঁ'র কাছ থেকে পরোক্ষে অনেক টপ্পা সঞ্চিত হয়েছে তাঁর ভাণ্ডারে।

সেই সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও উল্লিখিত সঙ্গীতপ্রেমী পরিবারগুলির উচ্চাঙ্গের আসরে অন্যান্য কলাবতদের সঙ্গীত-চর্চা থেকেও যে সঙ্গীত বিষয়ে উপকৃত হন, তা অনুমান করা যায়।

এমনিভাবে গঠিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবন।

সম্পূর্ণ অপেশাদার থেকে আমৃত্যু সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে তিনি নিয়োজিত রাখেন। উমানাথের সময়ে ও দৃষ্টান্তে পরিবারে যে সঙ্গীত-চর্চার পত্তন হয়েছিল, নগেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তা লাভ করে পরিপূর্ণতা। নগেন্দ্রনাথ বাড়ীর প্রায় সকলকে সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়ে রীতিমত সঙ্গীতজ্ঞ পরিবার গঠন করেন (তাঁর অনাত্মীয় শিষ্য-মণ্ডলীর কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে)। তাঁর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতার কাছে সঙ্গীত-চর্চা করলেও নির্দেশাদি পান জ্যেষ্ঠের কাছেও। তারপর তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি প্রথম থেকেই শিক্ষা দিয়ে গায়ক করে তোলেন। দৌহিত্র সৌরেশও তাঁর সঙ্গীত-শিষ্য। দৌহিত্রী পুত্র শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ও কিশোর বয়সে নগেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছেন। এমন কি নিজের এক কন্যা এবং দুই দৌহিত্রী কন্যাকেও নগেন্দ্রনাথ গান শিখিয়েছিলেন যা সেকালের স্থানীয় অঞ্চলে প্রায় অভাবিত ছিল। নগেন্দ্রনাথের প্রভাবে এ বংশে সঙ্গীত-চর্চার জন্যে তখন এমন খ্যাতি হয় যে, আগেকার আমলে পণ্ডিত বংশ বলে যে মালিপোতার ভট্টাচার্য পরিবারের পরিচয় ছিল, এ অঞ্চলের সাধারণ লোক সে কথা ভুলে গিয়ে গানের জন্যেই মনে রাখে এই ভট্টাচার্য উপাধির বংশটিকে।

ভট্টাচার্য বাড়ীর সবাই গাইয়ে—সেসব দিনে স্থানীয় অঞ্চলের লোকদের মনে এই ধারণা জন্মে যায়। এ বাড়ীর গানের আসর বন্ধ থাকত কদাচিৎ।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, নগেন্দ্রনাথের পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ এ বংশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গায়ক হন। তাঁর মতন অসাধারণ দরাজ গলা সচরাচর শোনা যেত না সেকালে। অতি দরাজ গলার জন্যে স্থানীয় অঞ্চলে তিনি অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। নদীয়া ও ২৪ পরগণার কাছাকাছি অঞ্চলে প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাঁর অনেক আসর মাৎ করবার চমকপ্রদ কাহিনী। ভাওয়াল দরবারেও সত্যেন্দ্রনাথের গান অনেক-বার হয়েছে। সেখানে পশ্চিমা গুণীদের সঙ্গে বসে হিন্দুস্থানী

গান শুনিয়েছেন তিনি সমান মর্যাদায়। ভাওয়াল দরবারে তাঁর গানের প্রাইভেট রেকর্ড হয়েছিল, কিন্তু সেসবের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথ জি শার্পে গান গাইতেন। এত উচ্চ গ্রামে বাঁধা ছিল তাঁর ভরাট কণ্ঠ। অনেক সময় তারা গ্রামের পঞ্চমে সুরকে স্থায়ী করে তিনি তানকারী করতেন। (লয়েও এমনি সিদ্ধ ছিলেন যে অনেক তবলচীকে নাকাল হতে হয়েছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতে বসে)।

সেকালের নিস্তব্ধ পল্লীতে কোন রাতের আসরে তিনি যখন গাইতেন, পাশের গ্রাম থেকে সহজেই তাঁর গান শোনা যেত। নদীপথে যদি গান গাইতে গাইতে নৌকায় আসতেন (এরকম সময়েও তিনি প্রাণের আরামে গান গাইতেন, সঙ্গীত তাঁর এমন অভিন্ন সত্তা ছিল যে, গান না গাওয়া অবস্থায় তিনি খুব কমই থাকতেন।)—মাইল খানেক দূর থেকে ভেসে আসত তাঁর গানের সুর। আর সকলেই বুঝতে পারত, সত্যেন্দ্রনাথ নৌকায় দূর থেকে আসছেন। তিনি উপস্থিত হবার অনেক আগে থেকে এসে পৌঁছে যেত তাঁর অতি দরাজ গলার সুর।

একবার তিনি যশোর থেকে ফিরছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ ও গুণমুগ্ধ বন্ধু ক্যাপ্টেন সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কৃতী চিকিৎসক) বাড়ী গিয়েছিলেন, যেমন যেতেন মাঝে মাঝেই। সেখানে গেলেই সত্যেন্দ্রনাথের গানের আসর হ'ত। কাছাকাছি অন্য জায়গায় হলেও সুরেন্দ্রনাথ যেতেন তাঁর গান শুনতে। পারতপক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের গানের আসর তিনি বাদ দিতেন না।

এদিনেও সুরেন্দ্রনাথের ওখানে গান গেয়ে তিনি ফিরছিলেন নৌকায়। বনগাঁ থেকে ইছামতী নদীতে আসছিলেন। মাজিপোতায় নয়, ইছামতীর ধারে ঘাটবাঁওড় গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়ী, সেখানে।

আগে থাকতে খবর দেওয়া ছিল না যে, আসছেন। তবে সেজন্যে কিছু আসে-যায় নি। সেকালের শ্বশুর-বাড়ীতে জামাইয়ের অভ্যর্থনা, আদরযত্ন সদা-প্রস্তুত। অসুবিধার কথা এই তাঁর মনে হয়েছিল যে, ফিরতে ফিরতে রাত তখন অনেক হয়ে গেছে। কন্‌কনে শীতের রাত, তাও একটা বেজে গেছে ঘাটবাঁওড়ে পৌঁছবার অনেক আগেই। সে বাড়ীতে পৌঁছতে দুটো বেজে যাবে নির্ঘাৎ। এত রাত্রে এই অন্ধকারে দরজা ঠেলাঠেলি করে তাঁদের জাগাবেন তাঁরা খাওয়াবার জন্যে নিশ্চয় তখন রান্নার আয়োজন, ইত্যাদি করবেন। বড়ই কষ্ট দেওয়া হবে—এই সব ভেবে সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন মনে মনে। কিন্তু কোন উপায় নেই, রাত যতই হোক যেতে হবে, মাজিপোতায় ফেরা এখন আরও অসুবিধা।

এই সব কথা মাঝে মাঝে ভাবছিলেন বটে, কিন্তু যথারীতি গানও গাইছিলেন নৌকোয় বসে। তারপর গ্রামের ঘাটে এসে নৌকো থেকে নেমে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছলেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! সেই দু'প্রহর রাতে বাড়ীতে আলো জ্বলছে। আর সকলেই তখনও জেগে।

সত্যেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি, এত রাত্রেও আপনারা ঘুমোন নি? আমি ভাবছিলাম, দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে আপনাদের তুলতে হবে।

—না। আমরা সব জেগেই আছি। এখন এস, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। খেতে বসবে চল, না হ'লে খাবার জুড়িয়ে যাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ আরও আশ্চর্য হলেন।—এত রাতেও খাবার গরম তৈরি আছে?

—আমরা ঘণ্টা খানেক আগে থেকে তোমার গান শুনেছিলাম। তখনই রান্নার জোগাড় করা হয়। আমরাও সেই জন্যেই জেগে আছি, যাতে তুমি আসামাত্র সব দেওয়া যায়।

জামাতা তখন ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন।

এমনি সব ঘটনা তাঁর সঙ্গীতজীবনকে ঘিরে আছে।

আসরে তিনি সাধারণত হিন্দুস্থানী গান গাইলেও, বাংলা টপ্পা গানও শোনাতেন অনুরুদ্ধ হ'লে। কলকাতার কয়েকটি আসরেও তাঁর গুণপনার পরিচয় শ্রোতারা পেয়েছেন। দেশে থাকতেই ভালবাসতেন আর সেখানে গান গেয়েই একরকম কাটিয়ে যান জীবন। গলা যেমন দরাজ ছিল, তেমনি অফুরন্ত দম। যে কোন আসরে ৪।৫ ঘণ্টা এক দমে অক্লেশে গেয়ে যেতে পারতেন। বাড়ীতে ত কথাই নেই। যে রাত্রে আকস্মিক মৃত্যু হয় হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে, সেদিনও সন্ধ্যার পর বসে চার ঘণ্টারও বেশি গান গেয়েছিলেন এবং তাও মৃত্যুর মাত্র আড়াই ঘণ্টা আগে। মাজিপোতার বাড়ীর পূজার দালানে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত সচরাচর যেমন গাইতেন, সেদিনও তেমনি গেয়েছিলেন—তবে কেউ জানত না যে সেই তাঁর শেষ গান।

তিনি মাজিপোতার আদি বাড়ীতেই থাকতেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বেশির ভাগ বাস করেন রাণাঘাটের বাসা বাড়ীতে, মিড্‌ল রোডে। সেজন্যে নগেন্দ্রনাথ রাণাঘাট নিবাসী বলেই সকলের সুপরিচিত হন এবং তাঁর সঙ্গীত-সাধনা ও শিষ্য গঠনের ফলে রাণাঘাটও সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে সেকালে বিখ্যাত হয়। রাণাঘাটে খেয়াল ও টপ্পা চর্চায় যে

ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রধানত শিল্পী তথা আচার্য নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে।

বৃহৎ শিষ্য-সমাজ নিয়ে পরিণত বয়সে নগেন্দ্রনাথ রাণাঘাটে স্বয়ং একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের তুল্য হয়েছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে কেন্দ্র করে 'নগেন্দ্র সঙ্গীত পরিষদ' নামে একটি সঙ্গীত সম্মিলনী স্থাপন করেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ। সে পরিচয় উচ্চশ্রেণীর আসরে আসরে প্রাণবন্ত হ'ত। তিনি জীবিত থাকতে পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন ওস্তাদ বদল খাঁ, ওস্তাদ রমজান খাঁ, ধ্রুপদাচার্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরবাহার-শিল্পী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, সঙ্গীতরত্ন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গুণী।

এসব নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবনের শেষ পর্বের কথা। প্রায় অন্তিমকাল পর্যন্ত নিজে সঙ্গীতচর্চা ও ছাত্রদের সঙ্গীত-শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে তাঁর কোন ছেদ পড়ে নি। সঙ্গীতের পরিবেশের মধ্যে তিনি থাকতে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি তা সৃষ্টি ক'রে নেবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর। সেই জন্যে নিজের সমগ্র পরিবারকে পরিণত করেছিলেন সঙ্গীতসেবী মণ্ডলীতে। পুত্র সন্তান ছিল না, তাই ভ্রাতুষ্পুত্রদের ও দৌহিত্রকে পুত্রস্নেহে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়ে গেছেন। সঙ্গীত তাঁর সমগ্র সত্তা কিরকম অধিকার ক'রে রেখেছিল, তার পরিচয় ফুটে উঠত ছোটখাট ব্যাপারেও। বাড়ীর শিশুদের আদর করতেন, তাও তাঁর নিজস্ব সুরে ও ভঙ্গিতে। দুই বলিষ্ঠ হাতে নিয়ে শিশুদের লোফালুফি করতেন তবলার বোলের তালে তালে: তেরেকেটে ধেন্ ধেনা ধেন ধেনে ধা, তেরেকেটে তেন্ তেনা তেন্ ধেনে ধা ইত্যাদি।

শেষ জীবনে দু'টি শোক পেলেন এবং তা-ই তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল। কিন্তু সে শোকও পুরো ব্যক্তিগত নয়, সঙ্গীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। প্রিয় দৌহিত্র সৌরেশকে পরম স্নেহে উদীয়মান গায়ক ক'রে গড়ে তুলেছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে পেলেন কঠিন আঘাত। বলেছিলেন—বুকের একটা ফুসফুস গেল। তার কিছুদিনের মধ্যেই প্রিয়তম শিষ্য ও শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক পদ্মবাবু মাত্র ৪২ বছর বয়সে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে প্রাণ হারালেন।

পদ্মবাবুকে যখন আচার্যের বাড়ীর সামনে দিয়ে শেষ যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হ'ল, দোতলার জানলায় গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন—আর একটা ফুসফুসও গেল।

সেই রাত থেকেই শয্যা নিলেন নগেন্দ্রনাথ। তারপর ঠিক এক সপ্তা পরে অনন্ত সুরলোকে প্রয়াণ করলেন।...

———

কোন দেশ বড় কি ছোট তাহা দেশের বৃহত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব দ্বারাই নিরূপিত হয় না। শক্তির দ্বারাই মহত্বের বিচার।...

এসব বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদ্রতর ঘরের কথাতেও দেখিতে পাই, লোক-সংখ্যায় দেশকে বড় করে না, অনুরাগ, উৎসাহ ও শক্তিতে বড় করে।

প্রবাসী, মাঘ ১৩২০

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকার দান

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় যে বিচিত্র বিষয়বস্তুর সার্থক সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তার বাহ্যিক প্রমাণ বা উল্লেখ রয়েছে পত্রিকার 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামাকরণের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড বা মধুচক্র। দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে সযত্নে আহরিত এবং রচিত এই মধুচক্রের কোষগুলিতে প্রত্যেক খণ্ডে সঞ্চিত রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব জাতেরই মধু। এই নানা জাতের মধুর, তথা বিচিত্র বিষয়বস্তুর উল্লেখ এবং পরিচয় আছে পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায়।

পত্রিকাখানির আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে: 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' অর্থাৎ 'পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিকপত্র।'

বিবিধার্থ-সংগ্রহ রূপ এই মধুচক্র মাইকেল শ্রীমধুসূদন রচিত মধুচক্রের তুলনায় কম স্বাদু বা উল্লেখযোগ্য নয়। তফাৎ এই যে, বিবিধার্থ-সংগ্রহ গদ্যে রচিত, আর শ্রীমধুসূদনের মধুচক্র প্রধানত চতুর্দশপদীতে রচিত। তবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা-খানির সম্পর্কেও মধু কবির মত সমান বিনয়-মিশ্রিত গর্বভরে বলতে পারতেন: 'রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!'

একাধারে দেশের শিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ-বনিতার মনে যে পত্রিকাখানি অন্তরঙ্গ আসন পেয়েছিল তা এই রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকা।

প্রকৃতপক্ষে, বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা আজও বাংলা ভাষাভাষী তথা, বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে উপভোগ্য এবং নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।—তার একমাত্র এবং প্রধান কারণ, পত্রিকায় পরিবেশিত বিচিত্র বিষয়-বস্তুর বিবরণ। আর, বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদের কাছেও বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার আকর্ষণ এখনও বজায় আছে বলেই বিশ্বাস করি। কারণ, বাংলা সাময়িক সাহিত্যে এবং সমালোচনা সাহিত্যে বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য দান রয়েছে।—গবেষক হিসাবে অন্তত এ কথাটা বলবার মত ভরসা রাখি। তা ছাড়া, পূর্বসূরী সাহিত্য-সমালোচকদের অনেকেই এ কথা বলে গেছেন। এবং সমসাময়িক সমালোচকদের অনেকেও এ কথা এখনও পরস্পর বলাবলি করে থাকেন।

যাই হোক, পত্রিকায় বিচিত্র বিষয়বস্তুর বিবরণমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের আয়োজনের ঘোষণামূলক একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় পত্রিকার প্রথম পর্বের প্রথম সংখ্যার ভূমিকায়। ভূমিকাটি, বলা প্রয়োজন, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। ওই সম্পাদকীয় ভূমিকার সুরুতেই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন:

"জগদীশ্বরের কি অনুপম মহিমা! তাঁহার ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কি আশ্চর্য অনির্বচনীয় ব্যাপার সকল অবিরত নিষ্পন্ন হইতেছে! তাঁহার নিয়মে আকাশে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি স্ব স্ব কর্মে সর্বদা নিযুক্ত আছে; কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তেও বিশ্রাম করে না। চন্দ্রের পাক্ষিক হ্রাস বৃদ্ধি সহস্র বৎসর পূর্বে যে নিয়মে হইয়াছিল অদ্যাপিও তদ্রূপেই হইতেছে. তাহার কিঞ্চিতমাত্রও ন্যূনাতিরেক হয় নাই। গ্রহ সকল আপন আপন নির্দিষ্ট ব্যাসে সর্বদা সমবেগে ভ্রমণ করে, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথার সম্ভাবনা নাই। জীবের জন্ম স্থিতি ও মৃত্যু কি বিস্ময়জনক পদার্থ! তাহাতে কত অদ্ভুত ঘটনা সকল সর্বদা দৃষ্ট হয়! এক প্রকার এমত কীট দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার দেহ কেবল মাংসময়, ও এমতে সূক্ষ্ম যে মনুষ্য-চক্ষের দুর্লক্ষ্য; অথচ তাহাদের বংশবৃদ্ধি এ প্রকার সত্বরে হয় যে, দুই দিবসের মধ্যে উর্ধ্বাধ-দীর্ঘ-প্রস্থ চতুর্দিকে এক ফুট স্থান ঐ কীটবংশে পরিপূর্ণ হয়। কোন জীবদেহ এ প্রকার আছে যাহাকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার প্রত্যেক খণ্ড এক এক তজ্জাতীয় জীব হয়। অপর এক প্রকার কীট আছে যাহার দেহ

একাঙ্গুলি পরিমাণ স্থানের সহস্রাংশের একাংশ স্থানও ব্যাপ্ত করে না ; অথচ মনুষ্যের উদরে যদ্রূপ কৃমি বাস করে তদ্রূপ তাহার দেহ মধ্যে তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র অন্য কীটসমূহ স্ব স্ব জীবনের কর্ম নির্বাহ করিতেছে। এহ্রেণবর্গ সাহেব অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে চীনদেশে ও অন্যত্র যে পীতবর্ণ বালুকাবৃষ্টি হয় তাহার প্রত্যেক রেণু এক একটি ক্ষুদ্র শম্বুক। এই বৃষ্টি এককালে বহু ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া হয়, অতএব পাঠক মহাশয়েরা ভাবিয়া দেখুন যে এক এক পশলা বালুকাবৃষ্টিতে কত অসংখ্য কোটি শম্বুক আকাশ হইতে নিপতিত হয়। অনেক উপদ্বীপ কেবল কীটদ্বারা নির্মিত। অনেক পর্বত শুদ্ধ কীটাগারের সমষ্টি। এক বিন্দু অপরিষ্কার জল শত সহস্র কীটের আধার। কিন্তু কেবল কীট সংঘই যে আশ্চর্যের আকর এমত নহে। জগৎ-পিতার বর্ণনাতীত কৌশল সর্বত্রই সমরূপে ব্যক্ত আছে, সকল জীবই স্ব স্ব অসাধারণ গুণ দ্বারা পরমেশ্বর-মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। দক্ষিণ অমরিকা (অ্যামেরিকা) দেশে এমত এক মৎস্য জাতি আছে যাহাকে স্পর্শ করিলে অশ্ব অবধি সকল জীব তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। কিয়ৎকাল পূর্বে আস্ত্রেলীয়া (অস্ট্রেলিয়া) দেশে এক পক্ষী ছিল যাহার ঊর্ধ্ব পরিমাণ সামান্য হস্তী হইতে দ্বিগুণ। অনেক পক্ষী আছে যাহাদের ডানা নাই। একজাতি পশু আছে যাহারা নগর নির্মাণ করিয়া বাস করে। ঐ নগর উত্তম পারিপাট্যে নির্মিত হয় ; এবং ঐ পশুনগরস্থ প্রত্যেক বাটীতে শয়নাগার, ও প্রমোদাগার, ও প্রসবাগার নির্দিষ্ট আছে। অপর অশ্বের বেগ এবং মনুষ্যোপকারিতা, হস্তীর বুদ্ধি এবং ধীরতা, কুকুরের কৃতজ্ঞতা, উষ্ট্রের সহিষ্ণুতা, সিংহের গাম্ভীর্য, ব্যাঘের বীর্য, এই সকলেতেই সর্বনিয়ন্তার মহিমা বিস্তৃত হইতেছে ; ইহাদের বিচার পরম জ্ঞান ও আনন্দের প্রধান উপায় ; ইহা বালক ও বৃদ্ধ ও বনিতা সকলেরই মনোরঞ্জক, এবং সকলেই ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সময়ে সময়ে এতদ্বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রায়, এবং তদভিপ্রায়ে এই পত্র স্থাপিত হইল। পরন্তু আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় এবং জীব-সংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালংকারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য ; এই সকল বিষয়েই আমরা যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব ; এবং যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে তত্তদ্‌বিষয়ের জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে সম্যগ্‌রূপে চেষ্টা করিব। যে কেহ দুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থ-সংগ্রহকে সমাদর করিবেন তাঁহার ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অনেকের নিকট ঐ পত্র পারিষদের ন্যায় বহুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধজ্ঞান ও প্রমোদজনক সদালাপ দ্বারা তাঁহাদের তুষ্টি জন্মাইবে ; ফলতঃ পাঠক মহাশয়দিগের সন্তোষার্থে এক বৎসরকাল আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে সংকল্প করিলাম, পরে তাঁহাদের উৎসাহানুসারে এই পত্রের পরমায়ু নির্দিষ্ট হইবে।"

দেখা গেল, সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে পত্রিকায় পরিবেষণযোগ্য বিচিত্র বিষয়বস্তুর উল্লেখও করেছেন কৌশলে। প্রথমে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি গ্রহের কথা, জীবের জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু প্রসঙ্গ ; এবং ক্রমে দেশ ও প্রাকৃতিক অবস্থার কথা ; নদ নদী পাহাড় পর্বত, পশু-পাখি ; জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্য অলংকার ইত্যাদি বিষয়বস্তুর উল্লেখ করে সম্পাদক বলেছেন, এই সমস্ত বিষয়ের "যথার্থ বর্ণনা প্রকাশ করা" তাঁদের অভিপ্রায়, এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যেই বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার আত্ম-প্রকাশ। শুধু তাই নয়, সম্পাদক আরও ঘোষণা করেছেন, উল্লিখিত সমস্ত বিষয়বস্তুর বর্ণনায় তাঁরা 'যথাসাধ্য মনো-নিবেশ' করবেন। কারণ হিসাবে সম্পাদক বলেছেন, যাতে "স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে তত্তদ্‌বিষয়ের জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েন"—এটাই তাঁদের উদ্দেশ্য, আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তাঁরা সম্যক চেষ্টা করবেন। সম্পাদকের এই প্রতি-শ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল, একথার প্রমাণ বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিষয়ের দুরূহ অথচ জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সাধারণের মধ্যে সহজ সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে প্রচারের কৃতিত্ব বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার অবশ্যই প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে ('ঘরের পড়া' অধ্যায়ে) বলেছেন :

> "রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নহাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার আনন্দ-স্মৃতি বর্ণনার পরবর্তী

অংশেই (ঐ 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে) রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালীন সমসাময়িক বাংলা পত্র-পত্রিকা-গুলিতে পরিবেষিত বিষয়বস্তুর দৈন্যের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। এবং তুলনামূলকভাবে, বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা ও বিদেশী পত্রিকাগুলির কৃতিত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "এই [বিবিধার্থ-সংগ্রহ] ধরণের কাগজ একখানিও এখন ['জীবনস্মৃতি' রচনাকালে] নাই কেন। একদিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ব, অন্যদিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণ কাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাসল্‌স ম্যাগাজিন, ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় যোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।"

—অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসরণে বলা যায়, দেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনের খাওয়া পরার চাহিদা অনুযায়ী মোটা ভাত মোটা কাপড় যোগান দেওয়ার কৃতিত্ব এই বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার যথাযথ মূল্যায়নে এই উক্তির বিরুদ্ধমত বাংলা ভাষাভাষীর মনে থাকতে পারে—একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, পত্রিকায় পরিবেশিত বিচিত্র বিষয়বস্তুর মূল্যায়নের জন্যে সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তার জন্যে প্রয়োজন কেবল-মাত্র পত্রিকা খুলে পাতা ওলটানো। তা হ'লেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে সহজ সত্যই অকপটভাবেই প্রকাশিত। আর, সেই উক্তিকে সমর্থন জানাতে বিবেচক পাঠক মাত্রেরই সঙ্গে বর্তমান লেখকও প্রস্তুত।

স্থূল অর্থে ভারতবর্ষ মানে ভূগোল বর্ণিত একটি সীমাবদ্ধ দেশ। কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থে ইহার মধ্যে কোন কোন জায়গা ভারতবর্ষ নহে, আবার ইহার বাইরেও কোন কোন জায়গা আছে, যাহাকে ভারতবর্ষ বলা যাইতে পারে। মাটির কোন জায়গাকে আমরা ততটা ভারতবর্ষ মনে করি না, ভারতীয় হৃদয় মন আত্মা যে-যে রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে যতটা ভারতবর্ষ বলিতেছি।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

নিঃসঙ্গ জীবন

নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো ক্রমেই সহ্য হয়ে আসতে লাগল কাজ ছাড়া সময় কাটানো মুস্কিল। কাজের মধ্যে সমস্ত সময়টা ভরিয়ে রাখতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। দুন স্কুলের মাষ্টাররাও তাদের স্ত্রীরাও অনেকেই আমায় স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক সময় আমি গল্প করে কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু তবু মনের ভেতর একটা জায়গায় নিঃসঙ্গ বোধ করতাম। এবং সে বোধ যতই নিবিড় হ'ত, ততই আমি ছবি আঁকায়, মূর্তি গড়ায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতাম। কলাদেবীই আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী, আমার শক্তি। তাঁর কাছ থেকেই আহরণ করছি ইন্‌স্পিরেশন! কলাদেবীই আমার অসম্পূর্ণ জীবন সম্পূর্ণ করে রেখেছেন!

মা ও শ্যামলীর দেরাদুন প্রত্যাবর্তন

যুদ্ধের সময় তখন। ১৯৪২ সাল থেকেই জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে লোকে এদিকে-ওদিকে সরে পড়তে লাগল। মা ও কন্যা শ্যামলী সিলেটে বড় দিদির কাছে ছিল। সিলেটেও জাপানী বোমার ভয় ছিল। দেরাদুনে আমি একলা। ফুট সাহেব আমায় একদিন বললেন, 'শ্যামলীকে সিলেটে না রেখে এখন নিজের কাছে রাখাই ভাল।' কথাটা বার বার ভাল করে নানাদিক থেকে ভেবে দেখলাম। অনেক ভাবনাচিন্তার পর ঠিক

জোরি

করলাম, মা যদি এখানে এসে থাকেন তবেই শ্যামলীকে এখানে এনে রাখা যায়। মাকে লিখলাম সব গুছিয়ে। তিনি রাজী হলেন। কিন্তু দিদি মর্মাহত হলেন। আমি

যে এখানে নিঃসঙ্গভাবে দিন কাটাচ্ছি, সে কথাটা বোধ হয় দিদি তলিয়ে দেখেন নি। তা ছাড়া যুদ্ধের সময় তখন; সবদিক থেকেই মেয়েকে অতদূরে রাখা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই সবাই পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমিও তাই মনে করে ছিলাম। শ্যামলীকে নিয়ে মা দেরাদুনে এসে পৌঁছলেন। নির্জন ঘর-দোরে আবার যেন শ্রী ফিরে এল। বাবা মারা যাবার পর মা এক রকম চুপচাপ হয়ে পড়েছিলেন। ভেবে-ছিলেন পৃথিবীতে তাঁর কাজ বুঝি শেষ হয়েছে। শ্যামলী মা হারা হতে ভগবান আবার মায়ের উপর আবার দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন।

মা ও শ্যামলী আসবার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই বাড়ীতে বাঙালী পাড়ার মেয়েরা কেউ কেউ দেখা করতে আসতে আরম্ভ করলেন। একলা যতদিন ছিলাম, কেউ ধারে-কাছে ঘেঁষতে ভয় পেত। এবার মা আসাতে তাদের সুবিধা হয়ে গেল। আমার যে বয়েস বেশী নয়, আমি যদি আবার সংসারী হই, তবে যে সেটা মোটেই বেমানান হবে না, এই সব কথা আমার কানের কাছে অনবরত নানান ভাবে নানান দিক থেকে আসতে লাগল। এমন কি দু'একজন একেবারে কন্যাদের নিয়ে ঘরে এসে দেখা করে গেলেন। মা ও শ্যামলী বাড়ীতে আছে এবং আমার উপর কলাদেবীর আশীর্বাদ—তাই দিনগুলি বেশ কাটছিল। আর কেন? জায়গা কোথায় যে স্থান করে নিতে পারবে এ সংসারে!

দুন স্কুলে স্পেশাল আর্ট ক্লাস

দেরাদুন সহর থেকে কেউ কেউ ছবি আঁকা শেখার জন্য আমার কাছে এসে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন। তার মধ্যে বেশীর ভাগই মেয়ে। তাদের চাপটা যখন এড়াবার উপায় রইল না, তখন ফুট সাহেবকে বলতে হ'ল। স্পেশাল আর্ট ক্লাস দুন স্কুলে খোলা ঠিক হ'ল, সপ্তাহে তিন দিন বাইরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তার জন্য প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা আর্ট স্কুল ফণ্ডে জমা দিতে হবে। পাঁচ-ছ'টি ছেলে-মেয়ে জুটে গেল। শ' দেড়েক টাকা মাসে মাসে আর্ট স্কুল ফণ্ডে জমা হতে লাগল। সেই টাকা দিয়ে আমি পরে বহু আর্টের বই, লিনো-কাট, উডকাট, প্রিন্টিং প্রেস আর্ট স্কুলের জন্য কিনেছি।

নজিবাবাদ থেকে একটি ছেলে রামরক্ষা পাল—ছবি আঁকা শিখতে এসেছিল। ছেলেটি অতিভদ্র ও বিনয়ী। দু'তিন বছর নিষ্ঠার সঙ্গে ছবি আঁকা শিখেছিল। পরে ও সর্বদা আমার খবরাখবর রাখত এবং মুসৌরীতে যতবার প্রদর্শনী করেছি, সে এসে সাহায্য করেছে।

দু'চারটি মেয়ে খুব মন দিয়ে ছবি আঁকা শিখেছিল। একটি মেয়ে নিয়মিত আসত, কিন্তু ছবি আঁকায় তার মন তেমন ছিল না। মেয়েরা যখন ছবি আঁকতে আসত, তখন দুন স্কুলের বড় ছেলেরা অনেকে আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শেখবার জন্য ভিড় করত। বড় ছেলেরা কেউ কেউ মেয়েদের সঙ্গে গল্প-সল্পও সুরু করল। সেই সময় আমি একদিন ফুট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্কুলের ছেলেরা এই সব স্পেশাল আর্ট ক্লাসের গার্ল ষ্টুডেন্টদের সঙ্গে যদি কথাবার্তা বলে, তাতে তাঁর আপত্তি আছে কি না। ফুট সাহেব হেসে বলেছিলেন, 'যে সব মেয়েরা আর্ট স্কুলে শিখতে আসছে তারা সবাই ভাল ঘরের মেয়ে; ছেলেরা যদি একটু গল্প-সল্প করে তাদের সঙ্গে, তাতে কিছু খারাপ হতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। বরং ছেলেদের শিক্ষার দিক থেকে এতে ভালই হবে তাঁর বিশ্বাস।" আমি আশ্বস্ত হলাম, কিন্তু মেয়েরা যখন আসত, তখন ছেলেরা অশোভন কিছু যাতে না করে বলে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করতাম। যে মেয়েটির ছবি আঁকায় মন ছিল না, সে মেয়েটি কখনও ক্লাস কামাই করত না। মেয়েটি একটা ছেলের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়েছিল লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু ভাবটা কতদূর গড়িয়েছে তা বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারলাম যখন ফুট সাহেব একদিন আমায় এসে গল্প করলেন। আমি ত অবাক! ছেলেটির মা ফুট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে গেছেন মেয়েটীর সঙ্গে ছেলেটির খুব ভাব হয়েছে, চিঠিপত্র লেখালেখিও চলছে তাদের, এমন কি স্কুলের বাইরেও দেখা সাক্ষাৎ করে থাকে। মেয়েটির মা ছেলেটির বিষয় জানতে এসেছিলেন সেখানে বিবাহ সম্ভব কি না! যদি বিবাহ সম্ভব না হয় তবে ব্যাপারটা আর বাড়তে দেবেন না তিনি! বিবাহ সম্ভব নয়, কারণ ছেলেটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের। সুতরাং মেয়েটির আর্ট স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমি মনে মনে খুশী হলাম, কারণ মেয়েটির ছবি আঁকায় মন ছিল না।

এমনি করে স্পেশাল আর্ট ক্লাস চলতে লাগল। স্কুলের

ছেলেদের শেখানো, স্পেশাল ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের শেখানো, তার উপর নিজের কাজ—মূর্তি গড়া, ছবি আঁকা—একেবারে 'টাইট' ব্যাপার। এতটুকু সময় থাকত না নিঃশ্বাস ফেলবার। দিনগুলো কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যেত তাও টের পেতাম না।

১৯৪৩ সালের গরমের ছুটি

—৪৩'এর গরমের ছুটি সুরু হ'ল জুন মাসের মাঝামাঝি। পুরোদমে ছবি আঁকা, মূর্তি গড়ার কাজ চালালাম। ছুটিতে কোথাও যাব না ঠিক করে ফেললাম। প্রতি সপ্তাহেই প্রায় দুটো করে মাথা শেষ করে ফেলছিলাম। কাউকে দেখে যদি মনে হ'ত তার মুখটি মূর্তি গড়ার মত, তাকেই ডেকে নিয়ে এসে মূর্তি গড়তাম। Life থেকে মূর্তি গড়ার ফাঁকে ফাঁকে মন থেকে ডিজাইন গড়াও চলছিল। মাঝে মাঝে ছবি আঁকাও চলছিল। দু'চারজন ছাত্র আসছিল।

যুদ্ধের বাজার তখন। দেরাদুনে বহু ইংরেজ ও আমেরিকান আর্মি অফিসার এসে পড়েছিলেন। প্রায়ই তাঁরা দুন স্কুল দেখতে এসে হাজির হতেন, ছুটিতেও। আমার সঙ্গে অনেকেরই আলাপ জমে উঠেছিল। মরিস্ লী' বলে একটি ইংরেজ যুবক প্রায়ই আসত আমার কাছে। ছবি ও মূর্তিতে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। অন্যান্য আরও অনেক অফিসারদের ইনি সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। প্রায়ই দু'একখানা ছবি এঁরা আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যেতেন। মরিস্ লী' আমার কাজের উপর কয়েকবার কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একটি প্রবন্ধ আমি আমার এ্যালবামের 'ইনট্রোডাকশন' হিসাবে ব্যবহারও করেছি।

স্যর থিওডোর টাসকার, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে হেলেন তখন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিউটের কম্পাউণ্ডের মধ্যে তাঁবুতে বসবাস করছিলেন। স্যর থিওডোরকে I. C. S. ট্রেনিং ক্যাম্পের সুপারভাইসর করে পাঠিয়েছিলেন। I. C. S. ছেলেদের সবাইকে ফরেষ্ট রিসার্চ ইনস্টিউটে তাঁবুতে বাস করতে হ'ত ; তবে বর্ষার সময় তাঁরা দু'মাসের জন্য দুন স্কুলে উঠে আসতেন। দুন স্কুলে ছুটি বলে সে সময় ছেলেরা চলে যেত। স্যর থিওডোর পরিবারও দুন স্কুলে উঠে এসে কোন খালি কোয়ার্টারে থাকতেন। স্যর থিওডোর ও তাঁর স্ত্রী সত্যই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। প্রায়ই আমার ছবি দেখতে আসতেন। সেই ছুটিতে তাঁদের তিনজনেরই মূর্তি আমি গড়েছিলাম। I. C. S. প্রোবেশনাররাও প্রায়ই আমার কাজ দেখতে আসতেন। ছুটির সময় হলেও দিনগুলি বেশ হৈ চৈ করে কেটে যেত। আগষ্টের প্রারম্ভ, ঘনঘোর বর্ষা চলছে তখন। ঠিক করলাম যে ছবি ও মূর্তির প্রদর্শনী করব। স্যর থিওডোরকে দিয়ে 'ফরম্যাল ওপনিং' করব। তিনি রাজীও হলেন। আর্ট স্কুলের দুটো ঘরই সাজিয়ে ফেললাম। দিন-রাত কাজ চলতে লাগল।

লেডী টাসকার ছিলেন মিষ্টি স্বভাবের বয়স্কা ভদ্রমহিলা। প্রায়ই আমায় খেতে ডাকতেন। নিজেও কোন 'ফরম্যালিটির' ধার ধারতেন না। আমার কাছে এসে প্রায়ই চা খেয়ে যেতেন। লোকেদের খবরাখবর নেওয়া, দরকারের সময় তাঁদের জন্য করা, এই সব স্বভাবসিদ্ধ গুণ তাঁর ছিল। তিনি আবার মাঝে মাঝে ডাক্তারী করতেও ছাড়তেন না। ওঁরা সবাই ছিলেন 'নেচার কিওরের' পক্ষপাতী। কিছু হলেই বলতেন—"উপোষ কর, আর লেবু খেয়ে তিনদিন কাটাও, সেরে যাবে।" সুতরাং ওঁর সামনে কোনরকম অসুস্থতার কথা বলা মোটেই নিরাপদ ছিল না।

প্রদর্শনী ত খোলা হয়ে গেল ঘনঘোর এক বর্ষার দিনে। সেদিন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের "ডেথ্ এ্যানিভার্সারীর" দিন! বর্ষা হলেও বেশ লোক হয়েছিল। আট দশখানা প্রথম দিনেই বিক্রী হয়ে গেল। লেডী টাসকার তিনখানা ছবি কিনলেন। আর কিনলেন Miss Oliphant, Welham School-এর ফরম্যাল ডিরেক্টর। সেই ছুটিতে মাটি দিয়ে তাঁর মূর্তিও করেছিলাম। তাঁর স্কুলের আরও দু'জনের মাথাও গড়েছিলাম। কি করে যে একটা ছুটিতে অত কাজ করেছিলাম, এখন ভেবে কিনারা পাই না। কোথা থেকে পেয়েছিলাম এত শক্তি!

Miss Oliphant আমার ছবির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ছুটি শেষ হতে তখন আর দেরি নেই। একদিন তিনি এসে হাজির। আমার গড়া মূর্তিগুলো আর্টস্কুলে তখনও সাজান ছিল। ছবি যা 'বিক্রী হয়েছিল তা সবই বিলি করা হয়ে গিয়েছিল। ঘরের চেহারাটা সেই কারণে কতকটা ভাঙা হাটের মত অবস্থায় ছিল। Miss Oliphant-এর হঠাৎ কি যে মনে হ'ল জানিনে ; মূর্তিগুলো

দেখতে দেখতে বললেন, "মূর্তিগুলো ব্রোঞ্জে ঢালাই করা উচিত! মাটিতে ক'দিন বা থাকবে, ভেঙে যাবে।"

আমি দুষ্টুমি করে বললাম, "ব্রোঞ্জে ঢালাই করতে যা খরচ! দিন না খরচ, ঢালাই করে রাখতে আমার আর আপত্তি কি!"

তিনি বললেন, "বেশ ত, কত খরচ লাগবে, বল না!"

বললাম, "এই সাত-আটটা মূর্তি যদি আপাতত: ঢালাই করি ত চার পাঁচ হাজার টাকা লাগবে বোধ হয়!"

বললেন, বেশ ত, আমি ঢালাই খরচ আপাততঃ দেব, করে ফেল ব্রোঞ্জ ঢালাই।"

চলে গেলেন সেদিন। আমি ভাবলাম বুঝি কথার কথা, ভুলে যাবেন। হঠাৎ একদিন ব্যাংক থেকে একটি চিঠি এল আমার নামে। চার হাজার টাকা মিস্ ওলিফ্যাণ্ট আমার নামে জমা দিয়েছেন। তার পরের দিন তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলাম। লিখেছেন, "গো অ্যাহেড্ উইথ ব্রোঞ্জ কাষ্টিং, কীপ দ্য ম্যাটার সিক্রেট।"

বরোদার কলহোটকরকে দিয়ে সাতটা মূর্তি ব্রোঞ্জে ঢালাই করে নিয়েছিলাম সেই টাকায়। পরে দিল্লীতে ছবি বিক্রী করে সেই টাকা শোধ করে ফেলি।

মিস্ ওলিফ্যাণ্ট ছিলেন একজন কর্মী মহিলা। Wilham school-টা তিনিই গড়ে তুলেছিলেন। তিনি প্রায় প্রতি বছরই গরমের সময় বিলেত যেতেন। মনে আছে, আমি যখন বিলেত যাই, সেই জাহাজে সেবার তিনিও বিলেত যাচ্ছিলেন। জাহাজ বোম্বে থেকে যখন ছাড়ল সবাই প্রায় Sea sick হয়ে পড়ল। আমিও কাহিল হয়ে কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন মিস ওলিফ্যাণ্ট সর্বদা আমাদের ফলমূল সরবৎ ইত্যাদি নিয়ে এসে দিতেন। এডেন পৌঁছবার পর আমরা সুস্থবোধ করি। অথচ মিস ওলিফ্যাণ্টের কিছুই হয় নি। তিনি নির্বিবাদে সর্বঘটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ডেকেই বসে থাকতেন। জলের ঝাপটায় যখন ডেক ভাসিয়ে দিত, তখনও। প্রতি বছরই তিনি বিলেত যেতেন—ফিরবার সময় বিলেত থেকে সর্বদা দু'একজন অবিবাহিত ইংরেজ মেয়ে নিয়ে আসতেন স্কুলের কাজের জন্য। তারা বেশীর ভাগই দু'এক বছরের মধ্যে কাউকে বিয়ে করে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। তাতে তাঁর উৎসাহ কমত না। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার নতুন শিক্ষয়িত্রী নিয়ে আসতেন দেশ থেকে। এমনি করেই চলত তার কাজ। বুড়ো হয়ে তাঁর কাজের কমতি ছিল না।

ন্যুড্ ষ্টাডি

স্কুলে আর্ট মাষ্টারী করার জন্যই হোক, আর যে জন্যেই হোক না কেন ন্যুড ষ্টাডি কাজে ঢোকবার পর আমি করি নি বললেই হয়। অ্যানাটমীর জ্ঞান আছে, হাড়গোড়, মাস্‌ল, শরীরের গড়ন সম্বন্ধে পুরো জ্ঞানই আমার আছে। ছাত্রাবস্থায় অনেক হাত মক্‌সো করতে হয়েছে। চোখ দুটো সর্বদা খুলেই রাখি। সুতরাং ন্যুড ষ্টাডি মডেল বসিয়ে না করলেও ন্যুড্ ছবি যে একেবারে আঁকি নি তা নয়। একবার দেরাদুনেই এক প্রদর্শনীতে আমি কতকগুলি টরসো এঁকে রেখেছিলাম। মেয়েদের শরীরের গড়ন নানান রকম হতে পারে। একটি ইংরেজ তরুণী টিচার একদিন প্রদর্শনী দেখতে এলেন এবং ঘুরে-ফিরে আমার ছবি দেখলেন। নানান আলোচনা সমালোচনার মধ্যে একটা কথা জোর দিয়ে বললেন যে, আমার আবার লাইফ ষ্টাডি করা উচিত। একটি টরসো দেখিয়ে বললেন—"একটু 'clumsy' মনে হচ্ছে। ড্রইং বা গড়নের ভুল আছে এতে।"

বললাম হেসে—"মডেল দেখে আঁকা নয়—মডেল এখানে পাওয়াও মুস্কিল।"

তরুণী হেসে সপ্রতিভ ভাবেই বললো—"আমি সাহায্য করতে রাজি আছি—ফর ইয়োর আর্টস্ সেক্। আমার গড়ন আইডিয়েল না হলেও কাজ চালাবার মত। দেশে আমি আর্টিষ্টের মডেল হয়েছি।"

নিজের থেকে যেচে ন্যুড্ সিটিং দিতে চায়, এ রকম এ দেশে বড় একটা দেখা যায় না। বললাম,—"বেশ ত, খবর দেব ভবিষ্যতে দরকার হলে।" কিন্তু দরকার হলেও তাঁকে খবর দেওয়া হয় নি। স্কুলের ষ্টুডিওতে ন্যুড মডেল নিয়ে কাজ করবার প্রবৃত্তি হয় নি। সে শিক্ষাও আমার নয়।

আদর্শ শিক্ষক হওয়া কঠিন

ইস্কুলে ছেলেদের শেখাতে গিয়ে বার বার বুঝতাম শেখাবার সামর্থ্য আমার কত কম! কত কম জানি। ছেলেরা নানা রকম ছবি এঁকে এনে দেখায়। ভুলচুক

নর্ত্তকী

দেখিয়ে দিতে পারি না সব সময়। ভুল মনে হ'ল শুধু একটু বলে দিতে পারি যে, যাও গিয়ে দেখে এস আর একবার। কিংবা নিজে গিয়ে দেখে এসে ভুল ঠিক করে দেই। এমনি করেই ত শেখাতে গিয়ে বার বার নিজেকেই শিখতে হয়। যত শিখি, ততই বুঝতে পারি শেখার শেষ হবে না কোনদিন। নিজে যখন আঁকি, তখন নিজের যা ভাল লাগে তাই ত আঁকি, যা জানি না যা ভাল লাগে না, তা ত আঁকি না। কিন্তু শেখাতে যা নিজের ভাল লাগে নি বা মনে ধরে নি তাও এঁকে দেখাতে হয়, কারণ নানান ছাত্র নানান রকম ছবি আঁকছে তাদের যা মনে ধরেছে বা ভাল লেগেছে তাই আঁকছে; —সেগুলোকে যতক্ষণ আমি ভাল করে উপলব্ধি না করছি, ততক্ষণ তার ভুলচুক দেখাবার অধিকার আমার নেই। সেই কারণে যারা নিতে জানে, তাদেরই হয় জিৎ, তারাই হয় বড়। তারাই পারে ফুল ফোটাতে। ছেলেদের শেখানো, সেও ত এক রকম ফুল ফোটানোরই মত!

মেদিনীপুরের বন্যা

১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষ লাগল। সাইক্লোন ও সমুদ্রে প্রবল বন্যা এসে সারা কণ্টাই ভাসিয়ে দিয়েছিল। আশেপাশের অনেক জায়গাই ডুবে গিয়েছিল—সে এক ভীষণ ব্যাপার হয়েছিল। কত গ্রাম জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল তার ঠিকানা নেই। বন্যার পরেই সেখানে কলেরা, ম্যালেরিয়া ও আরও নানা রকম উপসর্গ লেগে সারা সহর গ্রাম তচনচ হয়ে যেতে থাকে। ফুট সাহেবের এ বিষয়ে খুব প্রখর কর্তব্যবোধ বলতে হবে। —'৪২ সালের জুন মাসের ছুটিতে তিনি নিজে তিন সপ্তাহের জন্য কুড়ি জন ছাত্র নিয়ে কাঁথিতে গিয়েছিলেন রিলিফের কাজে। কাঁথির গ্রামে তাঁরা তাবু ফেলেছিলেন ও রীতিমত খেটেছিলেন গ্রামের লোকেদের ভাঙা ঘর মেরামত ও নোনা জল পুকুর সেঁচে ফেলার কাজে। ফিরে এসে তিনি ঠিক করেছিলেন, প্রতি ছুটিতেই দু'তিন সপ্তাহের জন্য দু'তিন জন মাষ্টারের সঙ্গে ছেলেদের পাঠাবেন রিলিফের কাজে। ১৯৪৩-এ তাঁর ইচ্ছে হ'ল আমিও রিলিফ পার্টিতে যাই মেদিনীপুরে। রাজী হয়ে গেলাম। রাজী হলাম, কারণ দেশের লোকের দৈন্য দশা নিজের চোখে দেখব, তাদের জন্য অনুভূতি জাগবে! আমাকে দিয়ে তাদের যদিও বিশেষ কিছু লাভ হবে না, তবুও কিছু লাভ হবে বৈ কি! বড়লোকদের ছেলেদের যদি একটুও চোখ খোলে এ সব দেখে-শুনে—সেটাও ত মস্ত বড় একটা লাভ!

জুনপুট

দেরাদুন থেকে ১৯শে ডিসেম্বর রওনা হলাম আমরা। হাওড়া খড়্গপুর হয়ে মোটর বদলে কণ্টাই পৌছে, আরও পাঁচ মাইল সমুদ্রের দিকে গেলে তবে জুনপুট পৌছান যায়। জুনপুটেই আমাদের থাকা ঠিক হয়েছিল। দুন স্কুলের সাতজন ছাত্র, তিনজন শিক্ষক ও আমি রিলিফের কাজের জন্য কণ্টাই পৌছলাম। দু'জন শিক্ষক ও তিনজন ছাত্র গেল পিছাবনীতে—কণ্টাই থেকে সাত মাইল দূরে একটি গ্রামে। আমরা দু'জন ছাত্র ও চারটি ছাত্র জুনপুটে পৌছলাম।

এর আগে ছাত্রাবস্থায় জুনপুটে এসেছিলাম সাত দিনের জন্য। সঙ্গে ছিলেন কবি-শিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্পী রামকিঙ্কর। শিক্ষা ভবনের ছাত্র সুকুমার জানার বাড়ী বনমালী চট্টাতে—কাঁথিরই এক গ্রাম—তারই অতিথি হয়েছিলাম। তখন জুনপুটে আসবার কারণ সহরের কোলাহলের বাইরে সমুদ্রের ধারে নির্জন বাস এবং সাগরে সূর্যোদয় দর্শন। মাঝিদের সঙ্গে গ্রামে থেকে ছবি আঁকা। এই সব জায়গাগুলো এবারে সব ভেসে গিয়েছিল বন্যাতে। বেশীর ভাগ লোক মরে গিয়েছে। বন্যার পর সর্বস্ব খুইয়ে কেউ কেউ ভিটে কামড়ে পড়ে আছে। নানান কষ্ট আর রোগ-জ্বালার মধ্যে দিন কাটছিল তাদের। এক বছর হয়ে গেল বন্যা এসে গেছে, কিন্তু যে মার দিয়ে গেছে এই প্রবল বন্যা তা বহু বছরেও লোকে ভুলতে পারবে না। সে বছরেও সেখানকার অনেক গ্রামের উপর সুবর্ণরেখার বন্যা চাষ হতে দেয় নি। শরীরেও এদের সামর্থ্য ছিল না—রোগবালাই লেগেই আছে। কতটুকুই বা সাহায্য পেয়েছে আমাদের কাছে!

পিছাবনীতে একদিন দেখে এলাম হিন্দু মহাসভার হাসপাতাল। বন্যার পর থেকেই এঁরা কাজ চালিয়েছেন। অনেক লোকেরই এঁরা উপকার করেছেন। ওষুধপত্তরের অভাব—কাজ চলছিল ঢিমেতালে। অথচ রোগীর অভাব

নেই। জুনপুট ও বালুসেইয়ে অনেক পরে মিলিটারী হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। ওষুধপত্তরের অভাব এদের তেমন ছিল না। কলেরার প্রকোপ এদিকে বেশী হয়েছিল। রোগীরা, যারা বহু কষ্টে হাসপাতালে পৌঁছেছিল তারা বেশীর ভাগই শেষ অবস্থায়। মরতেই যেন ঢুকেছিল হাসপাতালে। দূর গ্রাম থেকে তাদের নিয়ে আসবার লোকেরও অভাব। কারুর ভয়ে নিয়ে আসবার সামর্থ্য ছিল না। ষ্ট্রেচারে করে রোগী হাসপাতালে আনবার ভার আমরা কতকটা নিয়েছিলাম। হাসপাতালের তিনি গ্রামে গ্রামে কলেরার ইনজেকশন দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। আমাদের বললেন সমুদ্রপারের গ্রামগুলোর দেখাশোনা করতে। ভয়ানক খারাপ অবস্থা এদের। সমুদ্রপারের কদুয়া ও গোপালপুরের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা ছিল। কলেরা ম্যালেরিয়া লেগেছে আর খোস পাঁচড়ায় সারা অঙ্গ ভরে গেছে। হাড়-বের-করা শরীর দু'হাতে চুলকোচ্ছে, ছোট্ট কাপড় রক্তাক্ত বললেই হয়। এদের মধ্যে যারা চলতে ফিরতে পারছিল না, তাদের কুইনিন বিলি করাও আমাদের কাজ। বেশ

নৌকার মাঝি

ডাক্তার লেফ্‌টানেন্ট জয়ন্তী অন্ধ্র দেশের লোক, তরুণ যুবক, খাটছিলেন খুব। কলেরা নিউমোনিয়ার সঙ্গে চলছিল এঁর যুদ্ধ। খাবার-শোবার সময়ের ঠিক ছিল না তাঁর।

আমাদের ছেলেদের মধ্যে তিন জনকে হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা নার্সদের সাহায্য করার জন্য রাখা হয়েছিল।

টুরিং অফিসার মেজর বসুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বুঝতে পারতাম, দু'চার গুলি কুইনিন খাইয়ে এই সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া সরানো সম্ভব না। সরকার বাহাদুর বন্যার পর দু'মাইল তফাতে তফাতে নলকূপ বসিয়ে দিয়েছিলেন—যারা বেঁচেছিল, সেই নলকূপের জন্যই। বন্যার পর পুকুরের সব জল লবণাক্ত হয়ে যাওয়াতে এবং পুকুর ডোবা অপরিষ্কার হওয়াতে জলাভাব ভীষণ হয়েছিল! কদুয়ার দক্ষিণ, পশ্চিম কদুয়ার গ্রামগুলোর লোক কেবল

জলের অভাবে মারা পড়েছিল। সমস্ত গ্রামখানায় কী দুর্গন্ধ! যারা মরছে, খালের ধারে, ডোবার পারে ফেলে দিয়েছে। সমুদ্রের ধারেও মড়ার খুলি হাড়গোড়, শেয়াল-শকুনের উৎপাত! গ্রামের অনেকের গায়ে কম্বল দেখতে পাচ্ছিলাম। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম,—গুজরাটী রিলিফ কমিটি, হিন্দু মহাসভা ও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সেগুলি বিলি করেছে।

ঝাওড়া গ্রাম লোকশূন্য! কলেরাতে মরছিল লোক; কিন্তু সৎকারের ব্যবস্থা নেই। পাশেই শুকনো খালের ধারে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহগুলিকে ঘিরে দিন-দুপুরে চলেছিল শেয়াল-শকুনের উৎসব!

ফরিদপুর, সারসা, ডাউকী প্রভৃতি গ্রামগুলো কণ্টাই সহরের কাছেই, অথচ সেখানেও অবস্থা ভাল নয়। ঘরে চাল নেই, রিলিফ কেউ পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না। যাদের একটু সামর্থ্য ছিল, তাদের দু'চারজনকে ছোট ছোট জাল দিয়ে কাদা জলে মাছ ধরতে দেখতাম। ক্বচিৎ দু'চারটি পুঁটি চিংড়ি পাচ্ছে—তাতেই খুশী। এই নোংড়া পুকুরের মাছ খেয়েও কলেরা হচ্ছিল বলা বাহুল্য।

রোগ শোকের উপর আবার ডাকাতের উৎপাত। ডাউকী গ্রামে শুনলাম ডাকাতি হয়ে গেছে তিনটি বাড়ীতে। অথচ পুলিশে ডাকাত ধরতে পারে না। থালা বাটি, চাল, চুলো নিয়ে পালাচ্ছিল তারা বাড়ীর পুরুষদের কম্বল চাপা দিয়ে বেঁধে রেখে। মেয়েরা কংকালসার ম্যালেরিয়া রোগী, তারা আর করবে কি? ডাকাতরা ডাকাতি করেও ছাড়ে নি—যাবার সময় ঘরে আগুন দিয়েও গিয়েছে!

জুনপুটের কাছেই যে গ্রামগুলো, বিলিটারী হাসপাতাল খোলাতে তাদের উপকার হয়েছিল। কাছাকাছি গ্রামগুলো—বিচুনিয়া, আলাদারপুট. চিনচুরপুট, শীকারপুট, বাবুনিয়া থেকে—যাদের সামর্থ্য ছিল শরীরে—সবাই ওষুধ নিয়ে যেত। এই জুনপুটের সমুদ্রের ধারে সুধীর ঘোষ মশায়ের সঙ্গে একদিন আলাপ হ'ল। তিনি ফ্রেণ্ডস্ এ্যাম্বুলেন্স সোসাইটির তরফ থেকে রিলিফের কাজ করতে এসেছিলেন।

গতবার জুনপুটে এসে আনন্দ করেছিলাম। সে স্মৃতি মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। গ্রামে রোগ-শোক ছিল না, সুস্থ সবল মাঝিরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত, তাদের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে কত ঝাঁপাঝাঁপি করেছি। সকালবেলায় বালির উপর বাঁধের কাছে,—যেখানে কেয়া ঝোপ, তার ফাঁক দিয়ে সূর্যোদয় দেখতাম, বালির উপর সমুদ্রের কাঁকড়ার পিছনে ছুটতাম। সমুদ্রে বেশী জলে যেতে সাহস পেতাম না। মাঝিদের দু'চার জনের পা কাটা দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে, হাঙরের উৎপাত আছে, পা তাদের হাঙরেই কেটে নিয়ে গেছে, গোটা মানুষকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যায়। সেবারে ফিরে যাবার সময় বলেছিলাম, আবার আসব জুনপুটে। আবার গেলাম, কিন্তু সেদিনের সেই রঙিন ছবি মন থেকে মুছে ফেলতে হ'ল। অসহায় মানুষের সেই করুণ ছবি আজও মনের মধ্যে গাথা হয়ে আছে!

পাটনায় একক প্রদর্শনী

১৯৪৪-এর জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে রিলিফ ক্যাম্প থেকে ফিরে পাটনায় গিয়ে পৌছলাম। ঠিক ছিল হাবলুদার বাড়ী উঠবার। হাবলুদা, মটুকদার দাদা—প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তিনি তখন পাটনায় ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার ছিলেন পাটনায় কয়েকজন ডুন স্কুলের ছাত্র ছিল। তারা আগে ছবি নিয়ে গিয়েছিল পাটনায় প্রদর্শনীর জন্য। ঠিক ছিল আমি ক্যাম্প থেকে ফিরে প্রদর্শনী হবে। রিলিফ ক্যাম্প থেকে ফিরে মনটা এমন মুষড়ে গিয়েছিল যে, প্রথম কিছুদি প্রদর্শনী বা অন্য কিছু করায় মন লাগছিল না। হাবুলদা বাড়ীতে উঠে কিছুদিন কিছু না করে ঘুরে বেড়িয়ে কাটালাম। পাটনায় আগেও কয়েকবার গিয়েছি। তা নতুন নয় আমার কাছে। কিন্তু এবার মনে হ'ল, মশা পাটনায়! দিনের বেলাতেও সুস্থির হয়ে বসবার নেই। সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে পীন্ পীন্ শব্দে মশার গা ঘর-বাড়ী ভরে যায়। চা খাবার সময় চায়ে মশা প কথা বলবার সময় গলায় মশা ঢোকে, একটু অন্যমনস্ক হলে দু'চারটে মশার কামড় খেতেই হবে। এস. এম. মজুমদ মশায়ের বাড়ীতে দেখলাম—ঘরের ভেতর মশারীর ঘ ড্রইংরুমের ভেতর মস্ত বড় মশারী এবং তার মধ্যে বস সোফা, চেয়ার ইত্যাদি সাজান। লোকজনের সঙ্গে দে সাক্ষাৎ, গল্প-গাছা তিনি মশারীর ভেতর বসেই করেন!

পাটনায় তখন একমাত্র হল—লেডী ষ্টিফেনসন্ হল। সেখানেই প্রদর্শনী হবে ঠিক হ'ল। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার Mr. P. R. Das প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। পাটনার সব বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। অনেকেই ছবি দেখতে এসেছিলেন। সেখানকার সাহিত্যিকেরাও সবাই এসেছিলেন। মনে আছে, জয়পাল সিং এসেছিলেন এবং তিনি দু'খানা ছবিও কিনেছিলেন। 'বিহার হেরাল্ড' কাগজে প্রফেসার রঙিন হালদার প্রকাণ্ড রিভিউ বার করেছিলেন। মিঃ পি. আর. দাস মশায় বেশ ভাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রকলার একজন ভক্ত ছিলেন। অবনীবাবু ও নন্দবাবুর কয়েকখানা ভালো ছবি তাঁর সংগ্রহে ছিল।

জুনপুটে থাকতে যে সব পেন্সিলের স্কেচ এঁকেছিলাম, সেগুলির কিছু প্রদর্শনীতে রেখেছিলাম। সেগুলো দেখে অনেকের খুব ভালো লেগেছিল। এবং পরে তার থেকে কিছু স্কেচ 'পিপল্স্ ওয়ার' সাপ্তাহিকে বার হয়েছিল। 'পিপল্স্ ওয়ার' পত্রিকা বম্বে থেকে বার হত। পরে সেটা নাম বদলে 'পিপল্স্ এজ' বলে কিছুদিন চলে।

প্রদর্শনী করে ছবির বোঝা নিয়ে আবার যখন দেরাদুন ফিরে এলাম, তখনও ছুটি শেষ হয় নাই। সে শীতের ছুটিতে শ্যামলীকে নিয়ে মা দেরাদুনেই থেকে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আবার কাজ নিয়ে মেতে গেলাম। পাটনার গভর্ণমেণ্ট কটেজ ইন্ডাষ্ট্রির হ্যাণ্ডমেড পেপার ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু রাফ সারফেস্ কার্ডবোর্ড নিয়ে এসেছিলাম। তার ওপর ছবি আঁকা চলল পুরোদমে।

লক্ষ্ণৌ-এ একক প্রদর্শনী

লক্ষ্ণৌ থেকে য়ুনিভার্সিটির প্রফেসার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মশায় তাঁর নতুন লাইব্রেরীতে প্রদর্শনী করার জন্য অনেক দিন আগে থেকেই আমন্ত্রণ করেছিলেন। এই বার গিয়ে হাজির হলাম। ওঁর বাড়ীতেই অতিথি হলাম। বহুকাল আগে ছাত্রাবস্থায় লক্ষ্ণৌ-এ কিছুদিন ছিলাম আর্ট স্কুলের হোষ্টেলে। অসিতদার (হালদার) বাড়ীতে খুব গানের আড্ডা জমত তখন। এবারে গিয়ে প্রথমেই অসিতদার সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর বাড়ীতে সেই জমাট ভাব তখন আর ছিল না। মেয়েদের প্রায় সবারই বিয়ে হয়ে গেছে, স্ত্রীও ওখানে ছিলেন না। তবু অসিতদা কাজে-কর্মে বেশ ভালোই আছেন দেখলাম। ছবি আঁকছেন, কবিতা লিখছেন, গান শেখারও বাতিক আছে তাঁর। আমার ছবির প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনের ভার তাঁর উপরই দেওয়া হ'ল। তিনি খুশী হয়েই রাজী হলেন। হৈ চৈ করে ছবি টাঙিয়ে ফেলা হ'ল, প্রদর্শনী খোলা হ'ল। নতুন টেগোর লাইব্রেরীতে আমারই প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল। তিনচার দিন মাত্র সেখানে কাটিয়ে ফিরে গেলাম দেরাদুন।

ডুন স্কুলের প্রদর্শনী ও মুসূরীতে আমার একক প্রদর্শনী

ফেব্রুয়ারী মাসের পয়লা ফিরে এলেই স্কুলের কাজে ফিরে এলাম। ছেলেদের নিয়ে কাজ-কর্ম চলতে লাগল। প্রতি বছর মে মাসের শেষে ছেলেদের কাজের বাৎসরিক প্রদর্শনী করা হয়। তখন বাইরে থেকে কাউকে প্রিসাইড করতে ডেকে আনা হয় এবং ছেলেদের প্রাইজ দেওয়া হয়। এবারে ঠিক হ'ল ডঃ অমরনাথ ঝাকে ডুন স্কুলের শিল্প প্রদর্শনীতে প্রিসাইড করতে ডাকা হবে তিনি রাজী হলেন। প্রদর্শনীর জন্য ছেলেদের নিয়ে ছবি আঁকি দিনের বেলা। সন্ধ্যার পর নিজের কাজে লেগে যাই। ইচ্ছে, ছেলেদের প্রদর্শনীর পর ছুটি হলে মুসূরীতে আমার নিজের ছবির একক প্রদর্শনী করব। ডাক্তার অমরনাথ ঝা মুসূরীতে গরমের সময় থাকেন। তাঁকে দিয়ে আমার প্রদর্শনী উদ্বোধন করলে লোকও হবে, বিক্রীও হবে। কাজ, কাজ, শুধু কাজ! শরীরটা যতটা সহ্য করতে পারে ততটাই তার কাছ থেকে নিচ্ছিলাম, হয়ত বা বেশীই! মাঝে মাঝে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলাম। যাই হোক, মে মাসের শেষে ছেলেদের কাজের প্রদর্শনী হ'ল, খবরের কাগজে স্কুলের প্রদর্শনীর সুখ্যাতি বার হ'ল। ডাঃ ঝা বেশ রসিকতা-ভরা ভাষণ দিলেন। ছেলেদের প্রাইজ বিতরণ করলেন। সবাই খুশী!

ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজের ছবি নিয়ে মুসূরী রওনা দিলাম। বাইশ মাইল ত মাত্র মোটরের পথ! সায়লাভায় হোটেলের লাউঞ্জে প্রদর্শনী হবে। সেই হোটেলেই গিয়ে উঠলাম। সায়লাভায় হোটেল একেবারে ভর্তি। সাহেব-মেমের ভীড়! মাঝে মাঝে দু'এক জন ভারতীয়, হংসোমধ্যে বকো যথা– একটু আড়ষ্ট ভাবেই থাকি। তখন যুদ্ধের সময়। অনেক আরমি অফিসারও

মুসৌরীতে বেড়াতে এসেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে লাউঞ্জে ছবি টাঙান হ'ল। খাঁ সাহেব তিনখানা ছবি কিনলেন। ছবির দাম অবশ্য বেশী ছিল না, বড় ছবি প্রদর্শনীতে রাখি নি। প্রদর্শনী চলল চার দিন। সেই চার দিনে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। প্রদর্শনী শেষ হলে বিক্রি হয়ে যাওয়া ছবি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে আর দু'চার দিন লেগে গেল। মা ও শ্যামলীর জন্ম কিছু নিয়ে যেতে হবে। শ্যামলীর বয়স তখন বছর চারেক হবে। যাবার সময় সে বলে দিয়েছিল—"রাঙা পুতুল চাই আর চাই মুসৌরী পাহাড়ের খেলনা 'রিক্স'।" সেই রিক্সতে রাঙা পুতুল বসিয়ে টানবে সে রিক্সওয়ালা হয়ে। অনেক খুঁজে কেনা গেল সেগুলো। রাঙা পুতুল ও রিক্স পেয়ে শ্যামলী খুব খুসী!

সিমলায়

দেরাদুন থেকে ফিরে এসে বুঝলাম শরীরটা সত্যিই খারাপ হয়েছে। ঝোঁকের মাথায় কাজ করে চলেছিলাম। ভিতরে ভিতরে বেশ কাহিল করে ফেলেছে! রাত্রে ভাল ঘুম হয়না, যা খাই ভাল হজম হয় না। পড়লাম বেশ মুস্কিলে। কি করি, কোথায় যাই! এদিকে বৃষ্টি, ঘনঘোর বর্ষা সুরু হয়ে গেছে। মা খুব ভাবনায় পড়লেন আমাকে নিয়ে। নানান রকম খাবার করেন, কিন্তু খেতেও ইচ্ছে হয় না। খাব কি? খেলেই পেট খারাপ হয়! নানান রকম ওষুধপত্তর হ'ল সবই, কিন্তু কিছুতেই আর সামলে উঠতে পারি না। হঠাৎ এক সময় মটরুদার চিঠি এল। সিমলা থেকে লিখেছেন, 'চলে এস, ছবির পাততাড়ি নিয়ে, এখানে এসে কিছুদিন থেকে যাও। কোন অসুবিধা হবে না। একটা ছবির প্রদর্শনীও করে যাও হোটেল সিসিলে। সব বন্দোবস্ত আমি করে দেব। তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না!'—মুসৌরীতে সবেমাত্র প্রদর্শনী করে এসেছি, আবার সিমলায়! প্রদর্শনী করবার উৎসাহ নেই, তবে সিমলায় ঘুরে এলে মন্দ হবে না। দেখা যাক, যদি শরীরটা সারে। জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করবার সময় ছবির বাক্সটাও গুছিয়ে ফেললাম। শরীর ভাল হলে—যদি ইচ্ছে হয়, তবে একটা প্রদর্শনী করলে ক্ষতি কি? আর যদি নাও করি, তা হ'লেও শিল্পী আমি—ছবি ছাড়া, ছবি আঁকার সরঞ্জাম ছাড়া কোথাও যাওয়া ত ঠিক নয়!

দেরাদুন থেকে সিমলা যেতে কয়েকটা জায়গায় ওঠানামা করতে হয়। দেরাদুন থেকে আম্বালা, সেখান থেকে গাড়ি বদল করে কালকা, কালকা থেকে ছোট গাড়িতে কিংবা মোটরে সিমলা যেতে হয়। জিনিষপত্র ও ছবির বোঝা নিয়ে দু'তিনবার গাড়ি বদল করা বেশ মুস্কিল। তা ছাড়া বেখাপ্পা সাইজের ট্রাঙ্ক দেখে লোকে সন্দেহ করে এতে লোক কি নিয়ে যাচ্ছে। এক্সাইজের পুলিশ থেকে আরম্ভ করে ট্রেনের সাধারণ যাত্রীরা পর্যন্ত সন্দেহ করে। যাত্রীরা কেউ কেউ হাতে আঁকা ছবি আছে জেনে খুলে দেখাতে আবদার ধরে!

সিমলা ষ্টেশনে পৌঁছে পড়লাম 'অকট্রয়' ট্যাক্সওয়ালাদের পাল্লায়। লোকটা আবার পাঞ্জাবী শিখ। বাক্সে ছবি আছে জেনে সে ধরে নিয়ে গেল প্ল্যাটফরমের ধারে তার অফিসে। বাক্স খুলে ছবিগুলো সব একটা একটা করে বিছিয়ে রেখে দেখতে লাগল। ট্যাক্স নিল না, মাফ করে দিল। দাড়ি-ভরা মুখে একগাল হেসে বলল, 'সাবাস্ ভাইয়া!' ছবি দেখে খুব খুসী। সিমলায় আমার ছবির প্রদর্শনী প্রথমে প্ল্যাটফরমেই হয়ে গেল। মটরুদা ষ্টেশনে এসে না পৌঁছলে আরও কতক্ষণ কাটাতে হত বলতে পারি না, বেশ লোক জমে গিয়েছিল! আর আমি মনে মনে নিজের মুণ্ডপাত করছিলাম। কেন যে ছবিগুলো আনতে গেলাম এই পাঞ্জাবী মুলুকে! মটরুদা এসে বাঁচালেন। জিনিষপত্র নিয়ে একটা রিক্শাতে করে ছোটা সিমলায় বাড়ীমুখো রওনা দিলাম।

মটরুদার কথা আগেও বলেছি। দেরাদুনে ছিলেন তিনি। মটরুদার অনেক গুণ—বাঁশী বাজাতে পারেন, গীটার বাজানও আসে, গানের গলাও দরাজ! ছবি আঁকেন না নিজে, কিন্তু ছবি ও ছবি আঁকিয়েদের মাথায় তুলে রাখেন। আর একটি কারণে দেরাদুনে ওঁকে সবাই চিনত। ছিলেন দু'ছেলের বাবা, হঠাৎ একলাফে হয়ে গেলেন পাঁচ ছেলেমেয়ের বাবা! অর্থাৎ তার স্ত্রী একটি নয়, দু'টি নয়—একসঙ্গে তিনটি ছেলেমেয়ের জন্মদান করলেন। তাদের মানুষ করা কি সহজ কথা! তাও ত করলেন ভাল ভাবেই!

বাড়ী পৌঁছে ট্রিপলেটদের সঙ্গে যাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত 'আন্টি লুলু'!

মটরুদাদের আপন মাসী। জয়শ্রী দেবী—মটরুদার স্ত্রী বেড়িয়ে এলেন।—"ওমা, এত রোগা কেন হয়েছেন! দাঁড়ান, দাঁড়ান—থাকুন এখেনে কিছুদিন—শরীরটা সারিয়ে মোটা-সোটা হয়ে, চোখের কালি পুঁছে তুলে তবে ফিরে যাবেন।" সত্যবান-সুমিত্র বাড়ী ছিল না। পরে বাড়ী

বিনোদ মুখার্জ্জি

ফিরে এল—খুব হৈ চৈ! ট্রিপ্‌লেটরা কি হুল্লোড়টাই করতে পারে! মটরুদার পুরণো চাকর বিজয় হেসে নমস্কার করে বলল—"দাদাবাবু ভাল আছেন ত? রোগা হয়ে গেছেন যে!" যতবার শুনি রোগা হয়ে গেছি, মনটা খারাপ হয়ে যায়।

বর্ষাকাল। বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ্‌ঝুপ্‌। ক্ষণে ভরে যাচ্ছে, আর শীতও মন্দ নয়। তারই মধ্যে বর্ষাতি-ছাতা নিয়ে ঘুরে বেড়াই। বিকেলে মটরুদা অফিস থেকে ফিরলে দু'জনে বার হই। বেড়িয়ে ফিরে এসে মটরুদা বলতেন গীটার নিয়ে, আমি গাইতাম গান! বেশ অনেক রাত্তির পর্যন্ত গল্প-গান-গীটার-বাণী। লুলু মাসীও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন আমাদের আড্ডায়।

সকালবেলায় গুচ্ছেরখানেক পরিজ গিলতে হ'ত দুধের সঙ্গে ও অন্যান্য খাবারের সঙ্গে। প্রথমে বড় ভয় ভয় করত—বুঝি বা পেটে না সয়। কিন্তু সিমলার জলের

গুণের জন্যই হো'ক আর জয়শ্রী দেবীর আখাণ বাণীর জন্যই হ'ক, বা বিজয়ের রান্নার কায়দা ও গুণের জন্যই হো'ক—পেট খারাপ হ'ল না এবং ক্রমে ক্রমে শরীরটা সেরে উঠতে লাগল। চোখের কালিও গেল মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং প্রদর্শনী করাটা কেন আর বাদ যায়। দিন ঠিক হয়ে গেল। হোটেল সিসিলের লাউঞ্জে হবে প্রদর্শনী। স্যর সিকন্দর হায়াত খান প্রদর্শনী খুলবেন। সব ঠিক করে ফেললেন মটরুদা। সিমলার সব মুনিসিপ্যাল নোটিশ বোর্ডের গায়ে, রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় পোষ্টার লেগে গেল। প্রদর্শনীর খবর প্রচার হয়ে গেল দু'চার দিনের মধ্যেই!

মিঃ এন. সি. মেহতা—আই. সি. এস—শিল্পানুরাগী, আর্ট-সমঝদার, মোটা বইও লিখেছেন ভারতীয় শিল্পের উপর। তিনি তখন সিমলায় ছিলেন। মটরুদার সঙ্গে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি প্রদর্শনী খুলবার সময় কিছু বলবেন ঠিক হ'ল। স্যর সিকন্দর আর্ট ভালবাসেন বটে, তবে বোঝেন না তেমন তাই রক্ষে। মেহতা সাহেবই প্রকাণ্ড লেকচার দিলেন। ছবি বিক্রীও হ'ল কয়েকখানা। মেহতা সাহেব দু'খানা ছবি ত্রিবাঙ্কুরের আর্ট গ্যালারি—শ্রী চিত্রালয়ের জন্য কিনলেন। ছবি বিক্রী হলে একটু দুঃখও হয়—ছবিগুলো হাত-ছাড়া হয়ে যায় বলে। কিন্তু কিই বা করব এই ছবির বোঝা নিয়ে—যাক বিক্রী হয়ে......

ফিরে এলাম দেরাদুনে সিমলার মায়া কাটিয়ে, ছুটি কাটিয়ে, শরীর মেরামত করে এবং প্রদর্শনী করে। আবার কাজের ঘানিতে লেগে গেলাম।

দেরাদুনে টেগোর সোসাইটি

রবীন্দ্রনাথ যখন মারা যান,—১৯৪১-এর আগষ্ট মাসে, দেরাদুন টাউন হলে মিটিং হ'ল। সেখানে নানান গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বক্তৃতা দিলেন। আমি গেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথেরই দু'তিনটি গান। বলার চেয়ে গান গেয়েই সেদিন মনের বেদনা জানানো আমার কাছে সহজ বলে মনে হয়েছিল। বলব কি? দেরাদুনের বাঙালী-অবাঙালী লোকেরা কি বুঝবে আমাদের লোকসান এবং মনের নিবিড়তম দুঃখ-বেদনা! রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন, এ যে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারছিলাম না। যাঁকে ছোট বেলা থেকে জেনে এসেছি—তিনি যে আর সকলের মতই এ-লোক থেকে চলে যাবার লোক, সে কথা ভাবতে পারি নি কখনও। তাঁর কাছ থেকে অজস্র ধারায় আমরা পেয়েই এসেছি। কবিতা, গান, অভিনয়, গল্প, উপন্যাস দিয়ে যেন তিনি আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। বুড়ো বয়সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিয়ে তিনি আমাদের আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতটা আশ্চর্যের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা,—ততটা বোধ হয় আশ্চর্য হই নি, কারণ তাঁর কাছ থেকে কিছুই যেন আশ্চর্য হবার নয়! কিছু যেন তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আমাদেরই উদ্যোগে দেরাদুনে রবীন্দ্র সোসাইটি স্থাপিত হ'ল। আমাকে তার প্রেসিডেণ্ট হ'তে হ'ল। অযোগ্য হলেও আমাকেই ভারটা নিতে হ'ল। কারণ বলতে গেলে আমিই তখন দেরাদুনে একমাত্র শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। রবীন্দ্র সোসাইটি পাঁচ-ছয় বৎসর বেশ ভালভাবেই চলেছিল। প্রথম প্রথম প্রতি মাসেই সোসাইটির মেম্বারদের বাড়ীতে বাড়ীতে বৈঠক বসত, কবিতা, গান, প্রবন্ধ আলোচনা ও চর্চা হ'ত। মাঝে মাঝে সমারোহ করে রবীন্দ্রনাথের কোন বই অভিনয় করা হ'ত। দুন স্কুলের মুক্তাঙ্গন থিয়েটারে এই সব অভিনয় বেশ ভাল জমত। বিসর্জন ও চিত্রাঙ্গদা প্রথমে দুন স্কুলের ছেলেদের দিয়ে করানো হয়। ইংরেজ মাষ্টাররাও যোগ দেন। বাল্মীকি প্রতিভা আমরা দু'বার করাই। একবার স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে, আর একবার বড়রা এবং বাইরের লোকেরাও যোগ দেন। শান্তিনিকেতন থেকে কথাকলির নাচিয়ে বালকৃষ্ণ মেনন, শ্রীমতী সেবা মাইতি, পুষ্প মাইতি দুই বোন এসেছিলেন,—তাঁরাও বাল্মীকি প্রতিভায় যোগ দেওয়াতে জিনিষটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। আমাকেও সেবার অভিনয়ে নামতে হয় বাল্মীকির ভূমিকায়। বালকৃষ্ণের নাচ, সেবা মাইতির বালিকা ও সরস্বতীর ভূমিকা ও পুষ্প মাইতির লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় খুবই চমৎকার হয়েছিল। সমস্ত অভিনয়টি বাংলা ভাষায় হলেও, দেরাদুনের পাঞ্জাবী দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে অজস্র প্রশংসায় বাহবা দিয়ে মুক্ত অংগন মঞ্চ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। 'ফাল্গুনী' ও 'শারদোৎসব' হিন্দীতে করানো হয়েছিল ফাল্গুনীতে অন্ধ বাউলের পার্ট আমি করেছিলাম মনে

আছে। হিন্দীতে পার্ট মুখস্থ করে সেই প্রথম ও সেই শেষ অভিনয় করেছি।

একবার আমরা পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে আনিয়েছিলাম। তিনি সহরের টাউন হলে, বাঙালী লাইব্রেরীতে রবীন্দ্র বিষয় বক্তৃতা করে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। 'নটীর পূজা' হিন্দীতে অভিনয় করানো হ'ল যেবার, সেবার শান্তিনিকেতন থেকে সস্ত্রীক শান্তিদেব ঘোষকে আনিয়েছিলাম। আমার ছোট বোন শান্তিও তখন দেরাদুনে। কন্যা পাঠশালা কলেজের শিক্ষয়িত্রী লতিকা দাস, নিহারিকা দাস ও শান্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে অভিনয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। একটি 'নেপালী' মেয়ে অতি চমৎকার 'নটীর' পাট করেছিল। শান্তিদেবের কাছে

একক প্রদর্শনী করব তাও ঠিক করেছিলাম। সেইজন্ত রাত জেগে ছবি আঁকা চলছিল। শরীরটার ওপর 'ম্যাক্সিমাম্' চাপ দিয়েছিলাম—যতটা পারা যায়। দিনে স্কুলের কাজ, রাত্রে নিজের কাজ,—দেড়টা-দুটো পর্যন্ত প্রায়। অনেক ছবি হ'ল। ছুটি আরম্ভ হবার সময় এমন অবস্থা হ'ল যে, আর শরীরে সইছিল না। ছুটি সুরু হতে জিনিষপত্র ও ছবির বোঝা নিয়ে, ছেলেদের সঙ্গেই ডুন স্কুল স্পেশালে বম্বে রওনা হলাম। আমীরদের বাড়ীতেই ওঠার কথা ছিল। আমীর আলী ডুন স্কুলের ছাত্র ছিল এবং ডুন স্কুলেরই মাষ্টার হয়েছিল; সুতরাং আমার সহকর্মী। বান্দ্রায় পালি হিলে ওদের বাড়ী। দোতলা বাড়ী, সামনে বাগান। ওদের ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ভিক্ষুক

নিখুঁত ভাবে সে নাচ ও অভিনয় শিখে নিয়েছিল। এই সব অভিনয় করে আমরা অনেক টাকা তুলতাম এবং বিশ্বভারতীকে পাঠিয়ে দিতাম।

ক্রমে আমাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়লেও টেগোর সোসাইটি একেবারে বন্ধ হয় নি। জানি না এখন চলছে কি না!

বোম্বাই সফর : ডিসেম্বর ১৯৪৪-৪৫

স্কুলের ছুটি আরম্ভ হ'ল এবার ২১শে ডিসেম্বর থেকে। বোম্বাই বেড়াতে যাব ঠিক করে ফেলেছিলাম। কাছাকাছি দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিও দেখার ইচ্ছে ছিল। বোম্বাই সহরে

দোতলার বারান্দা থেকে সমুদ্রের দৃশ্য দেখা যায়। কয়েক-খানা বাড়ী, নারকোল গাছ—তারপর দিগন্ত, বিস্তৃত সমুদ্র, পাল তোলা জেলেদের নৌকো ভেসে চলেছে ঢেউয়ের দোলায়, উত্তাল উদ্দাম ঢেউ—শুধু জল আর জল!

আমীরের মা-বোন বাড়ীতেই ছিলেন—বাবা হাসান আলী সাহেব বাড়ী ছিলেন না। অনেকদিন পর আমীরকে পেয়ে সবাই কী খুসী! সেইদিনই আমীরের বড় ভাই 'সাহেদ' জেল থেকে দু'মাসের ছুটি পেয়ে বাড়ী এল। জেলে গিয়েছিল স্বদেশীয়ানা করে সন্দেহ নেই। এরা আব্বাস তৈয়াবজী পরিবারের,— সুতরাং কংগ্রেসী দলের লোক।

সপ্তাহ খানেক বেড়িয়ে কাটালাম। ভিলে পার্‌লেতে বাচু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম একদিন। বাচু ভাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র,—বোম্বেতে ছিল তখন। সে আমার মাসতুতো বোন মৈত্রীকে বিয়ে করেছিল। বাচু ভাই লিখেছিল—সে আমার ছবির প্রদর্শনী অর্গানাইজ করবে টেগোর সোসাইটির তরফ থেকে। বাচু ভাই আমেদাবাদ গেছে—মৈত্রীর সঙ্গে দেখা। সে ছবি আঁকা শিখত শান্তিনিকেতনে; কিন্তু পরে কলকাতায় হোমিও-প্যাথি শিখে দাক্তারী করছিল ভিলে পার্‌লেতে। বেশ পসার জমিয়েছে শুনলাম। এই সেই বোম্বে, যেখানে বহুকাল আগে ছাত্রাবস্থায় কাটাবার পর এসেছিলাম কিছুদিন। পুলিশ ও গোয়েন্দার উৎপাত না পড়লে হয়ত থেকেই যেতাম। ভিলে পার্‌লে—খারবান্দ্রা—এসব জায়গা আমার চেনা। ছিলাম খারে, জুহুতেও গিয়েছি কতবার।

কোটালিপাড়া কাহিনী

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ফরিদপুরে আবিষ্কৃত তাম্রখোদিত পাত্র হইতে জানা যায় যে, ষষ্ঠ শতকের শেষে এই ব-দ্বীপে আর একটি রাজবংশ রাজত্ব করিতেন।

উহাদের দুইটি তাম্রপাত্র হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মাদিত্য নরপতির সময়ে ভূমি হস্তান্তরের বিবরণ এবং তৃতীয় গোপ-চন্দ্র নামক রাজার সময়ের ভূমি হস্তান্তরের দলিল ছিল। ঐ সমস্ত দলিলকে কেবল "ফরিদপুরের তাম্রপাত্র" বলা হয়। Mr Pargiter উহা ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ, ৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ এবং ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বলিয়া অনুমান করেন।

কোটালিপাড়া দুর্গের নিকট তাম্রপত্রে সম্পাদিত দানপত্র এবং মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় অন্যূন পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে এখানে যে একটি উপনিবেশ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে কিছুদূরে ঘাঘরা-হাটি গ্রামের জনৈক কৃষক "ঘাঘরাহাটি তাম্রপত্র" আবিষ্কার করে। দুর্গের ঐ স্থান হইতে তিন চতুর্থাংশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গুরাখোলা গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সোনাকান্দুরি মাঠের মধ্যে গুপ্ত সম্রাটদের নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কোটালিপাড়া হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে ঘাঘর নামে জনৈক অজ্ঞাত রাজার একটি সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় এবং দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত-সংলগ্ন পিঞ্জুরী গ্রামের নিকটবর্ত্তী মদনপাড়া গ্রামে সেনরাজবংশীয় বিশ্বরূপের তাম্রপত্রে সম্পাদিত এক দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

ঘাঘরহাটিতে প্রাপ্ত এবং বর্ত্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত তাম্রপত্রে সম্পাদিত দানপত্র দেখিয়া ঢাকা যাদুঘরের তত্ত্বা-বধায়ক ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ-ভাগে সমাচারদেবের রাজত্বকালে প্রদত্ত ঐ দানপত্র সম্পর্কিত জমির সীমানার (চৌহদ্দির) নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—পূর্ব্বে প্রেত অধ্যুষিত পর্কটি বৃক্ষ, দক্ষিণে বিদ্যাধর জ্যোতিকা, পশ্চিমে চন্দ্রবর্ম্মণের দুর্গ এবং উত্তরে গোপেন্দ্রচরক গ্রাম। দুর্গের উত্তরদিকে অবস্থিত স্থানটিকে তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার বিষয় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন।—

"এই অঞ্চলটি স্থানীয় লোকদের নিকট বুজরুগর বা শিক্ষিত অথবা যাদুকরের স্থান বলিয়া পরিচিত—যেহেতু এখানে কোনও বুজরুগের বাসস্থান ছিল। এই স্থানের দুর্গ-সন্নিহিত জমি চতুর্দ্দিকস্থ মাঠ হইতে পনের ফুট উচ্চ এবং বাহিরের খাল হইতে আরও অধিক উচ্চ দেখায়। ইহার বিস্তার ১৫০ গজ। ঐ স্থান হইতে প্রায় আধ মাইল

উত্তর-পশ্চিমে পরিত্যক্ত বসতবাটি আছে। উহাতে একটি পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর পাড়ে বড় বড় বৃক্ষ আছে। ঐ বাড়ীটিকে "জটিয়াবাড়ী" বা "জটিয়ার বাড়ী" বলা হয়। এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে, ঐ স্থানে বিদ্যাধর নামে জনৈক ব্যক্তি পত্নী জটিয়া বুড়ীকে (অর্থাৎ তাহার জটওয়ালা বৃদ্ধাকে) লইয়া বাস করিত। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের মধ্যে এই গ্রামটিতে অপদেবতার বাসভূমি বলিয়া অখ্যাতি ছিল, জটিয়া বুড়ীর পুষ্করিণীর উত্তরপাড়ের দিকে পরস্পর হইতে কয়েকগজ ব্যবধানে দুইটি সমান্তরাল অদ্ভুত রাস্তা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। গ্রামবাসীদিগকে পরস্পরের এত নিকটবর্ত্তী রাস্তা দুইটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তাহারা জানাইল যে, একটি রাস্তা রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের জন্য ও অপরটি সাধারণ লোকদের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পাশাপাশি রাস্তা দুইটি নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহা দ্বারা জ্যোতিকা বা দুইটি রাস্তার একত্র স্থাপন বুঝায়। এই স্থান হইতে সামান্য উত্তরে গোবিন্দপুর গ্রামের আরম্ভ এবং ইহাই তাম্রপত্রে বর্ণিত গোপেন্দ্রচরক। গোবিন্দ এবং গোপেন্দ্র—একই অর্থ প্রকাশ করে।"

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে,দুর্গটি চন্দ্রবর্ম্মণের—এইরূপ উল্লেখটি সমাচারদেবের তাম্রপত্রের সহিত শেষ যোগসূত্র। এই চন্দ্রবর্ম্মণ কে ছিলেন? যিনি কোটালিপাড়া দুর্গের জন্য সমাচারদেবের সময় পর্য্যন্ত স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন? এই দুর্গটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আড়াই মাইল। ইহা বাংলা দেশের বৃহত্তম মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া পরিচিত। "মহাস্থান"-এর দুর্গটি আকারে ইহার পরবর্ত্তী স্থান পাইতে পারে। ইহার আয়তন মাত্র ১০০০×১৫০০ গজ। এই মহাপরাক্রমশালী চন্দ্রবর্ম্মণ কে ছিলেন—যিনি নিম্নভূমিতে এই বিরাট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—যাহার প্রাঙ্গণ হইতে গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রাগুলি ক্রমশ: আবিষ্কৃত হইতেছে? ইহা আমাদের "মেহারুল" স্তম্ভে খোদিত চন্দ্রের কথা তৎক্ষণাৎ মনে করাইয়া দেয় যে, চন্দ্র তাঁহার সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহার তরবারী দ্বারা তাহার যশ ঘোষিত করিয়াছিল। এই লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে Fleet জোর দিয়াছেন, অথচ তাহার কোন তারিখ দেন নাই এবং Allan তাঁহার স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির সহিত এই চন্দ্রই যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—এই মতবাদটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অবশেষে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, শুশুনিয়া পর্ব্বতে খোদিত "পুষ্করণ"-এর সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মণই এই চন্দ্র—যে চন্দ্রবর্ম্মণকে সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় দশকে বঙ্গদেশ ইহাতে বিতাড়িত করেন। যখন আমরা দেখি যে, প্রাচীন বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এক বিরাট দুর্গের আকারে এক অপরূপ স্মৃতিসৌধ এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতেও চন্দ্রবর্ম্মার নাম হইতে উল্লিখিত হইয়াছে—তখন আমরা সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মতবাদ বিশ্বাস করিতে পারি। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "মেহারুল" স্তম্ভে নামাঙ্কিত চন্দ্র এবং চন্দ্র একই ব্যক্তি। চন্দ্রবর্ম্মার বঙ্গদেশে আগমন এবং তাঁহার এই দুর্গের আরম্ভের তারিখ মোটামুটিভাবে ৩১৫ খ্রীষ্টাব্দ বলা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়—এই নিম্ন এবং জলাভূমিতে এই বিরাট দুর্গ কিরূপে নির্ম্মিত হইল? ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই প্রশ্নটি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার একটি ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে কোটালিপাড়া বহু মাইল বিস্তৃত জলাভূমি দ্বারা বেষ্টিত; কিন্তু ইহা চিন্তা করা যায় না যে, একজন স্থির মস্তিষ্ক মানুষ এইরূপ স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিবেন; কিন্তু এই বৃহদাকার দুর্গটি সেখানে রহিয়াছে এবং এই জলাভূমিতে প্রায়ই ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহাদির ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যাইতেছে। Pargiter এবং অন্যান্যেরা অনুমান করিতেছেন—এই নিম্ন জলাভূমি ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভূমিকম্পের সময় সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে, ধর্ম্মাদিত্যের রাজত্বকালে একটি নূতন শহর গড়িয়া উঠিতেছিল; কিন্তু ইহা তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয় না। লেখক এখানে "ঘাঘরাহাটি" তাম্রপত্রে উল্লিখিত "নব্যকশিক" অথবা প্রাদেশিক রাজধানীর কথা বলিয়াছেন! কিন্তু তিনি অনুমানে ধর্ম্মাদিত্যের একটি সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, ধর্ম্মাদিত্যের রাজত্বের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে একটি ভূমিকম্পে বিগত আড়াই শতাব্দীর রাজপরিবারের বাসস্থানের চতুর্দ্দিক জলাভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল এবং শাসন দপ্তরের প্রধান বিভাগগুলি অন্যান্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইল। কোটালিপাড়া অবশ্য "ডিষ্ট্রিক হেড কোয়ার্টার" হিসাবেই রহিল; কিন্তু ইহার জমির মূল্য এইরূপ কমিয়া গেল যে প্রায় সমগ্র গ্রামটি এক ব্রাহ্মণকে দান করা হইল। সমাচারদেবের তাম্রপত্রে এই গ্রাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এই গ্রামে নিম্ন জলাভূমি আছে।[১]

১। N. K. Bhattasali, The Ghagrahati Copper-plate Inscription of Samachara Deva and connected questions of later Gupta Chrono-

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত হইবে যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে কোটালিপাড়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়; কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কোটালিপাড়ার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নহে; কিন্তু একাদশ শতাব্দী হইতে কোটালিপাড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারার সন্ধান পাওয়া যায়—যাহা হইতে অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত (বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) অন্ততঃ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবার বংশপরম্পরায় কোটালিপাড়ায় বসবাস করিয়া আসিতেছেন। কালক্রমে এই সকল বংশ বহু বিস্তৃত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে এই স্থান হইতেই অনেকে বংলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

বিভিন্ন কুলপঞ্জিকা দৃষ্টে মনে হয় যে, ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলে হিন্দু অধিবাসীদের অনেকে পলায়ন করিয়া স্বধর্ম রক্ষার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতি দুর্গম কোটালিপাড়ায় আসিয়া সেই স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কাহারও কাহারও মতে—তৎকালে বঙ্গদেশে 'সাগ্নিক' ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় কোন বিশেষ যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করা হয় এবং তাঁহাদের কেহ কেহ কোটালিপাড়ায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, পরবর্ত্তী কালে কোটালিপাড়ায় যাঁহারা আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপ গোত্রভুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশধরদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ অগ্নিহোত্রী রাম মিশ্র রাজা হরিবর্ম্মার নিকট হইতে উনবিংশতি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পান। অগ্নিহোত্রী রামমিশ্র সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে কোটালিপাড়ায় আগমন করেন। এই উনবিংশতির অপভ্রংশ "উনশিয়া" * নামে পরিচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই 'উনশিয়া' কোটালিপাড়ার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম। উনশিয়া গ্রামের একটি পাড়া "কাশ্যপপাড়া" নামে অভিহিত। প্রবাদ ছিল যে, "বারোশত ব্রাহ্মণ তেরোশত আড়া—তাহার নাম কাশ্যপপাড়া।"

এই উনশিয়া গ্রামেই পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-মধুসূদন সরস্বতী প্রায় চারিশত তিরিশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

মধুসূদন সরস্বতীর জীবনী এই গ্রন্থের পরিশেষে দ্রষ্টব্য।

মধুসূদনের সময় হইতে অথবা তাহারও কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে কোটালিপাড়াস্থ ঋষিকল্প অনেক পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমি পর্য্যালোচনার সুযোগ পাইয়াছি এবং তাঁহাদের কিছু কিছু বিবরণীও এই গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

কিন্তু আমার পক্ষে একথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয় যে, বর্ত্তমানকালের ইতিহাস শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, সেই অর্থে কোটালিপাড়ার গত চার-পাঁচশ বছরের ইতিহাস রচনা করা চলে। শুধু এইটুকুমাত্র বলা সম্ভব যে, গত চার-পাঁচশ বছর ধরিয়া কয়েকটি ব্রাহ্মণবংশের ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য বৈদিক কাশ্যপ-বংশ অন্যতম প্রধান। এই বংশের বিবরণীর মাধ্যমেই কোটালিপাড়া-কাহিনীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।

প্রসঙ্গতঃ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার "বাঙ্গালীর ইতিহাস" নামক অমূল্য গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩০০) পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের বঙ্গে তথা কোটালিপাড়ায় আগমন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি—

"রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র বিভাগ ছাড়া ব্রাহ্মণদের আর একটি শ্রেণী, বৈদিক—বোধ হয় এই যুগেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

---

logy, Dacca Review, May-June 1920, and July-August, 1920.

উক্ত মুদ্রিতাংশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত পদটীকাদ্বয়ও দ্রষ্টব্য—

(১) Bengal District Gazetteers, Faridpur (Published in 1925) By LSSO' Malley, C.I.E. (Page 16)

(২) Dr. Radha Govinda Basak, the fine Damodarpur Copperplate Inscriptions of the Gupta Period. Epigraphia Indica, Vol. XV, No 7, p 113 et seq.

---

* (১) উত্তর উনশিয়া পাড়া, (২) সাহাপাড়া, (৩) দাসপাড়া, (৪) মধ্যাস্থপাড়া, (৫) অবিলম্বপাড়া, (৬) কাশ্যপপাড়া, (৭) চৌধুরীপাড়া, (৮) ঘোষপাড়া, (৯) কর্ম্মকারপাড়া, (১০) বিশ্বাসপাড়া, (১১) ঠাকুরপাড়া (১২) ধোপাপাড়া, (১৩) বচাইরপাড়া, (১৪) রাজাপুরা, (১৫) ধরপাড়া, (১৬) ভরদ্বাজপাড়া, (১৭) পুরন্দরপাড়া, (১৮) নাপিতপাড়া, ও (১৯) দত্তপাড়া—এই ১৯টি পাড়া লইয়া 'উনশিয়া' গ্রাম গঠিত হইয়াছে। ইহার জমি পরিমাণ ৭৬৫ একর।

কুলজী গ্রন্থমালায় এ সম্বন্ধে দুইটি কাহিনী আছে। একটি কাহিনীর মতে, বাংলা দেশে যথার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় এবং যজ্ঞাগ্নি যথানিয়মে রক্ষিত না হওয়ায় রাজা শ্যামলবর্ম্মা (বোধ হয় সামলবর্মা) কান্যকুব্জ হইতে (কোনও কোনও গ্রন্থ মতে বারাণসী হইতে) ১০০১ শকাব্দে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অপর কাহিনী মতে ; সরস্বতী নদীতীরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যবন আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া বাংলা দেশে পলাইয়া আসেন এবং বর্ম্মণরাজ হরিবর্ম্মার পোষকতায় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তর ভারত হইতে আগত এই সব বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই পাশ্চাত্ত্য বৈদিক নামে খ্যাত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আর এক শাখা আসেন উৎকল ও দ্রাবিড় হইতে; ইঁহারা "দাক্ষিণাত্য বৈদিক" নামে খ্যাত। এই কুলজী কাহিনীর মূল বোধ হয় হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া হলায়ুধ বলিতেছেন—রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেন না এবং সেই হেতু বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতিও জানিতেন না; যথার্থ বেদজ্ঞান তাঁহার সময়ে উৎকল ও পাশ্চাত্ত্য দেশেই প্রচলিত ছিল। বাংলার ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বেদজ্ঞ বলিয়া দাবি করিলেও যথার্থতঃ বেদ-চর্চ্চায় প্রচলন বোধ হয় সত্যই তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। যেখানে চোর-ডাকাতের ভয় নাই, ত্যাগী ও মনীষী মানবগণের আশ্রয়ভূমি, যে দেশ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ঘর্ঘরনদ প্রবাহিত হইতেছে, যে নদকে কোন কোন পণ্ডিত ব্রহ্মপুত্র বলিয়া থাকেন, তাহার পূর্ব্বদিকে অত্যুচ্চ ভূমিতে তাঁহারা উৎসাহের সহিত সরযাদি পর্ণনির্ম্মিত গৃহনির্ম্মাণ করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিকে ভল্লাতক, আম্রাতক, বিল্ব, বারুণ, প্লক্ষ, ধাত্রী, কদম্ব, হিজ্জল, অশোক, আম্র, জম্বু, কিংশুক প্রভৃতি গ্রাম্য বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছিল।

সেই দেশ বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে, গমনাগমনের পথে প্রচুর জল হয়। ইহা দেখিয়া, তাঁহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য কদলীবৃক্ষের দ্বারা ছোট ও বড় নানা প্রকার ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা বাঁশ, বেত, মুঞ্জা, কন্দুল ও কাশ দ্বারা অতি দৃঢ় গৃহসকল নির্ম্মাণ করিলেন।"

অতি পূর্ব্বকালে বৈদ্যবংশীয় করমজুমদারগণ কোটালি-পাড়া পরগণার মালিক ছিলেন। পরে দেনার দায়ে তাঁহারা স্বনামের পরিবর্ত্তে স্বীয় পুরোহিতের নামে সমস্ত সম্পত্তি বেনামী করেন। জমিদারীর কার্য্য পুরোহিতের নামে চলিতে থাকে। কিছুদিন পরে পুরোহিত বলিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে করমজুমদারগণ এই পরগণার মালিক নহেন। তিনি অর্থ দ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছেন। তদবধি, প্রকৃতরূপে পুরোহিতই ইহার জমিদার হন।(১)

সেই কোটালিপাড়া এখন আর নাই এবং আমার এই "কোটালিপাড়া কাহিনী"ও বহুব্যবচ্ছেদ কাল পর্য্যন্ত আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। আমার অনেক শুভার্থী বন্ধু-বান্ধব বর্ত্তমান ঐতিহাসিক সত্যকে মানিয়া লইয়া আমাকে এই নিরর্থক প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপদেশ ও অনুরোধের গুরুত্ব যে কিছু নাই—তাহা বলিতে পারি না।

হলায়ুধের আগে বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট ও তাঁহার 'পিতৃ-দয়িতা' গ্রন্থে বাংলা দেশে বেদচর্চ্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্ত্য বলিতে হলায়ুধ এক্ষেত্রে উত্তর ভারতকেই বুঝাইতেছেন সন্দেহ নাই। বাংলা দেশে উৎকল ও পাশ্চাত্ত্য দেশাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তখন বসবাস করিতেছিলেন কি না এ সম্বন্ধে হলায়ুধ কিছু বলেন না; তবুও সামলবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মার সঙ্গে কুলজী কাহিনীর সম্বন্ধ ও তাঁহাদের মোটামুটি তারিখ, অনিরুদ্ধ ভট্ট ও হলায়ুধ কথিত রাঢ়ে বরেন্দ্রীতে বেদচর্চ্চার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎকল ও পশ্চিম দেশসমূহে বেদজ্ঞানের প্রসার পাশ্চাত্ত্য ও দাক্ষিণাত্য—এই দুই শাখার বৈদিক ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দিয়াছিল।" খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত "বৈদিক-কুল-পঞ্জিকায়" তৎকালীন কোটালিপাড়া সম্বন্ধে এইরূপ একটি বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—

"ততঃ প্রয়াতঃ পুরুহূত-পালিতাং দিশঞ্চ তত্তুৎ
পারচিন্তয়াকুলঃ।
দেশং সুরম্যং বহুশস্যযুক্তং কোটালিপাটস্ববহার
বজ্জিতম্॥
প্লবঙ্গহীনঃ ফলনম্র-পাদপো লূলাপো-কোলর্ক্ষ-তরক্ষু-
বর্জ্জিতঃ।
সন্ন্যাসিমাশ্রয় দস্যুহীনো বাসায় দেশো রুচয়ে বভূব॥
যদ্দেশমধ্যে স হি ঘর্ঘরো নদো যৎ ব্রহ্মপুত্রেতি চ
কেচনাঽবদন্।
তস্যোন্নভাগে স্থিতিতুঙ্গভূতলে পর্ণালয়ানাং নবচক্রুরুৎ-
সুকাঃ॥
ভল্লাতকাম্রাতক-বিল্ববারুণা ধাত্রীজল-প্লক্ষ-কদম্ব-
হিজ্জলাঃ।

---

(১) ফরিদপুরের ইতিহাস, ২য় ভাগ—১৮ পৃষ্ঠা।

অশোক-অম্রাম্রক-বংশ কিংশুকা বিরেজিরে তে
যুগবিক্ষু বেশ্মনঃ ॥"

"বিলোক্য তস্মাজ্জলবপ্রবেশং বর্ষাগমে বর্ত্মসু ভূরি বারি।
ভেলাং প্রচক্রুঃ কদলীক্রবৈশ্চ ক্ষুদ্রাশ্চ দৌর্ঘ্যাৎ গমনাগমায় ॥
ততশ্চ সর্ব্বে স্বগৃহানি চক্রুর্দৃঢানি মৃৎস্না-পরিবেষ্টিতানি।
কন্দুল কাশোদ্দ্ধসমাচিতানি বংশৈশ্চ বেত্রৈশ্চ নবানি তত্র ॥"

ইহার তাৎপর্য এই যে, "তাঁহারা বাসস্থানের চিন্তায় ব্যাকুলচিত্তে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া কোটালিপাড়ায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, এই স্থানটি অতি রমণীয়, বহুশস্যযুক্ত, ফলভরে অবনত পাদপরাজি বিরাজিত।

যাঁহারা অতীতের কাহিনী ভালবাসেন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যাঁহাদের কাছে আবেগের অধীভূত, কেবলমাত্র বিলাসের বস্তু নয়, রূঢ় বাস্তবই যাঁহাদের কাছে একমাত্র সত্য নয় তাঁহারা হয়ত এই আপাত নিরর্থক প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু সার্থকতা ও মূল্য দেখিতে পাইবেন। কে জোর করিয়া বলিতে পারে যে, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদেই কোটালিপাড়ার অবসান ঘটিয়াছে? যদি তাহাও হয়, তবে পরমারাধ্য পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যজন্মভূমি ও পিতৃভূমির কাহিনী—তাহা বোধ হয় কোনক্রমেই একেবারে নিরর্থক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই আমি "কোটালিপাড়া কাহিনী" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং আমার প্রভূত আয়াসের ফলস্বরূপ এই কাহিনী "সমানধর্ম্মা"-দের হাতে অতি সঙ্কোচে তুলিয়া দিতেছি। তাঁহারা এই প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করিলে, আমি ধন্য ও কৃতার্থবোধ করিব।

জাতীয় জীবন বলিলে শ্রেণী বিশেষের জীবন বুঝায় না। রাজা, অভিজাতবর্গ, কিংবা ধন ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের জীবনই জাতীয় জীবন নয়। যাহারা খাটিয়া খায় ও খাটিয়া খাওয়ায় বরং তাহাদের জীবনই জাতীয় জীবন নামে আখ্যাত হইবার অধিকতর দাবী করিতে পারে। ···সুতরাং কোন সাহিত্য বাস্তবিক জাতীয় নামের যোগ্য কি না, বিচার করিতে হইলে, দেখা উচিত, তাহাতে সকল শ্রেণীর সুখ, দুঃখ, স্বার্থ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, উদ্যম, আমোদ প্রভৃতির যথোযথ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কি না।

দাসী, জুন ১৮৯৫

ভালবাসার জন্য

(ও. হেনরী)

অনুবাদ : নির্মলগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

কুড়ি বৎসর বয়সে যখন একদিন লম্বা নেকটাই ঝুলিয়ে আর কিছু সঞ্চিত অর্থ নিয়ে স্ব-গ্রাম পরিত্যাগ করে নিউ ইয়র্কে চলে এল, তখন সেই স্বল্প বয়স থেকেই জো ল্যারাবীর চিত্রাঙ্কনের আগ্রহ ছিল। একজন উচ্চ-স্তরের শিল্পী হওয়াই তার বাসনা ছিল।

ডিলিয়া—ডিলিয়া ক্যারিউ থার্স নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করছিল। পাইন বৃক্ষ বেষ্টিত ছায়া-শীতল এক গ্রামে সে তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করত। তাঁরা ওর সঙ্গীতের মধ্যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সেই হেতু তাঁরা ওকে নিউ ইয়র্ক শহরে প্রেরণ করলেন। শিক্ষান্তে ঘরের মেয়ে ঘরেই প্রত্যাগমন করবে, কিন্তু ওকে শিক্ষা শেষ করতে দেখবার সৌভাগ্য তাঁদের কারও হয় নি আর সেইটাই হচ্ছে আমাদের আখ্যানবস্তু।

নিউ ইয়র্কের এক বৃহৎ হলে ছাত্রছাত্রীদের সভা বসেছে—সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের উপরই এক উচ্চশ্রেণীর আলোচনা হচ্ছে। সেই স্থানেই চিত্রশিল্পের ছাত্র জো'র সঙ্গে সঙ্গীতের ছাত্রী ডিলিয়া'র পরিচয় হয়।

পরস্পরকে অবলোকন করে তারা আকৃষ্ট হ'ল। কিছুদিনের ভিতরেই তারা উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল।

ক্ষুদ্র একটি নিভৃত ফ্ল্যাটে তারা উঠে এল। তারা পরস্পরকে অতি সান্নিধ্যে পেল আর পেল নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-চর্চার সুযোগ। তাই তারা সত্যকারের সুখী-দম্পতি ছিল।

প্রখ্যাত শিল্পী ম্যাজিষ্টারের নাম কে না শুনেছে! জো তাঁর নিকটই অঙ্কন শিক্ষালাভ করত। তাঁকে স্থূল অঙ্কের পারিশ্রমিক দিতে হ'ত, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সামান্যই উশুল হ'ত। অবশ্য মোটা পারিশ্রমিকেই তাঁর কাজ বেশ সিদ্ধ হ'ত। তাঁর হাঁকডাকই যে তাঁর নামডাক বাড়িয়ে দিয়েছিল।

খ্যাতনাম শিল্পী রোজেন্সৃষ্টকের নিকট ডিলিয়া গান শিখত। পিয়ানো বাদনেও তাঁর অসামান্য যশ ছিল।

তাদের সাধনার লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট ও নিশ্চিত। জো ত অল্প কিছুকালের মধ্যে একজন শক্তিশালী শিল্পী হবে! তার ছবি ক্রয়ের জন্য তার ষ্টুডিয়োতে শিল্পানুরাগী ধনীদের ঠেলাঠেলি লেগে যাবে।

আর ডিলিয়া বিভিন্ন জলসায় যোগ দিতে দিতে শ্রান্ত হয়ে পড়বে। তখন ত তার সঙ্গীতের উপরই অশ্রদ্ধা এসে যাবে। আলোকের বন্যায় উদ্ভাসিত সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চে পিয়ানোর সম্মুখে উপবিষ্ট হওয়া অপেক্ষা বরং কণ্ঠে অসহনীয় যন্ত্রণা হওয়া এবং নির্জন এক ভোজন-কক্ষে বসে চিংড়ির স্বাদ গ্রহণে সে ব্যস্ত থাকবে।

তাদের ক্লাস করে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটটি আনন্দে কলমুখর হয়ে ওঠে। আহার্য গ্রহণ করতে করতে তাদের স্বপ্নময় রঙিন ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎসাহপূর্ণ আলোচনা চলে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পারস্পরিক বিনিময় তাদের আরও অধিক ঘনিষ্ঠ, আরও বেশী অন্তরঙ্গ করে তোলে।

॥ দুই ॥

কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের একনিষ্ঠ শিল্প-সাধনায় ভাঁটা পড়ল। কেবল জলের ন্যায় ব্যয়ই হচ্ছে, একটি পেনীও ঘরে আসছে না। মিঃ ম্যাজিষ্টার এবং হের রোজেন্সৃষ্টককে বেতন দেওয়ার মত আর তাদের অর্থ নেই। একদা ডিলিয়া জানাল যে, সে গানের শিক্ষকতা করবে। ছাত্রী সংগ্রহার্থে ডিলিয়া দু'তিনদিন খুবই ঘোরাঘুরি করল। একদিন সন্ধ্যায় সে বেশ খুশি ভাব নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করল।

—ওগো শুনছ, উল্লাসের সঙ্গে ডিলিয়া বলল, আমি ছাত্রী খুঁজে পেয়েছি। কি চমৎকার লোক ওঁরা!

জেনারেল এ. বি. পিঙ্কনির মেয়ে। ওদের কি জমকালো ধরনের বাড়ী! তুমি যদি শুধু সিংহদ্বারটা একবার দেখতে! আঃ! এ-যেন ইন্দ্রপুরী—তুমি এ-কথাই বলতে। আর একবার যদি ভিতরে ঢুকতে! ওগো, এমনটি আমি আর কখনও দেখি নি।

—আমার ছাত্রীটির নাম ক্লিমেন্টিনা। এরই মধ্যে তাকে খুব ভালবেসে ফেলেছি। মেয়েটির স্বভাব বেশ নম্র। সর্বদাই সাদা রঙের পোশাক পরে থাকে। কি সরল আর সুন্দর তার ব্যবহার! বয়স মাত্র আঠারো। আমাকে কেবল সপ্তাহে তিনদিন শেখাতে হবে। বুঝে দেখ, এক-একদিনের জন্য পাব পাঁচ পাঁচ ডলার! আর আমার গান শেখা? সেজন্য আমি কিছু চিন্তা করি না। আরও দু'টি কি তিনটি ছাত্রী জোটাতে পারলে আবার গিয়ে রোজেনস্টকের ক্লাশে যোগ দেব। আচ্ছা, এবার ভাবনা-চিন্তা ছাড় ত তুমি। ওগো, এস, রাত্রির খাওয়াটা একটু আরাম করে বসেই খাওয়া যাক।

—তোমার পক্ষে ত ভালই হ'ল ডেল, গম্ভীর মুখে খাদ্যের রেকাবিটা টেনে নিয়ে জো বলল, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি বলছ? তুমি দিনমজুরির জন্য ছুটাছুটি করে মরবে আর আমি বসে বসে সুকুমার-শিল্পের চর্চা করব! তুমি কি ভেবেছ, আমি তা হতে দেব! না, কখনই না। আমিও ভেবেছি, হয় খবরের কাগজ বিক্রী করব নয়ত জুতো বুরুশ করব। তাতেও সপ্তাহে ঘরে দু'এক ডলার আসবে।

ডিলিয়া উঠে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরল, তুমি বড্ড অবুঝ, জো। তোমাকে ছবি আঁকা শিখতেই হবে। আমি আমার গান একেবারে ছেড়ে দিয়ে বাজে কাজে কিছু করে বেড়াচ্ছি, এমন ত নয়! কোন কিছু শেখাতে গেলে নিজেরও শেখা হয় তা জান। আমি গান নিয়েই ত থাকব। সপ্তাহে পনর ডলার খরচ করে দেখবে কি রকম রাজার হালে আমরা থাকব। ম্যাজিষ্টারকে ছাড়বার কথা তুমি একেবারেই ভাবতে পারবে না।

—বেশ তাই হবে। সবজি-সিদ্ধটা মুখে দিতে দিতে জো বলল, কিন্তু তোমার এই গান শেখানটা আমি আদৌ পছন্দ করি না। এটা আর্ট বা কলা নয় মোটেই। কিন্তু তুমি এত ভাল মানুষ যে, এটা না করেও ছাড়বে না।

—যে কলাকে ভালবেসেছে, তার কাছে কোন কাজই কঠিন নয়, ডিলিয়া বলল।

—উদ্যানে বসে যে ছবিটা এঁকেছি, মিঃ ম্যাজিষ্টার সেটার খুবই প্রশংসা করেছেন। জো ধীরে ধীরে বলল, ভাবছি যদি বড়লোক বোকা খরিদ্দার পাই ত ওটা ছেড়ে দেব।

—নিশ্চয়ই তুমি পাবে। ডিলিয়া মিষ্ট হাসি হেসে বলল, আজকের মত এ আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করি, কি বল, জো?

॥ তিন ॥

ল্যারাবীরা পরবর্তী সমগ্র সপ্তাহটা ধরেই সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরে নিতে লাগল। সেন্ট্রাল পার্কে বসে জো'র চিত্রাঙ্কনের ঝোঁকটা রীতিমত বৃদ্ধি পেয়েছে। সে প্রত্যুষেই গৃহ হ'তে নির্গত হ'ত। চিত্রে প্রাভাতিক প্রভাব সুপরিস্ফুট করতে প্রাতঃকালেই যে গমন প্রয়োজন। ডিলিয়া তাকে খাইয়ে-দাইয়ে আদর করে সোহাগ জানিয়ে চুম্বন করে সকাল সাতটায় বাড়ী থেকে ছেড়ে দিত।

বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনে প্রায়ই তার সন্ধ্যা সাতটা হয়ে যেত। শিল্প-সাধনায় সে এমনই তন্ময় হয়ে থাকত!

সপ্তাহান্তে বেশ গর্বিত ভঙ্গিতেই ডিলিয়া এসে তিনখানা পাঁচ ডলারের নোট টেবিলের উপর রাখল, কিন্তু তার ঐ আপাত উল্লাসের সঙ্গে যেন একটা শিথিল-ক্লান্তি মিশে ছিল।

—মাঝে মাঝে কেমন যেন বিরক্তি ধরে যায়, শ্রান্ত-স্বরে ডিলিয়া বলল, মনে হয় ক্লিমেন্টিনা বাড়ীতে একটুও অভ্যাস করে না। এক কথাই আমাকে বহুবার বলতে হয়। ওর ঐ সাদা পোশাকটাও আজকাল আমার কাছে কেমন একঘেয়ে লাগছে। কিন্তু কি চমৎকার লোক ঐ জেনারেল পিঙ্কনি। ঐ বিপত্নীক বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে আমার বেশ ভাল লাগে। ওঁরা রীতিমত বনেদী বংশের লোক। ক্লিমেন্টিনার উপরও আমার ভারী মায়া পড়ে গেছে—মেয়েটি কি শান্ত আর ভদ্র! সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছে ত!

আর জো তখন নির্বিকার চিত্তে পকেট হাতড়ে কতকগুলো নোট বার করছিল—একখানা দশ ডলার, একখানা পাঁচ ডলার, একখানা দু' ডলার এবং একখানা এক ডলারের নোট টেবিলের উপর ডিলিয়ার উপার্জনের পাশে রাখল।

—পিওরিয়ার এক ভদ্রলোককে আমার সেই জল রঙের নতুন ছবিটা বিক্রী করে দিয়েছি। বলতে বলতে জো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। লোকটিকে যদি তুমি দেখতে ডিলিয়া! বাপ্‌রে বাপ্! কি মোটা! ভুঁড়িখান যেন প্রকাণ্ড একটা জালা! তার উপর আবার মাথা ও গলায় পশমের মাফলার জড়ান। আর হাতে ছিল

পাখীর পালকের একটা খড়কে। কিন্তু ক্রেতা হিসাবে চমৎকার! তিনি কেবল এই ছবিটাই কেনেন নি, জাহাজ ঘাটের একখানা তৈল বর্ণের ছবির জন্যও অর্ডার দিয়ে গিয়েছেন।

আর তোমার গান শেখান—জো একটু থেমে বলল, ওর মধ্যেও অবশ্য কিছুটা আর্ট বা কলা রয়েছে।

—তুমি কলার চর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছ বলে আমি যে কত খুশি—আন্তরিক দরদের সঙ্গে ডিলিয়া বলল, তুমি অবশ্যই দাঁড়িয়ে যাবে, জো। কি মজা! তেত্রিশ ডলার! আমরা কোনদিন এত টাকা খরচ করি নি।

—আশা করি, আজকের নৈশ-আহারটা ভালই হবে। জো বলল।

—নিশ্চয়ই, সে আর বলতে। ডিলিয়া নিশাকালীন ভোজনের আয়োজন করতে উঠে গেল।

॥ চার ॥

শনিবারের প্রদোষ। প্রথমে জো বাসায় প্রত্যাবর্তন করল। সে ক্ষুদ্র একটা টেবিলের উপর আঠার ডলার ছড়িয়ে রাখল। তার দু' হাতে বেশ খানিকটা কালো রং মাখান ছিল। সে ত্বরায় তা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিল।

অর্ধ ঘণ্টা পরেই ডিলিয়া এসে উপস্থিত হ'ল। তার দক্ষিণ হস্ত বিভিন্ন প্রকারের টুকরো কাপড়ের দ্বারা কি অদ্ভুত এক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

—কেমন করে এটা হ'ল? দৃষ্টি পড়তেই জো প্রশ্ন করল।

ডিলিয়ার আননে এক টুকরো হাস্য পরিস্ফুট হ'ল। কেমন প্রাণহীন নিরানন্দ দেখাল সে হাসি।

—এমন অদ্ভুত মেয়ে ক্লিমেন্টিনা—জবাব দিল ডিলিয়া, গান শেখান হয়ে গেলে আমাকে খেয়ে যেতে হবে বলে জেদ ধরল। ওদের খরগোশের মাংস রান্না হচ্ছিল। জেনারেলও বাড়ীতে ছিলেন। তিনি আমার খাওয়ার ব্যাপারে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তাতে মনে হচ্ছিল যেন বাড়ীতে ভৃত্য নেই। এমনিতেই ক্লিমেন্টিনার শরীরটা দুর্বল, তার উপর ঘাবড়েও গিয়েছিল একটু। পরিবেশন করতে গিয়ে আমার কব্জি আর হাতের উপর বেশ খানিকটা গরম ঝোল ফেলে দিল। মাংসটা একেবারে ফুটন্ত গরম ছিল। হাতটা পুড়ে গিয়ে ভীষণ জ্বালা করছিল। বেচারী ক্লিমেন্টিনা! তখন কি অপ্রস্তুতই না হয়েছিল। আর জেনারেল পিঙ্কনি! ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কেবল উন্মাদ হওয়া বাকী ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নীচের তলায় ছুটে গেলেন। কাকে যেন ঔষধ আর ব্যাণ্ডেজ আনতে পাঠিয়ে দিলেন।

—কি হয়েছে, একবার দেখি। ডিলিয়ার হাতখানা আস্তে টেনে নিয়ে জো ব্যাণ্ডেজটা একটু সরিয়ে বলল।

—ঐখানটায় শুধু একটু ব্যথা হয়েছে। ডিলিয়া উত্তর দিল, তা তেল লাগিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা তুমি কি আরও একখানা ছবি বিক্রী করেছ, জো? সে টেবিলের উপর টাকাটা পড়ে থাকতে দেখেছিল।

—বিক্রী করেছি কি না? জো'র কণ্ঠে অসন্তোষের সুর শোনাল। পিওরিয়ার সেই ভদ্রলোককেই না হয় জিজ্ঞাসা কর গিয়ে। তিনি তাঁর অর্ডার দেওয়া ছবিখানা আজ নিয়ে গিয়েছেন। হাওসন্ নদীর দৃশ্য নিয়ে তিনি আর একখানা ছবি আঁকবার জন্যেও বলে গিয়েছেন। আজ বিকেলে কখন তুমি হাত পুড়িয়েছ, ডেল?

পাঁচটা হবে। ক্ষুণ্ন-স্বরে ডিলিয়া বলল, ইস্ত্রি—মানে মাংসটা ঠিক ঐ সময়েই উনুন থেকে নেমেছিল কি না! জেনারেল পিঙ্কনির সঙ্গে তোমার পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, জো, কারণ—

—একটুখানি বস ত এখানে ডেল, বলেই জো তাকে টেনে এনে কোচে বসিয়ে দিল। নিজেও তার পাশে উপবেশন করল, তারপর স্কন্ধের ওপর একখানা হাত রাখল। গত দু'সপ্তাহ ধরে তুমি কি করছিলে আমায় বল দেখি, ডেল!

ডিলিয়া কয়েকটি মুহূর্তের জন্য অসীম দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে সম্বরণ করল। একবার কি দু'বার জেনারেল পিঙ্কনির নাম করে ও যেন অস্পষ্টভাবে কি বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিলিয়া মস্তক নত করল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দু চোখ ভরে অশ্রুর প্লাবন নেমে এল।

—আমি কোন ছাত্রীই সংগ্রহ করতে পারি নি। ডিলিয়া অবশেষে স্বীকার করল। কিন্তু তুমি ছবি আঁকা ছেড়ে দেবে, আমি এটাও বরদাস্ত করতে পারি নি। টোয়েন্টি ফোর্থ ষ্ট্রীটে যে বড় লণ্ড্রীটি রয়েছে তাতে সার্ট ইস্ত্রি করার একটা কাজ যোগাড় করে ফেললাম। জেনারেল পিঙ্কনি আর ক্লিমেন্টিনাকে নিয়ে আমি গল্পটা বেশ বানিয়েছিলাম, তাই নয়, জো? ঐ ধোলাইখানার একটা মেয়ে হঠাৎ গরম ইস্ত্রিটা আমার হাতের উপর ফেলে দেয় আর সেই তখন থেকে ঐ খরগোশের কাহিনীটা তৈরী করতে সুরু করে দিয়েছিলাম। তুমি কি রাগ করলে, জো? আমি যদি ঐ চাকরিটা না

নিতাম, তা হ'লে তুমি পিওরিয়ার সেই ভদ্রলোকের কাছে ঐ ছবিগুলো বিক্রয় করতে পারতে না।

—পিওরিয়ার লোক সে নয়। ধীরে ধীরে জো বলল।

—কোথাকার লোক তাতে কিছু এসে-যায় না। ডিলিয়া চোখে-মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়ে বলল। কি ভয়ঙ্কর চালাক ছেলে তুমি, জো! নাও, এবার আমায় একটা চুম্বন কর ত! আচ্ছা, আমি যে ক্লিমেণ্টিনাকে গান শেখাই না, সেটা তুমি কেমন করে ধরতে পারলে, জো?

—না আজকের রাত্রির পূর্ব পর্যন্ত আমি টের পাই নি; জো জবাব দিল, আজ বিকেলেই যে ইঞ্জিন-ঘর থেকে উপরতলার একটা মেয়ের জন্য কিছু ন্যাকড়া আর তেল পাঠিয়ে ছিলাম। গরম ইস্ত্রি লেগে মেয়েটার নাকি হাত পুড়ে গিয়েছে। তখনও কি কিছু বুঝতে পেরেছি। গত দু' সপ্তাহ ধরে আমি ত ঐ লণ্ড্রীর ইঞ্জিনেই কয়লা ঠেলছি।

—তা হ'লে তুমি ছবি—

—আমার ঐ পিওরিয়ার খদ্দের আর তোমার এই জেনারেল পিঙ্কনি সেই একই শিল্পকলার সৃষ্টি। তবে সেটা না চিত্রশিল্প, না সঙ্গীত-কলা।

দু' জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

জো বলল, যখন কেউ কারও আর্টকে ভালবাসে তখন তার কাছে কোন কাজই কঠিন—

কিন্তু ডিলিয়া তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল।

—না, ডিলিয়া বলল, যখন কেউ কাউকে ভালবাসে—

সেই সভ্যতাই স্থায়ী এবং মানুষকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে পারে, মানুষের হিতসাধন করিতে পারে; যাহা সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বাঙ্গীন। ধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প দর্শন প্রভৃতি সকল দিকে লক্ষ্য থাকিলে, যেরূপ সভ্যতার বিকাশ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। মানুষ সত্য চায়, জ্ঞান চায়, মানুষ শক্তি চায়, মানুষ শিব শুভ মঙ্গল চায়, মানুষ আনন্দ শুচিতা শ্রীসৌন্দর্য্য চায়। কোন সভ্যতাতে ইহার কোনটির অভাব হইলে, তাহা অঙ্গহীন, অস্থায়ী, মানবের কল্যাণ-সাধনে অক্ষম।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩০।

প্রণাম

জ্যোতির্ময়ী দেবী

বয়স অনেক হ'ল। তবু যেন কাকে
প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়।
কাকে করি? (সবাই তো বয়সে ছোট।)
(কিন্তু ছোটদেরও তো প্রণাম করা যায়)।
আর মন মাথাটা নীচু করে বেড়ায়
সে করবে প্রণাম।
নদী জল গাছ বন অরণ্য পাহাড়
সর্বত্র রয়েছে তীর্থ ভরা আছে দেবতা ঠাকুরে;
দাঁড়াই। বেড়াই ঘুরে ঘুরে।
জানাই প্রণাম।
শুধু যেন দেখি কিছু যে প্রণাম রয়ে গেছে বাকি।
সেটা কোথা রাখি?
সাধু সন্ত পীর ও ফকির নদ নদী দেশ ও বিদেশ
কত যে ঠাকুর আর কাহিনীও কত অলৌকিক
দেখা শোনা হয়ে যায় শেষ।
কাকে চাই কাকে খুঁজি প্রণামের বোঝা ভরা ভারি
মাথা নিয়ে

সে তো দেবদেবী তীর্থ নয় দেবালয় নয়।
মন্দিরে নেইক তারা। নাই তার মঠ বা আশ্রম।
সে শুধু পথিক
মানুষের চেয়ে বড় তুমি আমি ওরা তারা
সকলের চেয়ে বড়
সে ঘুরেছে পথে পথে কখনো বিবেকানন্দ নাম।
কখনো বিনোবা নামে পথ চলে কার লাগি চায়
দান গ্রাম।
দেশ ছেড়ে কখনো সে বনবাসী বনচর অজানা
লোকের সাথে নেয় বনবাস।
দণ্ডকের ঘোর বনে ভেরিয়ার এলুইন নাম ছিল তার।
আবার একদা আফ্রিকার জঙ্গলেতে রচিল আবাস
নাম ছিল এলবার্ট সোয়াইটজার।
জানত না মিরাক্‌ল। কিন্তু অলৌকিক,
পৃথিবীর সে এক পথিক।
ভারি মাথা ভরা মন আশ্চর্য্য নয়ন
রেখে যায় সেখানে প্রণাম।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বেসুরো বেতার—

দেশের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকার চরম অগ্রগতি-উন্নতি (যথা :—খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, যানবাহন, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি ইত্যাদি) সাধন করিয়া আমাদের 'দেশকাওয়াস্তে-অর্পিতপ্রাণ কংগ্রেসী কর্ত্তারা এবার ভারতীয় বেতারের প্রতি তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়াছেন। প্রস্তাব হইয়াছে যে, লোকশিক্ষার (??) কারণে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত এই দেশের জন্য অনতিবিলম্বে টেলিভিসনের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এবং বিদেশ হইতে আপাতত দশ হাজার টেলিভিসন সেট আমদানী করার একান্ত প্রয়োজন—(প্রতিটি-সেট প্রায় ৯০০৲ শত টাকা মূল্যে কিন্তু ডিভ্যালুয়েশনের পর প্রতিটি সেটের দাম পড়িবে কমপক্ষে ৯০০৲+৪৬০৲ টাকা !!)। বলা বাহুল্য, এই সামান্য মূল্য দিয়া দেশের শতকরা ৯৫ জন লোকই পরমাগ্রহের সহিত টেলিভিসন সেট কিনিতে পারিবে এবং আমদানী করা ১০,০০০ টেলিভিসন সেট নিশ্চয়ই দশ ঘণ্টার মধ্যেই বিক্রয় হইয়া যাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ কাহারও থাকিতে পারে কি?

এই প্রসঙ্গে এ দেশের মামুলি রেডিও সেটের চলন এবং চলন কতটা দেখিতে দোষ কি? ভারতে ১৯৪৭ সালে প্রতি শত লোকের মধ্যে দুইটি করিয়া রেডিও সেট ছিল। বর্ত্তমানে এই হার শতকরা ০·৮-এ নামিয়াছে। এশিয়ার অন্তত ১৩টি ক্ষুদ্রতর দেশেও, এমন কি ইরাণ এবং উত্তর কোরিয়াতেও শতকরা ৬ জনের একটি করিয়া রেডিও সেট আছে। ১৯৫৫ সালে এ-দেশের ৪০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৮১ হাজার রেডিও সেট বিক্রয় হয়। বর্ত্তমানে শতকরা কয় জনের রেডিও সেট আছে বলা শক্ত।

দেশীয় সরকার রেডিও মারফত জনসংযোগের কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন, কিন্তু রেডিও শিল্পের পত্তন এবং উন্নতির জন্য কিছু ত করেনই নাই—বরং বিপরীত ব্যবহারই এ যাবত করিয়া আসিতেছেন বিশেষ করিয়া দেশে সস্তা সেট নির্ম্মাণ বিষয়ে।

১৯৫৮ সালে এদেশে ২০টি বৃহৎ এবং ১৮৮টি ক্ষুদ্র রেডিও অ্যাসেম্ব্লী ইউনিট ছিল, এবং ইহাদের যুক্ত প্রচেষ্টায়—হইতে পারিত সাড়ে তিন লক্ষ সেট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেট্ নির্ম্মিত হয় ২৩৫০০০ মাত্র। রেডিও অ্যাসেম্ব্লী ইউনিটগুলির প্রধান আস্তানা ছিল কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং দিল্লী।

বর্ত্তমানে স্থানীয় ছোট ছোট রেডিও নির্ম্মাতারা সামান্য পরিমাণে লোকাল সেট প্রস্তুত করিয়া থাকেন—কিন্তু নানা প্রকার সরকারী অনর্থকর বিধি-নিষেধের কারণে ইঁহারা মাল-মসলার অভাবে সদাই বিব্রত। সদয় সরকার ইহাদের প্রতি সদয় ত নহেন—উল্টা নানা-ভাবে জ্বালাতন করিতেই সদা-প্রয়াসী, বিশেষ করিয়া পোষ্টাল দপ্তরের সরকারী ছোট-বড় কর্ম্মচারী এবং অফিসারের দল।

১৯৬০ সালে বিদেশ হইতে রেডিও সেট আমদানী একেবারে যখন বন্ধ করা হইল—সেই সময় দেশীয় রেডিও নির্ম্মাতাদের মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগে যে, এবার হয়ত দেশীয় রেডিও শিল্পের সবিশেষ উন্নতি হইতে পারে—এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় শেষ নাগাদ কমপক্ষে দশলক্ষ সেট দেশে নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু হিসাবে দেখা গেল (১৯৬৪-৬৫) বৃহৎ রেডিও নির্ম্মাতারা বাজারে দিলেন ৪৫০,০০০ সেট এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে পাওয়া গেল প্রায় ৩ লক্ষ সেট। আশা আছে এ বৎসর উৎপাদন হয়ত ৮ লক্ষ হইবে। কিন্তু এ লক্ষ্যেও পৌছিলে রেডিও উৎপাদন মূল লক্ষ্য হইতে শতকরা ২০ ভাগ কমই থাকিবে। সরকারের আশা ১০৫৲ টাকা মূল্যের (বাৎসরিক লাইসেন্স ৭॥০ টাকা) সেটে বাজার ছাইয়া যাক এবং ভারতের সকল রাজ্যে তথা পশ্চিম বাঙ্গলার ঘরে ঘরে একটি করিয়া রেডিও সেট দেখা যাইবে যাহাতে লোকে মন্ত্রী এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতা-মহানেতাদের প্রচারিত বিবিধ হিতবাণী সদা-সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া চিত্তে শান্তি এবং মনে বললাভ করিতে পারে। একথা বলিতেছি এই জন্য যে, ভারতীয় রেডিও

প্রচারের মূল বিষয়বস্তু সরকারী কর্তা তথা কংগ্রেসীদের গুণাবলী এবং ব্যক্তিগত সংবাদ প্রচার। রেডিও কর্মচারীদেরও প্রধানতম কর্তব্য সরকারী সকল ক্রিয়া-কর্মের নির্জ্জলা প্রশংসা এবং সমর্থন (অর্থাৎ সর্ব্বজনবোধ্য চলতি কথায় লোকে যাহাকে বলে ধামা ধরা)।

সরকারের আশা মত ১২৫৲ মূল্যের রেডিও সেট যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হইলেও—পশ্চিমবঙ্গের শতকরা কয়জন লোক এই মূল্য দিয়া সেট কিনিতে পারিবে? প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় জাপানে ২৫ টাকা মূল্যের সেট অজস্র প্রস্তুত হয়—এবং ঐ দেশের ঘরে ঘরে রেডিও সেট আছে।

দেশে মামুলী রেডিও সেটের যথোপযুক্ত বিলি এবং নির্ম্মাণ ব্যবস্থা না করিয়া দেশের টাকার এই অবনমিত মূল্যের সঙ্কটকালে কিছু সংখ্যক বিত্তশালী শেঠ-শঠের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে হঠাৎ টেলিভিসনের প্রতি এত মমত্ব উথলিয়া উঠিল কেন জানি না। তবে মনে পড়ে, শ্রীমতী গান্ধী তাঁহার বেতার মন্ত্রিত্বকালে এদেশে টেলিভিসন প্রবর্ত্তনের পরম উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

দেশে টেলিভিসন প্রবর্ত্তন কারণে সরকারী এবং কংগ্রেস কর্তামহলে এত উৎসাহের একটা কারণ আমাদের মনে হইতেছে। কর্তারা এখন আর কেবল-মাত্র রেডিওতে বাণী প্রচার করিয়া তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের মনের গহনের গোপন ইচ্ছা—রেডিও-শ্রোতারা কর্তাদের বাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে যে-শ্রীমুখ হইতে এত অমূল্য হিতবাণী অহরহ নির্গত হইতেছে—সেই সকল পরম সুন্দর, সুখদ্দর-পরিহিত এবং গান্ধী-টুপীরূপী মুকুট শোভিত, শ্রীবদন সমেত শ্রীঅঙ্গ-গুলিও লোকে অবলোকন করিয়া যুগপৎ কর্ণ এবং চক্ষু সার্থক করুক: দেশের এবং দেশবাসীর জন্য যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অসহ্যকষ্ট পরম সহনীয় বলিয়া বরণ করিয়াছেন, লোকে তাঁহাদের দেখিবার জন্য যে সদা পরম ব্যাকুল—এই পরম গোপন কিন্তু অতীব সত্য সংবাদ তাঁহাদের কে দিল জানি না, তবে যেই দিয়া থাকুক, তাহাকে সাধুবাদ জানাইব! সদা-বিসন্ন-বদন নন্দা, অমিত পৌরুষদীপ্ত ভীমকান্তি জগজীবন রাম, সদা-চিন্তা-ক্লিষ্ট মোরারজী, কন্দর্পকান্তি কামরাজ, অনিন্দ্যসুন্দর বিশালদেহী ক্ষুরবুদ্ধিধর অতুল্য ঘোষ, চির-যৌবন-দীপ্ত প্রফুল্ল সেন (আর নামের লিষ্ট বাড়াইব না) প্রভৃতি নেতা এবং দেশের কারণে 'ফকিরদের' চর্ম্ম-চক্ষুতে দেখিবার মর্ম্মবাসনা এবার সকলের পক্ষেই সার্থকতার পথে অগ্রসর হইতেছে! জয় নেহরু, জয় লালবাহাদুর, জয় কংগ্রেসী জোড়া বলদ! জয় হিন্দী!!

কলিকাতা আকা(ঠ) বাণী

কলিকাতা বেতার সম্পর্কে বার বার একই কটু কথা বলিতে লজ্জা বোধ করি আমরা, অথচ যাঁহাদের লজ্জা দিবার প্রয়াস আমরা করি, তাঁহাদের লজ্জার বালাই নাই, 'লজ্জা' বলিয়া যে কোন কিছু পৃথিবীতে আছে বা থাকিতে পারে, সে বোধ/ধারণাও তাঁহাদের নাই!

কলিকাতা বেতারের পল্লীমঙ্গল নামক আসরটির নাম বদল হইয়াছে সত্য কথা, কিন্তু "গুণের" কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই (নামেতে কি হয় বাপু গুণ যদি থাকে?)! এই অসহ্য অশ্রাব্য আসরটির পরিচালক সেই চিরন্তন এবং সর্ব্ববিদ্যাধর শ্রীমোড়ল মহাশয়। (এই আসরটিকে হরিসভা কিংবা বিলাতি মতে Moral Rearmament Centre বলা যাইতে —M. R. A. পারে)। এই মহাশয় ব্যক্তি যথানিয়মিত তাঁহার বাণী বিতরণ এবং দুইজন চির-প্রণম্য মহামানবের "বাণী" লইয়া অপরূপ এক ভাঁড়ামোর কারবার প্রতি-নিয়ত চালাইয়া যাইতেছেন। যে-কোন বিষয়ে শ্রীমোড়ল তাঁহার লোকহিত প্রচেষ্টার সার্থকতা এবং সাপোর্ট হিসাবে মহাত্মাদের বাণীর ইক বুকনি আসরের অসহায় শ্রোতাদের অপার্থিব কল্যাণের কারণে সদাই বিতরণ করিতেছেন কোন প্রকার কার্পণ্য না করিয়া—এমন কি কৃষি-কথার আসরও বাণী-বিনোদের বাণী-বাণ হইতে রক্ষা পায় না! একটা কথা জানিতে ইচ্ছা হয়—রেডিও কর্তারা কি এই ব্যক্তিটিকে (এবং মজদুর মণ্ডলীর পরিচালক খসখস কণ্ঠ—"শেখরদা") সরকারের ভাল-মন্দ সব কিছুর নির্জ্জলা (এবং বেকুবের মত) প্রশংসা করিবার জন্যই করদাতাদের পয়সায় বেতন দিয়া পালন করিতেছেন? রেডিও-কর্তারা কি জানেন না, সাধারণ লোকে সরকারের বহু প্রশাসনিক ব্যর্থতায় অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে? এ-প্রশ্নের জবাব পাইব না জানি এবং এ কথাও জানি যে, রেডিও-কর্তারাও উর্দ্ধতন কর্তাদের হুকুমমত কাজ করিতেছেন—(করিতে বাধ্য!)। একটি দৃষ্টান্ত দিই। কৃষিকথার আসরে কৃষকদের ফলন বাড়াইবার এবং একই জমিতে বছরে ২।৩ ফসল চাষ করিবার জন্য কৃষকদের অবাস্তব উপদেশের সঙ্গে সার ব্যবহার করিবার পরামর্শ—শ্রীমোড়ল প্রায় প্রত্যহ দিতেছেন—এবং প্রয়োজনীয় সার পাইবার জন্য বি ডি

ও-র শরণাপন্ন হইতে বলিতেছেন। কিন্তু ব্লক-ডেভদের কাছেও কৃষকরা অমূল্য পরামর্শ ছাড়া আর কিছু পায় না শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রেই! শ্রীমোড়লের কথায় মনে হয় দেশে সারের স্তূপ পাহাড় প্রমাণ হইয়া কৃষকদের তুলিয়া লইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। আসলে ব্যাপার ঠিক বিপরীত! দেশে ফার্টিলাইজার যে নাই, তাহা নহে—কি এ-দেশে বিবিধ শ্রেণীর ফার্টিলাইজারের মূল্য সম্পর্কে চাষ-পণ্ডিত মোড়লের কোন ধারণা আছে কি? সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতেছি—

(১) ইউরোপের কৃষক ফার্টিলাইজারের যে মূল্য দেয়, এ দেশে তাহার মূল্য অন্তত তিন গুণ বেশী, ডি-ভ্যালুয়েশনের কল্যাণে এবার অন্তত পাঁচ গুণ বেশী দিতে হইবে।

(২) ক্ষুদ্র পাকিস্তানের দরিদ্র চাষীরা যে-মূল্যে ফার্টিলাইজার পায়, এ দেশের চাষীদের তাহার অন্তত আড়াই গুণ বেশী দিতে হইতেছে—এবার প্রায় চার গুণ দিতে হইবে।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এ দেশের কৃষক জগতের মধ্যে দরিদ্রতম! চাষীদের কৃষির কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এবং আধুনিক কৃষি-যন্ত্রাদির সাহায্য লইবার পরম হিতকর পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে—নিরক্ষর চাষীদের! বিষয়টা যেন অতীব সরল এবং সহজ। ভাল বীজ ব্যবহারের পরম হিত উপদেশও বিপরীত হয়, অথচ আমরা জানি দেশে ভাল বীজ যাহা পাওয়া যায়, তাহা চাহিদার শতকরা ১০·৭৬ ভাগ মিটাইতেও সক্ষম নহে! কীটনাশক ঔষধ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য—কতকগুলি বিলাতী ইন্‌সেক্‌টিসাইডের বিলাতী নামের তালিকা দেওয়া কৃষি-বিশারদ মোড়লের পক্ষে সহজ (কারণ মাঠে নামিয়া তাঁহাকে হাতে-কলমে কাজ করিতে হয় না) কিন্তু কৃষি-কথার আসরের বাহিরে কয়জন চাষী তাহা শুনে এবং শুনিলেও নামগুলি বুঝিতে বা মনে রাখিতে পারে? কীটনাশক ঔষধগুলি বিষাক্ত —বহু চাষী এই সকল ইন্‌সেক্‌টিসাইড ব্যবহার করিয়া বা করিতে গিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করে (প্রাণহানিও ঘটে)। আসরে মোড়লী করিয়া চাষের বিষয় না বোঝা বিষয় সম্পর্কে গবেষণা সেই করিতে পারে, যেখানে বিজ্ঞ ব্যক্তি মূক থাকেন!

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ বিষয় আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, কৃষি-কথার আসরে অখাদ্য-অশ্রাব্য—প্যা-ঘিন-ঘিন-করা ভাঁড়ামোর চাষ মোড়ল ভালই করিতেছেন। নূতন একটি ভাঁড় আসরে উদিত হইয়াছেন—ইহার কণ্ঠস্বর যেমন কর্ণপ্রদাহকারী, ভাঁড়ামোও তেমনি চিত্তদাহী! বিগতকালের 'গোবিন্দ' নামধেয় ভাঁড়টি তবু পদে ছিল, তাঁহাকে বিদায় দিয়া এই নূতন জীবটিকে কোন্ জান্তবালয় হইতে আমদানী করা হইয়াছে জানি না। মোড়লের জন্য যদি মোসাহেব দরকার থাকে, তবে তাহা সরকারী পয়সায় রেডিও-শ্রোতাদের নির্য্যাতীত করিবার কাজে কেন নিযুক্ত করা হইতেছে? এই ভাঁড়টির নাম 'প্রত্যহ'-শিব না হইয়া দ্বিপদী রাসভ হইলেই মানাইত ভাল।

বিচিত্র অনুষ্ঠান (৺পল্লীমঙ্গল আসর) একদিন পরমহংস দেবের বাণী পাঠালোচনা প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর সাধুদের বিষয়ে বহু বহু জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "বুঝেছ—শিব, আজকাল দেশে আর সাধু দেখা যায় না, সেই জন্য সাধু-সঙ্গও আর হয় না—কাজেই হেঁ হেঁ" ইত্যাদি। শ্রীমোড়ল এ কথা বলিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিলেন কি? দেশে এত সব কংগ্রেসী মহাসাধুতেও তাঁহার মন উঠিল না? অবশ্য বিচিত্র অনুষ্ঠানের মোসাহেবদের প্রত্যহই মোড়লরূপী মহাসাধু দর্শন হইতেছে—এই দর্শনের কল্যাণে মোসাহেববৃন্দ মোক্ষলাভের কঠিন পথ অতি সহজ করিয়া লইতেছেন।

বারান্তরে আরও বলিব—বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের 'নব-মন্টেসরী' প্রথায় কি ভাবে শিক্ষিত করা হইতেছে—সেই বিষয়ে।

আকা(ঠ)শ বাণীর সংবাদ প্রচার

গত কিছুকাল হইতে কয়েকজন নূতন মহিলা সংবাদ ঘোষিকা সংবাদ প্রচার করিতেছেন। ইঁহাদের অনেকেরই এখনও কণ্ঠের জড়তা দূর হয় নাই—কণ্ঠস্বরে মনে হয়—ইঁহাদের অন্তত দুইজন এখনও 'খুকিত্ব'সীমা পার হয়েন নাই। সংবাদ প্রচার করা হইতেছে বিদ্যালয়ের ক্লাসে রিডিং পড়ার ষ্টাইলে—যাহা শ্রোতার পক্ষে কর্ণসুখকর হইতে পারে না। তাহার উপর তাড়াহুড়া করিয়া সংবাদ প্রচার (পাঠ?) করিতে গিয়া একজন ঘোষিকা কিছুদিন পূর্ব্বে বেলা একটার সংবাদে বলিলেন—

'শ্রীমতী গান্ধী মার্কিণ রাষ্ট্রকে ভিয়েটকঙ্গে বোমা বর্ষণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন!"

সংবাদে সংবাদের বিশেষ কিছুই থাকে না, থাকে শ্রীমতী গান্ধীর কথা—কি বলিলেন, কি বলিতে পারেন, কোথায় যাইবেন, কেন যাইবেন, কবে যাইবেন ইত্যাদির সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ভ্রমণ তালিকা এবং তাঁহাদের

অমূল্য ভাষণের সংক্ষিপ্তসার (চুম্বক নহে।) বি-বি-সি এবং অন্যান্য দেশের সংবাদ প্রচার রেডিও-কর্তারা শুনেন কি না জানি না। এমন কি পাকিস্তানী সংবাদ বুলেটিন এবং তাহার প্রচার ভারতীয় সংবাদ প্রচার অপেক্ষা হাজার গুণে শ্রেয়। এ. আই. আর কি সরকারী 'মোসাহেব' হইয়াই থাকিবে চিরকাল?

খাস বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর হাল—

পত্রান্তরে 'জনৈক 'বাঙ্গালী' একটি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন :—

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে চাকুরির ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশবাসী নিয়োগের বিষয়ে বাধা-নিষেধ রয়েছে কিন্তু উপরোক্ত প্রদেশগুলি দ্বারা পরি-বেষ্টিত পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ বাধা নেই। বাংলা দেশের প্রহরাহীন দরজা সকলের জন্য যে কেবল উন্মুক্ত তাই নয়; চাকুরি, ব্যবসায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশবাসীরা সাদরে অভ্যর্থিত। ফলে

(১) বাংলা দেশে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি, (২) বাঙ্গালী বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, (৩) বাংলায় উপার্জিত অর্থ প্রদেশের বাইরে প্রেরণের ফলে বাংলা দেশে মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশবাসীদের নিকট হতে পশ্চিম-বঙ্গে যথাযথ কর আদায় করা সম্ভব হয় না। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাঙ্গালীর আর্থিক সঙ্গতির অধোগতি এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি। বিহার প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে চাকুরি ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ হতে ৮০ ভাগ নিজ প্রদেশের অধিবাসী নিয়োগের নির্দেশ রয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ-তায় দেখা গেছে আরও অধিক পরিমাণে স্বপ্রদেশবাসী-গণকে কর্ম্মে নিযুক্ত করবার জন্য ঐ সকল রাজ্যে নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। বাংলা দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে মূল-কারখানায় বাঙ্গালীর স্থান অতি নগণ্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় এবং কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শিল্পাঞ্চলগুলিতে বাঙ্গালীর সংখ্যা এমন দ্রুতহারে হ্রাস পাচ্ছে, বাংলা ভাষার এরূপ হাল হয়েছে যে, ঐ সকল স্থানকে বাংলা দেশের অংশ বলে চেনা দুঃসাধ্য। পরিবহন বিষয়েও অবাঙ্গালীর অত্যধিক আধিপত্য সুস্পষ্ট! এই অবস্থা চলতে থাকলে বাঙ্গালী তথা বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ কি? বাঙ্গলার রাজ-নৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের অনুগামী যুবকগণ—যাঁরা আমেরিকার সামান্য কৃপাভিক্ষা লাভ করে অসীম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন, অথবা ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে কলকাতায় চেয়ার-টেবিল ভেঙ্গে আসবাবপত্র তছনছ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতিকে এই দুর্দ্দশা হতে মুক্ত করার মধ্যে তাঁরা কি মানবতার কণামাত্র খুঁজে পান না?—বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কল্যাণ সাধন কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলে মনে করেন না?—

পূর্ব্বে আমরা ঠিক এই বিষয়ে বহু অশ্রুমোচন করিয়াছি কিন্তু ফললাভ কিছুই হয় নাই। এ বিষয়ে আরো বহু কিছু বলা যায়—যেমন :

কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র যে সকল বিদেশী এবং অবাঙ্গালী কলকারখানা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে—সেই সব কলকারখানা এবং ব্যবসায় সংস্থা-গুলিতে বাঙ্গালী নিয়োগ অতি সীমিত। কলিকাতার বড় বড় যে-সব বিদেশী সংস্থা আছে, এবং যেখানে ক্রমশ 'ইণ্ডিয়ানাইজেনসন' হইতেছে সেখানে বাঙ্গলার বাহির হইতে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, উত্তর প্রদেশী প্রভৃতি আমদানী করিয়া উচ্চ পদগুলি (অফিসার কেডর্) পূর্ণ করা হইতেছে এবং এই সব নব-আমদানী-করা অফিসারদের শতকরা ৯৫ জনই, একেবারে যাহাকে বলে, 'নভিস'—আনকোরা কাঁচা। ইঁহাদের প্রধান কাজ বাঙ্গালী কর্ম্মীদের (যাহাদের মধ্যে অনেকেই অফিসার হইবার অতিযোগ্য) ক্রমাগত বিব্রত করিয়া বিতাড়িত করা এবং তাহার পর নিজ নিজ রাজ্য হইতে আত্মীয়-স্বজন আমদানী করিয়া শূন্য পদগুলি পূর্ণ করা। ইঁহাদের আর একটি পুণ্যকর্ম্ম বাঙ্গালী ডিলার-ডিস্ট্রিবিউটারদের হটাইয়া সেই স্থানে অবাঙ্গালী ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটার নিয়োগ। রেডিও, রেফ্রিজারেটার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি কারবারগুলিতে ইহা সবিশেষ লক্ষ করা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে অটোমোবাইলের বাজার হইতে বাঙ্গালী প্রায় বিতাড়িত—এবং এই বাজারের মালিকানা (শতকরা ৯৯ ভাগ) রাজস্থানী, পাঞ্জাবী গুজরাটিদের হাতে। এখানে দু'চারজন বাঙ্গালী বিক্রেতা এবং সাব-ডিলার মাত্র পাওয়া যাইবে। প্রা[illegible] সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাইকারী ব্যবসা (শতকরা শত ভাগই) অবাঙ্গালী শেঠ-শঠদের কব্জায়! বাঙ্গালী খুচরা দোকানদারদের রাধাবাজার ক্যানিং স্ট্রীট, বাগড়ী মার্কেট প্রভৃতি স্থানের অবাঙ্গালী পাইকারদের নিকট পয়সা ট্যাঁকে করিয়া জোড় হস্তে কৃপাপ্রার্থীরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ণা দিতে দেখা যাইবে। বলা বাহুল্য ন্যায্য মূল্যে হয়ত সামান্য মাল কেহ কেহ এখানে পাই[illegible] থাকেন, কিন্তু বেশী বা প্রয়োজনমত মাল পাইতে হইলে পাইকার-আড়তদারদের বাঁ-হাতে বেশ কিছু সেলা[illegible]

অবশ্যই দিতে হইবে। বড়বাজার অঞ্চলে অনাচার বন্ধ করিবার চেষ্টা করাতে—স্থানীয় থানার বড় দারোগাকে বদলী করা হইয়াছে মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে। (কলিকাতা পুলিস তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও, দেখা যাইতেছে, অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের অনাচার করিবার দাবি মানিয়া লইতে হয়।)

প্রজাপালক সরকারের কনট্রোল-মারের ফলে বাঙ্গালী মুদী-দোকান, বিশেষ করিয়া ছোট দোকানগুলি আজ ঝাঁপ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে, অথচ এই কলিকাতা শহরেই এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র অবাঙ্গালী মুদীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি-পথে। কেন এমন হইতেছে?

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও, পরাধীনতার আমলে, বাঙ্গালী সর্ব্ববিধ কারবারে প্রতিষ্ঠালাভ করে সবিশেষ, কিন্তু এই স্বাধীনতার আমলে বাংলা দেশে বাঙ্গালী এমনভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে পরাজিত এবং বিতাড়িত হইতেছে কেন? অনেকে বলিবেন "বাঙ্গালীর উদ্যোগ নাই, বাঙ্গালী কর্ম্মবিমুখ, বাঙ্গালী অল্পেই কাতর" ইত্যাদি। স্বীকার করিলাম, কিন্তু স্বাধীনতার ১৬।১৭ বছরে বাঙ্গালীর এ-দুরবস্থা হইল কেন, কোন্ বিশেষ কারণে, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার এবং অবস্থার প্রতিকার কিসে, কোন্ পথে হইতে পারে, তাহাও বাহির করা একান্ত প্রয়োজন। একটা প্রধান কারণ বলা যায়, সাধারণ বাঙ্গালী (শতকরা ৮৫ জনই) সপ্তাহে দুই বেলাও ভর-পেট খাইতে পায় না, আর যাহা খায় বা খাইতে পায়, তাহা দেহের পুষ্টিকর খাদ্য নহে—জঠর-বিবর ভরাট করিবার ভুষি মাল মাত্র! পথে-ঘাটে চোখ মেলিয়া দেখিলে—এ রাজ্যে যুবক নাই বলিয়া মনে হইবে। যাহাদের মনে হইবে যুবক, তাহারা আসলে প্রায়-বৃদ্ধ। বাঙ্গালী যুব সমাজের এ অবস্থা আজ কে করিল, কোন্ পাপে শতকরা ৮৫ জন রাজ্যবাসীর এ প্রায়শ্চিত্ত? পাপ করিল কাহারা—আর শাস্তিভোগ করিতেছে কাহারা?

বেশী বলার প্রয়োজন নাই, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গ আজ বাঙ্গালীর রাজ্য নহে, এরাজ্যে অবাঙ্গালীর সর্ব্ব-প্রাধান্য এবং রাজ্য সরকার তথা কংগ্রেস কর্ত্তারা এ প্রাধান্য নতমস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচালনায় একটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক আছে, কিন্তু অবাঙ্গালী শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী এই ব্যাঙ্কটিকে পরিহার করিয়া চলেন, তাঁহাদের পশ্চিমবঙ্গের সকল ব্যাঙ্কিং কারবার অবাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে! ফলে বাঙ্গালী পরিচালিত কয়েকটি ব্যাঙ্ক একান্ত বাধ্য হইয়াই অবাঙ্গালী বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির সহিত যুক্ত হইতেছে। বিগত দুই-তিন বছরে ইহার কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। অবাঙ্গালী শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী এরাজ্যে ব্যবসা চালাইয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটিবেন—কিন্তু তাহা বাঙ্গালীকে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত করিয়া! ইঁহাদের মতে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিলে বোধ হয় তাহার মূল্যমান কমিয়া যাইবে এবং এখানে গচ্ছিত টাকার সর্ব্বভারতীয় আদান-প্রদানও ঠিকমত হইবে না।

কেবল ব্যাঙ্কিং সম্পর্কেই নহে, কলিকাতার পুরাতন, এবং প্রখ্যাত এটর্নি কার্মগুলিও আজ লুপ্ত হইবার পথে। কলিকাতায় গত কিছুকাল হইতে কয়েকটি অবাঙ্গালী এটর্ণি সংস্থা চালু হইয়াছে, অবাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া রাজস্থানী-ব্যবসায়ী এবং অন্য অনেকে এই সকল অবাঙ্গালী এটর্ণি ফার্মের ক্লায়েন্ট। এখন ইঁহারা ভুল করিয়াও বাঙ্গালী এটর্ণি বাড়ীতে যাইবেন না, অথচ মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতায় বাঙ্গালী এটর্ণি ছাড়া অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের কাজ চলিত না। এই ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীবর্জ্জনের পূর্ণ প্রকোপ!

ভারত-বিখ্যাত একটি বাঙ্গালী শেয়ার ব্রোকার প্রতিষ্ঠান আছে কলিকাতায়—একদা ভারতে সংঘবদ্ধ সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের কাজ, অন্যান্য অবাঙ্গালী শেয়ার ব্রোকারদের সহিত, এই প্রতিষ্ঠানটি করিত সমানভাবে। কিন্তু গত দু'-চার বছর হইতে দেখা যাইতেছে—দেশের এত নূতন নূতন লিঃ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত লইলেও, শেয়ার বিক্রয়ের কাজ বাঙ্গালী শেয়ার ব্রোকারদের ভাগ্যে প্রায়ই জুটে না—এখানেও বাঙ্গালী বর্জ্জন নীতি অতি সক্রিয়, সতেজ! সর্ব্বক্ষেত্রেই যদি বাঙ্গালীর দাবি এবং সহজ অধিকার এই ভাবে ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর নির্ব্বাণ-মোক্ষ লাভে আর বেশী বিলম্ব হইবে না।

বাঙ্গালীকে বলিবার কিছু নাই। অনাহার, অভাব, অনটন, অসচ্ছলতা, অনুপায় হইয়া বাঙ্গালী আজ অনু-প্রাণিত হইবার শক্তি হইতে বঞ্চিত। বাঙ্গালী নিজেকে অনুচান বলিয়া ভাবে—বর্ত্তমানে তাহার অনুস্পন্দন বোধও নাই! মৃত্যু-সমান এই নিদারুণ অনুপলব্ধির কালো ছায়া কাটাইতে না পারিলে বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে চির অন্ধকার এবং চরম দুর্য্যোগ অবধারিত।

টাকার অবনমন অবনমিত টাকা!

ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া যে সব কংগ্রেসী

নেতা তথা কেন্দ্রীয় মহামন্ত্রী ডিভ্যালুয়েশনের গুণ বর্ণনায় হইয়াছিলেন পঞ্চমুখ, আজ এই বিষম কর্ম্মের বিষফল তাঁহাদের হতচকিত করিয়া নির্ব্বাক করিয়াছে! মাত্র কয়েকজন ব্যতিরেকে প্রায় সকল কংগ্রেসী নেতা (ইঁহাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও দুইজন প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রীও আছেন) মুদ্রা অবনমনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার দিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। আমরা অর্থনীতি বুঝি না। কিন্তু ডিভ্যালুয়েসনের ফলে প্রায় সকল সামগ্রীর যে বিষম মূল্য স্ফীতি ঘটিয়াছে—তাহার কামড়ে সাধারণ মানুষ আজ ছটফট করিতেছে! সকল যন্ত্রণার মধ্যে একমাত্র জ্বালা নিবারণী স্নিগ্ধ মলম—ডিভ্যালুয়েসন সম্পর্কে মহামতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের সান্ত্বনা বাণী! শ্রীঅতুল্য বলিয়াছেন—

"টাকার মূল্যহ্রাসের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ রাখিয়া সরকার যাহাতে জিনিষপত্রাদির মূল্য কমাইয়া রাখিতে পারেন, সেই কারণে কংগ্রেস-কর্ম্মী (এবং সাধারণ জন) যেন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন!"— শ্রীঘোষের বাণীতে আরো আছে:

> "টাকার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। এখন এটাকে মেনে নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।" (কি কাজ)
>
> "যারা অন্ধ তারা অন্য লোককে পথ দেখাতে পারে না (কিন্তু একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি পারে।) কেন টাকার মূল্য হ্রাস করতে হয়েছে, কংগ্রেস-কর্ম্মীদের প্রথমে তাই অনুধাবন করতে হবে। তারপর জিনিসপত্রের দাম কম রাখার জন্য জনসাধারণের যে দায়িত্ব আছে, সংবাদপত্র ও জনসভার মাধ্যমে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের তা জনসাধারণকে বেশ ভাল করে (হাড়েহাড়ে) বুঝিয়ে দিতে হবে।
>
> "জনসাধারণের উপর আমার আস্থা আছে। কংগ্রেস-কর্ম্মীরা যদি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দিতে পারেন তা হ'লে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, টাকার মূল্য হ্রাস করা কেন অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল"!!

মহামানব ঘোষ মহাশয়ের উপরি-উক্ত বাণী শ্রবণের পর ডিভ্যালুয়েসনের বিরুদ্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে কি? কিন্তু ঘোষ মহাশয়—হঠাৎ ডিভ্যালুয়েসন করিবার কারণটা তাঁহার পদাতিকদের উপর ন্যস্ত না করিয়া নিজে বলিলেই কি সব দিক হইতে শোভন সুন্দর হয় না? তবে ঘোষ মহাশয় যদি বলেন "জনস্বার্থের খাতিরে ইহা প্রকাশ করা যায় না", তাহা হইলে আমাদের দাবি অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে হইবে।

বহুকাল যাবৎ জানি অতুল্য ঘোষ মহাশয় সর্ববিধ নীতির ধারক—নির্ব্বাচন-নীতি, ভোট-নীতি, প্রয়োজন-মত তোষণ-নীতি—কংগ্রেস হইতে প্রাজ্ঞ সদস্য বিতাড়ন-নীতি, দলীয় নীতি, পৌর-নীতি—সহজ কথায় নিকট-নীতি এবং দূরনীতি—দুই মিলিয়া তাঁহার চরিত্রকে নীতি-সৌধ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আজ এই সর্ব্বপ্রথম জানিলাম যে, সুকঠিন অর্থনীতি বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান-সীমা হিমালয় সমান এবং গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগর অপেক্ষাও গভীরতর। অত্যধিক বিনয়ী না হইলে তিনি শ্রীশচীন চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী না করিয়া নিজেই এই গুরুদায়িত্ব লইতে পারিতেন এবং তাহা হইলে বেচারা শচীন চৌধুরীকে আজ সর্ব্বসমক্ষে এমন অনাবশ্যক অর্ব্বাচীন সাজিতে হইত না!

বিদেশে ডিভ্যালুয়েসনের প্রতিক্রিয়া

প্রসঙ্গক্রমে ফরাসী দেশের কথা উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স, অ্যালজেরিয়া এবং ইন্দো-চীনের সঙ্গে যখন যুদ্ধে লিপ্ত সেই সময় মার্কিন সরকারের অর্থ সাহায্যের আশায়, মার্কিণ-চাপে ফ্রান্সকে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে হয় বাধ্য হইয়া। ফ্রান্সকে ইহার পর আরো পাঁচবার ডিভ্যালুয়েসন করিতে হয়, কারণ টাকা নীচের দিকে গড়াইতে সুরু করিলে, তাহার শেষ কোথায় কেহ বলিতে পারে না। টাকার মূল্য হ্রাসের ফল মূল্যস্ফীতি এবং এই মূল্যস্ফীতির সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া চীনদেশে দেখা যায়। ১৯৪৬ হইতে ১৯৫০ পর্য্যন্ত, সারাদিন রিক্শ টানিয়া রিক্শওয়ালা দিনশেষে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিত রিক্শ-বোঝাই নোটের বস্তা লইয়া কিন্তু ইহার মূল্য ছিল মাত্র দু'তিন টাকা!

ভারতে দ্বিতীয়বার ডিভ্যালুয়েসন হইল যে দিন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই দেশের বাজারেও টাকার মূল্য অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে! ফলে সাধারণ লোকের প্রাণ রক্ষা করাই প্রায় অসম্ভব হইয়াছে আমাদের এ-দেশেও বিগত কালের চীনের দশাপ্রাপ্ত হইতে বিলম্ব না হইতেও পারে।

ভারতকেও যে মার্কিন-চাপেই ডিভ্যালুয়েসন করিতে হইল, তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই

এ ব্যাপারে ভারত সরকার জনসাধারণের সহিত সঙ্গত ব্যবহার করেন নাই।

আজ ইহাও স্বীকার করা দরকার যে, আমাদের পণ্ডিত রাষ্ট্রবিদদের অবাস্তব পররাষ্ট্রনীতির ফলে ভারতের প্রকৃত বন্ধু বিশ্বে আজ এমন একটিও নাই—যাহার উপর নির্ভর করা যায়। ইহাও সত্য যে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ফলে বিশ্বে ভারতের শত্রুর সংখ্যাই বেশী। কতকগুলি গালভরা ইক্ বুলির দ্বারা এবং গান্ধী মহারাজের আদর্শের কথা যত্রতত্র প্রচার করিয়া বাস্তববাদী বিদেশী রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে good conduct certificate হয়ত পাওয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত পাওয়া যাইবে, কিন্তু এই সব ফাঁকা আওয়াজে কাজের কাজ তথা দেশের কি মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা আমরা বুঝিব না, ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিনোবা ভাবে হয়ত কিছু আবিষ্কার করিলেও করিতে পারেন!

গণ-অভিযোগের প্রতিকার কোন্ পথে—কি ভাবে?

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্র গদকর বলেন, হিংসাত্মক জনবিক্ষোভ কিংবা অহিংস অনশন কোনটিই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভিযোগ জানাইবার পন্থা হইতে পারে না—সঙ্গতও নহে। তিনি এবং অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন শান্তিপূর্ণ এবং সংবিধানসম্মত বহু উপায় আছে, যাহার দ্বারা জনগণ তাহাদের ন্যায্য অভিযোগের প্রতিকার সরকারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে—এবং পারা উচিত। শ্রীগদকর এবং তাঁহার মত আইনজ্ঞ প্রবীণজন—এই মত প্রকাশ করিবার সময় নিশ্চয়ই এমন কোন গণতন্ত্রের কথা স্মরণ করেন, যেখানে জনতার অভিযোগ এবং ন্যায্য দাবি সরকারের নিকট পৌঁছিবার পর—তাহার দ্রুত প্রতিকার ব্যবস্থা আছে এবং অযথা বিলম্ব না করিয়া সেই ব্যবস্থা দ্বারা সাধারণ মানুষের অভিযোগ অপসারণ করা হইয়া থাকে। আমাদের ১৮ বৎসরের এখনও শিশু এই ভারত গণতন্ত্রেও উপরি-উক্ত অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—গত আঠারো বছরের বিক্ষোভের ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখিলে ইহাই দেখা যাইবে যে, এমন অভিযোগের সংখ্যা প্রায় নাই বলিলেই চলে যাহার প্রতিকার আদায় করিতে জনগণকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথ ত্যাগ করিয়া—শেষ পর্যন্ত পথে বিক্ষোভের অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছে বাধ্য হইয়াই। আমাদের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় বিষণ্ণবদন নন্দা—জন-বিক্ষোভের মড়কে ভীত-চিন্তিত হইয়া ইহা দমন করিবার দাওয়াই অনুসন্ধান করিতে অতি ব্যস্ত হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নিরস্ত্র জনতার অমোঘ অস্ত্র হিসাবে অনশনকে রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যবহার করেন প্রথম ম্যাক্সুইনী এবং তাহার বহু পরে এ-দেশে গান্ধীজী। ঐতিহাসিক পটভূমিকা আজ অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য। রাজনৈতিক অনশনকে অদ্যকার শাসকরাও পরোক্ষে জবরদস্তি বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু যেখানে অন্য সমস্ত পথ বন্ধ কিংবা ব্যর্থ সেখানে অনশনে প্ররোচনা দেবার দায়িত্ব কি শাসক-গোষ্ঠী অস্বীকার করিতে পারেন? জওহরলাল নেহরুর মত ডেমোক্র্যাটকেও অন্ধ্ররাজ্যে গঠনে সম্মত করাইতে পট্টি শ্রীরামুলুকে অনশনে প্রাণ দিতে হইয়াছে। সন্ত ফতে সিং আমরণ অনশনের সঙ্কল্প না লইলে পাঞ্জাবী সুবার ভবিষ্যৎ কি হইত তাহা শ্রীমতী ইন্দিরাই বলিতে পারেন। সুতরাং অনশনকে জবরদস্তির অস্ত্র হিসাবে যখন আমরা নিন্দা করিব তখন আমাদের এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিযোগ জানাইবার অধিকার স্বীকৃত হইলেও তাহার দ্বারা সমস্যার প্রতিকারের খুব বেশী দৃষ্টান্ত সরকার স্থাপন করিবার সুযোগ দেন নাই। শ্রীগজেন্দ্র গদকর এই দুর্লক্ষণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহকে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে যে, হিংসাত্মক বিক্ষোভ প্রদর্শন কিংবা অনশনের মত নাটকীয় পদ্ধতি ছাড়া অভিযোগ জানাইলে তাহা সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করে না, এমন ধারণা যেন জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া না বসে। কার্য্যত এই ধারণার ফলেই ভারতবর্ষে আজ প্রতিটি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বিক্ষোভ, সত্যাগ্রহ, অনশন এবং সরকারী আপিস ও সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সবের পিছনে রাজনৈতিক দলের প্ররোচনা থাকিতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক উপায়ে অভিযোগ প্রতিকারের ন্যায্য পথ যদি সঙ্কুচিত হয় অথবা দীর্ঘ-বিলম্বিত হয় তাহা হইলে এই সোজা রাস্তায় জনসাধারণকে নামিতে কি খুব বেশী রাজনৈতিক প্ররোচনা দরকার? খাদ্যবস্ত্রের দাবি হইতে সুরু করিয়া সীমানাবিরোধ মীমাংসা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রশ্নেই ভারতবর্ষ আজ বিক্ষোভের বারুদ স্তূপে পরিণত। ইহা হইতে মুক্তির পথ, গণতান্ত্রিক উপায়ে অভিযোগ প্রকাশ এবং অনতি-

বিলম্বে তাহার প্রতিকারে সরকারের সহযোগিতামূলক সম্মতি। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের এই রীতিই সর্ব্বত্র (ভারত ছাড়া) স্বীকৃত। শ্রীগজেন্দ্র গদকরও বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্রে অথবা জনসভার মারফৎ জনমতের যে অভিব্যক্তি হয় তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া গণতান্ত্রিক সরকারকে সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহা হইলে বিক্ষোভ বা অনশনের দ্বারা জনসাধারণকে অভিযোগ প্রতিকার পথ সন্ধান করিতে হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গেও বিগত কিছুকাল হইতে জনবিক্ষোভ এবং গণ-আন্দোলনের মড়ক লাগিয়াছে, যাহার ফলে একদিকে যেমন জন-জীবন বিঘ্নিত—একদিকে তেমনি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাও (যতটুকু আছে) প্রায় বানচাল হইতে চলিয়াছে।

এ কথা সত্য যে, জনবিক্ষোভ সৃষ্টি না করিলেও বিশেষ দু'-চারটি বামপন্থী দল ঐ সব বিক্ষোভের পূর্ণ সুযোগ লইয়া ফায়দা উঠাইতে সদা-তৎপর। জন-বিক্ষোভ এই সকল দলের কর্ত্তাদের কাছে সদা-আদৃত—কারণ বলিবার দরকার নাই।

জন-বিক্ষোভ দমন করিতে সরকারী চিরকেলে পুলিসী এবং মিলিটারী দাওয়াই অধুনাকার অবস্থায় বেকার—কেবল বেকারই নহে ইহা দ্বারা রোগের বিস্তৃতিও সহজেই ঘটে—এ কথা মনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে বলা কর্ত্তব্য যে বিক্ষোভের সুযোগে সর্ব্ব-প্রকার নষ্টামি এবং গুণ্ডামী দমন দরকার, সকল সুস্থমতি লোকের পূর্ণ সমর্থন সরকার এ বিষয়ে লাভ করিবেন এ আশা আমরা করি।

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যে ঋষিকল্প পুরুষের পুণ্যচরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে সত্যবাক্ ও সত্যানুসন্ধিৎসু সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে লিখিয়াছেন—"তিনি সততা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা মানুষের মত মানুষ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জ্ঞানী সাধু পুরুষের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি—সমস্তই তাঁহার ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি বুদ্ধিমান ও বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন।"(১) সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"তিনি শত শত পরিবারের অবৈতনিক চিকিৎসক ছিলেন; তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, নিঃস্বার্থ চিকিৎসাব্রতে যে পরিমাণ অর্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও বিপুল। তাঁহার ন্যায় যশস্বী ও ত্যাগী চিকিৎসক একাধারে অনায়াসলভ্য নহে।"(২) ইহা কেবল অধ্যক্ষ মহাশয়ের একার কথা নহে, অগণিত কণ্ঠে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়—"প্রাণকৃষ্ণবাবু গরীব রোগীদের মা বাপ ছিলেন।" বিনা ভিজিটে তিনি যে কত রোগীর চিকিৎসা করিতেন, তাহার সীমা-সংখ্যা ছিল না। নিরপেক্ষ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্যস্থানে লিখিয়াছেন—কলিকাতা ও বঙ্গের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের চিকিৎসা ত প্রীতিবশতঃ তিনি করিতেনই, কলিকাতা ও মফস্বলের বিস্তর গরীব লোকের চিকিৎসাও তিনি সাগ্রহে বিনা পারিশ্রমিকে করিতেন।"(৩) স্বল্প কথায় বলা চলে—চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকেই ত্যাগ ও সেবার সুরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভোগাপেক্ষা ত্যাগ ও সেবার আনন্দই তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিত বেশী। উপার্জ্জনের লোভে নহে, আর্ত্ত-সেবার সুযোগ মিলিবে বলিয়াই তিনি ডাক্তারী পড়িয়াছিলেন। যে রোগার্ত্তটিকে সেবা করিতে গিয়া তাঁহার এই সংকল্পের উদয় হয়, সে বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

ডাঃ আচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ সালের ২৫শে আগষ্ট। এই সালটি বঙ্গদেশের পক্ষে ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। কেননা বঙ্গের বহু প্রতিভাধর মনীষী—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, সুসাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার, লব্ধযশাঃ পণ্ডিত বিজয়কুমার মজুমদার, বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস প্রভৃতি এই সালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সালেই রচিত হইয়াছিল মহাকবি মাইকেলের অমর কাব্য "মেঘনাদ বধ"। আর এই বিশিষ্ট বর্ষেই ভূমিষ্ঠ হন মহাপ্রাণ প্রাণকৃষ্ণ, পাবনার অতি-নিঃস্ব এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। পরিবারটি এতই নিঃস্ব ছিল যে, সেদিন হয়ত কেহই তাহার সংবাদ রাখে নাই, একটি হৃদয়ও হয়ত আনন্দে উৎফুল্ল হয় নাই। কিন্তু যেদিন তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন, সেদিন যেন শোকের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল অগণিত গুণমুগ্ধ জ্ঞানীগুণী। সকলেই শোক-সন্তপ্ত, সকলেই স্বজন-বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত। আর প্রায় সব সংবাদপত্রই প্রশংসায় হইয়াছিল পঞ্চমুখ!

এই নবজাতকের পিতার নাম হরেকৃষ্ণ আচার্য্য, আর মাতার নাম বিন্দুবাসিনী দেবী। তাঁহার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল, কিন্তু সে খুব অল্প বয়সেই মারা যায়। তাঁহার পিতৃদেবও বেশীদিন জীবিত থাকেন নাই। যখন তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ এবং তাঁহার মাতার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর, তখনই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বহুদিন তিনি রোগে শয্যাগত থাকায়, বাটির কয়েকটি ভাল আমগাছ এবং ঘটি-বাটি তৈজসাদির সমস্তই, একে একে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুকালে একখানি জীর্ণ কুটীর ছাড়া, তিনি আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং সহায়-সম্বলহীন পিতৃহারা প্রাণকৃষ্ণ চরম দৈন্য-

(১) "প্রবাসী" পত্রিকা, আষাঢ় মাস, ১৩৪৩ সাল।
(২) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক—১২৪ পৃ।
(৩) "প্রবাসী" পত্রিকা, আষাঢ় মাস, ১৩৪৩ সাল।

দশা হইতে কি করিয়া মানুষের মত মানুষ হইয়াছিলেন—সত্যই তাহা চিন্তনীয় এবং শিক্ষণীয়! তথ্যনিষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আচার্য্য মহাশয় যদি আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া গিয়া থাকেন, কিংবা যদি তাঁহার ডায়েরী থাকে, তাহা হইলে তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।"(৪) অন্য এক মনস্বী শশিভূষণ বসু মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"দরিদ্র জ্ঞান-পিপাসু যুবকদিকের নিকট ডাঃ আচার্য্যের জীবনী আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকিবে। যদি কোন সুযোগ্য ব্যক্তি ডাঃ স্মাইলসের (Dr. Smiles) ন্যায় আমাদের দেশের স্বাবলম্বী পুরুষদের জীবনী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নাম তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিবেন। এইরূপ পুস্তক বাংলা দেশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর হইবে।"(৫) মহাজনদের ঐ সকল উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হয়, এইরূপ আদর্শ চরিত্রের পঠন-পাঠন দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীর্ণ ঘরখানি আরও জীর্ণ হইয়া পড়ে। আর ঘরের বেড়ার অবস্থা ত হইয়াছিল অত্যন্ত শোচনীয়। স্থানে স্থানে ভাঙ্গা এবং জীর্ণ চটে ঢাকা। একটু জোর বাতাসেই বুঝি বা খসিয়া পড়ে। তখনও পাবনাতে আধুনিক সহর গড়িয়া ওঠে নাই। চারিদিকে কেবল বনবাদাড় ও খানা-ডোবায় ভরা। সাপ, শিয়াল, শুকরের প্রিয় আবাস। হিংস্র ব্যাঘ্রেরও অভাব ছিল না। অনেক নিশীথে বাড়ীর আঙিনাতেও তাহার শুভাগমন হইত। একদিন শেষ রাত্রে এক ব্যাঘ্র-পুঙ্গব সেই ভাঙ্গা বেড়ার পাশে বসিয়া সরোষে গর্জ্জন আরম্ভ করিল। কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন! পুত্রদ্বয় সভয়ে জাগিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মাতাই বা কি করিবেন? কেবল মনে মনে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। এরূপ নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া হিংস্র ব্যাঘ্রের প্রাণেও হয়ত দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল; তাই সে এত সহজ শিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্য চেষ্টায় অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন পাবনায় অত্যল্প বসতি ও বনবাদাড়ে ভরা থাকায়, শীতকালে দারুণ শীত পড়িত। কিন্তু সেই দুরন্ত শীতেও একখানিমাত্র দোলাই ছাড়া পুত্রদের শীত নিবারণের অন্য কিছুই ছিল না।

পাঁচ বছর বয়সে শিশু প্রাণকৃষ্ণের 'হাতে খড়ি' হয়। পিতা আঙ্গিনায় খুব বড় করিয়া "ক" লিখিয়া পুত্রকে তদনুরূপ লিখিতে বলিলেন। কিন্তু পুত্র ঠিকমত তাহা লিখিতে না পারায় তাহার গণ্ডে এমন চপেটাঘাত করিলেন যে, পুত্র তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর কবিরাজ ডাকাইয়া তাহার সংজ্ঞা ফিরাইতে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর কোনদিন একাহারে, কোনদিন বা অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটিতে লাগিল। এই দারুণ কষ্টের ভিতরেই ছোট ভাইটিও একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। তখনও তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় নাই।—অকাল মৃত্যু ও অভাবের তাড়নায় একেবারে অস্থির। অবশেষে এক পণ্ডিতের করুণায় তাঁহারই বাংলা স্কুলে, ৮।৯ বছর বয়সে, ফ্রি ভর্ত্তি হন; এবং অনেক কষ্ট ও অসুবিধায় পড়াশুনা করিয়া, কয়েক বছর পরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া চারি টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

তদনন্তর এক প্রতিবেশীর সাহায্যে ইংরাজী হাই স্কুলে বিনা বেতনে ভর্ত্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে পুস্তক কিনিতে না পারায় পড়ার খুব ক্ষতি হইতে থাকে। সন্ধ্যায় সহপাঠীদের নিকট হইতে বই চাহিয়া আনিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পাঠ প্রস্তুত করতঃ তাহা ফিরাইয়া দিতেন। কিন্তু অনেক সময় তৈলাভাবে সেরূপ পাঠাভ্যাসেও ব্যাঘাত ঘটিত। একদিন এক বর্ষার সন্ধ্যায় বই লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় দেখিলেন, একটি নীচু খানায় জল জমিয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া পরণের কাপড়খানি খুলিয়া বইগুলি মাথার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, যেমন তিনি সাঁতার কাটিয়া খানাটি পার হইতেছিলেন, ঠিক তখনই শুনিতে পাইলেন অদূরে বাঘের ডাক। ডাক শুনিয়া আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে কোনক্রমে ডোবাটি পার হইলেন। ইহাই তাঁহার পাঠ্য-জীবনের মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস। এখনকার দিনে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখাপড়ার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। শিশুকাল হইতে হাটবাজারও তাঁহাকেই করিতে হইত। ১১।১২ বছরের বালক একমণ ধান বা চাউল বাজার হইতে মাথায় বহন করিয়া আনিতেন।

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, যাহা একবার পড়িতেন বা শুনিতেন, তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। তিনি

(৪) "প্রবাসী", আষাঢ় মাস, ১৩৪৩ সাল।
(৫) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক—৫৫ পৃঃ।

বরাবর ক্লাসের শীর্ষে থাকিতেন এবং অঙ্কও বেশ ভাল বুঝিতেন। কোনদিন অঙ্কের মাষ্টার না আসিলে, তাঁহাকেই ক্লাসে অঙ্ক কষাইতে হইত। এক ছাত্রের পিতা পুত্রের মুখে ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার পড়ার পুস্তক পর্য্যন্ত নাই শুনিয়া অতি মাত্রায় বিস্মিত ও ব্যথিত হন। এবং তিনিই দয়া করিয়া সমস্ত বই, শ্লেট ও পেন্সিল কিনিয়া দিয়া তাঁহার পড়ার পথ সুগম করিয়া দেন। তাঁহার সুযোগ্যা স্ত্রী লিখিয়াছেন—"সযত্নে রক্ষিত সেই শ্লেটখানিতে আমার কন্যা শিশুকালে লিখিয়াছে।"(৬) যাহা হউক এই প্রকারের নানা অভাব-অনটন ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি অষ্টম শ্রেণী হইতে ডবল প্রমোশন লইয়া চার বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পনর টাকার বৃত্তি পান।

তারপর এফ. এ. পড়িবার জন্য তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিয়াই তিনি প্রথম চটিজুতা পায়ে দেন। তৎপূর্ব্বে অর্থাভাবে তিনি জুতা পরেন নাই। মাতা ঠাকুরাণীর জন্য মাসিক খরচ পাঠাইয়া, উদ্বৃত্ত অর্থে তাঁহার মেস প্রভৃতির খরচ কুলাইত না, সুতরাং পাবনাস্থ ছাত্রবন্ধুদের দেওয়া এক তলার একখানি বিনা-ভাড়ার ঘরে তাঁহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু ঘরটি এতই অন্ধকার ছিল যে, দিনেও আলো ছাড়া পড়া চলিত না। তাহার ফলে অল্প বয়সেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খারাপ হইয়া পড়ে এবং চশমা লইতে হয়। যাহা হউক যথা সময়ে তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দেন এবং পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া পঁচিশ টাকার বৃত্তি পান। ইহার পরে তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত গমনের সংকল্প করেন। কিন্তু দুঃখিনী মা এই সংবাদে যেন আকাশ হইতে পড়েন এবং যাহাতে পুত্রের বিলাত যাওয়া না হয়, সেই কামনায় ঠাকুর দেবতার চরণে অঝোরে চোখের জল ফেলিতে থাকেন। ঠাকুর দেবতাও বুঝি তখন অত অশ্রু পায়ে ঠেলিতে না পারিয়া তাঁহার প্রার্থনাই পূর্ণ করেন। কেননা সেই বৎসরই প্রথম, গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় দুইটির স্থলে একটি বৃত্তি দেওয়া হয়; এবং দুর্দৈববশতঃ তিনি করেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার। সুতরাং বৃত্তি না পাওয়ায় উচ্চ-শিক্ষার্থ বিলাত গমন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই।

যথাসময়ে বি. এ. পাশ করার পর, তিনি এম. এ. পড়াই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন এক বিশেষ ঘটনায় তাঁহার সেই স্থির সঙ্কল্পও টলিয়া যায়। ঘটনাটি এই:—

সেই সময়ে তাঁহার পাবনাস্থ বাল্যবন্ধু মোহিনী চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর গালে ক্যানসার হওয়ায়, তার সমস্ত মুখ পচিয়া পড়িতে থাকে। ঘায়ের গন্ধ এতই উৎকট হইয়াছিল যে, সাধ্য কি কেহ কাছে ঘেঁষে! সেবা-শুশ্রূষা ত দূরের কথা। কিন্তু তাঁহার পরদুঃখ-কাতর প্রাণ এরূপ অযত্ন সহ্য করিতে পারে নাই। নিজেই তখন রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন। এবং সময় সময় গালের পচা মাংস তুলিয়া দিয়া, মুখখানি পরিষ্কার করিয়া দিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতেও বিভ্রাট ঘটে; স্বয়ং ডাক্তার আসিয়া বলেন—"এরূপ করিলে রোগিণীর বিশেষ ক্ষতি হইবে এসব আনাড়ি লোকের কর্ম্ম নয়।" শুনিয়া তাঁহার ধিক্কার জন্মে এবং সঙ্কল্প করেন, যাতে রোগীর যথার্থ হিত হয়, তাহাই শিখিবার জন্য তিনি ডাক্তারি পড়িবেন। কিন্তু সে বৎসর ভর্ত্তির সময় অতীত হওয়ায়, পরের বৎসর মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন।

সেখানে প্রতি বৎসর বৃত্তি ও মেডেলসহ তিনি পাশ করিয়া যাইতে থাকেন এবং শেষ বৎসরে তিনি গুডিভ্ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া ইডেন হাসপাতালের কার্যাভার লাভ করেন। কিন্তু সেখানে কিছুকাল কাজ করিবার পর কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষের কোন ব্যবহারে এতই মর্ম্মাহত হন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয় তত্তুল্য উপযুক্ত লোক আর না পাওয়ায়, তাঁহাকেই আবার ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি সেই পদ আর গ্রহণ করেন নাই, এতই প্রখর ছিল তাঁর আত্মসম্মান বোধ! ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে এম. এ. পাশ করেন।

একবার জার্ম্মাণ ভাষা শিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি একজন জার্ম্মাণ শিক্ষকের নিকটে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ঐ ভাষাটি আয়ত্ত করেন যে, জার্ম্মাণ শিক্ষকটি অবাক হইয়া বলিলেন—"একজন জার্ম্মেণও এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ শিখিতে পারিত না।"

তিনি প্রথম জীবনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণতা ছিল তাঁহার সহজাত এবং স্বভাবগত। খুব সম্ভব তাঁহার মহীয়সী মাতার নিকট হইতে তিনি ইহা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃদেবী ছিলেন খুবই ধর্ম্মশীলা এবং ভক্তিময়ী। সুতরাং মাতৃ-দৃষ্টান্তেই তিনি হয়ত অনু-

---

(৬) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক—৫ পৃষ্ঠা।

প্রাণিত হইয়া, শৈশব হইতেই, ধর্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। এফ. এ. পড়িবার জন্য যখন তিনি কলিকাতায় আসেন, তখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অনেক ছাত্রাবাসে যাইয়া, ঈশ্বর প্রসঙ্গ করিতেন। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছেই তাঁহার ধর্ম-জিজ্ঞাসাগুলির সদুত্তর পাইয়া খুব প্রীত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তখন ব্রাহ্মধর্মের পূর্ণ অভ্যুদয়কাল। দেশের বহু উচ্চ শিক্ষিত ও প্রগতিপন্থী মনীষী, তৎকালেই এই ধর্মের উদার বক্ষে আশ্রয় লইতে থাকেন। তিনি কেবলমাত্র ধর্ম গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, ইহা সাধনও করিয়াছিলেন প্রাণপণে সমস্ত জীবন। এই ধর্মসাধনের ভিতর দিয়াই তিনি উত্তর জীবনে, প্রভূত আত্মিক উন্নতি ও ব্রহ্মনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

উপার্জ্জনক্ষম হইয়া পরিণত বয়সে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহ হয় সুবিখ্যাত আই,সি, এস, (I. C. S.) স্যার কে. জি. গুপ্তের ভগিনী সুবালা দেবীর সহিত। তাঁহার শ্বশুর কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন ঢাকা জেলার ক স্থানীয় জমিদার। তিনি ছিলেন খুব সজ্জন ও রভিমান; এত ধর্মপ্রাণ ও ভক্তিপরায়ণ যে, "ভক্ত লীনারায়ণ" নামেই তিনি সর্ব্বত্র আখ্যাত হইতেন। রূপ পিতার কন্যা সুবালা দেবী, পিতার বহুগুণেরই রাধিকারিণী এবং স্বামীরও যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ই বিবাহোৎপন্ন সন্তানত্রয়ের মধ্যে প্রথমা কন্যা উষা, ং অন্য দুইজন পুত্র অজয়কৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ। ১৯১৫ ব্দে বি. এ. পড়িবার সময়ে কন্যা উষার বিবাহ হয় খ্যাত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ হীরালাল হালদারের র সুধীন্দ্রকুমার হালদার I. C. S. এর সঙ্গে। এই নবাবুই ব্রিটিশ আমলে বহু জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটি করিয়া, র আরও উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র জয়কৃষ্ণও পিতৃতুল্যই মেধাবী ছিলেন। মেডিক্যাল লজ হইতে গুডিভ্ বৃত্তিসহ পাশ করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে চতর জ্ঞানলাভের জন্য বিলাত গমন করেন এবং তথা তে অভীপ্সিত জ্ঞান ও ডিগ্রি অর্জ্জনকরতঃ দেশে ত্যাগত হন এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এসোসিয়েট (Associate) অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করেন। কনিষ্ঠপুত্র বিজয়কৃষ্ণও বিলাতের আই, সি, এস, (I. C. S.) ব্রিটিশ আমলেই তিনি চাকুরিতে প্রবেশ করেন এবং বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পরে, এক্ষণে তিনি কানাডায় ভারত সরকারের হাই কমিশনর পদে সমাসীন আছেন।

ডাঃ আচার্য্যকে সম্যকভাবে জানিতে হইলে, তাঁহার সমগ্র জীবন-পঞ্জীরই অনুসন্ধান প্রয়োজন। তিনি ছিলেন বহু গুণান্বিত ও শক্তিধর পুরুষ। চিকিৎসা, শিক্ষা, ধর্ম-প্রচার, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতির বহু ক্ষেত্রেই তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং প্রতিক্ষেত্রেই হইয়াছিলেন কৃতিত্বের অধিকারী। চিকিৎসা বিষয়ে পূর্ব্বেই কিছু নিবেদন করিয়াছি, এক্ষণে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার যে অবদান—তাহাই আমরা বিবৃত করিব। শিক্ষা বিস্তারের দিকে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। জীবন-ব্রত হিসাবেই তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেও সিটি কলেজে তিনি ষোলটি ছাত্রের পড়ার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কবি সখেদে লিখিয়াছেন—"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশী বিষে দংশে নি যারে।" খুবই খাঁটি কথা। সর্প-দষ্ট না হ'লে যেমন সর্পবিষের তীব্রতা বোঝা যায় না, তেমনি প্রকৃত ভুক্তভোগী ছাড়া কোন মর্ম্মান্তিক ক্লেশকেই কেহ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে দুঃখ-কষ্টকে যতই অনর্থক ও অনিষ্টকর মনে হউক, উহাদের উপযোগিতাও যথেষ্ট দুঃখে-কষ্টে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। উহার বনিয়াদই সর্ব্বাপেক্ষা পাকা। এই নিমিত্তই বোধ হয় মঙ্গলময় ভগবান্, দুঃসহ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়াই তাঁহার চিহ্নিত জনকে মানুষ করিয়া তোলেন। স্বর্ণকে খাঁটি করিতে হইলেই যেমন প্রবল অগ্নিদাহের প্রয়োজন, পর কৃপালু পরমেশ্বরও বুঝি তেমনি, শিশু প্রাণকৃষ্ণকে খাঁটি সহৃদয় করিবার জন্যই, দারুণ দারিদ্র্য-দাহনের ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফ —সংসার প্রবেশের প্রথম মুখেই তাঁহাকে দেখি—একে বারে খাঁটি মানুষ, নিঃস্বার্থ পরোপকারী। রোগার্ত্তে দরদী চিকিৎসক, দুঃস্থ ছাত্রের পরম সুহৃদ্ এবং অন অসহায়ের অকৃত্রিম বন্ধু! তাঁর ছাত্র-জীবনের দা অন্নকষ্টের প্রতিকারে, উপার্জ্জনের প্রারম্ভ হতেই তি দুঃস্থ ছাত্রকে অন্ন দিতে উৎসুক, পাঠ্যপুস্তক জোগাই তৎপর এবং স্কুল-কলেজের মাহিয়ানা ও থাকার স্থ দিয়া মানুষ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সৎ বিপ্রের শালগ্রা নিত্য তুলসীদানের ন্যায় এই ছাত্র মানুষ করাই তি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। এইরূপই চলিয়াছে তাঁহার স জীবন। তিনি যে কত ছাত্রকে শিক্ষিত ও স্বাবল করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। তি এত করিয়াও তিনি ছিলেন নিস্পৃহ ও আত্মপ্র

বিমুখ। কাজ করার আনন্দেই বিভোর, উহার যশঃ বা সাফল্যের গৌরব চাহেন নাই। পিতা পুত্রকে মানুষ করেন, লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন করেন; সে যেমন কেবল কর্ত্তব্যবোধে ও স্নেহের টানে; তিনিও তদ্রূপ কেবল কর্ত্তব্য-প্রেরণায়, পুত্রবৎ গরীব ছাত্রকে সাহায্য করিতেন এবং এই সাহায্য করিতেন এতই গোপনে ও অনাড়ম্বরে যে, বাহিরের ত দূরের কথা, তাঁহার নিজ পরিবারের লোকও জানিতে পারেন নাই। বৃক্ষের মূল যেমন মাটিতে লুকায়ে বৃক্ষকে রস যোগায় অতি নীরবে ও অনাড়ম্বরে। শিশির যেমন গভীর নিশীথে বর্ষিত হইয়া রবিশস্যকে বাঁচাইয়া রাখে, অতি নীরবে ও অনাড়ম্বরে। তাঁহার ছাত্র সাহায্যও ছিল ঠিক শিশিরের আত্মোৎসর্গের মত: পুত্রপ্রাণা জননীর পুত্র-বাৎসল্যের মত নামযশের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, প্রতিদানের প্রত্যাশা ছিল না। তিনি যে কত নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত ভাবে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, একটিমাত্র দৃষ্টান্তেই তাহা সুপরিস্ফুট হইবে।

তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"তাহার সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত ছিলাম। প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে একসঙ্গে গোলদীঘিতে ভ্রমণ করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যে উভয়ে অনেক স্থানে গিয়াছি। এক ঘরে শয়ন করিয়া রাত্রি প্রায় ১১।১২টা পর্যন্ত অনেক বিষয়ে আলোচনা করা গিয়াছে। এতকাল একত্রে বাস করিবার সুবিধা ঘটিয়াছে, কিন্তু কোনদিন তাঁহার দানের কথা তাঁহার মুখে শুনি নাই। কেবল—একদিন অতর্কিত ভাবে তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, যাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি ছাত্রদের সাহায্য করেন। একদিন গোলদীঘিতে ভ্রমণের পর তিনি আমার সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইলেন এবং দেওয়ালের গাত্রসংলগ্ন বিজ্ঞাপনসমূহ পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি দেখিতেছেন?" উত্তর হইল, "কোথায় বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, তাহাই দেখিতেছি।" তখন ভাবিলাম, হ্যারিসন রোডের উপর তাঁহার বৃহৎ ত্রিতল বাড়ী, তবে তিনি কাহার জন্য বাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"কয়েকটি গরীব ছাত্র আছে, তাহাদের জন্য খুঁজিতেছি।" তাঁহার নিজের মুখ থেকে তাঁহার দানের কথা সেইদিন প্রথমে শুনিলাম। যীশু বলিয়াছেন—"Do not let your left hand know what your right hand does." এই উপদেশ ডাঃ আচার্য্যের জীবনে মূর্ত্ত হইয়াছিল।(৭)

সত্যাশ্রয়ী দত্ত মহাশয় খুবই সত্যকথা লিখিয়াছেন। ডাঃ আচার্য্য ছিলেন—যীশুর ঐ মহোপদেশেরই মূর্ত্ত প্রতীক। সেই জন্যই কাজের গোপনীয়তা রক্ষায় ছিল তাঁর এত আগ্রহ। কাজ যতই শুভ ও কল্যাণকর হউক কিছুতেই তিনি তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাও অতি আকস্মিক-ভাবে। বস্তুত তিনি কোন প্রতিষ্ঠা বা পদমর্য্যাদার প্রার্থী ছিলেন না; সে সকলকে কাম্যবস্তু বলিয়াই মনে করেন নাই। করিলে হয়ত আয়ত্তও করিতে পারিতেন সহজেই। কিন্তু সেদিকে তাঁর আকাঙ্ক্ষাই জাগে নাই। তিনি ছিলেন খুব সংযত ও মিতাচারী এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে কাজ করাই ছিল তাঁর স্বভাব। তা-ই তাঁর নিত্যসঙ্গী দত্তমহাশয়ও তাঁর ছাত্র সাহায্যের কথা দীর্ঘকাল জানিতে পারেন নাই। অবশেষে অতর্কিতভাবে জানিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেও অতি সামান্য। আমরা আর যতটুকু জানি, তাহাও এখানে প্রকাশ করিব।

ছাত্রদের জন্য ভাড়া বাড়ী ত ছিলই, তাহা ছাড়া তাঁর নিজের বাড়ীর দোতলাতেও একখানা স্বতন্ত্র ঘর ছিল। পরীক্ষার ফল বাহিরের পর পরই দূর-দূরান্ত হ'তে ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে ভিড় করিত। তিনি তাহাদের কয়েকজনকে রাখিতেন নিজ বাটিতে, আর অবশিষ্টকে পাঠাইতেন তাঁর ভাড়া বাড়ীতে। এই ভাড়া বাড়ীটি ছিল বহুকাল ৬৫।২ হ্যারিসন রোডে। তাঁহার নিজ বাড়ীর সব ছাত্রই তাঁহার বাড়ীতেই আহারাদি করিত; আর ভাড়া বাড়ীর ২ ১ জনও তাঁহার বাড়ীতেই আহার পাইত। বাকী সকলের ২।১ জনকে তিনি রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে, ২ ১ জনকে সুবল মিত্রের বাড়ীতেও ব্যবস্থা করিয়া দেন। আর সকলে যার যা সুবিধামতস্থানে ভোজন করিত। তিনি সব ছাত্রেরই স্কুল-কলেজের মাহিয়ানা এবং পুস্তকাদি দিতেন। মফস্বলস্থ ছাত্রদের মাহিয়ানাদি পাঠাইতেন ডাকযোগে। এইরূপই চলিত বছরের পর বছর। মহামহোপাধ্যায় ডঃ প্রসন্নকুমার আচার্য্য আই. ই. এস. (I.E.S.) কুমিল্লা হইতে বি. এ. পড়িতে আসিয়া, ডাক্তারবাবুর এই ৬৫নং হ্যারিসন রোডস্থ বাড়ীতেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই আনুকূল্যে এম. এ. পাশ

(৭) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক, ৮৭ পৃঃ।

করিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্ম বিলাত গমন করেন এবং তথা হইতে পি. এইচ্. ডি ও ডি. লিট. ডিগ্রি লাভ করিবার পর খ্যাতিমান পুরুষে পরিণত হন। যশস্বী লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে (প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত) লিখিয়াছেন— "আমি যখন অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষালাভে অসমর্থ হইয়া নিজেকে ধিক্কৃত মনে করিতেছিলাম, তখন দৈবক্রমে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের সাক্ষাৎ ও সাহায্য পাইয়া উচ্চ শিক্ষালাভে সমর্থ হই।" এইরূপে কত গরীব ছাত্র যে তাঁহার কল্যাণে মানুষ হইয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। "প্রবাসী" লিখিয়াছেন—"দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করা, জীবনের শেষ সজ্ঞান দিবস পর্য্যন্ত, তাঁহার একটি নিয়মিত কর্ম্ম ছিল।" (৮)

ছেলেদের মত মেয়েদের শিক্ষাকেও তিনি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিতেন এবং তাহাদের শিক্ষা-বিস্তারেও অর্থব্যয় করিয়াছেন প্রচুর। উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত বাণীবন বালিকা বিদ্যালয়ের যখন নিতান্তই শোচনীয় অবস্থা, তখনই ডাঃ আচার্য্য আসিয়া উহার কর্ণধার হন এবং তদবধি আপ্রাণ চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে স্কুলটির ক্রমোন্নতি সাধন করেন। প্রধানতঃ তাঁহার অর্থসাহায্যেই বিদ্যালয়টির অভিনব সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়। স্কুলের উত্তর দিকের জমি acquire করিবার সময়েও তিনি এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ঐ স্কুলের অনেকগুলি দুঃস্থ ছাত্রীকে তিনি বছরের পর বছর অর্থ সাহায্য করিতেন। যদুবেড়ে স্কুলেও তিনি অনেক অর্থ সাহায্য দিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ ছাত্রী নিবাসের জন্যও তাঁহার দান ছিল প্রভূত। আরো কত প্রতিষ্ঠানে তিনি যে কত কি দান করিয়াছেন, তাহা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"যে মহৎ ও বৃহৎ কাজটিতে তাঁহার জীবনের শেষ কয়বৎসর তিনি অনেক সময় দিতেন, তাহা 'আসাম ও বঙ্গের অনুন্নত শ্রেণী সমূহের উন্নতি বিধায়িনী সমিতি।' তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দরিদ্র গ্রামিক লোকদের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষাদান ইহার প্রধান কার্য্য। ইহার তত্ত্বাবধানে নানা জেলায় প্রায় সাড়ে চারিশত বিদ্যালয় আছে। গ্রামিক লোকদিগকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনার্থ, তিনি পদব্রজে, পা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া বহুবার বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। বস্তুত তিনি কলিকাতায় বসিয়া শুধু কাগজে নাম স্বাক্ষর করিয়া জনহিতকর কার্য্যের সহিত যোগরক্ষায় তৃপ্ত হইতেন না। স্বয়ং মফস্বলে কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া কাজ করিতে ভালবাসিতেন। আমার মনে পড়ে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিতে গিয়া তথাকার একটি গ্রামে ছিলেন। 'দাসাশ্রম' নামে গত উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতায় অসহায় নিরাশ্রয় আতুরদের বাস গ্রাসাচ্ছাদন ও চিকিৎসাদির জন্য যে প্রতিষ্ঠান ছিল, আচার্য্য মহাশয় দীর্ঘকাল তাহার স্বেচ্ছাবৃত চিকিৎসক ছিলেন।" (৯)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার সমস্ত দানই ছিল গোপনে, সুতরাং তার অধিকাংশই আমাদের চির-অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে, চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি, প্রকৃত অভাবগ্রস্ত উপস্থিত হইলে, তিনি তাদের অভাব মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার কন্যাকে লিখিয়াছিলেন—এ দেশের টাকা বিলাতে নিতে গেলে যেমন টাকাকে L.S.D. করে নিতে হয়; তেমনি এ জগতের অর্থ পরলোকে সঙ্গে ক'রে নিতে হলেও দানে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। দানকেই তিনি অর্থের চরম সার্থকতা মনে করিতেন।

ষাট বৎসর বয়স হতেই তিনি চিকিৎসাবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপরে উপার্জ্জনের জন্য তিনি আর চিকিৎসা করেন নাই। দানাধিক্যের জন্য শেষ জীবনে তাঁহাকে বেশ টানাটানির মধ্যেই পড়িতে হইয়াছিল, তবু তিনি গোপন দান হইতে বিরত হন নাই। তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমাজসেবায় সহকর্ম্মী হরিনারায়ণ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"কোন কোন বন্ধুকে সাহায্য করিয়া যখন তিনি প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার স্বাভাবিক দান-প্রবৃত্তির হ্রাস হয় নাই। শেষ জীবনে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিলাত হইতে কিছু টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন—অর্থাভাববশতঃ সম্প্রতি টাকা পাঠাইতে পারিবেন না লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কোন যুবক ব্যবসার জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলে, গোপনে

(৮) প্রবাসী, আষাঢ় মাস, ১৩৪৩ সাল।

(৯) প্রবাসী, আষাঢ় মাস, ১৩৪৩ সাল

তাহাকে সাহায্য না করিয়া পারিলেন না। এইভাবে গোপনে সহস্র সহস্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।" (১০) তিনি কন্যার বিবাহের সময় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থ দুই হাজার টাকার একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি কেবল ছাত্রছাত্রী ও দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। রোগার্ত্তের জন্যও তিনি বহু অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আর্ত্তসেবার প্রেরণা হতেই তাঁহার ডাক্তারি পড়ার আগ্রহ, শেষ বয়সে ডাক্তারি ছাড়িলেও আর্ত্ত-সেবা ছাড়েন নাই। এবং কতখানি আগ্রহ ও অকুণ্ঠার সহিত তিনি তাহাদের সেবা করিতেন, একটিমাত্র উদাহরণেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে কলিকাতায় যখন প্লেগ রোগ দেখা দেয়, তখন ডাঃ আচার্য্যের এক কর্ম্মচারীও উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। সকলেই তখন রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন হাসপাতালে পাঠানোর অর্থই ছিল, মরার আগেই যমের মুখে পাঠানো। কারণ সেখানে প্লেগ-গ্রস্তের কোনো চিকিৎসাই হইত না, শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় পৃথক করিয়া ফেলিয়া রাখিত। সুতরাং নিশ্চিত যমের মুখে পাঠাইতে কিছুতেই তিনি রাজী হন নাই। নিজের বাটীতে রাখিয়াই চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ভয়ে বাড়ীর ভৃত্যগণ পলাইয়া যায়। ৩৪ দিন পরে তাঁর স্ত্রীরও জ্বর হওয়ায়, তাঁহাকেও অন্যত্র পাঠাইয়া, রোগী লইয়া একক বাটীতে পড়িয়া থাকেন। নিতান্ত একজন পরের জন্য নিজেকে এতখানি বিপন্ন করিলেন তবু তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইলেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুব বিরল। অষ্টম দিনে রোগীটির মৃত্যু হইলে তিনিই তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করেন।

"তত্ত্ব কৌমুদী" পত্রিকার সম্পাদক বরদাকান্ত বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"তিনি প্লেগ রোগাক্রান্ত নিজ কর্ম্মচারীর জন্য যাহা করিয়াছেন, সে কথা তাঁহার কন্যা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে অন্য এক প্লেগগ্রস্ত রোগীর মৃতদেহ নিজে স্কন্ধে বহন করিয়া নিয়া গিয়াছেন, তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।" (১১) অধিক নিষ্প্রয়োজন, এই দুই একটি ঘটনা হতেই প্রতিপন্ন হয় আর্ত্তসেবার ছিল তাঁর কি গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ!

ফল কথা, তাঁর কাছে সংসার ছিল ঈশ্বরেরই বিকাশ-ভূমি, সুতরাং জীবসেবাকেই তিনি ঈশ্বর-সেবারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক কেবল সেবা ও সাহায্যাদিতেই তিনি আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দেন নাই, দেশের বহু প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের জন্য বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের অনুকূলে, দেশব্যাপী যে প্রবল আন্দোলন হয়, ডাঃ আচার্য্য তাহার অন্যতম নেতা, আন্তরিক সমর্থক ও বাগ্মী বক্তা ছিলেন। তিনি নিজ ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়াও জেলায় জেলায় গমনকরতঃ দেশী পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইরূপ এক সভায় যোগদানের জন্য স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত কুমিল্লায় গিয়াছিলেন, তাহা আমরা ডঃ প্রসন্নকুমার আচার্য্যের লিপি হইতে জানিতে পারি। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পরেও তিনি নিজ পরিবারে স্বদেশী বস্ত্র ও পণ্যের ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

বৈষয়িক ব্যাপারেও তিনি ভাল বুঝিতেন। একাধিক জীবন-বীমা কোম্পানীর প্রধান ডিরেক্টরের কাজ কোন না কোন সময়ে তিনি করিয়াছিলেন।

তিনি বেশ পরিহাস-পটু লোক ছিলেন; এবং তাঁহার প্রাণের প্রাচুর্য্যও ছিল অপরিমেয়। তাঁহার গল্প-গুজব ও হাস্য-পরিহাস ছিল সত্যই অতি উপভোগ্য—হৃদয়রসায়ণ বিশেষ। যিনি একটু বেশী সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তিনিই তার আস্বাদ পাইয়াছেন এবং পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তিনি হতাশ রোগীকে আশ্বাস দিয়া এবং বিমনা বিমর্ষ রোগীকে হাসাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিতেন। তাঁহার স্নিগ্ধ ব্যবহার ও হাস্যোজ্জ্বল সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলেই রোগীর যেন অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যাইত।

একবার তাঁহার জনৈক সুহৃদ্ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কানের খুব ভিতর অংশে ফোড়া হইয়া কানের অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল। যখন তিনি প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রবণশক্তি ঠিক্ হবে ত?" তিনি বলিলেন, "এখন এত ব্যস্ত হবার দরকার কি? আপাততঃ লোকে যে আপনার নিন্দা করবে তা শুনতে পাবেন না, সেও কি কম লাভ?" (১২)

---

(১০) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক, ৭৬ পৃঃ।
(১১) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক, ১০৭ পৃঃ।
(১২) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক, ১০৭ পৃঃ।

একটি যুবকের স্বাস্থ্য ভাল নয়, অথচ সে প্রেমে পড়িয়াছিল। সতীশবাবুর ইচ্ছা ছিল যে, সে বিবাহে কিছু দেরি করে। কিন্তু কত দেরি করা উচিত, প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারছি না। আপনি ভেবেছেন—প্রাণকৃষ্ণ বাবুর Medical advice আর সতীশ বাবুর Spiritual advice উভয়ের এত জোর যে, তা দিয়ে আপনি ওদের বিয়ের তারিখ পেছিয়ে দিতে পারবেন। দেখবেন তার কোন আশা নেই।"(১৩) শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন, "তিনি সাতিশয় হাস্যরসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল শুভ্র অট্টহাস্য ভুলিবার নহে।" (১৪)

তিনি আজীবন ছাত্র ছিলেন; প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে এবং তন্ময় চিত্তে শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, শাণ্ডিল্যসূত্র প্রভৃতি ত পাঠ করিতেনই, তাহা ছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিও নিয়মপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। মধু-মক্ষিকার ন্যায়ই তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসু মন, নানা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সতত সত্য-মধু আহরণে ব্যস্ত থাকিত।

সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার দখল ছিল চমৎকার। স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্তই তিনি সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। তারপরে বিষয়ান্তর গ্রহণ করায়, বহু বৎসর আর ইহার চর্চ্চা করেন নাই। কিন্তু পরে অবসর মত নিজে নিজে পাঠ করিয়া বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। একবার ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে মাসাবধিকাল তিনি নিয়মত ভাবে ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, "মন্দিরে আচার্য্যরূপে উপাসনায়, তাঁহার উপনিষদ অধ্যয়নের প্রভাব অনুভূত হইত। পাতঞ্জল যোগসূত্রের সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। সাধনাশ্রমে ও মন্দিরের প্রাত্যহিক মণ্ডলীতে তিনি কিছুদিন পতঞ্জলীর "যোগসূত্র" ও ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াছিলেন।" (১৫) মনস্বী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "হিন্দুশাস্ত্র তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল।" (১৬)

পাঠে কখনও তাঁহার শ্রান্তি ক্লান্তি দেখা যায় নাই। বৃদ্ধ বয়সে শরীর যখন তাঁর নিতান্তই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তখনও তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া শাস্ত্র পাঠে সমাহিত থাকিতেন।

ব্রাহ্ম সমাজেও ছিলেন তিনি পরম শ্রদ্ধেয় ও অমিত প্রভাবশালী পুরুষ। তিনি ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা, সুদৃঢ় স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি ইহার সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন এবং আমরণ ছিলেন ইহার অন্যতম, আচার্য্য। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন প্রাতে, তিনি তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগে সমগ্র দেশই শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সুলেখিকা হেমলতা সরকার লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গভূমি এমন সুসন্তান হারাইয়া কাঙ্গাল হইল।" (১৭) বিবিধ তত্ত্ব গ্রন্থ প্রণেতা সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার অনবস্থিতিতে সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারে, এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।" (১৮) পাবনার পুণ্য শ্লোক পুরুষ জ্ঞানদা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"আমাদের জেলার মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের এ জেলাতে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অবস্থাপন্ন লোকের সন্তান; কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের মত নিঃস্ব অবস্থায় পড়িলে তাঁহাদের ভাগ্য যে কি হইত, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। এইখানেই প্রাণকৃষ্ণের অসাধারণত্ব।" (১৯)

আমরা এ যাবতকাল কেবল তাঁহার খোলস বা বহিরঙ্গ লইয়াই আলোচনা করিলাম। তাঁহার স্বরূপে—তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারি নাই। হয়ত তাহার যোগ্যতাও আমাদের নাই। তাঁহার সমসাধক ও সাধন সঙ্গীগণ, যাঁহারা তাঁহার উপাসনা দেখিয়াছেন, তাঁহার অশ্রুবিগলিত আকুল কণ্ঠের প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতেন তিনি ছিলেন কোন্ অমৃত-লোকের অভিযাত্রী। এই

(১৩) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক, ৭১ পৃঃ।
(১৪) "প্রবাসী", আষাঢ়, ১৩৪৩ সাল।
(১৫) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক, ৯১ পৃঃ।
(১৬) "প্রবাসী", আষাঢ়, ১৩৪৩ সাল।
(১৭) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক, ৫১ পৃঃ।
(১৮) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ—৯২ পৃঃ।
(১৯) ডাঃ আচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ পুস্তক, ৯৫ পৃঃ।

সংসারক্ষেত্র ছিল তাঁহার কাছে দীর্ঘ প্রবাস মাত্র। এই সংসারের যত কিছু কাজ, সবই ছিল তাঁর পরপারের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য। তিনি গৃহী ছিলেন সত্য, কিন্তু সে নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন গৃহী। কর্ম্মযোগী বিশেষ। সর্ব্ব কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণকরতঃ অনাসক্ত হৃদয়ে নির্লিপ্তভাবে সংসারে বাস করিতেন। অন্তঃসলিলা ফল্গুর যেমন বাহিরে বিশেষ ধারা নাই, সমস্ত প্রবাহই অভ্যন্তর পথে ; ইঁহার হৃদয়ের অব্যভিচারিণী ভক্তি-ধারারও তেমনি কোন বহিঃ-প্রকাশ ছিল না ; সমস্ত প্রবাহই ছিল নীরবে অন্তর পথে—ঈশ্বর চরণাভিমুখে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপসনামেব।" অর্থাৎ ভগবানে প্রীতি বা ভক্তি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, উভয়ই ভগবানের উপাসনা। সুতরাং উপাসনার এই উভয় অঙ্গকেই তিনি সমভাবে যাজন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। নানা পুষ্প ও নৈবেদ্য উপকরণে যেরূপ ভগবানের পূজা করিতে হয়, পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া যেমন তাঁহার আরতি করিতে হয়, তিনিও তদ্রূপ নানা নিষ্কাম সৎ কার্য্যের ডালা সাজাইয়া ভগবৎ-চরণে আত্মনিবেদন করিতেন এবং প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। স্বনামধন্য খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় "ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য স্মরণে" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন—"ডাক্তার আচার্য্যের উপাসনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ওজস্বী ও আন্তরিকতা-পূর্ণ হইত। তাহার একমাত্র কারণ এই যে—তাঁহার বক্তৃতা অন্তর হইতে উদ্ভূত হইত। ইহা চাতুর্য্যপূর্ণ বাগ্‌বিদগ্ধ মাত্র নহে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত তাঁহার বক্তৃতাগুলিও ভাব-পরিপ্লুত এবং হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্পার্ঘ্য সমন্বিত হইত। ইঁহাদের উপদেশ ও বক্তৃতায় সহস্র সহস্র লোকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।" (২০) ভগবানের বিশেষ অভিপ্রায়েই এরূপ পরম সাধক মহাপুরুষদের মাঝে মাঝে এই মর মর্ত্ত্য-ভূমিতে শুভাগমন হয়। ইঁহাদের আদর্শ অনুসৃত হইলেই দেশের পরম মঙ্গল হইবে।

---

(২০) "প্রবাসী" ১৩৬৫ সাল, ভাদ্র সংখ্যা।

ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র। ইহাতে অসংখ্য সাধু মহাত্মা, অসংখ্য ধর্ম্মবীর, স্বদেশ প্রেমিকের নশ্বর দেহ মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ এবং তাঁহাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দর্শন করিলে জীবনের গৌরব বৃদ্ধি হয়, আত্মার মূল্য বাড়িয়া যায়।

দাসী; জুলাই ১৮৯৩।

গবর্ণমেণ্ট বলছেন, যে-অনুপাতে মানুষ বাড়ছে সে-অনুপাতে চাল বাড়ছে না, খেতে দেব কোত্থেকে ?

—কিন্তু চালের অভাব ত কোথাও দেখতে পাই না। খোঁজ নিয়ে ছাখো হাজার হাজার মণ চাল মহাজনদের গুদামজাত হয়ে রয়েছে। কালোবাজার জন্মলাভ করছে ত ওখান থেকেই।

খুড়ো বললেন, তা যাই বল, ওরা ছিল বলে মানুষ আজ খেতে পাচ্ছে। নইলে 'রেশনে' গবর্ণমেণ্ট মানুষ-পিছু যা চাল বরাদ্দ করেছে তাতে সপ্তাহে তিন দিনের বেশি চলে না। বাকি চার দিন তারা কি খায় ? এই বাকি চার দিনের চাল জোগাচ্ছে কালো-বাজার। লোকের টাকা আছে, কেন কিনবে না।

—কিন্তু এতে চুরিকেই ত প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

—ও নীতি-কথা রাখ হে বাপু ! না খেয়ে ওসব উপদেশ কেউ শুনবে না। গবর্ণমেণ্ট এই কালোবাজার বন্ধ করবার জন্তে হাজার হাজার পুলিশ নিয়োগ করেছে। কিন্তু হচ্ছে কি তাতে ? পুলিশও বাড়ছে, 'ব্ল্যাক'ও বাড়ছে। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। 'ব্ল্যাক' কোন দিনই বন্ধ হবে না হে, যতদিন মানুষের খিদে আছে। ওপর থেকে খুব চাপ না পড়লে পুলিশও সক্রিয় হয় না। তবে বলতে পার এরা মনুষ্যপদবাচ্য নয়। এরা পারে না এমন কাজ নেই। অথচ তোমার-আমার মতই এদের রক্ত-মাংসের দেহ। চাল পাচার হচ্ছে—হাজার হাজার মণ চাল পাচার হচ্ছে। পুলিশ সব কাজ বন্ধ রেখে এই চাল ধরবার জন্তে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরছেও। কাদের ধরছে ? নিরীহ, গোবেচারা—পেটের জ্বালায় যারা দু' কিলো চাল আনছে। মারতে মারতে নিয়ে এল তাদের থানায়। পুলিশের প্রমোশন হয়ে গেল। একটি ঘটনা ত কাগজেই বেরিয়েছিল, দেখ নি ?

ছোট ছোট বাচ্চাগুলো খিদের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। ঘরে এক ফোঁটা চাল নেই। মা ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে রেল-লাইনের ওপার থেকে দু'কিলো চাল আনছিল, লাইনের এধারে পুলিশ তাকে ধরল। মেয়েটি অনেক কাকুতি-মিনতি করল—ছেলে-মেয়েরা আজ ক'দিন ধরে খায় নি—তোমরাও ত মানুষ, তোমাদেরও ত ছেলে-মেয়ে আছে।

পুলিশ গর্জে উঠল : ওসব ধর্ম-কথা শুনবার আমাদের সময় নেই। থানায় যেতে হবে।

মেয়েটির মাথা ঘুরে গেল। থানায় যেতে হবে ? পাঁচজন লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ?

পুলিশ এগিয়ে এসে তার হাত ধরতে এল। মেয়েটি দু'পা পিছিয়ে গেল। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে বললে, নেহাৎই যেতে হবে ?

—আমাদের ছাড়বার হুকুম নেই !

একখানা ট্রেণ আসছিল ফুল-স্পীডে। মেয়েটি চালের ব্যাগ নামিয়ে রেখে চোখের পলক পড়তে না পড়তে চলন্ত

গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গাড়ি চলে গেলে সবাই দেখলে একটি মেয়ে কাটা পড়েছে। কেন কাটা পড়েছে কেউ জানলে না। জানলে না, থানায় যাবার লজ্জা থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে গেল!

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মরতে সেই চুনো পুঁটিরাই মরে, রুই-কাৎলা ঠিক থাকে। সরকার জানে এই কালোবাজার বন্ধ করা যাবে না, তবু তাকে ইজ্জৎ বাঁচাতে এই ধর-পাকড়ের অভিনয় করে যেতে হচ্ছে।

—এ পাপ কি সইবে খুড়ো?

—পাপ? পাপ ব'লে কিছু আছে না কি? রাজনীতিতে পাপ নেই। দরকার হ'লে তারা বাপের গলা কেটে পার্টি রক্ষা করে। সরকার কি জানে না—এর কেন্দ্রস্থল কোথায়? ঐ যে বললাম, রাজনীতি। গদি রাখতে গেলে, এসব দিক থেকে তাঁদের চোখ বুজে থাকতে হয়। নইলে উনিশ বছর গদি রাখা যেত না।

কিন্তু এই 'ব্ল্যাক' ধরতে সরকারের খরচও ত কম হচ্ছে না। তার চেয়ে সরকার 'রেশনে'র চাল একটু বাড়িয়ে দিলেই গোল মিটে যায়। পেটের জ্বালায় লোকে কালোবাজার থেকে চাল কেনে, নইলে সখ করে কেউ অত দাম দিয়ে চাল কেনে না।

—এও রাজনীতির চাল হে! যে-কোন আন্দোলনকে জীইয়ে রাখাই সরকারী নীতি। এও কারবার। আন্দোলন বন্ধ থাকলে কারবার চলে না।

চুপ্‌, চুপ্‌! অত জোরে বলে না কি ওসব কথা!

দার্শনিকরা বলবেন, অভাব মনে করলেই অভাব, নইলে অভাব কিসের? মন্ত্রীরাও দার্শনিক ভাবাপন্ন, তাই নিয়ত জ্ঞান বিতরণ করছেন।

ওঁরা রাতারাতি দার্শনিক হয়ে উঠলেন কি করে?

খুড়ো হেসে বললেন, রাষ্ট্রপতি যে দার্শনিক হে!

* * *

দল বেঁধে মিছিল বেরিয়েছে—খেতে দাও, খেতে দাও! পুলিশ গুলী চালালে, মরলো কতকগুলো লোক। চারদিক থেকে চিৎকার সুরু হ'ল—সে আওয়াজ দিল্লী গিয়ে পৌঁছুল। কেউ কেউ ছুটে এলেন দিল্লী থেকে কলকাতা। এঁরা কৈফিয়ৎ দিলেন, এর পিছনে রাজনীতি কাজ করছে, এ খিদে নয়—খিদে পেলে কেউ অত জোরে চিৎকার করতে পারে? যাবার সময় দিল্লীওয়ালা বলে গেলেন, তা বটে, চিৎকারটা জোরেই হয়েছিল বটে!

একটা কোলাহল শুনে এগিয়ে গেলাম। দেখি, কয়েক গজ দূরে ফুটপাথের উপর রাশিকৃত খাদ্যসম্পদ—পোলাও, কালিয়া নানাবিধ তরকারি—সন্দেশ রসগোল্লাও গড়াগড়ি যাচ্ছে। ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে ন্যাংটা ছেলে-মেয়ের দল, আর ক্ষুধিত নর-নারী।

খুড়ো বল্লেন, কাল যে বিয়ে ছিল। ওরা খেয়েও শেষ করতে পারেনি—

—তবে যে শুনি নিমন্ত্রণের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে?

—সে তোমার আমার বেলায়। ওরা যে বড় লোক। ওখানে শাসনের হাত পৌঁছোয় না। বলছিলে না, দেশে চাল নেই? চাল যথেষ্ট আছে—বড় লোকের ঘরে। আছে বলেই অপচয় করে, আমাদের নেই, অপচয় করব কোত্থেকে?

—ফুঃ! 'অল বোগাস।'

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

(৪)

এই সময়টায় আমি একটি বেশ বড় এ্যাটিকে থাকতাম—দু'টি জানলা থেকে নতুন পোতাশ্রয়টি দেখা যেত, সামনে উপসাগর এবং দক্ষিণদিকে পাহাড়ের সারি। জানলার পরেই একটু ছোট ছাদ ছিল—এখানে স্বল্প পরিসরের ভেতরই বাগান করেছিলাম—নানারকমের ফুলের গাছ ছিল এই বাগানে।

ব্যারনেসের সদাচঞ্চল এবং শিল্পীসুলভ হৃদয়বৃত্তিকে সংহত করবার জন্য কিভাবে কি করা যায় ভাবতে ভাবতে আমার মনে হয়েছিল সাহিত্য রচনার ভেতর দিয়েই নিজের কাব্যিক কল্পনা-শক্তিকে তিনি রূপায়িত করতে পারবেন। এ বিষয়ে এতদিন তাঁকে আমি উৎসাহ দিয়ে আসছিলাম। নানা দেশের সাহিত্যের মাষ্টারপিসেস্ তাঁকে পড়তে এনে দিতাম। সাহিত্য রচনার প্রাথমিক অনুশাসনগুলি তাঁকে রপ্ত করিয়ে দিয়েছিলাম। এ বিষয়ে তাঁর খুব যে আকর্ষণ ছিল তা নয়। কারণ প্রথম থেকেই নিজের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান ছিলেন। আমি তাঁকে বলতাম প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের ভেতরই কবি বা লেখক হবার শক্তি লুকিয়ে রয়েছে—সঙ্কোচ কাটিয়ে সাহস ভরে তাকে বাইরে টেনে আনতে হয়। কিন্তু আমার এই ধরনের কথায় বিশেষ ফল পাওয়া যেত না। তাঁর মনে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে রঙ্গমঞ্চই হচ্ছে তাঁর আসল কর্মক্ষেত্র। তিনি বারবার বলতেন এলোকিউশনটা তাঁর একটা সহজাত চারিত্রিক গুণ এবং তাঁর সামাজিক কৌলিন্যের দিকটাই তাঁর মঞ্চে যোগ দেবার পক্ষে একটা বিরাট বাধাস্বরূপ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। মঞ্চে যোগ দেবার এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ না করতে পেরে তিনি এ বিষয়ে নিজেকে আত্মত্যাগী শহীদের মত মনে করতেন। আমি যে ব্যারনেসকে সাহিত্যিক হবার জন্য উৎসাহ দিতাম এজন্য ব্যারন আমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন। কারণ তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারতেন, যে স্ত্রী মঞ্চে যোগ দিলে বাড়ীর শান্তি নষ্ট হবে। ব্যারনেসের আপত্তি সত্ত্বেও আমি অনেক সময়েই তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে রঙ্গমঞ্চ তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের ক্ষেত্র নয়, তাঁর প্রতিভাকে তিনি রূপায়িত করতে পারেন, উপন্যাস, নাটক বা কবিতা রচনার ভেতর দিয়ে।

একটা চিঠিতে একবার ব্যারনেসকে লিখেছিলাম "আপনার অতীত জীবন এত ঘটনাবহুল—সেক্ষেত্রে যেসব অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে তাকে ত কাজে লাগাতে পারেন।" এরপর বোর্ণএর থেকে কোট করলাম "কলম নিয়ে কাগজের উপর মনটাকে খুলে ধরুন, দেখবেন লেখিকা হিসাবে সবাই আপনাকে মেনে নিতে বাধ্য হবে।" তিনি জবাব দিয়েছিলেন—"অসুখী অতীতের স্মৃতিকে আবার স্মরণ করতে গেলে নতুন করে দুঃখ পাব। শিল্পের ভেতর দিয়ে আমি বিস্মৃতি পেতে চাই। আমার থেকে অন্য রকমের চরিত্রের অন্তর্দেশে প্রবেশ করে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে থাকতেই আমার ভাল লাগে।" একটা কথা বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি নিজের জীবনের কোনও অতীত ঘটনাকে ভুলতে চান। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল হয় নি। তাঁর

বিগত জীবনের সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। আমাকে তাঁর প্রহেলিকাপূর্ণ অতীতকে জানতে দিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করছিলেন কেন? তিনি কি ভয় পাচ্ছিলেন তা হ'লে আমি তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণের আসল চাবিকাঠিটি হাতে পেয়ে যাব? মঞ্চের নায়িকাদের ভেতর নিজের আসল সত্তাকে লুকিয়ে রাখবার জন্য কি তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন? অথবা নাটকের আদর্শ নায়িকাদের চরিত্রে অনুপ্রবেশ করে নিজেকে বিরাট করে দেখাবার জন্যই তাঁর মঞ্চাভিনয় করবার অভিলাষ হয়েছিল।

এভাবে বাদানুবাদের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, বিদেশী লেখকদের রচনা অনুবাদ করে তিনি নিজের সাহিত্যিক জীবন সুরু করতে পারেন—এর থেকেই তাঁর নিজের লেখবার ষ্টাইলও ঠিক হয়ে যাবে এবং প্রকাশকদের কাছেও তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন।

"অনুবাদককে কি ভাল পারিশ্রমিক দেওয়া হয়? প্রশ্ন করলেন ব্যারনেস। ঠিকমত কাজ করতে পারলে মোটামুটি ভাল রকমই উপার্জন করেন অনুবাদকেরা।"

"আপনি হয়ত ভাবছেন আমি ভয়ানক অর্থগৃধ্নু—কিন্তু শুধুমাত্র কাজ করবার জন্য কাজ করার ভেতর কোন আকর্ষণ অনুভব করি না"—বললেন ব্যারনেস।

আমাদের সময়ের বেশীর ভাগ মেয়েদের মত, নিজের ভরণ-পোষণের জন্য নিজে রোজগার করব, এই ধরনের একটা বাতিক তাঁকে পেয়ে বসেছেন। একথা শুনে ব্যারন মুখবিকৃতি করেছিলেন, বেশ বুঝতে পেরেছিলাম তিনি চান স্ত্রী মন দিয়ে সংসার এবং গৃহস্থালীর সুপরিচালনা করেন এটাই তিনি চান। কিছু অর্থ রোজগার করে বাড়ীর খরচের সুরাহা করবার চেষ্টা করার থেকে, সংসার পরিচালনায় অবহেলা না হয় সেটাই দেখা গৃহিণীর কর্ত্তব্য—এই কথাই মনে করতেন ব্যারন।

কিন্তু সেইদিন থেকে ব্যারনেস আমাকে রেহাই দিতে চান না—বারবার অনুরোধ করেন তাঁর জন্য একটি ভাল বই এবং নামকরা প্রকাশক ঠিক করে দিতে। অনেক চেষ্টা করে ব্যারনেসের জন্য দু'টি ছোট প্রবন্ধ অনুবাদের ব্যবস্থা করলাম—ছাপা হবে একটি ইলাসট্রেটেড্ ম্যাগাজিনে। দু' ঘণ্টায় যে কাজ সমাধা করা যায় এক সপ্তাহ কেটে যাবার পরও তার সম্বন্ধে কোন কিছু শুনতে পেলাম না, ব্যারনেসের তরফ থেকে। এ নিয়ে পরিহাস ভরে ব্যারন তাঁর স্ত্রীকে আলস্যপরায়ণ বলাতে মহিলা ভয়ানক চটে গেলেন। সত্যি সত্যিই তিনি এতটা রেগে উঠলেন যে আমার মনে হ'ল ব্যারন তাঁর একটি অত্যন্ত দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছেন। এরপর এ সম্বন্ধে আমি আর কোন কথা বলি নি, পাছে এ নিয়ে আবার স্বামী-স্ত্রীতে গোলমাল বেধে যায় এই ভেবে।

ব্যারনেসের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার আগে আমাদের ভেতরকার সম্বন্ধটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

……এ্যাটিকে বসে ব্যারনেসের পুরান চিঠিগুলো আবার নতুন করে পড়ছিলাম। বেশ উপলব্ধি করছিলাম এ মহিলার অন্তরাত্মাটিও যন্ত্রণাজর্জরিত—একটি মহতী শক্তি যেন নির্দিষ্ট পথ খুঁজে না পাওয়াতে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে—একটি সুরঝঙ্কার-সমন্বিত বাণী যেন শ্রোতার সন্ধান না পেয়ে অনাদরে উপেক্ষিত হচ্ছে—এ যেন অনেকটা আমারই মত। এইখানটাতেই আমার সঙ্গে ব্যারনেসের এমন একটা আত্মিক মিল ঘটে গিয়েছিল যার ফলে আমরা উভয়ে উভয়কে সহানুভূতির চোখে দেখতাম। ব্যারনেস ক্রমশঃ যেন একটি দূষিত অঙ্গের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার পীড়িত আত্মার সঙ্গে এই দূষিত অঙ্গটিকে যেন গ্রাফ্‌ট করে দেওয়া হয়েছিল—ফলে এই দুষ্ট ক্ষতের যন্ত্রণা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। শেষে আমার বোধশক্তিও যেন ভোঁতা এবং স্থূল হয়ে যাচ্ছিল—সূক্ষ্ম বেদনা অনুভূতির শক্তি ও আনন্দ আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম তিনি এমন কি করেছেন যার জন্য তাঁকে আমার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করব? হিংসার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমার কাছে তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা বলেছেন। আমি তাঁর কথা বোঝবার চেষ্টা না করেই তাঁর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছি, তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। তাঁর সঙ্গে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করলে, তিনি নিশ্চয় আমার কথা বুঝতে পারতেন।

ব্যারনের কাছেই ত শুনেছি তিনি স্বামীকে সব রকমের লাইসেন্স দিয়েছেন।

ব্যারনেসের প্রতি একটা বিরাট অনুকম্পার ভাব এসে গেল আমার মনে। বেশ বুঝতে পারছিলাম তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে রহস্যের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে অনেক নিয়তি-নির্দিষ্ট গোপনীয় তথ্য, দেহ এবং মন-সংক্রান্ত অনেক বিকৃত চিন্তা। আমার কেমন মনে হচ্ছিল তাঁকে যদি সর্বনাশের পথের দিকে যেতে বাধা না দিই, তা হ'লে একটা মহাপাপের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে ব্যারনেসকে একটা চিঠি লিখতে সুরু করলাম। তাঁকে অনুরোধ করলাম গত ঘটনা ভুলে যেতে, বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমার ভুল বোঝার ফলেই ঐ বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছিল। কিন্তু কিছুতেই আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত এত ক্লান্তিবোধ করলাম যে, সটান গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালটা ছিল উষ্ণ—সারা আকাশ মেঘাবৃত—ঠিক যেমনটা সচরাচর হয়ে থাকে আগষ্ট মাসের সকালগুলো। আটটার সময় লাইব্রেরীতে গেলাম—মনটা ছিল বিষাদাচ্ছন্ন এবং হতাশায় ভরা। আমার কাছে একটা আলাদা চাবি ছিল, তাই সকাল সকাল গিয়ে বেশ ঘণ্টাতিনেক নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা উপভোগ করলাম গ্রন্থাগারে—কারণ অত সকালে সাধারণ পড়ুয়ারা ওখানে উপস্থিত হয় না। যাতায়াতের পথ দিয়ে পায়চারি করতে লাগলাম—চারপাশে থাক্ থাক্ বইয়ের সারি। একটা অদ্ভুত সূক্ষ্ম নিস্তব্ধ পরিবেশ আমার চারপাশে বিরাজ করছিল—একে ঠিক নিঃসঙ্গতা বা নির্জনতা বলা চলে না—কারণ সারাক্ষণই আত্মিক সংযোগ ঘটছিল নানা যুগের লেখকদের চিন্তাশীল মানসের সঙ্গে। এখান-ওখান থেকে দু'একটি বই টেনে নিয়ে আমি কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর মনসংযোগ করতে চাইছিলাম—আগের দিনের বেদনাপূর্ণ ঘটনাটি যাতে ভুলে যেতে পারি সেই চেষ্টাই করছিলাম। কিন্তু ব্যারনেস যেন ঐ ঘটনার পর থেকে আমার কাছে ভূপতিত ম্যাডোনার মত হয়ে গেছেন—তাঁর মাথার পেছনের সেই স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা এখন নির্বাপিত—এই কুৎসিত পরিবর্তিত ইমেজটিকে কিছুতেই মন থেকে সরিয়ে দিতে পারছিলাম না। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুললাম, পড়ছিলাম কিন্তু একটি শব্দও মর্মে প্রবেশ করছিল না—হঠাৎ মনে হ'ল যেন সামনে ব্যারনেসকে দেখতে পাচ্ছি, চক্রাকারে ওঠা সিঁড়ি দিয়ে তিনি নেমে আসছেন! নীল রঙের পোষাকের তলার দিকটা তিনি একটু টেনে উঠিয়ে নিলেন—তাঁর অনিন্দিত পায়ের পাতাগুলো কি সুন্দর! ছোট্ট এ্যাঙ্কল কি মনোরম দেখতে! আমার দিকে চোরাদৃষ্টিতে চাইছিলেন ব্যারনেস, যেন আমাকে প্রলুব্ধ করছিলেন তাঁর স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহন্তা হ'তে। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল সনির্বন্ধ মিনতি এবং কামনামিশ্রিত মধুর হাসি, ঠিক যেমনটি প্রথম আমার নজরে পড়েছিল গতকাল যখন তিনি স্বামীর চরিত্রহীনতার কথা আমাকে বলছিলেন। এই দৃশ্যটি গত তিনমাস ধরে আমার অন্তরে যে যৌনক্ষুধা সুপ্ত হয়েছিল, তাকে জাগিয়ে তুলল। কারণ এতকাল যে পবিত্র পরিবেশের মাঝে তাঁকে দেখতাম তার ফলে আমার মনের কামভাব আপনা থেকেই অপসৃত হ'ত। আমার অন্তরের সমস্ত আবেগ এবং আসক্তি এখন এসে এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হ'ল—ব্যারনেসকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার জন্য আমার দেহমনে একটা তীব্র আসক্তি জেগে উঠল। তাঁর শুভ্র অঙ্গসৌন্দর্য আমাকে যেন পাগল করে দিচ্ছিল। ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমার স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেল। আমার সহকর্মীরাও এবার একে একে আসছিলেন। আমি প্রাত্যহিক কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। সে সন্ধ্যাটা খুব হৈ-হুল্লোড় করে ক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে কাটালাম।

(৫)

পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমার মনের মেঘ তখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে—বেশ ভাল লাগছিল এই ভেবে যে, অস্বাস্থ্যকর আবেগ-প্রবণতার চাপ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের উপর নিজের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ফিরে পেয়েছি। ব্যারনেসের সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্কটা এখন আমার কাছে একটা দৈহিক এবং আত্মিক দুর্বলতা বলেই মনে হচ্ছিল। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে প্রাতঃরাশ সমাধা

করলাম। তারপর দৈনন্দিন কাজে যোগ দিতে গেলাম। ঐ ব্যাপারটার ঘটাতে মনটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছিল। কাজে ডুবে গেলাম—বেশ তাড়াতাড়ি সময় কেটে যাচ্ছিল।

সাড়ে বারটার সময় পোর্টার এসে জানাল যে ব্যারন এসেছেন। "এও কি সম্ভব?" নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম।" আর তা ছাড়া আমার ধারণা হয়েছিল ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে। এবার একটা বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা হবে ভেবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম।

ব্যারন দেখলাম খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন—আবেগভরে তিনি আমার হস্ত মর্দন করলেন। তিনি আমাকে আর একবার ষ্টীমারে প্রমোদ ভ্রমণে যাবার নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন, বললেন, "সভারটেলজে আমরা এ্যামেটিওর থিয়েটার ট্রিক্যালস দেখব।" ভদ্রভাবে অসম্মতি জানালাম—বললাম, আমার জরুরি কাজ আছে।

"আমার স্ত্রী আপনি আসতে পারলে খুবই খুসী হবেন—তা ছাড়া বেবীও পার্টিতে থাকবে।"

বেবী হচ্ছে সেই বহু-আলোচিত কাজিনটি। ব্যারন বারবার তাঁদের সঙ্গী হবার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। তখনি আমার সম্মতি না জানিয়ে প্রশ্ন করলাম—"ব্যারনেস কি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন?"

"গতকাল তাঁর শরীরটা খুব ভাল ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, কাল তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। আজ সকাল থেকে অবশ্য অনেকটা ভাল আছেন।"

তারপর একটু থেমে আবার ব্যারন জিজ্ঞেস করলেন—"পরশু আপনাদের ভেতর কি হয়েছিল? আমার স্ত্রী বললেন আপনি না কি তাঁকে ভুল বুঝে তাঁর উপর বিরক্ত হয়েছেন?"

আমি প্রথমটায় একটু হতচকিত হয়ে গেলাম। তারপরে বললাম—"তাই না কি, আমি ত এ সব কিছুই বুঝি নি। হয়ত আমি একটু অতিরিক্ত মদ্যপান করে ফেলেছিলাম—কি বলেছি এখন কিছুই মনে নেই।"

"ওসব কথা এখন ভুলে যাওয়াই ভাল—আপনি ত জানেন মেয়েরা অত্যন্ত টাচী হয়। যাক গে—ও ঠিক হয়ে যাবে। আপনি তা হ'লে নিশ্চয় আসছেন আমাদের সঙ্গে? ঠিক বেলা চারটের সময়। মনে রাখবেন আপনি না এলে আমাদের সমস্ত আনন্দ মাটি হয়ে যাবে।" এরপর রাজী হতেই হ'ল। অন্তহীন প্রহেলিকা! ভুল বুঝে তাঁর উপর বিরক্ত হয়েছি!... কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ...ভয়ে কি? ...না রাগে? ...না...

যাক গে, সেই অপরিচিতা কাজিনের আবির্ভাবের প্রত্যাশায় আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। চারটের সময় আগের ব্যবস্থামত ষ্টীমারে এসে হাজির হলাম। ব্যারনেস খুব ভালভাবে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, "আমার সেদিনকার ব্যবহারে নিশ্চয় আমার উপর বিরক্ত হন নি। আমার ঐ একটা বড় দোষ—আমি অত্যন্ত সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়ি।" ও নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই"—উত্তরে বললাম। তারপর তাঁর বসবার জন্য একটা সিট এগিয়ে দিলাম।

"মিষ্টার এ্যাক্সেল...মিস বেবী! ..."

আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্যারন। মেয়েটির বয়স আঠারো বছরের মত। একটু ফ্লার্ট ধরনের—ঠিক যেমনটি আমি আগে থেকেই কল্পনা করেছিলাম।

ব্যারনেসকে খুবই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। গাল দু'টি বসে গিয়েছিল। তাঁর সাজ-পোশাকেও বিশ্রী লাগছিল দেখতে—ফ্রকের রং অত্যন্ত কদাকার মনে হচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম তিনি আসলে অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে। তাঁর দিকে দেখতে দেখতে আমার মনটা অনুকম্পায় ভরে এল—নিজের আগেকার রূঢ় ব্যবহারের জন্য আমি মনে মনে অনুতপ্ত হলাম। এঁকে আমি কি ভেবে ককেট মনে করেছিলাম? এই মহিলা সেইন্ট মার্টার—ব্যারনের অকথ্য অত্যাচার এই মহিলাকে অকারণে সহ্য করে চলতে হচ্ছে।

এবার ষ্টীমার চলতে সুরু করল। আগষ্ট মাসের সুন্দর সন্ধ্যা—আমরা মালার হ্রদের উপর দিয়ে চলেছি—এই পরিবেশে এবং এই পরিস্থিতিতেই লোকে শান্তিপূর্ণ স্বপ্নের জাল বুনতে ভালবাসে। এরপর যে ব্যাপারটা ঘটল সেটা স্বেচ্ছাকৃত না এ্যাক্সিডেণ্টাল বুঝলাম না।

দাদাজী

কথা দিলাম

প্রভাকর মাঝি

গরু-চোরের মতন মুখটা কাচুমাচু করে

দাঁড়িয়ে আছিস, ব্যাপারটা কি, বল তো দেখি, হরে ?

পাঁচটা টাকার জন্যে বড়ো ঠেকায় পড়েছিস ?

এতক্ষণে হতভাগা, ভাঙলি কথা, ইস্‌ !

বিপদেতেই ছুটে মানুষ আপন জনের কাছে,

দায়-অদায়ে চাইলে কিছু লজ্জার কি আছে ?

জলের মতো সরল-সহজ করিস রে অন্তর,

দুঃখ পেলাম, হরিপদ, ভাবলি আমায় পর ।

সেবার নিলি তিন টাকা ধার, তার পরে নেই টিকি

ঠিক করে বল, কখনো তার তাগিদ দিয়েছি কি ?

কি হবে সে টাকায় যদি নাই লাগে তা কাজে ?

সোদ্দা কথা, মনে রাখিস—নই চালিয়াৎ বাজে ।

দশটা টাকাই দেবো তোকে, পাঁচ টাকাতে হয় ?

তুই ত জানিস, কথা আমার মিথ্যে হবার নয় ।

কড়কড়ে নোট দেবোই দেবো—কথা দিলাম, ভাই,

লটারিতে এবার যদি লক্ষ টাকা পাই ।

যাঁদের করি নমস্কার (৫)

অমর মুখোপাধ্যায়

মানিকতলার বোমার মামলার ছেলেরা ধরা পড়েছে। জেলের মধ্যে শুধু হল্লা, হৈ-চৈ লেগেই রয়েছে। কিন্তু, এই হট্টগোলের মধ্যে ঐ ভদ্রলোকটি কে? কোন কথায় কান নেই। একদম চুপচাপ বসে থাকেন। কারও কথায় 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই বলেন না। জেলের পাহারা-ওয়ালারা বলে, উনি না কি রাত্রিতে ঘুমোন না; ভাত খাওয়ার সময় পোকা-মাকড়দের ভাত খাওয়ান, মুখ ধোন না, স্নানও করেন না। কেউ কেউ আবার বলে—উনি সহজ মানুষ নন, একটি আস্ত পাগল।

ছেলেদের মনে একদিন প্রশ্ন উঁকি মেরে গেল—আমাদের ত স্নানের সময় মাথার তেল জোটে না কিন্তু, ওঁর জোটে কোথা থেকে? অমন তেল-চকচকে মাথার চুল হ'ল কি ক'রে?

ছেলেদেরই একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল একদিন—আপনি স্নানের সময় তেল পান কোথা থেকে? উত্তর হ'ল, আমি স্নান করি না। সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কতকগুলি পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। ওটা তারই একটা। আবার প্রশ্ন হ'ল—সাধনার দ্বারা আপনি কি পেলেন? তিনি হেসে জবাব দিলেন—যা খুঁজছিলাম, তাই পেয়েছি। শেষে, মামলার কথা জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বললেন—এ মামলায় আমি ছাড়া পাব।

মামলা শেষ হ'ল এক বছর পরে। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল তাঁর কথা। তিনি সত্য সত্যই জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

এই মানুষটি যে সহজ মানুষ নন—একথা সত্য। ছাত্র-জীবনে ইনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল রত্ন। বিলেতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু, অশ্ব চালনায় কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। পরে, দেশে ফিরে এসে বরোদার কোন এক কলেজে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

কিন্তু, বরোদায় বেশীদিন মন বসল না। বাংলার ছেলে ফিরে এলেন বাংলায়। সুরু হ'ল আগুন নিয়ে খেলা। দেশের তরুণ, যুবকরা বেরিয়ে এল দলে দলে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হবে। ইংরাজের শাসন-মুক্ত করতে হ'বে ভারতবর্ষকে—পণ করল তারা।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই চিনতে পারছ, ঐ মানুষটিকে। উনি সেদিনের বিপ্লবী গুরু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। আজকের দিনে ওঁর পরিচয় জগৎ-জোড়া। বর্ত্তমান পৃথিবীর মানুষ ওঁকে ঋষি অরবিন্দ ব'লে প্রণাম করে। যাঁকে উদ্দেশ ক'রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

১৫ই আগষ্ট। এই দিনটিতে আমরা মুক্ত হয়েছি বিদেশী শাসন থেকে। আর, মনে রেখ, এই শুভ দিনটিতেই জন্ম নিয়েছিলেন ঋষি অরবিন্দ—সেদিনের সেই বিপ্লবী গুরু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

মনে রেখ—

বাঙ্গালী লেখকের ছদ্মনাম

১) ভানু সিংহ —রবীন্দ্রনাথ
২) দিবাকর শর্ম্মা —রবীন্দ্রনাথ
৩) বীরবল —প্রমথ চৌধুরী
৪) টেকচাঁদ —প্যারীচাঁদ মিত্র
৫) পরশুরাম —রাজশেখর বসু

বাঙ্গলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক ও তাঁহাদের লিখিত বই

১) কাশীরাম দাস —মহাভারত
২) কৃত্তিবাস ওঝা —রামায়ণ
৩) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র —অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর
৪) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী —চণ্ডীমঙ্গল
৫) স্বর্ণকুমারী দেবী —দীপ নির্বাণ

ওফেলিয়া

অনিল চক্রবর্ত্তী

পটে আঁকা ছবির মত ছোট সহর ষ্ট্রাটফোর্ড। একদিকে তার রূপালী নদী 'অ্যাভন', অন্যদিকে শ্যামল বনভূমি 'ফুলব্রুক-পার্ক।' নদীর ধারে উইলো গাছের ছায়া। মাঠে মাঠে সবুজ ঘাসের মায়া। পার্কে গাছের ছায়ায় লঘু পায়ে হরিণ-শিশু খেলা করে। এই সহরেরই একটি খেয়ালী তরুণ আপনমনে বেড়ায় ঘুরে। তাকে কখনও দেখা যায় নদী-তীরে, কখনও দূরে বনের ছায়ায়। বনের শান্তি ঘরে মেলে না। তাই সে ঘরছাড়া। মনটিও তার খাপছাড়া। কি যেন সে খুঁজে ফেরে অথচ পায় না।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে তরুণটির বয়স যখন বছর ষোল তখন একটি বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা ঘটে এই সহরে—একটি মেয়ের মৃত্যু। মৃত্যু-দৃশ্যটি তার মানসপটে থাকে আঁকা চিরদিন। কোনদিন সে ভুলতে পারে না ঘটনাটি, ভোলে না। এই সহরেরই মেয়ে ক্যাথারিন হ্যামলেট। সে ছিল ফুলের পরী। কি ভালই সে বাসত ফুল! সকালে ঘুম ভাঙতেই সে ছুট ফুলবাগিচায়। বনে বনে আপনমনে ফুল কুড়িয়ে দিন কাটে তার। সে ফুল তুলত আর ফুলগুলিকে নিত জলে ভিজিয়ে। জল মানে অ্যাভন নদীর জল। রূপালী জলে সোনালী ফুল ধুয়ে নেওয়া তার নিত্য কাজ।

অ্যাভনের তীরে একটি অনেক কালের উইলো গাছ ডালপালা ছড়িয়ে শিকড় বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়েছিল নদী-জলে। তাই এখানে নদী শান্ত। ঢেউ নেই, স্রোত নেই। মেয়েটি রোজই গাছের শিকড় বেয়ে জলে নামত। তারপর আলতোভাবে ফুলগুলিকে নিত ভিজিয়ে। এমনিভাবেই কাটছিল দিনগুলি। হয়ত আরও অনেকদিন কাটত। কিন্তু একদিন ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হ'ল। অন্যদিনের চেয়ে মেয়েটি সেদিন একটু দেরি করেই পথে নামে। সেদিনের ফুলগুলি বৃষ্টিধারায় ম্রিয়মান। ম্রিয়মান সে নিজেও। কোথাও বা ঝরা ফুলে লেগেছে কাদা। মলিন ফুলগুলিকে দু'টি কচি হাতে ভরে নিয়ে সে ছুট দেয় সেই উইলো গাছটির ধারে, নদী-তীরে। তারপর প্রতিদিনের মতই তরতর ক'রে বৃষ্টি-ভেজা পিছল শিকড় বেয়ে নামতে থাকে জলের কিনারায়। অতি যত্নে সে ধুতে থাকে তার প্রিয় ফুলের মালিন্য। ধুয়ে নেওয়ার সময় দু'একটির পাঁপড়ি ছিঁড়ে ভেসে যায় জলে। দুঃখে তার দু'চোখে নামে জলের ধারা, চোখের জল সমিল হয় নদীজলে। একটু অসাবধানতা—তার হাত পিছলে যায়। ফুলগুলি জলেই ভাসতে থাকে কিন্তু তাকে আর দেখা যায় না। পরদিন সে ভেসে উঠে অনেক ভাসা-ফুলের মাঝে ফুলেরই মত। সহরের ছেলে-বুড়ো সকলেরই সে প্রিয়। সবাই তাকে খুঁজতে থাকে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ষ্ট্রাটফোর্ডের ফুলপরী। অবশেষে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর তারা দেখল ক্যাথারিনের মৃতদেহ অ্যাভনের জলে। উইলো গাছের ছায়ায়। অনেক ভাসা-ফুলের মাঝে ফুলপরীর মুখখানি পদ্মফুলের মত ভাসছে।

এই মৃত্যু-দৃশ্যটি সহরের সেই খেয়ালী তরুণটির মনে গভীর রেখাপাত করে। তার প্রিয় নদী-তীরে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ দেখল। দু'চোখে নামল জলের ধারা। তারপর সারাদিন ফুলব্রুক-পার্কের বড় বড় গাছের ছায়ায় বেড়াল ঘুরে।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ একুশটি বছর পার হয়ে গেছে সেদিনের তরুণের আজ যৌবনের শেষ। লণ্ডন সহ বসে তিনি লিখছেন একটি বিয়োগান্ত নাট "হ্যামলেট।" লিখছেন নায়িকা ওফেলিয়ার মৃত্যুদৃশ্যটি তাঁর দৃষ্টি পেরিয়ে গেল একুশ বছর পিছনের এক মৃত্যুদৃশ্যে। তাঁর নাটকের ওফেলিয়ার মৃত্যুদৃশ্যের স একুশ বছর আগের দেখা দৃশ্য এক হয়ে গেল। চো নামল একই জলের ধারা। ব্যক্তিগত বেদনা হ' বিশ্বজনীন বেদনা। তিনিও হলেন বিশ্বজনীন কবি এ নাট্যকার মহাকবি উইলিয়াম শেক্সপীয়র।

স্মৃতিকণা

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

(অপূর্ব্ব আতিথেয়তা)

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের কথাসাহিত্য পত্রিকায় (রামানন্দ জন্ম-শত-বার্ষিকী সংখ্যা) স্বর্গত শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে ৬ই নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে যে একখানি চিঠি লেখেন তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে দেখি। ঐ পত্রটিতে 'নবীনা জননী' পুস্তকের রচয়িতা প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম এবং তিনি প্রবাসীর জন্ম যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। একটি প্রবন্ধ ছিল একজন মুসলমান ভদ্রলোকের আতিথেয়তা সম্বন্ধে। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন এই প্রবন্ধটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় উহা আমার পড়িবার সৌভাগ্য হয়। আমার জীবনের অনুরূপ একটি ঘটনা উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ঘটে এবং ইচ্ছা ছিল যে উহা সেই সময়ে লিখিয়া প্রবাসীতে প্রকাশের জন্ম পাঠাইয়া দিব কিন্তু কয়েকটি অনিবার্য্য কারণবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সম্প্রতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপরি-উক্ত পত্রখানি পড়িয়া সে দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। সিমলা প্রবাসকালে প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ করিবার সুযোগ হয়। ১৯০৭ সালে আমি যখন কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে প্রথমে যোগদান করি সে সময়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথায় থাকিতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিমলা আসিবার পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং উহা পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। উভয়েই ছোট সিমলা পল্লীতে থাকিতেন। 'নবীনা জননী' পুস্তকখানি আমার পূর্ব্বেই পড়া ছিল। গ্রন্থকারের নাম সাদৃশ্য থাকায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পুস্তকের রচয়িতা কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি যে তাঁহার বহিখানি পড়িয়াছি এবং উহা আমার ভাল লাগিয়াছে এ কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করেন। সেই বৎসর আমি 'কুন্তলীন পুরস্কার' গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করি। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক নির্ব্বাচিত 'রাখীবন্ধন' নামক আমার গল্পটি 'কুন্তলীন কর্তৃপক্ষেরা স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সম্ভবতঃ এই পুস্তিকাটির সম্বন্ধে শুনিয়া থাকিবেন। আমার সাহিত্য-প্রীতির কথা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে রবিবার অথবা ছুটির দিনে তাঁহার বাসা-বাটীতে প্রায়ই আহ্বান করিতেন। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তক-গুলির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক ছিল দেখিয়াছিলাম। উহা হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি তখন Director-General of Education-এর অফিসে Curator পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুকাল পরে যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ পুনর্গঠিত হয় সেই সময়ে তিনি বাঙ্গলা প্রদেশের শিক্ষা বিভাগে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯২০ সালে আমি যখন কলিকাতায় যাই সে সময়ে হঠাৎ একদিন পথে বৈকাল বেলায় দেখা হইলে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ঝামাপুকুরস্থ বাসা-বাটীতে উপস্থিত হন। তাঁহার মাথায় হ্যাট দেখিয়া আমি প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। বাসায় পৌঁছিলে তিনি প্রবাসের বিগত দিনগুলির কথা উল্লেখ করেন ও নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি সেই সময়ে Presidency Division-এর Inspector of Schools and Colleges-এর পদে অধিষ্ঠিত জানিতে পারি। তাঁহার মত এমন সদা-প্রফুল্ল, সদাশয় ও উদার-ভাবাপন্ন ব্যক্তির সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্য আমার খুব কমই হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় উভয়ে বাঁকুড়া নিবাসী ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয়েই কৃতী ছাত্র ছিলেন।

এখন আমার জীবনে যে অপূর্ব্ব ঘটনাটি ঘটিয়াছিল

তাহার উল্লেখ করি। ১৯১২ সালে যখন কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসগুলির সারা বৎসর সিমলায় থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রত্যেক বৎসরে দুইবার স্থান পরিবর্ত্তন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় প্রত্যেক বৎসর বড়দিনের সময় দেশভ্রমণে বাহির হইতাম। আমার অনুজ ভ্রাতা ও এক খুড়তুতো ভ্রাতা আমার সঙ্গ লইত।

১৯১৪ সাল। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ও চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। বড়দিনের পুরা ছুটি পাওয়া সম্ভব হইল না। তিনজনে মিলিয়া স্থির করিলাম যে, দূর দেশে না যাইয়া কাছাকাছি লাহোর ও অমৃতসর ঘুরিয়া আসি। লাহোরে গিয়া কালীবাড়ীতে গিয়া উঠিব স্থির হয় এবং অমৃতসরে থাকা সম্বন্ধে আমার অনুজ ভ্রাতা তাহার এক পাঞ্জাবী অফিস বন্ধুর সহিত ব্যবস্থা করে। এই বন্ধুটির ভ্রাতা অমৃতসরের একজন উকীল। স্থির হইল তিনি নিজে অমৃতসর ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার বাটীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

যে দিন অমৃতসরে পৌঁছব সেই দিন দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইয়া লাহোর ত্যাগ করি ও অনতিবিলম্বেই অমৃতসরে পৌঁছি। ষ্টেশনে নামিয়া যে উকীল ভদ্রলোকটির উপস্থিতি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, দেখি যে তিনি অথবা তাঁহার প্রেরিত কোনও লোক আমাদের লইতে আসেন নাই। উকীল মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা অমৃতসরে ভাল হোটেল অথবা ধর্ম্মশালা আছে কি না সে সম্বন্ধে কোনও খোঁজ লওয়া আবশ্যক মনে করি নাই। প্লাটফর্ম্ম জনশূন্য হইলে উহারই এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কি করা কর্ত্তব্য আলোচনা করিতেছি এমন সময় দেখি যে প্লাটফর্ম্মের অন্য প্রান্ত হইতে একটি মধ্যবয়সী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ধীর পদক্ষেপে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পরিধানে তাঁহার কালো সার্জ্জের আচকান ও পাজামা এবং মস্তকে astrakhan টুপি। তাঁহার উদ্দেশ্য কি ঠিক বুঝা গেল না। তিনি নিকটে আসিলে তাঁহার শীর্ণ দেহ দেখিয়া মনে হইল তিনি বেশ অসুস্থ। মুখটি বুদ্ধি-প্রদীপ্ত হইলেও উহা বড় বিষণ্ণ বলিয়া বোধ হইল। আমাদের সহিত তাঁহার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে মনে মনে যখন অনুমান করিতেছি দেখি যে তিনি আমাদের নিকট আসিয়া ইংরাজিতে আমাদের 'ব্যাপার কি' বলিয়া প্রশ্ন করেন এবং উল্লেখ করেন যে আমাদের যদি কোনও সঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে তিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিলে বিশেষ সুখী হইবেন। তাঁহার এই অযাচিত সাহায্য করিবার স্পৃহা আমাদের যে একটু বিস্মিত করে নাই এমন নহে। অবশেষে তাঁহাকে আমাদের কথা বলিতে হইল। প্রত্যুত্তরে তিনি ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি মুসলমান এবং সরকারী কর্ম্মে যদিও তাঁহাকে সিমলাতে থাকিতে হয়, অমৃতসরই তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি। উপস্থিত ছুটি লইয়া এখানে আছেন। আমাদের যদি কোনও আপত্তি না থাকে, আমরা তাঁহার অতিথি হইলে তাহা তাঁহার পক্ষে যে অপরিসীম আনন্দের বিষয় হইবে তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন। আমাদের সমস্যার সমাধান যে এরূপ সহজে ঘটিবে তাহা অনুমান করিতে পারি নাই।

একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া আমরা চারিজনে তাঁহার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। বড় রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটি অল্প-পরিসর গলির মুখে গাড়িটি আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোকটি গাড়ি হইতে নামিয়া বলিলেন যে এই গলির ভিতরে তাঁহার বাড়ী, আমাদের এখানেই নামিতে হইবে। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আমরা একটা বৃহৎ বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গাড়োয়ান আমাদের দ্রব্যাদি লইয়া পিছনে পিছনে আসিল। বাড়ীটিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বলিলাম যে সে যেন আমাদের জন্য গাড়ি লইয়া অপেক্ষা করে, কিছু পরেই আমরা সহর দেখিতে বাহির হইব।

বাড়ীটির ত্রিতলে উঠিয়া তিনখানি বেশ বড় বড় ঘর ও তাহার কোলে প্রশস্ত একটি দালান দেখিলাম। সম্মুখে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ছোট একটি ছাদ। দালানে যে কয়খানি চেয়ার ছিল তাহাতে গিয়া আমরা বসিলাম। বাড়ীটি বড় নির্জ্জন বলিয়া বোধ হইল। গৃহস্বামী ভৃত্যকে নির্দ্দেশ দিলে যে আমাদের হাত মুখ

ধুইবার জন্য গরম জল, সাবান ও তোয়ালে ছাদের এক কোণে যে একটি জলচৌকি পাতা ছিল তাহাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। হাত, মুখ ধোয়া শেষ হইলে গৃহস্বামী আমরা চা-পানে অভ্যস্ত কি না জানিতে চাহিলেন। আমরা দুই ভ্রাতা চা পান করিতাম না তাহা জানাইলাম। অতঃপর পরিচয়াদি কিছু কিছু হইল। নাম বলিলেন দীন মহম্মদ, বিশেষ কিছু বলিতে চাহিলেন না। পরে সিমলায় যখন প্রত্যাবর্ত্তন করি তখন জানিতে পারি যে তিনি Army Head Quarters-এর Quarter Master General Office-এর একজন পদস্থ কর্মচারী। বিপত্নীক এবং একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। সরকারী কাজের পর যে অবসরটুকু পান তাহা সদ্গ্রন্থাদি পাঠে ব্যয়িত হয়।

আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম তাহার ঠিক পাশেই যে ঘরটি ছিল আমার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। উহা লাইব্রেরী বলিয়া বোধ হইল, কয়েকটি বৃহৎ আলমারি নানাবিধ পুস্তকে সজ্জিত। উঠিয়া গিয়া দ্বারের সার্সির ভিতর হইতে বহিগুলি কি বিষয়ের তাহা জানিবার কৌতূহল হইল। অধিকাংশ আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি-মূলক দেখিলাম। সার সৈয়দ আমির আলির History of the Saracens ও চোখে পড়িল। পুস্তকগুলির প্রতি আমার এই আগ্রহ দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে বহিগুলি অবিন্যস্তভাবে কয় মাস ধরিয়া পড়িয়া আছে। ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি দীর্ঘ ছুটি লইয়া মিশরে (ঈজিপ্ট) চলিয়া যাইবার পর কেহই পুস্তকগুলির প্রতি যত্ন লয় নাই। মিশরে গিয়া তিনি প্রখ্যাত 'অল-অজহর্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে যোগদান করেন, আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত বিশেষভাবে পরিচয় লাভ করা উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের বিষয় ছয় মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়েন, মাত্র এক সপ্তাহ হইল ভারতবর্ষে ফিরিয়াছেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

ইতিমধ্যে ভৃত্য আমার খুড়তুতো ভাইয়ের জন্য এক কাপ চা ও তিনখানি খালি রেকাবি টেবিলের উপর রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে দেখি সিঁড়ি বাহিয়া এক ব্যক্তি একটি বেশ বড় খাবারের চাঙ্গারী লইয়া আসিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া বুঝিলাম যে সে একজন হিন্দু হালুইকর। আমাদের জন্য গৃহস্বামীর এই আয়োজন দেখিয়া বিস্ময় অনুভব করি। কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি নিজ হইতে বলিলেন সহরের শ্রেষ্ঠ হিন্দু দোকান হইতে এই আহার্য্যগুলি আনীত হইয়াছে এবং আশা করেন যে, ইহার সদ্ব্যবহার করিতে আমাদের কোনও আপত্তি হইবে না। আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলাম যে এরূপ ব্যবস্থা করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ইহাতে তিনি একটু বিস্মিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। নিজ হাতে খাদ্য তুলিয়া লইতে আমরা একান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া অবশেষে সহাস্যে তিনি তিনটি রেকাবি সাজাইয়া দিলেন। নিজে কিছু লইলেন না দেখিয়া প্রশ্ন করায় জানিতে পারিলাম যে ডাক্তারের নির্দ্দেশ-মত নিয়ম মানিয়া তাঁহাকে চলিতে হয়। রাত্রে সামান্য কিছু আহার করেন।

জলযোগ শেষ করিতে প্রায় তিনটা বাজিল। অতঃপর আমরা নগর পরিভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলাম। কৃতজ্ঞ চিত্তে বিদায় প্রার্থনা করিলাম এবং বলিলাম যে ষ্টেশনে ফিরিবার মুখে তাঁহার বাটী হইতে আমাদের দ্রব্যাদি লইয়া রাত্রের ট্রেণ ধরিব। গলি ছাড়িয়া বড় রাস্তা পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে আসিলেন। যখন আমরা তিনজন গাড়িতে উঠিতে যাইতেছি তিনি তাঁহার একটি অনুরোধের কথা জানাইলেন। বলিলেন যে আমরা এই নগরে নবাগত, যাহা কিছু দ্রষ্টব্য তাহা সময়মত দেখিয়া উঠা কঠিন হইবে। আমরা যে শুধু তাঁহারই অতিথি তাহা নহে, এই সহরের অতিথি সে কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন এবং আমাদের কিছু বলিবার অবসর না দিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন এবং গাড়োয়ানকে কোথায় যাইতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ দিলেন। অসুস্থ দেহে তিনি যে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকিবেন ইহা আমাদের মনে যথেষ্ট অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিল। অবশেষে বলিতে বাধ্য হইলাম যে স্বর্ণমন্দিরে সন্ধ্যাকালে যে আরতি (আসা-দিওয়ার) হয় তাহা শুধু দেখিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি, উহা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে যথেষ্ট দেরি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা

সুতরাং তাঁহার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সঙ্গে যাওয়া সমীচীন হইবে না কিন্তু তিনি সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা স্বর্ণমন্দিরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। সর্ব্বাগ্রে ইহার নিকটবর্ত্তী সুউচ্চ ঘণ্টা-ঘরটি (clock tour) চোখে পড়িল। সুবৃহৎ জলাশয় ও উহার মধ্যে স্থাপিত স্বর্ণমন্দিরটি দেখিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। গেট হইতে মন্দির পর্য্যন্ত একটি মর্ম্মর সেতু বর্ত্তমান। তাহা অতিক্রম করিয়া আমরা মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এখানে জুতা খুলিতে হইল। দেখিলাম দীন মহম্মদ সাহেব বাহিরেই রহিলেন, বলিলেন মন্দিরে প্রবেশ তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কথাটি শুনিয়া আমার মন পীড়িত হইয়া উঠিল, মনে পড়িল গুরু নানকজীর জীবন-চরিতে যেন পড়িয়াছিলাম যে তাঁহার প্রথম দুইজন শিষ্যের মধ্যে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান ছিলেন। বর্ত্তমানে ব্যবস্থা অন্য রূপ দাঁড়াইয়াছে।

মন্দিরের অভ্যন্তরটি দেখিয়া মন প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। চারিদিক উন্মুক্ত, আলো ও বাতাসের প্রাচুর্য্য। মন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি উচ্চ বেদীর উপরে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ-সাহেব। গ্রন্থ-সাহেবের পৃষ্ঠাগুলি উন্মুক্ত। দুই পাশে দুই জন চামর দুলাইতেছে। মন্দিরে অষ্ট প্রহর কীর্ত্তন হয় শুনিলাম। এক ব্যক্তি বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করিতেছেন দেখিলাম। আমরা দ্বিতলে উঠিয়া কিছুক্ষণ গান শুনিয়া মন্দিরের ছাদে উঠিলাম ও পরে চারিদিক পরিভ্রমণ করিয়া আসিলাম। বিলম্ব হইয়া যাইতেছে দেখিয়া নিকটস্থ বাবা অটলের স্বর্ণ মণ্ডিত সুউচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ (মিনার) বাহির হইতে দেখিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম। দেখি যে দীন মহম্মদ সাহেব মন্দিরের বহির্দিকের চত্বরে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। সে চত্বরে বসিবার কোনও স্থানও ছিল না। প্রায় এক ঘণ্টাকাল অসুস্থ দেহে পাদচারণা করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার কষ্ট হইয়া থাকিবে এ কথা ভাবিয়া মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

মন্দির ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একজন গ্রন্থীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলাম যে আরতি সন্ধ্যা ৭টার সময় আরম্ভ হইবে। অতঃপর দীন মহম্মদ সাহেব আমাদের শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ "রাম বাগ" দেখাইতে লইয়া গেলেন। বিশাল স্থান ব্যাপিয়া এই উদ্যানটি। উহা অতিক্রম করিতে বেশ কিছু সময় লাগিল। তাহার পর স্থানীয় প্রসিদ্ধ বাজার প্রভৃতি দেখিয়া মন্দিরে ফিরিতে প্রায় ৭টা বাজিল। দীন মহম্মদ সাহেবকে গাড়িতে বসাইয়া আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম কিন্তু জন-সমাবেশ না দেখিয়া মনে একটা সন্দেহ জাগিল। একজন গ্রন্থীকে আরতি আরম্ভ হইতে কত বিলম্ব আছে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ওয়াহ, উহা ত কিছুক্ষণ আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে!" যে উদ্দেশ্যে অমৃতসরে আসিয়াছিলাম তাহা এরূপ ভাবে ব্যর্থ হওয়াতে মনে যে দুঃখ জাগিয়াছিল তাহা ভুলিবার নহে। যাহা হউক, মন্দির ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থীটি আমাদের প্রত্যেককে অপূর্ব্ব স্বাদ-বিশিষ্ট কড়া-প্রসাদ উপহার দিলেন। অবশ্য দক্ষিণাও কিছু দিতে হইয়াছিল।

আমাদের শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া দীন মহম্মদ সাহেব আমাদের ব্যর্থতায় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং আর একদিন থাকিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বেশী দিন ছুটি না থাকায় উহা যে সম্ভব নহে তাহা জানাইলাম। ফিরিয়া আসিয়া গাড়ি হইতে আমরা আর নামিলাম না। দীন মহম্মদ সাহেবকে ভৃত্যদের দিয়া আমাদের দ্রব্যাদি পৌঁছাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে দুইজন ব্যক্তি আমাদের দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতেছেন। মাথায় সুবৃহৎ পাগড়ি, পরিধানে কুর্ত্তা, ওয়েষ্ট কোট, লুঙ্গি ও পায়ে দেশী নাগরা জুতা। দ্রব্যাদি গাড়ির মাথায় রাখা হইলে দীন মহম্মদ সাহেব একটি খাবারের বাস্কেট লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং উহা সযত্নে গাড়ির ভিতর রাখিয়া দিলেন। যে দুই ব্যক্তি আমাদের দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহাদের নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের বলিলেন যে, ইঁহারা তাঁহার খুড়তুতো ভাই, আমাদের কথা শুনিয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের ঘরোয়া পোশাক দেখিয়া তাঁহারা যে দীন মহম্মদ সাহেবের নিকট আত্মীয় তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের

সহিত পরিচয় হইলে তাঁহারাও আমাদের আর একদিন থাকিয়া যাইবার কথা বলিলেন কিন্তু উহা যে সম্ভব নহে তাহা জানাইলাম। তাহাদের আত্মীয়সুলভ এই ব্যবহার আমাদের অন্তর স্পর্শ করিল। যথাযোগ্য বিদায় সম্ভাষণার পর ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। গাড়িতে বসিয়া নম্র ও ধীর প্রকৃতি মিতভাষী দীন মহম্মদ সাহেবের কথা ভাবিতে লাগিলাম। শীর্ণ ও অসুস্থ দেহ লইয়া অধিকন্তু, অভুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাদের আপনার করিয়া লইয়া, আমাদের সর্ব্বতোভাবে সুখ সুবিধা লক্ষ্য করিবার জন্য বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে আমাদের সঙ্গদান করিয়া হৃদয়ের যে ঔদার্য্যের পরিচয় দিলেন তাহা স্মরণ করিয়া তাহা অতুলনীয় বলিয়াই মনে হইল। লর্ড মর্লের উক্তিটি মনে পড়িল, "It is not enough to do good : one must do it the right way."

পাঁচ বৎসর পুর্ব্বে কলিকাতায় মহর্ষি ভবনে কবিগুরুর কণ্ঠে তাঁহার রচিত যে গানটি শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাহাও সেই সময়ে মনে জাগিয়া উঠিল,—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই !"

* * *

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ভদ্র মুসলমানের নিকট যে সহৃদয় ব্যবহার পাইয়াছিলাম তাহাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।

১৯২০ সাল। ডিসেম্বর মাস। অত্যধিক শীত পড়ায় ও তুষারপাত আসন্ন দেখিয়া কর্ম্মস্থল সিমলা হইতে তিন মাস ছুটি লইয়া স্ত্রী ও দুইটি শিশুপুত্র লইয়া কলিকাতা যাত্রা করি। দুঃখের বিষয় কলিকাতায় কিছুদিন থাকিবার পর আমি নিজে ও দেড় বছরের শিশুটি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হই। ছুটি ফুরাইবার কিছু পুর্ব্বে রোগমুক্ত হইলে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া, ভাগলপুরে নিজ বাটীতে কিছুদিন থাকিয়া, তথা হইতে সিমলা যাত্রা করি। সে সময়ে ভাগলপুর হইতে কালকা পর্য্যন্ত direct কোনও ট্রেণ ছিল না। গভীর রাত্রে কিউল জংসনে নামিয়া এক্সপ্রেস বা মেল ট্রেণ ধরিতে হইত। যে রাত্রে কিউল ষ্টেশনে পৌঁছি, দেখি যে এক্সপ্রেস ট্রেণটির দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ এবং তথায় স্থান না পাওয়ায় ষ্টেশন মাষ্টারের নির্দ্দেশে একটি খালি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠি। বেলা ১০টার সময় ট্রেণ এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌছিলে তথাকার ষ্টেশন মাষ্টার নিজে আসিয়া আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়া প্রথম শ্রেণীতে কেন ভ্রমণ করিয়াছি তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলাতে তিনি আমাকে অতঃপর কোনও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। ইতিপূর্ব্বেই আমি মনস্থ করিয়াছিলাম যে, এলাহাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া পাঞ্জাব মেল ধরিব ও শীঘ্র কালকা পৌঁছিব। কিছুক্ষণ পরে পঞ্জাব মেলটি আসিলে দেখা গেল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি যাত্রীতে পরিপূর্ণ, ট্রেণে উঠিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। এমন সময় হঠাৎ দেখি যে, যে-কামরার সম্মুখে আমরা দাঁড়াইয়া আছি তাহার জানালা হইতে সিমলা-প্রবাসী আমার একটি বন্ধুর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র সেই কামরায় উঠিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। কুলিদের সাহায্যে অতি কষ্টে গাড়িতে প্রবেশ করিলাম বটে কিন্তু দেখি যে তিলমাত্র বসিবার স্থান কোথাও নাই। দাঁড়াইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। রুগ্ন শিশুটি বহুক্ষণ ফাঁকা গাড়িতে থাকিবার পর এখন এই অসম্ভব ভীড় দেখিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারা গেল না। কামরাটির অপর পার্শ্বটি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা দেখিয়া আমরা সেইদিকে গিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার কাছে যে বার্থটি ছিল তাহাতে য়ুরোপীয় বেশধারী একজন সৌম্যদর্শন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি শয়ান দেখিলাম। শিশুটির উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন ও উহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া শিশুটি ক্রন্দন-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে জানাইলাম। তাহার পর কিছু কাথাবার্ত্তা হইলে তিনি জানাইলেন যে, তিনি গাজীপুরের একজন ডাক্তার। নাম শুনিলে বুঝিলাম তিনি মুসলমান। দিল্লীতে রোগী দেখিতে যাইতেছেন। শিশুটির ক্রন্দনে তিনি বিচলিত হইয়াছেন দেখিলাম। বলিলেন যে শিশুটির ক্রন্দন অসুস্থতাজনিত নহে, উহা ঘুমের আবদার ধরিয়াছে, উহাকে অবিলম্বে

শয়ন করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহা বলিয়াই দেখি যে তিনি ত্বরিত গতিতে নিজ ছোট বিছানাটি হোল্ডলে পুরিয়া ও এট্যাচে কেসটি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও আমার স্ত্রীকে 'বহিনজী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বিছানা করিয়া শিশুটিকে শোয়াইয়া দিতে বলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় শিশুটিকে শোয়াইয়া দিবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া ডাক্তার সাহেবটি কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে তাঁহার অনুমান যে কত সত্য সে কথা উল্লেখ করিয়া আমি যে পিতা মাত্র ও তিনি যে একজন ডাক্তার এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন! আমার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি অন্যত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে গাড়ির গতি মন্থর হইয়া আসিয়াছিল ও শীঘ্র ফতেপুর ষ্টেশনে উহা আসিয়া পৌছিল। অতঃপর ডাক্তার সাহেব বিদায় গ্রহণ করিয়া কামরা হইতে নামিয়া পড়িলেন। সমগ্র ট্রেণটিতে যেরূপ ভীড় দেখিয়াছিলাম তিনি যে অন্যত্র কোনও স্থান করিয়া লইতে পারিবেন কি না সে সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ ছিল। প্ল্যাটফরমে নামিয়া তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ পাশের কামরায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে দেখি যে তিনি বসিবার কোনও স্থান না পাইয়া দুইটি বার্থের মধ্যে যে অপরিসর স্থানটি আছে তাহার হোলডলটি রাখিয়া তাহার উপর নির্লিপ্ত ভাবে বসিয়া আছেন।

বর্ত্তমানে আমার ৮৪ বৎসর চলিতেছে। এই সুদীর্ঘ জীবনে বহুবার ট্রেণে যাতায়াত করিতে হইয়াছে কিন্তু গাজীপুরের এই সহৃদয় ডাক্তার সাহেবের মত সুমধুর ব্যবহার আর কাহারও নিকট হইতে কখনও পাইবার সৌভাগ্য হয় নাই।

—(*)—

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

উন্নয়ন প্রয়াসের পনের বৎসর

গত পনের বৎসরের উদ্দিষ্ট পরিকল্পনানুসারী উন্নয়ন প্রয়াসের অভিজ্ঞতা থেকে একটা শিক্ষা ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মতন একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার রূপায়ণের গতিপথে যে সকল অনিবার্য্য রাজনৈতিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রভাব ক্রিয়া করতে সুরু করে তার ফলে উন্নয়নের মূল কাঠামোটির রূপ বদল হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। গত পনের বৎসরের উন্নয়ন-পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়াস অবশ্যই খানিকটা পরিমাণে প্রথম দিকে সফলতা অর্জ্জন করেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কিছুদিন ধরে, বিশেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের শেষার্দ্ধ থেকে সুরু ক'রে, তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসর ধরে সাফল্যের পরিবর্ত্তে অধিকতর পরিমাণে সাফল্যের অভাবই পরিকল্পনা রূপায়নের কাজটিকে ব্যহত করে আসছিল, একথা আজ পরিকল্পনা দপ্তরের বড় ও মেজ কর্ত্তারাও স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতিটিই আদৌ সার্থকতা-বাচক হওয়া সম্ভব কি না এমন প্রশ্নও লোকের মনে ক্রিয়া করতে সুরু করেছে দেখতে পাওয়া যায়।

দুই বৎসর আগে যখন স্বর্গগত লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রস্তাব করেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজটির জন্য কতকগুলি নূতন পথ-নির্দ্দেশক (guide-lines)—যথা নূতন প্রয়োগ সুরু করবার পূর্ব্বে অসম্পূর্ণ পুরাতন প্রয়োগগুলির সম্পূর্ণীকরণ, অধিকতর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, স্থির-মূল্যাবস্থা প্রবর্ত্তন, অধিকতর পরিমাণে কর্ম্ম-সংস্থানের আয়োজন ইত্যাদি-উদ্ভাবন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তখন পরিকল্পনা রচনায় নূতন বাস্তবতা অনুসরণের আশু প্রয়োজন খানিকটা স্বীকৃত হ'তে সুরু করে। যোজনা ভবনের কর্ম্মকর্ত্তারা দাবী করেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনার নব-কলেবর এই নূতন চিন্তারই পরিচায়ক। কিন্তু এই চিন্তা এবং নূতন পরিকল্পনার খসড়ায় তার যে পরিচয় প্রকাশ পায় সেটা কি যতটা একান্ত প্রয়োজন ততটাই বাস্তবতা অনুসারী? এইটিই আজকের দিনের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন।

পরিকল্পনার নূতন রূপ

আমাদের দেশে আর্থিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়োগ আজ নূতন নয়। সেচব্যবস্থা, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, রাজপথ ও রেলপথ সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়োগ বহুকাল ধরেই, স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই, চলে আসছিল।

কিন্তু বৃহৎ শিল্পে সরকারী প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত নূতন। তা ছাড়া পূর্ব্বে সরকারী প্রয়োগে যে সকল আয়োজন চালু থাকত সেগুলির সম্প্রসারণ, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি বিষয়ক আয়োজন প্রতি বৎসর আগামী বৎসর-টুকুর জন্য নির্দ্ধারণ করা হ'ত। পাঁচ বৎসরের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী, এবং কেবল মাত্র বিভিন্ন প্রয়োগের নির্দ্দিষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুযায়ী মাত্র নয়, সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রয়োগের একটা সামগ্রিক চিত্র বা খসড়া অনুযায়ী উন্নয়ন প্রয়োগের বর্ত্তমান আয়োজনটি নূতন এবং উন্নততর প্রণালীর অনুসারক একথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই।

বস্তুতঃ সরকারী প্রয়োগে শিল্পায়ন ব্যবস্থাটি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশিষ্টতম উপাদান নয়, সেটি জাতীয় আয়-ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনার ধারাটি। অর্থাৎ সমগ্র জাতীয় আয়ের হিসাবের ওপরে তার কতটা অংশ ভোগে ব্যয় হবে এবং লগ্নীর জন্য কতটা অবশিষ্ট থাকবে স্থির করা। এই হিসাব থেকে উন্নয়নের জন্য কতটা সঙ্গতি বাস্তবিক দেশের অধিকারে আছে সেটা নির্দ্দিষ্ট হবে এবং তার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়নের হার কতটা পরিমাণ হওয়া সম্ভব সেটা স্থির করা। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী প্রয়োগে এইটিই ছিল এর বিশিষ্টতম পরিচয় এভাবে উন্নয়নধারার গতি ও পরিধি একবার বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারলে, পরিকল্পিত উন্নয়নবাচক প্রয়োগগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দ্দেশ (order of priorities) করাটা খুব বেশী কঠিন হবার কথা নয়। এভাবে বাস্তব সংস্থানের (resources in real terms) সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও প্রয়োগ করতে পারলে একটা সুসমঞ্জস (balanced) উন্নয়নধারার প্রবর্ত্তন ও ক্রমিক পুষ্টি-সাধন অসম্ভব হবার কথা নয়। বস্তুতঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় ও রূপায়ণে এমনই একটা চিন্তা ও উদ্দেশ্যের মোটামুটি পরিচয় আমরা দেখতে পাই। তবে এই প্রথম পরিকল্পনাতেও যে স্থানে স্থানে অর্থবিজ্ঞানের শিক্ষা যে রাজনৈতিক চাপের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয় নি এমন কথা বলা চলে না। সে সকল ক্ষেত্রে যে খানিকটা সমালোচনা হবেই এটা অবশ্যম্ভাবী। তবু মোটামুটি সুরুতে উন্নয়ন পরিকল্পনার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ যে মোটামুটি অর্থবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্যগুলি অনুসরণ করেই চলতে সুরু করেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নানাবিধ এবং নানা প্রকারের রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব পরিকল্পনা রচনার ধারার ওপরে এমন কঠিন চাপ সৃষ্টি করতে সুরু করে যে, ক্রমে পরিকল্পনার প্রকৃতি ও রূপ এর মূল বিজ্ঞানানুমোদিত বনিয়াদ থেকে সরে যেতে সুরু করে। এর ফলে পরিকল্পনার খসড়ায় বাস্তব পুঁজির (সঞ্চয় এবং বিদেশী সাহায্যের যুক্ত পরিমাণ) আয়তন অতিক্রম করে লগ্নীর আয়োজন নির্দ্দিষ্ট হতে সুরু করে। এর ফলে জাতীয় আয়ের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা রচনা করা—অর্থাৎ পরিকল্পনার লগ্নীর পরিমাণ বাস্তব সঙ্গতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করে নেওয়া—মোটামুটি বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়, উভয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, লগ্নীর আয়োজন এবং পুঁজির মোট সঙ্গতি (বিদেশী সাহায্য + সঞ্চয় + উদ্বৃত্ত রাজস্ব) এই দুইয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটা ফাঁক রেখে দেওয়া হচ্ছিল (uncovered gap); এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনাতে এই ফাঁকটি অপেক্ষাকৃত আয়তনে অনেক বড় ছিল; এই ফাঁকটি ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের দ্বারা পূরণ করা হচ্ছিল। পরিকল্পনাকালে,—এবং বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে এটি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে,—যে ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যচাপের ফলে আজ দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশেও আমরা যে অর্থসঙ্কটের মুখে এসে পড়েছি (টাকার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় মূল্য হ্রাস বা ডিভ্যালুয়েশন) সেটা এরই অনিবার্য্য ফল। "দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ইন্‌ফ্লেশনকেও স্বীকার করে নিতে হবে"—ইত্যাদি রাজনৈতিক শ্লোগানের দ্বারা হয়ত সাময়িক ভাবে নির্ব্বাচন-বৈতরণী পার হয়ে ক্ষমতার গদীতে আসীন থাকা চলতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার অনিবার্য্য ক্রমবর্দ্ধমান পঙ্গুতা থেকে উদ্ধার পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

বৃহদায়তন পরিকল্পনা

প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে সামান্য সময়ের জন্য একটা মূল্য-প্রতিক্রিয়ার (declining prices) সাময়িক লক্ষণ দেখা গিয়েছিল; ১৯৫৩-৫৪ সালের শেষাশেষি কতকগুলি অবশ্য ভোগ্যপণ্যের চাহিদা তথা মূল্যমান কিছুটা কমে যায়। এর ফলে সরকারী পরিকল্পনা ও অর্থ দপ্তরের কর্মকর্তারা এবং তাঁদের অর্থ-বিজ্ঞানী পরামর্শদাতারা ১৯২৯-৩০ সালের দুনিয়া-জোড়া অর্থ সঙ্কটের পুনরাভিনয়ের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েন এবং স্থির করেন যে, আনুসঙ্গিক বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও উন্নয়ন-গতি দ্রুততর করবার জন্য বৃহদাকার পরিকল্পনা প্রয়োগের প্রয়োজন। ইণ্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের বার্ণষ্টাইন মিশন এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেন কিন্তু ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং সম্বন্ধে ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশনকে যথাসম্ভব সতর্ক করে দেন: কিন্তু এঁদের এই সাবধান বাণী সত্ত্বেও এই সতর্কতার প্রয়োজন আগাগোড়াই উপেক্ষিত হয়ে চলে। ফলে অনিবার্য্যভাবে ক্রমাগত উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যচাপ সৃষ্টি হতে সুরু করে। দ্বিতীয় এবং বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানর ধারায় যে বিরাট ফাঁক (shortfall) থেকে গেছে তাতে এই মূল্যচাপ আরও বেশী করে সৃষ্টি হয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের প্রকৃতি ও প্রয়োগবিধির (character and technique) বিচার করা প্রয়োজন। যে ভাবে পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজনে উত্তরোত্তর বৃহৎ অঙ্কের ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের আশ্রয় এ ভাবৎ গ্রহণ করা হয়ে এসেছে, তাতে আশঙ্কা হয় যে, এই বিশেষ প্রয়োগের দ্বারা পুঁজি সৃষ্টির মূল প্রকৃতি ও সীমারেখা (character and limitations) সম্বন্ধে প্ল্যানিং কমিশনের কর্তৃপক্ষ গোষ্ঠী কিংবা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা (clear conception) কখনই ছিল না। অর্থশাস্ত্রের জটিল বিশ্লেষণে বা মুদ্রা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের প্রয়োগটিকে সাদা কথায় ভবিষ্যৎ উৎপাদনের ওপর বন্ধকী আয়োজন (advance draft on future production) বলে অভিহিত করা যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উদ্দিষ্ট অতিরিক্ত উৎপাদনের দ্বারা যাতে করে এই কৃত্রিম পুঁজির মূল্য সম্পূর্ণ আদায় হয়ে যায় এই লক্ষ্যই এই ধরনের পুঁজি সৃষ্টির বা ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের পরিমাণের সীমা নির্দ্দেশ করবে। এই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সার্থক এবং সম্পূর্ণভাবে সাধিত হলে এবং যথাসম্ভব সাবধানতার সঙ্গে এর প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই কৃত্রিম পুঁজির অর্থ যাতে ভোগ্য-ব্যয়ে লাগান না হয় তার ব্যবস্থা করলে, এর ফলে তেমন একটা মুদ্রাস্ফীতির কারণ না ঘটাই সম্ভব। অন্যথায় অবশ্য আনুপাতিক মুদ্রাস্ফীতি এবং তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধি যে অনিবার্য্য হয়ে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য। এবং সেটিই যে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ঘটে চলেছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ পুঁজি সৃষ্টি ও পুঁজি লগ্নীর ধারা যদি দেশের আর্থিক সংস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে করা হয় এবং লগ্নীর সঙ্গে উৎপাদন যদি সঙ্গতি রক্ষা করে আনুপাতিক পরিমাণে বেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তা হলে বৃহদায়তন পরিকল্পনা গ্রহণের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করা চলে না। এমন কি আর্থিক সংস্থানের (visible resources) তুলনায় অতিরিক্ত আয়তনের পরিকল্পনা রচনাও মঞ্জুর করা চলে যদি এই বৃহত্তর পরিকল্পনার অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত কম জরুরী প্রয়োগগুলির রূপায়ণের জন্য, পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে বার্ষিক সংস্থান বৃদ্ধির দ্বারা তার লগ্নীর প্রয়োজন সাধন করা সম্ভব হয়, কিংবা পরিকল্পনার অন্তর্গত মূল প্রয়োগগুলির কোন কোনটি যদি কোন কারণ বশতঃ সুরু করা অসম্ভব হয়ে ওঠে কিংবা তাতে বিলম্ব ঘটে এবং তার বদলে এগুলির কোন একটির রূপায়ণ (implementation) সুরু করা সম্ভব হয়। অন্যথায় অতিরিক্ত সংস্থান (resources) সংগৃহীত হওয়া সম্ভব হলেও এরূপ বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করা যেতে পারে। এর জন্য চাই একটা নির্দ্দিষ্ট অগ্রাধিকারের খসড়া (strict order of priorities)। এই বিশেষ প্রয়োজনটি দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্য ভাগ থেকে অনুভূত হতে সুরু করে এবং তৃতীয়

পরিকল্পনাকাল পর্য্যন্ত এর এলে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত কম জরুরী প্রয়োগ বাতিল করে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

যদি প্রথম থেকেই প্রতি বৎসর পরিকল্পনা রূপায়ণের অগ্রগতির ধারা ও প্রকৃতির একটা সাল-তামামি হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা করা হ'ত, তা হ'লে পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োগবিধিটিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আর্থিক সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চালনা করা সম্ভব হতে পারত। বস্তুতঃ এটি কখনই করা হয় নি; ফলে উদ্দিষ্ট পুঁজি লগ্নী প্রায় সম্পূর্ণ করতে (বাস্তব পুঁজি +ডেফিসিট পুঁজি+বিদেশী অর্থ সাহায্য) পরিকল্পনা রূপায়ণের গতি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের (target) অনেক পেছনে বার বারই পড়ে গেছে। প্ল্যানিং কমিশনের দ্বারা প্রচারিত সম্প্রতিকার একটি হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পুঁজি লগ্নী (outlay) নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের ৯৮% শতাংশ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির নির্দেশক চিহ্নে পরিকল্পনা রূপায়ণের সার্থকতা। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের ৫০ শতাংশ মাত্র পৌঁছেছে। অথচ এই লগ্নী (outlay) সম্ভব করবার জন্য প্রচণ্ড অঙ্কের ডেফিসিট ফাইনান্সিং থেকে উদ্ভুত পুঁজি সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়েছে। আগামী দুই, এমন কি তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের মধ্যেও অতিরিক্ত উৎপাদনের দ্বারা এটি পূরণ হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। রাজ্য সরকারগুলির পরিকল্পনানুযায়ী লগ্নীর সংস্থানে যে ঘাটতি দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ দিয়ে কিংবা ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের দ্বারা সর্ব্বদাই সেটিকে পূরণ করে এসেছেন, কিন্তু এই সকল পরিকল্পনানুযায়ী প্রয়োগগুলি তাদের উৎপাদন লক্ষ্যের কাছাকাছি পর্য্যন্ত আদৌ পৌঁছতে পারছে কি না সে প্রশ্নটির বিচার করেন নি। অথচ এটি পরিকল্পনা প্রয়োগবিধির একটি মূল ভিত্তি বা নীতি বা দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রেও ট্যাক্স বা ঋণ-নীতিই (credit policy) লগ্নী নিয়ন্ত্রণের একমাত্র অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে; অবশ্য আমদানী সঙ্কোচন বা উৎপাদন লাইসেন্স এ বিষয়ে অতিরিক্ত অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে।

উন্নয়ন-পরিকল্পনার ধারাটিকে প্রকাশমান (unfolding) অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চালনা করবার উপযোগী নানাবিধ আয়োজন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সেগুলির কোন সার্থক প্রয়োগ করা হয় নি এবং আর্থিক স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য-বাচক লক্ষণগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সরকারী নীতির অদল-বদলের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র সরকারী ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। পরিকল্পনা কমিশন মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের অবস্থা (balance of payments), শিল্পোৎপাদন বা কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি সমস্যাগুলির সম্বন্ধে যে একদম ওয়াকিবহাল ছিলেন না একথা সত্য না হলেও তাঁরা এগুলিকে উপেক্ষা করে এবং পূর্ব্বানুসৃত আর্থিক নীতি অনুসরণ করে নূতন লগ্নীর পরিমাণ নির্দ্দেশ করে এসেছেন এবং তার ফলে দেশের আর্থিক গতিপথে যে সকল বাধা ও চাপ অনিবার্য্যভাবে সৃষ্টি হয়ে চলেছে সেগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে রক্ষা করে চলবার নিষ্ফল প্রয়াসে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণবিধি এবং অনুরূপ সম্পূর্ণ অসার্থক গৌণ আর্থিক প্রয়োগের দ্বারা নিজেদের দায়িত্ব মোচনের ব্যবস্থা করে এসেছেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

এই সকল অবস্থা-ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতা থেকে একটা মূল উপলব্ধি এতদিনে গড়ে ওঠা উচিত ছিল। সেটা এই যে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এবং মিশ্র আর্থিক কাঠামোর (mixed economy) মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক ও সফল ভাবে প্রয়োগ করতে হলে, পারিপার্শ্বিক ও স্বতঃপ্রণোদিত প্রভাবগুলিকে (spontaneous and environmental market forces) উপেক্ষা করে করা চলে না। কৃষি উন্নয়ন মোটামুটি একমাত্র সার্থক বেসরকারী প্রয়োগের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল; বেসরকারী শিল্পোৎপাদনই মোটামুটি একমাত্র ভোগ্যপণ্য সরবরাহের উপায়; সরকারী প্রয়োগে বৃহদায়তন পুঁজি লগ্নী বেসরকারী ক্ষেত্রেও অনুরূপ লগ্নী প্রভাবিত করতে পারত, কিন্তু বিদেশী মুদ্রা এবং অন্যান্য বাস্তব সংস্থানের সীমিত আয়োজনের ফলে, এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন গতি যতটা দ্রুত হওয়া সম্ভব ছিল ততটা হতে পারে নি।

বস্তুতঃ প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রয়োগের

ফলে যতটা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে (এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ এতটা বেশী না হলে সেটুকুকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলা চলত না) সেটুকু এই মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়েই সম্ভব করা যেতে পারত। বস্তুতঃ পরিকল্পনা-রচয়িতারা যখন থেকে স্থিতাবস্থাকে (stability) উন্নয়নের পরিপন্থী বলে ধরে নিতে সুরু করেছেন, তখনই বিপদের গোড়াপত্তন হয়েছে। লগ্নী ও উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তর্বর্ত্তী কালটুকুতে খানিকটা মূল্যবৃদ্ধি হয়ত অনিবার্য্য ছিল কিন্তু যে পরিমাণে এই মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে তাতে সমাজের মধ্যে অনিবার্য্য আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ট্যাক্স ফাঁকি, কালোবাজারী মুনাফাবাজী ইত্যাদি অসামাজিক ও ক্ষতিকর ব্যবস্থা যেমন একদিকে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুঃখকষ্টে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। আমাদের এই সকল অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে একটা শিক্ষা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠা উচিত ছিল, যে সত্যকার উন্নয়নের জন্য একটা স্থিতাবস্থা (stability) একান্ত জরুরী এবং সত্যকার সম্পতি (resources, existing and potential, real and physical) অতিক্রম করে কাল্পনিক বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি-করা পুঁজি লগ্নীর দ্বারা উন্নয়ন সাধনের প্রয়াস করতে গেলে, বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তিই তার একমাত্র অনিবার্য্য ফল। চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা ও প্রয়োগের সময় এই শিক্ষাগুলি মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

যুগে যুগে ভারত শিল্প : শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দুইশত চিত্র, ১৬৩ পৃষ্ঠা। প্রকাশক—শ্রীসুরেন নিয়োগী, মুদ্রাকর— শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড। কলিকাতা-৯। মূল্য সাত টাকা।

লেখক—কীর্ত্তিমান চিত্রশিল্পী। এই পুস্তকে আমরা তাঁহার আরেকটি কীর্ত্তির পরিচয় পাইতেছি। মাত্র ১৬৩ পাতার মধ্যে দুইশত খানি চিত্র অবলম্বন করিয়া তিনি কিশোরদের জন্য সমগ্র ভারত-শিল্পের চিত্তহারী বিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন। ভাষা সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। মাত্র সাত টাকা মূল্যের এই পুস্তক বিতরণ করা পুস্তক জগতে অভাবনীয় ব্যাপার। বইখানি প্রত্যেক স্কুলে অবশ্য স্থানলাভ করিয়া, লেখক ও প্রকাশকের জয় ঘোষণা করিবে।

শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গৈলার কথা : প্রকাশক; গৈলা সম্মিলনীর পক্ষে ইতিহাস শাখার কর্ম্মসচিব হিরন্ময় গুপ্ত। পূর্ব্বাচল, পোঃ রহড়া, ২৪ পরগণা। মূল্য-২'৫০।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলা একটি সুপরিচিত গ্রাম। দেশ বিভাগের ফলে উক্ত গ্রাম আজ পররাজ্য; এবং একদিন হয়ত এই নামটুকুও আর অবশিষ্ট থাকিবে না। অথচ এক সময় এই গ্রামের ঐতিহ্য ও গৌরবময় একটি অতীত ছিল। যে অতীত লইয়া ইতিহাস রচনা করা যায়; গৈলা সম্মিলনী সেই ইতিহাস রচনায় ব্রতী হইয়াছেন; উদ্দেশ্য—অতীত গৌরব শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে··· আত্ম-বিশ্বাসকে ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই গ্রাম এক সময় বাংলা দেশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল; এই গ্রামে বহু জ্ঞানী গুণী জন্মলাভ করিয়া গ্রাম তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে পুস্তকখানিতে বহু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, যে তথ্যগুলি বিশেষ করিয়া গৈলাবাসীদের জানা দরকার। যদিও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি দেওয়া হয় না। তথাপি একথা অনস্বীকার্য্য যে, গৈলা সম্মিলনীর এই সাধু প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দূরের আকাশ : সমর বসু, সম্বোধি পাবলিকেশানস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২২ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ছয় টাকা।

যুদ্ধের পরে, বিশেষ করিয়া বাংলা বিভাগের ফলে আজ মানুষ চতুর্দ্দিক হইতে বিপন্ন। যে সমাজ-গোষ্ঠী এতকাল বাঙালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে সে সমাজ আজ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। যার ফলে মানুষ আজ বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। ভুলিয়া গিয়াছে সে তার সংযম, শিক্ষা, নীতি। চরিত্রকে সে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে। আজ একমাত্র বড় হইয়া উঠিয়াছে বাঁচিবার প্রশ্ন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকার যে-কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়া যেমনই জটিল তেমনই ভয়াবহ। ভদ্রঘরের মেয়ে কুন্তলা কেন পকেটমার হইল, সরমা কেন একজনের সঙ্গে পালাইয়া বাঁচিল ইহার উত্তর আজ কে দিবে? আমরা গালি দিতেই পারি, সমস্যার সমাধান করিতে পারি না। আজ যে ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া আমাদের সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, তাহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আজ জনসাধারণকেই লইতে হইবে। নহিলে এ পাপ কোনদিনই মুছিবে না।

গ্রন্থকার কতকগুলি বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে যে চাবুক মারিলেন তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হইবে। গ্রন্থকারের এ প্রচেষ্টা সার্থক হোক্ এই কামনা করি।

ক্রৌঞ্চমিথুন : নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও প্রতিমা চক্রবর্ত্তী, শ্রীভারতী নিকেতন, ৫৬ সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

কয়েকটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি পূর্ব্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই গদ্য কবিতা। তবে সুখের বিষয় ইহাতে আধুনিকতার উগ্র ঝাঁঝ নাই। এই ঝাঁঝে কবিতায় রস শুকাইয়া গিয়াছে, তাই পড়িতে ভয় করে। কবির অনেক কবিতাই পূর্ব্বে পাঠ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তিনি যথার্থ কবি, তাই কবিতাগুলি ছন্দ না থাকিলেও তাঁহার হাতে খেলিয়াছে ভাল। বিশেষ করিয়া কবি-দম্পতীর কাব্য-রচনা নামকরণের মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রতিকৃতি ৯.

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৭৩

ষষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সমষ্টিবাদ সংশোধন

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানব সমাজে যে সকল মতবাদ প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রায় সকল কথাই বিশ্বাসী মহলে অভ্রান্ত স্বয়ংসিদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মমতের ক্ষেত্রে সকল রীতি, নীতি ও সূত্রই চিরস্থায়ী এবং পরম বা চরম সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ইহার কারণ যে ধর্ম্মমত মাত্রই ভগবান অথবা ভগবান-সদৃশ কোন মানব-দেহধারী অবতারের বাণী বলিয়া চলিয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল মতের সংশোধন পরে অপর কেহ করিলে তাহা মহাপাপ ও দণ্ডনীয় ধার্য্য হয়। ধর্ম্মমত ছাড়িয়া দিয়া অন্য মতের কথাতেও প্রায়ই ধর্ম্মান্ধতা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ বড় কথা বর্জ্জন করিয়া অতি সাধারণ কথাতেও দেখা যায় মানুষ তাহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত মত বা অভ্যাসের বিপরীত কোন কিছু মানিয়া লইতে বিশেষ আপত্তি করে। কোন্ মাংস খাওয়া চলে বা কোন্‌টি খাওয়া মহা দোষের কথা, কি ভাবে পশু হনন করা পবিত্র ও শুদ্ধ এবং অপরভাবে পশু হত্যা করিলে সেই পশুমাংস খাওয়া অনুচিত ইত্যাদি মতবাদ ধর্ম্মঘটিত হইলেও প্রকৃষ্ট ধর্ম্মমত অনুগত বলা যায় না। কিন্তু ঐ জাতীয় কথার উপর স্বপক্ষ-বিপক্ষ দলের পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। বস্ত্র পরিধান, খাদ্য বিচার, আচমন, শয়ন, যাত্রারম্ভ, কেশকর্ত্তন বা রক্ষণ প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই "ধর্ম্ম" জাতীয় মতের অভাব নাই। যেখানে আধুনিকতা প্রবল, যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান কিংবা খাদ্য বা ঔষধের গুণাগুণ বিচার, সেই সকল ক্ষেত্রেও মতবাদ প্রবল। কেহ হোমিও, কেহ অ্যালো, কেহ বা কবিরাজী বা হাকিমী লইয়া প্রবল মতবাদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীত বা চলচ্চিত্র লইয়াও অভ্রান্ত মতের বন্যা সতত প্রবাহিত। কেহই কোন মত একবার মানিয়া লইয়া তাহা বদলাইতে কখনও প্রস্তুত হয়েন না। অতএব ধর্ম্ম বা মানব-সভ্যতার ভিতরের কোন মূল আদর্শগত বিষয়ের সহিত জড়িত মতবাদ লইয়া কলহ যে অতি প্রবল আকার ধারণ করিবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। মানব-সমাজ বা রাষ্ট্র-সংক্রান্ত রীতিনীতি যেখানে নিয়ম বা আদর্শের আকার ধারণ করে সেখানে সেই সকল মূল ধারণা ও বিশ্বাস ধর্ম্মমতের মতই অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সেই সকল মতবাদ সংশোধন চেষ্টা প্রায় নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের মতই বিক্ষোভ সৃষ্টিকর। পূর্ব্বকালে মতবাদ

লইয়া মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হইত। বর্ত্তমান কালেও ধর্ম্মমত লইয়া হত্যাকাণ্ড না হইলেও রাষ্ট্রমত লইয়া ক্রমাগতই তাহা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রমত এখন ধর্ম্মমত অপেক্ষা অনেক গভীর ও প্রবল হইয়া দাড়াইয়াছে। ধর্ম্মমত যে ভাবে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, ভাষা, খাদ্য, গৃহাভরণ, কেশ, বেশ প্রভৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিত; বর্ত্তমানে রাষ্ট্রমতও সেই ভাবে মানব-জীবনের বহুক্ষেত্রে বিচিত্র রূপ ও ভাবে ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চাল-চলন, কথাবার্ত্তা, বেশভূষা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বহু বিষয়ের মধ্য দিয়াই বর্ত্তমান মানুষের রাষ্ট্রমত বুঝিতে পারা যায়। কি কারণে কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, ফ্যাশিষ্ট বা অপর কোন রাষ্ট্রমত-বিশ্বাসী লোকের ধরনধারণ একটা বিশেষ রূপ ধরিয়া চলে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু একবার সেই ছাচে ঢালা আকৃতি ও ব্যবহারের পদ্ধতি অন্তরে-বাহিরে দানা বাঁধিয়া জমিয়া যাইলে তাহার পরিবর্ত্তন বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

এই ত গেল বাহিরের আকৃতির বা ভিতরের অন্ধ-বিশ্বাসের কথা। কিন্তু ইহার উপরে রহিয়াছে মতবাদের ঐতিহ্য ও প্রকৃত অর্থ। ঐতিহ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় কোন মতবাদ কি কি অবস্থায় কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগের শেষের দিকেও কারখানা বিস্তারের আরম্ভকালে মানুষের দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বাধা-বিপত্তির প্রাবল্যের জন্য মানুষ মুক্তির পথ খুঁজিয়া ফিরিত। একদিকে ছিল বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার সীমাহীন প্রবাহ; আর একদিকে ছিল অভাব, অভিযোগ, উৎপীড়ন, অত্যাচার, অন্যায় ও অবিচার। এই পরিস্থিতিতে মানুষের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, সমাজের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ ঘনঘটাচ্ছন্নই থাকিয়া যাইবে চিরদিনের মত। সামরিক ক্ষমতা ও শক্তির উপর ন্যায় বিচারের ভার যদি ন্যস্ত করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অধিকারের মূল নীতি "জোর যার মুলুক তার" হইবে এবং গরীব ও দুর্ব্বলের ভাগে ধনবানের উচ্ছিষ্ট ব্যতীত আর কিছু জুটিবে না। সেই সময় যাহারা সমাজের ধন উৎপাদন, বণ্টন ও উপভোগ রীতির চর্চ্চা করিতেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, ধন উৎপাদন গরীবের শ্রমশক্তি দিয়াই প্রধানত হইয়া থাকে, কিন্তু বণ্টনের বেলায় বেতন হিসাবে শ্রমিক অতি অল্প অংশই পাইত সেই উৎপন্ন ঐশ্বর্য্যের। সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই প্রায় না খাইয়া থাকিত এবং শ্রমশক্তির সম্মান কিছুই ছিল না সেই বাজারে। ছিল সামরিক শক্তির ও তাহার সহায়ক মূলধন সরবরাহ-কারী মহাজনের। এই কারণে প্রথম দিকে যাহারা সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদ প্রচার করিতেন তাঁহারা সেই অর্থনৈতিক আদর্শের মূল সূত্র ধরিয়াছিলেন উৎপাদনের কলকব্জা, উপাদান ও উপকরণের অধিকার বা মালিকানা সামাজিক করিয়া দেওয়া। তাহারা ভাবিয়াছিলেন সমাজ যদি সকল মূলধনের অধিকারী হয় তাহা হইলে শ্রমিক বা সমাজের অপর লোকেরা উৎপাদিত ধনের সমান সমান ভাগ পাইবে; কিন্তু বস্তুত পরে তাহা হয় নাই। যে সকল দেশে সমাজতন্ত্র বা সমষ্টিবাদ জোরাল হইয়া উঠিল সেই সকল দেশের লোকেরা রাষ্ট্রীয় দল, দেশনেতা ও আমলাদিগের কারসাজিতে উৎপন্ন বস্তুর ভাগ ঠিকমত পাইল না; খাদ্য, বস্ত্র, আবাসগৃহ প্রভৃতির প্রাপ্তি কাহারও উপযুক্ত রকম হইল না। যে সকল দেশের অর্থনীতি পুরানো পথে চলিতে থাকিল সেই সকল দেশের মধ্যে যেগুলি যন্ত্রবাদের চূড়ান্ত করিতে সক্ষম হইল সেইগুলিতে শ্রমিকের শ্রমমূল্য যথাযথভাবে দিবার ব্যবস্থা হইল। অপরাপর সুখ-সুবিধাও হইল অনেক। ইহার ফলে এই সকল দেশে সমাজতন্ত্র বা সমষ্টিবাদ এক নূতন ও সংশোধিত রূপ ধারণ করিয়া রীতিগত সমষ্টিবাদকে মানবতার বাস্তব প্রতিষ্ঠাতে নিচে বসাইয়া দিল। মার্কস এঙ্গেলস্-এর সমাজতান্ত্রিক নীতিবাদের সংশোধিত আদর্শে সাধারণ মানুষ (প্রলেটারিয়েট) মধ্যবিত্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সানন্দে সেই বুর্জোয়া অবস্থা মানিয়া লইল।

যে সকল দেশের নেতাগণ সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদ প্রচারকার্য্যে প্রায় এক শত বৎসর বিলম্বে আসিয়া নামিলেন, তাঁহারা সহজেই রাষ্ট্রীয় দলের হাঙ্গর-কুমীরের বুভুক্ষার ও আমলাতন্ত্রের "মার্জ্জারের পিষ্টক বণ্টন" পদ্ধতির আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। শ্রমিক বা অপর কোন সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তির এই সমাজ বিরুদ্ধ সমষ্টিবাদের দ্বারা কোন অর্থনৈতিক সুবিচার লাভ হইল

না। অর্থাৎ, এই অবস্থায় জনসাধারণ কম্যুনিজম-সোসিয়ালিজম প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক মতবাদের সংশোধন আকাঙ্খা করিতে বাধ্য হইলেন। সাম্য চাহিয়া যদি কেহ চূড়ান্ত অসাম্যের মধ্যে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকে এবং বেতনভোগী সমাজসেবকগণ যদি পূর্ব্বকালের মুনাফাভোগীদিগের তুলনায় চতুর্গুণ অনুপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়াও নিজ নিজ পদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাইতে পারে তাহা হইলে পদ্ধতি ও রীতিকে সরাইয়া দিবার জন্য নীতি সংশোধন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দুর্ভাগ্যের কথা, কিন্তু জীবনযাত্রার প্রয়োজনে সে দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

সোসিয়ালিজম-এর হাওয়া যখন ভারতের বক্ষে ঝড়ের গতিতে বহিতেছিল ও সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজের পয়সায় বিদেশ ভ্রমণ, স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করান, বৃহৎ ব্যবসা আরম্ভ করা, উপার্জ্জিত অর্থ বিনা বাধায় উপভোগ করা, যথাইচ্ছা চাউল ক্রয় করা, সন্দেশ-রসগোল্লা জাতীয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ, গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবসাগত আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি সুবিধামত ব্যবস্থা করা ইত্যাদি অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়েই সমষ্টিবাদের ছায়ায় দেশনেতাদিগের পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ও অপরাপর সাঙ্গপাঙ্গগণ অবাধে যত্রতত্র ভ্রমণ (অনেকক্ষেত্রেই সামাজিক খরচে), ঐশ্বর্য্য আহরণ, ব্যবসার অংশ গ্রহণ ইত্যাদি করিয়া এক নূতন ও গুপ্ত ধনবাদের ভিত্তি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ফলে সাধারণ লোকের সমষ্টিবাদে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়া একদিকে গুপ্তভাবে ঐশ্বর্য্য আহরণ ইচ্ছা ও অপরদিকে বিপ্লববাদে বিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। এই নব "আদর্শ" বা দৃষ্টিভঙ্গি আমরা আজ ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও প্রসারিত দেখিতে পাই। জয়ন্তী জাহাজ কোম্পানী এই নেতৃত্বের আড়ালে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য আহরণের একটা বৃহৎ উদাহরণ। এই কোম্পানীর সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রের বিশিষ্ট পরিবারের কত কত ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্থলাভ করিয়াছে তাহার পূর্ণ অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। সমষ্টিবাদের অন্তরালে আরও কত বিশিষ্টবংশীয় লোক কত শত ব্যবসার সহিত মিলিত থাকিয়া ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে তাহারও হিসাব হয় নাই। হইবে কি না তাহাও বলা যায় না। নেহরু বর্ণিত সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্নের সাধারণতন্ত্র (সমষ্টিবাদের আকৃতিলব্ধ সাধারণতন্ত্র) যে যথার্থ ও সত্যকার সমাজতন্ত্র নহে তাহা আমরা সময় থাকিতে বুঝিতে পারি নাই। এখন বিষয়টা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু নূতন ও গোপনে চালিত ধননীতির শাখা-প্রশাখা এখন অসংখ্য এবং সর্ব্বত্রই টাকার খেলা চলিতেছে। এই অবস্থায় দরিদ্র দেশের ভোটের কারবার টাকার উপরেই নির্ভর করে বলিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সমাজ-বিরুদ্ধতা সহজে দূর করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু চেষ্টা চলিতেছে ও চলিবে, যাহাতে সত্যকার সাধারণতন্ত্র এদেশে নিজের মরণোন্মুখ অবস্থা হইতে পূর্ণ স্বাস্থ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে। দেশের লোক এখনও সমাজ-বিরুদ্ধতাকে ঘৃণা করিতে শিখে নাই। ঐশ্বর্য্যের পূজা কিন্তু তাহারা পুরুষানুক্রমিকভাবে করিয়া আসিতেছে। এই মানসিক বিকার হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করা সহজ কার্য্য নহে। মুক্তিদাতাগণও আবার বিভিন্ন ও বৈচিত্রময় দেশ শত্রুতায় জড়াইয়া পড়েন থাকিয়া থাকিয়া। ঐশ্বর্য্য-বর্জ্জিত পাপ সেই সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পাপ হইতেও প্রবল ও দেশবাসীর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

আফ্রিকা

আফ্রিকার কথা আলোচনা করিলেই মনে পড়িয়া যায় মানুষের অমানুষিকতার দীর্ঘ ইতিহাস। আফ্রিকার মানুষের উপর আরবের, ইউরোপীয় ও আমেরিকার মানুষের অত্যাচার যে ভাবে চলিয়াছিল ও এখনও অল্প অল্প চলিতেছে তাহার ঘৃণ্য বর্ব্বরতার তুলনা শুধু স্পেনীয়দিগের দক্ষিণ আমেরিকা বিজয় কাহিনীর মধ্যেই পাওয়া যায়। আজ আফ্রিকার অনেক জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া মানবতার আদর্শ পূর্ণতরভাবে উপলব্ধি করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে। কোন কোন জাতি এখনও পোর্ত্তুগাল বা অপর কোন অর্দ্ধসভ্য দেশের অধীনে থাকায় উচ্চতর জীবনযাত্রার পথে চলিতে পারিতেছে না। এই সকল অর্দ্ধসভ্য জাতির মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ ও রোডেশিয়ার ব্রিটিশগণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকল দিক দিয়া সুসভ্য হইলেও সত্য মানবতার অধিকারী নহে।

কারণ ইহারা শক্তি ও ক্ষমতা অন্ধ ও সকল উচ্চ আদর্শ নষ্ট করিতে নির্লজ্জভাবে প্রস্তুত। দক্ষিণ আফ্রিকার ও রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্য বহুকাল হইতে চলিতেছে। এই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান নীতি হইল রাজকার্য্যে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব রক্ষা করা। অপরাপর প্রভুত্বের লক্ষণ হইল, কৃষ্ণাঙ্গদিগকে অল্প পয়সায় শ্রমে নিযুক্ত রাখা, দরিদ্রদিগের উপযুক্ত নিবাস অঞ্চল গঠন করিয়া তাহাদিগকে সেই সকল অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য করা, কৃষ্ণাঙ্গদিগের সকল ব্যবস্থা (শিক্ষা, চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ, বার্দ্ধক্যে ভরণ পোষণ প্রভৃতি) পৃথক করিয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুদিগের ইচ্ছামত রাখা বা না রাখা ইত্যাদি, ইত্যাদি। আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে উপরোক্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার স্বাধীনতা শুধু সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদিগের জন্যই সুরক্ষিত। শ্বেতাঙ্গগণ উক্ত দেশগুলির অপর সকল দেশবাসীর উপর মধ্যযুগের রাজাদিগের মত একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া থাকে। পৃথিবীতে আর কোন দেশে শ্বেতকায় প্রভুদিগের এই প্রকার একাধিপত্য এই যুগে নাই। শুধু আফ্রিকার আর দুই-চারিটি পোর্ত্তুগালের উপনিবেশে এই জাতীয় অথবা ইহা অপেক্ষাও হীন পরিস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু সেই উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন দেশ বলা চলে না। অ্যাঙ্গোলো, মোসাম্বিক্ ইত্যাদি দেশে প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ লোকের বাস। ইহাদিগের রাষ্ট্রীয় অবস্থা আইনত যাহাই হউক বস্তুত বিশেষ অনুন্নত ও পোর্ত্তুগালের অধীনস্থ। পোর্ত্তুগালের জনসংখ্যা প্রায় নব্বই লক্ষ। সুতরাং পোর্ত্তুগাল যে আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ চালাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেলজিয়াম দেশের জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি। কঙ্গো দেশের জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। বেলজিয়াম কর্ত্তৃক স্বাধীনতা দিবার পরেও বেলজিয়াম ঐ দেশে সৈন্য পাঠাইয়াছে। এই দেশেও আফ্রিকানের স্বাধীনতা ইয়োরোপীয়ের হাতের খেলনা। ইয়োরোপীয়দিগের ইচ্ছামত আফ্রিকানগণ উঠে বসে ও পরস্পরকে মারপিট, হত্যা ইত্যাদি করিয়া থাকে। ফরাসীদিগের সাম্রাজ্যবাদ ঐ ভাবে এখনও চলে এবং দ্যগলের হস্তে ফরাসী প্রভুত্বের একটা নূতন জাগরণের সূত্রপাত হইতেছে মনে হয়। আফ্রিকায় কঙ্গো (জনসংখ্যা ১০ লক্ষ), সেনেগাল (জনসংখ্যা) ৩০ লক্ষ), চাড (জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ), আইভরি কোষ্ট (জনসংখ্যা ৩৬ লক্ষ), দাহোম (জনসংখ্যা ২২ লক্ষ), আপার ভোল্টা (জনসংখ্যা ৪৪ লক্ষ), নাইজার (জনসংখ্যা ৩১ লক্ষ), ক্যামেরুন (জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ) ইত্যাদি দেশগুলিকে নানাভাবে ভাগ করিয়া দেশগুলির দুর্ব্বলতা কায়েমী করা হইয়াছে ও তাহার সুযোগে অর্থনৈতিক শোষণ-কার্য্য ইয়োরোপীয়দিগের দ্বারা ভাল মতেই হইতেছে।

সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগে মহাপ্রতাপশালী ছিল ব্রিটিশ জাতি। তাহারা দুইটি মহাযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়া ও আমেরিকার নিকট ক্রমাগত সাহায্য গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে সৈন্য ও অর্থবলে পৃথিবীতে পূর্ব্বের উচ্চস্থান হারাইয়াছে। সেইজন্য তাহাদিগের প্রভুত্ব করা শুধু গায়ের জোরে আর চলে না। অর্থবলও তেমন নাই। ভারতে দেশ বিভাগ করিয়া প্রভুত্বের পথ খোলা রাখিয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ। বর্ম্মা,সিংহল ও পাকিস্তান এখন দুর্ব্বলতার প্রতীক। পাকিস্তান ভারতের প্রগতির পথে মহা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মালয় দেশেও ব্রিটিশ কূটনীতির জোরে কাহাকেও শক্তিশালী হইতে দেয় নাই। আফ্রিকাতে ব্রিটিশ যে যে দেশে ছিল সর্ব্বত্রই বিভাগ ও অমিলের সৃষ্টি করিয়া শ্বেতকায় প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে। আফ্রিকান নেতাগণ পূর্ণ স্বাধীনতার উন্মুক্ত পথে চলিতে পারে নাই। কেহ বেশী বাড়াবাড়ি করিলেই তাহার পতন হয় ও তাহার শত্রুপক্ষ উপরে উঠিয়া ব্রিটিশের বন্ধুত্বের গৌরবে তক্তে বিরাজ করিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতকায় প্রভুত্ব পূর্ণ বিরাজিত। ৩৩ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ ১ কোটি ৪১ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গের উপর প্রভুত্ব করে। ব্রিটিশ বলিবে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন দেশ, ব্রিটিশ তাহাদিগের কার্য্যকলাপের জন্য দায়ী নহে। ঠিক কথা, কিন্তু ব্রিটিশ জাতীয় বহু লোক সেই দেশে বাস করে এবং ক্রমাগত নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া সেই দেশে গমন করিয়া উপনিবেশ গঠন করিয়া বাস করে। অন্তরের ঘনিষ্ঠতা ও মনের মিল না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। ইংরেজী ভাষা ও আফ্রিকান্স্ (ডাচ ভাষার ন্যায়) ঐ দেশের সরকারী ভাষা। জাতীয় পতাকা রচিত হইয়াছে ব্রিটিশের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া। ধর্ম্ম দেখিলে ব্রিটিশ শাখার খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোক শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে প্রায় শতকরা ৪০ জন। অর্থাৎ দক্ষিণ

আফ্রিকাতে শ্বেতকায় মহলের ব্রিটিশের কুটুম্বিতা অতি প্রবল ও ব্যাপ্ত। যদি রোডেশিয়ায় যাওয়া যায় তাহা হইলেও দেখা যায় ৩৮ লক্ষ কৃষ্ণকায়ের উপর ২।।০ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ রাজাসনে বসিয়া সকল কিছু ভোগ দখল করিতেছে। ব্রিটিশ রাজত্বের গালে চড় মারিয়া ইয়েন স্মিথ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেও ব্রিটিশ রাজ সে অপমান কুটুম্বিতার খাতিরে হজম করিয়া যাইতেছে। ফলে আফ্রিকার স্বাধীনতার অভিনয় বড়ই হাস্যরসাত্মক হইয়া দাড়াইতেছে। অন্যান্য আফ্রিকান মুলুক-গুলির যেগুলিতে ব্রিটিশ ছিল সেগুলির অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। স্বাধীন হইলেও স্বাধীন নহে। সর্ব্বদাই ভয় জাগ্রত যে ব্রিটিশরা চটিলে ক্ষণিকের প্রভুত্বের গণেশ উল্টাইয়া অপর কেহ তক্ত দখল করিবে।

ঘানার জনসংখ্যা ৭১ লক্ষ। নাইজিরিয়ার জনসংখ্যা ৫।।০ কোটি; সরকারী ভাষা ইংরেজী। ব্যবসা চলে ভালই। ঘানার মোট আমদানী-রপ্তানী ২৩ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে ৬ কোটি পাউণ্ড ব্রিটিশের সহিত। নাইজিরিয়ার ৩৬ কোটির চালানী কারবারের মধ্যে ১৫ কোটি ব্রিটিশের সহিত। আর যে সকল ব্রিটিশ অধিকৃত আফ্রিকান দেশ ছিল এখন সেগুলি বিভিন্ন রূপে ব্রিটিশ আনুকূল্যে স্বাধীন হইয়া দিন কাটাইতেছে। দেশগুলির নাম ও জনসংখ্যা নীচে দেওয়া হইল—

সিয়েরালিয়োন	লোকসংখ্যা	২১ লক্ষ	ব্যবসার	শতকরা	২৫ ভাগ	ব্রিটিশের
ট্যানজানিয়া	,,	১ কোটি	,,	,,	৩৫ ,,	,,
ইউগাণ্ডা	,,	৭১ লক্ষ	প্রায় ১ কোটি পাউণ্ড ব্রিটিশের সঙ্গে			
কিনিয়া	,,	৮৬ লক্ষ	ব্যবসার	শতকরা	২৮ ভাগ	ব্রিটিশের
মালাউই	,,	৩০ লক্ষ				
জাম্বিয়া	,,	৩৫ লক্ষ (শ্বেতকায় ৭৫ হাজার)				
গাম্বিয়া	,,	৩.।০ লক্ষ ব্রিটিশের ব্যবসা ২২ লক্ষ পাউণ্ড				

সাম্রাজ্যবাদীদিগের আফ্রিকা বিভাগ দেখিয়া বুঝা যায় যে, আফ্রিকানদিগের মিলিতভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। ইহার কারণ আফ্রিকান নেতাদিগের দলাদলি, ইয়োরোপীয়ানদিগের উপর নির্ভরশীলতা, ব্যবসার ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদিগের প্রভুত্ব এবং আফ্রিকার সহরে সহরে হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গের উপস্থিতি ও নিবাস। একথা মানিতেই হইবে যে সহরগুলি যদি ইয়োরোপীয়দিগের কবলে থাকে এবং কারখানা ও ব্যবসা যদি তাহারাই চালায় তাহা হইলে তাহারাই উপরওয়ালা হইবে। ইহা ব্যতীত শ্বেতাঙ্গদিগের যুদ্ধ ক্ষমতা ও অস্ত্রবল তাহাদিগকে জোরাল করিবে নিঃসন্দেহ। প্রয়োজন হইলেই যদি ২০০০/৪০০০ শ্বেতকায় সৈন্য যুদ্ধে নামিয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুদলে বিভক্ত আফ্রিকানগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনও পারিবে না। ইহার উপর বড় ঘাঁটি দক্ষিণ আফ্রিকা ও তৎপরে রোডিশিয়া রহিয়াছেই। সুদূর উত্তরে ইথিওপিয়া বা মিশর অথবা ত্রিপলি ও অ্যালজিরিয়া "অন্ধকারাচ্ছন্ন" আফ্রিকার সাহায্যে আসিবে বলিয়া আশা করা যায় না। কারণ তাহাদিগের নিজেদের পরিস্থিতিই সর্ব্বদা টলায়মান। লোহিত সাগরের পরপারে আরব দেশও বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়ান। ভারত পাকিস্তান ও চীনের আক্রমণ আশঙ্কায় আত্মরক্ষার জন্যই ব্যস্ত। তাহা হইলে আফ্রিকার বর্ত্তমান অবস্থা ফিরিয়া আরও কিছু উন্নত রূপ ধারণের আশা নেই বলিলেই চলে। শ্রীশরণ সিংহ ভাবিয়াছেন তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিলে কমনওয়েল্থ রোডেশিয়াকে শায়েস্তা করিতে পারিবে। কিন্তু কমনওয়েল্থের যে অংশটি ওয়েল্থের অর্থাৎ ব্রিটিশের, সেই অংশ যদি বিপরীত হয় তাহা হইলে শরণ সিংহের বাণী কেহই স্মরণে রাখিবে না।

ডিমক্রসি কি ?

ডিমক্রসি বা সাধারণতন্ত্র কাহাকে বলে তাহা লইয়া গবেষণা করিবার সাক্ষাৎ কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দলের নেতৃস্থানীয়েরা ঐ গবেষণা কার্য্যত না করাইয়া পারেন না। দার্শনিক ভাবে ও ন্যায়-

ভাঙিয়া খবর নষ্ট করিতে এই সকল মহাকর্মী ব্যক্তি আছেন। কার্য্যে বাস্তবকে আকৃতি দান করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন যে, সাধারণের রাজত্ব বা জনগণের প্রভুত্বের সত্য অর্থ কি। কংগ্রেস দলের শাসন-পদ্ধতি ও কার্য্য-কলাপের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে সাধারণতন্ত্রের অর্থ হইল ছলে-বলে-কৌশলে অধিক ভোট প্রাপ্তি ঘটাইয়া রাজকার্য্যের অধিকার করায়ত্ত করিয়া লওয়া ও তৎপরে মন্ত্রীদিগের বকলমে আমলা-প্রধান শাসন-পদ্ধতি চালাইয়া যাওয়া। সাধারণ-তন্ত্রের যে তন্ত্রের অংশটি তাহা প্রাচীন কৃষ্টির যুগের তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধকদিগের অনুসরণেই বোধ হয় যন্ত্র (মতলবের নক্সা বা ব্লুপ্রিন্ট) ও মন্ত্রের (মত, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সূত্র) সাহায্যে সিদ্ধির পথ দেখাইয়া দেয় এবং সিদ্ধিলাভের প্রণালী ও পন্থা অবলম্বনের কালে যদি বিভিন্ন দুষ্কর্ম করিতে হয়, সাধক-গণ তাহা অনাসক্ত আগ্রহে করিতে কিছুমাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না। কাহারও মাথার খুলি যদি অপর কাহারও পান-পাত্র হয় এবং তাহাতে বিশ্ববাসীর মোক্ষলাভের পথ খুলিয়া যায় তাহা হইলে সাধারণতন্ত্রের সাধারণ জনগণ অকাতরে নিজ নিজ মাথার খুলি দান করিতে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিবেন ইহা ধরিয়া লওয়া সাধারণতন্ত্রের স্বরূপের একটি দিক। এই সূত্রে যদি কোথাও কোথাও দল বাঁধিয়া কোন কোন লোক বিপরীত মতবাদ প্রকাশ করে তাহা হইলে দুই-চারিটি নরবলির ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন হইতে পারে। যাহা সাধারণ বুদ্ধিতে হইবে না বলিয়া মনে হয় তান্ত্রিকগণ তাহাই মন্ত্র-মন্ত্র ভূত প্রেত ও পিশাচদিগের সহায়তায় সম্ভব করিয়া দিতে পারেন। স্বদেশী প্রেত ও পিশাচ যদি কার্য্যে অপারগ হয় তাহা হইলে অপর দেশের আমদানি ভূত পেত্নী সংগ্রহ করা অনায়াসেই যাইতে পারে। তন্ত্র, মন্ত্র ও যন্ত্রের উপরেই নির্ভরশীল এবং শুধু পূজারী বা তান্ত্রিকগণই তাহার ব্যবহার জানেন। জন-সাধারণ পূজার মালমশলা সরবরাহ করিয়াও আরব্ধ মোক্ষের ছিটেফোঁটা পাইলেই শান্তভাবে শাসনতন্ত্রকে মানিয়া চলিবেন ইহাই রাজপুরোহিত অসাধ্য-সাধকগণ আশা করেন। তাঁহারা বলেন মানে বা অর্থ লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই, শুধু নিয়ম মানিয়া চলিলেই সিদ্ধিলাভ কেহ আটকাইতে পারিবে না। যদি নিয়ম করা হয় "খানাপিনা বন্ধ।" তাহা হইলে সকলকে অনাহারে দিন গুজরাণ করিয়া মোক্ষের আগমন অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি নিয়ম জারি হয় "রসগোল্লা ও কাঞ্চন ত্যাগ কর," তাহা হইলে সকলকে দলে দলে কলকাত্তাকা কংগ্রেসী লাড্ডু খাইয়া ও পিতলের আংটি পরিয়া সমাজে বিচরণ করিতে হইবে। এইভাবে সাধারণতন্ত্রের তন্ত্র যদি আড়াই ছটাক ধূলাবালি-মিশ্রিত চাল দিনে খাইতে দেয় তাহা হইলে তাহাই খাইয়া থাকিতে হইবে। রাজস্ব দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইলে চালচুলা বিক্রয় করিয়াও দিতে হইবে। পরিবার-পিছু সাধারণের উপর এক-দেড় হাজার টাকার সরকারী ঋণের বোঝা চাপাইয়া দিলে তাহা মানিয়া লইতে হইবে। মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া যে কোন অপর ভাষা আওড়াইতে বলিলে তাহা সানন্দে আওড়াইতে হইবে। অপর দেশের সৈন্য দেশ দখল করিলে তাহা শান্তভাবে সহ্য করিতে হইবে। নিজ ইচ্ছায় দেশভ্রমণ, গমনাগমন, ব্যবসা, বাণিজ্য, পড়াশুনা বা কোন কিছুই চলিবে না। "চলবে নিয়ম!"

অপরদিকে যাহারা বিক্ষুব্ধ আবেগে সাধারণের গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারাও তান্ত্রিক। শুধু তাঁহাদিগের ভূত প্রেত পিশাচ ভিন্ন গোষ্ঠীর। মন্ত্রগুলিও সাধারণের সকল ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা নাশক ও ব্যাপকভাবে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রেরণায় টইটুম্বুর। অর্থাৎ নানাভাবে ও নানা উপায়ে জনসাধারণের আত্মবোধ কমাইয়া সমষ্টিবোধ বৃদ্ধির ব্যবস্থাকারক। খাওয়া পরা থাকার ব্যবস্থা ক্রমশঃ কমাইয়া দিতে থাকিলে আত্মবোধ সহজেই লাঘব হইতে থাকে ; কিন্তু তাহাতে সমষ্টিগতভাবে ঠিক কি লাভ কেমন করিয়া হইবে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। কংগ্রেসীলাড্ডুর গন্ধও ঐ একই প্রকারের। শুধু কংগ্রেসী খানাপিনা সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণ মানিয়া চলে ; আর এ হইল পুরাপুরি সোসিয়ালিজম্। ইহার অর্থ কি তাহা ইহার প্রবর্ত্তকগণ পরিষ্কার ভাষায় বলিতে পারেন না, সম্ভবত জানেনও না। কারণ ৫০ কোটি মানুষের জন্য যদি ২০ কোটি উপার্জ্জক লোকের প্রয়োজন হয় সমষ্টিগত মোট রোজগারের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য, তাহা হইলে যে বিরাট কর্ম্মে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহার মালমশলা সংগ্রহ সমষ্টি-তন্ত্রের তান্ত্রিকদিগের যন্ত্রে বা মন্ত্রে হইবে বলিয়া কোন আশা নেই। চীন বা রুশ দুই-আড়াই

লক্ষ কোটি টাকা মূলধন সরবরাহ করিয়া দিবে সে আশা করাও বাতুলতা। শুধু যাহা হইতে পারে, তাহা অপেক্ষাকৃত ধনবান লোকেদের সম্পদ কাড়িয়া লইয়া অপর সকল দরিদ্রতর লোকেদের দিবার ব্যবস্থা (সরকারী খরচ বাদ দিয়া)। ইহা হইলে ভারতের সাধারণ পরিবারের আয় হইবে তিন-চার জনের খোরপোষের জন্য মাসিক সত্তর কিংবা পঁচাত্তর টাকা। মাথাপিছু পঁচিশ টাকা আয় হইলে খোরপোষ, বাসস্থান, চিকিৎসা, লেখাপড়া, যাতায়াত প্রভৃতি কি প্রকার হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অর্থাৎ আবার সেই যন্ত্র, মন্ত্র আর তন্ত্রের তান্ত্রিকদিগের স্বেচ্ছাচার ও সমষ্টিগতভাবে সামাজিক মূলধন ও রোজগারের অপব্যয়। নরকপাল ব্যবহার ও নরবলি আরও ব্যাপকভাবে চলিবে অবশ্যই। আর চলিবে সমষ্টির চাকর আমলাদিগের সরকারী হিসাবে খাওয়া থাকা চলাফিরার খরচ সাধারণের তুলনায় দশ গুণ হারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সাধারণতন্ত্রের অর্থে যদি তন্ত্রই প্রধান হয় তাহা হইলে সাধারণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। কারণ নিয়মের, রীতির ও পদ্ধতির আড়ালে থাকে লুক্কাইত পাপ। কত সহস্র কোটি টাকা কংগ্রেসী প্যাটার্ণ-এর সমষ্টিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার নামে ছদ্মবেশী পাপাত্মাদের পাটেরায় চলিয়া গিয়াছে তাহার খবর কেহ কোনদিন পাইবে না। শুধু বিদেশী অর্থ ঋণ করিয়া ও পূর্ব্বকার অর্জ্জনের সঞ্চিত ধন ভারতের সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যে কত সহস্র কোটি লাগিয়াছে বলিয়া আমরা জানি ও তাহার সহিত সেই অর্থে গঠিত কারখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্রপাতি, সেচন ও অপর কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত বাঁধ, রেলওয়ে বিস্তার ও বিদ্যুৎ-চালিত করা, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির বাস্তব ধনমূল্য তুলনা করিলে ১০০০ কোটি টাকার বিদেশী অর্থের হিসাব পুরা হইবে কি না তাহা বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা অনুসন্ধান করাইলে জানা যাইবে। মূল্য কাগজে দেখা যাইলেও আন্তর্জ্জাতিক দরদস্তুর দেখিয়া সে মূল্য কতটা কাল্পনিক তাহাও বিচার্য্য। অর্থাৎ ৩০০ কোটি টাকায় যে কারখানা গঠিত হইয়াছে, তাহা জাপানে গঠিত হইলে কত টাকা লাগিত কিংবা মেক্সিকোতেই বা কত লাগিত? ৭০০০ হাজার কোটি টাকার হিসাবে শতকরা ১০ টাকার গোলমালেই ৭০০ কোটি টাকা হয়। সেই পরিমাণ অর্থ যদি সমষ্টিগত অর্থনীতির নামে ৫
৭০০০০ হাজার লে
লাভ হইয়া থাকিতে ৫

অতএব দেখা যায় যে পার্টির যে নৌকাতেই পা দেওয়া যায় সেইটিই জলে ভরিয়া উঠে, আর সাধারণের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়ে। জনমঙ্গল বা গণকল্যাণ তলাইয়া গিয়া শুধু মাথা উঁচাইয়া থাকে পার্টির সুবিধা, নেতাদিগের দরবারের জাঁকজমক ও আমলাদিগের অক্লান্ত স্বার্থান্বেষণ ও জননিষ্পেষণ। পার্টি বা রাষ্ট্রীয় দল যে প্রকার মতবাদের উপরেই গঠিত হউক না কেন, সেই মতবাদ শুধু মন্ত্রেরই বিষয় হইয়া থাকে। কার্য্যত সেই সকল উচ্চ আদর্শপূর্ণ কথাবার্ত্তার কোন সাক্ষাৎ পরিচয় কেহ পায় না। পার্টি-গঠন সমাজ, সাধারণ বা জাতিকে বঞ্চনা করিবার একটা পন্থা মাত্র এবং যদি জনসাধারণ সত্যকার সাধারণতন্ত্র গঠন করিতে ইচ্ছা করেন ও নিজের শাসন নিজেরাই চালাইতে চাহেন তাহা হইলে পার্টি মাত্রকেই প্রথম হইতে বর্জ্জন করিয়া ব্যক্তিগত ক্ষমতা, শক্তি, সাধুতা, আদর্শবাদ ও জনহিত চেষ্টাতে বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে হইবে। যাহারা ব্যক্তিগতভাবে গুণী, শিক্ষিত, কর্ম্মকুশল, বিশ্বাসযোগ্য ও পরোপকার করিয়া থাকেন, সেই সকল লোককে বাছিয়া বাছিয়া অনুরোধ-উপরোধ করিয়া সাধারণতন্ত্রের কার্য্যভার গ্রহণ করাইতে হইবে। সমবেত প্রচেষ্টা ব্যক্তির কর্ম্মশক্তির ভিতর দিয়াই ব্যক্ত হয়। দুই শত নিরক্ষর লোক, বা দুই লক্ষ, একত্র হইলে তাহাদিগের সমবেত চিন্তাকে পাণ্ডিত্য বলা যায় না। এক হাজার শীর্ণ জীর্ণ ব্যক্তি একত্র হইলে তাহা একটি মহাশক্তির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায় না। সকল লোকের সমবেত চেষ্টা হইবে পণ্ডিত ও শক্তিশালীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা ও তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের ও দশের কাজ করাইয়া লওয়া। সকলে মিলিয়া দুনিয়ার যত মূর্খ ও অকর্ম্মা লোককে জড় করিলে তাহা দ্বারা পার্টি গঠন হইতে পারে কিন্তু জনমঙ্গল, জনকল্যাণ ও সুশাসনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। সেইজন্য সাধারণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি ও আদর্শ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে এক এক করিয়া আনিয়া দেশের কার্য্যে লাগান। যাহারা অকর্ম্মা ও দুষ্কর্ম্মে আসক্ত তাহাদিগের বহিষ্কার প্রয়োজন। পার্টি কখনও মানুষ গড়িতে পারে না। মানুষই

পার্টি বা দেশ গড়িতে পারে। যে পার্টিতে মানুষ নাই তাহা উঠিয়া যাইলেই মঙ্গল।

সাধারণের জেলখানা

ভারতীয় রাষ্ট্র ক্রমশঃ সাধারণের জেলখানায় পরিণত হইতেছে। জেলখানা অর্থে বুঝিতে হয় যে-স্থলে বাস করিলে সেই স্থলেই আবদ্ধ থাকিতে হয় ও বাহিরে যথেচ্ছা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ান যায় না সেই প্রকার স্থল। ভারতের জনসাধারণ পূর্ব্বে যথেচ্ছা বিদেশে যাইতে পারিতেন, এখন তাহা পারেন না। সরকারের অনুমতি পাইলে দুই-চারিদিনের চুক্তিতে ভ্রমণ সম্ভব হয়. জেল হইতে "অন প্যারোল" বাহিরে যাইবার মত। কারাগারের আর একটি নিদর্শন নিকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া থাকা ও সকল বিলাসিতা-বর্জ্জিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের লোকেরা যে প্রকার ময়লা ও নিকৃষ্ট খাদ্য পাইয়া থাকে, তাহা জেলের খাদ্যেরই মত। বস্ত্রও ক্রমশঃ জেলের উর্দ্দির মত হইয়া দাঁড়াইতেছে। যথা কাটা পায়জামা ও কুর্ত্তা (কম্যুনিষ্ট), গায়ে সাঁটা পাতলুন ও উৎকট বর্ণের বুশ সার্ট (সাহেবী ধরন) ও মোটা কাপড় ও কুর্ত্তা (কংগ্রেস)। ইহা ব্যতীত জেলের ভিতর জেলেরও ব্যবস্থা আছে। কোন কোন লোক যদি পুলিশের নেক নজরে না থাকে তাহা হইলে তাহারা যখন তখন ভারতরক্ষা আইনে জেলে বন্ধ হইয়া যায়। ভারতরক্ষা যদি আর প্রয়োজন মনে না হয়, তাহা হইলে দুই-চারিদিন পরে তাহারা মুক্তি পায়। অপরদিকে রাস্তায় ঘাটে, কোর্টে, আদালতে, বাসগৃহে, স্কুলে, কলেজে যত্রতত্র "ঘেরা ডালো" বা "সিট ডাউন স্ট্রাইক" অথবা মিছিল বাহির করিয়া সকল লোকের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কোন রাজকর্ম্মচারী বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যে কোন সময়ে কিছুক্ষণের জন্য কারাবাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন এবং তাহার জন্য গুলি চালান কিংবা লাঠি তাড়ন করিলেও বিশেষ সুবিধা হয় না। ব্যবসাদারদিগের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, তাহারা কবে, কোথায়, কিভাবে ব্যবসা চালাইতে পারিবে তাহা স্বয়ং ভগবানও বলিতে পারেন না। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর হইতে সকলের গভীর জলে পড়িতে অধিক বিলম্ব নাই বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

সবকিছু বন্ধ

অনেকের মতে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলে অথবা শুধু কথা বলিয়া, চিৎকার করিয়া কিংবা শক্তি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলেই জাতির সকল অভাব-অভিযোগ দূর হইয়া যাইবে। এ কথাটা অকেজো, নিষ্কর্ম্মা, অল্পবুদ্ধি ও পরের স্কন্ধে নির্ভরশীল লোকেদের কথা। জাতির অভাব-অভিযোগ দূর হইতে পারে শুধু কর্ম্মশক্তি ও তাহার সুব্যবহার দিয়া। অপর উপায় যাহারা কল্পনা করে তাহারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে বাস করে। আমাদিগের দক্ষিণ, বাম সরকারী, বেসরকারী সকল দলগুলিই দুর্ব্বল ও অক্ষম লোক দিয়া গঠিত। ঐ সকল দলের মধ্যে কোন স্বাবলম্বী, আত্ম নির্ভরশীল কর্ম্মী লোক কার্য্য ব্যবস্থা করিবার সুযোগ পায় না। যাহারা দল চালায় তাহারা বাক্যবীর ও আত্মমহিমা প্রচারে ব্যস্ত। ফলে সরকারী দলের লোকেরা দেশবাসীর খাওয়া পরা থাকা অথবা শিক্ষা চিকিৎসা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে অক্ষম; এবং বিপরীতদিকের লোকেরাও মিলিত ভাবে কোন গঠনশীল কার্য্য করিতে পারে না, শুধু চিৎকার, হাল্লা হাঙ্গামা ও জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া দিন কাটায়। খাদ্যাভাব হইয়াছে ও অসংখ্য মানুষ বেকার। ইহার প্রতিকার হাল্লা-হাঙ্গামা করিয়া হইতে পারে না। যাহারা হাল্লা-হাঙ্গামা করে তাহাদিগের মনে সরকারী দলের কর্ম্মক্ষমতার উপর অশেষ বিশ্বাস। কারণ তাহারা ভাবে যে হাল্লা-হাঙ্গামা করিলেই সরকারী দল সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আসলে যে সরকারী দলের কার্য্য করিবার ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রেরণা নাই তাহা বিপরীতপন্থিগণ বুঝে না ও মানে না। কারণ তাহারা নিজেরাও ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রেরণাহীন। যাহারা কাজ করিতে পারে ও জানে তাহারা মিলিত হইয়া চেষ্টা করিলে তবেই দেশের মঙ্গল হইতে পারে। সকল কিছু দেখিয়া মনে হয় যে সরকারী-বেসরকারী সকল রাষ্ট্রীয় দলগুলিকেই দমন করা প্রয়োজন।

মিহির সেন

মিহির সেন তাঁহার সাত সমুদ্র সন্তরণ পরিকল্পনায় সক্ষম হইয়াছেন। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি ইংলিশ চ্যানেল, পাক স্ট্রেট, স্ট্রেট অফ জিব্রালটার, দার্দানেলস্ ও বস্‌ফোরাস সাঁতার দিয়া পার হইয়াছেন। বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। ইহার মধ্যে আরও বড় কথা এই যে, মিহির সেন পেশাদার সাঁতারু নহেন। তিনি সুশিক্ষিত ব্যারিষ্টার এবং সাঁতার তাঁহার অবসরের সঙ্গী। মিহির সেন, সেনজায়া ও তাঁহার পরিবারের সকলকে আমরা আমাদিগের অভিনন্দন জানাইতেছি।

বেকুয়ানাল্যাণ্ড

শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আফ্রিকা কালো? ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন? অন্ধকার আমাদের অজ্ঞানতা, তিমির দুয়ার খোলা আজি জ্ঞানের আলোকে। একদা আঁধার কালো অভিহিত আফ্রিকার দিকেই আজ বিশ্বের জাগ্রত দৃষ্টি নিবদ্ধ। স্বাধীনতা লক্ষ্মীর জয়মাল্য-প্রসারিত হস্ত আজ তারই দিকে—তাই শুধু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই নয়, একবিংশ শতকেও আফ্রিকাই বিশ্ব ইতিহাসে সর্বাগ্রগণ্য মহাদেশ—ইহা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

শ্বেতাঙ্গ জাতির ঔপনিবেশিক ক্ষুধা যতই প্রবল হয়ে থাক, যতই ক্ষুরধার হোক তাদের রাজনীতি-ধুরন্ধরতা—যে মহাদেশে ছয় হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা বিদ্যমান—যে মহাদেশ আয়তনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বিশাল চীন, উপমহাদেশ ভারত, মার্কিন যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম য়ুরোপের সমষ্টির সমতুল—যে মহাদেশ বিশ্বের রত্নভাণ্ডারে শতকরা ৯১ ভাগ হীরা, ৫৭ ভাগ সোনা, ৯৯ ভাগ কলাম্বাইট (জেট প্লেনের ইস্পাত নির্মাণে অত্যাবশ্যক), ৮০ ভাগ কোবাল্ট, সর্বাধিক পরিমাণ য়ুরেনিয়ম প্রভৃতি উৎপাদন করে সেই রত্নগর্ভা আফ্রিকা অনন্তকাল পরপদানত থাকবে আর বহন করে চলবে বুভুক্ষা, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষার গ্লানি, এ কখনই সত্য নয়।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আফ্রিকার ইতিহাস ও মানচিত্রের দ্রুত পরিবর্তন কে উপেক্ষা করতে পারে? আফ্রিকা সভ্য-জগতের নূতন দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই দাবি রাখে। নানা কারণে এবং আত্মস্বার্থেই আফ্রিকার প্রতি ভারতেরও অধিকতর মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমাদের ছাত্র সমাজেরও আফ্রিকা-সচেতনতা বিশেষ কাম্য। তাই আফ্রিকার দেশগুলির কিছু পরিচয়, কিছু আলোচনা রাখতে চাই।

অবস্থান : উত্তরে : জাম্বেজি নদী ও জাম্বিয়া রাজ্য
দক্ষিণে : মালাপো নদী ও দক্ষিণ আফ্রিকা
পূর্বে : ট্রান্সভাল ও দক্ষিণ রোডেসিয়া
পশ্চিমে : দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা।
— মকর ক্রান্তি রেখা বরাবর —

আয়তন : ২,২২,০০০ বর্গমাইল।
ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ রাজ্যের একত্রিত আয়তনের সমতুল।

জনসংখ্যা : (১৯৬৪) : ৫,৪০,৪০১
(য়ুরোপীয় : ৪,০০০, এশীয় : ১,০০০)

রাজধানী : মাফেকিঙ্, নূতন রাজধানী : গাবেরোন্স্)
সরকারী ভাষা : ইংরাজি
প্রধান দেশীয় ভাষা : সোয়ানা (Tswana)
মুদ্রা : দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রা : র‍্যাণ্ড ও সেণ্ট
রাজনৈতিক অবস্থা : ব্রিটিশ রক্ষণাধীন—১৮৮৫-১৯৬৬
স্বাধীনতা ঘোষিত—অক্টোবর, ১৯৬৬

এমন একটা দেশের নাম করতে পার, যে দেশের রাজধানী নিজ সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয়? অবস্থিত অপর শাসিত ভিন্ন রাজ্যে? পৃথিবীতে একমাত্র উত্তর বোধ করি ব্রিটিশ রক্ষণাধীন বেকুয়ানাল্যাণ্ড। পৃথিবীতে একক দৃষ্টান্ত আফ্রিকার ওই রাজ্যেই। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশে, শ্বেতাঙ্গ শাসিত 'দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্যের' উত্তরে আর জাম্বিয়া ও জাম্বেজি নদীর দক্ষিণে বেকুয়ানাল্যাণ্ড—'ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা' নামাঙ্কিত অঞ্চলের অন্তর্গত বাসুতোল্যাণ্ড, সোয়াজিল্যাণ্ড, বেকুয়ানাল্যাণ্ড—তিনটি রাজ্যের একটি—বৃহত্তম। ছোটখাটো নয়। দু'লক্ষ বাইশ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড।

খোদ ইংলণ্ড আর ওয়েলস্ এর (৫৮,৩৪৩ বঃ মঃ) প্রায় চার গুণ। ভারতের বৃহত্তম রাজ্য মধ্যপ্রদেশ আর মাদ্রাজের একত্রিত আয়তনের (২,১১,৩৪২ বঃ মাঃ) চাইতেও বড়। স্বরাজ্যসীমা-বহির্ভূত রাজধানীর ওই বিড়ম্বনা ব্রিটিশ কবলিত বেকুয়ানাল্যাণ্ডের ভাগ্যেই হ'ল সত্য। রাজধানীর ঠাঁই ও আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধার ছিটেফোঁটা রইলো দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্যের কেপ প্রদেশে একটা ছোট্ট সহর মাফেকিঙ্-এ (Mafeking)। কারণ? কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক। অন্তত একটা কারণ এই, যে, ব্রিটিশ রাজের মজুত সেনানীর প্রধান আস্তানা ছিল কেপ প্রদেশে—কেপ অব গুড হোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপ-এ—যা ব্রিটিশ শক্তি প্রথম দখল করেছিল সুদূর ১৭৯৫ সাল থেকে।

প্রতিবেশী রাজ্য বেকুয়ানাল্যাণ্ডের উপর শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্যের যেমন লোলুপ দৃষ্টি ছিল, তেমনি ইংরেজ-শাসিত দক্ষিণ রোডেসিয়ারও দাবির অন্ত ছিল না বেকুয়ানাকে গ্রাস করবার। কিন্তু খোদ ব্রিটিশ রাজশক্তির কব্জা অনেক বেশি শক্ত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বেকুয়ানাল্যাণ্ড বিঘোষিত হ'ল ব্রিটিশ রাজের দখলিকৃত বলে। কিন্তু ইংরেজ-তনয় সেসিল জন্ রোডস্ (Cecil John Rhodes—১৮৫৩—১৯০২) নাছোড়বান্দা। কে এই রোডস্ সাহেব? যাবতীয় ইংরেজকুলে এক অদ্ভুত, অনন্যসাধারণ উদাহরণ সেসিল জন্ রোড্‌স্…অতি অদ্ভুত কল্পনাবিলাসী। ব্রিটিশের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণকারীদের ইতিহাসে আকাশচুম্বী কল্পনায় যার জুড়ি মিলবে না আর—সেই রোড্‌স্। আপন উৎসাহে ও একক উদ্যমে সে কম করেও আফ্রিকার আট লক্ষ বর্গমাইল স্থান ব্রিটিশ পতাকাতলে আনবে। যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখবে আকাশের ঊর্দ্ধে ওই গ্রহ-নক্ষত্রও হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত! সেই রোড্‌স্।

ভগ্নস্বাস্থ্য আর নির্ধন সে যুবক নিজ পুরুষকার বলে আফ্রিকায় ব্যবসা করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ওই দেশে 'ডি বীয়ার্স মাইনিং কোম্পানী' (De Beers Mining Co.) স্থাপন করে হীরক-খনির ইতিহাসে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্থা সৃষ্টি করলে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলে 'ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানী'। সেই রোড্‌স্…তারই সদ্য-স্থাপিত ওই বি-এস্-এ কোম্পানীর আওতায়ই নেওয়া হ'ল বেকুয়ানাল্যাণ্ডকে যার ডেপুটি কমিশনার ছিল সে ১৮৮৪ সালে। বেকুয়ানার পূর্ণ শাসনক্ষমতা গ্রহণেরই বাসনা তলে তলে ওই বি-এস্-এ কোম্পানীর অর্থাৎ রোডস্ সাহেবের। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনীর প্রধানমন্ত্রী হ'ল ওই সেসিল জন্ রোডস্। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বেকুয়ানাল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবন জুড়ে দেওয়া হ'ল সেই ১০০ বছর পূর্বে (১৭৯৫) ব্রিটিশ দখলিকৃত উত্তমাশা অন্তরীপের সঙ্গে, রোডস্ সাহেব যার প্রধানমন্ত্রী (১৮৯০-৯৫)।

১৮৯৫ সালেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে হ'ল এবং ওই বছরেই জাম্বেজি নদীর কূলে জাম্বেজিয়া অঞ্চলের নাম তাঁর স্বনামে চিহ্নিত করা হ'ল 'রোডেসিয়া' বলে (Rhodesia)। কিন্তু রোডস সাহেবের ইচ্ছা বেকুয়ানাল্যাণ্ডের পূর্ণ কর্তৃত্ব বি-এস্-এ কোম্পানীর হাতেই সমর্পণের।

ভারতে ইংরাজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে ভারতবর্ষে ইংরাজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রধান কাণ্ডারী রবার্ট ক্লাইভ সাহেবের কথা। ভারতবর্ষে ক্লাইভ—আফ্রিকায় রোডস।

বেকুয়ানাল্যাণ্ড রাজ্য ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়াই রোডস সাহেবের প্রয়াস। প্রতিবন্ধক হ'ল বেকুয়ানাবাসী। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর থাবা সম্প্রসারণ কালে যে প্রতিবাদ ইতিহাসে দেখতে পাইনে, তাই দেখি আফ্রিকার বেকুয়ানাল্যাণ্ডে। তিন দেশনেতা—তিনজন চীফ বা 'প্রধান' ছুটলেন ইংলণ্ড রাজ দরবারে তাঁদের প্রতিবাদ নিয়ে। উপনীত হ'ল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সকাশে।

'তোমাদের কিছু জমি ছেড়ে দিতে রাজী আছ? রেল-পথ স্থাপনের জন্য? রেল-পথ স্থাপন করতে চাই আমরা রোডেসিয়া ও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।'—ব্রিটিশ সর্ত তুলল তিন প্রধানের

প্রতিবাদের উত্তরে। অগত্যা রাজী হতে হ'ল। তবু একটা ব্যবসায়ী কোম্পানীর হাতে স্বদেশের ভাগ্য সঁপে দিতে বাধলো তাদের মনে। মহারাণী সম্মত হলেন কোম্পানীর হাতে বেকুয়ানার শাসনভার ন্যস্ত না করতে। ব্রিটিশ রক্ষণাধীনেই থাকল তাঁদের দেশ। আভ্যন্তরীণ প্রজা শাসনের ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 'প্রধান'দের ক্ষমতা ও অধিকারও স্বীকৃত হ'ল রাজদরবারের চুক্তিপত্রে।

দেশের পূর্বপ্রান্ত ঘেঁসে রেলপথের উপযুক্ত জমি পছন্দ করল ইংরেজ। রেল ছুটল (১৮৯৬-'৯৭) বেকুয়ানাল্যাণ্ড পাশে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্স-বার্গ আর দক্ষিণ রোডেসিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে। 'কেপ থেকে কায়রো'—দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে উত্তরতম প্রান্ত পর্যন্ত রেলপথের স্বপ্ন ছিল রোডস সাহেবের। তারই প্রথম ধাপ রূপ পেল ইংলণ্ডেশ্বরী আর বেকুয়ানার তিন প্রধানের চুক্তিপত্রে। আনন্দে সেসিল রোডস বেকুয়ানাকে বলে উঠল: 'সুয়েজ টু দ্য' নর্থ'।

২

বেকুয়ানাল্যাণ্ড সুবিশাল ভূখণ্ড হলেও সুসমৃদ্ধ রাজ্য হয়ে উঠতে পারে নি। কলোহারি মরুর নীরস বালুকা-রাশি বেকুয়ানার সৌভাগ্যের স্নেহ-আশ্বাস গ্রাস করেছে অনেকখানি। দেশের পশ্চিম দিকটায় ধূ ধূ করে শূন্যতা—নির্জন নিস্তব্ধ সুদূরপ্রসারী অনুর্বর পতিত জমি। আফ্রিকা মহাদেশের মহাশূন্যতার সর্বাধিক প্রমাণ এই বেকুয়ানায়। তথাপি প্রকৃতির হৃদয় নিষ্করুণ নয়। উত্তরে জাম্বেজি, দক্ষিণে মলপা—দুই নদীর স্রোতধারা রাজ্যের পূর্বাঞ্চলটি স্নেহসিক্ত রেখেছে যুগ যুগ ধরে। জনজীবনের বাসভবন আর গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব করেছে। সম্ভব করেছে পশুপালন। ও অঞ্চলই দিয়েছে সোনার খনি—দিয়েছে রূপা, এ্যাজবেষ্টাস প্রভৃতি। যদিও বেকুয়ানাবাসীর প্রধান উপজীবিকা পশুপালন ও গবাদি পশুর দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ। কারণ, কৃষি ত নির্ভরশীল বারিপাতের উপর। বৃহৎ শিল্পাদিরও অনেক বাধা। গোধনই ওদের সম্পদ। গোপালনই জাত ব্যবসা। ১৯৬৩ সালে গবাদি পশুর সংখ্যা ১৩,৪৯,৭৭৩ ছাগ-মেষ ৪,৮৭,১১৪ মোট ১৮,৩৬,৮৮৭। আর মানুষ? নরনারী? সবার উপরে যা সত্য? ১৯৬৪ সালের আদমসুমারি বলে: ৫,৪০,৪০১ জন মাত্র। তার মধ্যে য়ুরোপীয় হাজার চারেক, এশীয় হাজারখানেক। দু' লাখ বাইশ হাজার বর্গ-মাইলের মালিক কিঞ্চিদূর্ধ পাঁচ লাখ নরনারী। কিন্তু ওই সামান্য সংখ্যক নরনারী ইতিহাসে যে অসামান্য দেশপ্রীতি আর স্বাজাত্যবোধের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই তা সমগ্র মানবজাতির প্রশংসনীয়। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সে যে আমার জন্মভূমি"... বাঙালী কবি এ গান গেয়েছিলেন ভারতবর্ষে। কিন্তু দেশে দেশে সকল মানুষ, সকল জাতিরই এ প্রাণের কথা—হৃদয়বাণী। বামাঙওয়াতোও তাই বলে। বামাঙ-ওয়াতো? হাঁ, বেকুয়ানাল্যাণ্ডে সর্ব্বপ্রধান সর্বগরিষ্ঠ জাতি (১৯৬৪—২,০০,৫৮৫ জন বামাঙওয়াতো)। দেশীয় অপরাপর ক্ষুদ্রতর জাতির নাম Bakwena (৭২,৯২৯), Bangwaketse (৭১,৩২৩), Batawana (৪২,৩৯৫), Bagkatla (৩২,১১৮), Bamalete (১৩,৮৪৮), Barolong (১০,৬৮৮), Batlokwa (৩,৭৩৫) প্রভৃতি।

শুধু বেকুয়ানাল্যাণ্ডেই নয়, সকল অঞ্চলের সকল দেশীয় জাতির মধ্যে অন্যতম এক বিশিষ্ট জাতি বামাঙওয়াতো। বিশিষ্ট এই জাতির সবিশেষ এক নায়ক ২য় খামা (১৮৩০-১৯২৩) (Khama II)। বেকুয়ানার আধুনিক ইতিহাসে অবশ্য স্মরণীয় এক নাম। দেশের প্রধান সংগঠক, সংস্কারক, আধুনিক রূপায়ণের ভিত্তি-স্থাপক ওই দ্বিতীয় খামা। ব্রিটিশ আমলে ভারতের দেশীয় রাজাদের মতনই একজন রাজ্যাধিপতি—পদের নাম 'প্রধান' বা চীফ। একাদিক্রমে একান্ন বৎসর কাল ঐ পদে আসীন দেখি তাঁকে। লিভিংষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল তাঁর, হয়েছিল মিত্রতাও। ডক্টর ডেভিড লিভিংষ্টোন (স্কট) আফ্রিকায় আগত যাবতীয় য়ুরোপীয় মিশনারী বা দেশসন্ধানীগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জাম্বেজি নদীতে পতিত পৃথিবীর অন্যতম জলপ্রপাত আবিষ্কার ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে 'ভিক্টোরিয়া কলস' নামকরণ যাঁর অন্যতম কীর্তি। সেসিল রোডস্ স্থাপিত উত্তর রোডেসিয়ায় (জাম্বিয়া) 'লিভিংষ্টোন' নামে এক সহর এবং পার্শ্ববর্তী নিয়াজা-ল্যাণ্ডে তাঁর জন্মভূমি: 'Blantyre' নামে আরেকটি সহর যাঁর স্মৃতি ধরে রেখেছে। সেই লিভিংষ্টোন। আফ্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারেও এক প্রধান নায়ক।

২য় খামা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় লিভিংষ্টোনের সহিত তাঁর মিত্রতা বোধ করি দৃঢ়তর হয়েছিল। ডক্টর লিভিং-ষ্টোন বেকুয়ানাল্যাণ্ডেও ক'বছর কাজ করেছেন। স্থানীয় উন্নতিমূলক কাজ। এমন কি তাঁর বিবাহ-বাসরও ওই বেকুয়ানায়ই। আফ্রিকায় আগত একেবারে

প্রথম যুগের এক প্রধান মিশনারী রবার্ট মোফাত-এর (Robert Moffat) কন্যার পাণিগ্রহণ করেন লিভিংস্টোন বেকুয়ানাল্যাণ্ডে। বেকুয়ানাল্যাণ্ড-প্রধান দ্বিতীয় খামার পরিপক ৯৩ বৎসরে মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ২য় সেকগোমা (Sekgoma II) (১৯২৩)। ২য় সেকগোমা স্বল্পায়ু এবং স্বল্পকাল শাসন তাঁর। তাঁর মৃত্যুকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র সেরেটসি খামার (Seretse Khama) বয়স মাত্র চার বৎসর। বেকুয়ানাল্যাণ্ডে প্রশাসক-প্রধানের পদ উত্তরাধিকারক্রমে সত্য, কিন্তু সেই প্রধানকে রাজকার্য নির্বাহ করতে হয় গণতন্ত্রসম্মত প্রথায় নির্বাচিত এক জাতীয় পরিষদের পরামর্শক্রমে।

চার বৎসর বয়স্ক প্রধান সেরেটসির একজন প্রতিনিধি বা রিজেণ্ট নির্বাচন অবশ্যই প্রয়োজন হ'ল। জাতীয় পরিষদ (Kgotla) রাজপ্রতিনিধিত্ব ন্যস্ত করল এক যুবকের উপর (১৯২৬), তরুণ যুবক, বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। নাম শেকেদি খামা (Tshekedi Khama)। তৃতীয় খামার পুত্র, সেরেটসি খামার খুল্লতাত। অপরাপর দেশবাসীর মতই যার জাত-ব্যবসা বা উপজীবিকা গোপালন। ভুল করল কি জাতীয় পরিষদ? প্রশাক-বংশীয় হলেও অপরিণত বয়সের অনভিজ্ঞ তরুণ পারবে কি শাসন-তরী বয়ে নিয়ে যেতে শৃঙ্খলার সঙ্গে—দেশের উন্নতির পথে, কল্যাণের পথে? পারবে কি সে প্রতিবেশী লোলুপ দৃষ্টি শ্বেতাঙ্গ শাসিত দেশসমূহের শ্যেন দৃষ্টি আর মাথার উপর ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে যুঝে উঠে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে? ক্ষমতাগর্বে বেসামাল হয়ে পড়বে না ও তরুণ নায়ক? এই সকল প্রশ্নের আশ্চর্যজনক উত্তর অপেক্ষমান শেকেদি খামার নেতৃত্বের কাছে।

বিশ্ববাসী বিস্মিত হবে তরুণ নায়কের বিচক্ষণতা দেখে। বিস্মিত হবে শুধু বেকুয়ানা নয়, সমসাময়িক সমগ্র আফ্রিকার শাসন ইতিহাসে শেকেদির নেতৃত্ব তুলনাবিহীন দেখে। ইতিহাস মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিবে তার দেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধের অপূর্ব নিদর্শনের, দেশ-নেতৃত্বে তার বাস্তবতা জ্ঞানের। শেকেদি ভোলে নি তার দেশ অনুন্নত, গরীব। ভোলে নি সে আপামর স্বদেশ-বাসীর রুজি-রোজগারের পথ প্রশস্ত করা আর তাদের স্বার্থরক্ষাই দেশ পরিচালনার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। আরও ভোলে নি দেশের শক্তি-সাধ্য-সম্বলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই জাতির জয়যাত্রার পরিকল্পনা রচনা করা শ্রেয়, সঙ্গত। সহজ উন্নতির সহজ পথ। তার দেশকে রাতারাতি 'বিলেত' বানাবার দুঃস্বপ্ন দেখে নি শেকেদি খামা। কলে কারখানায় আর আকাশচুম্বি অট্টালিকায় রাতারাতি তার গরীব দেশের শোভাবৃদ্ধির কল্পনা করে নি সে, 'একটা নতুন কিছু করো'র মোহে বাতুল পদ্ধতির পেছনেও ছোটে নি। অলীক উন্নতির আশায় ছোটে নি সে ঘন ঘন দেশে দেশে ঋণপত্র স্বাক্ষর করে স্বদেশটাকে ঋণ পাশে নিবদ্ধিত করতে।

দেশবাসীর মূল সম্পদ গোধনের উন্নতির পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করাই শ্রেয় মনে করল সে প্রথমে। উন্নত ব্রীডিং পন্থায় অচিরে ঘরে ঘরে গৃহপালিত পশুর উন্নতি সাধনে দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটাল শেকেদি। তার-পর কৃষি সংস্কার। ধাপে ধাপে উন্নতির প্রকল্প। এবার শিক্ষা। বেকুয়ানাল্যাণ্ডে প্রথম মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করল শেকেদি। যোগ্য ও সমর্থ ব্যক্তির সেবাপরায়ণতাই তার দেশপ্রীতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাস্তববাদী শেকেদির প্রতি দেশবাসীর আন্তরিক আস্থা ও ভালবাসায় তার প্রশাসনের শক্তি ও প্রেরণা বেড়েই চলে। ১৯৬৪ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা দেখি আট—প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৪০, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ দুটো, কারিগরী স্কুলও বাদ যায় নি। হাসপাতাল নয়টি। নিশ্চিত সুখ ও সমৃদ্ধির শুভ আশ্বাস লাভ করল দেশবাসী। শেকেদি খামার নাম ইতিহাসে স্থায়ী হ'ল কল্যাণব্রতী, উৎসাহী ও সুসন্তান বলে। দৃঢ়চিত্ত ও সুশাসক বলে, ইংরেজেরা কি চোখে দেখল তাকে? একটা গল্প বলি তবে—

ব্রিটিশের অধীন দেশীয় রাজ্য শাসনের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব ঘটনা ঘটল বেকুয়ানাল্যাণ্ডে, আর শেকেদি খামার অসম সাহসিক ব্যবস্থা গ্রহণের দৃঢ়তার কথা ছড়িয়ে পড়ল দেশে-বিদেশে—আফ্রিকার অভ্যন্তরে আর সাগর পারে। ঘটনা হ'ল এই।

এক দুশ্চরিত্র ইংরেজ উৎপাত করে বেড়াচ্ছিল বেকুয়ানাল্যাণ্ডে। আফ্রিকান নারীর অসম্মান করছিল যথেচ্ছভাবে। সংবাদটা পৌঁছল শেকেদির কানে। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে দৃকপাত করল না সে। দুশ্চরিত্র ইংরেজ বন্দী হ'ল। আদালতে বিচার হ'ল সাধারণ কয়েদীর মতই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে। বিচারে বেত্রাঘাত দণ্ড হ'ল তার। কালো করল শাদার অপরাধ-বিচার! কালো হাতে শ্বেত অঙ্গে বেত্রাঘাত প্রকাশ্য ঘোষণায়! অশ্রুতপূর্ব ঘটনা শ্বেতাঙ্গ শাসিত, শ্বেতাঙ্গ রক্ষণাধীন আফ্রিকার ইতিহাসে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ শাসককুল, উত্তপ্ত হয়ে উঠল আফ্রিকার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল। দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্যে

ছিল এক অস্থায়ী ব্রিটিশ হাইকমিশনার। ইংরাজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। ফৌজ পাঠাল সুদূর কেপ প্রদেশ থেকে শেকেদির রাজধানী সেরোতে (Serow)। তার হুকুম—উপযুক্ত প্রতিশোধ লও, গদিচ্যুত কর শেকেদিকে। তাই হ'ল। শেকেদির কার্যভার কেড়ে নেওয়া হ'ল জুলুম করে। সংবাদটা লণ্ডনে পৌঁছতে বিলম্ব হ'ল না। পৌঁছল রাজদরবারে। শেকেদির ভাগ্য ভাল। লণ্ডনের নরমপন্থী ইংরেজগণের সমর্থন সে-ই লাভ করল। এক মাসের মধ্যেই পুনর্বহাল হল সে নিজপদে। ন্যায় বিচারের স্বীকৃতি পেয়ে বিজয় গৌরবে কার্যভার গ্রহণ করল সে। এই হ'ল শেকেদি খামা—সেরেটসি খামার রিজেন্ট। আর সেরেটসি? সেও আর শিশুটি নেই।

যোগ্য শাসকের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থায় ত্রুটি রাখেন নি খুল্লতাত। ভ্রাতুষ্পুত্রকে আইন পড়বার জন্য পাঠিয়েছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছেলেটিও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণই দেখিয়ে এসেছে এ যাবৎ। কিন্তু যুবক সেরেটসিকে ঘিরে মেঘ জমে উঠল বেকুয়ানার ভাগ্যাকাশে, বিরাট একখণ্ড কালো মেঘ। রাজনৈতিক ইতিহাসে উঠল প্রবল ঝড়। এক ইংরেজকন্যা, কুমারী রুথ উইলিয়ামস (Miss Ruth Williams) আর সেরেটসি খামা হয়েছে প্রণয়াবদ্ধ। আবদ্ধ হয়েছে বিবাহ-বন্ধনে। কালো এক দেশীয় রাজপুত্তুর বিবাহ করবে শ্বেতাঙ্গ তনয়াকে! প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হ'ল। দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে শিরোনামা দখল করল এই সংবাদ। বেকুয়ানার চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতাঙ্গ শাসিত রাজ্য—দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, রোডেসিয়া, এ্যাঙ্গোলা, টাঙ্গানিকা, কেনিয়া, উগাণ্ডা প্রভৃতি সর্বত্র শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব। আর তাদের সকলের চোখের সামনে এক কৃষ্ণাঙ্গ নেটিভ রাণী করে রাখবে প্রভুজাতির কন্যাকে! এ অসহ্য অবমাননা তাদের কাছে। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে চলল চতুর্দিকে। প্রবল আলোড়ন ইঙ্গ-এফ্রো সমাজে।

বিরক্ত হ'ল খুল্লতাত শেকেদি খামাও। স্বাজাত্য গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাঁর। আহত হয়েছে জাত্যাভিমান। নাইবা থাকুক তাঁদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য—তথাপি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রশাসনিক সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হবে মিশ্রিত রক্তোদ্ভব সন্তান—স্বকুলে এ অবমাননা নয়? ঐ বিবাহে আপত্তি তুলল দেশ-প্রতিনিধি শেকেদিও। আবার লণ্ডন…আবার ব্রিটিশ রাজদরবারে মীমাংসার হস্তক্ষেপ। ইঙ্গ-এফ্রো উভয় সমাজে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। দেশের উত্তেজনা-অগ্নিতে ইন্ধন যোগাল আরও একটা গুজব। এই সুযোগে শেকেদি খামা কি ভাইপোকে সরিয়ে নিজেই গদি দখল করতে চায়? প্রতিনিধি হতে চায় খোদ অধিকারী? প্রমাদ গুণল শেকেদি। ব্যথা পেল অকারণ সন্দেহে। অভিমান-মেঘও সঞ্চিত হ'ল অকৃত্রিম দেশসেবকের ক্ষুব্ধ চিত্তাকাশে। মিথ্যা রটনার মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

স্নেহার্থী ভাইপোর প্রতিযোগী শেকেদি খামা—এই মিথ্যা অপবাদ বেকুয়ানার ইতিহাস কলঙ্কিত করুক—চায় না সে। ব্রিটিশের মীমাংসাকালে রিজেন্ট নিজ প্রভাব বিস্তার করেছে—এরূপ সন্দেহেরও বিন্দুমাত্র সুযোগ দেবে না শেকেদি স্থির করল মনে মনে। স্বদেশের সীমা থেকে অন্তর্ধান করল সে অভিমানবশে। স্বরাজ্য ছেড়ে ভিন্ন রাজ্যে—অজ্ঞাতবাসে। সুযোগ জুটল ইংরাজের। অপূর্ব সুযোগ চতুর ব্রিটিশ সরকারের। শেকেদি খামার অনুপস্থিতির সেই সুযোগ গ্রহণ করল তাঁরা। সেরেটসি খামার সিংহাসন অধিকার হরণ করা হ'ল। নির্বিবাদে করা হ'ল গদিচ্যুত। এমন কি স্বদেশে বসবাস অধিকারও রইল না তার। আর শেকেদি খামারেরও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ হয়ে গেল, পদাধিকার বাতিল হ'ল তাঁরও। আপাতত সাময়িকভাবে পূর্ণ ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হ'ল বেকুয়ানাল্যাণ্ডে।

সেরেটসি খামা সস্ত্রীক আস্তানা নিল ইংলণ্ডে। কিন্তু শেকেদি খামার শাস্তির যুক্তি বিশ্বের কোন যুক্তি-বাদীই খুঁজে পেল না আজও। অসন্তোষ জেগে উঠল বেকুয়ানার জনচিত্তে। বামাঙ্‌ওয়াতো জাতি এ অন্যায় সহ্য করতে নারাজ। ইংরেজ বাধ্য হল পূর্ব সিদ্ধান্ত কিছু সংশোধন করতে। শেকেদি খামা অনুমতি পেল দেশে ফিরতে, যদিও রাজনৈতিক কোন কার্যে যোগদান রইল নিষিদ্ধই। ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শ—অপর কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন কর প্রশাসক পদে। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হ'ল। সুচারু মীমাংসার পথ ইংরেজ খুঁজে পেল না। বেকুয়ানাবাসীর ধূমায়িত অসন্তোষ ক্রমে রূপ নিতে থাকল জাতীয় আন্দোলনে। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকল নিরন্তর। শেকেদি আর সিরেটসি খামা সম্পর্কে ঝানু ইংরাজ-রাজেরও রাজনীতির চালে চরম ভুলের মাশুল তাদের পক্ষে বেদনাদায়ক হলেও গত্যন্তর রইল না।

১৯৬১ সালে শাসনবিধি আরও পরিবর্তন করতে

হ'ল দেশীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করে, গঠিত হ'ল আইন-পরিষদ ও কার্যনির্বাহক পরিষদ। এতেও নয়। ১৯৬৫ মার্চ মাসে ক্যাবিনেট প্রথা প্রবর্তন করা হ'ল—হ'ল আইন সভা (অ্যাসেম্ব্লি)। ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি হাই-কমিশনারের পদ পূর্বেই তুলে নেওয়া হয়েছে—তার স্থলে হয়েছে কমিশনার মাত্র। যদিও সরকারী ভাষা ইংরাজীই আছে। কিন্তু দেশ আর পূর্ব অবস্থায় পড়ে নেই। ওরা ব্যবসা শিখেছে। আজ তাদের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র লোবাটসি (Lobatsi), গাবেরোনস (Gaberones), ফ্রানসিস্‌টাউন (Francistown) বহু-বিদিত। ওদের বড় বড় সহর ক্যানাই (Kanye), সেরোই (Serowe), মোলপলোল (Moloeplole) প্রভৃতির জনবসতিও বেড়ে চলেছে। সর্বোপরি নূতন রাজধানী গড়ে উঠেছে ব্যবসা-কেন্দ্র গাবেরোনস সহরে। ইংরেজ বুঝেছে তাকে যেতে হবে—ছাড়তে হবে বেকুয়ানার রাজত্ব। স্বাধীনতা সমর্পণের দিন ধার্য হয়েছে ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে—এ সংবাদ বিঘোষিত হয়েছে বিশ্বের সংবাদপত্রে।

ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকার তিনটি রাজ্যের একটি মুক্ত হ'ল। রইল বাকী দুই।

বজ্রের আলোতে

শ্রীসীতা দেবী

(৫)

দিন আরও কয়েকটা কেটে গেল। ধীরা দুই সপ্তাহ বিভাদের বাড়ী যায় নি। প্রথমবার বলেছে শরীর খারাপ, দ্বিতীয়বার বলেছে তার অনেক পড়া আছে। বিভা কলেজে আসে বটে, তবে ধীরার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বিশেষ বলে না। ধীরার সঙ্গে visitor's day-তে দেখা করতে একদিন ভবতোষবাবু আর একদিন তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন। জয়ন্তের সঙ্গে আর ধীরার দেখা হয় নি, সেই বেড়াতে যাবার দিনের পর।

শুক্রবারে একটা ঘণ্টা ছুটি ছিল ধীরার। লাইব্রেরীর এক কোণে ব'সে সে কি একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, এমন সময় বিভা এসে তার পাশে ধপ ক'রে ব'সে পড়ল। বলল, "বই রাখ দেখি। তুই এই রবিবারেও যাবি না না কি আমাদের বাড়ী?"

ধীরা বলল, "যাবার বিশেষ ইচ্ছা ত নেই। যা scene কর তুমি।"

বিভা হঠাৎ কেঁদে ফেলল, রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারও দিন আসছে। তুমিই কি আর ছাড়া পাবে? এই রকম চেহারা নিয়ে জন্মেছ যখন, তখন অনেক ভক্ত ছুটবে চারপাশে। কারো না কারো জন্যে কাঁদতে হবেই।"

ধীরা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে তার হাত ধ'রে চোখ মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, "কাঁদছিস্ কেন ভাই? আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি? সত্যি অনেক পড়া জ'মে গিয়েছিল, সেদিক দিয়ে দেখলে না গেলেই ভাল হ'ত। তা তুই যদি খুসী হোস আমি গেলে, তা না-হয় আমি যাব। তবে আমাকে যখন-তখন খোঁচা দিসনে। আমি অন্যায় ত কিছু কাজ করিই নি, এমন কি অন্যায় চিন্তাও আমার মনে কখনও স্থান পায় নি।"

বিভা বলল, "জানিস, জয়ন্ত দা আমার সঙ্গে আজকাল কথাই বলে না।"

ধীরা বিস্মিত হয়ে বলল, "কেন রে?"

"এই তোকে বিরক্ত করেছি ব'লে। তুই ত সেই জন্যেই আমাদের বাড়ী যাস না? তাই রাগটা আমার উপরে ঝাড়ছে আর কি?"

ধীরা বলল, "তা না বলুক গিয়ে, তুইও বলিসনে। একে ত মানুষের মনে অশান্তির সীমা নেই, তার উপর আবার জোর করে অশান্তি ডেকে আনা।"

বিভা বলল, "তুমি ত তা বলবেই। নিজের ত আঁতে ঘা পড়ে নি?"

ধীরা বলল, "তোমারই বা পড়ছে কেন? কারও দাদা যদি একটু কম কথা বলে, তা হ'লে কি তার জন্যে কাঁদতে বসতে হবে? এমন কাণ্ডও ত কখনও দেখি নি।"

বিভা বলল, "দাদা ত কত! দাদা বললেই কি দাদা হয়ে যায় না কি? খুব দূর সম্পর্ক একটা কি আছে শুনি।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা, দাদা নাই হ'ল, বন্ধুই হ'ল। তা বন্ধু-বান্ধবেও ত সারাক্ষণ মান-অভিমান করে? তার জন্যে অত মন খারাপ করবার কি হ'ল?"

বিভা বলল, "আচ্ছা বাপু তুমি যদি ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজ ত আর কি করতে পারি। মোট কথা রবিবারে দয়া ক'রে যেও। তাতে লাভ-লোকসান যাই হোক আমার।"

ধীরা বলল, "সত্যি যদি মনে করিস যে লোকসানও হতে পারে তা হ'লে আমাকে ডাকিস নে ভাই। আমার এ সব একেবারে ভাল লাগে না। কারও মনে কষ্ট আমি দিতে চাই না, কারও কষ্টের কারণ হতেও চাই না।"

বিভা বলল, "আচ্ছা সে দেখা যাবে। তুমি মোট কথা যাবে। তোমার সামনে বেশী হাঁড়িমুখ ক'রে বেড়াতে পারবে না ত? যদি তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসে ত আমার সঙ্গেও কথা বলতে হবে।"

ধীরা কিছু বিরক্ত হয়ে চুপ ক'রে রইল। আচ্ছা উৎপাত রে বাবা! সে যে কেন এই ব্যাপারের ভিতর জড়িয়ে পড়ল, তা সে ভেবেই পায় না। জয়ন্তের প্রতি তার নিজের মনের টান কিছুই নেই, অথচ বিভা সারাক্ষণই ধীরাকে সব কিছুর জন্য দায়ী করছে।

জয়ন্তের উপরেও তার রাগ হতে লাগল। সে যদি বিভাকে আগে ভালবাসত, তা কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে এখন না ভালবাসতে? ধীরার সঙ্গে ক'দিনেরই বা তার পরিচয়? আর শুধু পরিচয়ই ত? মনের দিক থেকে তারা প্রায় সম্পূর্ণ অচেনা। সেও কি ভাবে না কি যে ধীরা তাকে ভীষণ পছন্দ ক'রে ফেলেছে? ধীরার ভয়ানক রাগ হতে লাগল। কোনরকম করে কি এই ছেলেটিকে জানান যায় না যে ধীরা তাকে অতি সাধারণ আলাপী মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে করে না?

পরের রবিবার অবশ্য ধীরাকে যেতেই হ'ল ভবতোষ বাবুদের বাড়ী। বিভা অন্য লোকজনের সামনে বেশ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ায়। কিন্তু একলা হলেই তার মূর্তি বদলে যায়। জয়ন্তের সামনাসামনি পড়লেও তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। জয়ন্ত যেন জিনিষটাকে দেখতেই পাচ্ছে না এইভাবে উপেক্ষা ক'রে যায়। এতে বিভার রাগ বাড়ে বই কমে না।

সন্ধ্যেবেলা যখন ধীরা একটু পড়তে যাবে তখন বিভা ঘরে এসে তাকে খবর দিল, "জানিস, জয়ন্তদা তোর ছবি আলাদা ক'রে একটা বড় print করে রেখেছে। আমি তার জামার পকেটে দেখে এলাম।"

ধীরা বলল, "তার পকেট হাতড়াতে গিয়েছিলে কেন?"

"এমন ত কত সময় হাতড়াই। আজ একটু অসময়ে ধোপা এসেছিল, তাই ওর ময়লা কাপড়গুলো বার ক'রে দিতে গিয়েছিলাম।"

ধীরা আর কথা বাড়াতে চাইল না। কিন্তু বিভার যে কথা বলাই দরকার। সে বলল, "কিছু বলছিস না যে? খুশী হয়েছিস, না রাগ করেছিস?"

ধীরা বলল, "খুশীও হই নি, রাগও করি নি। এটা নিয়ে হৈ চৈ করবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করছি না।"

"তা ত করবেই না। ওর কোনও মূল্যই ত নেই তোমার কাছে।"

ধীরা বলল, "সাধারণ বন্ধু-বান্ধবের যে মূল্য থাকে তার চেয়ে বেশী আর কি থাকবে?"

বিভা বলল, "সেটা তাকে বলে দে না?"

ধীরা বলল, "তুই কি ক্ষেপেছিস? আমি গায়ে প'ড়ে এ সব কথা তাকে বলতে গেলাম কেন? সে ত আমাকে কোনদিন কিছু মুখে বলে নি?"

বিভা বলল, "কাজে ত দেখাচ্ছে।"

ধীরা বলল, "তুমি চোখে jelousy-র চশমা পরে দেখছ তাই সব জিনিষ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তোমার কাছে। সাধারণ ভদ্রতার সম্পর্ক ছাড়া ওর আর আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, থাকতে পারেও না।"

বিভা বলল, "কোনদিনই পারবে না?"

"না, আমার প'ড়ে-শুনে মানুষ হতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এখন অত 'মায়ার খেলা' খেলবার সময় নেই আমার। ওদিকে আমার মন মোটেই যাচ্ছে না এখন।"

বিভা বলল, "যারা পড়াশুনো করছে, চাকরি-বাকরি করছে তারা কি কোনদিন প্রেমে পড়ে না, না বিয়ে করে না?"

ধীরা অতিষ্ঠ হয়ে বলল, "আমি অন্ততঃ এখন বিয়ের ভাবনা ভাবছি না। তুমিও এখন কিছুদিন না ভাবলে পার। যদি অবশ্য পড়াশুনো চালিয়ে যাবার আর পাশ করার ইচ্ছেটা থাকে।"

"সে ত আছেই। বিয়ে যে হবেই তারই ঠিক কি? ও হয়ত কোনদিন আমাকে বিয়ে করতে চাইবেই না। যদিও কখনও সে ইচ্ছা তার হয়ও বাবা-মা বাধা দেবেন। সে গরীব, তা ছাড়া দূর সম্পর্কও রয়েছে একটা।"

ধীরা বলল, "তা হ'লে এখন কিছুদিন মনটা ওদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে পড়াশুনোর দিকে দেবার চেষ্টা কর।"

বিভা বলল, "হয় তুই একেবারে পাথর, নয় দারুণ hypocrite। আচ্ছা দেখা যাবে,

"বুঝির বলে সকলি বুঝেছ হ' একটি বাকি রয়েছে তবু
দেব যাহারে সহসা, সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।"

বলে গট গট ক'রে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ধীরার পড়াশুনো প্রায় মাথায় উঠবার জোগাড় হ'ল। বিভার সঙ্গ ত্যাগ না করলে তার চলবে না, সে বুঝতেই পারল। কিন্তু কিভাবে সেটা করা যায়? সামনের বড় ছুটিটাতে একবার কলকাতা ঘুরে আসবে? কয়েকটা দিন শান্তি পাওয়া যায় তা হ'লে। আর তার অনুপস্থিতিতে যদি এই দুটো মানুষ কিছু বোঝাপড়া ক'রে নিতে পারে নিজেদের মধ্যে, তা হলে ত বাঁচাই যায়। কিন্তু কলকাতায় যেতে তার একেবারেই ভাল লাগে না যে? অতীতের একটা বিভীষিকা সেখানে হিংস্র জন্তুর মত ওৎ পেতে আছে তাকে গ্রাস করবার জন্যে। কলকাতা ছাড়ার পর থেকে ওটা তার মনের পিছন দিকে স'রে গেছে। ভুলতে সে পারে নি, একেবারে ভুলে যাওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু এখানের

পরিবেশে ওটাকে বেশী মনে পড়িয়ে দেওয়ার কিছু নেই। সে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের যে ছবি আজকাল আঁকে তার ভিতর এই নারকীয় অভিজ্ঞতার কোন স্মৃতি তাকে তাড়া ক'রে বেড়াবে না। নিজের প্রথম যৌবনের একটা অত্যন্ত বড় ক্ষত চিহ্নের মত সেটা লুকিয়েই থাক তার অস্তিত্বের মধ্যে। সে নিজে ছাড়া এটার জন্যে কারই বা কি ভাল-মন্দ হচ্ছে?

মনে মনে কলকাতা যাওয়াটাই সে স্থির করল। মাকে লিখল, মা উত্তরে জানালেন স্বচ্ছন্দে সে আসতে পারে। বিভাকেও বলল, মনে হ'ল সে খুশীই হয়েছে। জয়ন্তও নাকি মাস খানিকের জন্য দেশে যাচ্ছে। ধীরা ভাবল তার একটা প্ল্যান ভেস্তেই গেল তা হ'লে। জয়ন্ত এখানে উপস্থিত না থাকলে কার সঙ্গে বা বিভা বোঝাপড়া করবে? তবে ধীরা ফিরে আসার আগেই জয়ন্ত ফিরে আসবে। ঐ সময়টুকুর মধ্যে যদি ওরা কিছু বোঝাপড়া ক'রে নিতে পারে ত ভালই।

বিভাদের বাড়ী যাওয়া-আসা তার চলতেই লাগল। বিভার মেজাজ কখনও ভাল থাকে কখনও বা থাকে না। জয়ন্ত এবং ধীরা দু'জনেই বেশ কিছুদিনের জন্যে চ'লে যাবে, এতে সে যেন একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। জয়ন্ত এবং তার মাঝের বাধাটা এখনও দূর হয় নি। তবে বিভার মনটা একটু সুস্থ হয়েছে, খানিকটা সময় চ'লে যাওয়ার ফলে। ধীরার সঙ্গে আর সে ঝগড়া করে না আজকাল। জয়ন্ত আর একটা কি কাজ ঠিক করেছে, কাজেই বেশীর ভাগ সময় সে বাড়ীতেই থাকে না। একদিন তাকে আর বিভাকে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছিল, এ ছাড়া ধীরার সঙ্গে তার আর দেখাই হয় নি।

ছুটির সময় হয়ে এল। ধীরা কলকাতা যাবার ভাল সঙ্গীই পেয়ে গেল কপালক্রমে। ভবতোষবাবুর এক বন্ধু চলেছিলেন সপরিবারে, তাঁদেরই সঙ্গে জুটে গেল সে। ভবতোষবাবু টিকিট কেনা প্রভৃতির ভার দিয়ে দিলেন জয়ন্তের উপরে। ধীরা শুনে বিরক্ত হ'ল, কিন্তু বিরক্ত হয়েই বা লাভ কি?

যাত্রার আগের দিন জয়ন্ত এসে তার টিকিট দিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, "ষ্টেশনে কে পৌঁছে দিচ্ছে?"

ধীরা বলল, "আমি ত দুপুরে আপনাদের ওখানেই যাচ্ছি। খেয়েদেয়ে ওখান থেকেই বেরোব। যা হয় ব্যবস্থা ওঁরাই করবেন।"

জয়ন্ত নমস্কার ক'রে চ'লে গেল। ধীরার জিনিষ-পত্র গোছান সব শেষ হয় নি, সে বাকি কাজ সারতে গেল।

দুপুরে গিয়ে উঠল বিভাদের বাড়ী। বেশ কিছু-দিনের জন্যে যাচ্ছে সে, কাজেই বিভা আজ আর তার সঙ্গে ঝগড়া করল না। অন্য নানা বিষয়ে গল্প করল; তবে জয়ন্তের কথা বিশেষ কিছু বলল না। কলকাতার কাদের কাছে বিভার মা কি সব জিনিষ পাঠাবেন; নিজের বাক্সের মধ্যে সেগুলোর জায়গা করতেই অনেক সময় চ'লে গেল ধীরার।

ট্রেণের সময় হয়ে এল। ট্যাক্সি ডাকা হ'ল। ধীরাকে পৌঁছে দিতে চলল বিভা, জয়ন্ত আর বিভার বাবা। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল, সময় বেশী হাতে নেই। গাড়িতে উঠে ব'সেই ধীরা বলল, "যাঃ, একটা magazine টিন আনলে হ'ত। সময় কাটানই দায় হবে।" সে যাঁদের সঙ্গে যাচ্ছিল, তাঁরা এই সময় এসে পড়াতে একটু কলরবের সৃষ্টি হ'ল। তাঁদের সঙ্গে অনেক লটবহর, সব হৈ চৈ ক'রে ওঠান হতে লাগল।

জয়ন্ত যে জানলার কাছ থেকে স'রে গিয়েছে তা ধীরা বিশেষ লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ আবিষ্কার করল যে সে একটা নূতন magazine হাতে ক'রে ধীরার পাশের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরার হাতে পত্রিকাটি দিয়ে বলল, "খুব ভাল কিছু এ দিকে পাওয়া গেল না, এইটে নেড়ে-চেড়ে দেখবেন।"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে ধীরা বলল, "না হলেও কিছু অসুবিধা হ'ত না, কেন আবার কষ্ট করতে গেলেন?"

"কষ্ট করতে না পাওয়াটাই অনেক সময় কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। আচ্ছা, গাড়ি ত ছাড়ল এখন। আসি তবে," ব'লে জয়ন্ত হঠাৎ জনসমুদ্রে মিশে গেল। বিভা ও তার বাবাও এই সময় বিদায় গ্রহণ ক'রে ফিরে চললেন।

ধীরা জয়ন্তের কথায় সামান্য একটু বিরক্ত হ'ল, আবার তার জন্যে একটু দুঃখিতও হ'ল। এ সব ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়ে লাভ কি? বিভা ভাগ্যে শোনে নি, তা হ'লে আর রক্ষা রাখত না। ষ্টেশনেই একটা ঝগড়া-ঝাঁটি বাধিয়ে বসত হয়ত। আর জয়ন্তের এটা এতদিনে বোঝা উচিত ছিল যে ধীরার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তাতে এ সব ভাবোচ্ছ্বাস শোভা পায় না।

যাক, এখন মাস দেড়েকের মত সে এ সব ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল। কলকাতায় অবশ্য তার দিনগুলো ভাল কাটবে কি মন্দ কাটবে তা সে কিছুই জানে না। আগে আগে ত কাজকর্মের অভাবে, বন্ধু-

বান্ধবের অভাবে, একেবারেই ভাল লাগত না। তবে দিনও অনেকগুলো কেটে গেছে। অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে হয়ত। সে নিজে যা ভুলে যাচ্ছে, অন্য লোকে কি তা ভুলতে পারে নি? নীরাও অনেক বড় হয়েছে, বেশ বিজ্ঞের মত চিঠিপত্র লেখে। তার বিয়ের কথা হচ্ছে আবার। মা-বাবা এবার কাজ উদ্ধার করে তবে ছাড়বেন। ধীরার নিজের ত বিয়ে হবেই না, ছোট বোনের বিয়েতেই যতটা আমোদ-প্রমোদ করে নেওয়া যায়, ততটাই লাভ। ভাইগুলোও কিছুটা মানুষের মত হয়ে এসেছে।

পথটা কোনমতে কেটে গেল। সঙ্গীরা মিশুক মানুষ, কাজেই সারা পথ মুখ গুঁজে ব'সে থাকতে হ'ল না তাকে। হাওড়া ষ্টেশনে বাবা আর একটা ছোট ভাইকে দেখে তার বেশ ভালই লাগল। ছোট ভাই রিন্টু বলল, "বাবা দিদি কত মোটা হয়ে গেছে। করসাও হয়েছে অনেকটা।"

তার বাবা বললেন, "খোট্টার দেশে স্বাস্থ্যটা ভালই ছিল দেখছি।"

বাড়ী এসে খানিকটা সময় ভালই গেল। মা তার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে মহা খুসী। বললেন, "দেড় বছরেই চেহারা কতটা বদলে গেছে দেখ। আরও ত সাড়ে তিন বছর থাকবে ওখানে। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ফিরবে।"

নীরা তাকে চুপি চুপি বলল, "জানিস রে, পরশু একজনারা দেখতে আসছে আমায়। তুই যেন আগে-ভাগে দেখা দিয়ে বসিস না, তা হ'লে আর আমাকে কেউ পছন্দ করবে না।"

ধীরা বলল, "না রে না, আমি একেবারে ছাদে উঠে ব'সে থাকব। আমার মানুষ বিশেষ ভাল লাগে না, নতুন মানুষ ত একেবারেই না।"

মা, বাবা, ভাই-বোন এদের সঙ্গে গল্প ক'রে সময়টা মন্দ কাটছিল না। নীরাকে দেখেও গেল একদিন, একপাল লোক এসে। পছন্দই হ'ল বোধ হয়, কারণ নীরা মন্দ নয়। মেয়ে মোটামুটি পছন্দই হয়েছে, ব'লে পাঠাল তারা, তবে দেনা-পাওনার বিষয়ে কথা বলতে হবে।

ধীরা মনে মনে বলল, "বাবার এই একটা খরচ আমি বাঁচালাম, টাকা দিয়ে বিয়ে আমার দিতে হবে না।"

বিভার চিঠি প্রথম কয়েকদিন পেলই না। বোধ হয় জয়ন্তের আসন্ন বিদেশ যাত্রার ভাবনাটা তাকে বেশী ব্যস্ত করে রেখেছিল। অথবা ধীরার অনুপস্থিতিটাকে অন্যভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টাও হতে পারে।

অবশেষে চিঠি একটা এল। ধীরার বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। কলকাতায় আসতে তার কোন অসুবিধা হয়েছে কি না। বাড়ী ফিরে গিয়ে কেমন লাগছে। বিভাকে একবারও মনে পড়ে কি না। আর কাউকে কি মনে পড়ে? দিল্লী ফিরে যেতে ইচ্ছা করে কি না? জয়ন্ত আর দু'দিন পরেই চলে যাবে। মাসখানিক থাকবে বাইরে। এখনও ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা বলে না বিভার সঙ্গে, তবে আগেকার অখণ্ড নীরবতাটা ভেঙেছে। তবে একটা গুজব শুনে বিভা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। জয়ন্তের মা না কি দেশে নিয়ে গিয়ে তার বিয়ের চেষ্টায় আছেন। বিভা সম্বন্ধে কাণাঘুষা কিছু তাঁদের কানে গিয়ে থাকবে।

চিঠিটা বেশী বড় নয়। লেখিকার মনটা যে ভাল নেই, সে কথা প্রতিটি লাইনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ধীরার মনটা খুবই বিষণ্ন হয়ে উঠল, বিভার জন্যে। কি কষ্টই পাচ্ছে মেয়েটা। অথচ এ সব ব্যাপারে একজন তৃতীয় ব্যক্তি কি-ই বা করতে পারে? জোর ক'রে বিয়ে আমাদের দেশে যথেষ্টই হয়, কিন্তু জোর করে কাউকে ভালবাসিয়ে দেওয়া ত যায় না? অথচ বিভা যে ধরনের মেয়ে তাতে গতানুগতিক একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই যে সে খুব খুসী হয়ে উঠবে তা মনে হয় না। ভাল বিয়ে হলেও খুসী হবে না। সে যাকে চাইছে, উল্টে তার কাছ থেকে এই চাওয়াটাই চায়। সেখানে বঞ্চিত হলে হয়ত জীবনে সুখীই হবে না।

জয়ন্তকেও বোঝে না ধীরা সে প্রথমে ত বিভাকে খুবই পছন্দ করত, অন্ততঃ ধীরার তাই ধারণা। অবশ্য এ ধারণাটা তার বিভার কথা থেকেই হয়েছে। তবে সে হঠাৎ বদলে যাবে কেন? বিভা সুন্দরী নয়, তাই কি একজন সুন্দরীকে দেখেই তার এই পরিবর্ত্তন হ'ল? তা হ'লে ত পৃথিবীতে সাধারণ চেহারার মানুষকে কেউ ভালই বাসত না? জয়ন্ত নিজেও তবে সুন্দর নয়? তবে সে ভালবাসা প্রত্যাশা করে কেন? অবশ্য বিভার ধারণাটা গোড়ার থেকেই ভুল হতে পারে। হয়ত জয়ন্ত প্রথম থেকেই তাকে বোনের মতই ভালবেসেছে। বিভা এখন আর তাতে খুসী নয়।

কোনমতে একটা চিঠির উত্তর দিল ধীরা, বেশী মতামত কিছু প্রকাশ করল না। নীরাকে নিয়ে যে বৈবাহিক আলোচনা হচ্ছে তার অনেক গল্প লিখে জানাল। অবশ্য নীরাকে বিভা চেনে না, কাজেই

তার সম্বন্ধে খুব একটা কৌতূহল তার থাকবার কথা নয়। তবু কিছু ত একটা লিখতে হবে?

পরের চিঠিতে বিভা জানাল যে জয়ন্ত চ'লে গেছে। কতদিন পরে যে ফিরবে তা ঠিক ক'রে কিছু ব'লে যায় নি। তবে যাবার সময় ব্যবহার ভালই ক'রে গেছে। চিঠি বড় ক'রে কিছু লেখে নি। মায়ের নামে একটা পোষ্টকার্ড এসেছে। জয়ন্তের মা বিভার মাকে মস্ত এক চিঠি লিখেছেন। তিনি ছেলের বিয়ে দিতে চান। মেয়েও একটি তাঁর পছন্দ মত আছে। খুব সুন্দরী বা খুব ধনী-কন্যা নয়, তবে তাঁদের মত গেরস্ত ঘরে ভালই মানাবে। কিন্তু জয়ন্ত কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। এরকম অল্প আয়ে না কি বিয়ে করা অতিশয় নির্ব্বোধের কাজ হবে। কিন্তু তাঁরা ত অতি সাধারণভাবে থাকতেই অভ্যস্ত, বিয়ে করলেই যে রাজা-রাজড়ার ষ্টাইলে থাকতে হবে, এমনি কি কথা? হয়ত বড়লোকদের সঙ্গে থেকে থেকে তার নজর উঁচু হয়ে গেছে। জয়ন্ত যখন দিল্লীতে ফিরে যাবে, তখন বিভার মা কি তাকে একটু বোঝাতে পারেন না? জয়ন্তের মা বুড়ো হয়ে পড়ছেন, একলা আর সংসার ঠেলতে পারেন না। এই সময় একটি বধূ যদি আসত, তা হ'লে কত সুবিধা হ'ত তাঁর।

বিভা আগাগোড়া চিঠিটাই তাঁর তুলে দিয়েছে। কিন্তু বিভার মা এ-সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ পছন্দ করছেন না। তাঁদের ছেলে, তাঁরা তার সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। বিভার ইচ্ছা করে মাকে সব কথা খুলে বলতে, কিন্তু সাহস পায় না। তাঁরা মত কখনই দেবেন না, মাঝ থেকে একটা বিশ্রী গোলমাল হয়ে জয়ন্তের এখানে বাস করাই উঠে যাবে। বিভারও ত তাঁরা বিয়ে দিতে চান। তলে তলে পাত্র খোঁজা হচ্ছে। তবে বিভাকে এখনও কিছু বলা হয় নি। এটা ধীরা যেন নিশ্চিত করে জানে যে বিভা জয়ন্তকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

(৬)

নীরার বিয়েটা ঠিক-ঠাক হয়েই গেল। তবে বিয়ে হবে শ্রাবণ মাসে।

নীরা জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ ভাই দিদি, তুই তখন আসবি না?"

দিদি বলল, "কি ক'রে বলি? একটা পরীক্ষা এসে পড়বে, তখন আসতে পারব না হয়ত।"

নীরা বলল, "বা রে, তুমি একমাত্র দিদি আমার, আসবে না কিরকম?"

ধীরা বলল, "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে এ'ন। আর এরপর দিদি-টিদির দরকার হবে না। এক বর পেয়ে সব ভুলে যাবে।"

নীরা বলল, "হ্যাঁ, তা আর না? কোথাকার একটা অচেনা কে তার ঠিক নেই। আমি অনেক শাড়ী গহনা পাব, তাই ত বিয়ে করতে রাজী হলাম, নইলে মতই দিতাম না।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা যা হোক, আমি তোর বরকে ব'লে দেব যদি তখন আসি।"

নীরা বলল, "দিও ব'লে, ভারি বয়েই গেল।"

ধীরার কলেজ খোলার দিন এগিয়ে আসছে। বিভা বহুদিন চিঠিপত্র কিছু লেখে নি। কে কেমন আছে, ধীরা কিছুই জানে না।

অবশেষে তার যাওয়ার দিন এসে গেল। ধীরার বাবাই এবারও তাকে পৌঁছে দিতে চললেন। খুব বেশী পরিচিত লোক না হলে তাঁরা ধীরাকে এখনও কারো সঙ্গে যেতে দিতে রাজী ছিলেন না।

ধীরা সোজা গিয়ে হষ্টেলেই উঠল। বিভাদের বাড়ীর খবর কিছুই জানে না, কাজেই সেখানে যাবার চেষ্টা করল না। ধীরার বাবা একটা বেলা হোটেলে কাটিয়ে ফিরে চ'লে গেলেন।

পরদিন কলেজে গিয়ে বিভার দেখা পেল। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে, চোখে-মুখে বেশ অসুস্থতার চিহ্ন। বলল, "কি হয়েছিল রে? এত রোগা কেন হয়েছিস্? চিঠিপত্রও ত অনেকদিন দিস্ নি?"

বিভা বলল, "বেঁচে যে আছি সেই ত ঢের।"

ধীরা বলল, "কি অসুখ হয়েছিল? আমাকে ত কতকাল কোন খবরই দাও নি।"

বিভা বলল, "মাকে বলেই দিলাম। খালি অন্য জায়গায় বিয়ের জন্যে ঝুলোঝুলি করছিল। এখন এই নিয়ে হল্লোড় চলছে। বাবা চান জয়ন্ত বাড়ী থেকে চলে যাক, মা তা চান না, জয়ন্তকে এখনও কিছু খোলাখুলি বলা হয় নি। তবে সকলের রকম-সকম দেখে ও বুঝতেই পেরেছে ব্যাপারটা। আরো গম্ভীর হয়ে গেছে।"

ধীরা বলল, "তুই তাকে কিছু বলেছিস না কি?"

বিভা বলল, "তুই যেন কি? আমি আবার কি বলব? এটা কি Leap year যে মেয়েরাই propose করবে?"

ধীরা বলল, "তা, সেও বলবেনা আর তুমিও

হবে না? চিরকাল কি এই রকম ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মাঝখানে ঝুলে থাকবে?"

বিভা বলল, "কি যে করব কিছু বুঝতে পারছি না। নিজে কি করে বলি? ওর ধরন-ধারণে কোনো উৎসাহ ত পাই না।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা, এটা হতে ত পারে যে তুই যেটাকে প্রেম মনে করেছিলি, সেটা নিতান্তই সাধারণ ভগিনী স্নেহ? তোকে নিশ্চয়ই সে কোনদিন প্রেম নিবেদন করতে আসে নি?"

বিভা একটুক্ষণ থেমে বলল, "মুখের কথায় কিছু বলে নি বটে, তবে কাজে দেখাত যে, অন্য যে-কোনো মানুষের সঙ্গের চেয়ে আমার সঙ্গটা সে পছন্দ করে বেশী। আমার জন্যে কাজ ক'রে দিতে পারলে কত খুসী হ'ত। এসব অবশ্য বেশ বছর দুই আগের কথা। তখনও তার গগনে সূর্য্য ওঠে নি।"

ধীরা বলল, "আবার সুরু করলে বাজে কথা। সূর্য্যই হই আর চাঁদই হই, কারও ভাগ্যাকাশে উদিত হবার সম্ভাবনা আমার কিছুই নেই। তোকে আমি তামা-তুলসী হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারি যে, পৃথিবীতে যদি জয়ন্ত ছাড়া আর কোন পুরুষ মানুষ না থাকে, তা হ'লেও আমি তাকে বিয়ে করব না। এখন হ'ল ত?"

বিভা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমার দিকটা পরিষ্কার হ'ল বটে, কিন্তু অন্য দিকের যা গোলমাল, তা ত থেকেই গেল।"

ধীরা বলল, "সে আর আমি কি করব? আচ্ছা, তোকেও বলি, একটা মানুষ যে তোকে স্ত্রীরূপে চাইছেই না হয়ত, তাকে বিয়ে ক'রেই বা তোর লাভ কি?"

বিভা বলল, "ও যদি রোজ আমাকে একটা করে লাথিও মারে তবু আমি ওকেই বিয়ে করতে চাই।"

ধীরা বলল, "বাবাঃ, ধন্য তোমাকে। ভারতের মেয়ে বটে তুমি। আমি হলে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না, মুখে আনা ত দূরের কথা।"

বিভা বলল, "সব মানুষের কপাল ত সমান নয়। তোমার কাছে লাথি খেয়েই হয়ত কেউ কৃতার্থ হয়ে যাবে।"

ধীরা বলল, "অত ছোট লোক আমি নয় বাপু। ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে লাথি-টাথি মারতে পারব না। আমি ত আর 'রাজসিংহের' চঞ্চলকুমারী নয়?"

ক্লাশের ঘণ্টা পড়াতে দু'জনকে আলোচনা রেখে অন্য কাজের সন্ধানে যেতে হ'ল। পরের রবিবারে ধীরা একবার ঘুরে এল বিভাদের বাড়ী। জয়ন্ত সকালেই বেরিয়ে গেছে, খেতেও আসবে না ব'লে গেছে, কাজেই দুপুর পর্য্যন্ত তার সঙ্গে দেখাই হ'ল না ধীরার। বিভার মা খুব সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন, এবং চেষ্টা ক'রে নিজের উত্তেজনা চাপবার চেষ্টা করছেন। মায়ে-মেয়েতে প্রায়ই ঠোকাঠুকি লাগছে। বিভার বাবার ব্যবহারে ধীরা কোন তফাৎ দেখতে পেল না।

জয়ন্ত ফিরল সন্ধ্যার সময়। ধীরারা তখন চা খেতে বসেছে। টেবিলে এসে বস্‌ল বটে, তবে খেল না বিশেষ কিছু। ধীরাকে সাধারণ কুশল-প্রশ্ন করল। আর কারও সঙ্গে কোন কথা না ব'লে ব'সে ব'সে একটা মাসিক পত্রের পাতা উল্টোতে লাগল। বিভার মা খানিক পরে কাজে উঠে গেলেন। বিভা ব'সেই রইল, একে একে তিন পেয়ালা চা ঢালল এবং ফেলে দিল।

ধীরা বলল, "আচ্ছা, টি-পটটা ত খালি ক'রে ফেললি। চাকর-বাকররা ত খেতে পারত?"

জয়ন্ত মাসিক পত্র থেকে মুখ তুলে বলল, "চোরের উপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাওয়ার একটা কথা আছে?"

বিভা বলল, "সে ত তুমি, আমি নয়। তাও ভুঁয়েও যদি ভাতটা খেতে, খাওয়াটাই ত ছেড়ে দিয়েছ।"

জয়ন্ত বলল, "ভাত মাঝে মাঝে গলায় আটকে যায়, এমন অবস্থাও ত মানুষের হয়?"

হঠাৎ বাড়ীর ঝি এসে খবর দিল যে বিভার এক বন্ধু এসে ড্রয়িং রুমে ব'সে আছে এবং তাকে ডাকছে। নিতান্ত অনিচ্ছায় এবং জয়ন্তের দিকে একটা কুটিল দৃষ্টি হেনে বিভা উঠে চলে গেল।

ধীরাও উঠে যাবে ভাবছে এমন সময় জয়ন্ত বলল, "দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলছি কিছু মনে করবেন না।"

ধীরা একটু বিচলিত ভাবে বলল, "কি কথা বলুন। মনে করবার মত কোন কথা নিশ্চয়ই আপনি কিছু বলবেন না?"

"কি জানি, তা বলতে ত পারি না। আপনি কথাটাকে আস্পর্দ্ধা ভাবতেও পারেন। আর কিছু নয়, বিভাকে একবার যদি ব'লে দেন যে, সে আমাকে ভুল বুঝেছিল।"

ধীরার মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। তাকে আবার কেন? বিভার সঙ্গে ভাব করার বেলা ত কেউ তার পরামর্শ নিতে আসে নি? একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলল,

"দেখুন, আমাকে আবার এর ভিতর জড়াবেন [illegible] আমি কিছু বলতে গেলে বিভা সেটা কখনই ভাল ভাবে নেবে না। নিজেদের ব্যাপারে নিজেরা বোঝাপড়া করাই ভাল।"

জয়ন্ত একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনি মাপ করবেন আমাকে। অনুরোধটা করা আমার অন্যায়ই হয়েছে।" ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিভা এসে ঘরে ঢুকল। ধীরাকে জিজ্ঞাসা করল, "ও কি বলছিল তোকে রে? মুখ লাল ক'রে বেরিয়ে গেল।"

ধীরা বলল, "বলছি বাপু। সেই সঙ্গে এটাও বলছি যে ফের যদি এই সব কথা আমাকে শুনতে হয় তা হ'লে আমি আর কোনদিন এ বাড়ী আসব না, তা তুমি রাগই কর আর কান্নাকাটিই কর। আমাকে ও অনুরোধ করছিল তোমাকে বলতে যে তাকে যেন তুমি ভুল না বোঝ।"

বিভা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ধীরা উঠে গিয়ে পড়তে বসল। মনটা তার বেজায় খিচড়ে গেল। কি উৎপাতেই সে পড়েছে। বিভাকে সে বোনের মত ভালই বাসত। তার কষ্ট দেখে তার কষ্টও হচ্ছিল খুব। কিন্তু কি করতে পারে সে? জয়ন্তের মত তার ধারণা নেই যে কাউকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে ভালবাসার থেকে নিরস্ত করা যায়। তা হ'লে ত অনুরোধে পড়ে মানুষ ভালবাসতেও পারে? এটা যে অনুরোধ-উপরোধের জিনিষ নয়ই মোটে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সে বিভাকে বলল, "দেখ ভাই, আমি ঠিক করলাম, এখন কিছুদিন আমি তোদের বাড়ী আসবই না। অবশ্য অবস্থার উন্নতি হলেও আসব না এমন কথা বলছি না। তবে সম্প্রতি না আসাই ভাল। তোমার উত্তেজনার কারণ যত কম ঘটে ততই ভাল। আর তোমার জয়ন্তদাকেও আমি বুঝি না বাপু। তাঁর থেকেও দূরে থাকাই আমার ভাল। কলেজে ত দেখা হবেই তোর সঙ্গে।"

বিভা বলল, "যা ভাল বোঝ কর। আমার এখন কিছু ভাবতেও ইচ্ছা করছে না, কিছু বলতেও ইচ্ছা করছে না।"

পরদিন সকালেই ধীরা যাবার ব্যবস্থা করতে লাগল। জিনিষপত্র কিছু সঙ্গে নেই, সহজেই যাওয়া যাবে। তবু ভবতোষবাবু জয়ন্তকে বলে দিলেন [illegible] ভাইও সঙ্গে [illegible]।

ট্যাক্সিতে উঠেই ধীরা [illegible] ব্যাপারটার জন্যে আমি দুঃখিত। [illegible] না বললেই পারতেন, তবে বলেছেন যখন তখন কি করা যাবে? অনুরোধটা আপনার আমি রেখেছি অর্থাৎ বিভাকে বলেছি। লাভ কিছু হবে বলে আমি আশা করি না। আপনাকেও একটা আমি অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি, আপনি ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবেন। ও বড় বেশী কষ্ট পাচ্ছে। কথাবার্ত্তা সব বন্ধ ক'রে বসে থাকবেন না, সাধারণ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা সহজেই রাখা যায়। আমি উপদেশ দিচ্ছি ভাববেন না, উপদেশ দেবার মত বয়স আমার নয় এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আমার নেই কিছু। যা বললাম তা বিভার ভালোর জন্যেই বললাম।"

জয়ন্ত খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনি খুসী হবেন এতে?"

"আমি খুসী হবার জন্যে বলছি না। বিভার হয়ত এতে ভাল হ'ত।"

"তাই করব, অন্ততঃ করতে চেষ্টা করব," ব'লে জয়ন্ত চুপ ক'রে গেল। গন্তব্যস্থান এসে পড়ায় ধীরা তাড়াতাড়ি নমস্কার ক'রে নেমে গেল।

দিন এর পর একটা একটা ক'রে কাটতে লাগল। বিভা অতঃপর প্রায়ই কলেজ কামাই করতে আরম্ভ করল। চেহারাটা তার ক্রমেই খারাপ হতে লাগল এবং পড়াশুনো সব ছেড়ে দিল। ধীরা একদিন জিজ্ঞাসা করল, "তুই পরীক্ষা দিবি না?"

বিভা বলল, "আমার কোন কিছুতে মন বসে না। না পড়লে ত আর পরীক্ষা দেওয়া যায় না?"

"তা হ'লে কি করবি তুই? একটা কোন কাজ না থাকলে মানুষ চব্বিশটা ঘণ্টা কাটায় কি ক'রে?"

"আমি এখন বুঝতেই পারছি না কি করব। মা বলছেন বিয়ে করতে, বাবা বলছেন দেশে গিয়ে জ্যাঠাইমাদের কাছে কিছুদিন থেকে আসতে। কি যে করলে ভাল থাকব তা ত ভেবেই পাচ্ছি না।"

ধীরা বলল, "জয়ন্ত কিছু বলে না?"

বিভা বলল, "কথাবার্ত্তা বলে নিতান্ত ভাসা ভাসা ভাবে। বাবা তাকে চ'লে যেতেই বলেছেন শুনলাম। তবে রাগারাগি কিছু হয় নি। মীরাটে না কোথায় একটা চাকরির সন্ধান পেয়েছে বলছিল। হয়ত সেখানে যেতে পারে।"

উপরি উপরি কিছুদিন সে ক্লাশে এল না। ধীরা খবর নিয়ে জানল সে একেবারে বিছানা নিয়েছে। জয়ন্ত সত্যিই চ'লে গেছে মীরাট। বিভাকে দেখতে গেল। এখন ত আর তার যাওয়ায় কোন অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই?

বিভা তাকে দেখে খুসীই হ'ল। বলল, "একেবারে একলা পড়ে থাকি সারাদিন। কি যে এক জ্বরে ধরেছে। বেশী ওঠেও না, অথচ সারেও না। ওষুধ গিলে গিলে ত পেটে সমুদ্র হয়ে গেল। কোন কিছুতেই একটুও উপকার হয় না।"

ধীরা বলল, "একবার ঘুরেই আয় না দেশ থেকে? এসব জ্বর অনেক সময় হাওয়া বদলালেই সেরে যায়।"

বিভা বলল, "উঠতেই পারি না তার দেশে যাব কি? ঘর ছেড়ে বেরোতেই পারি না।"

ধীরা বলল, "মনে জোর করলে নিশ্চয় পারিস্ তুই। আসলে সারতে তোর মনটা চাইছে না।"

বিভা বলল, "মনই নেই, তার জোর। ভাবতে সুদ্ধ আজকাল ক্লান্ত লাগে। দেখি মা যদি যেতে রাজি হন, তা হ'লে হয়ত দেশেই যাই। একটু নূতন জায়গায় যেতে ইচ্ছা করে, নূতন মানুষ দেখতে একটু ইচ্ছা করে।"

ধীরা সেদিন থাকবে বলে আসে নি, একটুক্ষণ ব'সে, কথাবার্তা বলে সে চলেই এল।

বিভা শেষ অবধি চলেই গেল দেশে। তার মা-ই তাকে নিয়ে গেলেন শেষ পর্য্যন্ত। বাড়ীর ভার নেবার কাউকে পেলেন না। নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া ভাবে সংসার চলতে লাগল।

বিভার চিঠি পেল ধীরা কিছুদিন পরে। তার শরীর সেরেছে কিছুটা। আর দীর্ঘদিন থাকতে পারলে তার উপকারই হ'ত হয়ত। কিন্তু মা সংসার ছেড়ে আর বেশীদিন থাকতে চাইছেন না। যদি বিভা একলা থেকে যেতে চায় ত তাকে রেখে দিয়ে যেতে পারেন। তবে বিভার এখন অবধি সে রকম ইচ্ছা হচ্ছে না।

এদিকে নীরার বিয়ের সময় এসে উপস্থিত হ'ল। নীরা ত ক্রমাগত লিখছে তাকে যেতে। মা সেরকম কিছু বলছেন না। ছেড়ে দিচ্ছেন সব ধীরার উপর। ধীরা বুঝল মায়ের মনের কথা। সে না গেলেই ভাল, কিন্তু সে কথা তিনি ধীরাকে বলেন কি ক'রে? ধীরা গেলেই নানা সমস্যার উদ্ভব হবে। সে বড় মেয়ে, তার বিয়ে হয় নি কেন? বাপের পয়সা-কড়ি আছে, আর অত সুন্দরী মেয়ে? হয়ত দু'চারজন উমেদারও জুটে যেতে পারে ধীরার জন্যে। এ সব উৎপাতের মধ্যে না যাওয়াই ভাল। নীরাকে অনেক বুঝিয়ে চিঠি লিখল। মাকে জানাল, পরীক্ষা আসছে একটা। এই সময় কামাই করলে ক্ষতি হবে।

(৭)

কয়েকটা বছর কেটে গেল ধীরার জীবনের উপর দিয়ে। ঘরে-বাইরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। নীরার বিয়ে হয়ে গেছে, সে এখন সন্তানের জননী। ধীরা বার-দুই গিয়েছে কলকাতায়। শেষ পরীক্ষার দিন যত এগোচ্ছে, তার কলকাতা যাওয়াও তত কমে আসছে। পড়াশুনোর চাপ বেশী।

নিজে প্রায় একরকমই আছে অন্তরের দিক্ দিয়ে। জয়ন্তের হঠাৎ আগমন আর প্রস্থানে নিজের নারীত্ব সম্বন্ধে খানিকটা সচেতন হয়ে উঠেছে। সহজে আলাপ-পরিচয় কোন যুবকের সঙ্গে করে না। তবে কার্য্যগতিকে আলাপ-পরিচয় কিছু কিছু লোকের সঙ্গে হয়ই। ধীরা সাবধান হয়ে থাকে, কারও সঙ্গে পরিচয়ের মাত্রাটা যেন কাজের জন্যে যেটুকু দরকার ততটুকুই থাকে। আর বিরক্ত হবার বা বিস্মিত হবার প্রয়োজন তার নেই। সে নারী বটে, যুবতী নারী, কিন্তু ভগবান ত অন্তরলোকে তাকে নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপ যা তা দিলেন না। তবে সে-পথে শুধু কাঁটা মাড়াবার জন্যে কেনই বা পদক্ষেপ করা?

বিভা দেশে অনেকদিনই ছিল। এখন সম্প্রতি দিল্লীতে ফিরেছে। পড়াশুনো আর করবে ব'লে মনে হয় না। এখন শোনা যাচ্ছে কোথায় যেন তার বিয়ে স্থির হয়েছে। ধীরার এখনও মুখোমুখি দেখা হয় নি বিভার সঙ্গে। শেষের দিকে যোগসূত্রটা তাদের ছিঁড়েই গিয়েছিল। চিঠিপত্র আর লিখত না। বিভা আর তার মা চলে যাওয়ায় ধীরা আর তাদের বাড়ী যেতও না। মাঝে মাঝে ভবতোষবাবু এবং তাঁর ছেলেরা এসে ধীরার খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। বিভার মা অবশ্য বছর-খানিকের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন, তবে ধীরা তাঁদের বাড়ী আর যায় নি। বিভা কিছুদিন চিঠিপত্র লিখত, পরে তাও ছেড়ে দিয়েছিল।

জয়ন্ত যে কোথায় বা কি করছে, সে খবর ধীরা বিশেষ রাখত না। ও নামের কেউ যে কোনদিন ছিল তার জগতে তা সে যেন ভুলেই গিয়েছিল। বাস্তবিক জয়ন্তকে মনে রাখবার মত কি-ই বা ঘটেছিল? বিভা তাকে নিয়ে ক্রমাগত ব'কে যেত, এবং ধীরার সঙ্গে ঝগড়া করত। এখন বিভাও সামনে নেই, সে ঝগড়া-

ধাটিও নেই। অথচ কতবারই বা সোজাসুজি তার সামনে এসেছে বা তার সঙ্গে কথা বলেছে? দেহে ও মনে সে এমনই সাধারণ ছিল যে, অন্যের মনে কোথাও কোন চিহ্ন রাখতে পারে নি।

ধীরা এবারও গরমের সময় কয়েকটা দিন কলকাতায় কাটিয়ে আসবে ভাবছে। এখানের নিদারুণ গ্রীষ্মের হাত এড়াবার জন্যেও বটে, আবার একেবারে শেষ পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটু মা বাবা ভাই বোনের সঙ্গে কিছুদিন থেকে আসার ইচ্ছায়ও বটে। হয়ত ভাল চাকরি পেলে সোজাসুজি সেখানে চ'লেও যেতে পারে। তা হ'লে কলকাতায় যাওয়ার সুবিধা হবে না। পরীক্ষার ফল বেরোতে যে ক'মাস দেরি হবে, সে সময়টা সে দেশ বেরিয়ে কাটাবে স্থির ক'রে রেখেছে। কয়েকটি সহপাঠিনী মিলে তারা এই ঠিক করেছে। ধীরা এখন এতটাই বড় হয়েছে, এবং একলা ঘোরাফেরা করতে এতটাই সক্ষম, যে মা-বাবা এখন আর চোখে চোখে রাখার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন না।

বাইরের রূপ এখন তার পরিপূর্ণ, যেন কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে। বিভার মত বন্ধু আর তার কেউ হয় নি বটে, তবে সাধারণ বন্ধু-বান্ধব অনেক। সুন্দরী ব'লে আদর নানা রকম পায়, তবে তাতে মন ভরে না। একেবারে যে ভাল লাগে না তা নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে ইচ্ছা করে। সুসজ্জিতা হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। আবার নিজেকে তিরস্কারও করে। কি হবে এসব শুনে বা ভেবে? সে সুন্দরী আছে ত আছেই, কারও মুখে সেরূপের স্তব শুনে তারও কোন লাভ হবে না।

হঠাৎ সেদিন দুপুর বেলা বিভা কলেজে এসে হাজির হ'ল। পিছন থেকে ধীরার চুলের গোছা ধ'রে টান দিয়ে বলল, "কি গো সুন্দরী, চিনতে পার?"

ধীরা চুল ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "না চেনাই উচিত, এত রোগা হয়ে গেলি কি ক'রে?"

বিভা বলল, "তপস্যা ক'রে বোধ হয়। তবে বর কিছু পাই নি।"

ধীরা বলল, "এবার যেন শুনলাম যে বর লাভ করতে চলেছ?"

বিভা বলল, "তোমরা ত রসিকতা করেই খালাস। আমি একটা ভূতের বোঝা ঘাড়ে ক'রে চিরকাল মরি আর কি?"

"তবে কথাটা সত্যি নয়?"

বিভা বলল, "সত্যি বটেও, সত্যি নয়ও।"

ধীরা বলল, "সেটা আবার কি রকম হ'ল?"

বিভা বলল, "মা-বাবা বর একটা জোগাড় করেছেন। তারা কোথায় যেন আমায় দেখে পছন্দও করেছে। এখন তাঁরা যা দেবেন-থোবেন তা যদি ওদের পছন্দ হয় তা হ'লে বিয়ে হয়ে যেতে পারে।"

"তবে সত্যি নয় আবার বলছিস্ কেন?"

"আমি বিয়ে করব কি না, তা কিছুই ঠিক করতে পারছি না। পড়াশুনো করবার মত স্বাস্থ্য আর নেই, মনটাও কেমন যেন ওসব দিক্ থেকে ঘুরে গেছে। খালি বিশ্রাম চায়, খাটতে চায় না। কিন্তু শুধু হাঁ ক'রে ব'সে থেকে কি করব? মা-বাবাও কিছু অমর হয়ে চিরদিন আমার জন্যে ঘর-সংসার সাজিয়ে বসে থাকবেন না। তা হ'লে জীবনটাকে নিয়ে আমি করব কি? বিয়ে ক'রে একটা ঘর-সংসার হ'লে হয়ত মনটা বসে যাবে তার মধ্যে। Occupation ত একটা জুটবে। কিন্তু একটা অচেনা মানুষ, হঠাৎ আমার স্বামী হয়ে বসবে এ ভাবতে ভাল লাগে না। যারা কোনদিন কাউকে ভালবাসে নি তাদের পক্ষে এটা অত শক্ত নয়, কিন্তু আমি একজনের ছবি মন থেকে ঘষে মুছে দিয়ে, আর একজনকে সে জায়গায় বসাতে পারব কি? আর না পারলেও ত যাকে বিয়ে করব তার প্রতি একটা অন্যায় করা হয়। তাই মত এখনও দিই নি।"

ধীরা বলল, "এত বৎসর ধ'রে মন তোমার সেই খানেই প'ড়ে আছে?"

বিভা বলল, "তুই নামেই আমার বয়সী, কাজে এখনও বার বছরের খুকীর মত আছিস্। মন অত সহজেই কি আর সরিয়ে নেওয়া যায়? তবে সম্পর্ক সব চুকেই গেছে। সে বেঁচে আছে এইটুকু জানি, মাঝে মাঝে এর-ওর মুখে খবর পাই এই পর্য্যন্ত।"

ধীরা জবাব দিল না। সত্যিই ত মন নেওয়া-দেওয়ার কিই বা সে জানে?

বিভা সেদিন বেশীক্ষণ রইল না। বলল, "মাঝে মাঝে ত যেতে পারিস্ এখন? ঝগড়াঝাঁটি হবার ভয় ত আর এখন নেই?"

ধীরা বলল, "মাস-খানিকের জন্যে একবার কলকাতা যাচ্ছি। তারপর ত পরীক্ষা অবধি এখানেই চেপে ব'সে থাকতে হবে। তখন মাঝে মাঝে যেতে পারব, তোদের ওখানে।"

"তাই যাস্, কলকাতার থেকে চিঠি লিখিস্," ব'লে বিভা চ'লে গেল।

কলকাতা যাত্রা করল ধীরা আরও তিন-চার দিন পরে। সঙ্গী এবারেও চেনা-শোনা ছিল, কাজেই পথে কোন অসুবিধা হ'ল না। ষ্টেশনেও বাবা নিতে এসেছিলেন, তাঁর মুখে শুনল যে নীরা দু'চারদিনের মধ্যেই আসছে। তার খুকীটার শরীর ভাল থাকছে না, কলকাতায় থেকে কিছুদিন তার চিকিৎসা করাতে চায় ভাল ক'রে। ধীরা জিজ্ঞাসা করল, "প্রিয়নাথ আসবে না? আমি ত তাকে এ পর্য্যন্ত দেখলামই না, এতদিন হ'ল নীরার বিয়ে হয়েছে?"

ধীরার বাবা বললেন, "আসবে, তবে কয়েকদিন পরে। এখন ছুটী নেই না কি যেন শুনছিলাম।"

ধীরা জিজ্ঞাসা করল, "কে তবে নিয়ে আসবে ওদের?"

"বাড়ীরই কেউ দিয়ে যাবে, আমাদের কাউকে যেতে ত লেখে নি।"

বাড়ী পৌঁছে মায়ের সঙ্গে গল্প করতে ধীরার অনেক সময় কেটে গেল। মামার বাড়ী, পিসীর বাড়ী প্রভৃতির কত খবর ছিল যা ধীরা আজ পর্য্যন্ত শোনে নি। কত ভাই-বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, কত নূতন কাচ্চা-বাচ্চা হয়েছে। ধীরা মনে মনে ভাবল, "আমি শুধু এক রকমই আছি। বদলাই নি কোন জায়গায়ই।"

নীরা এসে উপস্থিত হ'ল তার পরের দিনই। তার শ্বশুরবাড়ীর এক আত্মীয় তাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সঙ্গে এক বৎসরের শিশুকন্যা ঝুনু। মেয়ে দেখতে মন্দ নয়, তবে শ্যামবর্ণ রং, মোটাসোটাও খুব একটা নয়। প্রায়ই না কি জ্বরে পড়ে। নীরা বেশ মোটা-সোটা হয়েছে, বেশ ভারিক্কি একটা ভাব এসে গিয়েছে চেহারার মধ্যে। ধীরাকে দেখে বলল, "বাবাঃ, রূপ যে একেবারে ফেটে পড়ছে। কি খাস্ রে দিল্লীতে?"

ক্রমশঃ

আমাদের দেশের বিস্তর সম্পন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোক আলস্যে কাল কাটান। মধ্যবিত্ত পরিবারেও ইহা দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই, যে, গরীবেরাও অলস জীবন যাপন করেন। সময় ও কার্য্যশক্তি ভগবানের অমূল্য দান, উহা আমাদের নিজের নহে। উহার সদ্ব্যবহার করা ধনী নির্ধন সকলেরই উচিত।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৮

ভারতীয় অর্থনীতির উপর মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে অথবা অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হইবে এরূপ মতবাদের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কারণ রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি নির্ভর করে দ্রব্য বিশেষের গুণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মূল্যমানের উপর। ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য অধিকতর দ্রব্য রপ্তানীর প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যে সব দ্রব্য রপ্তানী দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি তাহার অধিকাংশই কৃষিজাত দ্রব্য বা তদুৎপন্ন দ্রব্য যাহার উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা উৎপাদন ব্যয় কমান আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে আমাদের দেশে উৎপন্ন চা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পক্ষে একটা প্রধান সহায়ক। কিন্তু তাহার ক্রমবর্দ্ধমান স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশে রপ্তানীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের পক্ষে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভব হইতেছে না। অধিকন্তু উৎপাদন খরচ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ মজুরি বৃদ্ধি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি। স্থানীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন অপ্রচুর বিধায় আমদানীর উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে আমদানী খাদ্য শস্যের মূল্য অন্ততঃ শতকরা ৫৭½ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে, অতএব বণ্টন মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ফলে চায়ের উৎপাদন খরচ আরও বৃদ্ধি পাইলে বিশ্বের বাজার দরে অধিকতর চা রপ্তানী সম্ভব হইবে না। এমন কি বর্তমান রপ্তানীর পরিমাণ রক্ষা করাও দুঃসাধ্য। কারণ সেখানে চায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দেশও আছে। ১৯৫৯-৬০ সালে আমরা চা বিক্রয় করিয়া ১৩০৲ কোটি টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছিলাম। রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রয়াস সত্ত্বেও অদ্যাবধি তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৩২ কোটি টাকার বেশী অর্জন করিতে পারি নাই, এই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন জন্য স্থানীয় গ্রাহকদের উপর আবগারী শুল্ক বসাইয়া অনেক বেশী মূল্যে চা খরিদ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে যাহাতে তাঁহারা প্রয়োজন কমান। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল দেশে (Rupee countries) আমাদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যবসা চলিতেছে তাহারাও মুদ্রামূল্য হ্রাস হেতু চায়ের মূল্য সেই পরিমাণ না কমাইলে লইতে চাহিতেছে না, অতএব রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা কিছু বেশী টাকা পাইলেও তাহার দেড় গুণের বেশী টাকা না দিলে আমরা বিদেশ হইতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করিতে পারিব না। কারণ প্রথমোক্ত দেশগুলি আমাদের সে সব জিনিস দিতে পারে না। আমরা পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিদেশ হইতে ১৯৬৪-৬৫ সালে প্রায় ১৭২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছি। যদিও ইহা গত ১৯৬২-৬৩ সাল হইতে প্রায় ২০ কোটি টাকা বেশী, তথাপি এই উপার্জন বৃদ্ধি, পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু নহে মূল্য বৃদ্ধি হেতু। যে মূল্যে বর্তমানে বিক্রয় হইতেছে তাহা জুটমিলের পক্ষে লাভজনক নহে। সে কারণ বর্তমান বৎসর উৎপাদন অনেক কমাইতে বাধ্য হইয়াছে এবং পর্যাপ্ত পাট সংগ্রহ করিতে না পারায় বিদেশ হইতে ১৫ লক্ষ গাঁইট পাট আমদানী করিতে হইয়াছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে অনুমান করা যাইতেছে ২০ লক্ষ গাঁইট পাট আমদানী করিবার প্রয়োজন হইবে অতএব মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে সমপরিমাণ পাট আমদানীর জন্যই প্রায় ৩০ কোটি টাকা বেশী লাগিবে। পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে আরও অধিক টাকা লাগিবে ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইবে এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে। তাহার উপর রপ্তানী শুল্ক রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। তাহা তুলিয়া লইলেও অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সুদূরপরাহত। কারণ পাটজাত দ্রব্যের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বী আছে যাহাদের উৎপাদন খরচ কম। অধিকতর পাট উৎপাদন করিতে গেলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে, কারণ আমরা পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে পারি নাই, পাটের জমি বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছি।

১৯৬৫-৬৬ সালে তুলাজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আমরা ৬০ কোটি টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছিলাম, কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে তাহার পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি টাকা। প্রথমক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য আমরা ৬৪ কোটি টাকার তুলা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে বাধ্য হইয়াছি। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে সমপরিমাণ আমদানীর জন্য আমাদের ১২৫ কোটি টাকা লাগিবে

এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ আনিতেও কয়েক কোটি টাকা লাগিবে। ফলে উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যাইবে। বর্তমান বৎসরে উক্ত পরিমাণ মুদ্রা অর্জনের জন্য লোককে আবগারী শুল্ক বাবদ দ্রব্যমূল্যের প্রায় ১৫ ভাগ বেশী দিতে হইয়াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আরও পাইবে, অতএব উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পাইবে। চিনি বেচিয়া আমরা ১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছি সত্য কিন্তু যে চিনির উৎপাদন খরচ মণ-প্রতি ২৬৲ টাকা তাহা আমরা ১২৲ টাকায় বেচিতে বাধ্য হইয়াছি, ফলে দেশের লোককে নিত্য প্রয়োজনীয় চিনির জন্য মণপ্রতি ৪৭ টাকা দাম দিতে হইতেছে। এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। অতএব রপ্তানী বৃদ্ধি অথবা অধিকতর আবগারী শুল্ক বসাইয়া স্থানীয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা খর্ব করিয়া অধিকতর পরিমাণ রপ্তানী দ্বারা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা এক প্রকার অসম্ভব অথবা দেশের স্বার্থবিরোধী। অধিকতর ঋণ গ্রহণের দ্বারা লগ্নী করিলেই উৎপাদন বৃদ্ধি বা তদ্ সাহায্যে রপ্তানী বৃদ্ধি সম্ভব নহে। যেমন আমরা ঋণ শোধ করা দূরে থাক সুদের টাকা দিতেও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। অতএব একমাত্র উপায় আমদানী বন্ধ করা বা কমান কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া আমরা আমদানী করি নাই। খাদ্যশস্য আমরা ১৯৬৪-৬৫ সালে ৬ কোটি টন আমদানী করিয়াছিলাম যাহার জন্য আমাদের ৩০৭ কোটি টাকা লাগিয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ১২ কোটি টন আমদানী করার প্রয়োজন হইয়াছে আমাদের সরকারের অপরিণত বুদ্ধিপ্রসূত কনট্রোল বসাইবার ফলে, অতএব একই মূল্য থাকিলেও আমাদের ৩১৪ কোটি টাকা লাগিবে। এবং ৬৬-৬৭ সালের জন্য আমাদের বরাদ্দ ১০ কোটি টন। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে তাহার মূল্য ১০০০৲ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। ইহার উপর প্রায় ১০০০৲ কোটি টাকা ব্যয় প্রতি বৎসর দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজন। যে দেশের সর্বপ্রকারে রাজস্ব আদায় প্রায় ৩০০০৲ কোটি টাকা এবং আয় বৃদ্ধির প্রায় সর্ব পথ বন্ধ, সেই দেশের পক্ষে উক্ত রূপ ব্যয় করা অধিকন্তু চতুর্থ প্ল্যান বাবদ প্রতি বৎসর আরও ৪০০০৲ কোটি টাকা ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা বাতুলতা অথবা মরণের পথ প্রশস্ত করা ছাড়া কিছুই নহে।

আমরা গত তিনটি প্ল্যানে ১১,০০০ কোটি টাকা খরচ করিয়া ও রপ্তানী দ্বারা ৮০০ কোটি টাকার বেশী প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে আনিতে পারি নাই অথচ আমদানী খরচ ১৪০০ কোটি টাকা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র পথ প্ল্যানের নূতন খরচ বন্ধ করিয়া দেওয়া আমরা গত তিনটি প্ল্যান করিয়া কেবল মাত্র আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়াছি এমন নহে, আমাদের জাতীয় আয় এবং ব্যক্তিগত আয়ও বৃদ্ধি করিতে বা আশানুরূপ বৃদ্ধি করিতে পারি নাই, অধিকন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু ব্যক্তিগত খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অধিকতর ব্যয় করিয়া এইরূপ আত্মঘাতী প্ল্যানের কোন সার্থকতা নাই। অতএব চতুর্থ যোজনার জন্য ব্যয় এবং ঋণ গ্রহণ সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে। কেবলমাত্র সর্বাঙ্গীণ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইলেও তাহার দ্বারা সুফল লাভ হইবে না। কৃষি-ক্ষেত্রে একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং শিল্পক্ষেত্রে ইউনিট (Unit) প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে উৎপাদন খরচ কমিবে। তাহার সঙ্গে দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি করিতে পারিলে সেই সকল দ্রব্য রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া ঋণ যাহার পরিমাণ মুদ্রামূল্য হ্রাসজনিত এক কথায় শতকরা ৬০ ভাগ বাড়িয়াছে তাহা শোধ করিতে পারিব। ন্যায্য মত দ্রব্যমূল্য হইলে দেশের অধিবাসীরাও সুখে কাটাইবে। এই ব্যবস্থার জন্য প্রথম এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন সময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ—যেহেতু বৃষ্টির জল অপর্যাপ্ত এবং সময় মত হয় না, অতএব দেশের নদী, নালা, খাল, পুকুর ও কূপ-গুলি পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। এই কার্যে বিদেশী অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না এবং দেশের লোক স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিবে। সরকারকে স্বল্প-পরিসর রেলের পুলগুলি পাল্টাইয়া বৃহৎ পরিসর অথবা খুলা পুল তৈয়ারী করিতে হইবে। ফলে দেশ কেবলমাত্র খাদ্যশস্যে নহে, সকল প্রকার কৃষিপণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। বৃহৎ যন্ত্রপাতি বা ষ্টীল কারখানা অথবা রাসায়নিক সার যাহা জমির উৎপাদিকা বৃদ্ধি করিতে অক্ষম তাহার কারখানা প্রস্তুত অগ্রাধিকার পাইতে পারে না। ১০০০৲ কোটি টাকার ষ্টীল কারখানা কেবল লক্ষ্য মত উৎপাদন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এমন নহে। ঋণ শোধ করা দূরে থাকুক সুদ দিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই। উৎপাদন খরচ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ৫০ ভাগ বেশী হওয়ায় রপ্তানী দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন দূরে থাকুক আমদানী বন্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। অতএব তাহার বৃহদাকার অথবা সংখ্যা বৃদ্ধি বর্জনীয়।

অলকার মন

শিবপ্রসাদ দেবরায়

এক পা রথে, এক পা পথে। ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে যাবে অলকা, হঠাৎ চোখ পড়ে গেল ওদিকের ফুটপাথে। গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সুমিতা।

গাড়িতে আর ওঠা হ'ল না। হাতের ইশারায় ড্রাইভারকে চলে যেতে বলে পায় পায় এগিয়ে গেল অলকা।

পিছন থেকে পিঠে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিতেই চমকে ফিরে তাকাল সুমিতা। সামনে দাঁড়িয়ে অলকা। চোখেমুখে একটা অবিশ্বাসের ঢেউ খেলে গেল সুমিতার। আবেগে অলকার হাত দু'টো ধরে কলকণ্ঠে বলে উঠল, "অলকা! তুই? কতদিন পরে দেখা হ'ল বল ত?"

অলকা নিজেও কি ভাবতে পেরেছিল, এমনিভাবে দেখা হয়ে যাবে সুমিতার সঙ্গে। বলল, "ছ-সাত বছর ত হবেই। স্কুল ছাড়ার সময় সেই যে শেষ দেখা হয়েছিল জলপাইগুড়িতে—তারপর আজ এই।" একটু থেমে আবার বলল, "কেমন আছিস?"

"আছি কোনরকম। তুই কেমন?" বলল সুমিতা।

নির্জন রাস্তাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল অলকা। তাপদগ্ধ গ্রীষ্মের দুপুর। রাস্তায় লোক চলাচল তেমন নেই। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ির ত্বরিত আনাগোনা। রাস্তার দু'ধারে ফুটপাথের ঘেরা-টোপে গাছের ডালে হঠাৎ-উড়ে-আসা পাখীর কিচির-মিচির; কিংবা কোন অট্টালিকার দ্বিতল কি ত্রিতল কক্ষ হতে ভেসে-আসা দ্বিপ্রাহরিক রেডিও অনুষ্ঠানের আধুনিক গানের সুরেলা দু'একটা কলি।

রাস্তার দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে সুমিতার দিকে তাকিয়ে বলল অলকা, "আমার কথা পরে হবে। তোর কথা শুনি আগে।"

সুমিতাও ছাড়বার পাত্রী নয়, বলল, "ছেলেমেয়ে কটি তোর। স্বাস্থ্যটি কিন্তু তোর আগের মতই আছে। কি করে রাখিস্ বলত।" শেষের দিকে মুচকি হাসল সুমিতা, "দেখলে আমারই লোভ হয়।"

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল অলকা। নির্জ্জন এই রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়ে থাকতেও কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল। উপরন্তু, রাস্তা দিয়ে যখনই কেউ যাচ্ছিল, প্রত্যেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছিল। অলকা বলল, "এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। চল, ঐ রেস্তরাঁয় গিয়ে বসি একটু।"

সায় দিয়ে সুমিতা বলল, "তাই চল। একটু চা খাওয়াও যাবে আর সেই সঙ্গে অনেকদিনের জমানো কথাগুলোও শোনা যাবে।"

চলতে চলতে অলকা বলল, "শুধু শুনবি। শোনাবি না কিছু।"

রেস্তরাঁটা খুব আভিজাত্যপূর্ণ না হলেও, মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকাতে ওরা খুব খুশী হ'ল। সুইংডোর ঠেলে ভিতরে এসে বসল দু'জনে। অপেক্ষমান বয়কে চা আর টোস্টের অর্ডার দিয়ে অলকা বলল, "একটিও না। মা আমি আজো হতে পারি নি।"

হঠাৎ কথাগুলো বলে কেমন যেন লজ্জা পেল অলকা। হোক না, বহু পুরাতন বন্ধু। তবু মেয়েদের মুখে এই ধরনের কথা—কি এক ব্যথাভরা দৃষ্টি নিয়ে অলকা তাকিয়ে রইল সুমিতার মুখের দিকে।

যদিও প্রথমে সুমিতার একটু অবাক লেগেছিল অলকার কথা শুনে, তথাপি অলকার বিষণ্ণ দৃষ্টিটাকে সুমিতা কোনমতে উপেক্ষা করতে পারল না। অলকার শূন্য সিঁথির দিকে তাকিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারল সুমিতা। তবু জিজ্ঞাসা করল, "তবে কি আমি ভুল শুনেছিলাম।"

"কি শুনেছিলি?" অলকার চোখে জিজ্ঞাসা।

"তোর বিয়ের খবর।"

"পরের খবরটা শুনিস নি বুঝি।" ঠোঁটের আগায় এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে দিল অলকা।

"পরের খবর!" বিস্ময় বাড়ে সুমিতার।

যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে বলল অলকা, "বিবাহ-বিচ্ছেদের।"

"বিবাহ-বিচ্ছেদ! বলিস কি!" চেয়ারটা আরো একটু এগিয়ে নিয়ে এল সুমিতা। সে কি। তোদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় না?" বড় বড় চোখ করে তাকাল সুমিতা।

একটু হাসল অলকা। এবারের হাসিটা ওর তত মিষ্টি নয়। যেন কিছুটা বিষণ্ণতায় ভরা। বয় জলের গ্লাস দিয়ে গিয়েছিল টেবিলে। এক ঢোক জল খেয়ে বলল, "দেখা! কি যে বলিস। পাঁচ বছর ত হয়ে গেল।"

কিছু বলতে যাচ্ছিল সুমিতা, চা আর টোষ্ট নিয়ে ঢুকল বয়। দু'জনের সামনে চা আর টোষ্টের ডিশ সাজিয়ে দিয়ে বয় বেরিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অলকা বলল, "আমার কথা ত শুনলি। এবার তোর কথা বল।"

সংশয় যেন মিটছিল না সুমিতার। বলল, "সিঁদুরটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলেছিস।"

আবার হাসল অলকা, "ভুলে যেতে যখন পেরেছি, কেন মিছে আর একজনের স্মৃতিটুকু মাথায় নিয়ে বেড়ানো।"

প্লেট থেকে একপিস টোষ্ট তুলে নিয়ে বলল সুমিতা, "আবার যদি কখনও দেখা হয়ে যায়।"

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল অলকা, "সে সম্ভাবনা নেই। আর যদি দেখা হয়েই যায়—" কাপটা নামিয়ে রাখল অলকা। রুমালে মুখ মুছে বলল, "সে ভাবনা তখন ভাবা যাবে।"

সুমিতারও চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছল। কিছু বলতে যাচ্ছিল সুমিতা, বয় এসে ঢুকল ঘরে। বিল দেখে দাম চুকিয়ে দিয়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।

বেলা পড়ে এসেছে। রাস্তায় ভিড় বেড়েছে; ট্রাম-বাসের চলাচলও। হাঁটতে হাঁটতে ওরা কার্জ্জন পার্কে একটা ঝোপঅলা গাছের তলায় এসে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অলকার সব কথা জেনে নিল সুমিতা: জলপাইগুড়িতে একই স্কুলে পড়ত অলকা আর সুমিতা। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ওরা যখন কলেজে ঢুকবে, তখন হঠাৎ সুমিতার বাবা বদলি হয়ে গেলেন পাটনায়। সেই যে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল দশ বৎসর আগে তারপরে দুই বন্ধুতে দেখা আজ। অলকা জলপাইগুড়ির মেয়ে। জলপাইগুড়ি কলেজেই আই-এ পড়বার জন্য ভর্ত্তি হ'ল। লেখাপড়ায় ভালই ছিল অলকা। তরতর করে কলেজের ধাপগুলো পার হয়ে গেল নির্ব্বিঘ্নে। বাংলায় অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করার পর অলকা যখন এম-এ পড়বার জন্য কোলকাতা যাবার মনস্থ করে ফেলেছে, তখনই ঘটল দুর্ঘটনাটা।

দুর্ঘটনা মানে বিয়ে। মাত্র পনের দিনের ব্যবধানে অলকার বিয়ে হয়ে গেল। কোথা দিয়ে কেমন করে যে স্বপ্নের মত ঘটনাটা ঘটে গেল ঠিকমত ঠাহর করতেই পারল না অলকা। যখন বুঝল, ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

বাবা সত্যপ্রসন্ন রায় জলপাইগুড়ি শহরের শুধু নামকরা নয়, ডাকসাইটে উকিল। দাপটে শহরের লোক কেন, কোর্টের ছোকরা হাকিমদেরও মাঝে মাঝে তটস্থ হতে দেখা যেত। যেমন বিশাল বপু, তেমনি গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ। বিয়ের বিরুদ্ধে যে কোন কথা বলবে অলকা সে সুযোগই দিলেন না প্রসন্ন উকিল। মা'র কাছে ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিল অলকা। সেখানেও তেমন সুবিধা করতে পারে নি। কারণ, স্বামীকে তিনি মেয়ের চেয়ে ভালভাবেই জানতেন।

শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করতে হ'ল অলকাকে শুভেন্দু নামে জীবন-বীমার অজ্ঞাত-পরিচয় এক ফিল্ড ইন্স-পেক্টরকে। ছেলে হিসেবে শুভেন্দু হীরের টুকরো না হলেও, জামাই হিসেবে একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। শুভেন্দু সম্বন্ধে সত্যপ্রসন্নবাবু যতখানি পেরেছিলেন খোঁজ করেছিলেন ওঁরই এক মক্কেলের মারফৎ। বর্দ্ধমানে শুভেন্দুর পৈতৃক বাড়ী। বিধবা মা ছাড়া ইহ-সংসারে আপনার বলতে আর কেউ নেই শুভেন্দুর। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু বি-কম নয় শুভেন্দু, ফার্ষ্ট ক্লাস

সেকেণ্ডও। ছেলে বাছতে ভুল করেন নি সত্যপ্রসন্নবাবু। উকিলী চোখ দিয়ে তিনি শুভেন্দুকে যাচাই করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু বিবাহিত জীবন অলকার মোটেই সুখের হয় নি। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি অলকার। শাশুড়ীকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে একান্ত আপনার করে নিল। বিয়েটাকে আর দুর্ঘটনা বলে মনে হ'ল না অলকার। বৌমা ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না শাশুড়ীর। অফিসের কাজে শুভেন্দুকে প্রতি মাসেই বাইরে যেতে হয়। শুধু সে সময়টা যা খারাপ লাগে অলকার। নতুবা বেশ অনাবিল গতিতে কেটে যাচ্ছিল অলকার দিনগুলি। এভাবে কেটে গেল আরও দুটো বছর।

সুখের দিন মানুষের সব সময় একভাবে যায় না। অলকারও গেল না। একদিন রাত্রে শুভেন্দুর কথায় অলকার চমক্ লাগল। অলকার চুলে বিলি কাটতে কাটতে শুভেন্দু বলল, "বল ত অলক, আমাদের সংসারে কি নেই?"

শুয়ে একটা বই পড়ছিল অলকা। শুভেন্দুর কথায় বইটা বন্ধ ক'রে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বলল, "কেন। সবই আছে আমাদের। কিসের আবার অভাব।" শুভেন্দুর হাতটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে বলল অলকা, "এই ত তুমি আছ, আমি আছি। আর কি চাই?"

অলকার কথা শুনে একটু ফিকে হাসল শুভেন্দু। বলল, "আর কিছু চাই না? ভেবে দেখ ত ঠিক করে।"

গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইল অলকা শুভেন্দুর ঈষৎ-হাসিতে-ভরা মুখের দিকে। পরে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না। তুমি বল।"

অলকার বুকের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে এনে টুক করে বেড্সুইচটা নিভিয়ে দিয়ে অলকার নরম গালে গাল লাগিয়ে বলল শুভেন্দু, "একটা ছেলের!"

অন্ধকারের মধ্যেও লজ্জায় রাঙিয়ে উঠল অলকা। শুভেন্দুকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে অসার হয়ে পড়ে রইল বিছানায়।

রাতের কথাগুলো দিনের বেলায় আরও প্রকট হয়ে ধরা দিল অলকার কাছে। ওদের বিয়ে হয়েছে আজ তিন বছর। মা হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না অলকার দিক থেকে। তবে কি অলকা কোনদিন মা হতে পারবে না। সে কথাটাই কি কাল রাতে অলকাকে স্মরণ করিয়ে দিল শুভেন্দু।

আরও কয়েকমাস অপেক্ষা করার পর সন্দেহটা যেন অলকার কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হ'ল। শুভেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নি অলকা। ওষুধ, বিলিতি এবং দেশী। গাছ-গাছড়া—ফকিরের এবং সাধুর মাদুলি, তাবিজ। এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্রত পুজো-আচ্চা। কিছুই বাকী রাখে নি অলকা। অলকাকে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তারেরা সবাই যখন একবাক্যে রায় দিলেন, অলকা বন্ধ্যা, শুনে অলকার মাথায় যেন বাজ পড়ল।

এরপর থেকে নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হ'তে লাগল অলকার। অলকা চেয়েছিল শুভেন্দুকে সুখী করতে। নিজের শিক্ষা রূপ ও যৌবন দিয়ে শুভেন্দুকে আচ্ছন্ন করে রাখতে চেয়েছিল অলকা। সেখানেই মস্ত ভুল হয়েছিল অলকার। বিবাহিত জীবনে রূপ-যৌবন ছাড়াও যে আরও একটা জীবন রয়েছে—আর সে জীবনটা যে আরও সুখের এবং অন্য আর এক অনুভূতির—তা যখন জানতে পারল অলকা, তখন নিজেকে সে শুধু অপরাধী মনে করল না, বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগল।

নিজের এই অসহায়ভাব আরও বেড়ে গেল যখন শাশুড়ীর নির্লিপ্ততা আর শুভেন্দুর অবহেলা এবং দীর্ঘ অনুপস্থিতি ধরা পড়ল অলকার কাছে। একই বাড়ীতে থেকে শাশুড়ী যেন কত দূরের মানুষ। আর শুভেন্দু! গৃহের আর কোন আকর্ষণই রইল না শুভেন্দুর কাছে। বাইরের কাজে সে নিজেকে আরও জড়িয়ে ফেলল। সাংসারিক কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না শুভেন্দু। অলকাকে একটা মাংসের তাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই যেন পারে না শুভেন্দু। এতদিন ধরে মনের কোণে যে ইচ্ছেটাকে অতি যত্নে লালন করে আসছিল, সেই ইচ্ছেটা যখন এমনিভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, তখন আর সে এতটুকু প্রয়োজন

বোধ করল না অলকার। যতটুকু সম্ভব অলকাকে এড়িয়ে চলতে লাগল শুভেন্দু।

নিজের সঙ্গেও অনেক যুদ্ধ করল অলকা। কি যে করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারল না। কিন্তু এ ভাবেও ত একলা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা যায় না। শাশুড়ীর স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা যদি না-ই থাকে নারীর জীবনে, তবে সে জীবনের আর কতটুকুই-বা রইল। আর কেনই বা সে এত অবহেলা সহ্য করে পড়ে থাকবে এখানে। কেনই বা সে শুভেন্দুর জীবনে এভাবে আটকে থাকবে। শুভেন্দু যদি চায় সে আবার বিয়ে করতে পারে। কখনই সে পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মাতৃত্ব সে পায় নি সত্য; শুভেন্দুকে কেন সে পিতৃত্বের অধিকার হতে বঞ্চিত করবে। ও সরে দাঁড়াবে শুভেন্দুর সংসার থেকে, জীবন থেকে।

সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা। শুভেন্দু নামে কোন পুরুষকে আজ আর অলকার মনে পড়ে না। এ নামের কোন পুরুষের ছবি ক্ষণিকের জন্যও মনের স্মৃতিপটে ভেসে উঠে না আর।

বেশ মনোযোগ দিয়ে অলকার কথাগুলো শুনল সুমিতা। অলকার এই দুঃখময় জীবনের কথা শুনে সুমিতা নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না সুমিতা। চুপ করে বসে রইল আরও কিছুক্ষণ। সূর্য্য ডুবছে গঙ্গার পরপারে। রাঙা হয়ে উঠেছে গঙ্গার পশ্চিমকূল। আকাশ-সাঁতার-ক্লান্ত একদল পাখী এসে জটলা সুরু করে দিয়েছে পার্কের গাছে গাছে।

প্রথম নীরবতা ভাঙল অলকা, বলল, "কি ভাবছিস। তোর কথা কিন্তু কিছুই শোনা হ'ল না।"

এতক্ষণ একভাবে বসে থাকায় বেশ কষ্টবোধ হচ্ছিল সুমিতার। পা দু'টো নরম ঘাসের উপর বিছিয়ে দিয়ে একটু যুত হয়ে বসল সুমিতা। সুমিতার দিকে তাকিয়ে অলকা আবার বলল, "এই ভর দুপুরে কোথায় বেরিয়েছিলি একা।"

"হাসপাতালে। সেখান থেকে আমার এক দূর সম্পর্কের মাসীমার কাছে।" অলকার দিকে তাকিয়ে বলল সুমিতা।

গাছের ডাল থেকে একটা কচিপাতা ছিঁড়ে বলল অলকা, "হাসপাতালে! কেন? কার অসুখ!"

"অসুখ কারও নয়। গিয়েছিলাম আমার প্রয়োজনে।" বলল সুমিতা।

পরিপূর্ণ অথচ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে একবার সুমিতার সারা দেহটা জরিপ করে আনন্দে সুমিতাকে জড়িয়ে ধরে কলকণ্ঠে বলে উঠল অলকা, "তুই ত বেশ মেয়ে সুমি। এতক্ষণ আমায় বলিস নি কেন।" সুমিতাকে ছেড়ে দিয়ে আবার বলল, "আমার কিন্তু তোকে দেখে কেমন সন্দেহ হয়েছিল। ক' মাস?"

অপাংগে একবার অলকার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে সুমিতা বলল, "এ্যাডভান্স ষ্টেজ বলতে পারিস।"

"বলিস কি! এই অবস্থায় তুই বাড়ীর বের হয়েছিস। সাহস ত তোর কম নয়।" বড় বড় চোখ করে বলল অলকা।

চোখ তুলে অলকার দিকে তাকিয়ে বলল সুমিতা, "বাইরে না বেরিয়ে যে উপায় নেই, ভাই। কোলেরটার বয়েস মাত্র এই দুই। এর মধ্যে আবার একটা আসছে।" একটু থেমে আবার বলল, "কোলেরটার একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে, কি যে উপায় হবে, ভেবেই সারা হচ্ছি। তাই গিয়েছিলাম মাসীমার ওখানে। সেখানেও কিছু সুবিধে হ'ল না। মাসীমার ছোট মেয়ের খুব অসুখ। তিনি রাত্রের ট্রেনে ধানবাদ চলে যাচ্ছেন কবে যে ফিরবেন ঠিক নেই। আর এদিকে আমার এই অবস্থা। কূল-কিনারা কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।"

"কেন, তোর কর্ত্তামশায়।" অলকা বলল।

অপরূপ একটা মুখভঙ্গি করে সুমিতা বলল, "পোড়া কপাল! ওরা সুখের পায়রা। যতদিন তুমি সুস্থ আছ, ততদিন তোমাকে ঘিরে কত রকম্ রকম্ করবে। আর—"

বাধা দিয়ে অলকা বলল, "দূর! সবাই কি তাই।" কথাটা বলেই ধাক্কা খেল একটা অলকা। বহুদিন

পরে তত্তেন্দুকে মনে পড়ে গেল। আজ হতে দীর্ঘ সাত বছর আগেকার ছেঁড়া-ছেঁড়া কয়েকটি ছবি মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল।

অলকার এই ভাবান্তর কিন্তু সুমিতার চোখে পড়ল না। কতকটা আপনমনে বলে গেল, "ঠিকে ঝি অবশ্য একটা আছে। ওর ওপর ভরসা করে কি একটা দুধের ছেলেকে রেখে কোন মা হাসপাতালে যেতে পারে।"

অলকা যেন এই জগতে ছিল না। কি যেন ভাবছিল আনমনে। ইতিমধ্যে পার্কে ভিড় জমতে সুরু করেছে। অফিসের ছুটি হয়েছে অনেকক্ষণ। রাস্তায় রাস্তায় গৃহাভিমুখী জনতার ভিড়। হাওয়া-খাওয়া-বিলাসী মানুষের ভিড়ও পথে পথে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অলকা বলল, "যদি কিছু মনে না করিস, একটা কথা বলি তোকে।"

জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাল সুমিতা অলকার দিকে। অলকা আবার বলল, "যে ক'দিন তুই হাসপাতালে থাকবি, সে ক'দিন যদি তোর ছেলের দেখাশোনা করি, আপত্তি আছে তোর।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সুমিতা। অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল অলকার মুখের দিকে। পরে আবেগমিশ্রিতস্বরে বলল, "সত্যি বলছিস, অলক। বাঁচালি ভাই। কি যে বিপদে পড়েছিলাম। ঘরের মানুষের ত ঘরে ফিরতে আরও দেরি। ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে কি যে অবস্থা হ'ত আমার।" একটু থেমে কি ভেবে আবার বলল, "কিন্তু তোর যে খুব কষ্ট হবে। ছেলেটা ভারী দুষ্টু। বায়নাক্কা অনেক—সামলাতে পারবি ত?"

ফিকে একটু হাসল অলকা। হাসিটা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল না অলকার মুখ থেকে। বলল, "দিয়েই দেখ না, পারি কি না।"

অলকার কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে তাতে ঠিকানা লিখে দিয়ে সুমিতা বলল, "সামনের রবিবার বিকেলের দিকে যাস। আমি তোর অপেক্ষায় থাকব। তুই এলে তোকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব হাসপাতালে।"

ঠিকানা লেখা কাগজটা ব্যাগে রেখে দিয়ে অলকা বলল, "এবার ওঠা যাক সুমি। রাত হ'ল অনেক।"

নিজেকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুমিতা। পাশাপাশি চলতে চলতে একসময় অলকার হাত দুটো ধরে বলল, "অনেকদিন পরে দেখা তোর সঙ্গে। ছেড়ে দিতে ভারি কষ্ট হচ্ছে। কত কথা ছিল, কিছুই বলা হ'ল না। রবিবার দিন যাস কিন্তু। তখন বলব সব কথা।"

আস্তে একটু অলকার হাতে চাপ দিয়ে সুমিতা দক্ষিণ কলিকাতাগামী একটা ট্রামের দিকে এগিয়ে গেল আর নিষ্পলক অলকা কিছুক্ষণ সুমিতার অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

রবিবার যতই নিকটতর হতে লাগল ততই যেন কি এক অনাস্বাদিত আবেশে অলকার হৃদয় থেকে থেকে হিল্লোলিত হতে লাগল। হোক পরের ছেলে, তবু সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে সুমিতার ছেলেকে কোলে তুলে নেবে। ঢেলে দেবে ওর সমস্ত মাতৃত্ব! সুমিতা ওর বহু পুরাতন বন্ধু। এই দুঃসময়ে যদি সে তার বন্ধুর কোন উপকারে না আসে, তবে সে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রইল কোথায়।

সুমিতার স্বামীকে অলকা চেনে না, জানে না। সে লোকটি কি রকম স্বভাবের তাও জানে না। শুধু অনুমান করতে পারে, যে, সে বহির্মুখী। বিবাহের পর পুরুষের মন যতটুকু অন্তর্মুখী হওয়া উচিত সুমিতার স্বামী ততখানি নয়। নতুবা, সুমিতার এই বিপদের সময় স্বামী হয়ে এতদিন বাইরে থাকা মোটেই উচিত হয় নি। মনে মনে অলকা ঠিক করল, সুমিতার স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে এই কথাটাই ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে, বিবাহ করা আর বিবাহের পর স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব নেওয়া মোটেই এক জিনিষ নয়।

সুমিতার স্বামী অফিসের কাজে যেখানেই থাক, সুমিতা নিশ্চয় ওকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। জানিয়েছে ওর আসন্ন বিপদের কথা। অলকা নিজের চোখেই দেখেছে সুমিতাকে। বুঝেছে, যে অবস্থা চলছে সুমিতার,

তাতে যখন-তখন সুমিতাকে হাসপাতালে যেতে হতে পারে। এমন কি, রবিবার দিন গিয়ে ওকে বাসায় নাও পেতে পারে।

সামান্য একটা ঝিয়ের উপর ভরসা করে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব ফেলে কি করে যে সুমিতা চার-পাঁচদিন হাসপাতালে গিয়ে থাকবে, ভেবেই উঠতে পারছে না অলকা। ভীষণ রাগ হচ্ছে অলকার সুমিতার স্বামীর উপর।

গলির মুখে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ঠিকানা-লেখা কাগজটার সঙ্গে বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল অলকা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল অলকার। এত দিন ধরে নিজেকে যেভাবে তৈরী করে রেখেছিল অলকা, দোরগোড়ায় এসে যত রাজ্যের লজ্জা যেন ওকে পেয়ে বসল।

হাতে ঝোলানো একটা প্লাষ্টিকের ব্যাগে সুমিতার ছেলের জন্য আনা কিছু টুকিটাকি জিনিষ ছিল। ব্যাগটা দরজার কাছে নামিয়ে রেখে কড়া ধরে নাড়া দিল।

একটু পরে দরজা খুলে গেল। দরজা খুলতেই ছিটকে সরে দাঁড়াল অলকা। পায়ের ধাক্কায় প্লাষ্টিকের ব্যাগটা উল্টে গিয়ে জিনিষগুলো ছিটিয়ে গেল কিছু এদিক-ওদিক। দরজার কাছে দাঁড়ানো-লোকটাকে দেখে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না অলকা। দরজায় দাঁড়িয়ে সুমিতার ছেলেকে কোলে নিয়ে শুভেন্দু। শুভেন্দুও কম আশ্চর্য্য হয় নি। এতদিন পরে এরকম একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সামনে পড়ে যেতে হবে মোটেই ভাবতে পারে নি শুভেন্দু।

আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতেই শুভেন্দু দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। অলকার দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "তুমি! মানে—" শেষের দিকে আর ঠিক মত কথা গুছিয়ে বলতে পারল না শুভেন্দু।

এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে অলকার চোখে চোখ রেখে শুভেন্দু আবার বলল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন। ভেতরে চল। সুমিতা বলছিল বটে ওর কোন এক বন্ধু আসবে খোকার দেখাশোনা করবার জন্যে। এবং সে যে তুমি, মোটেই ভাবতে পারি নি। সুমিতা বাড়ী নেই। ঘণ্টাখানেক আগে এ্যাম্বুলেন্স এসে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।"

ছিটিয়ে-যাওয়া জিনিসগুলো এক এক করে ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে অলকা উঠে দাঁড়াল। শুভেন্দুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আড়চোখে একবার শুভেন্দু আর সুমিতার ছেলেকে দেখে নিয়ে অলকা ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। নিচে গিয়ে ফিরেও তাকাল না একবার। ভাবল, সুমিতার কাছে অলকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওর ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে এসেছে। ওর আর কোন্ ভয় নেই। যে মানুষটাকে সে আজ প্রায় পাঁচ বছর আগে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে এবং নিজের চোখে আজ শুভেন্দু-সুমিতার সুখী সংসারের ছবি দেখে গেল, কোন্ মুখে আজ আবার সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। অলকা আজ সুখী; অন্ততঃ সে আজ দেখে যেতে পারল, শুভেন্দু পিতৃত্বের অধিকার হতে বঞ্চিত হয় নি। অলকা নিজে যা দিতে পারে নি, সুমিতা তা দিয়েছে শুভেন্দুকে। একটা পরিতৃপ্ত ও সুখীমন নিয়ে অলকা ফিরে চলল।

— — — —

আমাদের পূর্বপুরুষগণের আহার্য

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম : ঘুরে বেড়াচ্ছি এক বিরাট প্রাসাদে। অভিনব তার গঠন-প্রণালী। এখানকার কোন প্রাসাদের সঙ্গেই তার মিল নাই। প্রাসাদের আসবাবপত্র যেমন অপূর্ব, প্রাসাদবাসীর বেশভূষাও তেমনি বিচিত্র।

প্রাসাদে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে। এক সহস্র ব্যক্তি সেই ভোজে যোগদান করেছেন। রাজকীয় ভোজ—দেখে-শুনে তাই মনে হ'ল।

ভোজে বসেছেন যাঁরা, তাঁরা উচ্চনাসা, আয়তনেত্র, দীর্ঘাকৃতি। অতি সুন্দর তাঁদের শুভ্রবর্ণ দেহাবয়ব। শুভ্রগাত্রে শুভ্র উপবীত। বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। সহস্র ইউরোপীয়কে কি সম্প্রতি "শুদ্ধি" করা হয়েছে? আর্য-সমাজের এ যে অপূর্ব কীর্তি!

নানাকৃতির স্বর্ণপাত্রে তাঁদের আহারের ব্যবস্থা। প্রথমে তুষারশুভ্র আতপান্ন। তারপর কৃষ্ণবর্ণ একপ্রকার শাক-এবং ঘৃত ও মধু পরিবেশন করা হ'ল। পরিবেশকদের গাত্রবর্ণ ওই কৃষ্ণবর্ণ শাকেরই মত। শ্বেতবর্ণ ভোজনকারীদের মধ্যে ঐ পরিবেশকদের বড়ই বিচিত্র লাগছিল।

শাকের পর এলো নানাজাতীয় মৎস্যের ব্যঞ্জন। তারপর আসতে লাগল মাংস। কত প্রকারেরই না মাংস। শশ মাংস, পক্ষী মাংস, শূকর মাংস, ছাগ মাংস, মৃগ মাংস। মৃগ মাংসও নানাজাতীয়-এণ মৃগ মাংস, রুরু মৃগ মাংস, চিত্র মৃগ মাংস, পরিবেশকগণই তা ঘোষণা করছিল। অতঃপর এলো গবয়মাংস। এই মাংস পরিবেশনের সময় সকলকেই বেশ উৎসুক দেখলাম। গবয়মাংসের পর এলো মেষ ও মহিষ মাংস।

তারপর যে-মাংস এলো—তার ঘোষণা শুনে আমার বমনোদ্রেক হ'ল। সে-মাংস হিন্দুমাত্রেরই অখাদ্য। অথচ ঐ উপবীতধারীগণ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তা আহার করলেন। অনেকেই তা পুনরায় চেয়ে নিলেন।

তারপর এলো পায়স ও নানাজাতীয় পিষ্টক। কি আশ্চর্য! কোনো আহার্যই কারো পাতে পড়ে থাকছে না।

কিন্তু তারপর যে আরও আশ্চর্য ব্যাপার আছে—তা কি তখন জানতাম! যখন ভাবছি ভোজ এবার শেষ হ'ল—তখন পুনরায় এক ভোজ্যবস্তু বিরাট গামলাজাতীয় সুবর্ণপাত্রে আসতে দেখা গেল। সেই খাদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভোজনকারীদের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। দেখে মনে হ'ল সেটি একটি পরম উপাদেয় সর্বজনপ্রিয় ভোজ্যবস্তু। কোনো বিশেষ প্রকারের মিষ্টান্ন হবে।

কিন্তু ঘোষণা শুনে চমকে উঠলাম। মিষ্টান্ন নয়, মাংস। এবং গণ্ডারের মাংস। গণ্ডারের মাংসও না কি মানুষে খায়? গামলার পর গামলা সাবাড় হয়ে গেল। এখনো এঁদের উদরে এত খাদ্যের স্থান হ'ল!—দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অতঃপর সেই ভোজনস্থলে এক দীর্ঘাকৃতি রাজবেশ-ধারী পুরুষকে দর্শন করলাম। ঘোষণা শুনে বুঝলাম—তিনি সম্রাট পুষ্যমিত্র।[1] তাঁরই পিতৃশ্রাদ্ধে এই রাজকীয় ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা!

সম্রাট এবার ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেবেন। ভারে ভারে ক্ষৌমবস্ত্র এবং অন্য নানাবিধ দান-সামগ্রী সেই ভোজন-স্থলে আসতে লাগল। তার সঙ্গে এলো "দীনার"[2] নামক স্বর্ণমুদ্রা। ব্রাহ্মণগণ পরম পরিতৃপ্ত এবং প্রফুল্লচিত্তে স্বগৃহে গমন করলেন।

---

1. circa, 137-151 B.C.

2. denarius (gold denarius) Roman coin.

এটি স্বপ্ন—কিন্তু অলীক স্বপ্ন নয়। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ-সমাজের এক যথার্থ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে।

সে যুগের ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে এ যুগের ব্রাহ্মণগণের মিল মাত্র ঐ উপবীতধারণে। আর কোনো মিল ত দেখতে পাই না! বর্ণে, আকারে, আচারে, আহারে-বিহারে, আর কোনোরূপ সাদৃশ্য গভীর গবেষণার বিষয়!

এ যুগের ব্রাহ্মণগণ স্বজাতি ভিন্ন অন্য জাতির পক্ব অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করেন না। সে-যুগের ব্রাহ্মণগণের অন্নব্যঞ্জন পাক করত শূদ্র৩। ব্যঞ্জন ছিল নানা-জাতীয় অধুনা নিষিদ্ধ মাংস। তার কতকগুলির উল্লেখ স্বপ্নে পাওয়া গেছে।

এই বিচিত্র স্বপ্নের উৎপত্তির কারণও এখানে উল্লেখ করি। সেদিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত স্মৃতিপুরাণাদির শ্রাদ্ধাধ্যায় অধ্যয়ন করছিলাম। বিষ্ণুপুরাণের শ্রাদ্ধাধ্যায়ে আছে :

"শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য করাইলে, পিতৃগণ এক মাস পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। মৎস্য প্রদানে দুই মাস, শশক মাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষীমাংস প্রদানে চারি মাস, শূকরমাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগমাংস প্রদানে ছয় মাস, এণমাংস দিলে সাত মাস, রুরুমৃগমাংস প্রদান করিলে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয় মাস, মেষমাংস প্রদানে দশ মাস, গোমাংস প্রদান করিলে এগার মাস পর্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন—পরন্তু যদি বাধ্রীনসের মাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন। হে রাজন, গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু এই সমুদয় দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ) বিষ্ণুপুরাণ, ৩-১৬ অধ্যায়।

মনু বলছেন :

> দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন্ মাসান হরিণেন তু।
> ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ ॥
> ষণ্মাসান্ মৃগমাংসেন পার্ষতেন সপ্ত বৈ।
> অষ্টাবেণস্য মাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু ॥
> দশমাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
> শশকূর্মেয়াস্তু মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু ॥
> সংবৎসরং তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
> বাধ্রীনসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশ বার্ষিকী ॥
> কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়্গলোহামিষং মধু।
> আনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানি চ সর্বশঃ ॥

মনু, ৩।২৬৮-৭১।

"মৎস্যমাংসে (মাছে) দু' মাস, হরিণমাংসে তিন মাস, মেষমাংসে চার মাস, পক্ষিমাংসে পাঁচ মাস, ছাগ মাংসে ছ'মাস, চিত্রমৃগমাংসে সাত মাস, এণমাংসে আট মাস রুরুমাংসে ন' মাস, বরাহ ও মহিষমাংসে দশ মাস, শশ ও কূর্মমাংসে এগারো মাস, পায়স সহ গোমাংসে৪ এক বছর এবং বাধ্রীনসের (শ্বেতবর্ণ বৃদ্ধছাগের) মাংসে দ্বাদশ বৎসর পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন। কাল শাক, মহাশল্ক-

৩। আর্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্তারঃ স্যুঃ
অধিকমহরহঃ কেশশ্মশ্রুনখবাপনম্ উদকস্পর্শনং চ সহ বাসসা ॥ আপস্তম্বধর্মসূত্র—২।২।২—সূত্র ৪-৬।
আর্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গৃহে তাঁদের তত্ত্বাবধানে থেকে শূদ্র তাঁদের জন্য রন্ধনাদি কার্য করবে। ব্রাহ্মণাদি তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দিবেন। তাঁরা নিয়মিত তার নখ, কেশ, শ্মশ্রু আদি কর্তন বা মুণ্ডনের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রতিদিন যাতে সে বস্ত্রসমেত স্নান করে—সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।"

৪। টীকাকার কুল্লুকভট্ট গব্যের গোমাংস অর্থ না ক'রে গোদুগ্ধ অর্থ করেছেন। মেধাতিথি তাঁর টীকায়, স্বয়ং গোদুগ্ধ অর্থ করে থাকলেও, সেখানে উল্লেখ করেছেন যে—অন্যেরা গব্যের অর্থ "গোমাংস" করেছেন। যাঁরা (যে টীকাকারেরা) গোমাংস অর্থ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধ-বাদীদের উদ্দেশে মেধাতিথি মন্তব্য করেছেন—"স্মৃতিকার শংখ যে গোমাংসভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়েছেন—সেই প্রায়শ্চিত্ত, মধুপর্ক, অষ্টকাশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যত্র কর্তব্য।" অর্থাৎ মধুপর্কে এবং শ্রাদ্ধে গোমাংস ভোজন করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না।

অন্য টীকাকারদের মধ্যে রাঘবানন্দ বলেছেন—গব্য অর্থাৎ "গোমাংস।"

গব্য যে এই প্রসঙ্গে গোমাংস—বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোক হ'তে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চাননতর্করত্ন মহাশয় সেখানে ঐ গোমাংস অর্থই করেছেন।

মৎস্য, গণ্ডারমাংস, লোহিতবর্ণ ছাগমাংস, মধু এবং নীবারাদি মুণিগণ ব্যবহৃত অন্ন পিতৃগণকে অনন্তকাল তৃপ্তিদান করে।"

মহাভারতের মতে, "মৎস্যে দু'মাস, মেষমাংসে তিন মাস, শশমাংসে চার মাস, ছাগমাংসে পাঁচ মাস, বরাহে ছ'মাস, পক্ষীমাংসে সাত মাস, চিত্রমৃগমাংসে আট মাস, রুরুমাংসে ন'মাস, গবয়ে দশ মাস, মহিষমাংসে এগার মাস, এবং শ্রাদ্ধে গোমাংস দিলে এক বৎসর পিতৃগণ তৃপ্ত থাকেন। গোমাংসের সঙ্গে পায়স এবং ঘৃত ভোজন করাবে। বাধ্রীনসের মাংসে পিতৃগণের দ্বাদশ বর্ষ তৃপ্তি হয়। গণ্ডারমাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ অনন্তকাল পরিতৃপ্ত হন" ৫ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৮৮।৫-১০।

মহাভারত, মনু, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ (৩১।৯), যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা (১।২৬০-৬১), বিষ্ণুসংহিতা (৮০।১৪), উশনঃসংহিতা (৩।১৪১), গৌতমসংহিতা (১৫ অধ্যায়) শংখসংহিতা (১৩ অঃ) প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে গণ্ডার মাংসকে পিতৃগণের পরমতৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্য বলে স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে গণ্ডারমাংসই সর্বশ্রেষ্ঠ। গণ্ডারমাংসের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান গোমাংসের।

এরপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠাদি স্থান সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে মেষমাংস, মহাভারতের মতে মহিষমাংস, এবং মনুর মতে শশ এবং কূর্মমাংস তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান লাভ করছে।

দেশভেদে রুচি ভেদ। তবু তারই মধ্যে ২।৩টি মাংস সম্বন্ধে গ্রন্থগুলির ঐরূপ ঐক্যমত লক্ষ্যণীয়।

মহিষ ও গণ্ডার মাংস অধুনা সভ্যসমাজে অপ্রচলিত। অথচ দেখা যাচ্ছে হাজার দুই বছর পূর্বে ভারতীয় আর্য-সমাজে তার অত্যন্ত সমাদর ছিল। মহিষ ত এখনও সর্বত্র সুলভ। কিন্তু গণ্ডার আসাম (ও নেপালের তরাই অঞ্চল) ব্যতীত, ভারত ও পাকিস্তানে, বোধ হয় কোথাও পাওয়া যায় না। দু' হাজার বছর পূর্বে হয়ত ভারতে নানাস্থানে গণ্ডার পাওয়া যেত—অন্তত এখনকার মত গণ্ডার এত দুর্লভ ছিল না।৬

ছাগ, মেষ ও মৃগমাংস সম্বন্ধে গ্রন্থকারদের মধ্যে বেশ মতভেদ দেখছি। মনু ও মহাভারতের মতে ছাগমাংস মেষমাংসাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে মেষমাংস ছাগমাংসাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

উপরোক্ত তিন গ্রন্থের মতই রুরুমৃগের মাংস ছাগমাংসাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ গবয়মাংসকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

এমন যে ঘোরতর (সর্ব-) মাংসভোজী আর্যসমাজ, তাও ক্রমে ক্রমে নিরামিষাশী হয়ে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যাবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ একালে মাংসাহার বর্জন করে।

তখন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেও অহিংসার জয়গান আরম্ভ হয়। মাংসের ব্যুৎপত্তি করা হয়—

মাংসভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।। মনু, ৫।৫৫

৫। সুশ্রুতের মতে "গণ্ডার মাংস কফঘ্ন, কষায় ও বায়ুনাশক। ইহা পিতৃগণকে নিবেদন করা যায়। ইহা পবিত্র, আয়ুষ্য (আয়ুবর্ধক) মূত্রের অল্পতাকারক ও রুক্ষতাকারক।" সুশ্রুত, ১।৪৬।১০৪।

"গোমাংস শ্বাস, কাশ, প্রতিশ্যায় (সর্দি, কফ) ও বিষমজ্বর নাশ করে। ইহা শ্রমকারী ও তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিদিগের হিতকর, পবিত্র এবং বায়ুনাশক।" সুশ্রুত, ১।৪৬।৯০।

"গবয়মাংস স্নিগ্ধ রসে মধুর, কাশনাশক, বিপাকে মধুর ও বৃষ্য।" সুশ্রুত, ১।৪৬।৯৮।

"মহিষমাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য, তর্পণ ও গুরু; ইহা নিদ্রা, পুংস্ব, বল ও স্তন্য বর্ধন করে। এবং মাংসের দৃঢ়তা সম্পাদন করে।" সুশ্রুত, ১।৪৬।৯৯।

৬। গণ্ডার মাংস না কি অতি সুস্বাদু। সুস্বাদু এবং সুদুর্লভ বলেই কি গণ্ডার মাংসের এত সমাদর ছিল? অথবা মাংসের অতিরিক্ত চাহিদাই গণ্ডারকে দুর্লভ করে তুলল?

নেপালে আজও শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গণ্ডার মাংস উৎসর্গ করা হয়। তরাই অঞ্চলে এখনও ২।১টা গণ্ডার পাওয়া যায়। তারই মাংস শুকিয়ে রেখে, শ্রাদ্ধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কেবল শ্রাদ্ধেই নয়, বিবাহাদি শুভকার্যেও সুপারির কুচির মত শুকনো গণ্ডারের মাংস অভ্যাগতদের হাতে দেওয়া হয়। একে পরম পবিত্র বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

"ইহলোকে যার মাংস আমি খাচ্ছি, সে পরলোকে (আমার) মাংস খাবে; মনীষিগণ বলেন এই মাংসের মাংসত্ব।"

মহাভারতেও মাংস শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মাংস ভক্ষণের নিন্দায় এবং নিরামিষ আহারের প্রশংসায় অতঃপর গ্রন্থকারগণ মুখর হয়ে উঠলেন।

"যে অপরের মাংসের দ্বারা নিজমাংসের বৃদ্ধি করতে চায়, তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর আর কেউ নাই। সেই নরই নৃশংসতর।" মহা, অনু, ১১৬।১১।

"মাংসাশী মাংসাহার পরিত্যাগ করলে যে পুণ্যলাভ করে, তা সর্ববেদ পাঠে এবং সর্বপ্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানেও লাভ করা যায় না।" মহা, অনু, ১১৫।১৮।

"যূপকাষ্ঠ ছেদন করে, পশুহত্যা ও মাটি রক্তে কর্দমাক্ত করে, লোকে যদি স্বর্গে যায়—তা হ'লে নরকে যায় কিরূপে (সাংখ্যীয় মত)?"

"অহিংসাই পরম সত্য—যার থেকে ধর্ম প্রবর্তিত হয়। (জীবহত্যা ব্যতীত) তৃণ, কাষ্ঠ বা উপল হতে মাংস পাওয়া যায় না।" মহা, অনু, ১১৫।২৬।

"বৈদিক শ্রুতি এই যে—'অজের দ্বারা যজ্ঞ করবে।' অজ অর্থাৎ 'বীজ'। অর্থাৎ ছাগকে হত্যা করা ঠিক নয়।" মহা, শান্তি, ৩৩৭।৪।

"অঘ্ন্যা (অর্থাৎ হননের অযোগ্যা) হ'ল গোজাতির নাম। কে এদের হত্যা করতে পারে?" মহা, শান্তি, ২৬১।৪৮।

"সর্বকর্মে অহিংসার কথা মনু বলেছেন। নরগণ কামবশত বেদীতে পশু হত্যা করে।" মহা, শান্তি, ২৬৪।৫।

"সুরা, মৎস্য, পশুমাংস, মদ্য, কৃশরৌদন ইত্যাদি ধূর্তগণ প্রবর্তন করেছে। এসব বেদে নাই।" মহা, শান্তি, ২৬৪।৯।

বেদের পশু-যজ্ঞাদির ঐ ভাবে নতুন করে ভাষ্য তৈরি করা হতে লাগল। এত বড় মাংসাশী জাতকে নিরামিষাশী করতে হবে তার জন্য নানারূপ চেষ্টা চলল। পুরানো শাস্ত্রেও নতুন নতুন অংশ জোড়া হ'ল। সেই সব নবগ্রথিত অংশে অহিংসার প্রশংসার আর অন্ত নাই:—

"অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা পরম দম (সংযম), অহিংসা পরম দান। অহিংসা পরম তপ। অহিংসা পরম যজ্ঞ। অহিংসা পরম বল। অহিংসা পরম মিত্র, অহিংসা পরম সুখ। অহিংসা পরম সত্য। অহিংসা পরম শ্রুত।

সর্বযজ্ঞে দান, সর্বতীর্থে স্নান এবং সর্বদান ফলও অহিংসার তুল্য নয়। অহিংসের তপ অক্ষয়। অহিংস সর্বদাই যজ্ঞ করছেন। অহিংস সর্বজীবের মাতা ও পিতার ন্যায়।" মহা, অনু, ১১৬।৩৭-৪১।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে বৈদিক যুগ হতেই একদল সাধক পশুযাগের উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতি যখন পশুযাগের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা সেই সাধকগণের সমর্থন পেলেন। বুদ্ধ এবং মহাবীরের মত মহামানবগণের আচরণ ও বাণী সমস্ত ভারতীয় জনগণের চিত্তের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করল। ফলে যাঁরা পশুযাগের পক্ষে ছিলেন, তাঁরাও বলতে লাগলেন—"যাগাদি ভিন্ন অন্যত্র প্রাণীহত্যা পাপ":—

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্ মনুঃ॥

"মধুপর্কে (অতিথিসেবায়), যজ্ঞে, শ্রাদ্ধাদিতে পশুহিংসা করা যায়—অন্যত্র নয়—একথাই মনু বলেছেন।"

"যা বেদবিহিতা হিংসা অহিংসামেব তাং বিদ্যাৎ"—"বেদবিহিত হিংসাকে অহিংসাই মনে করবে।" এও মনুর মত।

এইভাবে হিংসা ও অহিংসার একটা রফা করা হ'ল।

ঐ মনুই অন্যত্র বলেছেন—"প্রাণীহিংসা ব্যতীত মাংস উৎপন্ন হয় না। প্রাণীবধ স্বর্গের কারণ নয়, অতএব মাংস বর্জন করবে।"

বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে মাংসাহারের এমনই প্রচলন ছিল যে বুদ্ধকে নিয়ম করতে হ'ল, "ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ মাংসাহারে দোষ নাই।" নিরামিষ অন্ন অত্যন্ত দুর্লভ ছিল বলেই অন্নার্থী ভিক্ষুর জন্য এমন নিয়ম করতে হয়েছিল।

"প্রাণীহত্যা (স্বয়ং) করবে না, প্রাণীহত্যার অনুমোদন করবে না এবং তোমার জন্য হত্যা করা হয়েছে জানলে তা (মাংস) গ্রহণ করবে না।"

যেখানে তুমি প্রাণীহত্যা, বা প্রাণীহত্যার অনুমোদন কর নাই এবং যেখানে তোমার উদ্দেশে প্রাণীহত্যা করা হয় নাই, সেখানে তুমি ভিক্ষালব্ধ মাংস ভক্ষণ করতে পার। এইরূপ মাংসই "ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ" মাংস।

জৈনগণ কিন্তু এরূপ কোন আপোষ রক্ষা করেন নাই। তার ফলে জৈনধর্ম ভারতের বাইরে যেতেই পারল না। ভারতেও মাত্র কয়েকটি প্রদেশে সীমাবদ্ধ রইল।

"ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ" নিয়মের কিন্তু অপব্যবহার হয়েছে। সিংহলে নিরামিষাশী বৌদ্ধ এমন কি বৌদ্ধ-ভিক্ষুও পাওয়া কঠিন। তিব্বতে ত পাওয়াই যায় না।

তিব্বতের সবচেয়ে বড় মঠ "ডেপুঙ"-এ (চীনা আক্রমণের পূর্বে) দশ হাজার ভিক্ষু থাকতেন। তাঁদের মাংস সরবরাহ করার জন্য কয়েক মাইল দূরে একটি কসাইখানা ছিল।

"আমরা হত্যা করি না, হত্যার অনুমোদন করি না, আমাদের জন্য হত্যা করা হয়েছে—একথা জানি—না" এই বিশ্বাসেই মঠস্থ ভিক্ষুগণ নিত্য ঐ মাংস আহার করতেন। তাঁরা ঐ মাংস না কিনলে—ঐ কসাইখানারই অস্তিত্ব লোপ পেত।

বুদ্ধের "ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ" এইভাবে আরও পরিশুদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু একথা অবশ্যই মানতে হবে জৈনদের মত অহিংসা (মাংসাহার) সম্বন্ধে অত্যধিক কড়া আইন করলে, তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হ'ত না।

যাই হোক ভারতীয় সাধকগণ অহিংসার সাধনায় যে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তা জৈন সাধ্বীদের দেখলে আজও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পাছে অতি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ প্রাণীরও প্রাণ নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় তাঁরা মুখে "মুখপত্তি" ব্যবহার করেন এবং "ওঘা" নামক সুকোমল সম্মার্জনীর দ্বারা পথ পরিষ্কার করে চলেন। সন্ধ্যার পর (ঐ জন্যই) জল পর্যন্ত পান করেন না। "দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং—(৬।৪৬)" মনুর এই বচন যেন জৈন সাধুদের দেখেই রচনা করা হয়েছিল।

উমার তপস্যার মধ্যে অহিংসার চরমোৎকর্ষ দর্শন করি। বিশ্বের সর্বত্র প্রাণের লীলা—এই জ্ঞান যখন তাঁর উপলব্ধি হ'ল তখন বৃক্ষের পর্ণ পর্যন্ত ছিন্ন করতে তিনি প্রাণে ব্যথা পেলেন—পর্ণাহারও পরিত্যাগ করে তিনি "অপর্ণা" হলেন।

এ আশ্চর্য আদর্শ এবং উচ্চতম আদর্শ। এই আদর্শ ভারতই প্রচার করেছে। এবং তা বহুল পরিমাণে জৈন সাধুসাধ্বিগণ রক্ষা করচেন। জৈন গৃহস্থগণ নয়। তাঁদের মধ্যে একশ্রেণী অবশ্য পিঁপড়ে ও ছারপোকাদেরও আহার যোগান কিন্তু মানুষের বেলায় তাঁদের ব্যবহার অন্যরূপ।

যাক, ভারতবর্ষে ধর্মের যে কতরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে তার আর অন্ত নাই।

আধুনিকযুগে আর্যসমাজ জৈনদের মত অহিংসা প্রচার করলেন এবং নিরামিষ আহারের প্রবর্তন করলেন। তাঁরা বেদের নতুন ব্যাখ্যা করে জানালেন বেদের মধ্যে কোথাও প্রাণীহত্যার ব্যবস্থা দেওয়া হয় নি।

কিন্তু তাঁদের মধ্যেও একদল নিরামিষ আহার বরদাস্ত করতে পারলেন না। পাঞ্জাবে যেখানে আর্য-সমাজের প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল, সেখানে মাংসাহার একেবারে বন্ধ করা অত্যন্ত কঠিন হয়েছিল। কাজেই সমস্ত আর্যসমাজ (ঐ অহিংসামূলক বেদব্যাখ্যা স্বীকার করলেও) দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তাঁদের একদল নিরামিষাশী এবং অন্যদল আমিষাশী হলেন। জনসাধারণ সেই দুই দলের নাম দিলেন "ঘাসপার্টি" ও "মাসপার্টি"।

ভারতবর্ষের মত এত বড় বিরাট দেশে মাংসাহার (আমিষাহার) একেবারে বন্ধ করা সেকালেও সম্ভব হয় নাই—একালেও সম্ভব হচ্ছে না। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা মাংসাশী বা আমিষাশী। পাঞ্জাব মাংসাশী, বিহারেও অর্ধেকের উপর আমিষাশী। উত্তর প্রদেশেও বহু ব্যক্তি নতুন করে মাংসাহার আরম্ভ করেছেন। গুজরাটীরা প্রায় নিরামিষাশী। রাজস্থানেও নিরামিষাশীর সংখ্যা যথেষ্ট। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ নিরামিষাশী। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জনগণ অনেকেই আমিষাহার করেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী কোন প্রদেশ নাই বললেও বোধ হয় মিথ্যা বলা হবে না।

কিন্তু বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ সালে আমরা বাঙালীরা পর্যন্ত নিরামিষাশী হয়ে পড়ছি। বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতি মহামানবগণ এবং স্বামী দয়ানন্দ, শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি সংস্কারকগণ যা পারেন নাই, বর্তমানযুগের কৃষ্ণপন্থী বণিকগণ এবং অহিংসাপন্থী সরকার তাই সম্ভব করেছেন।

বর্তমানের এই মহাজনগণ প্রাচীনকালের মহাজনগণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবেন।

প্রথম ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা-প্রাপ্ত দুইজন তিব্বতী যুবকের কথা

জুলফিকার

বাইরে থেকে কোন বিদেশীকে তিব্বতে ঢুকতে দেবার ব্যাপারে তিব্বতীদের ঘোরতর আপত্তি থাকলেও, স্বদেশ থেকে দেশান্তরে যাওয়াটা ওরা এমন কিছু গর্হিত বলে মনে করে না। তিব্বতের বহু লোক মঙ্গোলিয়া, চীন, তুর্কীস্থান, নেপাল ও ভারতে হামেশাই আসা-যাওয়া করে থাকে। কালিম্পং-এর বাজারে বছর দুয়েক আগেও অনেক তিব্বতীকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। ভোট বা তিব্বতী সওদাগরেরা খচ্চর বা ইয়াকের পিঠে বোঝাই করে পশম, সোরা, মাখন প্রভৃতি সওদা নিয়ে কালিম্পং বা গ্যাংটকের বাজারে আসত, আবার এদেশ থেকে কেরোসিন, চিনি, দেশলাই, সাবান, মশলা ও টুকিটাকি নানা প্রকার সৌখীন জিনিবপত্র নিয়ে ফিরে যেত শিগবৎসী বা লাসার বাজারে। ছুটকো ব্যবসাদারদের কেউ বা শিলাজতু, চামরীর পুচ্ছ, কস্তুরী ও হিমালয়-জাত দুষ্প্রাপ্য বিবিধ ঔষধির পসরা নিয়ে পথের ধারে দোকান সাজিয়ে বসত, দার্জ্জিলিং বা নিকটবর্ত্তী কোন পাহাড়ী সহরে। ওদের কাছে মোটা ভোট কম্বলও পাওয়া যেত।... চীন সীমান্তে সাম্প্রতিক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তিব্বতীদের আনাগোনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। দেশত্যাগী, চীনবিরোধী কিছু কিছু তিব্বতী দালাই লামার সঙ্গে, এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে, বছর কয়েক হ'ল।......

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিব্বত ছিল একটা রহস্যময় অজ্ঞাত দেশ। তিব্বত সম্বন্ধে ইউরোপ বা আমেরিকার অনেকেরই যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও, ওদেশের খবর বিশেষ কিছু জানবার সুযোগ কেউ তেমন পান নি। এর আগে ভারতীয় যাঁরা ওদেশে গিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই গিয়েছিলেন সাধু বা লামার বেশে। উনবিংশ শতাব্দীতে দু'চারজন দুঃসাহসী ইউরোপীয় পর্য্যটকও তিব্বতীর ছদ্মবেশে, অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে, প্রাণ হাতে করে ঐ নিষিদ্ধ দেশটি ঘুরে এসেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও কোন তিব্বতী ইউরোপ বা আমেরিকা পরিভ্রমণ করেছেন বলে শোনা যায় নি।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস জর্জ্জ বগল্‌সকে ইংরাজদের দূত হিসাবে তিব্বতের শিগাৎসীতে পাঠান, কিন্তু বগল্‌স সাহেবের দৌত্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তিব্বতীরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ (Diplomatic Relation) স্থাপন করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না। এরপর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ টার্ণার বলে এক ভদ্রলোককে তিব্বতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হ'ল, কিন্তু তিনিও ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এলেন।

কিছুদিন বাদে সিকিমকে নিয়ে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে মন কষাকষি সুরু হ'ল। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত যাতে জটিল হয়ে না ওঠে, সেজন্য ইংরাজেরা দালাই লামার কাছে শান্তি প্রস্তাব পাঠালেন, কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। ভারত সরকারের চিঠিগুলো যা লামায় পাঠানো হ'ত। বলা বাহুল্য এই চিঠিগুলো খুবই সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় লেখা হ'ত, সবই না খুলে দালাই লামার দপ্তর থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হত।

*　　*　　*

১৯০৩ সালে কর্ণেল (পরে স্যার) ইয়ং হাসব্যাণ্ডকে (হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে স্যর ফ্রান্সিস ইয়ং হাসব্যাণ্ড একটি অবিস্মরণীয় নাম) ইংরেজ সরকার তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে তিব্বত সীমান্তে, কাম্পাজং (তিব্বতী জং (Dzong) শব্দের অর্থ দুর্গ)। ঘাটিতে পাঠানো হ'ল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তিব্বত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানালেন—তাঁরা যেন তাঁদের এজেণ্টকে কাম্পাজং-এ পাঠিয়ে দেন, যাতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ আলোচনা হয়ে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়।

দালাই লামা ইংরেজদের প্রস্তাবকে আমলই দিলেন না। তিনি তখন রুশদের দিকে ঝুঁকেছেন। রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজদের তখন আদৌ সদ্ভাব ছিল না।

রুশ আফগানিস্থানকে হাত করে ভারত-অভিযানে

প্রস্তুত হচ্ছে—ইংরেজদের মনে এইরূপ একটা সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল।

কাজেই দালাই লামার আচরণ তাঁরা মোটেই ভাল চোখে দেখলেন না। ইয়ং হাসব্যাণ্ডের নিরাপত্তার কথা ভেবে, তাই তাঁরা তিব্বতে একদল ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরণ করলেন, যাতে তিব্বতীরা তাঁর মিশনের লোকদের ওপর কোন হামলা না করতে পারে। তিব্বতীরা কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সহজভাবে নিতে পারল না। তারা ইংরেজ-সৈন্যদের আসার পথে বাধা দিতে সুরু করল। প্রথমে গুরু এবং তারপর পারি ও গ্যাংসীর মাঝে আরো দুটো জায়গায়, ইংরেজ ও ভোট সেনাদলের ছোটখাটো কয়েকটা সংঘর্ষ হ'ল। শেষটায় গ্যাংসীর কাছে দুই দলের মধ্যে বেশ বড় রকমের একটা যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে যদিও তিব্বতীদের বেশ কিছু ক্ষতি হ'ল, তবুও দালাই লামার তরফ থেকে কোন সন্ধির প্রস্তাব এল না।...কর্ণেল ইয়ং হাসব্যাণ্ড তাঁর দলবল নিয়ে এগিয়ে চললেন লাসার দিকে। শেষটায় দালাই লামা ভয় পেয়ে লাসা ছেড়ে চীনে পালিয়ে গেলেন।

এরপর নামল শীত,—তিব্বতের দুর্জ্জয় হিম-শীতলতা। ব্রিটিশ সৈন্যেরা শীতের ভয়ে তাড়াতাড়ি ভারতের সমভূমিতে ফিরে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ইয়ং হাসব্যাণ্ড দালাই লামার অনুপস্থিতিতে, তাঁর হোমরা-চোমরা অমাত্য শ্রেণীর লোকদের একত্র করে, তাঁদের সঙ্গেই একটা সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করলেন।

স্থির হ'ল—ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য ইয়াংটু ও গ্যাংসী পর্য্যন্ত অবাধে চলতে পারবে। ভারতের বণিকেরা এ পর্যন্ত তাদের মালপত্র নিয়ে ইচ্ছেমত আসা যাওয়া করতে পারবেন। গ্যাংটক, ইয়াংটু ও গ্যাংসী—এই তিন জায়গায় ইংরেজদের ঘাটি থাকবে। প্রত্যেক ঘাঁটিতে একজন ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারী থাকবেন এবং তাঁরই অধীনে থাকবে ছোট একদল সৈন্য। এও সিদ্ধান্ত হ'ল যে, অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে তিব্বত সরকার তাদের কোন এলাকা বিক্রী করতে বা ইজারা দিতে পারবেন না। লাসায় ইংরেজ দূতাবাস খোলা সম্বন্ধে তিব্বতের তরফ থেকে প্রবল আপত্তি ওঠায়, প্রস্তাবটি শেষ পর্য্যন্ত বাতিল করতে হ'ল। তবে স্থির হ'ল ব্রিটেনের মত অন্য কোন রাষ্ট্রকেও লাসায় তাদের বৈদেশিক দপ্তর খুলতে দেওয়া হবে না।

* * *

১৯০৪ সালে ইয়ং হাসব্যাণ্ডের দৌত্যকালীন ইংরেজ সরকার স্থির করলেন - তিব্বতীদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা যাতে সহজসাধ্য হয়, সেজন্য তিনজন মেধাবী তিব্বতী ছেলেকে বছর কয়েক ইংল্যাণ্ডে রেখে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। এর জন্য যাবতীয় ব্যয় ভারত-সরকারই বহন করবেন।

যে তিনজন ছেলেকে বেছে নেওয়া হ'ল, তাঁরা সবাই অভিজাত বংশের সন্তান। এঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাতে কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, ভারত গভর্ণমেণ্টের সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। এই ত্রয়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ছেলেটি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছানোর অল্প দিনের মধ্যেই মারা যান। অন্য দু'জন যাঁরা রইলেন, তাঁদের একজনের নাম ক্যাঁপাপ (KYIPUP), অপর জনের নাম মনদ্রন (MONDRON)। ক্যাঁপাপ রাগবী স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। মনদ্রন গেলেন মাইনিং ও প্রস্পেক্টিং-এর কাজ শিখতে কর্ণওয়ালের মাইনিং এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। খুব অল্পদিনের মধ্যেই ওঁরা দিব্যি ইংরেজী শিখে ফেললেন। পাঁচ বছর ওঁরা ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। এর মধ্যে দিশি তিব্বতী ভাষা প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন। বাড়ীতে চিঠিপত্র যা লিখতেন, সবই ইংরেজীতে। বলা বাহুল্য এসব চিঠি পেয়ে ওদের বাড়ীর রক্ষণশীল লোকেরা আদৌ খুসী হতে পারেন নি। তখনকার দিনে লাসায় ইংরেজী-জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কাজেই চিঠির পাঠ উদ্ধারের জন্য বেশ কিছু বেগ পেতে হ'ত।

স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওঁদের দু'জনার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল, তাতে দেখা যায়—

KYIPUP—Good natured, honest but not very promising.

MONDRON—Made excellent progress in studies but has picked up a reputation for oriental wiliness.

কিন্তু এই 'oriental wiliness' যে কি তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি।

ইংল্যাণ্ডে ইংরেজ ছেলেদের পাশাপাশি একটানা পাঁচ বছর কাটিয়ে, দু'জনেই খানিকটা বিলেতী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ ক্যাপাপ।

* * *

বিলাতে শিক্ষা সমাপ্তির পর এই দুইজন তিব্বতী যুবক দেশে ফিরে, কি ভাবে জীবন যাপন করেন এবং কাজকর্মে কিরূপ তৎপরতা দেখান,—তা জানবার জন্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সবিশেষ কৌতূহলী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যাশানুযায়ী সাফল্য বা যশ এদের দু'জনের কারো ভাগ্যেই জুটলোনা শেষ পর্য্যন্ত। ধরতে গেলে ওদের বিলেতী শিক্ষাদীক্ষাই ওঁদের উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

তিব্বতে ফেরবার পর ওঁদের দু'জনেরই সরকারী চাকরি মিল্‌ল ঠিকই, কিন্তু ওঁদের বিজাতীয় ধরন-ধারণ লামা-শাসক কর্তৃপক্ষ আদৌ ভালো চোখে দেখলেন না। ওঁদের কোন পদোন্নতি হ'ল না, অধস্তন কর্ম্মচারী হিসাবেই দিন কাটতে লাগল।

লাসায় যে নতুন ডাকঘর খোলা হয়েছিল, ক্যাপাপের সেখানে চাকরি জুটল, কিন্তু বেতনের অঙ্ক প্রায় একই রয়ে গেল বছরের পর বছর।

মনত্রন খনির কাজ শিখে এসেছিলেন। তাঁকে ভার দেওয়া হ'ল সোনা খুঁজে বার করবার। কিন্তু তিনি কোথায় পাবেন আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম। যা হোক অতি কষ্টে কিছু স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করলেন মনত্রন। কিন্তু তাঁর কাজে তিব্বতী সরকার আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। শেষটায় বেচারীর বেতন কমিয়ে দেওয়া হ'ল।

ক্যাপাপ ছিলেন আরামপ্রিয়, কিছুটা বিলাসী এবং অলস প্রকৃতির। তিনি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজীতে যাকে বলে, 'হ্যাপি-গো-লাকী'—তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক।...তিনি পোষ্টাপিসের কাজেই রয়ে গেলেন। আপিসের কাজও কম, কার্য্যে সুখ্যাতিরও আশা নেই। কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করা আর কি!

ক্যাপাপ নিজের ঘরে বসে গোপনে চীনা সিগারেট ফুঁকতেন (বিলেতে থাকবার সময় ওঁর ধূমপানের অভ্যাস হয়েছিল কিন্তু এ কাজটা তাঁকে লুকিয়েই করতে হ'ত। ধূমপান জিনিষটা তিব্বতীর চোখে নেহাৎ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ), কখনও কখনও হাল্কা ধরনের ইংরেজী গল্পের বই বা খবরের কাগজ সংগ্রহ করে তাই পড়ে দিন কাটাতেন। চাকরকে তালিম দিয়ে বিলেতী খানা পাকিয়েও খেতেন মাঝে মাঝে। কাঁহাতক ছাতু নুন আর মাখন চায়ের সঙ্গে খুঁটে খাওয়া যায়, না হয় থুক্‌পা, কিংবা অর্দ্ধসিদ্ধ বা শুকনো মাংস! মন খারাপ লাগলে, বিলেতী নাচের বাজনার রেকর্ড গ্রামোফোনে চাপিয়ে শুনতেন। ক্যাপাপ ফিরবার সময় বিলেত থেকে একটা ফনোগ্রাম সঙ্গে এনেছিলেন।

মনত্রন ছিলেন বুদ্ধিমান, উচ্চাভিলাষী এবং অনেকটা প্র্যাকটিকাল ধাঁচের লোক। যখন তিনি বুঝতে পারলেন এই স্বর্ণ সন্ধানের কাজে উন্নতির কোনরূপ সম্ভাবনাই নেই, তখন তিনি প্রস্পেকটিং ছেড়ে লামা হয়ে বসলেন। হ্যাট-কোট ছেড়ে, হলদে রঙের আলখাল্লা চাপালেন গায়ে।

তিব্বতে সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে লামা হতে কোন বাধা নেই। তাই বিলেতী আদপ-কায়দা সব ছেড়ে-ছুড়ে মনত্রন সনাতন-পন্থী হয়ে উঠলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত চাকরিতে উন্নতিও করেছিলেন।

* * *

বিলেত থেকে ফেরবার সময় ওঁরা একখানা মোটর-বাইক সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। দালাই লামা ওদের মোটর-বাইকের খবর পেয়ে এই শয়তান যন্ত্রটির (Devil Machine) চালনা দেখতে চাইলেন।

পোতালা প্রাসাদের নীচে, লাসার বিখ্যাত মাঠে ডেমনেষ্ট্রেশানের ব্যবস্থা হ'ল। কৌতূহলী বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। মহামান্য দালাই লামা ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গেরা এলেন খচ্চরের পিঠে চেপে।

মোটর বাইকটা উৎকট ভট্‌ভট্‌ শব্দ করে ষ্টার্ট নিয়ে চলতে সুরু করতেই, ভয় পেয়ে খচ্চরগুলো এদিক-ওদিক দৌড় লাগাল।

সে এক মহা কেলেঙ্কারী ব্যাপার!

আর একটু হলেই প্রবল প্রতাপ লামাজী অশ্বেতর পৃষ্ঠ থেকে ধরণীতলে পপাত হতেন!...যাক্‌, মহামান্য দালাই লামার উদ্গাত ক্রোধ শান্তির জন্য ওঁরা অতিশয় বিনম্র ভাজতে সাইকেলখানা তাঁরই হাতে তুলে দিলেন, উপঢৌকন হিসাবে। সেই অবধি (বোধ হয় ১৯১০ সাল থেকে) পোতালা প্রাসাদের একটা ছোট্ট কুঠরীতে মোটর-বাইকখানা অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়ে ছিল। বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ ডাঃ ডব্লু, এম, ম্যাকগভর্ণ—যিনি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে চীনা ও জাপানী ভাষার অধ্যাপনা করতেন—যখন ১৯২৩ সালে লামার ছদ্মবেশে লাসা যান, তখন ক্যাপাপের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হয়েছিল। বাইকের গল্পটি তাঁরই মুখে শোনেন তিনি এবং দেখেও এসেছিলেন যন্ত্রটিকে।

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৫) প্রতিভার অপমৃত্যু

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন বসেছে। এলাহাবাদ। ১৯৩৪ সাল।

সে রাতের অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পরের দিনকার সূচী ঘোষণা করা হ'ল। সে অধিবেশন বসবে সকালবেলা। প্রথমে ধ্রুপদ গান হবে। গাইবেন মুরারিমোহন মিশ্র। রাগ দরবারী তোড়ী।

সেকালের সঙ্গীত-সম্মেলনে অনেক সময় শিল্পীদের নামের সঙ্গে রাগের নামও উদ্যোক্তারা আগাম জানিয়ে দিতেন। সে সব রাগের নির্বাচন করতেন তাঁরা, অর্থাৎ পরিচালকরাই। এবং শিল্পীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ও তাঁদের মতামত না নিয়ে শ্রোতব্য রাগের নাম তাঁরা ঘোষণা করতেন। বিভিন্ন শিল্পীদের মধ্যে যাতে রাগের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে কারণেই যে শুধু পূর্বাহ্ণে শিল্পীদের অনুষ্ঠিতব্য রাগের নাম সম্মেলনের পক্ষে ঘোষণা করা হ'ত, তা নয়। অনেক সময় উদ্যোক্তারা অধিবেশনের প্রতিটি বিষয় একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুসারে স্থির করতেন। সেই সঙ্গে এমন একটি মনোভাবও হয়ত তাঁদের মধ্যে ছিল যে, নিখিল ভারত সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের যাঁরা শিল্পী তাঁরা নিশ্চয় সক্ষম হবেন একদিন আগে ফরমায়েস করা রাগ গাইতে বা বাজাতে! অনুষ্ঠান-সূচীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে আগেকার আমলের সম্মেলন পরিচালকরা অনেক সময় শিল্পীদের জন্যে এমনিভাবে রাগ নির্দিষ্ট করে দিতেন।

সেদিনও এলাহাবাদ সম্মেলনে বসে অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে মুরারিমোহন ঘোষণা শুনলেন যে, পরের দিন সকালে তাঁকে গাইতে হবে দরবারী তোড়ীর ধ্রুপদ। পিতা-পুত্র দু'জনে সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিতে এলাহাবাদে এসেছিলেন।

সম্মেলনের মঞ্চে পিতা মোহিনীমোহন মিশ্রও ছিলেন। সে অধিবেশনে তাঁরও গানের অনুষ্ঠান ছিল সেই রাতে। তিনিও জানতে পারলেন, মুরারিকে দরবারী তোড়ী গাইবার জন্যে বলা হয়েছে।

মোহিনীমোহন চিন্তিত হলেন ঘোষণা শুনে। কারণ মুরারির দরবারী ত জানা নেই! কিন্তু একথা সম্মেলন-এর কর্তৃপক্ষকে কিছুতেই জানান চলে না। অতি লজ্জাকর ব্যাপার হবে তা হ'লে।

তোড়ীর ঘরে দরবারী এমন কিছু একটা নতুন বা বিশেষ কঠিন রূপ নয়। অনেকের মতে দরবারী তোড়ী বলে তোড়ীর আলাদা কোন প্রকার-ভেদ নেই। শুদ্ধ তোড়ীর সঙ্গে তার কি পার্থক্য? যে তোড়ী দরবারে গাওয়া হয়েছিল তারই নাম হয়ে যায় দরবারী তোড়ী। তাঁদের মতে শুদ্ধ তোড়ীর সঙ্গে তা অভিন্ন।

কিন্তু কেউ কেউ আবার দরবারী তোড়ীকে শুদ্ধ তোড়ী থেকে একটু পৃথক করবার পক্ষপাতী। এই মতের সঙ্গেও পরিচিত আছে মোহিনীমোহন। বহুদর্শী সঙ্গীতবিদ্ তিনি। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হ'ল না যে সম্মেলনে কর্তৃপক্ষ যখন দরবারী তোড়ী ফরমায়েস করেছেন তখন তাঁরা তোড়ীর কিছু প্রকারভেদ শুনতে ও শোনাতে চান। এবং তাঁরা শেষোক্ত মতের পোষক। দু'একদিন আগে একথা জানতে পারলে মুরারিকে অনায়াসেই দরবারী তোড়ী ভালভাবে শিখিয়ে তিনি এখানে গাওয়াতে পারতেন।

কিন্তু এখন ত অসম্ভব। সে রাতের অনুষ্ঠান শেষ হতে আড়াইটে বেজে গেল। সকাল সাড়ে সাতটায় গান হবার কথা। সুতরাং কোন রকমেই সম্ভব নয়। একটা যেমন-তেমন আসরে গান হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের এত বড় সম্মেলন, বাংলা দেশও নয়। তা ছাড়া ধ্রুপদ। শুধু গানখানি নয়, পদ্ধতিসম্মত আলাপ-চারি সম্পূর্ণ ক'রে তবে গান ধরতে হবে। সঙ্গত করবেন পশ্চিমাঞ্চলের কোন অভিজ্ঞ পাখোয়াজী। এখন গানই শিখবে কখন, আর কখনই বা তৈরি হবে! এই সব ভেবে মোহিনীমোহন স্থির করলেন সকালের অধিবেশনে পুত্রের না যাওয়াই ভাল। গেয়ে নাম খারাপ করার চেয়ে তা শ্রেয়।

সম্মেলন স্থান থেকে বাড়ী ফেরবার পথে মোহিনীমোহন মুরারিকে বললেন—দরবারী তোড়ী তোমার জানা নেই। কাল সকালে ওখানে ত তোমার গাওয়া হতে পারে না। তুমি বাড়ীতেই থেক। আমি ওখানে গিয়ে একটা কিছু বলে দেব।

মুরারি চুপ ক'রে চলতে লাগলেন। পথে আর কিছু

কথা হ'ল না। সম্মেলনে আগত শিল্পীদের জন্তে নির্দিষ্ট বাড়ীতে ফিরে এসে রাত্রের খাওয়া শেষ করলেন ছ'জনে। রাত তখন তিনটে বেজে গেছে।

মোহিনীমোহন শোবার উদ্‌যোগ করছেন, এমন সময় মুরারি জিজ্ঞেস করলেন—বাবা, দরবারী তোড়ী কি রকম? এর আলাপটা একটু দেখিয়ে দিন না।

মোহিনীমোহন তখন খুবই ক্লান্ত। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া তিনি নিজে গেয়েছেন সম্মেলনে। এখন এই শোবার সময়ে রাগালাপে তাঁর স্পৃহা ছিল না। তা' ছাড়া এ শোনবার আর দরকারই বা কি?

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—দরবারী তোড়ীর আলাপ শুনে আর এখন কি হবে? শুয়ে পড়।

—না, আমার এখন ঘুম আসবে না। আপনি এর চলন আর আলাপটা একবার দেখান।

অগত্যা দরবারী তোড়ীর আলাপচারি শোনালেন মোহিনীমোহন। তারপর তিনি শয্যার আশ্রয় নিলেন। রাত তখন প্রায় চারটে।

কিন্তু মুরারি বিছানার ধারেও গেলেন না। বেরিয়ে পড়লেন বাড়ীর সামনেকার খোলা জায়গাটিতে। এইমাত্র শোনা দরবারীর আলাপ সেখানে বেড়াতে বেড়াতে গুঞ্জন করতে লাগলেন।

ক্রমে অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠল। তখন ঘরে এসে ডেকে তুললেন পিতাকে।

—বাবা, দরবারী তোড়ীর একটা গান শোনান।

একটু অপ্রসন্ন হলেন মোহিনীমোহন।

—আবার দরবারীর গান শুনে কি হবে এখন? তোমার ইচ্ছেটা কি?

—গানটা একবার দেখিয়ে দিন।

আর কিছু বললেন না। মোহিনীমোহনের একবার সন্দেহ হ'ল বটে, কিন্তু এই নিয়ে আর আপত্তি জানালেন না। ছেলের স্বভাব ভাল রকমই জানতেন তিনি। যত ধীর আর নম্রই হোক, ভেতরে অত্যন্ত রোখা। যদি কোন কাজ করবে মনে স্থির ক'রে থাকে, তা সে করবেই। কোন বাধা মানবে না।

এই ভেবে দরবারী তোড়ীর ধ্রুপদটি গাইলেন আদ্যোপান্ত। নিবিষ্ট হয়ে মুরারি শুনলেন। কোন কোন অংশ বিশেষ করে শোনবার জন্তে গাইতে হ'ল একাধিকবার। গানটা খুঁটিয়ে শুনে নিয়ে মুরারি আবার বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এবার গঙ্গার ধারে। শুধু গানখানি আগাগোড়া গলায় তুলতে হবে তা-ই নয়, আলাপ সমেত সেটি প্রস্তুত করতে হবে। কোন পাখোয়াজীর সঙ্গে গানটি গঠিয়ে নেবারও সুযোগ নেই। একাই এই অবস্থায় যতটুকু করা সম্ভব।..

এদিকে বেলা আর একটু বাড়ল, রোদ উঠল। মোহিনীমোহন আর ঘুমোবার বৃথা চেষ্টা করলেন না। কিন্তু মুরারি কোথায়? শেষ রাতটুকু তাকে ত একেবারেই শুতে দেখা গেল না।

খানিক পরে ফিরতে দেখলেন তাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্নান সেরে জামা-কাপড় বদলে বেরুবার জন্তে মুরারি প্রস্তুত হয়ে এলেন।

—কনফারেন্সে যাচ্ছি। গান গাইব।

মোহিনীমোহন চমৎকৃত হলেন।

—বল কি? এ গান কখন শিখলে যে কন্‌ফারেন্সে গাইতে যাচ্ছ? এ কি সাধারণ কোন আসর?

—না, বাবা। আমি গাইতে যাব। না গেলে ভাল হয় না। আপনি আর 'না' বলবেন না।

তাকে আর বাধা দিলেন না, কিন্তু তার সঙ্গে নিজে আর তাঁর যাবার ইচ্ছে হ'ল না। এই রকম বিনা প্রস্তুতিতে কখনও গাওয়া যায়, আর এত বড় সম্মেলনে? নির্ঘাৎ হাস্যাস্পদ হবে। কি করে তা বসে থেকে দেখা যায়?

মনে অতিশয় অস্বস্তি নিয়ে ঘরে বসে রইলেন মোহিনীমোহন। তাঁর সমস্ত চিন্তা অধিকার করে রইল সম্মেলনে মুরারির গান। মাত্র খানিক আগেই যে গান শুধু শুনেছে, তৈরি করবার সময়ই পায় নি তা কেমন করে কন্‌ফারেন্সে গাইবে? পাখোয়াজী পর্যন্ত নিজের নয়। একটু ঘুমিয়েও নেয় নি সারা রাতের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। মুরারির ভাবনায় অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়লেন সম্মেলনের দিকে। একরোখা ছেলেটা কি করবে কে জানে। আর বাংলার বাইরে এই সব দুর্ধর্ষ ওস্তাদদের সামনে!

এই সব ভাবতে ভাবতে পৌঁছলেন এসে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কন্‌ফারেন্সের-হল এ প্রবেশ করা মাত্র সতেজ, সুরেলা গলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। ডায়াস তখনও দেখতে পান নি, গায়ক তখনও চোখের আড়ালে কিন্তু এ গলা তাঁর চেয়ে বেশি আর চেনে কে? সারা হল সুরে ভরে উঠে গম গম করছে। রাতের শেষ প্রহরে দরবারী তোড়ীর যে আলাপের কাঠামো দেখিয়েছিলেন, তাকেই ভিত্তি ক'রে রাগের বিস্তৃত রূপ প্রদর্শন ক'রে চলেছে গায়ক। তার নিজস্ব অনুভবে, প্রতিভার স্পর্শে প্রাণবন্ত সেই রাগের আলাপন। প্রভাতকালীন দ্বিতীয় প্রহরের সেই উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগটির প্রকারভেদ। কোমল ধৈবতকে

...ল স্বর দেখিয়ে, কোমল গান্ধার, আর কোমল ঋষভের ...গ্র আবেদন কি হৃদয়স্পর্শী রূপেই প্রকাশ হচ্ছে। শোনবার ...তন।

মোহিনীমোহন হলের মধ্যে এসে মুরারির গান শুনতে লাগলেন। মনের সব উদ্বেগ নিশ্চিহ্ন হয়ে তখন তাঁর নিশ্চিন্ত কৌতূহলের আনন্দ।

যথারীতি আলাপচারি শেষ ক'রে মুরারি গান ধরলেন। পাখোয়াজে সঙ্গত করছেন গোয়ালিয়রের প্রবীণ গুণী পর্বত সিং। তাঁর সঙ্গে অতি সাবলীল সুকণ্ঠে গায়ক গানের রূপদেশ সুন্দরভাবে দেখাতে লাগলেন। যেন কতদিন ধরে এই গানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়।

তখন মুগ্ধ শ্রোতাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব হ'ত যে, গানখানি আলাপ সমেত ক' ঘণ্টা মাত্র আগে গায়কের প্রথম শোনা, তাও খণ্ডভাবে।

গান শেষ করতে মুরারি মুখরিত প্রশংসায় ধন্য হলেন। তাঁর সেদিনকার অসাধারণত্বের অনেকখানিই কিন্তু রয়ে গেল অজ্ঞাত অধ্যায় হিসেবে। ...

আর একটি বড় আসরের ঘটনা। এটিও সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন। আগ্রা শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বাংলা থেকে সেই সম্মেলনে যোগ দিতে যান গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে, তারাপদ চক্রবর্তী, মুরারিমোহন মিশ্র প্রভৃতি।

সে রাতের অধিবেশনে একটি অপ্রিয় ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীদের প্রতি স্পষ্ট বিরোধী মনোভাব। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে বাংলার রাগ-সঙ্গীতের শিল্পীদের সম্পর্কে সেকালে একটি বিরুদ্ধ মনোভাব কোন কোন সময় দেখা গেছে—সেখানকার শিল্পী ও শ্রোতাদের অনেকের মধ্যেই। রাগ-সঙ্গীত মূলত পশ্চিমাঞ্চলের সম্পদ, বাঙ্গালীর নয়, বাঙ্গালীর রাগ-সঙ্গীতচর্চা অনধিকার—এই ধরনের এক হীনমন্যতা বোধ থেকে ওই রকম ধারণা পশ্চিমাদের মধ্যে কোন কোন মহলে সে যুগে ছিল। এবং তা কখনও কখনও প্রকাশ পেত সম্মেলনের আসরেও।

আগ্রা সম্মেলনের সেই রাতে বাঙ্গালী শিল্পী-বিরোধী মনোভাবটি স্থানীয় শ্রোতাদের মধ্যে কিছু উগ্র ও নির্লজ্জ ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বাঙ্গালী গায়কদের গান না শোনবার জন্যে তখন শ্রোতারা বদ্ধপরিকর। বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবীণ ধ্রুপদগুণী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় গান আরম্ভ করবার পরই সেই সব অসহিষ্ণু শ্রোতাদের কাছে বাধা পেতে লাগলেন। হৈ চৈ চীৎকার হতে লাগল তাঁর গান থামিয়ে দেবার জন্যে। তিনি তা সত্ত্বেও গান বন্ধ করলেন না। গেয়ে চললেন খানিকক্ষণ ধরে। কিন্তু বহু কণ্ঠের সম্মিলিত চীৎকার ও করতালি ধ্বনিতে তাঁর গান অশ্রুত থেকে যেতে তিনি কিছুক্ষণ পরে গান বন্ধ ক'রে উঠে গেলেন।

সেই হট্টগোলের মধ্যে পরবর্তী গায়কের নাম ঘোষিত হ'ল—মুরারিমোহন মিশ্র। ঘোষণার পরই তরুণ শিল্পী সপ্রতিভভাবে আসরে এসে বসলেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই যেন। তাঁর আকৃতি ও বেশবাসে অবাঙ্গালী বলে ভুল করবার কোন কারণ নেই। তা ছাড়া, পশ্চিমাঞ্চলের শ্রোতাদের কাছে তিনি অপরিচিতও নন।

শ্রোতাদের তখন যা মেজাজ তাতে বাঙ্গালী-শিল্পীর পক্ষে আসরে গাইতে বসা অতি দুঃসাহসের কাজ। গান যতই ভাল গাওয়া হোক, অসহিষ্ণু শ্রোতারা তা অগ্রাহ্য করবার জন্যে সোচ্চার প্রস্তুত। সেখানে মুরারির মতন কোন তরুণ বয়সীর গাইতে বসা সমীচীন হবে কি না সে বিষয়ে মোহিনীমোহনের মনেও দ্বিধা জাগছিল।

কিন্তু মুরারির অটল আত্মবিশ্বাস। অকুতোভয় শিল্পী-সত্তা। পিতার কাছে গাইবার সম্মতি চেয়ে নিলেন।

তারপর মঞ্চে বসে যখন গান গাইতে আরম্ভ করলেন তখনও আসরের আবহাওয়া রীতিমত প্রতিকূল। শ্রোতাদের বাঙ্গালীর গান শোনবার মতন মতিগতি আদৌ নেই। অশান্ত পরিবেশ।

তিনি কোনদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে অবিচলিত ভাবে গানের উদ্বোধন করলেন। ধীর-স্থির ভাবে আলাপ করতে লাগলেন স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে। দেখা গেল, অনিচ্ছুক শ্রোতারাও ক্রমে আকৃষ্ট বোধ ক'রে গোলমাল থামিয়েছেন। শান্ত ভাব ধারণ করেছে আসর।

যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গান চলল সমস্ত শ্রোতা মুগ্ধচিত্তে বসে শুনলেন। গান শেষ হতে এবার সানন্দ করতালিতে সচকিত হয়ে উঠল সম্মেলন ভবন।

এমনি প্রতিভাধর গায়ক ছিলেন মুরারিমোহন মিশ্র। আর এই সব বড় বড় আসর যখন মাৎ করেন তখন বয়স মাত্র ১৯।২০ বছর। তারও কয়েক বছর আগে থেকে কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা সেই কিশোরের। কলকাতার নানা আসর থেকে তখন তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

রাগ-সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর অনায়াস বিচরণ-পটুত্ব যেমন সমঝদারদের চমৎকৃত করেছিল, তেমনি অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গীতেও অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই রেকর্ড হয়েছিল তাঁর ছয় খানি গান—আধুনিক ও পল্লীগীতি।

আর একদিকে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ প্রভৃতি গানের নিষ্ঠাবান গায়করূপে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণীর বিশেষ স্নেহ ও আস্থাভাজন। সেই অল্প বয়সেই রবীন্দ্র সঙ্গীতে এমন কৃতী হন যে, দিনেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রধান গায়কের আসন দিতেন। অনেক সম্মেলক গীতিতেও তাঁদের নির্দেশে নেতৃত্ব করতে হ'ত তাঁকে। (উত্তরকালে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী মহোদয়া সঙ্গীতস্মৃতি বিষয়ে স্বরচিত একটি নিবন্ধে সে যুগের বাংলা দেশের উদীয়মান গায়ক হিসেবে মুরারিমোহনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।)

তারপর ১৯৩৪ সালে যখন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ সঙ্গীতপ্রেমীদের পরিচালনায় আরম্ভ হ'ল নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (ও সঙ্গীত সম্মেলন)—যার বিচারক-মণ্ডলী অলঙ্কৃত করেন তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ও ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতগুণীরা এবং যা প্রতিভা আবিষ্কারে উচ্চ মানের জন্যে শুধু পথিকৃৎ নয়, আজও আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে—তখন সেখানে সকলকে চমৎকৃত ক'রে দেয় মুরারিমোহনের দুর্লভ সঙ্গীত-প্রতিভা।

সেই প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় কলেজের ছাত্ররূপে (বয়স তখন ১৯ বছর) মুরারিমোহন সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হলেন। ধ্রুপদে প্রথম স্থান, খেয়ালে প্রথম স্থান, টপ্পায় প্রথম, আধুনিক গানে প্রথম, লোক-সঙ্গীতে প্রথম এবং কীর্তনে দ্বিতীয়—এই হ'ল তাঁর প্রতিযোগিতার ফলাফল। ওই বছরেই দ্বিতীয় অধিবেশনের সাধারণ প্রতিযোগিতায় তাঁর গ্রুপে এইরকম নির্বাচন দেখা গেল—মুরারিমোহন ধ্রুপদে প্রথম, টপ্পায় প্রথম, গজলে প্রথম, রবাব যন্ত্রে প্রথম, স্বরলিপিতে প্রথম, আধুনিক বাংলা গানে প্রথম, খেয়ালে দ্বিতীয় (খেয়াল বিভাগে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪১ জন), ভজনে দ্বিতীয় এবং কীর্তনে তৃতীয়।

(তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে একজন সফল প্রতিযোগী হিসেবে মুরারিমোহন নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে খেয়াল গানের অনুষ্ঠান করেন।)

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে অসামান্য গুণপনার পরিচয় দেবার সমঝদারেরা লাভ করলেন তা যুগপৎ স্বভাবদত্ত এবং সাধারণ সুবর্ণ ফল। সঙ্গীতচর্চায় অতিশয় কৃতী পিতার সুযোগ্য পুত্র মুরারিমোহন। প্রতিভা তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ উত্তরাধিকার। সঙ্গীত-প্রতিভার বহুমুখীনতাও তাঁর পৈত্রিক দৃষ্টান্ত বলা যায়। পিতা মোহিনীমোহনের তুল্য বহুমুখী সঙ্গীতজ্ঞ বর্তমান শতকে দুর্লভ। তিনি একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি গায়ক এবং পাখোয়াজ তবলা বীণা রবাব ক্ল্যারিওনেট সুরচয়ন সুররঞ্জন প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতে অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক-দের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ভজন কীর্তন কাব্যসঙ্গীত ইত্যাদি রীতির গায়ক হলেও এত বিভিন্ন যন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না মোহিনীমোহনের মতন। তা ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র পরিণত বয়সে সিনেমার ব্যবসায়ী সঙ্গীতে অনেকাংশে আত্মনিয়োগ করার ফলে রাগসঙ্গীতচর্চা গভীর-ভাবে করবার অবকাশ পেতেন না। অপরপক্ষে মোহিনী-মোহন ছিলেন রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে একজন নেতৃস্থানীয়। বিভিন্ন অঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীতে এবং নানা যন্ত্রে তিনি অনেক শিষ্য গঠন করেছিলেন। তার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে অবান্তর। শৈশব কাল থেকে হাতে গড়া দ্বিতীয় পুত্র মুরারির নাম শুধু এ প্রসঙ্গে করা রইল। মুরারির এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা তবলাবাদক মদনমোহনও পিতার শিষ্য। আধুনিক কাব্যসঙ্গীতের খ্যাতনাম্নী গায়িকা নির্মলা মিশ্রও মুরারিমোহনের কনিষ্ঠা এবং পিতার শিক্ষাধীনেই শ্রীমতী নির্মলা ধ্রুপদ খেয়ালের চর্চা অল্প বয়স থেকে ভালভাবে করতেন; কিন্তু টাইফয়েড রোগে কণ্ঠের ক্ষতি ঘটবার পর থেকে হালকা সঙ্গীত গাওয়া আরম্ভ করেন।

মোহিনীমোহনের তুল্য বাংলার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় বহুমুখী প্রতিভার প্রসঙ্গে। তিনি হলেন বিগত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী—লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী। মোহিনীমোহনের মতন তিনিও নানা রীতির কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, ভজন গান, এবং বীণা, এসরাজ তবলা পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রের শিল্পী ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী। সঙ্গীতজীবনে এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তিনিও মোহিনীমোহনের মতন মূলত ধ্রুপদী নামে পরিচিত হতে গৌরব বোধ করতেন। কারণ ধ্রুপদই ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু।...

মোহিনীমোহনের সঙ্গীত-জীবন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতে মুরারিমোহনের বহুমুখীনতা তাঁর পিতারই উত্তরাধিকার। এই প্রতিভা নিয়েই মুরারির জন্ম। সঙ্গীত-সাধনায় নিবেদিত প্রাণ পিতার জন্যে বাড়ীতে সঙ্গীতের আবহ। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সে শিশুর সুরের সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্ক গড়ে ওঠে সহজ, স্বাভাবিক এবং অব্যর্থ ভাবে। পাঁচ বছরের ছেলে পাখীর মতন অনায়াসে গান গাইতে আরম্ভ করে। মিষ্টি গলা। আর সেই সঙ্গে শুনে শুনে শিখে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা।

তার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীমোহন লক্ষ্য

রেখে চলেন শ্রুতিধর ছেলেটির দিকে। গান দিলেই সে শিখে নেয়, বেশি কষ্ট ক'রে শেখাতে হয় না। খুব বেশি খেটেও শিখতে হয় না তাকে।

এমনি ক'রে কিশোর বয়সেই রীতিমত গাইয়ে হয়ে উঠল। শুধু সুরেলা গলায় গান নয়, রাগ-পদ্ধতির রীতি-নীতি, বিভিন্ন অঙ্গের কলা-কৌশল শিখে নিতে লাগল দক্ষতার সঙ্গে। অসামান্য মেধা। দরাজ সুকণ্ঠ। অল্প আয়াসে সুর ঝরে পড়ে সাবলীলভাবে। আর অন্তর দিয়ে গান গায়। তার নিজের মনের অনুভব মিশে যায় বলে গান স্পর্শ করে শ্রোতাদেরও অন্তর।

দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় তখন মোহিনীমোহন বসবাস করছেন। সেখানে কৈশোর থেকেই মুরারির গানের খ্যাতি। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়বার সময় ছ'খানি গানের রেকর্ড বেরিয়ে সে প্রসিদ্ধি আরও বিস্তৃত হয়ে যায়।

কলেজ-জীবনের গোড়া থেকেই খ্যাতনামা। শুধু রাগসঙ্গীতে নয়, আরও নানা ধরনের গানের জন্যেও বিভিন্ন দিকে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কৃতিত্বের জন্যে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয়পাত্র।

কলেজের ছাত্র-জীবন থেকে খ্যাতির পরিমণ্ডল অতি দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন এবং কলকাতার ভাল ভাল আসর। তারপর বাংলার বাইরের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে মর্যাদা লাভ। একাধিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে প্রতিভার স্বীকৃতি। বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে বাংলার এক প্রতিশ্রুতিমান তরুণ কণ্ঠশিল্পী। তরুণতম। কারণ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং তারাপদ চক্রবর্তীরও বয়োকনিষ্ঠ মুরারি মিশ্র।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতগুণ ছাড়া মুরারিমোহনের স্বভাবে ক'টি বৈশিষ্ট দেখা যেতে লাগল। মন অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐকান্তিক ভক্ত। পরমহংস-দেবের বাণী ও আদর্শ সেই তরুণ বয়সেই অনুসরণ ক'রে চলবার অনুরাগী ও প্রয়াসী। পরবর্তী কয়েক বছর গান উপলক্ষ্যে বাংলার বাইরে যেখানে বাস করতে হয়েছে, যথাসম্ভব থেকেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি-সদনে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অন্তরের গভীর যোগ তাঁর পরিচিত কারুরই অবিদিত ছিল না। অনেকেই বিস্মিত হতেন এত অল্প বয়স থেকে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবে এমন সমর্পিত প্রাণ দেখে।

সরল, মধুর স্বভাব। তেমনি চরিত্রবান, শুদ্ধ সত্তা। অতি তরুণ কাল থেকে মাঘোৎসব ও নানা সঙ্গীতানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অনাত্মীয়া মহিলাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা। সঙ্গীত-প্রতিভার জন্যে স্বাধীনা অনুরাগিণীদেরও অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু নারীসঙ্গ বিষয়ে সহজ, স্বাভাবিকভাবেই মুরারিমোহন নিস্পৃহ। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত—একথা অণুমাত্র অতিকথন নয়। এ বিষয়ে দু'একটি উদাহরণ পরে দেওয়া হবে।

চরিত্রের একদিকে যেমন ধৈর্য, স্থৈর্য ও নম্রতা, আর একদিকে তেমনি অনমনীয় ঋজুতা, যা দৃঢ়তারই নামান্তর। অথচ সদালাপী, মিশুক ও বন্ধুবৎসল।

আর অন্তরের সবচেয়ে প্রিয় সাধন—সঙ্গীত। সঙ্গীতৈকপ্রাণ। সঙ্গীত-জীবনের প্রথম দিকে নানা অঙ্গের গানে অপক্ষপাত আগ্রহ ছিল। সেই সঙ্গে একাধিক সঙ্গীত-যন্ত্রেও হাত পড়ত, কারণ পিতার সঙ্গীত-ভাণ্ডারে এক ডজনেরও বেশি বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা বাল্যকাল থেকেই দেখতে অভ্যস্ত। সেই একাধিক যন্ত্রের মধ্যে রবাবটির প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় রবাব বাদনে বিচক্ষণ গুণীদেরও প্রশংসা অর্জন করেন, যখন বর্ষীয়ান, ব্যবসায়ী যন্ত্রীদের মধ্যেও রবাব-বাদক কালে সুদুর্লভ।

কিন্তু পরে মুরারিমোহনের বৈচিত্রবিলাসী সঙ্গীত-চর্চা ঘনীভূত হয়ে প্রায় একমুখীনতার পথে এগিয়ে চলে। যন্ত্র-সঙ্গীত ছেড়ে দিলেন একে একে। কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা বিভিন্ন রীতি থেকে ক্রমে কেন্দ্রায়িত হয়ে ধ্রুপদ ও খেয়ালে এসে স্থায়ী হ'ল। এই দুই অঙ্গের মধ্যে আবার খেয়ালের ওপর ঝোঁক পড়তে লাগল বেশি ক'রে। ধ্রুপদের অনুশীলনে ছেদ না পড়লেও খেয়ালের সৌন্দর্যে অধিকতর আকৃষ্ট হলেন।

খেয়াল আরও ব্যাপকভাবে, আরও গভীরভাবে, আরও আধুনিক কালের উপযোগী অভিনব তান-কর্তবে মনোমুগ্ধকর ভাবে আয়ত্ত করতে অনুপ্রেরণা জাগল অন্তরে।

সঙ্গীতচর্চার এই পর্যায়ে—যে কালের প্রসঙ্গে বক্ষ্যমান নিবন্ধ আরম্ভ হয়েছে তার অব্যবহিত পরে—পিতা-পুত্রে আদর্শগত সংঘাত সৃষ্টি হ'ল।

আগেও আভাস দেওয়া হয়েছে, নানা যন্ত্র ও গীত-রীতির মধ্যে মগ্ন হ'লেও মোহিনীমোহন ছিলেন প্রধানত ধ্রুপদী। রাগ-পদ্ধতি সম্পর্কে নিষ্ঠাবান এবং ঐতিহ্য অনুসারী। মতামতে তিনি সাম্প্রতিক কালের বিচারে হয়ত প্রাচীনপন্থী। তিনি যে খেয়ালের চর্চা করতেন তা খানিক পরিমাণে ধ্রুপদ-ঘেঁষা। খেয়াল গানে ইতিমধ্যে নানা অভিনবত্বের সঞ্চার হয়েছে যা তাঁর সাধনার যুগে ছিল না। এত বৈচিত্রময় তান-লীলা খেয়ালে এনেছে এক

নতুনের স্বাদ, যার রীতি-নীতি ও ঢঙ অর্বাচীন মনে হয় তাঁর কাছে। রাগ মিশ্রণের নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিকদের কাছে যে নতুন নতুন সৌন্দর্যের দ্যোতক, তাঁর মতে সেসব প্রয়াস রাগের ঐতিহ্য আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে।

এই ধরনের মনোভাবের জন্যে পুত্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর প্রকট হয় সঙ্গীত বিষয়ে। কারণ যুগধর্মের প্রভাবে মুরারিমোহন আধুনিক চালের খেয়ালের অনুবর্তী হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, খেয়ালের নতুন কর্মকাণ্ডের অংশভাগী হওয়া।

প্রাচীন ও নবীনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব!

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে স্থাপিত লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে মুরারিমোহন ভর্তি হ'তে চাইলেন।

অভিপ্রেত না হলেও পিতা মত দিলেন শেষ পর্যন্ত। মনে দুঃখ পেলেন, কিন্তু পুত্রের সাগ্রহ সাধে বাদ সাধলেন না। অক্ষুণ্ণ রইল অন্তরের স্নেহ।

মুরারির দিক থেকেও পিতার প্রতি অবাধ্যতার কোন প্রশ্ন নেই। তেমন অমান্য করবার মতন স্বভাবই নয় তাঁর। পিতার খেয়াল গান সেকেলে মনে হয়, এখনকার পশ্চিমের খেয়ালে অনেক নতুন কারুকর্ম, অনেক তানের বৈচিত্র এসেছে, সেসব শেখবার বড় ইচ্ছে করে। এই মুরারির মনের ভাব। পিতার ওপর ভক্তি শ্রদ্ধার কোন অভাবই নেই। এ পর্যন্ত তাঁর কাছে যা পেয়েছেন, তাই সঙ্গীত-জীবনের মূল সম্বল। তা ছাড়াও আরও কিছু চাই। সে জন্যেই পশ্চিমে যেতে হবে। পিতার প্রতি সম্মান বা বিশ্বাসের অভাবের জন্যে নয়।

কলকাতায় ছাত্র-জীবনে বি. কম পড়া চলছিল। কিন্তু মন উন্মুখ হয়ে ছিল সঙ্গীতকে পুরোপুরি জীবনের অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করতে। অন্য কোন বৃত্তির কথা চিন্তা করা অসম্ভব বোধ হয়। এই অবস্থায় বাড়ীর সম্মতিতেই এখানকার কলেজপাঠে ইতি করে লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন।

শিক্ষার্থীরূপে যোগ দিলেন সেখানকার মরিস কলেজে। ছয় বছরের সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতন জনকর অধ্যক্ষ।

কলেজে প্রবেশ করবার সময় থেকেই রতন জনকরের সপ্রশংস দৃষ্টি মুরারিমোহন আকর্ষণ করেন। পরীক্ষা করে অধ্যক্ষ তাঁকে ভর্তি করে নিলেন একেবারে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। নতুন পরিবেশে প্রতিভা স্ফুরণের নতুনতর সুযোগ উপস্থিত হ'ল।

লক্ষ্ণৌতে মুরারিমোহন স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করলেন। আমিনাবাদ অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। তারই অতিথিভবনের একটি ঘরের বাসিন্দা হলেন। বয়স তখন ২১ বছর। যৌবনের পরিপূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সঙ্গীত-সাধনায় এবার আরও একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

পরে মিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে জানা যায়, রাত চারটে থেকে গান শোনা যেত মুরারির। বেলা, দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলত। প্রতিদিনের এই নিয়মিত সাধনা। তারপর কলেজের শিক্ষা। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে নানা আসরে গান, এ সব ত ছিলই।

সুতরাং সেই প্রতিভাবান তরুণ যে সঙ্গীত-জীবনে উত্তরোত্তর এগিয়ে চললেন তা অনুমান করা কঠিন নয়।

পশ্চিমাঞ্চলে শুধু লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ রইল না। সর্বভারতীয় সম্মেলনে লক্ষ্ণৌতে আসবার আগে থেকেই লাভ করেছেন সুনাম। এখানে থাকতে বড় বড় আসরে শুধু নয়, লক্ষ্ণৌর বাইরে দিল্লী ও মীরাটেও সঙ্গীতজ্ঞ মহলে গুণীর প্রতিষ্ঠা পেলেন। লক্ষ্ণৌ বাসের সময়ও যোগ দেন একাধিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে। কিন্তু পশ্চিমের আরও অনেক শহরে ছোটখাটো আসরেও এত আমন্ত্রণ আসত যা থেকে বোঝা যেত নামডাক অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গীতচর্চার অনেক গোষ্ঠী তাঁর গান শুনতে আগ্রহী। ছোট ছোট সঙ্গীতকেন্দ্রেও বাইরেকার কোন শিল্পীর যখন ডাক আসে, তখনই বোঝা যায় সে শিল্পীর সঙ্গীত-জগতে যথার্থ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

মুরারিমোহন ২৩।২৪ বছরের মধ্যেই সে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

অনেক সুহৃদও লাভ করেন লক্ষ্ণৌতে, সুর-শিল্পী মহল থেকে। তাঁদের মধ্যে তিনজন সবচেয়ে অন্তরঙ্গ হন। বেহালা-গুণী বিষ্ণু গোবিন্দ যোগ (ভি, জি, যোগ), অমৃতকণ্ঠ দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুসকর (ডি, ভি, পালুসকর—বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকরের পুত্র) এবং সেতারী ধ্রুবতারা যোশী (ডি, টি, যোশী—লক্ষ্ণৌয়েরই সন্তান)। এই চারজনের অনেক মেলামেশা, অনেক আসরে যোগদান আর অনেক দিনের একত্র সঙ্গীতচর্চা পরিচিত মহলে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কলকাতায় থাকতেও যেমন, তেমনি এই বিদেশ বাসের সময়েও যাঁরা সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই ভালবেসেছেন মুরারিমোহনকে। শুধু সঙ্গীত-প্রতিভার জন্যে নয়; সরল অমায়িক নিরহঙ্কার স্বভাবের জন্যেও।

সর্বজনপ্রিয়—একটি কথার কথা। সংসারে কোন মানুষের সম্পর্কেই তা সঠিক প্রয়োগ করা যায় কি না সন্দেহ। যিনি সকলের প্রিয় কিংবা যাঁর কোন শত্রু নেই এমন ব্যক্তি ইহজগতে কোথায়? তবে সর্বজনপ্রিয় বা অজাতশত্রু

হওয়ার উপযুক্ত মানুষ জগতে দেখা যায়, যদিও তাঁরা তা হতে পারেন না তাঁদের নিজেদের কোন দোষে নয়, অন্যের কারণে। নিতান্ত নির্বিরোধী হয়েও কেউ কেউ কারুর অতিশয় অপ্রিয় এমন কি গুপ্ত শত্রুতার লক্ষ্য হয়ে থাকেন অবস্থা-বৈগুণ্যে কিংবা ঘটনাচক্রে। মুরারিমোহন সম্পর্কেও সর্বজনপ্রিয় কিংবা অজাতশত্রু বিশেষণ ব্যবহার করা যায় না, যদিও সেই রকম হবার মতন অন্তঃকরণ ও চরিত্র তাঁর ছিল। অথচ যে মারাত্মক শত্রুতার ফলে তাঁর জীবনের চরম ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসে সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর নিজের কোন অপরাধের জন্যে সেই ভয়াবহ শত্রুতার সৃষ্টি হয় নি—এবং তার কারণ বা উপলক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না পর্যন্ত।

বরং বলা যায়, সেই চূড়ান্ত বৈরিতার তিনি পাত্র হয়েছিলেন তাঁর গুণের জন্যে—সঙ্গীতগুণের জন্যে। গুণ কখনও কখনও সংসারে দুর্ভাগ্যক্রমে দোষের তুল্য হয়ে থাকে। দু'শ বছর আগেও রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র যেমন মন্তব্য করেছিলেন—গুণ হয়্যা দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।

মুরারিমোহনের সঙ্গীতবিদ্যা যে দোষের কারণ হয়ে তাঁর জীবনের ভয়ানক পরিণতি ঘটিয়েছিল, সে প্রসঙ্গ শেষে প্রকাশ্য। তার আগে তাঁর জীবনের অন্যান্য আরও কিছু কথা আছে। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা ও চরিত্রবলের দু'একটি কাহিনী।

মরিস কলেজে যোগ দেবার কয়েক মাস পরের ঘটনা। তখনও তিনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

ধ্রুপদ গানের ক্লাস। কলাবত অধ্যাপক আশাবরী রাগের ধ্রুপদ শেখাচ্ছেন। মুরারিমোহন ভিন্ন অন্য কয়েকজন ছাত্রও ক্লাসে রয়েছেন।

আশাবরীর গান গাইবার সময় শিক্ষকের হঠাৎ চোখ পড়ল—মুখ ফিরিয়ে নিলে মুরারি মিশ্র আর সে মুখে ফুটে রয়েছে হাসির রেখা।

গান বন্ধ করে তিনি রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি হাসছিলে কেন?

লজ্জিত হয়ে মুরারিমোহন বললেন—এম্‌নি।

—না। কক্ষোনো শুধু শুধু হাসো নি। তুমি নিশ্চয় আমার গানকে বিদ্রূপ করবার জন্যে হেসেছিলে। তুমি আমাকে অপমান করেছ।

মুরারিমোহন নম্রভাবে উত্তর দিলেন—আপনি বিশ্বাস করুন, আপনাকে অপমান করবার জন্যে আমি হাসি নি। হঠাৎ হাসি এসে গিয়েছিল।

শিক্ষক সক্রোধে বলে উঠলেন—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তুমি আমায় অপমান করবার জন্যে হাসছিলে। আমি প্রিন্সিপ্যালের কাছে রিপোর্ট করব তোমার নামে।

তখনি উঠে চলে গেলেন। খানিক পরেই নিয়ে এলেন রতন জনকরজীকে সঙ্গে নিয়ে। বক্তব্য ইতোমধ্যেই তাঁকে শোনানো হয়ে গেছে। এখন শুধু অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন মুরারির দিকে।

রতন জনকর মুরারিকে ভালভাবে জানতেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এঁর গান শুনে হেসেছিলে কেন?

মুরারিমোহন সলজ্জ ভাবে উত্তর দিলেন—ওঁর আশাবরীতে ভুল হচ্ছিল। সেজন্যে হঠাৎ আমার হাসি এসে যায়। কিন্তু আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম আর ওঁকে অপমান করবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।

রতন জনকর বললেন—আশাবরীতে কি ভুল হচ্ছিল দেখাও ত।

মুরারিমোহন পিতার কাছে আশাবরী ভালভাবে শিখেছিলেন। শিক্ষক কিভাবে গাইছিলেন, তাঁর ভুল কোথায় সব দেখিয়ে, শোনালেন আশাবরীর শুদ্ধ রূপের ধ্রুপদ।

রতন জনকর মুরারিকে কোনরকম তিরস্কার না করে ফিরে গেলেন।

এই পর্বের ফল এই জানা গেল যে, মুরারিমোহন ধ্রুপদের ক্লাসে অতঃপর শিক্ষক নিযুক্ত হলেন! এবং সেই ছাত্র অবস্থাতেই!

রতন জনকরজীর নির্দেশে, অন্যান্য ক্লাশে ছাত্ররূপে থাকলেও, ধ্রুপদ শিক্ষা দিতে লাগলেন মুরারি মিশ্র।

যতদিন মরিস কলেজে ছিলেন, ধ্রুপদের অধ্যাপক হয়েই থাকেন সেই তরুণ বয়সে!

উক্ত শিক্ষকের অভিযোগের ফলেই রতন জনকরজী সেদিন মুরারিমোহনের প্রতিভাকে নতুন করে আবিষ্কার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তখন মরিস কলেজে সাড়া পড়ে গিয়েছিল তরুণ সঙ্গীতজ্ঞের এই কৃতিত্ব উপলক্ষ্য করে। কিন্তু এই নিয়ে তাঁর নিজের মনে কোন অহমিকা কোনদিন জাগে নি। তেমনি মনে কোন প্রবৃত্তির বিকারও ছিল না, যা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিতে পারত এই প্রথম যৌবনকালে। জৈব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার সুযোগ এলে এসময় অনেকেরই হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু মুরারির অন্তর অন্য ধাতুতে গড়া। যথার্থ সৎ ও ধর্ম-প্রবণ। এ সম্পর্কে আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে তাঁর সংযত চরিত্রের।

লক্ষ্ণৌতে বাস আরম্ভ করবার কিছুদিনের মধ্যেই সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে একেবারে নিমগ্ন করে দেন। সকাল বেলাতেই একাদিক্রমে ৬ ঘণ্টা। রেওয়াজের কথা আগেই বলা হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি সদনে তাঁর বাসের প্রসঙ্গে।

তাল-লয়ে আরো অধিকার অর্জনের জন্যে নিয়মিত তবলচীও নিযুক্ত করেন। তবলা-সঙ্গতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় চিত্তে কেটে যায় তান-সাধনের বৈচিত্রে। নানা মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন চালের তান রেওয়াজের সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে, পরীক্ষা চলছে। নতুন নতুন তানের কল্পনা, পরিকল্পনা এবং তবলার সঙ্গে সেসব গঠানো। এইভাবে খেয়াল গানের সাধন অগ্রসর হতে থাকে।

তবলচী চলে যাবার পরেও অনেক সময় সাধনা বন্ধ হয় না। শুধু সকালে নয়, সময় হলে বিকাল, সন্ধ্যাতেও ঘরখানি মুখরিত থাকে নানা চিত্তাকর্ষক সুরে। এখানে নিত্য আবাহন চলে রাগের অর্থাৎ যা মনকে রঞ্জিত করে।

সুরে তদ্‌গত গায়ক বাহ্য জগতের অনেক কিছুতেই উদাসীন। তাঁর ধারণাও নেই এই সুরের রঞ্জিনী শক্তি কোন হৃদয়কে মায়াবিষ্ট করেছে কি না।

একদিন গাইবার সময় হঠাৎ নজরে পড়ল ঘরের জানলার মধ্যে দিয়ে অদূরবর্তী আর একটি জানলায়। সেখানে এক রূপবতী পর্দার পাশে ছবির মতন দাঁড়িয়ে। সে আয়ত চোখের একাগ্র দৃষ্টি এইদিকেই এবং মুরারির মতন অনভিজ্ঞেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে দৃষ্টি বিমুগ্ধ মনের।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার গানে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। তারপর ভুলে গেলেন সেই মুগ্ধা তরুণীর কথা।

কিন্তু পরের দিন গাইতে গাইতে আবার সেই অনুরাগিণীকে সেইভাবে দেখতে পেলেন। যতক্ষণ গান হ'ল তার শেষ পর্যন্তও দেখা গেল বাতায়নবর্তিনীকে।

তারপর থেকে দিনের পর দিন।

মুরারিমোহন ঘরের জানলাটা বন্ধ করে দিলেন, আর খুলতেন না।

তখন ও পক্ষ থেকে ভেট্ পাঠানো আরম্ভ হ'ল। স্থানীয় এক ধনী ও অভিজাত-বংশীয়া নন্দিনী। অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করলেন উপহার সামগ্রীতে। মুরারি আদৌ রূপবান ছিলেন না। তাঁর প্রতি আকৃতি প্রকাশ পায় নিতান্ত সুরের আকর্ষণেই। কোন যুবকের পক্ষে এই অবস্থায় প্রলুব্ধ না হওয়া সুকঠিন। প্রত্যাখ্যান করতে বিশেষ সংযমের প্রয়োজন।

মুরারিমোহন ভেট্ ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এ পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের ফলে আর অগ্রসর হতে পারলো না নাটিকাটি। কিছুদিনের মধ্যেই যবনিকাপাত ঘটল।...

লক্ষ্ণৌতে থাকবার সময় পশ্চিমাঞ্চলের আসরে যেমন যোগ দিতেন, তেমনি বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। বছরে একবার করে আসতেন কলকাতায়। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে গানের অনুষ্ঠান করতেন। বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, নাটোর-রাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ সঙ্গীতপ্রেমীর। তাঁদের মতন মুরারির আরো অনেক গুণগ্রাহী, শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। যেমন সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

সঙ্গীতক্ষেত্রে মুরারিমোহনের অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করতেন সকলে। তাঁর প্রতি তাঁদের বড় আশা ছিল, ভরসা ছিল প্রদীপ্ত প্রতিভার আধার বলে।...

পশ্চিমের কয়েকটি বড় বড় সঙ্গীত সম্মেলনে, দিল্লী লক্ষ্ণৌ মীরাট প্রভৃতি শহরের নানা আসরে তাঁর গান গাওয়ার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনের মধ্যে বারাণসী সম্মেলনেও যোগ দিয়ে লাভ করেছিলেন গুণীজনের স্বীকৃতি।

বারাণসীতে তিনি আগেও গান গেয়েছিলেন, সেখানেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি হয়েছিল। দু'জন বাঙালী ছাত্রী হয়েছিলেন এখানে। তাঁরা দুই ভগ্নী। কাশীরই এক বাঙালী গায়ক তাঁদের আগে থেকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্ণৌর ওই সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাবার সময় শিখতেন মুরারিমোহনের কাছে। কাশীতে তিনি এলে সেখানেও তাঁর কাছে শিখতেন। পূর্বতন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা তাঁরা বন্ধ করে দেন নি বটে, কিন্তু মুরারিমোহনের প্রতি ছাত্রীদের সমধিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে শিক্ষকটি বিদ্বিষ্ট হন মনে মনে। মুরারি উক্ত সঙ্গীত-শিক্ষকটির মতিগতির সন্ধান জানতেন না।

সেবার আবার গাইতে এলেন বেনারস কনফারেন্সে। সঙ্গে ছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ্দ্বয় বেহালা-শিল্পী ভি. জি. যোগ ও সেতার-বাদক ডি. টি. যোশী। বয়স তখন তাঁর ২৪ বছর। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত শরীর। এ বিষয়েও ব্যায়াম বলিষ্ঠ মোহিনীমোহনের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

কিন্তু কোথা থেকে কি যে ঘটে যায়।

এবার কাশীতে আসাই কাল হ'ল মুরারিমোহনের। কিন্তু কার্য-কারণের গূঢ় রহস্য ভেদ করবার সাধ্য সে-সময় কারুর ছিল না। যখন উদ্‌ঘাটিত হ'ল—তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি।......

কিন্তু পরের কথা পরে।......

কাশীর সঙ্গীত সম্মেলনে মুরারির অনুষ্ঠান হ'ল। গান গাইলেন শ্রোতাদের প্রশংসাধন্ত হয়ে।

সঙ্গীত-শিল্পীর আত্মপ্রকাশের আনন্দ। সাধনার সার্থকতার আনন্দে পরিপূর্ণ অন্তর। কোথাও কোন বেসুর নেই যেন জগতে।

সম্মেলনের শেষে তাঁর এক গুণগ্রাহী, সেই ছাত্রী দু'জনের পিতা তাঁদের বাড়ীতে প্রীতিভোজের আয়োজন করলেন। মুরারির সঙ্গে সে রাত্রে শ্রী ভি. জি. যোগ, শ্রী ডি. টি. যোশী প্রভৃতিও নিমন্ত্রিত হলেন। কাশীর সেই সঙ্গীত শিক্ষকটিও উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

ভোজের ব্যবস্থা প্রচুর। বন্ধুদের সঙ্গে বসে আনন্দ সহকারে মুরারি সেসবের সদ্ব্যবহার করলেন। পাশাপাশি বসে সে রাত্রে আহার করলেন শ্রী যোগ ও শ্রী যোশীর সঙ্গে।

পরের দিন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন তিন বন্ধু মিলে।

কিন্তু মুরারিমোহন জ্বর নিয়ে লক্ষ্ণৌতে ফিরলেন।

প্রথমে কারুরই এমন কিছু গুরুতর মনে হয় নি। অল্প অল্প জ্বর। ওষুধ-পথ্য চলছে। আসা-যাওয়া দেখা-শোনা করছেন মিশনের সন্ন্যাসীরা, প্রিয় সুহৃদ যোগ, যোশী প্রভৃতি। প্রথম দিকে গানও কিছু কিছু হ'ত।

কিন্তু কিছুদিন পরে বোঝা গেল, জ্বর একেবারে ছাড়বে না। আর মাঝে মাঝে শরীরের মধ্যে একটা যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটা বাড়তে বাড়তে একেবারে অসহ্য বোধ হতে থাকে।

যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বন্ধুরা। প্রথমে জানাশোনা ডাক্তার, পরে লক্ষ্ণৌর সব বড় বড় ডাক্তারই মুরারিকে পরীক্ষা করেন, চিকিৎসা করেন। কিন্তু কোন উপশম হয় না রোগের। আর গান গাইতে পারেন না। ঘর থেকে বেরুনোও বন্ধ।

এককালের সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, বিস্তৃত বক্ষ, প্রশস্ত স্কন্ধ এখন দুর্বল, শীর্ণ, রোগ-পাণ্ডুর। প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থা।

অসুখ আরম্ভ হবার কয়েকদিন পর থেকেই বাড়ীতে চিঠি আসে—পিতার কাছে, বড় ভাই মনোজমোহনের কাছে। প্রথম প্রথম তাঁরা জানতে পারেন—মুরারির জ্বর হয়েছে, এখনো সারছে না। তবে চিকিৎসার কোন ত্রুটি নেই। কখনো হয়ত ওরই মধ্যে একটু কম থাকে। মুরারি জানান—এখন অনেকটা ভাল আছি। আবার যন্ত্রণাটা যখন বাড়ে, কয়েকদিন পরের চিঠিতে খবর আসে কলকাতায়।

এমনি ভাবে কিছুদিন যায়। গভীর উৎকণ্ঠা বোধ করতে থাকেন পিতা-মাতা। তারপর স্থির হয়, মুরারিকে কলকাতায় আনিয়ে চিকিৎসা করানো হবে। আর দেরি করা উচিত নয়। বিশেষ লক্ষ্ণৌর ডাক্তাররা যখন কিছু করতে পারছেন না।

জ্যেষ্ঠ মনোজমোহন ভাইকে আনতে গেলেন লক্ষ্ণৌ থেকে।

দাদার সঙ্গে মুরারির বড় প্রীতি। ভালবাসেন বন্ধুর মতন। দাদার কাছে তাঁর কোন কথা গোপন নেই। বাইরে থাকতে সবচেয়ে বেশি চিঠি তাঁকেই লেখা হয়। সেই যে সুন্দরী মেয়েটি রোজ জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনত, তারপর ভেট পাঠাত—সেসব কথাও দাদাকে জানাতে বাদ পড়ে নি। সরল স্বভাব এবং প্রতিভাবান এই ভাইটির ওপরেও মনোজমোহনের অতিশয় স্নেহ।

উদ্বিগ্ন মনে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে, ষ্টেশন থেকে আমিনাবাদ। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। তার বাইরের দিকে দোতলার যে ঘরে মুরারি থাকেন সেখানে মনোজমোহন এলেন। ঠিক এতখানি আশঙ্কা করা যায় নি চিঠি থেকে।

শয্যার একপাশে শ্রী যোগ বসেছিলেন, আর তাঁরই গায়ে মাথা রেখে মুরারী অর্ধশয়ান। চেহারা দেখে চিনতে কষ্ট হয়। কি শীর্ণ, বিবর্ণ—এ কি সেই মুরারি?

দাঁড়াবার ক্ষমতা আর মুরারির নেই। দাদাকে দেখে দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। অশ্রুর মধ্যে দিয়ে যেন প্রকাশ পেলে—শুধু স্নেহ নয়, মনের গভীর নৈরাশ্যও! এ ব্যাধিকে পরাস্ত করবার সব দৈহিক ও মানসিক শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে!

সেই রাত্রেই তাঁকে ট্রেনে ওঠানো হ'ল ষ্ট্রেচারে করে। বন্ধুরা ষ্টেশনে এসে বিদায় দিলেন।

কলকাতায় আনিয়েই যথাসম্ভব চিকিৎসা আরম্ভ করা হ'ল। প্রথম থেকেই দেখতে লাগলেন ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য। উপকার বিশেষ দেখা গেল না। জ্বর আগেকার মতন চলতে লাগল, একদিনের জন্যেও ছাড়ান নেই। আর মাঝে মাঝে পেটে সেই অসহ্য যন্ত্রণা। তারপর ডাক্তার অমলকুমার রায়চৌধুরী চিকিৎসা করলেন কিছুদিন। কিন্তু কোন সুফল নেই।

বিধানচন্দ্র রায়ও এসে মুরারিকে পরীক্ষা করলেন। তাঁর নির্দেশে চিকিৎসা হ'তে লাগল। কিন্তু কোন উপশম হ'ল না সেই জ্বর আর সেই যন্ত্রণার। কি যে রোগ তা তিনিও অন্যান্য বিখ্যাত ডাক্তারদের মতন, নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন না।

এইভাবে আরো কয়েকদিন যায়।

ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যের চিকিৎসা তার পরেও আরো

কিছুদিন চলল বটে—ডাক্তার রায়ের সম্মতি নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন—কিন্তু মুরারির অভিভাবকরা আর আশা বা নির্ভর করতে পারছিলেন না চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওপর। স্বয়ং বিধানচন্দ্র এবং ডাক্তার অমলকুমারের মতন ধন্বন্তরির হাতেও কোন সুফল পাওয়া গেল না, তখন আর ডাক্তারীর ওপর কি করে ভরসা রাখেন ?

একেবারে নিঃশেষ হয়ে এসেছে রোগীর জীবনীশক্তি। শীর্ণ বিবর্ণ শরীর যেন লীন হয়ে গেছে বিছানার সঙ্গে। পাণ্ডুবর্ণ মুখ-চোখ। কথার স্বর এত নিস্তেজ, ক্ষীণ হয়েছে যে, পাশে না থাকলে শুনতে পাওয়া যায় না। শরীরের এমন দুর্বলতা যে পাশ ফিরতে পারেন না ইচ্ছা মতন। পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। তার ওপর সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা যখন হতে থাকে, মা-বাবা আর চোখ চেয়ে দেখতে পারেন না। একটি দিনের জন্যেও জ্বরের বিরতি নেই। অথচ কি যে রোগ তা কোন ডাক্তার স্থির করতে পারলেন না, উপকার দূরের কথা।

কলকাতায় আসবার পর এইভাবে প্রায় দু'মাস কাটল।

ডাক্তারী চিকিৎসার ওপর প্রায় আস্থা হারিয়ে তখন মুরারির অভিভাবকরা সাহায্য নিতে লাগলেন দৈব ওষুধ, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতির 'অলৌকিক' শক্তির। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশী যার কাছে এসব বিষয়ে যা পরামর্শ পাওয়া গেল, সবই একে একে করে দেখা হতে লাগল। কিন্তু কোন সুফল হ'ল না কোন কিছুতেই।

তবে এখন যাঁরা অর্থাৎ সাধু-সন্ন্যাসীরা দেখলেন, তাঁদের কেউ কেউ জানালেন যে, এ কোন সাধারণ রোগ নয়। শারীরিক কোন কারণে এ ব্যাধির আক্রমণ হয় নি। কেউ কোন আভিচারিক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা করে রোগীর এই অবস্থা ঘটিয়েছে। সাধারণ তুক-তাক নয়। কোন সাংঘাতিক মারণ ক্রিয়ার ফলে এ দেহ নষ্ট হতে চলেছে।

কিন্তু এ অপশক্তির নিরাকরণ এ পর্যন্ত সম্ভব হ'ল না কারো পক্ষে। রোগ-যন্ত্রণার কোন উপশম দেখা গেল না।

আরো দু'সপ্তা গেল।

এর মধ্যে মুরারিমোহনের ফিরে আসা এবং অসুস্থতার কথা শুনে অনেকেই দেখে গেছেন বাড়ীতে এসে। সঙ্গীত-জগতের সুহৃদ বা গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ীরা। পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, নাটোর-রাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ সঙ্গীতক্ষেত্রের অনেকেই। এমন সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীকে এই বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে দেখে সকলে গভীর দুঃখ পেয়েছেন, নিরাময় কামনা করেছেন। কিন্তু সমস্ত মঙ্গল ইচ্ছা সত্ত্বেও বাঁচবার আশা আর করা যায় না রোগীর।

এমন সময় কলকাতাতেই একজন তথাকথিত 'অলৌকিক' শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেল এবং তাঁকে মুরারির ঘরে নিয়ে আসা হ'ল।

ব্যক্তিটি অবাঙালী, হিন্দুস্থানী। অতি সাধারণ আকৃতি, এবং বহির্লক্ষণে সাধু-সন্ন্যাসী কিছুই নন। এমনকি উপার্জনশীল, গৃহস্থ মানুষ রূপেই টালিগঞ্জ অঞ্চলে জীবন যাপন করেন। বিহার প্রদেশের চৌধুরী শ্রেণীর লোক। তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক গাড়োয়ান এবং গরুর গাড়ি। তাই অর্থকরী পেশা। জীবনযাত্রাও আর পাঁচজন হিন্দুস্থানীর মতন নিতান্ত আটপৌরে।

কিন্তু তিনি যে একজন প্রচ্ছন্ন যোগী, তা বোঝা যায় তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে।

(বাহ্য অবয়ব দেখে যোগশক্তির সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না এমন অনেক যোগীর পরিচয় পূজনীয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা তান্ত্রিক ও অবধূতের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা তাঁর রচনাবলী থেকে অনেক দৃষ্টান্ত পেতে পারেন।)

মুরারির ঘরে প্রবেশ করে তিনি দরজার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। অদূরে খাটে মুরারীর শয্যা। কিন্তু সেখানে রোগীর কাছে গেলেন না। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মুরারীর মুখের দিকে।

আর তাঁর দিকে দেখতে লাগলেন মোহিনীমোহন প্রভৃতি। পরনে আধময়লা কাপড়, গায়ে আধময়লা শার্ট, তার আস্তিন ঢলঢলে খোলা। মুখে-চোখেও অসাধারণত্বের কোন চিহ্ন ফুটে নেই। তাঁকে দেখে কারুরই মনে আশা জাগবার নয়।

কতক্ষণ অচঞ্চলভাবে এবং এক লক্ষ্যে রোগীর দিকে চেয়ে থাকবার পর তিনি মৌন ভঙ্গ করলেন।

মুরারিকে তাঁর কাছে উঠে আসবার জন্যে হাতের ইসারা করে ডাকলেন—আও, বেটা আও।

তাঁর কথা শুনে বাড়ীর সকলে অবাক হলেন। যে এতদিন যাবৎ শয্যাশায়ী, বিছানায় উঠে বসবার যার ক্ষমতা নেই, ইনি তাকে বলছেন হেঁটে তাঁর কাছে যেতে।

তিনি এক পাও না এগিয়ে সেই দরজার পাশ থেকে মুরারিকে ডাক দিলেন—আও, বেটা আও।

যন্ত্রণার সময় ছাড়া অন্য সময়ে রোগীর যেমন নিঝুম অবস্থা দেখা যেত, এতক্ষণ তাই ছিল। কিন্তু এই আহ্বান শোনবার পর—মোহিনীমোহন ও বাড়ীর অন্যান্যদের দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না—মুরারি আস্তে আস্তে উঠে বসল; শুধু তাই নয়, দাঁড়াল মেঝের পা দিয়ে।

তিনি তার চোখে চোখ রেখে হাতের ইঙ্গিতে আবার ডাকলেন—উধার সে ঘুমকে আও।

শুধু আসা নয়, খাট ঘুরে তাঁর দিকে আসতে হবে। তিনি সেইভাবে ইঙ্গিত করলেন আসতে। সকলে যার-পর-নেই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন—মুরারি টলতে টলতে পা ফেলে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

তিনি এক হাতের তালুতে কি একটা বস্তু অন্য হাতে দলাই ক'রে মুরারিকে দিয়ে বললেন—খা লে।

মুরারি সেটি খেয়ে নেবার পর তাকে বললেন—অব্ শো যাও।

আবার সেইভাবে পায়ে পায়ে এসে রোগী বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তিনি যাবার আগে রোগের পূর্ববৃত্তান্ত সম্পর্কে মোহিনী-মোহনকে জানালেন যে—এই ব্যাধি আরম্ভ হয়েছে বাংলা দেশের বাইরে কোন জায়গায়। সেখানে একদিন নিমন্ত্রণ ভোজনের পরেই এই রোগের উৎপত্তি, ইত্যাদি।

তিনি একটু পরে চলে গেলেন। এদিকে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল রোগীর।

এতদিন পরে এই প্রথম জ্বর ছাড়ল। মুরারির মুখ-চোখের চেহারায় চলে গেল সেই নিরক্ত পাণ্ডুরতা। তার বদলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফিরে আসতে লাগল। দু' একদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, তার শরীরে অনেকটা জোর এসেছে, খাট থেকে নেমে এঘর-ওঘর যাতায়াত করতে পারছে আর পেটের সেই অসহ্য যন্ত্রণাটা একেবারে নেই। এতদিনের রোগমুক্তির নিশ্চিত লক্ষণ!

সব বিষয়েই ভাল বোধ করছে মুরারি। নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে। কথা বলতে আর কষ্ট হচ্ছে না—স্বর সহজ ও স্বাভাবিক। মনের প্রফুল্লতা অনেকখানি ফিরে এসেছে। তাকে দেখে বাড়ীর সকলের আনন্দের সীমা নেই। দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষ হ'ল এতদিনে।

শরীরের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়ে এক সপ্তা কাটল।

কিন্তু হঠাৎ তার পরের দিন থেকে আবার বিপরীত পরিবর্তন। জ্বর আর সেই যন্ত্রণা আবার আরম্ভ হ'ল। জীবনের লাবণ্য মিলিয়ে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ-চোখ। দুর্বল নিস্তেজ শরীর। খাট থেকে নামবার আর শক্তি নেই। গলার স্বর আবার সেই অসুস্থ অবস্থার মতন অতি ক্ষীণ, সানুনাসিক হয়ে এল।

ঠিক যত দ্রুত এক সপ্তা আগে উন্নতি দেখা গিয়েছিল, প্রায় তেমনি অবনতি দেখা যেতে লাগল এখন। বাড়ীর সকলের মন হাহাকার করে উঠল। কি হ'ল আবার!

মনোজমোহন টালিগঞ্জে তাঁর ডেরায় গিয়ে ভাইয়ের এই খারাপ অবস্থার কথা তাঁকে জানালেন। তিনি শুনে খানিক চিন্তা করে বললেন যে যজ্ঞ করতে হবে।

সেজন্যে কয়েকটি জিনিষ আনতে বললেন। যজ্ঞের সেসব সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে আসা হ'ল তাঁর কাছে। তিনি তাঁর ক্রিয়াদি আরম্ভ করলেন।

কিন্তু এদিকে রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলল। কোন দিকেই ভাল নয়।

পরের দিন তাঁকে জানাবার জন্যে মনোজমোহন তাঁর এক মাতুলকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন টালিগঞ্জে।

তিনি তখনো যজ্ঞ করছিলেন। সামনে শিখান্বিত অগ্নিকুণ্ড। এঁরা দু'জন গিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবামাত্র তিনি ধুনি থেকে একটা জলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করতে উঠলেন।

প্রাথমিক বিমূঢ় ভাব কেটে যেতেই তাঁরা দু'জন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলেন আত্মরক্ষার জন্যে।

তিনি খানিক দূর পর্যন্ত সেই জলন্ত কাঠ হাতে তাঁদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে এলেন। তাঁর মুখে এই রকম আর্তস্বর শোনা যেতে লাগল—তোম্ লোগোঁকো ওয়াস্তে মেরা জান্ চলা যায়গা! উও লোগ হাম্ সে আউর বড়া গুণী হ্যায়।

এঁরা দু'জনে প্রাণপণ দৌড়ে তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেলেন এবং বাড়ী ফিরে এলেন।

কি থেকে কি হ'ল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তখনই ধারণা করতে পারেন নি। হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর এই আকস্মিক ভাব-বৈপরীত্য দেখে! যাঁর কাল পর্যন্ত অন্যরূপ দেখা গেছে, হঠাৎ আজ এ কি হ'ল তাঁর? তিনিই এতবড় উপকার করেছিলেন, অথচ আজ এই মারমূর্তি! দুর্বোধ্য। শুধু একটা জিনিষ বোঝা গেল যে তাঁর কাছে আর যাওয়া চলবে না।

তা হ'লে মুরারির কি হবে? আর কোন দিকে আশা করবার মতন কিছু নেই। এই ক'দিন আগে তার নিরোগ হবার সময়ে ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য একবার দেখেছিলেন এবং বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন তার অভাবিত উন্নতি দেখে। কিন্তু এখন তাঁরও আর বিশেষ ভরসা দেবার চিকিৎসা নেই।

এদিকে পরের দিন টালিগঞ্জ থেকে কয়েকজন হিন্দুস্থানী এসে আর এক অবিশ্বাস্য বিবরণ দিলে মুরারির অভি-ভাবকদের। গতকাল—মনোজমোহন ও তাঁর মাতুল সেখান থেকে চলে আসবার কয়েক ঘণ্টা পরে—তিনি রক্ত বমন করতে করতে মৃত্যুমুখে পড়েছেন! মৃত্যুর আগে দারুণ বেদনায় কষ্ট পেয়েছিলেন এবং কাতর কণ্ঠে তাঁকে

শুধু বলতে শোনা যায়—হামারা জান লে লিয়া। উও গুণী হাম্‌কো মার ডালা!···

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাবার মতন সংবাদ! রীতিমত সুস্থ সমর্থ সে মানুষ যজ্ঞ করছিলেন রোগীর আরোগ্য কামনায়, তাঁর অকস্মাৎ এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত বমন করে মৃত্যু ঘটে গেল!

ওদিকের সমস্ত আশাই এখন নিঃশেষ!

তারপর রোগীর অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটতে লাগল পাঁচ-ছ'দিন ধরে। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় সেদিন সকালবেলা প্রতিবেশী রাজা রায় মশায় তাঁর গুরুদেবকে নিয়ে এলেন মুরারিকে একবার দেখাবার জন্যে। মোহিনীমোহনকে তিনি বলে রাখলেন যে যদি গুরুদেব মুরারিকে দেখবার পর এ সম্পর্কে কোন কথা না বলেন, তা হ'লে বুঝতে হবে অবস্থা ভাল নয় এবং তাঁকে যেন তখন কিছু জিজ্ঞাসা করা বা বলা না হয়।

রায় মশায়ের গুরুদেব যখন ঘরে এলেন, মুরারি তখন যন্ত্রণায় কাতর। তিনি খানিকক্ষণ রোগীর দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর হয়ে রইলেন।

তারপর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে মুরারির গলা বুক পেটের ওপর দিয়ে পা বুলিয়ে দিলেন। এইভাবে পা দিয়ে স্পর্শ করবার পর চলে গেলেন তিনি।

আর মুরারির সেই বিষম যন্ত্রণাটা একেবারে কমে গেল। তিনি বেশ আরাম বোধ করতে লাগলেন তখন থেকে। কথাবার্তা আবার সহজ হয়ে এল। এই ক'দিনের বেদনা দুর্ভোগের পরে একটা শান্তির ভাব এল তাঁর মনে-প্রাণে। এটা সকলেই লক্ষ্য করলেন। রোগীর outlook ভরসা করবার মতন দেখাচ্ছে।

তবে, সপ্তাখানেক আগে রোগ যেমন একেবারে নিরাময় হয়েছিল, আজকের অবস্থাটা ঠিক তা নয়। রোগ-মুক্তি হয় নি, শরীরে জোর আসে নি কিংবা দুর্বলতাও যায় নি, কিন্তু রোগী এমন শান্তি আর আরাম বোধ করছেন যা এই শেষের ক'দিন আদৌ ছিল না। তাই বাড়ীতে আবার আশা জাগল—মুরারির ভাল হয়ে ওঠবার একান্ত আশা।

কিন্তু মায়ের কি একটা কথার উত্তরে তখনি মুরারি বললেন—আমি ত আজ চলে যাচ্ছি।

কথা শুনে সকলে শিউরে উঠলেন। —ছি, এমন অলক্ষণে কথা মুখে আনতে নেই। আর কখনও ব'লো না। তুমি ত অনেক ভাল আছ এখন।

সত্যিই রায় মশায়ের গুরুদেবের পা দিয়ে স্পর্শ করবার পর থেকে মুরারিকে দেখে ভাল হবার আশাই জাগে। তাই অবিশ্বাস্য মনে হয় ওই সাংঘাতিক কথা।

কিন্তু তখন থেকে মুরারির মুখ থেকে অনেক বারই সেদিন শোনা যায়—আমি আজ রাত্তিরে চলে যাব।

কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন সুহৃদদের নাম ক'রে বলতে লাগলেন সকলকে নিয়ে আসবার জন্যে, তাঁদের দেখতে ইচ্ছে করছে।

এমন সুস্থ কথাবার্তার ধরন এবং জর্জর দেহেও যতখানি সম্ভব এমন প্রাণবন্ত ভাব যে তাঁর কথা বাড়ীর কারুরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। আরোগ্যের আশা করছিলেন সকলেই। তবু মুরারির কথা মতন সকলকে খবর দিয়ে আনা হ'তে লাগল দেখা করাবার জন্যে।

দুপুর গেল, বিকাল গেল।

গানের কথাও মনের মধ্যে বেশ ছিল—এবার গান শেখা বিশেষ কিছু হ'ল না। পরের বার আবার যখন আসব, খুব ভাল ক'রে গান শিখব। গান শিখতে আবার আসব।

এ সব কথা যাঁরা শোনেন, চোখ সজল হয়ে ওঠে। কিন্তু মুরারিকে দেখে বিশ্বাস করতে কিছুতেই মন চায় না। কেন এ জীবনে গান কিছু হবে না? জীবনের এখনও অনেক বাকি। সেরে উঠবে। আবার গান গাইবে।

সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি এল। যাদের নাম করে করে দেখা করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন, দেখা হল সকলেরই সঙ্গে।

রাত তখন প্রায় ন'টা। দাদাকে আবার মনে পড়ল।

—দাদা কোথায়? দাদাকে একবার ডেকে আন। একটা কথা বলা হয় নি।

মুরারির শরীর সেদিন দুপুরে অনেক ভাল দেখে মনোজমোহনের বন্ধুরা তাঁকে ফুটবল ম্যাচ খেলতে নিয়ে যান। খেলা জিতে এসে ক্লাবে বসে বাড়ীতে আসার কথা মনে হচ্ছিল, এমন সময় বাড়ী থেকে লোক গেল ডাকতে।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতে মুরারি বললেন—দাদা, কাশীতে তোমার যেখানে সম্বন্ধ করেছি, সেই মেয়েটিকে বিয়ে করবে ত?

—সে সব কথা নিয়ে তুই এখন ভাবছিস কেন? সে পরে দেখা যাবে।

—না। আমায় এখন কথা দাও।

—এখন কথা দেবার কি হয়েছে? সে পরে দেখা যাবে।

ছেলেমানুষের মতন জেদ করতে লাগলেন—না, না।

এখনি আমায় কথা দাও। একটু পরেই আমি চলে যাব। কথা দাও, ওখানে বিয়ে করবে।

—কি পাগলের মতন বলছিস। তুই ঠিক সেরে উঠবি। ওসব কথা পরে হবে।

—তুমি আমায় এখন কথা দাও।

—আচ্ছা, কথা দিচ্ছি।

এই রকম কথাবার্তার পর আরও কিছুক্ষণ গেল। তারপর মুরারি মাকে ডেকে দিতে বললেন।

—মা, একটু জল দাও।

মায়ের হাতে জল খাওয়ার পর মুহূর্তেই সব শেষ! জলটুকু খাওয়ার জন্যেই যেন প্রাণটি ছিল!

মৃত্যুর অনেকদিন পরে দুর্ঘটনার রহস্য অনেকখানি ভেদ হয়েছিল নানাসূত্রে পাওয়া বিবরণে।

মুরারির অভিভাবকরা জানতে পেরেছিলেন, সব নষ্টের মূলে কাশীর সেই ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গীত শিক্ষকটি। ছাত্রীদের মুরারিমোহনের কাছে শিক্ষায় আগ্রহ ও শ্রদ্ধার ভাব দেখে আক্রোশের বশে সেই নিমন্ত্রণের রাত্রিতে অলক্ষ্যে শত্রুতা সাধনের ব্যবস্থা করে। সম্ভবত কোন আভিচারিক ক্রিয়াসিদ্ধ ব্যক্তির সাহায্য সে নিয়েছিল।

কিন্তু একথা জানতে পারা যায় নি—মুরারির ব্যাধির উপশম যিনি করতে সমর্থ হন, তাঁর শোচনীয় ও আকস্মিক মৃত্যু কি প্রক্রিয়ায় ঘটালে কাশীর সেই দুষ্কৃতিকারিরা।

জানতে পারা যায় নি বলেই যে ব্যাপারটি ঘটে নি ত তা নয়। জীবন ও জগতের সব কথা কি এ পর্যন্ত জ্ঞাত হয়েছে?

হ্যামলেটের সেই বহুল-প্রচারিত উক্তিটি তাই আজ একটি দিক্‌দর্শনী হয়ে আছে—

There are more things in heaven an
earth, Horatic
Than are dreamt of in your philosophy.

তবে বিজ্ঞানী মানুষের অনুসন্ধান ও আবিষ্কা প্রতিভাও নব নব জয়যাত্রার পথে এত এগিয়ে চলে যে, ভবিষ্যতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের পার্থক্য কি পরিমা থাকবে, কেউ বলতে পারে না। বিচিত্র-প্রতিভ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের Tele-theraphy যদি সম্ভব হ থাকে, Tele-killing কেন নয়?···

পরে, মুরারিমোহনের সঙ্গীত-জীবনের স্মৃতিকে বাঁচি রাখবার জন্তে সচেষ্ট হলেন তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধ ও গুণমুগ্ধেরা।

সঙ্গীতপ্রেমী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতা মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন ও মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত প্রতি যোগিতার বার্ষিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ল। আর কয়েকজ মাত্রের মনের পটে আঁকা রইল তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিচি সঙ্গীত-জীবন ও বিচিত্রতর মৃত্যু!

[সমাপ্ত]

'কিরণদা'র স্মৃতি

শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়

সেদিন আর এদিন। সে-যুগের সঙ্গে এ-যুগের কত তফাৎ। সেটা ছিল সকলকে আড়াল দিয়ে সকলের জন্য কাজ করার সময়,—এটা সকলের মধ্য থেকে সকলের জন্য কাজ করার সুযোগ। কর্মের দেবতা সেদিন চলতেন নিঃশব্দে, আজ চলেছেন সদর্পে পা ফেলে। এটা প্রচারের যুগ। কিন্তু, কর্মের প্রচারকে ছাপিয়ে আত্মপ্রচার যখন মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন সত্য-সত্যই বিস্মিত হতে হয়,—অনেক সময়, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে।

শিয়ালদহ থেকে শ্যামবাজারের দিকে আসতে 'টাওয়ার হোটেলটা'কে বাঁদিকে রেখে দু-একখানা বাড়ী পার হয়েই 'সরস্বতী প্রেস'। হ্যাঁ, ঐ বাড়ীটা। ওপর তলার পশ্চিম-দিকে কোনের ঘরটা। ঐ ঘরে থাকতেন তখন 'কিরণদা'—অগ্নিযুগের বিপ্লবী চিন্তানায়ক এবং কর্মনায়ক শ্রী কিরণ মুখোপাধ্যায়। এক হাতে কাজ করতেন, অপর হাতটির অগ্রভাগ দেশপ্রেমের উগ্রচাপে একদিন ছিঁড়ে গিয়েছিল। মাথায় ছোট এবং বছরে ছোট মানুষটির হাতে থাকত একটি মোটা বেতের ছড়ি। যাঁরা তাঁর কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের অনেকের পিঠেই ঐ ছড়িটির কঠিন-কোমল আশীর্বাদের ছাপ পড়েছে।

মনে পড়ে, সেদিনের কথা। ইংরাজ তখনও আমাদের প্রভু। একদিন গিয়েছি 'কিরণদা'র কাছে। তিনি তখন দৈনিক কাগজটার পাতায় মগ্ন হয়ে আছেন। ঘরে ঢুকে চুপ করে একপাশে বসলাম। কয়েক মিনিট পরে খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন—'কি ব্যাপার?' বললাম—'একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। অর্থাৎ, আপনার জীবনের ইতিহাস জানতে চাই।' কিরণদা'র চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তিরস্কারের দণ্ড বয়ে নিয়ে এল সেই বেতের ছড়িটা আমার পিঠের ওপর। গম্ভীর স্বরে বললেন কিরণদা—'ঐ ধরনের প্রস্তাব আমার কাছে উপস্থিত করার আগে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। আমাদের কোন ইতিহাস নেই। যে-কাজটুকু জীবনে করেছি তা কিছুই নয়। এ-দেশ কতখানি চায় আমাদের কাছে তা জান? দেশ-মাতৃকার চরণে আমরা প্রত্যেকে বলি-প্রদত্ত। পূর্ণ বলিদান যতদিন আমার না হচ্ছে ততদিন এই জীবনের কোন সার্থকতা আমি খুঁজে পাই না।' তর্ক করার সাহস হ'ল না। আবহাওয়াটা হাল্কা করার জন্য অন্য কথার অবতারণা করতে গেলাম। কিরণদা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন—'বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে, আর কোন কথা শুনতে চাই না।' অগত্যা, সেদিনের মত পশ্চাদপসরণ।

প্রজা সাধারণ যাতে অশান্ত হয়ে না পড়ে তার জন্য ইংরাজ সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ছিল চারিদিকে। তার একটা বিশেষ দিক—স্বাধীনচেতা লেখকদের লেখা, বিভিন্ন রচনা ও বই বাজেয়াপ্ত করে রাখা। ঐ ধরনের বই কেমন করে আয়ত্ত করা যায় তারই চেষ্টায় কোন সূত্রে জানতে পারলাম যে আমাদের 'কিরণদা'ই একমাত্র অগতির গতি। কাজেই, একদিন আবার তাঁর শরণাপন্ন হলাম। উদ্দেশ্যটা সহজ-ভাবেই ব্যক্ত করলাম। কিরণদা কি একটু চিন্তা করলেন এবং বললেন—'ঠিক আছে। টাকা রেখে যাও। তবে, সাবধান, তৃতীয় ব্যক্তি যেন না জানে। মাসখানেক পরে এস।'

এক মাস অতিবাহিত হ'ল। গেলাম কিরণদা'র কাছে। বললেন—'এখনও কিছু করতে পারিনি। আরও দেরি হবে।' সেদিন ফিরে এলাম। শুধু সেদিন কেন? আরও কয়েকবার গেলাম এবং ফিরলাম। শুনে এলাম একই কথা—'আরও দেরি হবে।'

সেবার রাঁচী বেড়াতে গিয়ে দেখা করলাম অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবীনেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কথায়-কথায় বললাম—'আপনার লেখা 'ভারতে সমর সঙ্কট' বইখানার এক কপি আমার চাই।' যাদুবাবু হাসতে হাসতে

বললেন—'এক কপি কেন, একখানা ছেঁড়া পাতাও আমার কাছে নেই। সরকার বাহাদুর সেগুলি সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছেন। তুমি এক কাজ করতে পার—তুমি 'কিরণদা'র কাছে খোঁজ কর। পেলে ওর কাছেই পাবে।' বললাম—'হ্যাঁ, তাঁকে বলেছি। তিনিও চেষ্টা করবেন বলেছেন।' যাদুবাবু আশা দিয়ে বললেন—'তা হ'লে, পাবে।'

রাঁচী থেকে ফিরে গেলাম 'কিরণদা'র কাছে। আমাকে দেখেই 'কিরণদা' রাগে জ্বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই বেতের ছড়িটা পিঠের ওপর এসে পড়ল। কারণ জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ কোথায়? ব্যাপারটা 'কিরণদা'ই উদ্ঘাটন করলেন—'আমি যে তোমাকে বই যোগাড় করে দেব বলেছি, সে কথা তুমি 'যাদু'কে বলেছ কেন?' বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কি করে 'কিরণদা' এ-কথা জানতে পারলেন আজও তার কোন কিনারা দেখতে পাই নি। শেষ পর্যন্ত, আমার দেওয়া সেই দশটাকার নোট আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন কিরণদা, আর, বললেন—'এই নাও তোমার টাকা, বেরিয়ে যাও, অপদার্থ কোথাকার। দেশের কাজ তোমরা ক'রো না। তাতে দেশের ক্ষতি হবে। একটুখানি কাজ যদি তোমরা কর, তা ঢাক পিটিয়ে জাহির না করলে তোমাদের ঘুম হবে না। যাও, বেরিয়ে যাও। তোমাদের মুখ দর্শন করা পাপ।' কতখানি হতাশা, ক্ষোভ এবং লজ্জা নিয়ে সেদিন 'কিরণদা'র ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম তা বর্ণনার ভাষা নেই।

তারপর, কোন্ মুখে আর কিরণদার কাছে যাই! ঐ পথ দিয়ে কতদিন গিয়েছি। সরস্বতী প্রেসের সামনে দিয়ে মাথা নীচু করে হেঁটেছি।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব-দিকের বিখ্যাত 'সরবৎ'-এর দোকানটা। গ্রীষ্মের দিনে কলেজ ভেঙে ছেলেরা এসে ভিড় করে। সেদিন কেন জানি না, বদখেয়াল চাপল ঘাড়ে। ঢুকে পড়লাম ঐ দোকানটায় মৌজ করে আলাপ করছি কোল্ড-ড্রিংকের সঙ্গে। ঘর্মাক্ত দেহটা কিছুটা শান্ত হয়েছে। হঠাৎ নজর পড়ল—কিরণদা দোকানের সমুখের ফুটপাথ দিয়ে চলে গেলেন। এবং যাবার পথে নিক্ষেপ করলেন একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দোকানের মধ্যে। কি সর্বনাশ! আমাকে দেখতে পেলেন না কি। কি একটা অজানিত আশঙ্কায় সারা দেহে রোমাঞ্চ লাগল। দেহটা আবার ঘেমে উঠল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলাম। ফুটপাথে পা বাড়াতেই দেখতে পেলাম অদূরে দাঁড়িয়ে 'কিরণদা'। ছোট্ট হুকুম—'শুনে যাও' এগিয়ে গেলাম। ধারাল কয়েকটি কথা মাথা নীচু করে শুনে গেলাম—'লজ্জা করে না। গরীব দেশের ছেলের অত সরবৎ-এর লোভ কেন? ছ' আনা কিংবা আট আনা দিয়ে একটা মানুষের এক-বেলার অন্ন হয়। কাছাকাছি কোথাও এক গ্লাস জল জোটাতে পার নি। যে-দেশে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে থাকে, সেই দেশের ছেলের আবার সরবতী মেজাজ কিসের? যাও, তোমরা মানুষ বলে পরিচয় দিও না।' বলতে দ্বিধা নেই, সেদিন ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম যতখানি, লজ্জা পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী। বাড়ীতে ফিরে এসে সেদিন সারারাত্রি অনিদ্রায় কেটেছিল। সত্যই উপলব্ধি করেছিলাম সেদিন কিরণদার কথার তাৎপর্য। বুঝেছিলাম গরীব দেশের মানুষ আমরা। বাদশাহী খানা-পিনা আমাদের সাজে না।

লজ্জার ভারে সেদিন এতখানি নুয়ে পড়েছিলাম যে পথে-ঘাটে কিরণদাকে দেখলে নিজেকে আড়াল করে রাখতাম। ভাবতাম—এ মুখ সত্যই কিরণদা আর দেখবেন না।

কিন্তু, অদৃষ্টের পরিহাস এমনই যে, একদিন আবার বাঘের মুখে পড়লাম। শরীরটা সেদিন জ্বরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ দিয়ে ধীর পদক্ষেপে চলেছি। হঠাৎ সামনে কিরণদা। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল—'কি খবর, দেশের কাজ করা বন্ধ করেছ ত?' কোন উত্তর দিলাম না। বরং, দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললাম। বললাম 'আজ দু-দিন জ্বরে ভুগছি, দাদা। জ্বর ছাড়ছে না।' কিরণদা যেন শিউরে উঠলেন—'সে কি? তবে এ রকম ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? যাও, বাড়ী যাও। চুপচাপ সাতদিন পূর্ণ বিশ্রাম নাও।' কি একটু চিন্তা করে আবার বললেন—'এস, আমার সঙ্গে।' এগিয়ে চললাম। শেষ পর্যন্ত এক টাকার কমলালেবু কিনে দিয়ে আমাকে ট্রামে তুলে দিলেন। আশ্চর্য লাগল। পাষাণের বুকে ঝর্ণা দেখলে কে না আশ্চর্য হয়!

আজ কিরণদা নেই। দেশের জনতা কিরণদাকে

চেনে না। স্বদেশী যুগে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন জেলে গেলেন তখন পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব যিনি নিলেন সেই কিরণদা আজ প্রায় বিস্মৃত। শুধু সম্পাদনা নয়, প্রকাশনা এবং প্রয়োজনবোধে হকারের কাজের দায়িত্বও কিরণদাকে বহন করতে হয়েছে। যুগান্তর পত্রিকার জনাদর তখন এত প্রসারিত যে, একদিন ঐ কাগজের একখানি একশত টাকায় বিক্রি হ'ল। এবং, আমাদের কিরণদা ছিলেন সেদিনের 'হকার'। যুগান্তরের বাছা বাছা লেখা সংগ্রহ করে 'পন্থা' প্রকাশিত হয়েছিল। এই পন্থা প্রকাশের জন্য কিরণদার দু'বছর জেল হয়। আজ সেই কিরণদাকে আমরা ভুলতে বসেছি।

কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি, স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন নুতন যুগের মানুষ কিরণদাকে চিনবেই। এই নির্ভীক স্বাধীনচেতা মানুষটি হারিয়ে যাবার নয়। মেঘের আড়ালে থেকে সূর্যের মত দীপ্তি নিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষে যাঁরা রাত্রির তপস্যা করে গেলেন তাঁদের সেই সাধনার ফল স্বাধীন ভারতবর্ষের আজকের দিনের এই আলোটুকু। একথা যদি আমরা মনে রাখি তা হ'লে নিশ্চয়ই কিরণদাকে আমরা হারাব না।

আজ যখন দেখি রাম-শ্যাম-যদু-মধুর দল নিজেদের এক একজন বিশ্বকর্ম্মা বলে জাহির করেন তখন ভাবি, কিরণদা এদের দেখলে কি বলতেন! হয়ত বা আত্মহত্যা করতেন।

কেবল ত্যাগ দ্বারা অন্তরটাকে খালি করিলে জন্ম ও জীবন সার্থক হয় না; ত্যাগে আত্মার যে স্থান শূন্য হইল, জ্ঞান ভক্তি ও সেবার ইচ্ছা দ্বারা তাহাকে পূর্ণ করিতে পারিলে তবে মানবকুলের বন্দনীয় হওয়া যায়।

প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৮

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

প্রভাস সেনের সঙ্গে লোনাভ্‌লায়

প্রভাস সেন শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র! আমার কিছুকাল পরেকার ছাত্র। সুতরাং বয়ঃকনিষ্ঠ! সে দেরাদুনের কাছে রাজপুরে 'মানব ভারতী' আশ্রমে যখন কাজ করত তখন তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। পরে সে বম্বেতে চলে যায়। সে একদিন বলল যে বড়দিনের ছুটির ঠিক পরেই লোনাভ্‌লায় যাবে। তার দাদা আছেন সেখানে। তার দাদা-বৌদি আর তাঁদের দু'টি মেয়ে কৃষ্ণা ও সবিতা। প্রভাসের বাবা-মা, পিসতুতো ভাই প্রীতি সেন সবাই জড় হয়েছেন লোনাভ্‌লায়। আমিও প্রভাসের সঙ্গ নিলাম। প্রভাসের সঙ্গেই রওনা দিলাম 'ডেকান কুইনে'। 'ডেকান কুইন' একেবারে বিলেতের ট্রেণের মত। জোরে চলে, ট্রেণ চলবার সময়ও সমস্ত ট্রেণ ঘুরে বেড়ানো যায়—একেবারে সবই বিলিতি—কেবল লোকগুলোর গায়ের রংই যা একটু কালো!

লোনাভ্‌লায় দিন দশেক কাটল বেশ আনন্দে। ছুটি বলা যাকে বলে, খুব খাওয়া, খুব বেড়ানো। প্রীতিবাবু বেশ মজার লোক! দিলদরিয়া, পথে-ঘাটে লোকেদের সঙ্গে আলাপ করলেন নির্বিবাদে। যে কোন লোকের দিকে তাকিয়ে অকারণে হেসে কথা কন, ছেলেপিলেদের সঙ্গে কখনও হৈ চৈ করে খেলায় মাতেন। অথচ কোথায় যেন একটু বেসুর বাজে। ভদ্রলোক বিয়ে করেন নি কেন? এমনি করে হেসে-খেলে ঘুরবার কারণ আছে একটা কিছু সন্দেহ নাই। আছে বৈ কি! বুঝতে পেরেছিলাম ক্রমে ক্রমে; কিন্তু থাক্ সে নিঃসঙ্গ আমুদে লোকের মনের গোপনতম ব্যথার কথা!

চিন্তাশীল

একদিন কার্‌লা কেভ দেখে আসা গেল। বেশ উঁচু দরের মূর্তিগুলো সেখানকার। কয়েকটা দেবমূর্তি ও একটি হাতীর গড়ন উৎকৃষ্ট। পাহাড় ভেঙে গুহা দেখা সার্থক হ'ল। সঙ্গে কিছু খাবার ও ফল ছিল, সেগুলি বসে খাওয়া গেল। আরেক দিন যাওয়া গেল খান্দালায়, একদিন ভাঁটগাঁও। জ্যোৎস্না রাতে পূর্ণিমার দিন খুব গান গাওয়া ও বাঁশী বাজানো চলত। পুণা-বম্বে রাস্তায় রাত্রিবেলায়

ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগত ! একদিন কৈবল্য ধামে গেলাম। সেখানে সাধুদের একটি আশ্রম আছে। যোগ অভ্যাস ও শরীর চর্চার ব্যাপার। বাবাজী না কি রোগও সারান। লাইব্রেরীতে অনেক পুঁথি ও বইও আছে। হ্যাভলক এলিস থেকে আরম্ভ করে সব রকম শরীর-বিষয়ক বইয়ে ভরা ঘরগুলো।

আরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ, ইলোরা

লোনাভলা থেকে বম্বে ফিরে এসে গরম বোধ হতে লাগল। এবারে আমীরকে সঙ্গে নিয়ে আবার বার হলাম। আরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ হয়ে ইলোরা গেলাম। দৌলতাবাদে আমীরের এক কাকা রিটায়ার করে বাস করছেন, কাকীও আছেন। দুই বুড়ো-বুড়ীতে বেশ সুখে বাস করছেন। তাঁদের বাড়ীতে প্রায়ই অতিথিদের সমাগম হয়। চেনাশোনা যাঁরাই ইলোরা দেখতে যান, তাঁরাই তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হন। মোটর আছে তাঁদের, আমীর আমাকে সেই মোটরে কাছাকাছি সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল। দৌলতাবাদের দুর্গ কাছেই, সেখানে গিয়ে দু'দিন ছবি ও স্কেচ আঁকা গেল। তারপর, দৌলতাবাদের কাছেই একটা ছোট্ট গুহার মধ্যে সেই বিখ্যাত নৃত্যরতা মেয়েটি ও বাজিয়েদের মূর্তির গ্রুপটি দেখে এলাম একদিন। ইলোরাতে কাটালাম একদিন। ইলোরার ভাস্কর্য স্কেচ করলাম, কিন্তু মন ভরল না। ফটো তুললাম কিছু। এত ভাল ভাল মূর্তি চারিদিকে ছড়ানো যে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা আঁকি—কোন্‌টারই বা ফটো তুলি। ইলোরা বোধ করি দিনের পর দিন—অনেকদিন থাকা যায়, থাকা দরকারও শিল্পীদের পক্ষে !

বোম্বাইয়ে একক প্রদর্শনী

বোম্বাইয়ে ফিরে আসা গেল আবার। এবার প্রদর্শনীর কাজ আরম্ভ করা দরকার। দেরাদুন ফিরবার আগে প্রদর্শনী ভালমত করে, কিছু ছবি বিক্রী করে যেতে পারলে তবেই মনে করব যে কিছু হ'ল !

বাচুভাই শুক্লা বম্বে টেগোর সোসাইটির সেক্রেটারী। ওঁর কাছে গিয়েছিলাম প্রদর্শনী খুলবার আগে। কুমিল্লা ব্যাংকের ম্যানেজার ভট্টাচার্য্যি, এঁদেরই সাহায্যে নিমন্ত্রণ-পত্র, ক্যাটালগ ছাপানোর কাজ শেষ হ'ল। বিজিও হ'ল কামা ইন্‌স্টিটিউট হলে প্রদর্শনী হবে। শ্রীমতী হংস মেহতা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করবেন !

মিঃ মুছালা সাহেব ছবি ভালবাসেন। ওঁর কাছে গিয়েছিলাম প্রদর্শনী খুলবার আগে। তিনি আমাকে ছবি টাঙ্গানো বিষয় সাহায্য করলেন। প্রদর্শনী খোলা হ'ল, শ্রীমতী মেহতা বক্তৃতা দিলেন, লোকও মন্দ হ'ল না। কিন্তু ছবি প্রথম দিনে বিক্রী হ'ল মাত্র দু'তিনখানা। দ্বিতীয় দিনে লোক বেশী হল না। বাচুভাই বেগতিক দেখে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কাছে গেলেন। পরের দিন সন্ধ্যায় তিনি আসবেন কথা দিলেন। বাচুভাই শ্রীমতী নাইডুর প্রদর্শনীতে আসবার কথা কাগজে ছাপিয়ে দিলেন। লোকে ভাবল তিনি বুঝি বক্তৃতাও দেবেন। পরের দিন পাঁচটা বাজবার আগেই হল একেবারে ভরে গেল। শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে আমার আগে আলাপ ছিল। তাঁকে নিয়ে ভীড়ের মধ্যে প্রদর্শনী ঘুরিয়ে দেখানো গেল। খুব খুশী হলেন তিনি ছবি দেখে। ছবি দেখা হয়ে গেলে পর লোকে তাঁকে অস্থির করে তুলল কিছু বলবার জন্য। মিসেস্ নাইডু ত রেগে চটে অস্থির। তিনি বলতে আসেন নি। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন সবাইকে—"শুনতে পাচ্ছ না, কালা না কি তোমরা সব ? দেয়ালের এই প্রত্যেকটি ছবি নানানভাবে যে কথা বলছে তা বুঝবার বা শোনবার চোখ, কান নেই না কি তোমাদের ?"

সামনে একটি অতি স্মার্ট ছেলে বলল—'চোখ খুলে দিন আমাদের একটু।' আর যাবে কোথায় ? একেবারে ফেটেই পড়লেন যেন ! হু হু করে কথার স্রোত বইল, ঝাড়া পনের কুড়ি মিনিট বকতে গিয়ে কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করলেন যেন ! তারপর হঠাৎ থেমে বললেন, "বলতে আসি নি আমি, দেখতে এসেছি !" আমাকে দেখিয়ে বললেন—"এই শিল্পীই এখানকার প্রধান বক্তা। দেয়ালভরা তাঁর বক্তব্য ছড়িয়ে রয়েছে, কেবল চোখ খুলে দেখ, বোঝ,—বুঝবার চেষ্টা অন্ততঃ কর।" তারপর হৈ হৈ করে চলে গেলেন। ভীড়ও সেদিন আস্তে আস্তে কমে গেল। বিক্রী সেদিন কিছুই হ'ল না। কিন্তু তবু মনটা ভরে গিয়েছিল।

পরের দিন এক অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল। রোজকার মত বিকেল চারটের সময় প্রদর্শনী-হলে গিয়েছি চা খেয়ে। লোকজন দেখতে আসছে, চলে যাচ্ছে। হঠাৎ একজন

সাদা আচকানপরা ফিটফাট লোক ঘরে ঢুকলেন। একখানা ক্যাটালগ নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব। দেখবার সময় কলম দিয়ে তাঁর পছন্দমত ছবিগুলি বোধ হয় চিহ্ন দিয়ে রাখছিলেন। আমি ভদ্রলোকের রকম-সকম দেখে ভাবলাম—বোধ হয় লেখক বা খবরের কাগজের ক্রিটিক। সমালোচনা লিখবেন বোধ হয়। সব ছবি দেখা হয়ে গেলে ক্যাটালগ যিনি বিক্রী করছিলেন তাঁর কাছে এসে বললেন, 'আমার সঙ্গে একটু এস। কতকগুলি ছবি আমি কিনতে চাই, যেগুলোর উপর বিক্রী হয়ে গেছে চিহ্ন লাগিয়ে দাও।' তিনি একদিক থেকে একটি একটি করে প্রায় চল্লিশখানা ছবিতে নিজের নাম লেখালেন। আমি ব্যাপারটা দেখে খুব অবাক! ভদ্রলোক ঠাট্টা করছেন না ত? ঠিকানা দিয়ে বললেন, কালকে প্রদর্শনীর শেষ দিনে নিজে এসে ছবিগুলি নিয়ে যাবেন। টাকাও দিয়ে যাবেন।

বোম্বের প্রদর্শনীতে প্রায় সাত হাজার টাকার ছবি বিক্রী হ'ল। একক প্রদর্শনীতে তখনকার দিনে এমন বড় একটা হ'ত না। শেষ দিনে বহু লোক এসে আশ্চর্য হয়ে গেল। কেউ কেউ ত সন্দেহ করতে লাগল যে আমি বোধ হয় রসিকতা করে সব ছবিতে বিক্রীর চিহ্ন লাগিয়েছি। শেষ দিনে আরও দু'চারখানা ছবি বিক্রী হ'ল।

বোম্বের প্রদর্শনীতে যা ছবির দাম রেখেছিলাম তা' বোধ হয় সত্যিই একটু কমের দিকে। একশ' টাকা দামের ছবিই বলতে গেলে সব চেয়ে বেশী দামের ছিল। ছবিগুলো কোনটাই বাঁধানো ছিল না। পরে অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম কে লোকটি এত ছবি কিনল। লোকটি যে ব্যবসায়ী তা বুঝেছিলাম। বোম্বের এক বিখ্যাত জুয়েলার্স ও কিউরিও ডিলার, মস্ত বড় দোকান আছে তাঁদের। ছবিগুলোকে ভাল ফ্রেম করিয়ে তাঁরা শো'রুমে রাখেন, একশ' টাকার ছবি পাঁচশ' টাকায় বিক্রী করেন সুবিধামত। পরে জেনেছিলাম, ভারতীয় জাহাজ 'জল আজাদের' কেবিনে ও ঘরে আমার অনেক ছবি আছে। আমার ছবি তারা পেল কোথায়? আমার কাছ থেকে নয়—বোম্বের সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পেয়েছে তাও জেনেছিলাম।

শ্রীপুলিন দত্ত ও অন্যান্য বন্ধুগণ

প্রদর্শনীর শেষ দিনে বহু লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল অনেক দিন পর। আর্টিষ্ট পুলিন দত্ত তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে নন্দিনী এলেন। নিউ এরা স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল M. T. Vyas ও তাঁর স্ত্রী সরোজ বেহেন। অনেক বোম্বের শিল্পীদলও এসেছিলেন। সবার সঙ্গে গল্প-গুজব করে যখন বাড়ী ফিরলাম শেষ দিন, তখন শরীর মন অবসন্ন। এত ক্লান্ত যে নিজেকে অসুস্থ মনে হতে লাগল। পরের দিন ছবি তুলে ফেলে প্যাক্ করা—সেও হাঙ্গাম। বিক্রী হয়ে যাওয়া ছবি বিলি করে, বাকী ছবি বাক্সে ভরে ফিরে গেলাম

শীলা

বান্দ্রায়। সন্ধ্যার সময় আমীরের বাবা মা, ও সালিম আলীর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসেছিলাম। সমস্ত শরীর মন ক্লান্ত, ঝিম ঝিম্ করছিল যেন! এ অবসন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারব না যেন মনে হচ্ছিল। সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলের হাওয়ায় আবার ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে শরীরে যেন বল ফিরে এল। বাড়ী ফিরে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়লাম সেদিন। কী ঘুম সে রাত্তিরে! উঠলাম যখন সকালে, তখন রোদ উঠেছে বেশ!

দু'চার দিন মাত্র বাকী, বোম্বে ছেড়ে আবার চলে যাব দেরাদুন। ছুটি ফুরিয়েছে। * * *

বম্বে থেকে চলে আসবার দিন বম্বের তরুণ শিল্পীরা নিমন্ত্রণ করেছিল তাদের এক ক্লাবে চা' খেতে ও কিছু বলতে। কিছু বলেছিলাম, বড় বড় কথা অবশ্য নয়। বলেছিলাম শান্তিনিকেতনের কথা। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ত দেখলাম! বড় বড় সহর, হৈ চৈ, বড় বড় গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্টস্—সব, কিন্তু শান্তিনিকেতনের মত শিল্প-শিক্ষার পক্ষে সুন্দর ও উপযুক্ত জায়গা আর কোথাও ত দেখতে পেলাম না। আমার যদি কিছুমাত্র আঁকবার সামর্থ্য হয়ে থাকে, তবে তার জন্ম দায়ী শান্তিনিকেতনের কলাভবন, মাষ্টারমশাই (শ্রীনন্দলাল বসু), সেখানকার শিল্পী-বন্ধুরা এর শেখাবার উপযুক্ত 'অ্যাটমস্ফিয়ার'।

নির্দিষ্ট সময়ে বম্বে সেণ্ট্রাল ষ্টেসন থেকে দুন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আবার রওনা দিলাম। আমীরও আমার সঙ্গে। ষ্টেসনে তুলে দিতে এলেন বাচুভাই শুক্লা, মুছালা সাহেব ও আমীরের বাবা হাসান আলী সাহেব। তাঁর পালি হিলের বাড়ীতে ছুটিটা কেটেছিল আনন্দে। একেবারে আপন জনের মত করে সমস্ত ছুটিটা আমাকে আদরে রেখেছিলেন। আসবার সময় তাঁদের আন্তরিক ধন্তবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলাম—'খোদা হাফেজ' বলে! * * *

১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারীতে বম্বে থেকে ফিরে এসে আবার কাজে লাগা গেল। কলকাতা থেকে শ্যামলী ও মা ফিরে এসেছেন শান্তির সঙ্গে। শান্তি ওয়েলহাম স্কুলে কাজ নিয়েছিল তখন। ওয়েলহাম স্কুলেই তার কোয়ার্টার। শনিবার দুন স্কুলে আমাদের কাছে আসে, আবার রবিবার সন্ধ্যাবেলায় ফিরে যায় নিজের কোয়ার্টারে। সেবার ফেব্রুয়ারীতে অসম্ভব শীত। জানুয়ারী মাসে দুন সহরে বরফও পড়েছিল। দেরাদুনে সচরাচর বরফ পড়ে না। শীতের মধ্যে আবার বৃষ্টি। হিটার জ্বালিয়ে রাখি সারারাত। হীটার পায়ের কাছে রেখে কাজকর্ম করি। এর মধ্যে আবার আর এক ব্যাপার! আমাদের স্কুলের তখনকার 'বারসার'—তার চাকরি গেল। তার হয়েছিল 'পাওয়ার ম্যানিয়া'—তার ফলে শেষটায় পাগল হয়ে গেল! ছুটিতে সে না কি স্কুলের সমস্ত চাকর-বাকরদের ডেকে মীটিং করে বলে, চাঁদবাগের সে না কি রাজা! ফুট সাহেব তার মন্ত্রী, আর অন্তান্ত সবাই তার প্রজা! সুতরাং চাঁদবাগে যদি সুখে বাস করতে চাও, তবে তাকে সকাল-বিকেল 'কুর্নিশ' করে যেন মেনে চলে।

বারসার সাহেবের বিয়ে ঠিক হয়েছিল বেশ বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে। শরীরটা ভাল করবার জন্ত সে না কি হকিমী ওষুধ খাচ্ছিল কিছুদিন থেকেই। মাত্রাটা নাকি একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। গরম ওষুধ লোকটাকে একেবারে পাগল করে ছেড়ে দিল। বিয়ে গেল ভেঙ্গে! লোকটার চাকরিই গেল, আর কেই বা দেবে তাকে মেয়ে!

জুন : ১৯৪৫

ছেলেদের বাৎসরিক প্রদর্শনী প্রতিবারের মত এবারও মে মাসে হয়ে গেল। ছুটির আরম্ভে মুসৌরীতে সাভয় হোটেলে আমার নিজের ছবির প্রদর্শনী করব ঠিক করে ফেলেছিলাম। সুতরাং আবার হুড়মুড়িয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছিলাম। প্রদর্শনীগুলো যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একটা আসে, সেটা ফিরতে না ফিরতেই আবার আসে প্রবল জোরে,—লাগাল ধাক্'!

কয়েকটি ছেলে বেশ ভালই আঁকতে শিখেছে। তবে ছবির ধারা বদলেছে। ছেলেগুলো কেউ ভ্যান গগের ছবি দেখে সেই ধরনে আঁকে, কেউ সিজ্যাঁ বা মাঁতিস্ হতে চায়। কেউ বা পিকাসো নকল করে। সবাই বিদেশী, বিলেতী নকল করে ভাবে নতুন কিছু করছি। এই সব শিল্পীদের ষ্টাইল নকল করা কি নতুন কিছু করা? ছেলেরা যাই করুক, বেশী বারণ করে লাভ নেই। তবে ছেলেদের নেচার থেকে কাজ করাতে চেষ্টা করি কিন্তু বিলেতী মডার্নিষ্টদের নকল করা সহজ—নেচার ষ্টাডি করতে ধৈর্য চাই। তবু, এমনি করেই কাজ চলে, এমনি করেই চলবে। ভারতবর্ষ এক বিরাট অদ্ভুত দেশ এখন, খিচুড়ি সব কিছুর! না বিলেতী, না দেশী। দুন স্কুলটা আবার বড় বেশী বিলেতী ঘেঁষা। সুতরাং পিকাসো মাঁতিস নকল করায় দোষ তেমন নাই। বরং 'অজন্তা' বা 'রিভাই-ভেলিষ্টদের' পদ্ধতিতে আঁকলে দোষ! ছেলেদের দোষ দেব কি, আমার নিজের ছবির ধারা একটু বদলেছে। এবারে যেসব ছবি মুসৌরীতে নিয়ে গেলাম সেগুলি আগের তুলনায় একটু অন্ত ধাঁচের।

বেগম হামিদ আলী প্রদর্শনী খুলবেন ঠিক হয়েছিল। তিনি আমার ছবিগুলো আগে দেখতে চাইলেন। প্রথমে ওঁদের বাড়ীতেই উঠেছিলাম। ছবির বাক্স খুলে ওঁদের ছবিগুলো নগ্ন পুরুষ ও নারী দেহের। পুরাতনপন্থী বেগম সাহেবা সেগুলো দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন।

প্রদর্শনী আরম্ভ হবার একদিন আগে আমি সাভয়

শিব

দেখালাম সব ছবি। বেগম সাহেবের আপত্তি কতকগুলি ছবি দেখে। সেগুলো আলাদা করে রেখে বললেন, "এগুলো প্রদর্শনীতে রেখো না সুধীর!' —রাজী হতেই হ'ল। হোটেলে উঠে গেলাম। ছবি টাঙান হয়ে গেল। সাভয় হোটেলের প্রোপাইটরের ছেলেরা আমাদের স্কুলে পড়ে, তাদের সাহায্য পাওয়া গেল। যথাসময়ে বেগম সাহেবা

তাঁর পুরো দেশী রংএর পোশাকে এসে হাজির হলেন। হামেদ ভাইও সঙ্গে এসেছেন। লোকজন জড়ো হ'ল। বেগম সাহেবার বক্তৃতা হয়ে গেল। উনি নিজে একটা ছবি কিনলেন। নানান রকম, নানান দেশের লোকদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এইটাই এই ছিল ষ্টেসনের প্রদর্শনীতে লাভজনক ও লোভনীয় আমার কাছে। সবাই থাকে ছুটি করবার আনন্দে; সুতরাং খুব ব্যস্ততা কারুর নেই,—ছুটি কাটাতেই আসা মুসুরীতে।

প্রদর্শনী হয়ে গেল। পাত্তাড়ি গুটিয়ে ফিরে এলাম দেরাদুন। লম্বা ছুটি, অথচ বাংলা দেশ বা আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। জুলাই মাসে খুব বৃষ্টি নামল। মুসুরী থেকে ফিরে আবার ছবি আঁকায় মন দিলাম। কিন্তু জুলাই মাসের মাঝামাঝি দিল্লী থেকে চিঠি পেলাম স্যর ক্লড অকিন লেকের—তখনকার C-in-C ছিলেন তিনি। দেরাদুন এসেছিলেন কিছুদিন আগে, তখন আলাপ হয়েছিল। বেশ মূর্তি গড়বার মত মুখ। তাঁকে বলেছিলাম—যদি সীটিং দেন ত গড়ব তাঁর মুণ্ডু। উনি খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে সময় পেলেই আমায় তিনি জানাবেন। মূর্তি গড়বার আমন্ত্রণ জানিয়ে স্যর ক্লড চিঠি দিয়েছিলেন। দিল্লীতে যাওয়া ঠিক করলাম এবং সঙ্গে ছবিও নিয়ে যাওয়া যুক্তি যুক্ত মনে হ'ল। দিল্লীতে ছবির প্রদর্শনী করবার ইচ্ছে স্যর ক্লডকে লিখলাম। তিনি যেন প্রদর্শনীর ফরমাল ওপনিং করতে রাজী হন—তাও লিখলাম। তিনি রাজী হলেন বলা বাহুল্য। কুইনস্-ওয়েতে আমাদের দুন স্কুলের পুরোণো বন্ধু দাস্তার ভাই ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে অতিথি হলাম। দাস্তার ভাই দুন স্কুলে ইতিহাস পড়াতেন। আমরা একই দিনে দুন স্কুলে যোগ দেই। যুদ্ধের আরম্ভে তিনি A.R.P'র চাকরি নিয়ে দিল্লী চলে আসেন। আমার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল।

স্যর ক্লডের মূর্তি গড়া

স্যর ক্লডের মূর্তি গড়া আরম্ভ হ'ল জুলাই মাসের শেষের দিকে। বৃষ্টি হয়ে গেলেও দিল্লী তখনও বেশ গরম। কিন্তু মূর্তি গড়তে কোন অসুবিধা নেই। C-in-C'র গাড়ি এসে নির্দিষ্ট সময় বাড়ী থেকে আমাকে নিয়ে যায়। স্যর ক্লডের এয়ার-কনডিশনড্ অফিস ঘরে মূর্তি গড়ি। কোন রকম ক্লান্তি আসে না। মূর্তি গড়ে যখন বাহিরে বার হই, তখন যা একটু খারাপ লাগে।

কমাণ্ডারের বউ নেই। তাঁরই এক বিশিষ্ট বন্ধুকে বিয়ে করে চলে গেছেন। তারপর থেকে তিনি একলাই আছেন। পরে বিলেত থেকে তাঁর এক বোন এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে। স্যর ক্লডকে আমার অত্যন্ত ভদ্র বলেই মনে হয়েছিল। মূর্তি গড়া শেষ করে যখন ফিরতাম, তখন রোজই তিনি আমাকে মোটরে তুলে দিয়ে নিজে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিতেন। শিল্পীর সম্পূর্ণ ন্যায্য খাতির তিনি সবরকম ভাবে আমায় দিতেন। মূর্তিটা ঠিক চার দিনে শেষ হ'ল,—তিনি রোজ এক ঘণ্টা করে সীটিং দিতেন। তারপর দু'দিন লাগল প্লাষ্টারে ঢালাই করতে। মূর্তিটা ভালই হয়েছিল। পরে মূর্তিটা আমি ব্রোঞ্জে ঢালাই করিয়ে রাখি। আশা করেছিলাম ভবিষ্যতে মূর্তিটার একটা গতি হবে; কিন্তু স্যর ক্লড স্বরাজ হবার সময় ভারতবর্ষে খুব দুর্নাম অর্জন করেন। মুসলমান-প্রীতি তাঁর খুব বেশী পরিমাণে হয়েছিল এবং পার্টিশনের সময় কিছু গোলমাল সৃষ্টি হয়—যার জন্য আমাদের নেতারা তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নি। মূর্তিটা ন্যাশনাল ডিফেন্স এ্যাকাডেমিতে (দেরাদুন) রাখবার জন্য আমি সেখানকার কমাণ্ডারকে অনুরোধ করেছিলাম একবার। তিনি জানিয়েছিলেন যে, ও মূর্তি N.D.A.-তে রাখা সম্ভব নয়। অর্ডার আছে যে অকিন লেকের ছবি বা ফটো যদি কোথাও টাঙানো থাকে তা যেন সরিয়ে ফেলা হয়। মূর্তি রাখা ত দূরের কথা!

দিল্লীতে দ্বিতীয়বার একক প্রদর্শনী

মূর্তি গড়া শেষ হ'ল। এবার প্রদর্শনী নিয়ে পড়লাম। নিউ দিল্লীর Y.M.C.A. হলে প্রদর্শনী হবে ঠিক হয়েছিল। এই হলে আর একবার আমার একক প্রদর্শনী হয়েছিল। আমাদের দুন স্কুলেরই ছাত্র মদনজিৎ সিং আমার ছবি নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনী করেছিল। আমি যেদিন প্রদর্শনী খোলা হয় সেদিন দিল্লী গিয়েছিলাম। এবারে আমি নিজেই ছবি সাজালাম। স্যর ক্লড প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করবেন—বেশ হৈ চৈ ব্যাপার! প্রদর্শনী আরম্ভের দিন মন্দ লোক হ'ল না। প্রথম দিনেই কতকগুলি ছবি বিক্রী হয়ে গেল। স্যর ক্লড নিজে দু'খানা ছবি কিনলেন। আমেরিকান এম্বেসীর জর্জ মেরিল,—তিনিও দু'খানা ছবি

কিনেছিলেন। সবাই খুব খুশী, কেবল একটি বিদেশী সাহেবকে বেগুন পোড়ার মত মুখ করে বেড়াতে দেখলাম। লোক কমলে তিনি আমার কাছে এসে আলাপ করলেন। "মূর্তিগুলো আনলেই পারতেন প্রদর্শনীতে, ছবিগুলোর চেয়ে মূর্তিগুলোই যে ভাল!"

তাঁকে বললাম—"মূর্তি নিয়ে আসা এই যুদ্ধের বাজারে কি সোজা কথা! ছবিগুলো আনতেই বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ভবিষ্যতে যখন সুবিধে করতে পারব, তখন মূর্তিগুলোর প্রদর্শনী একবার নিশ্চয়ই করব।"

কৃষ্ণমূর্তি

ইনিই দিল্লীর এক বিখ্যাত ইংরেজী কাগজের আর্ট-রিপোর্টার। প্রদর্শনীতে আমার কতকগুলি মূর্তির ফটোগ্রাফ রাখা ছিল। তিনি সেগুলি দেখিয়ে বললেন—

ভদ্রলোক অতি অদ্ভুত ব্যবহার করলেন। শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ছিলাম জেনে তেলে-বেগুনে অবস্থা হ'ল তাঁর। তিনি শান্তিনিকেতন আর নন্দবাবুর নিন্দা আরম্ভ করলেন। আমারও বিরক্তি বোধ হতে লাগল। তাঁকে তাচ্ছিল্য করেও কয়েকটা কথা আমায় বলতে হয়েছিল। খবরের কাগজের আর্ট-ক্রিটিককে তাচ্ছিল্য করে কথা বলার পরিণাম যা হ'ল তা পরের দিনের কাগজ খুলেই বুঝতে পারলাম। আমার শিল্পী-জীবনে এই প্রথম গালাগালি খেলাম। খারাপ আঁকি বলে নয়,—শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম বলেও। রং ব্যবহার করতে না কি আমি জানি না, আমার কল্পনা-শক্তিরও অভাব, এমন কি 'ড্রাফস্‌ম্যানশিপের'ও অভাব। গালাগালির মাত্রাটা ভদ্রতার গণ্ডী ছাড়িয়েছিল এবং সে রিভিয়ু পড়ে আমার দ্বিতীয় রিপুর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, কিন্তু Sir U. N. Sen ও স্যর ক্লড ডু' জনেই আমায় বলেছিলেন —"লেট্‌ দ্য ডগ্‌ বার্ক,—তুমি চুপ করে থাক। কি হবে ঝগড়া করে!" আমি চুপ করেই ছিলাম—যদিও মনে মনে ভীষণ অস্বাচ্ছন্দ্য ও অশান্তি বোধ করছিলাম। দ্বিতীয় দিনে বেশ একটু বিমর্ষ ও লজ্জিতভাবে প্রদর্শনী-হলে গেলাম। গিয়ে দেখি হল লোকে ভরে গেছে। এত ভীড় প্রথম দিনেও হয় নি। অনেক চেনা লোকেরা আমায় এসে অভিনন্দন জানাল, প্রদর্শনী ভাল হয়েছে বলে! এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের ক্রিটিক যে কত ভুল ও ভ্রান্তির ওপর নিজের মন্তব্য খাড়া করেছে,—তাও বেশ মুরুব্বিচালে বলে গেলেন! মোট কথা, বেশ দেখা গেল, খবরের কাগজে প্রশংসা বার হলে লোকেরা যতটা খুশী হয় ও মনে রাখে—তার চেয়ে ঢের বেশী খুশী হয় ও মনে রাখে তীব্র ভাষায় নিন্দা বার হলে! যাই হোক, ক্রিটিকের বিষয় একটু খোঁজ না নিয়ে পারলাম না। যতদূর খবর নিয়ে জানলাম, লোকটা 'কন্‌টিনেন্টাল' ইহুদী। পরে শান্তিনিকেতনে মাষ্টারমশাইয়ের (নন্দলাল বসু) কাছে জেনেছিলাম যে, এই লোকটি না কি শান্তি-নিকেতনে কিছুদিন ছিলেন। সেখানে কলাভবনে উনি কয়েকটা বক্তৃতাও দেন এবং কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। কলাভবনের ছাত্ররা তাঁর বক্তৃতা থেকে উঠে চলে যায় এবং পরে সাহেবকে মানে মানে শান্তিনিকেতন থেকে চলে যেতে হয়। সেই কারণে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি সাহেবের মনে সুধা-প্রলেপ করে না। শান্তিনিকেতনের গন্ধ পেলেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন!

দিল্লীতে সেবারে সত্যিই আমার নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। দেরাদুনে ফিরে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ক্রিটিক সাহেবের আমার ছবির উপর আক্রমণের খানিকটা উত্তর সেই প্রবন্ধে ছিল। প্রবন্ধটা 'ওরিয়েন্ট' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এই সময় থেকেই মাঝে মাঝে আমি শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি। আর্ট-ক্রিটিকরা যখন অযথা আমাদের বেইজ্জতি করতে দ্বিধা করে না, তখন মাঝে মাঝে নিজেদের পরিচয় ও আমাদের যা বলবার তা নিজেদের বলাই ভাল মনে হয়েছিল। অন্যদের ওপর নির্ভর করতে যাই কেন?

Food Poison

এই সময় দুন স্কুলে এক কাণ্ড হ'ল। টাটা-হাউসের অনেক ছেলে—প্রায় জন ত্রিশেক-'ফুড পয়জন' হয়ে প্রায় মর মর! সবাই সে যাত্রায় বেঁচে গেল, কেবল একটি ছেলে মারা গেল। হৈ হৈ ব্যাপার স্কুলে! এর আগে আরও একটি ছেলে মারা গিয়েছিল—সে বহুদিন আগে। কিন্তু এই রকম 'ফুড পয়জন' হয় এই প্রথম। ছেলেটির বাবা ও আত্মীয়রা এসে ফুট সাহেবকে খুব গালাগালি করে মৃতদেহ নিয়ে গেল। সমস্ত লাঞ্ছনা তিনি মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন। যা হয়ে গেছে তা তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়, কিন্তু দায়ী করা হয়েছিল যেন তাঁকেই, যেন তাঁরই দোষ! পরে জানা গিয়েছিল যে, আইসক্রীম তৈরী হয়েছিল টিনের জমা দুধ দিয়ে। একটি টিন না কি খারাপ ছিল, তাইতেই এই কাণ্ড!

লুধিয়ানায়

১৯৪৫-এর ডিসেম্বর মাসে ছুটি আরম্ভ হবার আগেই বোধ করি লুধিয়ানা গিয়েছিলাম। সেখান থেকে নিমন্ত্রণ এসেছিল। সেখানে যে টেগোর সোসাইটি ছিল, তারাই আমায় রবীন্দ্রনাথের বিষয় বলতে এবং ছবির প্রদর্শনী করতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রথমটা বক্তৃতা দিতে হবে শুনে যাব না ঠিক করে ফেলেছিলাম। সভাতে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞ লোকের মত গল গল করে কথা বলব সে সাহস ও প্রকৃতি

আমার ছিল না। কিন্তু কিছুতেই অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। তাঁরা সব খরচ বহন করবেন বলে বার বার অনুরোধ করে লিখলেন। সুতরাং যেতেই হ'ল। ছবিও নিয়ে যেতে হ'ল। সেখানকার কলেজের হলে ছবির প্রদর্শনী হ'ল। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও শান্তিনিকেতনের বিষয় কিছু বলতে হল। 'ফাল্গুনী' অভিনয় করেছিল

সাঁওতাল দম্পতি

উর্দুতে সেখানকার কলেজের মেয়েরা: সে কী অপরূপ মনে হয়েছিল। গানে, নাচে, অভিনয়ে বইটা যে রবীন্দ্রনাথের তা বোঝা মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লুধিয়ানায় প্রদর্শনী জমেছিল বেশ। তিন-চার দিন মাত্র ছিলাম। সেখানকার দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি, গরম কাপড়ের আড়ৎ ও কল-কারখানা দেখে ভালয় ভালয় দেরাদুন ফিরে এলাম।

সিমলায় আবার প্রদর্শনী

১৯৪৬ সাল। জুন মাসের মাঝামাঝি স্কুল ছুটি হ'ল। আবার ছেলেদের সঙ্গে এক ট্রেণে সিমলা রওনা দিলাম। মটরুদারা তখন সিমলায় আছেন—বাড়ী বদলেছেন। আগে থাকতেন ছোট সিমলায়, এবারে উঠেছেন গভর্ণমেণ্ট হাউসের পাশ দিয়ে যে রাস্তা নেমে গেছে, সেই রাস্তায় একটা বেশ সুন্দর বাংলোয়। সুবিধে হলে এবারও প্রদর্শনী করব ইচ্ছে ছিল। এবারেও শরীর তেমন বিশেষ ভাল ছিল না। সিমলার জল সত্যিই ভাল বলতে হবে—শিগ্‌গীরই চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। একদিন ম্যালে বেড়াবার সময় রায় গোবিন্দ চাঁদের সঙ্গে দেখা, প্রভাত নিয়োগী তাঁর সঙ্গে। সেই বহুকাল আগে নৈনিতালে তাঁরা যে ভাবে এক সঙ্গে বেড়াতেন, সেই রকম করেই তাঁরা বেড়াচ্ছেন। নিয়োগী গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া স্কুল থেকে ছুটিতে সস্ত্রীক এসেছেন সিমলায়। রায় গোবিন্দ চাঁদ এসেছেন বেনারস থেকে সপরিবারে—তাঁর বাড়ীতেই উঠেছেন প্রভাতরা। সেও ছবি নিয়ে এসেছে, প্রদর্শনী করবার ইচ্ছা। ভালই হ'ল। দু'জনে জল্পনা-কল্পনা করে ঠিক করলাম যে, সসিল হোটেলে দু'জনে এক সঙ্গে প্রদর্শনী করব। মটরুদাকে সেই কথা বলাতে তিনিও সায় দিলেন এবং আমাদের দু' জনকে স্যার পাট্রিকের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি হচ্ছেন তখনকার চীফ জাষ্টিস অব ইণ্ডিয়া। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো চেহারা—রাজী হলেন আমাদের প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনের ভার নিতে। আমাদের বিষয় তিনি কিছুই জানেন না। তাই আমাদেরই মশলা জোগাতে হ'ল। প্রদর্শনী খোলার সময় বক্তৃতায় আমরা যে খুব বড় বড়

আর্টিষ্ট সে কথা না বললে প্রদর্শনী খোলা সার্থক হবে কি করে ?

স্যর ইউ, এন, সেন সিসিল হোটেলেই ছিলেন। এবারে তিনিই সিসিল হোটেলের লাউঞ্জটা চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকায় চার দিনের জন্য ভাড়া ঠিক করে দিয়েছিলেন। সিসিল হোটেলে এবারও অনেক চেনা লোক আছেন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব চন্দ,—তিনি মজলিসি লোক,—প্রায়ই তাঁর ঘরে আড্ডা জমত। স্যার U. N. ও অপূর্ব বাবু আমাদের মাঝে মাঝে সেখানে 'লাঞ্চ' খাওয়াতেন। প্রদর্শনী খুলবার আগেই আমরা সিমলায় অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম। এই বছরে শ্রীযুক্ত ধীরেন সেনও সিমলায় ছিলেন। এডুকেশন সেক্রেটারী সার্জেণ্ট সাহেব বিলেত গেছেন—ধীরেনদাই বোধ হয় তাঁর কাছে অফিসিয়েট করছিলেন দিল্লীতে।

প্রদর্শনী খোলার কিছুদিন আগে থেকে মটরুদা আর এক হুজুগ নিয়ে মাতলেন—আমাদেরও মাতালেন। হৈ হৈ করে 'বর্ষা মঙ্গল' করবেন বলে গানের রিহার্সেল হ'ত। সুরু করলেন। লেডী আরউইন স্কুলের লেডী প্রিন্সিপ্যাল মিস্ সেন। তাঁর বাড়ীতে গানের ও নাচের রিহার্সাল আমাকে দুটো 'সোলো' গানও গাইতে হবে। সিমলার রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আরও দু' তিন জন মেয়ে 'ট্যালেণ্ট'—মটরুদা নিজে ও দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চের বাগচী মশায়ের মেয়ে নিনা,—সবাই গাইবে। বাগচী মশাইরাও সেবার সিমলায় গিয়েছিলেন। প্রভাতের স্ত্রী'র বড় ভয় ও রাগ—আমরা প্রদর্শনী করব, না গানের রিহার্সাল দিয়ে সময় নষ্ট করব। দুই কাজই হ'ল। প্রদর্শনীতে অনেক লোক হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু বিক্রী বিশেষ হল না। প্রভাতের স্ত্রী হতাশ! আমরা ত প্রদর্শনী করে করে একেবারে সিদ্ধপুরুষ হয়ে গিয়েছি,—সহজে হতাশ হই না! প্রভাতের স্ত্রীর কাছে প্রদর্শনী করা একেবারে নতুন। সে ভেবেছিল, প্রদর্শনী খুলবামাত্র হৈ হৈ করে ছবি বিক্রী হয়ে যাবে, টাকার হিসেব রাখতে গোলমাল হয়ে যাবে—লোকেরা ছবি কিনতে না পেয়ে ফিরে যাবে,—সব ছবি বিক্রী হয়ে গেছে। কিন্তু হায়! এ কী ব্যাপার! ছবি দেখে সবাই দুটো প্রশংসা করে চলে যায়। কেউ যদি আর্ট বোঝে বা ভালবাসে! এত নাম-করা বড় বড় দু' দু'জন আর্টিষ্ট,—আর তাদের ছবি কেউ কেনে না! এ-দেশের হবে কি ?

প্রদর্শনীতে না থেকে আমরা রিহার্সাল দিতে যাই। প্রভাতের স্ত্রী তাতে আরও চটে অস্থির! বলেন, প্রদর্শনী হলে কেউ যদি ছবি কিনতে চায় ত কিনবে কি করে ? কিন্তু কে' কার কথা শোনে! আমরা জানি হবার হলে বিক্রী হবেই ছবি! প্রদর্শনীর ঘরে তীর্থের কাকের মত বসে থাকলেই কি ছবি বিক্রী হয়! যাক প্রদর্শনী হয়ে গেল, কিন্তু 'বর্ষা মঙ্গলের' রিহার্সাল পুরোদমে চলতে লাগলেন। কালীবাড়ীতে 'বর্ষামঙ্গল' হবে। দু' তিনটি মেয়ে নাচবে গানের সঙ্গে। মটরু দা বেলফুল ঝুলিয়ে শান্তিনিকেতনী কায়দায় ষ্টেজ সাজালেন। হল লোকে ভরে গেল। বর্ষামঙ্গল সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে উৎরে গেল। প্রদর্শনীর চেয়ে বর্ষামঙ্গলের প্রশংসা শুনে প্রভাতের স্ত্রী চটে লাল! —"গান গাইলেই হয়, ছবি আঁকবার দরকার কি আপনাদের ? কেবল রং নষ্ট, পয়সা নষ্ট! কেউ ত দেখি কেনে না ছবি !" তাঁকে বলি—"আমাদের দুর্ভাগ্য !'

প্রভাতরা আমার আগেই সিমলা থেকে চলে গেল। তাদের ছুটি ফুরিয়েছে। আমাদের ছুটি শেষ হতে বহু দেরি। আমি থেকে গেলাম আরও কিছুদিন। শেষের দিন ক'টা বাড়ীতেই আড্ডা জমত। বর্ষা ঘনঘোর করে সুরু হ'ল। মটরুদার গীটারে মেঘমল্লার সুর বেজে উঠত—গানে গানে সারা সন্ধ্যে কাটত! রাত্রিতেও তার জের চলত। সকালে উঠেও কখনও কখনও! ঐ বর্ষার মধ্যেই আমিও একদিন বেরিয়ে পড়লাম। আবার সেই দেরাদুন! ছুটি চলছে তখনও। দেরাদুনেও ঘনঘোর বর্ষা!

দিল্লীতে তৃতীয়বার একক প্রদর্শনী

১৯৪৬। ডিসেম্বর মাসের গোড়া থেকেই ছুটিতে দিল্লী যাব বলে ঠিক হয়ে গিয়েছে। অথচ, মনে মনে খুব যে একটা উৎসাহ ছিল দিল্লী যাবার, তা' নয়। শরীরটাও খুব ভাল ছিল না।

সাতটা মূর্তি ব্রোঞ্জে ঢালাই হয়ে অনেক দিন হ'ল বরোদা থেকে এসে গেছে। সেগুলি এবার দিল্লী নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনীতে রাখতে হবে। সুবিধে মত দাম পেলে

লেগুলি বিক্রীর ব্যবস্থাও করতে হবে। প্রদর্শনীর দিন স্থির হয়ে গেছে। প্রদর্শনী হবে অল ইণ্ডিয়া আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌টস সোসাইটিতে। তারাই অর্গানাইজ করবে। সুতরাং আমার বিশেষ কিছু ভাববার নেই। শুধু ছবিগুলি নিয়ে গিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া, মূর্তিগুলি সাজিয়ে দেওয়া।

কার্ড ছাড়বার কথা, প্রদর্শনীর দিনে কার্ড পাঠান হ'ল মাত্র তিন শ'। পরে আরও কিছু কার্ড পাঠান হয়েছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ কার্ড পড়ে রইল অফিসের টেবিলের তলায়। খবরের কাগজে কার্ড পাঠান হয় নি। আমার প্রদর্শনীর আগে পরিতোষ সেনের প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছিল। সে ছিল দিল্লীতে তখনও। তারই সাহায্য পেলাম কিছু। নিজেই

দক্ষিণা বাতাস

ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছবির বোঝা নিয়ে রওনা হলাম দিল্লীর পথে। মূর্তিগুলো আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দিল্লীতে গিয়ে উঠলাম দাক্তার ভাইয়ের বাড়ী। তিনি বাড়ী বদলেছেন। কুইনসওয়ে থেকে একেবারে লোদী রোডে একটা বাংলোয়। চাকরিও বদলেছেন। এখন করেন ইম্পোর্টস-এর ডেপুটি সেক্রেটারী। কোথায় ছুল স্কুলে পড়াতেন ইতিহাস, আর কোথায় নিউ দিল্লীর গভর্ণমেন্ট হাউসে ফাইলের কাগজপত্রে চালাচ্ছেন সই!

অল ইণ্ডিয়া আর্টস এ্যাণ্ড ক্র্যাফটসের অফিসে গিয়ে দেখলাম তখনও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। তাড়া লাগিয়ে কাজ এগুতে হবে। প্রদর্শনী খুলবার লোক ঠিক হয়েছে, আফগান কনসাল। বেছে বেছে জুটিয়েছে এক-জনকে, যিনি আর্টের কতবড় সমঝদার তা তাঁর কথা-বার্তাতেই বোঝা গেল। ইনভিটেশন কার্ডগুলো তাড়াহুড়ো করে যখন নিয়ে এল, দেখলাম আমার নামটার বানান ভুল কার্ডে। যাক্, এসব ছোট কথা। হাজারের উপর

ছবি টাঙিয়ে কোন রকমে প্রদর্শনী ত খাড়া করলাম। কি আর করা যায়! ইউ, এন, সেন সোসাইটির চেয়ারম্যান তখন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য আমার পুরণো হৃদ্যতা ছিল। তিনি এলেন, আফগান কনসাল এলেন, লোকজন কিছু এল, প্রদর্শনী খোলা হয়ে গেল। ছবি কিছু বিক্রী হ'ল। রন্ধোবা সাহেব তখন দিল্লীতে ছিলেন, তিনি সবে ছবি কিনতে সুরু করেছেন। তিনি কয়েকখানা ছবি পছন্দ করে গেলেন। ছবি যাঁরা কিনলেন, তাঁরা সবাই প্রায় আমার আগেকার পরিচিত। এমনি করে সেবারে দিল্লীর প্রদর্শনী হয়ে গেল। সোসাইটির হলে প্রদর্শনী করার খানিকটা শিক্ষাও হয়ে গেল। বড়দিনের ছুটিটা এমনি করেই কাটল! পুরো জানুয়ারী মাসটাও আমাদের ছুটি! দাক্তার ভাইয়ের বাড়ী আছি। কতদিন আর বন্ধুর বাড়ী থাকা যায়? ফিরে যাব ভাবছি, কিন্তু দাক্তার ভাই বললেন, 'থেকে যাও, জওহরলালের মূর্তি গড়ে যাও।' ত্রিলোক সিং তখন জওহরলালের সেক্রেটারী। তাঁকে

মূর্তি গড়ার কথাটা বলা হ'ল। তিনি আমাকে ও দাক্তার ভাইকে চায়ে ডাকলেন। আলাপ-পরিচয় হ'ল। সেখানে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। দেবিকারাণী ও তাঁর স্বামী রোরিক। দেবীকারাণী 'অচ্যুৎ কন্যায়' অভিনয় করে বেশ নাম করেছিলেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী নিকোলাস রোরিকের শিল্পী পুত্র সোয়েটেস্লেভ রোরিক তখন ছবি এঁকে নাম করতে আরম্ভ করেছিলেন। বাবার পরিচয় ছাড়াও তাঁর নিজের পরিচয় লোকে পেতে আরম্ভ করেছিল। নানান রকম গল্প আলোচনায় সেদিনকার সভা জমে উঠেছিল। কাজের মত একটি কাজ ঠিক হয়ে গেল যে, জওহরলালের মূর্তি গড়ার আগে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মূর্তি গড়তে হবে। তিনি সম্প্রতি লখনউ থেকে দিল্লীতে এসেছেন এবং কিছুদিন থাকবেন। তাঁর মূর্তি হয়ে গেলে জওহরলালের মূর্তি করা সম্ভব হবে। বিজয়লক্ষ্মী যদি তাঁর ভাইকে অনুরোধ করেন তবে জওহরলাল আর 'না' করবেন না নিশ্চয়ই। ত্রিলোক সিং উপায় বার করেছেন বেশ।

বিজয়লক্ষ্মী ও পণ্ডিতজীর মূর্তি গড়া

নির্দিষ্ট দিনে সময় মত মাটি ও মডেলিং ষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে জওহরলাল নেহরুর তখনকার ইয়র্ক রোডের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। সুবিধে হ'ল এই যে, লোদী রোডের দাক্তার ভাইয়ের বাড়ী থেকে এই ১৭ নং ইয়র্ক রোড কাছেই। হেঁটে যাতায়াত করাও চলে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর মূর্তি গড়া আরম্ভ করা গেল। কিন্তু আরম্ভটা বড় সুবিধের হল না। দোতলায় জওহরলালের অফিস ঘরের পাশে মূর্তি গড়তে আরম্ভ করেছিলাম। যাতায়াত করবার সময় জওহরলাল সর্বদা হেসে জিজ্ঞাসা করতেন—"কতদূর?" "কেমন চলছে?" শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী লখনউ থেকে এসে অবধি, তখনও বোধ হয় চুলগুলো একটু অগোছালো ও বড় বড় হয়েছিল, উনি নিজে বোধ হয় ভাবতে পারেন নি যে মূর্তিটা ঠিক সুবিধের দেখতে হবে না। দ্বিতীয় দিনে মূর্তির কাঠামোটা যখন একরকম দাঁড়িয়ে গেছে, তখন বোঝা গেল যে, মাথাটা একটু ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্রাম্‌জি'—সেই গোছের হয়ে গেছে। পরের দিন মূর্তি গড়তে এসে দেখি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর চেহারা অন্যরকম। চুল ছেঁটে ফেলেছেন, চমৎকার ঢেউ খেলিয়ে আঁচড়িয়েছেন চুলগুলো। সাদা চুল, অথচ যৌবনের জৌলুষ আছে। তাঁকে দেখে হেসে বললাম, "এই রকম প্রথম দিন থেকে হলেই ত সব ঠিক হ'ত।"

উনি বললেন, "কেন, এখন আর হতে পারে না নাকি?" মূর্তিটাকে ভেঙে ফেলে বললাম, "হতে পারে বৈকি, হতেই হবে! আবার আরম্ভ করব নতুন করে!"

এবারে চলল কাজ পুরোদমে। চোখও সেই সঙ্গে তার কাজ করে যাচ্ছে। এইবারে মনের মধ্যে যে খুঁত খুঁতানিটা ছিল, সেটা গেল। মনে হল, এবারে কাজটা উৎরে যাবে। চারদিন পর পর চারটে সীটিং নিলাম এবং জিনিষটা শেষ হল। গল্প মাঝে মাঝে করতেন সীটিং দেবার সময়। এমনি করে সীটিং দিতে তাঁর ভালই লাগত। অনেক দরকারী কাজ ও দেখাশোনা করা সীটিঙের অজুহাতে বন্ধ রাখতেন। বলতেন, 'সবাই আসে কাজে, নিজের স্বার্থের জন্য। কাজের জন্য নয়, স্বার্থের জন্য নয়, কেবল মাত্র নিছক দেখা করার জন্য কেউ বড় একটা আসে না। কিন্তু তবু দুনিয়া চলছে এমনি করেই। দিনের পর দিন কাটছেও। কাজ ও স্বার্থের জন্য লোকে না এলে হয়ত দিন কাটানো মুস্কিল হবে; এই ত জীবন!"

মূর্তিটা শেষ হ'ল যেদিন, তার পরের দিন থেকেই জওহরলালের মূর্তি আরম্ভ করলাম। জওহরলালজীর মূর্তি গড়ার আগের দিন সায়েন্স কংগ্রেসে সমাগত দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের সংবর্ধনার জন্য এ্যাসেম্বলী হাউসের বাগানে একটা চায়ের পার্টি ছিল। বৈজ্ঞানিক না হলেও সেখানে আমারও ছিল নিমন্ত্রণ। জওহরলাল ও অন্যান্য বড় বড় লীডাররা সেখানে ছিলেন। পুরাতন চেনাশোনাদের মধ্যে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সেখানে ছিলেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও ছিলেন। নানান ভদ্রলোক ও মহিলাদের সঙ্গে এখানে আলাপ হ'ল। হঠাৎ অনেকদিন আগের চেনা একটি মহিলার সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি স্কেচ বই নিয়ে সরোজিনী নাইডুর স্কেচ আঁকবার চেষ্টা করছিলেন। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে খবরাখবর নিতে লাগলেন। দিল্লীতে কি করছি জিজ্ঞাসা করলেন যখন, তখন তাঁকে বলে ফেলি যে আগামী কাল থেকে জওহরলালের মূর্তি গড়তে আরম্ভ করব। মহিলাটি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন কখন যাব মূর্তি গড়তে এবং তিনি সে সময় স্কেচ

করতে গেলে কিছু অসুবিধা আছে কি না। আমি তাঁকে বললাম যে জওহরলালের অনুমতি না নিয়ে ত বলতে পারি না। তিনি কিছুমাত্র না দমে বললেন, "বেশ ত, আমি অনুমতি এক্ষণি নিয়ে রাখছি।' তিনি জওহরলালের কাছে গিয়ে বললেন যে, সুধীর যে সময় মূর্তি গড়তে যাবে, তখন তিনি স্কেচ করতে চান, আশা করি অসুবিধা হবে না কিছু। জওহরলালজী প্রথমে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অসুবিধা আমার চেয়ে সুধীরের হবে বোধ হয়। একসঙ্গে দু'জন না আসলেই ভাল। সুধীরের হয়ে যাক, পরে না হয় সুবিধে মত তুমি কর।' মেয়েটি নাছোড়বান্দা, বলতে লাগলেন, 'কোন অসুবিধা হবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি—'

জওহরলালজী একটু বিরক্তভাবেই বললেন, "অসুবিধা হবে কি হবে না তা তুমি কি করে জানবে। আসবেই যখন ঠিক করে ফেলেছ তখন অনুমতির কি দরকার—এস তবে।"

ঠিক ছিল সকাল সাড়ে আটটা থেকে মূর্তি গড়তে আরম্ভ করব। দিল্লীতে শীতকালে সকাল সাড়ে আটটায় তৈরী হয়ে কাজ করতে যাওয়া দেখলাম বেশ কষ্টকর। শীতও বেশ পড়েছিল। হাতে কিছু সময় নিয়েই যেতাম। প্রথম দিন গিয়ে দেখি তখনও তিনি তৈরী হন নি। মেঠাই সাহেবকে বলে তাঁর অফিস ঘরে গিয়ে মডলিং ষ্ট্যাণ্ডে মাটি চাপাতে আরম্ভ করলাম। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় জওহরলাল এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললেন, 'গুড মর্ণিং খাস্তগীর।' আমিও তাঁকে বললাম, 'গুড মর্ণিং।' তারপর আর কোন কথাবার্তা হ'ল না কিছুক্ষণ। তিনি নিজের কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। আমিও নিজের কাজ করে চললাম। ন'টার সময় হন্তদন্ত হয়ে সেই মহিলাটি ঘরে ঢুকলেন, দেরি হয়ে গেছে, সেই জন্য বার বার দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। খাতা-পেন্সিল বার করে একবার এখানে, একবার ওখানে টুল টানাটানি করে বসতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই আর একটা 'পজিসন' ঠিক করতে পারেন না। স্পষ্ট বুঝলাম, জওহরলালজী বিরক্ত হয়ে উঠছেন। আমিও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

মূর্তি গড়বার সময় প্রথম দিন অন্ততঃ আমি মডেলকে একেবারেই বিরক্ত করি না। নিশ্চল হয়েও কখনও বসতে বলি না। তার সুবিধেমত যে রকম খুশী বসতে চান, বসলেই ভাল। আমার কাজ শুধু তাঁকে দেখা। আর যে ভাবে বসলে তাঁকে সবচেয়ে স্বাভাবিক লাগে, সেই 'পোজ'টিকে মনের মধ্যে গেঁথে মূর্তি গড়ে চলি। মডেল থেকে ছবি আঁকতে গেলেও অবশ্য সেই রকমই খানিকটা। তবে, আঁকতে আরম্ভ করে ফেললে মডেলকে বেশী নড়তে-চড়তে দেওয়া চলে না। ছবিটা ত আর 'থি্ ডাইমেনশনে' আঁকার জিনিষ নয়। ফ্লাট কাগজে আঁকতে হয়, সুতরাং মডেলকে একেবারে এক 'পজিশনে' 'পোজ' দিতে হয়। মূর্তি গড়ার মডেলকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হয় না, এই যা সুবিধে।

মহিলাটি কিছুতেই স্কেচ আরম্ভ করতে পারছিলেন না। একটু করেন, আবার জায়গা বদল করতে হয়, কারণ জওহরলালজী হয়ত একটু নড়ে বসেছেন। এই রকম চলতে লাগল। মহিলাটি শীতের জন্য ওভারকোট পরেই আঁকতে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর কোটের খোলা বেল্ট বা আর কিছু লেগে পাশের টেবিল থেকে কি যেন পড়ে বেশ একটু শব্দ হ'ল। এইবার প্রথম জওহরলালজী কথা বললেন। মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে ইংরেজীতে বললেন,—"ইউ আর ডিস্টার্বিং আস। ইউ শুড নট হ্যাভ কাম!" মেয়েটি অপ্রস্তুত না হয়ে, ক্ষমা না চেয়ে বার বার প্রতিবাদ করতে লাগল যে, সে ডিস্টার্ব করছে না। একবার যদি বলত, 'সরি, জিনিষটা পড়ে গেছে, আমি দেখতে পাই নি' —তবে জওহরলালজী হয়ত ('হ্যারো'র পড়া ছেলে ত!) ক্ষমা করতে দ্বিধা করতেন না!

জওহরলালজী শেষটায় বিরক্ত হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—'তুমি যদি না যেতে চাও, তবে আমাকেই যেতে হয়। কি আর করা"—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি উনি ফিরে এসেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'খাস্তগীর, তুমি কালকে সকালেই এস!" তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—"তোমার আর আসতে হবে না!"—বলেই আবার হন হন করে চলে গেলেন। মেয়েটি এতক্ষণে রাগে যেন ফেটে পড়ল। বেশ চেঁচিয়ে বলতে লাগল—"দেখেছেন, আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লীডার, কত অল্পে রাগ করেন, সহ্যশক্তি কত কম!"—ইত্যাদি, ইত্যাদি—

আমি শুধু মহিলাটিকে বলেছিলাম,—"ভুলে যাবেন না, এটা তাঁরই বাড়ী। আর আপনি অনাহুতভাবেই এসেছিলেন। তাঁর বাড়ীর ভেতর দাঁড়িয়ে তাঁকে নিন্দে করবেন না।"

তারপর দু'দিন বেশ নিরিবিলি কাজ চলল। সকালে গিয়ে পণ্ডিতজী আসবার আগেই আমি কাজ আরম্ভ করে দিতাম। উনি ঠিক সাড়ে আটটায় অফিস ঘরে এসে ঢুকতেন। ন'টায় তাঁর সেক্রেটারী আসতেন ফাইল নিয়ে। সাড়ে দশটার মধ্যে অফিসে চলে যেতেন। তখনও সম্পূর্ণ স্বরাজ হয় নি। হবে হবে হয়েছে মাত্র।

পণ্ডিতজীর মূর্তি করছি, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ও অন্যান্য কারুর কারুর ইচ্ছে, মাথায় টুপি দিয়ে তাঁর অমন সুন্দর মাথাটা—অর্থাৎ টাক্‌টা ঢেকে দেই। আমি কিছুতেই তা করতে রাজী নই। ওঁর টাক মাথাটা ওঁর মস্ত বড় একটা 'ক্যারেক্টার'—সে কেন যে অনেকে বোঝে না জানিনে। ওঁর মাথার সবটাই ত বিরাট একটা কপাল,—কে বলল, টাক্। আর ওই জন্যই উনি জওহরলাল। ওঁর মাথা-ভরা যদি সুন্দর কোঁকড়া চুল থাকত, তবে উনি সিনেমা-ষ্টার হয়ে মিঠি মিঠি প্রেম-সঙ্গীত গাইলে মানাত। কিন্তু ভারতের প্রাইম মিনিষ্টারের মত উপযুক্ত চেহারা হ'ত না, মানাতও না।

একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি জওহরলালের চোখে মুখে। একটা নির্বিকার সন্ন্যাসীর ভাব এসেছে তাঁর চেহারায়। একলা যখন জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকেন, তখন তাঁর চোখে দৃষ্টির গভীরতা সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। মনে হয়, তিনি এ রাজ্যে নেই।

চতুর্থ দিনে ঠিক সময় গিয়ে কাজ আরম্ভ করলাম, কিন্তু সাড়ে আটটা বেজে গেল, সাড়ে ন'টা, সাড়ে দশটা, সাড়ে এগার হয়ে গেল, জওহরলালের দেখা নেই, কোথায় যেন কাজে বেরিয়েছেন। ভাবছি ফিরে যাই; এমন সময় জওহরলাল ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন দেখতে পেলাম। আমাকে তখনও অপেক্ষা করতে দেখে লজ্জিত হয়ে বললেন, 'হ্যালো, ভেরি সরি, কাম অন্ আই উইল সীট ফর ইউ নাও'—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'না, এখন নয় ভাইয়া, ভূক্ লগ্ গৈই'—

আমি শুনে বললাম, 'বেশ, তাই হবে, আমি লাঞ্চ খেয়েই ফিরে আসছি।'

পণ্ডিতজী তা শুনে বললেন, 'ডোণ্ট বি সিলি, হ্যাভ্ নট লাঞ্চ উইথ আস্ টু-ডে'—আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন। খাওয়াটা বেশ ভালই হ'ল সেদিন। কাশ্মিরীদের প্রিয় মেহতি শাক যে এত ভাল খেতে তা সেদিন বুঝলাম। আমাদের দেশে শাককে এত বেশী ভেজে ফেলে যে, তার মধ্যে শাকের স্বাদটুকু আর কিছু থাকে না।

আরও দু'দিন কাজ করে সীটিং নেওয়া শেষ হ'ল। তারপর প্লাষ্টারের কাজ। প্লাষ্টারের মোল্ড করে ডাক্তার ভাইয়ের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেখানেই প্লাষ্টারে ঢালাইয়ের সব কাজই নিজে করেছিলাম। ইতিমধ্যে আমেরিকান এম্বেসীর জর্জ মেরিলের সঙ্গে হ'ল আলাপ। উনি বড় দিলদরিয়া লোক! চেহারাখানা বেশ মজার—মূর্তি গড়া চলে। তিনি রাজী সীটিং দিতে; মডলিং ষ্ট্যাণ্ড নিয়ে গেলাম জর্জ মেরিলের বাড়ী! সেখানেই সীটিং দিতেন লাঞ্চের পর। আমাকে অবশ্য রোজই ওঁর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে হ'ত। ভদ্রলোকের বাড়ীতে কত রকমের যে জিনিষ, একেবারে 'কিউরিও শপ' করে রেখেছেন। একটা ঘরে ঢুকে আমার আঁকা দু'খানা ছবি দেখলাম। দিল্লীর আগের প্রদর্শনীতে সে দু'টি কিনেছিলেন।

মনটা বেশ ভাল ছিল। বিজয়লক্ষ্মী, জওহরলালের মূর্তি গড়ে ফেলেছি। কাগজে ছবিও বেরিয়ে গেছে। জর্জ মেরিলের মূর্তি আরম্ভ করেছি, মূর্তিটার দ্বিতীয় দিনেই চেহারা মিলে গেছে। জর্জ মেরিলের বোন সেটা কিনবেন। কত দাম চাই, একদিন জিজ্ঞাসা করলেন। প্লাষ্টারে হেড ষ্টাডি, পাঁচশ' টাকার বেশী ত নেই নি কখনও। তাই চাইলাম। পরের দিনই চেক পেলাম—অথচ, মূর্তিটা শেষ হয় নি তখনও। খুব তাড়াতাড়ি মূর্তিটা শেষ হয়ে গেল, শুধু মাথা। ছাঁচ ঢালা, প্লাষ্টার ঢালতে আরও দু'দিন গেল। সমস্ত ছুটিটা এমনি করে কাজে-কর্মে কেটে গেল। আর মাত্র তিন-চার দিন বাকী ছুটি ফুরোতে। আর মূর্তি গড়া নয়। এই ক'দিন শুধু বিশ্রাম, বড় জোর এর ওর বাড়ী গিয়ে চা, লাঞ্চ বা ডিনার খেয়ে কাটানো।

দিল্লীর আর্ট-ক্রিটিক

দিল্লীর আর্ট-ক্রিটিকদের কজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেই ছুটিতেই। আমার ছবির প্রদর্শনীতে এবারে একটি খবরের কাগজের অফিস থেকে যিনি রিপোর্ট লিখতে এসেছিলেন, তিনি বিদেশী মহিলা। যিনি সচরাচর লেখেন, তিনি বোধ হয় তখন ছিলেন না। যাই হোক, এই মহিলার আর্ট সম্পর্কে যে কত জ্ঞান, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়েছিল, যখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'টেরা-কোটার' অর্থ কি? অথচ এই সব অর্ধ-শিক্ষিত বিদেশী সাহেব-মেয়েরা আমাদের দেশে এসে বড় বড় আর্ট সমালোচক হয়ে যায়। ফরাসী দেশ থেকে ঘুরে এলেও সে প্রকাণ্ড আর্ট সমঝদার বনে যায়। বিদেশী বা বিদেশ ফেরৎ হলেই হ'ল, আমাদের দেশে তাঁদের এখনও অতুল প্রতিপত্তি! স্বরাজ হয়েও এক তিলও কমে নি এই 'মেণ্টালিটি'!

কে, কে, নায়ার যে 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম নিয়ে লেখেন, তখনই জানতে পারলাম। উনি তখন 'ইন্‌ফর্মেশন' অফিসে কাজ করেন। এখনও হয়ত সেখানেই আছেন, ঠিক জানিনে। আমার ছবির প্রদর্শনীতে এসে বহু ছবি ও মূর্তির ফটো তুলে নিয়েছিলেন। উনি সুবিধে মত সব শিল্পীরই ছবির ফটো তুলে রাখেন জানি। তখন দিল্লীতে আর্ট-ক্রিটিক বিশেষ ছিল না, এখনো যে ভাল আর্ট-ক্রিটিক আছে তাও ত মনে হয় না! তখন প্রদর্শনী হলে বরদা উকীল মশাই নিজেই রিপোর্ট লিখে কাগজে পাঠাতেন। এই 'কৃষ্ণচৈতন্য' পরে আমার ছবি ও মূর্তির ওপর দু'একটা ভালই প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

মিঃ রন্ধোয়ার সঙ্গে এইবারেই প্রথম আলাপ। অবশ্য রন্ধোয়া সাহেব আমার অনেক ছবি কিনেছেন এবং বিক্রীও করে দিয়েছেন। জওহরলাল ও বিজয়লক্ষ্মীর মূর্তি দুটোও উনি আমার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। জওহর-লালের মূর্তিটা দিল্লী য়ুনিভার্সিটিতে আছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর মর্তিটা কোথায় আছে তার খবর জানিনে।

১লা ফেব্রুয়ারী আবার দেরাদুন ফিরে এলাম। আবার সেই স্কুলের ছেলেদের নিয়ে কাজ। নিজের কাজও পুরোদমে চলল।

বোম্বেতে দ্বিতীয়বার একক প্রদর্শনী

বোম্বে থেকে শ্রীমনু থাকার চিঠি লিখলেন। লিখলেন, আমার ছবির প্রদর্শনী যদি করি, তবে তিনি তা' অর্গানাইজ করবার সম্পূর্ণ ভার নেবেন। ষাটখানা ছবি বোম্বেতে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি খুব সুন্দর ভাবে বোম্বে আর্ট সোসাইটিতে আমার ছবির প্রদর্শনী অর্গানাইজ করেছিলেন। শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া প্রদর্শনী খুলেছিলেন। মনু থাকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রদর্শনী খুব ভালভাবেই হয়েছিল। ছবি বিক্রীও মন্দ হয় নি। আমি নিজে সে প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলাম না। শ্রীযুক্ত মনু থাকার এমন সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শনী ম্যানেজ করেছিলেন যে, কোন গোলমাল বা বিভ্রাট হয় নি, ছবি একটিও হারায় নি—অন্যদের হাতে ছবির প্রদর্শনী করতে দিলে যা হয়ে থাকে। তিনি শিল্প ও শিল্পীদের ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হয়েছিলাম। ক্রমশঃ

নীলকান্ত মণি

নীরেন্দুকুমার হাজরা

বৈশাখের তপ্তঘন যন্ত্রণায় যবে
গান খুঁজে পথে পথে মনের মুকুরে
স্বপ্নের সুন্দর বেশ কত সুর ঝরে
একটি নামের গুণে। কোথা মন কবে
নীলকান্ত হৃদয়ের নীলমণি হবে—
চেতনার দ্যুতি সম কত প্রাণ ভরে।
মহাকাল কয় কথা অতি চেনা সুরে
দেশে দেশে যুগে যুগে ব্যথা যেথা রবে।

সেথায় জেনেছি আমি হৃদয়ের পর
সোনার ফসল তুমি ধরিত্রীর ধন
উদ্ভাসিত গন্ধ যার যুগ-যুগান্তর ;
রুক্ষ মুধু প্রাণে তাই জেগে ওঠে কোন

বৈশাখের জ্বালা নয়—সুরের রণন
চেতনার অগ্নিসম ভ'রে ওঠে মন।

জীবন ও মৃত্যু

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

খেলা শেষ হ'য়ে আসে—সংসারের খেলা !
ওপারের কাছাকাছি জীবনের ভেলা !
চৈত্রমাস, অপরাহ্ণ, আমের বাগানে
আরণ্যকপোত কাঁদে ! আমার পরাণে
বিজয়ার সুর বাজে ! এতকাল ধ'রে
যারা ছিল হৃদয়ের প্রতিকণা ভ'রে
তাদের ছাড়িয়া যাই ! ইহাই নিয়ম !
তবু জানি বিশ্বনাট্যে মৃত্যুই চরম
সত্য নয় ! পাতা ঝরে ! নবীন পল্লবে
প্রাণের বিজয়ধ্বজা উড়ে সগৌরবে !
কখন্ সে প্রাণ হয় হেমন্তে পাণ্ডুর !
মৃত্যুর কালিন্দীকূলে প্রাণের নূপুর
আমি শুনিতেছি আজ ! মৃত্যু ও জীবন
যম ও যমুনা যেন দুটি ভাই-বোন।

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হতমান ভারতীয় মুদ্রা

কর্ত্তারা যে দিন হইতে দরিদ্র দেশকে বিত্তশালী করিবার নেশায় মাতিলেন—সেইদিন হইতেই বিদেশের দেওয়া ভিক্ষার দানই হইল আমাদের দেশ গড়িবার প্রথম এবং প্রধান মূলধন! কর্ত্তারা কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি এবং শ্রীবদনে ভিক্ষার কাতর আবেদন-বুলি লইয়া বিদেশে বাহির হইলেন "তোমরা ভিক্ষা দাও, দয়া কর, আমাদের কিছু ভিক্ষা দাও—আমরা দেশ গড়িব—।" জানিনা, কোনো দেশ বা জাতি ভিক্ষামাত্র সম্বল করিয়া দেশ গঠন এবং জাতিকে বিত্তশালী করিতে পারিয়াছেন কি না। কংগ্রেসী-কর্ত্তারা স্থির করিয়াছেন দেশের চরম এবং পরম মোক্ষলাভ হইবে এই পরের দয়ার ভিক্ষার দ্বারাই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে ভিক্ষাই আমাদের আজ চরম মোক্ষ দিতে উদ্যত হইয়াছে পরম নির্ব্বাণের পথে! বেশী ভিক্ষা পাইবার আশায় কিছুদিন পূর্ব্বে টাকা হতমান করা হইল, যাহার ফলে দেশে সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বপণ্যে এবং দ্রব্যে, অসম্ভব একটা মূল্যস্ফীতি হইয়াছে এবং এই মূল্যস্ফীতি ক্রমাগত উর্দ্ধমুখেই চলিয়াছে—চলিতেও থাকিবে—সকল প্রকার প্রতিরোধ পন্থাকেই কদলী প্রদর্শন করিয়া।

"মুদ্রামূল্য কমান হইবে না—কখনই কমান হইবে না—কিছুতেই হইবে না"—দেশবাসীকে বহুবার, বারবার এই স্তোকবাক্য দিয়া কর্ত্তারা হঠাৎ রাতারাতি, কাকপক্ষ'ও জানিতে পারিল না, তাঁহাদের বহু-ঘোষিত পবিত্র প্রতিশ্রুতিকে 'সত্যের-অপলাপে' পরিণত করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিলেন না!

বাঙলা ও বাঙালীর সহিত এই হঠাৎ মুদ্রামূল্য হ্রাসের বিষম যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়া আজ এত কথা বলিতে হইতেছে। একথা অবশ্যই সত্য যে, বিদেশের কৃপা-ভিক্ষা লাভের ফলেই দেশে মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হয়, বেশ কয়েকবৎসর পূর্ব্বে। সময়মত যদি এই বিষম মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য আন্তরিক প্রয়াস করা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আজ দয়ালু বিদেশী কর্ত্তাদের পরোক্ষ চাপে কংগ্রেসী সরকারকে এমন একটা পরম অবমাননা এবং দেশের পক্ষে পরম ক্ষতিকর নতি স্বীকার করিতে হইত না। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে মুখের কথা ছাড়া দিল্লীর হঠাৎ-বাদশারা কার্য্যত কোন চেষ্টাই করেন নাই—এখনও করিতেছেন কি না সন্দেহের বিষয়! ভুলের উপর ভুল—বেচালের উপর আরো বেচাল করিয়া কর্ত্তারা সমগ্র দেশকে প্রায় ভরাডুবি করিতে বসিয়াছেন। আর এই ভুল এবং বেচালের মাশুল—কর্ত্তারা দিবেন না—দিতে হইবে দেশের সাধারণ লোককেই, আমাদের।

গত ১৬।১৭ বছর ধরিয়া দেশবাসী আমাদের কর্ত্তাদের সাধের পরিকল্পনার বিষম সাফল্যের কথা অহরহ শুনিতেছে, কিন্তু দীর্ঘ ১৭ বৎসরে পরিকল্পনার, তথা দেশ গঠনের, অজুহাতে হাজার হাজার কোটি টাকা অতলে গেল, কিন্তু দেশ এবং দেশের লোক পাইল কি অমূল্য বস্তু? এখনও লোকে দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পাইতেছে না, বিবিধ করের ভারে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত, দেশের, বিশেষ করিয়া এই একদা শস্য-শ্যামলা বাঙলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠিবার মুখে। শিক্ষার শ্রাদ্ধ হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিনা চিকিৎসায় এবং বিনা ঔষধে অকালে শ্মশান যাত্রা করিতেছে। শহরে, গ্রামে, মাঠে, ময়দানে হাহাকার। কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া ডিভিসি, হিরাকুঁদ প্রভৃতি বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় শতকরা কয়জন কৃষক চাষের জল পাইতেছে? পরিকল্পনার ঠেলায় আজ পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য চাষীকে কেবল হালের বলদ নহে, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ঘরের

সামান্য ঘটিবাটি থালাও বিক্রয় করিতে হইতেছে!

আজ দেশে অভাব সর্ব্বপ্রকার নিত্য এবং অবশ্য *প্রয়োজনীয় সামগ্রীর*, খাদ্য, বস্ত্র, সার, ঔষধ-আর কত নাম করিব? এই অভাবের দাহন ভোগ করিতেছে দেশের মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রজন। উপরতলার মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক শেঠ এবং শঠ দেশের এই অবস্থাতেও পরমানন্দে উৎসব বিলাসে দিন যাপন করিতেছে।

দেশের কর্ত্তারা লোকের এই বিষম এবং অসহনীয় কষ্টের কথা হয়ত স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ভরা পেটে—মোলায়েম গদী-আঁটা কুর্সিতে বসিয়া দেশের কল্যাণ চিন্তায় সদা-নিমগ্ন রহিয়াছেন এবং খেয়াল ও অবসরমত জনগণকে অসার হিতবাণী বিতরণ করিতেছেন! কর্ত্তাদের উপদেশ বাণীতে ইহাই মনে হয়—আমাদের এত ঘাবড়াইবার কোন কারণই নাই। দেশকে যখন উন্নতির পথে যাইতে হয়, তখন সকলকেই দেশের এবং দশের কারণে সামান্য একটু কষ্ট সহ্য অবশ্যই করিতে হইবে। অতএব "হে দেশবাসী, প্রাণপ্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! আর সামান্য কাল অপেক্ষা কর, সুদিন আসিল বলিয়া। রাত্রি প্রায় শেষ হইল, ভোরের আলো দেখা যাইতেছে, সুখ-সূর্য্য উদিত হইতে আর বিলম্ব নাই!"—অবশ্য স্বীকার্য্য আশার কথা! কর্ত্তাদের প্রতিশ্রুত সুদিনের নমুনা আমরা চোখের সামনেই প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছি! এই প্রায়-আগত সুদিনের আশ্বাসে আমরা অন্ন-বস্ত্র এবং অন্যান্য সর্ব্ব অভাবের নিদারুণ দুঃখ-যাতনাও ভুলিতে বসিয়াছি।

মূল্য-হ্রাসের ম্যাজিক—

ডিভ্যালুয়েসনের ফলাফল, লাভক্ষতির সর্ব্বাত্মক আলোচনা করার সাধ্য আমার নাই—অর্থনীতি বিষয়ে অতুল্য পণ্ডিতেরা ইহা ভালই করিবেন। মোটা বুদ্ধিতে যাহা মনে হইতেছে এবং যতটুকু প্রকট হইয়াছে এই কয়মাসে কেবলমাত্র সেই বিষয়েই দু'চার কথা বলিয়া এ-বিষয়ে বক্তব্য এবারের মত শেষ করিব।

বিদেশের সহিত বাণিজ্যে ভারত ইতিমধ্যেই দেনদার হইয়াছে, অর্থাৎ যে-পরিমাণ পণ্য রপ্তানী করা হইতেছে—তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী মূল্যের বিদেশী পণ্য আমাদের আমদানী করিতে হইতেছে বাধ্য হইয়া। এখন মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে—রপ্তানী ও আমদানীর পরিমাণ যদি একই থাকে, তাহা হইলে আমদানী মালের জন্য শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেশী দিতে হইবে—অন্যদিকে রপ্তানী পণ্যের মূল্য কম হইবে, বর্ত্তমানের রপ্তানী যদি অন্তত আরো শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ানো যায়। তাহা হইলে আয় সমানই থাকিবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, আমদানী কমাইয়া, রপ্তানীর পরিমাণ অন্তত তিনগুণ বাড়াইতে পারিলে, বিদেশ হইতে আমাদের পাওনা বেশী হইবে—কিন্তু এ-কাগজী হিসাব বাস্তবে কি হইবে বলা শক্ত। এখন পর্য্যন্ত আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি হয় নাই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানীর কমতি হইতেছে দেখা যাইতেছে। বিদেশে চায়ের বাজার পড়তি—পাটও সেই পথে।

আমদানী কমাইব বলিলেই আমরা কাজে তাহা করিতে পারিব না, নানা কারণে। এমন বহু মূলধনী সামগ্রী আমাদের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়—যাহা না করিলে শিল্পক্ষেত্রে বহু দ্রব্যের উৎপাদন কেবল ব্যাহত নহে—একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ এই সকল মূলধনী দ্রব্য আমাদের দেশে কবে প্রস্তুত হইবে, আদৌ হইবে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে মূলধনী সামগ্রী আমদানী কমানোর অর্থই হইবে দেশের বহু শিল্প, তথা দেশ গঠনের মূলে কুঠারাঘাত করা!

এমন বহু কাঁচামাল আছে যাহা আমদানী করা ছাড়া আমাদের পথ নাই। দেশীয় শিল্পে এমন বহু সামগ্রী উৎপাদিত হইতেছে যাহার মূল কাঁচামাল এদেশে উৎপাদিত হয় না। এ বিষয়ে বিদেশের উপর আমরা একান্ত নির্ভরশীল। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ব্বে যে সব বিদেশী কাঁচামাল আমরা একশত টাকায় ক্রয় করিতেছিলাম এখন তাহার জন্য দিতে হইতেছে অন্তত একশত ষাট টাকা! তাহা হইলে উপায় কি? বিশেষ করিয়া প্রতিরক্ষার জন্য যে সব বিদেশী কাঁচামাল প্রয়োজন একান্তভাবে, তাহা কি বন্ধ করা যাইবে? —হইলে প্রতিরক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় বহুবিধ সাজ-সরঞ্জাম নির্ম্মাণ স্থগিত হইবে, দেশের এই সঙ্কটকালে? না। ইহা সম্ভব নহে। কাজেই এখন প্রায় দ্বিগুণ মূল্য দিয়া পূর্ব্বের সমপরিমাণ মাল

আমাদের আমদানী করিতেই হইবে। এই বাড়তি টাকা কোন গৌরী সেন মহাশয় যোগাইবেন? ইচ্ছামত দরাজ হস্তে কারেন্সী নোট ছাপাইয়া এ-দায় মিটিবার নহে!

ইহার উপর আছে কেরোসিন, পেট্রল, ডিজেল তৈল, বহু প্রকার কাইন এবং হেভি কেমিক্যাল—যাহা এখনো বহুদিন আমাদের আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ঔষধাদির শিল্পে বিদেশী উপাদান যে ভাবেই হউক আমদানী করিতেই হইবে। মুখে "আমদানী কমাইয়া, রপ্তানী বাড়াইব" বলা সহজ—কিন্তু একান্ত প্রয়োজনীয় কোন বিদেশী মূলধনী সামগ্রীর আমদানী কর্ত্তারা কমাইবেন—সামান্ত বুদ্ধিতে সামান্তজন তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

কর্ত্তাদের আশা ছিল টাকার মূল্য হ্রাস করিলেই আমাদের ভিক্ষার ঝুলি বিদেশের ভিক্ষার দানে একেবারে উপচাইয়া পড়িবে—কিন্তু বাস্তবে কি হইতেছে—কতটুকু ভিক্ষার দান বাড়িয়াছে? বলা হইতেছে—পরিকল্পনার সার্থকতার জন্ত বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু পরিকল্পনা কিসের বা কাহাদের জন্ত? দেশের শতকরা ৯৫ জন লোকই যখন অভাবে, অনটনে, অনাহারে প্রায় নির্ব্বাণের পথে চলিয়াছে তখন এই বিষম পরিকল্পনার কি প্রয়োজন ছিল। যতগুলি পরিকল্পনার কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে—এবং যাহা এখনো সমাপ্ত হয় নাই, তখন নূতন পরিকল্পনার জন্ত বিদেশের নিকট কোটি কোটি টাকা ভিক্ষা না চাহিয়া অসমাপ্ত পরিকল্পনাগুলি ধীরে ধীরে সমাপ্ত করিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত? আর বু'ঝয়া যায় নেহাৎ গন্দভেও করে।

পশ্চিম বাঙলার অসংখ্য শিল্প, বিশেষ করিয়া ঔষধ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি—কোন রকমে কৃষ্ণ-বাজারের দয়ায় টি'কিয়া ছিল, এইবার এইসব শিল্প-সংস্থা, বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি—শেষবার কৃষ্ণনাম লইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইবে!

মহারাজ অশোকের পর আজ এই নবাশোক ভারতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারত এই নবাশোককে ধর্ম্মাশোক বলিয়া মনে করিবে না, করিবে চণ্ডাশোক বলিয়া।

পুণ্য প্রতিষ্ঠান কলিকাতা কর্পোরেশন!

কলিকাতা পৌরসভা—অর্থাৎ কর্পোরেশন—সত্যই একটি পুণ্য প্রতিষ্ঠান এবং এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠিত যাঁহারা সেই কাউন্সিলারদের প্রায় সকলেই ধর্ম্মপুত্র এবং কোন প্রকার পাপকর্ম্ম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। যদি কেহ কোন পাপ বা অপকর্ম্ম করেন, ধর্ম্মপুত্রের দল সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে কলিকাতা কর্পোরেশনরূপ স্বর্গ (অথবা নন্দনকানন) হইতে বিদায় দান করেন। এবং এই কারণেই গত কয়েক বৎসরের ইতিহাসে দেখা যাইবে:

১। ১৯৫৭ সালে কমিশনার বি কে সেনকে বিবিধভাবে নির্য্যাতীত এবং অপদস্থ হইয়া পদত্যাগ করিতে হয়। বলা বাহুল্য শ্রীসেন কলিকাতা শহরের নানা প্রকার উন্নয়ন প্রয়াস করেন, যাহা পৌর-অপপিতাদের মনোমত হয় নাই—

২। ১৯৬৩ সালে জবরদস্ত কমিশনার শ্রী এস বি রায় পৌর-অপদেবতাদের ইতরামো-অসভ্যতার জ্বালায় অস্থির হইয়া পদত্যাগ করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, শ্রীরায়ের মত এমন সুযোগ্য এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিও পৌরসভা ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পদত্যাগে এক বিশেষ শ্রেণীর কাউন্সিলার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন।

৩. ১৯৬৪ সালে সুযোগ্য প্রশাসক কমিশনার শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ মাত্র চারিমাস কাজ করিয়া (টার্ম শেষ হইবার ৬ মাস পূর্ব্বেই) পদত্যাগ করেন—পদত্যাগ করিবার সময় শ্রীঘোষ উক্তি করেন যে—এই স্বর্গে পাপীর পক্ষে বাস এবং কাজ করা অসম্ভব!—এবং আপাতত শেষ:

৪। ১৯৬৬ সালে—দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই বিদায় লইলেন ভদ্র, কর্ম্মদক্ষ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কমিশনার শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (কমিশনারের চাকুরির মেয়াদ পাঁচ বৎসর, রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারেন)।

শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আর কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন এই প্রসঙ্গে। তিনি কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চীফ ভ্যালুয়ারের পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে কমিশনার পদ গ্রহণ করেন মাসিক চারিশত টাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়া। তাঁহার পদত্যাগ পত্র যেদিন বেলা আড়াইটার সময় রাইটার্স বিল্ডিংএ পৌঁছায় সেই দিনই—তাহার ঠিক একঘণ্টা পরেই ঐ পদত্যাগপত্র স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান কর্ত্তৃক গৃহীত হয়! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

এই বিষয়ে এমন সাংঘাতিক তৎপরতা দেখিয়া রাইটার্স বিল্ডিংএর অফিসার মহলও বিস্ময়-বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার বলেন যে, রাঁচীর একজন ডেপুটি কমিশনার যখন পদত্যাগ করেন, তাহা প্রত্যাহার করার জন্য তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করা হয়—কিন্তু তাহা তিনি না করায় কিছুকাল পরে তাহা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। এই পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যেই শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় যখন পদত্যাগ করেন—তাহাও গৃহীত হয় বেশ কিছুদিন পরে। স্বর্গত ডঃ রায় অন্নদাশঙ্করকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বহু অনুরোধ করেন, কারণ বিধানবাবু জানিতেন যে ভোটের জোরে মন্ত্রী ডজন ডজন পাওয়া অতি সহজ, কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দক্ষ সরকারী অফিসার এবং কর্মচারী ভোটের কল্যাণে সৃষ্টি করা অসম্ভব।

মন্ত্রীবর, পদত্যাগী কমিশনারের সহিত একটা কথা বলার, পদত্যাগের কারণের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজনই বোধ করিলেন না! অথচ বিদায়ী কমিশনারকে মৌখিক good conduct certificate দিতে মন্ত্রী মহাশয় দ্বিধা করেন নাই—কিন্তু শ্রীমুখোপাধ্যায়কে সামান্য সৌজন্য হইতে বঞ্চিত করা হইল অসঙ্কোচে! অবশ্য উচ্চমার্গীয় সরকারী মহাশয় ব্যক্তিদের (খুব কম কয়জন ছাড়া) নিকট হইতে আমরা সৌজন্যবোধ এবং প্রদর্শন—আশা করি না।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিষম অপরাধ তিনি কর্পোরেশনে কয়েকটি দুর্নীতির (পুণ্যকর্মের) অনুসন্ধান করিতে সুরু মাত্র করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে এই সকল দুর্নীতির অভিযোগে কেবল কর্পোরেশনের কয়েকজন অফিসারই নহেন—কিছু সংখ্যক পৌর-অপপিতাও জড়িত আছেন। প্রধানত এই কারণেই পৌরসভার ক্ষমতাশীল পাপ দুষ্টচক্র—উদ্বেগ বোধ করিতেছেন এবং পাপ বিদায় করিতে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন আত্মরক্ষার জন্য। আমরা জানি না বিদায়ী কমিশনারের সুরু করা দুর্নীতি-তদন্ত আর হইবে কি না, এবং হইলেও তাহার ফলাফল প্রকাশ পাইবে কি না।

সমস্ত ব্যাপারটা দেখিয়া মনে হয় যেন কলিকাতা কর্পোরেশনে ইতিপূর্ব্বে আর কোন পাপকর্ম কেহ কোনদিন করে নাই। কমিশনার শ্রীমুখোপাধ্যায়ই প্রথম পাপী—কর্পোরেশনের অপদেবতাদের ন্যায়-বিচারে! একথা সকলেই জানেন যে, পৌরসভার অপপিতারা নিজেদের কর্তব্য ছাড়া আর সকল ব্যাপারেই, সকল প্রকার অনাচার অবিচারে অতি এবং সদা তৎপর ও উৎসাহী। একটি সংবাদপত্র মন্তব্য করিয়াছেন—"Citizens of Calcutta have, over the weary years, have grown to expect almost anything from their Corporation except Civic Service!" এবং ইহা সত্ত্বেও কমিশনার শ্রীমুখোপাধ্যায়এর বিদায় (বিতাড়ন?) "...still comes as a shock!"

কলিকাতা কর্পোরেশন বনাম রাজ্য সরকার

প্রায়ই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামান্য কারণে এ-রাজ্যের অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পৌরসংস্থা অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি বাতিল করিয়া থাকেন অতি তৎপরতার সহিত। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতি রাজ্য সরকারের এ-নেকনজর কেন? শত শত অনাচার, পাপাচার, বিবিধ প্রকারে করদাতাদের অর্থের অপচয়, পৌর-অপপিতাদের স্বজন পালন, দলীয় লোকদের বিবিধ পৌর কর্মে নিয়োগ (পরম অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও)—এমন কি চুরি-চামারির প্রশ্রয় দান সত্ত্বেও কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেসী শাসন চলিতে দেওয়া হইতেছে কেন? ইহার একমাত্র কারণ কি এই যে কলিকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেসী রাজ্য সরকারের 'বি-টিম'? সর্ব্বনীতির ধারক ও বাহক নীতিসৌধ শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় কর্পোরেশন-কংগ্রেসী পার্টির ডিকটেটর। ঘোষ মহাশয় সর্ব্বভারতীয় ২নং নেতা। কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি দিবার সময় বোধ হয় নাই এবং সামান্য একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টিদানের প্রয়োজনও হয়ত তিনি বোধ করেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কলিকাতার করদাতারা অবশ্যই আশা করিতে পারে যে, রাজ্য সরকার করদাতাদের সামান্য স্বার্থ রক্ষা এবং কলিকাতা শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া হইতে রক্ষা করার জন্যও অন্তত কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে রাহুমুক্ত করিবেন অবিলম্বে।

গত কিছুকাল হইতে কর্পোরেশনের কাজকর্ম যে ভাবে চলিতেছে—আর কিছুকাল এইভাবে চলিলে কলিকাতা শহর মানুষ-বাসের অযোগ্য জলাভূমিতে পরিণত হইতে বাধ্য।

রাষ্ট্রপতির আবেদন :

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, "তরুণমতি ছাত্র, এমন কি বিদ্যালয়ের শিশুদেরও রাজনৈতিক এবং অন্য প্রকার বিক্ষোভ মিছিল এবং হাঙ্গামায় টানিয়া আনা হইতেছে—ইহাতে কেবল তাহাদেরই অনিষ্ট করা হয় না, দেশেরও সর্ব্বনাশ করা হইতেছে।" তিনি আশা প্রকাশ করেন ছাত্রসমাজকে, বিশেষ করিয়া স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিক্ষোভ মিছিল এবং হাঙ্গামা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কাহাদের নিকট এ আবেদন করিতেছেন? যাহারা নিজেদের দলীয় স্বার্থ এবং প্রচার ছাড়া আর কিছুই বুঝে না এবং দেশের প্রতি যাহাদের কোন শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং আনুগত্য নাই—তাহারা রাষ্ট্রপতির আবেদনে সাড়া দিবে এ আশা আমাদের নাই। গত কিছুকাল হইতে ভারতে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিতেছে ক্ষোভ এবং বিক্ষোভের প্রবল বন্যা এবং এই বিক্ষোভ-বন্যায় ছাত্রেরা যাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে, সেই শিক্ষককুলও গা ভাসাইয়াছেন। একথা অবশ্যই সত্য যে, শিক্ষকদেরও পরিবার আছে এবং তাঁহাদেরও স্ত্রী-পুত্রকন্যা প্রতিপালন করিতে হয় এবং তাহার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন যথেষ্ট। কিন্তু এই অর্থের দাবি আদায় করিতে যদি তাঁহারাও সাধারণ মানুষের মত রাস্তায় নামেন, তাহা হইলে আর কাহাকেও কিছু বলিবার থাকে না। সাধারণ শ্রমিকদের মত যদি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়েরাও মিছিল করিয়া পথে-ঘাটে হাঁকিতে থাকেন "আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে" এবং তাঁহাদের ছাত্রছাত্রীরাও যদি (শিক্ষকদের) সমর্থনে মিছিলে যোগদান করে—দৃশ্যটা অশোভন বলিয়া মনে হয়।

গত কিছুকাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে বিষম অরাজকতা চলিতেছে। ইহা সমাজ এবং দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিদের কেবল চিন্তান্বিত নহে, আতঙ্কিত করিয়াছে। দেশের বিবিধ প্রকার ব্যাধির মত শিক্ষা জগতের বর্ত্তমান এই অরাজকতাও একটি ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া মনে হয়—এ বিষয়ে কাহারো কোন বিশেষ গরজ নাই, সরকার শিক্ষাকে সামান্য একটা প্রশাসনিক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং মামুলী প্রশাসনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে শিক্ষার সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও এ বিষয়ে বিশেষ দায় বা দায়িত্ব নাই। সমগ্রভাবে সমস্যার সমাধান প্রয়াস না করিয়া সকলেই যেন দফায় দফায়—অর্থাৎ যখন যে সমস্যাটা সামনে আসে—তাহারই একটা গোঁজামিল মিটমাট করিতে চেষ্টান্বিত হয়েন যেমন ভাবে শ্রমিকদের দাবি, কিছু বেতন বা ভাতা বৃদ্ধি করিয়া সাময়িক অশান্তি নির্ব্বাপিত করা হইয়া থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই টেক্‌নিক বোধ হয় অচল।

মোট কথা—সর্ব্বদিক হইতে ক্ষতি হইতেছে ছাত্রদের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি তথা দেশের। সবকিছু দেখিয়া মনে হইতেছে ছাত্রদের বিদ্যার্জ্জন এবং শিক্ষকদের বিদ্যাদান নেহাতই অকিঞ্চিতকর বস্তু এবং ইহা না হইলেও আমাদের চলিয়া যাইবে, কোন প্রকার ক্ষতি না হইয়া।

বর্ত্তমান বৎসরে আজ পর্য্যন্ত সাকুল্যে তিন মাসও বোধ হয় স্কুল-কলেজ হয় নাই—নয় মাসের মধ্যে ছয় মাসেরও বেশী—ধর্ম্মঘট, আন্দোলন, প্রতিবাদ দিবস এবং ছুটিছাটার কল্যাণে ছাত্র সমাজ স্কুল-কলেজ মুখো হয় নাই। সামনে আছে পূজার বন্ধ, ডিসেম্বর মাসে স্কুল কলেজ কয়দিন হয় জানা নাই, দশ দিনের বেশী হয়ত নহে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে—বৎসরে বারো মাসের মধ্যে হয়ত কোনক্রমে পাঁচ মাস নিয়মিত স্কুল-কলেজ বসে—কিন্তু এই পাঁচ মাসে ছাত্রদের বিদ্যার্জ্জন কতখানি এবং কি পরিমাণ হয় তাহা শিক্ষক এবং ছাত্ররাও হয়ত বলিতে পারিবেন না। পরীক্ষা ত প্রায় একটা প্রহসনের ব্যাপার হইয়াছে! পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে পরীক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং মমত্ব প্রদর্শন করেন—ছাত্রদের পাস করাইবার জন্য ইচ্ছামত ১০ হইতে ২০।২৫ 'গ্রেস মার্ক' দেওয়ার রেওয়াজ আজকাল হইয়াছে—কিছু দিন পরে হয়ত ইহাই নিয়ম হইবে। যে-ভাবে পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া চলিতেছে তাহাতে এমন দিন হয়ত আমরা দেখিতে পাইব অচিরে—যখন 'পরীক্ষা অর নো-পরীক্ষা' ছাত্ররা 'গ্রেস মার্কের' দৌলতেই পরীক্ষা সাগর উত্তীর্ণ হইবে।

আগামী দু'তিন মাসের 'আগাম বাজারে'র যে প্রকার আবহাওয়ার সম্ভাবনা—তাহাতে অনতিবিলম্বে সকল শ্রেণীর শিক্ষকদেরই বিবিধ প্রকার দাবি আন্দোলন আরম্ভ করিবার কথা আছে (হয়ত বা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই)। এই আন্দোলন শ্রেণী-ওয়ারী

কিংবা সমবেতও হইতে পারে। মোটামুটি যতটুকু দেখা যাইতেছে। তাহাতে ১৯৬৬ সালে পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল প্রকার শিক্ষার পূর্ণ শ্রাদ্ধের আশা করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ অতি চমৎকার—একদিকে খরা কিংবা অতি বর্ষণের ফলে চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, অন্যদিকে ছাত্র এবং শিক্ষকমহলের প্রখরা আন্দোলন, কর্ম্মবিরতির ইত্যাদির কল্যাণে শিক্ষার চাষও প্রায় বন্ধ হইবার মুখে। অদূরে আরো কয়েকটি ভিয়েৎনাম দিবস, হরতাল, 'বন্ধ' এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার অনুষ্ঠানের কথা শুনা যাইতেছে—বাস্তবে ইহা ঘটিলে শিক্ষার শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

গণতন্ত্রের পূজারী—কংগ্রেস—

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কংগ্রেসী এম, এল, এ, গণ কম্যু দলপতি শ্রী:জ্যাতি বসুকে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে যে-ভাবে বিষম হৈহল্লা করিয়া থামাইয়া দেন, তাহাতে কেবল কংগ্রেসীরা নহেন, অকং'গ্রেসী জনগণও মুগ্ধ, চমৎকৃত হইয়াছেন। কংগ্রেসী দলের অজুহাত, বিরুদ্ধ দলীয় সদস্যগণ মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তৃতা দানে বাধা দেন এবং বিষম হট্টগোলের জন্য শ্রীসেনকে বসিয়া পড়িতে হয়, ইহারই প্রতিশোধ স্বরূপ—কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দ অনুরূপ কার্য্য কলাপ দ্বারা শ্রীজ্যোতি বসুকেও বক্তব্য পেশ করিতে বাধা দিয়া নিরস্ত করেন। খুবই ন্যায় যুক্তি এবং ইহার প্রতিযুক্তি দিবার কিছু নাই। কিন্তু কংগ্রেসী ছোট বড় মাঝারি—সকল সদস্যই অবিরত এবং স্থানে-অস্থানে গণতন্ত্রের মহিমা তথা আদর্শ লোক-সমক্ষে প্রচার করেন। লোকে আশা করে—কংগ্রেসী দেশভক্ত এবং গণতন্ত্রের পূজারীরা তাঁহাদের আচার-ব্যবহার এবং কার্য্যকলাপে গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিবেন, লোককে শিখাইবেন। ধরিয়া লইলাম—বিরুদ্ধপক্ষের সদস্যগণ মুখ্যমন্ত্রীকে কথা বলিতে না দিয়া ঘোরতর অন্যায় করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শবাদী কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দও যদি সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে আর একটা অন্যায় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অহরহ এবং বহুল প্রচারিত আদর্শের মান কতটুকু রক্ষিত হইল? কংগ্রেসী আত্মপ্রচারের মূল্যও বা কয় পয়সা?

বিধান সভায় কোন পক্ষেরই কোন অন্যায়কে সমর্থন করি না, বিশেষ করিয়া যাঁহারা নিজেদের আদর্শবাদী বলিয়া কেবল মনেই করেন না, প্রচারিত করেন, তাঁহাদের অন্যায় আচরণ ক্ষমার যোগ্য নহে। বঙ্গীয় বিধান সভায় শ্রীজ্যোতি বসু যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন, ভোটের জোরে কংগ্রেসী দল তাহা তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন (এবং ইহা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে)—কাজেই গণতন্ত্রী কংগ্রেসী দলের কোন বাস্তব ক্ষতি বিরুদ্ধবাদীরা করিতে পারিত না জ্যোতি বসুর প্রস্তাবে। সবকিছু জানিয়াও কংগ্রেসী দলের আচরণকে কি বলা যায়—ছেলেমানুষী না,—মায়েলী?

যেদিন বিধান সভায় এই হট্টগোল ঘটে সেদিন মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের ব্যবহারও লোকে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। বিধান সভার অধিবেশন কালে সভার কাজে হট্টগোল এবং বাধা সৃষ্টির জন্য প্রায়ই বিরোধী পক্ষের দু-চারজন সদস্যের নাম উল্লেখ স্পীকার মহাশয় করিয়া থাকেন—এবং অবস্থা বিশেষে দু'চারজন সদস্যকে বিধান সভা হইতে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়াও হইয়া থাকে—কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—যে-বিশেষ দিনের কথা বলিতেছি, সেইদিন বিধান সভার কাজে ইতর এবং অসভ্যজনোচিত হৈহল্লা এবং বাধা সৃষ্টির জন্য কোন কংগ্রেসী সদস্যের 'নাম করা' কিংবা সভা হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার কোন নির্দ্দেশই দেওয়া হয় নাই! কেন, এবং কংগ্রেসী গণতন্ত্রের কোন বিশেষ অধিকার বলে অপরাধী কংগ্রেসী সদস্যরা রেহাই পাইলেন? জবাব পাইব কি?

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন

আমরা ভাষাভিত্তিক রাজ্যে বিশ্বাস করি না। স্বর্গত নেহরুও এই মত পোষণ করিতেন এবং এ বিষয়ে বহু মূল্যবান কথাও বলেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ভারতের সর্ব্বরাজ্যেই কংগ্রেসী নেতারা নূতন করিয়া ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি তথা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এই দাবী এবং আন্দোলন যেখানে উৎকার পরিগ্রহ করিতেছে, সেইখানে কেন্দ্রীয় সদাশয় এবং বিচক্ষণ রাজচক্রবর্ত্তীরা তাহা সসম্মানে স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

অবস্থা যখন এমত প্রকার, তখন ভাগ্যহত পশ্চিমবঙ্গই বা কেন পিছাইয়া থাকিবে—ধলভূম, মানভূম, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া। উদ্ধৃত অঞ্চলগুলিতে বাঙ্গালী সংখ্যাগুরু এবং শতকরা প্রায়

১০ জনের ভাষা বাঙ্গলা হইলেও, উহাদের বিহার এবং আসামের সহিত যুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের জবরদস্তির কারণে। বিহার জবর দখল অঞ্চল হারাইবে এবং আসামের নগণ্য একটু জমি কমিয়া যাইবে, একমাত্র এই কারণেই বোধ হয় কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় অপহৃত অঞ্চলগুলি ফেরত দিতে নারাজ। তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের একান্ত ন্যায্য দাবিও আজ কেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত, অস্বীকৃত হইবে সর্ব্ববিষয়েই। দিল্লীর বর্ত্তমান মোগল দরবারে এমন একটি শক্তিধর চক্র আছে, যাহার কৃপায় পশ্চিমবঙ্গ একটি কেন্দ্রীয় 'ক্রাউন কলোনীতে' পরিণত হইয়াছে। এ-রাজ্যের এই নিদারুণ অবস্থার আশু পরিবর্ত্তন যেমন করিয়াই হউক করিতে হইবে। হৃত অঞ্চল ফেরত পাইবার জন্য বাঙ্গলা কংগ্রেস এবং অন্যান্য অকংগ্রেসী দলগুলিকে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের দাবি আদায় করিবার প্রতিশ্রুতিও দিতে হইবে।

রাজ্য কংগ্রেসের উপর আজ শতকরা ৯৫ জন রাজ্যবাসীর বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। মহানেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের নিকট হইতে একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। কাজেই আজ সাধরাণ জনকেই পশ্চিম বাঙ্গলার স্বার্থ এবং 'স্বাস্থ্য'-রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়িতে হইবে—এবং এই আন্দোলন কেবল "আমাদের দাবি মান্‌তে হবে"—এই ষ্টক বুলিতেই যেন পর্য্যবসিত না হয়, সে-বিষয়েও অবহিত থাকিতে হইবে।

এ রাজ্যের প্রশাসক-প্রধান মুখ্যমন্ত্রীকে একটি মাত্র অনুরোধ করিব, তিনি উচ্চাসনের মায়ামুগ্ধ না থাকিয়া, মহারাষ্ট্র এবং মহিশূরের মুখ্য মন্ত্রীদের মত পশ্চিম বাঙ্গলার হৃত অঞ্চলগুলি অযথা বিলম্ব না করিয়া যাহাতে বাঙ্গলার কোলে ফিরিয়া আসে সেই দাবি তুলুন—ইহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইবে। এই একটি মাত্র 'ইস্যু'তে আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহার এবং মন্ত্রীবর্গের জয়-পরাজয় নির্ভর করিতে পারে। হৃত অঞ্চলগুলি ফিরিয়া পাইলে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ভীষণতম জনসংখ্যার চাপ কিছু কমিবে—অন্যথায় আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ-রাজ্যে জনপ্রতি চারি বর্গফুট জমিও হয়ত থাকিবে না।

"মাতৃভাষা ও জাতীয় সংহতি"

প্রদ্যোৎ মৈত্র

মানব সভ্যতায় ভাষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানবীয় ইচ্ছা, ভাবনা, কল্পনা, মমতা সবই ভাষার দ্বারা প্রকাশ সম্ভব। শুধু তাই নয় সৃষ্টির আলোকে আমৃত্যু মানুষ একটানা তার সবকিছুর প্রকাশ একমাত্র ভাষায় ব্যক্ত করে চলেছে। তার অতি ইচ্ছা, অপরিমেয় মানস সৌন্দর্যের অনুভূতি সবই ভাষাকে নিতান্ত মাধ্যম বেছে নিয়েছে। এমনকি চিন্তার প্রকোষ্ঠ ছাড়া সাধণার আলাপ-আলোচনা, সভ্যতা, সংস্কৃতি শিক্ষার প্রসারতা ক্রমাগত ভাষার রোমন্থন ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন আদিম অন্ধকার যুগে সভ্যতার রেশ নিস্তেজ হয়ে ছিল তখনও আকার-ইঙ্গিতে চলত ভাষার আদান-প্রদান, বুঝত সবাই সেই ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করে। পাখীর ভাষা আছে তার সুরের অন্তরালে, যদিও তা বর্ণাত্মক নয় তবু সেখানেও তাদের চেতনার অনুভূতি একান্ত সতেজ। সেখানেও প্রগতির সংগতি।

তেমনি আজ সারা পৃথিবীর ভাষা, সৃষ্টির নবদিগন্ত ছেড়ে সার্থক হয়েছে সব জাতির এক কিংবা একাধিক ভাষা যার মাধ্যমে তার আলাপ, ইচ্ছা, কল্পনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কালো ঘোমটা-পরা স্তিমিত নিরেট রাত্রির অভেদ্য পর্দা ভেদ করে সৃষ্টির অমূলক ভ্রান্তি নয় বাস্তবতার চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে ভাষা ভাষা ছায়ার সংকীর্ণতাকে বিলীন করে দিয়ে।

জানার অসীম দিগন্ত ছেয়ে স্বপ্ন-ছোঁওয়া আকাঙ্খা জেগে থাকে ভাষা ভাষা চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে। ভাবতে চায় মানুষ সবকিছুর অসীমতা একক মাতৃভাষার উপর ভর করে। বিশ্বজোড়া কোন একক জাতীয় ভাষা নয় যার দেওয়াল উঠতে পারে পথের প্রতিটি ধাপে ধাপে। থম্‌কে যেতে হয় আচম্‌কা কুহেলিকার মত। কেননা সে ভাষা ইচ্ছার স্বাধীনতার বিরোধী, নখের ডগায় 'মানস প্রতিমা'র স্তব্ধতা আসে যেখানে Shelley-র ভাষায় Shadow of the idol of my thoughts'-এর calamity এসে ঠাওর করে শেষ সংকীর্ণতায়। অসম্ভব হয়ে পড়ে কবোষ্ণ ইচ্ছাগুলোর সীমিত রোশনাই যেখানে ভাষার খোয়াই নির্জন। স্তব্ধ রাতের তারার মতন নিশ্চলতা, যেখানে একক জাতীয় ভাষাকে একান্ত করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে জাতিধর্ম নির্বিশেষে। এমনি করেই প্রকৃত ভাষার গণ্ডি হয়ে পড়েছে সীমিত, সীমাবদ্ধ। মনের কোণের জানলা খোলা আকাশ লক্ষ্য করে করে বিশ্বের নির্দিষ্ট কোন একক ভাষা দিয়ে সে ক্ষেত্রে মানস-প্রতিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা অহেতুক অবচেতন মনের crude ছাড়া আর কিছুই নয়। চেতন মনের আয়নায় সে ভাষায় মননের ইচ্ছা, অন্ধকারে ব্যর্থতায় হোঁচট খাওয়ার মতই। এ ভাষায় প্রাণের স্পন্দন নেই, নেই কোন চেতনার স্পর্শ। সব বাধ্যতার ছেঁড়া ছেঁড়া সুতোয় জাল বুনতে চেষ্টা করা।

যে ভাষা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগত রোমন্থন করে করে তা আয়ত্ত হয়ে যায়, নিরেট কল্পনাকে ভাবা যায় অতি সহজে—তাই মাতৃভাষা। ভাবনা, চিন্তা, মনন, একান্ত বাস্তবতায় রূপ পায়। মাতৃভাষা আজ বিশ্বের সকল সভ্য দেশে শিক্ষার ও জ্ঞানের বাহন। কিন্তু বর্তমান যুগে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পথ এখন আঁধারের আবছা আলোয়। যথার্থ শিক্ষার একান্ত পথ স্বরূপ এই মাতৃভাষা। জন্ম থেকে মৃত্যুর শবছায়া অতিক্রম করা পর্যন্ত একই রীতিতে চলে আসছে যে এক একটি নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলা, শিক্ষা করা, ভাবের লেনদেনের পদ্ধতি, যদি তাতে বাধা পড়ে, যদি সে ভাষা ছেড়ে গ্রহণ করতে হয় অন্য ভাষার আলতো স্পর্শ, সে স্পর্শ হয়ে ওঠে জ্বলন্ত। ভাবনা আর কল্পনা হয়ে আসে নিঃশেষ সীমিত মনের কোণে। মনের চেতন পর্দায় তখন পুরনো আপন করে হৃদয়স্থ

করে আসা যে ভাষা, তাতে মাটি চাপা পড়ে। আপনাকে জড়িয়ে ফেলি নিদারুণ নবীন ভাষার জড়তায়, তার কর্কশতায়, তার কাঠিন্যে। তার কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরে যখন অপর এক ভাষাকে অনিচ্ছায়, বাধ্যতায় আপন করে গ্রহণ করতে হয়।

মাতৃভাষায় সাহিত্যের সৌন্দর্য, গভীরতা, স্পষ্টতা উপলব্ধি করা যায়। ভাষার মাধ্যমে "আমি যে আমি এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ইংরেজীতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আটে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিত ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা।" এখানে ভাষায় কল্পনা করা যায় কিন্তু real বলতে mind-এর conscious state-এ তার যে reflexion হয় তাই সত্য। তাকেই উধাও অসীমে ভাবতে গেলে হয়ত তার ভাবনার ভাষা infinity-তে গিয়ে পৌঁছবে। আপন আপন মাতৃভাষার বিশিষ্টতার প্রকাশ সম্ভব হয় তার ব্যাপ্তিতে। যা সত্য তার উপলব্ধি গভীরতায় বিলীন হয়, তাই যে সত্যকে আমরা 'হৃদয় মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। Truth is beauty-র ভাষায় তার অহেতুক Metaphysical কল্পনাই ভাষার সরসতাকে আড়ষ্ট করে ফেলে। তখন ব্যর্থতায় দুঃখের প্রকাশ। কিন্তু তা হ'লেও "দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা ; ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে। সেই 'ভূমৈব' সুখম।"

ভাষাকে তাই দ্বৈত ছকে ফেলা যায়। একটি ভাবের, অপরটি জ্ঞানের ভাষা। জ্ঞানের ভাষা হবে স্পষ্ট, জটিল নয়। সহজ-সরল কিন্তু ভাবের ভাষা অশেষ শৌখিনতার ভাষা, অলঙ্কারের সাজ সজ্জা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে"। "এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর একদিকে অস্পষ্ট কথারও।" কিন্তু তবু যেন ভাষার জড়তায় জাতির সম্পর্ক ভাবতে হয়, জাতীয় সংহতির কথা যখন অগত্যা প্রগলভ চিন্তার আকাশ-মাটি মনের দিগন্তে। জাতির সংজ্ঞা খুঁজতে হয় সব তাই ছিন্ন করে একাগ্র মনের কোনে।

জাতি বলতে বুঝি একক নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর এক ভাষা, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি, এক সভ্যতার চূড়ান্ত সমতা সমন্বয়। ভেদাভেদহীন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির যুগের ডায়ালে আবর্তন ভারতবর্ষে একাধিক ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি বর্তমান। ফলে জাতির একাধিক্য লক্ষ্য করি তার বৈশিষ্ট দেখে দেখে, সহজেই অনুমান করতে পারি ভারত এক অখণ্ড হলেও তার জাতি সংখ্যাতীত, অগণিত এবং ভাষা ধর্ম নির্বিশেষে তারা এক নয়। পার্থক্য পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যায় সেখানে। বাস্তব জগতে এক জাতির পূর্ণতা এখন আসে নি ভারত ভূখণ্ডে। জাতীয় সংহতির পথে তাই আজ বাধা পড়েছে এত বেশী। ফলে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার সুর সংগীতের বেহাগ পূরবীর নিতান্ত ভিন্নতায়, অভিন্ন নয় একক জাতীয়তাবোধের সুরেলা যন্ত্রণা যখন চেতন সত্তার ক্ষীণ রোশনাই ঠিকরে পরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে। জাতির বিভিন্নতার দরুণ একে অপরের ভাষা ধর্ম সভ্যতা মোটেই বুঝতে সমর্থ হয় না। তাদের নিজস্ব ভাষাকেই আঁকড়ে থাকে—আমৃত্যু, সভ্যতার আসমুদ্র ভেসে যায় ধর্ম সংস্কৃতির হাওয়ায় ভর করে। ফলে কেউ কারো ভাষা ধর্ম ত্যাগ করে এক জাতি এক প্রাণে আবদ্ধ হতে ভয় পায়। তাদের জাতীয় ঐক্যের পথে আসে নিদারুণ বাধা-বিপত্তি। জাতীয় সংহতি থমকে যায় সমস্ত বিবেচনার বিরাট দৃষ্টি কোণ থেকে। তাই জাতীয়তাবোধ জাগাটাই এখন আওতার বাইরে। সবটাই ঝাপসা, নতুন করে তার cadre সৃষ্টি করা নিতান্ত cataclysm। সেখানে নেই কোন প্রকৃত ব্যাকুলতা জাতীয় সংহতির গঠনে পরস্পরের মনের কাঠিন্তে। জাতীয় সংহতি বলতে একথাই শুধু বোঝায় না যে সারা দেশ জুড়ে এক ভাষা, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতির একক অখণ্ড অস্তিত্ব। যদিও সবার মতে জাতীয় ঐক্যের সংজ্ঞা প্রকৃত তাই। কিন্তু তেমন করে জাতীয়তা বোধ জাগানো মোটেই সহজ নয়। রংচটা মনটায় যখন কাব্যের জল রং দিয়ে তার স্নিগ্ধতা ফিরিয়ে আনা হয়, যখন কল্পনার উধাও দুপুর সময় গোণে কাব্যের আখরে, তখন ভাবনা করা উদাস

সৌন্দর্যবোধ স্বচ্ছ হয়ে আসে নিশ্চল মানস-পটে। তখন সেই আপন ভাষার সরস স্নিগ্ধতা কেউ উপেক্ষা করতে চায় না, তখন জাতিকে জাতি বলে চিনতে পারাটাই নিতান্ত দৃষ্টির বাইরে। কেননা জাতি বলে তার সংজ্ঞা কিছু নেই। তার ভাষা নেই, ধর্ম নেই; যদিও বা থাকে তার একক সত্তার স্বীকার নয়। তবে জাতীয় ঐক্য সম্ভব হবে একটি সর্তে, মুহূর্তে, তাতে নেই কোন ধর্ম, সংস্কৃতি, কিংবা ভাষার জটিলতা বা গোঁড়ামি। তাহ'ল 'sentiment' —বিবেক। বিবেকে যখন ভাবা যায় আমরা এক, জাতি এক প্রাণ তখন প্রকৃত জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতির চরম সীমাকে উপলব্ধি করি। চেতন-শক্তির আস্ফালন বেড়ে যায় রক্তের সমগতিতে। সবার বিবেক থেকে যখন নিজেকে এক জাতির পর্যায় ফেলবার চিন্তা করবো তখন তার কোন বিপর্যয় নেই, তার চিন্তা তখন অবাস্তব নয়। কেবল ভাষা, ধর্ম দিয়ে জাতীয়তা বোধ জাগানো নিতান্তই কুহক, মনভোলানো কাগজের ফুলস্বরূপ শৌখিনতা। তার সমাধান মৃত্যুর গণ্ডি পার হয়ে যায় তীরের আশায়, ব্যর্থতা আসে জীবনের প্রতিটি পাতায়। অবশেষে সেই ছেঁড়া পাতা নিয়েই জোড়াতালি মেরে শেষ করতে হয় প্রগাঢ় চিন্তার শিয়রে বসে। যদিও বা কোন ভাষা, ধর্মকে বাদ দেওয়া যায় তবে তাতে জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন হয় না। অর্কেষ্ট্রার স্বরূপ একাধিক যন্ত্রের সমন্বয়। কিন্তু যদি তার একটা যন্ত্র বাদ পড়ে তবে তা বেসুরো হয়ে যায়। সেখানেই তার প্রকৃত সুরের ব্যর্থতা আসে। কিংবা গাছের সৃষ্টিকে যদি লক্ষ্য করি তবে সেখানেও এক চিরন্তন সত্তার চলমান গতি জ্ঞানের কোটরে এসে ঠেকে। তাহ'ল গাছ কেবল যে একটি অংশেই তৈরি তা নয়। তার শাখা-প্রশাখা, ডালপালা, লতাপাতা, কাণ্ড-মূল সবের জড়িত সমন্বয়; একটিকে বাদ দিলে গাছটাই অসমাপ্ত। নামের সার্থকতা বৃথা। তেমনি যেন রামধনুর, সুতরাং এর এক অপূর্ব সমন্বয় সবার চোখের দৃষ্টি বাঁকা করে দেয়, আনত চোখে দৃষ্টি মেলতে হয় তার অপূর্বতা লক্ষ্য করে। তাই একথা কখনই গ্রহণীয় নয় যে সর্বধর্ম, সব ভাষা, সব সংস্কৃতি সভ্যতার উচ্ছেদ করে দিয়ে কোন একের অস্তিত্ব রাখাই যেন জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতির চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু তা মনের ভুল। যুদ্ধের আষাঢ় ঘনালে একথা কখনই আমরা উচ্চারণ করতে পারি না যে যুদ্ধের শিয়রে প্রথম যাবে পাঞ্জাবী কিংবা মারাঠি, সেখানে ভেদাভেদের প্রশ্ন নেই। সবাই এক। সবার যাত্রাই প্রথম এবং শেষ। আগে-পরের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাই বলা যেতে পারে কেবল একটা সর্বভারতীয় ভাষা চাপিয়েই জাতীয় সংহতির পথ চওড়া করা নয়, সেখানে **compulsion can never produce unity of hearts**। শুধু sentiment-এর গভীরতা ছাড়া চেতন-মনে তাই বলা যায় **A nation is one when all people feel themselves to be a nation sentimentally**, কিন্তু তথাপি যেন আজকের যুগে ভাষাটাই একটা নিদারুণ সমস্যা হয়ে উঠেছে। আজ সবার মনে এই ধারণাটা নিরেট স্পষ্ট হয়েছে যে একটি সর্ব-ভারতীয় ভাষার প্রচলন না হলে আন্ত-প্রাদেশিক সভ্যতা, ঐক্য গড়ে উঠবে না। এমনকি কেউ কারো পরিচিত না হয়ে চিরকাল অচেনা পর্দার আড়ালে বেঁচে থাকবে। এক সর্বভারতীয় সভ্যতার পথে ভাষাটাই পাথর চাপা হয়ে পড়ে থাকবে। তাই ভাষার নিথর রূপ ভেঙ্গে ফেলে তার সমাধান না করা পর্যন্ত জাতীয় সংহতির পথ বন্ধ, শান্তি নেই।

অনেকের মতে হিন্দীই হ'ল একান্ত শ্রেষ্ঠ ভাষা ভারতীয় জনসমাজে। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে ভারতের পাঁচ কোটি ভারতবাসী বাংলা ভাষার ভক্ত এবং তাতেই তাদের জীবন-প্রবাহের ধারা বেয়ে চলেছে। প্রতিটি মাতৃভাষায় রয়েছে তার স্নিগ্ধতা, কমনীয়তা, যা এক সর্বভারতীয় কঠিন শুষ্ক ভাষায় তার এরূপ ফুটতেই পারে না। তবু একথা ঠিক যদিও বা এক সর্বজনস্বীকৃত রাষ্ট্রিক ভাষার সৃষ্টি হয় তবে মাতৃ ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। তার সত্তার স্বাধীনতা চিরন্তন, নিত্য, শাশ্বত হয়ে রইবে। তবে যে ভাষা আজ রাষ্ট্রিক ভাষা হিসাবে গণ্য হবে তা হবে প্রধানতঃ ব্যবহারিক ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা। চেনার সঙ্গে অচেনার আলাপনের ভাষা। সাহিত্যের ভাষা নয়। আত্মপ্রকাশের ভাষা নয়। সৌন্দর্যের ভাব

প্রকাশের ভাষা নয়। কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্রীয় ভাষাকে কখনই মাথায় করে রাখা নয়। যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপমায় ব্যবহার করেছেন তা আমার এই critique এর ভেতর রূপ নিয়েছে। একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীক কাজের সুবিধা করা চাই বৈ কি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ আপন ভাষার মাধ্যমে দেশের চিত্ত সরস করা, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা। তাই বলে "দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।"

ইউরোপের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে পারি যে সেখানে এক দেশে একাধিক ভাষা থাকলেও তার সংস্কৃতি, ঐক্য পুরোদমে দৃঢ়তা বজায় রেখেছে। সেখানে জাতীয় সংহতি কোথাও ভাষাকে কেন্দ্র করে এতটুকু শ্লথ হতে পারে নি। তবে ভারতীয় দিক থেকে রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রয়োজন-বোধ অতিমাত্রায় সবার উপলব্ধি হয়েছে। তাই তার সমাধানের প্রচেষ্টাকে একান্ত গভীর নৈরাশ্যে ঠেলে দিলে চলবে না। তবু একটা দিক আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে confer করতে হবে। ভাষার যদিও একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে, সে কাজের নয়, আত্মপ্রকাশের। কিন্তু যেটি কৃত্রিম রাষ্ট্রভাষা হতে চলেছে তার কয়েকটা নীতির অনুসরণ করাই প্রযোজ্য। যেমন সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতে হিন্দি শিক্ষা করা ভাষা নয়, ঘরের ভাষা। তার প্রচলিত সংখ্যা হ'ল চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। তথাপি আরো আট কোটি অষ্টাশি লক্ষ লোক স্বেচ্ছায় আপন ভাষা cede করে হিন্দির প্রেমে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই একেই যেন সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষার পর্যায় নিহিত করা চলে। তবে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ভাষা সুনীতিবাবুর মতে "কেবল উচ্চ কোটির সাহিত্যের প্রসাদে আন্তঃ-প্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে কোন ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যারা ভাষা বলে, তাদের কর্মশক্তি, প্রসার-শক্তি, এবং অধিকার-শক্তির উপরেই সে ভাষার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বজন, কর্তৃক তার স্বীকৃতি নির্ভর করে। শেক্সপিয়র, মিলটন, শেলী, ব্রাউনিং, স্কট, ডিকেন্স পড়ার আগ্রহে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক ইংরাজী শেখে না—ইংরেজের কর্মশক্তি, প্রসারশক্তি ও অধিকারশক্তির জোরেই ইংরেজের ভাষার এত প্রতিষ্ঠা।"

অনেকের মতে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার উপযুক্ত মনে হ'লেও তা ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতির ক্ষেত্রে অচল। ব্যবহারিক ভাষা সেটা নয়। ভাষা সমস্যাকে এক বৃত্তাকারে পর্যবেক্ষণ করলে কোন ভাষাই উপযুক্ত নয়। তাই সেক্ষেত্রে নতুন ভাষার সৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। সুনীতিবাবু লাতিন কিংবা রোম লিপির অনুসরণে ভাষার সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। যা অদূর ভবিষ্যতে ভারত রোমক বর্ণমালায় দাঁড়াবে। সংখ্যাতীত অবাঙ্গালী জনসাধারণ হিন্দি বা উর্দু পেছনে আঠার মতন আটকে ধরেছে। যার ফলে ক্রমেই ভাষার দলাদলিতে একটা crisis বাধছে। তবে ultimatum-এ দেখা যাবে দুইয়ের মিশ্রণে ভাষার নতুনত্বেই এক সর্বজনস্বীকৃত ভাষার উদ্ভব হবে। কিন্তু তার অবস্থানের সঙ্গে ইংরেজীর মতন নিদারুণ একটা শক্তিশালী ভাষার অস্তিত্ব আমাদের মানতেই হবে। যার ভেতর লুপ্ত রয়েছে অশেষ জ্ঞানের পরিধি আর শিক্ষা-সংস্কৃতি। শুধু তাই নয় বিদেশীয় সেই Universal ভাষার চর্চা উপেক্ষা করলে চলবে না—যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সৌহার্দ বেঁচে থাকবে। সেই সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা থাকবে আপন মাতৃভাষা। ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা কখনই সেই সব প্রাদেশিক ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে না। যার প্রকাশ হবে অতি-ইচ্ছার স্বাধীনতায় ভর করে আপন আপন সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি। তবে গায়ের জোর দিয়ে কেবল হিন্দিই হবে না একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা। যেমন জোর গলায় ঘোষণা করেছে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রী থানু পিল্লাই। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তার কর্কশ কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে অকাতরে ঈর্ষা-কাতর তীর্যক চাহনির কনীনিকা ভেদ করে চরম হিন্দি-প্রেমের মর্মদায়ক বাণী। তার ঘোষিত বাণী ছিল, জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে যে সর্বভারতীয় ভাষাটির প্রয়োজন, তা হবে হিন্দি ভাষা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে কি করেই বা হিন্দির চোখ রাঙ্গানো খেটেছে, যা সত্যই সহ্যের অতিরিক্ত।

শ্রীরাজাগোপালাচারীও হিন্দির বিরোধিতা করে তাঁর গম্ভীর জোড়ালো কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তবু হিন্দিকে বিদ্রূপ করে তাই যেন বিদুর মহাশয়ের উপমাটি খুবই শৌখিনতার আবরণে আবৃত হয়েছে। প্রকৃত অন্তর্নিহিত অর্থটি সবার কাছেই একদৃষ্টিতে চমৎকার transparent হয়ে যাবে।

"বিবিধ ফুল ফুটে যেমন একটি বাগান, বিবিধ ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশেই তেমনি একটি পূর্ণ সংস্কৃতির পরিচয় থাকে। ভাষার সংহতির কথাটা আসলে কেমিক্যাল সোনা।"

সবশেষে একটা কথা দিয়েই আমার প্রবন্ধের দীর্ঘতায় ছেদ টানছি। তা হ'ল জাতীয় সংহতি শুধু মাত্র ভাষার সীমায় সীমিত নয়, তার আগে দরকার রাজনৈতিক ঐক্য, সামাজিক ঐক্য, অর্থনৈতিক ঐক্য। এগুলির climax সঠিক নির্ধারিত হলে তারপর ভাষার প্রশ্ন। ভাষাটা মুখ্য নয়, গৌণ।

জাতীয় ক্ষতিলাভ গণনায় চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবনতিকে গণনার মধ্যে আনিতে হইবে। যাঁহারা এরূপ গুরু বিষয়ে মন দিতে সমর্থ, তাঁহারা অবশ্য সর্ব্বপ্রথমে নিজের চরিত্রই পরীক্ষা করিবেন। তাহার পর আদালতে যে সব অপরাধের বিচার হয়, এবং যে সব ঘটনা আদালতের গোচর হয় না কিন্তু সমাজের লোকের গোচর হয়, তৎসমুদয়ের প্রতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক জাতীয় উন্নতি অবনতি কতদূর হইতেছে তাহা স্থির করিয়া বিহিত কার্য্য করিবেন।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৮

মাঝি

মিখাইল শোলোকফ

অনুবাদক—অমল হালদার

কসাক গ্রামখানির প্রান্তবর্তী সবুজ ঝোপের মধ্য দিয়া সূর্যের ক্ষীণ আভা দেখা গেল। যে খেয়ায় আমাকে ডন নদী পার হইতে হইবে, তাহা নিকটেই বাঁধা ছিল। ভিজা বালির মধ্য দিয়া আমি কোনোমতে হাঁটিয়া চলিলাম। বালির মধ্য হইতে যেন ভেজা কাঠের পচা দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ক্ষ্যাপা খরগোসের পায়ের দাগের মত ঝোপের মধ্য দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পথ গিয়াছে। গ্রামের পেছনে গীর্জা-প্রাঙ্গণে রক্তবর্ণ সূর্য অস্তে নামিয়া গেল। আমার পেছনে শুকনো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া গোধূলির আলো আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল।

খেয়া নৌকা ঘাটেই বাঁধা ছিল। নৌকার তলায় জল লাগিয়া ছল-ছল শব্দ উঠিতেছিল। হালগুলি ক্যাঁচকোঁচ শব্দে এপাশ-ওপাশ করিতেছিল। নৌকার শ্যাওলা-ঢাকা তলদেশ হইতে মাঝি তখন জল সেঁচিয়া ফেলিতেছিল। মাথা তুলিয়া আধা-হলদে মিটমিটে চোখে আমার দিকে তাকাইয়া সে যেন বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল,' পার হতে চাও? আমার হাতের কাজ এক মিনিটেই হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে না থেকে দড়িটা খুলে দাও না।'

আমরা দু'জনায় কি নৌকা বয়ে যেতে পারব?

চেষ্টা করে দেখা যাক। শিগগিরই অন্ধকার হয়ে যাবে। হয়ত আর কেউ এসে যেতে পারে। পায়জামা গুটাইয়া আমার দিকে আর একবার তাকাইয়া সে বলিল—বুঝতে পেরেছি, এদিকে তুমি নতুন আসছ। কোথা থেকে আসছ?

সৈন্যদল থেকে।

নৌকার মধ্যে টুপিটা রাখিয়া, ককেসাসের রূপোর মত মাঝে মাঝে কালো দাগওয়ালা তার চুলগুলো ঝাঁকা দিয়া পেছনে ফেলিয়া ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁত বাহির করিয়া সে আমার দিকে আরেকবার তাকাইল। তারপর জিজ্ঞাসা 'ছুটিতে যাচ্ছ বুঝি?'

আমাকে সৈন্যের কাজ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদের জাতকে আর ও কাজ করতে হবে না।'

হাল ধরিয়া আমরা দু'জনে বসিলাম। যেন বিদ্রূপ ছলেই নদী-পাড়ের ঝোপ-ঝাড়ের ডালপালার মধ্যে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। নৌকার কাঠের তলদেশে জল লাগিয়া শব্দ হইতে লাগিল। মাঝির নীল-শিরায় ভরা দু'খানি খালি পায়ে মাংস-পেশীর স্তূপ। ঠাণ্ডায় তাহার পায়ের তলা নীল হইয়া গিয়াছে। মোটা হাড়ওয়ালা লম্বা দু'খানি হাতের কব্জির শিরার মধ্যে জট পাকাইয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে।

তাহার কাঁধ নুইয়া পড়িয়াছে, পিঠ গিয়াছে বাঁকিয়া। হাল টানিবার সময় তাহাকে বড় বিশ্রী দেখায়। কিন্তু, তাহার হালের মধ্যে আলগোছা ঢেউ কাটিয়া জলে ডুবিয়া চলিতেছে।

তাহার একটুও পরিশ্রম হইতেছে না। তাহার সহজ ও স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ধ্বনি আমার কানে আসিতেছিল। আর নাকে আসিতেছিল তাহার গায়ের সেলাই-করা পশমের গেঞ্জী হইতে গায়ের গন্ধে, তামাকের গন্ধে, জলের গন্ধে মিশিয়া এক অদ্ভুত গন্ধ। হঠাৎ হালের উপর ভর দিয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরা এগুচ্ছি বলে ত মনে হচ্ছে না। বোধহয় গাছ-পালার মধ্যে আটকে গেছি। আর পারা যায় না।'

একটা জোরালো স্রোতের মুখে পড়িয়া আমাদের নৌকাখানি একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খাইল, গলুইটা সাংঘাতিকভাবে দুলিয়া ঘুরিয়া গেল, তারপর আমরা সোজা চলিলাম গাছের গুঁড়িগুলোর দিকে। আধ ঘণ্টা পরে দেখিলাম ডালপালার মধ্যে আটকা পড়িয়াছি। হালগুলি ভাঙিয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। দড়ি হইতে ভাঙা

হাল ঝুলিতেছে অসহায়ের মত। নৌকার তলা ফুটা হইয়া গল গল করিয়া জল উঠিতেছে। সে রাত্রে আমাদের গাছের ওপরই থাকিতে হইল। একটা ডালের দুই পাশে পা দিয়া মাঝি আমার কাছে সরিয়া আসিল। পাইপ টানিতে টানিতে সে কথা বলিতেছিল আর শুনিতেছিল মাথার উপর নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়া উড়িয়া-যাওয়া বুনো রাজহাঁসের পাখার শব্দ।

তা হ'লে তুমি বাড়ী যাচ্ছ? বেশ, বেশ। তোমার মা নিশ্চয়ই তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন। তার বুড়ো বয়সের একমাত্র অবলম্বন, তার ছেলে বাড়ী ফিরছে। এবারে বুড়ীর বুকে খুশি উথলে উঠবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমার কিছুই আসে-যাবে না তাতে। কোথায় তোমার মা বুক-কাটা উদ্বেগে তোমার জন্যে সারারাত কেঁদে কাটাচ্ছে তোমার তাতে কী বা আসে-যায়। তোমাদের ধরনই এই। যতদিন না পর্যন্ত তোমাদের ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে ততদিন বাপ-মায়ের দুঃখ তোমরা বুঝবে না। তবু সন্তানের জন্যে প্রত্যেক মা-বাপের অসহ্য যন্ত্রণা পেতে হবে।

মাছ কুটতে গিয়ে অনেক সময় মাছের পিত্তি গলে যায়। সে মাছ এত তেতো হয় যে মুখে তুলে আর গলা দিয়ে নামানো যায় না। আমার হয়েছে সেই দশা। বেঁচে আছি বটে, কিন্তু জীবনের ভোজে যাই মুখে তুলি না কেন, সব তেতো। তবু বেঁচে থাকি, বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি এ জীবনের শেষ সর্বনাশ হতে আর কতদিন বাকি!

এ অঞ্চলের লোক তুমি নও, এখানে তুমি নতুন আসছ। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পার, গলায় ফাঁস লটকে আমার মরা উচিত নয় কি?

আমার একটা মেয়ে আছে। নাটশা তার নাম। এই ঠিক সতেরোয় সে পা দিয়েছে। সে আমার বলে তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসতে আমার প্রবৃত্তি হয় না বাবা। তোমার হাতের দিকে তাকালেই আমার মনে পড়ে ঐ হাত দিয়েই তুমি আমার ভাইদের খুন করেছ, ঘেন্নায় আমার গা রি-রি করে ওঠে।

কিন্তু সে হতভাগী বোঝে না তার জন্যেই আর তার অন্য ভাইবোনের জন্যই আমার এই কাজ করতে হয়েছিল।

—আমি খুব অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু কপালে আমার এমন বৌ জুটল যে, সে বিয়োতে লাগল খরগোসের মত। এক-এক করে আটটি ছেলে-মেয়ে সে সংসারে আনল। নয়টি যেদিন হ'ল তার পাঁচদিন পরে বৌ মারা গেল জ্বরে। আমি পড়লাম একা। তবু ভগবান মুখ তুললেন না, নটি ছেলে-মেয়েই বেঁচে রইল। আইভান ছিল বড়। সে হ'ল আমার মত। কাল চুল শরীর স্বাস্থ্য ভাল। সুন্দর তার কসাক চেহারা, খুব চটপটে কাজের ছেলে। পরের ছেলেটা আইভানের চার বছরের ছোট, মায়ের মতই চেহারা—বেঁটে ও পেটমোটা। কাকের মত চুল, আধা নীল চোখ। তার নাম ছিল ড্যানিলো। আমি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম, আর সাতটির অনেকগুলো একেবারেই ছোট।

আইভানকে আমি গাঁয়েই বিয়ে দিলাম। শিগ্‌গিরই তারও একটা ছেলে হল। ড্যানিলোর জন্য যখন একটা ভাল মেয়ে খুঁজছি তখনই হ'ল "গোলমাল" সুরু। আমাদের কসাক গাঁয়ের লোকেরা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। আইভান দৌড়ে এসে আমায় বলল, বাবা, চল, আমরা সাম্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিই। দোহাই ভগবানের, তোমার পায়ে পড়ছি বাবা, সাম্যবাদীদের সঙ্গেই আমাদের চলতে হবে, তারাই ন্যায়ের পথে।

ড্যানিলোও আমাকে বোঝাতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে তারা আমাকে বহুভাবে বোঝাল, অনেক খোসামোদ করল। কিন্তু আমি বললাম, জোর করে তোমাদের কিছু করতে চাই না। তোমরা যেখানে খুশি যেতে পার। আমি এখানেই থাকব। তোমরা ছাড়া আরও সাতটা পেটের আমাকে ভাত যোগাতে হবে। একটু কম হলে কেউ ছাড়বে না!

তারা চলে গেল। গাঁয়ের লোকেরা তখন যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আমায় ধরে তারা বলল, চল যুদ্ধে। আমি তাদের বললাম, তোমরা জান কত বড় পরিবার আমার ঘাড়ের

উপর। বাড়ীতে সাত-সাতটা ছেলেমেয়ে আমার এখনও বিছানায়। আমি মরে গেলে কে তাদের দেখবে?

কোন ফল হ'ল না। কেউ শুনল না আমার কথা। জোর করে আমায় পাঠিয়ে দিল যুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্র তখন গাঁয়ের কাছেই।

ইষ্টারের ঠিক আগে একদিন ন'জন বন্দীকে তারা ধরে নিয়ে এল। তাদের ভেতর একজন আমার ড্যানিলো। বাজারের ভিতর দিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। কসাকরা ঘর থেকে দৌড়ে বাইরে এসে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, পাজী বজ্জাত-গুলোকে শেষ করে ফেল। একবার জেরা করা হয়ে গেল অথবা দেরি না ক'রে ওদের একেবারেই শেষ করে দেব।

আমার পা-দুটো ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু ড্যানিলোর জন্যে যে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, সেটা তাদের জানতে দিতে চাই না। আমি লক্ষ্য করলাম, আমার দিকে মাথা নেড়ে কসাকরা নিজেদের ভেতর কি বলাবলি করছে। সার্জেণ্ট মেজর আর্কিপ আমার কাছে এসে বলল, এই কমিউনিষ্টদের আমরা এখন শেষ করব, মিকিশারা। আসবে তুমি আমাদের সঙ্গে?

কেন আসব না? নিশ্চয় আসব—আমি বললাম।

তা হ'লে এই নাও বেয়োনেট। এই এখানে দরজার মুখে দাঁড়াও। বলেই সে আমার দিকে একবার অদ্ভুত-ভাবে তাকাল, তারপর বলল, তোমার দিকে আমার নজর রাখব, মিকশারা। সাবধান হে বন্ধু। এদিক-ওদিক হলে তোমার বিপদ হতে পারে।

দরজার সামনে এসে আমি দাঁড়ালাম। মাথার ভিতরটা ঘুরে উঠল, 'হায় ভগবান, নিজের হাতে ছেলেকে মারতে হবে। পাহারা-ঘর থেকে ক্রমেই বেশি বেশি আওয়াজ আসতে লাগল।

বন্দীদের বের করে আনা হ'ল। প্রথমেই ড্যানিলো। তাকে দেখেই ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। মাথাটা তার ফুলে উঠেছে সাংঘাতিক—চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে। রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে সারা মুখে দলো বেঁধে রয়েছে। চুলের ভেতর ঠাসা রয়েছে দুটো পুরু পশমের দস্তানা। মারের চোটে থেঁতলে যাওয়া জায়গাটায় তারা দস্তানা চাপা দিয়েছে। রক্ত শুষে শুকিয়ে চুল কামড়ে পড়ে আছে দস্তানাগুলো। গাঁয়ে আনবার সময় পথের মধ্যেই এই করা হয়েছে। দরজার সামনে আসতেই ড্যানিলো আবার ঘুরে পড়ে যাওয়ার মত হ'ল। তারপর আমায় দেখতে পেয়ে দু'টি হাত সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। সে হাসতে চেষ্টা করল। একটা চোখ তার রক্তে একেবারে বুজে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম যদি আমি তার সঙ্গে না যাই, তবে গাঁয়ের লোক তৎক্ষণাৎ, আমায় মেরে ফেলবে আর বাপ-মা-হারা আমার ছেলে-মেয়েরা পড়বে একেবারে অকূলে।

আমার কাছে আসতেই ড্যানিলো বলে উঠল, বাবা, বাবা, বিদায়। তার গাল বেয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ে রক্ত ধুয়ে যাচ্ছে। হাত দুটো তখন আমার কাঠের মত ভারি হয়ে পড়েছে, কিছুতেই তুলতে পারলাম না। বেয়োনেটটা আমার বাহুতে যেন একেবারে আটকে গেছে। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আমি বাছাকে মারলাম, ঠিক এই জায়গায়, ঠিক কানের পিছনটায়, 'উঃ' 'উঃ' শব্দ করে হাতে মুখ চেপে সে পড়ে গেল। আমার কসাক বন্ধুদের তখন হাসতে হাসতে দম ফেটে যাবার উপক্রম। মার হে মিকিশারা, মার। তোমার ড্যানিলোর উপর তুমি চটে আছ দেখছি। আবার মার। না মার ত আমাদের হাতে তোমার কিছু রক্তপাত হবে।

এমন সময় বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেকটা লোক-দেখান ভাবেই তার লোকদের চেঁচিয়ে ধমক দিলেন। কিন্তু চোখে তার হাসি দেখলাম স্পষ্ট।

বন্দীদের উপর লাফিয়ে পড়ে কসাকরা তাদের বেয়োনেটে বিদ্ধ করতে লাগল। আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এল। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না, দৌড় দিলাম রাস্তা দিয়ে। আমি যে দেখছি, ড্যানিলো আমার মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। হাতের বেয়োনেট

সার্জেণ্ট মেজর তার গলায় বসিয়ে দিল। ড্যানিলোর মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল কররূ... !

জলের ভারে নৌকার কাঠগুলো ক্যাচ ক্যাচ করিয়া উঠিল। আমাদের পায়ের তলায় আলডার গাছের গুঁড়ি হইয়া পড়িল। জলের উপর ভাসিয়া ওঠা নৌকার তলাটা মিকিশারা পা দিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, তারপর পাইপ হইতে তামাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে বলিয়া চলিল, নৌকাটা ডুবে যাচ্ছে। কাল দুপুর পর্যন্ত আমাদের এখানেই বসে থাকতে হবে। মহা মুস্কিলে পড়া গেছে।

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙ্গা গলায় ধীরে ধীরে আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল—

সেদিনের কাজের জন্যে তারা আমাকে পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব দিল। সে আজ বহুদিনের কথা, তারপর বহু জল ডন্ নদী দিয়ে বয়ে গেছে। কিন্তু এখনও রাত্রে আমি মরণ গোঙানি শুনতে পাই, কে যেন দম আটকে মরছে। সেদিন দৌড়ে যেতে যেতে যে শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম আমার ড্যানিলোর গলা থেকে, ঠিক সেই শব্দ।

ঠিক এমনিভাবে বিবেক আমার উপর প্রতিশোধ নেয়। বসন্তকাল পর্যন্ত আমরা কমিউনিষ্টদের ঠেকিয়ে রাখলাম। তারপর জেনারেল সেক্রেটিয়েভ আমাদের দিকে যোগ দেওয়াতে ডনের ওপারে সারাটোভ প্রদেশের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত আমরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম।

আমার ছেলেরা কমিউনিষ্টদের দিকে যোগ দেওয়া, কাজে আমার খুবই অসুবিধা হতে লাগল। বালাসোর শহর পর্যন্ত আমরা এগিয়ে গেলাম। আইভানের খবরই আমি তখন পর্যন্ত পাই নি, সে কোথায় আছে তাও জানতাম না। কিন্তু হঠাৎ কসাকদের মধ্যে একটা গুজব রটে গেল—কে রটাল ভগবান জানেন—আইভান না কি কমিউনিষ্টবাহিনী ছেড়ে দিয়ে ৩৬শ কসাক ব্যাটারীতে যোগ দিয়েছে।

গাঁয়ের লোকেরা আমাকে শাসিয়ে গেল—তোমার ছেলেকে একবার হাতে পেলে তাকে ঘাস খাইয়ে ছেড়ে দেব। একটা গ্রামে পৌঁছে দেখলাম ৩৬ কসাক ব্যাটারী সেখানে রয়েছে। আইভানকে খুঁজে বের করে তারা হাত-পা বেঁধে পাহারা-ঘরে নিয়ে এল। সেখানে তার উপর চলল অকথ্য প্রহার। তারপর তারা আমায় বলল—

'নিয়ে যাও একে রেজিমেণ্টাল হেড কোয়ার্টার্সে'।

হেড কোয়ার্টার্স গ্রাম থেকে কিছু দূরে। আমার কাগজপত্র বুঝিয়ে দিলে আমাদের কোম্পানীর কমাণ্ডার। অন্যদিকে তাকিয়ে আমায় বললেন, এই নাও কাগজপত্র মিকিশারা। ছোঁড়াটাকে নিয়ে যাও হেড কোয়ার্টার্সে। তুমি সঙ্গে থাকলে ওর সম্বন্ধে নির্ভাবনা হওয়া যাবে। বাপের কাছ থেকে ও আর পালিয়ে যাবে না।

তখন চট করে ভেতরের ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাকে তারা আইভানকে হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে যেতে বলেছে, কারণ তারা জানে বাপ হয়ে তাকে আমি নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব। তখন আমাকে ও ছেলেকে দু'জনকেই তারা এক সঙ্গে সাবাড় করবে।

যে ঘরে আইভান ছিল সেখানে গিয়ে প্রহরীদের বললাম, কয়েদীকে ছেড়ে দাও আমার হাতে। আমায় ওকে হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে যেতে হবে।

তারা বলল, বেশ ত। আর আমাদের কিছু করবার নেই। কাঁধের উপর বড় কোটটা ফেলে আইভান মাথার টুপিটা ঠিক করে নিল, তারপর কি ভেবে সেটা বেঞ্চের উপর ফেলে দিল।

আমরা গ্রাম ছেড়ে চললাম। পাহাড়ের পাশ দিয়ে আমাদের পথ। আমরা দু'জনেই নির্বাক। আমি পিছু ফিরে ফিরে দেখতে লাগলাম কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে কি না। এইভাবে এলাম প্রায় অর্ধেক পথ। একটা মন্দির আমরা ছাড়িয়ে এলাম। পেছনে কাউকে দেখা যায় না। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বড় করুণ গলায় আইভান বলে উঠল, বাবা, হেড কোয়ার্টার্সে নিশ্চয়ই তারা আমায় মেরে ফেলবে। তুমি আমায় মারতে নিয়ে যাচ্ছ। তোমার বিবেক কি এখনও ঘুমিয়ে?

—'না ঘুমুবে কেন' আমি জবাব দিলাম। তবে

কি আমার উপরে তোমার দয়া নেই।—দয়া নেই? বাছারে তোর জন্যে বুক যে আমার ভেঙে যাচ্ছে।

তা হ'লে আমায় ছেড়ে দাও তুমি। একবার ভেবে দেখ দেখি কত অল্প দিন হ'ল এ পৃথিবীতে আমি এসেছি। হঠাৎ সে আমার সামনে হাঁটু পেতে বসে তিনবার মাটিতে মাথা নোয়াল। আমি বললাম, এই ঢালু জমিটার শেষ অবধি চলে যাও। তারপর দৌড়তে সুরু কর। লোক দেখানোর জন্য আমি তখন কয়েকবার গুলী চালাব।

যখন ছোট তখন কোনদিন, বুঝলে ভাই, বাপকে কোনদিন ভাল মুখে একটা কথা সে বলে নি। কিন্তু তখন গলা জড়িয়ে ধরে আমার হাতে ও মাথায় সে চুমু খেল। কিছু দূর এক সঙ্গে গেলাম। কারও মুখে কথা নেই। ঢালু জমিটার সামনে আসতেই আইভান থেমে দাঁড়াল।

বিদায় বাবা, বিদায়! যদি আমরা দু'জনে বেঁচে থাকি, তবে তোমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমার দেখাশুনা করব। কোনদিন কড়া কথা বলব না।

সে আমায় জড়িয়ে ধরল। ব্যথায় আমার বুক তখন ভেঙে যাবার উপক্রম। আমি বললাম, আচ্ছা, এবার যাও। ঢালু জমিটা বেয়ে সে দৌড়ে নামতে লাগল। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে আমার দিকে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে সে চলতে লাগল। আমি গজ চল্লিশেক তাকে যেতে দিলাম। তারপর রাইফেল নামিয়ে এনে হাত কাঁপার ভয়ে হাঁটু পেতে বসে ঘোড়া টিপলাম—বুলেট বিঁধল গিয়ে ঠিক তার পিঠে।

পকেট হাতড়াইয়া মিকিশারা কিছুক্ষণ তার তামাকের কৌটা খুঁজিল, তারপর দৃঢ় নিবদ্ধ হাতে চকমকি ঠুকিয়া আগুন বাহির করিয়া ধীরে ধীরে পাইপ ধরাইল, মুখ হইতে একরাশ ধোঁয়া বাহির হইয়া গেল। তার হাতের চেটোয় কিছুক্ষণ আগুনটা জ্বলিতে লাগিল। মুখের পেশীগুলি তার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। আগুনের আভায় জ্বলিয়া ওঠা চোখের পাতায়। নিচ হইতে ছোট ছোট দু'টি চোখ দিয়া সে কঠিন নির্মমভাবে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রইল।

তারপর শূন্যে একটা লাফ দিয়া যন্ত্রণায় কয়েক গজ সে দৌড়ে গেল। হাত দিয়ে পাকস্থলীটা চেপে ধরে সে আমার দিকে ফিরে তাকাল। যেন বাবা, তারপর বাঁচতে পথে পা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আমাদের বাবাই পথ শেষ [illegible] আমার হাতের দিকে হাত বাড়িয়ে আমার ছেলে আছে, বৌ আছে···মাথাটা তার হেলে পড়ল। আঙুল দিয়ে চেপে ধরবার জন্যে তখন সে তার গুলী বেঁধা জায়গায়টা খুঁজে বেড়াচ্ছিল—কোথায় গেল জায়গাটা। তবুও তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে—যন্ত্রণায় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানি! তারপর চিৎকার করে আমার দিকে তাকাল সে ভীষণ ভাবে। কিন্তু বলবার শক্তি তার শেষ হয়ে এসেছে। কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু শুধু 'বা-বা,-বা-বা'—চোখের জল আমি রুখতে পারলাম না। আমি বললাম, বাছা আইভান, আমার জন্যে এ যন্ত্রণা তোমায় সইতে হবে। আমি জানি তোমার ছেলে আছে, বৌ আছে। কিন্তু আমার বাড়ীতে আমার সাতটা অসহায় শিশু। তোমায় যদি ছেড়ে দিতাম তবে কসাকরা আমায় মেরে ফেলত। আমার ছেলে-মেয়ে-গুলোকে তখন দোরে দোরে ভিক্ষে মেগে খেতে হ'ত।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল তারপর সব শেষ হয়ে গেল। তখনও আমার হাত তার হাতের ভেতর। আর ওভারকোট, বুট আমি খুলে নিলাম; এক টুকরো নেকড়া দিয়ে তার মুখটা ঢেকে দিলাম, তারপর গাঁয়ে ফিরে এলাম।

'তোমার হৃদয়ে দয়া থাকে তবে তাই দিয়ে আমার বিচার কর। ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে এতখানি দুঃখ আমি বহন করেছি, আমার চুল পেকে গেছে। যাতে তাদের রুটির অভাব না হয়, সেইজন্যে আমি খাটি দিন রাত্রি, আমার শান্তি নাই। তবু মেয়ে নাটশার সঙ্গে অন্য ছেলেমেয়েগুলো বলে, তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসতে ইচ্ছা করে না বাবা। আচ্ছা, লোক এত সহ্য করতে পারে।

মিকিশারা মাঝির মাথা সামনে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কঠিন দৃষ্টি মেলিয়া সে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে তখন বিষণ্ণ কুহেলিকার মধ্য দিয়া সূর্য উদিত হইতেছে।

নদীর দক্ষিণ তীরের পপলার বনের অন্ধকারের মধ্য হইতে ঠাণ্ডায় ভারী ঘুম-ভাঙা বিরক্ত গলায় কে যেন ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।······

মিকিশারা, খেয়া নিয়ে এস।

টেনিসন্ ও হ্যালাম

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

অসমতল—কিছুটা ঢালু জমির উপরকার সমার্সবী (Somersby) নামক ক্ষুদ্র পল্লীর ধর্মযাজক ছিলেন আলফ্রেড টেনিসনের পিতা ডক্টর টেনিসন। এই-খানেই আলফ্রেডের জন্ম। তিনি পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। এই পল্লীতে কোনো বিদ্যালয় ছিল না বলে লাউথ নামক গ্রামান্তরে তাঁর দিদিমার কাছে লেখা-পড়ার জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়। সেখানকার 'গ্রামার স্কুলে' তিনি কিছুকাল পড়তে থাকেন। কিন্তু সে স্কুলে বালকের মন বসল না এবং ১৮২০ সালে সেখান থেকে চলে আসেন।

তিনি পরবর্তী জীবনে সেখানকার স্মৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন—ঐ স্কুলটা আমার একেবারেই ভাল লাগত না। কয়েক ছত্র ল্যাটিন কবিতা সেখানে আমি মুখস্থ করেছিলাম এই যা হয়েছিল আমার লাভ। আর স্কুলটার জানলা দিয়ে দেখতাম চেয়ে পাশেই প্রকাণ্ড এক উঁচু দেয়াল—যার গা বেয়ে ফুটে উঠেছে চমৎকার লতাপাতার সৌন্দর্য। লাউথে থাকাকালে আমি একটা ইংরেজী কবিতা লিখেছিলাম যার একটা মাত্র লাইন মনে পড়ছে—"While bleeding heroes lie along the shore."

তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর।

এরপর তিনি সমার্সবীতেই ফিরে আসেন এবং তাঁর পিতা ডক্টর টেনিসনের কাছেই পড়তে থাকেন যিনি একজন বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু বড়ই রাশভারি মেজাজের লোক ছিলেন। ডক্টর টেনিসন তাঁর পুত্রদের গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, কলাবিদ্যা, অংকশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। আর ছেলেরা তাঁর বৃহৎ গ্রন্থাগারে পড়াশুনায় ডুবে যেত। সেখানে তারা পড়ত শেক্সপিয়ার, মিলটন, কারভান্‌টেস, বানিয়ান বার্ক, গোল্ডস্মিথ, অ্যাডিসন, সুইফট্ এবং ডিফো।

১৮২৭ সালে "পোয়েম্‌স্ বাই টু ব্রাদার্স" নামে এক কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। বইখানা লিখে-ছিলেন আলফ্রেড ও তাঁর এক বছরের বড় ভাই চার্লস। এ বইএর মূল্য বাবদ তাঁরা কুড়ি পাউণ্ড পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন এবং লিটারেরী ক্রনিক্‌ল নামক কাগজে ইহার উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আল-ফ্রেড টেনিসন নিজে পরিণত বয়সে বইখানির মধ্যকার তাঁর নিজের কবিতাগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"early rot."

১৮২৮ সালে চার্লস ও আলফ্রেড কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়তে যান। সেখানে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফ্রেডারিক আগে থেকেই পড়ছিলেন এবং পিরামিড সম্বন্ধে গ্রীক ভাষায় এক কবিতা লিখে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মেডেল পেয়েছিলেন। এখানে এসেও আলফ্রেডের প্রথম কিছুকাল ভাল লাগে নি। তখনকার এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—আমি প্যাঁচার মত চুপটি করে আমার ঘরে একলা বসে থাকি ; রাত হলে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই—তাকিয়ে দেখি ছাতে ছাতে টালির সারি আর আকাশভরা তারা। এখানকার বিরক্তিজনক একটানা সমতলভূমি, এখানকার একঘেয়ে আমোদ-প্রমোদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শুষ্ক শিক্ষাব্যবস্থা—এত রসকষ-বিহীন, এত matter of fact—এ সব আমার ভাল লাগে না। None but dry headed calculating, angular little gentlemen can take much delight in them.

কিন্তু কিছুকাল পরেই আলফ্রেডের বন্ধুর সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগল। তাঁর বন্ধুদের অনেকেরই ভবিষ্যৎ রাজনীতি বা ধর্মনীতি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বলে মনে হ'ত তাঁর কাছে। কিন্তু একাধারে সকল নীতির সম্ভাবনার প্রাচুর্য যে বন্ধুটির মধ্যে ছিল, যাঁর সর্বমুখীন প্রতিভার বিমুগ্ধ ও পরমপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে-ছিলেন তিনি এই আর্থার হ্যালাম। টেনিসন হ্যালামের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভে প্রচুর উপকৃত হলেন। তাঁর শুষ্ক বিমর্ষ মনোভাব ধীমান ও প্রাণবন্ত হ্যালামের সংস্পর্শে সরস ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। দু'জনেই কবিতা লিখতেন এবং পরস্পরের লেখার গুণাগুণ বিচার করতেন আর ধর্ম, দর্শনশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য

ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিস্তর আলোচনা চালাতেন। হ্যালাম্ সম্বন্ধে টেনিসন বলতেন যে তিনি অতি কঠিন ও জটিল বিষয় অতি সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারতেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এক কবিতা-প্রতিযোগিতায় টেনিসন একটি কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন। হ্যালাম তখন উৎফুল্ল হয়ে গ্লাডষ্টোন্‌কে লিখেছিলেন—আমি মনে করি কাব্যজগতে টেনিসনের ভবিষ্যৎ এত উজ্জ্বল যে আমাদের কালের, এমনকি এই শতাব্দীর, তিনিই হবেন শ্রেষ্ঠ কবি। এ সময়কার তাঁদের আর এক বন্ধু বলেছিলেন যে চিমনির অগ্নি-তাপের পাশে বসে তাঁরা সকলে যখন গল্প গুজব করতেন তখন টেনিসন অন্যমনস্ক ভাবে কবিত্বের গভীরে ডুবে যেতেন, আবার হঠাৎ একেকবার সকলের সঙ্গে আলোচনায়ও যোগ দিতেন। আর হ্যালামের গুণাবলীর কথাও টেনিসন ছাড়াও অনেকের মুখেই শোনা যেত।

একবার এক ছুটির সময় টেনিসন ও হ্যালাম একসঙ্গে বেড়াতে চলে যান ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে স্পেন দেশের কাছাকাছি। নিছক বেড়ানোই উদ্দেশ্য ছিল না, অত্যাচারী স্পেনের রাজার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ দল তখন গড়ে উঠছিল যার অর্থের প্রয়োজন বুঝে এই দুই বন্ধু কিছু অর্থসংগ্রহ করে সেই বিদ্রোহ দলের নেতার হাতে পৌঁছে দেন। এই ভ্রমণের বিপদসংকুল অথচ মাধুর্যপূর্ণ স্মৃতি ও বন্ধুপ্রীতি তাঁদের মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। এই ভ্রমণকালে বিদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোলে বসে টেনিসন কয়েকটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে টেনিসন কেম্ব্রিজ ছেড়ে সমার্যবীতে চলে যান, কারণ সেখানে তাঁর পিতা মরণাপন্ন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে তাঁর মায়ের কাছ থেকে সংবাদ পান। যাবার আগে টেনিসনের কয়েক বন্ধুতে মিলে তাঁর বিদায়-ভোজ সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

টেনিসনের পিতা তার এক মাস পরেই মারা যান। পিতৃভক্ত টেনিসন কিছুকাল তাঁর পিতার খাটেই শুতে লাগলেন এই আশায় যদি পিতার আত্মা এসে তাঁকে কখনো দর্শন দেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

সমার্সবীতে নতুন ধর্মযাজক যিনি এলেন ডক্টর টেনিসনের জায়গায় তিনি টেনিসন্ পরিবারকে সেই আশ্রমেই থেকে যেতে অনুমতি দিলেন। এখানে হ্যালাম প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। সমগ্র টেনিসন্ পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং টেনিসনের এক ছোট বোন এমিলির সঙ্গে হ্যালামের বিবাহ-প্রস্তাব ইতঃপূর্বেই পাকাপাকি হয়ে যায়। টেনিসনের অপর তিনটি বোনের মত এমিলিও বেশ সঙ্গীতজ্ঞ ছিল। হ্যালাম এমিলিকে ইটালিয়ান ভাষা শেখাতেন এবং এক সঙ্গে দাঁন্তে (Dante), পেট্রার্ক, টাসো এবং আরিওস্টোর বই পড়তে থাকেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে টেনিসন অনেক কবিতা লেখেন, তার মধ্যে The Lady of Shallot বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেখানি ফ্যানি কেম্বল্ নামক বিখ্যাত অভিনেত্রী খুবই তারিফ করেছিলেন। আর হ্যালাম তখন লিখছিলেন আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ ও বিচিত্র মন্তব্য। হ্যালামও কেম্ব্রিজের পড়া ছেড়ে দেন। তিনি তখন লিখেছিলেন—কেম্ব্রিজে গিয়ে আবার থাকার কথা আমি আর ভাবতে পারি না, সেখানে কোনো আনন্দ আর নেই।

১৮৩২-এর জুলাই মাসে টেনিসন ও হ্যালাম রাইন নদীর বক্ষ বেয়ে জলপথে অনেক দ্রষ্টব্য দেশ দেখে দেখে বেড়াতে থাকেন। ফিরে এসে এই ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনামূলক টেনিসনের সুন্দর সুন্দর কবিতার সমষ্টি মুদ্রিত হয়। কিন্তু এই পুস্তকখানা প্রকাশিত হবার পর সাময়িক কাগজে তীব্র তিক্ত সমালোচনা হতে থাকে—যার ফলে টেনিসন এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে তিনি মনে করেন ইংলণ্ডে তাঁর কবিতার সমাদর হবে না এবং স্থির করেন যে, দেশ ছেড়ে বিদেশের কোনো স্থানে গিয়ে বসবাস করবেন। কিন্তু হ্যালাম ও অন্যান্য বন্ধুদের সান্ত্বনা ও পরামর্শদানে তিনি সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং বইখানির কোনো কোনো কবিতা পরিবর্তন ও কয়েকটা একেবারেই বর্জন করে নূতন সংস্করণ মুদ্রিত করেন। তার ফল ভালই হয়েছিল।

১৮৩৩ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে যখন টেনিসন স্কটল্যাণ্ডে ছিলেন তখন লণ্ডন থেকে হ্যালামের এক চিঠি পান। চিঠিতে লিখছেন—আমি মাঝে মাঝে তোমার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করি; আমার প্রিয় আলফ্রেডের জন্যে কেন যেন অকারণেই আমার চিত্ত আকুল হয়ে পড়ে।.........

......যাই হোক, তোমার স্কটল্যাণ্ড ভ্রমন কাহিনীর বর্ণনা পেলে আমি খুবই খুসী হই, কিন্তু তোমার এই ভ্রমণ

ব্যস্ততার মধ্যে সুদূর ভিয়েনায় তুমি আমার চিঠি লিখবে, এতটা জুলুম তোমার উপর আমি করতে চাই না। অর্থাৎ আমি খুব শীগগিরই ভিয়েনায় যাচ্ছি। এই চিঠি পাওয়া মাত্র টেনিসন্ ও কয়েকজন বন্ধু ছুটে যান লণ্ডনে হ্যালামকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। বিদায়-ভোজের আসরে টেনিসন তাঁর নিজের কোনো কোনো কবিতা আবৃত্তি করে হ্যালামকে পরিতৃপ্ত করেন।

হ্যালাম তাঁর পিতার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ায় চলে যান। সেখানকার পার্বত্য দৃশ্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন। ভিয়েনা সহরটা ফ্রান্স দেশের রাজধানী প্যারীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর লাগে তাঁদের। চিত্রকলার গ্যালারি দেখে হ্যালাম টেনিসনকে ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখেছিলেন—আহা! আলফ্রেড্! তোমায় যদি আজ কাছে পেতাম এই সৌন্দর্যরাশির মধ্যে! এসব দেখে তুমি নিশ্চয়ই কতই না-জানি কবিতা লিখে ফেলতে।

এর পরই টেনিসন্ যে সংবাদটা পান তা একেবারে চূড়ান্ত মর্মান্তিক। হ্যালামের পিতা ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর দৈনন্দিন প্রাতর্ভ্রমণের পর ফিরে এসে দেখেন হ্যালাম তখনও নিদ্রিত! জাগাতে গিয়েই বুঝলেন এ ঘুম আর ভাঙবার নয়। এ যে চিরনিদ্রা! মস্তিষ্কের এক শোণিত-শিরা হঠাৎ ছিন্ন হয়ে মারা গিয়েছিলেন। হ্যালামের বয়স তখন মাত্র বাইশ। তাঁর দেহ জাহাজে করে দেশে এনে সমাধিস্থ করা হয়।

টেনিসন ও তাঁর বোন এমিলি একেবারে ভেঙে পড়েন। টেনিসন তাঁর দুঃখ-সাগর মন্থিত ক'রে তাঁর কবিচিত্ত থেকে যে কাব্যামৃত উৎক্ষেপ করলেন বছরের পর বছর ধরে—দীর্ঘ সতের বছর পর সেই সকল খণ্ড কবিতাগুলি সঞ্চয় করে যে অপূর্ব কাব্যগ্রন্থখানি মুদ্রিত করলেন তার নাম দিলেন "ইন্ মেমোরিয়্যাম্"। ইন্ মেমোরিয়্যাম প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স্ অ্যালবার্ট বইখানির খুব প্রশংসা করেন। প্রিন্স্ অ্যালবার্টের মৃত্যু হয় ১৮৬১ সালে। তখন শোকবিধুরা মহারাণী ভিক্টোরিয়া আবার নিবিষ্ট মনে ইন্ মেমোরিয়্যাম কাব্যখানি পড়েন এবং খুবই সান্ত্বনালাভ করেন। তিনি টেনিসন্‌কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেন—আপনার এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রায় বাইবেলের মত আমার শোকসন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা প্রদান করেছে।

এর কিছুকাল পরেই টেনিসন্‌কে মহারাণী রাজকবির পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই গ্লাডষ্টোন্। তিনি লিখেছিলেন—ইন্ মেমোরিয়্যাম নামে টেনিসন্ যে কাব্যগ্রন্থখানি জগতকে উপহার দিলেন তা তাঁর প্রিয়বন্ধুর উদ্দেশে অর্ঘ প্রদানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বস্তুত এই বইখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে টেনিসনের কবি-খ্যাতি ও আর্থিক উন্নতি হতে থাকে। শুধু ইংলণ্ডে নয়, সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। বইখানির সূচনাটি যেন ভগবানের উদ্দেশে ভক্তের নৈবেদ্য!

তারপর স্তরে স্তরে শোকামৃত।

ক্লাইভের চন্দননগর অভিযান

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা দেশ। বাংলার অনেক পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। এই বছরেই নবাব সিরাজ রাজকোষ শূন্য দেখে অতিরিক্ত রাজস্ব দাবি করলেন কলকাতার ইংরাজ কুঠিয়ালের কাছে। ইংরাজেরা নবাবের এই দাবি মানলেন না। ফলে ২০শে জুন তারিখে নবাব কলকাতার কুঠি ও দুর্গ দখল করলেন এবং ইংরাজরা প্রাণভয়ে ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এর পরই নবাব চন্দননগর দখল করার ভয় দেখিয়ে সেখানকার কুঠিয়াল মসিয়েঁ রেনোঁর কাছ থেকে তিন লাখ টাকা আদায় করেন।

এই ধরনের অত্যাচার ও লুণ্ঠন চুঁচুড়ার ডাচেদের উপরও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনও পক্ষই নবাবের কাছে এই নীতি স্বীকার সহজে মেনে নিতে চাইলেন না। একদিকে যেমন ইংরাজ কোম্পানীর মাদ্রাজ কাউন্সিল কলকাতা আবার দখল করার চেষ্টায় থাকলেন তেমনি চন্দননগরের কুঠিয়ালও সহর ও দুর্গের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় মন দিলেন।

এই বছর অক্টোবর মাসে মাদ্রাজ কাউন্সিল কয়েকটি নির্দ্দেশসহ ক্লাইভ ও ওয়াটসনের অধীনে ১১ খানা জাহাজ ও প্রায় ৩,০০০ সৈন্য কলকাতা দখলের জন্য পাঠালেন। ক্লাইভের উপর তাঁদের কলকাতা পুনরাধিকার ছাড়া আরও আদেশ দেওয়া হ'ল যে নবাবকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে আর এই বাহিনী বাংলায় থাকাকালীন যদি ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের খবর আসে তা হ'লে চন্দননগর দখল করতে হবে।

ইংরাজদের ফরাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব অনেক কারণেই হয়েছিল। নবাব যখন কলকাতা লুণ্ঠন করেন তখন ইংরাজদের বাহিনী থেকে ছেড়ে আসা কিছু গোলন্দাজ সৈন্য ফরাসীদের অধীনে চাকুরিতে ছিল এবং এরাই নবাবের কলকাতা দখলে সহায়তা করে। এ ছাড়া নবাব ফরাসীদের কাছে বারুদের সাহায্য নিয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল যে, চন্দননগরের বাণিজ্যিক প্রসার বজায় থাকায় কলকাতার বাণিজ্য কিছুতেই বাড়ান সম্ভব হচ্ছিল না। ইংরাজের এই মনোভাব ক্লাইভের মাদ্রাজ কাউন্সিলকে লেখা পত্র থেকে জানা যায়। সেখানে তিনি জানান 'কলকাতাকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে চন্দননগরের পতন ঘটান ছাড়া আর কিছুই সময়োপযোগী হতে পারে না।'...'আমার আশা আছে, চন্দননগর ফরাসীদের হস্তচ্যুত করতে পারব।'

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ক্লাইভ কলকাতা এসে তাঁদের দুর্গ পুনরায় দখল করেন। এতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। নবাবকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ক্ষুদ্র একটি বাহিনী পাঠিয়ে হুগলীর মোগল দুর্গ বিধ্বস্ত করলেন এবং সহরটিকেও পুড়িয়ে শেষ করলেন।

ক্ষুব্ধ নবাব তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য আবার কলকাতা আক্রমণ করলেন। যাত্রাপথে ডাচ্ ও ফরাসীদের কাছে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন। কলকাতা অভিযানে হতাশ হয়ে ফিরে যাবার পথে ফরাসীদের কাছ থেকে আগের বছর নেওয়া টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দেন, এখানকার দুর্গটি সংস্কারের অনুমতি দেন এছাড়া মুদ্রা নির্ম্মাণের অধিকার ও কোম্পানীর ব্যবসার বাইরের ফরাসীদের অবস্থিতি অনুমোদন করেন।

এর কিছুদিন পর নবাব ইংরাজদের সঙ্গেও এক শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যার বলে নবাবকে বিপদে সাহায্য করা ছাড়া গঙ্গাবক্ষকে ইংরাজের রণতরীমুক্ত রাখাও একটি সর্ত্ত ছিল। বিভিন্ন পক্ষ পরস্পরের মধ্যে শান্তি বা অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে নবাব, ইংরাজ বা ফরাসী কোনও পক্ষই অপরকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই চন্দননগরের কুঠিয়াল রেণোকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র রক্ষার ব্যবস্থায় মন দিতে হ'ল। তিনি দুর্গ-সংস্কার ও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পণ্ডিচেরীর সাহায্য চাইলেন। ফলে মাত্র ২৩৪ জন ফরাসী ও দেশীয় সৈন্য লাভ করলেন আর অর্থ সাহায্য মোটেই পেলেন না।

এদিকে ইয়োরোপে ব্রিটিশ ও ফরাসী যুদ্ধ আসন্ন এবং ইংরাজদের হুগলী বিধ্বস্ত করার সময় ফরাসী পতাকা অভিবাদন না করে যাওয়াতে ইংরাজদের ফরাসী বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। ইংরাজের হুগলী অভিযানের কয়েকদিন আগেই ইংরাজেরা শান্তি চুক্তি স্থাপনের এক প্রস্তাব পাঠান এবং মসিয়েঁ রেণো এই সন্ধির জন্য তিনজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধিকে কলকাতা পাঠান।

দুর্গকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা সমানভাবে চলতে থাকে। স্থানীয় দুর্গটি—অরলিয়াঁ দুর্গ (Fort de Orleans) প্রায় ৬০ বছর আগে নির্ম্মিত হয় এবং এতদিন ঠিকভাবে রক্ষা না করায় অনেক সংস্কার করতে

হ'ল। ৬০০ ফুট বর্গাকারের দুর্গটির চারিদিকে প্রাচীর খুব মজবুত ছিল না এবং ৪ ফুট চওড়া একটি ছোট নালা মাত্র পরিখার স্থান নিয়েছিল। দুর্গ-প্রাকারে অনেকগুলি ছোট-বড় কামান সাজান ছিল। দুর্গের বাহিরেও কয়েকটি বড় কামান ছিল। যতদূর সম্ভব যোগ্য বাস্তুকারের অভাবে রেণো নিজেই দুর্গের সংস্কার-কার্য্যে তদারক করতে লাগলেন। শত্রুপক্ষের গতি ব্যাহত করার জন্য আড়াআড়িভাবে অনেকগুলি খাদ খনন করা হ'ল। দুর্গের গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে কোনও উঁচু বাঁধ না থাকায় জলপথে আক্রমণে বাধা দেওয়ার কোন উপায় ছিল না।

সৈন্য সংগ্রহের কাজও ঠিকমত চলতে থাকে। অতিরিক্ত ফরাসী সৈন্য ছাড়া কিছু বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ গোলন্দাজ ও ২০০০ হাজার মোগল সৈন্য রেণো সংগ্রহ করেন। দুর্গের প্রতিরক্ষার সমস্যা আরও কঠিন হয়ে পড়ে যখন ইংরাজের অভিযানের খবর পেয়ে দেশীয় শ্রমিক মিস্ত্রি সব সহর ছেড়ে চলে গেল। ১৫ ফুট উঁচু প্রাচীরের বাইরে ৩০ ফুট উঁচু কয়েকটি বড় আকারের বাড়ী থাকায় দুর্গকে রক্ষা করার সমস্যা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে রেণো বাধ্য হয়ে দুর্গের উত্তর দিকের সমস্ত বাড়ী ধ্বংস করেন। কিন্তু দক্ষিণের বাড়ীগুলি ফরাসী অধিবাসীরা আপত্তি করায় ধ্বংস করা সম্ভব হ'ল না।

কলকাতায় ফরাসী প্রতিনিধিরা গঙ্গাবক্ষে বাণিজ্য বা নিরপেক্ষতার চুক্তি করতে তিন দিন অবস্থান করেন। চুক্তি সই হবার আগেই অতিরিক্ত ৩ খানা জাহাজ সমেত আরও ৫০০ সৈন্য বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে যায়। এই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর দখল করারও নির্দ্দেশ আসে। ইংরাজদের বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব শুধু কিছু সময় কাটানর জন্য একটা ছল করা হয়েছিল। এ অবস্থা যে হবে সেটা মসিয়ে রেণো আগেই অনুমান করেছিলেন।

৩রা মার্চ নবাব পাঠান আক্রমণের ভয়ে ইংরাজের সাহায্য চান। উত্তরে ওয়াটসন জানান যে, চন্দননগরকে শত্রুর কবলে রেখে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন না। তাই তাঁরা নবাবের উত্তরের অপেক্ষায় চন্দননগরের নিকটেই অবস্থান করছেন। এই সময় নবাবের স্বাক্ষর নকল করে চন্দননগর আক্রমণের একটি নির্দ্দেশ ইংরাজেরা সংগ্রহ করে এবং এটা শুধু মুর্শিদাবাদের ইংরাজ কুঠিয়াল ওয়াটসের চাতুরিতেই সম্ভব হয়েছিল। খবর পেয়েই মুর্শিদাবাদের ফরাসী কুঠিয়াল ম'সিয়েল রায় দুর্লভের নেতৃত্বে ২০,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী চন্দননগর রক্ষার জন্য পাঠানর এক আদেশ নবাবের কাছ থেকে আদায় করেন।

এই সময়ে ক্লাইভের কূটনৈতিক দক্ষতা অপর সকল জাতের নেতার চেয়ে খুব উঁচু ধরনের ছিল। মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক বন্ধুলাভ, এমনকি অনেক ক্ষমতাবান লোককে নবাবের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসাবে নিয়োগ করা—এসবই ক্লাইভের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। নবাবের মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত যাকে নবাব বিরুদ্ধাচারী বলে জানতে পারেন নি সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মহারাজা নন্দকুমার পর্য্যন্ত ক্লাইভের সব কাজে সহায়তা করতে থাকেন। চন্দননগর অভিযানের সময় কিভাবে নন্দকুমার মোগল সরকারের দেওয়ানের পদে বহাল থেকে ক্লাইভকে সাহায্য করতে পারেন সে-বিষয়ে সবকিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা আগে থেকে হয়ে যায়। এর মধ্যে নবাবকে মিথ্যা সংবাদে বিভ্রান্ত করা, ক্লাইভের সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করা এগুলি অন্যতম।

এই রকম পরিবেশে ক্লাইভ বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১২ই মার্চ্চ চন্দননগর উপস্থিত হন। ১৩ই মার্চ্চ ক্লাইভ ইংরাজ সম্রাট ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় চন্দননগরের দুর্গ ও সহর সমর্পণ করার জন্য মসিয়ে রেণোর নিকট এক শমন জারি করেন।

মসিয়ে রেণো সহর সমর্পণ করা স্থির করেছিলেন কিন্তু কোম্পানীর অপর সদস্য ও উপনিবেশবাসীরা বাধা দেওয়ায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতে বা সহরকে রক্ষা করতে মনস্থ করেন। ক্লাইভ তাঁর আদেশের উত্তর পাবার আশায় মাত্র একদিন অপেক্ষা করলেন। ১৪ই মার্চ্চ বিকালে দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে প্রথম আক্রমণ করেন। নিকটবর্ত্তী অনেক বাড়ীতে রেণোর ভাড়া-করা মুসলমান সৈন্যকে ক্লাইভ বিতাড়িত করেন। ১৫ই মার্চ্চ ক্লাইভ দুর্গের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি বাড়ী দখল করেন।

ইতিমধ্যে যেসব মুসলমান সৈন্য দুর্গে স্থানাভাববশতঃ বিতাড়িত হয় তারা চুঁচুড়ায় নন্দকুমারকে জানায় যে চন্দননগরের দুর্গ ইংরাজেরা দখল করেছে। ২০,০০০ সৈন্যের যে বিরাট বাহিনী চন্দননগরের দিকে এগিয়ে আসছিল তাকে আসতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্লাইভ নন্দকুমার ও রায়দুর্লভকে ভয় দেখিয়ে দুখানিপত্র দেন। নন্দকুমার ক্লাইভকে এই সহর জয়ে সহায়তা করার উদ্দেশে নবাবকে ও রায়দুর্লভকে একই ভাবের দু'খানা পত্র দেন। তাতে তিনি জানান যে, চন্দননগরের পতন আসন্ন, কাজেই আর কোন সাহায্যের দরকার নেই।

১৬ই মার্চ্চ তারিখে নিরুপায় হয়ে দূরবর্ত্তী ফাঁড়িগুলি থেকে সৈন্য দুর্গে নিয়ে আসা হয় কারণ ইংরাজেরা নিকটবর্ত্তী বাড়ীগুলি থেকে দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ করতে থাকে।

একে ইংরাজের পদাতিক সৈন্য সংখ্যায় ফরাসীদের চেয়ে অনেক বেশী। তার উপর ফরাসীদের কোন যুদ্ধ জাহাজ নেই। তাই যদি জলপথে সহর আক্রান্ত হয় তা হ'লে কোন রকমে সহরকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই রকম বিপদ আশঙ্কা করে রেণো দুর্গের এক মাইল দক্ষিণে গঙ্গার প্রস্থ যেখানে কম সেখানে পাশাপাশি তিনখানি মাল-ভর্ত্তি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে বাধা সৃষ্টি করলেন। জাহাজগুলির মাস্তল জলের উপরে থাকায় অবস্থান জানতে মোটেই অসুবিধা হ'ল না।

১৬ই থেকে ১৮ই মার্চ্চ উভয় পক্ষে বেশ কয়েকবার গোলা বিনিময় হয়। ফলে ইংরাজদের সামনের দিকের কয়েকটি কামানের কেন্দ্র ধ্বংস হয়। নৌবাহিনীর মিলিত আক্রমণ ছাড়া যে দুর্গ জয় করা সম্ভব নয় এটা ক্লাইভ বেশ বুঝতে পারেন। ১৯শে মার্চ্চ ওয়াটসনের অধিনায়কত্বে কেন্ট, টাইগার ও সলসবেরী এই তিনখানা যুদ্ধজাহাজ কেল্লার দেড় মাইল দক্ষিণে এসে পৌঁছুল। ২০শে মার্চ্চ যখন ক্লাইভ প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করে দুর্গের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে কামান স্থাপন করতে সমর্থ হন, ওয়াটসনের বাহিনীও গোলা নিক্ষেপ করে ডুবিয়ে দেওয়া জাহাজের মাঝখানে পথ নির্ণয় করে নেয়। আরও দু'দিন ধরে দুর্গের সঙ্গে এবং পথ-যুদ্ধ করে ক্লাইভ আরও কয়েকটি স্থায়ী কামানের ঘাঁটি স্থাপন করেন।

২৩শে মার্চ্চ ভোরবেলায় জোয়ারের জল বেড়ে যাওয়ায় ইংরাজের তিনখানি রণতরী কেন্ট, টাইগার ও সলসবেরী অনায়াসে আগে থেকে ডুবিয়ে দেওয়া জাহাজের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসে ও দুর্গের পাশে গঙ্গায় এসে যায়। ইতিমধ্যে ক্লাইভ বিশেষ পরিশ্রমের ফলে দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি স্থায়ী কামান ঘাঁটি স্থাপন করেন। সকাল ৬টা থেকে এক ভীষণ কামান ও বন্দুকের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুর্গ থেকে জাহাজের সঙ্গে ও স্থলবাহিনীর সঙ্গে একই সঙ্গে গোলাগুলীর যুদ্ধ চলে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্গের পূর্বদিককার উত্তর ও দক্ষিণ প্রাকার ভগ্নপ্রায় ও কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পাঁচ ঘণ্টা প্রচণ্ড রকমের যুদ্ধে প্রায় ২০০ ফরাসী সৈন্য মারা যায়। ওদিকে ইংরাজের কেন্ট জাহাজটিও অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ধ্বংস হওয়ার অবস্থায় এসে যায়। এ অবস্থায় ইংরাজ সৈন্যরা কিছুটা নিজেদের সামলে নেওয়ার জন্য বিরতি দেন।

রেণো তখন দেখতে পান যে, দুর্গ-প্রাকার কামানের পাশে বেশীর ভাগ সৈন্য মৃত অথবা আহত। বাকী যারা তারাও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। প্রাকারগুলি যে কোনও সময়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে। ওদিকে ইংরাজ সৈন্যরা গঙ্গাতীরের বাঁধের কাছে এগিয়ে এসে আবার আক্রমণের আদেশ অপেক্ষা করছে। এই অবস্থায় আর দুর্গরক্ষা করা সম্ভব নয় বিচার করে রেণো যুদ্ধ বিরতি ও সন্ধির নিশানা হিসাবে শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

যুদ্ধ বিরতির নিশানা দেখানর সঙ্গে সঙ্গে আয়ার কুটকে দুর্গের দিকে প্রেরণ করা হয় এবং মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে আয়ার কুট রেণোর পুত্রের সঙ্গে উপনিবেশ হস্তান্তরের একটি পত্র সহ ইংরাজের শিবিরে আসেন।

দুর্গের মধ্যে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যরা ইংরাজের হাতে বন্দী হতে ইচ্ছুক ছিল না। তাই তারা দুর্গের উত্তরদিকে শত্রুপক্ষের পাহারা নেই দেখে উত্তরের ফটক দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চুঁচুড়ায় অবস্থিত মসিয়েঁ ল-এর কাছে চলে যায়। কিছু সংখ্যক ইংরাজ সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করা সত্ত্বেও ৬০জন ফরাসী সৈন্য ল-এর বাহিনীতে যোগ দেয়। এবং এই বিষয় নিয়ে সহর হস্তান্তরের চুক্তি পালন করা হয় নি বলে ফরাসী পক্ষেরও অনেকগুলি সর্ত্ত ইংরাজেরা মেনে নেয়নি।

সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী আয়ার কুট বেলা ৩টায় দুর্গ ও সহরের দখল নিলেন। রেণো অপরাপর সদস্য ও আরও যত ফরাসী সৈন্য ও স্থানীয় অধিবাসী সবাইকে বন্দী করে কলকাতায় পাঠান হয় এবং নবাবের পরাজয়ের পর তাদের মুক্তি হয়।

এইভাবে চন্দননগর দখলের পর সহরের উত্তরদিকে ক্লাইভ সৈন্যসহ একটি বিজয় উপলক্ষে কুচকাওয়াজ করান আর এই অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন হুগলীর দেওয়ান। মহারাজা নন্দকুমার, যাঁর সাহায্যে নবাবের পতন ঘটানর প্রথম পদক্ষেপ এই চন্দননগরের পতন ঘটান সম্ভব হয়।

এই যুদ্ধের ফলে নবাবকে পরাভূত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। বাংলার এই ক্ষুদ্র সহরের উপর ফরাসীদের কর্ত্তৃত্ব এইখানেই শেষ বলা যায়। এরপর দক্ষিণ ভারতের উপনিবেশ নিয়ে ফরাসী ইংরাজের সঙ্গে বার বার যুদ্ধে লিপ্ত হন বটে কিন্তু এই সহর পরবর্ত্তী ৬০ বছরের মধ্যে বিনা বাধায় বা বিনা রক্তপাতে ছয় বার ইংরাজের দখলে আসে।

ফরাসীদের মধ্যে বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিনা দ্বিধায় প্রাণদান এই যুদ্ধের একটি স্মরণীয় ঘটনা—যা থেকে বিশ্বের অনেকেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। আর স্মরণীয় হচ্ছে যে কি অসাধারণ কূটনৈতিক দক্ষতা ছিল রবার্ট ক্লাইভের যাঁর চাতুরিতে নবাব ও ফরাসীরা সবাইকে হার মানতে হয়।

শ্রী অশোক সেন

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

শেষ পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহের দরজা খুলল এবং আমরা সিটে গিয়ে বসলাম—কার্টেন উঠল। ব্যারনেসকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি মহাখুশী। মঞ্চের দৃশ্য এবং ষ্টেজের নানা ধরনের রং-মাখানো ক্যানভাস, কাঠ, রুজ এবং পারফিউম্‌সের গন্ধ মিলে-মিশে ব্যারনেসের ঘ্রাণশক্তিকে যেন উতলা করে তুলেছিল। মঞ্চকে যাঁরা ভালবাসেন প্রেক্ষাগৃহে এলে তাঁরা বোধ হয় এই ভাবেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিনয় ব্যাপারটাকে উপভোগ করেন।

যে নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল তার নাম ছিল 'এ হুইস'। হঠাৎ আমার যেন শরীর খারাপ লাগতে লাগল—এর কারণ বোধ হয় এই যে, অভিনয় দেখতে গিয়ে আমার স্মৃতিপথে ভেসে উঠল এই চিন্তাটা যে আমি নিজে একসময় রঙ্গমঞ্চে নাটক লিখে আধিপত্য করব ভেবেছিলাম এবং আমার সে ইচ্ছা কার্যতঃ সফল হয় নি। আর তা ছাড়া আগের রাত্রের অতিরিক্ত মদ্যপানেও শরীরটা অসুস্থ লাগছিল। কার্টেন পড়বার পর আমি সিট্ ছেড়ে রেস্তোঁরার দিকে গেলাম এবং ভাবল এবসিনথের অর্ডার দিলাম—এবসিনথের কৃপায় দেহমন আবার তাজা হয়ে উঠল—নাটক শেষ হওয়া পর্যন্ত রেস্তোঁরাতেই ব'সছিলাম।

প্লে'র পর আমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হলাম এবং একসঙ্গে সবাই সাপার খেতে গেলাম। ওদের খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল এবং আমি হল থেকে চলে যাওয়াতে সবাই যে বেশ বিরক্ত হয়েছেন সে কথাও ওদের মুখভাবে বোঝা যাচ্ছিল। যখন টেবিল সাজানো হচ্ছিল কারোর মুখে একটি শব্দ নেই—শেষে অনেক কষ্টে এলোমেলো ভাবে কথাবার্তা সুরু করা গেল। কাজিনটি রুক্ষ, গম্ভীর এবং উদ্ধত ভাব নিয়ে বসে রইলেন।

মেনু নিয়ে আমাদের ভেতর আলোচনা সুরু হ'ল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যারনেস hors d'oeuveres অর্ডার করলেন। অত্যন্ত রুক্ষভাবে ব্যারণ এই অর্ডারটি পাল্টে দিলেন। আমার মনটা এ সময় ছিল বিষাদাচ্ছন্ন—যেন ব্যারণের কথা শুনি নি এভাবে আমি বললাম দু'জনের জন্য hors d'oeuveres দেবে—অর্থাৎ আমার এবং ব্যারনেসের জন্য আগের অর্ডারটাই বহাল রাখলাম।

বুঝলাম আমার কথায় ব্যারণ খুবই বিরক্ত হয়েছেন। রাগে তাঁর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল। ঘরের আবহাওয়া বেশ ভেতে উঠেছে একথা সবাই অনুভব করছিলাম। কেউ আর কোন কথা বললেন না।

ভেতরে ভেতরে আমি নিজের সাহসের তারিফ করলাম। ব্যারণের রুক্ষ আচরণের প্রতিবাদে যে তাঁকে সোজাসুজি অপমান করতে পেরেছি এই ভেবে আমি খুশী হয়ে উঠেছিলাম—অবশ্য বেশ বুঝতে পারছিলাম যে কোন দেশের সভ্য সমাজে এ ধরনের অপমানকে সহজে গলাধঃকরণ করে নেওয়া হয় না। ব্যারনেস আমার কাছ থেকে এই ধরনের সাহায্য পাওয়াতে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠে আমাকে হাসাবার জন্য নানাভাবে আমাকে ক্ষেপাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এ চেষ্টা সফল হ'লনা। এই পরিবেশে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। কারোরই বলবার মত কিছু আছে বলে মনে হচ্ছিল না—আমি এবং ব্যারণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে এ-ওর দিকে চাইছিলাম। ব্যারণ তাঁর পার্শ্বস্থিত কাজিনটির কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি বললেন—মহিলা শুনে মুখবিকৃত করলেন, মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন এবং অস্ফুটভাবে ব্যারণকে দু'একটা কথা বলে আমার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

আমার যেন মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছিল এবং হয়ত তখনই রাগে ফেটে পড়তাম—কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটা ঘটনা ঘটল যা এক্ষেত্রে লাইটনিং কণ্ডাক্টরের কাজ করল।

পাশের একটি ঘরে একটি উচ্ছৃঙ্খল দল আধ ঘণ্টা ধরে পিয়ানো বাজাচ্ছিল—এখন তারা একটি অশ্লীল গান গাইতে সুরু করল—আর ওদের ঘরের দরজাটা ওরা ইচ্ছে করেই যেন সম্পূর্ণভাবে খোলা রেখেছিল।

ব্যারণ ওয়েটারকে কড়াভাবে আদেশ দিলেন ওই দরজাটা বন্ধ করে দিতে।

দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে আবার দরজাটা খুলে দেওয়া হ'ল। গায়কের দল সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে সেই অশ্লীল গানটা আবার গাইতে লাগল—তা ছাড়া আমাদের লক্ষ্য করে নানা ধরনের মন্তব্য করতে লাগল ও-ঘরের লোকেরা—ব্যাপারটা আমাদের প্রতি একটা প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জের মত হয়ে দাঁড়াল। এইবার একটা কিছু করা দরকার—বিস্ফোরণের এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

আমি লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—লম্বা লম্বা পা ফেলে ওদের দরজায় গিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলাম—ওরা ভেতর থেকে দরজা চেপে রইল, আর ঘরে ঢোকবার জন্ত আমি ক্রমাগত দরজায় ঘা দিতে লাগলাম।

হঠাৎ একসঙ্গে দরজাটায় টান দিয়ে ওরা আমাকে ঘরের ভেতর এনে ফেলল—বদমাসের দল আমাকে প্রহার করবার জন্ত উদ্যত হ'ল।

সেই মুহূর্তে আমার কাঁধে একটা স্পর্শ অনুভব করলাম। বিরক্তি মাখানো কণ্ঠে ব্যারনেসের কণ্ঠস্বর শুনলাম—এরা নিজেদের বলে ভদ্রলোক—অথচ একদল লোক মিলে একসঙ্গে একজনকে আক্রমণ করতে এদের সম্মানে বাধে না।

উত্তেজিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ব্যারনেস এঘরে চলে এসেছিলেন—এ থেকে বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার প্রতি ব্যারনেসের মনের ভাবটা কি ধরনের।

মারামারির ব্যাপারটা আর এগোতে পারল না। ব্যারনেস আমার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন: আমার ছোট্ট বীরপুরুষ, আপনার জন্ত ভাবনায় আমি ভেতরে ভেতরে কাঁপছিলাম।

ব্যারণ এবার বিল দিতে আদেশ করলেন, ওখানকার মালিককে ডেকে পাঠালেন, এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন পুলিশে খবর দিতে।

এরপর যখন আমরা বসে পাঞ্চ পান করছিলাম তখন আবার আমাদের পুরাণো বন্ধুত্ব নতুনভাবে জেগে উঠল। ভেতরে ভেতরে সবাই আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম—যেভাবে আমার এবং ব্যারণের সম্বন্ধটা একটা বিকৃত দিকে যাচ্ছিল, তার শেষ ফলটা যে কারোর পক্ষেই ভাল হ'ত না একথা এখন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। ভাগ্যে এই সময় ওই ঘটনাটা ঘটছিল।

পরের দিন সকালে আমরা সবাই কফিরুমে একত্রিত হলাম। প্রত্যেকের মনটাই যেন বেশ উল্লাসে ভরা। কাল যে নিজেদের মধ্যে কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি একথা ভেবে প্রত্যেকেই আজ মনে মনে আনন্দ অনুভব করছিলাম।

প্রাতঃরাশ সেরে আমরা ক্যানালের পাড় দিয়ে হাঁটতে লাগলাম—একটি লকের কাছে এসে, যেখান থেকে ক্যানালটি হঠাৎ বাঁক নিয়েছে, ব্যারণ দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—এ জায়গাটার কথা মনে আছে তো মারী? তা আছে বইকি প্রিয়তম! বিষাদমাখা আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরে জবাব দিলেন ব্যারনেস। পরে ব্যারনেস এই প্রশ্নের ভেতরকার রহস্য আমার কাছে উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন। এই জায়গাটিতেই ব্যারণ প্রথম ব্যারনেসের কাছে প্রেম নিবেদন করেন—একদিন সন্ধ্যায়।

আমি একথা শুনে মন্তব্য করেছিলাম সে ত তিন বছর আগেকার ঘটনামৃত অতীতকে নিয়ে চর্বিত চর্বণ করে লাভ কি—বর্তমানকে নিয়ে পরিতুষ্ট নন্ বলেই এভাবে বিগত দিনের কথা স্মরণ করতে আপনাদের ভাল লাগছে। আপনি একটু দয়া করে থামুন—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুদ্ধি-বিবেচনা সব জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছেন......অতীতকে স্মরণ করতে আমি ঘৃণা বোধ করি, স্বামীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে আমার স্বেচ্ছাচারী এবং অহঙ্কারী মা'র হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন—কারণ আর বেশীদিন মায়ের খবর-দারিতে থাকলে আমার সর্বনাশ হয়ে যেত। এই কারণেই আমি আমার স্বামীকে মনে মনে এ্যাডোর করি, তিনি আগাগোড়া আমার সঙ্গে অনুগত বন্ধুর মত ব্যবহার করে এসেছেন.........

আপনার যা বলতে ভাল লাগে বলুন ব্যারনেস—যাই বলবেন, আপনাকে খুশী করবার জন্ত আমি মেনে নেব।

যথানির্দিষ্ট সময়ে ফিরে যাবার জন্য আমরা জাহাজে গিয়ে উঠলাম। নীল সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে ভেসে যেতে ভারি ভাল লাগছিল—মাঝে মাঝে সমুদ্রের বুকের উপর শ্যামশ্রী-মণ্ডিত দীপগুলো ভেসে উঠছিল। ষ্টকহল্ম-এ এসে পৌছলাম—তারপর বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কাজ নিয়ে মেতে উঠব বলে মনকে ঠিক করলাম। অন্তর থেকে এই প্রেমের ব্যাপারটাকে উপড়ে ফেলতে হবে—কিন্তু এর পরেই বুঝলাম যে-অদৃশ্য শক্তি এর পেছনে কাজ করছে তাঁকে অগ্রাহ্য করবার মত ক্ষমতা আমার নেই। *আমাদের প্রমোদ ভ্রমণের পরদিন ব্যারনেসের* কাছ থেকে নৈশ আহারের নেমন্তন্ন এল। এটা ছিল তাঁর বিবাহ বাৰ্ষিকীর অনুষ্ঠান। নিমন্ত্রণে না যাবার কোন বিশ্বাসযোগ্য অজুহাত খুঁজে পেলাম না—এবং যদিও বেশ ভয় পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, এ সময় কাছাকাছি হলে আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে, তবুও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই হ'ল। গিয়ে অত্যন্ত হতাশ হলাম—সারা বাড়ীটা সেদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে—ফলে আসবাবপত্র ইত্যাদি উল্টে-পাল্টে একেবারে তছনছ করে ফেলা হয়েছে। ব্যারনেস দেখলাম মেজাজ ভাল নেই—ব্যারনেস গৃহসংস্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বলে পাঠালেন নৈশ আহারটা একটু দেরিতেই সারতে হবে এবং এজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। অগত্যা তাঁর ক্ষুধার্ত এবং খিটখিটে স্বামীটির সঙ্গেই বাগানে পায়চারী করে বেড়াতে লাগলাম। ব্যারণ যেন আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছিলেন না। আধ ঘণ্টার পর আমার পক্ষেও আর চেষ্টা করে ব্যারণকে এণ্টারটেইন করে রাখা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। কথাবার্তাও আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এসেছিল —ব্যারণ আমাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে এলেন এরপর।

ডিনারের তৈজসপত্র টেবিলে সাজানো হ'ল। পাশের টেবিলের ওপর এ্যাপিটাইজারসও রাখা হ'ল। কিন্তু বাড়ীর কর্ত্রীর তখনও দেখা নেই (সুউডেনে নৈশ আহার সুরু করা হয় সুগন্ধি স্যাণ্ডউইচ্ দিয়ে—এই স্যাণ্ডউইচ্ মানুষের খিদে বাড়িয়ে দেয় এবং এইজন্যই একে বলা হয় এ্যাপিটাইজার)।

আসুন কিছু স্ন্যাক্স খাওয়া যাক্ ততক্ষণ—বললেন ব্যারন।

আমাদের একা একা এভাবে খেতে দেখলে ব্যারনেস অফেণ্ডেড হবেন বুঝে আমি ব্যারনকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি আগাগোড়াই নিজের জিদ বজায় রাখলেন।

শেষ পর্যন্ত ব্যারনেস এসে ঘরে ঢুকলেন—যৌবনমদে মত্তা, প্রাণরসে ভরপুর, সুন্দর ভাবে সজ্জিতা হয়ে এসেছিলেন তিনি।

গোলাপ ফুলের যে স্তবকটি সঙ্গে করে এনেছিলাম তা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। এই শুভ দিনটি যেন তাঁর জীবনে বারবার ফিরে আসে এই ইচ্ছাও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করলাম। আমাকে যে ব্যারনের জিদ বজায় রাখবার জন্যই বাধ্য হয়ে খাওয়া সুরু করতে হয়েছে সে কথাও তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম।

টেবিলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন এক মুহূর্তের জন্য ব্যারনেস—দেখলেন জিনিষপত্র ঠিকভাবে সাজানো নেই, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—বিরক্তিতে তাঁর ঠোঁট কুঁচকে উঠল, তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে একটি মন্তব্য করলেন যার ভেতর ঠাট্টার থেকে তিক্ততাই ছিল বেশী। ব্যারণও সঙ্গে সঙ্গেই একটা কড়া রকমের জবাব দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি এই বিশ্রী আবহাওয়াটার পরিবর্তনের জন্য গত দিনের জলবিহারের আনন্দপূর্ণ ঘটনাগুলির কথা নিয়ে আলোচনা সুরু করলাম।

আমার সুন্দরী কাজিন সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হ'ল—জিজ্ঞেস করলেন ব্যারনেস।

খুবই মধুর স্বভাবের বলে মনে হ'ল আমার।

ব্যারন বললেন—আপনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এই ছোট্ট মেয়েটি সব দিক থেকেই একেবারে অতুলনীয়া? এই একটি কথা থেকেই বেশ বুঝতে পারলাম মেয়েটির প্রতি ব্যারণের মনোভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে অপত্যস্নেহের ভাব, আন্তরিক প্রীতি এবং অপরিসীম করুণা। অথচ একথা আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম যে, মেয়েটি হচ্ছে একটি জাত ডাইনী জাতীয়। অথচ বাইরে এমন একটা ভাব তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠে যেন সে একজন সত্যিকার মার্টার এবং নিদারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িতা।

স্বামী ঐ মেয়েটিকে শিশুর পর্যায় ফেলা সত্ত্বেও ব্যারনেস নির্দয়ভাবে বলতে লাগলেন: নজর করে একবার দেখুন, প্রিয়তমা ঐ বেবীটি কিভাবে আমার স্বামীর চুল আঁচড়াবার ধরনটা পর্যন্ত বদলে দিয়েছে।

কথাটা দেখলাম সত্যি। মাথার যেখানে চুলটা এতকাল ভাগ করে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন ব্যারণ, তার পরিবর্তন হয়েছে। ছাত্রদের অনুকরণে তিনি সিঁথি করেছেন—গোঁফে ওয়াক্স দিয়েছেন অথচ এসব মোটেই তাঁকে মানায় নি।

আমি অবশ্য এও নজর করলাম যে কাজিনের প্রভাবে ব্যারনেসেরও সাজ-পোশাক এবং হেয়ার ষ্টাইলে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে—এমন কি ভাবভঙ্গিতেও।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে নৈশ আহারের ব্যাপারটাকে টেনে নেওয়া হ'ল—আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল ঐ কাজিনটি। শুনলাম তিনি পরে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সবাই একসঙ্গে কফি পান করা হবে।

ডিজার্টের সময় এই দম্পতির উদ্দেশে আমি টোষ্ট প্রোপোজ করলাম চিরাচরিত ভাষায়। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারছিলাম আমার বলার ভেতরে কোন প্রাণ ছিল না।

এঁরা স্বামী স্ত্রী, অতীতের অনেক কথা স্মৃতির পর্দায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠাতে খুব উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন। মধুর চুম্বনের দ্বারা নিজেদের সম্পর্কটাকে নিবিড় করতে চাইলেন, অতীতের ভালবাসার আচার-আচরণগুলোর অনুকরণ করে প্রেমিক-প্রেমিকার মত ব্যবহার করতে লাগলেন। স্নেহশীল? এমন কি মনে হচ্ছিল দু'জনে দু'জনকে অন্তর থেকে কামনা করছেন। এঁদের এই অবস্থায় দেখে আমি ভাবছিলাম কোন অভিনেতা যখন নকল চোখের জল ফেলবার সময় মনটাকে বিষাদাচ্ছন্ন করে নেয়, এঁরাও তেমনি প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে নিজেদের মনটাকে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট—এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে চাইছিলেন।

অথবা এমনও হতে পারে ওদের ভেতরকার প্রেমের আগুনটা তখনও ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল—উপরটা ছাই চাপা ছিল বলেই বোঝা যায় নি, এখন আবার বাতাস লেগে সেই স্তিমিত আগুনটা আবার শিখা বিস্তার করে প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠেছে। এদের অন্তরের সম্পর্কটা সত্যি সত্যি কি ধরনের তা আঁচ করা সত্যিই একরকম অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল আমার।

নৈশ আহারের পর আমরা বাগানে গিয়ে সামার-হাউসে বসলাম। ওখানকার জানলাটা ছিল ঠিক রাস্তার ধারে। ব্যারন অন্যমনস্ক ভাবে মাঝে মাঝে জানলার ধারে যাচ্ছিলেন, বোধ হয় মনে মনে ভাবছিলেন কাজিনটি যখন এই রাস্তা ধরে আসবে তখন দেখতে পাবেন। হঠাৎ তিনি প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন—আমরা বেশ বুঝতে পারলাম প্রত্যাশিত অতিথি আসছেন এবং তিনি আগে থেকেই তাঁকে স্বাগত করবার জন্য প্রবেশদ্বারে গিয়ে অপেক্ষা করবেন।

একলা ব্যারনেসের সান্নিধ্যে রয়েছি—আমি বেশ বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। আমি সাধারণতঃ সেল্ফ-কন্সাস নই—কিন্তু ব্যারনেস এমন ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং আমার চেহারার কয়েকটি বিশেষত্ব নিয়ে এমন উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করছিলেন যে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এরপর দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ব্যারনেস হাসিতে ফেটে পড়লেন। ব্যারণ যেদিকে গেছিলেন সেদিকে আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ করে বললেন:

প্রিয়তম বৃদ্ধ ভূইত নতুন প্রেমে প্রায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

উত্তরে বললাম - আমারও অনেকটা এই রকমেরই একটা কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার সত্যি সত্যিই হিংসার ভাব মনে আসছে না ত?

বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন—একেবারেই না, আমার নিজেরও আমার ঐ বেড়ালবাচ্চার মত কাজিনটিকে ভাল লাগে। ওর সম্বন্ধে আপনার সত্যিকার মনের অবস্থাটা কি ধরনের বলুন ত?

আমার সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নাই। প্রথম থেকেই এই যুবতী কাজিনটি সম্বন্ধে আমার মনে একটা বিরূপ ভাব এসে গিয়েছিল। আমারই মতন এই মহিলাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন তাঁর মত আমিও এই ব্যারণ পরিবারকে আশ্রয় করে উচ্চশ্রেণীর সমাজে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করছি—এবং তিনি যে আসলে কোন্ শ্রেণীর তা আমার অজানা নেই এবং সেই হিসাবে আমি নিশ্চয় তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ। তাঁর ছাই রঙের চোখ দিয়ে আমাকে দেখামাত্রই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাকে দিয়ে তাঁর সত্যিকার কোন কাজের কাজ হবে না। তাঁর প্লিবিয়ান ইন্‌ষ্টিংকট তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আমি একজন এ্যাডভেনচারার। তাঁর এই ধারণার ভেতর খানিকটা সত্যি ছিল নিশ্চয়, কারণ একথা ত অস্বীকার করতে পারি না যে ব্যারনের বাড়ীতে প্রথম এই আশা নিয়েই ঢুকেছিলাম যে আমার সেই অনাদৃত নাটকটির একজন পেট্রন হয়ত এখানে পাওয়া যেতে পারে। আমার নিজের কোন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ষ্টেজের কোন যোগাযোগ ছিল না—সুতরাং উচ্চশ্রেণীর কারোর ব্যাকিংএ মঞ্চে প্রবেশাধিকার পাব এই ধরনের চিন্তাটাই আমাকে ব্যারণদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে উৎসাহিত করেছিল।
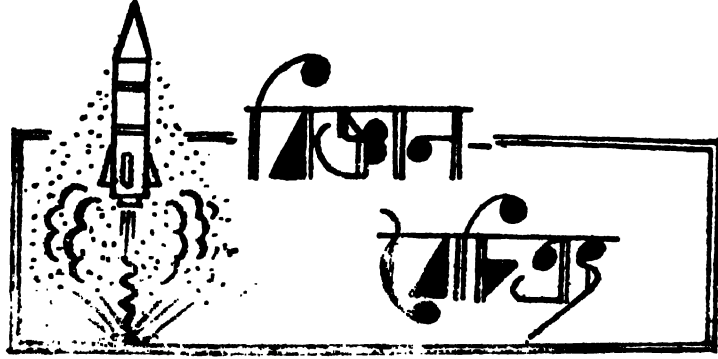
আমাদের পৃথিবীর কতটুকু জানি

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের পৃথিবীর জীবনের ১ হাজার বছর মানুষের জীবনের মিনিট খানেকের সমান। ভূগর্ভে প্রতিনিয়ত যে ভাঙাগড়ার খেলা চলেছে তার ফলে ঘটছে এমন সব পরিবর্ত্তন যেগুলি পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠতে লেগে যায় হাজার হাজার বছর। কিন্তু তবু যুগযুগান্ত ধরে পৃথিবীর গভীরে যে সব ব্যাপার ঘটেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির দৌলতে, মানুষ আজ সেগুলি ধরে ফেলতে পারছে বলে পৃথিবী সম্পর্কে তার জ্ঞান নিত্য নতুন আবিষ্কারের ভিত্তিতে ঢেলে সাজতে হচ্ছে।

জন্মদিনের পর ক্রমবিকাশের পথে পৃথিবী আজ পা দিয়েছে তার পরিণত বয়সে। আরো কয়েক শো কোটি বছর পরে হয়ত বার্দ্ধক্য ও জরার কবলে তাকে পড়তে হবে, তার দেহের উত্তাপ কমতে থাকবে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি ক্রমশ পড়বে ঝিমিয়ে। কত বয়স অবধি সে বেঁচে থাকবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা এখনো সম্ভব নয়, কারণ তার অতীত ইতিহাসের বিশ্লেষণের এখনো অনেক কিছুই বাকি। আজ থেকে হাজার দুই বছর আগে পৃথিবীকে জানবার যে চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল, ভারত, গ্রীস ইত্যাদি দেশে আজ অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহকে জানার মধ্যে দিয়ে সেই চেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে, কারণ গ্রহ-নক্ষত্রগুলির ক্রমবিকাশ ও বিবর্ত্তনের ধারা একই সূত্রে গ্রথিত। প্রতিটি জগৎ সেই সূত্রের একটি গ্রন্থিস্বরূপ। কোন কোন গ্রন্থি কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু সেটা সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে কয়েকটি নুড়ি সংগ্রহ করার সামিল। এখনো সংখ্যাতীত প্রশ্ন রয়েছে জানবার। যেমন ধরুন, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের আয়তন যে ক্ষেত্রে এত বড় (পৃথিবীর ১/৮ ভাগ) সে ক্ষেত্রে মঙ্গলের 'ফোবস' ও 'ডিমস' নামে উপগ্রহ দু'টি মঙ্গলের হাজার বা লক্ষ ভাগ ছোট কেন? মঙ্গলে পৃথিবীর মত এত উঁচু পাহাড় কেন নেই? আজ থেকে শত কোটি বছর পরে সূর্য্য ও গ্রহগুলির সারবস্তুর কি কি পরিবর্ত্তন হবে? ভূগর্ভে তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থের উৎপত্তি হয় কি ভাবে? এইরকম কত যে প্রশ্ন আমাদের গবেষণার প্রতীক্ষায় রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু পৃথিবীর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করেছি নানা রকমের অভিনব যন্ত্রপাতি, স্পুৎনিক, রকেট ও মহাকাশ-যানের সাহায্যে। সেই রকম একটি যন্ত্রের নাম পোলারিস্কোপ যার সাহায্যে কোথায় কি প্রাকৃতিক ভাঙাগড়া চলছে তা জানা যায়, ভূগর্ভে কোথায় কি খনিজ পদার্থ লুকিয়ে আছে তা ধরা পড়ে, এমন কি ভূমিকম্পের পূর্বাভাষও পাওয়া যেতে পারে।

মানুষের হাতে গড়া কৃত্রিম উপগ্রহ ও উড়ন্ত লেবরেটরিগুলি শুধু মহাজাগতিক তদন্তে নিয়োজিত নেই। সেগুলি আমাদের এই গ্রহের বহু অদৃশ্য ব্যাপারকে পরিদৃশ্যমান করে দিচ্ছে। আমরা সবাই জানি যে স্থানবিশেষের ভূগর্ভে খনিজ পদার্থের বিন্যাস ও সংস্থানের উপর নির্ভর করে সেখানকার মহাকর্ষের মাত্রা। সুতরাং পৃথিবীর মহাকর্ষের এক্তিয়ারের মধ্যে দিয়ে ভ্রাম্যমান স্পুৎনিকের আবর্ত্তন পথ পরীক্ষা করে বলা

যায় কোথায় সেটি কি পরিমাণ মহাকর্ষের সম্মুখীন হয়েছে। ভূগর্ভে ধাতুর পরিমাণ বেশি হ'লে মহাকর্ষের জোর বেশি হবে। এমন কি মহাকর্ষের মাত্রা মেপে বলে দেওয়া যায় সেখানে মাটির নিচে কোন্ ধাতু লুকিয়ে আছে।

ভূত্বকের নিচে একটি কোমল উপমণ্ডল আছে। পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে, উপমণ্ডলের উপকরণ হচ্ছে স্তরীভূত, দানাদার ও পললশিলা। পৃথিবীর স্থলভাগের নিচে সেই উপমণ্ডলের গভীরতা ২৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার কিন্তু সমুদ্রের তলায় তার চেয়ে অনেক কম। ভূত্বকের উপাদানের শতকরা ৯৩ ভাগ অক্সিজেন, বাকি ৭ ভাগ অন্যান্য পদার্থ। ভূত্বক হচ্ছে এক বিরাট অম্লজানজারিত খোলস—যার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে অন্যান্য ধাতু। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যতই পৃথিবীর পেটের ভিতরে যাওয়া যাবে ততই অক্সিজেনের মাত্রা যাবে কমে।
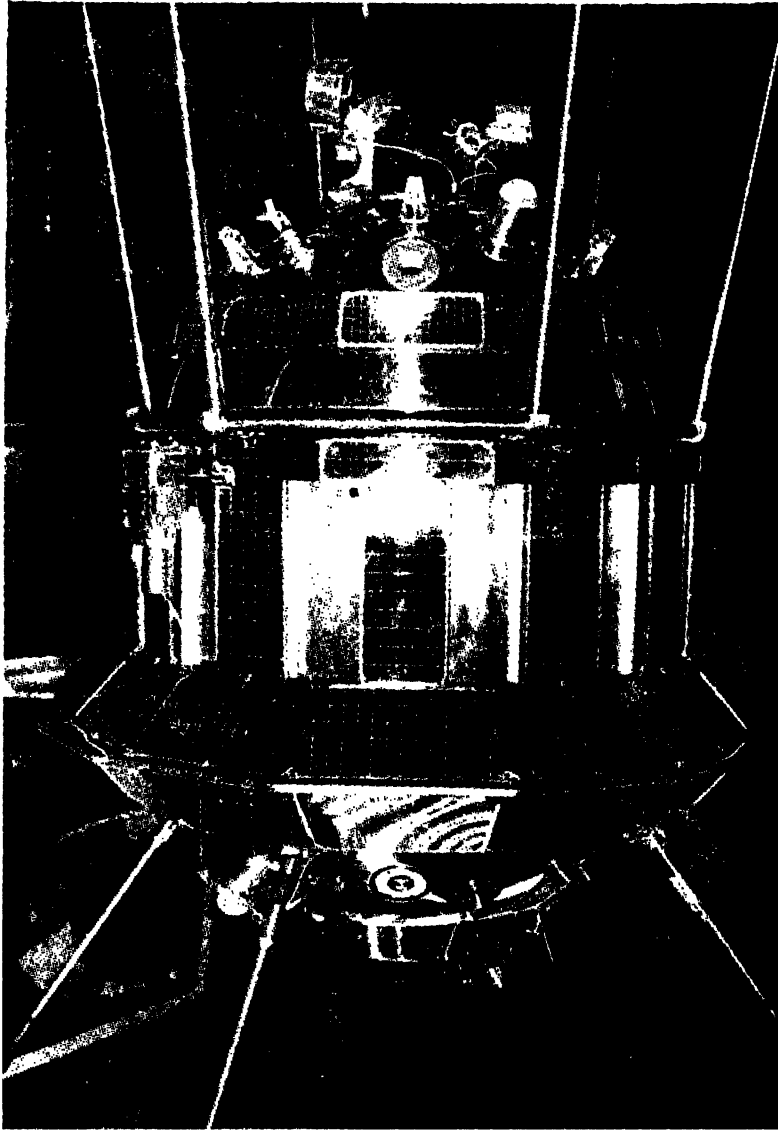
এই স্বয়ং চালিত সোভিয়েত উড়ন্ত লেবরেটরী পৃথিবী সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে

ভূমণ্ডলের গভীর স্তরগুলিতে তাপমাত্রার কোন সমতা নেই। কোথাও প্রতি কিলোমিটারে ৮।৭ ডিগ্রী করে তাপের পার্থক্য হয়। আবার আগ্নেয়গৈরিক এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে সেই পার্থক্য ৩৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হতে পারে। সেই তাপমাত্রার তারতম্য পরীক্ষা করে আমরা জানতে পারি দেশ বিশেষের কোন্ অঞ্চলে মাটির তলায় কিরকম তাপজনিত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলেছে এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক তাপ উদ্ধার করে কাজে লাগানো সম্ভব। কোন কোন অঞ্চলে (যেমন ইউরোপের ট্রান্সকার্পেথিয়্যান অঞ্চলে) ভূগর্ভের উত্তাপ এত বেশি মাত্রায় ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠে আসে যে সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণের উত্তাপকে শিল্পে এবং গৃহস্থালীর কাজে লাগানো সম্ভব।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে মাটির নিচে ১০।১৫ মাইল নেমে গেলে এমন সব মিশ্র ধাতু ও প্রাকৃতিক শক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে যেগুলির সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই।

পৃথিবীর প্রকৃতির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে তার চৌম্বক ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মটির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল পৃথিবীর আকৃতি এবং ভূগর্ভে বিভিন্ন ধাতুর উদ্ভব। তা ছাড়া আবহমণ্ডলও তার উপর বড় কম নির্ভর করে না। এই ধর্ম্মটির সঙ্গে মানুষের পরিচয় বহুকালের বলেই মানুষ শত শত বছর ধরে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে দিগদর্শন যন্ত্র ব্যবহার করে আসছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র মহাশূন্যে বহুদূর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত। লক্ষ মাইল দূরেও তার আকর্ষিকা শক্তি অনুভব করা যায়।

ভূচৌম্বক ক্ষেত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ধ্রুবক্ষেত্র ও চলক্ষেত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের গতিবিধি সব জায়গায় এক নয়। এই বৈষম্যকে বলা হয় চৌম্বক বৈষম্য। চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্ত্তনশীল বলেই পৃথিবীর চৌম্বক মানচিত্র কিছুদিন অন্তর নতুন করে সকংলন করতে হয়। চৌম্বক বৈষম্য থেকেই চৌম্বক ঝড়ের উৎপত্তি।
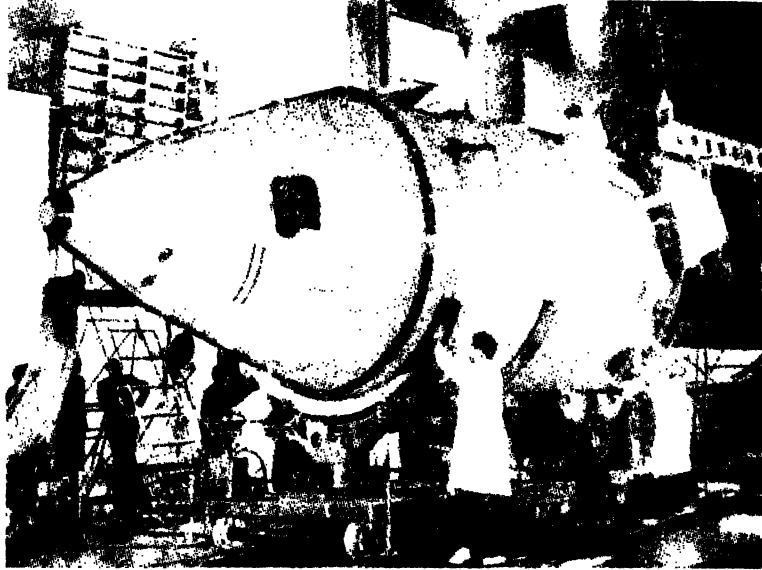
এইরকম মহাকাশযানে বসে মানুষ পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করতে পারে

বৈজ্ঞানিকদের এতদিনকার একটি অনুমতি হচ্ছে যে পৃথিবীর ধ্রুব চৌম্বক শক্তির উৎপত্তি হয় ভূগর্ভের গলিত মর্ম্মস্থলে সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহ থেকে এবং চল চৌম্বক শক্তির উৎস হচ্ছে আয়নমণ্ডলে প্রবাহিত প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ। কিন্তু হালে এই অনুমিতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে রুশ বিজ্ঞানাচার্য্য কজিরেক চাঁদে অগ্ন্যুদ্গারের ফটো তোলার পর। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে, চাঁদে যদি অগ্ন্যুদ্গার হয় তার মানে চাঁদের গর্ভে তাপ-গলিত ধাতু রয়েছে। যদি থাকে তা হ'লে চাঁদের ক্ষেত্রে তাই থেকে ধ্রুব চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্ম হয় নি কেন?

তৃতীয় স্পুৎনিকের বেতারে প্রেরিত সাংকেতিক তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল যে, পৃথিবীর বিষুব রেখাকে ঘিরে আছে এমন একজোড়া বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকা মেখলা যার প্রসার ৫০ হাজার কিলোমিটারের মত। সে দু'টি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে।

পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির আকর্ষণে আয়নমণ্ডলের তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলির স্রোত যখন পৃথিবীর দিকে বইতে থাকে তখনই উৎপত্তি হয় চৌম্বক বাত্যার। রকেট ও স্পুৎনিকের সাহায্যে আয়নমণ্ডলের উর্দ্ধভাগ পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে নিচের দিকের তুলনায় উপরের দিকে ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশি। আরো জানা গিয়েছে যে, পৃথিবীর আবহমণ্ডলের শেষ সীমা রয়েছে ৩০০০ কিলোমিটার উপরে। সেখানে আবহমণ্ডলের ঘনত্ব মহাজাগতিক বাষ্পের ঘনত্বের সমান।

ভাঙন-গড়নের ১৬টি চক্রাকার অধ্যায় নিয়ে রচিত হয়েছে ভূত্বকের ইতিহাস। প্রতিটি অধ্যায়ের মেয়াদ ২০ থেকে ৩০ কোটি বছর। শেষতম অধ্যায়ের আবির্ভাব হয়েছিল ২২ কোটি বছর আগে যখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল আল্পস পর্বতমালা। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, ঐসব ভাঙন গড়ন গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি এবং পৃথিবীর উপর এগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, কারণ সেগুলি মহাকর্ষ চাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে পৃথিবী কখনো সঙ্কুচিত, কখনো বা প্রসারিত করে।

দিনরাত্রির পালাবদলের জন্য পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের তাপ বাজেটে এত পার্থক্য এবং আবহচাপ, গাছপালার গঠনবর্দ্ধন, জলের বাষ্পীভবন ও মেঘের উৎপত্তি, বায়ুর গতি ইত্যাদি ব্যাপারের মূলে রয়েছে সেই পার্থক্য।

পৃথিবীর আকার গোল হলেও উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধ ষোল আনা সমতুল্য নয়। দক্ষিণ মেরুর ব্যাসার্দ্ধ উত্তর মেরুর ব্যাসার্দ্ধের চেয়ে ৬০ মিটার ছোট। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে উত্তর মেরু প্রতি ১০০ বছরে ৮ মিটার করে আমেরিকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আইসোটোপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গণনার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর বয়সের মোটামুটি একটা হিসাব করেছেন। সেই হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বয়স ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি বছর। পৃথিবী কঠিন রূপ নিয়েছিল অন্তত ৪০০ কোটি বছর আগে এবং প্রাচীনতম শিলার বয়স হবে ৩৫০ কোটি বছর।

কলকাতায় এক সাধুবাবা এসেছেন। শ্যামবাজারের কোথায় আছেন। তিনি না কি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান শুধু মুখ দেখে বলে দিতে পারেন। তার অলৌকিক শক্তিও না কি কতকগুলো আছে—কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায়...সবাই ছোটে। ছোটে কানা, খঞ্জ, কুব্জ। তিনি কাউকে ওষুধ দেন, কাউকে মাদুলি দেন, আবার কারু রোগ তিনি নিজের দেহে ধারণ করেন।

কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন, অন্ধের চোখে হাত বুলিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এক বন্ধ্যা পঁয়ত্রিশ বছরে পুত্রসন্তান লাভ করেছে। এমনি কত কি ঘটনা ঘটে গেল। দেখতে দেখতে কলকাতা থেকে দিল্লী, মাদ্রাজ, কন্যাকুমারীকায় পৌঁছে গেল এই সংবাদ।

সকলের মুখে এক কথা, সাধুবাবা সাধুবাবা! প্রতিদিনের এক একটি বিস্ময়কর ঘটনা। যক্ষ্মারোগীর যক্ষ্মা টেনে নিয়ে সর্বদেহ নীলবর্ণ হয়ে গেল, এও তাঁর ভক্ত-শিষ্যেরা দেখেছেন।

অগণিত জনসমাগম। ট্রাম-বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েও কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসছে, শুনেছি না কি স্পেশাল ট্রেনেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই স্পেশাল ট্রেনের স্পেশাল ভিড় সামলাতে লালবাজার থেকে—পদাতিকে হয় নি, অশ্বারোহী পুলিশ আনাতে হয়েছে।

খুড়ো এসে বলল, শুনেছ?

—না ত।

—সাধুবাবা না কি ইচ্ছা করলে, ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই ভাবছি, দুঃখের বোঝাটা সাধুবাবার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শেষ ক'টা দিন নিশ্চিন্ত হবো।

বললাম, তোমাকে এ সংবাদ কে দিলে খুড়ো?

—শোনা কথায় দরকার কি বাবাজি, চলো না দেখেই আসি।

কিন্তু সেখানে ঢোকে কার সাধ্য।

ব্যবস্থা যদিও বা করা গেল, কিন্তু সাধু-সন্দর্শন হ'ল না। খুড়ো বললে, না দেখা করে যাচ্ছি না তা সে যত বেলাই হোক্। বুঝলাম, আজ কপালে ভোগ আছে।

বেলা ১টার সময় সাধুবাবা দর্শন দিলেন।

প্রথমে খুড়োকে নিয়েই পড়লেন। সেই সনাতন কথা: বড় দুঃখে আছিস, ভয় নেই কেটে যাবে—সময় ভাল আসছে, আর দুটো মাস···

একজনকে বললেন, যা, কাল আসিস।

লক্ষ্য করছিলাম, আমার দিকে মাঝে মাঝে আড়-চোখে চাইছেন—কি দেখেছিলেন তিনিই জানেন। হঠাৎ বললেন, তোর মস্ত বড় একটা ফাঁড়া আসছে। সাবধানে থাকিস।

বললাম, তা হবে না, তারিখ বলতে হবে।

—দিন-ক্ষণ শুনলেই কি তার হাত থেকে বাঁচতে পারবি রে ক্ষ্যাপা! বরং প্রতিরোধ করবার ব্যবস্থা বলে দি শোন।

—তার চেয়ে বলুন না, দিন-ক্ষণ বলবার শক্তি আপনার নেই।

সাধুবাবা হাসলেন।

পথে বেরিয়ে এসে দু-পয়সা চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে বাড়ী ফিরছি, দেখলাম, হেদোর ধারে বসে আছে, সেই আমাদের চির-পরিচিত চেনামুখ চার পয়সার

গণক ঠাকুর। ছোট্ট একখানি আসন পেতে, খড়ি কেটে, পুঁথি খুলে বসে আছে। অফিস-ফেরতা কেরানিবাবুরা দু-একজন হাত পেতে বসে আছে। সেই সনাতন-ছকে-বাঁধা মন-রাখা কথা তাঁরও।

লোক মন্দ হয় না। তোমার-আমারই মতো দুঃস্থ গরীবের গণক ঠাকুর ওরা। চার পয়সায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জেনে নিয়ে আবার দৈনন্দিন কাজে মন দিচ্ছে।

দেখলাম, দু'জন বর্ষীয়সী ঝি, কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরছে। চারটি করে পয়সা ফেলে তারাও বসল। বললে, ঠাকুর বলে দাও দেখি, দাসীবৃত্তি আর কতকাল করব?

ঠাকুর গণনা করে ব'লে দিলেন, ও আর তোদের ঘুচবে না।

সবাই চলে গেলে ঠাকুরকে বললাম, আমার কোনো ফাঁড়া আছে কি না দেখ ত ঠাকুর!

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরে হাতখানা দেখে হেসে বললেন, সাধুবাবার কাছ থেকে আসছ বুঝি?

—হাঁ, কেন বলো দেখি?

—কত দিলে?

—কিছুই দি নি।

—তবে ত ফাঁড়া কেটেই গিয়েছে। ব'লে গণক ঠাকুর হাসলেন। বললেন, রোগের চিকিৎসা করাতে কেউ চৌষট্টি টাকার ডাক্তার ডাকে, কেউ বত্রিশ, কেউ আট—আবার দু' টাকাতেও কেউ সারে। কিন্তু মূলে সেই একই প্রেসক্রিপসন···সেই 'ব্যালকালি' মিকশ্চার!

—আবার এমনও ত আছে, শ্মশান-যাত্রা পর্যন্ত রোগী ছাড়তে চায় না চিকিৎসক।

খুড়ো বললে, তবে বলি শোন: মোক্ষদা কবিরাজ—ঐ যে হে পটলডাঙায় বাড়ী—

বড় রাস্তার ধারে ফুটপাত জুড়ে বড় বড় খলগুলো রোদে পুড়ছে। কোনটায় আছে লক্ষ্মীবিলাস, কোনটায় ভাবনার সর্বজ্বর, আবার কোনোটায় চন্দ্রপ্রভা, মহাশঙ্খ। মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছে কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রেরা। রাজ্যের ধুলো ওষুধের খলে এসে পড়ে এক উপাদেয় বস্তু তৈরী হচ্ছে। কিন্তু রোদ পেতে হ'লে এই ফুটপাতের শরণাপন্ন হতেই হবে··· অন্যত্র কোথাও রোদ নেই।

কবিরাজ মশায় রোগীদের কাছে বলেন, এ ওষুধ ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া প্যাক-করা বিলিতি আরক নয়, এর প্রতিটি প্রক্রিয়ার পিছনে রয়েছে অতি বড় নিষ্ঠা। নক্ষত্রানুযায়ী মূল সংগ্রহ, বার, তিথি, কাল, বারবেলা পরিত্যাগ করে, যথানিয়মে যথাকালে এর মারণ, পাতন, শোধন এর জাত-ধর্ম। বিলিতি ওষুধের ভাল প্যাকিং-এর নিষ্ঠা এ নয়, দ্রব্যের প্রভাবকে অতিক্রম করে আর এক নূতন শক্তিতে প্রভাবান্বিত করাই হ'ল এর নিষ্ঠা।

খুড়ো বললে, রাখো তোমার নিষ্ঠা। ফাঁকি দিতে ওরাও বড় কম জানেন না। ওষুধে কোন্ মশলা তাঁরা দয়া করে দিলেন আর না-দিলেন তা জানবার উপায় নেই। ওষুধের বড়িগুলোর চেহারা দেখেছ। যেন শেকড় গজিয়েছে। ভাল হলে বুঝতে হবে, রোগী পরমায়ুর জোরে বেঁচেছে। যেসব উপকরণ দিয়ে তেল পাক করবার বিধি আছে, কোন্ কবরেজ মশায় করে থাকেন? লোকে দুধ খেতে পাচ্ছে না, আর সেই দুধ তারা তেলে খাওয়াবেন?

আর রোগী মারতে সবাই সমান ওস্তাদ। শ্বাস না-ওঠা পর্যন্ত কেউ বলবে না, তাঁর দ্বারা কিছু হবে না। ডাক্তারেরাও রোগী হাতে রাখছেন নানাবিধ পরীক্ষার প্যাঁচে ফেলে, আর কবিরাজ মশায়দের প্যাঁচ নেই, পাঁয়তারা আছে···প্রাচীন আর্য ঋষিদের শাস্ত্র।

ডাক্তারেরা বলেন, অবৈজ্ঞানিক—রিসার্চ নেই, নতুন আবিষ্কার নেই—শাস্ত্র যেন এক একটি ঘরোয়ানা·

—কিন্তু এও ত শুনেছি, তাঁদের নাড়ী-জ্ঞানের ক্ষমতা।

—আমার কথায় বাধা দিয়ে খুড়ো বললে, শাস্ত্রকে ত 'অবজ্ঞা' করছি না, অবজ্ঞা করছি যাঁরা সেই শাস্ত্রকে ভাঙিয়ে চিকিৎসার নামে মারণ-যজ্ঞ করছেন! তাঁরা জানেন না কিছুই, অথচ সবজান্তা বলে নিজেকে গলার জোরে প্রচার করেন। তাঁরা বরিশালের চার আনা দামের 'রসসিন্দুর'কে স্বর্ণঘটিত এবং ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ বলে রোগীকে বিষ প্রয়োগ করেন। সকলের কাছে সকল ওষুধ থাকে না, কিন্তু তাঁরা 'নাই' বলতে জানেন না। 'বিষ্ণুতেল' 'মহামাষ' হয়ে রোগীর কাছে যাচ্ছে। ডাক্তার ফুঁড়ে মারছে, আর এঁরা টিপে মারছেন! ধীরে ধীরে 'স্লো পয়জনে'র ক্রিয়া—রোগী জানতেও পারে না তার হত্যাকারী কে?

একটি রোগীকে ঘিরে শহরের যে যেখানে ছিল, সবাই এসেছে। হোমিওপ্যাথী, য়্যালোপাথী—সকল প্যাথীই রোগীকে ঘিরে ধরেছেন। দেহ নিয়ে কাড়া-কাড়ি, ছেঁড়া-ছেঁড়ি!

যেন ভাগাড়ে গোরু পড়েছে। কিন্তু সে মৃতদেহ। এমন ক'রে জ্যান্ত মানুষের দেহ নিয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়ি করতে বোধ করি জন্তু-শকুনিরাও লজ্জা বোধ করত।

কিন্তু লজ্জা নেই মানুষ-শকুনির!

দাদাজী

যাঁদের করি নমস্কার (৬)

শ্রীঅপরেশ ভট্টাচার্য

বাংলা দেশের সুদূর পল্লীগ্রামের এক চতুষ্পাঠী। নানা জায়গা থেকে আসে নানান বয়সের ছাত্র দল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়—প্রায় সারাক্ষণই চলে পাঠ পর্ব। সকালের সোনালী রোদ দুপুরের রুদ্র তেজ সংবরণ করে ঢলে পড়ে অস্ত-অচলে। সন্ধ্যায় জলে মাটির প্রদীপ। ধূপ-ধুনোর সঙ্গে হয় সন্ধ্যা-আরতি। সে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এক তরুণ যুবক। শীর্ণ দেহ, জীর্ণ বাস। প্রতিভার অপরূপ প্রসন্নতায় তাঁর দেহ-মন পরিষিক্ত। দিন রাত শুধু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। পড়া ও পড়ানো। শৈশবেই এঁর অসামান্য প্রতিভায় গুরু হয়েছেন আনন্দিত আর মা-বাবা এঁকেছেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সুন্দর ছবি। নবদ্বীপ থেকে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করে তিনি এসে চতুষ্পাঠী খুললেন শেরপুরে। (ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত)। তাঁর প্রতিভার সৌরভ পল্লী-প্রকৃতিকে অতিক্রম করে ক্রমে বিস্তৃত হয়ে পড়ল সারা বাংলা দেশে। ডাক এল কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য। কিন্তু তখনই তিনি সে ডাকে সাড়া দিতে পারেন নি। তাঁর মায়ের অমত ছিল ছেলেকে এত দূরে পাঠাতে। তাই এত বড় পদ ও যশের সম্ভাবনাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করে কর্তৃপক্ষকে লিখলেন…"বিশেষতঃ আমার মাতৃদেবী জীবিতা। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি কলিকাতা যাইতে অক্ষম।" তাঁর সুগভীর মাতৃভক্তির এটি একটি বড় পরিচয়। অবশ্য সে যুগে বিদ্যাসাগর-আশুতোষ-গুরুদাসের মত আরও অনেক মাতৃভক্ত সন্তান বাংলা দেশকে গৌরবান্বিত করে তুলেছিল—আর তখনকার জীবন-সাধনায় মাতৃমন্ত্রই ছিল তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান।

মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর অবশ্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদও গ্রহণ করেন। এই অধ্যাপকের পদটি তিনি না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর ধরে শূন্যই রেখেছিলেন গুণগ্রাহী কর্তৃপক্ষ। তাঁর পাণ্ডিত্য বা বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে কারও মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা ছিল না। কিন্তু তবু তাঁকে একটু পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়। তিনিই এই অভিনব পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু খুব কায়দা করে—যাতে তাঁকে পরীক্ষা করা হচ্ছে—এটা যেন তিনি বুঝতে না পারেন। বুঝতে তিনি পেরেছিলেন ঠিকই এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়ও লজ্জিত হয়েছিলেন পরে। যাই হোক—এই তরুণ অধ্যাপক ন্যায়রত্ন

মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে—আকস্মিক ভাবে তিনি এই পল্লী অঞ্চল থেকে সদ্য আগত পণ্ডিতকে একটা ছল করে এম. এ. ক্লাসে খুব একটা কঠিন বই (নৈষধ চরিত) পড়াতে পাঠিয়ে দিলেন। পণ্ডিতও কণামাত্র ইতস্ততঃ না করে গিয়ে হাজির হলেন এম. এ. ক্লাসে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র দল, আরেকদিকে মুণ্ডিত মস্তক, শীর্ণদেহ কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত পণ্ডিত। অপরদিকে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষ স্বয়ং। পাঠ-পর্ব সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল প্রশ্নবাণ। ছেলেরা একের পর এক প্রশ্ন করে চলে এই নবাগত পণ্ডিতকে আর তিনি সঙ্গে সঙ্গেই অবলীলাক্রমে মীমাংসা করে দেন। ক্রমে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে ছাত্রদল জানায় প্রণাম অন্তরালে অবস্থিত অধ্যক্ষের মুখে ফুটে ওঠে পরিতৃপ্তির নির্মল প্রশান্তি। শেষ হয় সেদিনের পরীক্ষা। কিন্তু আর এক পরীক্ষা তখনও বাকী। সেটি ছিল টোল-বিভাগে। সেও এক স্মরণীয় দৃশ্য। একদিকে সমবেত উপাধি-পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দ অপরদিকে সেই পণ্ডিত। পাঠ্য কাদম্বরী নামক দুরূহ গ্রন্থ। "পিতা স্থির ভাবে কাদম্বরীর দীর্ঘ সমাসগুলি বুঝাইয়া, ভাষা প্রাঞ্জল করিয়া বলিতে লাগিলেন। চতুর্দিক হইতে সমস্ত ক্লাসের ছাত্রবর্গ শৈব, পাশুপত, অগ্নি, ঐশিক, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন অস্ত্র-রাশি পিতার উপর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। পিতা সমস্তই বৈষ্ণব বাণে মুহূর্ত মধ্যে নিবারণ করিতে লাগিলেন।" তাঁর এই অলোক-সামান্য পাণ্ডিত্যে ন্যায়-রত্ন মহাশয় মুগ্ধ বিস্মিত ছাত্রবর্গ আনন্দিত বিগলিত হইলেন। এম. এ. ক্লাসের পরীক্ষায় সেদিন ছাত্রের ভূমিকায় ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই আশুতোষ শাস্ত্রীই ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান।

পল্লীর চতুষ্পাঠীর এই পণ্ডিত তাঁর অধ্যাপক জীবনে অত্যন্ত সুনাম এবং কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে দেশ ও জাতির অলঙ্কার স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। আশুতোষ শাস্ত্রী এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়াও যাঁদের নাম অমর হয়ে আছে—তাঁরা হচ্ছেন পদ্মনাভ বিদ্যাবিনোদ, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, যামিনীভূষণ রায় ও যোগেন্দ্রনাথ সেন। এ ছাড়াও রয়েছেন—আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ, মহামহোপাধ্যায় কালী কিশোর তর্করত্ন, গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। দ্রোণাচার্যের অস্ত্রবিদ্যা সার্থক হয়ে উঠেছিল একা ধনঞ্জয়ের সাফল্যে। আর এই পণ্ডিতের শাস্ত্রবিদ্যা সার্থক হয়ে উঠেছে শত ধনঞ্জয়ে।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে রচনা-কর্মেও তিনি ছিলেন অনলস। এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে তাঁর সুগভীর চিন্তা ও প্রজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ 'শিক্ষা' পুস্তকটির (প্রবন্ধ সংকলন—১২৮৯) নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি গোভিল গৃহ্য সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে তিনি এটি রচনা করেন এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়দ্বয় এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে এটি প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আরও অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তার মধ্যে কাব্য এবং নাটকও রয়েছে। তাঁর জীবিতকালেই কলকাতা রঙ্গ-মঞ্চে তাঁর "কৌমুদী সুধাকর" দৃশ্যকাব্যটি অভিনীত ও প্রশংসিত হয়।

বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার তখনই গোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের প্রবর্তন হয়। আশুতোষের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এবং "সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সমস্ত দর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে বক্তৃতা করেন। পরে পুস্তকাকারে ফেলোশিপের লেকচার নামে প্রচারিত হয়।...এই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পঁচিশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। কৃতিত্বের আরও কত নিদর্শন, প্রতিভার আরও কত বিচিত্র কাহিনী থাকল অকথিত।

এমন যে বিরাট পণ্ডিত, তাঁর ছাত্র-জীবনের একটা ভারী মজার গল্প শোনা যায়। বিদ্যাসাগর টিকিতে দড়ি বেঁধে রাত জেগে পড়তেন—এ কাহিনী আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই পণ্ডিত-মনীষী রাত জেগে পড়াশুনার জন্য এক অবিশ্বাস্য পথ বেছে নিয়েছিলেন।

সে পথটি হ'ল কম করে খাওয়া, আধ-পেটা খেয়ে থাকা। কিন্তু খিদের পেটে কি কম করে খাওয়া যায়। আধপেটা খেয়ে উঠে পড়া যায়? তিনি কিন্তু তাই করতেন। আধ-পেটা খেয়েই উঠে পড়তেন। তখন তিনি নবদ্বীপে থেকে স্মৃতিশাস্ত্র পড়েন; নিজেই রান্না-বান্না করে খান। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা ফন্দি এল। আর সঙ্গে সঙ্গেই তা কাজে লাগালেন। রান্না করার সময় ডাল-তরকারিতে খুব বেশী করে লবণ দিয়ে দিতে লাগলেন। একেবারে লবণে পোড়া ডাল-তরকারি! আর তাই দিয়ে মেখে ভাত মুখে দিতে না দিতেই—ওয়াক! থুঃ!—একে-বারে বত্রিশ নাড়ি উল্টে আসতে চায়! তাই শুধু ভাত খানিকটা খেয়ে নিয়ে উঠে পড়া। আর কাজও হ'ল তাতে। সহজে আর ঝিমুনি আসে নি কোনদিন—রাতের পর রাত এমনি করেই চলেছে পাঠের সাধনা—অধ্যয়নের তপস্যা। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—এই উপদেশ বাক্যকে তিনি মূর্ত করে তুলেছিলেন তাঁর নিজের জীবনে।

এই জ্ঞান-তাপসের নাম বাংলা দেশের এক অতি সুপরিচিত নাম। সে নাম চন্দ্রকান্ত—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

—(*)—

গরীবের ভগবান

চৈতালী বসু

আজ সকালে ডাক্তার কাকার মৃত্যু সংবাদ শুনে ভীষণ দুঃখ পেলাম। এই বিদেশে বসে তাঁর মত বন্ধুর কথা বড় বেশী করে মনে পড়তে লাগল। দেশে গেলে সেই সদাহাস্যময় মুখ আর দেখতে পাব না। দুঃখের দিনে যিনি পাশে এসে দাঁড়াতেন, আনন্দের দিনে প্রাণ খোলা হাসি হেসে সেই আনন্দকে আরও মধুময় করে তুলতেন, সেই আত্মসংযমী, পরোপকারী ডাক্তার কাকা অর্থাৎ ডাঃ অনিল রায় আর আমাদের মধ্যে নেই। সেই অজ্ঞাত দেশপ্রেমিকের মৃত্যু সংবাদের খবর দেবার জন্য হয়ত কোনও সাংবাদিক তাঁর কাগজের এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা নষ্ট করবেন না কিন্তু তবুও গোবিন্দপুরের গ্রামবাসীদের 'দেবতা' মারা গেছেন। আজ তাদের বড় দুঃখের দিন।

সেই সদাব্যস্ত মানুষটি প্রতিদিন ভোরবেলায় উঠে প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন তাঁর প্রিয় সাইকেলটিতে চড়ে। একটা ব্যাগ ঝোলানো থাকতো আর তাতে থাকতো অনেক রকমের প্রয়োজনীয় জিনিষ। প্রতিটি বাড়ীর সামনে সাইকেলের বেল বাজিয়ে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন, হয়তো দেখলেন অসুস্থ রাজেন সকালে উঠে খালি গায়ে বাগানের কাজ করছে, তখুনি তাকে ধমকে দিলেন—কি হে! এতো সকালে খালি গায়ে ঘুরছো কেন? সেদিন তো সবে নিউমোনিয়া থেকে উঠলে। রাজুর বাড়ীতে গিয়ে রাজুকে ডেকে একটা হরলিক্স দিলেন, তার অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করবার জন্য।

সকলেই তাঁর এই দানকে মাথায় পেতে নিত। যারা টাকা নেই বলে তাঁর কাছে যেতো না, তাদের শুনতে হতো তীব্র ভর্ৎসনা। সেবার নবীন মণ্ডল তার বউকে ডাক্তার না দেখিয়ে মেরে ফেলল, বেচারী বউটা টাকা ঘরে থাকতেও চিকিৎসা হবার সুযোগ পেল না। ডাক্তার কাকার সে কী রাগ। বার বার বলতে লাগলেন—এরা মানুষ না জানোয়ার? মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করে এরা কি বলতো? সেই থেকে তিনি আর কখনও নবীন মণ্ডলের মুখ দর্শন করেননি, কিন্তু তাঁর ছোট ছেলেটার যখন অসুখ করেছিল তখন তিনি নিজে ওষুধ দিয়ে, পথ্যি দিয়ে ছেলেটাকে সারিয়ে তুলেছিলেন। নবীনের একটি পয়সাও তিনি স্পর্শ করেননি।

বিচিত্র ছিল তাঁর মন। যখন শুনতেন কেউ পরীক্ষার ফী জমা দিতে পারছে না, তখনই তার ফীয়ের টাকা জমা দিয়ে দিতেন। পিতৃমাতৃহীন একটা ছেলেকে তিনি মানুষ করছেন, সেই ছেলে আজ কলকাতা থেকে ডাক্তারি পড়ছে। তাঁর আশা একটা নারসিং হোম খুলবেন তাতে শুধু গরীবদের রেখে চিকিৎসা করা হবে। কিন্তু তাঁর সে আশা আজও বাস্তবের রূপ পায়নি উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে।

আলাদা কোনও সংসার তাঁর ছিল না। গ্রামের গরীব দুঃখীরাই ছিল সর্ব্বস্ব। তাদের আনন্দে তিনি আত্মহারা হতেন, তাদের দুঃখে তিনি একেবারে নিকট আত্মীয়ের মতো সাহায্য করতেন। এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবন। এমনিভাবে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে করতে তিনি মারা গেছেন, এমন মানুষের কথা হয়ত কোনদিন ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে না, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে, মানবপ্রেমিক হিসাবে তিনি যে কত বড় গোবিন্দপুরের গ্রামবাসী তা হৃদয়ে গেঁথে রেখেছে।

———

শেষ হয় দেশ

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশসেবক : সর্বকালের সর্বদেশের সমসাময়িক ইতিহাসের নয়া নায়ক দেশসেবক। হাল আমলের বহাল আমলা দেশসেবক, যিনি নয়া জমানার সব হামলার সমস্ত মামলার বিচারক, বিবেচক, বিশ্লেষক। দেশসেবক বেশ লেখক; যিনি শুধু সেবাব্রতের দৌলতে অনির্বাচিত স্বনির্বাচিত উত্তম পুরুষ; যিনি মধ্যমদের মধ্যমণি; অথচ যিনি অধমদেরও প্রথম।

দেশসেবক : শব্দটি যেন একটি নিঃশব্দ নিবেদন, একটি নিস্তব্ধ আবেদন। দেশসেবক : এই সুভাষিত ভাষাটিতে মাহাত্ম্য আছে, আভিজাত্য আছে; কিন্তু নেই অর্থের অনর্থ।

দেশ বিরাট। সেবক বিশাল। দু'টিই গভীর, উভয়েই গম্ভীর । কিন্তু দুই মিলে যখনই এক হয়, তখনই হয় একচ্ছত্র একাকার। দেশ আর সেবক : দু'টি দ্বন্দ্বী যখনই সন্ধি বাঁধে, তখনই ফন্দি ফাঁদে। সেই বন্ধনের উদ্বন্ধনে দেশ মরে, সেবক ঝরে। সেই দাম্পত্যের আধিপত্যে দেশ দশকে করে বশ, সেবক যশকে করে অবশ। দেশ দেয় নির্দেশ, সেবক দেয় উপদেশ; তবু সেই দ্বৈত দানের প্রতিদানে মহাদেশ দাঁড়ায় না, বরং মহামারী বাড়ায় পা। সেই শৃঙ্খলের বিশৃঙ্খলায় দেশ থাকে না সুস্থ, সেবক থাকে না স্বস্থ। অর্থাৎ সেই দুর্দিনের সুদিনে আর দেশও থাকে না, সেবকও থাকে না। যেমন; হোলি রোমান এম্পায়ার হোলি ছিল না, রোমানও ছিল না; এমন কি, এম্পায়ারই ছিল না।

প্রতীচির নীতি : যখন যাবে রোমে, তখন সাজবে রোমান। প্রাচীর রীতি : যখন যাবে লঙ্কায়, তখন সাজবে রাবণ; অন্তত সাজবে বিভীষণ।

তাই যখন প্রবীণ দশরথ ছাড়েন অযোধ্যা, নবীন দাশরথি নাড়েন যোদ্ধার জয়ধ্বজা, তখন পঞ্চবটি বনে ঘনায় অশোক-কানন, সীতা হারায় সতীত্ব, বিচক্ষণ লক্ষণ অলক্ষণের মেঘ জমায় মেঘনাদের সাধের সাধনায়। সেই সুযোগে, সেই দুর্যোগে তুচ্ছ মুখ, উচ্চ বুক আকাশে তোলে বালী, সুগ্রাব, হনুমান।

এদিকে ক্ষোভে কাঁপে দেশ, লোভে কাঁপে সেবক। সর্বজনের সর্বনাশে পৌষ মাসে হাসে দু'জন চারজন দেশসেবক।

আদিযুগের মুনিজনের মতে, সেবক ছিলেন 'তৃণাদপি সুনীচানি, মৃদুনি কুসুমাদপি'; ছিলেন ঘাসের চেয়েও নত, ফুলের চেয়েও নম্র। মধ্যযুগের মহাজনের ভজনে-পূজনে সেবক ছিলেন সাধক, ছিলেন দাসানুদাস; চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বৃন্দাবনদাস। প্রাগৈতিহাসিক প্রকৃতিতে সেবক ছিলেন বিক্রীত ও ধিক্কৃত ক্রীতদাস। অভিনন্দিত অভিধানের বিধানে সেবক মানে সসম্মানে ভৃত্য।

কিন্তু সেবক যেখানে দেশসেবক, ভৃত্যের আসন সেখানে দেশের দশের শ্রীপাদপদ্মে নয়; ভৃত্যের আসর-বাসর সেখানে একাদশ-দ্বাদশের শির-শীর্ষে; অচল অটল; অক্ষয়, অব্যয়। ভৃত্য সেখানে প্রভুর প্রভু। ভৃত্য সেখানে নিতান্তই "পুরাতন ভৃত্য", যাকে "দেখে জ্ব'লে যায় পিত্ত, তবু মায়া" যার "ত্যাগ করা ভার, বড় পুরাতন ভৃত্য।"

সেই ভক্ত ভৃত্যের শক্তিতে-আসক্তিতে বিরক্তি জানায় অবিশ্বাসী প্রতিবাসীরা; কত শত অকথ্য কথায় কূজন জানায় অযুত নিযুত কুজন; ভৃত্য "শুনেও শোনে না কানে; যত পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।"

দেশের সেবক সাজে বিদেশের শাবক ও স্তাবক। দেশের ভৃত্য নৃত্য তোলে বিদেশের আদেশে, আবেশের বেশে; "না মানে শাসন : অশন, আসন, বসন, বাসন যত; কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত।"

দেশসেবক স্বদেশকে করে পরদেশ, দেশের খাঁটি 'মা'টিকে করে মাটি, দেশের অজকে ভজ করে সঙ্গোপনে, দেশের নিরাপদ সম্পদে বাধায় বিপদ; "তিনখানা দিলে

একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে ; একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করি' আনে।"

দেশসেবকই শেষ সেবক, যার বিশুদ্ধ সেবৌষধের নিষিদ্ধ সেবনে অবশেষে শেষ হয় দেশ।

দেশ নিয়তই নিহত হয় রাজনীতিতে, স্বরাজনীতিতে, সমাজনীতিতে। দেশ অহরহই আহত হয় সাহিত্য-নীতিতে। দেশের দরদে জল্পনা-কল্পনা শুধু দেশসেবকের দীপ্ত দপ্তরে নয়, সাহিত্যসেবকদের অন্তরের অভ্যন্তরেও সমান বর্তমান।

যুগযুগান্তরে দেশদেশান্তরে দেশের দুরন্ত দুরাশা, দেশের দুর্দমনীয় দুর্দশা আভাসে ভাসে সাহিত্যিকের আকাশে, সাহিত্যের বাতাসে। দেশের বিচিত্র চিত্র "ফসল ফলায় কত সাহিত্য কত কাব্যের বুকের তলায়।"

লেখকের লেখনে নানা রঙে রাঙে দেশ ; নানা রূপে হয় অপরূপ। দেশের কালো চোখে আলোর আলেয়া খোঁজেন লেখক। দেশকে শান্তির ভ্রান্তিতে শ্রান্ত করেন সাহিত্যিক।

ইংল্যাণ্ডের কবি লেখেন, "ইংল্যাণ্ড, যত অপরাধ থাক তোমার, তবু ভালবাসা নাও আমার।" বাংলার কবি বলেন, "আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি ; তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।" গান শোনান বাংলার কবি, "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা ; তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

আসলে, বিশ্বময়ীও নেই, বিশ্বমায়ীও নেই সাহিত্যের দায়িত্বে ; বিশ্বপ্রেমের আদর নেই, কদর নেই দেশপ্রেমের সদরে অন্দরে। দেশের দুর্গম দুর্গে বিশ্ব নিঃসংশয়েই নিঃস্ব, নিঃসম্বল। জন্মায়ত্ত দেশের স্বায়ত্তশাসিত স্বাধিকারে বিদেশের অনতিক্রম্য অনধিকার।

যদিও জাতীয়তার ও আন্তর্জাতীয়তার অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্তরালে কখনও কখনও জেহাদ হাঁকেন কোনও কোনও বিদ্রোহী বান্ধব, "জাতের নামে বজ্জাতি, সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া ;" তবু জনচিত্তের গণ-সাহিত্যে স্বজনেরও স্বজাতের ও স্বদেশের অবিরল অবিচল "খেলা ভাঙার খেলা," যে খেলায় "তাজা খুনে লাল" হয় "সরস্বতীর শ্বেতকমল।"

ভূগোলের দু'টি গোলার্ধের পাঁচটি মহাদেশে শত সহস্র দেশ, প্রদেশ, উপদেশ, উপনিবেশ। তবু "সারা জগতের উত্তম স্থান আমার অমর হিন্দুস্থান।" অখিল নিখিলে পরিপূর্ণ পরিক্রমণ করলেন ভ্রমণপ্রবণ ভ্রাম্যমান ; "তবু ভরিল না চিত্ত, সর্ব তীর্থ সারি ; তাই, মা, তোমার কাছে এসেছি আবার।"

দিকে দিকে আছে কত অগণিত গ্রাম-নগর, কত লোকাকীর্ণ লোকালয় ; আছে কত রাজ্য, কত সাম্রাজ্য ; "তাহার মধ্যে আছে যে দেশ, সকল দেশের সেরা ; স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ; এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি ; সকল দেশের রাণী, সে যে আমার জন্মভূমি।"

যে দেশ যত দুঃস্থ, সে দেশে তত প্রবল দুর্বলতা দূষিত দেশের প্রতি প্রায় প্রতি সাহিত্যের, প্রতিটি সাহিত্যিকের ; প্রভূত শুভ কামনা, শুভ্র বাসনা প্রায় প্রতি লেখকের, প্রতিটি লেখনের। রক্তের মধ্যে ভক্তের আর্তি প্রার্থনা, "এই দেশেতেই জন্মে' যেন এই দেশেতেই মরি।"

কিন্তু দেশপ্রেমিক মরে না, দেশপ্রেম মরে না ; মরে দেশ। শেষ হয় দেশ।

রাষ্ট্রীয় দল ও দেশের উন্নতি

কংগ্রেস যখন পণ্ডিত নেহরুর মারফতে ভারতবর্ষকে দুইভাগ করিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম অনুযায়ী দুই জাতির অস্তিত্ব মানিয়া লইল ও ফলে প্রায় এক কোটি লোক খুন জখম সর্ব্বস্বান্ত ও বাস্তুহারা হইয়া দুর্দ্দশার চরমে গিয়া পড়িল, তখন কংগ্রেস বলিল "আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করিলাম"। দেশবাসীর মধ্যে যাহারা বোবা তাহারা কিছু বলিল না। কম্যুনিষ্ট পার্টি পুরাতন কোন প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া পড়িলেই তাহার ভিতর পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট আকারে পুনর্জ্জন্মলাভের ইঙ্গিত দেখিয়া পুলকিত হয়। এ ক্ষেত্রেও বুর্জ্জোয়া সভ্যতার মহাকেন্দ্র ভারতবর্ষ দুই টুকরা হইয়া যাইলে তাহাদিগের প্রাণে আনন্দের উদ্ভব হইল। কংগ্রেস অতঃপর অহিংস, চরখাবহুল, ঐশ্বর্য্য বিভাগে সাম্য অনুসরণকারী এবং সকল পাপ ও অভাব বর্জ্জিত এক সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার জন্য বিদেশ হইতে আমদানি বিশেষজ্ঞ ও স্বদেশের হাতে বাছাই-করা অনভিজ্ঞদিগকে একত্র করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। জমিদারি বাতিল হইল কিন্তু বিদেশীদিগের চা-বাগান ও অপরাপর কারখানা ও ব্যবসাগত অধিকার পূর্ণরূপে মোতায়েন রহিল। জমি যাহা সরকারের হস্তগত হইল তাহাও ফাইলে ন্যস্ত হইল। ক্রমে ক্রমে আরও যেখানে যাহার জমা টাকা দেখা যাইল সে সকল তহবিলেই সরকার হাত লাগাইতে আরম্ভ করিলেন। যথা ব্যাঙ্ক, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, হেলথ ইনসিওরেন্স ও লাইফ ইনসিওরেন্স। ব্যাঙ্কগুলি সরকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে ক্রমে ক্রমে দেশের লোকের জমা টাকা প্রায় কাহাকেও বা কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই আর লাগাইতে পারিল না। রিজার্ভ ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টকে শত শত কোটি টাকা ধার হিসাবে টানিয়া লইতে দিতে লাগিলেন ও গভর্ণমেণ্টগুলি এইভাবে ও সোজাসুজি ঋণ করিয়া দেশবাসীর উপার্জ্জিত ধন অপব্যয় করিয়া উড়াইতে লাগিলেন। কোন ব্যাঙ্কের টাকাই যদি সরকারী ভাবে বেহাত হইয়া যায় তাহাতে কম্যুনিষ্ট দল পরম প্রীতি অনুভব করে। সুতরাং ৭৫ টাকা মাহিনার কেরাণীর বীমায় জমা টাকা লইয়া যখন "গ্রাম সংস্কার" বা অপর কোন খেলা চলিতে লাগিল তাহাতে গরীবের বন্ধু কম্যুনিষ্ট-দল কোন আপত্তি করিল না। এখন দেখা যাইতেছে যে, সকল ব্যাঙ্কের সকল অর্থই সরকারী হস্তে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতেও কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধ দলের অনেক ব্যক্তি একমত। অর্থাৎ উপার্জ্জক যে; অর্থসঞ্চয়, অর্থ দিয়া কোন কাজ-কারবার করা, বা অর্থের মালিকানা তাহার হইবে, না হইবে আমলাদিগের ও তাহার পশ্চাতে ঝাণ্ডাধারী রাষ্ট্রীয় দলগুলির। এ এক প্রকার অর্থনৈতিক জুলুম, যাহার প্রতিকার দেশবাসীর হাতেই আছে। কিন্তু কেহ সে কথার আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ অর্থ যাহাদিগের আছে তাহাদিগের মধ্যে দুই-চারিজন ধন-দানব আছে ও তাহারা জনপ্রিয় নহে ও তাহাদিগের কার্য্য-কলাপের ফলে জনহিত সাধিত হয় না—উল্টাই হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায় যে, রাষ্ট্রনেতা ও আমলাদিগের মধ্যেও বেশ কিছু লোক জনহিতবিপরীত কার্য্যে লাগিয়া আছে। কাহারও কাহারও জেলও হইয়াছে। আরও অনেকের হওয়া উচিত। কিন্তু এই কারণে সকল রাষ্ট্রনেতাকে ও আমলাদিগকে কেহ সাক্ষাৎ ভাবে দোষ দিতেছে না। সকল ব্যক্তি সরকারের দাস হইয়া যাইলে সকলেরই মঙ্গল; একথা কোন স্বাধীনচেতা মানুষ স্বীকার করিবে না। ব্যক্তিগত অধিকার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিলেই এক সমষ্টিগত পরম ও চরম অধিকার ও সম্ভোগের মহাসূর্য্য উদিত হইবে—একথাও কেহ বিশ্বাস করে না। মাওৎসেটুঙ্গের রাজত্বে মরিবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু বাঁচিবার ব্যবস্থা সেখানে কতটা অনায়াসলভ্য তাহার কথা সকলে চাপিয়া যায়। সম্প্রতি যে চাইনিজ টেডি বয়ের ঝাড় নূতন কৃষ্টির সৃজন চেষ্টায় ঘরে ঘরে ঢুকিয়া পুরাতন বহুমূল্য দ্রব্য ধ্বংস করিয়া মাও-এর বাহবা পাইয়াছে, ইহার সহিত মুসলমান প্রগতির যুগের আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার, নালন্দা বিশ্ব-

বিদ্যালয় ও শত সহস্র মন্দির ধ্বংসের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। চীনা ধরনের কম্যুনিজম্ দেখা যাইতেছে ধর্মান্ধতার অন্ধকারে গভীর ভাবে প্রবিষ্ট। মানুষের আত্মার অধিকার যাহারা স্বীকার করে না, প্রাণশক্তিকে শুধু অবস্থাগত যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা বিশ্ব-বাসীর আত্মাকে হনন করিতে উদ্যত। অপরদিকে যাহারা মানব-আত্মার অধিকার দার্শনিক মতবাদের সাহায্যে কাড়িয়া লইবার ও মানবত্তাকে পরিকল্পনার কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া মনুষ্যত্বকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া শেষ অবধি একটা কৃত্রিম চির-নাবালক অবস্থায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহারাও মানব-প্রগতির শত্রু। ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপরই মানব-সভ্যতা, কৃষ্টি ও উন্নতি নির্ভর করে। প্রেরণা কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় পদ্ধতি। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন পদ্ধতির কোন মূল্য নাই। উদ্দেশ্যের পথ দেখায় প্রেরণা যাহা শুধু ব্যক্তির আত্মাতেই আলোকিত হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রীয় দলগুলির কার্য্যত উদ্দেশ্য মানবাত্মাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিজেদের মতলব হাসিল করা। ইহার ফলে বিজ্ঞান, কারখানাবাদ ও সামরিক শক্তি বাড়িতে পারে, কিন্তু সভ্যতার ও কৃষ্টির বিস্তৃতি ও পূর্ণতর বিকাশ হইতে পারে না। নিজ নিজ পায়রার খোপে নিবাসের অধিকার ও নিয়মমত কার্য্য, অবসর, ভ্রমণ, ক্রীড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলেই মানবজীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। নিয়মের সীমা নিয়মই বাঁধিয়া দেয়, কিন্তু নিয়মবাহুল্য চিন্তা, কল্পনা, প্রেরণাজাত অনুভূতি ও আবেগকে ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া দেয়। প্রাচীন সভ্যতাগুলি যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যেও দেখা যায় নিয়মাধিক্য। মানবপ্রাণ নিয়মকে কখনও না কখনও শৃঙ্খল বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করে ও তখন চায় নিয়মকে ভাঙ্গিতে। ইহার পরে নিয়মগঠিত সাম্রাজ্য, রাজত্ব বা রাষ্ট্র টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে আরম্ভ হয় ও মানব-আত্মা ও প্রাণ আবার নূতন করিয়া প্রগতির পথ খুঁজিতে বাধ্য হয়। নিয়মবৃদ্ধি মানবসভ্যতাবিরুদ্ধ এবং নিয়ম প্রবর্ত্তকদিগকে সেই কারণে দমন করিয়া রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় দলগুলির প্রভুত্ব মানিয়া চলা কখনও মানুষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে। মানুষকে মানুষ বলিয়া বিচার করিয়া তবে তাহাকে উচ্চ পদে বসান উচিত। রাষ্ট্রীয়দলের আদেশে নহে।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

চতুর্থ পরিকল্পনা ও দেশের ভবিষ্যৎ

গত মাসের আলোচনায় আমরা পরিকল্পনার মূল নীতি ও পরিকল্পনা রূপায়ণের গতি ও প্রকৃতির ধারা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিয়াছি যে দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণ অসার্থক ও সাফল্যহীন পরিকল্পনাবিধি অনুসরণ। ইহার অন্যতম লক্ষণ দেখিতে পাই সঙ্গতির (resources) সীমা লঙ্ঘন ও অতিক্রম করিয়া (সত্যকার সঙ্গতির সীমা বস্তুতঃ সঞ্চয়+বৈদেশিক সাহায্য (ঋণ+দান)+অতিরিক্ত রাজস্ব দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা) বৃহৎ অঙ্কের লগ্নীর আয়োজন করা।

গত তিন তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে লগ্নীযোগ্য পুঁজির হিসাব-নিকাশে (estimates) সর্ব্বদাই সঙ্গতির হিসাবে একটা ফাঁক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে (uncovered gap)। অর্থাৎ সঞ্চয়, বিদেশী সাহায্য, অতিরিক্ত রাজস্ব, সরকারী প্রয়োগগুলির (Public Sector Projects) উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা, এবং আভ্যন্তরীণ ঋণ, এ সকল বিভিন্ন দিক হইতে সংগৃহীত মোট সঙ্গতি হইতে আরো বেশী লগ্নীর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির খসড়ায় এই সঙ্গতি অতিক্রান্ত লগ্নীর হিসাবটি ছিল সামান্য অঙ্কের। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এবং বিশেষ করিয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় এই অঙ্কটি সমধিক বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু যেই উদ্দেশ্যে এই সন্দেহযোগ্য (questionable) বিধি পরিকল্পনা রচনায় অনুসৃত হইতেছিল, তাহা আদৌ সফল করা সম্ভব হয় নাই। উদ্দেশ্য ছিল যে কৃত্রিম পুঁজি সৃষ্টি করিয়া লগ্নীর আয়তন ও পরিধি বিস্তৃত করিয়া দিয়া উন্নয়ন গতি দ্রুততর করিতে হইবে। লগ্নীর আয়তন ও পরিধি সত্যকার সঙ্গতি অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহার ধারায় আনুপাতিক উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সম্পদ সৃষ্টির দ্বারা এই অতিরিক্ত লগ্নীর সার্থকতা সম্পাদন সম্ভব হয় নাই। ফলে বাজারে পণ্যের তুলনায় অর্থ-সরবরাহ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং সেই অনুপাতে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাজারে অর্থ-সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ সঙ্গতি অতিক্রম করিয়া কৃত্রিম পুঁজি সৃষ্টির দ্বারা লগ্নীর আয়তন ও পরিধি বৃদ্ধি মাত্র নয়। বস্তুতঃ যদি এই অতিরিক্ত লগ্নী সার্থকভাবে আনুপাতিক অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন-সার্থকতায় প্রতিফলিত হইত তাহা হইলে পণ্য উৎপাদনের তুলনায় অর্থ-সরবরাহ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারিত না। কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োজনানুপাতিক পরিচালন-সঙ্গতির অভাব এই দিক হইতে সার্থকতা লাভে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহা না হইলেও একটা বিশেষ দিক হইতে সার্থক পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে একটা প্রচণ্ড বাধা আগাগোড়াই ক্রিয়া করিয়া আসিতেছিল। দেশে যে একটা বিরাট পরিমাণের হিসাব-নিরপেক্ষ অর্থ-সরবরাহ রহিয়াছে তাহার কথা সরকারী মুখপাত্ররাও স্বীকার করিয়াছেন। ইহার সঠিক

পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী আন্দাজ করেন ইহার পরিমাণ সম্ভবতঃ ৩৫০০ কোটি টাকার মতন হইবে। স্বর্গগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী একবার বলিয়াছিলেন ইহার পরিমাণ ১০,০০০০ হাজার কোটি টাকার মতন হওয়াও অসম্ভব নয়। ইহার সঠিক পরিমাণ যাহাই হউক তাহার অঙ্ক যে বৃহৎ সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই।

এই অঙ্কটির পরিমাণ যতটাই হউক না কেন, তাহা যে সরকারী হিসাবে মোট অর্থ সরবরাহের প্রায় সমান সমান হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই অর্থের পরিমাণটিও যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তাহা আন্দাজ করাও কঠিন নহে। দুই দিক হইতে এই হিসাব-নিরপেক্ষ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ রহিয়াছে প্রথমতঃ সরকারী রাজস্বের কাঠামোর মধ্যেই ইহার একটি বিরাট সুযোগ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে মোট কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৭৪% ভাগের মতন পরোক্ষ ট্যাক্স হইতে আদায় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভোগ্য পণ্যাদির উপর আবগারী শুল্ক হইতে শতকরা৫০%ভাগেরও বেশী আদায় হইয়া থাকে। ভোগ্য পণ্যাদির উপরে আবগারী শুল্কের পরিমাণটি অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশী মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণতঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকে এবং আমাদের দেশে বস্তুতঃ তাহাই হইতেছে। এটি ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত মুনাফা রূপে তাহার কুক্ষিগত হইয়া থাকে। কিন্তু এই অতিরিক্ত মুনাফার অঙ্কটি সরকারী হিসাবে ধরা পড়ে না এবং ইহার উপরে আয়কর ধার্য্য করা বা আদায় করা সম্ভব হয় না। এইভাবে একদিকে হিসাব-নিরপেক্ষ অর্থ-সরবরাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্যদিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রয়োগকৃত নানাবিধ লগ্নী নিয়ন্ত্রণ বিধি (credit control policy) হিসাব-নিরপেক্ষ অর্থ লগ্নীর উপরে সার্থকভাবে প্রয়োগ করিবার কোন উপায় আজিও উদ্ভাবিত হয় নাই। চোরাকারবারের মুনাফাবাজী নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন উপায় নাই। খাদ্যশস্য ইত্যাদি অবশ্যভোগ পণ্যে মুনাফাবাজীর মতলবে (speculative investments) এই চোরা অর্থের নিয়োগ যে প্রভূত পরিমাণে হইতেছে এবং হইয়া থাকে তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহার সত্যকার চিহ্ন পাওয়া যায় খোলা-বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যমান হইতে। উদাহরণ স্বরূপ কলিকাতার পূর্ণ র‍্যাশনিং-বিধৃত এলাকার চতুষ্পার্শ্বে চাউলের মূল্যের উঠ্তি-পড়্তির হিসাব হইতে তাহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যাইবে। গত বৎসর (১৯৬৪-৬৫) সালে খাদ্যশস্যের ফসলের পরিমাণ এতাবৎ বৃহত্তম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। নূতন ফসলের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস হইতে সুরু করিয়া কলিকাতার সন্নিহিত খোলা-বাজারে সাধারণ চাউলের খুচরা দাম নিম্নলিখিত রূপ ছিল :—

১৯৬৪ নভেম্বর হইতে ১৯৬৫ জানুয়ারী ০'৯০ পয়সা—১'০০ প্রতি কিলো
১৯৬৫ ফেব্রুয়ারী ,, ,, এপ্রিল ১'১০ ,, —১'২৫ ,, ,,
১৯৬৫ এপ্রিল ,, ,, নভেম্বর ১.২৫ ,, —১৫০ ,, ,,
১৯৬৫ নভেম্বর ,, ১৯৬৬ জানুয়ারী ১'৫০ ,, —২'০০ ,, ,,
১৯৬৬ জানুয়ারী ,, ,, এপ্রিল ২'০০ ,, —২'৫০ ,, ,,
,, এপ্রিল হইতে
,, (খাদ্য আন্দোলন) জুন ১'৬০ ,, —১'৭৫ ,, ,,
,, জুন হইতে ১'৭৫ ,, —২'৪০ ,, ,,

খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাট্‌তির কারণে যে এই প্রচণ্ড মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য সরবরাহের বাস্তবিক (Physical) হিসাব হইতে (সরকারী হিসাব) দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান লোকসংখ্যাকে প্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্য দৈনিক

১৬ আউন্স এবং ৮ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়স্কদের জন্য দৈনিক ৮ আউন্স বরাদ্দ হিসাবে ধরিলে, এই লোকসংখ্যার (৩ কোটি ৯০ লক্ষ; ১৯৬১ সালের আদম সুমারী বর্ণিত লোকসংখ্যার বার্ষিক ২·৪% হিসাবে বৃদ্ধি ধরিয়া লইয়া) মোট খাদ্যশস্যের চাহিদার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩৭ লক্ষ টন। ইহার সহিত অনিবার্য্য অপচয় এবং বীজ শস্যের জন্য ভোগ চাহিদার পরিমাণের উপর ১০% যোগ করিলে, রাজ্যের সর্ব্বসাকুল্যে মোট চাহিদার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার টন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালে চাউলের (আমন) মোট ফসলের পরিমাণ হইয়াছিল ৪৪ লক্ষ টন (পূর্ব্ব বৎসরের প্রাথমিক হিসাবে বলা হয় যে ১৯৬৪-৬৫ সালে চাউলের মোট ফসলের পরিমাণ হইয়াছিল ৫৪ লক্ষ টন, পরে সংশোধন করিয়া ইহার পরিমাণ ৪৮ লক্ষ টনে নামাইয়া দেওয়া হয়)। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে যে হিসাব দিতেছেন যে এই রাজ্যের মোট ভোগ চাহিদার পরিমাণ ৬২ লক্ষ টন, তাহা কোন রকমেই বাস্তবানুগ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ১৯৬৫-৬৬ সালের আমন ফসলের ৪৪ লক্ষ টনের উপরে আরো তিন লক্ষ টন চাউল আশু ধান্য হইতে পাওয়া গিয়াছে; ইহা ছাড়া ১৯৬৫ সালে ডিসেম্বর হইতে ১৯৬৬ সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত বাহির হইতে আরো ৩ লক্ষ টন আন্দাজ চাউল এবং প্রায় ৭½ লক্ষ টন গম আমদানী হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের মোট সরবরাহের পরিমাণ এতাবৎ বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় ৫৭½ লক্ষ টনের মতন হইবে। ইহার মধ্যে পূর্ণ র‍্যাশনিং বিধৃত-এলাকাগুলিতে ৮৬ লক্ষ লোকের জন্য জন প্রতি দৈনিক ১০ আউন্সের কিঞ্চিৎ কম এবং আংশিক র‍্যাশনিং-বিধৃত এলাকার ১ কোটি ১৩ লক্ষ লোকের জন্য দৈনিক জন-প্রতি প্রায় ৯ আউন্স বরাদ্দ সরবরাহ করিতে, সরকারী হিসাব মতেই বৎসরে মোট ১৭,৭৫,৭০০ টন, অর্থাৎ প্রায় ১৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে রাজ্যের বাকী ১ কোটি ৯১ লক্ষ লোকের (পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর হিসাব মতন ২ কোটি ২১ লক্ষ) লোকের জন্য উদ্বৃত্ত থাকে ৩৯½ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। তথাপি বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের প্রচণ্ড প্রাবল্য খাদ্যশস্য সরবরাহের বাস্তব ঘাট্‌তির দরুণ যে ঘটে নাই তাহা সুস্পষ্ট। এই ঘাট্‌তি কৃত্রিম, চোরাকারবারীদের চোরা অর্থের দ্বারা পুষ্ট মুনাফাবাজীর কারণে সৃষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থার ফলে যে মূল্যসঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পরিকল্পনানুযায়ী দেশের আর্থিক উন্নয়নের পথে সঙ্কটজনক বাধা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

এই সঙ্কটের একটা বাস্তব চিত্র পাইতে গেলে উন্নয়ন গতির অনুশীলন করিলে পাওয়া যাইবে। প্রথম পরিকল্পনার প্রাক্কালে—১৯৫০-৫১ সালে—হিসাব করা হইয়াছিল যে, দেশের সমগ্র জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৯০০০ হাজার কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনার শেষে, ১৯৫৫-৫৬ সালে, জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১০,৮০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫০০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে মূল্যমান মোটামুটি ৩০% বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই হিসাব যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৭৮০০ কোটি টাকার মতন নূতন লগ্নী হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির মূল্যে, অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে, অতি যৎসামান্য পরিমাণ মাত্র হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণের শেষ হিসাব এখনো তৈয়ারী হয় নাই; আন্দাজ করা হইতেছে যে, ১৯৬৩-৬৪ সালের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭০০০।১৭৫০০ কোটি টাকার মতন হইবে। ১৯৬০-৬১ সাল হইতে ১৯৬৪-৬৫ সালের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩৭% মতন মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। প্ল্যানিং কমিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত একটি হিসাব অনুযায়ী তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৬৩-৬৪ সালের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আয় মোটামুটি ১২% বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঐ পরিকল্পনাকালে নির্দ্দিষ্ট লগ্নীর আয়োজনের ৯৮% বাস্তবিক লগ্নী হইয়া গিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে।

এই মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপের একটি বিশিষ্ট ফল এই হইয়াছে যে, ভারত সরকার গত জুন মাসের প্রথম দিকে বিদেশী মুদ্রার তুলনায় টাকার বিনিময় মূল্য প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল, এই দশ বৎসরের মধ্যে দেশে ৮০% মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবার ফলে আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় বাজারে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীর চাহিদা এমন ভাবে কমিয়া যাইতেছিল যে, টাকার বিনিময় মূল্য কমাইয়া ইহাকে বাস্তব মূল্যমানে নামাইয়া না আনিলে ভারতীয় রপ্তানী বাড়াইবার, এমন কি পূর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করাও সম্ভব হইত না। দুঃখের বিষয় টাকার বিনিময়-মূল্য কমাইয়া দিবার পরও মূল্যবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত গতিতে উর্দ্ধদিকে এখনো চলিতেছে। ইহার পর গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি বাস্তবিক কতটা পরিমাণ হইয়াছে তাহার কোন সঠিক হিসাব এখনো করা হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু ভোগ্য পণ্যাদির বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ হইতে মনে হয় ইহার গড়পড়তা পরিমাণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। ইহার পরে কি ঘটিবে?—আরো কতটা পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে টাকার বিনিময়-মূল্য আবার কমাইতে সরকার বাধ্য হইবেন?

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পরিকল্পনাটির নতুন খসড়ার বিচার করিলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কথা। পরিকল্পনা কমিশনের কাল্পনিক পরিকল্পনাবিলাস দেশের যে অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাহার বিশদ বিশ্লেষণ আমরা গত মাসেই করিয়াছি। অনেকেই আশা করিতেছিলেন যে, অতীতের বিফলতা-প্রসূত অভিজ্ঞতার ফলে পরিকল্পনা কমিশনের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান হইবেন। ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া বাস্তব সঙ্গতির আয়তনের মধ্যে সীমিত রাখা হইবে। তাহার ফলে উন্নয়ন গতি মন্দীভূত হইলেও দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস্তব পন্থা অনুসরণ করিতে থাকিলে ক্রমে বর্ত্তমান সঙ্কট কাটাইয়া উঠা হয়ত সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনার যে খসড়া সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এই আশা সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়া গিয়াছে। ভারত সরকার তথা তাঁহাদের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন পরিকল্পনা কমিশনের কর্ম্মকর্ত্তাদের কল্পনা-বিলাস সংযত হইবার নহে; তাহার ফলে যদি দেশের লোকের প্রাণহানি হয়, তাহাতে তাঁহাদের কিছু আসে যায় না। দেশের কল্যাণের অজুহাতে ধার-দেনা করিয়া সংগৃহীত, ভিক্ষা করিয়া জোটান পুঁজির লগ্নীর অঙ্ক যতই বড় হইবে, ততটাই তাঁহাদের আশ্রিত গোষ্ঠী ত উপকৃত হইবেন—তাহা হইলেই ইঁহাদের সমাজবাদী উন্নয়ন প্রক্রিয়া সার্থক হইবে!

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের সংশোধন

সম্প্রতি নিখিল ভারত স্বর্ণ শিল্পী গোষ্ঠীর সত্যাগ্রহ ও পার্লামেণ্টে বিরোধী দল সমূহের চাপের ফলে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশের একটি ধারার কিঞ্চিৎ সংশোধন হইবে বলিয়া ভারত সরকারের অন্ত্র মন্ত্রণালয়ের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। কোন কোন দল স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার দাবি করিয়াছিলেন কিন্তু অর্থমন্ত্রী ইঁহাদের এই দাবী গ্রাহ্য করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। কেবল আদেশটির যে অংশটি স্বর্ণশিল্পীদের জীবিকা স্পর্শ করিতেছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছিল,—অর্থাৎ ১৪ ক্যারেটের অধিক মূল্যের স্বর্ণ দ্বারা অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে নিষেধটুকু প্রত্যাহৃত হইয়াছে। এখন হইতে স্বর্ণশিল্পীরা আগের মতনই গিনি সোনার, অর্থাৎ ২২ ক্যারেট মূল্যের সোনা দিয়া আবার অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। পার্লামেণ্টে বিষয়টির আলোচনার সময় দেখা গিয়াছে যে, কেবল মাত্র বিরোধী দলের মুখপাত্ররাই শুধু নন, কংগ্রেস দলেরও কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজি দেশাই যখন স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করেন, তখন নানা দিক হইতে ইহার বিরোধী সমালোচনা করা হয়। শোনা যায় যে, শ্রীমোরারজি দেশাই বিশেষ করিয়া কাষ্টমস বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের পরামর্শেই এই আদেশ জারি

করেন। কিন্তু যে ভাবে এই আদেশের ধারাগুলি রচিত ও জারি করা হয় তাহাতে তাঁহারাও সম্পূর্ণ খুশী হইতে পারেন নাই। এই আদেশ জারি করিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশে বিদেশ হইতে চোরা স্বর্ণ আমদানীর যে বিরাট কারবার গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে সংযত ও বন্ধ করা। এবং এই চোরা কারবারটি বন্ধ করিতে পারিলে চোরা মুনাফার টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়া গোপন করিয়া রাখিবার একটি প্রধান পথ বন্ধ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল।

সেই সময় আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই আদেশের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সত্যকার উদ্দেশ্য থাকিলে এই আদেশের প্রয়োগটি অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল। প্রথমতঃ সোনার হিসাব দাখিল করিতে বাধ্য করিয়া যে প্রাথমিক আদেশটি জারি করা হয় সেটি মূলতঃ কার্য্যকরী হইবার কোনই আশা ছিল না। কেননা একে ত অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে কোন হিসাব দাখিল করিবার দায়িত্ব এই আদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই; তার উপর অলঙ্কারাদি ব্যতীত অন্য রূপে রক্ষিত সোনার হিসাব বাস্তব এবং সম্পূর্ণ কিনা সেটি যাচাই করিবার কোন উপায় এই আদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

এই সম্পর্কে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের রাজ সরকার সোনার চোরা আমদানী তথা বিরাট পরিমাণ ট্যাক্স ফাঁকি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি আদেশ জারি করেন। কিন্তু আদেশটি জারি করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা দেশের সকল সাধারণ ও ব্যক্তিগত মালিকানায় সেফ্ ডিপোজিট ভল্টগুলি সীল করিয়া দেন। তাহার পর একটি আদেশে যাহার যে রূপে যত সোনা ছিল—সে অলঙ্কারই হউক বা অন্য কোন রূপেই হউক—তাহার সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করিতে বলা হয়। এই সকল হিসাব দাখিল হইবার পর একে একে সেফ ডিপোজিটগুলি সীলমুক্ত করিয়া প্রত্যেকের হিসাবের সঙ্গে সোনার সঞ্চয় মিলাইয়া লওয়া হয়; যেখানেই দাখিল করা হিসাব হইতে অধিকতর পরিমাণে সোনার সঞ্চয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই অতিরিক্ত সোনাটুকু তখনই সরকারী তহবিলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রচারিত হয় যে এ ভাবে ব্রহ্মদেশের মতন ছোট্ট একটি দেশেও সর্ব্বসাকুল্যে আন্তর্জ্জাতিক মূল্যমানে প্রায় ৬৭ কোটি টাকার মতন সরকারী কোষে জমা হয়। ইহার পর হিসাব অনুযায়ী সোনার সঞ্চয় কি ভাবে প্রত্যেকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দাবি করা হয়। এই ক্ষেত্রেও আবিষ্কৃত হয় যে সকলে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বিবরণ দিতে সমর্থ হন নাই। যে সকল ক্ষেত্রে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই, সে সকল ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, অন্তত অংশত এই সোনা চোরাকারবারের সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া মুনাফার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে এবং সেই পরিমাণ মূল্যের সোনাও সরকারী তহবিলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইহার উপরে একটি আদেশের দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে অলঙ্কার কিংবা অন্য কোন রূপে কতটা পর্য্যন্ত সোনার সঞ্চয় কেহ নিজ নিজ অধিকারে রাখিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই নির্দ্দিষ্ট সীমার উপরে যাহার যত সোনার সঞ্চয় ছিল সরকার তখনকার আন্তর্জ্জাতিক মূল্যমানে খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। এই ত্রিবিধ প্রয়োগ হইতে ব্রহ্মদেশের রাজতহবিলে মোটামুটি ১৬০ কোটি টাকার মতন আদায় হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহা হইতেও গুরুত্বপূর্ণ যে ফলটি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইল যে ভবিষ্যতের জন্য সোনার চোরা আমদানির কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিবার মতন সুযোগ প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমরা তখন বলিয়াছিলাম যে যেভাবে শ্রীমোরারজি দেশাইয়ের স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশ রচনা ও প্রয়োগ করা হইতেছে তাহার ফলে সোনার চোরা আমদানী কমিলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হইবে না; ফাঁকি দেওয়া রাজস্ব আদায় হইবে না এবং যে পরিমাণ চোরা অর্থ (unaccounted money) সোনার সরবরাহের অভাবে পড়িয়া থাকিবে তাহার দ্বারা ভোগ্য পণ্যাদির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। বস্তুতঃ হইয়াছেও ঠিক তাহাই। কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের উল্লিখিত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সত্ত্বেও সোনার চোরা আমদানীর কারবার গত কয়েক বৎসরে

এদেশে খুব বিশেষ পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। ইহাতে সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া মুনাফাবাজদের যে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছিল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহারা প্রথম হইতেই স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের বিরুদ্ধে নানা অজুহাতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন। এবং এসকল বিষয়ে আমাদের দেশে সর্ব্বদাই যাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে—ইঁহাদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে ইঁহারা রাজনৈতিক দলগুলিকেও সামিল করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। কংগ্রেস দলের কোন কোন বিশিষ্ট মুখপাত্রও যে এই সমালোচনায় যোগ দিয়াছেন এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। বস্তুতঃ মোরারজি দেশাই কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় ত্যাগ করিবার পর শ্রীটি.টি. কৃষ্ণমাচারী তাঁহার দ্বিতীয় দফার অর্থমন্ত্রীত্বের কালে স্বয়ং স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন, যদিও ইহা প্রত্যাহার করিতে তিনি ভরসা পান নাই।

সম্প্রতি স্বর্ণ শিল্পীদিগকে আশ্রয় করিয়া এই বিরুদ্ধ আন্দোলন আবার জোরদার করিয়া তোলা হইতেছিল। বস্তুতঃ স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রথম জারি হইবার পর কিছুদিন সোনার কারিগরদের খানিকটা অসহায় অবস্থা চলিয়াছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ সোনার গহনা যাঁহারা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা এতকাল গিনি সোনার অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের গহনাই ব্যবহার করিতেন। ইঁহাদের অনেকেরই নিকট গহনার মূল্য দেহসজ্জার উপাদান ব্যতীতও সঞ্চয়ের উপায় বলিয়া ব্যবহৃত হইত। নূতন ব্যবস্থায় ১৪ ক্যারেটের গহনার চাহিদা কি রকম হইবে তাহারও কোন নিশ্চিত নির্দ্দেশ তখন জানা ছিল না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই অনিশ্চয়তা নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের দ্বারা নিরসন হইয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় কলিকাতা মহানগরীতেই স্বর্ণশিল্প ব্যবসায়টি সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত ছিল। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের ফলে ইহার বিস্তৃতি কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অতি সহজেই ১৪ ক্যারেটের গহনা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে যে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল এমন প্রমাণেরও অভাব নাই। তবে একটা বিষয়ে স্বর্ণশিল্পীদের খুবই অসুবিধা হইতেছিল। ১৪ ক্যারেটের গহনা প্রস্তুত করিতে হইলেও পাকা সোনার প্রয়োজন হয়। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের বলে খোলা সোনার বাজার (bullion market) বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থা হইতে স্বর্ণ শিল্পীদিগকে তাঁহাদিগের সত্যকার বায়নার (orders) অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইবার কথা। যেমন সকল সরকারী প্রয়োগ সম্বন্ধেই সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, এ বিষয়ে ঘোরতর অব্যবস্থা প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। বারংবার অভিযোগ ও অনুযোগ সত্বেও আজও এ বিষয়ে কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই, কোন কালে হইবে এমন আশাও কেহ করিতে পারিতেছে না; ফলে চোরাবাজার হইতে অনেক অধিক মূল্যে সোনা সংগ্রহ করিয়া ইঁহাদিগকে জীবিকার কাজ চালাইতে হয়। এই ভাবেও—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের নিষেধ-বিধি সত্বেও—খানিকটা পরিমাণ চোরা সোনার কারবার এখনো চলিতেছে। বস্তুত স্বর্ণকারদিগের ন্যায্য সোনার চাহিদা পূরণ করিবার সরকারী সুবন্দোবস্ত হওয়া একান্ত ও আশু প্রয়োজন। বিরোধী দলগুলির তথা স্বর্ণকারদিগের নিজেদেরও ইহাই একমাত্র সঙ্গত দাবি হওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে সত্যকার স্বর্ণকারদিগের জীবিকা বিপন্ন বা বিঘ্নিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না

কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রত্যাহার করিবার দাবি লইয়া এবং স্বয়ং স্বর্ণকারদিগকে শিখণ্ডীর মতন আন্দোলনের পুরোভাগে রাখিয়া বিরোধী আন্দোলন জোরদার করিয়া তোলা হইয়াছিল। এই আন্দোলনের ভিত্তিমূলে কোনো সুষ্ঠু ও সৎ সামাজিক নীতির কোন বালাই মাত্র ছিল না বরং এই আদেশটিকে কেন্দ্র করিয়া একটা সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা ভবিষ্যতে গড়িয়া তুলিতে পারিবার যে অবকাশটুকু সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এই আন্দোলনের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মানসে সেটুকুকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইতেছিল। আশুনির্ব্বাচন আসন্ন। এই সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর যতটা দৃঢ় হইতে পারা উচিত ছিল, ততটা তিনি হইতে পারেন নাই। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণাদেশের মূল কাঠামোটিকে না ভাঙ্গিয়া দিয়া, তিনি ইহার প্রয়োগের একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপায়টিকে বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে এই অন্যায়টি করিতে বাধ্য করিলেন তাঁহারা দেশবাসীর মিত্র নহেন, স্বর্ণশিল্পীদিগেরও বন্ধু নহেন। ২২ ক্যারেটের গহনা প্রস্তুত করিবার স্বাধীনতা পাইয়া স্বর্ণশিল্পীদিগের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা যে নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। এই বিষয়ে পূর্ব্ব আদেশ প্রত্যাহার করিতে সরকারকে বাধ্য করিয়া বিরোধী আন্দোলনকারীরাও দেশের ও দেশবাসীর কোন উপকার সাধন করেন নাই, বরং প্রভূত ক্ষতি করিলেন। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নূতন ব্যবস্থা হইতে একমাত্র যাঁহারা লাভবান হইলেন তাঁহারা দেশের ঘোরতর শত্রু চোরাকারবারী মুনাফাবাজ সরকারী রাজস্ব-ফাঁকিবাজ।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩